মধ্যকালীন ভারত

[৬৫০ খ্রীঃ — ১৫৫৬ খ্রীঃ]

ভারতী লাইব্রেরী
৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক
অবিনাশ সাহা
ভারতী লাইব্রেরী
৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

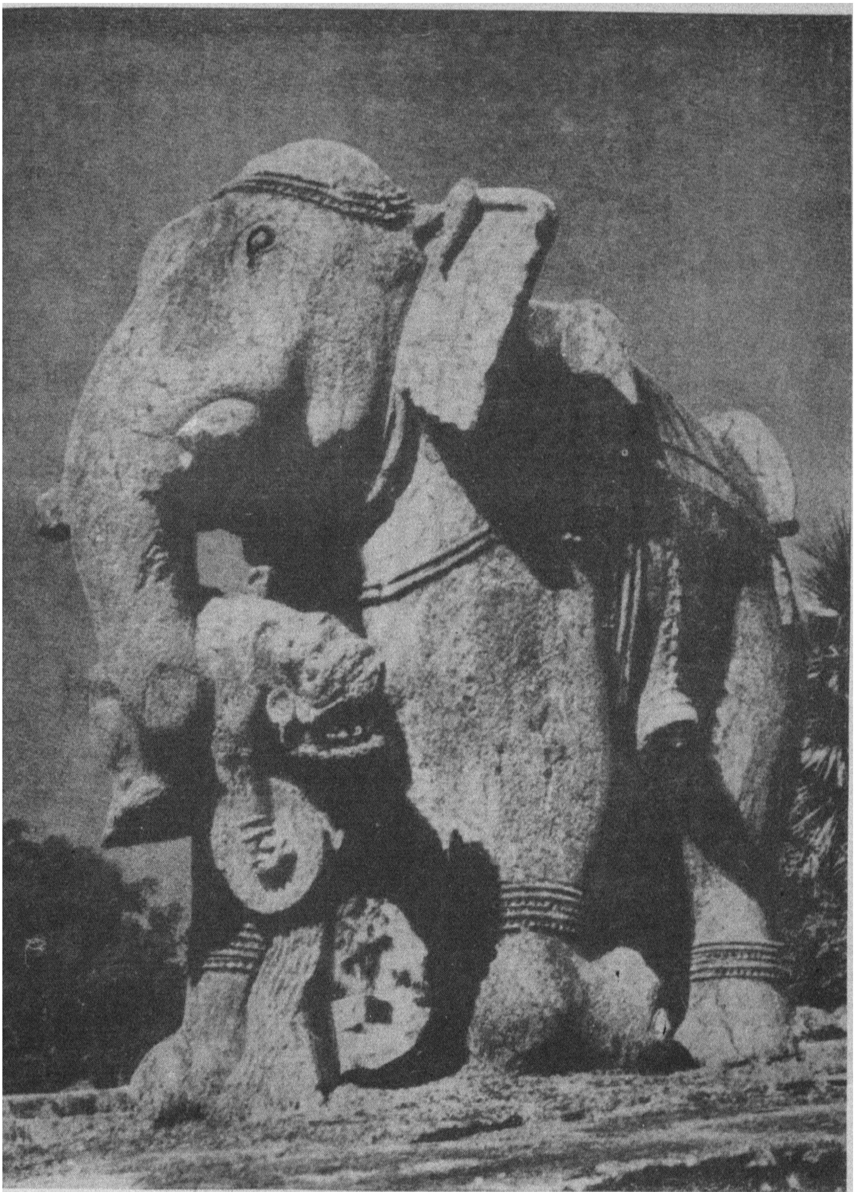
প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৬৭

মুদ্রাকর
রতিকান্ত ঘোষ
দি অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৯।এ, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

সূচীপত্র



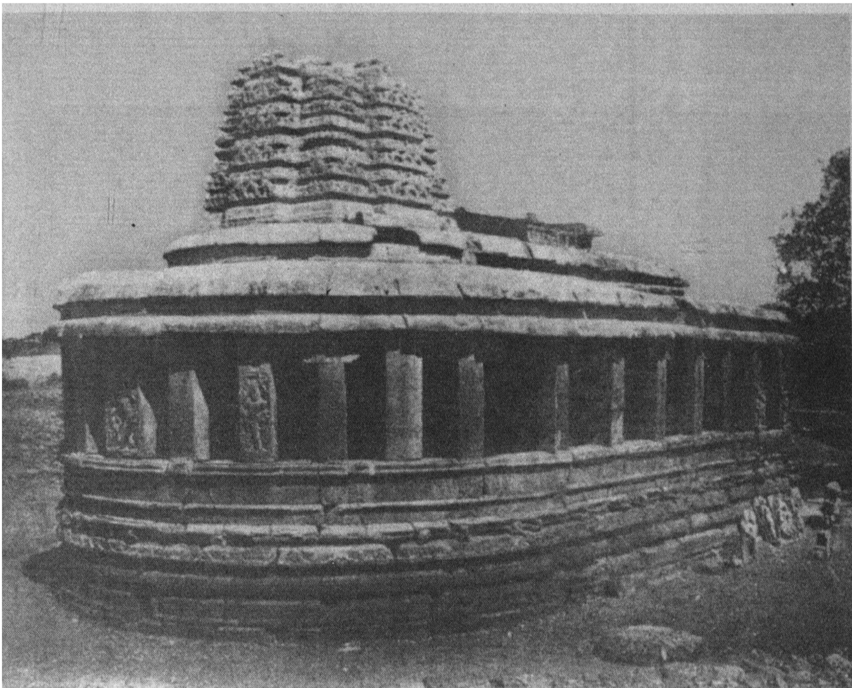
চিত্র - ১ নৃত্যরত নটরাজ (দশম শতক)



চিত্র - ২ কোনারক এর হাতি।



চিত্র - ৩ অমরাবতি।



চিত্র - ৪ আইহোল দুর্গামন্দির।



চিত্র - ৫ এলিফেন্টা ঃ ত্রিমূর্তি (নবম শতক)



চিত্র - ৬ হাম্পি।



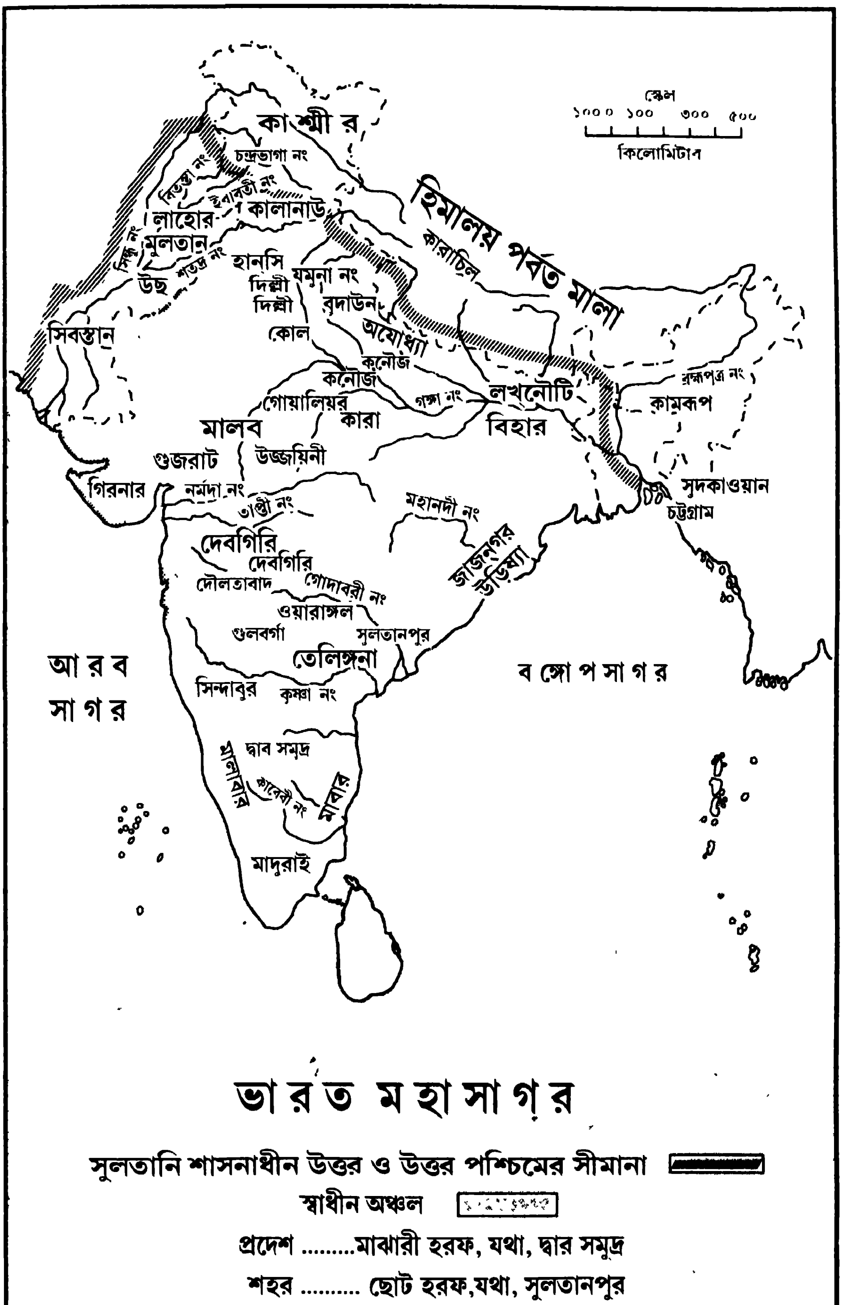
চিত্র - ৭ হোয়সলেশ্বর মন্দির।



দিল্লী সুলতানি
আনুমানিক ১২৮০ খ্রীষ্টাব্দে
ভারতের বর্তমান আন্তর্জাতিক সীমানা
স্কেল
১০০ ০ ১০০ ২০০ ৩০০ ৪০০
কিলোমিটার
ভারতে সুলতানি শাসনাধীন এলাকা
কাশ্মীর
হিমালয় পর্বতমালা
ভারত
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
ব্রহ্মদেশ
গান্ধার
গজনি
বামিয়ান
খাইবার গিরিপথ
কাবুল নং
পেশোয়ার
সিন্ধু নং
বিতস্তা নং
চন্দ্রভাগা নং
ইরাবতী নং
বিপাশা নং
শিয়ালকোট
লাহোর
জলন্ধর
ভাতিন্দা
মুলতান
শতদ্রু নং
উচ
হানসি
দিল্লী
সিবমুব
বিজনোর
বরণ
বুদাউন
নেপাল
বহবাইচ
তিরহুত
ভূটান
কচ
ব্রহ্মপুত্র নং
গৌহাটি
সেওয়ান
দেবল
জয়শলমীঢ়
নাগৌর
মান্দোব
সম্বর
আজমীঢ়
বয়ানা
গঙ্গা নং
কনৌজ
কলপি
অযোধ্যা
গোয়ালিয়র
চম্বল নং
বেতোয়া নং
মাহোবা
মাউন্ট আবু
চিতোর
কালিঞ্জর
শোন নং
বারাণসী
গঙ্গা নং
গৌড়
বুদ্ধগয়া
সোনারগাঁও
নদীয়া
ত্রিপুরা
সাতগাঁও
ভীলসা
অজয়গড়
উজ্জয়িনী
নর্মদা নং
তাপ্তী নং
জাজপুর
মহানদী নং

চিত্র - ৮

মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের আমলে দিল্লী সুলতানি



চিত্র - ৯

মধ্যকালীন ভারত

[৬৫০ খ্রীঃ — ১৫৫৬ খ্রীঃ]

প্রথম অধ্যায়

ইতিহাস চর্চা ও কালবিভাজন ঃ আদি-মধ্যযুগ সংক্রান্ত বিতর্ক
[Historiography : Periodisation : Debate on Early Medieval Period]

○ ইতিহাস চর্চা ও কালবিভাজন ঃ

ইতিহাসের যুগ বা কাল-বিভাজন করা হয় প্রধানত বোধগম্যতার সুবিধার্থে। তবে ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন যুগকে শুধুমাত্র কতকগুলি সময়কালে আবদ্ধ বর্ষগুচ্ছ বলা আদৌ সঠিক নয়। আবার কালের বেড়া দিয়ে ইতিহাসের অবিচ্ছিন্নতাকেও কঠোরভাবে পৃথক করা সম্ভব নয়। কারণ ইতিহাস বলতে যদি বুঝি মানবসভ্যতা ও মানব সমাজের উত্থান, অগ্রগতি বা সাময়িক অধোগতির ধারাবাহিক বিবরণ, তাহলে স্বীকার করতে হয় যে, একটি যুগ থেকে আর একটি যুগে উত্তরণের কোন কঠোরভাবে নির্দিষ্ট সময়কাল নির্দিষ্ট করা সম্ভব নয়। এই সভ্যতা ও সমাজের সম্মিলিত রূপই *'সংস্কৃতি'*। 'সংস্কৃতি' বা Culture শব্দটির সঠিক চরিত্র বা ব্যাখ্যা সম্পর্কে পণ্ডিতদের মতভেদ আছে। বিভিন্ন পণ্ডিত ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে 'সংস্কৃতির' ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন। তবে ইতিহাসের সাথে সংস্কৃতির গভীর যোগ সম্পর্কে কারোরই দ্বিমত নেই। এমনকি কেউ কেউ এই শব্দটিকে ইতিহাসের 'দ্বিতীয় নাম' হিসেবেও ব্যবহার করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, 'সংস্কৃতি' বলতে যদি বুঝি যে, এটি হল মানুষের সেইসকল বস্তুগত ও বৌদ্ধিক কর্মকাণ্ডের যোগফল, যার মাধ্যমে মানুষ তার জৈবিক ও-সামাজিক জীবনের চাহিদা পূরণ করতে সমর্থ হয়, তাহলে অবশ্যই এটিকে ইতিহাসের বিকল্প সত্তা বলা যায়।

ঐতিহাসিক *ই. এইচ. কার* (E. H. Carr) তাঁর What is History? শীর্ষক পুস্তকে বলেছেন, *"ইতিহাস হল ঐতিহাসিক ও তার সংগৃহীত তথ্যবলীর মধ্যে ধারাবাহিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং অতীত ও বর্তমানের মধ্যে অন্তহীন সংলাপ" (It is a contiauous process of interection between the historian and his facts, an unending dialogue between the past and the present : Carr.)*। এই অর্থে ইতিহাস হল এমন একটি লিখিত বিবরণ যার অন্তর্ভুক্ত হবে—(১) মানুষের জীবন ও সমাজের বিবরণ, (২) যে সকল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সমাজজীবন বিবর্তিত হচ্ছে, তার কাহিনী, (৩) যে সকল চিন্তা-চেতনা মানুষের ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রণ বা চালিত করে তার বর্ণনা এবং (৪) সেইসব বস্তুগত পরিপ্রেক্ষিত যা মানুষের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করে বা বাধা দেয়। ইতিহাসের এই সংজ্ঞায় মানবজীবন ও সভ্যতার সার্বিক প্রতিফলন দেখা যায়। এখানে সামাজিক কর্মকাণ্ডের বিবর্তনের চরিত্রের প্রেক্ষিতে কোন উপবিভাগ দ্বারা ইতিহাসকে সংকীর্ণ করা হয়নি।

বাস্তব চিত্র কিছুটা স্বতন্ত্র। বোধগম্যতার সুবিধার জন্য ইতিহাসের কালবিভাজন একটি স্বীকৃত সত্য। প্রাথমিকভাবে *প্রাচীন, মধ্য* ও *আধুনিক যুগ* নামে ইতিহাসের কালবিভাজন করা হয়। ইউরোপের ক্ষেত্রে এই বিভাজনের রীতি ভারতের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হয়। তবে কিছু প্রাচ্যবাদী

ঐতিহাসিক ভারত ইতিহাসকে জাতি-ধর্ম ভিত্তিক *হিন্দু যুগ, মুসলিম যুগ* ও *ব্রিটিশ যুগ* ইত্যাদি নামে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু জাতপাত ভিত্তিক এই বিভাজন কেবল অনৈতিহাসিক নয় অনৈতিকও। কারণ ভারত-ইতিহাসের কোন পর্যায়েই নির্দিষ্টভাবে কোন একটি জাতি বা ধর্মগোষ্ঠীর শাসন ছিল না। তথাকথিত হিন্দু যুগে ভারতে বহিরাগত জাতিগোষ্ঠীর শাসন ছিল, মুসলমানদের শাসনকালে বহু আঞ্চলিক হিন্দু রাজা বা গোষ্ঠীর শাসন ছিল, আবার ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রায় গোটা অধ্যায়ে স্থানীয়ভাবে মুসলিম, মারাঠা, শিখ শাসকদের অস্তিত্ব ছিল। এই বিচারে প্রাচীন, মধ্য, আধুনিক ইত্যাদি নামে কাল বা যুগ বিভাজন অধিক যুক্তিসঙ্গত। অবশ্য আন্তঃযুগ ধারাবাহিকতাকে কোনোভাবেই অস্বীকার করা সম্ভব নয়।

অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি কাল থেকে সমাজ ও ইতিহাস চর্চায় নতুন নতুন ধারণার উদ্ভব ঘটে। সমাজ বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ শাখা হিসেবে ইতিহাস এবং ইতিহাসের অন্যতম শাখা হিসেবে 'ইতিহাস চর্চার ইতিহাস' বা 'Historiography' গুরুত্ব পায়। ফরাসী দার্শনিক ভলতেয়ারের নেতৃত্বে আধুনিক ইতিহাস চর্চা প্রথম শুরু হয়। এই নতুন ঐতিহাসিকদের ইতিহাস চর্চাকে 'জ্ঞানদীপ্ত ইতিহাস চর্চা' Englightened Historiography বলা হয়। আধুনিক ইতিহাস চর্চায় প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রেও বাহ্যিক বিষয়বস্তুর পরিবর্তে অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তুর উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। ইতিপূর্বে রাজার ব্যক্তিগত মহিমা, রাজ্যাভিষেক, যুদ্ধযাত্রা, সন্ধি, সাম্রাজ্য প্রসার ইত্যাদি ইতিহাসের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। আধুনিক ইতিহাস চর্চায় এই সকল বাহ্যিক বিষয়বস্তুর পরিবর্তে সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি, আর্থ-সামাজিক জীবনের বিভিন্ন দিক অর্থাৎ মানবজীবনের অন্তর্নিহিত বিষয়গুলি ইতিহাস চর্চার কেন্দ্রে উঠে আসে। এতকাল ইতিহাস ধর্মের বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। এখন তা থেকে মুক্ত হয়ে ইতিহাস ধর্মনিরপেক্ষ সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে নিজের স্থান করে নিয়েছে।

অতি সম্প্রতি ইতিহাস চর্চার পদ্ধতি সম্পর্কে আরো একটা বিতর্ক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তা হল ইতিহাসের বিষয়বস্তু কিভাবে লেখা হবে। একদল ঐতিহাসিক মনে করেন, ঐতিহাসিকের কাজ কেবল তথ্যনিষ্ঠ ঘটনার উপস্থাপনা। অন্যদলের মতে, ঘটনার বস্তুগত উপস্থাপনার পাশাপাশি একজন ঐতিহাসিকের কাজ হল প্রাপ্ত তথ্যের বিচার-বিশ্লেষণ করে নিজের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা। প্রথম মতের সর্বশ্রেষ্ঠ সমর্থক হলেন জার্মান ঐতিহাসিক ***লিওপোল্ড-ভন র‍্যাঙ্কে***। তাঁর মতে, ঐতিহাসিকের প্রধান কাজ হল *'একনিষ্ঠভাবে ঘটনার উপস্থাপনা'* (Strict presentation of facts)। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক ***বিউরি*** (Bury) এই মত সমর্থন করে বলেছেন যে, ইতিহাস রচনায় থাকবে কঠোর বৈজ্ঞানিক নিয়ন্ত্রণ। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর উপস্থাপনার ক্ষেত্রে কোন কিছু বেশি বলবে না, আবার কমও বলবে না। তাঁর ভাষায়, *'History is a science, no less and no more,'* এই গোষ্ঠীর যুক্তি হল যে, ঐতিহাসিক ঘটনার ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করলে দৃষ্টিভঙ্গিগত প্রভেদ থাকতে বাধ্য। সেক্ষেত্রে ইতিহাসের বিষয়বস্তু একটা স্থায়ী বিতর্কিত বিষয়ে পরিণত হবে। এঁদের মতে, একমাত্র 'বিষয়গত' (objective) দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিহাস রচনা এই বিভ্রান্তি ও বিতর্কের অবসান ঘটাতে পারে। এই মতের তীব্র বিরোধিতা করেন ***লর্ড এ্যাকটন***। বিশিষ্ট এই ঐতিহাসিকের মতে, ঐতিহাসিক তথ্যের বিশ্লেষণ ছাড়া ইতিহাস চর্চা অর্থহীন। উনিশ শতকে ইউরোপের 'দৃষ্টবাদী' (Positivist) ঐতিহাসিক ***কোর্ত, বার্কলে*** প্রমুখ

ইতিহাস ও বিজ্ঞানের অভিন্নতার তত্ত্বপ্রচার করেন। কেউ কেউ ইতিহাসকে 'Social Physics' বলেও অভিহিত করেন। অর্থাৎ বিজ্ঞান যেমন কতকগুলি নিয়ম অনুযায়ী অগ্রসর হয় এবং বিভিন্ন সূত্র দিয়ে যেমন বিজ্ঞানের বিষয়গুলিকে ব্যাখ্যা করা যায় ; তেমনি ইতিহাসের সূত্র নির্ণয় করে সেই সূত্র ধরে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা করা যায় এবং রাষ্ট্র ও সমাজকে সঠিক পথ নির্দেশ করা যায়। এই বিতর্কের সমাধান হয়নি, তবে আধুনিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে বিশ্লেষণভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গিকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়।

○ আদি-মধ্যযুগের সূচনা ও বিতর্ক ঃ

ইতিহাসের সংজ্ঞা ও আধুনিক ইতিহাস চর্চা-সংক্রান্ত বিতর্কের প্রেক্ষিতে ভারতে 'আদি-মধ্যযুগ' নামক কালপর্বের আলোচনাটি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। ভারত-ইতিহাসের মধ্যযুগের আদিপর্ব বলে কোন কালবিভাজন সম্ভব কিনা এবং সম্ভব হলে সেই কালপর্ব নিরূপণের ভিত্তি কি হবে এ বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক আছে। সাধারণভাবে ঐতিহাসিকেরা গভীর আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের ভিত্তিতে প্রাচীন যুগ থেকে আদি-মধ্যযুগে উত্তরণের বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন। পণ্ডিতেরা প্রাচীনত্ব থেকে মধ্যযুগে কিংবা 'আদি-ঐতিহাসিক' থেকে 'আদি-মধ্যযুগে' রূপান্তরের ঘটনাটিকে প্রধানত প্রাচীন সাংস্কৃতিক মৌল (Civilizational matrix)-এর অবক্ষয়ের নিরিখে বিশ্লেষণ করেছেন। এই অবক্ষয় যে সামাজিক সংকট সৃষ্টি করে তার প্রেক্ষাপটে ঐতিহাসিকেরা ভিন্ন ভিন্ন কারণের আপেক্ষিক গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় হূন উপজাতির আক্রমণের উল্লেখ করেছেন। আর. এস শর্মা বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন সপ্তম শতকের ভূমিদান ব্যবস্থা ও সামন্ততন্ত্রের আবির্ভাবের ঘটনাকে। আবার ড. আর. এন. নন্দী তাঁর *Urban Decay in India* (c. 300–c. 1000) শীর্ষক গ্রন্থে নগরের অবক্ষয়জনিত সমস্যাকে সামাজিক সংকটের ভিত্তি হিসেবে তুলে ধরেছেন। আর.এস.শর্মা সাম্প্রতিক ইতিহাস চর্চায় পুরাণশাস্ত্রে ও অন্যান্য স্মৃতিশাস্ত্রে উল্লেখিত 'কলিযুগ'-এর ধারণার ভিত্তিতে সামাজিক সংকট তথা মধ্যযুগের আবির্ভাবের প্রসঙ্গটিকে ব্যাখ্যা করেছেন। উল্লেখিত কারণসমূহের ঐতিহাসিক সত্যতা, কালানুক্রম এবং পারস্পরিক সম্পর্কের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে এ বিষয়ে একটা ধারণা অর্জন করা যেতে পারে।

ঐতিহাসিক পর্ব হিসেবে 'আদি-মধ্যযুগ'-এর ধারণা ও প্রয়োগ ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে (১৯৫০ খ্রীঃ) বিশেষ গুরুত্ব পায়। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের জয়পুর ইতিহাস-কংগ্রেসেও বিষয়টি গুরুত্ব পায়। তবে তখন এই বিভাজনের ধারণা ছিল স্বতন্ত্র। তৎকালে ভারতের প্রাচীন যুগকে দু'টি ভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রথম পর্বের পরিধি ৭১১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। ৭১২ থেকে ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্বের পরিধি। এক্ষেত্রে সিন্ধুতে আরব মুসলমানদের আক্রমণকে প্রাচীন ভারতেরই একটি পৃথক অধ্যায়ের সূচনা পর্ব বলে বিবেচনা করা হয় এবং প্রচলিত ধারণা অনুযায়ীই দিল্লির সুলতানি শাসনের প্রতিষ্ঠার মুহূর্তকে প্রাচীন যুগের সমাপ্তি বলেই চিহ্নিত করা হয়। নতুনত্ব এই যে ভারতে দীর্ঘ মুসলমান শাসনকালকে দু'টি পর্বে ভাগ করার চেষ্টা এখানে করা হয়। ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ দিল্লিতে সুলতানি শাসনের সূচনা থেকে ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ দিল্লিতে মুঘল শাসনের প্রতিষ্ঠার কালকে 'আদি-মধ্যযুগ' নামাঙ্কিত করা

হয়।[1] বিশিষ্ট পণ্ডিত ও ইতিহাসবিদ্ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার, কে. এ. নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী, আর. এস. ত্রিপাঠী প্রমুখের লেখা প্রাচীন ভারত বিষয়ক গ্রন্থাদিতে ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইতিহাস সন্নিবিষ্ট হয়েছে। *ড. রামশরন শর্মা* এই ঘটনাকে তথাকথিত ব্রিটিশ পদ্ধতি অর্থাৎ প্রাচীন ভারতকে হিন্দু ভারত এবং মধ্যযুগের ভারতকে মুসলমান ভারত নামে অভিহিত করার প্রয়াসের ফল বলে মনে করেন। তিনি লিখেছেন, *"আগের প্রজন্মের হিন্দু-মুসলমান উভয় ঐতিহাসিকদের বদ্ধ সংস্কার হচ্ছে তাঁরা মধ্যযুগের সাথে মুসলমান শাসনকে একীকরণ করেন।"*[2] সমস্যা হল যে, মুসলমান শাসনকে মধ্যযুগের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করলে বলতে হয় যে, নেপালে কদাপি মধ্যযুগের আবির্ভাব ঘটেনি, কিংবা তুরস্ক, মিশর, ইরাক, ইরান প্রভৃতি দেশ স্থায়ীভাবেই মধ্যযুগেই আটকে আছে। কিন্তু এমন ধারণা ইতিহাসগতভাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

ড. নীহাররঞ্জন রায় যাটের দশকের শেষ দিকে নিছক কালানুক্রমভিত্তিক ইতিহাসের যুগ-বিভাজনের পরিবর্তন দাবি করেন। তাঁর মতে, কালভিত্তিক যুগ-বিভাজন অবশ্যই সেই যুগের বিশেষত্ব দ্বারা সমর্থিত হওয়া উচিত। অতঃপর এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুরু হয়। ইতিহাসের ধারাবাহিকতা সত্ত্বেও দুটি পৃথক কালক্রমের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধানের উপর গুরুত্ব অর্পিত হয়। আদি-মধ্যযুগ সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য আদি-মধ্যযুগ বলতে কি বোঝা হয় এবং কিসের ভিত্তিতে আদি-মধ্যযুগের নামাঙ্কন করা হয়েছে, তা স্পষ্ট হওয়া আবশ্যিক। 'আদি-মধ্যযুগ' নামক একটি প্রাক্-পর্যায়ের অস্তিত্ব স্বীকার করার মাধ্যমে ইতিহাসের ধারায় নিরবচ্ছিন্নতার পাশাপাশি একটি পরিবর্তনশীলতার কথাও মান্য করা হয়। *ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়ের* মতে, প্রাচ্যবাদী (Orientalist) লেখকদের উন্নাসিকতা এবং ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তনহীনতা সম্পর্কে ভ্রান্ত প্রত্যয়কে মিথ্যা প্রমাণিত করার কাজে 'আদি-মধ্যযুগের' ধারণার উদ্ভব গুরুত্বপূর্ণ। তবে পরিবর্তনশীলতাকে মেনে নিলেই সমস্যার সমাধান হয় না। কারণ ভারতীয় সমাজ ও জীবন ধারার প্রেক্ষিতে এই পরিবর্তনে ধারা ও প্রকৃতি সম্পর্কে পণ্ডিতদের মতভেদ থাকা অস্বাভাবিক নয়। তাই *ড. চট্টোপাধ্যায়* মনে করেন এই বিতর্কের সমাধানের জন্য কয়েকটি বিষয়ে যত্নবান হওয়া আবশ্যিক। যেমন—(ক) প্রাচীন যুগ থেকে আদি-মধ্যযুগে উত্তরণের পরিবর্তনসমূহের প্রকৃতি নিরূপণ, এক্ষেত্রে প্রাচীন যুগ বলতে সঠিক কি বুঝি সে বিষয়ে ব্যাখ্যা এবং পরবর্তীকালীন পরিবর্তনসমূহের তুলনামূলক আলোচনা আমাদের সাহায্য করতে পারে। (খ) ইতিহাসের একটি বিশেষ পর্যায় হিসেবে 'আদি-মধ্যযুগ' নামাঙ্কিত কালপর্বে কি ধরনের পরিবর্তন সূচিত হয়েছে, সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা ইত্যাদি।

'প্রাচীন-যুগ', 'আদি-মধ্যযুগ' প্রভৃতি নামের বহুমাত্রিক ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। এবং এই সকল ব্যাখ্যা সকলের মনঃপুত না হওয়াই স্বাভাবিক। তবে এই ধরনের কালবিভাজন যে ইতিহাস চর্চার অঙ্গ হওয়া উচিত, তা প্রাচীন যুগ সম্পর্কে ইতিহাস চর্চার আপাত পরিণতি থেকে বোঝা যায়। একসময় মনে করা হত যে আর্যদের আগমনকাল থেকেই ঐতিহাসিক যুগের সূচনা হয়েছে, যা সার্বিকভাবে প্রাচীন যুগের প্রাক্-মুহূর্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়। ১০০০ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমানদের

আক্রমণের ফলে সেই ধারায় ছেদ পড়ে এবং পরবর্তী ঐতিহাসিক পর্যায় অর্থাৎ মধ্যযুগের সূচনা হয়। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে তথাকথিত প্রাচীন যুগের আগেও ধারাবাহিক সাংস্কৃতিক স্তরের অস্তিত্ব ছিল। প্রাক্-আর্য পর্বের এই সময়কে ধর্মানন্দ দামোদর কোশাম্বী বলেছেন 'লিভিং প্রি-হিস্ট্রি' (Living Pre-history)। অর্থাৎ ভারত উপমহাদেশের প্রস্তর যুগ, হরপ্পা সংস্কৃতির যুগ, বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাক্ লৌহযুগ, এমনকি লৌহ যুগকেও সামগ্রিকভাবে 'প্রাচীন যুগ'-এর শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট করা যায় না। 'প্রাক্-ইতিহাস' নামাঙ্কন দ্বারা এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে এর পরে এসেছে 'প্রায়-ইতিহাস' বা Proto-History পর্যায়টি এবং এরই পরিণত রূপটি হল অতি পরিচিত 'প্রাচীন যুগ'। একইভাবে বলা যায় যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগের মধ্যবর্তী স্তরে একটি স্বতন্ত্র স্তরের অস্তিত্ব কল্পনা করা অনৈতিহাসিক হবে না।

আধুনিক ইতিহাস চর্চার ব্যাকরণ মেনে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় 'আদি-ইতিহাসযুগ' বা তথাকথিত প্রাচীন যুগের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের সার্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করে সেগুলির পরিবর্তনের ভিত্তিতে মধ্যযুগের আবির্ভাবের ব্যাখ্যা করেছেন। (ক) 'রাজন্য' শাসিত আঞ্চলিক রাজ্য ব্যবস্থার অবসান এবং মৌর্য ও গুপ্ত রাজাদের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে ভারতীয় রাজনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। রাজকর্মচারীদের বেতন দেওয়া হত নগদ অর্থে এবং ভূমিভিত্তিক অভিজাতদের অস্তিত্ব ছিল না। (খ) সরল মুদ্রা অর্থনীতির প্রচলন এ যুগে দূরপাল্লার বৈদেশিক বাণিজ্য এবং নগরায়ণের কাজ ত্বরান্বিত করে। হস্তশিল্পের গ্রামীণ উৎপাদনের ক্ষেত্রে গ্রাম-সমিতির কর্তৃত্ব এবং জমির উপর গোষ্ঠী-মালিকানার অস্তিত্বও প্রাক্ মধ্যযুগকে বিশিষ্টতা দেয়। (গ) সামাজিক জীবন ছিল কঠোরভাবে বর্ণভিত্তিক। রাজন্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ শ্রেণী ছিল সুবিধাভোগী ও কর্তৃত্বের অধিকারী। বৈশ্যারা ছিল প্রধান কর প্রদানকারী এবং দৈহিক শ্রমের দায়বদ্ধতা ছিল শূদ্র শ্রেণীর ওপর ন্যস্ত। দাস প্রথার অস্তিত্ব ছিল। (*"The existence of 'Slavery' in various forms was also an attribute of the period....that labour represented a pre-'Serfdom' phase."*)[1] ভারতীয় সমাজ ও অর্থনীতির এই সকল বৈশিষ্ট্যের চূড়ান্ত প্রকাশ দেখা যায় তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে। এই সকল প্রাক্ মধ্যযুগীয় বা আদি-ঐতিহাসিক (early historical) বৈশিষ্ট্যের রূপান্তরের ভিত্তিতে 'আদি-মধ্যযুগে'র আবির্ভাবের বিষয়টি অনুধাবন করা সম্ভব।

অধ্যাপক ***নীহাররঞ্জন রায়*** 'মধ্যযুগ' তত্ত্বের বহুমাত্রিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন।[2] তাঁর মতে, সপ্তম শতকে মধ্যযুগের প্রক্রিয়ার সূচনা হয় এবং পরবর্তী এক শতকে তা স্পষ্ট রূপ নেয়। অধ্যাপক রায় মধ্যযুগকে তিনটি উপপর্বে বিভক্ত করেছেন। প্রথম পর্বের পরিধি সপ্তম শতক থেকে দ্বাদশ শতক। দ্বিতীয় পর্বের সময়কাল দ্বাদশ শতক থেকে ষোড়শ শতকের প্রথম পঁচিশ বছর এবং তৃতীয় পর্বের পরিধি অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত। মধ্যযুগের উপবিভাগীকরণের ক্ষেত্রে অধ্যাপক রায় কোন বিশেষ ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেননি। তিনি সামগ্রিকভাবেই ভারতে মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্যগুলির উপস্থাপনা করেছেন। যেমন—(১) এই পর্বে আঞ্চলিক রাজতন্ত্রের উত্থান ও প্রতিষ্ঠা ঘটে। ইউরোপের জাতীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থার উত্থানের সাথে এই

রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাযুজ্য লক্ষ্যণীয়। (২) মুদ্রা অর্থনীতির পরিবর্তে স্বাভাবিক অর্থনীতির বিকাশ ঘটে। (৩) সামাজিক ভাব বিনিময়ের উপাদানসমূহ, যেমন—লিপি, ভাষা, সাহিত্য ইত্যাদির ক্ষেত্রেও আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য প্রকটিত হয়। ইউরোপে মধ্যযুগের সূচনার সাথে এই ব্যবস্থার অদ্ভুত মিল দেখা যায়। (৪) ধর্মের ক্ষেত্রে অসংখ্য সম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায় এবং জাতি ও উপজাতি ভিত্তিক ধর্ম সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। (৫) শিল্পকলা বা সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও আঞ্চলিক বৈচিত্র্যের প্রাবল্য দেখা যায়। (৬) ভারতীয় শিল্পকলার পরিবর্তে পূর্ব ভারতীয়, পশ্চিম ভারতীয়, মধ্য ভারতীয়, দক্ষিণী শিল্পধারা ইত্যাদি আঞ্চলিক ভিত্তিতে শিল্পচর্চার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। দক্ষিণী শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে আবার চোল শিল্প, পল্লব শিল্প ইত্যাদি আঞ্চলিক ধারার স্বাতন্ত্র্য ও বিশিষ্টতা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় মনে করেন, ভারতীয় ইতিহাস চর্চার প্রেক্ষিতে বোঝা যায় যে ভারতে তুর্কী শাসন প্রতিষ্ঠার কয়েক শতক আগে থেকেই মধ্যযুগীয় উপাদানের অস্তিত্ব ছিল এবং আদি-মধ্যযুগীয় পরিস্থিতি অনুধাবন করার জন্য ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

ভারতে আদি-মধ্যযুগের সূচনাকারী প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভবের প্রসঙ্গটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন ড. ***রামশরণ শর্মা*** তাঁর 'ইন্ডিয়ান ফিউডালিজম' শীর্ষক গ্রন্থে। এই প্রসঙ্গে ভারতে আদি-মধ্যযুগের সূচনাকাল-সংক্রান্ত বিতর্কটিও তাঁর 'আর্লি মিডিয়াভ্যাল ইন্ডিয়ান সোসাইটি' গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। অধ্যাপক শর্মার মতে, কেবল রাজনৈতিক কেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থার অবক্ষয় কিংবা আঞ্চলিকতাবাদের প্রসারের বিচারে সপ্তম শতককে ভারতে আদি-মধ্যযুগের সূচনাকাল বলা যুক্তিযুক্ত হবে না। কারণ মৌর্য বা গুপ্ত রাজারা ভারতের বৃহত্তর স্থায়ী রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে তুলতে পারেননি। তেমনি এদের পতনের পরে রাজনৈতিক বিভাজন ভারতে ইতিহাসের কোন স্থায়ী বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়নি। কিন্তু প্রাক্ গুপ্তযুগীয় ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রকৃতির সাথে উত্তর ভারতে হর্ষবর্ধন বা দক্ষিণ ভারতে পল্লব ও চালুক্যদের পার্থক্য দেখা যায়। প্রাক্ গুপ্তযুগে প্রশাসনের ভিত্তি ছিল বিভিন্ন স্তরের আমলা। এদের বেতন দেওয়া হত নগদ অর্থে। কিন্তু গুপ্তযুগে এবং নির্দিষ্টভাবে গুপ্তযুগের পরবর্তীকালে অর্থাৎ সপ্তম শতকের প্রায় মাঝামাঝি সময় থেকে ধর্মীয় ও প্রশাসনিক কাজের পারিশ্রমিক দেওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিদান গুরুত্ব পায়। আঞ্চলিক প্রশাসনের দায়িত্ব ভূমিস্বত্ব-ভোগীদের হাতেই ন্যস্ত হয়। স্বভাবতঃই রাষ্ট্রপ্রধান বা রাজার ক্ষমতা অনেকটাই হ্রাস পায়। ড. ***শর্মা*** লিখেছেন, *"অনেকগুলি রাজধানীর অস্তিত্ব কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের দুর্বলতাই নির্দেশ করে। প্রাচীন পুঁথিতে দুর্গ সমন্বিত রাজধানী বা দুর্গকে রাষ্ট্রের একটি বিশেষ অঙ্গ মনে করা হত। কিন্তু আদি-মধ্যযুগে একজন রাজার কয়েকটি রাজধানী থাকত। স্পষ্টতই নগর দুর্গগুলি রাজা, প্রজা ও বৃহৎ ভূস্বামীদের সুরক্ষার জন্য তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ও কৃষকদের বিরুদ্ধে নির্মিত হয়েছিল এবং এটাই ছিল আদি-মধ্যযুগের চিত্রের একটি অংশ।"*[1]

অধ্যাপক শর্মার মতে, শেষ পর্যন্ত প্রাচীন ভারতীয় সমাজ থেকে মধ্যযুগীয় সমাজে রূপান্তরের প্রধান কারণ ছিল নতুন ভূমিদান ব্যবস্থা। গুপ্তযুগের শেষদিকে 'অগ্রহার' ব্যবস্থার

মাধ্যমে প্রথমে ব্রাহ্মণ, পুরোহিত ও ধর্মস্থানকে নিষ্কর ভূমিদান শুরু হয়। ৩০০ থেকে ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ সময়কালে ভূমিদান ব্যবস্থা সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে এক নতুন প্রবণতার জন্ম দেয়। খ্রীষ্টীয় ৬৫০—১২০০ সময়কালে এই ব্যবস্থা পরিণত রূপ পায়। অগ্রহার ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে প্রদত্ত ভূখণ্ডের উপর (আবাদি বা অনাবাদি জমি বা গ্রাম) দানগ্রহীতার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। দানগ্রহীতা ক্রমে ভূস্বামীতে পরিণত হন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অব্রাহ্মণ বা শাসক শ্রেণীর লোকেরাও বেতনের পরিবর্তে ভূখণ্ড ভোগদখলের অধিকারী হন। রাজস্ব আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ভূস্বামী আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করার অধিকারী হন। ভূমি ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানার প্রসার এবং ভূস্বামীদের ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা শিথিল ও খণ্ডিত হয়। রাজা তাঁর অধীনস্থ সামরিক কর্মচারী বা শাসক কর্মচারীদের বৃহৎ ভূখণ্ডের প্রশাসনিক দায়দায়িত্ব ছেড়ে দিলে সামন্ততান্ত্রিক প্রবণতা জোরালো হয়। এই ব্যবস্থার সাথে মধ্যযুগের জায়গির ব্যবস্থার সাদৃশ্য দেখা যায়।[1] এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির সমর্থনে অধ্যাপক শর্মা পুরাণশাস্ত্রে বর্ণিত ***'কলিযুগ'*** তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। আনুমানিক পঞ্চম শতকে পুরাণ কাহিনী সংকলিত হয়। এখানে বর্ণিত চারটি যুগের শেষতম পর্বটি 'কলিযুগ' নামে বর্ণিত ও নিন্দিত। এই যুগের বৈশিষ্ট্যই হল অস্থিরতা, বিশৃঙ্খলা ও আর্থ-সামাজিক সংকট। এই বর্ণনার ঐতিহাসিক সত্যতা সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়। কিন্তু সপ্তমশতকে ভারতের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, কৃষকদের দুঃখ- দুর্দশা, বাণিজ্যের অবনতি ইত্যাদির ইঙ্গিত এই বর্ণনা থেকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা অবাস্তব নয়। গুপ্তদের পতনের পর ভারতের রাজনীতি, সমাজ ও অর্থনীতিতে আঞ্চলিকতার বিকাশ এই যুগ পরিবর্তনের আভাস দেয়। সমকালের বৃহৎ শক্তিগুলি আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য দ্বারাই চিহ্নিত হয়। যেমন—বাংলায় পাল ও সেন বংশ, উত্তর ও পশ্চিম ভারতে গুর্জর প্রতিহার, দক্ষিণ ভারতে রাষ্ট্রকূট ও চোল বংশ ইত্যাদি। স্থাপত্য, ভাস্কর্য, ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও আঞ্চলিক বৈচিত্র্য যুগ পরিবর্তনের পূর্বাভাষ দেয়। অনুরূপভাবে সামন্ত ব্যবস্থার বিকাশ সামাজিক ধন উৎপাদনের ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক ভোগ ও আঞ্চলিক প্রয়োজনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়। উদ্বৃত্ত পণ্যের অভাব ব্যবসা-বাণিজ্যের সংকোচন ঘটায়। পণ্য বিনিময়ের সুযোগ কমে যাওয়ায় এক বদ্ধ অর্থনীতির জন্ম হয়। সপ্তম শতকে ভারতীয় অর্থনীতি ও রাজনীতির সমরূপ বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে এই পর্যায়কে 'আদি-মধ্যযুগ' নামাঙ্কিত করা সম্ভব।

আদি-মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্য হিসেবে অধ্যাপক শর্মা ও যাদব (B. N. S. Jadav) ব্যবসা-বাণিজ্যের পতন ও নগরের অবক্ষয়ের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেন। এঁদের মতে, ষষ্ঠ শতক থেকে ভারতের দূর বাণিজ্যে মন্দা আসে। এই সময়ে রোম, ইরান ও বাইজানটিয়ামের সাথে সমৃদ্ধ রেশম বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়। একাদশ শতকের মধ্যেই ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যে আরব বণিকদের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ কায়েম হয়ে যায়। খ্রীষ্টীয় ৬০০ থেকে ৯০০ অব্দ সময়কালে সোনা ও অন্যান্য ধাতু মুদ্রার স্বল্পতা বাণিজ্যের মন্দার প্রমাণ দেয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের মন্দা নগরের অবক্ষয় নিয়ে আসে।[2] শর্মা তাঁর 'পারস্পেকটিভস ইন সোস্যাল এণ্ড ইকনমিক হিস্ট্রি অফ আর্লি ইন্ডিয়া' শীর্ষক গ্রন্থেও গুপ্তোত্তর যুগে বাণিজ্যিক নগরের অবক্ষয় ও পতনকে আদি-

মধ্যযুগের সূচনাকারী বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করেছেন। তবে *অধ্যাপক ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়* সপ্তম শতকে নগরের অবক্ষয়ের কথা মেনে নিলেও, এই ব্যবস্থা যে সার্বিক ছিল না, তা পুরাতাত্ত্বিক সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করেছেন।

অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় ষষ্ঠ থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যবর্তীকালে ভারতে আঞ্চলিক শক্তিগুলির উত্থান ও বিকাশকে আদি-মধ্যযুগের সূচনা তথা বিশিষ্টতার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। রাজস্থান অঞ্চলকে গবেষণার ভিত্তি করে তিনি দেখিয়েছেন যে সপ্তম শতকের পর থেকে রাজস্থানে 'রাজপুত' নামে একটি সামাজিক গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। এই গোষ্ঠীর মধ্যে যেমন 'হূন'দের মত বিদেশী উপাদান ছিল ; তেমনি ছিল ভারতীয় চৌলুক্য ও গুহিলট বা গুহিলো'দের মত দেশজ উপাদান। কোন কোন ক্ষেত্রে একই বংশজাত একাধিক গোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ হয়ে বৃহত্তর ও শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। গুজরাট ও রাজস্থানের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে গুহিলোদের একাধিক গোষ্ঠীর আঞ্চলিক ছোট ছোট রাজ্য ছড়িয়ে ছিল। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে গুহিলোদের 'নাগদা-আহর' গোষ্ঠী মেবারকে কেন্দ্র করে একটি শক্তিশালী রাজ্য গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। *অধ্যাপক বি. ডি. চট্টোপাধ্যায়* দেখিয়েছেন যে, সপ্তম-অষ্টম শতকে রাজস্থানের নানা অঞ্চলে ভূমি বন্দোবস্তের ভিত্তিতে শক্তি সঞ্চয়কারী এবং মূলত কৃষিজীবী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে কেউ কেউ রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছিল। দৃষ্টান্ত হিসেবে গুর্জরদের নাম উল্লেখ করা যায়। পশ্চিম ভারতে আদি-মধ্যযুগে উদ্ভূত একাধিক রাজবংশের মধ্যে গুর্জর রক্তের অস্তিত্ব দেখা যায়।[1] পূর্বাঞ্চল উড়িষ্যা বা দাক্ষিণাত্যে চোল, পল্লব, পাণ্ড্য রাজ্যের উত্থানে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ও কৃষি ভিত্তির সন্ধান পাওয়া যায়।

অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের মতে, আদি-মধ্যযুগের গঠন পর্বের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কোন সার্বজনীন সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়। অঞ্চল ভিত্তিতে এই রূপান্তরের চরিত্রগত বা গঠনগত বৈচিত্র্য থাকতেই পারে। তবে পরিবর্তনশীলতার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পণ্ডিতেরা সহমত পোষণ করেন। কারণ, এই গুণাবলীসমূহ আদি-ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যসমূহ থেকে স্পষ্টরূপে স্বতন্ত্র এবং বিপরীত। ***প্রথমত,*** আদি-ইতিহাস যুগে ভারতীয় রাজনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল কেন্দ্রমুখী ও কেন্দ্রবিমুখ প্রবণতার দোদুল্যমানতা। কিন্তু গুপ্ত-উত্তর যুগে কেন্দ্রমুখী ও আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তে বিকেন্দ্রীভূত ও ক্রমোচ্চ স্তর বিশিষ্ট আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ঘটে যেখানে অসংখ্য প্রায় স্বাধীন সামন্ত, উপসামন্ত ও অনুরূপ কর্তৃপক্ষের অস্তিত্ব ছিল। ***দ্বিতীয়ত,*** গুপ্ত পরবর্তী যুগে সামন্ততান্ত্রিক উপাদান-সমৃদ্ধ একটি ভূমিভিত্তিক মধ্যস্বত্বাধিকারী শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। এর দ্বারা ভারতের রাজনৈতিক কেন্দ্রমুখীনতা এবং ভূমি-সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটে। প্রাক্-গুপ্তযুগে এরূপ ভূম্যাধিকারী সামাজিক গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিল না। এই সামাজিক শ্রেণীর উত্থান রাষ্ট্র কর্তৃত্বের বিচ্ছিন্নতা ও বিকেন্দ্রীকরণ ত্বরান্বিত করে। ***তৃতীয়ত,*** আদি-ঐতিহাসিক যুগ থেকে আদি-মধ্যযুগে রূপান্তরের ধারায় প্রাচীন ঐতিহাসিক নগর কেন্দ্রগুলির এবং বাণিজ্যিক যোগসূত্রের পতন ছিল গুরুত্বপূর্ণ। পরিণামে রাজার অর্থনীতি বা মুদ্রা অর্থনীতির পরিবর্তে স্বনির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতির আবির্ভাব ঘটে। নগদ

অর্থের সংকটের ফলে কর্মচারীদের বেতন নগদ অর্থের পরিবর্তে ভূমি বন্দোবস্তের মাধ্যমে দেওয়া শুরু হয়। এই সূত্রে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী গ্রামমুখী হয় এবং কৃষি-সম্প্রসারণ ঘটে। গ্রাম সমাজে দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতার শর্তে *'যজমানী ব্যবস্থা'* গড়ে ওঠে। ***চতুর্থত,*** আদি-ঐতিহাসিক কৃষি-সংগঠনে স্বাধীন কৃষক হিসেবে বৈশ্য সম্প্রদায় এবং শ্রমজীবী শূদ্র শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু গুপ্ত-পরবর্তী পর্যায়ে প্রায়-ভূমিদাস চরিত্র বিশিষ্ট এমন এক কৃষক শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে যারা বহুলাংশে জমির সাথে আবদ্ধ, যাদের কাছ থেকে প্রভু জোর-পূর্বক শ্রম আদায় করে এবং শাসক আদায় করে অযৌক্তিক ধরনের উচ্চ-রাজস্ব। ড. *চট্টোপাধ্যায়* লিখেছেন, *"The condition of the peasantry in this pattern of rural stratification was in sharp contrast to what the agrarian structure in early historical India represented."*[1] ***পঞ্চমত,*** গুপ্ত পরবর্তী যুগ জাতি-বিস্তার ও বিচ্ছিন্নতার যুগ হিসেবে চিহ্নিত। এই সময় প্রচলিত বর্ণ থেকে অনেকগুলি জাতির জন্ম হয়। বহু নতুন উপজাতি ও জাতি তাদের সাথে যুক্ত হয়। ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ে রাজপুত নামে নতুন জাতির উত্থান জাতি-বিস্তার দ্রুত করে। এদের কেউ কেউ ক্ষত্রিয় থেকে এসেছে। চালুক্য, চান্দেল ও পালরা সম্ভবত ব্রাহ্মণ কুলজি শাস্ত্রকারদের দ্বারা সম্মানীয় ক্ষত্রিয় কুল পেয়েছিলেন। আদি-মধ্যযুগ এদের শাসনকর্ম দ্বারা চিহ্নিত। ব্যাকট্রিয়, গ্রীক, শক ও প্রার্থীয়গণ হিন্দু সমাজে দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষত্রিয় হিসেবে গৃহীত হয়। ষষ্ঠ শতকে হূন ও গুর্জররা রাজপুত হিসেবে গণ্য হলে ক্ষত্রিয়দের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সপ্তম শতকে গুরুমুখী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়-সমূহ এবং শৈব, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ ও জৈনদের মধ্যে দ্রুত বেড়ে ওঠা সম্প্রদায়গুলি ক্রমে স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে পরিচিত হয়।[2] প্রাক্-গুপ্তযুগে 'বর্ণসংকর' ব্যবস্থার অস্তিত্ব জাতি-বিকাশের সম্ভাবনা দেখালেও, কার্যত গুপ্ত-পরবর্তী যুগেই জাতি ব্যবস্থার ব্যাপকতা দেখা যায়, ফলে আদি-মধ্যযুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে গ্রহণ করা যায়। ***ষষ্ঠত,*** সপ্তম শতকে ধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতির সামন্ততান্ত্রিক চরিত্র আদি-মধ্যযুগের আবির্ভাবের সূচক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। এই সময় ধর্ম দর্শনের মর্মকথা ছিল 'ভক্তি'। ভক্তিবাদের শিক্ষায় সামন্ততান্ত্রিক উপাদান খুঁজে পাওয়া সম্ভব। ভক্তিবাদে ভক্ত ও ঈশ্বর বা গুরু-শিষ্যের সম্পর্কের প্রধান ভিত্তি হল 'আনুগত্য' ও 'আত্মত্যাগ'। সামন্ত ব্যবস্থার ভিত্তিও হল প্রভু ও প্রজার পারস্পরিক আনুগত্য ও নির্ভরতা ('The core of ideology of the period is seen to be characterised by 'Bhakti', which was feudal in content, since it accentuated the relationship of loyalty and devotion, which are believed to be hallmarks of feudal ties.')[3] গুপ্ত পরবর্তী যুগে ব্রত ও উৎসবের সংখ্যাবৃদ্ধির বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। গুপ্ত-পূর্ব গ্রন্থগুলিতে ব্রত'র সংখ্যা ছিল সীমিত। গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগে এর সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পায়। সমস্ত বর্ণের মানুষ ব্রত পালনের অধিকারী হওয়ায় এটি সার্বজনীন চরিত্র পায়। এর পাশাপাশি খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে হিন্দু ধর্মশাস্ত্রগুলিতে 'তন্ত্রবাদ' বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তন্ত্রবাদ দ্বারা শৈব, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ,

জৈন প্রভৃতি হিন্দু ও তথাকথিত প্রতিবাদী ধর্মমত প্রভাবিত হয়। কলা, সাহিত্য, জ্যোতিষ-বিজ্ঞান প্রভৃতির উপরেও তন্ত্রের প্রভাব পড়ে। তন্ত্রবাদের ফলে সামাজিক সমন্বয় দৃঢ়তর হয় এবং এই মতাদর্শ উপজাতীয় মানুষকে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করার কাজে সহায়তা করে।[1]

○ আদি-মধ্যযুগের ইতিহাসের উপাদানসমূহ ঃ

○ সাহিত্য ঃ বিজ্ঞানসম্মতভাবে ইতিহাস চিন্তা ও ইতিহাস লেখার সূত্রপাত ভারতে ঘটে ব্রিটিশ আমলে। উনিশ শতকে ভারতীয় ইতিহাসবিদ্‌রা বৌদ্ধিক অনুসন্ধিৎসা এবং যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ দ্বারা ইতিহাস চর্চার নতুন ধারার সূচনা করেন। এর ফলশ্রুতিতে ভারতে ইতিহাসবিদ্যা ও ইতিহাস চর্চার আবির্ভাব ঘটে। তবে আধুনিক যুগে ভারতে ইতিহাসবিদ্যার আবির্ভাব ঘটলেও প্রাচীনকালে এদেশে ইতিহাসবোধ ও ইতিহাসচর্চা একেবারেই ছিল না কিংবা সেকালে ইতিহাস গ্রন্থ আদৌ রচিত হয়নি, এমন ধারণা সঠিক নয়। Hero-lands গীতগাথায় ভ্রূণাকারে ইতিহাসমূলক বিষয়বস্তুর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া সম্ভব। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (খ্রীষ্টপূর্ব ৩য় শতক/ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক) ইতিহাসের বিষয়বস্তুর ব্যাপক পরিধির উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে পুরাণ, ইতিবৃত্ত, আখ্যায়িক, ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র ইত্যাদিকে ইতিহাসের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ইতিহাস 'পঞ্চম বেদ' হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ায় প্রাচীন ভারতে ইতিহাসের উপর একটা পবিত্রতার ছাপ দেওয়ার ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। ড. *রমেশচন্দ্র মজুমদার* মনে করেন, কৌটিল্য কথিত ইতিহাস ধর্মের এক্তিয়ার বহির্ভূত মানবজীবনের নানা দিককে স্পর্শ করতে দায়বদ্ধ ছিল। ব্যক্তি ও ঘটনা বিষয়ক ঐতিহ্য, আর্থ-রাজনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক তত্ত্ব এবং সেই সব তত্ত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ, আইন বিষয়ক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং বিধিবিধান সবই ইতিহাসের উপজীব্য ছিল।

বর্তমানে ইতিহাস বলতে বোঝায় বিভিন্ন যুগের আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার বর্ণনাসহ কালানুক্রমিক ভিত্তিতে রাজা বা রাজবংশের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে সেই সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতির বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক কাঠামো ইতিহাসের অন্যতম প্রধান উপজীব্য হিসেবে স্বীকৃত। প্রাচীন ভারতেও এই বিষয়টির গুরুত্ব সম্পর্কে সমকালীন লেখকদের সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত হিসেবে পুরাণ গ্রন্থে বর্ণিত 'সূত' ও 'মাধব'দের কর্তব্য কর্মের উল্লেখ করা যায়। *পার্জিটার*-এর মতে, পুরাণে বর্ণিত রাজনৈতিক ইতিহাসের অংশের উপাদান 'সূতগণ' কর্তৃক সংগৃহিত। রাজাদের বংশতালিকা, ঐতিহ্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্পর্কে বীরগাথা 'সূত'রাই সংগ্রহ করতেন। পুরাণ প্রদত্ত তথ্যর ভিত্তিতেই পার্জিটার, প্রাক্-গুপ্ত ভারতের অন্তত কুড়িটি বংশের তুলনামূলক তালিকা প্রস্তুত করেছেন। গুপ্ত রাজাদের আমলে এই ব্যবস্থা কিছুটা নতুন রূপে পালিত হয়। এ সময় সরকারী মহাফেজখানায় বংশতালিকা রাখার প্রথা চালু হয়। সমকালীন তাম্র লেখ থেকে এ ধরনের তালিকা সংরক্ষণ ব্যবস্থার কথা জানা যায়। নিঃসন্দেহে পুরাণ গ্রন্থের শিক্ষা থেকেই এই ব্যবস্থার সৃষ্টি।

প্রাচীন ভারতে ইতিহাসের উপজীব্য বিষয়াবলী সম্পর্কে লেখার রীতি চালু থাকলেও আক্ষরিক অর্থে 'ইতিহাসমূলক' গ্রন্থের অভাব সম্পর্কে সংশয় নেই। আবেগাপ্লুত হয়ে এই ঐতিহাসিক তথ্যটিকে অস্বীকার করা যায় না। তবে এই কারণে ঐতিহাসিক সত্য অনুসন্ধানের কাজ হয়ত কিছুটা জটিল হয়েছে, কিন্তু অসম্ভব হয়ে পড়েনি। আদি-মধ্যযুগের ভারতবর্ষ সম্পর্কেও এই কথাটি প্রাসঙ্গিক। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন থেকে তুর্কী-আফগান শাসনের সূচনা কাল (৬৫০—১২০০ খ্রীঃ) পর্যন্ত আদি-মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাসমূলক তথ্য বা উপাদান হিসেবে আমরা মূলত সাহিত্য কীর্তির উপর নির্ভর করি। সমকালীন লেখ ও মুদ্রার সাক্ষ্য দ্বারা সাহিত্য থেকে সংগৃহীত তথ্যাবলীকে পরিশুদ্ধ করে নেবার চেষ্টা করা হয়। তবে সমকালীন ঘটনার বিবরণ বিষয়ক নির্ভরযোগ্য নিরপেক্ষ সাহিত্যের অপ্রতুলতা যেমন স্পষ্ট ; তেমনি লেখ বা মুদ্রার পরিমাণও সীমিত।

আদি-মধ্যযুগের ইতিহাসের প্রধান উপাদান হল সাহিত্য। ইতিহাসের উপাদানে সমৃদ্ধ অনেকগুলি সাহিত্য এ যুগে রচিত হয়। এই সকল সাহিত্য কর্মের গুণগত মূল্যমানে অনেক প্রভেদ আছে। তবে এগুলি সকলেই কোন-না-কোন ভাবে ইতিহাস রচনার কাজে সহায়তা করেছে। সমকালীন তথ্য সমৃদ্ধ অন্যতম গ্রন্থ হল বাণভট্ট রচিত ***'হর্ষচরিত'।*** **গ্রন্থটি** মূলত গদ্যে রচিত। অবশিষ্ট অংশ পদ্যে রচিত। বাণভট্ট তাঁর এই গ্রন্থে হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালের প্রথম কয়েক মাসের ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। তবে হর্ষবর্ধনের পৃষ্ঠপোষকতা ধন্য বাণভট্ট তাঁর লেখনীতে ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষতা দেখাতে পারেননি। তিনি অযৌক্তিকভাবে হর্ষবর্ধনকে একজন পরাক্রমশালী ও প্রজাদরদী শাসক হিসেবে চিত্রিত করেছেন। ***ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের*** মতে, হর্ষচরিত গ্রন্থে ঐতিহাসিক গুরুত্ব সমৃদ্ধ বিবরণী বারো পৃষ্ঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কাশ্মীরের ব্রাহ্মণ বিলহন দাক্ষিণাত্যের চালুক্য বংশীয় রাজা ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের সভাকবি ছিলেন। ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের কর্মকাহিনী স্মরণীয় করার উদ্দেশ্যে তিনি ***'বিক্রমাঙ্কদেব চরিত'***গ্রন্থ রচনা করেন। বিক্রমাদিত্যের পূর্বসূরী প্রথম ও দ্বিতীয় সোমেশ্বরের রাজত্বকালের কিছু তথ্যও এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। একাদশ শতকের আট-এর দশকে রচিত এই গ্রন্থ দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক তথ্যের সূত্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। অনুরূপ আর একটি ইতিহাসমূলক গ্রন্থ হল সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত ***'রামচরিত'***। বাংলার পালবংশীয় শাসক রামপাল-এর কীর্তিকাহিনী এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু। সমকালের গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা কৈবর্ত বিদ্রোহের বিবরণ এই গ্রন্থ থেকে জানা যায়। বাণভট্টের মতই সন্ধ্যাকর তাঁর রচনায় রাজা রামপালের প্রতি অকারণ পক্ষপাত দেখিয়েছেন। তবে এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য হল এটি দ্ব্যর্থবোধক। এটি এক অর্থে রাজা রামপালের গৌরবগাথা ; আবার অন্য অর্থে অযোধ্যাপতি রাজা রামচন্দ্রের বিবরণ। ফলে ইতিহাসের উপাদানের তুলনায় শ্লোক কাব্য হিসেবেই এটি বেশি সার্থক। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে বাক্‌পতিরাজ প্রাকৃত ভাষায় রচনা করেন ***'গৌড়বহ'*** (গৌড় বধ) কাব্য। এই গ্রন্থে কনৌজ রাজা যশোবর্মনের বঙ্গ বিজয় সম্পর্কে এক কল্পনা মিশ্রিত আখ্যান বর্ণিত হয়েছে। চালুক্য বংশ সম্পর্কিত আর একটি গ্রন্থ হল ***'কুমারপালচরিত'***। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকে বিখ্যাত জৈন কবি আচার্য জয়সিংহ এটি রচনা করেন। পালি ভাষায় রচিত এই গ্রন্থে চালুক্য বংশীয় নৃপতি কুমারপালের কাহিনী বর্ণিত রয়েছে। ১০০৫ খ্রীষ্টাব্দে পদ্মগুপ্ত রচনা করেন আর একটি রাজপ্রশস্তিমূলক গ্রন্থ ***'নবশশাঙ্কচরিত'***। এটি

গৌড়রাজ শশাঙ্কের বিবরণ নয়। এই গ্রন্থের কেন্দ্রে আছেন গুর্জরবংশীয় জনৈক সিন্ধু রাজা। ইনি নবশশাঙ্ক নামেই অভিহিত হতেন।

স্মরণীয় যে, এই জীবনচরিতগুলির ইতিহাসগত মূল্য খুবই সীমিত। এদের রচনাশৈলীও যথেষ্ট উন্নত ও ভারসাম্যপূর্ণ নয়। ভাষাও সাধারণ মানুষের বোধগম্যতার ঊর্ধ্বে। ভাষা, অলংকরণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে যেমন কৃত্রিমতার প্রাধান্য দেখা যায় ; তেমনি বিষয়বস্তু বর্ণনার ক্ষেত্রে বাস্তবের পরিবর্তে পৃষ্ঠপোষক-রাজন্যবর্গের মনোরঞ্জনের দিকেই লেখকদের ঝোঁক ছিল বেশি। স্বভাবতঃই, ইতিহাসের উপাদান হিসেবে এদের সাক্ষ্য গ্রহণ করার বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন আবশ্যিক।

আদি-মধ্যযুগের ইতিহাসের উপাদান হিসেবে স্থানীয় ইতিবৃত্তগুলি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে সব থেকে উল্লেখযোগ্য রচনাটি হল কাশ্মিরী ঐতিহাসিক কলহন-এর ***'রাজতরঙ্গিনী'***। গ্রন্থটির রচনাকাল আনুমানিক ১১৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দ। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যগুলির মধ্যে একমাত্র রাজতরঙ্গিনীকেই ইতিহাস-গ্রন্থের মর্যাদা দেওয়া হয়। ***এ. এল. ব্যাসামের*** মতে, ***"প্রচলিত সংস্কৃত সাহিত্যাবলীর মধ্যে কেবল এই গ্রন্থ (রাজতরঙ্গিনী)-টিই প্রকৃত ইতিহাস রচনার প্রয়াস হিসেবে সুন্দর"*** *(The book is unique as the only attempt at the true history in the whole of surviving Sanskrit literature)*। কাব্যছন্দে রচিত এই গ্রন্থে কলহন ঐতিহাসিকের নির্মোহ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পূর্বাপর ঘটনার বিশ্লেষণ করেছেন। রাজতরঙ্গিনী রচনার অন্যতম লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন গ্রন্থে বিধৃত কাশ্মীরের খণ্ডিত ইতিহাসকে একটি সুসংবদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়া। এজন্য তিনি রাজাদের সমকালীন লেখকদের রচনাবলী থেকে প্রাথমিক উপাদান সংগ্রহ করেছেন। কাশ্মীরের স্থানীয় পুরাণ গ্রন্থ ***'নীলামত পুরাণ'*** থেকেও তিনি রসদ সংগ্রহ করেন। তবে বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়া তিনি কোন তথ্য গ্রহণ করেননি। বিভিন্ন পত্রলেখ এবং ধর্মস্থানকে উৎসর্গী-সংক্রান্ত দলিল পত্রের সাক্ষ্য দ্বারা সাহিত্যসূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে যাচাই করেছেন। তাঁর কৃতিত্ব এই যে, তিনি কাশ্মীরের রাজাদের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত করতে সক্ষম হন। তবে তথ্যের অভাবের কারণে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের পূর্ববর্তী ইতিহাস সমানভাবে নির্ভরযোগ্য হয়নি। স্থানীয় ইতিবৃত্ত হিসেবে গুজরাট সম্পর্কিত রচনাগুলিও উপাদান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। সোমেশ্বর রচিত ***'রসমালা'*** ও ***'কীর্তিকৌমুদি'***, বালচন্দ্র লিখিত ***'বসন্ত বিলাস'*** গুজরাট সম্পর্কিত বহু তথ্য সরবরাহ করে। ইতিহাসের সমগোত্রীয় ছিল কিছু প্রবন্ধ সংকলন। ১৩০৬ খ্রীষ্টাব্দে জৈন মেরুতুঙ্গ রচিত ***'প্রবন্ধ চিন্তামনি'*** এমনই একটি উল্লেখযোগ্য রচনা।

গুপ্তদের আমল থেকে সরকারী মহাফেজখানায় বংশতালিকা রাখার ব্যবস্থা হলেও, সূত্রগণ তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে বংশতালিকা রচনার কাজ চালিয়ে যেতেন। নেপালী বংশাবলী, বাংলার কুলজী গ্রন্থ, আসামের বুরঞ্জী প্রভৃতি একই ধরনের ঘটনাপঞ্জী হিসেবে ইতিহাসের সূত্র নির্দেশ করে। সিন্ধুদেশের অনুরূপ ঘটনাপঞ্জী থেকে সংগৃহীত তথ্য নিয়েই ***'চাচ্‌নামা'*** রচিত হয়েছে। এমনকি কলহন্‌ও কাশ্মীর বিষয়ক ঘটনাপঞ্জী থেকে উপাদান সংগ্রহ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে রাজবংশের উত্থান-পতন, পরিবর্তন, সংঘাত ইত্যাদি কারণে সরকারী মহাফেজখানায় রক্ষিত বংশতালিকা প্রায়ই ধ্বংস হয়ে যাওয়াব সম্ভাবনা দেখা দিত। কিন্তু সূত্রগণের ঘটনাপঞ্জী

সংরক্ষণের প্রয়াস অব্যাহত থাকত। হর্ষচরিত, রাজতরঙ্গিনী প্রভৃতি ইতিহাসমূলক গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে লেখকরাই এইসব ঘটনাপঞ্জীর সাক্ষ্য উল্লেখ করেছেন।

আদি-মধ্যযুগের ইতিহাসের উপাদান হিসেবে বিদেশী পর্যটক ও পণ্ডিতদের রচনাগুলি গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে চৈনিক ও আরবীয় পর্যটকদের অবদান সর্বাধিক। চৈনিক পরিব্রাজকদের মধ্যে হিউয়েন সাঙ্-এর নাম সর্বাগ্রগণ্য। ৬৩০ থেকে ৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ভারতে অবস্থান করেন এবং বুদ্ধদেবের স্মৃতি-বিজড়িত স্থানগুলি পরিভ্রমণ করেন। থানেশ্বরের শাসক হর্ষবর্ধনের আতিথেয়তা লাভ করে তিনি বৌদ্ধদর্শন ও সমকালীন ভারতের জীবন ধারা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। ভারত পর্যটনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি লেখেন *'সি-ইউ-কি'* (Siyuki) গ্রন্থটি। তাঁর জীবনীকার হুই-লি'র রচনা থেকে এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু জানা যায়। সি-ইউ-কি বা 'পশ্চিমীদেশের স্মৃতি' গ্রন্থে তিনি ভারতের সম্যক, অর্থনীতি, শিক্ষাব্যবস্থা, রাজনীতি ইত্যাদি নানা বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন। হিউয়েন সাঙ্-এর রচনাটিও সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়। তথাপি সমকালীন ভারতের জীবনধারা সম্পর্কে তথ্য আহরণের সূত্র হিসেবে এটি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। আর এক চৈনিক পরিব্রাজক *ই-সিং* (I-tsing) সপ্তম শতকের শেষ দিকে (৬৭১-৬৯৫ খ্রীঃ) ভারতে আসেন এবং সমকালের বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচনার ভিত্তিতে সংস্কৃত সাহিত্যের রচনাকাল স্থির করা সম্ভব হয়।

চৈনিক পর্যটকদের বিবরণীর মত ব্যাপকাকার না হলেও, আরবীয় পর্যটকদের সংক্ষিপ্ত বিবরণী আদি-মধ্যযুগের ভারত-ইতিহাসের উপাদান হিসেবে স্মরণীয়। আরব বণিক সুলেমান নবম শতকে (৮৫১ খ্রীঃ) ভারতে আসেন। পালবংশীয় রাজা দেবপালের সাম্রাজ্য পরিভ্রমণ করে তিনি একটি বিবরণী প্রস্তুত করেন। এই বিবরণী থেকে পাল রাজাদের সুবিশাল সেনাবাহিনী এবং রাজনৈতিক কর্তৃত্বের জন্য প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূটদের সাথে পাল রাজাদের সংঘর্ষের বিষয় জানা যায়। বাগদাদের অধিবাসী আল-মাসুদি ৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আসেন। প্রতিহার রাজ মহীপালের পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনীর বিবরণ তাঁর রচনা থেকে জানা যায়। তিনি প্রতিহার রাজ্যকে 'অল-জুজ্‌র' (Al-Juzr) নামে অভিহিত করেছেন। আল-মাসুদির বিবরণ থেকে প্রতিহার রাজ্যের শক্তিশালী সেনাবাহিনী এবং কর্তৃত্ব দখলের জন্য বাংলার পাল রাজা ও দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট রাজাদের অবিরাম সংঘর্ষের কথা জানা যায়। এ ধরনের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল আরব পণ্ডিত আলবেরুণী রচিত *'তহকক্-ই-হিন্দ'* (হিন্দুস্তান অনুসন্ধান)। মধ্য এশিয়ার খারিজম রাজ্যের রাজধানী খিবাতে ৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে আলবেরুণীর জন্ম হয়। তাঁর আদি নাম আবু রায়হান। তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে গজনীর সুলতান মামুদ তাঁকে সভাসদ হিসেবে গজনীতে আনেন। ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দের কিছু আগে গজনীর সুলতান মামুদের সাথে তিনি ভারতে আসেন। আরবী ও ফার্সীতে দক্ষ এই পণ্ডিত ভারতের দর্শন, গণিতশাস্ত্র, ভেষজবিদ্যা, ধর্মতত্ত্ব ইত্যাদির প্রতি আকৃষ্ট হন। 'তহকক্-ই-হিন্দ' গ্রন্থে তিনি তাঁর ভারত সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেন। অবশ্য ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি প্রায় নীরব থেকেছেন। তবে ভারতের সমাজ, অর্থনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি ভারতীয়দের শিক্ষানুরাগের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ওপর ভারতীয় পণ্ডিতদের দক্ষতার কথা এই গ্রন্থ থেকে জানা যায়। একই সাথে তৎকালীন হিন্দু সমাজের

অবক্ষয়ের দিকটিও তিনি তুলে ধরেন। নতুন ভাবধারা গ্রহণ তথা বহির্জগতের পরিবর্তনের সাথে নিজেদের সমন্বয় ঘটানোর কাজে ভারতীয়দের অনীহা ও অক্ষমতার তিনি নিন্দা করেছেন। আলবেরুণীর মতে, এই সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও সংকীর্ণতার ফলেই মুসলমান আক্রমণের সামনে হিন্দুরা ধুলিকণার মত উড়ে গিয়েছিল। (*"—the Hindus became like atoms of dust and scattered in all directions"*)। এমনই আর একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হল আরবী ভাষায় রচিত '*চাচনামা*'। চাচ্ লিখিত এই গ্রন্থ নাসিরুদ্দিন কুবাচার আমলে মহম্মদ-আলি-বিন্-আবুবকর কুফী এটিকে ফার্সীতে অনুবাদ করেন। আরবদের সিন্ধু বিজয়ের পূর্বাপর ঘটনাবলী এই গ্রন্থ থেকে জানা যায়। মহম্মদ-বিন্-কাশিম কর্তৃক সিন্ধু অভিযানের প্রাক্কালে সিন্ধুদেশের রাজনৈতিক অবস্থা এবং আরব আক্রমণের পরে সিন্ধু অঞ্চলের আর্থ-রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে নানা তথ্যে চাচ্নামা সমৃদ্ধ।

○ প্রত্নতত্ত্ব ঃ

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের সূত্র হিসেবে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান যেমন গুরুত্বপূর্ণ ; আদি-মধ্যযুগের ইতিহাসের ক্ষেত্রেও সে কথা প্রযোজ্য। কারণ সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতকীয় ভারত ইতিহাসের উপাদান হিসেবে সাহিত্য সূত্র সর্বাংশে নির্ভরযোগ্য হতে পারেনি। আবার সরকারী স্তরে দলিল-দস্তাবেজ সংরক্ষণের প্রথাও তখন গড়ে উঠেনি। স্বভাবতঃই প্রত্নতত্ত্বের সাক্ষ্য ইতিহাস রচনার কাজে অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য উপাদান হিসেবে কাজ করে। প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হল সমকালের অসংখ্য লেখ। সরকারী ও বেসরকারী উভয় ধরনের লেখই সমকালের ইতিহাসের সূত্র হিসেবে ভূমিকা পালন করে। লেখগুলির মধ্যে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ লেখগুলি হল প্রতিহার-রাজ মিহিরভোজের '*গোয়ালিয়র প্রশস্তি*', ধর্মপালের '*খালিমপুর লেখ*', 'নারায়ণ পালের '*ভাগলপুর লেখ*', দেবপালের আমল সম্পর্কিত '*মুঙ্গের লেখ*' ও '*বাদল-প্রশস্তি*', উমাপতি ধর রচিত বিজয় সেনের 'দেওপাড়া লেখ' ইত্যাদি। লেখর উপর ভিত্তি করেই চোলদের আমলে প্রচলিত গ্রামীণ স্বায়ত্ত শাসনব্যবস্থার স্পষ্ট ধারণা গড়ে তোলা যায়। এ প্রসঙ্গে দশম শতকে রচিত (৯২১ খ্রীঃ) উত্তর-মেরু গ্রামের মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ লিপিটির নাম উল্লেখ্য। অতি সম্প্রতি (মার্চ ১৯৮৭ খ্রীঃ) মালদহ জেলার জগজ্জীবনপুরে আবিষ্কৃত তাম্র শাসনটি ইতিহাসের নতুন সূত্র প্রদান করে ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। এই তাম্র লেখটি আবিষ্কারের পর এমন ধারণার জন্ম হয়েছে যে রাজা দেবপালের পর প্রথম বিগ্রহ পাল সিংহাসনে বসেননি। দেবপালের অব্যবহিত পরেই সিংহাসনে বসেন তাঁর পুত্র জনৈক মহেন্দ্রপালদেব। এই তাম্রশাসনে বৌদ্ধদের ভূমিদান সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ আছে। এই বিবরণ থেকে বোঝা যায় যে পাল রাজারা বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিশেষ অনুগত ছিলেন।

সরকারী লেখগুলি অধিকাংশই ভূমিদান সম্পর্কিত। জমি বিক্রি বা জমিদান-সংক্রান্ত নানা বিষয় এতে উল্লেখ করা আছে। এদের প্রথম অংশটি প্রশস্তিমূলক। এই অংশে রাজার নাম, বংশ পরিচয়, রাজ্যের আয়তন ইত্যাদির বিবরণ থাকে। ভূমিদান অংশে দানকৃত জমির পরিমাপ, রাজস্ব, মূল্য ইত্যাদি লিপিবদ্ধ থাকে। সরকারী লেখর তুলনায় বেসরকারী লেখর সংখ্যা অনেক বেশি। গুপ্ত পরবর্তী যুগের বেসরকারী লেখগুলি প্রধানত সংস্কৃত ভাষায় লেখা এবং ব্রাহ্মণ্য

ধর্মবিষয়ক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে প্রাক্-গুপ্ত বেসরকারী লেখগুলির মাধ্যম ছিল প্রাকৃত ভাষা এবং তার কেন্দ্রে ছিল বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম। যাই হোক্, বেসরকারী লেখগুলির প্রচারক ছিলেন মূলত উচ্চ সরকারী পদাধিকারী ব্যক্তিগণ। এগুলির বিষয়বস্তু মূখ্যত ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্যে 'ব্রহ্মদেয় দান' কিংবা মন্দিরের উদ্দেশ্যে 'দেবদান' সম্পর্কিত। তবে উচ্চপদাধিকারীদের বংশ পরিচয়, সামাজিক অবস্থান, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্মচেতনা ইত্যাদি বিষয়ে ইতিহাসমূলক তথ্য অর্জনে এগুলির গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

আদি-মধ্যযুগের ইতিহাসের উপাদান হিসেবে মুদ্রার গুরুত্ব অকিঞ্চিৎকর। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর মুদ্রার গুরুত্ব হ্রাস পায়। সম্ভবত, এ সময় মুদ্রার ব্যবহার হ্রাস পেয়েছিল. পাল, প্রতিহার, রাষ্ট্রকূট রাজারা খুব কম মুদ্রার প্রচলন করেন কিংবা আদৌ করেননি। সপ্তম শতকের পর থেকে একাদশ শতকের মধ্যবর্তীকালে অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত সমতট-হরিবেল অঞ্চলে কিছু মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে পোড়ামাটির জিনিসপত্র, বুদ্ধমূর্তি, মন্দিরের অবশেষ ইত্যাদি কিছু কিছু পাওয়া যায়। যা সমকালের ইতিহাস রচনায় সাহায্য করে। সম্প্রতি আবিষ্কৃত বেড়াচাঁপার চন্দ্রকেতুগড়ের ধ্বংসাবশেষ, অজয় নদীর তীরে গড়ে ওঠা 'পাণ্ডুরাজার ঢিবি' ইত্যাদি আদি-মধ্যযুগের ইতিহাসের সূত্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ।

○ বাণভট্টের হর্ষচরিত ঃ

কনৌজের পুষ্যভূতি বংশীয় সম্রাট হর্ষবর্ধনের (৬০৭-'৪৭ খ্রীঃ) সভাকবি ছিলেন বাণভট্ট। বৎসগোত্রভুক্ত ব্রাহ্মণ বাণভট্ট কনৌজের সন্নিকটে শোন নদী তীরবর্তী প্রীতিকূট নামক গ্রামে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষ দিকে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ও মাতার নাম যথাক্রমে চিত্রভানু এবং রাজ্যদেবী। কৈশোরে তিনি মাকে হারান এবং সদ্য-যৌবনে তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে। ফলে অভিভাবকহীন অবস্থায় তিনি কিছুটা অস্থির ও অসংযমী জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। এই সময় বিভিন্ন পেশার মানুষের সাথে তিনি দেশ-দেশান্তরে পরিভ্রমণ করেন। তাঁর সঙ্গী-বন্ধুদের মধ্যে কবি, নাট্যকার, বৈদ্য, চিত্রকর, লিপিকার, কথক, সন্ন্যাসী, যাদুকর ইত্যাদি নানা পেশার মানুষ ছিলেন। এঁদের সঙ্গ ও সাহচর্যে তাঁর অন্তর্নিহিত কলাজ্ঞান ও সাহিত্য প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে।

দীর্ঘকাল দেশ ভ্রমণ, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় এবং অধ্যয়নের ফলে তাঁর পাণ্ডিত্য গভীরতর হয়। সাহিত্য ও বিভিন্ন শাস্ত্রে বাণভট্টের অর্জিত দক্ষতার ভিত্তিতে সম্রাট হর্ষবর্ধন তাঁকে সভাকবির পদে বরণ করেন। হর্ষবর্ধনের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি ***'কাদম্বরী'*** নামে একটি আখ্যায়িক এবং ***'হর্ষচরিত'*** নামে হর্ষবর্ধনের জীবনী রচনা করেন। তবে কোনটিই তিনি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি। এই অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে একাধিক মত প্রচলিত আছে। কারো কারো মতে, বৌদ্ধদের প্রতি সম্রাটের সহিষ্ণুতায় বাণভট্ট ব্যথিত হয়ে এটি সম্পূর্ণ করার কাজ বন্ধ রাখেন। আবার অন্য মতে, চালুক্য রাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর কাছে হর্ষবর্ধনের পরাজিত হওয়ার ঘটনায় আশাহত হয়ে তিনি গ্রন্থ রচনার কাজ বন্ধ করে দেন। যাই হোক্, হর্ষচরিত গ্রন্থটি আটটি অংশে (উচ্ছ্বাস) বিভক্ত। অধিকাংশ ভাগ গদ্যে রচিত। কিছু অংশে কৃত্রিম কাব্যসৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে বাণভট্ট তাঁর নিজের জীবন সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালের প্রথম কয়েক

মাসের ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। স্বভাবতঃই এই গ্রন্থের ইতিহাসগত মূল্য সম্পর্কে সংশয় ও বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। *ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের* মতে, এই গ্রন্থে ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন ঘটনার বিবরণ আছে সর্বাধিক বারো পৃষ্ঠার মত। অবশিষ্ট আলোচনায় সম্রাটের গুণকীর্তন ও লেখকের কল্পনা প্রাধান্য পেয়েছে। তাই একে ইতিহাসের উপাদান হিসেবে গুরুত্ব দেওয়া যুক্তিহীন। তাছাড়া, বাণভট্ট এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু হিসেবে বহমান ঘটনাকে যতটা গ্রহণ করেছেন, তার চাইতে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন এর সাহিত্যগত মান বৃদ্ধির দিকে। তাই 'হর্ষচরিত' যতটা ছিল ঐতিহাসিক গ্রন্থ, তার তুলনায় অনেকগুণ বেশি ছিল একটি কল্পনাধর্মী সাহিত্য।

○ কলহনের 'রাজতরঙ্গিনী' ঃ

আদি-মধ্যযুগে রচিত একমাত্র স্বীকৃত ইতিহাসমূলক গ্রন্থটি হল *'রাজতরঙ্গিনী'*। এটি রচনা করেন কাশ্মিরী ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান কলহন। কলহনের পিতা চম্পক সম্ভবত কাশ্মীর নৃপতি হর্ষের একজন মন্ত্রী ছিলেন। রাজা হর্ষ ১১০১ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনচ্যুত ও নিহত হন। চম্পক অতঃপর সরকারী কাজে যুক্ত ছিলেন না। সম্ভবত, কলহনও কোন সরকারী পদের সাথে যুক্ত ছিলেন না। তবে প্রাক্তন উচ্চ রাজকর্মচারীর সন্তান হিসেবে তিনি সমকালীন ঘটনাবলীকে রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে বিচার-বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হন। গৃহযুদ্ধে জর্জরিত, বিশৃঙ্খল কাশ্মীর রাজ্যের ঘটনাবলী তাঁর লেখনীতে উঠে আসে। রাজা জয় সিংহের আমলে তিনি 'রাজতরঙ্গিনী' রচনার কাজ সম্পন্ন করেন। আনুমানিক ১১৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থ রচনা সম্পূর্ণ হয়। আটটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত এই গ্রন্থে প্রায় আট হাজার সংস্কৃত শ্লোক সন্নিবিষ্ট আছে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ের বক্তব্য ঐতিহ্য বা পরম্পরাগত লোকশ্রুতির উপর ভিত্তি করে পরিবেশন করা হয়েছে। পরবর্তী তিনটি অধ্যায়ে কার্কোট ও উৎপল রাজবংশ দুটির ইতিহাস লিখিত আছে। এর উপাদান তিনি সংগ্রহ করেছেন মূলত ঐ দুটি রাজবংশের কার্যকালে প্রত্যক্ষদর্শী লেখকদের বিবরণ থেকে। শেষে দুটি অধ্যায়ে (সপ্তম ও অষ্টম) তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় লোহার রাজবংশের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। ছয়টি অধ্যায়ের সাথে শেষ দুটি অধ্যায়ের গুণগত প্রভেদ লক্ষ্যণীয়। প্রথম দুটি অধ্যায়ের রচনাশৈলী প্রধানত অলংকার বর্জিত, সহজ-সরল। কিন্তু শেষ অধ্যায় দুটির বর্ণনা আড়ম্বরপূর্ণ। প্রথম অধ্যায়গুলিতে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কালানুক্রম রক্ষা করা হয়েছে ; কিন্তু সপ্তম-অষ্টম অধ্যায়ে ঘটনার সন-তারিখ প্রায় অনুপস্থিত। যথাযথ পূর্ব-পরিচয় প্রদান না করেই দীর্ঘ রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ও গৃহবিবাদ বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি নতুন নতুন চরিত্রের আবির্ভাব ঘটিয়েছেন। সম্ভবত, দেশবাসীর মানসিক চাহিদার ভিত্তিতে তিনি মূলত কল্পনাভিত্তিক কাহিনীর অবতারণা করেছেন।

কলহন নিজেকে ঐতিহাসিক বলে দাবি করেননি। তিনি কবি হিসেবেই নিজেকে চিহ্নিত করেছেন এবং কবিতা রচনার প্রেরণা থেকেই তিনি কাশ্মীরের রাজনৈতিক ঘটনাবলী তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। রাজতরঙ্গিনী রচনার উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে, এতাবৎকাল কাশ্মীরের কোন ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত রচিত হয়নি। পূর্ববর্তী রচনাগুলি ছিল ঐতিহ্যাশ্রয়ী এবং বহুক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী। তিনি এই গ্রন্থে কাশ্মীরের রাজবংশ, রাজন্যদের যথাযথ কালানুক্রম তুলে ধরতে প্রয়াসী হন। এ জন্য তিনি যেমন পূর্ববর্তী রচনাবলীর আশ্রয় নেন, তেমনি সেই সকল তথ্য সূত্রের সীমাবদ্ধতাগুলিও সচেতনভাবে অনুধাবন করেন:

কাশ্মীরের ঐতিহ্যভিত্তিক রচনা 'লীলামত পুরাণ' বা ক্ষেমেন্দ্রর ইতিবৃত্ত থেকে সাহায্য নিলেও তাদের দুর্বলতা বা অস্পষ্টতা সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় ও তৃতীয় উদ্দেশ্য ছিল যথাক্রমে কাশ্মীরের অতীত ঘটনা তুলে ধরে পাঠকদের আনন্দ বর্ষণ করা এবং পাঠকদের নীতিবোধ জাগ্রত করে মানসিক শান্তরস জাগ্রত করা। অধ্যাপক *ব্যাসামের* মতে, রাজতরঙ্গিনী রচনার কাজে কলহনের প্রধান লক্ষ্যই ছিল পাঠকদের শান্তরস জাগ্রত করা। সর্বোপরি ছিল জন্মভূমি কাশ্মীরের প্রতি তাঁর আত্মিক ভালবাসা এবং নিজ লেখনীর মধ্য দিয়ে সেই ভালবাসার প্রকাশ ঘটানোর ইচ্ছা। এ জন্য তিনি কবিতার ছত্রে ছত্রে কাশ্মীরের ভূ-প্রকৃতির সৌন্দর্যঘন রূপ এবং প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের ছবি তুলে ধরেছেন। রাজনীতি ও রাজতন্ত্র সম্পর্কেও তিনি তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কলহন পরম্পরাগত ঐতিহ্যের মাধ্যমে শক্তিশালী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। তাঁর মতে, একজন শক্তিশালী রাজাই বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিদের দমন করে রাষ্ট্রের মঙ্গল বিধান করতে পারেন। তিনি কাশ্মীরের রাজনৈতিক অনাচার ও বিশৃঙ্খলার জন্য সে দেশের সামন্তদের (দামর) দোষারোপ করেছেন। রাজা হর্ষের মৃত্যুর পর এই সকল ক্ষুদ্র সামন্তদের জন্যই কাশ্মীরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিল বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন যে, উইপোকা যেমন মাকে ধ্বংস করে এবং কাঁকড়া বিছা যেমন পিতাকে ধ্বংস করে, তেমনি অকৃতজ্ঞ আমলাতন্ত্র স্বাধীন হলে দেশের সবকিছুই ধ্বংস করতে পারে। এজন্য তিনি নিয়ন্ত্রিত আমলাতন্ত্র ও কেন্দ্রীভূত রাজতন্ত্রের পক্ষে সওয়াল করেন।

❍ অলবেরুণী ঃ

মধ্য-এশিয়ার অন্তর্গত খারাজিম রাজ্যের রাজধানী খিবাতে অলবেরুণীর জন্ম হয় (৯৭৩ খ্রীঃ)। তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে গজনীর সুলতান মামুদ তাঁকে সভাসদরূপে বরণ করেন। মামুদের ভারত আক্রমণকালে অলবেরুণী ভারতে আসেন। অনন্য-সাধারণ প্রতিভার অধিকারী অলবেরুণী এদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করে প্রাচ্যদেশীয় সাহিত্য ও দর্শন পাঠ করেন এবং গভীর জ্ঞান লাভ করেন। ভারতবর্ষের উপর লিখিত তাঁর গ্রন্থ *'তহকক্-ই-হিন্দ'* থেকে এদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে বহু তথ্য জানা যায়। মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাস রচনায় এটি একটি অমূল্য উপাদান হিসেবে স্বীকৃত। লেখক হিসেবে তাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি ও বলিষ্ঠ মানসিকতার পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।

অলবেরুণী সুস্পষ্ট ভাষায় মন্তব্য করেছেন যে, সুলতান মামুদের আক্রমণের ফলে ভারতের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়েছিল। তিনি লিখেছেন, *"Mahmud utterly ruined the prosperity of the country......."*। তাঁর বিবরণ থেকে তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতার কথা জানা যায়। সারা উত্তর ভারত জুড়ে একাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা ছিল। এরা সর্বদাই ছিল বিবাদমান। ফলে বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করার কোন পরিকল্পনা তারা নিতে পারেনি। পরন্তু বহির্জগত থেকে এরা ছিল বিচ্ছিন্ন এবং নিজেদের সম্পর্কে ছিল অনর্থক উচ্চ ধারণা।

ভারতীয় সমাজ ছিল অসাম্য ও বৈষম্যে ভরা। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, জাতিভেদ অস্পৃশ্যতা

প্রভৃতি নানা কুসংস্কারে জনজীবন ছিল জর্জরিত। নারীরা ছিলেন অবহেলিত। ব্রাহ্মণদের দাপট ছিল অপ্রতিরোধ্য। ধর্ম-ভাবনা ছিল গোঁড়ামি ও কুসংস্কারে পরিপূর্ণ। আধ্যাত্মিকতার পরিবর্তে বাহ্যাড়ম্বর ও আচার-অনুষ্ঠানের কঠোরতা ধর্মকে গ্রাস করেছিল। বহু ঈশ্বরবাদ ছিল সাধারণভাবে প্রচলিত, তবে পণ্ডিতেরা বিশ্বাস করতেন ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়।

অলবেরুণী ভারতীয় বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, বিচারে সমতার নীতি অনুসৃত হত না। ব্রাহ্মণশ্রেণী বিচারের ক্ষেত্রেও অধিক সুবিধা ভোগ করত। তাই কোন কারণেই তাদের প্রাণদণ্ড দেওয়া যেত না, যদিও প্রাণদণ্ডের শাস্তি স্বীকৃত ছিল। ফৌজদারী বিচারব্যবস্থা ছিল মানবোচিত। লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা দায়ের করা হত। অবশ্য মৌখিক অভিযোগও বিচারের জন্য গৃহীত হত। প্রাণদণ্ড ছাড়া জরিমানা, বেত্রাঘাত, অঙ্গচ্ছেদ প্রভৃতি শাস্তিস্বরূপ দেওয়া হত।

দেশের অধিকাংশ মানুষের জীবিকা ছিল কৃষিকার্য। তবে আংশিক সময়ের জন্য অনেকেই নানারকম কুটিরশিল্পে নিয়োজিত থাকত। রাজকোষে আয়ের প্রধান উৎস ছিল ভূমি রাজস্ব। তবে বণিক, কারিগর প্রমুখও কিছু কিছু কর প্রদান করত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আদি-মধ্যযুগের রাজনীতি
[EARLY MEDIEVAL POLITICS]

■ (ক) ইসলামের প্রসার ও আরবদের সিন্ধু অভিযান ঃ

হজরত মহম্মদ (৫৭১-৬৩২ খ্রীঃ) ইসলামধর্মের প্রচার শুরু করেন সপ্তম শতকের প্রথম দশকে। তিনি ঘোষণা করেন, *"ঈশ্বর (আল্লাহ) অদ্বিতীয়। তিনিই সৃষ্টিকর্তা। তিনি জন্ম ও মৃত্যুর নিয়ন্ত্রক। তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী।"* ঈশ্বরের মহিমা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রত্যেককেই কতকগুলি মানবিক গুণের অধিকারী হবার পরামর্শ দেন, যার অন্যতম হল—দয়া-দাক্ষিণ্য, সহমর্মিতাবোধ, সৌভ্রাতৃত্ববোধ ইত্যাদি। ধর্মাচরণের জন্য ঘোষণা করেন অতি সহজ, সরল, অনাড়ম্বর, ব্যয়বাহুল্যবর্জিত কয়েকটি নির্দেশিকা। প্রাথমিক তীব্র বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও ইসলামধর্ম খুব দ্রুত মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করে এবং হজরত মহম্মদের জীবনাবসানের (৬৩২ খ্রীঃ) এক শতকের মধ্যেই ইসলামের বাণী ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ; এবং এই সম্প্রসারণের কাজে মূল ভূমিকা নেয় আরবদেশ।

ইসলামের জন্মভূমি আরবদেশ বিশ্বের বৃহত্তম উপদ্বীপ এবং গোলার্ধের শুষ্কতম অঞ্চল। এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার মিলনভূমি দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়ার এই উপদ্বীপটি পূর্ব গোলার্ধের কেন্দ্রভূমি হিসেবে ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামধর্মের উত্থানের কালে আরবদের মোট জনসংখ্যা দেড় লক্ষের বেশি ছিল না এবং সমাজ ছিল উপজাতি-ভিত্তিক। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতা, সামাজিক জীবনে বৈষম্য ও নৈতিক অধঃপতন দ্বারা জর্জরিত। আরব ভূখণ্ডে নতুন যুগের সূর্যোদয় ঘটে ইসলামের নেতৃত্বে। আরবদেশ ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুরবস্থা ইসলামধর্মের দ্রুত প্রসার ও শক্তিবৃদ্ধিতে সাহায্য করে। ইসলামের স্পর্শে অন্ধকারাচ্ছন্ন আরবভূমি যেমন আলোকের সন্ধান পায়, তেমনি আরবভূমিকে ভিত্তি করেই ইসলামের ধর্ম, রাষ্ট্র ও সংস্কৃতির বার্তা ছড়িয়ে পড়ে দেশে দেশে। হজরতের মৃত্যুর পর ইসলামের বাণী বহন করার দায়িত্ব অর্পিত হয় ***'খলিফা'***র উপর। প্রথম চারজন মহান খলিফা, যথা—***আবুবকর*** (৬৩২-'৩৪ খ্রীঃ), ***ওমর*** (৬৩৪-'৪৪ খ্রীঃ), ***ওসমান*** (৬৪৪-'৫৬ খ্রীঃ) এবং ***আলি*** (৬৫৬-'৬১ খ্রীঃ)-র নেতৃত্বে আরবদেশে একটি সুষ্ঠু ও সবল শাসন-কাঠামো গড়ে ওঠে এবং আরবের সাম্রাজ্য ছড়িয়ে পড়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। আলির আমলে এক গৃহযুদ্ধের সূচনা হয় এবং সিরিয়ার শাসনকর্তা মোয়াবিয়া আলিকে হত্যা করে খলিফা-পদ দখল করেন। ৬৬১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কাল খলিফাপদ 'উমায়েদ' বংশের অধীনে থাকে। এই পর্বেই আরবগণ ভারতের সিন্ধু দখল করে তাদের শাসন প্রবর্তন করে। যাই হোক্, ৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই সিরিয়া ও মিশর আরবগণ কর্তৃক অধিকৃত হয়। ৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পারস্য আরব সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অক্ষু নদী ও হিন্দুকুশ পর্বতের মধ্যবর্তী

অঞ্চল আরব শাসনাধীনে চলে আসে। অষ্টম শতকের মধ্যেই ইসলামের বিজয়-পতাকা উড্ডীন হয়েছিল অতলান্তিক মহাসাগর থেকে সিন্ধুনদ এবং কাস্পিয়ান সাগর থেকে নীলনদ পর্যন্ত সুবিস্তৃত ভূখণ্ডে এবং স্পেন, পোর্তুগাল, দক্ষিণ-ফ্রান্স, উত্তর-আফ্রিকা, মিশর, আরব, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া, আফগানিস্তান, পারস্য, বালুচিস্তান ও ট্রান্স-অক্সিয়ানার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিশাল আরব সাম্রাজ্য। পারস্য জয় করার পর আরবদের দৃষ্টি পড়ে পূর্বদিকে ভারত-ভূমির উপর।

○ আরবদের সিন্ধুবিজয়ের পটভূমি ও কারণ ঃ

ইসলামের বিজয়-পতাকা বাহিত হওয়ার তথ্যমূলক বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। কিন্তু ভারতভূমিতে তাদের প্রাথমিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাব অনুভূত হয়। আরবী ও ফার্সীতে লেখা কিছু গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোকপাত অবশ্যই করা হয়েছে। তবে সেগুলির নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। এ বিষয়ে প্রধান উপাদান হল ***'অল-বিলাদুরি'*** নামক গ্রন্থ। এতে আরবদের ভারত-অভিযানের ধারাবাহিক বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু উল্লিখিত সন-তারিখের পরস্পর-বিরোধিতা কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। তবে ***'আল-তারি'*** এবং ***'খুলাসত্-উৎ-আকবর'*** নামক গ্রন্থ দুটির সাহায্যে ***'অল-বিলাদুরি'র*** বিভ্রান্তি কিছুটা নিরসন করা যায়। সিন্ধুর রাজা ***'চাচ'***-এর নামাঙ্কিত ***'চাচনামা'*** গ্রন্থটি আরবদের সিন্ধু অভিযান সম্পর্কে একটি নির্ভরযোগ্য উপাদান। এখানে ঘটনার ধারাবাহিকতা যথার্থভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়া পরবর্তীকালে রচিত ***তারিখ-এ-সিন্ধ'*** (মীর মহম্মদ মাসুদ) এবং ***'তুফাতুল কিরাম'*** (আলিশের কানি) গ্রন্থ দুটিও এ বিষয়ে আমাদের আলোকপাত করে।

স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতবর্ষ এবং আরবদেশের মধ্যে বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। সপ্তম শতকে ইসলামধর্ম গ্রহণের আগেই আরবীয় বণিকেরা ভারতের পশ্চিম উপকূলে উপস্থিত হয়ে বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করত। সিরাজ, হরমুজ প্রভৃতি বন্দর থেকে আগত বণিকেরা ভারতবাসীর কাছে বরণীয় ছিল, অন্তত অর্থনৈতিক কারণে। ইসলামধর্ম প্রসারের অব্যবহিত পরেও এই বাণিজ্যিক সম্পর্কের প্রকৃতিগত বা গুণগত বৈশিষ্ট্য অব্যাহত ছিল। কিন্তু ইসলামধর্ম গ্রহণ করার পরে আরবদের চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটে। ইসলামধর্ম আরবদের মধ্যে একদিকে যেমন রাজনৈতিক স্থিতি ও দৃঢ়তা আনে, অন্যদিকে তাদের মনে নতুন ভূখণ্ড ও ইসলামের বাণী প্রসারের উন্মাদনার জন্ম দেয়। ইতিপূর্বে ভারতে আগত বণিকদের মাধ্যমে এদেশের ঐশ্বর্য-সম্পদের বিষয়ে তারা অবহিত হয়েছিল। এখন আপন শক্তিবলে সেই সম্পদ দখল এবং পৌত্তলিকদের ধ্বংসসাধন করে ইসলামের সম্প্রসারণ—এই অর্থনৈতিক ও ধর্মনৈতিক দ্বৈত-কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য তারা অস্ত্র-হাতে অগ্রসর হয় ভারতের বিরুদ্ধে। আরবদের ভারতভূমি দখল কর্মসূচীর প্রথম লক্ষ্য হয় সিন্ধুদেশ।

ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে আরবদের প্রথম সামরিক অভিযান প্রেরিত হয় খলিফা ওমর-এর আমলে। ৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রেরিত এই অভিযানের লক্ষ্য ছিল বোম্বাই-এর নিকটবর্তী থানা অঞ্চল। কিন্তু তাদের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। সমুদ্রপথে এরূপ অভিযানের বিপদ-সম্ভাবনা খুব বেশি ছিল বলে খলিফা এই ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ প্রাথমিকভাবে নিষিদ্ধ করে দেন। ওমরের মৃত্যুর পর আবার আরবদের ভারত-অভিযানের কর্মসূচী গৃহীত হয়। সমস্ত বিপদকে তুচ্ছ করে

এবং একই সাথে জলপথ ও স্থলপথে ভারতের বিরুদ্ধে তারা পর পর কয়েকটি অভিযান প্রেরণ করে। ৬৪৩-'৪৪ খ্রীষ্টাব্দে আবদুল্লা-বিন্-অমর-বিন্-বাবি'র নেতৃত্বে আরবগণ সিস্তান দখল করে এবং মাক্রান (বালুচিস্তান) পর্যন্ত অগ্রসর হয়। এখানে জাঠ সম্প্রদায়ের মানুষ আরবীয়দের প্রবলভাবে বাধা দেয়। ভারত-অভিযানের সমস্যা প্রসঙ্গে *আবদুল্লা* খলিফাকে এক পত্রে লেখেন : *"এখানে পানীয় জলের খুব অভাব, ফলমূল নিম্নমানের, কিন্তু ডাকাতরা ভয়ঙ্কর। খুব কম সৈন্য নিয়ে অভিযানে এলে তাদের নিহত হবার সম্ভাবনাই বেশি, কিন্তু বেশি সংখ্যায় এলে তাদের উপোসী থাকতে হবে।"* এমতাবস্থায় খলিফার নির্দেশে অভিযান পরিত্যক্ত হয়। এর পর ৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে আল-হারি অভিযান চালিয়ে কিছুটা সাফল্য পান। কিন্তু ৬৬২ খ্রীষ্টাব্দের অভিযানকালে তিনি পরাজিত ও নিহত হন। ৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে আল-মুহাল্লব আর একটি ব্যর্থ অভিযান পরিচালনা করেন। অন্যান্য কয়েকটি অভিযানে এসে আরব সেনাপতি আবদুল্লা, সিমান-বিন্-সালমা, রসিদ-বিন্-আমির, আল-মুধির প্রমুখ সাফল্য ও ব্যর্থতার মিলিত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। অবশ্য সাফল্যের থেকে ব্যর্থতার ভার ছিল অনেক বেশি। অতঃপর ইরাকের উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও সাম্রাজ্যবাদী গভর্নর আল হজ্জাজ সিন্ধুদেশের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণের নেতৃত্ব দেন। খলিফা ওয়ালিদ মালিকের অনুমতি ও শুভেচ্ছা পেতেও তাঁর দেরি হয়নি। সিন্ধুর রাজা দাহিরের সঙ্গে সামান্য একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে হজ্জাজের মতবিরোধ ঘটলে, তিনি সিন্ধুর বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান পাঠান। ৭১১ খ্রীষ্টাব্দে ওবেদুল্লা ও বুদাইল-এর নেতৃত্বে যে দুটি অভিযান পাঠান তা আরবদের ধারাবাহিক ব্যর্থতারই পুনরাবৃত্তি ঘটায়। যুদ্ধক্ষেত্রেই নিহত হন আরব সেনাপতিদ্বয়। ক্ষুব্ধ হজ্জাজ পরবর্তী অভিযানের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি নেন। অভিযানের নেতৃত্ব দেন নিজের জামাতা সপ্তদশ বর্ষীয় যুবক ইমাদ-উদ্দিন-মহম্মদ-বিন্-কাশিমকে (৭১২ খ্রীঃ)।

আরবগণ কর্তৃক সিন্ধু আক্রমণের এই পর্বের তাৎক্ষণিক কারণ সম্পর্কে একাধিক কাহিনী প্রচলিত আছে। একটি মতানুযায়ী সিংহলে বসবাসকারী কয়েকজন মুসলমান বণিকের মৃত্যুর পর সিংহল-রাজ মৃত বণিকদের কন্যাদের একটি জাহাজে করে খলিফার পূর্ব সাম্রাজ্যের শাসনকর্তা হজ্জাজের কাছে প্রেরণ করেন। কিন্তু সিন্ধুর উপকূলে জলদস্যুরা ওই জাহাজগুলি লুঠ করে। অন্য একটি মতে, সিংহলের রাজা স্বয়ং ইসলামধর্ম গ্রহণ করে খলিফার উদ্দেশ্যে কিছু উপঢৌকন একটি জাহাজে প্রেরণ করেন। সিন্ধুর উপকূলে জাহাজটি লুণ্ঠিত হয়। ***ডঃ ঈশ্বরীপ্রসাদ*** সিংহলের রাজার ইসলাম-গ্রহণ তত্ত্বটিকে 'সম্পূর্ণ অবাস্তব, ও অসম্ভব ও ভ্রান্ত' বলে বর্ণনা করেছেন। তৃতীয় মতানুসারে, খলিফা ওয়ালিদ-এর পিতা আব্দুল মালিক ভারত থেকে কিছু মহিলা ক্রীতদাস ও দ্রব্যসংগ্রহের জন্য প্রতিনিধি প্রেরণ করেছিলেন। এই প্রতিনিধিদল সিন্ধুর দেবল বন্দরে উপস্থিত হলে জলদস্যু দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং তাদের মালপত্র লুণ্ঠিত হয়। তিনটি বিবরণীর মূলকথা হল খলিফার প্রাপ্য কিছু জিনিস সিন্ধুর বন্দরে লুণ্ঠিত হয়েছিল। এই ঘটনায় হজ্জাজ প্রচণ্ড মর্মাহত হন এবং এই কাজের জন্য সিন্ধুর রাজা দাহিরের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। কিন্তু দাহির এ ব্যাপারে তাঁর দায়িত্ব অস্বীকার করেন এবং ক্ষতিপূরণ দিতে অসম্মত হন। অতঃপর ক্ষুব্ধ হজ্জাজ খলিফার অনুমতিক্রমে সিন্ধুর বিরুদ্ধে অভিযান পাঠান।

*কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিক **ওলসি হেগ** 'জলদস্যুদের দ্বারা লুণ্ঠন-তত্ত্ব'টিকেই* আরবদের সিন্ধু অভিযানের (৭১২ খ্রীঃ) মুখ্য কারণ বলে মনে করেন। কিন্তু ভারতীয় বহু ঐতিহাসিক মনে

করেন, এটি ছিল অন্যতম এবং প্রত্যক্ষ কারণ, কিন্তু একমাত্র বা মূল কারণ নয়। ঐতিহাসিক ***শ্রীবাস্তব*** (A. L. Srivastava) মনে করেন, আরবদের সিন্ধু-আক্রমণের পশ্চাতে গভীর রাজনৈতিক ও ভৌমিক আকাঙক্ষা লুকিয়ে ছিল। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল ভারতীয় ধনসম্পদ লাভের আকাঙক্ষা। ইতিপূর্বেই ভারতের ঐশ্বর্য সম্পর্কে তারা অবহিত হয়েছিল। এখন সাম্রাজ্যবাদী অভীপ্সা পূরণের শর্ত ও সঙ্গী হিসেবে ভারতের অতুল সম্পদ তাদের আক্রমণ-স্পৃহাকে প্রবলতর করেছিল। তবে আরবদের সিন্ধু-আক্রমণের ক্ষেত্রে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ধর্মীয় প্রেরণা। ***শ্রীবাস্তবের*** ভাষায় ঃ *"…..the principal driving force was the religious zeal which made them feel and act as if God was using them as agents for the propagation of Islam and the uprooting of infidel fiath…."* আরবরা যে সকল অঞ্চল দখল করেছে, সেখানে কেবল ইসলামধর্ম প্রচার করেই ক্ষান্ত হয়নি ; সেইসব অঞ্চলের প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণভাবে মুছে দিয়েছে। সিন্ধু-আক্রমণের ক্ষেত্রেও এই মানসিকতা বজায় ছিল। তাই দেবল বন্দরে জাহাজ লুণ্ঠনের ঘটনাটি ছিল তাদের সিন্ধু-আক্রমণের তাৎক্ষণিক কারণ বা অজুহাত মাত্র।

মহম্মদ-বিন্-কাশিম প্রায় পনেরো হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনীসহ সিন্ধু অভিমুখে রওনা হন। মাকরানে তিনি উপস্থিত হলে সেখানকার শাসক মহম্মদ হারুন তাঁর বাহিনীসহ কাশিমের সাথে অগ্রসর হন। আব্দুল আসাদ জাহানের নেতৃত্বে সাহায্যকারী আরও একটি আরবীয়-বাহিনী সিন্ধুর উপকূলে কাশিমের সাথে যোগ দেয়। সব মিলিয়ে প্রায় ২৫ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী সিন্ধু-আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়। ৭১২ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে মহম্মদ-বিন্-কাশিম দেবলে উপস্থিত হন। সিন্ধুর রাজা দাহির তাঁর অদূরদর্শিতার বা আলস্যের জন্যই হোক্, কিংবা তাঁর গুপ্তচরবাহিনীর অপদার্থতার জন্যই হোক্, আরবীয়দের এই আক্রমণের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন এবং দেবল রক্ষা করার কোন উদ্যোগ ছাড়াই রাজধানী আলোরে (বা আরোর) বসে থাকেন। মহম্মদ কাশিম মাত্র ৪ হাজার রক্ষীর দুর্বল প্রতিরোধ ভেঙে খুব সহজেই দেবল দখল করে নেন। রক্ষীরা আপ্রাণ বাধা দেয়, কিন্তু আরববাহিনীর সংখ্যাধিক্য এবং জনৈক ব্রাহ্মণের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে দেবল নগরীর পতন ঘটে। মুসলমানরা নির্বিচারে হত্যা, লুঠতরাজ ও ধর্মান্তরিতকরণের কাজ চালায়। সতেরো বছরের ঊর্ধ্বে সমস্ত পুরুষকে হত্যা করা হয়। নারী ও শিশুদের পরিণত করা হয় দাসে। লুণ্ঠিত অর্থের এক-পঞ্চমাংশ হজ্জাজ মারফত উপঢৌকন হিসেবে প্রেরিত হয় খলিফার কাছে। এইভাবে দীর্ঘ ব্যর্থতার পর আরবগণ সিন্ধুর বিরুদ্ধে প্রবল সামরিক সাফল্য অর্জন করে। এবং এই সাফল্যের জন্য আরবীয়দের দক্ষতা যতটা না দায়ী ছিল, তার থেকে অনেক বেশি দায়ী ছিল রাজা দাহিরের অপদার্থতা। ***শ্রীবাস্তব লিখেছেন*** ঃ *Thus did the first important town of India fall in to the hands of the Arabs not due to any cowardice on the part of the Indian soliders, but owing to the lethargy of an Indian ruler."*

দেবলে একজন আরবীয় শাসক নিযুক্ত করে মহম্মদ-বিন্-কাশিম দেবলের উত্তর-পূর্বে নিরুণ শহরের দিকে অগ্রসর হন। নিরুণের অধিবাসীরা, যাদের অধিকাংশই বৌদ্ধ এবং রাজা দাহিরের উপর বীতশ্রদ্ধ, বিনা প্রতিরোধে আরবদের বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। অতঃপর মহম্মদ-

বিন্-কাশিম সিন্ধুর উপনদী মিরান অতিক্রম করে ব্রাহ্মণাবাদে অবস্থানকারী রাজা দাহিরের মুখোমুখি হওয়ার উদ্যোগ নেন। রাজা দাহির আর কাল বিলম্ব না করে আরব বাহিনীকে বাধা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ৭১২ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জুন চূড়ান্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বিশাল হস্তী-বাহিনীসহ রাজা দাহির স্বয়ং যুদ্ধে অংশ নেন। ইতিপূর্বে দেবলে আক্রমণকারীদের বাধা না-দিয়ে দাহির একটি ভুল করেছিলেন ; কিন্তু এখন স্বয়ং যুদ্ধে অংশ নিয়ে আর একটা মহাভুল করলেন। কারণ রাজা হিসেবে নিরাপদ শিবিরে থেকে সৈন্যদের নির্দেশ দিলেই তিনি ভাল করতেন। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমান সৈন্যর আঘাতে তাঁর পতন ঘটার ফলে সমগ্র সিন্ধু-বাহিনীর মনোবল ভেঙে যায়। দাহিরের মৃত্যুর পরেও তাঁর পত্নী রানীবাঈ এবং রাওর দুর্গের অন্যান্য অধিবাসীরা প্রতিরোধ চালিয়ে যায়। কিন্তু আরবদের তীব্র আক্রমণের সামনে দাঁড়ানো তাঁদের পক্ষে ছিল নিতান্তই অসম্ভব। তাই অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে মহিলারা নিজেদের মর্যাদা রক্ষা করেন। রাওর দুর্গের পতনের পর আরবীয়-বাহিনী ব্রাহ্মণাবাদ আক্রমণ করে। দাহিরের অন্যতম পুত্র জয়সিংহ কিছু বাধাদানের পর সাফল্য অসম্ভব বুঝতে পেরে চিতোরে পালিয়ে যান। এখানেও বহু মানুষ নিহত হন এবং লুণ্ঠিত হয় বহু ধনসম্পদ। এখান থেকেই মহম্মদ-বিন্-কাশিম দাহিরের অপর স্ত্রী রানী লাদি এবং দুই কন্যা সূর্যদেবী ও পরমলদেবীকে সংগ্রহ করেন। অতঃপর কাশিম সিন্ধুর রাজধানী আরোর এবং মুলতান দখল করেন এবং কনৌজের বিরুদ্ধে এক অভিযান প্রেরণের প্রস্তুতি শুরু করেন। কিন্তু এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার মুহূর্তে খলিফা ওয়ালিদ মহম্মদ-বিন্-কাশিমের প্রাণদণ্ড দেন।

অভাবনীয় সাফল্য দ্বারা খলিফার মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করার পরেও মহম্মদ-বিন্-কাশিমের আকস্মিক প্রাণদণ্ডাদেশ কিছুটা কৌতূহলোদ্দীপক। এ-সম্পর্কে দুটি কারণ উল্লেখ করা হয়। প্রথম কারণটি রোমাঞ্চকর। মহম্মদ-বিন্-কাশিম দাহিরের কন্যাদ্বয় সূর্যদেবী ও পরমলদেবীকে বন্দি করে খলিফার কাছে পাঠিয়েছিলেন। পিতার হত্যাকারীকে চরম শাস্তি দেবার বাসনায় এঁরা খলিফার কাছে নালিশ করেন যে, মহম্মদ কাশিম তাঁদের মর্যাদা হানি করার পরে খলিফার কাছে পাঠিয়েছেন। এহেন ধৃষ্টতার সংবাদে ক্রুদ্ধ খলিফা ওয়ালিদ তৎক্ষণাৎ মহম্মদ-বিন্-কাশিমের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন এবং তা কার্যকর করা হয়। অবশ্য কাশিমের প্রাণহীন দেহ দেখার পর দাহিদের কন্যারা স্বীকার করেন যে, তাঁদের অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং উদ্দেশ্যমূলক। খলিফা অতঃপর এঁদের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। আধুনিক কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন, এই কাহিনীটি অবাস্তব ও অতিরঞ্জিত। এঁদের মতে, কাশিমের মৃত্যুদণ্ড ছিল আরবের রাজনৈতিক ক্ষমতাদ্বন্দ্বের পরিণতি মাত্র। খলিফা ওয়ালিদের মৃত্যুর (৭১৪ খ্রীঃ) পর খলিফা হন তাঁর ভাই সুলেমান। নতুন খলিফা ছিলেন হজ্জাজের ঘোর শত্রু। তাই ক্ষমতা দখল করার পর তিনি হজ্জাজের জ্ঞাতিভাই তথা জামাতা মহম্মদ-বিন্-কাশিমকে পদচ্যুত করেন এবং বন্দিরূপে মেসোপটেমিয়ায় এনে নৃশংসভাবে হত্যা করেন (৭১৫ বা ৭১৬ খ্রীঃ)। ঐতিহাসিক *শ্রীবাস্তব* মনে করেন, দ্বিতীয় কারণটিই বেশি নির্ভরযোগ্য। তাঁর ভাষায় : *"The other account which ascribes Muhammad's death of political reasons, is more worthy of credence."*

মহম্মদ-বিন্-কাশিমের সামরিক ও প্রশাসনিক প্রতিভা সিন্ধুদেশে আরবীয়দের যে প্রাধান্যের সূচনা করেছিল ; তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই অবক্ষয়ের ছাপ দৃষ্ট হয়। মহম্মদ কাশিমের স্থলাভিষিক্ত

এজিদ, হাবিব, জুনাইদ প্রমুখ প্রত্যেকেই ছিলেন অসম্পূর্ণ প্রশাসক। আরবীয় রাজনীতির পট পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে এঁরা কেউই সিন্ধুর বাস্তব পরিস্থিতি ও চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারেননি। ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে ওমায়িদ বংশের পতন ঘটিয়ে আব্বাসিদ বংশ খলিফাপদ দখল করে সিন্ধুর শাসক পরিবর্তন করলে এখানেও গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়। মুসলমানদের অন্তর্বিরোধ এবং ভারতীয় গোষ্ঠীগুলির ক্ষমতাদখলের নতুন উদ্যোগ সিন্ধুদেশে আরবীয় শাসনের দুর্বল ভিত্তিকে দুর্বলতর করে দেয়। সিন্ধুতে খলিফার কর্তৃত্ব প্রায় শূন্যের কোঠায় পৌঁছে যায় এবং সিন্ধুর শাসকরা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে শুরু করেন।

○ আরবদের সাফল্যের কারণ ঃ

আরব-আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে বিলম্ব হলেও রাজা দাহিরের প্রতিরোধ ছিল যথেষ্ট তীব্র। বীরের মতই যুদ্ধক্ষেত্রে অসংখ্য সঙ্গীসহ তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এমনকি রাজা দাহিরের মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা পত্নী রানীবাঈ অসম সাহসিকতা ও দেশাত্মবোধের পরিচয় দিয়ে রাওর দুর্গ থেকে প্রতিরোধ চালিয়ে যান। চূড়ান্ত পরাজয়ের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি লড়াই চালিয়ে যেতে দ্বিধা করেননি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুসলমানরাই বিজয়ী হয়। আরবদের এই সাফল্যে ভারতের রাজনীতিতে বিশেষ বা সুদুরপ্রসারী কোন পরিবর্তন হয়ত ঘটাতে পারেনি, কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে তুর্কী আক্রমণকারীদের সাফল্যের প্রেক্ষাপট বিচারের দিক থেকে আরব-বাহিনীর এই সাফল্য গুরুত্বপূর্ণ।

মহম্মদ-বিন্-কাশিমের দক্ষ নেতৃত্ব এবং মুসলমানদের উন্নত সামরিক কৌশল অবশ্যই তাদের সাফল্যের অন্যতম কারণ ছিল। মুসলমানদের দ্রুতগামী অশ্বারোহী-বাহিনী এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে সাম্যবোধ ও ধর্মীয় প্রেরণা তাদের প্রায় অপ্রতিরোধ্য করে তুলেছিল। কিন্তু কেবল ক্ষাত্রশক্তির তারতম্য একটা দীর্ঘস্থায়ী সমাজ ও রাজনীতির পতন ঘটানোর পক্ষে যথেষ্ট নয়। এই ব্যর্থতা ও পতনের জন্য তার অভ্যন্তরীণ অবক্ষয় অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। সিন্ধুর রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিও এজন্য কম দায়ী ছিল না। রাজা দাহিরের পিতা চাচ্ অন্যায়ভাবে সিন্ধুর ক্ষমতা দখল করেছিলেন বলে এই বংশের প্রতি সাধারণ মানুষের আন্তরিক সমর্থন ছিল না। তাই দাহিরের সিন্ধুর বিরুদ্ধে মুসলমানদের আক্রমণ সাধারণ মানুষকে বিশেষ প্রভাবিত করেনি। পরন্তু সামাজিক শ্রেণীভেদ ও বৈষম্য এবং রাজশক্তি কর্তৃক তাকে সমর্থন সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষকে রাজতন্ত্রের বিরোধীতে পরিণত করেছিল। জাঠ, মেড এবং অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর মানুষেরা সরকারী কর্তৃপক্ষ দ্বারা নানাভাবে নির্যাতিত হত। উচ্চশ্রেণীর মানুষের সাথে এইসব নিম্নশ্রেণীর মানুষের বিভেদ ও বৈষম্য সামাজিক সংহতি ব্যাহত করেছিল। ধর্মের ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল হিন্দুরা। এর পরে ছিল বৌদ্ধ ও জৈনরা। স্বভাবতই ধর্মের ক্ষেত্রেও কোনরূপ ঐক্যবদ্ধ প্রেরণা-সৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল না। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী জাঠ ও মেড জাতিভুক্ত মানুষেরা সামাজিক ও ধর্মীয় কারণে ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী রাজা দাহিরের প্রতি ক্ষুব্ধ ছিল। সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত এইসব গোষ্ঠী আরব-আক্রমণের বিরুদ্ধে রাজা দাহিরকে সাহায্য ত করেইনি ; পরন্তু, আক্রমণকারীদের সাথে গোপন সমঝোতা দ্বারা দাহিরের পতন ত্বরান্বিত করেছিল। *'চাচনামা'* গ্রন্থে এই সকল ব্যক্তিকে *'জাতীয়তাবাদীচেতনা-বঞ্চিত বিশ্বাসঘাতক'* অভিহিত করে

বলা হয়েছে *"The Buddhist fifth-columnists welcomed the Arabs and entered into a pact with them against their own governor of Schwan)"* / অবশ্য একথা সত্য নয় যে, সমস্ত বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মানুষ দাহিরের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। আবার এটাও সত্য যে, অনেক অ-বৌদ্ধ ভারতীয় মুসলিম আক্রমণকারীদের সাথে যোগ দিয়ে তাদের সাফল্য ত্বরান্বিত করেছিল। প্রকৃত সত্য এই যে, উপরোক্ত বিবরণ তৎকালীন সিন্ধুদেশের তথা ভারতের সামাজিক বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতার একটা ছবি তুলে ধরে, যা ভারতীয়দের রাজনৈতিক পতনের জন্য বহুলাংশে দায়ী ছিল। চাঁদ বরদৈ রচিত *'পৃথ্বীরাজ রসোঃ'* গ্রন্থের বিবরণও এই মতকে সমর্থন করে। অর্থনৈতিক দিক থেকে সিন্ধুদেশ ছিল অনুর্বর। স্বভাবতঃই বিশাল সেনাবাহিনী বা অতি উন্নত যুদ্ধ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করা সিন্ধুর পক্ষে সম্ভব ছিল না। আক্রমণকারী সেনাদের সংখ্যাধিক্য অবশ্যই তাদের সাফল্যের একটা কারণ ছিল। তবে সাহসিকতার দিক থেকে সিন্ধুর বাহিনীকে পশ্চাৎপদ বলা চলে না। কিন্তু শুধুমাত্র সাহসিকতাকে ভর করে আরবদের মত শক্তিশালী আক্রমণকারীর গতিরোধ করা সম্ভব ছিল না। সিন্ধুদেশ তার ভৌগোলিক অবস্থানের জন্যই ভারতের অবশিষ্ট অংশ থেকে দীর্ঘকাল বিচ্ছিন্ন ছিল। এমনিতেই ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল ভঙ্গুর ও আত্মধ্বংসী। কোন কেন্দ্রীয় শাসনের অস্তিত্ব ছিল না। সেই সঙ্গে সিন্ধুদেশের একক অস্তিত্ব তাকে ভারতীয় মৈত্রী বা সাহায্যলাভে বঞ্চিত করেছিল নিদারুণভাবে। ব্যক্তিগতভাবে রাজা দাহিরের অদূরদর্শিতা ও অযোগ্যতা মুসলমানদের সাফল্যকে সহজলভ্য করেছিল। রাজ্যবিস্তারে আগ্রহী এবং শক্তিশালী আরবগণ সিন্ধুর সীমান্ত অঞ্চলে মাকরান পর্যন্ত অগ্রসর হবার পরেও দাহির নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সামান্যতম চিন্তিত হয়নি। একজন রাজার বুদ্ধি-বিবেচনার এই দৈন্য সত্যই কষ্টদায়ক। শুধু তাই নয়, মুসলমান-বাহিনী যখন সিন্ধুর একের পর এক অঞ্চল দখল করছে, বিজয়োল্লাস করছে, নির্বিচার হত্যা ও লুণ্ঠন চালাচ্ছে, তখনও দাহির ব্রাহ্মণাবাদে বসে অলসভাবে চিন্তা করছেন কখন, কিভাবে তাঁর আক্রমণে যাওয়া উচিত। শেষ পর্যন্ত যখন তিনি আক্রমণকারীদের মুখোমুখি হলেন, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। একের পর এক পরাজয়ের ফলে সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়েছে ভারতীয়-বাহিনীর মনোবল এবং একই কারণে আক্রমণকারীদের মনোবল তখন তুঙ্গে। (*'as the Arabs, on account of their repeated success, were flushed with enthusiasm and our people, proportionately, dispirited and demoralised for the same reasons.'—A. L. Srivastava.'*)।

○ আরবীয় শাসনব্যবস্থা ও প্রকৃতি ঃ

মহম্মদ-বিন্-কাশিম যে নিছক লুণ্ঠনকারী ছিলেন না তার প্রমাণ পাওয়া যায় এদেশে তাঁর যুদ্ধবিজয়ের পরবর্তী কর্মধারা থেকে। সিন্ধুদেশে প্রবেশ ক'রে এক-একটি নগর বা অঞ্চল দখল করার পরেই তিনি সেখানে আরবীয় শাসন নিযুক্ত করেন এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সৈন্য মোতায়েন করেন। তবে সিন্ধুর রাজা দাহিরকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর চিন্তাধারা ছিল একজন গোঁড়া ধর্মপ্রচারক ও সম্পদ সংগ্রাহকের। এই পর্বে মহম্মদ-বিন্-কাশিম প্রশাসনিক পদে কেবলমাত্র আরবীয়দের নিযুক্ত করেন। এবং বিজিত অঞ্চলে লুঠতরাজ ও পরাজিতদের ইসলামধর্মে দীক্ষিত করার কাজকেই তাঁর প্রশাসনের একমাত্র লক্ষ্য বলে গ্রহণ

করেন। তাঁর প্রভু হজ্জাজ ছিলেন প্রচণ্ড গোঁড়া। স্বভাবতঃই তাঁর নির্দেশে কাশিম নির্বিচারে লুণ্ঠন ও ধর্মান্তরিতকরণের কাজ চালিয়ে যান। কিন্তু এই যুদ্ধে রাজা দাহিরের পরাজয় ও মৃত্যুর পরে সমগ্র সিন্ধুদেশ আরব-বাহিনীর করতলগত হলে, এখানে স্থায়ী ও কার্যকরী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়োজন অনুভূত হয়। কিন্তু কাজটা খুব সহজ ছিল না। কারণ আরবরা সংখ্যায় ছিল খুব কম। অধিকাংশই যোদ্ধা। প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা বা দক্ষতা তাদের ছিল না। ভারতের প্রশাসনিক পরিকাঠামো, ভাষা, রাজস্বব্যবস্থা ও আইনকানুন ইত্যাদি সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা ছিল না। অন্যদিকে হিন্দুরা মুসলমানদের আক্রমণকারী ও ধর্মনাশকারী বিধর্মী এই ধারণার বশবর্তী হয়ে আরবদের সাথে অসহযোগিতা না-করার সিদ্ধান্তে অটল থাকে। বস্তুত, আরব-বাহিনীর অনুপ্রবেশকাল থেকে তাদের কার্যকলাপ এই বিরূপতা তৈরি করার পক্ষে যথেষ্টই ছিল। এমতাবস্থায় মহম্মদ-বিন্-কাশিম দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। হেজ্জাজ ও সিন্ধুর অধিবাসীদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য কাশিমকে নমনীয় ও বাস্তববাদী নীতি গ্রহণের অনুমতি দেন। *'বিনা প্রশ্নে ইসলাম গ্রহণ অথবা মৃত্যুবরণ'*—হিন্দুদের প্রতি এই নীতির আক্ষরিক প্রয়োগের পরিবর্তে তিনি কিছুটা সামঞ্জস্যবিধান নীতি গ্রহণ করেন। নিয়মিত *'জিজিয়া কর'* প্রদানের পরিবর্তে হিন্দু ও বৌদ্ধদের ও ইহুদী বা খ্রীষ্টানদের (জিম্মি) মত নিজ নিজ ধর্মপালনের অধিকার দেওয়া হয়। মহম্মদ-বিন্-কাশিম মুলতানে ঘোষণা করেন : *"খ্রীষ্টানদের গীর্জা, ইহুদীদের ধর্মসভা ও পারসিক পুরোহিতদের পূজাবেদীর মত হিন্দুদের মন্দিরও পবিত্র থাকবে।' স্যার উইলিয়াম মুর* (W. Muir)-এর মতে, এই ব্যবস্থা ইসলামের রাজনীতিতে একটি নতুন ধারার সূচনা করে। কারণ এতদিন পর্যন্ত আল-কিতাবী হিসেবে স্বীকৃত হিব্রু বা খ্রীষ্টানগণ ব্যতীত কাউকে জিজিয়া প্রদানের পরিবর্তে ধর্মানুসরণের স্বাধীনতা দেওয়া হত না। সিন্ধুদেশে কাশিম প্রবর্তিত এই সমঝোতা পরবর্তীকালে মুসলমান শাসকদের পথ দেখিয়েছে বলেও স্যার মুর মনে করেন। *ঐতিহাসিক শ্রীবাস্তবও* এই মন্তব্যের সাথে একমত। তবে তিনি মনে করেন, মুসলমানদের এই আংশিক ধর্মসহিষ্ণুতা তাদের মনে উদারতার ফসল নয়। একটা দেশের সমস্ত মানুষকে ধর্মান্তরিত করা অসম্ভব ও অবাস্তব জেনে তারা এহেন মধ্যপন্থা অবলম্বনে বাধ্য হয়েছিল। যাই হোক্, এই ব্যবস্থায় মহম্মদ-কাশিম সিন্ধুর হিন্দুদের সহযোগিতা অর্জনে সক্ষম হন এবং তাদের সাহায্যে সিন্ধুদেশে একটি কার্যকরী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।

সিন্ধুর বিজিত ভূখণ্ডকে কয়েকটি জেলায় (ইক্‌তা) বিভক্ত করা হয় এবং সরকারের প্রয়োজনে সামরিক সেবা প্রদানের শর্তে প্রতিটি জেলার শাসনভার একজন করে আরবদেশীয় সামরিক অফিসারের হাতে ন্যস্ত করা হয়। জেলার নিম্নস্তরের প্রশাসনিক দায়িত্ব হিন্দু কর্মচারীদের হাতে থাকে। সৈন্যদেব নগদ বেতনের পরিবর্তে অনেককেই 'জায়গির' জমি দেওয়া হয়। মুসলমান সন্ত এবং ইমামরাও দান হিসেবে জমি ভোগ করার সুযোগ পান। এই ব্যবস্থার ফলে সিন্ধুদেশে বেশ কয়েকটি আরবীয় সামরিক উপনিবেশ গড়ে ওঠে। গ্রামাঞ্চলের স্থানীয় শাসন-দায়িত্ব আগের মতই স্থানীয় মানুষের হাতে থাকে। গ্রামাঞ্চলে আইন-কানুনও অপরিবর্তিত থাকে। কিছু নতুন আইন রচিত হয় মূলত শহরাঞ্চলের জন্য।

আরবদের শাসনে সিন্ধুর করব্যবস্থা প্রায় অপরিবর্তিত ছিল। সরকারী আয়ের প্রধান উৎস ছিল ভূমি-রাজস্ব এবং 'জিজিয়া'। উৎপন্ন ফসলের দুই-পঞ্চমাংশ বা এক-চতুর্থাংশ হিসেবে সংগ্রহ

করা হত। এছাড়া নিলামের মাধ্যমে কিছু কিছু এককালীন কর আদায় করা হত। 'জিজিয়া' ছিল একপ্রকার ধর্মকর, যা অ-মুসলমানদের প্রদান করতে হত। প্রত্যেকের আয়ের ভিত্তিতে তার প্রদেয় 'জিজিয়া'র পরিমাণ নির্ধারণ করা হত। জিজিয়া নির্ধারণের জন্য অ-মুসলমানদের তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। তথাকথিত ধনীদের মাথাপিছু জিজিয়ার হার ছিল ৪৮ দিরহাম। মধ্যআয়ী ব্যক্তিদের দিতে হত ২৪ দিরহাম করে। এবং নিম্ন আয়কারীদের প্রদেয় জিজিয়ার হার ছিল মাথাপিছু ১২ দিরহাম। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, শারীরিকভাবে অক্ষম, অন্ধ, কর্মহীন প্রমুখকে জিজিয়া প্রদান থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। আরবদের আমলে বিচারব্যবস্থা ছিল বিশৃঙ্খলায় ভরা। বিচারালয়ের সুনির্দিষ্ট স্তরবিন্যাস ছিল না। জেলা-আধিকারিক বা অভিজাতগণ নিজ নিজ এলাকার বিচারকার্য সম্পাদন করতেন। নির্দিষ্ট বা লিপিবদ্ধ কোন আইন নয়, বিচারকের ইচ্ছা-অনিচ্ছা দ্বারাই শাস্তি নিরূপিত হত। স্বভাবতঃই হিন্দুদের উপর শাস্তির বোঝাটা ছিল অনেক বেশি। সামান্য চুরির অপরাধে কোন কোন হিন্দুকে চরমভাবে নির্যাতন করা কিংবা তার স্ত্রী-পুত্রদের পুড়িয়ে হত্যা করার ঘটনার অভাব ছিল না। হিন্দু ও মুসলমান-এর মধ্যে কোন বিরোধ ঘটলে কাজী কোরানের ব্যাখ্যা অনুযায়ী বিচার করতেন। অবশ্য হিন্দুদের অভ্যন্তরীণ বিরোধ স্থানীয় পঞ্চায়েত ফয়সালা করতে পারতেন। তবে পরবর্তীকালে আগত তুর্কীদের তুলনায় আরবদের ধর্মীয় গোঁড়ামি ছিল অনেক কম। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'জিজিয়া' কর প্রদানের বিনিময়ে হিন্দুরা ধর্মাচরণের স্বাধীনতা ভোগের অধিকারী ছিল। অধুনা কোন কোন গবেষক মনে করেন, 'জিজিয়া'-কে নিছক ধর্ম-কর না বলে 'সামরিক বৃত্তি-রেহাই-কর' বলা ভাল। কারণ ইসলামীয় রাষ্ট্রতত্ত্ব অনুযায়ী একজন মুসলমান রাষ্ট্রকে সর্বদা সামরিক সেবা দিতে বাধ্য ছিল, কিন্তু অ-মুসলমানদের ক্ষেত্রে এই সামরিক সেবা বাধ্যতামূলক ছিল না। তাই তাদের 'জিজিয়া' কর দিতে হত। কিন্তু ঐতিহাসিক ***শ্রীবাস্তব*** এই ব্যাখ্যাকে 'ভ্রান্তিমূলক' মনে করেন। কারণ যে সকল হিন্দু সামরিক বৃত্তি অবলম্বন করত, তাদেরও 'জিজিয়া' দিতে হত। সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষের সামাজিক বা অর্থনৈতিক অবস্থা পরিবর্তনের কোন চেষ্টা আরবদের শাসনব্যবস্থায় ছিল না। রাজা দাহিরের আমলে জাঠ, মেড প্রভৃতি নিচুতলার মানুষ যে অভাব ও অমর্যাদার সাথে বসবাস করত, আরবদের শাসনকালেও তা অপরিবর্তিতই ছিল।

○ আরব শাসনের স্বল্প স্থায়িত্বের কারণ ঃ

খলিফার বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যের অঙ্গ হিসেবে সিন্ধুদেশ টিকে ছিল মাত্র দেড়শো বছর। তার পরেও সিন্ধুতে আরবদের শাসন অব্যাহত ছিল প্রায় দেড়শো বছর ; কিন্তু এটি ছিল নিছক শব্দবর্ণহীন একটি মৃতপ্রায় অধ্যায় মাত্র। ৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধুর শাসকদের সাথে খলিফার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় এবং মূলতান ও মনসুরা'কে কেন্দ্র করে দুজন আরব শাসক প্রায় স্বাধীন শাসন চালাতে থাকেন। তুর্কীদের আগমনের আগেই আরবদের অস্তিত্ব প্রায় বিলীন হয়ে যায়। যে প্রচণ্ড উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে আরবগণ সিন্ধু দখল করেছিল, তার এহেন স্বল্পস্থায়ী ও গুরুত্বহীন পরিণতি বিস্ময়কর। সম্ভাবনা সত্ত্বেও ভারতভূমিতে আরবদের এই ব্যর্থতার অনেকগুলি কারণ ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। ***প্রথমত,*** সিন্ধুবিজয়ী আরবদের ভারতব্যাপী কোন রাজনৈতিক কর্মসূচী ছিল না। তারা সিন্ধুকে ভারত-বিজয়ের ভিত্তিকেন্দ্র রূপে

ব্যবহার করার পরিবর্তে অবশিষ্ট ভারত-জীবন থেকে সিন্ধুদেশকে বিচ্ছিন্ন রেখেই সন্তুষ্ট ছিল। ইতিপূর্বেই আরবদের সাথে ব্যাপক বাণিজ্যের সূত্রে সিন্ধুপ্রদেশ বহির্ভারতীয় মুসলমান রাষ্ট্রগুলির সাথে অধিক সম্পর্কিত ছিল। রাজস্থানের মরুভূমির ওপারে হিন্দু-জগৎ থেকে এটি ছিল বিচ্ছিন্ন। আরবগণ সিন্ধুর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব লাভ করার পরেও ভারতের রাজনৈতিক জীবনের মূল স্রোতের সাথে সিন্ধুর যোগ ঘটানোর কোন উদ্যোগ নেয়নি। ***দ্বিতীয়ত,*** আরবদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতা সিন্ধুতে তাদের রাজনৈতিক সম্ভাবনা নষ্ট করেছিল। ওমায়িদ বংশের সাথে আব্বাসিদ বংশের বিরোধ ও ক্ষমতাদখলের লড়াই, সিন্ধুর আরব শাসকদের স্বাধীনতা-স্পৃহা বৃদ্ধি করেছিল। তাছাড়া সিন্ধু-বিজয়ের প্রথম পর্বে খলিফার উদার হাতে আক্রমণকারীদের সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই খলিফার দরবারে এ সত্য প্রকাশ পায় যে, সিন্ধু একটি অনুর্বর দেশ এবং সেখান থেকে প্রচুর রাজস্ব লাভের সম্ভাবনা ক্ষীণ। ফলে খলিফার দপ্তর সিন্ধুর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিস্পৃহ হয়ে পড়ে। ঘন ঘন ভূমিকম্প এবং মাঝে মাঝে সিন্ধুনদীর গতিপথ পরিবর্তনের ঘটনা এই ধারণাকে আরও জোরদার করে। ***তৃতীয়ত,*** আরব-আক্রমণকারীরা যে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও ঐক্যবোধ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সিন্ধুদেশের বিরুদ্ধে আক্রমণে নেমেছিল, সিন্ধু-বিজয়ের পর তা দ্রুত অন্তর্হিত হয়। রাষ্ট্রক্ষমতা আর ঐশ্বর্যের সুখ তাদের অলস ও উদ্যোগহীন করেছিল। ইতিমধ্যে খলিফা হারুণ-অল্-রশিদ-এর আমলে (৭৮৬-৮০৮ খ্রীঃ) বাগদাদের নৈতিক জীবনেও ইসলামের ত্যাগ, সংগ্রাম ও ভালবাসার মূল সত্যের পরিবর্তে বিলাস ও দার্শনিক সুখবাদের প্রাবল্য ঘটেছিল। এই প্রভাব পড়েছিল সিন্ধুতেও। স্বভাবতঃই সামরিক বা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আরব-প্রতিভার পূর্ণ প্রকাশ আর সম্ভব ছিল না। ***চতুর্থত,*** হিন্দু অধ্যুষিত ভারতবর্ষের সাথে আরবদের হৃদয়ের মেলবন্ধন ঘটানোর কোন চেষ্টা করা হয়নি। সিন্ধুবাসীদের কাছে আরবগণ নিছক আক্রমণকারী হিসেবেই থেকে গিয়েছিল। ক্ষমতাবান ব্রাহ্মণদের নেতৃত্বে সমগ্র হিন্দুসমাজের মনে যে গোপন প্রতিরোধ-বাসনা গড়ে উঠেছিল, আরব শাসনের অস্থায়িত্বের জন্য তার দায়িত্ব কম নয়। ***শ্রীবাস্তব*** লিখেছেন ঃ *"The generality of the Hindus, under the influence of the priestly class, considered themselves and their culture superior that of the Arabs, who were, in their eyes, nothing more than unclean barbarians."* ***পঞ্চমত,*** পূর্ব ও উত্তর ভারতের পরাক্রান্ত রাজপুত শক্তিগুলির, বিশেষত গুর্জর-প্রতিহার বংশের উপস্থিতি আরবদের ভারতব্যাপী সাম্রাজ্যের সম্ভাবনা নষ্ট করে দিয়েছিল। অনেকেই মনে করেন, রাজপুতদের সামরিক পরাক্রমের কাছে আরবদের অবস্থান ছিল দুর্বল। এ ছাড়া মহম্মদ-বিন্-কাশিমের মত দক্ষ ও বিচক্ষণ নেতার অভাব, সিন্ধুর ভৌগোলিক অবস্থিতি, আধুনিক তুর্কী শক্তির উত্থানের ফলে খলিফার ক্ষমতা হ্রাস ইত্যাদি একাধিক কারণের সমন্বয়ে আরবদের উজ্জ্বল রাজনৈতিক জীবন দীর্ঘায়িত হতে পারেনি।

○ সিন্ধুদেশে আরব শাসনের গুরুত্ব ঃ

আরবগণ কর্তৃক সিন্ধুদেশ বিজয় ও তিনশত বৎসর স্থায়ী শাসনব্যবস্থা কোন স্থায়ী বা সুদূরপ্রসারী ফল দ্বারা সমৃদ্ধ ছিল না। ***স্ট্যান্‌লী লেন্‌পুল (S. Lanepool)*** আরবদের

সিন্ধুবিজয়কে "ভারতবর্ষ ও ইসলামের ইতিহাসে একটি ক্ষুদ্র উপাখ্যান, একটি নিষ্ফল বিজয়" *("merely an episode in the history of India and Islam, a triumph without results")* বলে গণ্য করেছেন। মূলগতভাবে এই বক্তব্যের সাথে অধিকাংশ পণ্ডিতই একমত। অধ্যাপক ***শ্রীবাস্তব*** *(A. L. Srivastava)* এই বিজয়ের রাজনৈতিক গুরুত্বহীনতা বর্ণনা করে লিখেছেন ঃ *"From the political point of view the Arab conquest of Sind was an insignificant event in the history of Island and also in that of India."* ***স্যার ওলসি হেইগ (W. Haig)***-এর মতে, *"সিন্ধুতে আরবদের অধিষ্ঠান ছিল একটি সামান্য উপাখ্যান এবং একটি বিরাট দেশের অতি ক্ষুদ্রতম অংশে তাদের স্বল্পস্থায়ী কর্মকাণ্ড সীমিত ছিল।"* অধ্যাপক ***হাবিবুল্লাহ*** এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, *"ভারতে ইসলামকে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে আরবরা অগ্রসর হয়নি। বিশাল এই ভারত মহাদেশের একপ্রান্তকে তাদের আক্রমণ নাড়া দিতে পেরেছিল মাত্র ; এবং তাও মিলিয়ে গিয়েছিল স্বল্পকালের মধ্যেই।"*

সিন্ধুদেশে আরবদের অভিযান এবং তার দুঃখজনক পরিণতি উপরিলিখিত মন্তব্যগুলির যথার্থতা প্রমাণ করে। আশ্চর্যজনক হলেও এটাই সত্য যে, স্বল্পকালের মধ্যে একাধিক মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় যে আরবদেশের বিজয়পতাকা উড্ডীন হয়েছিল, ভারতবর্ষে তারা ছিল অনেক নিষ্প্রভ। ভারতের রাজনৈতিক জীবনের মূল ধারা থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন সিন্ধুদেশের ক্ষুদ্রতম গণ্ডীর মধ্যেই তাদের কর্মকাণ্ড সীমাবদ্ধ ছিল। স্বভাবতঃই বিশাল ভারত-ভূখণ্ডের রাজনৈতিক বা সামাজিক জীবনে তাঁদের উপস্থিতি অনুভূত হয়নি, আর তাকে প্রভাবিত করার প্রশ্ন ত অবান্তর। এই সত্য আরও দৃঢ় হয় যখন লক্ষ্য করা যায় যে, সিন্ধু থেকে মুসলমানদের বিতাড়িত করার জন্য ভারতীয় শক্তিগুলি আদৌ কোন সংঘবদ্ধ উদ্যোগ নেওয়া থেকে বিরত থাকে। এমনকি আরববাহিনীর এহেন সাফল্যলাভের ঘটনা থেকে ভবিষ্যতের বৃহত্তর ও ব্যাপক কোন আক্রমণের সম্ভাবনা রোধ করার জন্য সীমান্ত সুরক্ষা বা ঐক্যবদ্ধ থাকার শিক্ষাও ভারতীয় রাজন্যবর্গ গ্রহণ করেননি। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আরবগণ কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটাননি। অনুর্বর সিন্ধুর অর্থনীতিকে সবল করার কোন চেষ্টাও তারা করেনি। অথচ জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক থেকে আরবদেশ যথেষ্ট অগ্রণী ছিল। ইসলামধর্ম প্রসারের কাজেও তারা ছিল ব্যর্থ। 'জিজিয়া' কর প্রদানের বিনিময়ে অধিকাংশ ভারতবাসী তাদের স্বধর্মে দৃঢ় ছিল। হিন্দুদের কাছে আরবগণ ছিল 'বর্বর আক্রমণকারী' মাত্র। তাই আরবদের সাথে তারা কখনও একাত্ম হতে পারেনি। আর আরব-শাসকরাও নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও দুর্বলতার কারণে স্থিতাবস্থা বজায় রাখতেই বেশি আগ্রহী ছিলেন।

রাজনৈতিক দিক থেকে নিষ্ফল হলেও ; সিন্ধুদেশে আরব-শাসনের কিছু পরোক্ষ ফল লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত সাংস্কৃতিক দিক থেকে এই ঘটনা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। ঐতিহাসিক ***শ্রীবাস্তব*** মনে করেন, আরবরা সিন্ধু আক্রমণ করে এদেশে ইসলামের যে ভিত রচনা করে যায়, তার উপরে ভর রেখে পরবর্তীকালে তুর্কীরা ইমারত গড়ে তুলেছিল। তিনি লিখেছেন ঃ *"The Arab conquest of Sind was destined to sow the seed of Islam in this land. ...It became the endeavour of future invadors from the north-west to help this religion expand and flourish..."* শ্রীবাস্তবের এই মূল্যায়নকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা যায়

না। তবে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সিন্ধুতে আরব-শাসনের ইতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে সকল ঐতিহাসিক একমত। আরো পরিষ্কার করে বলা যায়, ভারতবর্ষের সাথে সংযোগের ফলে বেশি উপকৃত হয়েছিল আরবের সভ্যতা ও সংস্কৃতি। মন্দির ইত্যাদি ভারতের বহু সুদৃশ্য ইমারত আরবদের সদম্ভ আঘাতে ধ্বংস হয়েছিল। তাদের নির্মিত দুর্গ ও প্রাসাদ কালের করাল গ্রাসে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে স্বাভাবিক ভাবেই। কিন্তু ভারতের শিল্প, সাহিত্য, দর্শন থেকে তারা নিজেদের সমৃদ্ধ করতে পেরেছে। ভারতীয় সভ্যতার উন্নতমান তাদের অবাক করেছিল। ভারতীয় দর্শনের অন্তর্নিহিত ভাবধারা এবং ভারতীয় পণ্ডিতদের জ্ঞানের গভীরতা বিস্মিত করেছিল নবাগত আরবদের। এখানে এসে তারা বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করে যে, ইসলামের মূল তত্ত্ব *'একেশ্বরবাদ'* হিন্দু-দর্শনে অজানা বা অস্বীকৃত নয়। আরবরা ভারতীয়দের কাছ থেকেই রাষ্ট্রশাসনের গূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত হয়। তাই আরবদেশের প্রশাসনে তারা ভারতীয় ব্রাহ্মণদের সাদর অভ্যর্থনা জানায়।

ভারতীয় ভাস্করদের অমর সৃষ্টি দেখে বিস্ময়ে আপ্লুত হয়ে আরবরা তাদের দেশে সসম্মানে নিয়ে যায় ভারতীয় শিল্পীদের। ভারতীয় পণ্ডিতদের পদতলে বসে দর্শন, ভেষজ, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতি শাস্ত্রে তারা দক্ষতা অর্জন করে। খলিফা মনসুরের আমলে (৭৫৩-৭৭৪ খ্রীঃ) বাগদাদে আমন্ত্রিত হয়ে আসেন বহু ভারতীয় পণ্ডিত। আরবীয় শিক্ষার্থীরাও ভারত থেকে বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন খলিফার আগ্রহে। তাঁরা এই সময় ব্রহ্মগুপ্ত-রচিত *'ব্রহ্মসিদ্ধান্ত'* ও *'খণ্ড খাদ্যক'* নামক দুটি পুস্তক আরবে নিয়ে যান এবং ভারতীয় পণ্ডিতদের সহায়তায় সেগুলিকে আরবীতে ভাষান্তরিত করেন। এখান থেকেই আরবগণ বৈজ্ঞানিক জ্যোতির্বিদ্যার মূলতত্ত্ব শিক্ষালাভ করে। খলিফা হারুনের আমলে (৭৮৬-৮০৮ খ্রীঃ) এই যোগাযোগ আরও সম্প্রসারিত হয়। আরবীয় লেখকদের গ্রন্থে ভালা, মনাকা, বিজয়কর, সিন্দবাদ প্রমুখ ভারতীয় বিজ্ঞানীদের প্রশংসনীয় ভূমিকার উল্লেখ পাওয়া যায়। কথিত আছে, মনাকা একবার এক দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে খলিফা হারুনকে মুক্ত করেছিলেন। বাগদাদের একটি চিকিৎসালয়ে প্রধান চিকিৎসক হিসেবে ধনা কৃতিত্বের পরিচয়ে দিয়েছিলেন। বস্তুত, ইউরোপের ভাবজগৎ ও জ্ঞান-বিজ্ঞান একদা বাগদাদের আলোকস্পর্শে আলোকিত হয়েছিল ; এবং একথা বললে অত্যুক্তি হয় না যে, বাগদাদের এই গৌরবের মূল স্থপতি ছিল ভারতবর্ষ। ***ঈশ্বরীপ্রসাদ*** লিখেছেন : *"A great many elements of Arabian culture, which afterwards had such a profound effect upon European, civilization were borrowed from India."* আরবদেশের মাধ্যমে ভারতীয় সুপ্রাচীন ও সুমহান জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন ও জ্যোতির্বিদ্যা ইউরোপে সম্প্রসারিত হয়েছিল। তাই অষ্টম ও নবম শতকে ইউরোপের জ্ঞানদীপ্তির আড়ালে ভারতের সাথে আরবদের যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। অধ্যাপক ***শ্রীবাস্তব*** লিখেছেন : *"much of the enlightenment of the early Europeans of the 8th and 9th centuries A. D., was therefore due to the Arab contact with India."* ঐতিহাসিক ***হ্যাভেল***ও স্বীকার করেছেন যে, ভারতের সাথে সংযোগের ফলে আরবীয় তথা ইউরোপীয় দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদি পুষ্ট হয়েছিল।

এই উজ্জ্বল চিত্রের অন্ধকারময় দিকটিও উল্লেখ্য। আরবগণ ভারতীয় দর্শন ইত্যাদির স্পর্শে সঞ্জীবিত হলেও, ভারতের শিক্ষা, সংস্কৃতি, দর্শন ইত্যাদিকে তারা কোনভাবে সাহায্য করেনি বা

করতে চায়নি। তাই সেদেশের মহত্তর দিক, যা কিছু কিছু নিশ্চয় ছিল, এদেশের মাটিতে প্রচারিত হতে পারেনি। ঐতিহাসিক ***সতীশচন্দ্র*** মনে করেন, আরবদেশের শাসককুলের অনুদারতা এজন্য অবশ্যই দায়ী ছিল। তিনি আরও মনে করেন যে, আরবীয় পণ্ডিতেরা যেভাবে বাগদাদের সাহায্য, সমর্থন পেয়েছিলেন, ভারতীয় পণ্ডিতেরা ঠিক ততটা স্বাধীনতা ও পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন কিনা সন্দেহের অবকাশ আছে। এটি অবশ্যই দুঃখজনক ঘটনা। তবে সান্ত্বনা এই যে, ভারতবর্ষ তার উদারতা ও আতিথেয়তা সুমহান ঐতিহ্য বহিরাগত আরবদের ক্ষেত্রেও উন্মুক্ত হাতে বিলিয়ে দিতে কার্পণ্য করেনি।

■ (খ) ভারতের আঞ্চলিক রাজনীতি ঃ

কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে, গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের শেষ চেষ্টা করেছিলেন পুষ্যভূতি বংশের হর্ষবর্ধন। কিন্তু সাম্রাজ্যের স্থপয়িতা হিসেবে হর্ষবর্ধনের সাফল্য সম্পর্কে সাম্প্রতিক কিছু গবেষণায় সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। অন্যদিকে এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে, হর্ষের মৃত্যুর এক শতকের মধ্যে ভারতের তিন প্রান্তে তিনটি সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রয়াস শুরু হয়েছিল। উত্তর ও পশ্চিম ভারতে প্রতিহার বংশ, পূর্ব ভারতে পালবংশ এবং দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রকূট বংশ সাম্রাজ্য স্থাপনের লক্ষ্যে দীর্ঘ যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। দক্ষিণ ভারতের আর একটি রাজ্য চোলদের নেতৃত্বে সমুদ্র অতিক্রম করে বহির্ভারতে অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব স্থাপনের চেষ্টা করেছিল। আদি-মধ্যযুগের ভারতে এই রাজ্যবংশগুলি দীর্ঘস্থায়ী বা বৃহত্তর সাম্রাজ্য স্থাপন করতে না পারলেও, ভারতীয় সংস্কৃতি ও অর্থনীতির উপর স্থায়ী অবদান রেখে যেতে সক্ষম হয়েছে।

○ প্রতিহার বংশ ঃ অষ্টম শতকের গোড়ার দিকে প্রতিহার রাজবংশের রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সূচনা হয়। সাধারণভাবে এরা গুর্জর প্রতিহার নামে পরিচিত। শিলাসিপির সাক্ষ্য অনুযায়ী প্রতিহার হল গুর্জরদেরই একটি শাখা। এই প্রতিহারবংশীয় রাজারা বিভিন্ন শিলালিপিতে নিজেদের সূর্যবংশীয় বলে দাবি করেছেন। তাঁদের দাবি তাঁরা হলেন রামচন্দ্রের ভ্রাতা লক্ষ্মণের বংশধর। কিন্তু এই দাবির কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায়নি। কারণ ***প্রথমত,*** সাধারণভাবে মনে করা হয়ে থাকে, পঞ্চম শতাব্দীর শেষার্ধে ভারতে হূন আক্রমণের সময় গুর্জরেরা একটি বহিরাগত জাতি হিসেবে ভারতে প্রবেশ করে এবং পাঞ্জাবের মধ্যে অগ্রসর হয়ে আরাবল্লী পর্বতের পশ্চিমে যোধপুর অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। অঞ্চলটির বর্তমান নাম রাজপুতানা, মুসলিম আমল থেকে প্রচলিত। কিন্তু তার বহু পূর্বে এ অঞ্চলের নাম ছিল গুর্জরত্রা (বর্তমানে গুজরাট)। ***দ্বিতীয়ত,*** ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে রচিত কোন ভারতীয় গ্রন্থে গুর্জরদের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। হর্ষবর্ধনের উত্তর-ভারতে রাজ্যবিস্তারের সময়েতেও এই বংশের 'প্রতিহার' নামক একটি শাখা এ অঞ্চলে তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। এ-কারণে অনেক সময় সমগ্র রাজ্যবংশকেই 'গুর্জর-প্রতিহার' বলে অভিহিত করা হয়।

গুর্জরবংশের প্রতিষ্ঠাতা ***হরিচন্দ্র***। হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণী অনুযায়ী তাঁর রাজধানী ছিল ***'ভিনমাল'*** নামক স্থানে। এই বংশেরই প্রতিহার শাখার এক রাজা প্রথম নাগভট্ট (৭২৫—৭৪০

খ্রীঃ) রাজপুতানা অঞ্চল থেকে সরে গিয়ে মালবে এক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী। প্রথম নাগভট্ট সিন্ধু অঞ্চলে আরবদের আক্রমণ প্রতিহত করেন এবং গুজরাট ও রাজপুতানার কিছু কিছু অঞ্চলও নিজ অধিকারভুক্ত করেন। এই বংশের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য নরপতি বৎসরাজ। তাঁর সময় থেকেই ভারতে ত্রিশক্তি সংঘাতের শুরু হয়।

অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে ভারতে যে তিনটি প্রধান শক্তির উত্থান ঘটেছিল তারা হল, গুর্জর-প্রতিহারবংশ, পালবংশ এবং রাষ্ট্রকূটবংশ। যথাক্রমে পশ্চিম, পূর্ব ও দক্ষিণ-ভারতে রাজত্বকারী এই তিনটি রাজশক্তির মধ্যে ত্রিপাক্ষিক দ্বন্দ্বই ভারতের ইতিহাসে ত্রিশক্তি-দ্বন্দ্ব নামে খ্যাত। এই বৈরিতার মূল লক্ষ্য ছিল কনৌজের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা। হর্ষবর্ধনের সময় থেকেই কনৌজ উত্তর-ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে স্থাপিত হয়। হর্ষের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারীদের দুর্বলতার সুযোগে এই তিনটি শক্তিই কনৌজকে নিজ অধিকারভুক্ত করে সমগ্র উত্তর-ভারতে আধিপত্য বিস্তার করতে চেয়েছিল। এ কারণে প্রায় একশো বছর ধরে গুর্জর, পাল ও রাষ্ট্রকূট-রা বংশানুক্রমিকভাবে সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল। গুর্জর-প্রতিহারদের পক্ষে এই সংঘাতে প্রথম অংশগ্রহণকারী রাজা ছিলেন বৎসরাজ।

গুর্জর-প্রতিহারদের পরবর্তী রাজা বৎসরাজ (৭৭৫-৮০০ খ্রীঃ) পশ্চিম ও মধ্য-ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রভুত্ব বিস্তার করেন। একই সময়ে পূর্ব-ভারতে পাল-বংশীয় রাজারাও একটি শক্তিশালী রাজশক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। বৎসরাজ পূর্বে রাজ্য বিস্তার করতে চাইলে গৌড়ের রাজা ধর্মপালের সাথে তার যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের সময় ও স্থান সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে *আর. সি. মজুমদারের* মতে, গঙ্গা-যমুনার দোয়াব অঞ্চলেই সম্ভবত এই দুই শক্তির সংঘাত বাধে। এই যুদ্ধে বৎসরাজ ধর্মপালকে পরাজিত করেন। কিন্তু তাঁর এই বিজয় দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। দক্ষিণ-ভারতের রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব বৎসরাজকে পরাজিত করেন ও তাঁকে রাজপুতানায় বিতাড়িত করেন। ফলে বৎসরাজ তাঁর হারানো ক্ষমতা ফিরে পেলেন, আবার কনৌজও ধর্মপালের অধীনে থেকে গেল। তবে এ সময় থেকেই ত্রিশক্তি সংঘাত দীর্ঘস্থায়ী হতে শুরু করল।

রাজশক্তিগুলির ক্রমিক ক্ষমতার হস্তান্তর এবং উত্থান-পতনের মাঝে কোন একটি শক্তি দ্বারা উত্তর-ভারত নিরবচ্ছিন্নভাবে শাসন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। রাষ্ট্রকূটরা গুর্জরদের পরাজিত করেছিল ঠিকই কিন্তু তাদের শক্তিকে নির্মূল করতে পারেনি। বৎসরাজের পুত্র দ্বিতীয় নাগভট্ট (৮০০-৮২৫ খ্রীঃ) প্রতিহারবংশের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হন। তিনি প্রথমে সিন্ধু, অন্ধ্র, বিদর্ভ ও কলিঙ্গরাজ্যের উপর নিজ আধিপত্য বিস্তার করে নিজেকে শক্তিশালী করে তোলেন। এরপর তিনি কনৌজে অবস্থিত ধর্মপালের প্রতিনিধি চক্রায়ুধকে আক্রমণ করেন ও পরাজিত করে কনৌজ অধিকার করেন। এমতাবস্থায় ধর্মপালের সাথে দ্বিতীয় নাগভট্টের যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে। মুঙ্গেরের কাছে এক যুদ্ধে তিনি ধর্মপালকে পরাজিত করেন এবং অতি দ্রুত মালব, কীরাট, বৎস, মৎস প্রভৃতি রাজ্য জয় করেন। কিন্তু তার এই জয়ও বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ বুন্দেলখণ্ডের যুদ্ধে দ্বিতীয় নাগভট্টকে পরাজিত করেন এবং কনৌজ ত্যাগ করতে বাধ্য করেন। যদিও রাষ্ট্রকূটবাহিনী ফিরে গেলে নাগভট্ট আবার শক্তিশালী হয়ে ওঠেন, তবে কনৌজের একচ্ছত্র অধিপতি হওয়ার স্বপ্ন সফল হয়নি। নাগভট্টের রাজ্যসীমা পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে বাংলার সীমা অবধি বিস্তৃত ছিল।

নাগভট্টের পুত্র রামভদ্র গুর্জরদের পরবর্তী রাজা হলেও তাঁর আমলে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি। রামভদ্রের পর (আনুমানিক ৮৩৬ খ্রীঃ) তাঁর পুত্র মিহিরভোজ বা প্রথমভোজ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন সুদক্ষ যোদ্ধা ও সমরকুশলী সেনানায়ক, এবং এই বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি। সিংহাসনে বসার অব্যবহিত পরেই প্রতিহারবংশের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হন। তিনি 'গুর্জরাত্রা'র (মধ্য ও পূর্ব রাজপুতানা) উপর প্রতিহারদের কর্তৃত্ব পুনঃস্থাপন করেন। তাঁর এই সাফল্যের পিছনে তাঁর অধীনস্থ সামন্তরাজাদের আনুগত্য ও সহযোগিতা বিশেষভাবে কার্যকরী ছিল বলে মনে করা হয়। কিন্তু বাংলার পালরাজা দেবপালের সামনে এসে মিহিরভোজের বিজয় রথ সাময়িকভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়। রাষ্ট্রকূট রাজ্য আক্রমণ করেও প্রতিহাররাজ পরাজিত হন। অবশ্য রাষ্ট্রকূটদের লিপিতে মিহিরভোজের প্রশংসা দেখা যায়। মিহিরভোজ 'পৃথিবীর সকল অঞ্চল জয় করিয়াছেন'—এমন উল্লেখ কার্যত যোদ্ধা ও রাজ্যের সংগঠক হিসেবে মিহিরভোজের খ্যাতি প্রতিষ্ঠা করে। অবশ্য পাল, রাষ্ট্রকূট ও কলচুরিদের হাতে পুনঃ পুনঃ পরাজয়ের ফলে এই সময় প্রতিহারদের রাজনৈতিক গুরুত্ব অনেকাংশে শিথিল হয়েছিল।

তবে যুদ্ধে পরাজিত হলেও মিহিরভোজ উদ্যম হারাননি। দ্বিতীয় দেবপালের মৃত্যু এবং দুর্বল উত্তরাধিকারদের সিংহাসনারোহণ তাঁর সামনে নতুন সুযোগ এনে দেয়। অন্যদিকে একই সময়ে রাষ্ট্রকূটদের সিংহাসনে বসেছিলেন অমোঘবর্ষ। অমোঘবর্ষ তাঁর পূর্বসুরী রাজা ধ্রুব বা তৃতীয় গোবিন্দর মত সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন। এই অনুকূল রাজনৈতিক পরিস্থিতির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন মিহিরভোজ। চেদীরাজের সহায়তায় দেবপালের অযোগ্য ও দুর্বল উত্তরসূরীদের পরাজিত করেন। অপরপক্ষে ভাগ্য তাকে অন্য ভাবেও সহায়তা করেছিল। রাষ্ট্রকূটরাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণ এই সময় চালুক্যদের সাথে প্রাণপণ যুদ্ধে রত ছিলেন। এই সুযোগে মিহিরভোজ দ্বিতীয় কৃষ্ণকে আক্রমণ করে পরাজিত করেন ও মালব অধিকার করেন। পরে দ্বিতীয় কৃষ্ণ বহু সংগ্রাম করেও সমগ্র কাথিয়াওয়াড় উপকূলকে মিহিরভোজের অধিকার থেকে মুক্ত করতে পারেননি। এইভাবে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির সাথে জয়লাভ করে মিহিরভোজ প্রায় সমগ্র উত্তর-ভারতে তার আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হন। দাক্ষিণাত্যে পরবর্তীকালে দ্বিতীয় ধ্রুবের সাথে পরাজিত হয়ে রাজ্যবিস্তারের বাসনা ত্যাগ করতে হলেও কনৌজের উপর তাঁর স্থায়ী অধিকার অক্ষুণ্ণ ছিল। আরবীয় পর্যটক সুলেমান মিহিরভোজের সামরিক শক্তি ও শাসনব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাঁর মতে, মিহিরভোজের অশ্ববাহিনী সমগ্র ভারতে ছিল অপরাজেয়। আরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেও ভোজ আরবরাজের প্রশংসা করেছেন। ভোজের রাজকোষ অর্থ সম্পদে ভরা ছিল। তখন সোনা ও রূপার গুড়ো দিয়ে বাণিজ্যিক লেনদেন চলত। দেশে সোনা ও রূপার খনি ছিল। কিন্তু চুরি-ডাকাতির ভয় ছিল খুব কম। তাঁর রাজ্য সমগ্র কাথিয়াবাড়, উত্তর-পশ্চিমে পাঞ্জাব, পূর্বে গোরক্ষপুর এবং সম্ভবত অযোধ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

প্রথম ভোজের পর তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকারী পুত্র ***প্রথম মহেন্দ্রপাল*** সিংহাসনে বসেন (৮৮৫-৯১০ খ্রীঃ)। তিনি যে তাঁর পিতার বিশাল সাম্রাজ্যের অখণ্ডতাকে রক্ষা করেছিলেন তাই নয় ; বাংলার পালবংশীয় রাজা নারায়ণ পালকেও পরাজিত করে মগধ ও উত্তরবঙ্গের কিয়দংশ এই বিশাল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। কলহনের রাজতরঙ্গিনীতে কিছুটা অস্পষ্টভাবে উল্লেখ

আছে যে, মিহিরভোজ পাঞ্জাবের যে সকল অঞ্চল দখল করেছিলেন তার একাংশ এই সময় কাশ্মীরের রাজা শঙ্কর বর্মন পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তবে *ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার* এই দাবি সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। বিভিন্ন লিপির সাক্ষ্য থেকে অনুমান করা যায় যে, তিনি পূর্ব সীমান্তে রাজ্য সম্প্রসারণে যথেষ্ট সফল ছিলেন। বিহার ও উত্তরবঙ্গে তাঁর আমলের সাতটি লিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। এইসব লিপির তারিখ থেকে অনুমিত হয় যে তিনি মগধকে নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করেছিলেন এবং উত্তরবঙ্গের বিরুদ্ধে সফল অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। এছাড়া ঝাঁসি, কাথিয়াবাড়, আযোধ্যা, পূর্ব-পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে আবিষ্কৃত বিভিন্ন লিপি থেকে পণ্ডিতদের অনুমান যে মহেন্দ্রপালের আমলে প্রতিহার সাম্রাজ্য পূর্ব সমুদ্র থেকে পশ্চিম সমুদ্র পর্যন্ত এবং উত্তর-দক্ষিণে হিমালয় থেকে বিন্ধ্যা পর্বত পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। উপরন্তু এই সময় উত্তর ভারতে গুর্জর পাল-রাষ্ট্রকূটদের মধ্যে যে ত্রিশক্তি সংঘাত প্রায় একশো বছর ধরে চলে আসছিল তার অবসান ঘটে। প্রথম মহেন্দ্র পাল শিক্ষা ও সংস্কৃতির পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। 'কর্পূর মঞ্জরী' নাটক ও 'কাব্য-মীমাংসা' নামক সমালোচনা গ্রন্থের লেখক রাজশেখর তাঁর সভাকবি ছিলেন।

মহেন্দ্রপালের পর তাঁর দুই পুত্র দ্বিতীয় ভোজ ও মহীপাল পর্যায়ক্রমে সিংহাসনে আরোহণ করেন। দ্বিতীয় ভোজ অল্পদিন সিংহাসনে বসেছিলেন। মহীপালের রাজত্বকালের (৯১২-৮৮ খ্রীঃ) প্রথমার্ধে প্রতিহারবংশের গৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল—একথা সভাকবি রাজশেখর এবং আরব পর্যটক আল্‌মাসুদির বর্ণনায় পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর আমল থেকেই প্রতিহারদের সঙ্গে রাষ্ট্রকূটদের দ্বন্দ্ব আবার তীব্রতর হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় ইন্দ্রের কাছে মহীপাল সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন ও কনৌজ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। যদিও ইন্দ্র কনৌজে স্থায়ী রাজধানী স্থাপন করেননি এবং তিনি দাক্ষিণাত্যে ফিরে যাবার পর মহীপাল হৃতশক্তি পুনরুদ্ধারের সচেষ্ট হন। কিন্তু তিনি কতদূর সফল হয়েছিলেন বলা যায় না। পণ্ডিত রাজশেখর মহিপালের রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁর বিবরণ থেকে জানা যায় যে মেলক, মুরল, কেরল, কুলুট, কলিঙ্গ, কুন্তল প্রভৃতি উপজাতি গোষ্ঠী মহীপালের পদানত হয়েছিল। সমগ্র উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের একাংশ তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। রাজশেখর তাঁকে প্রতিহার বংশের মণি-মুক্তার সাথে তুলনা করে আর্যাবর্তের 'মহারাজাধিরাজ' বলে আখ্যায়িত করেছেন। মহীপাল রাষ্ট্রকূটদের হাত থেকে হৃত রাজ্যাংশ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলেন কিনা, সে বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে কিছু জানা যায় না। তবে সমকালীন সাহিত্যে প্রাপ্ত তথ্যাবলী থেকে অনুমিত হয় যে, মহীপালের রাজত্বের শেষ দিকে তাঁর সাম্রাজ্য পূর্বে বারানসী থেকে পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র পর্যন্ত এবং দক্ষিণে চান্দেরী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

মহীপালের পরবর্তী প্রতিহাররাজ ছিলেন বিনায়কপাল। তিনি ৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁর পর দ্বিতীয় মহেন্দ্রপাল, দেবপাল, দ্বিতীয় বিনায়কপাল, দ্বিতীয় মহীপাল আরো কয়েকদশক রাজত্ব করেছিলেন। কিন্তু এঁরা ছিলেন দুর্বল ও অযোগ্য শাসক। ফলে প্রতিহার রাজ্য তার অতীত গৌরব আর পুনরুদ্ধার করতে পারেনি। ফলে রাজপুত সামন্তরা একে একে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে থাকে এবং প্রতিহার শক্তি ক্রমে ক্রমে দুর্বল হয়ে ধ্বংসের পথে এগোতে থাকে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বুন্দেলখণ্ডের চান্দেলা, চেদীর কালাচুরী,

মালবের পারমার ও গুজরাটের চালুক্য বংশ। অধিকন্তু রাষ্ট্রকূটরা আবার আঘাত হানে ও তৃতীয় কৃষ্ণের নেতৃত্বে তারা কালাঞ্জুর ও চিত্রকূট দুর্গ অধিকার করে। মহীপালের উত্তরাধিকারীগণ ছিলেন দুর্বল। এত প্রতিকূলতার সাথে সাম্রাজ্য রক্ষা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। অবশেষে সুলতান মামুদের আক্রমণে ১০১৮ খ্রীষ্টাব্দে কনৌজ লুণ্ঠিত হলে প্রতিহারশক্তির চূড়ান্ত অবসান ঘটে।

হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর যে সমস্ত রাজশক্তি উত্তর-ভারতের অখণ্ডতাকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সংগ্রাম চালিয়েছিল তাদের মধ্যে গুর্জর-প্রতিহাররাই ছিল প্রধান। প্রতিহার রাজারা প্রায় এক শতাব্দী ধরে আরব আক্রমণ থেকে ভারতকে রক্ষা করেন। আরব পর্যটক ***সুলেমানের*** মতে, *"ভারতে প্রতিহার রাজাদের মত ইসলামের প্রবল শত্রু আর কেউ ছিল না।"* প্রতিহার রাজারা ছিলেন প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম ও শিক্ষা-সংস্কৃতির রক্ষক ও পৃষ্ঠপোষক। তাদের সময়েই ভারতে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার বিকাশ ঘটে। প্রতিহার-বংশের আমলেই ভারতে রাজপুত-জাতির আবির্ভাব ঘটে, যারা সুদীর্ঘকাল ভারতের বিভিন্ন শক্তিদ্বন্দ্বে গুরুত্বপূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করেছিল।

❂ রাষ্ট্রকূট বংশ ঃ অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে দক্ষিণ-ভারতে চালুক্যবংশের দুর্বলতার সুযোগে রাষ্ট্রকূটগণ প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠেছিল। রাষ্ট্রকূটগণের বংশপরিচয় বা তাদের প্রতিষ্ঠা লাভের পথ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ লক্ষ্য করা যায় না। এ বিষয়ে মূল যে সমস্ত মতবাদ প্রচলিত আছে সেগুলি হল—(ক) রাষ্ট্রকূটদের আদি অনুশাসন লিপিতে তাঁরা নিজেদেরকে মহাভারতের যদু বংশীয় রাজা 'সাত্যকীর' বংশধর বলে বর্ণনা করেছেন। এমনকি রাষ্ট্রকূট-রাজাদের সভাকবিরা রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দকে 'ভগবান কৃষ্ণ' বলে বর্ণনা করেছেন। (খ) অনেকের মতে, অশোক শিলালিপিতে বর্ণিত 'রথিক' বা রাষ্ট্রীকগণই হল রাষ্ট্রকূটগণ। (গ) *বার্নেল*-এর মতে, এঁরা ছিলেন অন্ধ্রপ্রদেশের 'রাড্ডি'দের বংশধব। (ঘ) ***অনন্ত আলতেকরের*** মতে, রাষ্ট্রকূটগণ ছিলেন কর্ণাটকের অধিবাসী, এঁদের মাতৃভাষা ছিল কানাড়ি। (ঙ) এ বিষয়ে ড. ***আর. সি. মজুমদারের*** বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে, দক্ষিণ-ভারতের 'রাষ্ট্রকূট' কথাটি সম্ভবত 'রাষ্ট্রের বা প্রদেশের প্রধান' অর্থে ব্যবহৃত।[1] The word Rastrakuta is used as the name of an official in early records of the Deccan, and probably indicates 'The heads of a rastra of Province'.মনে করা যায়, রাষ্ট্রকূট বংশের প্রতিষ্ঠাতারা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে একটি বৃহৎ সাম্রাজ্য গঠনের পরেও এই নামটি তাঁদের সঙ্গে থেকে যায়। পঞ্চম শতাব্দী থেকেই বহু রাষ্ট্রকূটবংশীয় প্রধান দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন অঞ্চলে শাসনকর্তা হিসেবে নিযুক্ত ছিল বলে জানা যায়। এঁরা ছিলেন চালুক্যরাজাদের অধীন সামন্ত রাজা। সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে এদের মধ্যেই কোন একজন একটি শক্তিশালী রাজ্য গঠনের সূচনা করেন। রাষ্ট্রকূটবংশের প্রথম উল্লেখযোগ্য শাসক ছিলেন ইন্দ্র, যিনি এক চালুক্য রাজকন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। ইন্দ্রের পরবর্তী সময়ে সিংহাসনে বসেন তাঁর পুত্র দন্তিদুর্গ (৭৫৩-৫৮ খ্রীঃ)। দন্তিদুর্গের সময় থেকেই রাষ্ট্রকূটদের প্রকৃত উত্থান শুরু হয়।

দন্তিদুর্গের রাজ্যশাসনের সূচনা, তাঁর পূর্বপুরুষদের মতই, চালুক্য রাজাদের অধীনস্থ

---

1. R.C.Majumdar-Arcient India, P.280.

সামন্তরাজা হিসেবে। *ড. আলতেকরের* মতে, দন্তিদুর্গ, তাঁর প্রভু দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যকে পল্লবদের বিরুদ্ধে কাঞ্চী অভিযানে এবং আরবদের ভারত অভিযান প্রতিরোধে সক্রিয় সহায়তা করেছিলেন। তাঁর বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য দন্তিদুর্গকে *'পৃথিবী বল্লভ'* উপাধিতে ভূষিত করেন। দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর দন্তিদুর্গ নিজ বাহুবলে রাজ্য বিস্তারে উদ্যোগী হন। চালুক্যরাজাদের সামন্ত-পদে থাকা অবস্থাতেই তিনি মধ্যপ্রদেশের পূর্বাংশে নিজ কর্তৃত্ব স্থাপন করেছিলেন, কিন্তু তিনি নিজে থেকে তাঁর প্রভু চালুক্যরাজাদের সাথে বৈরিতা এড়িয়ে যান। এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁর উত্তরোত্তর শক্তিবৃদ্ধিতে উদ্বিগ্ন চালুক্যরাজ দ্বিতীয় কীর্তিবর্মন তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এই যুদ্ধে দন্তিদুর্গ কীর্তিবর্মনকে পরাজিত করে বাতাপির চালুক্যবংশের অবসান ঘটান ও রাষ্ট্রকূটবংশের সূচনা করেন (৭৫৩ খ্রীঃ) বর্তমানে শোলাপুরের নিকটে মালখেড়ে তিনি রাজধানী স্থাপন করেন ও *'মহারাজাধিরাজ'* উপাধি গ্রহণ করেন।

দন্তিদুর্গের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁর পুত্র (মতান্তরে খুল্লতাত) প্রথম কৃষ্ণ সিংহাসনে বসেন (৭৫৮-৭৩৩ খ্রীঃ)। এইসময় চালুক্য-রাজ দ্বিতীয় কীর্তিবর্মন তাঁর হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য একবার শেষ চেষ্টায় রত হন। কিন্তু ৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম কৃষ্ণের হাতে সম্পূর্ণ পরাজিত হন, এবং এরই সাথে আক্ষরিক অর্থেই চালুক্যরাজবংশের অবসান ঘটে। এরপর প্রথম কৃষ্ণ মহীশূরের গঙ্গরাজা এবং বেঙ্গীর চালুক্যবংশীয় রাজাকে পরাজিত করেন। এর ফলে চালুক্যদের প্রায় সমস্ত সাম্রাজ্যই, অর্থাৎ মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশ রাষ্ট্রকূটদের হস্তগত হয়। প্রথম কৃষ্ণ ৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান। মৃত্যুর আগে তিনি রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্যকে একটি সংহত রূপদান করতে পেরেছিলেন। তবে তার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি ইলোরার কৈলাসনাথের মন্দির নির্মাণ। পাহাড়ের গায়ে পাথর খোদাই করে নির্মিত এই মন্দির ভাস্কর্য ও শিল্প-নৈপুণ্যে আজও বিশ্বজনের বিস্ময় উদ্রেক করে। প্রথম কৃষ্ণের মৃত্যুর পর তাঁর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হন কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিতীয় গোবিন্দ। তিনি ছিলেন ব্যভিচারী। কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধ্রুবের হাতে শাসনকার্যের ভার ন্যস্ত করে তিনি অধিকাংশ সময় আমোদ-প্রমোদে ব্যস্ত থাকতেন। ফলে ধ্রুব ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকেন। ভীত গোবিন্দ ধ্রুবকে শাসনক্ষমতা থেকে বিচ্যুত করলে ধ্রুব বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন ও ভ্রাতা গোবিন্দকে পরাজিত করে সিংহাসন দখল করেন। ধ্রুবর সিংহাসনে আরোহণের সাথে সাথে রাষ্ট্রকূটদের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয় (৭৮০-৯৩ খ্রীঃ)। তারা আর কেবলমাত্র দক্ষিণ-ভারতে আবদ্ধ না থেকে উত্তরের দিকে অগ্রসর হয় এবং এইভাবে রাষ্ট্রকূটগণ সমগ্র ভারতের ইতিহাসে তাদের স্থায়ী স্বাক্ষর স্থাপনে সমর্থ হয়।

আনুমানিক ৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় গোবিন্দকে ক্ষমতাচ্যুত করে সিংহাসন দখল করার পরই ধ্রুব, মহীশূরের গঙ্গবংশীয় রাজা, বেঙ্গীর চালুক্যরাজ এবং পল্লবরাজ দন্তিবর্মনকে পরাজিত করে কাবেরী নদীর তীর পর্যন্ত সমগ্র দক্ষিণ-ভারতকে রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্যের অধীনস্থ করেছিলেন। দক্ষিণ-ভারত বিজয়ের পর তিনি উত্তর-ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোযোগী হন। উত্তর-ভারতে যে সময় দুইটি প্রবল রাজশক্তি ছিল পূর্ব-ভারতের পালবংশ এবং পশ্চিম-ভারতের গুর্জর-প্রতিহার বংশ, হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর কনৌজকে কেন্দ্র করে এই দুই রাজশক্তির মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল। রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব তৃতীয় শক্তি হিসেবে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশ নিলে শতবর্ষব্যাপী পাল-প্রতিহার-রাষ্ট্রকূট সংঘাত দেখা দেয়, যা ভারতের ইতিহাসে 'ত্রিশক্তি দ্বন্দ্ব'

নামে খ্যাত। এই দ্বন্দ্বের প্রথম পর্যায়ে প্রতিহাররাজ বৎসরাজ কনৌজের সিংহাসনে আসীন পালরাজ ধর্মপালের আশ্রিত চক্রায়ুধকে পরাজিত করেন। কিন্তু রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব বৎসরাজকে যুদ্ধে পরাজিত করেন ও তাঁকে কনৌজ ছেড়ে রাজপুতানায় পলায়নে বাধ্য করেন। এরপর ধ্রুব পালরাজ ধর্মপালের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং তাকেও পরাজিত করে গঙ্গা-যমুনা-দোয়াব অঞ্চলে নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠান করেন। তবে ধ্রুব তাঁর উত্তর-ভারত অভিযানে বিজয়ী হলেও উত্তর-ভারতে রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে কখনই সুপ্রতিষ্ঠিত করননি। ৭৯০ খ্রীঃ তিনি তাঁর রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন। ধ্রুব ছিলেন রাষ্ট্রকূটবংশের প্রথম সার্বভৌম নরপতি। তিনি *'শ্রী বল্লভ', 'ধ্রুব নিরুপম'* ইত্যাদি উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালেই রাষ্ট্রকূট-শক্তি প্রবল পরাক্রান্ত হয়ে ওঠে। বস্তুত, আসমুদ্র হিমাচল বিস্তৃত ভারতে ধ্রুবের শক্তিকে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করার মত কোন রাজাই তখন ছিল না।

ধ্রুব তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র তৃতীয় গোবিন্দকে (৭৯৩-৮১৪ খ্রীঃ) তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। একই সাথে তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র স্তম্ভকে গঙ্গাদেবীর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। স্বভাবতঃই স্তম্ভ কনিষ্ঠের কর্তৃত্ব স্বীকার না করে বিদ্রোহী হন। স্তম্ভকে এই কাজে পল্লববংশীয় রাজারা এবং শিবরাম নামে এক গঙ্গবংশীয় যুবরাজ সহায়তা করেন। এতদ্‌সত্ত্বেও স্তম্ভের বিদ্রোহ সফল হয়নি। তৃতীয় গোবিন্দ স্তম্ভকে পরাজিত করেন এবং শিবরামকে হত্যা করেন। স্তম্ভকে কিন্তু গোবিন্দ মুক্তি দেন এবং পুনরায় তাকে গঙ্গাবেদীর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন, এবং আশ্চর্যের বিষয় স্তম্ভও পরবর্তী জীবনে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতার অনুগত কর্মচারীরূপেই শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন। এইভাবে নিজরাজ্যের মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করার পর তৃতীয় গোবিন্দ রাজ্যবিস্তারে মনোযোগী হন। দাক্ষিণাত্যের পল্লবরাজ দন্তিবর্মন, বেঙ্গীরাজ চতুর্থ বিষ্ণুবর্মন শীঘ্রই তাঁর প্রভুত্ব স্বীকার করে নেন। এর ফলে প্রায় সমগ্র দক্ষিণ-ভারত তাঁর করায়ত্ত হয়। দক্ষিণ-ভারত বিজয়ের পর গোবিন্দও তাঁর পিতার ন্যায় উত্তর-ভারতের দিকে অগ্রসর হন। তিনি এক বিশাল বাহিনী নিয়ে ভূপাল ও ঝাঁসীর মধ্য দিয়ে কনৌজের দিকে অগ্রসর হন। উত্তর-ভারতে তখনও পাল ও প্রতিহার রাজারা সক্রিয় ছিলেন, ফলে তৃতীয় গোবিন্দের উত্তর-ভারত অভিযানের সাথে সাথে ত্রিশক্তি দ্বন্দ্বের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়। প্রতিহাররাজ নাগভট্ট গোবিন্দকে বাধা দেন কিন্তু তিনি যুদ্ধে পরাজিত হয়ে রাজপুতানায় পলায়ন করতে বাধ্য হন। কনৌজের রাজা পালবংশীয় ধর্মপালের আশ্রিত চক্রায়ুধ বিনাযুদ্ধে তৃতীয় গোবিন্দের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। পালবংশীয় ধর্মপালও তাঁর প্রবল শত্রু নাগভট্টকে পরাজিত করায়, কৃতজ্ঞতাস্বরূপ গোবিন্দের কাছে বিনাযুদ্ধেই বশ্যতা স্বীকার করেন। অতঃপর গোবিন্দের বিজয়বাহিনী সম্ভবত হিমালয়ের পাদদেশে প্রয়াগ, গয়া ও বেনারস অবধি অগ্রসর হয়েছিল। কিন্তু গোবিন্দও তাঁর পিতার মত উত্তর-ভারতে রাষ্ট্রকূট-শাসনকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করার সুযোগ পাননি। তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে দাক্ষিণাত্যের গঙ্গ, পল্লব, পাণ্ড্য এবং কেরলবংশীয় রাজারা একত্রিত হয়ে রাষ্ট্রকূটদের বিরোধী এক শক্তিজোট গঠন করেন। এই একত্রিত শক্তিজোটকে দমন করতে তৃতীয় গোবিন্দকে দাক্ষিণাত্যে প্রত্যাবর্তন করতে হয়। দাক্ষিণাত্যে ফেরার পথে তিনি মালব, কোশল, বেঙ্গী প্রভৃতি রাজ্যগুলিকে নিজ বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। দাক্ষিণাত্যে ফিরেই গোবিন্দকে গঙ্গা-পল্লব পাণ্ড্য ও কেরলদের মিলিত শক্তিজোটের সাথে প্রবল সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়, কিন্তু তিনি একে একে

সব দক্ষিণ-ভারতীয় নৃপতিকেই যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং পল্লবদের রাজধানী কাঞ্চী দখল করে নেন। এইভাবে সমগ্র দক্ষিণ-ভারতে রাষ্ট্রকূট বংশের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। কথিত আছে তৃতীয় গোবিন্দের পরাক্রমে ভীত হয়ে সিংহলের রাজাও রাষ্ট্রকূট রাজের বশ্যতা স্বীকার করেন। সামরিক শক্তি ও রাজ্যসীমার বিচারে তৃতীয় গোবিন্দই ছিলেন শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রকূট নরপতি।

তৃতীয় গোবিন্দের আমলে রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্য শক্তি ও গৌরবের শিখরে আরোহণ করেছিল। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথেই এই সুবিশাল সাম্রাজ্যের পতনেরও শুরু হয়। তৃতীয় গোবিন্দের মৃত্যুর পর তাঁর নাবালক পুত্র প্রথম অমোঘবর্ষ সিংহাসনে আরোহণ করেন (৮১৪-৭৮ খ্রীঃ)। অবশ্য এ সময় তাঁর অভিভাবক হিসেবে রাজকার্য পরিচালনা করতেন তৃতীয় গোবিন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং গুজরাট ও মালবের শাসনকর্তা কর্ক। অমোঘবর্ষের সিংহাসনে বসার অনতিকাল পরেই রাষ্ট্রের মন্ত্রী ও রাজকর্মচারীরা ক্ষমতা আত্মসাৎ করতে থাকেন এবং রাজ-পরিবারের মধ্যেও অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এমতাবস্থায় রাজ্যের সর্বত্র বিদ্রোহ দেখা দেয়, বিদ্রোহ এত তীব্র হয়ে ওঠে যে, বালক অমোঘবর্ষ রাজধানী ত্যাগ করতে বাধ্য হন। তবে কিছুদিনের মধ্যেই কর্কের সহায়তায় তিনি আবার সিংহাসন লাভ করতে সমর্থ হন। রাষ্ট্রকূটবংশের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তৃতীয় গোবিন্দ দ্বারা একদা পরাজিত বেঙ্গীর রাজা দ্বিতীয় বিজয়াদিত্য। অমোঘবর্ষ নিজ হস্তে শাসনভার গ্রহণ করে ৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়াদিত্যকে পরাজিত করেন এবং বেঙ্গী দখল করেন। এর পর প্রায় দশবছর বেঙ্গী তাঁর করায়ত্ব ছিল। এইভাবে রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করলেও অমোঘবর্ষের হাত থেকে গঙ্গবাদী হস্তচ্যুত হয়। প্রায় কুড়ি বৎসর পরে মহীশূরের গঙ্গবংশীয় রাজাদের সাথে যুদ্ধ করলেও অমোঘবর্ষ পরাজিত হন ও গঙ্গদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে বাধ্য হন। কর্কের সাথে অমোঘবর্ষের সৌহার্দ্য কর্কের মৃত্যু অবধি স্থায়ী ছিল, কিন্তু কর্কের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র প্রথম ধ্রুব অমোঘবর্ষের বশ্যতা স্বীকারে অস্বীকার করেন। উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। পঁচিশ বর্ষ ব্যাপী এই যুদ্ধের অবসান ঘটে প্রথম ধ্রুবের পৌত্র দ্বিতীয় ধ্রুবের মধ্যস্থতায় ; যখন প্রতিহাররাজ প্রথম ভোজ রাষ্ট্রকূটবংশের উত্তরাংশ আক্রমণে উদ্যোগী হন। উভয়ের মিলিত শক্তি প্রতিহারদের প্রতিহত করেছিল।

অমোঘবর্ষ যাট বছরেরও বেশি সময় ধরে রাজত্ব করেছিলেন। তবে পূর্বপুরুষদের মত সামরিক প্রতিভা তাঁর ছিল না। যুদ্ধজয়ের মাধ্যমে রাজ্যবিস্তার অপেক্ষা শান্তির পথকেই তিনি শ্রেয় হিসেবে বেছে নেন। তিনি নিজেও ছিলেন সুলেখক। তাঁর সভায় বহু হিন্দু ও জৈন ধর্মাবলম্বী লেখক সহাবস্থান করতেন। অমোঘবর্ষের রচিত 'রত্নমালিকা' ও 'কবিরাজমার্গ' গ্রন্থ দুটি সুধীজন সমাজে বহু প্রশংসিত এবং এগুলি কানাড়ি সাহিত্যের আদি নিদর্শনগুলির অন্যতম। এমনকি আরব পর্যটক সুলেমান বলেছেন যে, অমোঘবর্ষ ছিলেন ভারতের শ্রেষ্ঠ নরপতি এবং তিনি চীন সম্রাট, বাগদাদের খলিফা ও কনস্টানটিনোপোলের সম্রাটের সাথে তুলনীয়।

অমোঘবর্ষের পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় কৃষ্ণ সিংহাসনে বসেন (৮৭৮-৯১৪ খ্রীঃ)। তাঁর আমলে বেঙ্গীর চালুক্যরাজা তৃতীয় বিজয়াদিত্য কলচুরীর রাজার সহায়তায় রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। প্রাথমিক যুদ্ধে দ্বিতীয় কৃষ্ণ পরাজিত হলেও অবশেষে তিনি চালুক্যদের পরাজিত করেন এবং বিজয়াদিত্যের উত্তরাধিকারী ভীমকে বন্দি করেন ও তাঁকে নিজের সামন্তরাজায় পরিণত করেন। দ্বিতীয় কৃষ্ণের আমলের অপর উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল প্রতিহাররাজ ভোজের সাথে

দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ। এই যুদ্ধে কৃষ্ণ পরাজিত হন এবং প্রতিহাররা মালব এবং কাথিয়াওয়াড় উপদ্বীপ দখল করে নেয়। দ্বিতীয় কৃষ্ণ ৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান এবং তাঁর পৌত্র তৃতীয় ইন্দ্র (৯১৪-২২ খ্রীঃ) সিংহাসনে বসেন। সিংহাসনে বসার কিছুকাল পরেই তৃতীয় ইন্দ্র রাষ্ট্রকূটবংশের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য উত্তর-ভারতে সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন। এই অভিযানে তিনি প্রতিহার রাজ মহীপালকে পরাজিত করেন ও কনৌজ অধিকার করেন, কিন্তু তিনিও কনৌজে স্থায়ী আধিপত্য কায়েম করেননি। দক্ষিণ-ভারতে ফিরে তৃতীয় ইন্দ্র বেঙ্গীর চালুক্যরাজ চতুর্থ বিজয়াদিত্যকে যুদ্ধে পরাজিত করেন ও হত্যা করেন। তৃতীয় ইন্দ্রের মৃত্যুর পর রাষ্ট্রকূটবংশের পতন ত্বরান্বিত হয়। তৃতীয় ইন্দ্রের পর সিংহাসনে বসেন তার পুত্র দ্বিতীয় অমোঘবর্ষ, কিন্তু অনতিকালের মধ্যেই চতুর্থ গোবিন্দ তাঁকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করেন। চতুর্থ গোবিন্দের অত্যাচার প্রজাদের অতিষ্ঠ করে তোলে এবং শীঘ্রই (৯৩৬ খ্রীঃ) চতুর্থ গোবিন্দের খুল্লতাত তৃতীয় অমোঘবর্ষ গোবিন্দকে ক্ষমতাচ্যুত করে শাসনভার গ্রহণ করেন। তৃতীয় অমোঘবর্ষের তিন বছরের রাজত্বকালে মূল শাসনক্ষমতা ছিল তার পুত্র তৃতীয় কৃষ্ণের হাতে। তৃতীয় কৃষ্ণ (৯৪০-৬৮ খ্রীঃ) ছিলেন রাষ্ট্রকূটবংশের শেষ উল্লেখযোগ্য নরপতি। তিনি সিংহাসনে বসার পর রাষ্ট্রকূটবংশের হারানো মর্যাদা পুনরুদ্ধারে ব্রতী হন। তিনি উত্তর-ভারতে প্রতিহাররাজ মহীপালকে পরাজিত করে *'কালাঞ্জর'* ও *'চিত্রকূট'* দুর্গ দুটি দখল করেন। গঙ্গাবেদীর শাসকের সহায়তায় কৃষ্ণ চোলরাজ রাজাদিত্যকে পরাজিত করেন এবং কাঞ্চী ও তাঞ্জোর দখল করেন। কৃষ্ণ তাঁর বিজয় অভিযান রামেশ্বর পর্যন্ত বিস্তৃত করেন এবং সেখানে এক বিজয়স্তম্ভও স্থাপনা করেন। চোল ছাড়া তিনি দক্ষিণ-ভারতে পাণ্ড্য ও কেরলদেরও পরাজিত করেন। তৃতীয় কৃষ্ণ উত্তর-ভারতে আরও একবার অভিযান চালিয়ে (৯৬৩ খ্রীঃ) মালব ও উজ্জয়িনী দখল করেন ও বুন্দেলখণ্ড অবধি অগ্রসর হন। কিন্তু তাঁর এই সাফল্য ছিল, সম্পূর্ণ নিভে যাওয়ার আগে প্রদীপশিখার শেষবার উজ্জ্বল হয়ে ওঠার মতই। তাঁর মৃত্যুর পর রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সামন্তরাজারা বিদ্রোহ করতে থাকে। অবশেষে আনুমানিক ৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে রাষ্ট্রকূটদেরই সামন্তরাজা কল্যাণের চালুক্যবংশীয় তৈল বা তৈলপ শেষ রাষ্ট্রকূটরাজ দ্বিতীয় কর্ককে পরাজিত করে রাষ্ট্রকূট বংশের অবসান ঘটান।

○ শাসনব্যবস্থা ঃ

রাষ্ট্রকূট-শাসনব্যবস্থায় রাজা ছিলেন সর্বোচ্চ প্রশাসক। তিনি প্রতিদিন রাজদরবারে উপস্থিত থেকে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। তাঁরা *'মহারাজাধিরাজ'*, *'পরমভট্টারক'* প্রভৃতি উপাধি ধারণ করতেন। রাজা কর্তৃক মনোনীত মন্ত্রীগণ শাসনকার্যে সহায়তা করতেন। যুবরাজ ও অন্যান্য কুমারগণ গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদে নিযুক্ত হতেন। মন্ত্রীদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, রাজস্বমন্ত্রী ছিলেন বিশেষ ক্ষমতাশালী।

রাষ্ট্রকূটশাসকদের প্রত্যক্ষ শাসিত অঞ্চলগুলি *প্রদেশ, বিষয়* ও *ভুক্ত* এই তিনভাগে বিভক্ত ছিল। শাসনব্যবস্থার সর্বনিম্ন একক ছিল গ্রাম। প্রদেশ বা রাজ্যের শাসনকর্তাকে বলা হত *'রাষ্ট্রপতি'*। নিজ এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, সামরিক-বাহিনীকে নিয়ন্ত্রিত করা প্রভৃতি কাজ রাষ্ট্রপতিকে করতে হত। বিষয়-এর প্রধান শাসককে বলা হত 'বিষয়পতি', গ্রামগুলির

শাসনের ভার ছিল গ্রাম-প্রধানের উপর। শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য গ্রাম-প্রধানের অধীনে একটি সুশিক্ষিত লাঠিয়াল-বাহিনী থাকত। *গ্রাম-মহাজন'* বা *'গ্রাম-মহাত্তার'* নামক গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের পরামর্শক্রমে গ্রাম-প্রধান গ্রাম-শাসন করতেন। গ্রামের অভ্যন্তরীণ উন্নয়নমূলক কাজও গ্রাম-প্রধানকে করতে হত। রাষ্ট্রের আয়ের প্রধান উৎস ছিল ভূমি-রাজস্ব। উৎপন্ন ফসলের এক-চতুর্থাংশ কর হিসেবে গৃহীত হত। এছাড়া জলকর, খনিজ দ্রব্যের উপর কর প্রভৃতিও আদায় করা হত। দেশগ্রামুক্ত নামে রাজস্ব কর্মচারীদের উপর কর আদায়ের ভার ন্যস্ত থাকত। রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্যে সামন্তশাসনেরও অস্তিত্ব ছিল। শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে সামন্তরাজাগণ ছিলেন স্বাধীন। তাঁরা রাষ্ট্রকূটরাজাদের নিয়মিত কর দিতেন এবং যুদ্ধের সময় সেনাবাহিনী দিয়ে সাহায্য করতেন। রাষ্ট্রকূটবংশের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ***অনন্ত আলতেকার*** তাই বলেছেন : *"The period of Rashtrakuta ascendancy in Deccan constitutes perhaps the most brilliant chapter in its history."*

◎ চোল বংশ : চোল রাজবংশের উত্থান দক্ষিণ-ভারতের ইতিহাসে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কেবল রাজনৈতিক সংহতি নয়, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশের ক্ষেত্রেও চোল রাজাদের অবদান গুরুত্বপূর্ণ।

আদি-মধ্যযুগে ভারতের রাজবংশগুলির মধ্যে চোলবংশ অন্যতম। অশোকের লেখায়, পেরিপ্লাসে, টলেমীর রচনায়, মহাবংশে চোলগণের উল্লেখ আছে। আনুমানিক দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দে চোলরাজ কারিকল পেনার ও ভেলার নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে চোল-শাসনের সূচনা করেন। কিন্তু চের, পাণ্ড্য ও পল্লবদের ক্রমাগত আক্রমণে এক শতকের মধ্যেই চোলরাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়। চোলগণ চালুক্য বা পল্লবদের সামন্ত নৃপতি হিসেবে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করে চলে। নবম খ্রীষ্টাব্দে পল্লববংশের পতন শুরু হলে বিজয়ালয়ের নেতৃত্বে চোলবংশের পুনরুভ্যুত্থান ঘটে।

বিজয়ালয় ছিলেন পল্লবরাজা নৃপতুঙ্গের অধীন সামন্ত নৃপতি। পল্লবরাজের হয়ে তিনি তাঞ্জোর অধিকার করেন। তাঁর পুত্র আদিত্যও পাণ্ড্যদের বিরুদ্ধে শ্রীপুরামবিয়ামের যুদ্ধে পল্লবরাজাকে সাহায্য করেন। পরিবর্তে পল্লবরাজ অপরাজিত বর্মন তাঞ্জোরের উপর আদিত্যের অধিকার স্বীকার করে নেন। এইভাবে শক্তিশালী হয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত অপরাজিত বর্মনকে পরাস্ত করেন ও সমগ্র পল্লবরাজ্য নিজে অধিকারভুক্ত করেন। গঙ্গরাজ তাঁর আধিপত্য মেনে নেন। এইভাবে তিনি ক্ষুদ্র চোলরাজ্যকে এক সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। পরবর্তী রাজা প্রথম পরান্তক দীর্ঘকাল রাজত্ব করেছিলেন (৯০৭-৫৫ খ্রীষ্টাব্দ)। পাণ্ড্যরাজ দখল করে তিনি চোল রাজ্যসীমা কন্যাকুমারী পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। রাষ্ট্রকূটরাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণকে তিনি বল্লালের যুদ্ধে পরাস্ত করেন। কিন্তু তাঁর রাজত্বের শেষদিকে রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় কৃষ্ণ রাজরাজ সিংহাসনে বসার পূর্ববর্তী তিরিশ বছর অযোগ্য রাজাদের অধীনে চোলবংশ ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। এরপর রাজরাজ সিংহাসনে বসলে চোলবংশের প্রকৃত গৌরবের সূচনা হয়।

◎ প্রথম রাজরাজ (৯৮৫-১০১৮ খ্রীষ্টাব্দ) : প্রথম রাজরাজ ছিলেন চোলবংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক। তাঁর নেতৃত্বে চোলরাজ্য একটি বৃহৎ সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। তাঁর সুদক্ষ

পরিচালনায় চোলরাজ্য সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। 'তাঞ্জোর লিপি' থেকে তাঁর সামরিক কৃতিত্ব সম্পর্কে জানা যায়। তিনি পাণ্ড্যগণকে পরাজিত করেন। ফলে মাদুরা তাঁর অধিকারে আসে। তিনি কেরলদেরও পরাজিত করেন। রাজরাজ ছিলেন প্রকৃতই সাম্রাজ্যবাদী শাসক। তাই তিনি স্থলযুদ্ধের পাশাপাশি জলযুদ্ধের প্রকৃত গুরুত্বও উপলব্ধি করেন ও একটি শক্তিশালী নৌবহর গড়ে তোলেন। এই নৌবহরের প্রথম সাফল্য হল ত্রিবান্দমের নৌযুদ্ধে চের নৌবাহিনীর ধ্বংসসাধন। ***রোমিলা থাপারের*** মতে, রাজরাজ কেরল ও চেরদের বিরুদ্ধে অভিযান করেছিলেন। এই জন্য যে, তারা মালাবার উপকূলে আগত আরব বণিকদের পক্ষ অবলম্বন করেছিল। রাজরাজ আরবদের অগ্রগতি রুদ্ধ করার জন্য কেরল নিজ অধিকারভুক্ত করেছিলেন। তিনি তাঁর সুগঠিত নৌবহরের সাহায্যে সিংহলেও অভিযান করেন। সিংহলরাজ পঞ্চম মহেন্দ্র রাজরাজার কাছে পরাস্ত হন ও সিংহলের দক্ষিণ-পূর্ব দিকের পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় নেন। রাজরাজ রাজধানী অনুরাধাপুর বিধ্বস্ত করেন ও চোল-অধিকৃত ভূখণ্ডের রাজধানী স্থাপন করেন পোলন্নরুবতে। এখানে তিনি শিবমন্দিরও নির্মাণ করেন। এছাড়া রাজত্বের শেষের দিকে তিনি মালদ্বীপ জয় করেন। এই সিংহল জয় ও মালদ্বীপ জয় তাঁর সুগঠিত নৌ-বাহিনীর সাফল্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। রাজরাজ গঙ্গ ও চালুক্যগণের সাথে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন। তুঙ্গভদ্রার অপর পারে অভিযান চালিয়ে তিনি গঙ্গরাজ্য মহীশূর অধিকার করে নেন। পূর্ব উপকূলে রাজত্বকারী পূর্ব চালুক্যদের রাজধানী বেঙ্গী অধিকার করে তিনি নিজ প্রতিনিধি বিমলাদিত্যকে সেখানকার সিংহাসনে বসান। বেঙ্গীতে চোলেদের এই ক্ষমতাবৃদ্ধিতে আশঙ্কিত পশ্চিম চালুক্যরাজ সত্যাশ্রয় বেঙ্গী আক্রমণ করেন। সত্যাশ্রয়ের বিরুদ্ধে সমরাভিযান পরিচালনা করার দায়িত্ব দেওয়া হয় যুবরাজ রাজেন্দ্রকে। রাজেন্দ্র বনগসি ও রাইচুর দোয়ারের অনেকাংশ নিজ অধিকারে আনেন ও মান্যখেড ভস্মীভূত করেন। এই অবস্থায় সত্যাশ্রয় বেঙ্গী থেকে সৈন্য প্রত্যর্পণে বাধ্য হন। এইভাবে সারা রাজত্বকাল ব্যাপী সমরাভিযানের দ্বারা রাজরাজ মাদুরা, অন্ধ্র, মহীশূর ও কুর্গের কিয়দংশ, উত্তর সিংহল-সহ বেশ কিছু দ্বীপে চোল আধিপত্য প্রসারিত করেছিলেন।

রাজরাজ চোল কেবল সাম্রাজ্য সংগঠকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন সুশাসকও। শিল্প, স্থাপত্য ও সাহিত্যের প্রতি ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ। তিনি ছিলেন শৈব ধর্মাবলম্বী। তাঞ্জোরের সুবিখ্যাত রাজরাজেশ্বর মন্দির তাঁরই উল্লেখযোগ্য কীর্তি। তবে তিনি অন্যান্য ধর্মের প্রতিও শ্রদ্ধাবান ছিলেন। কারণ সুমাত্রার রাজা ***শ্রীবিজয়*** তাঁর অনুরোধেই মেগাপতমে বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করেছিলেন। রাজত্বের শেষ দু'বছর (১০১২-১০১৪ খ্রীঃ) তিনি পুত্র রাজেন্দ্রের সাথে যুগ্মভাবে শাসন পরিচালনা করেন। প্রকৃত অর্থেই তিনি ছিলেন চোলবংশের এক 'মহান' শাসক।

○ রাজেন্দ্র চোল (১০১২-১০৪৪ খ্রীষ্টাব্দ) ঃ প্রথম রাজেন্দ্র ছিলেন চোলবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি কন্যাকুমারী, মহেন্দ্রগিরি ও সুত্তুর অঞ্চলে প্রাপ্ত লিপিসমূহ থেকে তাঁর সামরিক কীর্তির কথা জানা যায়। সিংহাসনে বসেই তিনি পিতার অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করতে অগ্রসর হন এবং একাধিক সামরিক সাফল্যের দ্বারা চোল-শক্তিকে অপ্রতিহত করে তোলেন। রাজত্বের পঞ্চম বৎসরে সিংহল অভিযানের মাধ্যমে তিনি রাজ্যজয়ের সূচনা করেন। অবশ্য রাজরাজের রাজত্বকালে তিনি বহু সফল সমরাভিযানে নেতৃত্ব দেন। যাইহোক্, মহাবংশ থেকে তাঁর সিংহল অভিযানের বর্ণনা পাওয়া যায়। জানা যায় যে, তিনি রাজা পঞ্চম মহেন্দ্রকে বন্দী করেছিলেন।

সমগ্র সিংহল তাঁর পদানত হয়েছিল। সিংহলকে তিনি একটি চোল-প্রদেশে পরিণত করেন। নৌ-অভিযানের ক্ষেত্রে সিংহল বিজয়ই তাঁর একমাত্র সাফল্য ছিল না। তিনি শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য শ্রীবিজয়ের (মালয় উপদ্বীপ, সুমাত্রা, যবদ্বীপ) বিরুদ্ধেও নৌ-অভিযান প্রেরণ করেন। শৈলেন্দ্ররাজ বিজয় তুঙ্গবর্মন রাজেন্দ্রের নিকট পরাজিত হয়ে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হন। অবশ্য এরপর তাঁকে হৃতরাজ্য ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এই বিজয়ের ফলে চীনের সাথে ভারতের বাণিজ্যপথের অন্তরায় দূর হয়।

তিরুবালাঙ্গারু পট্ট থেকে তাঁর রাজ্যজয়ের বিবরণ পাওয়া যায়। রাজত্বের ষষ্ঠ বৎসরে দিগ্বিজয়ে বের হয়ে তিনি পাণ্ড্য ও কেরলদের উপর নিজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। তারপর নিজপুত্রের হাতে রাজ্যগুলির শাসনভার অর্পণ করেন। তাঁর পরবর্তী সংগ্রাম ছিল পশ্চিম চালুক্যরাজ জয়সিংহ। বেঙ্গীর সিংহাসনের উত্তরাধিকারের প্রশ্নে উভয়ের মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছিল। বিমলাদিত্যের মৃত্যুর পর তাঁর দুই পুত্র, বিজয়াদিত্য ও রাজরাজ উভয়েই সিংহাসন দাবি করতে থাকেন। এই পরিস্থিতিতে জয়সিংহ বিজয়াদিত্যের পক্ষ নেন। অন্যদিকে রাজরাজার পক্ষ নেন রাজেন্দ্র, কারণ রাজরাজ ছিলেন চোলরাজ মহান রাজরাজার কন্যা কুন্দভাকের পুত্র। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়সিংহই শেষ পর্যন্ত পরাজিত হন, *'মাস্কির যুদ্ধে'*। চোলদের অপর এক বাহিনী বেঙ্গিতে উপস্থিত হয়ে. বিজয়াদিত্যকে হটিয়ে, রাজরাজকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে। মাস্কির যুদ্ধের পর রাজেন্দ্র কলিঙ্গ অভিমুখে অগ্রসর হন। কারণ কলিঙ্গরা জয়সিংহকে সাহায্য করেছিলেন। যথারীতি, কলিঙ্গরাজ রাজেন্দ্রের কাছে পরাস্ত হন।

কলিঙ্গজয়ের পর রাজেন্দ্রর সেনা আরো উত্তরে অগ্রসর হয়। এই উত্তর-ভারত অভিযানের বর্ণনা পাওয়া যায় তিরুমলয় লেখ থেকে। এই অভিযানে সময় লেগেছিল দু'বছর (১০২১-২৩ খ্রীঃ) এবং সাম্রাজ্যবিস্তারের উদ্দেশ্য নিয়ে এই অভিযান পরিচালিত হয়নি। এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল পবিত্র গঙ্গাজল সংগ্রহ। পূর্ববঙ্গের শাসক গোবিচন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গের মহীপাল ও দক্ষিণবঙ্গের রণশূর চোল-বাহিনীর কাছে পরাজিত হন। এই অভিযানের মাধ্যমে উত্তর-ভারত, দক্ষিণের এক প্রবল সাম্রাজ্যিক শক্তির পরিচয় পায়। এই অভিযানের সাফল্যের পর রাজেন্দ্র *'গঙ্গাইকোণ্ড চোল'* অর্থাৎ *'গঙ্গাবিজেতা'* উপাধি নেন এবং কাবেরী নদীর তীরে নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। এর নাম হয় *'গঙ্গাইকোণ্ড চোলপুরম্'*।

রাজেন্দ্রের রাজত্বের শেষদিকে পাণ্ড্য ও কেরলগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। সম্ভবত রাজত্বের অন্তিমভাগে তিনি পশ্চিম চালুক্যগণের সাথেও সংঘর্ষে লিপ্ত হন। সম্ভবত, চালুক্যদের সাথে যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থাতে রাজেন্দ্রর মৃত্যু হয় (১০৪৪ খ্রীঃ)।

○ পরবর্তী চোল রাজাগণ ঃ

প্রথম রাজেন্দ্রর মৃত্যুর পর চোল সাম্রাজ্যের ক্রমাবনতি শুরু হয়। তাঁর পুত্র প্রথম রাজাধিরাজ (১০৪৪-৫২ খ্রীঃ) চের, চালুক্য ও পাণ্ড্য রাজ্যের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। সিংহলের বিরুদ্ধেও তিনি অভিযান প্রেরণ করেন। রাজাধিরাজের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য নৃপতি ছিলেন বীররাজেন্দ্র (১০৬৪-৭০ খ্রীঃ)। তিনি চালুক্যদের বিরুদ্ধে স্মৃতিস্বরূপ তুঙ্গভদ্রার তীরে একটি বিজয়স্তম্ভ নির্মাণ করেছিলেন। চোল নৃপতি কুলোতুঙ্গের রাজত্বকালে (১৯৭০-১১২০ খ্রীঃ) চোল-চালুক্য সংঘর্ষ কিছুটা কমেছিল। কারণ তাঁর মহিষী ছিলেন চালুক্য রাজকন্যা।

অবশ্য পরবর্তী শাসকদের আমলে চোল-চালুক্য সংঘর্ষ আবার বৃদ্ধি পেয়েছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত চোল-শক্তি টিকেছিল। ইতিমধ্যে যাদব ও কাকতীয় বংশ দক্ষিণ-ভারতে প্রবল ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিল। তাদের আক্রমণে শেষ পর্যন্ত চোল-শাসনের অবসান ঘটে।

○ চোলদের নৌ-নীতি ও সামুদ্রিক অভিযান ঃ

প্রাচীন ও আদি-মধ্যযুগের ভারতবর্ষে একাধিক শক্তিশালী আঞ্চলিক রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছিল। দক্ষিণ ভারতের এমনি শক্তি হিসেবে চোলদের উত্থান রাজনৈতিক গুরুত্ব ছাড়াও দু'টি কারণে স্বাতন্ত্র্যের দাবি রাখে। একটি হল তাদের নৌ-অভিযান এবং অন্যটি হল গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার রূপায়ণ। আদি-মধ্যযুগের ভারতে সামুদ্রিক অভিযান কিছুটা অভূতপূর্ব ঘটনা। স্বভাবতঃই চোলদের জঙ্গী নৌ-নীতি বিশিষ্টতার দাবি রাখে। এটি চোল রাজাদের কোন আকস্মিক রোমাঞ্চকর সিদ্ধান্ত ছিল না। যথেষ্ট পরিকল্পিত পথে এবং পূর্ণ প্রস্তুতি সহ একাধিক চোল রাজা এই দুঃসাহসিক ও অভূতপূর্ব অভিযানে লিপ্ত হয়েছিলেন। ৯৮৫-১১২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চোলরা কার্যত বঙ্গোপসাগরকে একটি 'চোল হ্রদে' পরিণত করতেও সক্ষম হয়েছিলেন।

চোলদের সামুদ্রিক অভিযানের সূচনা করেন প্রথম রাজরাজ (৯৮৫-১০১৪ খ্রীঃ)। তাঁর চতুর্থ রাজ্যবর্ষের একটি লেখতে দেখা যায় যে রাজরাজ চের বা কেরল রাজ্য আক্রমণ করে ***'কুন্দলুর-স্পালৈ-কলমরুগু'*** উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। তামিল শব্দ 'স্পালৈ'-এর ইংরাজী প্রতিশব্দ Anchorage বা নোঙ্গর ফেলার স্থান। কুন্দলুর-স্পালৈ স্থানটিকে ঐতিহাসিকেরা বর্তমানের ত্রিবান্দ্রম অঞ্চল বলে সনাক্ত করেছেন। এইভাবে সমুদ্র উপকূলে কর্তৃত্ব স্থাপন করে রাজরাজ সামুদ্রিক অভিযানের সম্ভাবনা সৃষ্ট করেন। রাজরাজের অষ্টম রাজ্যবর্ষের একটি লেখতে (৯৯৩ খ্রীঃ) দাবি করা হয়েছে যে, তিনি উন্মুক্ত সমুদ্রে অবস্থিত ইলম জয় করেছিলেন। রাজরাজের পুত্র ও উত্তরাধিকারী রাজেন্দ্র চোলের তিরুবলাঙ্গরু তাম্র পট্ট থেকে জানা যায় যে তাঁর পিতা ইল্‌মণ্ডলম্‌ বা শ্রীলঙ্কা জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই লেখতে রাজরাজকে শ্রীরামচন্দ্রের বানর সেনার সেতুবন্ধন করে শ্রীলঙ্কা অভিযানের চেয়েও বড় কৃতিত্ব দেওয়া হয়েছে। বৌদ্ধগ্রন্থ দীপবংশ, মহাবংশতে বলা হয়েছে যে চোলদের আক্রমণে সন্ত্রস্ত হয়ে সিংহলরাজ পঞ্চম মহেন্দ্র দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্বে পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। সিংহলের উত্তরভাগ অর্থাৎ রাজরট দখল করে রাজরাজ তার নতুন নাম দেন ***'মুম্মুডি-চোলমণ্ডলম্‌'***। অতঃপর রাজরাজ সিংহলের রাজধানী অনুরাধপুর ধ্বংস করেন এবং 'পোলন্নরুব'তে সিংহলস্থ চোল প্রদেশের নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। রাজরাজ এই বিজয়কে স্মরণীয় করে রাখার জন্য পোলন্নরুব'-তে একটি পাথরের শিবমন্দির নির্মাণ করেন। এটি হিন্দু স্থাপত্যের নিদর্শন হিসেবে আজও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চোল নৌবহর সিংহলের গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র 'মহাতীটঠ দখল করে তার নতুন নাম দেয় রাজরাজপুর। পূর্ববর্তী তামিল শাসকদের সিংহল অভিযানের সাথে চোলদের অভিযানের একটি মৌলিক পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। পূর্ববর্তী শাসকেরা কেবল সিংহলরাজের বশ্যতা আদায় করতে উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু রাজরাজের লক্ষ্য ছিল সমুদ্রপারে সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ ঘটানো।

রাজরাজের শেষ উল্লেখযোগ্য নৌ-অভিযান ছিল ভারত মহাসাগরের পশ্চিম দিকে অবস্থিত মালদ্বীপ (মালদিব) পুঞ্জের বিরুদ্ধে। ১০১২/১৪ খ্রীষ্টাব্দের একটি লেখতে উল্লেখ করা হয়েছে যে তাঁর (রাজরাজ) নৌবহর সমুদ্র অতিক্রম করে ১২,০০০ দ্বীপপুঞ্জ জয় করেছিল। সম্ভবত, ত্রিবান্দ্রাম অঞ্চল থেকে এই অভিযান পাঠানো হয়। ইতিমধ্যে আরব বণিকরা পশ্চিম উপকূলের বাণিজ্যে অনেকটাই কর্তৃত্ব করছিল। চোলদের শত্রু কেরল রাজ্য ছিল আরবদের পৃষ্ঠপোষক। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যে আরবদের প্রতিযোগিতা বন্ধ করার জন্য রাজরাজ আরব বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র মালদ্বীপপুঞ্জের বিরুদ্ধে নৌ-অভিযানের সিদ্ধান্ত নেন বলে রোমিলা থাপার মনে করেন।[1]

রাজরাজ যে নৌ-অভিযানের সূচনা করেন তাঁর পুত্র রাজেন্দ্র চোলের আমলে (১০১৪-১০৪৪ খ্রীঃ) তা আরো ব্যাপকাকার লাভ করে। বস্তুত, রাজেন্দ্রর সাফল্যের পটভূমি তৈরি করে দেন তাঁর পিতা প্রথম রাজরাজ। সম্রাট হিসেবে রাজেন্দ্র চোলের প্রথম উল্লেখযোগ্য নৌ-অভিযান হল সিংহল আক্রমণ ও দখল। তাঁর রাজত্বের পঞ্চম বর্ষের কয়েকটি লেখতে এই অভিযানের কথা উল্লেখ আছে। অবশ্য এই অভিযানের বিশদ বিবরণ লেখতে পাওয়া যায় না। তবে সিংহলী ইতিবৃত্ত মহাবংশ গ্রন্থ থেকে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। মহাবংশে দাবি করা হয় যে চোলরা শ্রীলঙ্কায় বিপুল সম্পদ লুণ্ঠন করেছিল। রাজার হীরের তৈরি অলংকার চোলরা দখল করে নেয়। এমনকি বৌদ্ধ বিহারগুলিও তাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়নি। মহাবংশ গ্রন্থে চোল সেনাবাহিনীকে রক্তপিপাসু মগ দস্যুদের সাথে তুলনা করা হয়েছে। রাজেন্দ্র সমগ্র সিংহলকে (শ্রীলঙ্কা) চোল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত একটি প্রদেশে পরিণত করেন। তবে চোলরা সমগ্র সিংহলের উপর তাদের নিরঙ্কুশ অধিকার দীর্ঘকাল বজায় রাখতে পারেনি। মহাবংশে দাবি করা হয়েছে যে রাজা পঞ্চম মহেন্দ্রর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র কশ্যপের নেতৃত্বে জাতীয় প্রতিরোধ তৈরি হয় এবং দীর্ঘ যুদ্ধের পর সিংহলের দক্ষিণভাগে তিনি নিজ কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। প্রথম বিক্রমবাহু নাম নিয়ে তিনি বারো বৎসর দক্ষিণ সিংহল শাসন করেন।

রাজেন্দ্র চোলের রাজত্বের দ্বাদশ বর্ষে একটি লেখতে দেখা যায় যে তিনি ভারতের পূর্ব উপকূলের উত্তরদিকে এক অভিযান পাঠান। বেঙ্গী রাজ্যের সাথে এই যুদ্ধে কলিঙ্গদেশ বেঙ্গীকে সাহায্য করলে ক্ষুব্ধ চোলরাজ কলিঙ্গ দেশকে সমুচিত শাস্তি দিতে অগ্রসর হন এবং সসৈন্যে গঙ্গানদীর মোহনা পর্যন্ত অগ্রসর হন। চোল সেনা বঙ্গোপসাগরের পশ্চিম উপকূল ধরে অগ্রসর হয়ে উড়িষ্যা (ওড্ডবিষয়), রায়পুর, বিলাসপুর, সম্বলপুর ও বঙ্গদেশ জয় করে গঙ্গার জল নিয়ে চোল রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করে। এক্ষেত্রে কোন অঞ্চলের উপর চোলশাসন স্থাপিত হয়নি। তবে এই ঘটনা কাবেরী ব-দ্বীপ থেকে গঙ্গার ব-দ্বীপ পর্যন্ত চোলদের সামরিক সাফল্যের প্রমাণ দেয়। রাজেন্দ্র তাঁর চতুর্দশ রাজ্যবর্ষে বিখ্যাত 'কড়ারম্' (শ্রীবিজয়) অভিযান চালান। একটি লেখতে বলা হয়েছে যে উত্তাল সমুদ্রে অনেকগুলি যুদ্ধ জাহাজ পাঠিয়ে রাজেন্দ্র কড়ারম্-এর শাসক সংগ্রাম বিজয়োত্তুঙ্গ বর্মনকে পরাজিত করেন। শ্রীবিজয় ছিল একটি সামুদ্রিক রাষ্ট্র। মালয় উপদ্বীপ, যবদ্বীপ, সুমাত্রা এবং সন্নিহিত মোবিলিম্বনগম, থলৈপ্পনদরু, তলৈটট্কোল্লম,

মাদমালিঙ্গম, মানক্কবারম প্রভৃতি দ্বীপ-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। অবশ্য বিজিত কোন অঞ্চলকেই তিনি চোল রাজ্যের অঙ্গীভূত করেননি।

রাজেন্দ্র চোলের পরবর্তী বংশধর ছিলেন রাজাধিরাজ (১০৪৪-৫৪ খ্রীঃ), দ্বিতীয় রাজেন্দ্র (১০৫৪-৬২ খ্রীঃ), বীর রাজেন্দ্র (১০৬২-৭০ খ্রীঃ), অধিরাজেন্দ্র (১০৭০ খ্রীঃ) প্রমুখ। এঁদের রাজত্বকালে চোল নৌবহর ব্যবহার হয়েছিল মূলত শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে। সিংহলের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য অবিরাম সংগ্রাম চালাচ্ছিল। ১০৫৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এই বিদ্রোহ দমন করার জন্য চোল রাজারা মাঝে মাঝেই সিংহলে সেনা পাঠান এবং অনেকসময় বর্বরতার সাথে বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা করেন। সিংহলের রাজা প্রথম বিজয়বাহু চোল শাসনের অবসান ঘটাতে সচেষ্ট হলে বীর রাজেন্দ্র ১০৬৫ খ্রীষ্টাব্দে সিংহল আক্রমণ করেন। বীর রাজেন্দ্রর একটি লেখতে দাবি করা হয় যে তিনি বিজয়বাহুকে পরাজিত করে সমগ্র সিংহলের উপর অধিকার পুনঃস্থাপন করেন।

প্রধান চোল বংশের শেষ শক্তিশালী রাজা ছিলেন প্রথম কুলোতুঙ্গ (১০৭০-১১২০ খ্রীঃ)। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর শাসনকালে তিনি শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে কোন অভিযান পাঠাননি। ১০৭০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহল কার্যত চোলশাসন থেকে মুক্ত হয়ে যায়। ১০৭০-এর পর সিংহলে কোন চোল লেখ পাওয়া যায়নি। মহাবংশ গ্রন্থেও উত্তর সিংহলের স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তাঁর আমলে চোল নৌবাহিনীর শক্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। 'কলিঙ্গাত্তুপ্পারনি' গ্রন্থে দাবি করা হয়েছে যে কুলোতুঙ্গ উন্মুক্ত সাগর অতিক্রম করে 'কড়ারম্' অভিযান করেছিলেন।

চোল রাজারা দীর্ঘ ১৩৫ বছর ধরে একটি পরাক্রান্ত নৌ-বহরের সাহায্যে সমুদ্রের বিভিন্ন দ্বীপ রাষ্ট্রে অভিযান চালান। কিন্তু একমাত্র সিংহল বা শ্রীলঙ্কা ছাড়া কোন এলাকা তাঁর স্থায়ীভাবে সাম্রাজ্যভুক্ত করেননি। স্বভাবতঃই চোলদের সামুদ্রিক অভিযানগুলির প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটা সংশয় সৃষ্টি হয়। ঐতিহাসিকদের ব্যাখ্যার বিভিন্নতা সেই সংশয়কে দৃঢ়তর করে। ***রমেশচন্দ্র মজুমদার, কে. জি, কৃষ্ণান*** প্রমুখের মতে, রাজনৈতিক গৌরব অর্জনের লক্ষ্যে নতুন নতুন রাজ্যগ্রাস করে 'দিগ্‌বিজয়ী' আখ্যা লাভের জন্যই এই সকল অভিযান কর্মসূচী গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু এই ব্যাখ্যা যুক্তি বা পরিস্থিতি দ্বারা সমর্থিত নয়। কারণ দিগ্‌বিজয়ের বাসনা কোন বিশেষ এক/দুজন শাসকের মানসিকতায় দানা বাঁধতে পারে। কিন্তু ধারাবাহিকভাবে ছয় বা সাত জন শাসকের ক্ষেত্রে এই মানসিকতা থাকা সম্ভব নয়। তাছাড়া দেখা গেছে যে কোন অভিযানে বিজয়ী হলেও এঁরা রাজ্যগ্রাস করেননি। অথচ দিগ্‌বিজয়ের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্যই হল রাজ্যজয়।

মার্কিন ঐতিহাসিক ***বার্টন স্টাইন, জর্জ স্পেনসার*** প্রমুখ চোলদের সামুদ্রিক ক্রিয়াকলাপকে রাজনৈতিক কর্মসূচী না বলে অর্থনৈতিক লালসাজাত পরিকল্পনা বলে মনে করেন। এঁদের মতে, চোল শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল কর্তৃত্বের বিকেন্দ্রীকরণ। রাজা কেন্দ্রে ছিলেন, কিন্তু রাজস্ব সংগ্রহের কাজ করত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ উর, সভা, নাত্তার ইত্যাদি। উরাইয়ুর ও মানের লেখর ভিত্তিতে এঁরা দেখিয়েছেন যে স্থানীয় সংস্থাগুলি রাজস্ব সংগ্রহ ও পুনর্বণ্টন করার ফলে খুব সামান্য সম্পদ কেন্দ্রীয় কোষাগারে জমা পড়ত। কিন্তু শাসন পরিচালনার জন্য অর্থের প্রয়োজন। তাই চোল রাজারা অর্থ সংগ্রহের কাজে সর্বদা লিপ্ত থাকতেন এবং সামুদ্রিক অভিযানগুলির প্রধান লক্ষ্যই ছিল অর্থ সংগ্রহ করা। অর্থাৎ চোলদের যুদ্ধগুলি 'সংহতিমূলক

কার্যধারা' (Integrating activity) ছিল না, সেগুলি ছিল 'লুণ্ঠনমূলক কর্মসূচী' (Plundering activity)। স্টাইন ও স্পেনসার চোলদের অভিযান কর্মসূচীর পেছনে চোল সেনাবাহিনীর প্রকৃতির ভূমিকাও উল্লেখ করেছেন। এঁরা মনে করেন চোলদের কোন স্থায়ী সুগঠিত বাহিনী ছিল না। মূল ছোট্ট বাহিনীর সাথে যুদ্ধকালে ভাড়াটে সৈনিক নিয়োগ করা হত। এই পাঁচমিশেলী বাহিনীকে সদা কর্মরত না রাখলে তাদের কর্মদক্ষতা ও আনুগত্যে ঘাটতি দেখা দিত। তাই চোলরাজারা নিরন্তর যুদ্ধে লিপ্ত থাকতেন।

বিগত শতকের আশির দশক থেকে স্টাইন ও স্পেনসারের বক্তব্যের প্রবল বিরোধিতা শুরু হয়েছে। অধ্যাপক ***ডি. এন. ঝা, আর. চম্পকলক্ষ্মী, ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়*** প্রমুখ দেখিয়েছেন যে, স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা থাকলেও গ্রামস্তর পর্যন্ত কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের প্রশাসনিক প্রভাব কার্যকরী ছিল। চম্পকলক্ষ্মী চোল লেখগুলির নতুন ব্যাখ্যা করে প্রমাণ করেছেন যে চোলযুগে তথাকথিত স্বাধীন গ্রামসভাগুলি কেন্দ্রীয় রাজকর্মচারীদের অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে ছিল। তাই রাজস্ব ঘাটতি মেটানোর জন্য চোলদের লুণ্ঠননীতি গ্রহণ করতে হয়েছিল, এই ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। অধ্যাপক ***রণবীর চক্রবর্তী*** তাঁর *'warfare for wealth (1986)'* শীর্ষক গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে দশম শতক থেকেই চোলরা নিয়মিতভাবে খমের (Khmer), বর্মা, উত্তর ভিয়েতনাম, চীন ও আরবদেশের সাথে বাণিজ্যসম্পর্ক বজায় রেখেছিল। চোলদের লেখ থেকে জানা যায় যে, শ্রীবিজয়ের রাজা চোল রাজাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন। শ্রীবিজয়ের রাজা সংগ্রাম বিজয়োত্তুঙ্গবর্মন চোল রাজ্যের নাগপট্টমে চূড়ামনবিহার তৈরি করেছিলেন। এই সুসম্পর্ক নিয়মিত যোগাযোগ এবং আর্থিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থ ছাড়া সম্ভব হয় না। আসলে চীনের করমণ্ডল উপকূলের বাণিজ্যে শ্রীবিজয় অন্তর্বর্তীর ভূমিকা পালন করত। সেই অন্তর্বর্তীর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য শ্রীবিজয়ের শাসকেরা চোল রাজাদের সাথে মিত্রতার সম্পর্ক রক্ষা করতে তৎপর ছিলেন। কিন্তু চোল রাজারা অন্তর্বর্তীকে এড়িয়ে সরাসরি চীনের সাথে বাণিজ্যে উদ্যোগী হন এবং বার বার 'কড়ারম্' আক্রমণ করেন। লক্ষণীয় যে, তাঁদের জয় করা প্রতিটি অঞ্চলই ছিল বাণিজ্যিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। ***নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী*** মন্তব্য করেছেন যে, রাজেন্দ্রর গঙ্গা অভিযান ভারতের পূর্ব-উপকূল বরাবর চালিত হয়েছিল, কারণ ওই উপকূলের সমৃদ্ধ বন্দর ও তার বাণিজ্যের উপর কর্তৃত্ব করাই ছিল তার লক্ষ্য। সাধারণভাবে, এ কথা বলা যায় যে, চোলদের সামুদ্রিক অভিযানগুলি বিশুদ্ধ লুণ্ঠন প্রবৃত্তি সঞ্জাত ছিল না। সুদূরপ্রসারী অর্থনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যেই একাধিক চোল নৃপতি এই অভিযান কর্মসূচী গ্রহণে তৎপর ছিলেন।

O চোল শাসনব্যবস্থার স্বরূপ ঃ

আদি-মধ্যযুগে চোল নৃপতিদের নেতৃত্বে দক্ষিণ ভারতে যে সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে তার পশ্চাদ্‌পটে চোল রাজাদের সাংগঠনিক প্রতিভার দিকটি গুরুত্বপূর্ণ। চোলরাজা রাজরাজ এবং কুলতুঙ্গের শাসনের অন্তর্বর্তীকালে চোল প্রশাসনিক কাঠামো একটি সুনির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে। শতাধিক বছরের ঐতিহ্য ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ক্রম রূপান্তরের মধ্য দিয়ে চোলশাসন কাঠামো সুসংহত রূপ নিতে সক্ষম হয়। এই সাফল্যের ক্ষেত্রে তামিল প্রশাসনিক ঐতিহ্যের কাছে চোল প্রশাসন বিশেষভাবে ঋণী ছিল। তবে চালুক্য, সাতবাহন, পল্লব বা রাষ্ট্রকূটদের শাসন ধারার

সাথে চোল প্রশাসনের প্রভেদ ছিল লক্ষণীয়। সাতবাহন বা পল্লব রাজারা মূলত উত্তর-ভারতে প্রচলিত শাসনরীতি দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। আবার চালুক্য ও রাষ্ট্রকূটদের রাষ্ট্রব্যবস্থায় সামন্ত শাসকদের প্রবল প্রতাপ ওই দুই রাজ্যে কেন্দ্রীভূত রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে ছিল বিশেষ অন্তরায়স্বরূপ। সেক্ষেত্রে চোল রাজারা একটি প্রতাপশালী কেন্দ্রীয় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে সফল হন এবং দক্ষিণ ভারতীয় ঐতিহ্যকে ভিত্তি করে একটি সুবিন্যস্ত ও সুশৃঙ্খল শাসন কাঠামো গড়ে তুলতে সক্ষম হন।

চোল সাম্রাজ্যের শাসনতান্ত্রিক পরিকাঠামো জানার জন্য আমাদের প্রধান উপাদান হল সমকালীন কিছু লেখ। তবে লেখগুলির বক্তব্য সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মতভেদ আছে। চৈনিক পরিব্রাজক চো-গুয়া'র বিবরণী এক্ষেত্রে আমাদের কিছু আভাস দেয়। চোল রাজাদের প্রশস্তি ও 'সঙ্গম' সাহিত্য থেকে অস্পষ্ট কিছু ধারণা পাওয়া যায়। গুপ্ত পরবর্তী যুগে মুদ্রার প্রচলন সীমিত হওয়ায় এই পর্বের ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ কিছুটা কষ্টকর।

সপ্তম যুগের মত চোল আমলে একটি কেন্দ্রীভূত রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। রোমিলা থাপারের মতে, কেবল চোলদের রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই কৃষকদের সঙ্গে নিয়মিত সম্পর্ক বজায় ছিল এবং কেন্দ্রীয় শাসনের কিছু কিছু লক্ষণ দেখা যেত।[1] প্রবল সামন্ততন্ত্রের উত্থানের যুগে চোল রাজাদের এই নিয়ন্ত্রণকারী দক্ষতা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। অসংখ্য রাজপ্রাসাদ, একাধিক রাজধানী, বিশাল কর্মীমণ্ডলী ও জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে চোল রাজারা এক শক্তিশালী কেন্দ্রের অস্তিত্ব জাহির করতে সক্ষম হন। ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজাদের অভিধাতেও পরিবর্তন সূচিত হয়। প্রথম পর্বের চোল রাজারা উপাধি নিয়ে চিন্তা করতেন না। কিন্তু পরবর্তীকালের রাজারা কর্তৃত্বব্যঞ্জক উপাধি যেমন 'চক্রবর্তীগল' অর্থাৎ 'সম্রাট' ইত্যাদি গ্রহণ করতে শুরু করেন। কর্তৃত্ব বৃদ্ধির অনুসঙ্গ হিসেবে রাজধানীর সংখ্যা ও জাঁকজমকে পরিবর্তন ঘটে। বিজয়ালয়ের রাজধানী ছিল তাঞ্জোর। পরে কাঞ্চীপুরম দ্বিতীয় রাজধানী হয়। রাজেন্দ্র চোল গঙ্গই কোণ্ড চোলপুরমে নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি কয়েকটি শহরে নতুন রাজপ্রাসাদও নির্মাণ করেন। রাজপ্রাসাদকে কেন্দ্র করে নতুন নতুন রাজনৈতিক নগরী গড়ে ওঠে।

কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সর্বোচ্চ ছিলেন রাজা। রাজনৈতিক কর্তৃত্বের পাশাপাশি রাজাদের উপর দেবত্ব আরোপ করা হয়। মৃত রাজাদের স্মরণে মন্দির নির্মাণ করা হয়। রাজপদ ছিল বংশানুক্রমিক। আইন, বিচার, প্রশাসন সব কিছুর উর্ধ্বে ছিল রাজার স্থান। তিনিই ছিলেন প্রধান বিচারপতি ও প্রধান সেনাপতি। রাজসভায়, 'রাজগুরু' বিশেষ মর্যাদা পেতেন। রাজগুরু পার্থিব ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে রাজাকে পরামর্শ দেবার পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল রাজনৈতিক বিষয়েও পরামর্শ দিতেন; যুবরাজ রাজকার্যে রাজাকে সহায়তা করতেন। রাজা পরবর্তী উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যেতেন। তাই গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা শিথিল হয়। রাজার অনুপস্থিতিতে যুবরাজ শাসনকার্য চালাতেন। অনেক সময় রাজা উপশাসক হিসেবে যুবরাজের হাতে কিছু প্রশাসনিক ক্ষমতা হস্তান্তর করে দিতেন। যুগ্ম-শাসন ছিল চোল প্রশাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

অধ্যাপক ***নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী*** চোলদের অধীনে 'উদান কুট্টম' (Udan Kuttam) নামক মন্ত্রীদের অস্তিত্ব উল্লেখ করেছেন। এঁরা বিভিন্ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। তবে রোমিলা থাপার মনে করেন চোলদের কোন স্থায়ী মন্ত্রীসভা ছিল না। সম্ভবত, উদান কুট্টম শ্রেণীর কর্মচারীরা রাজার অনুগত হিসেবে শাসন দায়িত্ব পালন করতেন এবং রাজাকে পরামর্শ দিতেন। পরামর্শ গ্রহণ করা বা না-করা ছিল সম্পূর্ণভাবে রাজার ইচ্ছাধীন।

চোল শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল এক বিশাল ও জটিল আমলাতন্ত্র। ***নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী*** লিখেছেন, *'The chola administrative machinary was an elaborate and complicated bureau cracy comprising officials of various grades.'* অর্থাৎ চোল কর্মচারীদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ ছিল স্পষ্ট। পদ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন অভিধা দ্বারা কর্মচারীদের পার্থক্য বোঝান হত। সাধারণভাবে উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা ***'পেরুদনম'*** (Perudanam) এবং নিম্নপদস্থরা ***'সিরুদনম'*** (Sirudanam) নামে অভিহিত হতেন। ড. ***রমেশচন্দ্র মজুমদার*** এদের যথাক্রমে 'পেরুন্দনম' ও 'সিরুতনম' নামে অভিহিত করেছেন। এদের মধ্যবর্তী কর্মচারীদের বলা হত ***'সিরুদনত্তুপ-পেরুন্দনম'***। সামরিক ও বেসামরিক উভয় শ্রেণীর কর্মচারীর ক্ষেত্রেই অভিধাগুলি প্রযুক্ত হত। কর্মচারীর পদগুলি বংশানুক্রমিক ধারায় পূরণ করা হত। তবে কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের নিয়োগ পদ্ধতি, পদোন্নতি ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্যাবলী খুব স্পষ্ট নয়। ***রোমিলা থাপারের*** মতে, সম্ভবত উত্তর-ভারতীয় নিয়োগ পদ্ধতির সাথে চোলদের নিয়োগ ব্যবস্থার বিশেষ পার্থক্য ছিল না।[1] এক্ষেত্রে বর্ণ, বংশ পরিচয়, যোগাযোগ ও অন্যান্য গুণাবলী বিবেচনা করা হত। প্রথমে রাজা মৌখিক নির্দেশ দিয়ে কাজে নিয়োগ করতেন। পরে ওই নিয়োগ লিপিবদ্ধ করা হত। কোন কোন ক্ষেত্রে নিয়োগের আদেশপত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকেও স্বাক্ষর করতে হত। পদোন্নতির ক্ষেত্রে কর্মচারীর দক্ষতা, সততা, রাজানুগত্য ইত্যাদি গুণাবলী বিবেচনা করা হত। কর্মচারীরা নগদ অর্থে বেতন পেতেন না। বেতনের পরিবর্তে তাদের ভূমিদান করা হত। এই দান 'জীবিত' নামে পরিচিত ছিল। ভূমির মালিকানাস্বত্ব রাজার হাতেই থাকত। কর্মজীবনে সংশ্লিষ্ট কর্মী উক্ত জমির রাজস্ব নগদ অর্থে কিংবা দ্রব্যের মাধ্যমে আদায় করতেন। সরকার ভূমি-সংক্রান্ত নির্দেশনামাগুলি কঠোরভাবে সংরক্ষণ করত।

সমগ্র চোল সাম্রাজ্য কয়েকটি প্রদেশ বা *'মণ্ডলম'*-এ বিভক্ত ছিল। প্রদেশের সংখ্যা ছিল আট বা নয়। প্রতিটি প্রদেশ *'জেলা'* বা *'বলনাডু'তে* বিভক্ত ছিল। কয়েকটি করে গ্রামের সমষ্টি নিয়ে গঠিত হত নাডু বা কোট্টম বা কুররম। বলনাডু ছিল কয়েকটি নাডু বা কোট্টম-এর সমষ্টি। শাসনব্যবস্থার সর্বনিম্ন একক ছিল গ্রাম। অনেক সময় এক একটি বড় গ্রাম এককভাবে কুররম নামে চিহ্নিত হত। এমন গ্রামকে বলা হত *'তানিয়ুর'*। গ্রামগুলির স্বায়ত্তশাসন অধিকার ছিল। বড় বড় নগরের স্বতন্ত্র পৌরশাসন কায়েম ছিল। সাধারণভাবে যুবরাজ বা অনুগত সামন্ত প্রদেশগুলির শাসক নিযুক্ত হত। প্রাদেশিক শাসকদের নিজস্ব কর্মীমণ্ডলী ছিল। প্রাদেশিক শাসকরা রাজার ইচ্ছানুসারে শাসন পরিচালনা করতেন এবং সমস্ত ঘটনাবলী সম্পর্কে রাজাকে অবহিত রাখতেন।

1. পূর্বোক্ত গ্রন্থ—পৃ. ১৪৮।

চোল আমলে রাজকোষে আয়ের প্রধান উৎস ছিল ভূমিরাজস্ব। চোল রাজা প্রথম রাজরাজ জমি জরিপ করে রাজস্ব আরোপের নীতি প্রবর্তন করেন। পরবর্তী রাজাদের লেখা থেকে জানা যায় যে, জরিপ ব্যবস্থা পরবর্তীকালেও কার্যকরী ছিল। ভূমি রাজস্বের হার সাধারণভাবে ছিল উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ। তবে জমির উর্বরতা অনুসারে এই হারের তারতম্য ঘটত। উৎপন্ন ফসলের চরিত্র পরিবর্তন হলেও রাজস্বের হার নতুনভাবে নির্ধারণ করা হত। নগদে অথবা শস্যে রাজস্ব দেওয়া যেত। প্রতি গ্রামে বাসগৃহ, দেবস্থান, জলাশয়, শ্মশান, সেচখাল ইত্যাদির জন্য নিষ্কর জমি নির্দিষ্ট করা থাকত। তবে করযোগ্য জমির কর প্রদানের ক্ষেত্রে সামান্যতম শিথিলতা সহ্য করা হত না। জমির মালিকানা ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা গ্রামসভার হাতে ন্যস্ত হত। ভূমি রাজস্ব ছাড়া আমদানি-রপ্তানি শুল্ক, নগরে প্রবেশের শুল্ক এবং খনি, অরণ্য ইত্যাদি ক্ষেত্র থেকে কর আদায় করা হত। সব মিলিয়ে করের চাপ ছিল যথেষ্ট। সরকার বা ধনী ব্যক্তিরা সামাজিক দান-ধ্যানের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে অতিরিক্ত পরিসেবা দেবার চেষ্টা করতেন।

নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী চোলদের তিন ধরনের আদালতের নাম উল্লেখ করেছেন—রাজকীয় আদালত, গ্রামীণ আদালত এবং জাতি-পঞ্চায়েত। রাজকীয় আদালতগুলিকে সম্ভবত 'ধর্মাসন' বলা হত। ধর্মাসনের বিচার পরিচালনার ক্ষেত্রে শাস্ত্রজ্ঞ-ব্রাহ্মণদের (ধর্মাসন-ভট্ট) মতামতকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত। রাজদ্রোহিতার মত গুরুত্বপূর্ণ অপরাধের বিচার রাজা স্বয়ং করতেন। তবে সাধারণভাবে গ্রামসভাগুলিই স্থানীয় স্তরে অধিকাংশ বিবাদের নিষ্পত্তি করে দিত। গ্রামসভায় বিচারে সন্তুষ্ট না হলে নাড়ুর ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর কাছে আবেদন করা যেত। দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার মধ্যে প্রভেদ করা হত না। শাস্তির ক্ষেত্রে কঠোরতা ছিল। রাজদ্রোহিতার অপরাধে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, নির্বাসন কিংবা প্রাণদণ্ড দেওয়া হত। সাধারণ অপরাধের ক্ষেত্রে আর্থিক জরিমানা বা কারাদণ্ড দেওয়া হত। দাঙ্গা এবং অগ্নি সংযোগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ জরিমানা আদায় করা হত। মন্দিরের সম্পত্তি নষ্ট করলে (শিবদ্রোহ) অভিযুক্তের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে দেবস্থানের ক্ষতিপূরণ করা হত। চুরি, ব্যাভিচারিতা, জালিয়াতি ইত্যাদি লঘু অপরাধের ক্ষেত্রে বেত্রাঘাত, অর্থদণ্ড, বা কারাদণ্ডের বিধান ছিল। এই সকল অপরাধী গ্রামসভার কাজে যোগ দিতে পারত না।

○ গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা ঃ

চোল শাসনব্যবস্থার সর্বনিম্ন একক ছিল গ্রাম। গ্রামীণ শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে গুপ্তশাসন-ব্যবস্থার সাথে চোলশাসন ধারার বিশেষ প্রভেদ নেই। তবে গঠনগত মিল থাকলেও চোল ও গুপ্ত গ্রামীণ শাসনের প্রকৃতিগত প্রভেদ ছিল লক্ষণীয়। চোল শাসনব্যবস্থায় গ্রামগুলির শাসনতান্ত্রিক স্বাধীনতা ছিল অভূতপূর্ব। চোল রাজকর্মচারীরা গ্রামীণ শাসনের কাজে সরাসরি হস্তক্ষেপ বা নিয়ন্ত্রণ করতেন না। তাঁরা মূলত পরিদর্শক বা পরামর্শদাতার ভূমিকা পালন করতেন। অষ্টম ও নবম শতকে পাণ্ড্য ও পল্লবদের লেখাতেও স্বতন্ত্র গ্রাম শাসনের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে চোল রাজ্যের মত পাণ্ড্য বা পল্লবদের গ্রামীণ শাসন এত স্বাধীন, সুবিন্যস্ত ও সমৃদ্ধ ছিল না। সম্ভবত, এই কারণে রাজবংশের পরিবর্তন সত্ত্বেও গ্রামীণ বিকাশের ধারা

অব্যাহত থাকত। ***রোমিলা থাপারের*** মতে, 'উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় তামিলনাদে যে অনেক বেশি সাংস্কৃতিক অবিচ্ছিন্নতা লক্ষ্য করা যায়, তার মূলেও হয়ত রয়েছে চোলদের গ্রামশাসন পদ্ধতি। ***নীলকণ্ঠ শাস্ত্রীর*** ভাষায়, *"The most striking feature of the chola period was the unusual vigour and efficiency that characterised the functioning of the autonomous rural institutions."*[1] একটি অতি-উন্নত সমিতি ব্যবস্থার (ভরিয়মস্) মাধ্যমে স্থানীয় শাসন পরিচালনা করা হত। উত্তরমেরুর 'সভা' অল্প সময়ের ব্যবধানে রাজা প্রথম পরন্তকের আমলে দু'বার সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাকে পরিশীলিত করে তোলার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

চোল আমলে গ্রামীণ শাসনব্যবস্থার প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল গ্রামবাসীকে স্বনির্ভর করে তোলা। এই উদ্দেশ্যে একটি গ্রাম-পরিষদ গঠন করে তার হাতে গ্রামের সম্পূর্ণ শাসনদায়িত্ব অর্পণ করা হত। মূল সমিতি ছাড়াও অনেকগুলি সামাজিক, অর্থনৈতিক বা ধর্মীয় গোষ্ঠী এক একটি নির্দিষ্ট বিভাগ বা কাজের তত্ত্বাবধান করত। গোষ্ঠীগুলি কোন দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে বা সমস্যার সম্মুখীন হলে পরিষদের কাছে আবেদন করতে পারত। গোষ্ঠীর সদস্যরাই মূল পরিষদের সদস্য হতেন। ফলে পরিষদের সাথে গোষ্ঠী-সংগঠনের সংঘাতের সম্ভাবনা ছিল না। বড় বড় গ্রামগুলিতে সুশাসনের প্রয়োজনে একাধিক প্রতিষ্ঠান থাকত। গ্রামগুলি বিভিন্ন পাড়ায় বিভক্ত ছিল। এক একটি পাড়ায় ভিন্ন ভিন্ন পেশাজীবি মানুষ নিজ নিজ গোষ্ঠী গঠন করত, যেমন সূত্রধর, কর্মকার, স্বর্ণকার প্রভৃতি। বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল গ্রামের সমাজজীবনের মূল ভিত্তি।

সাধারণ পরিষদে স্থানীয় অধিবাসীরাই সদস্য হতে পারত। পরিষদ ছিল তিন ধরনের—উর্, সভা ও নগরম্। (ক) যেসব গ্রামবাসী কর প্রদান করে তাদের গঠিত সমিতির নাম ছিল *'উর্'*। (খ) ব্রাহ্মণদের দান করা গ্রাম (চতুর্বৈদিমঙ্গলম্) অথবা গ্রামের ব্রাহ্মণদের নিয়ে গঠিত হত *'সভা'*। (গ) ব্যবসা কেন্দ্রগুলির তত্ত্বাবধানের জন্য বণিকদের নিয়ে গঠিত হত *'নগরম্'*। কোন কোন সময় স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে ব্রাহ্মণদের জন্য নতুন বসতি গড়ে তোলা হত। সেক্ষেত্রে একই গ্রামে উর্ ও সভা দুইই থাকত। আবার বড় বড় গ্রামে কাজের সুবিধার জন্য প্রয়োজন হলে একই সাথে দুটি উর্ গঠন করা হত।

স্থানীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী এই সকল সমিতির কাজকর্ম ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হত। গ্রামের সকল প্রাপ্ত বয়স্ক করদাতা উরের সদস্য হতে পারতেন তবে উর্-এর কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রবীণদেরই প্রাধান্য ছিল। দৈনন্দিন কাজকর্ম পরিচালনার জন্য প্রবীণরা কার্যকরী সমিতি গঠন করতেন। কার্যনির্বাহী সমিতিগুলির পূর্ব ইতিহাস খুব স্পষ্ট নয়। সম্ভবত, পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এগুলির রূপদান করা হয়েছে। চোল আমলের প্রথম দিকের লেখগুলিতে নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য অস্থায়ী সমিতি গঠনের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিভিন্ন পরিষদে সমিতির সংখ্যা ও তাদের সদস্য সংখ্যার উল্লেখও এগুলিতে পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে চিঙ্গেলপুট জেলার 'উত্তরামেরুর' (Uttaramerur) গ্রামে প্রথম পরন্তকের রাজত্বকালের দুটি লেখ গুরুত্বপূর্ণ।

৯১৯ ও ৯২১ খ্রীষ্টাব্দের এই দুটি লেখতে বিভিন্ন কার্যনির্বাহী সমিতি গঠন সম্পর্কে বলা হয়েছে। প্রথম লেখটির সংশোধিত ও পরিমার্জিত রূপ হল পরবর্তী লেখটি।

উত্তর মেরুর এই গ্রামটি ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত। দশম শতকের শেষ লেখটি (৯২১ খ্রীঃ) অনুসারে উত্তর মেরুর গ্রামের ত্রিশটি পাড়া বা কুড়ুম্ব থেকে কার্যনির্বাহী সমিতিগুলিতে নির্বাচনের জন্য যোগ্য ব্যক্তিদের প্রথমে বেছে নেওয়া হত। এই ত্রিশটি পাড়ার অধিবাসীরা মিলিত হয়ে লটারী দ্বারা নির্বাচনের জন্য একজন করে প্রার্থী স্থির করতেন। নির্বাচনে নামার জন্য যোগ্যতা বিচার করা হত কঠোরভাবে। লেখটিতে প্রার্থীদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতার বিবরণ দেওয়া আছে। নির্বাচন প্রার্থীকে করদায়ী জমির ২৫ শতাংশের বেশি মালিক হতে হবে। তাঁর নিজস্ব বাসগৃহ থাকবে এবং বয়স হবে ৩৫ বছরের বেশি কিন্তু ৭০-এর কম। শাস্ত্রজ্ঞানকে বিশেষ গুণ বলে উল্লেখ করা হয়। প্রার্থীকে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণগুলি সম্পর্কে জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। কোন ব্যক্তির যদি উল্লেখিত পরিমাণ জমি না থাকে, কিন্তু অন্তত একটি বেদ ও চারটি ভাষ্যের মধ্যে অন্তত একটি ভাষ্য সম্পর্কে জ্ঞান থাকে তাহলে তিনিও নির্বাচন প্রার্থী হতে পারবেন। যাঁদের এইসব গুণাবলী আছে তাঁদের মধ্যে যাঁরা বাণিজ্যে দক্ষ এবং যাঁদের নৈতিক চরিত্র উন্নত, তাঁদের নির্বাচনের জন্য বিবেচনা করা যাবে। নৈতিক চরিত্রের উপর বিশেষ গুরুত্ব চোল রাজ্যের উন্নত চরিত্র ভাতির সাক্ষ্য দেয়। বলা হয়েছে *যাঁরা সৎপথে থেকে জীবিকা নির্বাহ করেন, যাঁদের মন পবিত্র, যাঁরা গত তিন বছর কোন পরিষদের সদস্য ছিলেন না, তাঁরা যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।* অনুরূপভাবে অযোগ্যতার দিকটিও উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, যাঁরা বিগত বছরে কোনো পরিষদের সদস্য ছিলেন কিন্তু আয়-ব্যয়ের হিসেব দাখিল করেননি তাঁরা এবং তাঁদের নিকট আত্মীয়রা প্রার্থী হতে পারবেন না। যিনি অনাচারে লিপ্ত হয়েছেন তিনি প্রার্থী হতে পারবেন না। ব্রাহ্মণ হত্যা, মদ্যপান, চুরি, ব্যভিচারিতা ও অপরাধীর সাথে সংযোগ রক্ষা করেন তিনি বা তাঁর নিকট আত্মীয়রাও প্রার্থী পদে অযোগ্য বিবেচিত হবেন। যিনি হঠকারী, যিনি অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পত্তি আত্মসাৎ করেছেন, যিনি নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ করেন তিনি বা তাঁর নিকট আত্মীয়দের অযোগ্য বলে বিবেচনা করা হত। নিকট আত্মীয় হিসেবে পিতা বা পুত্র, কাকা, মামা, মাসতুতো ভাই, পিসতুতো ভাই, জামাই, ভাই, শ্বশুর, শ্যালক, ভগ্নিপতি, ভাগ্না প্রমুখের কথা বলা হয়েছে।

এই যোগ্যতার ভিত্তিতে ইচ্ছুক প্রার্থীদের নাম কাগজে লিখে একটি পাত্রে রাখা হত। গ্রামের সকল বয়স্ক ব্যক্তি ও তরুণদের উপস্থিতিতে লটারীর মাধ্যমে ত্রিশটি পাড়া থেকে একজন করে ত্রিশজন নির্বাচিত হতেন। এই ত্রিশজনের মধ্যে যাঁরা ইতিপূর্বে 'উদ্যান-সমিতি' ও 'পুষ্করিণী' সমিতিতে কাজের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এবং বয়সে প্রবীণ ও জ্ঞানী এমন বারো জনকে নিয়ে 'বাৎসরিক সমিতি' গঠন করা হত । অবশিষ্ট বারো জনকে নিয়ে 'উদ্যান-সমিতি' এবং ছয় জনকে নিয়ে পুষ্করিণী সমিতি' গঠন করা যেত। এছাড়া আগের পদ্ধতিতে ত্রিশটি পাড়ায় লটারী দ্বারা সদস্য নির্বাচিত করে 'স্বর্ণ সমিতি', ' পঞ্চমুখী সমিতি গঠন করা হত। ঢোল বাজিয়ে সভা বা মহাসভার অধিবেশন ডাকা হোত। বিভিন্ন গ্রাম-সভার মধ্যে মতবিনিময় ও সহযোগিতা ছিল সেকালের স্মরণীয় বৈশিষ্ট্য। উল্লেখিত তিনটি সমিতি ৩৬০ দিনের জন্য কার্যভার পেতেন এবং তারপরে অবসর নিতেন। কোন সদস্য কর্মকালের মাঝে অপরাধী সাব্যস্ত হলে তাকে তৎক্ষণাৎ

অপসারণ করা হত। এদের অবসর গ্রহণের পর নতুন সমিতি গঠনের জন্য বারোটি রাস্তার 'ন্যায়রক্ষা সমিতি' 'মধ্যস্থ' নামক সরকারী প্রতিনিধির মাধ্যমে মহাসভার অধিবেশন ডাকতেন এবং আবার লটারীর মাধ্যমে নতুন সদস্য নির্বাচনের ব্যবস্থা নিতেন গ্রামের আয়-ব্যয়ের হিসেব লেখার দায়িত্ব তুলে দেওয়া হত সবচেয়ে সৎ ব্যক্তির হাতে। তিনি প্রধান সমিতির কাছে বাৎসরিক হিসেব ত্রুটিহীন ভাবে তুলে দিতে দায়বদ্ধ থাকতেন। হিসেব না মেলানো পর্যন্ত হিসেবরক্ষক নিষ্কৃতি পেতেন না।

সভা বা মহাসভার কাজের পরিধি ছিল বেশ দীর্ঘ। গ্রাম-সম্প্রদায়ের জমির উপর সভার মালিকানাস্বত্ব ছিল। ব্যক্তি মালিকানা ধনী সম্পত্তির উপরেও সভার প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ছিল। উৎপন্ন ফসলের পরিমাপ, জমির জরিপ এবং রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণের কাজে সভা রাজকর্মচারীদের সহায়তা করত। পতিত জমি উদ্ধার করে কৃষি এলাকা বাড়ানোর দায়িত্ব সভা পালন করত। রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব পালন করত সভা। রাজস্ব অনাদায়ী হলে উক্ত জমি নীলামে হস্তান্তরের অধিকার সভার হাতেই ছিল। জমির অধিকার-সংক্রান্ত বিরোধ বা জলসেচ-বিষয়ক সমস্যা সমাধানের দায়িত্বও সভার হাতে ন্যস্ত ছিল। কোন বিশেষ উন্নয়নমূলক কাজের জন্য সভা আলাদা খাজনা আদায় করতে পারত, যেমন—পুষ্করিণী খনন, নতুন রাস্তা নির্মাণ, বাঁধ দেওয়া ইত্যাদি। মহাসভাগুলি এই সকল কাজের জন্য কর্মচারী নিয়োগ করত। তবে ছোট ছোট গ্রামের অধিবাসীরা বিনা পারিশ্রমিকেই কাজ করে দিত।

গ্রাম এবং রাজা বা কেন্দ্রীয় প্রশাসনের মধ্যে যোগসূত্র হিসেবে স্বতন্ত্র সংগঠনের অস্তিত্ব ছিল। চোলযুগে সামন্তরা এই কাজ করতেন। তবে সামন্ত ও রাজার সম্পর্ক বিষয়ে গ্রামসভার কোন উৎসাহ ছিল না। সভা রাজস্ব আদায় করলে সামন্তদের মাধ্যমে তা রাজকোষে পৌঁছে যেত। এর বাইরে গ্রামের উপর সামন্ত বা কেন্দ্রীয় প্রশাসনের কোন সম্পর্ক ছিল না। চোলযুগে গ্রামগুলির রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার ফলেই এটা সম্ভব হয়েছিল। এই কারণে দেশের রাজনৈতিক টানাপোড়েন গ্রামগুলির কর্মধারায় কোন ছেদ ঘটাতে পারত না।

উর্ ও সভার মত আর একটি স্থানীয় প্রতিষ্ঠান ছিল 'নগরম্'। সাধারণভাবে এটি ছিল স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সমবায় সংঘ। অধিকাংশ শহরে এগুলির অস্তিত্ব ছিল। অনেক সময় উর্ ও নগরম্ পাশাপাশি থেকে কাজ করত। বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষা করাই ছিল নগরম্ -এর প্রধান কাজ। অনেকে নগরম্‌কে ব্যবসায়ীদের সংঘ বা গিল্ড (Guild) হিসেবে বর্ণনা করেছেন। রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এই সংগঠন বাণিজ্যকর্ম তত্ত্বাবধান করত।

আঞ্চলিক শাসনতান্ত্রিক বিভাগ হিসেবে যে 'নাডু'র উল্লেখ আছে, তারও নিজস্ব 'সভা' ছিল। একে বলা হত *'নাত্তার'*। নাত্তার কিভাবে গঠিত হত তা স্পষ্ট নয়। সম্ভবত, নাডুর অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রামের প্রতিনিধিদের নিয়ে নাত্তার গঠিত হত। বিচার ও রাজস্ব আদায়-সংক্রান্ত কাজে এই নাত্তার 'সভাকে সাহায্য করতে বলে অনুমিত হয়।

গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনমূলক সংগঠনগুলির কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে সমকালীন লেখাগুলি প্রায় নীরব। তবে সামগ্রিকভাবে চোল রাজাদের উদারতা, শাসনতন্ত্রের প্রকৃতি এবং গ্রামসভাগুলির স্বাধীনতা ও স্বনির্ভরতার প্রেক্ষিতে কিছুটা অনুমান করা যায়। সম্ভবত, যে-কোন বিষয় নিয়ে

সাধারণভাবে আলোচনা করা হত। ব্রাহ্মণ, প্রবীণ বা প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা সামাজিক মর্যাদা ও অন্যান্যরা পদমর্যাদার ভিত্তিতে আলোচনায় অংশ নিতেন। কোন বিশেষ সামাজিক শ্রেণীর স্বার্থ-সংক্রান্ত আলোচনার সময় ওই শ্রেণীর প্রতিনিধিদের বক্তব্য শোনা হত। সম্ভবত, ভোটদান প্রথা ছিল না। বিস্তারিত আলোচনার পর সহমতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হত। প্রথম পরান্তকের রাজত্বকালে প্রতিবেশী দুটি গ্রামের সভা যৌথ অধিবেশনের মাধ্যমে (৯৩৩ খ্রীঃ) দুটি গ্রামকে মিলিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্বানুমতির প্রয়োজন হয়নি। এই ঘটনা গ্রামগুলির স্বাধীনতার ব্যাপকতা ও গভীরতা প্রমাণ করে।

চোলদের লেখ থেকে গ্রামশাসনের সাথে সম্পর্কিত অন্তত দু'জন কর্মচারীর নামোল্লেখ পাওয়া যায়। এঁরা হলেন *'মধ্যস্থ'* ও *'করণত্তার।'* সম্ভবত মধ্যস্থ ছিলেন কেন্দ্রের প্রতিনিধি ও পরিদর্শক। সভা বা মহাসভার অধিবেশনে এঁরা পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত থাকতেন, তবে আলোচনায় অংশ নিতেন না কিংবা সভার আলোচনাকে কোনভাবে প্রভাবিত করতেন না। 'করনত্তার' ছিলেন হিসেব-পরীক্ষক। সম্ভবত জমির সীমার উপরেও তাঁরা নজর রাখতেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, চোল শাসনব্যবস্থা ছিল একদিকে কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্র এবং অন্য প্রান্তে স্বশাসিত ও স্বনির্ভর গ্রামসমূহের স্বাধীন স্থানীয় শাসনধারার সমন্বয়। ***নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী*** মনে করেন যে, আদি-মধ্যযুগীয় রাজনীতির লক্ষ্য ছিল সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা। নিম্নবর্ণের মানুষ ছিল অবহেলিত। তবে এই ব্যবস্থা নিজ থেকেই একটা দহনশীল গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকত। জনগণের রাজস্ব অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা হত এবং সেবামূলক কাজের মাধ্যমে তার একাংশ আবার জনগণের কাছেই ফিরে যেত। তাঁর মতে, এক বিস্ময়কর সামাজিক ঐক্যের উপর দক্ষিণ ভারতের শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। এই ঐক্যের ভিত্তি সামাজিক সাম্য বা ব্যক্তির সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। তবে উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে পারস্পরিক আদান-প্রদানের শুভ মানসিকতা সক্রিয় ছিল, যার শিকড় সমষ্টি-জীবনের গভীরে প্রোথিত ছিল। ড. ***শাস্ত্রী*** লিখেছেন, ***"It was a woundetful social harmony based not on equality of classes or individuals but on readiness to give and take, a mutual goodwill that had its roots deep down at the foundations of communal life."[1]***

চোল শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের সাম্প্রতিক বিতর্কটি উল্লেখ্য। ***নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী, টি. মহালিঙ্গম, ডি. এন. ঝা, আর. চম্পকলক্ষ্মী*** প্রমুখ চোল শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীকরণ-প্রবণতার উপর জোর দিয়েছেন। ***বার্টন স্টাইন, জর্জ স্পেনসার*** প্রমুখের বক্তব্যের সাথে এখানেই তাঁদের সংঘাত। ***স্টাইন ও স্পেনসার***-এর মতে, চোলশাসন কাঠামোয় ছিল দুটি প্রশাসনিক কেন্দ্রের সমাহার। একদিকে ছিল কেন্দ্রীভূত প্রশাসন, অন্যদিকে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক স্থানীয় শাসন। তাঁদের মতে, চোল রাজ্য ছিল 'খণ্ডিত রাষ্ট্র বা Segmented state। এই রাষ্ট্র ব্যবস্থা তিনটি অঞ্চলে (zone) বিভক্ত—মূল এলাকা (core area), মধ্যবর্তী অঞ্চল (intermediate area) এবং প্রান্তিক

এলাকা (Peripherial area)। মূল এলাকায় থাকতেন প্রবল প্রতাপশালী রাজা, কিন্তু প্রান্তিক এলাকায় ছিল স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা। ***স্টাইনের*** মতে, গ্রামাঞ্চলে মূল ক্ষমতার উৎস ছিল নাড়ু ও সভা বা উর্। কিন্তু *দেবেন্দ্রনাথ ঝা, চম্পকলক্ষ্মী* প্রমুখ ভিন্ন মত পোষণ করেন। ***চম্পকলক্ষ্মী*** চোল লেখমালার নতুন পাঠ অনুসরণ করে বলেছেন যে, চোলদের তথাকথিত স্বাধীন গ্রামসভাগুলি কার্যত কেন্দ্রীয় রাজ্যপুরুষদের অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে ছিল। এই বিতর্কের সমাধান পরবর্তী গবেষণার উপর নির্ভর করছে।

○ শশাঙ্কের পর বাংলার অবস্থা ঃ

শশাঙ্ক স্থাপিত সাম্রাজ্যের ভিতের উপরই পালবংশীয় রাজারা সৌধ নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু এই দুই আলোকরেখার মধ্যবর্তীকালে বাংলা ছিল সম্পূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন। শশাঙ্কের মৃত্যু বাংলার রাজনৈতিক জীবনে যে শূন্যতা সৃষ্টি করেছিল, তা পালরাজাদের আগমনকাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এই সময়ে এদেশে ঘটেছে পুনঃপুনঃ বহিরাক্রমণ। এসময়ে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ বাংলায় এসেছিলেন। তিনি তখন বাংলাদেশে ৫টি রাজ্যের অস্তিত্ব দেখেছেন। এগুলি হল কজঙ্গল, পুণ্ড্রবর্ধন, কর্ণসুবর্ণ, তাম্রলিপ্ত ও সমতট। আর্যমঞ্জুশ্রী মূলকল্পে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শশাঙ্কের মৃত্যুর পর গৌড় অন্তর্কলহ ও বিদ্রোহে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। বাংলার এ হেন রাজনৈতিক দৈন্যের ফলেই হর্ষবর্ধন ও ভাস্করবর্মন বাংলাদেশ আক্রমণ করতে পেরেছিলেন। ***রমেশচন্দ্র মজুমদার*** বলেছেন যে, শশাঙ্কের মৃত্যুর পর পদ্মানদীর উত্তরভাগে *ভাস্করবর্মনের* এবং দক্ষিণভাগে *হর্ষবর্ধনের* আধিপত্য স্থাপিত হয়েছিল। ***ড. মজুমদার,*** কর্ণসুবর্ণ থেকে প্রাপ্ত ভাস্করবর্মনের একটি ভূমিদান পট্টকে ভিত্তি করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন। অবশ্য এ বিষয়ে পণ্ডিতগণ একমত হতে পারেননি।

সম্ভবত গৌড়ে ভাস্কর বর্মনের কর্তৃত্ব দীর্ঘস্থায়ী ছিল না। ৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তীকালে কর্ণসুবর্ণে জয়নাগ নামে একজন রাজার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। তিনি ***'মহারাজাধিরাজ'*** উপাধি নিয়েছিলেন। তাই ধারণা করা হয় জয়নাগ বেশ শক্তি ও কর্তৃত্বের অধিকারী ছিলেন। অনুমান করা হয় যে, বর্তমান বীরভূম, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলার অন্তর্গত ভূখণ্ড তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

জয়নাগের মৃত্যুর প্রায় এক শতাব্দী কাল বাংলার ইতিহাস খুবই অস্পষ্ট। এই সময়ে তিব্বতীয়দের সহায়তায় চীন পূর্ব-ভারতে আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট হয়। তিব্বতরাজ স্র-সান-গাম্পো সম্ভবত ভাস্কর বর্মনের উত্তরাধিকারীদের পরাজিত করে বাংলার কিছু অংশে এবং অসমের কিছু অংশে তাঁর কর্তৃত্ব স্থাপনে সক্ষম হন। সমকালীন সাহিত্যে সম্ভবত ম্লেচ্ছ বলতে তিব্বতীয়দের বোঝানো হয়েছে।

অষ্টম শতকের প্রারম্ভে শৈলবংশীয় জনৈক রাজা পুণ্ড্র বা উত্তরবঙ্গ জয় করেছিলেন। সম্ভবত ৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটেছিল। বাংলায় শৈল শাসনের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। এর অল্পকাল পরে কনৌজরাজ যশোবর্মা গৌড় ও বঙ্গ জয় করেন। এই ঘটনাকে অবলম্বন করে বাকপতিরাজ 'গৌড়বাহ' (গৌড়বধ) নামে একটি কাব্য রচনা করেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তিনি কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্যের কাছে পরাজিত হন। অবশ্য ***'রাজতরঙ্গিনী'*** গ্রন্থে ললিতাদিত্য

কর্তৃক গৌড় বিজয়ের কোন উল্লেখ নেই। তবে কবি কলহন এই গ্রন্থে এমন দুটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন, যা থেকে মনে করা যেতে পারে যে, গৌড়রাজ ললিতাদিত্যের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। যেমন—(১) গৌড়মণ্ডল থেকে একটি হস্তীবাহিনী কাশ্মীররাজের সাথে যোগ দিয়েছিল। (২) ললিতাদিত্যের আক্রমণে গৌড়রাজ কাশ্মীরে গেলে তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল। এই বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিবাদে গৌড়ের একদল সেনা ছদ্মবেশে কাশ্মীরে গিয়ে ধ্বংসকার্য শুরু করে। অবশ্য কাশ্মীর-সৈন্যের হাতে তারা সকলেই প্রাণ হারায়। *'রাজতরঙ্গিনী'* গ্রন্থে এই সব বীরের আত্মত্যাগের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। কলহনের রচনা থেকে আরো জানা যায় যে, ললিতাদিত্যের পৌত্র জয়াপীড় গৌড়ের সামন্তরাজা জয়ন্তর কন্যাকে বিবাহ করেন ও গৌড়ের ৫ জন নরপতিকে পরাজিত করে জয়ন্তকে সমগ্র গৌড়ের আধিপত্য প্রদান করেন। এ কাহিনীর সত্যতা সন্দেহাতীত না হলেও একথা সত্য যে, তখন গৌড়ে বিচ্ছিন্ন শাসন প্রচলিত ছিল।

নেপালের লিচ্ছবীবংশীয় রাজা দ্বিতীয় জয়দেবের শিলালিপিতে তাঁর শ্বশুর রাজা হর্ষ (ভগদত্তবংশীয়) গৌড়সহ বাংলার কিছু অংশ দখল করেছিলেন বলে উল্লেখ আছে।

বঙ্গরাজ্য অর্থাৎ বর্তমানের ঢাকা, ফরিদপুর, যশোর অঞ্চল শশাঙ্কের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল কিনা বলা যায় না। তবে হিউয়েন-সাঙের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, শশাঙ্কের মৃত্যুর পরেও সেখানে 'সমতট' নামে স্বাধীন রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। অতঃপর এখানে খড়্গবংশের উত্থান ঘটে। ঢাকার নিকট আসরফপুরে প্রাপ্ত দুটি তাম্রপট্ট ও কুমিল্লার দেউলবাড়ীতে প্রাপ্ত একটি মূর্তির সূত্রে এই তথ্য পাওয়া যায়। এঁরা সম্ভবত অষ্টম বা নবম শতকে রাজত্ব করতেন। পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গের উপর খড়্গবংশের শাসন কায়েম ছিল।

কনৌজের যশোবর্মা গৌড় দখল করার পর বঙ্গ জয় করেন বলে অনুমান করা হয়। তবে তাঁর অধিকার দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। তবে খড়্গবংশের শাসনের অব্যবহিত আগে এই অংশে রাতবংশীয় কিছু রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। এঁরা বামতটেশ্বর উপাধি নিয়েছিলেন। কারও কারও ধারণা রাতবংশ খড়্গবংশের অধীনে সামন্ত ছিলেন। পরে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। ত্রিপুরায় প্রাপ্ত একটি তাম্রশাসন থেকে লোকনাথ ও তাঁর পূর্বপুরুষদের রাজত্বের কথা জানা যায়। অনেকের মতে, লোকনাথ রাতবংশীয় জীবধারণের সামন্ত ছিলেন। শ্রীহট্ট জেলার কালাপুর তাম্রশাসন থেকে জনৈক সামন্ত শ্রীমরুণ্ডনাথের কথা জানা যায়। উপরিলিখিত দুটি তাম্রশাসনের সাদৃশ্য থেকে মনে করা হয় যে, এঁরা দুজনে একই ব্যক্তির অধীনে সামন্তরাজা ছিলেন।

তিব্বতীয় লামা তারানাথের ইতিহাস থেকে চন্দ্রবংশীয় কয়েকজন রাজার নাম জানা যায়। এই বংশের শেষ দুজন রাজা ছিলেন গবিচন্দ্র ও ললিতচন্দ্র। সম্ভবত, চন্দ্রবংশীয় রাজারাই খড়্গবংশ বা রাতবংশের হাত থেকে বঙ্গ জয় করেন এবং ললিতচন্দ্রকে শেষ পর্যন্ত যশোবর্মা পরাজিত করেন।

○ পালবংশের সূচনা ঃ

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর থেকে বঙ্গদেশের শান্তিশৃঙ্খলা সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত হয়েছিল। কার্যত, এই সময়ে বাংলাদেশ বহু ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে ও এখানে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে। ক্রমে দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচারের চরম পরিণতি রূপে দেখা দিল এক অসহ্য নৈরাজ্যকর

অবস্থা। এই অবস্থাকেই সমসাময়িক লিপি ও কাব্যে *'মাৎস্যন্যায়'* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পুকুরের বড় মাছ যেমন ছোট ছোট মাছকে নির্বিচারে গ্রাস করে, তেমনি অরাজকতার সুযোগে বাংলাদেশে সবলেরা দুর্বলের উপরে যথেচ্ছ শোষণ চালাত। তাই এ সময়কে *'মাৎস্যন্যায়'* বলে অভিহিত করা হয়েছে। ***লামা তারানাথ*** তৎকালীন বাংলার অবস্থা প্রসঙ্গে বলেছেন, *"তখন বাংলায় কোন রাজা ছিল না। প্রত্যেক ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, সামন্ত ও বণিক নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতেন। কিন্তু তখন সমগ্রদেশের কোন রাজা ছিল না।"*

ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসনের চতুর্থ শ্লোক থেকে জানা যায় যে, এই নৈরাজ্যকর অবস্থা বা মাৎস্যন্যায়ের অবসান ঘটানোর জন্য প্রকৃতিপুঞ্জ গোপালকে রাজপদে অভিষিক্ত করেছিল।[1] এখানে প্রকৃতি বলতে ঠিক কাদের বোঝানো হয়েছে, তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক আছে। কলহন প্রকৃতিপুঞ্জ বলতে জনসাধারণ অর্থাৎ প্রজামণ্ডলীকে বুঝিয়েছেন, যাঁরা গোপালকে রাজা হিসেবে নির্বাচিত করেছিল। কিন্তু অনেক পণ্ডিত এই মতের বিরোধিতা করে বলেছেন যে, রাজ্যের এইরূপ নৈরাজ্যকর পরিস্থিতিতে সমগ্র প্রজাবর্গের সম্মিলিত নির্বাচন সম্ভব ছিল না। তাই মনে হয় প্রকৃতি বলতে এখানে কতিপয় প্রধান সচিব বা কর্মচারীকে বোঝানো হয়েছে এবং এঁরাই গোপালকে রাজা হিসেবে নির্বাচিত করেন। ***ড. ব্রতীন্দ্রনাথ মুখার্জী*** অর্থশাস্ত্রের মত উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, প্রকৃতি বলতে রাজা, অমাত্য, জনপদ, দুর্গ, সেনা, মিত্র ইত্যাদিকে বোঝানো হত। সুতরাং মাৎস্যন্যায়ের অবসানকল্পে মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা গোপালকে নির্বাচিত করেন, এমন ভাবা যেতে পারে।

○ পালরাজা গোপাল ঃ গোপালের বংশপরিচয় বা প্রথম জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। রামচরিত অনুযায়ী বরেন্দ্রী ছিল পালরাজাদের আদি বাসস্থান। ড. মজুমদারও এই মত সমর্থন করেন। খালিমপুর তাম্রশাসনে গোপালের পিতা ও পিতামহ হিসেবে ব্যপট ও দয়িতবিষ্ণুর নাম রয়েছে। এই লেখতে ব্যপটকে শত্রুনিধনকারী রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এ থেকে মনে হয় যে, তিনি হয়তো সামরিক-প্রধান ছিলেন। পালগণের বংশপরিচয় সম্পর্কেও নানা মত প্রচলিত আছে। রামচরিত অনুযায়ী এঁরা ছিলেন ক্ষত্রিয়। আবার আর্যমঞ্জুশ্রী মূলকল্পে পালবংশকে 'দাসজীবীনর' বলা হয়েছে। আবুল ফজলের মতে, এঁরা ছিলেন কায়স্থ।

গোপাল সম্ভবত ভদ্ররাজবংশের কন্যা দদ্দাদেবীকে বিবাহ করেন। কারণ খালিমপুর লেখতে দদ্দাদেবী সম্পর্কে 'ভদ্রাত্মজা' বিশেষণটি ব্যবহার করা হয়েছে। সিংহাসনে আরোহণ করে গোপালের প্রথম ও প্রধান কাজ ছিল দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনা। তিনি সেই কাজে সফল হন এবং সম্ভবত সমগ্র বঙ্গদেশের উপর নিজ কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। খালিমপুর লেখতে বলা হয়েছে, তিনি ছিলেন 'পরম সৌগত' অর্থাৎ বৌদ্ধধর্মের উপাসক। গোপাল ৭৫০ থেকে ৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

○ ধর্মপাল ঃ গোপালের মৃত্যুর পর আনুমানিক ৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর পুত্র ধর্মপাল বাংলার সিংহাসনে বসেন। তিনি ছিলেন সুদক্ষ যোদ্ধা ও কূটনীতিজ্ঞ। ক্ষুদ্র পাল রাজ্যকে তিনি সাম্রাজ্যের মর্যাদায় উন্নীত করেন। বিজেতা হিসেবে তিনি সমগ্র আর্যাবর্তে সার্বভৌম ক্ষমতার অভিলাষী

ছিলেন। সেই সময়ে উত্তর-ভারতের প্রভুত্বকে কেন্দ্র করে প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট বংশের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল। কালক্রমে ধর্মপালও এই দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন।

সিংহাসনে বসেই ধর্মপাল ত্রিশক্তি দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন। এই ত্রিশক্তি দ্বন্দ্বের তিনটি পক্ষ ছিল যথাক্রমে পূর্ব-ভারতের পালগণ, পশ্চিম-ভারত অর্থাৎ মালব-রাজপুতনারা প্রতিহারগণ এবং দক্ষিণ-ভারতের রাষ্ট্রকূটগণ। সেই সময় কনৌজ ছিল 'সাম্রাজ্যবাদের আসন ও প্রতীক'। তাই মগধ, বারাণসী ও প্রয়াগ জয় করে ধর্মপাল কনৌজ জয়ের জন্য অগ্রসর হন। একইভাবে প্রতিহাররাজ বৎস্যরাজও কনৌজের উপর আধিপত্য প্রচেষ্টায় উদ্যোগী হন। এর অনিবার্য ফলস্বরূপ উভয়ের মধ্যে সংঘাত হয়, যাতে ধর্মপাল পরাজিত হন। কিন্তু বৎস্যরাজ জয়ের ফলভোগ করার আগেই আবির্ভাব ঘটে তৃতীয় শক্তির অর্থাৎ রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুবর। তিনি বৎস্যরাজকে পরাজিত করেন ও রাজপুতানায় ফিরে যেতে বাধ্য করেন। অবশ্য ধর্মপালও এরপর ধ্রুবর হাতে পরাজিত হন। তবে এই পরাজয়ের ফলে ধর্মপালের বিশেষ কোন ক্ষতি হয়নি। কারণ ধ্রুব এরপর নিজ রাজ্যে ফিরে যান। প্রতিহাররাজের পরাজয় ও ধ্রুবর নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্তনের ফলে উত্তর-ভারতে যে শক্তিশূন্যতার সৃষ্টি হয়, ধর্মপাল তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন। তিনি পুনরায় ক্ষমতা বিস্তারে অগ্রসর হন। নারায়ণপালের ভাগলপুর তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে, ধর্মপাল কনৌজ অধিকার করেন ও কনৌজের সিংহাসনে নিজ মনোনীত চক্রায়ুধকে বসান। কনৌজের পূর্ববর্তী রাজা ইন্দ্রায়ুধ বিতাড়িত হন। কনৌজ ছাড়াও ধর্মপাল উত্তর-ভারতের আরো নানা রাজ্য জয় করেন। কনৌজে অনুষ্ঠিত এক দরবারে উপস্থিত উত্তর-ভারতের অনেক রাজা ধর্মপালের প্রতি বশ্যতা জ্ঞাপন করেন বলে খালিমপুর লেখ থেকে জানা যায়। খালিমপুর লেখতে এই রাজ্যগুলির নামের নিম্নলিখিত তালিকা পাওয়া যায়।—(১) *ভোজ* (বরার), (২) *মৎস্য* (জয়পুর), (৩) *মদ্র* (মধ্য-পাঞ্জাব), (৪) *অবন্তী* (মালব), (৫) *গান্ধার* (পশ্চিম-পাঞ্জাব), (৬) *কুরু* (পূর্ব-পাঞ্জাব), (৭) *যদু* (পাঞ্জাব), (৮) *যবন* (সিন্ধু উপত্যকার মুসলিম রাজা) ইত্যাদির। অনেক পণ্ডিত মনে করেন, খালিমপুর লেখর এই বর্ণনা কিছুটা অতিরঞ্জিত। কিন্তু মুঙ্গের লেখতেও এই বর্ণনার সমর্থন পাওয়া যায়। সুতরাং অন্তত কিছুকালের জন্য, ধর্মপাল সমগ্র উত্তর-ভারতের উপর নিজ কর্তৃত্ব বিস্তারে সমর্থ হয়েছিলেন, এতে কোন সন্দেহ নেই। সম্ভবত, এই দূরবর্তী রাজ্যগুলির শাসনের দায়িত্বে থাকতেন ধর্মপালের প্রতি অনুগত সামন্তগণ। আর বাংলা ও বিহার ছিল তাঁর প্রত্যক্ষ শাসনাধীন অঞ্চল।

ধর্মপালের রাজত্বের শেষের দিকে ত্রিশক্তি সংঘর্ষের দ্বিতীয় অঙ্ক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। খ্রীষ্টীয় নবম শতকের সূচনায় দ্বিতীয় নাগভট্টের নেতৃত্বে প্রতিহারগণ পুনরায় শক্তিশালী হয়ে উঠে ও কনৌজ দখল করে নেয়। এই অবস্থায় ধর্মপাল সম্ভবত রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের সাহায্যপ্রার্থী হন। কারণ রাষ্ট্রকূট রাজকন্যা রন্নাদেবী ছিলেন ধর্মপালের পত্নী। অবশ্য রাষ্ট্রকূট সাহায্য আসতে বিলম্ব হওয়ায় ধর্মপাল একাই কনৌজ পুনরুদ্ধারে এগিয়ে যান। কিন্তু এবারেও তিনি নাগভট্টের কাছে পরাজিত হন। আবার দ্বিতীয় নাগভট্টও রাষ্ট্রকূট রাজ তৃতীয় গোবিন্দের কাছে পরাজিত হন। ধর্মপাল তৃতীয় গোবিন্দের বশ্যতা স্বীকার করে নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করেন। সম্ভবত, এরপর থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ধর্মপাল কনৌজ তথা উত্তর-ভারতে নিজ প্রতিপত্তি বজায় রাখতে সমর্থ হন।

ধর্মপাল কেবল রাজ্যবিজেতাই ছিলেন না, শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ও শিক্ষানুরাগী হিসেবেও তিনি ছিলেন কৃতিত্বের অধিকারী। বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে তিনি বহু বৌদ্ধমঠ নির্মাণ করেন। তাঁর গুরু ছিলেন বৌদ্ধ পণ্ডিত হরিভদ্র। মগধে নতুন রাজধানী স্থাপন করে তিনি সেখানে বিখ্যাত 'বিক্রমশীল বিহার' নামক বৌদ্ধমঠটি নির্মাণ করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'বিক্রমশীল' ছিল ধর্মপালের উপাধি। বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র হিসেবে বিক্রমশীল বিহারের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। এছাড়া পাহাড়পুরের সোমপুরী বিহার এবং ওদন্তপুরী বিহারও ধর্মপালের অনন্য কীর্তি। তারানাথের মতে, ধর্মপাল অন্তত ৫০টি বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাকেন্দ্রও নির্মাণ করেছিলেন। ৮১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হলে তাঁর সুযোগ্য পুত্র দেবপাল বাংলার সিংহাসনে বসেন।

✪ **দেবপাল ঃ** পরমেশ্বর পরমভট্টারকে মহারাজাধি দেবপাল ৮১০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনিই ছিলেন পালবংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের বিভিন্ন লেখ থেকে আমরা তাঁর রাজ্যজয়ের বিস্তৃত বিবরণ পাই। এই লেখগুলি হল 'মুঙ্গের লেখ', 'ভাগলপুর লেখ' ও 'বাদল প্রশস্তি'। বাদল প্রশস্তি থেকে জানা যায় যে, দেবপাল উৎকল, হূন, দ্রাবিড় ও গুর্জরদের পরাজিত করেছিলেন। ভাগলপুর লেখতে তাঁর উৎকল ও প্রাগ্‌জ্যোতিষ জয়ের কথা আছে। মুঙ্গের তাম্রলেখতে বলা হয়েছে যে, দেবপালের বিজয় পতাকা পশ্চিমে কাম্বোজ ও দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত পর্যন্ত বাহিত হয়েছিল।

তারানাথের মতে, পালদের উত্থানের ঠিক পূর্ববর্তী সময়ে বাংলার মত উৎকলেও নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা চলছিল। তারপর কর রাজারা সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দেবপাল সম্ভবত এই করবংশীয় রাজা শিবকরকে পরাস্ত করে উৎকল জয় করেন। ভাগলপুর লেখ অনুযায়ী দেবপালের ভ্রাতা জয়পাল উৎকলে উপস্থিত হলে উৎকলরাজ তাঁর রাজধানী পরিত্যাগ করে পলায়ন করেন। দেবপাল প্রাগ্‌জ্যোতিও জয় করেন। প্রাগ্‌জ্যোতিষ বলতে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাকে বোঝায়। ভাগলপুর লেখতে বলা হয়েছে যে, জয়পাল যখন প্রাগ্‌জ্যোতিষ আক্রমণ করেন তখন সেখানকার রাজা দেবপালের কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেন। কয়েকজন ঐতিহাসিক মনে করেন যে, কামরূপরাজ ও দেবপালের মধ্যে এক চুক্তি হয়, যার ফলশ্রুতিতে তাঁরা একযোগে উড়িষ্যা আক্রমণ করেন। পঞ্চম শতকের শেষদিকে ও ষষ্ঠ শতকের প্রথমদিকে মধ্য এশিয়ার যাযাবর হূন জাতি উত্তর-ভারতের রাজনীতিতে এক বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিল। এই সময়ের পরে আর তাদের বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় না। হর্ষচরিতে অবশ্য প্রভাকরবর্ধনের শত্রু হিসেবে হূনদের উল্লেখ আছে। সুতরাং বোঝা যায় যে, উত্তর-ভারতের কোন স্থানে এদের কোন ক্ষুদ্র রাজ্য হয়তো থেকে গিয়েছিল, দেবপাল সেখানেই অভিযান করেছিলেন। এরপর সম্ভবত তিনি কম্বোজ রাজ্যে অভিযান করেন। কম্বোজ রাজ্যটি সাধারণত ভারতের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ছিল বলে মনে করা হয়। এখানকার অশ্ব বিখ্যাত ছিল। মুঙ্গের লেখতেও এ প্রসঙ্গে অশ্বের উল্লেখ থাকায় মনে করা যায় যে, দেবপাল ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কম্বোজ রাজ্যই অভিযান করেছিলেন। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে, দেবপালের পক্ষে দূরবর্তী কম্বোজ রাজ্য জয় করা সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, ধর্মপাল গান্ধার পর্যন্ত তাঁর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। তাই দেবপালের কম্বোজ জয়ের দাবি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক নাও হতে পারে।

'বাদল লেখয়' যে গুর্জরগণের উল্লেখ আছে, তারা ও প্রতিহারগণ অভিন্ন ছিল কিনা, তা নিয়ে পণ্ডিতমহলে মতভেদ আছে। যদি লেখয় উল্লেখিত গুর্জর ও প্রতিহারগণ একই হয় তাহলে বলা যায় যে, ধর্মপালের সময়ে যে ত্রিশক্তি দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়েছিল, দেবপালের সময়েও তা অব্যাহত ছিল। দেবপালের সমসাময়িক প্রতিহাররাজ ছিলেন মিহিরভোজ। তাঁর গোয়ালিয়র প্রশস্তি থেকে জানা যায় যে, তিনি পালরাজের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন। তবে ড. চৌধুরী মনে করেন যে, ভোজ প্রথমে জয়লাভ করলেও পরবর্তীকালে দেবপালের কাছে পরাজিত হন।

দেবপাল যে দ্রাবিড়দের পরাস্ত করেন, তারা কারা ছিল, সে বিষয়েও বিতর্ক আছে। অধিকাংশ পণ্ডিত মনে করেন যে, দ্রাবিড় বলতে রাষ্ট্রকূটদের বোঝানো হয়েছে। দেবপাল রাষ্ট্রকূটরাজ প্রথম অমোঘবর্ষকে পরাস্ত করেছিলেন। কিন্তু ড. *মজুমদার* মনে করেন যে, এই পরাজিত দ্রাবিড় রাজা ছিলেন পাণ্ড্যরাজ শ্রীমার শ্রীবল্লভ। অবশ্য ***ড. নীহাররঞ্জন রায়***-সহ অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ মনে করেন না যে, দেবপাল সুদূর দক্ষিণের পাণ্ড্যরাজ্য পর্যন্ত অঞ্চল জয়ে সমর্থ হয়েছিলেন। 'মুঙ্গের লেখতে' দেবপালের রাজ্যের বিস্তৃতি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে দক্ষিণে রামেশ্বর সেতুবন্ধ পর্যন্ত তাঁর রাজ্যবিস্তৃত ছিল, এবং পূর্ব ও পশ্চিমে এটি সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত ছিল। এই বর্ণনায় কিছুটা অতিশয়োক্তি আছে সন্দেহ নেই। সে তুলনায় 'বাদল প্রশস্তিতে' প্রদত্ত রাজ্যসীমা অনেকটা যুক্তিগ্রাহ্য। এখানে বলা হয়েছে যে, দেবপালের রাজত্ব উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এর পূর্ব-পশ্চিম সীমা পূর্বের রাজ্যসীমার অনুরূপ। এই দুটি লেখর সাক্ষ্য থেকে মনে হয় যে, দেবপাল দক্ষিণের কিছু অংশ অন্তত জয় করেছিলেন। অবশ্য ***ড. দীনেশচন্দ্র সরকারের*** মতে, "*এই দুটি বর্ণনার মূলে আছে সমগ্র ভারতবোধক আদি চক্রবর্তীক্ষেত্র এবং পরবর্তীকালে কল্পিত উত্তর-ভারত বোধক ক্ষুদ্র চক্রবর্তীক্ষেত্র। যে-কোনও সম্রাটই এ ধরনের দাবি করতেন। এর কিছুমাত্র ঐতিহাসিক মূল্য নেই।*"[1] তবে দেবপালের সাম্রাজ্য যে যথেষ্ট বিস্তৃত ছিল তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

দেবপালের সঙ্গে যবদ্বীপের শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজা বালপুত্রদেবের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া যায় নালন্দা লেখ থেকে। এই লেখ থেকে জানা যায় যে, বালপুত্রদেব নালন্দায় একটি বিহার নির্মাণের অনুমতি প্রার্থনা করে দেবপালের কাছে দূত পাঠান। দেবপাল কেবল অনুমতি দান করেন, তাই নয়, ওই বিহারের ব্যয় নির্বাহের জন্য পাঁচটি গ্রাম দান করেন। এই থেকে বোঝা যায় যে, পাল সাম্রাজ্য ও শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। আরবদেশীয় পর্যটক সুলেমান দেবপালের রাজত্বকালে ভারতে এসেছিলেন। তাঁর বিবরণী থেকে দেবপালের বিশাল ও সুদক্ষ সেনাবাহিনীর কথা জানা যায়।

পালযুগে নালন্দা বিহারের খ্যাতি দেশে-বিদেশে বিস্তৃত হয়েছিল। দেবপালের পৃষ্ঠপোষকতায় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় বৌদ্ধধর্ম-চর্চার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছিল। 'ঘোস্ত্রবণ' লেখ থেকে জানা যায় যে, দেবপালের সময়ে নগরহারের বাসিন্দা *বীরদেব* ছিলেন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। পিতার মতই দেবপালও ছিলেন বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক। ***ড. মজুমদারের*** মতে, ধর্মপাল ও দেবপাল আর্যাবর্তে যে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন, তার পরিচয় বাঙালীর ইতিহাসে পূর্বে বা পরে আর কখনও পাওয়া যায়নি।

---

1. পাল-সেন যুগের বংশানুচরিত—দীনেশচন্দ্র সরকার (পৃ.-৭০)।

○ পরবর্তী পাল রাজাগণ ঃ দেবপালের মৃত্যুর পর পালবংশের গৌরবরবি সাময়িকভাবে অস্তমিত হয়েছিল। পরবর্তী পাল-রাজাদের দুর্বলতা ও অকর্মণ্যতা ক্রমেই পাল সাম্রাজ্যকে পতনের মুখে ঠেলে দেয়। দেবপালের পরবর্তী রাজা ছিলেন শূরপাল। তাঁর তৃতীয় রাজ্যবর্ষের একটি তাম্রশাসন পাওয়া যাওয়ায় বোঝা গেছে যে, শূরপাল ছিলেন দেবপালের পুত্র। এই তাম্রশাসনটি আবিষ্কৃত হবার আগে পর্যন্ত মনে করা হত যে, শূরপাল ও বিগ্রহপাল একই ব্যক্তি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, শূরপালের পর বিগ্রহপাল সিংহাসনে বসেন। এই বিগ্রহপাল ছিলেন দেবপালের ভ্রাতুষ্পুত্র। পালবংশের সিংহাসনে আরোহণের এই নীতি পরিবর্তনের কারণ হিসেবে অনেকে অন্তর্দ্বন্দ্বের সম্ভাবনার কথা বলে থাকে। যাই হোক্, বিগ্রহপাল ছিলেন দুর্বলচিত্ত, শান্তিপ্রিয় ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। স্বল্পকাল রাজত্ব করেই তিনি নিজপুত্র নারায়ণ পালকে সিংহাসনে বসিয়ে ধর্মকর্মে মন দেন। নারায়ণ পাল দীর্ঘ ৫৭ বৎসর (৮৬০-৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ) রাজত্ব করেন। কিন্তু তিনিও ছিলেন দুর্বল ধরনের শাসক। পালরাজাদের এই দুর্বলতার সুযোগ নেয় পালদের বংশগত শত্রু প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূটগণ। রাষ্ট্রকূটরাজ অমোঘবর্ষ অঙ্গ-বঙ্গ-মগধের শাসককে পরাস্ত করেছিলেন বলে লেখ থেকে জানা যায়। প্রতিহাররাজ ভোজের কাছেও পালরাজ পরাজিত হন। ভোজের পুত্র মহেন্দ্রপালের একাধিক লেখ পাটনা, গয়া ও উত্তরবঙ্গে পাওয়া গেছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মগধ এবং উত্তরবঙ্গের কিছু অংশেও প্রতিহাররাজদের কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়েছিল। কামরূপ ও উড়িষ্যার শাসকগণও পাল-অধীনতা মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। নারায়ণ পালের রাজত্বকাল এইরূপ দুর্যোগের মধ্যেই শেষ হয়। পরবর্তী রাজা রাজ্যপাল ও দ্বিতীয় গোপালের কয়েকটি লেখ মগধ ও উত্তর-বাংলায় পাওয়া গেছে। এথেকে মনে হয় যে, তাঁরা হৃত রাজ্যবংশের কিছু অন্তত উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সম্ভবত, মহেন্দ্রপালের মৃত্যুর পর তাঁর দুই পুত্রের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সূচনা হলে প্রতিহার শক্তি দুর্বল হয়ে যায় ও পালরাজাগণ এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন। কিন্তু বুন্দেলখণ্ডের চান্দেল্লগণের ও কলচুরিগণের আক্রমণে বাংলা আবার বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। পরবর্তী রাজা দ্বিতীয় বিগ্রহপালের সময়ে বা তার পূর্বে কম্বোজগণও পাল রাজ্য আক্রমণ করে। উত্তর ও পশ্চিম বাংলায় কম্বোজ অধিকার স্থাপিত হয়। মগধের সামান্য অংশে পালশক্তি কোনরকমে টিকে থাকে।

○ পাল বংশের পুনরুজ্জীবন—প্রথম মহীপাল ঃ দ্বিতীয় বিগ্রহ পালের পুত্র ও উত্তরাধিকারী মহীপাল যখন সিংহাসনে বসেন (৯৭৭ খ্রীঃ) তখন পাল সাম্রাজ্য মগধের ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। পাল সাম্রাজ্যকে রক্ষা করা ও তাকে পূর্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল মহীপালের অন্যতম কৃতিত্ব। মহীপালের রাজত্বকালের বহু লেখ আমরা পেয়েছি। যেমন—বাঘাউরা মূর্তিলেখ, নারায়ণপুর মূর্তিলেখ, বেলোয়া তাম্রশাসন, সারনাথ লেখ, বানগড় তাম্রশাসন, ইমাদপুর লেখ, তেত্রাবন লেখ ইত্যাদি।

বানগড় ও বেলোয়া তাম্রশাসনে মহীপালকে তাঁর পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করার জন্য কৃতিত্ব দান করা হয়েছে। এখানে পিতৃরাজ্য বলতে সমগ্র বঙ্গকেই বোঝানো হয়েছে বলে ড. মজুমদার মতপ্রকাশ করেছেন। সমগ্র বঙ্গ জয় করুন বা না করুন, চন্দ্র রাজাদের পরাস্ত করে উত্তর-বাংলা ও পূর্ব-বাংলা যে তিনি নিজ কর্তৃত্বাধীনে এনেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। পূর্ববঙ্গের উপর তাঁর আধিপত্যের প্রমাণ দেয় কুমিল্লা জেলায় প্রাপ্ত বাঘাউরা লেখ। এই লেখ থেকে জানা যায় যে, মহীপাল তাঁরা তৃতীয় রাজবর্ষে সমতটে একটি বিষ্ণুমূর্তিপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আবার ভৌগোলিক

দিক থেকে, মহীপালের পক্ষে আগে উত্তর-বাংলা জয় না করে পূর্ববাংলা জয় করা সম্ভব ছিল না। বেলোয়া, তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে, পঞ্চম রাজ্যবর্ষের ঠিক পূর্বে বা ওই বৎসরই বরেন্দ্র তাঁর আধিকারভুক্ত হয়। পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গও তাঁর রাজ্যভুক্ত ছিল কিনা তা বিতর্কের বিষয়, কারণ এই অঞ্চলগুলির উপর তাঁর অধিকারের কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

মহীপালের দ্বারভাঙ্গা, কুরকীহার, ইমাদপুর, তেত্রাবন ইত্যাদি লেখর প্রাপ্তিদেশ প্রমাণ করে যে, বিহারের বেশি কিছু অংশ তাঁর রাজ্যাধীন ছিল। 'সারানাথ লেখ' থেকে জানা যায় যে, বেনারস পর্যন্ত তাঁর রাজ্যসীমা বিস্তৃত ছিল।

মহীপালের রাজত্বকালের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল, চোল সম্রাট রাজেন্দ্র চোলের পূর্ব-ভারত অভিযান। তিরুমলয় লেখ থেকে এই অভিযান প্রসঙ্গে জানা যায়। অভিযানটি সংঘটিত হয়েছিল ১০২১-'২৩ খ্রীষ্টাব্দে। উৎকল জয় করে মেদিনীপুরের দণ্ডভুক্তির মধ্য দিয়ে চোলসেনা বাংলায় প্রবেশ করে। 'তিরুমলয়' লেখ থেকে জানা যায় যে, বাংলায় তখন একাধিক রাজা রাজত্ব করতেন। কারণ চোলবাহিনী দণ্ডভুক্তির শাসক ধর্মপালকে, উত্তর রাঢ়ের রাজা রনশূরকে ও বাংলার রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজিত করেছিল। *ড. সরকারের* মতে, এই রাজাগণের কেউ ছিলেন মহীপালের বশীভূত মিত্র, কেউ বা তার সামন্ত। মহীপালও রাজেন্দ্রর সেনাবাহিনীর হাতে পরাজিত হন, মতান্তরে পলায়ন করেন। তবে চোলরাজ উত্তর-পূর্ব ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের কোন প্রচেষ্টা করেননি। লেখ অনুযায়ী এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল গঙ্গাজল সংগ্রহ, যার দ্বারা রাজেন্দ্র তাঁর নতুন রাজধানীকে পবিত্র করবেন বলে মনস্থ করেছিলেন। এই অভিযানে সফল হবার পর তিনি 'গঙ্গাইকোণ্ড' বা 'গঙ্গাবিজেতা' উপাধি নেন। যাই হোক্, এই কারণেই চোল অভিযানের ফলে গুরুতর কোন ক্ষতি মহীপালের হয়নি। তবে রাজত্বের শেষদিকে কলচুরিরাজ গাঙ্গেয় দেবের হাতে মহীপালের পরাজয় ঘটে। লেখ থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। গোহরবা লিপি থেকে অনুমিত হয় যে, গাঙ্গেয়দেব অঙ্গরাজকে (মহীপাল) পরাস্ত করেছিলেন। এরই ফলশ্রুতিতে চোলদের উপর মহীপাল তাঁর অধিকার হারান। কারণ বৈহাকির রচনা থেকে অনুমিত হয় যে, ১০৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বারাণসী কলচুরিরাজের অধীনস্থ ছিল।[1]

মহীপালের রাজত্বকালে গজনীর শাসন সুলতান মামুদ একাধিকবার আক্রমণ করে উত্তর-ভারতকে বিপর্যস্ত করে তোলেন। উত্তর-ভারতের রাজারা মুসলমান আক্রমণের বিরুদ্ধে এক শক্তিজোট গড়ে তুলেছিলেন। সেই শক্তিজোটে যোগ না-দেবার জন্য মহীপাল অনেক ঐতিহাসিকের দ্বারা সমালোচিত হয়েছেন। *আর. ডি. বন্দ্যোপাধ্যায়, আর, পি, চন্দ* প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ একথাও বলেছেন যে, উত্তর-বিহার জয় করার পর সম্রাট অশোকের মত মহীপাল ধর্মীয় ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এ মত সত্য হোক্ বা না হোক্, মহীপালের পক্ষে ওই শান্তিজোটে যোগ না-দেবার যথেষ্ট উপযুক্ত কারণ ছিল। *প্রথমত*, পৈত্রিক রাজ্য উদ্ধার করাই ছিল তাঁর প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। *দ্বিতীয়ত*, চোল ও কলচুরী আক্রমণের সম্মুখীন হতে গিয়ে তাঁকে সর্বশক্তি নিয়োজিত করতে হয়েছিল। *তৃতীয়ত*, বাংলা ও বিহার ছিল মুসলিম আক্রমণ-সীমার বহির্ভূত। তাই নিজ রাজ্যের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মোকাবিলা করার পরিবর্তে

1. বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ)—রমেশচন্দ্র মজুমদার।

বহু দূরবর্তী মুসলিম আক্রমণ প্রতিরোধে শক্তিক্ষয় না করে মহীপাল সুবিবেচনার কাজই করেছিলেন।

মহীপালের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্মও তার পূর্বগৌরব ফিরে পায়। তিনি বহু সংঘ, বুদ্ধমূর্তি ইত্যাদি স্থাপন করেছিলেন, সারানাথের বিহারগুলির সংস্কারসাধন করেছিলেন। তাঁর সময়ে বহু বৌদ্ধপণ্ডিতের আগমন ঘটেছিল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন তিলোপা, জ্ঞানশ্রীমিত্র প্রমুখ।

মহীপাল যে কেবলমাত্র রাজ্য সংগঠক ছিলেন তাই নয়, তিনি ছিলেন সুশাসক ও অত্যন্ত জনপ্রিয়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত শহর, পুষ্করিণী প্রভৃতি আজও তাঁর জনপ্রিয়তার পরিচয় বহন করে আছে। রংপুর জেলার মহীগঞ্জ, চোগরা জেলার মহীপুর ইত্যাদি স্থান, দিনাজপুরের মহীপাল দীঘি, মুর্শিদাবাদের (মহীপাল নির্মিত) সাগরদীঘি ইত্যাদি তাঁর কৃতিত্বের নমুনা। এমনকি তাঁর নামে বাংলাদেশে বহু লোকগাথা পর্যন্ত তৈরি হয়েছিল। মহীপাল সবদিক থেকেই পাল সাম্রাজ্যকে সুসংবদ্ধ করে এক নবজীবন দান করেছিলেন।

❍ মহীপালের পরবর্তী নৃপতিগণ ঃ প্রথম মহীপালের পুত্র ও উত্তরাধিকারী নয়পাল দীর্ঘদিন কলচুরিরাজ কর্ণের সাথে সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। লেখ থেকে জানা যায় যে, নয়পাল কলচুরি সেনাবাহিনীকে বিধ্বস্ত করেন। পরিশেষে অতীশ দীপঙ্করের মধ্যস্থতায় উভয়ের মধ্যে এক সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। তবে পরবর্তী রাজা তৃতীয় বিগ্রহপালের সময়ে পুনরায় এই বিবাদ শুরু হয়। রামচরিত' থেকে জানা যায় যে, এবারেও পালরাজ জয়ী হন। তবে তিনি নিজ কন্যা যৌবনশ্রীর সাথে কর্ণের বিবাহ দিয়ে স্থায়ীভাবে শান্তি স্থাপন করেন। কলচুরিরাজ ব্যতীত ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের নেতৃত্বে চালুক্যগণও পাল সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। ত্রিপুরাতে এক স্বাধীন রাজবংশের উদ্ভব হয়। এমনকি মগধের বিভিন্ন অংশের উপরেও তাঁদের অধিকার অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। এইভাবে নয়পাল ও বিগ্রহপালের আমলে (১০৩৮-১০৭০ খ্রীঃ) পাল অধিকার ক্রমেই সংকুচিত হতে থাকে।

পরবর্তী রাজা দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল কৈবর্ত বিদ্রোহ। তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালেই নানাদিক থেকে পাল সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। বৈদেশিক শক্তির আক্রমণে অভ্যন্তরীণ প্রশাসন ভেঙে পড়ে। সেই সুযোগে সামন্তরাজাদের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভুত হয়। তৃতীয় বিগ্রহপালের তিন পুত্র মহীপাল, শূরপাল ও রাজ্যপালের মধ্যে মহীপাল সিংহাসনে বসেন। তিনি ছিলেন অযোগ্য ও কুচক্রী শাসক। তাঁর কুশাসনে কয়েকজন সামন্ত বিদ্রোহী হয়। মহীপাল সন্দেহ করেন যে, তাঁর ভ্রাতাদ্বয়ও তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন। ফলে মন্ত্রীদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে তিনি তাদের কারারুদ্ধ করেন। তারপর প্রয়োজনীয় সামরিক শক্তি না-থাকা সত্ত্বেও বিদ্রোহীদের মুখোমুখি হন। পরিণামে বিদ্রোহীদের হাতে তাঁর মৃত্যু হয়। 'কৈবর্ত' নামক দিব্যকের নেতৃত্বে বিদ্রোহীরা বরেন্দ্রে স্বাধীন শাসন প্রবর্তন করে।

❍ কৈবর্ত বিদ্রোহ ঃ

পালরাজা দ্বিতীয় মহীপালের আমলের (১০৭০-৭৫ খ্রীঃ) বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল জনৈক দিব্য বা দিব্যোক-এর নেতৃত্বে সংঘটিত বিদ্রোহ। এটি সাধারণভাবে বিদ্রোহীদের জাতিগত বিচারে 'কৈবর্ত বিদ্রোহ' নামে অভিহিত হয়। আবার বিদ্রোহের মূল এলাকা হিসেবে একে 'বরেন্দ্রী-বিদ্রোহ' নামেই অভিহিত করা হয়। কৈবর্ত বিদ্রোহ সম্পর্কে আমাদের প্রধান উপাদান

হল ***সন্ধ্যাকর নন্দীর*** 'রামচরিত' কাব্য। সন্ধ্যাকর নন্দী উত্তরবঙ্গের মানুষ। সম্ভবত বিদ্রোহের সময় তাঁর পিতা রাজকার্যে নিয়োজিত ছিলেন। পরে সন্ধ্যাকর এই বিদ্রোহ দমন বিষয়ে পুনর্মূল্যায়ন করেছেন। স্বভাবতই সন্ধ্যাকরের বক্তব্যে পক্ষপাতিত্ব থাকা অসম্ভব নয়। তাছাড়া 'রামচরিত' গ্রন্থের শ্লোকগুলি দ্বৈত অর্থবোধক। এক অর্থে এটি রাজা রামচন্দ্রের কাহিনী, অন্য অর্থে এটি পাল রাজা রামপালের গুণকীর্তন। এছাড়া কুমারপালের মন্ত্রী বিদ্যাধরের 'কামাউলিপট্ট, মদনপালের' 'মানালি দানপত্র' এবং ভোজবর্মনের 'বেলবা দানপত্র' থেকেও এই বিদ্রোহের কিছু আভাস পাওয়া যায়। সাম্প্রতিক কালের ঐতিহাসিকেরা প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কৈবর্ত বিদ্রোহের কারণ ও প্রকৃতি সম্পর্কে মত প্রকাশ করেছেন। এ বিষয়ে অধ্যাপক *রমেশচন্দ্র মজুমদার, রামশরণ শর্মা, রোমিলা থাপার, দীনেশচন্দ্র সরকার, এস. পি. লাহিড়ী* প্রমুখের মূল্যায়ন গুরুত্বপূর্ণ।

রামশরণ শর্মা তাঁর *'আদি-মধ্যযুগে ভারতীয় সমাজ'* শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন যে, কৈবর্তরা একটি উপজাতি এবং মিশ্র নিচু জাতি হিসেবে ব্রাহ্মণ্য সমাজে গৃহীত হয়েছিল। অনুমান করা হয় যে, কৈবর্তরা নির্দিষ্ট কাজের বিনিময়ে পালরাজাদের কাছে কিছু ভূমিসত্ত্ব পেয়েছিল। প্রথম মহীপালের রাজত্বের পঞ্চমবর্ষে (৯৯৩ খ্রীঃ) রচিত 'বেলওয়া' দানপত্র অনুসারে কৈবর্তরা তাদের জাতিবৃত্তির জন্য ২১০টি ভূখণ্ড দান হিসেবে পেয়েছিল। এই দান বাতিল হওয়ায় প্রায় সাতদশক পরে কৈবর্তরা বিদ্রোহী হয়। অধ্যাপক ***এস. পি. লাহিড়ীর*** মতে, জনৈক চাষী কৈবর্ত যশোদাসের আমলে কৈবর্ত জাতিভুক্ত অনেকেই পাল-প্রশাসনের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই প্রশাসনিক ক্ষমতাকে ব্যবহার করে কৈবর্তরা রাজনৈতিক কর্তৃত্ব দখল করতে আগ্রহী হন এবং বিদ্রোহ দ্বারা সিংহাসন দখলের কাজে লিপ্ত হয়েছিলেন। 'ভাতুরিয়া লিপিতে উল্লেখিত 'দাস' ও 'ভূমিজ শব্দ' দুটির ভিত্তিতে ড. লাহিড়ী বিদ্রোহীদের চাষী-কৈবর্ত বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ***দীনেশচন্দ্র সরকারের*** মতে, সেকালে ব্রাহ্মণ বা কায়স্থদেরও 'দাস' পদবি ছিল। তাই বিদ্রোহীদের নির্দিষ্টভাবে চাষী-কৈবর্ত জাতিভুক্ত বলে চিহ্নিত করা সম্ভবত সঠিক নয়। ***ড. নীহাররঞ্জন রায়***-এর মতে, এই বিদ্রোহীরা ছিল জেলে-কৈবর্ত জাতিভুক্ত। ***ড. বি. সি. সেনের*** বক্তব্যে এই মতের সমর্থন পওয়া যায়। ড. সেন এই বিদ্রোহের আর্থ-সামাজিক চরিত্র তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, মৎস্যজীবী কৈবর্তদের সাথে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পাল রাজাদের স্বার্থ-সংঘাত ছিল। অহিংস পালরাজারা মৎস্য ভক্ষণকারী কোন মানুষের পক্ষে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ নিষিদ্ধ করলে জেলে-কৈবর্তদের জীবিকার সংকট ঘনীভূত হয়। তাদের সামাজিক অস্তিত্ব বিপন্ন হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এই অবস্থায় তারা পাল শাসনের অবসান কামনা করে এবং পাল রাজাদের গৃহযুদ্ধের সুযোগে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তবে ***ড. কে. এস. চৌধুরী*** এ বিষয়ে কিছুটা ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, পালরাজারা বৌদ্ধ হলেও তাঁদের কোনরূপ ধর্মীয় গোঁড়ামি ছিল না। তাছাড়া, পালযুগে বৌদ্ধধর্ম তান্ত্রিক হিন্দু ধর্মের এতটাই কাছাকাছি এসেছিল যে, মৎস্যভক্ষণ সম্পর্কে এমন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। অবশ্য অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদ্ ***ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত*** মনে করেন, যে পালরাজাদের কিছু রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত হয়তো কৈবর্তদের বংশানুক্রমিক উপার্জনের পথে কিছু প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল, যা শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহে রূপান্তরিত হয়।

অধ্যাপক ***রমেশচন্দ্র মজুমদার*** এই বিদ্রোহের রাজনৈতিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে, তৃতীয় বিগ্রহপালের মৃত্যুর পর পাল সাম্রাজ্যে যে অস্থিরতা শুরু হয়েছিল তাতে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব শিথিল

হয়। পালবংশের গৃহযুদ্ধ এক রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি করে। এর ফলে সামন্ত শাসকেরা পাল বংশের উপর আস্থাহীন হয়ে পড়েন। এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি লাভের জন্য তাঁরা বিক্ষুব্ধ কৈবর্ত নেতা দিব্যকে সমর্থন জানান। দিব্য সু-প্রশাসক রূপে মানুষের হৃদয়ে ইতিমধ্যেই ঠাঁই করে নিয়েছিলেন। এখন বিক্ষুব্ধ সামন্তরা তাঁকেই রাজপদে বসিয়ে জনগণের ইচ্ছাপূরণ করেন। সম্ভবত এই কারণে এখনও উভয়বঙ্গে দিব্যকে মহাপুরুষ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং 'দিব্য স্মৃতি' উৎসব উদযাপনের মাধ্যমে তাঁকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।

ড. যদুনাথ সরকার, উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল প্রমুখ এই মত সমর্থন করে বলেছেন যে, দ্বিতীয় মহীপালের দুর্বল ও অত্যাচারী শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ছিল এই বিদ্রোহ। দিব্য নিজ দক্ষতায় সামন্তদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তবে বিদ্রোহীদের কোন জাতিগত ভিত্তি সম্ভবত ছিল না। এটি ছিল স্পষ্টতই একটি রাজনৈতিক কর্মসূচী। সাধারণ মানুষ বিদ্রোহী সামন্তদের পরোক্ষে সমর্থন করেছিলেন। বিদ্রোহীদের সকলেই কৈবর্ত ছিলেন না, হয়তো সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিলেন চাষী-কৈবর্ত জাতির অন্তর্ভুক্ত। তবে *ড. মজুমদার* মনে করেন যে, দ্বিতীয় মহীপাল দুর্বল ও অত্যাচারী ছিলেন, একথা নির্দিষ্টভাবে বলা যায় না। তাছাড়া রামপালের প্রতি আস্থাবশত সামন্তরা ক্ষমতা দখলকারী দ্বিতীয় মহীপালের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন, একথাও নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। কারণ বিদ্রোহীরা বিজয়ী হবার পরেও রামপালকে সিংহাসনে বসাননি। সিংহাসন পেয়েছিলেন দিব্য। অর্থাৎ রাজনৈতিক প্রয়োজন থেকেই বিদ্রোহ সংঘটিত হয় এবং বিদ্রোহের পরের সিদ্ধান্তও ছিল রাজনৈতিক।

সন্ধ্যাকর নন্দী তাঁর 'রামচরিত' গ্রন্থে এই বিদ্রোহকে 'অনিকম্ ধর্মবিপ্লবম্' বলে বর্ণনা করেছেন। 'অনিকম্ ' শব্দের অর্থ 'অপবিত্র'। অর্থাৎ দিব্যর কাজটি ছিল অপবিত্র বা অনৈতিক একটি ঘটনা। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন যে, রাজা দ্বিতীয় মহীপাল এক সম্মিলিত সামন্তচক্রের (মিলিতান্তক সামন্তচক্র) সাথে যখন যুদ্ধে লিপ্ত হন তখন দিব্য রাজার পক্ষেই ছিলেন। যুদ্ধের মাঝপথে দিব্য তাঁর অনুগামী বৃন্দসহ বিরোধী পক্ষে যোগ দেন। আসলে তাঁর লক্ষ্য ছিল রাজা ও সামন্তদের এই বিরোধকে কাজে লাগিয়ে ব্যক্তিগতভাবে ক্ষমতা দখল করা। তাই সন্ধ্যাকর দিব্যর কাজকে অনৈতিক বলে অভিহিত করেছেন। তবে সামন্তরা স্বেচ্ছায় দিব্যকে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন, নাকি রাজা ও সামন্তদের বিরোধ ও শক্তিক্ষয়ের সুযোগে তিনি অন্যায়ভাবে ক্ষমতা দখল করেছিলেন, এ বিষয়ে পরিষ্কার তথ্যের অভাব আছে।

কৈবর্ত বিদ্রোহের উৎস ও প্রকৃতি সম্পর্কে অধ্যাপক শর্মার মূল্যায়নটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে, কৈবর্ত বিদ্রোহের দুটি পর্যায় ছিল। প্রথম পর্যায়ে বিপ্লবের নেতৃত্ব দেন দিব্য। সম্ভবত দিব্য গুরুত্বপূর্ণ রাজকার্যে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু মহীপালের বিরুদ্ধে প্রজাদের বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কিনা তা স্পষ্ট নয়। মহীপাল ও সামন্তদের মধ্যে সম্পর্কে তিক্ততা ছিল। মহীপাল অত্যাচারী ছিলেন কিনা, সে বিষয়েও ড. শর্মা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তবু তাঁর দুর্বল শাসন ও যুদ্ধে আবিষ্টতার কারণে হয়তো সামন্ত-প্রজাদের ক্ষোভ ছিল। যাই হোক, মহীপাল ও সামন্ত-প্রজাদের এই বিরোধে তৃতীয় পক্ষ হিসেবে দিব্য ও তাঁর সম্প্রদায়ের মানুষেরা যোগ দিয়েছিলেন এবং মহীপালকে হত্যা করে ক্ষমতা দখল করেছিলেন। হয়তো এজন্য ব্রাহ্মণ শ্রেণী দিব্যকে

'প্রতারকদস্যু' ('উপাধিব্রতী') বলে ঘৃণা প্রকাশ করত। দুর্বল সামাজিক ভিত্তির জন্য দিব্যর শাসন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।[1] কৈবর্ত বিদ্রোহের দ্বিতীয় পর্বের নেতৃত্ব দেন দিব্যর ভ্রাতুষ্পুত্র ভীম। রামপালের (১০৭৭-১১২০ খ্রীঃ) বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ সফল হয়নি। কিন্তু ভীমের বিদ্রোহ পূর্বাপেক্ষা ছিল অধিক গণমুখী। ড. শর্মার মতে, ভীমের নেতৃত্বাধীন কৈবর্তদের মধ্যে উপজাতীয় অস্তিত্ব বজায় ছিল। এই প্রসঙ্গে ড. শর্মা এই বিদ্রোহকে ভূমিসত্ত্ব ভোগীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৈবর্ত-কৃষকদের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি লিখেছেন, খুব সম্ভবত কৈবর্তরা তাদের জমি ফেরত পেতে চেয়েছিল। কারণ তাদের জমি মহীপাল পুনর্গ্রহণ করে বৌদ্ধদের দান করেছিলেন। একই সঙ্গে পালরাজাদের চাপিয়ে দেওয়া করের বোঝা থেকে মুক্তি পাওয়াও ছিল বিদ্রোহীদের লক্ষ্য। যদিও পাল শাসনের অন্তর্বর্তীকালে কিছুদিনের জন্য ক্ষমতাসীন হলেও সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই বিদ্রোহ কোন পরিবর্তন আনতে পারেনি। বহু পরে সেন রাজাদের আমলে কৈবর্তদের সামাজিক অবস্থানকে উন্নত করার কিছু প্রয়াস গৃহীত হয়। 'বল্লালচরিত' থেকে জানা যায় যে, রাজা কৈবর্তদের সামাজিক অবস্থান উন্নত করেছিলেন।

ড. মজুমদারের মতে, কৈবর্ত বিদ্রোহকে পাল রাজত্বের পতনের কারণ হিসেবে বিবেচনা না করে তার ফল হিসেবে গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। নিছক গোষ্ঠীগত আকাঙ্ক্ষা থেকে গড়ে ওঠা এই বিদ্রোহ ছিল নিষ্ফলা ও ক্ষণস্থায়ী। সামন্তরা প্রাথমিকভাবে রাজার বিরুদ্ধে গেলেও, শেষ পর্যন্ত তাঁদের সমর্থন ও সাহায্য নিয়েই রামপাল বরেন্দ্রী পুনর্দখল করতে ও পাল শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কৈবর্ত বিদ্রোহের গুরুত্ব এটুকুই যে, শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়ার পরিণতি রাজদণ্ড অধিকারের মধ্যেই সমাপ্ত হয়েছিল। ড. শর্মাও মনে করেন যে, এগালাটেরিয়ান (Egalaterian) মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হলেও কৈবর্ত বিদ্রোহ সামাজিক সম্পর্ক বা উৎপাদন সম্পর্কের পুনর্গঠনের কোন নতুন পথ দেখাতে পারেনি।

✪ রামপাল (১০৭৭-১১৩০ খ্রীঃ) ঃ সামন্তদের বিদ্রোহজনিত অস্থিরতার সুযোগে শূরপাল ও রামপাল কারাগার থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁরা সম্ভবত মগধে গিয়ে পাল শাসনের সূচনা করেন। প্রথমে সিংহাসনে বসেন শূরপাল। তারপর রাজা হন রামপাল। এদিকে দিব্যোকের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই রুদ্দোক ও পুত্র ভীম যথাক্রমে বরেন্দ্রের সিংহাসনে বসেন। ভীম ছিলেন তুলনামূলক ভাবে দুর্বল শাসক। এই সময়ে রামপাল বরেন্দ্র পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হন। এ কাজে তিনি তাঁর সামন্তরাজাদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। 'রামচরিত' থেকে আমরা জানতে পারি যে, তিনি ভূমি ও ধনসম্পদের লোভ দেখিয়ে তাদের বশীভূত করেন। তারপর তাদের সাহায্যে এক শক্তিশালী বাহিনী গড়ে তোলেন। এ বিষয়ে প্রধান সহায় ছিলেন তাঁর মাতুল রাষ্ট্রকূটরাজ অঙ্গপতি মোহন। তিনি তাঁর দুই পুত্র মহামাণ্ডলিক কাহ্নুরদেব ও সুবর্ণদেব এবং ভ্রাতুষ্পুত্র মহাপ্রতিহার শিবরাজকে সাথে নিয়ে রামপালের পক্ষে যোগ দেন। অন্যান্য সামন্তদের একটি তালিকা রামচরিতে প্রদত্ত হয়েছে। সেখানে নিম্নলিখিত রাজাদের নাম পাওয়া যায়—

(১) মগধ ও পিথীর রাজা *ভীমযশ*। (২) কোটাটবীর রাজা *বীরগুণ*। *অধ্যাপক মজুমদার*-এর মতে, পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার কয়েক মাইল পূর্বে অবস্থিত কোটেশ্বর গ্রামই কোটাটবী।

(৩) দণ্ডভুক্তির রাজা *জয়সিংহ*—দণ্ডভুক্তি হল মেদিনীপুরের দাঁতন। (৪) দেবগ্রাম সংযুক্ত বালবলভীরাজ *বিক্রম*। (৫) আটবিক সামন্ত চূড়ামণি অপারমন্দাররাজ *লক্ষ্মীশূর*। অপার মন্দার হল হুগলী জেলার গড় মান্দারণ। (৬) কুবুবটির শূরপাল। কুবুবটি সাঁওতাল পরগনার নয়াদুমকার উত্তরে অবস্থিত। (৭) তৈলকম্পরাজ *রুদ্রশিখর*। তৈলকম্প হল ধানবাদ পুরুলিয়ার তেলকূপি। (৮) উচ্ছলরাজ ভাস্কর। পঞ্চানন মণ্ডলের মতে, উচ্ছল হল বর্ধমান জেলার উচালন গ্রাম। (৯) ঢেক্করীরাজ *প্রতাপসিংহ*। ঢেক্করীকে বর্ধমান জেলার ঢেকুরী গ্রামের সাথে সনাক্ত করা যায়। (১০) কয়ঙ্গল মণ্ডলের অধিপতি *নর-সিংহার্জুন*। কয়ঙ্গল অর্থাৎ কজঙ্গল হল রাজমহলের দক্ষিণে অবস্থিত কাঁখজোল। (১১) সঙ্কটগ্রামের রাজা *চণ্ডার্জুন*। (১২) নিদ্রাবলীর *বিজয়রাজ*। অনেকের মতে, ইনি সেনবংশীয় বিজয়সেন। তা যদি হয় তবে নিদ্রাবলী রাঢ় যা পশ্চিমবঙ্গের কোথাও অবস্থিত ছিল। (১৩) কৌশাম্বীর *রাজা দ্বোরপার্বন*। কৌশাম্বী সম্ভবত বগুরা জেলার কুশুম্বী। (১৪) পদুবন্ধা মণ্ডলের রাজা *সোম*। *ড. সরকারের* মতে, পদবন্ধা হল বর্তমান পাবনা। এছাড়াও আরো অনেক সামন্তরাজা রামপালের সাথে যোগদান করেন বলে 'রামচরিতে' বলা হয়েছে।

উপরোক্ত রাজাদের অধিকাংশই বসতিস্থান ছিল দক্ষিণ বিহার ও দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গ। একমাত্র কৌশাম্বী ছাড়া বরেন্দ্রের কোন সামন্তরাজা রামপালের পক্ষে যোগ দেননি। যাই হোক্, এই সামন্তরাজাদের সাথে মিলিত হয়ে রামপাল বরেন্দ্রী উদ্ধারে যাত্রা করেন। প্রথমে রাষ্ট্রকূট শিবরাজ গঙ্গা পার হয়ে বরেন্দ্রী আক্রমণ করেন। তিনি কিছুটা সাফল্য লাভ করলে রামপাল সেনাবাহিনীর বৃহৎ অংশ-সহ গঙ্গার উত্তরতীরে অবতীর্ণ হয়ে যুদ্ধ শুরু করেন। হস্তীপৃষ্ঠে যুদ্ধরত অবস্থায় ভীম বন্দী হন। কিন্তু এর পরেও ভীমের মিত্র হরি প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে যান। পরিশেষে রামপাল কৌশলে তাদের সপক্ষে আনেন।[1] 'রামচরিত' থেকে জানতে পারা যায় যে, বহুদিন পর পিতৃভূমি উদ্ধার করে রামপাল প্রথমেই সেখানে শান্তিশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে যত্নবান হন। তিনি প্রজাদের করভার লাঘব করেন, কৃষির উন্নতি ঘটান এবং গঙ্গা ও করতোয়ার সঙ্গমস্থলে রামাবতীতে রাজধানী স্থাপন করেন।

পিতৃরাজ্য উদ্ধারের পর রামপাল নিকটবর্তী রাজ্যগুলি জয় করতে সচেষ্ট হন। রামচরিতে বলা হয়েছে যে, পূর্বাঞ্চলের বর্মনরাজ নিজের নিরাপত্তার জন্য উৎকৃষ্ট হস্তী ও রথ উপহার দিয়ে রামপালকে সন্তুষ্ট করেছিলেন। এই বর্মনরাজকে হরিবর্মনের সাথে সনাক্ত করা যায়। রামপাল কামরূপও জয় করেন বলে 'রামচরিত' থেকে জানা যায়। এই সময়ে কামরূপের রাজা ছিলেন ধর্মপাল। রামপাল উড়িষ্যা জয়েও প্রবৃত্ত হন। একই উদ্দেশ্যে পূর্বগঙ্গরাজ অনন্তবর্মন চোড় গঙ্গ ও উড়িষ্যা আক্রমণ করেন। এই সময়ে কুলোত্তুঙ্গ চোল গঙ্গরাজ্যে অভিযান চালালে তা রামপালের পক্ষে সহায়ক হয়। সম্ভবত গঙ্গদের বিরুদ্ধে জয়লাভের জন্য তিনি কুলোত্তুঙ্গের সঙ্গে বশ্যতামূলক সন্ধি স্থাপন করেন। কারণ তামিলকাব্য 'কলিঙ্গত্তু পরণি'-তে বলা হয়েছে যে, বঙ্গ, বঙ্গাল, মগধের নৃপতি কুলোত্তুঙ্গকে কর দিতেন। এইভাবে রামপাল কলিঙ্গ পর্যন্ত জয় করেন। এছাড়া বারাণসী অঞ্চলে রাজত্বকারী প্রতিবেশী গাহড়বাল শক্তির সঙ্গেও তিনি সংঘর্ষে লিপ্ত হন। এই সংঘর্ষে কখনো রামপাল, কখনো গাহড়বালরাজ গোবিন্দচন্দ্র জয়ী হতে থাকেন। পরিশেষে

রামপাল গাহড়বালদের প্রতিহত করতে সমর্থ হন। তবে তিনি মিথিলার নান্যদেবকে প্রতিহত করতে পারেননি। মিথিলা তাঁর হস্তচ্যুত হয়েছিল।

'চণ্ডীমৌ লিপি' অনুযায়ী রামপাল ৪২ বছর রাজত্ব করেছিলেন। 'রামচরিত' থেকে জানা যায় যে, পরম শুভানুধ্যায়ী মাতুল রাষ্ট্রকূটরাজ মোহনের মৃত্যুতে তিনি গভীর শোকগ্রস্ত হন ও গঙ্গার জলে প্রাণ বিসর্জন দেন।

নির্বাসনে জীবন শুরু করেও অসীম মনোবলের দ্বারা রামপাল পাল সাম্রাজ্যের হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। খণ্ড-বিখণ্ড ও অন্তর্দ্বন্দ্বে দীর্ণ সাম্রাজ্যকে গ্রথিত করে তিনি কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন। তিনিই ছিলেন পালবংশের শেষ দক্ষ নৃপতি। তাই ড. ***মজুমদার*** (R. C. Majumdar) তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, "*The reign of Rampal was the fickering of the lamp before its final extinction.*" তবে সহজাত ত্রুটি ও অন্তর্দৃষ্টির অভাবহেতু রামপাল তাঁর কাজকে স্থায়িত্ব দিতে পারেননি। সামন্তদের শক্তি কমানোর কোন চেষ্টা তিনি করেননি, বা কার্যকরী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনও করেননি। তাই তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই পাল সাম্রাজ্য দ্রুত ভেঙে পড়ে।

○ রামপাল পরবর্তী শাসকগণ ঃ

পাল সাম্রাজ্যের পতন ঃ রামপালের পরবর্তী পাল সম্রাটগণ ছিলেন অযোগ্য। রামপালের পর রাজা হন তাঁর পুত্র ***কুমারপাল***। তাঁর সময়েই কামরূপে স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হয়। পূর্ববঙ্গ পাল অধীনতা অস্বীকার করে। এর পরে রাজা হন তৃতীয় গোপাল ও তারপর মদনপাল। সেনরাজ বিজয়সেন এই মদনপালকেই পরাস্ত করে গৌড় অধিকার করেন। ফলে মদনপালের রাজ্য বিহারের সামান্য অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এরও পরে রাজা হন গোবিন্দপাল (১২৬২-৬৫ খ্রীঃ). ইনি গয়া অঞ্চলে রাজত্ব করতেন। পরিশেষে এখান থেকেও সেনগণ তাদের বিতাড়িত করলে পাল সাম্রাজ্যের অবসান হয়।

○ পালযুগের অবদান ঃ

বাংলাদেশে পালরাজাদের দীর্ঘ চারশো বছরের শাসন নানাকারণে স্মরণীয় হয়ে আছে। ***ড. মজুমদারের মতে,*** *"এই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ফলেই বাঙালীর নতুন জাতীয় জীবনের সূত্রপাত হয়। বাংলার রাজনীতি, শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই পাল-রাজাদের অবদানে উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছিল।"* ড. ***মজুমদারের*** *মতে, "অষ্টম শতাব্দীতে পাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা বাঙালীজাতি, তার ভাষা ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের প্রশ্নাতীতভাবে এক যুগান্তকারী ঘটনা।"* ***("The establishment of Pala empire in the eighth century is unquestionably an poch making event in the evolution of the Bengali people and their language and culture.")*** ড. ***নীহাররঞ্জন*** *রায়ের মতে, "বাঙালীর জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে পালরাজারা কৃতিত্বের দাবি করতে পারেন।"* একথা ঠিক, পালরাজাদের দক্ষতার ফলেই বাংলা যেমন সর্বপ্রথম আঞ্চলিক শক্তির পরিবর্তে সাম্রাজ্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল, তেমনি শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উত্তর-ভারতের ক্রমবর্ধমান ধারার সঙ্গে যুক্ত হতে পেরেছিল।

বাংলার ইতিহাসে পালবাজাদের সর্বপ্রথম ও প্রধান অবদান হল রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা, অরাজকতা ও অনিশ্চয়তার অবদান ঘটানো এবং প্রকৃত অর্থেই বাংলাকে এক শক্তিশালী রাজ্যে

পরিণত করা। যে 'মাৎস্যন্যায়' অবস্থা বাঙালীর জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল, তা থেকে দেশবাসীকে উদ্ধার করার জন্য পালরাজারা অবশ্যই চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। শুধু তাই নয়, ধর্মপাল ও দেবপাল তাঁদের দক্ষতা ও প্রচেষ্টার দ্বারা দাক্ষিণাত্যের দুর্ধর্ষ রাষ্ট্রকূট ও প্রতিহার-রাজাদের সাথে সাফল্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কনৌজ দখল করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শুধু স্বদেশে নয়, বিদেশের সাথেও তাঁরা বাংলার যোগসূত্র স্থাপন করেছিলেন। পালরাজাদের ক্রমবর্ধমান সাফল্যের ফলে বাংলার রাষ্ট্রীয় গৌরব যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল।

পালযুগে বাংলার সমাজজীবন ছিল সহজ, সরল এবং অনাড়ম্বর। হিউয়েন সাঙ সমতটের অধিবাসীদের শ্রমসহিষ্ণুতা, তাম্রলিপ্তের অধিবাসীদের চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং কর্ণসুবর্ণের অধিবাসীদের অমায়িকতা ও বাঙালীর বিদ্যোৎসাহিতার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

পালযুগে রমণীগণ ছিল মৃদু, শান্ত, সুভাষিণী এবং সুন্দর। মহিলাদের মধ্যে পর্দাপ্রথার প্রচলন থাকলেও তা কঠোরভাবে পালিত হত না। মেয়েদের মধ্যে লেখাপড়ার প্রচলনও ছিল। এ যুগেই 'দায়ভাগ' আইন অনুসারে স্বামীর সম্পত্তিতে বিধবা স্ত্রীর অধিকার স্বীকৃত হয়। অবশ্য এর জন্য তাকে পবিত্র বৈধব্য জীবনযাপন করতে হত। সাধারণভাবে একপত্নী গ্রহণই নিয়ম ছিল। তবে উচ্চবিত্ত ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে বহুবিবাহও প্রচলিত ছিল। অসবর্ণ বিবাহের দৃষ্টান্তও বিরল ছিল না। মেয়েদের পাতিব্রত্যের উপর সে যুগে বিশেষ জোর দেওয়া হত।

পালরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ঐ যুগে শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি ঘটেছিল। পালরাজাদের প্রত্যক্ষ সাহায্য ও সহানুভূতি নিয়ে গড়ে উঠেছিল 'বিক্রমশীল-বিহার' ও 'নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়'। এগুলিতে দেশ-বিদেশের বহু ছাত্রী নানাবিষয়ে পঠন-পাঠন করতে পারত। পালযুগেই বাংলাদেশে সংস্কৃত সাহিত্যে অলঙ্কারবহুল গৌড়রীতির উদ্ভব হয়। এই যুগে বাঙালী গ্রন্থকারদের মধ্যে চতুর্বেদে অভিজ্ঞ দণ্ডপানি, 'মুদ্রারাক্ষস' প্রণেতা বিশাখদত্ত, 'দায়ভাগ' রচয়িতা জীমূতবাহন, 'রামচরিত'-রচয়িতা সন্ধ্যাকর নন্দী প্রমুখ ছিলেন উল্লেখযোগ্য। 'রামচরিত' পালযুগে রচিত একমাত্র কাব্যগ্রন্থ। এর প্রতিটি পদের দু'রকম অর্থ ছিল। পৃথক পৃথক ভাবে বর্ণ-বিন্যাস ও শব্দ যোজনা করলে এটি একদিকে রামায়ণের রামচন্দ্র ও অপরদিকে পালরাজা রামপালের জীবনী বর্ণনা করেছে। শূরপাল ও বঙ্গসেন চিকিৎসাশাস্ত্রের উপর মৌলিক গ্রন্থও পালযুগে রচনা করেছেন। চক্রপানি দত্তের 'চিকিৎসা সংগ্রহ'ও চিকিৎসা-বিষয়ক একটি অমূল্য গ্রন্থ।

পালযুগে বাংলাভাষার নবজন্ম ঘটেছিল। 'মাগধ' ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পালযুগেই বাংলাভাষা তার স্বতন্ত্র রূপ পরিগ্রহ করে। মাগধী ও সৌরসেনী ভাষার মিশ্রণে এই ভাষা আপন বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর হয়ে ওঠে। এই স্বতন্ত্র ধারায় লিখিত প্রথম বাংলাভাষা *'চর্যাপদ'* নামে খ্যাত।

পাল আমলে বাংলার স্থাপত্য-শিল্পেও নবযুগ সূচিত হয়েছিল ; স্বতন্ত্র নির্মাণশৈলীর জন্য পরবর্তী কয়েক শতক বাংলার শিল্প 'পালযুগের শিল্প' নামে অভিহিত হত।

পালযুগে স্থাপত্য, শিল্প-নিদর্শনের অধিকাংশই ধ্বংস হয়ে গেছে। তবুও ধ্বংসস্তূপ থেকে যে নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে তা আমাদের বিস্মিত করে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ও তিব্বতের বহু বিহার পালযুগে নির্মিত সোমপুর বিহার ও উদন্তপুর বিহারের অনুকরণে নির্মিত হয়েছিল বলে পণ্ডিতদের ধারণা। সোমপুর বিহারটি ছিল সম্ভবত পাঁচতল ও ষোল কোণবিশিষ্ট। চারদিকে ছিল চারটি

সিংহদরজা ও চারটি গর্ভগৃহ। এছাড়া, পাহাড়পুরের বিহারটিও ছিল পালযুগের অনন্য কীর্তি। ড. নীহাররঞ্জন রায়ের মতে, এটি ছিল প্রাচীন বাংলার স্থাপত্যশিল্পের বিস্ময়।

পালযুগের ভাস্কর্যের প্রধান ক্ষেত্র ছিল সাধারণ মানুষের জীবনধারা ; দেব-দেবীর নয়। পোড়ামাটি ও কালোপাথরের উপর নির্মিত এইসব মূর্তি ছিল স্বাভাবিক ও সজীব। এছাড়া, ব্রোঞ্জ ও পাথর খোদাই করেও ভাস্কর্য নির্মিত। চিত্রশিল্পেও পালযুগ অগ্রণী ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মহাযান-বজ্রযান-হীনযান প্রভৃতি বৌদ্ধধর্মকে কেন্দ্র করে চিত্রগুলি রচিত হয়েছিল। চিত্রগুলির রচয়িতাগণ নিঃসন্দেহে প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক ছিলেন। পালযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পী ছিলেন বীতপাল ধীমান।

পালযুগে ধর্মের ক্ষেত্রেও পুনরুজ্জীবনের আভাস পাওয়া যায়। পালরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্মের পুনরুত্থান ঘটেছিল। এই সময় নির্মিত হয়েছিল বহু বৌদ্ধমঠ ও বিহার। বৌদ্ধ আচার্য অতীশ দীপঙ্কর (শ্রীজ্ঞান) পালরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে গমন করেছিলেন, তবে কোনরূপ ধর্মীয় গোঁড়ামি পালরাজাদের ছিল না।

এইভাবে রাজনীতি, সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পালযুগে বাংলার অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটেছিল। তাই *ড. স্মিথ* যথার্থই বলেছেন, ভারতের রাজবংশগুলির ইতিহাসে বাংলার পালবংশ বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। তাঁর ভাষায় ঃ *"The Pal dynasty deserves to be remembered as one of the most remarkable of the Indian dynasties."*

○ ত্রি-শক্তি সংঘর্ষ ঃ

প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে বর্তমান উত্তরপ্রদেশের ফারুদাবাদ জেলায় অবস্থিত 'মহোদয়' বা কনৌজ একদা 'সাম্রাজ্যবাদের আসন ও প্রতীক'-এ পরিণত হয়েছিল। কনৌজের রাজনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে শুরু করে হর্ষবর্ধন কর্তৃক সেখানে রাজধানী স্থাপনের পর থেকে। পরে মৌখরী বংশীয় জনৈক যশোবর্মনের আমলে গুরুত্ব ও মর্যাদা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। তিনি সম্ভবত আরবদের আক্রমণ থেকে কনৌজকে রক্ষা করেছিলেন। অষ্টম ও নবম শতকে কনৌজের রাজনৈতিক গুরুত্ব অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায়।

কনৌজের গুরুত্ব বৃদ্ধির পিছনে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ বিদ্যমান ছিল। মৌর্য বা গুপ্ত সাম্রাজ্যেব পতনের পরে 'সাম্রাজ্যের' সংজ্ঞা কিছুটা সংকুচিত হয়ে পড়েছিল। সমগ্র ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব স্থাপনের পরিবর্তে শুধুমাত্র উত্তর-ভারতে বা শুধুমাত্র দক্ষিণ-ভারতে একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপনকেই তৎকালীন নরপতিরা লক্ষ্য হিসেবে স্থির করে নিয়েছিলেন। বলা যেতে পারে, উত্তর-ভারত দক্ষিণ-ভারতের রাজনৈতিক কর্তৃত্বের প্রশ্নে এক অলিখিত চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। হর্ষবর্ধনের পরবর্তীকালে উত্তর-ভারতের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব স্থাপনই উচ্চাকাঙ্ক্ষী নরপতিদের লক্ষ্যে পর্যবসিত হয়েছিল এবং উত্তর-ভারতের কর্তৃত্বের প্রশ্নে কনৌজের উপর অধিকার স্থান করা ছিল মর্যাদার প্রতীক। *"পশ্চিম এশিয়ার যোদ্ধা জাতিদের কাছে যেমন ব্যাবিলন, টিউটনিক জাতিদের কাছে যেমন রোম ছিল লক্ষ্যবস্তু, তেমনি অষ্টম ও নবম শতকের ভারতীয় রাজবংশগুলির কাছে কনৌজ বা কান্বকুব্জ অধিকার ছিল চূড়ান্ত মর্যাদার লক্ষ্যবস্তু।"* একইভাবে কনৌজের অর্থনৈতিক গুরুত্বও ভারতীয় রাজাদের কনৌজ দখলে

প্ররোচিত করেছিল। কনৌজ যার দখলে থাকবে তার পক্ষে গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চলের উর্বর ভূমির সম্পদ আহরণ করা সহজসাধ্য হত। এইসব কারণে অষ্টম শতকে কনৌজ দখলের প্রশ্নে এক দীর্ঘস্থায়ী ত্রি-শক্তি সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল। এই ত্রি-শক্তি ছিল উত্তর-ভারতের পালবংশ ও গুর্জর-প্রতিহার বংশ এবং দক্ষিণ-ভারতের রাষ্ট্রকূট বংশ। এই ত্রি-শক্তি সংগ্রাম প্রায় দুইশত বৎসর স্থায়ী হয়েছিল।

অষ্টম শতকের শেষ পাদে পাল, প্রতিহার ও রাষ্টকূট বংশ প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠে এবং স্ব-স্ব ক্ষমতা বিস্তারে উদ্যোগ নিলে তাদের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠে। কনৌজের অধিকারকে কেন্দ্র করে উত্তরের পাল ও প্রতিহার শক্তির সংঘর্ষ ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু দক্ষিণের রাষ্ট্রকূট শক্তি এই দ্বন্দ্বে যোগদান করে এর গুরুত্ব বাড়িয়ে দেয়। সম্ভবত রাষ্ট্রকূটগণ উত্তর-ভারতে পাল বা প্রতিহার কোন একটি শক্তিকে একচ্ছত্র হতে দিতে চায়নি। কারণ সেক্ষেত্রে ওই শক্তি দ্বারা দক্ষিণ-ভারতে রাজ্য বিস্তারের সম্ভাবনা সৃষ্টি হতে পারত। তাই রাষ্ট্রকূটরা প্রতিরোধমূলক পন্থা হিসেবে কনৌজের দিকে হাত বাড়িয়েছিল।

দীর্ঘস্থায়ী ত্রি-শক্তি সংঘর্ষের ক্রমপরম্পরা নির্ণয় করা কঠিন। সম্ভবত কনৌজকে কেন্দ্র করে পাল ও প্রতিহার শক্তির মধ্যে প্রথম যুদ্ধ হয়। বাংলাদেশের পালরাজা ধর্মপাল নিজ ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করার পর পশ্চিমদিকে অগ্রসর হতে শুরু করেন। একই সময়ে প্রতিহার-রাজ বৎস মধ্য ভারতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে পূর্বদিকে অগ্রসর হতে শুরু করেন। ফলে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। গাঙ্গেয় দোয়াব অঞ্চলের যুদ্ধে ধর্মপাল প্রতিহাররাজ বৎসের নিকট পরাজিত হন। প্রতিহাররাজের জয়লাভ ও ক্ষমতা-বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব উত্তর-ভারত অভিযান করেন। বৎস পরাজিত হন ধ্রুবর হাতে। অতঃপর বৎসরাজ রাজপুতনার মরু অঞ্চলে পালিয়ে যান। রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব দোয়াব পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং ধর্মপালকেও পরাজিত করেন।

এই যুদ্ধে বস্তুত লাভবান হন ধর্মপাল। কারণ ধ্রুবর হাতে পরাজিত হবার ফলে বৎসরাজ কনৌজ ছেড়ে চলে যান। আবার ধ্রুব কনৌজ দখল করেই দক্ষিণ-ভারতে ফিরে যান। এই সুযোগ নেন ধর্মপাল। তিনি খুব সহজে কনৌজ দখল করতে সক্ষম হন। ধর্মপাল কনৌজের সিংহাসন থেকে ইন্দ্রায়ুধকে বিতাড়িত করে নিজ অনুগত ব্যক্তি চক্রায়ুধকে বসান। কনৌজ ধর্মপালের অধীন, কিন্তু প্রত্যক্ষ শাসনবহির্ভূত একটি অঞ্চলে পরিণত হয়। খালিমপুর লিপি থেকে জানা যায়, ধর্মপাল কনৌজে এক দরবার আয়োজন করলে উত্তর-ভারতের বহু রাজা উপস্থিত হয়ে তাঁর প্রতি বশ্যতা জ্ঞাপন করেন।

তবে ধর্মপাল দীর্ঘকাল কনৌজের উপর স্ব-অধিকার বজায় রাখতে পারেননি। রাজত্বের শেষদিকে কনৌজকে কেন্দ্র করে পুনরায় ত্রি-শক্তি সংঘর্ষের সূচনা হয় এবং এবারেও ধর্মপালের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে। বৎসরাজের পর দ্বিতীয় নাগভট্টের নেতৃত্বে প্রতিহারগণ পুনরায় শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং কনৌজ অধিকারের জন্য অগ্রসর হয়। নাগভট্ট প্রথমে সিন্ধু, বিদর্ভ, অন্ধ্র প্রভৃতি শক্তির সাথে মিত্রতা স্থাপন করেন এবং আকস্মিক আক্রমণ করে কনৌজের সিংহাসন থেকে ধর্মপালের প্রতিনিধি চক্রায়ুধকে বিতাড়িত করেন। এই অবস্থায় ধর্মপাল সম্ভবত রাষ্ট্রকূট তৃতীয় গোবিন্দের সাহায্যপ্রার্থী হন। কারণ রাষ্ট্রকূট রাজকন্যা রন্নাদেবী ছিলেন ধর্মপালের পত্নী। অবশ্য

রাষ্ট্রকূটদের সাহায্য আসতে বিলম্ব হওয়ায় ধর্মপাল একাই কনৌজ পুনরুদ্ধারের জন্য এগিয়ে যান। মুঙ্গেরে উভয় পক্ষ মুখোমুখি হয়। কিন্তু এবারেও ধর্মপাল নাগভট্টের কাছে পরাজিত হন।

তবে নাগভট্ট এই বিজয়কে দীর্ঘস্থায়ী করতে পারেননি। কারণ তাঁর জয়লাভের অব্যবহিত পরেই রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ উত্তরদিকে অভিযান চালান। তাঁর হাতে প্রতিহাররাজ চূড়ান্তভাবে পরাস্ত হন। ধর্মপাল বিনা যুদ্ধে তৃতীয় গোবিন্দের বশ্যতা স্বীকার করে নেন। এবারেও তৃতীয় গোবিন্দ জয়লাভের পরেই দক্ষিণ-ভারতে প্রত্যাবর্তন করে যান। *ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের* মতে, এই সুযোগ নেন ধর্মপাল। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি কনৌজ তথা উত্তর-ভারতে নিজ প্রতিপত্তি বজায় রাখতে সক্ষম হন। তবে আধুনিক গবেষকরা ড. মজুমদারের সাথে একমত হতে পারেননি। তাঁদের মতে, প্রতিহাররাজের কাছে বার বার পরাজয় বরণ এবং রাষ্ট্রকূটরাজের কাছে বশ্যতা স্বীকার করার ফলে তাঁর সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হয়েছিল এবং অধিরাজের আসন থেকে তিনি সরে গিয়েছিলেন।

দীর্ঘস্থায়ী ত্রি-শক্তি সংগ্রামের ফল ছিল সুদূরপ্রসারী। এর ফলে তিনটি শক্তিরই ক্ষতি হয়েছিল। দীর্ঘকাল সংগ্রামে লিপ্ত থাকার ফলে প্রত্যেকেরই সৈন্য ও অর্থক্ষয় ঘটেছিল। যুদ্ধের বিপুল ব্যয় সামাল দিতে প্রত্যেকেই জনগণের উপর করের বোঝা বাড়াতে বাধ্য হয়েছিল। তাছাড়া তিনটি শক্তির পারস্পরিক দ্বন্দ্বের সুযোগে সামন্তরাজারা স্বাধীনতাকামী হয়ে উঠেছিল।

○ সেন বংশের শাসন ঃ

একাদশ শতকের অন্তিমভাগে বাংলাদেশে সেন বংশের উত্থান বাংলার ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট অধ্যায়। সেনরাজাদের পূর্বপুরুষরা দক্ষিণ ভারত থেকে বাংলায় আসেন বলে অনেকের ধারণা। বিজয়সেনের দেওপাড়া লেখতে বলা হয়েছে যে, দাক্ষিণাত্যের চন্দ্রবংশীয় রাজাগণের অন্যতম বীরসেন ছিলেন তাঁর পূর্বপুরুষ।[1] সেনরাজাদের লিপিতে তাঁরা নিজেদের ব্রাহ্ম-ক্ষত্রিয় বলে উল্লেখ করেছেন। তাই মনে হয় তাঁরা প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিলেন পরে ক্ষত্রিয়তে পরিণত হন। বংশ পরিচয়ের মত এঁদের বাংলায় আবির্ভাব সম্পর্কেও মতভেদ আছে। অধিকাংশের মতে, একাদশ শতকে কর্ণাটের চালুক্যরা যখন বাংলাদেশ আক্রমণ করেন, তখন তাদের সেনাবাহিনীর সদস্য হিসেবে সেনরা বাংলায় আসেন এবং এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। আবার অনেকের মতে, রাজেন্দ্র চোলের সেনাবাহিনীর সদস্যরূপেই সেনরা প্রথম বাংলায় আসেন। কেউ কেউ মনে করেন, সেনবংশীয় ব্যক্তিরা পাল রাজাদের আমলে উচ্চ-রাজপদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। পরে পালবংশের দুর্বলতার সুযোগে এদেশে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

সামন্ত সেন ছিলেন সেন কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠাতা। তবে তিনি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে মনে হয় না। তাঁর পুত্র হেমন্ত সেন প্রথমে রাঢ় অঞ্চলে নিজ কর্তৃত্ব বিস্তার করেন। হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেনের আমলে সেনবংশ বাংলায় স্বাধীন সাম্রাজ্য স্থাপনে সক্ষম হয়।

○ বিজয় সেন ঃ বিজয় সেনের রাজত্বকাল সম্পর্কে জানার জন্য নির্ভরযোগ্য উপাদান হল ব্যারাকপুর তাম্রশাসন ও দেওপাড়া প্রশস্তি। রামপালের মৃত্যুর পর পালবংশের দুর্বলতার সুযোগে বিজয়সেন বাংলার উপর নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি রাঢ়ের শূরবংশীয়া

১। পাল-সেন বংশানুচরিত—(পৃষ্ঠা ১১৩)।

রাজকন্যা বিলাসদেবীকে বিবাহ করে নিজের হাত শক্ত করেন। রাজ্যারম্ভের প্রথম দিকেই তিনি বর্মনরাজাদের পরাজিত করে পূর্ববঙ্গ নিজ অধিকারে আনেন। কারণ প্রথম দিকের সেন লেখতে *'বঙ্গে বিক্রমপু ভাগে'* কথাটি পাওয়া যায়।

দেওপাড়া লিপিতে বলা হয়েছে যে, বিজয় সেন গৌড়, কামরূপ ও কলিঙ্গরাজকে এবং নান্য, রাঘব, বীর ও বর্ধন নামক কয়েকজন নরপতিকে পরাজিত করেছিলেন। বর্ধন ও বীর হলেন রামচরিতে উল্লেখিত দোরপবর্ধন ও বীরগুণ। এঁরা ছিলেন যথাক্রমে কৌশাম্বী ও কোটাটবীর সামন্ত নৃপতি। নান্য ছিলেন মিথিলার শাসক নানাদেব। রাঘবের প্রকৃত পরিচয় অনিশ্চিত। অনেকে মনে করেন, এই রাঘব ছিলেন কলিঙ্গরাজ অনন্ত বর্মন চোড়গঙ্গের পুত্র। বিজয় সেনের কাছে পরাজিত গৌড়রাজ ছিলেন সম্ভবত মদনপাল। তবে বিজয় সেন গৌড় বিজয় সমাপ্ত করেননি বলেই মনে হয়। কারণ বল্লাল সেনও নয়, একমাত্র লক্ষ্মণ সেনই গৌড়েশ্বর অভিধা গ্রহণ করেছিলেন। কলিঙ্গ সম্পর্কেও একই প্রযোজ্য। লক্ষ্মণ সেন পুরীতে জয়স্তম্ভ স্থাপন করেন। এই কাজ যদি তিনি নিজ রাজ্যকালে স্বাধীনভাবে করে থাকেন তবে কলিঙ্গজয়ের কৃতিত্ব একমাত্র তাঁরই। পূর্ববাংলা জয়ের পর আসামে অভিযান করা, বা তার একাংশ দখল করা হয়তো তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল না। তবে অনেকে মনে করেন, কামরূপরাজই বঙ্গ আক্রমণ করেছিলেন, বিজয় সেন সেই আক্রমণ সাফল্যের সাথে প্রতিহত করেছিলেন।

রামপাল পরবর্তী বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ভগ্নদশার সুযোগে বিজয় সেনই বাংলায় সেনবংশের ভিত্তিপ্রস্তর মজবুত করেন। পরাক্রান্ত রাজবংশ ও রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার দ্বারা তিনি দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনেন। ব্যারাকপুর তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে, তিনি দীর্ঘ ৬২ বছর (১০৯৬-১১৫৮ খ্রীঃ) রাজত্ব করেছিলেন। তিনি দেওপাড়ায় প্রদ্যুম্নেশ্বর শিবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন ও 'অরিরাজ বৃষভশঙ্কর' উপাধি নেন। ড. *মজুমদারের* মতে, বিজয় সেনের নেতৃত্বে বাংলায় সুদিনের সূচনা হয়েছিল।

○ বল্লাল সেন ঃ বিজয় সেনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বল্লাল সেন সিংহাসনে আরোহণ করেন। নৈহাটি পট্ট ও বল্লালচরিত গ্রন্থ থেকে তাঁর রাজ্যকাল সম্পর্কে জানা যায়। অবশ্য বল্লালচরিতের ঐতিহাসিক মূল্য সন্দেহাতীত নয়।

'বল্লালচরিত' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, তিনি মগধ ও মিথিলা জয় করেছিলেন। ভাগলপুরের একটি লেখ থেকেও জানা যায় যে অন্তত মগধের কিয়দংশ তাঁর অধিকারভুক্ত ছিল। তাছাড়া মগধে রাজত্বকারী শেষ পালরাজ গোবিন্দ পাল বল্লাল সেনের রাজত্বকালেই রাজ্যহারা হন। সুতরাং এ বিষয়েও তাঁর কিছুটা কৃতিত্ব ছিল বলে মনে করা যেতে পারে। তাছাড়া তিনি বর্তমান চব্বিশ পরগনা ও মেদিনীপুর জেলার কিয়দংশ সেন সাম্রাজ্যভুক্ত করতে সক্ষম হন।

সাহিত্য-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ও সমাজসংস্কারক হিসেবে বল্লাল সেনের সুখ্যাতি ছিল। তিনি স্বয়ং *'দানসাগর'* ও *'অদ্ভুতসাগর'* নামে দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থ দুটিতে তিনি হিন্দু আচার ও ক্রিয়াকর্মের বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনিই ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থদের মধ্যে কৌলিন্য-প্রথার প্রবর্তন করেছিলেন বলে অনুমান করা হয়। ড. *নীহাররঞ্জন রায়ের* মতে, কৌলিন্য-প্রথার প্রবর্তন করে তিনি জাতিভেদ-প্রথার কঠোরতা বৃদ্ধি করেছিলেন। অনেকের মতে, রাজনৈতিক প্রয়োজনে তিনি এই প্রথার প্রবর্তন করেন। যাই হোক্, এই ঘটনা তাঁর রক্ষণশীল

মানসিকতার পরিচয় দেয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, আধুনিক গবেষকগণ মনে করেন যে, বল্লাল সেন কৌলিন্য-প্রথার প্রবর্তক নন। এই প্রথা বল্লাল সেনের প্রায় পাঁচ-ছয় শত বৎসর পরে বাংলার কুলপঞ্জীর উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছিল। তবে ***দীনেশচন্দ্র সরকারের*** মতে, হয়তো বল্লাল সেন *"আচার, বিনয়, বিদ্যা, বৃত্তি, দান—ইত্যাদি গুণের ভিত্তিতে কয়েকটি ব্যক্তি বা পরিবারকে কুলীন মর্যাদা দান করেছিলেন।"*

বল্লাল সেন চালুক্য রাজকন্যা রামদেবীকে বিবাহ করেছিলেন। তিনি *'অবিরাজ নিঃশঙ্কশঙ্কর'* উপাধি নেন। বল্লাল সেন ছিলেন তান্ত্রিক হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষক। আরাকান, নেপাল, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে তিনি ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করেছিলেন। বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। শেষ বয়সে পুত্র লক্ষ্মণ সেনের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে তিনি গঙ্গাতীরে শাস্ত্রচর্চায় জীবন অতিবাহিত করেন। বল্লাল সেন সম্ভবত ১১৫৮ থেকে ১১৭৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন।

❂ লক্ষ্মণ সেন ঃ লক্ষ্মণ সেন সম্ভবত ১১৭৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১২০৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁর রাজ্যকাল সম্পর্কে জানার জন্য প্রত্নতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক উভয়প্রকার উপাদানই যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত লেখগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো গোবিন্দপুর তর্পনদীঘি, মাধাইনগর, শক্তিপুর, ভাওয়াল প্রভৃতি লেখ। সাহিত্যিক উপাদানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মিনহাজ-উদ্দিন রচিত *'তাবাকৎ-ই-নাসিরি'*। এই গ্রন্থ থেকে লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বের শেষদিককার ঘটনাবলী জানা যায়।

লক্ষ্মণ সেনের লেখ থেকে জানা যায়, তিনি গৌড়, কামরূপ, কাশী ও কলিঙ্গদেশ সেন রাজ্যভুক্ত করেন। পুরী, কাশী ও এলাহাবাদে তিনি জয়স্তম্ভও স্থাপন করেছিলেন। ড. ***মজুমদার*** মনে করেন যে, লক্ষ্মণ সেন এইসব রাজ্য জয় করেছিলেন পিতামহ বিজয় সেনের রাজত্বকালে তাঁর সেনাপতি হিসেবে। সম্ভবত তিনি গাহড়বালরাজ *জয়চন্দ্রকে* পরাজিত করেন ও মগধ থেকে বিতাড়িত করেন। এই বিজয়ের প্রথম পদক্ষেপ ছিল গয়া অধিকার। এরপর তিনি গাহড়বাল রাজ্যের অভ্যন্তরভাগ পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং বিজয়ের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে কাশী ও প্রয়াগে জয়স্তম্ভ স্থাপন করেন। বৃহত্তর রাজনৈতিক স্বার্থে, লক্ষ্মণ সেন যদি গাহড়বালদের পরাজিত না করতেন তবেই ভারতের পক্ষে মঙ্গল হত । কারণ এই সময়ে উত্তর ভারত মুসলমান আক্রমণ কবলিত হয়েছিল। গাহড়বাল শক্তির পক্ষেই শেষ পর্যন্ত তাদের প্রতিরোধের চেষ্টা করার সম্ভাবনা ছিল। লক্ষ্মণ সেন সেই সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করে বিহার ও বাংলায় মুসলিম আক্রমণের পথ প্রশস্ত করে দেন।

লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালের শেষদিকের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো তুর্কী নায়ক কুতুবউদ্দিন আইবকের সেনাপতি ইখতিয়ার-উদ্দিন-মহম্মদ-বিন্-বখতিয়ার-খলজীর বাংলা আক্রমণ ও দখল। মিনহাজ উদ্দিনের রচনা থেকে এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। মিনহাজউদ্দিন ছিলেন দিল্লী-সুলতানির অধীনস্থ উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। পরে তিনি লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী লক্ষ্মণাবতীতে দু' বছরের জন্য বসবাস করেন। এই সময়েই তিনি তাঁর গ্রন্থ রচনার উপাদান সংগ্রহ করেন। মিনহাজউদ্দিনের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, বখতিয়ারের বিহার জয় সম্পূর্ণ হবার পর লক্ষ্মণ সেন এই মুসলমান আক্রমণকারীর বিষয়ে জ্ঞাত হন। রাজ-জ্যোতিষীগণ তাঁকে দেশত্যাগের পরামর্শ দেন, কারণ তাঁরা নাকি গণনার দ্বারা জেনেছেন যে,

তুর্কীগণ ওই অঞ্চলও শীঘ্র অধিকার করবে। কিন্তু লক্ষ্মণ সেন দেশত্যাগ করেননি। তিনি যখন নবদ্বীপে অবস্থান করছেন তখন বখতিয়ার মাত্র ১৮ জন অনুচরসহ নগরে প্রবেশ করেন। নগরে প্রবেশ করে তারা এমনভাবে ধীরভাবে অগ্রসর হতে থাকে যে, নগরবাসী প্রথমে তাদের মুসলমান বণিক মনে করে। এইভাবে বখতিয়ার লক্ষ্মণ সেনের প্রাসাদ দ্বারে পৌঁছান। ইতিমধ্যে বখতিয়ারের বাকি সেনাদল নগরে পৌঁছায়। বৃদ্ধ লক্ষ্মণ সেন তখন মধ্যাহ্নভোজনে বসেছিলেন। নগর আক্রান্ত হয়েছে বুঝতে পেরে নগ্নপদে প্রাসাদের পিছনদ্বার দিয়ে পলায়ন করেন। এইভাবে নদীয়া মুসলিম আক্রমণকারীদের দ্বারা অধিকৃত হয়। লক্ষ্মণ সেন নৌকাযোগে বঙ্গ অভিমুখে প্রস্থান করেন।

বখতিয়ার খলজী মাত্র ১৭/১৮ জন সৈন্য নিয়ে নদীয়া আক্রমণ করেছিলেন কিনা, কিংবা লক্ষ্মণ সেন কাপুরুষের মত প্রাসাদ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন কিনা—বিষয়টি বিতর্কিত। এই কারণে প্রাচীন কাব্য-সাহিত্যে লক্ষ্মণ সেনের চরিত্র ভীরু, কাপুরুষ হিসেবে চিত্রিত হয়েছে। কবি নবীনচন্দ্র সেন লিখেছেন, *"সপ্তদশ অশ্বারোহী যবনের ডরে..... সোনার বাংলা রাজা দিলা বিসর্জন।"* চিত্রশিল্পী সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর তুলিতে লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন দৃশ্য অত্যন্ত দুঃখজনকরূপে চিত্রিত হয়েছে। আপাতভাবে একথা সত্য যে, মাত্র ১৭/১৮ জন অশ্বারোহী সৈনিকের বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধ খাড়া না করে লক্ষ্মণ সেন চূড়ান্ত দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ও কাপুরুষতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

আধুনিক ঐতিহাসিকেরা মিনহাজউদ্দিন ও ইসামীর বিবরণের মধ্যে নানা অসঙ্গতি খুঁজে পেয়েছেন। *রমেশচন্দ্র মজুমদার, সতীশ চন্দ্র, দীনেশচন্দ্র সরকার* প্রমুখ মনে করেন, মুসলমান ঐতিহাসিকদের বিবরণের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। মিনহাজউদ্দিন স্বয়ং তাঁর গ্রন্থে একাধিক ক্ষেত্রে লক্ষ্মণ সেনের প্রশংসা করেছেন। তিনি লক্ষ্মণ সেনকে *"আর্যাবর্তের রাজাগণের মধ্যে সর্বপ্রধান, হিন্দুস্থানের রায়গণের পুরুষাণুক্রমিক খলিফা স্থানীয়"* বলে বর্ণনা করেছেন। যোদ্ধা হিসেবে অকৌমার যুদ্ধসহ নানা রণাঙ্গনে তাঁর সাহসিকতা ও বীরত্বের প্রমাণ ইতিহাসে আছে। এমন একজন শাসক মাত্র অষ্টাদশ যবন সেনার ভয়ে ভীত হয়ে রাজধানী ত্যাগ করে পলায়ন করবেন—একথা বিশ্বাস করা কঠিন। সম্ভবত, মুসলিম যোদ্ধাদের নৈপুণ্য এবং ভারতীয় শাসকের দুর্বলতা প্রকাশ ও প্রচার করার বাসনায় মুসলিম লেখকেরা ঘটনাটিকে এইভাবে উপস্থাপিত করেছেন। আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে, ভারতে উন্নতমানের ঘোড়ার প্রচণ্ড চাহিদা ছিল। তাই সুযোগ নিয়ে ছলনার মাধ্যমে আকস্মিক আক্রমণ ঘটিয়েছিলেন। একথা বিশ্বাস করা অযৌক্তিক হবে না যে, অষ্টাদশ অশ্বারোহীকে একটি বৃহত্তর বাহিনী অনুসরণ করছিল। তাই অশ্বারোহীদের প্রাসাদ দখলের মুহূর্তেই প্রাসাদবাসীরা নগরের মধ্যে ভীত মানুষের কোলাহল শুনতে পেয়েছিলেন। লক্ষ্মণ সেন কাপুরুষ ছিলেন না, তার প্রমাণ প্রাসাদ ত্যাগ করলেও তিনি রাজত্ব ত্যাগ করেননি। রাজ্যের অন্যপ্রান্তে গিয়ে তিনি পুনরায় শাসন কায়েম করেছিলেন।

এঁদের মতে, ইখতিয়ারউদ্দিনের বিজয় ছিল পতনমুখী ভারতীয় রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে তুর্কী মুসলমানদের বিজয় অভিযানের স্বাভাবিক পরিণতি। অবশ্য স্মৃতিশাস্ত্রের ভাষ্যের প্রতি অন্ধবিশ্বাস এবং নিয়তিতে বিশ্বাসী বাঙালীজাতির পলায়নী মনোবৃত্তি এজন্য অনেকটাই দায়ী ছিল। উচ্চপদস্থ রাজ-কর্মচারীদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, কর্তব্যে অবহেলা, সংকীর্ণ স্বার্থচিন্তাও এই পতনের জন্য দায়ী ছিল।

বখতিয়ার কর্তৃক নদীয়া আক্রমণের ঘটনাটি ঘটেছিল ১২০২ খ্রীষ্টাব্দে। এর পর তিনি বিক্রমপুর থেকে পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গ শাসন করতে থাকেন। *'সদুক্তি কর্ণামৃত'* থেকে জানা যায়, ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দেও তিনি জীবিত ছিলেন। হয়তো এর অল্পকাল পরে তাঁর মৃত্যু হয়।

লক্ষ্মণ সেনও ছিলেন কবি ও শিল্প-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। পিতার অসমাপ্ত গ্রন্থ *'অদ্ভুতসাগর'* তিনিই সমাপ্ত করেন। *'গীতগোবিন্দ'* রচয়িতা জয়দেব *'পবনদূত'* রচয়িতা ধোয়ী, ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ হলায়ুধ প্রমুখ খ্যাতনামা পণ্ডিত ও দার্শনিক তাঁর রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন। তিনি ছিলেন বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী। কারণ তিনি *'পরম বৈষ্ণব'* অভিধা গ্রহণ করেছিলেন। এছাড়া তিনি ছিলেন 'গৌড়েশ্বর', *'অরিরাজ-মদন-শঙ্কর'* ইত্যাদি অভিধাও গ্রহণ করেন।

লক্ষ্মণ সেনের মৃত্যুর পর তাঁর দুই পুত্র বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন দক্ষিণবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গে কিছুকাল শাসন করেন। তবে এঁদের বা পরবর্তী সেনরাজাদের সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। সম্ভবত এঁরা খুবই গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছিলেন।

○ শাসনব্যবস্থা ঃ

মহারাজ শশাঙ্কের মৃত্যুর পরবর্তীকাল বাংলাদেশে যে সার্বিক অরাজক অবস্থা উদ্ভূত হয়েছিল, তা থেকে বাংলাকে রক্ষা করেন পালবংশের রাজাগণ। প্রশাসনিক অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার অবসানে তাঁরা প্রচলন করেছিলেন এক সুপরিচালিত ও সুপরিকল্পিত শাসনব্যবস্থা। অবশ্য এই শাসনকাঠামো একান্তভাবে তাঁদের উদ্ভাবন ছিল না। গুপ্তযুগে শশাঙ্কের আমলে যে প্রশাসনিক ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল, মূলত তাকে ভিত্তি করেই পালরাজারা তাঁকে রাষ্ট্রযন্ত্র গড়ে তুলেছিলেন।

পালযুগে রাজা ছিলেন প্রশাসনের সর্বোচ্চ। এক বিশাল আমলাতন্ত্রের সাহায্যে তিনি শাসন পরিচালনা করতেন। আপাতদৃষ্টিতে রাজা ছিলেন নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী। তিনিই ছিলেন প্রধান শাসক, প্রধান বিচারক ও প্রধান সেনাপতি। তবে বাস্তবক্ষেত্রে রাজার ইচ্ছা কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হত তাঁর মন্ত্রিমণ্ডলের দ্বারা। এ ছাড়া, সামন্ত-রাজাগণ এবং প্রচলিত সংস্কার ও শাস্ত্রের বিধান রাজার স্বেচ্ছাচার নিয়ন্ত্রণ করত।

মহামন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীগণ রাজাকে সাহায্য করতেন। পাল আমলে মন্ত্রীপদে ব্রাহ্মণশ্রেণীর বিশেষ আধিপত্য ছিল। তার কারণ সম্ভবত ব্রাহ্মণগণ বিদ্যা, বুদ্ধি ও সম্পদে অন্যান্য শ্রেণী অপেক্ষা বলীয়ান ছিলেন। মন্ত্রীপদ বংশানুক্রমিক ছিল। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটু রাজমনোনীত মন্ত্রি-পরিষদ শাসনকার্যে রাজাকে সহায়তা করতেন। মন্ত্রী ছাড়া প্রশাসনে রাজার বিশ্বস্ত সহায়ক ছিলেন যুবরাজগণ।

ধর্মপালের খলিমপুর লেখ এবং নালন্দা পট্ট থেকে পালযুগের আমলাতন্ত্রের বিবরণ পাওয়া যায়। রাজামাত্য, *দণ্ডশক্তি' বিষয়পতি, বলাধ্যক্ষ, নাবাধ্যক্ষ, মহাদণ্ডনায়ক, মহাপ্রতিহার, ক্ষেত্রপাল, প্রান্তপাল* প্রমুখ বহু রাজকর্মচারী কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সাথে জড়িত ছিলেন।

পালযুগে বিকেন্দ্রীকৃত শাসনধারা অব্যাহত ছিল। পাল সাম্রাজ্য কয়েকটি ভুক্তিতে বিভক্ত ছিল। ভুক্তির শাসনকর্তাকে *'উপরিক মহারাজ'* বা *'ভুক্তিপতি'* বলা হত। ভুক্তির নিচে শাসনতান্ত্রিক বিভাগ ছিল বিষয় এবং তার নিচে ছিল মণ্ডল । বিষয় ও মণ্ডলের শাসনকর্তাকে

যথাক্রমে *'বিষয়পতি'* ও *'মণ্ডলাধিপতি'* বলা হত। পালদের আমলে 'বীথি' নামক একটি জনপদ বিভাগের অনুমান করা হয় যে, দশটি করে গ্রাম নিয়ে একটি উপবিভাগ ছিল।

রাষ্ট্রের আয়ের প্রধান উৎস ছিল কর। পাঁচটি প্রধান কর ছিল— *ভাগ, ভোগ, কর, হিরণ্য এবং উপরিকর*।

রাজা ছিলেন সর্বোচ্চ বিচারক। বিচারবিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন মহাদণ্ডনায়ক, দণ্ডনায়ক প্রমুখ। তবে স্থানীয় শাসকগণও বিচার পরিচালনা করতেন। মহীপ্রতিহার, দাণ্ডিক, দণ্ডশক্তি নামক কর্মচারীগণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন।

পালযুগে সৈন্যবিভাগের সর্বোচ্চে ছিলেন মহাসেনাপতি। তাঁর অধীনে ছিলেন সেনাপতি ও বিভিন্ন বাহিনীর অধ্যক্ষগণ। অশ্ব, হস্তি, রথ ও পদাতিক বাহিনীর সাথে একটি নৌ-বাহিনীও ছিল। দেশের নানা প্রান্ত থেকে সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করা হত।

পালযুগে প্রচলিত রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় আদর্শ কম-বেশি সেনযুগেও অনুসৃত হত। তবে সেন-আমলে যেমন কিছু নতুন আমলা-পদের উল্লেখ পাওয়া যায়, তেমনি পালযুগের কিছু পদের অবলুপ্তিও লক্ষ্য করা যায়। সেনযুগের শাসনপ্রকৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো পুরোহিততন্ত্র তথা ব্রাহ্মণশ্রেণীর প্রাধান্য। ইতিপূর্বে রাজকার্যে ব্রাহ্মণদের নৈতিক স্বীকৃতিকে মর্যাদা দেওয়া হত। কিন্তু সেনরাজাদের আমলে ব্রাহ্মণগণ শ্রেণী হিসেবে প্রত্যক্ষ এবং সক্রিয়ভাবে প্রশাসনকে প্রভাবিত করতে শুরু করেন। সেনযুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য হলো রাজকার্যে মহিষীদের প্রাধান্য-বৃদ্ধি। পালযুগের প্রশাসনিক তালিকায় কোন মহিষীর উল্লেখ পাওয়া যায়নি। কিন্তু সেনযুগের লেখগুলিতে পাটরানী ও অন্যান্য মহিষীদের নামোল্লেখ পাওয়া যায়।

সেনবংশের শাসনকালেও রাজা ছিলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তখনও সামন্ততন্ত্র অটুট ছিল। রাজা একটি মন্ত্রিমণ্ডলীর পরামর্শে একগুচ্ছ আমলার সাহায্যে শাসন পরিচালনা করতেন। সেনযুগে মন্ত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও *মহাসন্ধিবিগ্রহিক, মহাভোগপতি, মহাধর্মাধ্যক্ষ, মহাসেনাপতি, মহাকরণাধ্যক্ষ, মহাসূত্রাধিকৃত* প্রমুখ গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী পদ ছিল। তবে সেনদের আমলে রাজ্যের পরিধি সংকুচিত হয়েছিল, অথচ মন্ত্রীর সংখ্যা বেড়েছিল। তাই অনেকের অনুমান যে, পালযুগের তুলনায় সেনযুগে প্রশাসনে আমলাতন্ত্রের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল। সম্ভবত এই কারণে পূর্বের তুলনায় সাধারণ প্রজার সাথে প্রশাসনের ব্যবধান বৃদ্ধি পেয়েছিল।

○ পাল ও সেনযুগের সমাজ-সংস্কৃতি ঃ

বাংলাদেশের ইতিহাসে পাল ও সেনযুগ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। ভারতীয় ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই দুই বংশের অধীনে ভারতের এই অংশে একটি বৃহত্তর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল। স্বভাবতই বাংলার সমাজ-সংস্কৃতির উপর এই শাসনকালের বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

● সমাজ ঃ প্রাচীন বাংলার সমাজ-জীবনে বর্ণবিন্যাস বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। গুপ্তযুগে আর্যসমাজের বৈশিষ্ট্যগুলি বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও, পাল আমলে আর্যদের চতুর্বর্ণের অস্তিত্ব দেখা যায় না। তৎকালীন বাংলার বর্ণবিন্যাসের কেন্দ্রে ছিলেন ব্রাহ্মণগণ। বর্ণ হিসেবে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উল্লেখ পাওয়া যায় না। পালযুগে বৌদ্ধধর্ম ও রীতিনীতি ব্রাহ্মণ্য-সমাজদর্শনকে

ধীরে ধীরে স্বীকার করে নিয়েছিল। গৃহীবৌদ্ধগণও বর্ণশাসনকে মেনে চলতেন, যদিও বৌদ্ধধর্মে বর্ণভেদ ছিল না। সামাজিক জীবনে বৌদ্ধরাও মনুর শাসন অনুসরণ করতেন। তবে এযুগে বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ সম্পর্ক ছিল অতি সহজ ও সহনীয়। এ বিষয়ে পালরাজাদের বংশগত ঐতিহ্যের অভাবেরও কিছুটা ভূমিকা ছিল। ব্রাহ্মণদের পরেই ছিল করণ-কায়স্থদের স্থান। রাজা এবং রাজবৈদ্যগণও 'করণ' বলে নিজেদের পরিচয় দিতেন। পালযুগে কৈবর্তদের উল্লেখ প্রথম পাওয়া যায়। তখন কৈবর্তরা যে বিশেষ প্রভাবশালী গোষ্ঠী ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় কৈবর্ত দিব্যর বিদ্রোহ ও সাফল্য থেকে। সমাজের নিম্নস্তরে ছিল, মেদ, অন্ধ্র, চণ্ডাল, ডোম, শবর প্রভৃতি জাতি।

সেনযুগে বর্ণবিন্যাস অনমনীয় ও সুদৃঢ় আকার ধারণ করেছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্মের গোঁড়া সমর্থক সেন-রাজাগণ পালযুগের উদার বর্ণবিভাগকে বর্জন করে কঠোর বর্ণবিভাগ প্রবর্তন করতে সচেষ্ট ছিলেন। ব্রাহ্মণ ছাড়া সমস্ত বর্ণকেই তখন সংকর ও শূদ্র বর্ণের অন্তর্গত বলে মনে করা হত। এদের আবার উত্তম, মধ্যম ও অধম বা অন্ত্যজ—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করে প্রতিটি উপবর্ণের মর্যাদা ও বৃত্তি নির্দিষ্ট করা হত। সেনযুগের এই কঠোরতার অনিবার্য ফলস্বরূপ ব্রাহ্মণগণ সমাজের অন্যান্য সমস্ত শ্রেণীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। সম্ভবত এই কারণে মুসলমান আক্রমণের সময় নিজপক্ষে গণ-সমর্থনের সম্ভাবনা নেই, লক্ষ্মণ সেন বিনা প্রতিরোধে নদীয়ায় পলায়ন করেছিলেন। এই যুগেই বাংলায় সহজিয়া ও ভাগবতধর্মী সমন্বয়কারী সাধকদের আবির্ভাব ঘটেছিল। অবশ্য সাধারণ মানুষের হৃদয়ে স্থান পেলেও প্রভাবশালী ব্রাহ্মণদের কর্তৃত্ব থেকে এঁরা সমাজকে মুক্ত করতে পারেননি। কারণ সমাজপতি ব্রাহ্মণগণ শূদ্রদের মধ্যে একাংশকে ম্লেচ্ছ বা অস্পৃশ্য ঘোষণা করে তাদের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর গড়ে তুলেছিলেন। সেনযুগে ভৌগোলিক অবস্থানের ভিত্তিতে ব্রাহ্মণগণ রাঢ়ীয়, বারেন্দ্রী প্রভৃতি নামে পরিচিতি লাভ করেন। আবার গ্রামের নাম অনুসারেও তাঁদের উপাধি চট্টোপাধ্যায়, ভট্টাচার্য প্রভৃতি হয়। তবে বল্লাল সেন কৌলীন্য-প্রথার প্রচলন করেছিলেন কিনা, এ বিষয়ে সাম্প্রতিক কিছু বিতর্ক দেখা দিয়েছে। প্রখ্যাত গবেষক *অতুল* সুর তাঁর *'বাংলায় সামাজিক ইতিহাস'* গ্রন্থে বলেছেন যে, একাদশ-দ্বাদশ শতকে নয়, পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে বাঙালী কুলপঞ্জীকারগণই কৌলীন্য-প্রথা চালু করেছেন, এবং এটিকে ঐতিহাসিক ব্যঞ্জনা দেবার জন্যই বল্লাল সেনের নাম এই ব্যবস্থার সাথে যুক্ত করেছেন। অবশ্য এই বক্তব্য অনেকে স্বীকার করেন না।

ধর্ম ঃ পালরাজারা সাধারণভাবে বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁদের আনুকূল্যে বাংলাদেশ বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁদের আনুকূল্যে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের একমাত্র আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছিল। তবে ধর্ম বিষয়ে তাঁরা ছিলেন উদার ও সহিষ্ণু। তাই ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রেও তাঁরা মুক্তহৃদয় ছিলেন। হিউয়েন সাঙ বাংলাভ্রমণে এসে যেমন বৌদ্ধ-বিহার দেখেছিলেন, তেমনি বহু হিন্দু-মন্দিরেরও অস্তিত্ব দেখেছিলেন। পালরাজাদের আমলে বৌদ্ধধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের মধ্যে একটা সমন্বয়সাধনের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। পালযুগের বৌদ্ধধর্মের মধ্যে বৈদিক হিন্দুধর্মের নানা আচার-অনুষ্ঠানের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বৌদ্ধধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের পাশাপাশি তখন জৈনধর্মও স্বমহিমায় বিরাজ করত। অবশ্য ইতিপূর্বে জৈনধর্মের যে ক্ষয় শুরু হয়েছিল, পালযুগেও তা অব্যাহত ছিল।

পালযুগের ধর্মীয় সহিষ্ণুতা সেনযুগে ছিল না। সেনরাজারা ছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্মের গোঁড়া

সমর্থক। সে আমলে বৈদিক ধর্ম ও সংস্কার আরও সুদৃঢ় ও প্রসারিত হয়েছিল। সেনরাজারা বৌদ্ধদের পীড়ন করেননি কিংবা তখন বৌদ্ধবিহার একেবারেই ছিল না, তা নয়। কিন্তু রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বৌদ্ধদের অতীত প্রভাব ছিল না। তখন বৌদ্ধদের 'পাষণ্ড' আখ্যা দেওয়া সাধারণ রীতিতে পরিণত হয়েছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্মের সার্বিক প্রভাবের চিহ্ন সর্বত্র ছিল স্পষ্ট। এমনকি প্রধান প্রধান বৌদ্ধ-বিহারগুলিতেও হিন্দুদেবদেবীর অবস্থান দেখা যায়। এককথায়, পালযুগের ধর্মীয় সহিষ্ণুতা সেনযুগে অনেকটা হ্রাস পেয়েছিল।

○ অর্থনীতি : প্রাচীনকালের ধারা অনুযায়ী পাল-সেন যুগে বাংলার অর্থনীতির ভিত্তি ছিল কৃষি-উৎপাদন। অবশ্য শিল্প ও বাণিজ্য থেকেও কিছু অর্থাগম ঘটত। জমির মালিক ছিলেন রাজা। তিনি কৃষকদের জমি দান-বিক্রয় ও দান করতেন। কৃষিজ উৎপাদনের মধ্যে প্রধান ছিল ধান। রামচরিতে উৎকৃষ্ট ধানের উল্লেখ পাওয়া যায়। অবশ্য সেকালের লেখগুলিতে বা সাহিত্যে ধানের বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় না। ধান ছাড়া আখ, সুপারি, নারিকেল, সরষে, আম, কাঁঠাল, তুলো প্রভৃতি প্রচুর উৎপাদিত হত। বরেন্দ্রভূমিতে তখন উন্নতমানের এলাচ উৎপাদন হত বলে জানা যায়।

শিল্প-উৎপাদনের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল কার্পাস বস্ত্র। এ ছাড়া, কাষ্ঠনির্মিত গোরুর গাড়ি, পাল্‌কি, নৌকা ইত্যাদি ছিল অন্যতম শিল্পজাত দ্রব্য। মিনহাজ-উদ্দিনের লেখা থেকে জানা যায়, সে যুগে দক্ষ অলঙ্কার-শিল্পীরও অস্তিত্ব ছিল।

পাল-সেনযুগে শিল্পীরা সংঘবদ্ধ ছিল। 'দেওপাড়া লেখ' থেকে 'শিল্পীসংঘের' (গিল্ড) কথা জানা যায়। সেখানে শূলপাণিকে 'বারেন্দ্র শিল্পীগোষ্ঠী চূড়ামণি' বলা হয়েছে। শিল্পীগোষ্ঠীর প্রধান নেতা মর্যাদার স্মারক হিসেবে রাজার দান গ্রহণ করতেন।

পাল ও সেনযুগে বাংলার বাণিজ্যে অবনতি ছিল লক্ষণীয়। সপ্তম শতাব্দীর পর থেকেই বাণিজ্যহ্রাসের লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তখন বাণিজ্যে আরব বণিকদের আধিপত্যের সূচনা-পর্ব। ইতিপূর্বে তাম্রলিপ্ত বন্দরের যে রমরমা ছিল, এযুগে তা-ও ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল। লক্ষণীয় যে, পাল ও সেন আমলের মুদ্রার খোঁজ পাওয়া যায় না। স্বর্ণমুদ্রা ছিল না। রৌপ্যমুদ্রা পালযুগে কিছুটা প্রচলিত থাকলেও সেনযুগে তা আর ছিল না। তখন বিনিময়-মাধ্যম ছিল কড়ি।

পাল ও সেন আমলে প্রচলিত প্রধান কর ছিল চার প্রকার, যথা—ভাগ, ভোগ, কর ও হিরণ্য। 'ভাগ' ছিল উৎপন্ন শস্যে রাজার প্রাপ্য এক-ষষ্ঠ্যাংশ ফুল, ফল-মূল উত্যাদি মাঝে-মাঝে রাজাকে দেওয়া হত। একে বলা হত *'ভোগ'*। *'কর'* বলতে বোঝাত জনগণের আয়ের উপর নির্ধারিত রাজার প্রাপ্য অর্থ। *'হিরণ্য'* শব্দের প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে সন্দেহ আছে। অনুমান করা হয়, রাজা শস্যের পরিবর্তে যে নগদ মুদ্রা নিতেন, তাকেই *'হিরণ্য'* বলা হত। সে যুগে কয়েকটি অপ্রধান করও আদায় করা হত। গো-চারণভূমি, হাট, খেয়াঘাট প্রভৃতি ব্যবহারের জন্য কিছু কর প্রদান করতে হত। *'উপরিকর'* বলে একটি করের উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবত আপৎকালে প্রচলিত করের অতিরিক্ত হিসেবে এটি আদায় করা হত। অপরাধীদের কাছ থেকে শাস্তি হিসাবেও কিছু অর্থ রাজকোষে জমা পড়ত।

পাল ও সেন আমলের অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক হওয়ার ফলে তৎকালীন সভ্যতা ছিল প্রধানত গ্রামকেন্দ্রিক। গ্রামগুলি গড়ে উঠেছিল প্রধানত যেখানে জলের সুবিধা বেশি। তবে আকারে ও

লোকসংখ্যার বিচারে গ্রামগুলির মধ্যে বিভিন্নতা ছিল। পাল ও সেনযুগ গ্রামপ্রধান হলেও তখন নগরের অস্তিত্বও ছিল। তাম্রলিপ্ত, কোষীবর্ষ, রামাবতী, লক্ষ্মণগড়, দণ্ডভুক্তি, কর্ণসুবর্ণ প্রভৃতি ছিল সেকালের কয়েকটি সমৃদ্ধ নগর। নগরগুলি ব্যবসাবাণিজ্য, তীর্থস্থান ও শিক্ষা সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে খ্যাতির অধিকারী ছিল।

পাল ও সেন যুগে ধনবণ্টন-বৈষম্য ও তজ্জনিত সামাজিক অসাম্য ছিল। একদিকে ছিল বিত্তহীন কৃষক ও কারিগর শ্রেণী, অন্যদিকে ছিল সমৃদ্ধ বণিক, প্রতাপশালী সামন্তশ্রেণী ও উচ্চপদস্থ রাজপুরুষবৃন্দ।

○ সংস্কৃতি ঃ শিল্প-স্থাপত্য ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও পাল ও সেনযুগে বাংলাদেশে নানা পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। স্থাপত্যের ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে পাল-সেনযুগে কোন নতুনত্ব সাধিত হয়নি। ইতিপূর্বে প্রচলিত শিল্প-ভাবনাই কোনক্রমে টিকে ছিল বলা চলে। সে যুগের স্থাপত্যকর্মের মধ্যে ছিল কিছু স্তুপবিহার ও মন্দির। তবে এগুলির সবই কালের করাল গ্রাসে নষ্ট হয়ে গেছে। আছে শুধু সামান্য ধ্বংসাবশেষ। তা থেকেই পণ্ডিতেরা কল্পনার আলোকে সেকালের শিল্পীদের কৃতিত্ববিচারে প্রয়াসী হয়েছেন। পার্সী ব্রাউন ও বিদেশী পর্যটকদের অনুমান এ যুগের স্তূপগুলি বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদনের উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছিল। এগুলির গঠন-পদ্ধতি দেখে অনুমান করা যায় যে, এগুলি স্তূপের স্থাপত্য-বিবর্তনের শেষদিকের কাজ। স্তূপের চূড়া অধিক উঁচু ও চতুষ্পার্শ্বের আকার বৃহৎ হওয়ার ফলে প্রথমদিকের স্তূপের থেকে এগুলির প্রভেদ ও মন্দিরশিল্পের সাথে কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। সে যুগের বিহার ও মন্দির বলতে সোমপুর বিহারের কিছু অবশিষ্ট এখনো দেখা যায়। বাকি সবই প্রকৃতি ও মানুষের আঘাতে ধ্বংস হয়ে গেছে। গবেষক *কাশীনাথ দীক্ষিতের* মতে, এই মন্দিরের স্থাপত্য-রীতি ছিল সম্পূর্ণ নতুন। পূর্বে অথবা পরে এই রীতির নিদর্শন দেখা যায় না। কিন্তু অধ্যাপক *সরসীকুমার সরস্বতীর* মতে, এটি প্রচলিত মন্দির-রীতি অনুযায়ী নির্মিত হয়েছিল। ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে পালযুগের কিছু অবদান থাকলেও সেনযুগ এ বিষয়ে নীরব। পাল-ভাস্কর্যের ভাণ্ডার ছিল পাহাড়পুর। এখানকার মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ ফলগুলি থেকে সে যুগের ভাস্কর্যকর্মের পরিচয় পাওয়া যায়। পাল-ভাস্কর্যে গুপ্তযুগের কিছু প্রভাব থাকলেও তা মৌলিকতাবর্জিত ছিল না। মূর্তিগুলি সবই ছিল ব্রাহ্মণ্যধর্মের দেবদেবীর। অধ্যাপক সরস্বতী বৈশিষ্ট্যগত তারতম্য অনুসারে মূর্তিগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। মূর্তিগুলির সুষ্ঠু বেশবাস, নমনীয়তামার্জিত রুচির পরিচায়ক। তবে তৎকালে ভাস্কর্যশিল্প ছিল একান্তভাবে ধর্মভিত্তিক ও ধনী সম্প্রদায়ের বস্তু। এগুলি প্রকৃত অর্থে লোকশিল্প ছিল না। পালযুগের প্রখ্যাত শিল্পী ছিলেন ধীমান ও বীতপাল। স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের মত চিত্রশিল্পেও পালযুগের কিছু অবদান ছিল। তবে এগুলিও অতীতের ধারা বহন করেছিল মাত্র, চিত্রশিল্পে এ যুগ কোন নতুন মাত্রা যোগ করতে পারেনি।

○ মুসলমান অনুপ্রবেশের প্রাক্কালে ভারতের অবস্থা ঃ

৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দে হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে উত্তরভারতের রাজনৈতিক ঐক্য শিথিল হয়ে পড়ে। হর্ষের সাম্রাজ্য খণ্ড খণ্ড হয়ে যায় এবং সন্নিহিত অঞ্চলসহ পুষ্যভূতি বংশের শাসনাধীন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয় একাধিক ছোট ছোট রাজ্য। ঘটনাচক্রে এই সকল রাজ্য রাজপুত জাতির

বিভিন্ন গোষ্ঠী দ্বারা শাসিত হলেও এদের মধ্যে কোন রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। পরন্তু সংকীর্ণ গোষ্ঠীস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এইসব ছোট ছোট রাজ্য প্রতিনিয়ত নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত থেকে পরস্পরের শক্তি ও অর্থ ক্ষয় করত। বস্তুত সপ্তম শতকের পরবর্তীকালে এবং দিল্লী-সুলতানির প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত ভারতে এমন কোন কেন্দ্রীয় শক্তির অস্তিত্ব ছিল না, যার নেতৃত্বে ভারতের রাজনৈতিক সংহতি ও শক্তি দানা বাঁধতে পারে। তুলনামূলক ভাবে তখন কনৌজ ছিল সর্বাধিক শক্তিশালী ও সম্ভাবনাময় রাজ্য। তবে কেন্দ্রীয় শক্তি হিসেবে ভারতের রাজনৈতিক ঘটনাবলীকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা কনৌজেরও ছিল না, কিংবা অন্যান্য রাজপুত রাজ্যগুলিও জাতীয় স্বার্থে কনৌজের নেতৃত্ব মেনে নিতে আদৌ প্রস্তুত ছিল না।

○ রাজনৈতিক অবস্থা ঃ

হর্ষবর্ধনের মৃত্যু উত্তর-ভারতের রাজনীতিতে কেন্দ্রীকরণের সম্ভাবনা শেষ করে দেয়। অতঃপর কনৌজকে কেন্দ্র করে বাংলার পালবংশ, উত্তর-ভারতের গুর্জর-প্রতিহারবংশ এবং দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটবংশের মধ্যে দীর্ঘ প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। অষ্টম শতকের শেষ থেকে নবম শতকের শেষ পর্যন্ত প্রায় একশো বছরের বেশি এই ত্রি-পাক্ষিক সংঘর্ষ চলেছিল। বাংলার পালরাজা ধর্মপাল প্রাথমিক পর্বে সাফল্যলাভ করেন। কিন্তু উত্তরভারত থেকে প্রতিহাররাজ বৎস অভিযান চালিয়ে ধর্মপালকে পরাস্ত করেন। কিন্তু দাক্ষিণাত্য থেকে রাষ্ট্রকূটরাজ দাক্ষিণাত্যে ফিরে গেলে ধর্মপাল কনৌজসহ উত্তরভারতে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার সুযোগ পান। পালরাজা দেবপাল, প্রতিহাররাজ মিহিরভোজ এবং রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ একইভাবে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লড়াই চালিয়ে যান। এই দীর্ঘস্থায়ী ত্রিশক্তি সংঘর্ষ উত্তরভারতের রাজনীতিতে অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলার জন্ম দেয়। কারণ এই সংঘর্ষে তিনটি রাজ্যেরই বিপুল অর্থ ও শক্তিক্ষয় ঘটেছিল।

হর্ষের গৌরবদীপ্ত শাসনের পরে কনৌজসহ উচ্চ-গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চলে যে অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছিল, অষ্টম শতকের গোড়ার দিকে যশোবর্মনের নেতৃত্বে তার সাময়িক অবসান ঘটে। সুযোদ্ধা, সুশাসক এবং সংস্কৃতিমনা যশোবর্মনের নেতৃত্বে কনৌজ আবার তার হৃতগৌরব ফিরে পায়। এই সময়ে কনৌজের গুরুত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে জনৈক ঐতিহাসিক লিখেছেন ঃ *"পশ্চিম-এশীয় দেশগুলির কাছে ব্যাবিলন, টিউটন জাতির কাছে রোম এবং পূর্ব ও দক্ষিণ ইউরোপের কাছে বাইজান্টাইন মধ্যযুগে যেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তেমনি অষ্টম ও নবম শতকে উত্তর ভারতের উঠতি রাজ্যগুলির কাছে কনৌজ ছিল গুরুত্বপূর্ণ।"*

কনৌজের ভৌগোলিক অবস্থান তাকে এই আর্থ-রাজনৈতিক গুরুত্বের গরিমায় ভূষিত করেছিল। যাই হোক্, যশোবর্মনের নেতৃত্বে কনৌজের রাজ্যসীমা এক সময় পূর্বে বাংলা থেকে উত্তর-পশ্চিমে থানেশ্বর ও পূর্ব-পাঞ্জাব পর্যন্ত, এবং উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে দক্ষিণে নর্মদার তীর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। শোনা যায়, কাশ্মীররাজ মুক্তাপীড়ের সাথে মিলিতভাবে যশোবর্মন তিব্বতের বিরুদ্ধে এক অভিযান পাঠিয়েও কিছুটা সাফল্য পেয়েছিলেন। বিদ্যানুরাগী হিসেবেও তাঁর সুনাম ছিল। কথিত আছে, প্রখ্যাত সংস্কৃত নাট্যকার এবং *'উত্তর-রামচরিত'*-এর রচয়িতা ভবভূতি যশোবর্মনের রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন। কিন্তু যশোবর্মনের বংশধররা ছিলেন দুর্বল ও প্রতিভাহীন। তাঁদের আমলে কনৌজ বিশৃঙ্খলা-জর্জরিত হয়ে পড়ে এবং শেষ

পর্যন্ত প্রতিহাররাজ নাগভট্ট কনৌজ দখল করে সেখানে প্রতিহার-শাসনের সূচনা করে যান। গুর্জর-প্রতিহার মিহিরভোজ (৮৩৫ /৪০-৯০ খ্রীঃ) এবং প্রথম মহেন্দ্রপালের (৮৯০-৯১০ খ্রীঃ) আমলে কনৌজ যথেষ্ট শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয়। মিহিরভোজ পাঞ্জাব, রাজপুতানা এবং যুক্তপ্রদেশের কিছু অংশ কনৌজের সাথে যুক্ত করতে সক্ষম হন। কিন্তু মহীপালের আমলে কনৌজ আবার দুর্বল হয়ে পড়ে এবং রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় ইন্দ্রর কাছে মহীপাল চূড়ান্তভাবে বিপর্যস্ত হন (৯১৬ খ্রীঃ)। মহীপাল হৃতরাজ্য পুনর্দখল করতে পারলেও রাজ্যের অবক্ষয় রোধ করতে পারেননি। সেই অবক্ষয়ের চরম পরিণতি ঘটে ১০১৮ খ্রীষ্টাব্দে, যখন গজনীর সুলতান মামুদ কনৌজের সীমান্তে উপস্থিত হলে কনৌজের রাজা রাজ্যপাল সামান্যতম প্রতিরোধের পরিবর্তে অত্যন্ত অপমানজনক শর্তে মামুদের বশ্যতা স্বীকার করে নেন। ১০৯০ খ্রীষ্টাব্দে কনৌজের প্রতিহারবংশের শাসনের অবসান ঘটে এবং সেখানে শুরু হয় গাহড়বাল-বংশীয় রাজপুতদের শাসন।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে স্বাধীন রাজ্য হিসেবে কাশ্মীরের উত্থান ঘটে। কার্কোত-বংশীয় *দুর্লভবর্ধন* এখানে এক শক্তিশালী হিন্দু শাসনের সূচনা করেন। এই বংশের রাজা ললিতাদিত্য মুক্তাপীড়ের আমলে (৭২৫-৫২ খ্রীঃ) কাশ্মীর যথেষ্ট শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয়। মুক্তাপীড় ৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে কনৌজরাজ যশোবর্মনকে পরাজিত করে তাঁর বশ্যতা আদায় করেন। তিব্বতের বিরুদ্ধেও তিনি অভিযান প্রেরণ করেন। কলহনের গ্রন্থে ললিতাদিত্যের কৃতিত্ব ও বিজয়কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর আমলেই প্রসিদ্ধ মার্তণ্ড সূর্য-মন্দির নির্মিত হয়। চীনের সম্রাটের সাথেও ললিতাদিত্যের সুসম্পর্ক ছিল। ললিতাদিত্যর উত্তরসূরী জয়াপীড়ের আমলে সিন্ধুদেশে আরব-আক্রমণ ঘটেছিল। নবম শতকে কার্কোত-বংশের পতন ঘটে এবং সেখানে উৎপল-বংশের শাসন শুরু হয় (৮৫৫ খ্রীঃ)। এই বংশের দু'জন দক্ষ শাসক ছিলেন অবন্তীবর্মন এবং শংকরবর্মন। শংকরবর্মনের মৃত্যুর পর (৯০২ খ্রীঃ) উৎপলবংশ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত একটি স্থানীয় মুসলমানবংশ কাশ্মীরের শাসনক্ষমতা দখল করে নেয় (১০৩৯ খ্রীঃ)। ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে বাবরের নিকটাত্মীয় তথা প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ্ মির্জা হায়দার দখলত্ কাশ্মীর-উপত্যকায় নিজ কর্তৃত্ব স্থাপনে সক্ষম হন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর (১৫৫১ খ্রীঃ) পুনরায় কাশ্মীরে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা গ্রাস করে। শেষ পর্যন্ত সম্রাট আকবরের আমলে কাশ্মীর মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

প্রতিহার-রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাওয়ার পর উত্তরভারতে বেশ কয়েকটি রাজপুত রাজ্যের উদ্ভব হয়। রাজপুতজাতির উৎপত্তি ও উত্থান সম্পর্কে নানা মত আছে। সম্ভবত এরা বিদেশী এবং ব্রাহ্মণরা বিশেষ প্রয়োজনে এদের ক্ষত্রিয়ের মর্যাদা দিয়েছে এবং রাজবংশসম্ভূত বলে স্বীকার করে নিয়েছে। অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে, রাজপুতরা হুণদের বংশধর। *ড. রোমিলা থাপারের* মতে, হূণদের আক্রমণের সময় আরও যে সব বিভিন্ন উপজাতির লোক ভারতে প্রবেশ করেছিল এবং পরে উত্তর ও পশ্চিম ভারতে বসতি স্থাপন করেছিল, রাজপুতরা তাদের বংশধর। রাজপুতের মধ্যে *'সংকর'*-গোষ্ঠীর উপাদান থাকার সম্ভাবনাই প্রবল। যাই হোক্, আলোচ্য পর্বে উত্তর-ভারতে উদ্ভূত রাজপুত রাজ্যগুলির মধ্যে চারটি গোষ্ঠী বিশেষ সম্মান দাবি করত। এরা হলো *প্রতিহার* (বা পরিহার), *চৌহান* (চাহমান), *শোলাঙ্কি* (বা চৌলুক্য,—এরা দাক্ষিণাত্যের চালুক্যদের কেউ নয়) এবং *পরমার* (বা পাওয়ার) বংশ। আবুপাহাড়ের যজ্ঞের আগুন থেকে উদ্ভূত এই পৌরাণিক

দাবি অনুযায়ী এরা নিজেদের *'অগ্নিকুল'* গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মনে করত। প্রাক্তন প্রতিহার সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের উপর এরা নিজেদের রাজ্য গড়ে তোলে। প্রতিহাররা দখল করে দক্ষিণ রাজস্থান। কাথিয়াবাড়ে শোলাঙ্কিরা। মালব দখলে থাকে পরমারদেব, এবং চৌহানরা দিল্লীর দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে কর্তৃত্ব স্থাপন করে।

শোলাঙ্কি-বংশীয় মূলরাজা আনুমানিক ৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাটের অনহিল-পাটকে স্বাধীন শাসনের সূচনা করেন। ইতিপূর্বে এরা সম্ভবত গুর্জরদের অধীনস্থ সামন্ত ছিল। মূলরাজা ছিলেন সুযোদ্ধা। তিনি আবুর পরমারদের পরাজিত করেন এবং সিন্ধু, কচ্ছ এবং কাথিয়াবাড়ের বন্‌হলিদের মিলিত জোটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বীরত্ব প্রদর্শন করেন। তিনি সিদ্ধাপুরে রুদ্র-মহালয়-এর বিখ্যাত শিবমন্দির নির্মাণ করেন। মূলরাজের মৃত্যুর পর (৯৯৫ খ্রীঃ) তাঁর পুত্র চামুণ্ডারাজা সিংহাসনে বসেন। তাঁর আমলে মালবের পরমারদের সাথে শোলাঙ্কিবংশের বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করে। অতঃপর সিংহাসনে বসেন যথাক্রমে বল্লভরাজা, দুর্লভরাজা এবং প্রথম ভীম। গজনীর সুলতান মামুদ যখন গুজরাট আক্রমণ করে সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠন করেন, তখন ভীম কোন প্রকার বাধাদানের পরিবর্তে আত্মগোপন করে নিজ নামকে কলঙ্কিত করেন। শোলাঙ্কিবংশের পরবর্তী রাজা তথা ভীমের পুত্র জয়সিংহ (১০৯৩-১১৪২ খ্রীঃ) ছিলেন নানা গুণের অধিকারী। তিনি *'সিদ্ধারাজা'* নামেই অধিক পরিচিত। তিনি মালব, গিরনার, আজমীর প্রভৃতি রাজ্য আক্রমণ করে তাদের বশ্যতা আদায়ে সফল হয়েছিলেন। বিদ্যা ও বিদ্বানের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধাবোধ ছিল। পরবর্তী শাসক কুমারপালও ছিলেন সুযোদ্ধা ও সংস্কৃতিমনা। মালব ও রাজপুতানার কিছু অংশ তিনি গুজরাটের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। শোলাঙ্কিবংশের শেষ স্বাধীন রাজা ছিলেন কর্ণ। ১৩১০ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দিনের সেনাপতি মালিক কাফুর কর্ণকে পরাজিত করে গুজরাটে মুসলমান শাসনের সূচনা করেন।

খ্রীষ্টীয় নবম শতকে জনৈক কৃষ্ণ রাজা (বা উপেন্দ্র) মালবে পরমারবংশের কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। প্রথমে পরমাররা কনৌজের প্রতিহারদের সামন্ত ছিলেন। দশম শতকের শেষদিকে এই বংশের দ্বিতীয় শিয়াক স্বাধীন শাসনের সূচনা করেন। এঁদের রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী। পরমারদের সাথে সীমান্তবর্তী রাজ্য চেদীর কলচুরী, মহাবার চন্দেলা, গুজরাটের শোলাঙ্কি এবং দাক্ষিণাত্যের চালুক্যদের যুদ্ধবিগ্রহ ছিল নিত্য ঘটনা। পরমারবংশের শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন ভোজ (১০১০-৬০ খ্রীঃ)। সুযোদ্ধা ও শিক্ষানুরাগী হিসেবে তিনি বিশিষ্টতা অর্জন করেছিলেন। ভোজের মৃত্যুর পর পরমারবংশ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং চতুর্দশ শতকের প্রথম দশকে এই রাজ্য তুর্কী-শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

দিল্লীর দক্ষিণ-পশ্চিমে সম্ভর বা শাকম্ভরীত স্বতন্ত্র শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলে চৌহানবংশ। আজমীর ছিল সম্ভরের অন্তর্গত একটি অঞ্চল। চৌহানবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে চতুর্থ বিগ্রহরাজা'র নাম পাওয়া যায়। তিনি *'বিশালদেব চৌহান'* নামেও পরিচিত ছিলেন। সাহসী ও সুযোদ্ধা বিশালদেব মুসলমানদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে চৌহানবংশের শাসন উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। শিক্ষানুরাগী হিসেবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। তাঁর রাজসভাসদ্ কর্তৃক ***'ললিতবিগ্রহরাজ'*** এবং ***'হরকেলি'*** নামক দু'টি বিখ্যাত নাটক রচিত হয়েছিল। আজমীরে তিনি একটি উচ্চ-বিদ্যালয়ও

প্রতিষ্ঠা করেন। চৌহানবংশের সর্বাধিক কীর্তিমান শাসক হিসেবে পৃথ্বীরাজ চৌহানের নাম ইতিহাসে স্মরণ করা হয় (১১৭৮-৯২ খ্রীঃ)। ১১৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চান্দেল-রাজ্য আক্রমণ করে মহাবার নিকট রাজা পরমলকে পরাজিত করেন। ১১৯১ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ঘুরীর বিরুদ্ধে পৃথ্বীরাজ রাজপুত রাজাদের একটি জোট গঠন করেন। তরাইনের প্রথম যুদ্ধে তিনি মুসলমানদের পরাজিত করতে সক্ষম হন। অবশ্য পরের বছরেই ঘুরীর কাছে তিনি পরাজিত হয়ে বশ্যতা স্বীকার করেন। তবে অল্পদিনের মধ্যেই ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে তাঁকে হত্যা করা হয়। এর অল্পদিনের মধ্যেই দিল্লী ও আজমীর তুর্কী-শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

সূর্য বা চন্দ্রবংশোদ্ভূত আরও কয়েকটি রাজপুতগোষ্ঠী পশ্চিম ও উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেছিল। এদের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল বুন্দেলখণ্ডের চন্দেলবংশ এবং চেদীর (মধ্যপ্রদেশ) কলচুরীবংশ। চন্দেলরা প্রথমে কনৌজের প্রতিহারদের সামন্ত হিসেবে এই অঞ্চল শাসন করতে থাকে। খ্রীষ্টীয় নবম শতকের শেষদিকে নান্নুক চন্দেলা প্রথম স্বাধীনভাবে শাসন শুরু করেন। হর্ষ চন্দেলা (৯০০-'২৫ খ্রীঃ) রাষ্ট্রকূটরাজ ইন্দ্রের বিরুদ্ধে কনৌজের প্রতিহার-রাজের পক্ষে যুদ্ধ করে নিজের সামরিক দক্ষতার পরিচয় দেন। চৌহানবংশের রাজকন্যার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ফলে চন্দেলাদের হাত শক্ত হয়। হর্ষের পুত্র যশোবর্মন এবং পৌত্র ধাঙ্গার আমলে চন্দেলাবংশ যথেষ্ট প্রতিপত্তির অধিকারী হয়েছিল। যশোবর্মন কনৌজের শাসককে পরাজিত করে এবং ধাঙ্গা গজনীর সুলতান সবুক্তগীনের বিরুদ্ধে রাজপুতদের জোটের নেতৃত্ব দিয়ে সুনাম অর্জন করেন। ধাঙ্গার পুত্র গণ্ডও যুদ্ধ দ্বারা রাজ্যবিস্তার নীতি অনুসরণ করতে থাকেন। গণ্ডর মৃত্যুর পর চন্দেলাবংশের সাথে প্রতিবেশী রাজপুত রাজ্যগুলির দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চলতে থাকে। চেদীর কলচুরীদের হাতে চন্দেলারাজ পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হন। অবশ্য ব্রাহ্মণ মন্ত্রী গোপালা'র সাহায্যে শীঘ্রই তা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন। মদনবর্মনের আমলে (১১২৯-'৬৩ খ্রীঃ) চন্দেলাবংশ আবার হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করে। পরবর্তী শাসক পরমারদিদেব-এর আমলে দিল্লীর চৌহানবংশের সাথে চন্দেলাদের তীব্র বিরোধ শুরু হয় এবং এবং চৌহান পৃথ্বীরাজের হাতে তিনি চূড়ান্তভাবে পরাজিত হন (১১৮২ খ্রীঃ)। এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য পৃথ্বীরাজ ও মহম্মদ ঘুরীর সাথে যুদ্ধের কালে পরমারদিদেব পৃথ্বীরাজকে সাহায্য দিতে অস্বীকার করেন। তবে ১২০২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নিজেই ঘুরীর সেনাপতি কুতুবউদ্দিনের হাতে বিধ্বস্ত হন। অতঃপর চন্দেলাদের শক্তির ক্রম-অবক্ষয় শুরু হয়।

দিল্লীর নিকটবর্তী বর্তমান হরিয়ানা অঞ্চলে ছিল রাজপুত তোমরবংশের শাসন। এরাও প্রথমে প্রতিহারদের সামন্ত ছিল। তোমররা ৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ধিল্লীক শহর প্রতিষ্ঠা করে। বর্তমানে এটিই *'দিল্লী'* শহর নামে পরিচিত।

এই যুগে কামরূপ বা অসমে একটি পার্বত্য রাজ্য গড়ে উঠেছিল। *ড. থাপার*-এর মতে, *"পূর্ব-ভারতের সাথে তিব্বত ও চীনের বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে কামরূপ ক্রমশ স্বাধীন রাজ্যে রূপান্তরিত হয়েছিল।"* ত্রয়োদশ শতকে শান উপজাতিভুক্ত অহোমরা কামরূপের অনেকটা দখল করে নেয়। পরবর্তীকালে এদের নামানুসারে এই অঞ্চল 'অসম' নামে পরিচিত হয়।

নবম শতকে কাবুল উপত্যকা ও গান্ধার অঞ্চলে শাহীক নামক যে মুসলিমবংশ শাসন করত,

তাদের জনৈক ব্রাহ্মণ মন্ত্রী সেখানে ক্ষমতা দখল করে হিন্দু শাহীবংশের শাসনের সূচনা করেন। উত্তর ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যবর্তী আটক অঞ্চলে এই হিন্দুশাহী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ঘটে। এই বংশের জয়পাল পাঞ্জাব পর্যন্ত রাজ্যসীমা সম্প্রসারণ করেন। এই জয়পালই সর্বপ্রথম মামুদ গজনীর আক্রমণের মুখোমুখি হয়েছিলেন।

হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্যের অন্যতম অংশ বাংলাতেও চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিল। পরবর্তী প্রায় একশো বছর বাংলায় চলেছিল *'মাৎস্যন্যায়'* অবস্থা। শেষ পর্যন্ত সমাজপতিদের উদ্যোগে জনৈক গোপাল অষ্টম শতকের মাঝামাঝি বাংলার সিংহাসনে বসেন (আনুঃ ৭৫০ খ্রীঃ) এবং পালবংশের শাসনের সূচনা করেন। অর্থাৎ সিন্ধুদেশে আরব আক্রমণকালে বাংলায় গোপালের শাসন ছিল বলে মনে করা হয়। এই বংশের দু'জন পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন ***ধর্মপাল*** ও ***দেবপাল***। দেবপালের রাজত্বকালে আরবীয় পর্যটক সুলেইমান ভারতে এসেছিলেন (৮৬১ খ্রীঃ)। তিনি পালরাজাদের সামরিক শক্তির উল্লেখ করলেও সেই শক্তি যে প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূটদের সাথে সংঘর্ষের ফলে দ্রুত ক্ষয়িত হচ্ছিল তা উল্লেখ করতে ভোলেননি। বস্তুত, দেবপালের মৃত্যুর অল্পকালের মধ্যেই পালসাম্রাজ্যের গৌরব অস্তমিত হতে থাকে। দশম শতকের মধ্যেই খণ্ডবিখণ্ড পালসাম্রাজ্যের উপর একাধিক ক্ষুদ্র ও স্বাধীন রাজ্যের জন্ম হয়েছিল, যেমন—উত্তর ও পূর্ববঙ্গে কম্বোজ ; ঢাকা-ফরিদপুরে চন্দ্র ; ত্রিপুরায় লৌহচন্দ্র ইত্যাদি। এদের মধ্যে কম্বোজরাই কিছুটা শক্তির অধিকারী হয়েছিল। সম্ভবত প্রথম মহীপাল এইসব রাজ্যাংশ পুনরধিকার করেছিলেন। তবে পালসাম্রাজ্য তার পূর্ব গৌরব ও কর্তৃত্ব আর ফিরে পায়নি। কারণ মামুদ গজনীর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য আর্যাবর্তের রাজারা যখন শক্তিসংঘ গঠন করেন, তখন মহীপাল তাতে যোগ দিতে অস্বীকার করেন। কারণ যাই হোক্, এটি তাঁর দুর্বলতা ও কাপুরুষতার দৃষ্টান্ত বহন করে। একাদশ শতকের গোড়ায় পালসাম্রাজ্য সংকুচিত হয়ে পড়ে এবং ১১৬২ খ্রীষ্টাব্দে সেনবংশীয় রাজা বিজয় সেনের হাতে মদন পালের পরাজয়ের পরে পালশাসনের চূড়ান্ত অবসান ঘটে। সেনবংশীয় রাজা লক্ষ্মণ সেনের আমলে তুর্কী সেনাপতি ইখতিয়ারউদ্দিন মহম্মদ-বিন্-বখতিয়ার খলজী বাংলাদেশ দখল করে (সম্ভবত১২০২ খ্রীঃ) সেখানে মুসলমান শাসনের সূচনা করেন।

ভারতে মুসলমান আক্রমণের ঢেউ প্রবলভাবে যে রাজ্যে লেগেছিল, তা হলো সিন্ধু। একদা হর্ষবর্ধনের রাজ্যাংশ সিন্ধুতে প্রথমে একটি শূদ্র শাসনের প্রতিষ্ঠা হয়। পরে সেখানকার জনৈক ব্রাহ্মণ মন্ত্রী চাচা শূদ্র শাসনের অবসান ঘটিয়ে স্বাধীন শাসনের সূচনা করেন। চাচার পৌত্র দাহিরের আমলে সিন্ধুর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে মহম্মদ-বিন্-কাশিম আরবীয় শাসনের প্রতিষ্ঠা করেন।

উত্তর ভারতের রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা যদি মুসলমান আক্রমণকারীদের ভারত-আক্রমণে উৎসাহি করে, তাহলে দক্ষিণ ভারতীয় রাজ্যগুলির আত্মধ্বংসী নিরন্তর সংগ্রামে তাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল বলা যেতে পারে। উত্তরের তুলনায় দক্ষিণ ভারতে আঞ্চলিক রাজ্য স্থাপনের প্রবণতা অর্থনৈতিক কারণে সবদিনই বেশি এবং ভৌগোলিক কারণে সেখানকার ছোট ছোট রাজ্যগুলির বিরামহীন সংঘর্ষ ছিল অনিবার্য। ড. ***রোমিলা থাপার*** লিখেছেন ঃ *"উর্বর বৃহৎ সমভূমির অভাবে সেখানে কোন কৃষিভিত্তিক সাম্রাজ্য গড়ে উঠতে পারেনি। স্থানীয় সংগঠনকে ভিত্তি করে ছোট ছোট রাজ্য গড়ে ওঠার প্রবণতা দক্ষিণ ভারতে প্রথম থেকে নিয়মিতভাবেই লক্ষ্য করা যায়।"*

ষষ্ঠ শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে পরবর্তী তিনশো বছর দাক্ষিণাত্যের প্রধান শক্তিগুলির মধ্যে সংঘর্ষের ভৌগোলিক-রাজনীতি ছিল পশ্চিম পর্বতমালা থেকে প্রবাহিত বঙ্গোপসাগরমুখী, বিশেষত কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীগুলির প্রবাহপথ নিয়ন্ত্রণের ইচ্ছা। এই সংঘর্ষ ছিল পশ্চিম-দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চলের সাথে আর দক্ষিণের তামিলনাদের উর্বরা সমভূমির সংঘর্ষ। এই উর্বরাভূমির কেন্দ্রে ছিল বেঙ্গী (অন্ধ্র) রাজ্য। তাই এই অঞ্চল নিয়েই বিরোধ ছিল সবথেকে বেশি। দক্ষিণের পরস্পরবিরোধী রাজ্যগুলির মধ্যে প্রধান ছিল বাদামী বা বাতাপীর চালুক্যবংশ, কাঞ্চীপুরমের পল্লববংশ এবং মাদুরার পাণ্ড্যবংশ। কালক্রমে অন্যান্য রাজবংশও এই আঞ্চলিক সংঘর্ষের শরিক হয়েছিল।

বাতাপীর চালুক্যবংশ (Western Chalukyas) প্রথম স্বাধীন শাসক ছিলেন প্রথম পুলকেশী (আনুঃ ৫৩৫-৬৬ খ্রীঃ)। দ্বিতীয় পুলকেশীর আমলে (৬১১-'৪২ খ্রীঃ) চালুক্যদের কর্তৃত্ব কাবেরী নদী অতিক্রম করে চোল, কেরল ও পাণ্ড্য রাজ্য পর্যন্ত প্রসারিত হয়। পল্লবরাজ প্রথম মহেন্দ্রবর্মনকে পরাজিত করে পল্লবদের রাজধানী কাঞ্চীপুরমের নিকটস্থ অঞ্চল পর্যন্ত তিনি দখল করে নেন। কিন্তু পরবর্তী পল্লব-রাজা নরসিংহবর্মন চালুক্যদের আক্রমণ করে বাতাপী বিধ্বস্ত করেন এবং সম্ভবত দ্বিতীয় পুলকেশীকে হত্যা করেন (৬৪২ খ্রীঃ)। দ্বিতীয় পুলকেশীর মৃত্যুর ফলে চালুক্যবংশ সাময়িকভাবে প্রতিপত্তিহীন হয়ে পড়ে। তাঁর পুত্র প্রথম বিক্রমাদিত্য (৬৫৫-'৮১খ্রীঃ) বাতাপী পুনরুদ্ধার করেন এবং পল্লবদের রাজধানী কাঞ্চীপুরম লুণ্ঠন করে অপমানের প্রতিশোধ নেন। সপ্তম ও অষ্টম শতক ধরে পল্লব ও চালুক্যদের সংঘর্ষ চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রকূট শক্তির হাতে চালুক্য-শাসনের অবসান ঘটে (৭৫৭ খ্রীঃ)। অবশ্য বেঙ্গীর চালুক্যগণ (Eastern Chalukyas) এবং কল্যাণের চালুক্যগণ যথাক্রমে একাদশ ও দ্বাদশ শতক পর্যন্ত ক্ষমতায় টিকেছিল। এরাও পল্লব, রাষ্ট্রকূট এবং চোল শক্তিসমূহের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত থেকে নিজেদের ক্রম-অবক্ষয় ডেকে আনে।

পল্লববংশের উত্থান ঘটে ষষ্ঠ শতকের শেষদিকে। সিংহবিষ্ণু পাণ্ড্য, চোল এবং সিংহল রাজকে পরাজিত করেছিলেন বলে কথিত আছে। প্রথম নরসিংহবর্মন ছিলেন পল্লববংশের সর্বাধিক কৃতী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। তিনি চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীকে হত্যা করে এবং বাতাপী দখল করে (৬৪২ খ্রীঃ) পল্লবদের দক্ষিণ ভারতে শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করেন। সপ্তম ও অষ্টম শতক ধরে পল্লব-চালুক্য সংঘর্ষ দক্ষিণ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। এই সকল যুদ্ধের পরিণতি সম্পর্কে উভয় পক্ষই নিজেদের কৃতিত্বের কথা প্রচার করেছেন। যাই হোক্, এর ফলে যে পক্ষই আপাত বিজয়লাভ করুক, পরিণতিতে উভয়েরই যে শক্তিক্ষয় হয়েছিল,—সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। নবম শতকে চোলরাজ প্রথম আদিত্য পল্লবরাজ অপরাজিত বর্মনকে পরাজিত করে (৮৯৭ খ্রীঃ) পল্লব-শাসনের অবসান ঘটান।

ভারতে মুসলমান অনুপ্রবেশ ও ক্ষমতাবিস্তারের আদিলগ্নে দাক্ষিণাত্যের অন্যতম শক্তিশালী রাজশক্তি হিসেবে রাষ্ট্রকূটদের আবির্ভাব ঘটেছিল। দাক্ষিণাত্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে রাষ্ট্রকূটগণ দুইশত বছরেরও বেশি সময় প্রভুত্ব করেন। সম্ভবত এঁরা ছিলেন চালুক্যদের সামন্ত এবং আদিনিবাস ছিল কর্ণাটকে। অষ্টম শতকে দন্তিদুর্গ রাষ্ট্রকূট-শক্তির প্রতিষ্ঠা করেন। তবে রাষ্ট্রকূটদের গৌরবময় উত্থান শুরু হয় রাজা ধ্রুব (৭৮০-'৯৩ খ্রীঃ)-র রাজত্বকাল থেকে। গঙ্গরাজ ও

পল্লবরাজকে পরাজিত করে তিনি দাক্ষিণাত্যে একচ্ছত্র কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। অতঃপর তিনি বাংলার পালরাজা ধর্মপাল ও প্রতিহাররাজ ব্রহ্মাকে পরাজিত করে দক্ষতা প্রদর্শন করেন। অবশ্য উত্তর ভারতে রাজ্য স্থাপনের কোন চেষ্টা তিনি করেননি। ধ্রুবর পুত্র তৃতীয় গোবিন্দও (৭৯৪-৮১৪ খ্রীঃ) পরাক্রান্ত শাসক ছিলেন। তিনিও পালরাজা ধর্মপাল, প্রতিহার রাজা দ্বিতীয় নাগভট্টকে পরাজিত করেন এবং দক্ষিণের পাণ্ড্য, পল্লব, গঙ্গ, কেরল, চালুক্য-সহ কোশল, অবন্তী ও সিংহলরাজকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। লক্ষণীয় যে, ক্ষমতাশালী হলেও রাষ্ট্রকূটগণ সিন্ধু-দখলকারী আরবদের সাথে কোনরকম বিরোধে যাননি ; পরন্তু আরব বণিকদের সাথে রাষ্ট্রকূটদের সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বের এবং পরস্পর সহাবস্থানের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। দাক্ষিণাত্যের এই ওঠাপড়ার খেলায় আরও কয়েকটি ছোট ছোট রাজ্যের সৃষ্টি হয়েছিল, যেমন—কদম্ব, গঙ্গ, যাদব, কাকতীয় বংশ ইত্যাদি ; এবং এরাও অবিরাম নিজেদের মধ্যে সংগ্রামে লিপ্ত ছিল।

সামগ্রিকভাবে বলা যায়, ষষ্ঠ শতকের শেষদিক থেকে ভারতীয় রাজনীতিতে আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতাবাদ এমনভাবে থাবা বিস্তার করেছিল যে, সাম্রাজ্যিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা ছিল অসম্ভব। একই সঙ্গে উত্তর ও দক্ষিণ ভারত, যা একদা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক কর্তৃত্বের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল, অসংখ্য ছোট ছোট আঞ্চলিক রাজ্যের অসংহত সমষ্টিতে পরিণত হয়েছিল। অন্যদিকে একই সময়ে ইসলামধর্মকে ভিত্তি করে একদা বিচ্ছিন্ন, বিভ্রান্ত এবং অরাজকতায় দীর্ণ আরবদেশ পেয়েছিল নতুন জীবন। স্থাপিত হয়েছিল জাতীয় সংহতি ও রাষ্ট্রীয় ঐক্য। তারা তখন স্বপ্ন দেখছিল বিশ্ববিজয়ের। ধর্মবিজয়ের আকুল আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণতার মাধ্যমে তারা অর্জন করতে চেয়েছিল রাজনৈতিক প্রাধান্য। আর ভারতীয় রাজনীতিতে তখন ভাটার টান। গতিহীন জড়তা আর অবক্ষয় গ্রাস করেছে তার প্রাণশক্তিকে। এমতাবস্থায় বহিরাগত মুসলমানদের অগ্রগতি হয়েছে সহজ, সরল ও প্রায় বাধাহীন।

○ আর্থ-সামাজিক অবস্থা ঃ

অষ্টম শতকের প্রারম্ভে ভারতীয় সমাজের ভিত্তি ছিল বর্ণবিভাগ। তৎকালীন হিন্দুসমাজ মূলত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চার বর্ণে (শ্রেণী) বিভক্ত ছিল। সাধারণভাবে সর্বোচ্চ দু'টি বর্ণের সাথে সর্ব নিম্নবর্ণের প্রকাশ্য মেলামেশা নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয় ছিল। বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারেও সমকালীন স্মৃতিশাস্ত্রগুলি কঠোর বিধিবিষেধ আরোপ করেছেন। ফলে অসবর্ণ বিবাহের দৃষ্টান্ত তখন ছিল বিরল। তবে বর্ণভেদের কঠোরতা সম্পর্কে কিংবা প্রথম দুটি বর্ণের বৃত্তি প্রসঙ্গে স্মৃতিকারগণ যতই সোচ্চার হন না কেন, বাস্তবে তা সম্পূর্ণ অনুসৃত হত না। অধ্যাপক ***সতীশচন্দ্র*** লিখেছেন ঃ *"ব্যক্তি বা দল উচ্চবর্ণে উন্নীত হতে পারত, আবার তাদের পতনেরও সম্ভাবনা ছিল"*। অধ্যাপক ***রায়চৌধুরী*** (S. C. Roy Chowdhury) লিখেছেন ঃ "*....in actual practice the members of different varna did not strictly adhere to their own profession and there is ample evidence to show that often the Brahmins acted as warriors and the Kshatriyas performed the functions of Merchants.*" ব্রাহ্মণ বা বৈশ্যরা ক্ষত্রিয়দের সহযোগী হিসেবে রাজত্ব পরিচালনাও করতেন। সমকালীন লেখকরা এমন কিছু জাতির উল্লেখ করেছেন, যার বিভাজন ঘটেছে পেশাভিত্তিক।

কুমোর, তাঁতি, নাপিত, মুচি, জেলে, শিকারী ইত্যাদি 'জাতি' হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। লক্ষণীয় যে, বিভিন্ন কর্মীসংঘ তাদের পেশার ভিত্তিতে স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। আবার তখন 'কায়স্থ' জাতির উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু এই জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং শূদ্র উভয় বর্ণের ব্যক্তিই ছিল। অধ্যাপক সতীশচন্দ্রের মতে, সম্ভবত রাজকর্মে নিয়োজিত ব্রাহ্মণ ও শূদ্রদের স্বতন্ত্রভাবে 'কায়স্থ' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ক্রমে এরা একটি জাতি হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। জাতি-তত্ত্বের প্রথম ক্ষেত্রে কেবল নিম্নশ্রেণীর মানুষ পেশার ভিত্তিতে চিহ্নিত হয়েছে; কিন্তু দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণ মিলিতভাবে স্বতন্ত্র জাতির অভিধা পেয়েছে এবং এক্ষেত্রেও স্বতন্ত্রীকরণের মাপকাঠি তাদের পেশা। আলোচ্য পর্বে বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম তার অতীত গরিমা হারিয়েছিল। ফলে বহু বৌদ্ধ ও জৈন প্রত্যাবর্তন করেছিল হিন্দুধর্মে। বহিরাগত বহু জাতি, যেমন হূণ এবং স্থানীয় কোন কোন উপজাতি হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছিল। এই সকল নবাগতরা হিন্দুধর্মের রীতি-নীতির সাথে তাদের নিজস্ব কিছু কিছু আচার-অনুষ্ঠান বা দেব-দেবীকে সংযুক্ত করে ফেলে। ফলে সমাজ ও ধর্ম ক্রমশ জটিলতর হয়ে ওঠে।

আগের মতই সমাজে নারীর বিশেষ মর্যাদা ছিল না। স্বামীর তথা পরিবারের সেবা করাই নারীর একমাত্র কর্তব্য বলে বিবেচিত হত। গৃহকোণের বাইরে বাস্তব জীবনের বৃহত্তম আসনে নারীর বিচরণ ছিল নিষিদ্ধ। বেদপাঠে নারীর অধিকার ছিল না। ৭-৮ বছরের মধ্যেই মেয়েদের বিবাহ সম্পন্ন করা পিতামাতার অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হিসেবে বিবেচিত হত। সাধারণভাবে এক স্ত্রী গ্রহণ করার রীতি ছিল। তবে কারো স্ত্রী সন্তানের জন্মদানে অক্ষম হলে তার স্বামী ব্রাহ্মণদের অনুমতিক্রমে পুনর্বিবাহ করতে পারত। ভূস্বামী বা সামন্ত-প্রভুদের মধ্যে বহুবিবাহ নিয়ন্ত্রিত ভাবে প্রচলন ছিল। অবশ্য নারীর অধিকার রক্ষার ব্যাপারেও সমকালীন গ্রন্থে কিছু কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন স্ত্রীর প্রতি সৎ আচরণ এবং ন্যায়পথে জীবনযাপন স্বামীর প্রধান কর্তব্য হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে। স্ত্রীকে পরিত্যাগ করলেও তার ভরণপোষণের ভার স্বামীকে গ্রহণ করতে হত। সামন্ততান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থায় অপুত্রক অবস্থায় স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রী সম্পত্তির অধিকারিণী হত। অবিবাহিতা কন্যা তার বিধবা মায়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হতে পারত। সাধারণভাবে বিধবাবিবাহের প্রচলন ছিল না। তবে স্বামী নিরুদ্দেশ হলে, সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করলে, পুরুষত্বহীন হলে কিংবা জাতিচ্যুত হলে বিবাহিতা নারী পুনরায় বিবাহ করতে পারত। স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীদের একই চিতায় দগ্ধ হয়ে প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার রীতি (সতীদাহ) তখনও ছিল, তবে এই রীতির প্রয়োগ কতটা কঠোরভাবে করা হত সে বিষয়ে মতভেদ আছে। অধ্যাপক ***সতীশচন্দ্র*** লিখেছেন: *"সমকালীন কোন কোন লেখক সতীদাহ-প্রথার নিন্দা করেছেন।"* আরবীয় লেখক ***সুলেমান লিখেছেন,*** *"সতীদাহ'-প্রথা প্রচলিত ছিল, তবে এই কাজে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে স্ত্রীদের নিজস্ব ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে গুরুত্ব দেওয়া হত";* সম্ভবত প্রথা হিসেবে সতীদাহের প্রচলন থাকলেও ষষ্ঠ শতক ও অষ্টম শতকের মধ্যবর্তী কালে তার ততটা প্রয়োগ ছিল না। তবে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বিকাশের ফলে সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার সৃষ্টি এবং মৃত স্বামীর সম্পত্তির উপর অপুত্রক স্ত্রীর অধিকার স্বীকৃত হলে জমির অধিকারকে কেন্দ্র করে গৃহবিবাদের সূত্রপাত হয় এবং তখন স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী কর্তৃক সতীদাহ ব্যবস্থা প্রসারের ঝোঁক দেখা যায়। সামাজিক মর্যাদা বা কর্তৃত্বের বিচারে অবহেলিত হলেও সে যুগের কোন কোন রমণী

ললিতকলায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন এমন উল্লেখ পাওয়া যায়। অধ্যাপক ***সতীশচন্দ্র*** লিখেছেন যে, *"রাজদরবারের নারী এমনকি রানীর পরিচারিকাও সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় অতি চমৎকার কবিতা রচনা করেছেন। অভিজাত-কন্যা বা ধনী ব্যক্তির উপপত্নীরা ললিতকলার নানা ক্ষেত্রে পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছেন। রাজকুমারীগণ সঙ্গীত ও চিত্রাঙ্কনে যে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন, তার প্রমাণও পাওয়া যায়।"* যাই হোক্, এগুলিকে ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তরূপে বিবেচনা করাই যুক্তিযুক্ত। কারণ সমাজের উঁচুতলার অসংখ্য নারীর মধ্যে সীমিত কয়েকজন যে সুযোগ পেয়েছিলেন, তাকে সমাজের সাধারণ-বৈশিষ্ট্য হিসেবে গ্রহণ করা যায় না।

সপ্তম শতকের ভারতীয় সমাজে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার উপাদানের অস্তিত্ব লক্ষণীয়। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে কেন্দ্রীয় শাসনের পরিবর্তে আঞ্চলিক আনুগত্যভিত্তিক বহু ছোট ছোট রাজ্য গড়ে উঠেছিল। তারা স্থানীয় প্রয়োজন ও সামর্থ্যের উপর ভিত্তি করে যে নতুন আর্থ-রাজনৈতিক কাঠামোর ভিত্তি স্থাপন করে, তাতে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ও উৎপাদন ব্যবস্থার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য ইউরোপের অন্যান্য দেশের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে ভারতের সামন্ততান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যের মিল খুঁজে পাওয়া কঠিন। কারণ এখানে অর্থনৈতিক চুক্তির উপর জোর দেওয়া হয়নি কিংবা ***'ম্যানর'*** (Manor) ব্যবস্থার অস্তিত্বও ছিল না। তাই অনেকে তৎকালীন ভারতীয় সমাজকে ***'সামন্ততান্ত্রিক ধাঁচের'*** সমাজব্যবস্থা বলে অভিহিত করেন। আধুনিক গবেষকদের অনেকে মনে করেন, 'তথাকথিত 'সামন্ততন্ত্র' ভারতে ছিল না ; তবে ভারতীয় সমাজে সামন্ততান্ত্রিক উপাদানের অস্তিত্ব অবশ্যই ছিল। যাই হোক্, সপ্তম শতকের ভারতীয় সমাজকে *'সামন্ততান্ত্রিক উপাদান সমন্বিত সমাজ'* বলাই অধিক সম্মত। প্রথমে উত্তর ভারতে এবং পরে দক্ষিণ ভারতে এই পরিবর্তন সম্প্রসারিত হয়। সপ্তম শতকে নগদ বেতনের পরিবর্তে সরকারী কর্মচারীদের জমি ইজারা দেবার প্রথা চালু হলে সামন্ততন্ত্রের পথ সুগম হয়। পাল-প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূটদের রাজত্বে এই জাতীয় ধর্মনিরপেক্ষ অনুদান হিসেবে বহু গ্রাম দান করা হয়। ধর্মীয় কারণে ব্রাহ্মণ, পুরোহিত বা মন্দিরকে ভূমিদানের প্রথা প্রাচীনকাল থেকেই ছিল। তবে গুপ্তযুগে ভূমির রাজস্ব-অধিকারের সাথে সাথে এই অঞ্চলের সাধারণ প্রশাসক, বিচার ইত্যাদির দায়িত্বও দানগ্রহীতার হাতে অর্পিত হয়। খনিজ দ্রব্যের মালিকানাও দানগ্রহীতা লাভ করেন। ধর্মনিরপেক্ষ দানের ক্ষেত্রেও এই সকল অতিরিক্ত অধিকার সম্প্রসারিত হয়। এছাড়া ছিলেন কিছু পরাজিত রাজা, যারা বশ্যতা স্বীকারের বিনিময়ে কিছু অঞ্চলের রাজস্ব আদায় ও ভোগ করতে পারতেন। অধ্যাপক সতীশচন্দ্র সামন্ততন্ত্রের ধারক ও বাহক হিসেবে আরও দুটি শ্রেণীর উল্লেখ করেছেন—স্থানীয় উদ্যমশীল ব্যক্তি এবং উপজাতিগোষ্ঠীর নায়ক। এরাও রাজার অনুমতিক্রমে কম বা বেশি নির্দিষ্ট অঞ্চলে আধিপত্য করতেন। এইভাবে *'উৎপাদনে কায়িক শ্রম না দিয়ে যে গোষ্ঠী মধ্যস্বত্বভোগী হিসেবে নিজেদের জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করতেন, তাঁরাই এদেশে সামন্ততন্ত্রের বাহক হিসেবে চিহ্নিত হলেন'।*

সামন্তদের কর্তব্যকর্মের মধ্যে প্রধান ছিল কর আদায় করা এবং যুদ্ধের সময় রাজাকে সেনা সরবরাহ করা। অর্থাৎ সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্র এবং রাজকীয় বাহিনী অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। রাজা সামন্তদের উপর অত্যধিক নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। ফলে তাদের ক্ষমতা ও মর্যাদা হ্রাস পায়। ইতিপূর্বে গ্রামগুলি ছিল বহুলাংশে স্বনির্ভর। স্বতন্ত্রভাবেই হোক্ কিংবা সমষ্টিগতভাবেই হোক্, গ্রামগুলির একটা প্রবণতা ছিল আত্মনির্ভরশীল হয়ে গড়ে ওঠার।

অর্থনীতি, আইন-শৃঙ্খলা, স্থানীয় প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে এবং স্থানীয় স্বশাসন প্রবর্তন করে গ্রামগুলি রাষ্ট্রের প্রাথমিক স্তরে একটা প্রাণস্পন্দন জাগানোর চেষ্টা করত। কিন্তু সামন্ত-ব্যবস্থার বিকাশ গ্রামগুলিকে শক্তিহীন ও শ্রীহীন করে তোলে। সামন্ত প্রধানদের আধিপত্য গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দেয়। গ্রাম-সমিতির নির্বাচনে সামন্তপ্রভুর মতামত প্রাধান্য পেতে থাকে। ফলে স্বাভাবিক ও সুস্থ নির্বাচন ব্যাহত হয়।

সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য *'দাস'*-ব্যবস্থা তখন কি আকারে ছিল, তা পরিষ্কার বলা কঠিন। তবে পণ্ডিত ও গবেষকরা সমকালীন দানপত্র এবং বিবরণী বিশ্লেষণ করে নিশ্চিত হয়েছেন যে, ক্রীতদাস-ব্যবস্থা হয়তো ভারতে ছিল না, কিন্তু ভূমিদাসত্বের অস্তিত্ব ছিল। এক্ষেত্রেও স্মরণীয় যে, ইউরোপের ভূমিদাসদের জীবনযাপন পদ্ধতির রূপ ও কঠোরতা অষ্টম শতকের ভারতে ছিল না ; তবে ভূমির সাথেই আবদ্ধ একদল মানুষ ছিল,—যারা বংশানুক্রমে ভূমির আধিকারিক পরিবর্তনের সাথে নিজেদের ভাগ্যকে জড়িয়ে রাখতে বাধ্য ছিল। অধ্যাপক ***রামশরণ শর্মা*** উল্লেখ করেছেন যে, *"কাংড়া ও গুজরাটে কোন কোন অংশে ষষ্ঠ ও সপ্তম দশকের মধ্যে ভূমিদাস-প্রথা প্রচলিত ছিল।"* জমিদানের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত জমির সাথে যুক্ত চাষীদেরও দানগ্রহীতার কাছে হস্তান্তরের রীতি প্রথম শুরু হয় দক্ষিণ ভারতে এবং তা সপ্তম শতকের আগেই। পরে এই ব্যবস্থা দেশের অন্যান্য অংশে চালু হয়। তবে এই প্রথা প্রথমেই গ্রামভিত্তিক চাষীদের উপর প্রযুক্ত হয়নি। সম্ভবত প্রথমদিকে সেই সকল জমির সঙ্গে চাষীদেরও দাসরূপে হস্তান্তরিত করা হত, যেখানে চাষীরা অসংগঠিত ভাবে চাষের কাজে যুক্ত থাকত কিংবা যে জমি কোন সংগঠিত গ্রামের অংশ ছিল না, সেটিকেই দান করা হত। অধ্যাপক শর্মা এক্ষেত্রে দু'ধরনের চাষীর কথা উল্লেখ করেছেন—(১) যারা একান্তভাবে কৃষি-শ্রমিক হিসেবে জমি চাষ করত, এবং (২) যারা গ্রামবাসী প্রজা হিসেবে নিজ উৎপন্ন ফসলের একাংশ দানগ্রহীতাকে প্রদান করত এবং দানপত্রে নির্দিষ্ট অন্যান্য কর্তব্য পালন করত। অধ্যাপক শর্মা জমির সাথে যুক্ত কৃষি-শ্রমিকদের *'পূর্ণ ভূমিদাস'* রূপে এবং গ্রামের হস্তান্তরিত চাষীদের *'অর্ধদাস'*-রূপে অভিহিত করেছেন। ৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক চীনা পর্যটকের গ্রন্থেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, অষ্টম শতকের মধ্যভাগে দাস-ব্যবস্থা এদেশে বহুল প্রচলিত একটি রীতি ছিল।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সপ্তম থেকে দশম শতককে, ভারতের ক্ষেত্রে, *'গতিহীন জড়ত্ব ও অবক্ষয়ের যুগ'* বলে চিহ্নিত করেছেন কোন কোন পণ্ডিত। এবং এই স্থবিরত্বের জন্য তাঁরা দায়ী করেছেন আলোচ্য পর্বে ভারতীয় বাণিজ্যের ক্রমাবনতিকে। পশ্চিমী দেশগুলির সাথে ভারতের সমৃদ্ধ বাণিজ্য এই পর্বে ভিন্ন চরিত্রের কয়েকটি কারণে দ্রুত হ্রাস পেয়েছিল। যেমন—(১) পশ্চিম রোমসাম্রাজ্যের সাথে ভারতের বেশ উন্নত ও সমৃদ্ধ বাণিজ্য দীর্ঘকাল চালু ছিল। কিন্তু বর্বর আক্রমণের ফলে পশ্চিম রোমসাম্রাজ্যের পতন এবং পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের সাথে পারস্য সাম্রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে ভারতের ব্যবসা ব্যাহত হয়। (২) ইসলামের উত্থান এবং পারস্যের সামানিদ প্রভৃতি প্রাচীন সাম্রাজ্যের পতনের ফলেও ভারতে স্থল-বাণিজ্য কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। অধ্যাপক ***শর্মা*** লিখেছেন ঃ *"ইসলামের পতাকাতলে মিলিত আরবদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রসারের ফলেও ভারতের বহির্বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকতে পারে। বিশেষ করে প্রথমদিকে পশ্চিম এশিয়া, মিশর ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে আরবদের বিজয়-অভিযান যে*

রাজনৈতিক অস্থিরতার সৃষ্টি করেছিল, তার প্রতিকূল প্রভাব পড়েছিল পশ্চিমী দেশগুলির সাথে ভারতের বাণিজ্যে। অবশ্য পরবর্তীকালে পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকায় সুবিস্তৃত আরবসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে এবং আরো পরে সিন্ধুপ্রদেশে আরবীয় শাসনের সূচনা ঘটলে ভারতের বহির্বাণিজ্যে আবার জোয়ার এসেছিল।" (৩) সমকালীন কয়েকটি স্মৃতিশাস্ত্রে সমুদ্রযাত্রাকে অপবিত্র কর্ম বলে নিন্দা করা হয়েছে, যা বাণিজ্যিক অবক্ষয়ের আভাস দেয়। পশ্চিম দেশগুলিতে ইসলামধর্মের উত্থান এবং পূর্বের দেশসমূহে বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য সম্ভবত ব্রাহ্মণ্যধর্মের নেতাদের শঙ্কিত করেছিল। কারণ ঐ সকল দেশে বাণিজ্যের কারণে অধিকসংখ্যক ভারতীয় ভ্রমণ করলে ঐ সকল দেশ থেকে ব্রাহ্মণ্যধর্মবিরোধী ভাবধারা এদেশে অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা ছিল। তবে এই কারণটির গুরুত্ব তুলনামূলক ভাবে ছিল সীমিত। কারণ ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যান্য বর্ণের মানুষ এই নিষেধাজ্ঞাকে যে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন না, তখন পারস্য ও পশ্চিম এশিয়ার অন্যান্য মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলিতে ভারতীয় বণিক, কারিগর ও বুদ্ধিজীবীদের অবস্থান তার যর্থাথতা প্রমাণ করে। (৪) সামন্ততান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার দ্রুত প্রসারের ফলে ভূমিভিত্তিক অভিজাততন্ত্রের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। ফলে জমি থেকে নিয়মিত ও নিশ্চিত আয়ের লোভে অনিশ্চিত বাণিজ্যযাত্রা মূর্খামি বলে বিবেচিত হতে শুরু করে। তাছাড়া, গ্রামগুলি অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করলে স্বাভাবিক ভাবেই গ্রামে ব্যবসাবাণিজ্য অপ্রয়োজনীয় বোধ হয়। পরন্তু অষ্টম শতকের গোড়ার দিকে দক্ষিণ-ভারতে জারি-করা দুটি সনদে দেখা যায়, একটি ক্ষেত্রে কয়েকজন ব্যবসায়ীর একটি দলের হাতে একটি মন্দিরকে দান-করা কয়েকটি গ্রামের তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়া হয়েছিল এবং অপর ক্ষেত্রে একটি শহর ও সংলগ্ন তিনটি গ্রামের দায়িত্ব দু'জন ব্যবসায়ীর হাতে অর্পিত হয়েছিল। দু'টি ক্ষেত্রেই ব্যবসায়ীদের হাতে *'সামন্ততান্ত্রিক'* সব অধিকার তুলে দেওয়া হয়েছিল। ফলে বণিকেরাও মধ্যস্বত্বভোগীতে পরিণত হওয়ায় বাণিজ্যপ্রবণতা হ্রাস পাচ্ছিল।

আলোচ্য পর্বে উপরিলিখিত কারণে পশ্চিমী দেশের সাথে ভারতের বাণিজ্য হ্রাস গেলেও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও চীনের সাথে ভারতীয় বাণিজ্য অব্যাহত ছিল। নবম শতকের একটি চৈনিক বিবরণী থেকে জানা যায় যে, সপ্তম শতকে চীনে বহু ভারতীয় বণিক বসবাস করত। চীনের ক্যান্টন নদী পারসিক ও আরবীয় জাহাজের সাথে সাথে ভারতীয় জাহাজে ভর্তি থাকত। জাপানী বিবরণীতেও চীনে ভারতীয় বণিকদের উপস্থিতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই বাণিজ্যে বিশিষ্ট ভূমিকা নিত বাংলা ও দক্ষিণ ভারতের বন্দরগুলি। বাংলার পাল ও সেন রাজারা এবং দক্ষিণ ভারতের চোল ও পল্লব রাজারা চীনে দূত প্রেরণ করে সে দেশের সাথে বাণিজ্যপ্রসারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। চীনের সাথে বাণিজ্যে বাধা সৃষ্টি করার জন্য চোল রাজারা মালয় ও পার্শ্ববর্তী দেশগুলির বিরুদ্ধে নৌ-অভিযানও প্রেরণ করেছিলেন। ত্রয়োদশ শতকে এই বাণিজ্যে মন্দা দেখা দেয়।

রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা, অন্তর্দ্বন্দ্ব, ব্যক্তি বা বংশভিত্তিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা, জাতীয় চেতনার একান্ত অভাব, নিশ্চল মধ্যযুগীয় অর্থব্যবস্থা মিলিতভাবে ভারতের রাষ্ট্রজীবনে যে ভাঙন ধরিয়েছিল, সেই পথ ধরে একের পর এক মুসলমান আক্রমণ ঘটেছিল ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে। প্রথমে আরবগণ, তারপরে মামুদ গজনী এবং শেষে মহম্মদ ঘুরী বিধর্মীর দেশ এই ভারতবর্ষের অতুল ধন-সম্পদ

আর বিধর্মীকে ধর্মান্তরিত করে ইসলামের বিজয়যাত্রা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েন এর বুকে। ভারতভূমির বক্ষদেশের পাঁজরসদৃশ তন্দ্রাচ্ছন্ন রক্ষককুল আত্মকেন্দ্রিকতা ও অন্তর্দ্বন্দ্বে এতটাই দীর্ণ ছিল যে, বহির্জগতের দিকে চোখ ফেরানো বা সেই শক্তিকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা,—কোনটাই তার অবশিষ্ট ছিল না।

○ তুর্কীজাতির উত্থান ঃ

ভারতের বিরুদ্ধে আরবদের সামরিক অভিযানের ব্যাপ্তি ছিল সীমিত এবং স্থায়িত্ব ছিল স্পল্প। পশ্চিম সীমান্তের সিন্ধু ও মুলতান ছাড়া অন্য কোন অঞ্চলে তাদের কর্তৃত্ব সম্প্রসারিত হয়নি। কিন্তু আরবদের দৃষ্টান্তে উদ্বুদ্ধ হয়ে পরবর্তীকালে তুর্কীরা ভারতের বিরুদ্ধে বিশাল ও ব্যাপক অভিযান পরিচলনা করে। ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্য স্থাপনের কৃতিত্ব তুর্কীদেরই। এবং এই কাজের সূচনা করেন আফগানিস্তানের অন্তর্গত গজনীর তুর্কী সুলতানগণ। আদপে অ-মুসলমান তুর্কী উপজাতির দ্রুত উত্থান এবং মুসলমান রাজনীতির নিয়ন্ত্রকে পরিণত হওয়ার অন্যতম কারণ ছিল নবম-দশম শতকে মুসলমান জগতের অন্তর্বিরোধজনিত বিভেদ ও দুর্বলতা এবং জাতিগোষ্ঠী হিসেবে তুর্কী উপজাতির শক্তি, সাহস এবং কর্মোদ্যোগ।

তুর্কী উপজাতির আদি বাসস্থান ছিল আনাতোলিয়ার (মধ্যপ্রাচ্য) জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চল। এরা ছিল প্রকৃতির উপাসক এবং মুসলমানদের চোখে ধর্মহীন অসভ্য ও বর্বর। তুলনামূলক ভাবে খর্বাকৃতি তুর্কীদের শারীরিক গঠন ছিল বলিষ্ঠ এবং যোদ্ধা হিসেবে ছিল দুর্ধর্ষ। এদের অর্থলোভ ছিল প্রবল এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল সীমাহীন। ওমাইয়া এবং আব্বাসিদ খলিফাবংশের বিরোধের সুযোগে এরা মুসলমান রাজনীতির কেন্দ্রে চলে আসতে সক্ষম হয়। আব্বাসিদ খলিফারা আরবদের সর্বময় প্রাধান্য হ্রাস করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদে আরবদের সাথে সাথে অ-আরবদের নিয়োগে গুরুত্ব দেন। খ্রীষ্টীয় নবম শতকে আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করে বহু তুর্কী ইসলামধর্ম গ্রহণ করে এবং প্রসাদরক্ষী ও সৈনিকের বৃত্তি গ্রহণ করে। ক্রমে দক্ষ যোদ্ধা, সাহসী এবং কর্মঠ তুর্কীরা পারসিকদের পেছনে ঠেলে দিয়ে মুসলমান সাম্রাজ্যের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ পদ কব্জা করে নেয়। শীঘ্রই তারা এত ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে যে, রাজপদে মনোনয়ন তাদের ইচ্ছাধীনে পরিণত হয়। এদিকে খলিফার কর্তৃত্ব দুর্বল হবার সুযোগে উচ্চাকাঙ্ক্ষী বহু তুর্কী-নেতা স্বাধীন আঞ্চলিক রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। নিরুপায় খলিফা এই সকল দক্ষ এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী নেতাকে নিয়মমাফিক *'আমীর-উল্-উমারা'* অর্থাৎ খলিফার প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে নিজের মুখ রক্ষা করেন। আপাতদৃষ্টিতে খলিফার প্রতিনিধি এই সকল শাসক আসলে স্বাধীন সুলতান রূপেই ক্ষমতা ভোগ করতে থাকেন। অধ্যাপক মহম্মদ হাবিব তুর্কীজাতির সমরদক্ষতা ও রাজকীয় গুণাবলীকে হিন্দুসমাজের ক্ষত্রিয়দের সাথে তুলনা করে বলেছেন যে, ক্ষত্রিয়দের মত তুর্কীদের প্রধান বৃত্তি ছিল যুদ্ধ এবং রাজ্যশাসন। এক সময় তুর্কী উপজাতি ছিল মুসলমানের শত্রু। কিন্তু ক্রমে বহু তুর্কী ইসলামধর্ম গ্রহণ করে ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক ও নির্ভরযোগ্য রক্ষকে পরিণত হয়। দশম শতকের পরবর্তীকালে মুসলমান সমাজে এই ধারণা দৃঢ়মূল হয়েছিল যে, মুসলমান সাম্রাজ্যের প্রসার ও স্থায়িত্ব তুর্কীদের সহায়তা ছাড়া অসম্ভব। অবশ্য অ-মুসলমান তুর্কীদের সাথে লড়াই করে ইসলামকে রক্ষা করার কাজে যেমন নিবেদিতপ্রাণ ছিল মুসলিম

তুর্কীরা, তেমনি ইসলাম গ্রহণ করলেও আদি লুণ্ঠন-প্রবৃত্তিকে তারা সহজে ত্যাগ করতেও পারেনি। দুই কাজেই তারা দক্ষতা দেখাতে থাকে।

ভারতের বিরুদ্ধে তুর্কী মুসলমানদের অভিযান শুরু হয়েছিল গজনী রাজ্যকে কেন্দ্র করে। সামানিদ রাজ্যের জনৈক তুর্কী ক্রীতদাস আলপ্তগীন স্বাধীন গজনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। নবম শতকের শেষভাগে ট্রান্স-অক্সিয়ানা (বোখারা সমরখন্দ প্রভৃতি অঞ্চল), খোরাসান এবং ইরানের কিছু অংশে সামানিদ-বংশ রাজত্ব করত। সামানিদরা ছিল পারসিক (ইরানী) মুসলমান। তুর্কী উপজাতির সাথে সামানিদরা দীর্ঘদিন অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই করেছিল। এই লড়াইতে *'গাজী'* নামক এক নতুন যোদ্ধা-সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটেছিল, যারা ধর্মপ্রচারক হিসেবে কাজ করত, আবার ধর্মরক্ষার প্রয়োজনে আপ্রাণ যুদ্ধও করত। একথা সত্য যে, 'গাজী'দের ত্যাগ ও দৃঢ়তা ছাড়া তুর্কীদের আক্রমণ থেকে শিশু মুসলিম রাজ্যকে রক্ষা করা সম্ভব হত না। ক্রমে বহু তুর্কী ইসলামধর্ম গ্রহণ করে ইসলামের রক্ষকে পরিণত হয়। যাই হোক্, সামানিদ রাজ্যের তুর্কী-মুসলমান কর্মচারী আলপ্তগীন খোরাসানের গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন। দশম শতকের মাঝামাঝি আলপ্তগীন আফগানিস্তানের অন্তর্গত গজনীতে এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

আলপ্তগীনের জনৈক বংশধর পিরাই ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত হিন্দুশাহী রাজ্যের বিরুদ্ধে তুর্কী অভিযানের মাধ্যমে ভারতের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন। মুসলিম আক্রমণের প্রাক্কালে হিন্দুশাসিত এই রাজ্যের সীমানা উত্তরে হিন্দুকুশ পর্বত, দক্ষিণে গোমতী নদীর উভয় তীরে, পূর্বে লামঘান, পেশোয়ার, জালালাবাদ, উন্দ, উত্তর-পূর্বে কাশ্মীর এবং পশ্চিমে পারস্য সাম্রাজ্যের সীমানা পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। চৈনিক ধর্ম পর্যটক হিউয়েন সাঙ উল্লেখ করেছেন যে, সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে হিন্দু'শালী কাবুল রাজ্যে দক্ষ রাজতন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল। একসময় বর্তমান আফগানিস্তানের সম্পূর্ণটাই হিন্দুশাহী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভৌগোলিক অবস্থিতির কারণে মুসলমানদের আক্রমণের প্রথম ঢেউ এই রাজ্যের উপর বারবার আছড়ে পড়েছে। আরবদের আক্রমণ দীর্ঘ তিন শতক ধরে এরা প্রতিহত করে গেছে। স্বভাবতই গজনীর তুর্কী শাসকেরা উপলব্ধি করেন যে, হিন্দুশাহী রাজ্যকে ধ্বংস করতে না-পারলে ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যাবে না। পরবর্তী শাসক সবুক্তগীনও (৯৭৭-৯৯৭ খ্রীঃ) পিরাই প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হন এবং গজনীর নিকটতর শত্রু শাহীরাজ্যের বিরুদ্ধে উপর্যুপরি আক্রমণ চালান।

সবুক্তগীন ছিলেন দক্ষ এবং উচ্চাকাঙক্ষী শাসক। তাই মধ্য-এশীয় রাজনীতিতে ব্যস্ত থাকলেও পাঞ্জাবের শাহীরাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধপ্রস্তুতিতে তিনি অমনোযোগী হননি। এদিকে শাহীরাজা জয়পালও তুর্কীদের কাছ থেকে সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাই প্রথমেই আক্রমণ করে শত্রুকে ঘায়েল করার সিদ্ধান্ত তিনি নেন (৯৮৬-৮৭ খ্রীঃ)। বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করলেও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে জয়পাল অপমানজনক এক সন্ধি স্বাক্ষর করে রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হন। কিন্তু স্বরাজ্যে ফিরে এসে তিনি সন্ধির শর্ত মানতে অস্বীকার করেন। শর্তভঙ্গের অজুহাতে সবুক্তগীন শাহীরাজ্য আক্রমণ করে লামঘান বিধ্বস্ত করেন। এই সময়ে দিল্লী, আজমীর, কনৌজ-সহ কয়েকটি ভারতীয় রাজ্য জয়পালের সাহায্যে তাঁর সাথে যোগ দেন। কিন্তু দুর্ধর্ষ তুর্কীদের কাছে তারা পরাজিত হয়। লামঘান ও পেশোয়ার গজনীর অন্তর্ভুক্ত হয়।

এর অল্পকাল পরে সবুক্তগীনের মৃত্যু ঘটে (৯৯৭ খ্রীঃ)। এই সময় সবুক্তগীনের দুই পুত্র ইসমাইল ও মামুদ-এর মধ্যে সিংহাসনকে কেন্দ্র করে ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের সূচনা হয়। শেষ পর্যন্ত মামুদ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইসমাইলকে পরাজিত ও বন্দী করে গজনীর সিংহাসন দখল করেন (৯৯৮ খ্রীঃ)।

O সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণ ঃ

মধ্যযুগের মুসলিম ইতিহাসকারদের বিবরণ অনুযায়ী মামুদ ছিলেন ইসলামধর্মের বীর নায়ক। উচ্চাকাঙ্ক্ষী এই তুর্কী গজনীকে মধ্য-এশিয়ায় একটি শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করেন এবং অ-মুসলমান তুর্কী উপজাতির বিধ্বংসী আক্রমণের হাত থেকে মুসলমান সমাজকে রক্ষা করেন। মামুদ তাঁর মুদ্রায় *'আমীর'* শব্দটি ব্যবহার করতেন। খলিফার কর্তৃত্বকে তিনি অশ্রদ্ধা বা অস্বীকার করেননি, যদিও তাঁর চালচলন ছিল একান্তভাবেই একজন স্বাধীন শাসকের মত। তাই খলিফার প্রতিনিধি (আমীর-উল্-উমারা) মামুদ সমকালীন লেখকদের কলমে *'সুলতান'* বলেই অভিহিত হয়েছেন। স্বাধীন ও সার্বভৌম শাসকের স্বীকৃতি হিসেবে খলিফা আল্-কাদির-বিল্লাহ তাঁকে ***'ইয়ামিনউদ্দৌলাহ'* ও *'আমিন-উল্-মিল্লাহ'*** উপাধিতে ভূষিত করেন। সেইজন্য গজনীর সুলতানি বংশ *'ইয়ামিনি বংশ'* নামেও অভিহিত হয়।

কথিত আছে, সুলতান মামুদ খলিফার কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন যে, ভারতের হিন্দু তথা বিধর্মী পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে প্রতি বছর অভিযান চালাবেন। এর সত্যতা যাই হোক্, মামুদ যে বারবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ভারতের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযানের মোট সংখ্যা সম্পর্কে কিছুটা মতভেদ আছে। তবে স্যার ***হেনরী এলিয়ট*** (H. Elliot) তাঁর *'History of India as told by its own Historian'* গ্রন্থে *(Vol-II, page 434-78)* মামুদ কর্তৃক সতের বার ভারত আক্রমণের কথা লিখেছেন, যা অধিকাংশ পণ্ডিত গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন। ভারতের বিরুদ্ধে কোন আক্রমণেই মামুদের কোন দীর্ঘ বা স্থায়ী পরিকল্পনা ছিল না। পর্যায়ক্রমে তিনি একবার ভারতের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়েছেন, এবং ভারতীয় শক্তিকে বিধ্বস্ত করে কিছু ধন ও সম্পদ সংগ্রহ করে পরমুহূর্তেই ছুটে গেছেন মধ্য-এশিয়ায় কোন শত্রুর বিরুদ্ধে লড়তে। তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল মধ্য-এশীয় রাজনীতিতে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় উত্তীর্ণ হওয়া। কারণ তাঁর বিচারে আফগানিস্তানের রাজনীতির উত্থান-পতনের সাথে ভারতের তুলনায় মধ্য-এশিয়ার যোগ ছিল বেশি। আর সেই লক্ষ্যপূরণের জন্য আবশ্যিক ছিল একটি অতি সমৃদ্ধ রাজকোষ। আফগানিস্তানের অনুর্বর ভূমি তা প্রদান করতে অক্ষম ছিল। চীন ও ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্য থেকেও তাঁর ভাল অর্থাগম হত, কিন্তু গজনীর রাজকোষকে সচল ও সক্ষম রাখার দ্বিতীয় উৎস হিসেবে তিনি পাঞ্জাবের উর্বর ভূমি এবং ভারতের মন্দির ও নগরের *ঐশ্বর্য-সম্পদকে* ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন।

ভারতের বিরুদ্ধে সুলতান মামুদের সামরিক অভিযানগুলি সম্পন্ন হয়েছিল ১০০০-১০২৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। সমকালীন মুসলিম লেখকের মধ্যে ভারতের বিরুদ্ধে মামুদের আক্রমণের প্ররোচনা সৃষ্টি করেছিল সীমান্তবর্তী শাহীরাজ্যের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ। হিন্দু শাহীরাজা জয়পাল ইতিপূর্বে গজনীর বিরুদ্ধে যে হামলা করেছিলেন, মামুদের বিচারে তা ছিল গজনীর অস্তিত্বের পক্ষে বিপজ্জনক এবং অপমানজনক। ১০০০ খ্রীষ্টাব্দে আক্রমণ চালিয়ে মামুদ

সীমান্তবর্তী কয়েকটি দুর্গ দখল করে নেন। পরের বছরেই (১০০১ খ্রীঃ) দশ হাজার দক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য ও আনুষঙ্গিক-সহ জয়পালের রাজ্য আক্রমণ করেন। পেশোয়ারের সন্নিকটে এক যুদ্ধে জয়পাল পরাজিত ও বন্দী হন এবং মুক্তিপণ হিসেবে প্রচুর অর্থ, হাতী এবং রাজ্যের কিয়দংশ মামুদকে প্রদান করতে বাধ্য হন। কিন্তু এই অপমানের গ্লানিতে দগ্ধ জয়পাল অচিরেই আত্মহত্যা করেন। শাহীরাজ্যের দায়িত্ব পড়ে পুত্র আনন্দপালের হাতে। ১০০৪-১০০৫ খ্রীষ্টাব্দে মামুদ তৃতীয় অভিযান দ্বারা ঝিলাম নদীর বামতীরবর্তী ভীরা নগরী গজনীর অন্তর্ভুক্ত করে নেন। ১০০৬ খ্রীষ্টাব্দে মামুদের পরবর্তী অভিযান পরিচালিত হয় মুলতান রাজ্যের বিরুদ্ধে। মুলতানের শাসক আবুল-ফত্-দাউদ ছিলেন কার্মাথিয়াম গোষ্ঠীভুক্ত গোঁড়া শিয়া মুসলমান। সুন্নী মতবাদে বিশ্বাসী মামুদ দাউদের বিরুদ্ধে অভিযানে প্রথম বাধা পান দাউদের মিত্র শাহীরাজা আনন্দপালের কাছে। কিন্তু আনন্দপাল পরাজিত হন। ভীত দাউদ আত্মসমর্পণ করেন, জয়পালের পৌত্র এবং ধর্মান্তরিত সুখপালের (সেবক পাল) হাতে মুলতানের শাসনভার দিয়ে মামুদ গজনীতে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সুখপাল ইসলামধর্ম ত্যাগ করে মামুদের কর্তৃত্ব অস্বীকার করেন। ফলে ১০০৮ খ্রীষ্টাব্দে মামুদ পুনরায় মুলতানে স্বসৈন্যে উপস্থিত হয়ে সুখপাল ও দাউদকে বন্দী করেন এবং মুলতানকে সরাসরি গজনীর অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

হিন্দু শাহীরাজ্যের সাথে সুলতান মামুদের একটা চূড়ান্ত বোঝাপড়া ছিল ইতিহাসের অনিবার্য পরিণতি। দাউদকে সঙ্গ দেবার জন্য আনন্দপাল যেমন মামুদের ক্ষোভের সঞ্চার করেন, মামুদও তেমনি সুখপালকে বন্দী করে আনন্দপালকে ক্ষুব্ধ করেন। তাছাড়া মামুদ জানতেন, পাঞ্জাবকে পদানত করতে না পারলে ভারতের সম্পদের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবেন না। মামুদের এই মনোভাব সম্পর্কে আনন্দপালও অবহিত ছিলেন। তাই তিনিও উত্তর ভারতের নৃপতিদের একত্রিত করে সুলতান মামুদের বিরুদ্ধে এক শক্তিসংঘ গড়ে তোলেন। ১০০৮ খ্রীষ্টাব্দে মামুদ আনন্দপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা শুরু করেন। গোয়ালিয়র, কালিঞ্জর, কনৌজ, দিল্লী, আজমীর, উজ্জয়িনী প্রভৃতির নৃপতিরা আনন্দপালের সাহায্যে অগ্রসর হন। কিন্তু কিছুটা ভাগ্যবিপর্যয় এবং কিছুটা নেতৃত্বের অভাবহেতু ওয়েইহিন্দের যুদ্ধে ভারতীয় শক্তিসংঘ তুর্কীদের হাতে চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয় (১০০৮-১০০৯ খ্রীঃ)। অতঃপর তুর্কীবাহিনী কাংড়ার নিকটবর্তী নগরকোট দুর্গ দখল করে প্রভূত ধন-সম্পদের অধিকারী হয়। মামুদের সভালেখক ***উতবি*** এবং ***ফেরিস্তার*** বিবরণ থেকে জানা যায় যে, মামুদ এখানে যে বিশাল পরিমাণ স্বর্ণ-মোহর এবং সোনা-রূপা লুণ্ঠন করেছিলেন, তা সাধারণ মানুষের কল্পনার অতীত। মুসলমান সৈন্যরাও ব্যক্তিগতভাবে প্রচুর ধনরত্ন সংগ্রহ করেছিল। ফলে মামুদের অর্থ-লিপ্সা যেমন বেড়েছিল, তেমনি তাঁর সৈন্যরাও নতুন উদ্যমে ভারতের অভ্যন্তরে অভিযান চালাতে প্রেরণা পেয়েছিল।

আনন্দপাল অতঃপর নন্দনাতে (লবণ পর্বতশ্রেণীর উত্তরে) আশ্রয় নিয়ে পুনরায় শক্তিসঞ্চয়ের চেষ্টা করেন। তবে কার্যকরী কিছু করার আগেই তিনি মারা যান। তাঁর পুত্র ত্রিলোচন পাল মামুদকে বাধা দেবার জন্য নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করেন। কিন্তু ১০১৪ খ্রীষ্টাব্দে মামুদ ত্রিলোচনকে পরাজিত করে নন্দনা দখল করে নেন। ত্রিলোচন পাল প্রথমে কাশ্মীরে আশ্রয় নেন, পরে পাঞ্জাবের পূর্বে শিবালিক পার্বত্য-অঞ্চলে প্রত্যাবর্তন করে নতুনভাবে শক্তিসঞ্চয়ের চেষ্টা করেন। বুন্দেলখণ্ডের চান্দেল্ল-বংশীয় বিদ্যাধরের সাথে মামুদের বিরুদ্ধে তিনি এক জোট গড়ে তোলেন। কিন্তু এবারেও

মামুদ আক্রমণ চালিয়ে (১০১৯ খ্রীঃ) এই জোট ভেঙে দেন। ত্রিলোচনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ভীম পালও তুর্কী প্রতিরোধের ব্যর্থ আশা পোষণ করে আজমীরে আশ্রয় নেন। ১০২৬ খ্রীষ্টাব্দে ভীমের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মামুদের বিরুদ্ধে শাহীরাজ্যের প্রতিরোধের শেষ আশা মুছে যায়। ইতিমধ্যে মামুদও পাঞ্জাব গজনীর অন্তর্ভুক্ত করে নেন। ব্যর্থ হলেও তুর্কী আক্রমণের বিরুদ্ধে হিন্দু শাহীরাজ্যের ধারাবাহিক প্রতিরোধ তাঁদের স্বদেশপ্রেম ও বীরত্বের পরিচায়ক। আরবদেশীয় লেখক এবং ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী *অলবেরুনী* হিন্দু-শাহীবংশের প্রশংসা করে লিখেছেন : *"তারা ছিলেন সু-মহান ঐতিহ্যের ধারক। সমস্ত প্রাচুর্যের মধ্যেও সৎ ও ন্যায়কার্য সম্পাদনের তীব্র আকাঙক্ষা তাঁদের কখনো শিথিল হয়নি।"*

হিন্দু শাহীবংশের বিরুদ্ধে লড়াই চালানোর পাশাপাশি মামুদ অন্যান্য কয়েকটি স্থানে অভিযান চালিয়ে প্রচুর ধনসম্পদ সংগ্রহ করে নেন। ১০০৯ খ্রীষ্টাব্দে মামুদ নারায়ণপুর (বর্তমান আলোয়ার জেলা) দখল করেন। সেখানকার হিন্দুরাজা মামুদের বশ্যতা স্বীকার করে নেন। এর ফলে ভারত ও খোরাসানের মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেন খুব বৃদ্ধি পায়। ১০১৪ খ্রীষ্টাব্দে নন্দনা দখল করার পর মামুদ থানেশ্বরের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। চক্রস্বামীর বিশাল মন্দিরে সঞ্চিত ধনরত্নের কথা মামুদের অজানা ছিল না। থানেশ্বরের পথে জনৈক হিন্দুরাজা মামুদকে বাধাদানের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। মামুদ অতঃপর চক্রস্বামীর মন্দির দখল করে প্রচুর ধনরত্ন লুণ্ঠন করেন।

১০১৫ এবং ১০২১ খ্রীষ্টাব্দে মামুদ কাশ্মীর দখলের দুটি ব্যর্থ চেষ্টা করেন। সম্ভবত, শাহীবংশীয় রাজাকে আশ্রয়দানের জন্যই কাশ্মীর মামুদের আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত হয়েছিল। ১০১৮ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর ভারতের রাষ্ট্র-কর্তৃত্বের কেন্দ্রভূমি কনৌজের উদ্দেশ্যে মামুদ গজনী থেকে রওনা হন। মথুরায় উপস্থিত হয়ে তিনি সেখানকার স্থাপত্যকর্মে সমৃদ্ধ হিন্দু মন্দিরগুলি ধ্বংস করেন এবং মন্দিরে রক্ষিত অর্থ লুণ্ঠন করেন। অকারণে শিল্পসমৃদ্ধ মন্দিরাদি ধ্বংস করে মামুদ গোঁড়ামি ও মধ্যযুগীয় বর্বরতার পরিচয় দেন। ১০১৯ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় তিনি উপস্থিত হন কনৌজে। মথুরার মত কনৌজেও তিনি পৈশাচিক উল্লাসের মাঝে সমস্ত মন্দির ও তীর্থস্থান ধ্বংসের নির্দেশ দেন। কনৌজের রাজা রাজ্যপাল বিনা প্রতিরোধে মামুদের বশ্যতা স্বীকার করে নেন। রাজ্যপালের কাপুরুষতায় ক্ষুব্ধ হয়ে বুন্দেলখণ্ডের চান্দেল্ল রাজা বিদ্যাধর রাজ্যপালকে হত্যা করেন। মামুদ এতে অপমানিত বোধ করেন এবং বিদ্যাধরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। এছাড়া হিন্দু শাহীরাজ্যের সাথে বুন্দেলখণ্ডের মৈত্রীজোটও মামুদকে ক্ষুব্ধ করেছিল। যাই হোক্, বিদ্যাধর আত্মগোপন করে এ যাত্রা রক্ষা পেয়ে যান। ১০২০ খ্রীষ্টাব্দে মামুদ পুনরায় কালিঞ্জর আক্রমণ করেন এবং বিদ্যাধরের বশ্যতা ও প্রচুর ধনরত্ন লাভ করেন।

ভারতের বিরুদ্ধে মামুদের দুঃসাহসিক অভিযানগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল গুজরাটের সোমনাথের বিরুদ্ধে আক্রমণ। ১০২৫ খ্রীষ্টাব্দে মুলতান থেকে রাজপুতানা হয়ে মামুদের বাহিনী সোমনাথের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়। সোমনাথ শহরের ধর্মপ্রাণ অধিবাসীদের ধারণা ছিল *সর্বশক্তিমান সোমনাথেশ্বর তাদের রক্ষা করবেন। কিন্তু মামুদ বিনা বাধায় সোমনাথে প্রবেশ করেন* এবং মন্দির লুণ্ঠন করেন। তাঁর নির্দেশে দেবমূর্তিটিকে খণ্ড খণ্ড করে গজনীতে নিয়ে যাওয়া হয়। মন্দিরের পুরোহিত-সহ প্রায় ৫০ হাজার হিন্দু তুর্কীদের অস্ত্রাঘাতে নিহত হন। প্রভূত ধনরত্ন-সহ মামুদ গজনীতে ফিরে যান।

ভারতের বিরুদ্ধে মামুদের শেষ অভিযান ছিল সিন্ধুর জাঠদের বিরুদ্ধে। সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠন করে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তনের সময় জাঠরা কচ্ছ অঞ্চলে তুর্কীবাহিনীকে নানাভাবে বিব্রত করেছিল। তাদের সমুচিত শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে মামুদ পরবৎসর জাঠদের আক্রমণ করে পরাজিত করেন। অতঃপর তিনি মধ্য-এশিয়ার রাজনীতিতে ব্যস্ত থাকেন। ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

○ সুলতান মামুদের অভিযানের প্রকৃতি ও গুরুত্ব :

গজনীর সুলতান মামুদ ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে টানা ২৬ বছর ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করলে তাঁর প্রতিটি আক্রমণের নির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য আবিষ্কার করা সম্ভব। এই সকল আক্রমণের ফলে আক্রান্ত রাজ্য ও জনগোষ্ঠীর উপর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াও ছিল জোরালো। কিন্তু সামগ্রিকভাবে তাঁর ভারত-বিরোধী অভিযানগুলির কোন সুদূরপ্রসারী বা গঠনমূলক প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। ভারতের বিরুদ্ধে তিনি অভিযান পাঠিয়েছেন মোট সতের বার এবং প্রতিবারই তিনি জয়লাভ করেছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত প্রায় নেই-ই, যখন একজন মধ্যযুগীয় শাসক কোন একটি দেশের বিরুদ্ধে একনাগাড়ে এতগুলি অভিযান পাঠিয়েছেন, অথচ লক্ষ্যে এবং ফলের দিক থেকে প্রতিটি অভিযানই ছিল স্বতন্ত্র। তখন ভারতে কোন কেন্দ্রীয় শক্তি ছিল না। এককভাবে কোন আঞ্চলিক ভারতীয় রাজ্য শক্তিতে মামুদের সমকক্ষও ছিল না। আবার তাদের মধ্যে স্বার্থ-দ্বন্দ্ব এত প্রবল ছিল যে, বহিরাগত শত্রুর বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হয়ে লড়াই করাও সম্ভব হয়নি। এত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সুলতান মামুদ দীর্ঘ ২৬ বছর ধরে সতেরটি অভিযান চালিয়ে কেবলমাত্র পাঞ্জাব ও মুলতানকে তাঁর রাজ্যভুক্ত করতে পেরেছিলেন। এমনকি এই দুটি ভারতীয় অঞ্চল দখল করার পিছনে তাঁর কোন গুরুতর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না। পাঞ্জাব ছিল ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশদ্বার। তাই উক্ত অঞ্চল দখল করে ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশের পথ তিনি নিরুপদ্রব করতে চেয়েছিলেন মাত্র।

ড. রোমিলা থাপার মনে করেন, মামুদের ভারত-আক্রমণের লক্ষ্য ছিল এদেশের অপরিমেয় ঐশ্বর্য এবং পাঞ্জাবের উর্বরা সমভূমি অঞ্চল। ভারতভূমিতে রাজনৈতিক আত্মপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্য দ্বারা মামুদ পরিচালিত হননি। কারণ ভারতের থেকে মধ্য-এশিয়ার রাজনীতির প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল বেশি। তাঁর রাজ্য গজনীর রাজনীতির সাথে মধ্য-এশিয়ার যোগ ছিল অনেক বেশি। ***ড. থাপার*** লিখেছেন। *"মামুদ ভারত-আক্রমণ সম্পর্কে কোন দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা করেননি। চীন ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের লাভজনক বাণিজ্য থেকে তাঁর আয় হত প্রচুর। তাই ভারতে রাজত্ব করার চেয়ে মধ্য-এশিয়ায় রাজত্ব করাই মামুদের কাছে অধিক আকর্ষণীয় ছিল।"* অধ্যাপক ***সতীশচন্দ্রও*** মনে করেন, সুলতান মামুদের ভারত-আক্রমণের সূচনাপর্ব অর্থাৎ হিন্দু শাহীরাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযানের লক্ষ্য ছিল সীমান্তবর্তী শত্রু রাজ্যের ধ্বংস করা এবং ভারতের সমৃদ্ধ অঞ্চলের প্রবেশের ছাড়পত্র অর্জন করা। অর্থাৎ তাঁর প্রাথমিক আক্রমণের পশ্চাতে ছিল পরবর্তী আক্রমণ শানানোর পথ তৈরি করার লক্ষ্য। তাই দেখা যায় ১০১০ থেকে ১০২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য ছিল মথুরা, থানেশ্বর, কনৌজ ও সোমনাথ প্রভৃতি অর্থাৎ যেখানকার মন্দিরগুলি ধনসম্পদের জন্য বিখ্যাত ছিল। এইসব স্থান দখল করার পরেই নির্বিচারে লুণ্ঠন চালিয়ে তিনি দ্রুত স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছেন। ভারতে সংগৃহীত ঐশ্বর্য দ্বারা তিনি শক্তি সংগ্রহ করে লিপ্ত

হয়েছেন মধ্য-এশিয়ার রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে। বিজিত স্থানে নিজস্ব প্রতিনিধি বসিয়ে বা অধিকার বজায় রেখে শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের কোন চেষ্টাই তিনি করেননি। এই কারণে ঐতিহাসিক ***স্মিথ***ও (V. A. Smith) সুলতান মামুদকে *'নিছক লুণ্ঠনকারী দস্যু' (A bandit operating on a large scale)* বলে অভিহিত করেছেন। ভারতের ভূমিখণ্ড নয়, ভারতের ধন-সম্পদ লুণ্ঠনই ছিল তাঁর সপ্তদশ অভিযানের মূল লক্ষ্য। মামুদের মধ্য-এশীয় নীতি ব্যাখ্যা করলে তাঁর লুণ্ঠনস্পৃহার প্রমাণ পাওয়া যায়। দেখা গেছে, ভারত অভিযানের প্রায় সাথে সাথে তিনি 'সিস্তান', 'খোরাসান', 'ঘুর' প্রভৃতি মধ্য-এশীয় রাজ্যগুলি আক্রমণ করে সেখানে স্থায়ী সরকার গঠনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে লুটপাট করেই ফিরে গেছেন স্বদেশে। তাই বলা চলে, ভারতের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন লুণ্ঠনকারী, কিন্তু মধ্য-এশিয়ায় তাঁর ভূমিকা ছিল সংগঠকের।

মামুদের ভারত-আক্রমণের প্রকৃতি হিসেবে *'লুণ্ঠনতত্ত্ব'* স্বীকার করে নিলেও বিতর্ক দেখা দেয় তাঁর ধর্মীয় চরিত্র প্রসঙ্গে। অর্থাৎ মামুদ কেবল রাজনৈতিক প্রয়োজনে অর্থসংগ্রহের জন্য ভারত-আক্রমণ করেছিলেন, নাকি লুণ্ঠনের সাথে সাথে ধর্মপ্রচারের প্রেরণাও তাঁকে ভারত-আক্রমণে প্ররোচিত করেছিল? মামুদের সভা-ঐতিহাসিক ***উতবি (Utbi)*** প্রচার করেন যে, গভীর ধর্মবোধ এবং অবিশ্বাসীদের মধ্যে তাকে প্রচার করার মহৎ উদ্দেশ্য দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সুলতান ***মামুদ*** ভারত আক্রমণে অগ্রসর হয়েছিলেন। *'তারিখ-ই-ইয়ামিনি'* গ্রন্থে তিনি লিখেছিলেন : *"Sultan Mahmud at first designed in his heart to go to Sijistan, but subsequently preferred to engage previously in a holy war against Hind."* উত্‌বির এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে কোন কোন ঐতিহাসিক মামুদের ভারত-অভিযানকে একটা ধর্মীয় চরিত্র প্রদান করেছেন। একথা ঠিক মামুদ বেছে বেছে হিন্দুমন্দিরগুলিকে আক্রমণ করেছেন। লুণ্ঠনের সঙ্গে সঙ্গে দেবদেবীর মূর্তিগুলিকেও কলুষিত করেছেন। বহু বন্দী ইসলামধর্ম গ্রহণের বিনিময়ে মুক্তি পেয়েছে। যুদ্ধরত সেনাদের মনোবল ও যুদ্ধস্পৃহা বৃদ্ধির জন্য তিনি তাদের মধ্যে *'গাজী'* হবার টোপ দিয়েছেন। ঐতিহাসিক ***ঈশ্বরীপ্রসাদ***ও মনে করেন, লুণ্ঠন ও ধর্ম যুগপৎ মামুদের ভারত-আক্রমণের প্রেরণা হিসেবে বর্তমান ছিল। তিনি লিখেছেন : *"রাজ্য নয়, সম্পদ ; বিজয় নয়, পৌত্তলিকদের ধ্বংসসাধন করাই ছিল তাঁর (মামুদের) ভারত-আক্রমণের লক্ষ্য" (Wealth and not territory, the extipation of idolatory and not conquest, were the objects of his raids.")*।

কিন্তু অধ্যাপক ***মহম্মদ হাবিব*** উপরিলিখিত বক্তব্যের সাথে একমত হতে পারেননি। তাঁর মতে, মামুদের মধ্যে ধর্মীয় গোঁড়ামি ছিল না। তাঁর ভারত-আক্রমণের পশ্চাতে ধর্মীয় প্রেরণা ছিল না, ছিল ধ্বংসের উন্মাদনা। ***হাবিবের*** ভাষায় : *" Mahmud was not a fanatic and his expeditions against India were not motivated by religion but by love of plunder."* একথা হয়তো সত্য যে, ভারতে আগত মুসলিম-আক্রমণকারীদের তুলনায় মামুদ ধর্মের ব্যাপারে কিছুটা নমনীয় ছিলেন। বহুক্ষেত্রেই অর্থপ্রদানের বিনিময়ে হিন্দুদের তিনি মুক্তি দিয়েছেন। তাঁর রাজ্য গজনীতেও হিন্দুদের প্রতি নমনীয় ব্যবহার করা হত। এমনকি অর্থলাভের সম্ভাবনা থাকলে তিনি নিজ ধর্মক্ষেত্র বাগদাদকেও বিধ্বস্ত করতে দ্বিধা করতেন না বলে অনেকে মনে করেন। ***হ্যাভেল*** *(Havell)* লিখেছেন : *"He would have sacked Bagdad with*

a little compunction as he plundered Somnath, if the undertaking had seemed as profitable." আপন ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং তার মহিমা প্রচার করার কোন লক্ষ্য হয়তো মামুদের ছিল না ; তবে মথুরা, সোমনাথ প্রভৃতি দেবস্থান ও দেবমূর্তির প্রতি তিনি যে নগ্ন আচরণ করেছেন, তাতে তাঁকে গোঁড়া ও পরধর্মদ্বেষী বলা চলে। ***মহম্মদ হাবিব***ও তাঁর এই আচরণের তীব্র নিন্দা করেছেন এবং এই কাজকে ইসলামের মূল আদর্শের পরিপন্থী বলেও বর্ণনা করেছেন।

যাই হোক্, মামুদের ভারত-আক্রমণের পশ্চাতে রাজ্যস্থাপন বা ধর্মপ্রচার—কোন ইচ্ছাই তদর্থে বর্তমান ছিল না, একথা বলা চলে। এ প্রসঙ্গে ড. ***রমেশচন্দ্র মজুমদারের*** মন্তব্যটি খুবই যথার্থ এবং মামুদের আক্রমণের চরিত্র বিশ্লেষণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি লিখেছেন ঃ *"মিশনারী উদ্দেশ্য নিয়ে ধর্মপ্রচার বা সাম্রাজ্যের সংগঠক হিসেবে মামুদ ভারতে আসেননি। তাঁর অভিযানগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ভারতের ধনসম্পদ লুণ্ঠন এবং এদেশীয় রক্ষকদের ধ্বংসসাধন।" ("He was neither a missionary for the propagation of religion in this country, not an architect of empire. The main object of his eastern expeditions seems to have been the acquisition of the 'wealth of India' and the destruction of the moral of its custodians.")*

মামুদ ভারতে কোন রাজ্য স্থাপন করেননি সত্য, কিন্তু তাঁর আক্রমণগুলি সম্পূর্ণ নিষ্ফলা ছিল, একথা বলা চলে না। ***প্রথমত,*** সুলতান মামুদ ভারতের অভ্যন্তরে ইসলামের বিজয়-পতাকা বহন করে এনেছিলেন এবং পরবর্তীকালে অন্যান্যরা সেই পথ ধরে ভারতে প্রবেশ করে এদেশে ইসলামের শাসন প্রবর্তন করেছিল। ড. ***মজুমদারের*** ভাষায় ঃ *"The Ghaznavid occupation of the punjub served as the key to unlock the gates of the Indian interior."* ***দ্বিতীয়ত,*** মামুদের একাধিক অভিযান এবং ভারতের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রাজার পরাজয় কিংবা আত্মসমর্পণ ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক দৈন্যকে প্রকট করে তুলেছিল। মামুদের উপর্যুপরি আক্রমণ, ধ্বংস ও লুণ্ঠন ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিল এদেশের রাজনৈতিক কাঠামোকে। ড. ***মজুমদারের*** ভাষায় ঃ *"Big cracks were made in the great fabric of Indian polity."* ***তৃতীয়ত,*** মামুদ ভারত থেকে লুণ্ঠন করে গজনীতে নিয়ে গিয়েছিলেন অপরিমেয় ধনসম্পদ। ভারতের বিভিন্ন মন্দিরে ও দুর্গে দীর্ঘদিন ধরে সঞ্চিত সম্পদের এত বিশাল ও দ্রুত বহির্গমন (Drain) এদেশের অর্থব্যবস্থায় গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছিল। আরব পণ্ডিত ***অলবেরুণী*** লিখেছেন ঃ *"Mahmud utterly ruined the prosperity of the country and performed those wonderful exploits by which the Hindus became like the atoms of dust, scattered in all direction ......"* ***চতুর্থত,*** মামুদ এদেশে সম্পদ লুণ্ঠনের সঙ্গে সঙ্গে যে ধ্বংসলীলা চালান, তার ফলে মথুরা, বৃন্দাবন, নগরকোট, সোমনাথ প্রভৃতি স্থানের বহু শিল্পসমৃদ্ধ মন্দির ও দুর্গ ধুলিসাৎ হয়েছিল। এই সকল রুচিসম্পন্ন ও কারুকার্যময় স্থাপত্য-শোভা থেকে বঞ্চিত হয়েছিল পরবর্তী প্রজন্ম। শুধু তাই নয়, অতঃপর সামরিক শক্তি-সঞ্চয়ের প্রয়োজনে সুকুমার কলার বিকাশ ব্যাহত হয়েছিল অনিবার্যভাবে। ***পঞ্চমত,*** অধ্যাপক ***হাবিব*** মনে করেন, এই আক্রমণের ফলে আধ্যাত্মিকতার দেশ ভারতবর্ষে ইসলামের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছিল নিদারুণ

ভাবে। মামুদের লোভ এবং নৃশংসতা এবং ইসলামের আদর্শ একাকার রূপে প্রতিভাত হয়েছিল আধ্যাত্মবাদী হিন্দুদের কাছে। ইসলামকে শান্তির দূত না ভেবে ধ্বংসের অপদেবতা বলে ভাবতে বাধ্য হয়েছিল তারা। মামুদকে ইসলামের গৃহশত্রু রূপে বর্ণনা করে তিনি বলেছিলেন ঃ *"He showed to the philosophical Hindus the darker and more tyrannical sode of Islam and the Hindus began to hate Islam for all times to come."*

আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, মামুদের এতগুলো আক্রমণ এবং তার করুণ পরিণতি সত্ত্বেও ভারতের সীমান্ত-সমস্যা সম্পর্কে ভারতীয় শক্তিবর্গ কোন শিক্ষা অর্জন করেননি। যৌথভাবে বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার কোন পরিকল্পনা তাঁরা নেননি। তাৎক্ষণিক আত্মরক্ষার চেষ্টা ছাড়া কোন দীর্ঘস্থায়ী সীমান্তরক্ষার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। মামুদের মৃত্যু সংবাদে এদেশের নৃপতিগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস নিয়েছিলেন ; কিন্তু উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে ভবিষ্যতে যে আবার কোন আক্রমণ আসতে পারে, সেকথা কেউই উপলব্ধি করতে পারেননি। তাই দ্বাদশ শতকের শেষদিকে ঐ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে মহম্মদ ঘুরী যখন ভারত আক্রমণ করলেন, ভারতীয় শক্তিবর্গ তখনও আত্মরক্ষায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হন।

○ মামুদের কৃতিত্বের মূল্যায়ন ঃ

এশিয়ার অগ্রণী মুসলমান শাসকদের অন্যতম 'ছিলেন গজনীর সুলতান মামুদ। ইরাক এবং ক্যাস্পিয়ান সাগর থেকে গঙ্গা পর্যন্ত বিস্তৃত এবং বাগ্‌দাদের খলিফার সাম্রাজ্য থেকে তুলনায় বৃহত্তর এক সাম্রাজ্যের সংগঠক ও অধীশ্বর ছিলেন তিনি। পুঁথিগত বিদ্যা তাঁর ছিল না। কিন্তু মানব-চরিত্র অনুধাবন করার ক্ষমতা ছিল তীব্র। তাঁর দৈহিক গড়ন ছিল কমনীয়তাবর্জিত, কিন্তু বলিষ্ঠ। স্বতন্ত্রভাবে মামুদ একজন দক্ষ সৈনিক বা সেনাপতিও ছিলেন না। কিন্তু তাঁর চরিত্রে এমন কিছু গুণের সমাবেশ ঘটেছিল, যা সম্মিলিতভাবে তাঁকে নেতা, সুলতান বা বিজেতার গৌরব অর্জনে সাহায্য করেছিল। ঐতিহাসিক ***শ্রীবাস্তব***-এর ভাষায় ঃ *"His outstanding virtue were cool courage, prudence and resourcefulness."* কিন্তু মামুদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ কেবল মধ্য-এশিয়া কিংবা গজনীতে সীমাবদ্ধ ছিল না। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গেও তাঁর রাজনৈতিক বা সামরিক জীবন বিজড়িত ; এবং এখানেই সৃষ্টি হয়েছে তাঁর কৃতিত্ব-বিচারের জটিলতা। কারণ মধ্য-এশিয়াতে তিনি ছিলেন সাম্রাজ্যের সংগঠক, কিন্তু ভারতে তিনি ছিলেন একজন ধর্মান্ধ লুণ্ঠনকারী। তাই কোন কোন পণ্ডিতের বিচারে সুলতান মামুদ ছিলেন ভয়ঙ্কর হিংস্র ও ধর্মান্ধ একজন মুসলমান শাসক, যিনি অস্ত্রের জোরে ভারতভূমিতে প্রতিষ্ঠা পেতে সচেষ্ট ছিলেন। আবার এক শ্রেণীর ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে মামুদ ছিলেন সাম্রাজ্যের সংগঠক, সুশাসক এবং শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক একজন সম্পূর্ণ সুলতান। এই বিতর্কের সুন্দর সমন্বয় খুঁজে পাওয়া যায় ড. ***ঈশ্বরীপ্রসাদের*** মন্তব্যে। তিনি লিখেছেন ঃ *"To the Muslims of his days, he was a Ghazi who tried to extirpate infidelity in heathen lands. To the Hindus, he is to this day a veritable Hun who destroyed their most sacred shrines and wantonly wounded their religious susceptibilities"* কিন্তু এই ধরনের গোষ্ঠীকেন্দ্রিক ব্যাখ্যা ইতিহাসের মূল্যায়ন হিসেবে চূড়ান্ত হতে পারে না। আসলে তিনি ছিলেন নিজ ধর্মের প্রতি

বিশ্বস্ত, উচ্চাকাঙক্ষী এবং বাস্তববাদী ব্যক্তিত্ব। মধ্যযুগীয় উপাদানের মধ্যেও নিজ ভাগ্য গড়ে তুলতে ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাই ***ঈশ্বরীপ্রসাদ*** মনে করেন, *"সামগ্রিকভাবে সুলতান মামুদ ছিলেন দক্ষ নেতা, ন্যায়পরায়ণ শাসক এবং গুণীজনের পৃষ্ঠপোষক, যার ভিত্তিতে তাঁকে মধ্যযুগীয় বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক বলা যায়।"*

মামুদের শাসন-কাঠামোর প্রকৃতি ও বিন্যাস সম্পর্কে আলোকপাত না-করলেও, সমকালীন লেখকেরা সুলতান মামুদকে একজন *'দক্ষ ও ন্যায়পরায়ণ শাসক'* বলে উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত, তাঁর রাজ্য কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল এবং প্রতিটি বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন একজন করে গভর্নর। ***উতবি*** তৎকালীন প্রাদেশিক শাসকদের দক্ষতা ও মানবতার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। প্রদেশগুলিতে আদায়ীকৃত রাজস্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব রাখতে হত। বিভিন্ন বাজার ও ব্যবসাকেন্দ্রের উপরেও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ বলবৎ ছিল। বিচারতত্ত্বের মর্মার্থ তাঁর অজানা ছিল না। তাই ন্যায়বিচার প্রণয়নের ব্যাপারে তাঁর কোন কুণ্ঠাও ছিল না। কথিত আছে, মামুদ ব্যভিচারের অপরাধে তাঁর এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন। নিজপুত্র মাসুদকে যথাসময়ে ঋণ প্রত্যাবর্তন না-করার অপরাধে অর্থদণ্ড দিতে বাধ্য করেছিলেন। মামুদের ন্যায়পরায়ণতা প্রসঙ্গে ***উতবি*** লিখেছেন ঃ *"The glorious lord of the poor who displayed equality between the widow and the wealthy so that the door of boasting and oppression was closed."*

মামুদ নিঃসন্দেহে অসাধারণ সামরিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। ছোট্ট এক পাহাড়ী রাজ্যকে তিনি যে বিশালতা দিয়েছিলেন, তা একজন সাধারণ সমর-নায়কের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাঁর বাহিনীতে ছিল বহুজাতির মানুষের সমাবেশ। আরব, আফগান, তুর্কী, হিন্দু প্রভৃতি নানা ধর্ম ও জাতির মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে তাদের কাছ থেকে সর্বোচ্চ সেবা আদায় করে নেবার অপূর্ব দক্ষতা তাঁর ছিল। কোন যুদ্ধে তিনি পরাজিত হননি। মধ্য-এশিয়ার দুর্ধর্ষ জাতিগুলিকে তিনি দমন করেছিলেন অনায়াসেই। ঐতিহাসিক ***লেনপুল*** সুলতান মামুদকে একজন *'মহান সৈনিক এবং দেহ ও মনের দিক থেকে অসীম সাহস ও অদম্য উৎসাহী'* বলে আখ্যায়িত করেছেন। গবেষক ***এস. এম. জাফর*** (S. M. Jaffar) মামুদের সামরিক প্রতিভার প্রশংসা করে লিখেছেন ঃ *"He was endowed with a genius of war, a scientific general, skillful in planning and through in execution."*

এই সময় ইরানীয় ভাবধারায় যে নবযুগের সূচনা হয়েছিল, তার সঙ্গেও মামুদ গভীরভাবে জড়িত ছিলেন। মামুদের উৎসাহে পারসিক সভ্যতা-সংস্কৃতির সাথে তুর্কীদের পরিচয় ঘটে এবং পরবর্তীকালে তা ভারতে প্রবেশ করে। রণাঙ্গনের দক্ষ যোদ্ধা মামুদ ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষা-সংস্কৃতির অনুরাগী ছিলেন। প্রতিভাবান *অলবেরুণী*, ইতিহাসবিদ্ *উতবি*, দার্শনিক *ফারাবি*, সুসাহিত্যিক *ফিরদৌসী* প্রমুখ বহু পণ্ডিত তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। এছাড়া কবি *আনসারী*, *উজারী*, *ফারুকী* প্রমুখ গুণিজনের সমাবেশ ঘটেছিল গজনীর রাজদরবারে। তাই ***লেনপুল*** লিখেছেন ঃ*"..... from the cities of Oxus and shores of the Caspian ; from Persia and Khorasan he pressed into his service the light of oriental letters."* গজনীতে মামুদ একটি বিশ্ববিদ্যালয়, জাদুঘর ও সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার নির্মাণ করে শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রসারে সহায়তা

করেন। শোনা যায়, অনিশ্চিত যুদ্ধাভিযানের মাঝেও তিনি কবিতা ও গান শোনার জন্য কিছুটা সময় ব্যয় করতে দ্বিধা করতেন না।

কায়ার পাশে যেমন ছায়ার অবস্থান, তেমনি সুলতান মামুদের চরিত্র ও কৃতিত্বের উজ্জ্বল আভার পাশে ধর্মান্ধতা, নৃশংসতা ও লালসার কালো ছায়ার অস্তিত্ব লক্ষণীয়। শিক্ষার উন্নয়নে তাঁর অবদান সীমাবদ্ধ ছিল সমাজের উচ্চশ্রেণীর মানুষের মধ্যে। জ্ঞানের জন্য শিক্ষা নয়, আত্মগৌরবের জন্য শিক্ষার পৃষ্ঠপোষণ ছিল তাঁর শিক্ষানুরাগের ভিত্তি। ভারতবর্ষের স্বার্থের বিচারে তিনি ছিলেন নিছক ধ্বংসকারী। ***শ্রীবাস্তবের*** ভাষায় ঃ "..... *a daring bandit, an avaricious plunderer and a wanton destroyer of Art.*" যে নৃশংসতার সাথে তিনি ভারতের মন্দির ও মূর্তি ধ্বংস করেছেন, তাতে আর যাই হোক্ তাঁকে আন্তরিকভাবে সংস্কৃতিমনা বলা যায় না। অধ্যাপক ***হাবিব*** সুলতান মামুদের এই অন্ধকারময় দিকটির কথা স্মরণ করে গভীর অনুতাপের সাথে লিখেছেন ঃ "*কোন সৎ ঐতিহাসিক এবং যে-কোন মুসলমান যার ইসলামের তত্ত্ব সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা আছে, মামুদের এহেন নীতিবিবর্জিত মন্দির ধ্বংস করাকে গোপন করবেন না বা কোন অজুহাতে তাকে সমর্থন করবেন না। ... হিন্দুদের পবিত্র উপাসনার স্থানগুলিকে অপবিত্র করাকে ইসলাম ও অন্যান্য সব ধর্মই নিন্দা করে।*" অর্থের প্রতি তাঁর লালসা ছিল সীমাহীন। কথিত আছে '*শাহনামা*'র প্রখ্যাত লেখক ফিরদৌসীকে তিনি প্রতিশ্রুত অর্থ দিতে অস্বীকার করেছিলেন। সমকালীন লেখকের বিবরণীতে দেখা যায়, মৃত্যুর মুহূর্তে তিনি সমস্ত সঞ্চিত সম্পদ তাঁর চোখের সামনে সাজিয়ে দেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ সকল বক্তব্যে অতিরঞ্জন হয়তো আছে, কিন্তু তাঁর অর্থলালসা ও হীনমন্যতা সম্পর্কে একটা আভাস এ থেকে পাওয়া সম্ভব।

শাসক হিসেবে তাঁর মধ্যে মৌলিকত্বের অভাব অবশ্যই ছিল। উদ্ভাবনী শক্তি দ্বারা প্রশাসনকে দক্ষ ও দৃঢ় করার চেষ্টা তিনি করেননি। ঐতিহাসিক ***লেনপুলের*** মতে, কোন নতুন সরকারী সংগঠন বা আইন তিনি উদ্ভাবন করেননি। ***লেনপুলের*** ভাষায় ঃ "***We hear of no laws or institutions or methods of government that sprang from his initiative.***" এই কারণে সুলতান মামুদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে। ড. ***ঈশ্বরীপ্রসাদ*** মনে করেন, "*সুলতান মামুদের সাম্রাজ্যের কোন সাংগঠনিক ভিত্তি ছিল না। বিরাট অঞ্চলে বিস্তীর্ণ নানা জাতির এই অসংবদ্ধ রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছিল কেবলমাত্র অস্ত্রের জোরে।*" তাই জনৈক রহস্যবাদী মুসলমান লেখক বলেছেন ঃ "*শাসক হিসেবে মামুদ ছিলেন মূর্খ। তাই বর্তমান রাজ্যকে নিশ্চিত নিরাপদ না-করেই, বার বার নতুন রাজ্যজয়ে প্রলুব্ধ হয়েছিলেন।*" *(He is a stupid fellow. Without being able to manage what he already possesses he yet goes out to conquer new countries.")*। অর্থ-সম্পদের প্রতি অস্বাভাবিক লালসা তাঁর রাজ-চরিত্রকে নিঃসন্দেহে কলুষিত করেছে। লুণ্ঠন ও ব্যক্তিগত সম্পদসংগ্রহের যে দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করেছিলেন, তাতে সাম্রাজ্যের ভিত সবল হয়নি, দুর্বল হয়েছে। সেনাবাহিনী বা প্রজাসাধারণের মধ্যে কোন জাতীয়তাবোধ গড়ে ওঠেনি এবং সে চেষ্টাও তিনি করেননি।

উপরিউক্ত সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটি সত্ত্বেও সুলতান মামুদ মধ্যযুগীয় শাসকদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান রূপে স্বীকৃত। গজনীকে মধ্য-এশিয়ার অন্যতম শক্তিশালী রাজ্যে উন্নীত করার কৃতিত্ব তাঁরই। অন্যদিকে ভারতভূমিতে তুর্কী শাসনের পথপ্রদর্শকও ছিলেন সুলতান মামুদ। এ

প্রসঙ্গে *মহম্মদ হাবিব* যথার্থই বলেছেন, *"সমসাময়িকদের কাছে সুলতান মামুদের উজ্জ্বল ভাবমূর্তির মূল কারণ তাঁর চরিত্র নয়, তাঁর দক্ষতা এবং সাফল্য।"*

○ মামুদের উত্তরাধিকারীদের আমলে ভারত ঃ

সুলতান মামুদের মৃত্যুর (১০৩০ খ্রীঃ) পরেও দেড়শো বছর ইয়ামিনি বংশ গজনী শাসন করে এবং ভারতের পাঞ্জাব অংশে গজনীর প্রতিনিধিদের শাসন চলতে থাকে। অবশ্য এই পর্বে গজনীতে ইয়ামিনি বংশের অস্তিত্ব যেমন শব্দবর্ণহীন ছিল, ভারতেও তেমনি একটা স্থাণু কর্তৃত্ব তাদের নামের সাথে যুক্ত ছিল। মামুদ তাঁর সাম্রাজ্য দুই পুত্র মাসুদ ও মহম্মদের মধ্যে বণ্টন করে গিয়েছিলেন। কিন্তু মাসুদ (১০৩১-'৪১ খ্রীঃ) সেই ব্যবস্থা মানতে অস্বীকার করেন এবং মহম্মদকে বন্দী করে গোটা সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব দখল করেন। *ফেরিস্তার* বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, মাসুদও পিতার মত নানা সদ্‌গুণের অধিকারী ছিলেন। ব্যক্তিত্ব, সাহসিকতা, উদারতা, শিক্ষানুরাগ ইত্যাদি তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। তখন ভারতে গজনীর শাসক-প্রতিনিধি ছিলেন আরিয়ারুক। স্বাধীনতাকামিতা এবং তহবিল আত্মসাৎ-এর অভিযোগে তাঁকে গজনীতে আহ্বান করে হত্যা করা হয় এবং ভারতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন নিয়ালতিগিন। বারাণসী আক্রমণ করে (১০৩৩ খ্রীঃ) নিয়ালতিগিন প্রচুর সম্পদ সংগ্রহ করেন। তবে মাসুদের কাছে সত্য গোপন করে রাখেন। পাঞ্জাবে তাঁর শত্রুপক্ষের প্ররোচনায় মাসুদ নিয়ালতিগিনকে দমন করার জন্য তাঁর ধর্মান্তরিত হিন্দু সেনাপতি তিলককে ভারতে প্রেরণ করেন। তিলক অল্পদিনের মধ্যেই নিয়ালতিগিনকে হত্যা করেন এবং ভারতের গভর্নর নিযুক্ত হন মামুদের পুত্র মাসুদ (১০৩৬ খ্রীঃ)। এই সময় মাসুদ ভারত অভিযান করে পঞ্জাবের হান্সীদুর্গ দখল করে প্রচুর ধনসম্পদ ও বন্দী-দাস সংগ্রহ করেন। সোনিপতের রাজা মাসুদকে প্রচুর অর্থ প্রদান করে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে নেন।

মাসুদ গজনীতে প্রত্যাবর্তন করেই সেলজুক-তুর্কীদের আক্রমণের মুখে পড়েন। ১০৪০ খ্রীষ্টাব্দে সেলজুক-তুর্কীদের কাছে পরাজিত হবার পর মাসুদ ভারতে চলে আসার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু পথিমধ্যে বিদ্রোহী সেনারা মাসুদকে বন্দী এবং হত্যা করে এবং তাঁর ভ্রাতা মহম্মদকে গজনীর সিংহাসনে বসায়। অবশ্য কিছুকালের মধ্যেই মাসুদের পুত্র মাদুদ মহম্মদকে হটিয়ে সিংহাসন পুনর্দখল করে নেন। মাদুদ ১০৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর পুত্রদ্বয় মামুদ এবং মনসুরকে যথাক্রমে লাহোর ও পেশোয়ারের শাসক নিযুক্ত করেন। অবশ্য এঁরা ছিলেন নামে মাত্র শাসক। প্রকৃত অর্থে এই অঞ্চলে এঁদের কোন রাজকীয় কর্তৃত্ব ছিল না। ওদিকে গজনীতেও ইয়ামিনিদের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং সেলজুক-তুর্কীদের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক প্রাধান্য গজনীর প্রশাসনে অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা প্রকট করে তোলে। তৃতীয় মাসুদের মৃত্যুর পর (১১১৫ খ্রীঃ) সেলজুক-তুর্কীরা ইয়ামিনিবংশের উত্তরাধিকার প্রশ্নেও হস্তক্ষেপ করে এবং তাদের সাহায্য ও সমর্থন নিয়ে বাহরাম গজনীর সিংহাসনে বসেন। এই বিশৃঙ্খলার যুগে আমীর-মালিকদের ক্ষমতা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। শেষ পর্যন্ত ঘুর রাজ্যের সাসাবনী বংশীয় শাসক গিয়াসউদ্দিন ঘুরীর নির্দেশে তাঁর ভাই শিয়াবউদ্দিন মহম্মদ ১১৬৯ খ্রীষ্টাব্দে গজনী আক্রমণ ও দখল করে ঘুর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। অবশ্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুমতিক্রমে শিহাবউদ্দিন স্বাধীনভাবে গজনী শাসন করতে শুরু করেন।

শিহাবউদ্দিন পরে *'মুইজুদ্দিন মহম্মদ-বিন্-সাম'* উপাধি গ্রহণ করেন। ভারতের ইতিহাসে মুইজুদ্দিন 'মহম্মদ ঘুরী' নামেই বেশি পরিচিত।

○ ঘুর রাজ্যের উত্থান ঃ

গজনীর সুলতান মামুদ সতের বার ভারত আক্রমণ করলেও পাঞ্জাব ও মুলতান ছাড়া কোন ভারতীয় অঞ্চলে গজনীর শাসন কায়েম করেননি। সুলতান মামুদের মৃত্যুর পর তাঁর দুর্বল বংশধরদের আমলে গজনী তার পূর্বগৌরব দ্রুত হারিয়ে ফেলে এবং মধ্য-এশিয়ার রাজনীতিতে দুটি নতুন রাজ্যের উদ্ভব ঘটে। এগুলি হলো *'ঘুর'* ও *'খারিজম'* রাজ্য। ঘুর রাজ্য গড়ে উঠেছিল আফগানিস্তানের উত্তর-পশ্চিমে গজনী ও হীরাটের মধ্যবর্তী পার্বত্য অঞ্চলে। খারিজম রাজ্য ছিল ইরানকে কেন্দ্র করে। দশম শতকে ইরানীয় তাজিক বংশ ঘুর রাজ্যে স্বাধীনভাবে শাসন পরিচালনা করত। এই বংশ ইতিহাসে *'সাসাবনী বংশ'* নামে বেশি পরিচিত। সুলতান মামুদ ১০০৯-১০ খ্রীষ্টাব্দে ঘুরের শাসক মহম্মদ-বিন্-সুরিকে পরাজিত করে ঘুর রাজ্যটি গজনীর অন্তর্ভুক্ত করে নেন। অতঃপর ঘুরীরা গজনীর সামন্ত হিসেবে শাসনকার্য চালাতে থাকেন। কিন্তু ঘুর রাজ্যের স্বাধীনতাস্পৃহা সদা জাগরুক ছিল। মামুদের মৃত্যুর পর গজনী কিছুটা দুর্বল হয়ে গেলে ঘুরীরাও স্বাধীনতা লাভের জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠেন। গজনীর সুলতান বাহরাম-এর আমলে ঘুরের সৈফুদ্দিন ঘুরী গজনী আক্রমণ করে জয়লাভ করেন। অবশ্য তা ছিল ক্ষণস্থায়ী। এবং পরিণামে বাহরাম সৈফুদ্দিনকে বন্দী ও হত্যা করেন। কিন্তু আলাউদ্দিন হুসেন-এর আমলে ঘুর রাজ্য যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে ওঠে। আলাউদ্দিন গজনী আক্রমণ করে ঐ সুসজ্জিত নগরীকে আগুনে ভস্মীভূত করেন এবং *'জাহানসোজ'* বা *'পৃথিবী-দহনকারী'* উপাধি ধারণ করেন। আলাউদ্দিনের সময় থেকেই ঘুর রাজ্যের উত্থান সূচিত হয়। তিনি বামিয়ান, তুর্কীস্তান, জিরুন, বাস্ত, গর্জীস্তান, হীরাট প্রভৃতি অঞ্চল ঘুর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। অবশ্য রাজত্বের শেষদিকে বল্খ, হীরাট ও তুর্কীস্তান তাঁর হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। আলাউদ্দিনের পুত্র সৈফুদ্দিনের মৃত্যুর পর ঘুর রাজ্যের শাসক হন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র গিয়াসউদ্দিন। গিয়াসউদ্দিন গজনীসহ কয়েকটি হৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধার করেন। রাজ্যবিস্তারের সূত্রে খারিজম রাজ্যের সাথে ঘুর রাজ্যের সংঘাত দেখা দেয়। খারিজম সাম্রাজ্যের উত্থানের ফলে মধ্য-এশিয়ায় ঘুরীদের রাজ্যলিপ্সা ধাক্কা খায়। খোরাসানের উপর কর্তৃত্বের প্রশ্নে এই দুই শক্তির দ্বন্দ্ব প্রবল আকার ধারণ করে। শেষ পর্যন্ত শক্তিশালী খারিজম শাহ্-র হাতে ঘুরীরা পরাজিত হয়। উত্তর-পশ্চিমে কেবল হীরাট ও বল্খ ঘুরীদের দখলে থাকে। এমতাবস্থায় মধ্য-এশিয়ার পরিবর্তে ভারতবর্ষের দিকে ঘুরীদের সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হয়।

○ মহম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযান ঃ

ঘুর রাজ্যের শাসক গিয়াসউদ্দিন গজনী পুনর্দখল করার পর তাঁর ভাই শিহাবউদ্দিন ওরফে মুইজউদ্দিন মহম্মদকে স্বাধীনভাবে তা শাসন করার দায়িত্ব দেন (১১৭৩ খ্রীঃ) অবশ্য শিহাবউদ্দিন নিজমুদ্রায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম উল্লেখ করে নিজেকে অধীনস্থ শাসক হিসেবে বর্ণনা করে এক অনবদ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তাই অধ্যাপক *মহম্মদ হাবিব* মন্তব্য করেছেন যে, প্রাচ্যের রাজবংশগুলির মধ্যে একমাত্র সামানিদবংশ ভ্রাতৃকলহ ও দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত ছিল এবং এটিই ছিল

তাদের সাফল্য ও অগ্রগতির প্রধান কারণ। যাই হোক্, *শিহাবউদ্দিনই ভারত-ইতিহাসে 'মহম্মদ ঘুরী' নামে সমধিক পরিচিত* এবং তাঁর নেতৃত্বেই শুরু হয়েছিল ভারতের বিরুদ্ধে তুর্কো-আফগানদের সফল ও সুদূরপ্রসারী অভিযান। ব্যক্তিগত ভাবে মহম্মদ ঘুরী ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও কর্মোদ্যোগী। সামরিক গৌরব অর্জনের সাথে সাথে একটা সুবৃহৎ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হওয়ার ইচ্ছা ছিল তাঁর প্রবল। প্রতিদ্বন্দ্বী খারিজিম সাম্রাজ্যের সাথে সংঘর্ষ এড়িয়ে নিজ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য তিনি হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করে ভারত ভূখণ্ড দখলের কর্মসূচী নেন। তাছাড়া আফগান সীমান্তে পাঞ্জাব ও লাহোরে তখনও চলছিল ঘুরীদের অন্যতম শত্রু গজনীবংশীয়দের শাসন। সুলতান মামুদের বংশধর খসরু শাহ (বা খসরু মালিক) তখন পাঞ্জাবে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাই মহম্মদ ঘুরী প্রথমেই পাঞ্জাব দখল করে শত্রু-সাম্রাজ্যের অবসান ঘটাতে উৎসাহ বোধ করেন। এই রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তার সাথে যুক্ত হয়েছিল আর্থিক ও ধর্মীয় প্রেরণা। ভারতবর্ষের ধন-সম্পদ সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট অবহিত ছিলেন। ভারত-আক্রমণ করে সেইসব সম্পদ সংগ্রহ করে নিজ সামরিক শক্তিকে দৃঢ় করার পরিকল্পনাও তাঁর ছিল। অধিকাংশ ঐতিহাসিক মনে করেন, মহম্মদ ঘুরীর ভারত-আক্রমণের পশ্চাতে ইসলামধর্মের প্রসার এবং পৌত্তলিকতার অবসান ঘটানোর একটা গোপন ইচ্ছাও সক্রিয় ছিল। তবে সেটা ছিল একান্তই ইচ্ছা, মূল লক্ষ্য নয়।

খারিজম শাহী রাজ্যের শক্ত প্রতিরোধ যেমন মহম্মদ ঘুরীকে উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে নিস্পৃহ করেছিল, তেমনি দ্বাদশ শতকে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা তথা শক্তিশালী কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অভাবজনিত শূন্যতা তাঁকে ভারত-আক্রমণে উৎসাহিত করেছিল। সুলতান মামুদের আক্রমণ থেকে ভারতীয় রাজন্যবর্গ কোন শিক্ষাই নেননি। মামুদের মৃত্যুসংবাদে তাঁরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন এবং পুনরায় লিপ্ত হয়েছিলেন আত্মকলহে। মামুদের পরেও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপথ ধরে যে বহিঃশত্রুর আক্রমণ ঘটতে পারে, এই দূরদৃষ্টি তাঁদের ছিল না। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে সুলতান মামুদের দুর্বল বংশধরদের রাজত্ব উত্তর ভারতের রাজন্যবর্গের কাছে ভীতি নয়, ভরসার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাঁরা পাঞ্জাব-লাহোরের গজনীবংশীয়দের শাসনকে বিব্রত না-করে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতিকে যথার্থ বিবেচনা করেছিলেন। এতে অতিরিক্ত সুবিধা পেয়েছিলেন মহম্মদ ঘুরী। মুলতান এবং সিন্ধু-অঞ্চলও গজনীর মামুদ দখল করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে পরেই এগুলি গজনীর কর্তৃত্ব থেকে স্বাধীন হয়ে যায়। মহম্মদ ঘুরীর আক্রমণের প্রাক্কালে মুলতান এবং সিন্ধুতে যথাক্রমে 'কার্মাথীয়' এবং 'সুমার' নামক স্থানীয় উপজাতিগোষ্ঠীর কর্তৃত্ব কায়েম ছিল।

সীমান্তবর্তী সিন্ধু, পাঞ্জাব এবং মুলতান ক্ষমতাসীন দুর্বল মুসলমান শাসনব্যবস্থা যেমন মহম্মদ ঘুরীর ভারত-অভিযানকে সম্ভাবনাময় করেছিল, তেমনি উত্তর ভারতের রাজপুত শক্তিগুলির গোষ্ঠী-দ্বন্দ্বও তাঁর সাফল্যের সহায়ক হয়েছিল। সুলতান মামুদ কনৌজ পর্যন্ত অগ্রসর হলেও গাঙ্গেয় সমভূমির পূর্বদিকে তাঁর ধ্বংসলীলা ও লুণ্ঠন ততটা বিধ্বংসী ছিল না। তাই মামুদের অভিযানের অল্পকালের মধ্যেই কনৌজ তার গৌরব পুনরুদ্ধার করে এবং বিভিন্ন রাজপুতগোষ্ঠী মর্যাদার প্রতীক 'কনৌজ' দখলের প্রতিযোগিতায় আবার মত্ত হয়ে ওঠে। দিল্লি-আজমীরে চৌহানবংশ, মালবে পরমারবংশ, গুজরাটের নিকট কাথিয়াবাড়ে শোলাঙ্কি বংশ, কনৌজে গাহড়বাল বংশ, বুন্দেলখণ্ডের চান্দেল বংশ ইত্যাদি প্রত্যেকেই নিজ নিজ

সীমানাবৃদ্ধির ইঁদুরদৌড়ে লিপ্ত থেকে নিজেদেরই অন্তঃসারশূন্য করতে থাকে। তৃতীয় পৃথ্বীরাজের নেতৃত্বে চৌহানরা এইসময় বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। শোলাঙ্কিরাও এই সময় চিতোর মালব প্রভৃতি দখল করে নিলে চৌহানদের সাথে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। শোলাঙ্কিরা এই সংঘর্ষের ফলে দুর্বল হয়ে পড়ে। সেই সুযোগে পরমাররা মালব পুনরুদ্ধার করে নেয়। পৃথ্বীরাজ পাঞ্জাব আক্রমণ করে ভাতিন্দা দখল করতে সক্ষম হন। চান্দেল্লরাজ্য আক্রমণ করে তিনি মাহবা দখল করেন। কিন্তু পৃথ্বীরাজের সামরিক অগ্রগতি অন্যান্য রাজপুত রাজাদের ঈর্ষান্বিত করে তোলে। সামাজিক কারণেও অন্যান্য রাজপুত রাজাদের সাথে পৃথ্বীরাজের সুসম্পর্ক ছিল না। চারণ-কবি ***চাঁদ বরদাই*** রচিত 'পৃথ্বীরাজরসো' থেকে এই চৌহান রাজার রোমাঞ্চকর বিবাহ-কাহিনী এবং সামাজিক বিরোধের কাহিনী জানা যায়। কথিত আছে পৃথ্বীরাজ কনৌজের রাজকন্যা সংযুক্তাকে তাঁর পিতার অমতে জোরপূর্বক, অবশ্য সংযুক্তার ইচ্ছানুযায়ী বিবাহ করার জন্য কনৌজরাজ জয়চাঁদ প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন এবং পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে আক্রমণকারী মহম্মদ ঘুরীকে সাহায্য করেন। এইভাবে ব্যক্তিগত ক্রোধে ও প্রতিশোধ-স্পৃহা চরিতার্থ করতে গিয়ে জয়চাঁদ দেশদ্রোহিতা করেন। একইভাবে চেদী, কলচুরি বা গুহিল বংশীয় রাজপুতরাও ক্রমাগত সংঘর্ষে লিপ্ত থেকে মহম্মদ ঘুরীর ভারত-বিজয়ের পথ প্রশস্ত করে দেয়।

উত্তর-পূর্ব ভারতে পাল ও সেন বংশের নেতৃত্বে শক্তিশালী রাজতন্ত্রের যে সম্ভাবনা দশম-একাদশ শতকে অনুভূত হচ্ছিল, দ্বাদশ শতকে তা-ও বিলীন হয়ে যায়। রামপালের নেতৃত্বে পতনোন্মুখ পালসাম্রাজ্য নবজীবন লাভ করলেও, দ্বাদশ শতকে তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পালসাম্রাজ্য আবার বিচ্ছিন্নতার অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যায়। মহম্মদ ঘুরীর আক্রমণের সময় উত্তর ভারতের ক্ষুদ্রাংশে পালবংশ অগৌরব ও অবহেলার মাঝে টিকে ছিল মাত্র। সেনবংশীয় রাজারা বাংলাদেশে পাল সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের উপর নতুন সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করলেও, বিজয় সেন (১০৯৭-১১৫৯ খ্রীঃ) বা বল্লাল সেন (১১৫৯-'৭০ খ্রীঃ)-এর আমলে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব লক্ষ্মণ সেন (১১৭০-১২০৬ খ্রীঃ)-এর আমলে শিথিল হয়ে পড়েছিল। এই সুযোগে মাথা চাড়া দিয়েছিল সামন্ততান্ত্রিক প্রবণতা। এইরূপ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মহম্মদ ঘুরী ভারত-আক্রমণ করে খুব সহজেই সাফল্য অর্জন করেন।

১১৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ঘুরী গোমাল গিরিপথের মধ্য দিয়ে সিন্ধু-উপত্যকায় উপস্থিত হন এবং কার্মাথীয় শাসককে পরাজিত করে মুলতান দখল করেন। পরের বছরেই তিনি উচ্ সহ সিন্ধু দখল করেন। ১১৭৮ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ঘুরী রাজপুতানার মরুভূমি অতিক্রম করে গুজরাট দখলের চেষ্টা করেন। কিন্তু মাউন্ট আবুর নিকট *'অনহিলবারের যুদ্ধে'* গুজরাটরাজ ভীমদেবের হাতে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হয়ে স্বরাজ্যে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। এই পরাজয়ের পরে ঘুরী উপলব্ধি করেন যে, পাঞ্জাবে একটি সুদৃঢ় ঘাঁটি না-থাকলে ভারতের বিরুদ্ধে সাফল্য অর্জন সহজ হবে না। তাই তিনি প্রথমে পাঞ্জাবের গজনীবংশীয় শাসক খসরু মালিকের বিরুদ্ধে অভিযান পাঠান। ১১৭৯ খ্রীষ্টাব্দে পেশোয়ার তাঁর দখলে আসে। ১১৮৫ খ্রীষ্টাব্দে আবার পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে ঘুরী শিয়ালকোট পর্যন্ত অগ্রসর হন। খসরু মালিক এবং খোক্কর উপজাতির দৃঢ় প্রতিরোধের মুখে মহম্মদ ঘুরী আপাতত আর অগ্রসর হওয়া থেকে বিরত থাকেন। অতঃপর

মহম্মদ ঘুরী খসরু মালিকের শত্রু জম্মুর রাজা চক্রদেবের সাথে হাত মিলিয়ে পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন (১১৮৬ খ্রীঃ)। কিন্তু সোজাপথে লাহোর দখল করতে ব্যর্থ হয়ে তিনি চাতুরির আশ্রয় নেন এবং মিত্রতার অজুহাতে খসরু মালিককে আমন্ত্রণ জানিয়ে আচমকা বন্দী করেন এবং লাহোর অধিকার করেন। অতঃপর ঘুরী দিল্লী ও গাঙ্গেয় দোয়াব অভিমুখে অগ্রসর হবার সিদ্ধান্ত নিলে চৌহানরাজ পৃথ্বীরাজের সাথে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে।

○ তরাইনের যুদ্ধ ঃ

ইতিমধ্যে আজমীরে চৌহানবংশীয় পৃথ্বীরাজের অভিষেকের কয়েক বছরের মধ্যে রাজপুতানার রাজনীতির দ্রুত পটপরিবর্তন ঘটেছিল। বহু কাহিনী ও কিংবদন্তীর নায়ক পৃথ্বীরাজ রাজস্থানের ছোট ছোট রাজ্যকে বিধ্বস্ত করে আজমীরের রাজ্যসীমা দ্রুত বৃদ্ধি করেছিলেন। মাহবা'র সন্নিকটে চন্দেল-রাজাকে পরাজিত করে পৃথ্বীরাজ গুজরাট আক্রমণ করেন। কিন্তু গুজরাটের শাসক ভীমদেবের কাছে তিনি পরাজিত হন। রাজ্যলিপ্সু পৃথ্বীরাজ গুজরাটের কাছে বাধা পাওয়ার ফলে পাঞ্জাব ও গাঙ্গেয় উপত্যকার দিকে সম্প্রসারণ নীতি গ্রহণ করেন। এখন মহম্মদ ঘুরী ও পৃথ্বীরাজের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। মহম্মদ ঘুরী লাহোর দখল করার পর আকস্মিক ভাতিন্দা (বা তরবার হিন্দ্) আক্রমণ করেন। ফেরিস্তার বিবরণ অনুযায়ী পৃথ্বীরাজ এই আক্রমণের আকস্মিকতায় প্রথমে কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। অবশ্য দ্রুত তিনি নিজেকে সামলে নেন এবং অবিলম্বে মহম্মদ ঘুরীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। ১১৯১ খ্রীষ্টাব্দে থানেশ্বরের নিকটবর্তী তরাইনের প্রান্তরে উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। রাজপুত-বাহিনী মুসলমানদের ভীষণভাবে বিধ্বস্ত করে। রাজপুত সেনাপতি স্কন্দ এই যুদ্ধে দারুণ বীরত্বের স্বাক্ষর রাখেন। এমনকি মহম্মদ ঘুরীও দারুণ আহত হন এবং জনৈক খলজী অশ্বারোহী সৈনিকের সাহায্যে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ রক্ষা করেন। ঘুরীর অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান-বাহিনী প্রতিরোধ-শক্তি হারিয়ে পিছু হটতে থাকে। রাজপুতগণ প্রায় ৪০ মাইল তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে যায়। সম্ভবত ইতিপূর্বে মুসলমান-বাহিনী এমন জঘন্যভাবে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হয়নি। **Lanepool** লিখেছেন ঃ *"Never had the armies of Islam been so worsted by the infidels."* সন্ত্রস্ত মহম্মদ ঘুরী লাহোরে থাকাটাও নিরাপদ নয় চিন্তা করে সোজা ঘুর রাজ্যে ফিরে যান। পৃথ্বীরাজ এক বছর অবরোধের পর ভাতিন্দা দখল করতে সক্ষম হন। কিন্তু তরাইনের প্রথম যুদ্ধে বিজয়ের সুফল আহরণ করার কোন চেষ্টা করেননি। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, তৎকালীন ভারতীয় নৃপতিদের রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতা থেকে তিনিও মুক্ত ছিলেন না। তাই তিনিও ভেবেছিলেন যে, মহম্মদ ঘুরী পাঞ্জাবের অধিকার নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবেন। এই সুযোগে পাঞ্জাব থেকে মুসলমানদের বিতাড়িত করে ভবিষ্যৎ আক্রমণের সম্ভাবনা বিনষ্ট করার কোন চেষ্টাই পৃথ্বীরাজ করেননি। এমনকি পলায়মান মুসলিম সৈনিকদের বন্দী করে মহম্মদ ঘুরীর সামরিক শক্তির ভিতটাকে ভেঙে দেবার কথাও তিনি ভাবেননি।

মহম্মদ ঘুরী পরের বছরেই (১১৯২ খ্রীঃ) প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী সহ পৃথ্বীরাজকে আক্রমণ করেন। ঘুর আক্রমণের তীব্রতা উপলব্ধি করে পৃথ্বীরাজ

উত্তর-ভারতের অন্যান্য রাজপুত রাজাদের সংঘবদ্ধ হবার ও সাহায্যদানের আবেদন জানান। এই আবেদনে সাড়া দিয়ে অনেকেই তাঁকে সাহায্য পাঠান। কিন্তু সংযুক্তার সাথে পৃথ্বীরাজের বিবাহের ঘটনায় ক্ষুব্ধ কনৌজের রাজা তথা সংযুক্তার পিতা জয়চাঁদ পৃথ্বীরাজের বিরোধিতা করেন। অবশ্য আধুনিক পণ্ডিতদের মতে, সংযুক্তা-পৃথ্বীরাজ প্রণয়োপাখ্যান *'পৃথ্বীরাজরসো'* গ্রন্থটিই কল্পনাভিত্তিক। কারণ এই উপাখ্যানে এমন অনেক ঘটনার বিবরণ আছে, যা বাস্তবে সম্ভব নয়। তাই মনে হয়, পৃথ্বীরাজের নেতৃত্বে চৌহানবংশের উত্থানে কনৌজের রাঠোরবংশ ঈর্ষান্বিত ও শঙ্কিত ছিল। তাই পৃথ্বীরাজের ধ্বংস কামনায় তারা এই যুদ্ধে নিস্পৃহ থাকে। যাই হোক্, সংখ্যার বিচারে উভয় বাহিনী প্রায় সমান হলেও, তুর্কী অশ্বারোহী ও তীরন্দাজ বাহিনীর ক্ষিপ্রগতি ও রণকৌশলের কাছে রাজপুত-বাহিনী আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। তুর্কী সেনারা হান্‌সি, সরস্বতী ও সামানা দুর্গগুলি দ্রুত দখল করে নেয়। অবশ্য পৃথ্বীরাজের শেষ পরিণতি সম্পর্কে একাধিক মত প্রচলিত আছে। ***মিন্‌হাজউদ্দিনের*** মতে, মহম্মদ ঘুরী যুদ্ধের পরে পরেই পৃথ্বীরাজ ও তার ভাইকে নরকে পাঠিয়ে দেন (হত্যা করেন)। ***চাঁদ বরদাই***-এর মতে, পৃথ্বীরাজকে বন্দী করে গজনীতে এনে মহম্মদ ঘুরী নিজে হত্যা করেন। কিন্তু ***হাসান নিজামীর*** মতে, বন্দী পৃথ্বীরাজকে ঘুরী আজমীরে নিয়ে যান এবং তাঁর বশ্যতা স্বীকারের বিনিময়ে আরো কিছুদিন আজমীর শাসনের দায়িত্ব দেন। তবে কিছুদিন পরে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে পৃথ্বীরাজকে হত্যা করে তাঁর পুত্রকে আজমীরের শাসক নিয়োগ করা হয়। এই মতটাই অধিকাংশ পণ্ডিত গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন। কারণ সমকালীন কিছু মুদ্রায় এক পিঠে *'পৃথ্বীরাজদেব'* এবং অন্য পিঠে *'শ্রীমহম্মদ সাম'* লেখাগুলি খোদিত ছিল। এইসব মুদ্রা নিজামীর বক্তব্যকেই সমর্থন করে।

তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ (১১৯২ খ্রীঃ) ভারতের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। এই যুদ্ধে চৌহানবীর পৃথ্বীরাজের পরাজয়ের প্রতিক্রিয়া ছিল সুদূরপ্রসারী। এই যুদ্ধে বিজয়ের অব্যবহিত পরেই অবশ্য মহম্মদ ঘুরী এদেশের শাসন-দায়িত্ব সরাসরি নিজের হাতে নেননি; তবে এই জয়লাভের ফলে তিনি নতুন উদ্যমে ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশের চেষ্টা করেন। অতঃপর মূলত তাঁর প্রতিনিধিরাই নতুন নতুন ভূখণ্ডে তুর্কী আধিপত্য প্রসারিত করেন। 'তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে মহম্মদ ঘুরীর সাফল্য একদিকে যেমন ভারতীয় রাজপুত জাতির রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা স্পষ্ট করে দেয়, তেমনি ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে অ-হিন্দু বহিরাগত তুর্কীদের অধিষ্ঠানের সম্ভাবনা উজ্জ্বল করে। মহম্মদ ঘুরীর এই সাফল্যকে ভিত্তি করে অল্পকালের মধ্যে ভারতে সুলতানি শাসনের প্রতিষ্ঠা ঘটে। তুর্কী শাসনের সূত্রে ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও গুরুতর পরিবর্তনের সূচনা করে। এই যুদ্ধে ভারতীয় সামরিক পদ্ধতির ত্রুটি ও দুর্বলতা আক্রমণকারীদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। চরম বিপদের মুহূর্তেও রাজপুত শক্তিগুলি সংকীর্ণ গোষ্ঠীস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে পৃথ্বীরাজের আহ্বানে সাড়া দিতে ব্যর্থ হন। এই সত্য মহম্মদ ঘুরীকে নতুন প্রেরণা দেয়। তাই ঐতিহাসিক ***ভি.স্মিথ.*** (V.Smith) লিখেছেন ঃ "*It may be regarded as the decisive contest which assured the ultimate success of Muhammadan attack on Hindustan.*" এই পরিণতির জন্য পৃথ্বীরাজের অদূরদর্শিতা এবং ব্যক্তিগত ত্রুটি বিচ্যুতিও কম দায়ী ছিল না। আগেই দেখেছি যে, তরাইনের প্রথম যুদ্ধের পর পৃথ্বীরাজের

কৌশলগত ত্রুটি মহম্মদ ঘুরীকে পুনরায় শক্তিসঞ্চয়ে ও আক্রমণে পুনর্লিপ্ত হতে সাহায্য করেছিল। রাজপুতদের সংকীর্ণ গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের উর্ধ্বে তিনিও উঠতে পারেননি। তাই গুজরাটের বিরুদ্ধে মহম্মদ ঘুরীর আক্রমণের সময় পৃথ্বীরাজ নির্লিপ্ত থেকে শোলাঙ্কিদের সর্বনাশ কামনা করছিলেন। কিন্তু শোলাঙ্কিদের থেকে বহিরাগত আক্রমণকারীরা যে বেশি বিপজ্জনক—এ সত্য তিনিও উপলব্ধি করতে পারেননি।

○ তুর্কীশক্তির অগ্রগতি ঃ

মহম্মদ ঘুরী তরাইনের যুদ্ধে বিজয়ের পর অধিকৃত অঞ্চলসমূহের শাসন-দায়িত্ব তাঁর বিশ্বস্ত ও সুদক্ষ সেনাপতি কুতুবউদ্দিন আইবকের উপর ন্যস্ত করে গজনী ফিরে যান। পৃথ্বীরাজের পুত্রকে রণথম্ভোর দেওয়া হয়। কুতুবউদ্দিন দু'বছরের মধ্যেই বুলন্দশহর, মীরাট, দিল্লী, পাঞ্জাব, আজমীর, কোইল প্রভৃতি অঞ্চলের উপর তুর্কী-কর্তৃত্ব সম্প্রসারিত করেন। দিল্লী তুর্কীদের রাজধানী শহরে পরিণত হয়। ১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ঘুরী পুনরায় সসৈন্যে ভারতে উপস্থিত হন এবং রাজপুতদের শক্ত ঘাঁটি কনৌজ আক্রমণ করেন। *'চন্দওয়ার যুদ্ধে'* কনৌজরাজ জয়চাঁদকে পরাজিত করে ঘুরী বেনারস আক্রমণ করেন। এখানে তিনি প্রায় ১ হাজার হিন্দুমন্দির ধ্বংস করেন এবং বহু সম্পদ লুণ্ঠন করেন। অবশ্য রাজপুতদের দীর্ঘ প্রতিরোধ চূর্ণ করে কনৌজবিজয় সম্পূর্ণ করতে ঘুরীকে প্রায় চার বছর সময় ব্যয় করতে হয়েছিল। যাই হোক্, কনৌজের পতনের পর তুর্কীদের বিরুদ্ধে রাজপুতদের প্রতিরোধের তীব্রতা অনেকটাই কমে যায়।

১১৯৫-'৯৬ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ঘুরী বেয়ানা দখল করে বাহাউদ্দিন তুঘ্রিলকে সেখানকার শাসক নিযুক্ত করেন। অতঃপর দিল্লীর দক্ষিণ দিক সুরক্ষিত করার জন্য তিনি গোয়ালিয়রের দুর্গগুলি দখলের চেষ্টা করেন। সুলক্ষ্মণ পালের দৃঢ় প্রতিরোধের জন্য ঘুরী তাঁর সাথে আপস করেন এবং সুলক্ষ্মণ পালের বশ্যতা আদায় করে ফিরে যান। পরবর্তীকালে বাহাউদ্দিন গোয়ালিয়র দখল করেন। ১১৯৬-'৯৭ খ্রীষ্টাব্দে কুতুবউদ্দিন গুজরাট ও অনহিলবারের শাসক দ্বিতীয় ভীমদেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং ঐ স্থান দখল করে একজন তুর্কী-শাসক নিযুক্ত করেন। অবশ্য অল্পকালের মধ্যেই গুজরাট থেকে তুর্কীরা বিতাড়িত হয় এবং সেখানে শোলাঙ্কিদের কর্তত্ব পুনঃস্থাপিত হয়। এর কিছুদিনের মধ্যেই আইবক চন্দেল্লরাজা পরমার্দিদেবকে পরাজিত করে *'কালিঞ্জর', 'মাহবা'* ও *'খাজুরাহো'* দখল করেন (১২০২ খ্রীঃ)।

○ বিহার ও বঙ্গদেশে তুর্কী-বিজয় ঃ

বিহার ও বঙ্গদেশের উপর তুর্কী-শাসন প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব প্রাপ্য মহম্মদ ঘুরীর আর এক দক্ষ সেনাপতি ইখ্‌তিয়ারউদ্দিন-মহম্মদ-বিন্-বখ্‌তিয়ার খলজীর। মহম্মদ ঘুরী বখ্‌তিয়ারকে বারাণসীর পার্শ্ববর্তী কিছু অঞ্চলের শাসনভার দিয়েছিলেন। কিন্তু বখ্‌তিয়ার ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী। তাই সময়-সুযোগমত তিনি বিহারের অসংরক্ষিত অঞ্চলসমূহে মাঝে মাঝে হানা দিতে থাকেন। এইভাবে তিনি বিহারের প্রখ্যাত বৌদ্ধবিহার নালন্দা ও বিক্রমশীলা আক্রমণ, লুণ্ঠন ও ধ্বংস করেন। উদ্যানপুরে তিনি একটি দুর্গও নির্মাণ করেন। বিহারে সাফল্যলাভের পর তাঁর দৃষ্টি যায় বঙ্গদেশের দিকে। বঙ্গদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য এবং সমৃদ্ধ বহির্বাণিজ্যের কথা বখ্‌তিয়ারের অজানা ছিল না. তাই রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে

বাংলার ধন-সম্পদ লাভ করে নিজের রাজকোষকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে তিনি বঙ্গদেশে আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন।

মিন্‌হাজউদ্দিনের '***তবকাৎ-ই-নাসিরী***' গ্রন্থ থেকে বখ্‌তিয়ার কর্তৃক নদীয়া বিজয়ের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। তবে মিন্‌হাজ এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না। ঘটনার প্রায় ৫০ বছর পরে লোকশ্রুতির ভিত্তিতে তিনি এই বিবরণ রচনা করেন (আনুমানিক ১২৫০ খ্রীষ্টাব্দের পরে) এরও একশ বছর পরে আর এক ঐতিহাসিক ইসামী '***ফুতুহ-উস্‌-সালাতিন***' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থদ্বয় থেকে জানা যায় যে, তখন বঙ্গদেশের শাসক ছিলেন সেনবংশীয় লক্ষ্মণ সেন। তিনি ছিলেন বয়সের ভারে ক্লান্ত এবং জ্যোতিষশাস্ত্রে গভীরভাবে বিশ্বাসী। শাস্ত্রকারগণ বিধান দিয়েছিলেন যে, তাঁর রাজ্য শীঘ্রই তুর্কীদের দ্বারা আক্রান্ত হবে এবং তিনি ক্ষমতাচ্যুত হবেন। এমতাবস্থায় ইখ্‌তিয়ারউদ্দিন অশ্ব-বিক্রেতার ছদ্মবেশে মাত্র ১৭ জন (মতান্তরে ১৮ জন) সশস্ত্র অনুচরসহ নদীয়া আক্রমণ করেন (আনুমানিক ১২০৩-৪ খ্রীষ্টাব্দে)। তাঁর বাকি অনুচরেরা ছিল কিছুটা দূরে। যাই হোক্, তুর্কী আক্রমণের মুহূর্তে লক্ষ্মণ সেন মধ্যাহ্নভোজনে রত ছিলেন। ঘটনার আকস্মিকতায় বিহুল লক্ষ্মণ সেন নাকি জ্যোতিষীর গণনাকে অভ্রান্ত মনে করে কোনরূপ প্রতিরোধ ছাড়াই নগ্নপদে প্রাসাদের পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে নৌকাযোগে পালিয়ে যান। বখ্‌তিয়ার খলজী বিনা বাধায় নদীয়া দখল করেন। ইতিমধ্যে বাকি তুর্কী সেনারাও নগরীতে প্রবেশ করে অবাধ লুণ্ঠন শুরু করে। বঙ্গদেশ দখল করার পর বখ্‌তিয়ার খলজী লখ্‌নৌতে রাজধানী সরিয়ে এনে বাংলা শাসন করতে থাকেন। লক্ষ্মণ সেন দক্ষিণবঙ্গের সোনারগাঁতে গিয়ে কোনক্রমে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করেন।

বখ্‌তিয়ার খলজী মাত্র ১৭ জন সৈন্যসহ নদীয়া দখল করেছিলেন কি না? কিংবা লক্ষ্মণ সেন কাপুরুষের মত অষ্টাদশ তুর্কী সৈন্যের ভয়ে রাজধানী অরক্ষিত রেখে পলায়ন করেছিলেন কিনা—ইতিহাসের বিতর্কিত বিষয় হিসেবেই থেকে গেছে। কারণ এ ব্যাপারে মিন্‌হাজউদ্দিন ও ইসামীর বিবরণ থেকে উপরোক্ত বক্তব্য দুটিকেই সঠিক মনে হয়। এর উপর ভিত্তি করে কবিবর ***নবীনচন্দ্র সেন***ও লক্ষ্মণ সেনকে দোষী সাব্যস্ত করে লিখেছেন : *"সপ্তদশ অশ্বারোহী যবনের ডরে'..... 'সোনার বাংলা রাজ্য দিলা বিসর্জন।"* শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তৎকালীন একটি প্রখ্যাত চিত্রে লক্ষ্মণ সেনের কলঙ্কজনক পলায়ন-কাহিনী অঙ্কন করেছেন। তবে ঘটনাপরম্পরা ও যুক্তিতর্কের বিশ্লেষণ করলে তথ্যের সন্ধান পাওয়াও অসম্ভব নয়। ড. ***রমেশচন্দ্র মজুমদার*** ও ড. ***নীহাররঞ্জন রায়*** মনে করেন, মুসলমান ঐতিহাসিকদের রচনার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় না যে, মাত্র সতের-আঠারো জন সৈন্য নিয়ে ইখ্‌তিয়ারউদ্দিন বাংলা জয় করেছিলেন কিংবা রাজা লক্ষ্মণ সেন নিতান্তই কাপুরুষ ছিলেন। মিন্‌হাজ নিজেই লক্ষ্মণ সেনকে *"আর্যাবর্তের রাজাগণের মধ্যে প্রধান"* বা *"হিন্দুস্তানের রায় (রাজা)-গণের মধ্যে খলিফাস্থানীয়"* বলে প্রশংসা করেছেন। গৌড়, কামরূপ, কলিঙ্গ, প্রয়াগ, কাশী প্রভৃতি অঞ্চলে লক্ষ্মণ সেনের শৌর্যের পরিচয় আগেই পাওয়া গেছে। এখন প্রশ্ন হলো তিনি বিনা প্রতিরোধে এক কমসংখ্যক তুর্কীর ভয়ে পালিয়ে গেলেন কেন? প্রথমেই বলা যায়, সতেরো বা আঠারো জন তুর্কী সৈন্য কর্তৃক আক্রান্ত হবার তত্ত্বটাই সঠিক নয়। ইখ্‌তিয়ারউদ্দিন যখন নদীয়া প্রাসাদের

সিংহদুয়ারে উপস্থিত হন, তখন তাঁর পাশে এই সামান্যসংখ্যক অনুচর হয়তো ছিল ; তবে তাঁর মূল বাহিনী তখন নগরীর সীমান্তে উপস্থিত হয়ে গিয়েছিল। কারণ প্রাসাদরক্ষীদের কোলাহলের সঙ্গে সঙ্গেই নগরীর জনগণের কোলাহলও শ্রুত হচ্ছিল। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পেরেই সম্ভবত লক্ষ্মণ সেন পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তাছাড়া তুর্কীবাহিনী তাদের নেতাসহ অশ্ববিক্রেতার ছদ্মবেশে নগরীতে প্রবেশ করেছিল। তখন এদেশে উন্নতমানের ঘোড়া ছিল না। তাই বিদেশী অশ্ববিক্রেতাদের বিনা বাধায় নগরীতে প্রবেশের ঢালাও অনুমতি দেওয়া ছিল। এক্ষেত্রে ইখ্‌তিয়ারউদ্দিন চাতুরির দ্বারা রাজ্যজয় করেছিলেন,—যুদ্ধ দ্বারা নয়।

এতদ্‌সত্ত্বেও লক্ষ্মণ সেনের দায়িত্বকে অস্বীকার করা যায় না। উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলসহ পূর্ব ভারতের বিহার পর্যন্ত তুর্কী আধিপত্য প্রসারিত হওয়া সত্ত্বেও লক্ষ্মণ সেন বঙ্গদেশের সীমান্ত সুরক্ষা করার ব্যবস্থা না-করে অযোগ্যতা ও অপদার্থতার পরিচয় দিয়েছেন। তাছাড়া শত্রুর আক্রমণের মুখে, তা যতই আকস্মিক বা প্রবল হোক্, নিজের রাজ্য ও জনগণকে সম্পূর্ণ অরক্ষিত রেখে পালিয়ে যাওয়া আর যাই হোক্, বীরত্ব বা মহত্ত্বের দৃষ্টান্ত হতে পারে না। যাই হোক্, মহম্মদ ঘুরীর অনুমতিক্রমে ইখ্‌তিয়ারউদ্দিন স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করতে শুরু করেন। তবে তাঁর শাসনকাল স্থায়ী হতে পারেনি। কারণ তিনি নির্বোধের মত তিব্বত ও চীন অভিযানের কর্মসূচী গ্রহণ করে চরম অপদস্থ হন। বহু তুর্কী সৈন্য তাঁর একগুঁয়েমির জন্য প্রাণ দিতে বাধ্য হয়। এমতাবস্থায় তাঁরই অধীনস্থ জনৈক আমীর ক্রোধবশত ঘুমন্ত অবস্থায় ইখ্‌তিয়ারকে হত্যা করে।

কুতুবউদ্দিন আইবক ও ইখ্‌তিয়ারউদ্দিন যখন ভারতে তুর্কী অধিকারকে সুসংহত ও সম্প্রসারিত করার কাজে ব্যস্ত, তখন মহম্মদ ঘুরী মধ্য-এশিয়ায় তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী খারিজম শাহের আক্রমণের মুখোমুখি হন। ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে গিয়াসউদ্দিনের মৃত্যুর পর তিনি সমগ্র ঘুর সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন, কিন্তু ঐ বছরেই খারিজম শাসকের হাতে দারুণভাবে পরাজিত হন। পারস্যের খারিজম শাহ্ সরকারের এই সাফল্য মহম্মদ ঘুরীকে ভারতীয় সাম্রাজ্য সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে। অতঃপর তিনি ভারতীয় তুর্কী সাম্রাজ্যকে দৃঢ় ভিত্তিদানের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। মধ্য-এশিয়ার ঘুরীর পরাজয়ে ভারতে তাঁর শত্রুদের কেউ কেউ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। পাঞ্জাবের যুদ্ধপ্রিয় খোক্কর উপজাতি তুর্কীদের উপর আক্রমণ চালাতে থাকে। এমতাবস্থায় মহম্মদ ঘুরী ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আসেন এবং বিদ্রোহী খোক্করদের দমন করেন। কারও কারও মতে, খোক্করদের ষড়যন্ত্রে তিনি ঝিলামের তীরে প্রার্থনা করার সময় নিহত হন। অন্যমতে গোঁড়া শিয়া সম্প্রদায়ের জনৈক আততায়ী তাঁকে হত্যা করে।

○ মহম্মদ ঘুরীর কৃতিত্ব ঃ সুলতান মামুদের সাথে তুলনা ঃ

মুইজউদ্দিন-মহম্মদ-বিন্-সাম ওরফে মহম্মদ ঘুরীকে ভারতে তুর্কী শাসনের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে স্বীকার করার ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের কোন দ্বিধা নেই। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গিয়াসউদ্দিনের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি বার বার ভারত-অভিযান করেন এবং ব্যর্থতা সত্ত্বেও নিজ লক্ষ্যে অবিচল থেকে নিষ্ঠা ও কর্মোদ্যোগের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। স্বাধীনভাবে সমগ্র ঘুররাজ্য

শাসনের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি অনুগত থেকে তিনি ভ্রাতৃপ্রেমের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, যা মধ্যযুগের ইতিহাসে ছিল খুবই বিরল।

কিন্তু মহম্মদ ঘুরীর কৃতিত্ববিচার করতে গিয়ে তাঁর পূর্ববর্তী আক্রমণকারী সুলতান মামুদের সাথে তুলনামূলক আলোচনা অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে। একথা ঠিক যে, এরা দু'জনে ভিন্ন পরিস্থিতিতে যুদ্ধ করেছিলেন। এমনকি দু'জনের ভারত-অভিযানের রাজনৈতিক ও সামরিক লক্ষ্যও পুরোপুরি এক ছিল না। তথাপি এই দুই আক্রমণকারী যোদ্ধাকে পাশাপাশি রেখে আলোচনা করার মূল কারণ সম্ভবত কয়েকটি ক্ষেত্রে দু'জনের আপাত সাদৃশ্য। যেমন, দু'জনেই ছিলেন বহিরাগত মুসলমান এবং ভারতের বিরুদ্ধে বহু আক্রমণ, হত্যা ও লুণ্ঠনের নায়ক। দু'জনেই মধ্য-এশিয়ার রাজনৈতিক শক্তির কেন্দ্র থেকে ভারতের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়েছিলেন ইত্যাদি। কিন্তু অভিযানের লক্ষ্য এবং অর্জিত সাফল্যের নিরিখে মহম্মদ ঘুরী ও সুলতান মামুদের কৃতিত্বের ধার ও ভার এক নয়।

এই দুই যোদ্ধার তুলনামূলক বিচার করতে গিয়ে ঐতিহাসিকেরাও দ্বিমত পোষণ করেছেন। ***স্ট্যান্‌লি লেন্‌পুল*** সুলতান মামুদকে মহম্মদ ঘুরীর তুলনায় অনেক বেশি সফল ও প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করেন। তিনি লিখেছেন ঃ *"As compared with Mahmud, Muhammad is an obscure figure."* বস্তুত, সমরকুশলী যোদ্ধা ও সমরবিজয়ী সেনাপতি হিসেবে সুলতান মামুদ মহম্মদ ঘুরীর তুলনায় অনেক বেশি অগ্রণী ছিলেন। তিনি গ্রীষ্মকালে মধ্য-এশিয়ায় যুদ্ধবিজয় সেরে শীতকালে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন ভারতের বিরুদ্ধে। এইভাবে একবার ভারতে এবং একবার মধ্য-এশিয়ার রণাঙ্গনে সাফল্যের সাথে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। দেশে বা বিদেশে কোথাও যুদ্ধ-পরাজয়ের গ্লানি তাঁকে ভোগ করতে হয়নি। তাই ***সৈয়দ জাফর*** (S. A. Jaffar) লিখেছেন ঃ *"Mahmud Ghazni was verily endowed with a genius of war. He was a scientific general, skillful in planning and through in execution."* পক্ষান্তরে মহম্মদ ঘুরী ছিলেন একজন সাধারণ সমরনায়ক। যুদ্ধকে তিনি ভয় করতেন না, দৃঢ় মনোবলেরও অভাব ছিল না ; কিন্তু সামরিক প্রতিভা তাঁর ছিল না। সুলতান মামুদের মত যুদ্ধক্ষেত্রে ধারাবাহিক সাফল্য তিনি পাননি। ভারতে অন্তত তিনটি ক্ষেত্রে তিনি পরাজিত হয়ে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিলেন, যার মধ্যে পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে তরাইনের প্রথম যুদ্ধে এবং গুজরাটের ভীমদেবের বিরুদ্ধে অন্‌হিলবারের যুদ্ধে মামুদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল শঙ্কাজনক।

অধ্যাপক হাবিবের ভাষায় তিনি ছিলেন *"hero of three stupendous defeats—Ankhud, Tarain and Anhillwara,"* তবে কয়েকটি যুদ্ধে ঘুরী পরাজিত হয়েছিলেন এটা যেমন সত্য, তেমনি এটাও সত্য যে, প্রকৃত যোদ্ধার মতই তিনি পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলে নতুন উদ্যমে পরবর্তী অভিযানের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। এটাও কম কৃতিত্বের নয়। তাছাড়া, মনে রাখা দরকার যে মামুদের তুলনায় মহম্মদ ঘুরীকে ভারতে অনেক বেশি বড় ও সুসংগঠিত রাজ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছিল।

যোদ্ধা বা সেনাপতি হিসেবে পিছিয়ে পড়লেও, রাজনীতিবিদ্ ও সংগঠক হিসেবে মহম্মদ ঘুরী সুলতান মামুদকে অতিক্রম করে যেতে পেরেছেন। ঘুরী ও মামুদের ভারত-অভিযানের

প্রকৃতিগত স্বাতন্ত্র্য খুবই স্পষ্ট। সুলতান মামুদের ভারত-আক্রমণের মূল প্রেরণা ছিল এদেশের অতুল সম্পদ। এই সম্পদ লুণ্ঠনের আশায় তিনি অনুগামীদের মধ্যে ধর্মীয় উন্মাদনার সৃষ্টি করেছেন। ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের কোন ইচ্ছাই তাঁর ছিল না। কারণ মধ্য-এশিয়ার সাথে ছিল তাঁর রক্তের বন্ধন। ভারতবর্ষের সম্পদকে তিনি মধ্য-এশীয় রাজনীতির সংগ্রামে ব্যবহার করার লক্ষ্যে স্থির ছিলেন। তাই ***ঈশ্বরীপ্রসাদ*** লিখেছেন ঃ *"তিনি ঘূর্ণিঝড়ের মত ভারতে এসেছেন এবং প্রচুর সম্পদ সংগ্রহ করে সত্বর নিজরাজ্যে ফিরে গেছেন।"* অর্থলোভে অন্ধ এই যোদ্ধা ভারতের মাটিতে ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক গৌরব অর্জনের কোন স্বপ্ন দেখতে পারেননি। কিন্তু মহম্মদ ঘুরী ছিলেন রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির অধিকারী। ভারতের সম্পদ নয় ; ভারতের মাটিতে নতুন রাজ্যের ভিত্তি স্থাপনই ছিল তাঁর লক্ষ্য। ***ঈশ্বরীপ্রসাদের*** ভাষায় ঃ *"Not so fanatical as Mahmud, Muhammad was certainly more political than his great predecessor. He saw clearly the rotten political condition of India and made up his mind to found a permanent dominion."*

স্বরাজ্য থেকে দূরবর্তী ভূখণ্ডে নতুন শাসনতান্ত্রিক ভিত্তি রচনার জন্য যে রাজনৈতিক দূরদর্শিতার প্রয়োজন, মহম্মদ ঘুরীর চরিত্রে তার অভাব ছিল না। অধ্যাপক ***নিজামী*** *(K. A. Nizami)* লিখেছেন ঃ *"The two striking feature of Muizzuddin's character were his dogged tenacity of purpose and his grim political realism."* যুদ্ধে পরাজয়ের পরেও যেমন তিনি যুদ্ধপ্রেরণা হারিয়ে ফেলেননি, তেমনি ভারতীয় ভূখণ্ড দখল করার পরেই সেখানে তৎক্ষণাৎ নিজের শাসন শুরু করেননি। কারণ তখন ভারতীয় ভাষার সাথে পরিচিত তুর্কী মুসলমানের সংখ্যা ছিল খুবই কম। পাঞ্জাব থেকে বাংলা পর্যন্ত এত বড় অঞ্চলের শাসন-দায়িত্ব প্রত্যক্ষভাবে পরিচালনা করা তাদের পক্ষে ছিল অসম্ভব। তাই যুদ্ধজয়ের পরে মহম্মদ ঘুরী ভারতীয় শক্তির প্রতি ধর্মীয় জিঘাংসামূলক আচরণ করেননি। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের পর পৃথ্বীরাজের বশ্যতার ভিত্তিতে দিল্লী ও আজমীরের শাসনভার খাণ্ডেরায় ও পৃথ্বীরাজের পুত্রের হাতে অর্পণ করেছিলেন। বশ্যতাস্বীকার করার পরে হিন্দু সর্দারদের স্ব-স্ব পদে এবং সম্মানের সাথে তিনি বহাল রাখেন। ঘুরী নিশ্চিত ছিলেন যে, গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করে এবং প্রদেশ ও জেলার শাসকদের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে স্থানীয় শাসকদের হাতে শাসন-দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া প্রয়োজন। তাঁর এই চিন্তা রাষ্ট্রপ্রজ্ঞার নিদর্শন। হাসান নিজামী, ইবন-ই-অসির-এর বিবরণ থেকে তাঁর এই প্রশাসনিক আপস-নীতির বিবরণ পাওয়া যায়।

মহম্মদ ঘুরী ছিলেন মানব-চরিত্রের দক্ষ বিচারক। যোগ্য ও প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিকে চিনে নিতে তিনি ভুল করতেন না। এইভাবেই কুতুবউদ্দিন আইবক, তাজউদ্দিন ইলদিজ, বাহাউদ্দিন তুঘ্রিল, ইখ্‌তিয়ারউদ্দিন প্রমুখ সৈনিকদের সংগ্রহ করেছিলেন যাঁরা ভারতবর্ষে তুর্কী শাসনের ভিত্তি রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাই অধ্যাপক ***হবিবুল্লাহ*** যথার্থই বলেছেন যে ঃ *"If he (Ghuri) failed to found a dynasty, he yet trained up a bond of men who were to prove more loyal to his ideals and better bitted to maintain his empire."*

সাহিত্য-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হিসেবে সুলতান মামুদ ছিলেন অনন্য কৃতিত্বের অধিকারী।

অলবেরুণী, উতবি, ফিরদৌসী, আনসারী প্রমুখের মত জ্ঞানী-গুণী পণ্ডিত-দার্শনিক গজনীর রাজসভা উজ্জ্বল করেছিলেন। সংগৃহীত অর্থে মামুদ গজনীতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় ও পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করে আন্তরিক শিক্ষানুরাগের পরিচয় স্থাপন করেছেন। ***লেনপুল*** লিখেছেন ঃ *"নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বিজিত রাজ্য থেকে শিল্পকর্ম এনে নিজ রাজধানীকে সুসজ্জিত করেছিলেন ; কিন্তু সুলতান মামুদ বিদেশ থেকে শিল্পী ও কবিদের আমন্ত্রণ করে এনে নিজ রাজসভাকে উজ্জ্বলতর করেছিলেন।"* তাই ***লেনপুল*** মনে করেন, *"শিল্প-সাহিত্যের অনুরাগী হিসেবে সুলতান মামুদের তুলনায় মহম্মদ ঘুরী ছিলেন নগণ্য।"* কিন্তু ঐতিহাসিক নিজামী এই বক্তব্যের সাথে একমত হতে পারেননি। তাঁর মতে, মহম্মদ ঘুরী হয়তো সুলতান মামুদের মত শিল্পানুরাগের স্বাক্ষর রেখে যেতে পারেননি ; কিন্তু তিনি আদৌ সংস্কৃতিমনস্ক ছিলেন না—একথা বলা যায় না। নিজামীর মতে, গিয়াসউদ্দিন ও মহম্মদ ঘুরীর আমলেই ঘুর-সংস্কৃতির ধারা নব-রূপপরিগ্রহ করেছিল। ঘুরীর পৃষ্ঠপোষকতায় *মৌলানা ফকরুদ্দিন রাজি, নিজাম উরুজী* প্রমুখ পণ্ডিত ঘুররাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ধর্ম-শিক্ষার প্রসার ঘটান। মহম্মদের আমলেই একধরনের রঙীন টালি (glazed tile) আবিষ্কৃত হয়েছিল। যে রহস্যবাদী সংস্কারকের দল মুসলিম সমাজে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সহনশীলতার ফল্গুধারা প্রবাহিত করেছিলেন, তাঁরা মহম্মদ ঘুরীর আমলেই লালিত হয়েছিলেন গজনী ও হিরাটের মাটিতে। সুলতান মামুদ গজনীকে শিল্পসমৃদ্ধ করলেও ভারতের শিল্প-নিদর্শনের উপর যে তাণ্ডব চালিয়েছিলেন, মহম্মদ ঘুরী তা কখনোই করেননি। অবশ্য এটা ঠিক যে, শিল্পসংস্কৃতির উন্নয়নের জন্য মহম্মদ ঘুরী মামুদের মত আন্তরিকভাবে সময় ও উদ্যোগ ব্যয়িত করেননি। সম্ভবত সে সুযোগ ও সময় তাঁর ছিল না।

○ তুর্কীদের সাফল্যের কারণ ঃ

ভারতের বিরুদ্ধে মুসলমান আক্রমণকারীদের, বিশেষত তুর্কী যোদ্ধাদের সাফল্য তথা সামরিক ঐতিহ্যের অধিকারী ভারতীয় হিন্দুদের পরাজয় বাস্তব হলেও কিছুটা আশ্চর্যজনক। শিক্ষা-সংস্কৃতিতে সুদীর্ঘ ঐতিহ্যের ধারক, বিশালায়তন ও জনবহুল এমন একটি দেশের নবোত্থিত তুর্কীজাতির হাতে দ্রুত পতন সত্যই অভূতপূর্ব একটি ঘটনা। ঐতিহাসিক ***মহম্মদ হাবিবের*** ভাষায় ঃ *"Seldom is human history has a country so large, so populous and, according to the academic standards of the age, so cultured and civilised as far as the upper classes were concerned, been conquered so easily, and by such common place men (as the Turks.)"* নিজেদের দেশে এবং পরিচিত পরিবেশে যুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় রাজন্যবর্গ এবং সেনাবাহিনী বহিরাগত মুসলমানদের বিরুদ্ধে কখনোই কার্যকরী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি। মহম্মদ-বিন্-কাশিম কিংবা সুলতান মামুদের বিরুদ্ধে ভারতীয় প্রতিরোধ ছিল শূন্য। মহম্মদ ঘুরীর বিরুদ্ধে দু'একটি রণক্ষেত্রে ভারতীয়-বাহিনী সাফল্য পেলেও, তা এত ক্ষণস্থায়ী ও নিষ্ফলা ছিল যে, ইতিহাসের ঘটনা পরম্পরায় তা মূল্যহীন। যাই হোক্, ঐতিহাসিকেরা এই বিচিত্র পরিণতির কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে একাধিক তথ্য ও তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। তবে লক্ষণীয় যে, মধ্যযুগীয় ঐতিহাসিকদের মধ্যে কেউই মুসলমানদের

সাফল্য বা হিন্দুদের ব্যর্থতার কারণ সম্পর্কে আলোচনা করেননি। সমসাময়িক তিনজন লেখক ***হাসান নিজামী, মিন্‌হাজউদ্দিন*** এবং ***ফকর মুদাব্বির*** যুদ্ধের বিবরণ লিপিবদ্ধ করলেও ফলাফলের বিশ্লেষণ করেনি। মুদাব্বির অবশ্য তুর্কীগণ কর্তৃক অশ্বের ব্যাপক ব্যবহার এবং মুসলিম যোদ্ধাদের মধ্যে সাম্যবোধ সম্পর্কে যেটুকু আলোচনা 'করেছেন, তা আক্রমণকারীদের সামরিক সাফল্য বিষয়ে কিছুটা আভাস দেয়।

সাধারণ ভাবে মনে করা হয় যে, ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তুর্কী যোদ্ধাদের সাফল্য অনিবার্য করেছিল। আপাতভাবে এমন ধারণা অমূলক নয়। বস্তুত, নবম-দশম শতকে ভারতের রাজনীতির দৈন্য কেবল তুর্কী নয়, যে-কোন বহিরাগত আক্রমণকারীর সাফল্য সূচিত করার উপযোগী ছিল। উত্তর ভারতে হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর আক্ষরিক অর্থে কোন শক্তিশালী রাজ্য গড়ে উঠেনি। উত্তর ভারতে পাল ও সেন রাজাদের নেতৃত্বে যে আঞ্চলিক রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়, বহিরাগত আক্রমণ প্রতিহত করার পক্ষে তা আদৌ যোগ্য ছিল না। দক্ষিণ ভারতের শক্তিগুলি আঞ্চলিক ভাবে হলেও শক্তিশালী ছিল। কিন্তু সর্বভারতীয় রাজ্য স্থাপনের ইচ্ছা বা উদ্যোগ তাদের ছিল না। উপরন্তু আঞ্চলিক ক্ষেত্রে তারা নিরন্তর যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থেকে নিজেদের শক্তি ক্ষয় করছিল। পাল-প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূটরা দীর্ঘ দুশো বছর যুদ্ধে লিপ্ত থেকে কেবল নিজেদের শক্তি ক্ষয় করেছিল। এই সময় উত্তর ভারতে অনেকগুলি রাজপুত গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে। এদের মধ্যে কয়েকটি গোষ্ঠী রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাফল্যেরও পরিচয় দেয়। কিন্তু যোদ্ধা ও দেশপ্রেমিক হিসেবে এদের গুণাবলী ছিল সন্দেহের উর্ধ্বে। কিন্তু রাজপুতদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ছিল প্রবল। বস্তুত, সংকীর্ণ গোষ্ঠী-বিরোধ ও দ্বন্দ্ব রাজপুতদের সমস্ত উদ্যম ও গৌরবকে ম্লান করে রেখেছিল। ফলে কোন বহিরাগত আক্রমণের বিরুদ্ধে এরাও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়। উত্তর ভারতের রাজনীতির এই সংকট ও দুর্বলতা তুর্কীদের সাফল্য সহজতর করে তোলে।

তবে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক অনৈক্যই তুর্কীদের সাফল্যের একমাত্র বা প্রধান কারণ ছিল না। সমকালীন ভারতের সমাজ, অর্থনীতি, ধর্ম, ইত্যাদি নানা কারণে তুর্কীদের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের প্রতিরোধ দুর্বল হয়েছিল। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক ***এল্‌ফিনস্টোন, লেন্‌পুল, ভিন্‌সেন্ট স্মিথ*** প্রমুখ মুসলমানদের সাফল্যের কারণ হিসেবে হিন্দুদের তুলনায় তাদের সবল দেহ, অসীম সাহস ও অদম্য মনোবলের কথা উল্লেখ করেছেন। এঁরা মনে করেন, শীতপ্রধান দেশ থেকে আগত এবং মাংসাশী তুর্কো-আফগান, পারসিক সেনারা গ্রীষ্মপ্রধান ভারতবর্ষের নিরামিষাশী ভারতীয় সৈন্যদের থেকে দেহে ও মনোবলে অনেকটাই এগিয়েছিল। ***এল্‌ফিন্‌স্টোন*** লিখেছেন ঃ *"দুর্ধর্ষ সেল্‌জুক-তুর্কী এবং তাতারদের বিরুদ্ধে বিজয়ী মুসলমান সৈনিকদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ভদ্র ও নম্রমনা হিন্দুদের পরাজয় ছিল স্বাভাবিক পরিণতি।"* কিন্তু ঐতিহাসিক ***নিজামী, ড. ঈশ্বরী প্রসাদ, শ্রীবাস্তব*** প্রমুখ ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের যুক্তি মানতে পারেননি। ***নিজামী*** লিখেছেন, *"মোঙ্গলদের হাতে মুসলমানদের পরাজয়ের ঘটনা ইংরেজ ঐতিহাসিকদের এই তত্ত্বকে মিথ্যা প্রমাণ করেছে। ঠাণ্ডা আবহাওয়ার মানুষ মাত্রেই দক্ষ যোদ্ধা হবে কিংবা আমিষ ভক্ষণকারীরা সবাই উন্নত যোদ্ধা হবে—এ ধারণা বিজ্ঞানসম্মত নয়"*। ***শ্রীবাস্তব*** লিখেছেন ঃ *"The theory that makes the people of a cold climate*

fighters or that which seeks to show that non-vegetarian are necessarily better fighters does not stand the test of sientific examination." ড. ***ঈশ্বরীপ্রসাদ*** যোদ্ধা হিসেবে রাজপুতজাতির প্রশংসা করে লিখেছেন ঃ *"The Rajputs were the finest soldiers, scarcely inferior in the qualities, in courage, valour and endurance of ment of any other country,"* এমনকি মুসলমান আক্রমণকালে ভারতীয় সৈনিকদের সবাই নিরামিষাশীও ছিল না। তাই ইংরাজ ঐতিহাসিকদের ব্যাখ্যাকে ভারতীয়দের পরাজয়ের কারণ বলে মেনে নেওয়া যায় না।

কেউ কেউ মনে করেন, মুসলমান সৈনিকদের ধর্মীয় প্রেরণা তাদের সাফল্যের সহায়ক হয়েছিল। বিধর্মী ও পৌত্তলিক হিন্দুদের ধ্বংস করে *'গাজী'* হওয়ার একান্ত ইচ্ছা তাদের জীবনপণ লড়াই করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। মুসলমান সৈনিকেরা ইসলামের প্রসারকে তাদের অবশ্য পালনীয় ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করার ফলে, তাদের যুদ্ধোন্মাদনা নতুন মাত্রা পেয়েছিল। কিন্তু ঐতিহাসিক নিজামী এই মতের বিরোধিতা করেছেন। মহম্মদ সাদি'র কবিতা উল্লেখ করে ***নিজামী*** লিখেছেন যে, "লস্কর (সৈন্য) তার প্রাপ্য বেতনের জন্যই যুদ্ধ করে ; রাজা, দেশ বা ধর্মের জন্য যুদ্ধ করে না।" তিনি আরো লিখেছেন যে, আরব-আক্রমণকারীদের সময় (অষ্টম শতকে) যে ধর্মীয় প্রেরণা ছিল, পরবর্তীকালে তা আদৌ ছিল না। তুর্কী উপজাতিভুক্ত সৈন্যদের অনেকেই তখন পুরোপুরি ইসলামে ধর্মান্তরিত ছিল না। এমনকি তুর্কী সেনাপতিদের অনেকেই তখন ধর্ম সম্পর্কে সম্যক সচেতনও ছিলেন না। তাই ধর্মীয় প্রেরণা কোনভাবেই তাদের যুদ্ধপ্রেরণা বৃদ্ধি করেনি। ***নিজামী*** লিখেছেন ঃ *"This could only have been a mere 'passing mood' and not a permanent objective or inspiring motive of their campaigns."* সুতরাং জলবায়ু, দৈহিক গঠন কিংবা ধর্মীয় প্রেরণা নয়, মুসলমানদের সাফল্যের কারণ অন্য কোথাও খুঁজতে হবে।

অধ্যাপক ***নিজামী*** তৎকালীন ভারতবর্ষের ক্রটিপূর্ণ সমাজব্যবস্থাকে ভারতীয়দের পরাজয়ের প্রধান কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, কঠোর জাতিভেদ ও বর্ণবৈষম্য ভারতের সামাজিক জীবনে ভেদাভেদের যে প্রাচীর তুলেছিল, তা সমগ্র সামরিক ব্যবস্থাটাকেই রুগ্ন ও দুর্বল করেছিল। জাতিভেদ ও সামাজিক বৈষম্য জন্ম দিয়েছিল রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার। ***নিজামীর*** ভাষায় ঃ *"... the invidious caste distinctions, which rendered the whole military organisation rickety and weak, Caste taboos and discriminations killed all sense of unity–social or political."* ধর্মাচরণে ছিল ব্রাহ্মণদের একচ্ছত্র আধিপত্য ; আর রাজ্যশাসনে রাজপুত বা ক্ষত্রিয়দের। সাধারণ মানুষের সাথে সমাজের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত ব্রাহ্মণদের বা রাজপুতদের কোন সম্পর্ক ছিল না। ধর্মে বা রাজনীতিতে সাধারণ জনসমাজকে মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী মানুষ কর্তৃক অপাংক্তেয় করে রাখার ফলে ভারতীয় সমাজে যে অবক্ষয় এসেছিল, তাতে লাভবান হয়েছিল আক্রমণকারী মুসলমানেরা। যুদ্ধের পরিণতি সম্পর্কে সাধারণ মানুষ ছিল উদাসীন। তাই বিপদের মুহূর্তে গণশক্তি সংগ্রহ করার কোন সুযোগ ভারতীয়দের ছিল না। যুদ্ধবিদ্যা-চর্চার ক্ষেত্রেও নিম্নবর্ণের মানুষের কোন স্থান ছিল না। এমনকি অস্পৃশ্যতার নীতি অনুসরণ করার ফলে নিম্নবর্ণের মানুষ সেনাবাহিনীর

সাহায্যকারী হিসেবেও কাজ করতে পারত না। তাই ভারতীয় সেনাবাহিনীতে 'শ্রম-বিভাজন' ব্যবস্থার কোন অস্তিত্ব ছিল না। সেক্ষেত্রে একজন সৈনিককে যুদ্ধও যেমন করতে হত, তেমনি নিজের পানীয় জলও সংগ্রহ করতে হত। যোদ্ধার সর্বোচ্চ সেবা আদায়ের পক্ষে এই ব্যবস্থা ছিল বিপজ্জনক। ***ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, স্যার যদুনাথ সরকার, কে. এস. লাল*** প্রমুখও ***নিজামীর*** সাথে একমত হয়ে ভারতের পচনশীল সমাজব্যবস্থাকে হিন্দুদের দুর্বলতার মূল কারণ বলে উল্লেখ করেছেন।

পক্ষান্তরে মুসলমানদের মধ্যে ছিল সামাজিক সাম্য ও ধর্মীয় ঐক্য, যা তাদের এক অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে পরিণত করেছিল। ***আচার্য সরকার*** লিখেছেন ঃ *"Islam gave to its followers .... complete equality and social solidarity, as regards legal status and religious privileges."* আইন ও ধর্মের চোখে এই সাম্যবোধ ইসলামের মধ্যে জাতিগত ভেদাভেদ সম্পূর্ণ নির্মূল করে দিয়েছে এবং সমগ্র ইসলাম সম্প্রদায় এক অভিন্ন পরিবারের সদস্য হিসেবে অগ্রসর হয়েছে নিজেদের লক্ষ্যপথে। তাই ইসলামের শক্তি হয়েছে অপ্রতিরোধ্য। এই প্রসঙ্গে ***কে. এস. লাল*** বলেছেন যে, ভারতীয় সমাজের বর্ণবৈষম্য বর্ণ-সংঘাতের জন্ম দিয়েছিল। এর ফলে মুসলমানদের পক্ষে বিশ্বাসঘাতক সংগ্রহ করা সহজ হয়েছিল, যাদের সাহায্যে আক্রমণকারীরা ভারতীয়দের শক্তি-সামর্থ্য ও দুর্বলতা সম্পর্কে বহু গোপন ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করে নিজেদের রণকৌশল স্থির করতে পেরেছিল।

ভারতের রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা এবং প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত সচেতনতার অভাবও মুসলমানদের সাফল্যকে ত্বরান্বিত করেছিল। অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যবর্তীকালে ভারতে কোন কেন্দ্রীয় শক্তির অস্তিত্ব ছিল না। গোটা দেশ জুড়ে ছিল অসংখ্য ছোট ছোট রাজ্য,— যাদের মধ্যে না ছিল ঐক্য, না ছিল স্বদেশচেতনা। যে রাজপুতজাতি শৌর্যবীর্যের প্রতীক হিসেবে বন্দিত, তাদের গোষ্ঠীবিরোধ এবং সংকীর্ণ গোষ্ঠীচিন্তা বিচক্ষণ ও দূরদর্শী মুসলমান আক্রমণকারীদের উৎসাহবর্ধন করেছে। এমনকি উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপথ দিয়ে আরবদের আক্রমণ ঘটে যাওয়ার তিনশ' বছর পরেও তারা সীমান্ত সম্পর্কে উদাসীন থেকেছেন। প্রতিরক্ষা বলতে ভারতীয় নৃপতিরা বুঝতেন তাৎক্ষণিক আত্মরক্ষা এবং কোনক্রমে নিজের রাজ্যটুকুকে রক্ষা করা। এরাঁ সবাই 'ভারতের রাজা' ছিলেন ; কিন্তু কেউই *'ভারতীয় রাজা'* হয়ে উঠতে পারেননি। তাই আরো দুশো বছর পরে যখন মহম্মদ ঘুরী আক্রমণ করেন, তখনও সীমান্তদেশ ছিল অরক্ষিত এবং অবাধ।

ভারতীয়দের পরাজয়ের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল তাদের পশ্চাৎপদ সামরিক ব্যবস্থা। তুর্কীদের সামরিক-বাহিনীর সংগঠন, যুদ্ধকৌশল, যুদ্ধের সরঞ্জাম এবং অস্ত্রাদি সবই ছিল ভারতীয়দের তুলনায় উন্নত। ***নিজামী*** লিখেছেন ঃ *".... There were basic differences in the principles on which the Indian and Turkish forces were organised, maintained and fought in the battlefield".* তুর্কীবাহিনীর মর্মকথা ছিল ক্ষিপ্রতা। দ্রুতগামী অশ্বপৃষ্ঠে বসে হাল্‌কা ধনুক থেকে তারা অল্প সময়ে অজস্র তীর নিক্ষেপ করতে পারত। অশ্বারোহী সৈন্যরা দ্রুত অগ্রসর হতে বা পশ্চাদ্‌গামী হতে পারত। লৌহ-রেকাব ব্যবহার করার ফলে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে স্থিরলক্ষ্যে তীর নিক্ষেপ করা তাদের পক্ষে সহজসাধ্য

হয়েছিল। পক্ষান্তরে, ভারতীয় সামরিক ব্যবস্থায় বেশি গুরুত্ব দেওয়া হত হাতিকে। মন্থরগতি হাতির পক্ষে দ্রুতগামী অশ্বের সাথে পাল্লা দেওয়া সম্ভব ছিল না। রাজপুতরা যুদ্ধকৌশল হিসেবে ঘনবিন্যস্ত ব্যূহরচনা করে শত্রুপক্ষের উপর একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ধ্বংস করতে চেষ্টা করত। কিন্তু মহাভারতের যুগের যুদ্ধপদ্ধতি যে মধ্য-এশিয়ার ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন অশ্বারোহী তীরন্দাজ-বাহিনীর কাছে অকেজো হয়ে যাবে, এ সত্য রাজপুতরা উপলব্ধি করতে পারেনি। আসলে মধ্য-এশিয়ার যুদ্ধপদ্ধতিতে দ্রুতগতি এবং হাল্‌কা অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার ও কার্যকারিতা সম্পর্কে ভারতীয় নৃপতিবর্গ উদাসীন থেকে নিজেদের ব্যর্থতা ডেকে এনেছিলেন। ***স্যার যদুনাথ সরকার*** তুর্কীদের অশ্ববাহিনীর অধিক কার্যকারিতার পাশাপাশি তাদের রসদ ও যুদ্ধসরঞ্জামের বাহক হিসেবে উটের ব্যবহারের উপযোগিতার কথা উল্লেখ করেছেন। ভারতীয়রা এই কাজে ব্যবহার করত বলদ। বলদের তুলনায় উট ছিল দ্রুতগামী এবং বলদের খাদ্যসংগ্রহের জন্য সমস্যায় পড়তে হত, উটের ক্ষেত্রে তা ছিল না। কারণ উট সাধারণত গমনপথের পার্শ্ববর্তী গাছপাতা থেকেই নিজখাদ্য সংগ্রহ করে নিতে পারত। ***ড. সরকার*** লিখেছেন : *"Banjara pack-oxen of the Hindu commissarial were slow and burdensome."* ***R. C. Smile*** তাঁর ***'Crusading Warfare, A Contribution to Medieval Military History'*** নামক প্রবন্ধে বলেছেন যে, অশ্বপৃষ্ঠে ধাবমান অবস্থায় তুর্কী-সৈন্য ধনুকে তীর সংযোজন ও নির্দিষ্ট লক্ষ্যে নিক্ষিপ্ত করতে পারত। ফলে ঘনবিন্যস্ত এবং শ্লথগতিসম্পন্ন ভারতীয়-বাহিনী পরাভূত হয়েছিল অনিবার্যভাবে। ***শ্রীবাস্তব*** লিখেছেন : *"Our military leaders did not keep themselves in touch with the development of tacts. .... we were therefore outclassed in weapons and out-manoeuvred in tactics."*

যুদ্ধ সম্পর্কে রাজপুত এবং তুর্কীদের দৃষ্টিভঙ্গিরও পার্থক্য ছিল। মুসলিম তুর্কী-সৈন্য যুদ্ধ করেছিল রাজ্য-সম্পদ ও বিজয়ীর গৌরব অর্জনের জন্য। যে-কোন উপায়ে যুদ্ধে সাফল্য অর্জন করতে তারা দ্বিধা করত না। কিন্তু রাজপুতদের কাছে যুদ্ধ ছিল এক ধরনের খেলা —যেখানে কিছু নিয়ম ও নীতি অনুসরণ করাকে তারা নৈতিক কর্তব্য বলে মনে করত। যুদ্ধক্ষেত্রে সততা প্রদর্শন ভারতীয় ঐতিহ্যের সাথে জড়িত ছিল। শত্রুকে দুর্বল করার জন্য কিংবা বিচ্ছিন্ন করার জন্য কোন গোপন পরিকল্পনা বা মিথ্যাচার কাপুরুষতার লক্ষণ বলে নিন্দিত হত। তাই পানীয় জলে বিষ মিশ্রিত করে কিংবা বিশ্বাসঘাতকের সহায়তায় শত্রুকে আঘাত হানার কোন চেষ্টা তারা করেনি। ***ড. রোমিলা থাপার*** লিখেছেন : *"ছোটখাট যুদ্ধে সেরকম নিয়ম মেনে বীরধর্ম প্রদর্শন করা সম্ভব হলেও আফগানদের সঙ্গে যুদ্ধে এসবের অবকাশ ছিল না।"* তাই ***U. N. Ghosal*** লিখেছেন : *"They (Rajputs) were inspired by a high sense of chivalry and military honour which made them unfit even for practical success in warfare."*

অধ্যাপক ***সতীশচন্দ্র*** ও ***ড. আর. সি. দত্ত*** প্রমুখ মনে করেন, সামন্ত-প্রথার বিকাশের ফলে ভারতীয় সামরিক-বাহিনীর সংগঠন দুর্বল হয়েছিল। ভারতীয় নৃপতিরা সরাসরি বিশাল বাহিনী পোষণ বা নিয়ন্ত্রণ করতেন না। সামরিক-শক্তির জন্য তাঁরা একান্তভাবে নির্ভরশীল ছিলেন

সামন্ত নায়কদের উপর। ফলে ভারতীয়-বাহিনীর মধ্যে একাত্মতা বা সমন্বয়ের যথেষ্ট অভাব ছিল। পক্ষান্তরে তুর্কী-বাহিনী কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা সংগৃহীত হত এবং প্রয়োজন অনুসারে তাদের যুদ্ধে নিয়োজিত করা যেত। সামন্ততান্ত্রিক প্রবণতার কারণে রাজপুতরা কখনোই পূর্ণশক্তি নিয়ে শত্রুর মুখোমুখি হতে পারেনি।

অধ্যাপক ***হবিবউল্লাহ্*** ভারতীয়দের সামরিক কৌশলগত ত্রুটিকে তাদের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। রাজপুতরা রক্ষণাত্মক যুদ্ধনীতিতে আস্থাশীল ছিল। ***হবিবউল্লাহ*** মনে করেন, আক্রমণাত্মক যুদ্ধরীতি অনুসরণ করলে রাজপুতরা অধিক সাফল্য পেতে পারত। সামরিক-শক্তির বিন্যাসের দিক থেকেও তুর্কীরা এগিয়ে ছিল। রাজপুতরা যখন তাদের সামরিক-বাহিনীকে দক্ষিণ, বাম ও মধ্যবর্তী—এই তিনটি দলে বিভক্ত করে যুদ্ধে এগিয়ে যেত, তখন তুর্কী-বাহিনী যুদ্ধ করত পাঁচটি ভাগে বিভক্ত থেকে। রাজপুতদের মতই তিনটি বাহিনীর সাথে তারা যুদ্ধ করেছিল অগ্রবর্তী-বাহিনী এবং সংরক্ষিত-বাহিনী *(Advanced force and Reserve force)* দ্বারা। অগ্রবর্তী-বাহিনী শত্রুর ক্ষমতা যাচাই করতে পারত এবং সংরক্ষিত-বাহিনী যুদ্ধের শেষ পর্বে নতুন উদ্যমে যুদ্ধে যোগ দিয়ে শ্রান্ত-ক্লান্ত শত্রু-বাহিনীকে বিপর্যস্ত করে দিত। তাই ঐতিহাসিক ***ভিন্সেন্ট স্মিথ*** লিখেছেন : *"Hindu kings though fully equal to their assailants in courage and contempt of death, were distinctly inferior in art of war and for that reason lost their independence."*

অধ্যাপক ***পানিক্কর*** *(K. M. Panikkar)* মনে করেন, নবম-দশম শতকে ভারতে তান্ত্রিক দর্শনের প্রসার এবং মন্দির ও মঠগুলিতে অনৈতিক জীবনচর্চার প্রাবল্য ভারতবাসীর মানসিক দৃঢ়তা শিথিল করেছিল, যা তাদের ব্যর্থতা ডেকে এনেছিল। আচার্য সরকারও মনে করেন, 'অদৃষ্টবাদ' হিন্দুদের কর্মপ্রেরণা হ্রাস করেছিল ; কিন্তু মুসলমানদের কর্মোদ্যোগ বৃদ্ধি করেছিল। হিন্দুরা যখন বিশ্বাস করত যে, কলিযুগে 'ম্লেচ্ছদের' হাতে তাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী ; তখন মুসলমানরা বিশ্বাস করত যে, আল্লা তাদের ভাগ্যের পরিণতি নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। তাই প্রাণপণ যুদ্ধ করে সেই পরিণতির দিকে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের কোন দ্বিধা ছিল না। অর্থাৎ অদৃষ্টবাদ *'দ্বিমুখী তরবারির'* মত হিন্দুদের আঘাত করেছিল। অবশ্য ***ইউ. এন. ঘোষাল*** নৈতিক অবক্ষয়ের তত্ত্বকে ভারতবাসীর পরাজয়ের অন্যতম কারণ বলতে রাজী নন। তাঁর মতে, যে-কোন উন্নয়নশীল জাতির ক্ষেত্রে আংশিক নৈতিক অনাচার থাকা অস্বাভাবিক কোন ঘটনা নয়। তাছাড়া, একাদশ-দ্বাদশ শতকে ভারতীয় সমাজের নৈতিক অবক্ষয় এমন পর্যায়ে ছিল না যে, এইজন্য তারা প্রতিরোধ-শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। আসলে বিশেষ কোন একটি কারণ নয়, একাধিক কারণের সমন্বয়ে হিন্দুদের দুর্বলতা প্রকট হয়েছিল এবং পতন ডেকে এনেছিল। হিন্দুদের দুর্বলতা কেবল সামরিক ক্ষেত্রে ছিল না। হিন্দুদের সমাজ, ধর্ম, অর্থনীতি ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে যে পশ্চাদ্‌পদতা ও বৈষম্য প্রবেশ করেছিল, তাতে শিথিল হয়েছিল মানসিক ও সামরিক শক্তি। সামাজিক বিচ্ছিন্নতা রাজনৈতিক অনৈক্য এবং অবক্ষয় সামরিক সংগঠনের দুর্বলতা ভারতীয়দের প্রতিরোধ-ক্ষমতাকে এমন দুর্বল করে তুলেছিল যে, সংগঠিত তুর্কীদের আধুনিক যুদ্ধকৌশলের সাথে পাল্লা দেওয়া তাদের পক্ষে

অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। *এ. এল. শ্রীবাস্তবের* ভাষায় বলা যায় ঃ "*.... the absence of political unity, social divisions, rise of Brahmanism, moral degeneration and the superiority of the Turks in militaray skill, organisation and resources were responsible for the success of the Turks.*"

○ ভারতে তুর্কী-বিজয়ের প্রভাব ঃ

ভারতে তুর্কী-বিজয়ের ফলে এদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল। ***প্রথমত,*** হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর উত্তর-ভারতে যে রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার বীজ রোপিত হয়েছিল, তুর্কীদের আগমনে তার অবসান ঘটে। একাদশ-দ্বাদশ শতকে অঞ্চলভিত্তিক এবং গোষ্ঠীনিয়ন্ত্রিত ছোট ছোট রাজ্য প্রতিষ্ঠা উত্তর-ভারতীয় রাজনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছিল। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, সমুদ্রগুপ্ত বা হর্ষবর্ধনের ঐতিহ্যের উত্তরসূরী কোন শাসকের আদর্শ বা লক্ষ্যে জাতীয় রাষ্ট্র গড়ে তোলার সামান্যতম প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়নি।

দ্বিতীয়, তুর্কীরা বিজয়ী হবার ফলে একাদশ-দ্বাদশ শতকের বিচ্ছিন্নতাবাদের অবসান ঘটে। রাজতান্ত্রিক আদর্শ হিসেবে তুর্কীরা শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন-প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়। ফলে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার দুটি মূল উপাদান আঞ্চলিকতাবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদ দ্রুত অপসারিত হয়। *'ইক্‌তা'*ব্যবস্থার প্রবর্তন করে সামন্ততান্ত্রিক ভূমি-ব্যবস্থার অবসান ঘটানো হয় এবং দূরবর্তী প্রদেশের উপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করার চেষ্টা করা হয়।

তৃতীয়ত, তুর্কী-বিজয়ের ফলে ভারতবর্ষ আবার কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থার স্বাদগ্রহণে সমর্থ হয়। হর্ষের পরবর্তী কোন শাসকই একক কেন্দ্রের অধীনে বিস্তীর্ণ ভারত-ভূখণ্ডকে ঐক্যবদ্ধ করতে সচেষ্ট হননি। উত্তর-ভারতের রাজন্যবর্গ নিরন্তর যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকতেন ; তবে তাদের লক্ষ্য ছিল অন্যকে পরাজিত ও হত্যা করে নিজগোষ্ঠীর গৌরব বৃদ্ধি করা, কিংবা নিজে মৃত্যুবরণ করে বীরের মর্যাদা অর্জন করা। তবে তাদের উদ্দেশ্য ছিল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা। দিল্লীকে কেন্দ্র করে তারা ভারতসাম্রাজ্য গঠনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে। এদের উদ্যোগেই গড়ে ওঠে সর্বভারতীয় শাসনতান্ত্রিক ঐতিহ্য।

চতুর্থত, খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে প্রতিবাদী ধর্মসমূহের, বিশেষত বৌদ্ধধর্মের উত্থান ও প্রসারের ফলে ভারতবর্ষের সাথে এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহের মধ্যে যে যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল, অষ্টম শতকে তা অন্তর্হিত হয়। ব্রাহ্মণ্যবাদের কর্তৃত্বের যুগে ভারতবর্ষ আবার বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। ভারতের সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম—সবকিছুই আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল তার ভৌগোলিক সীমার গণ্ডীতে। কিন্তু তুর্কীদের বিজয়-অভিযানের ফলে আবার ভারতবর্ষের সাথে বহির্ভারতের যোগসূত্র স্থাপিত হয়। আচার্য ***যদুনাথ সরকারের*** ভাষায় ঃ "*This touch with the rest of Asia and the nearest part of Africa was restored by the Muslim couquest at the end of the 12th century ...*"

পঞ্চমত, তুর্কীদের সাফল্য ভারতের প্রচলিত সমাজব্যবস্থার ক্ষেত্রে গভীরতর পরিবর্তনের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। আপাতভাবে বর্ণভিত্তিক হিন্দুসমাজ ও জীবনধারার উপর তুর্কী-বিজয়ের

প্রত্যক্ষ প্রভাব বিশেষ ছিল না। কিন্তু ইসলাম সংস্কৃতির প্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য হিন্দু-সমাজব্যবস্থার মধ্যে আরো কঠোরতর নিয়মবিধি প্রবর্তিত হয়। অন্যদিকে উদারতাবাদী ভক্তি-আন্দোলনের মাধ্যমে সামাজিক সাম্য ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার এক নতুন প্রয়াস শুরু হয়। রক্ষণশীল গোষ্ঠী কর্তৃক স্মৃতিশাস্ত্রের নববিধানের মাধ্যমে সামাজিক রক্ষা-প্রাচীর তৈরির পাশাপাশি ভক্তিবাদী গোষ্ঠী সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার অভূতপূর্ব প্রয়াস চালিয়ে যান। ক্রমে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সংস্কৃতির সহনশীলতা প্রসারিত হলে সংস্কৃতি-সমন্বয়ের বাতাবরণ তৈরি হয়।

ষষ্ঠত, মুসলমান বিজয়ের ফলে ভারতের সামরিক সংগঠন ও যুদ্ধরীতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। ইতিপূর্বে সামরিক কাজে একমাত্র রাজপুত বা ক্ষত্রিয় ইত্যাদি উচ্চবর্ণের লোকদের একাধিপত্য ছিল। যুদ্ধরীতি ছিল অবৈজ্ঞানিক এবং প্রাচীনপন্থী। এখন সামরিক-বাহিনীতে নিযুক্তির মাপকাঠি হিসেবে বংশকৌলিন্যের পরিবর্তে দক্ষতা ও যোগ্যতাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। সামন্ত-প্রভুদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত কেন্দ্রীয়-বাহিনী গড়ে তোলা হয়। পদাতিক-বাহিনীর (পাইক) সংখ্যা হ্রাস করে বিশাল অশ্বারোহী-বাহিনী গঠন করা হয়। মধ্য-এশিয়ার যুদ্ধকৌশলে শিক্ষিত এবং হাল্‌কা ও কার্যকরী অস্ত্রে সুসজ্জিত কেন্দ্রীয়-বাহিনী পরবর্তীকালে সাম্রাজ্য-সম্প্রসারণে এবং নিরাপত্তাবিধানে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

সপ্তমত, তুর্কী-শাসনে প্রাচীন বর্ণভিত্তিক সমাজব্যবস্থার ভাঙনের অনিবার্য ফলস্বরূপ সর্বজনভিত্তিক শহরের অভ্যুত্থান ঘটে। আগের জাতিভিত্তিক শহরের স্থান দখল করে ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, হিন্দু-মুসলমান, ছুৎ-অছুৎ নির্বিশেষে শিল্পী, কারিগর, বণিক, ব্যবসায়ী, কর্মী অধ্যুষিত আধুনিক শহর। অধ্যাপক ***হাবিব*** এই ঘটনাকে *'শহর-বিপ্লব'* নামে আখ্যায়িত করেছেন। এইসব শহর জাতিভেদের বেড়া ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও নতুন সূর্যোদয় ঘটায়। নবোত্থিত শ্রমজীবী মানুষ অধ্যুষিত শহরকে কেন্দ্র করে ব্যবসাবাণিজ্যের দ্রুত প্রসার সম্ভব হয়। বাণিজ্য-আইন, শুল্ক-আইন, মুদ্রাব্যবস্থা ইত্যাদির সমতা ও স্থিরতার ফলে অন্তর্দেশীয় ও বহির্দেশীয় বাণিজ্য প্রসারলাভ করে। ইতিপূর্বে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভাষায় তারতম্য এবং কোন সর্বভারতীয় ভাষার অভাব রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ঐক্যের পথে যে বাধার সৃষ্টি করেছিল, মুসলমানরা প্রশাসনিক কাজে ফার্সী ভাষায় প্রচলন করলে তা অন্তর্হিত হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

অর্থনৈতিক অবস্থা (৬৫০-১২০০ খ্রীঃ)
Economic Condition (650-1200 A.D.

○ ভূমিদান ঃ 'অগ্রহার ব্যবস্থা' ঃ

সাধারণভাবে গুপ্ত সাম্রাজ্যকে উত্তর ভারতের শেষ সংগঠিত সাম্রাজ্যিক ব্যবস্থা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। অবশ্য দক্ষিণ ভারতে গুপ্তদের প্রায় সমকক্ষ ছিলেন বকাটক বংশীয় শাসকগণ। লক্ষণীয় যে, উত্তর ভারত ও দাক্ষিণাত্যের এই দুই বৃহৎ শক্তির পতনের পর উভয় অঞ্চলেই একাধিক রাজবংশের নেতৃত্বে রাজ্য প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু গুপ্ত রাজাদের সময়কালের বৈশিষ্ট্য-গুলিকে কেবল গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে আবদ্ধ রাখা সঠিক নয়। গুপ্তযুগের সাংস্কৃতিক বিকাশের ধারা সার্বিক ভাবেই ভারতের আর্থ-সামাজিক জীবনকেও প্রভাবিত করেছিল। প্রায় সমগ্র গুপ্ত আমল জুড়ে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের যে বৈশিষ্ট্যটি সমকালের আর্থ-সামাজিক জীবনে রূপান্তর ঘটানোর সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সমাজ ও অর্থনীতির উপর সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলেছিল, তা হল — 'অগ্রহার' বা 'ভূমিদান' ব্যবস্থা।

ভূমি হস্তান্তরের বৃত্তান্ত জানার ক্ষেত্রে প্রধান উপাদান হল অসংখ্য তাম্রশাসন। তামার ফলকে রাজকীয় 'শাসন' হিসেবে ভূমি হস্তান্তরের ঘটনাগুলি উৎকীর্ণ করা হয়েছে। এই তাম্রপট্ট বা তাম্রশাসন থেকে দাতা ও দান গ্রহীতার নাম, প্রদত্ত জমির বিবরণ, দানের উপলক্ষ ও উদ্দেশ্য ইত্যাদি বিষয়ে জানা যায়। সমকালীন মুদ্রা ও অন্যান্য পুরাতাত্ত্বিক অবশেষ থেকেও কিছু তথ্য সূত্র পাওয়া যায়। সমকালীন সাহিত্যাবলীও সেকালের আর্থ-সামাজিক জীবনের নানা তথ্যের সরবরাহ করে। এদের মধ্যে বানভট্টের *'হর্ষচরিত'*, দণ্ডীনের *'দশকুমার চরিত'*-এর নাম উল্লেখযোগ্য। ধর্মশাস্ত্রগুলির মধ্যে নারদ স্মৃতি ও বৃহস্পতি স্মৃতি উল্লেখযোগ্য। একই ধরনের গুরুত্বসম্পন্ন কিছু বিদেশী পর্যটকের বিবরণও তথ্যসূত্র হিসেবে স্মরণীয়। যেমন—চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের বিবরণ, হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণ, কসমাস ইণ্ডিকো-প্লয়েস্টেস-এর খ্রীশ্চিয়ান টপোগ্রাফী (৬ষ্ঠ শতক) ইত্যাদি।

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের সূচনা থেকে ব্রাহ্মণ বা ধর্মস্থানের উদ্দেশ্যে ভূমিদান প্রথার প্রচলন ঘটে। ব্রাহ্মণ পুরোহিত বা ধর্মস্থানের উদ্দেশ্যে করমুক্ত গ্রাম বা নির্দিষ্ট ভূখণ্ড দানের এই রীতি *'অগ্রহার'* নামে পরিচিত হয়। সাতবাহন রাজাদের আমলে এমন ভূমিদানের ঘটনা প্রথম দেখা যায়। তবে ৩০০ খ্রীষ্টাব্দের পরেই অগ্রহার দানব্যবস্থা ব্যাপকতা পায়। প্রাথমিক পর্বে শক, কুষাণ বা সাতবাহন রাজারা বৌদ্ধ সংঘকে ভূমিদান করেন। তবে বণিক, কারিগর ইত্যাদি সম্পদশালী বৃত্তিজীবী ব্যক্তিরাও ব্যক্তিগত পুণ্য সঞ্চয়ের বাসনায় ব্রাহ্মণ বা ধর্ম প্রতিষ্ঠানকে স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি দান করতে শুরু করেন। কিন্তু খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের সূচনা থেকে এই ভূমিদান ব্যবস্থায় একটা মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হয়। এখন থেকে ব্রাহ্মণ ও ধর্ম প্রতিষ্ঠানকে দানের জন্য মূলত

ভূমিদান করা হয় এবং দাতা হিসেবে প্রধান ভূমিকা নেন স্বয়ং রাজা। গুপ্তযুগে উৎকীর্ণ বাংলার তাম্রশাসনগুলি থেকে এই ভূমিদানের বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা যায়। গুপ্তরাজা কুমার গুপ্ত, বুধগুপ্ত এবং সম্ভবত বিষ্ণুগুপ্তের আমলের মোট পাঁচটি (২ + ২ + ১) দামোদরপুর তাম্রপট্ট থেকে জানা যায় যে, এই সকল দান ছিল 'নিষ্কর' (অগ্রহার) ; স্থায়ী (অক্ষয়নীবি) এবং পতিত জমি (ভূমিচ্ছিদ্র ন্যায়)। সমাজের ধনী বা অভিজাতরা রাজার কাছে জমি ক্রয় করে তা ব্রাহ্মণ বা কোন ধর্মস্থানকে দান করতেন। দানকার্য সম্পাদনের পর জমির চতুঃসীমা চিহ্নিত করা হত। জমির সীমা নির্ধারণের সময় গ্রামবাসী উপস্থিত থেকে তা অবহিত হতেন। গুপ্ত-পরবর্তী যুগে ঘুঁটি বসিয়ে জমির চিহ্নিতকরণ হত।

প্রাচীন রীতি অনুযায়ী সকল পতিত অনাবাদী জমির মালিক ছিল রাষ্ট্র বা রাজা। তাই রাজার কাছে জমি ক্রয় করে দান কার্য সম্পন্ন করতে হত। তবে এইভাবে দু'বার জমি হস্তান্তরের দৃষ্টান্ত বাংলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। মধ্য ভারত, পশ্চিম ভারত, এমনকি দাক্ষিণাত্যে প্রাপ্ত তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে ঐ সকল এলাকায় ব্রহ্মদেয় দানের মূল কর্তা ছিলেন রাজা স্বয়ং। বাংলাদেশের দু'বার হস্তান্তরিত জমির মত অবশিষ্ট ভারতের দানকৃত জমিগুলি সম্পূর্ণ পতিত বা অনাবাদী ছিল না। রাজকীয় দান হিসেবে ভূমিখণ্ডের পাশাপাশি গ্রামও দান করা হত। প্রশাসনিক আধিকারিক, কৃষক বা কুটুম্বী এবং স্থানীয় সম্ভ্রান্ত মানুষদের উপস্থিতিতে দানপত্র ঘোষণা করা হত। গ্রাম ও ভূমিদানের শর্তাবলী এক ছিল না। রাজা দানকৃত ভূখণ্ডের উপর দান গ্রহীতার মালিকানা স্বত্ব স্বীকার করতেন। কিন্তু গ্রামের ক্ষেত্রে মালিকানা পূর্ববৎ রাজার হাতেই থাকত। তবে দানগ্রহীতা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উক্ত গ্রামের রাজস্ব ভোগ করার অধিকার পেতেন। উত্তর ভারতের তুলনায় দক্ষিণ ভারতে রাজকীয় অগ্রহারে দানের ঘটনা ছিল বেশি। অধ্যাপক ***কৃষ্ণমোহন শ্রীমালী*** তাঁর *'Agrarian Structure in Central India and The Northern Deccan'* (Delhi 1987) শীর্ষক গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, দাক্ষিণাত্যের বকাটক শাসকদের আমলেই পঁয়ত্রিশটি গ্রাম অগ্রহার হিসেবে দান করা হয়েছিল। ঋদ্ধপুর তাম্রশাসন, পৌনি তাম্রশাসন এবং যাবত্মল তাম্রলেখ থেকে জানা যায় যে, ভূমিদানের সঙ্গে সঙ্গে বহুক্ষেত্রেই ভূমির চতুষ্পার্শ্বস্থ বাসগৃহগুলির অধিকারও দান গ্রহীতাকে হস্তান্তর করা হত। একজন ব্রাহ্মণ একাধিক গ্রাম দান হিসেবে পেতেন এমন দৃষ্টান্তও আছে। কেবল ব্রাহ্মণ নয়, বৌদ্ধ বিহারগুলিও অগ্রহার দান লাভে সক্ষম হয়েছিল। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন পঞ্চম শতকের প্রথম দিকে ভারতে আসেন এবং হিউয়েন সাঙ ভারতে কাটান ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। এঁদের বিবরণ থেকে বৌদ্ধ বিহারগুলির অধীনে নিষ্কর ভূমির অবস্থান জানা যায়। এই জমি তারা 'অগ্রহার' দান হিসেবেই পেয়েছিল।

অগ্রহার ব্যবস্থা আদি মধ্যযুগের অব্যবহিত প্রাক্পর্বে ভারতের আর্থ-সামাজিক সম্পর্ক এবং উৎপাদন ব্যবস্থায় কোনও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের সূচনা করেছিল কিনা, তা বিচার করা জরুরী। কারণ ভারত-ইতিহাসের কাল বিভাজনের সাম্প্রতিক ধারায় আদি-মধ্যযুগ পর্বটির সংযোজন গুরুত্বপূর্ণ। এই নবতম সংযোজনে এদেশের ভূমি-সম্পর্কের পরিবর্তনের ধারাটিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ইউরোপে মধ্যযুগের আবির্ভাবের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য বা বৈসাদৃশ্যের ভিত্তিতে পণ্ডিতেরা কাল বিভাজনের বিষয়টির ব্যাখ্যা করেছেন। স্বভাবতই তৃতীয় শতকের

পরবর্তীকালে অগ্রহার ব্যবস্থার প্রচলন এই বিশ্লেষণে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে অনিবার্যভাবেই। এ বিষয়ে পণ্ডিত রামশরণ শর্মা তাঁর গবেষণায় দু'টি দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এগুলি হল—(১) অগ্রহার ব্যবস্থাব কালে কোন দ্বিতীয় শক্তিশালী সামাজিক গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেছিল কিনা এবং (২) এই ব্যবস্থায় মধ্যস্বত্বভোগী শোষকশ্রেণীর অস্তিত্বের বীজ বপন হয়েছিল কিনা। অধ্যাপক ***শর্মার*** মতে, গ্রাম বা ভূমিখণ্ডের উপর স্থায়ী মালিকানা বা ভোগাধিকার পাওয়ার সূত্রে ব্রাহ্মণদের হাতে অধিক সুবিধা কেন্দ্রীভূত হয়। একইভাবে দান প্রাপ্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতেও ক্ষমতার কেন্দ্র গড়ে ওঠে। আর্থিক সমৃদ্ধির পাশাপাশি কিছু কিছু শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতাও দান গ্রহীতাদের হস্তগত হয়। সমকালীন লেখমালায় গ্রাম বা ভূমিদান-সংক্রান্ত অনুশাসনের 'অচাটভাট প্রবেশ্য' বা চাট-ভাট অপ্রবেশ্য' কথাটির উল্লেখ পাওয়া যায়। 'চাট' ও 'ভাট' ছিল স্থায়ী ও অস্থায়ী সরকারী কর্মী। সম্ভবত এরা গ্রাম থেকে রাজস্ব আদায়ের কাজে প্রশাসনকে সাহায্য করত। অধ্যাপক শর্মার মতে, দানকৃত গ্রামে এই সকল সরকারী কর্মীর প্রবেশে বিধিনিষেধ জারী করায় ঐ সকল গ্রামের শাসন ও আইন শৃঙ্খলার উপর দানগ্রহীতা ব্রাহ্মণ বা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। এইভাবে দানগ্রহীতা আঞ্চলিক ভিত্তিতে ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন। দ্বিতীয় প্রশ্নটির সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন অধ্যাপক ***রণবীর চক্রবর্তী***।[1] ***ড. শর্মার*** অভিমতের ভিত্তিতে তিনি দেখিয়েছেন যে, আপাতভাবে অগ্রহার ব্যবস্থার ফলে একটি অন্তর্বর্তী সামাজিক শ্রেণীর উদ্ভব অবশম্ভাবী হয়েছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে কৃষি-উৎপাদনের জগতে কেবল রাজা ও কৃষক, এই দুটি উপাদানের অস্তিত্ব উল্লেখ আছে। এখানে কোন তৃতীয় শক্তির অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু চতুর্থ শতকের নারদ স্মৃতি, কাত্যায়ন স্মৃতি ইত্যাদিতে তিনটি স্তরের উল্লেখ পাওয়া যায়। এগুলি হল—(১) মহীপতি, (২) স্বামীন, (৩) কর্ষক। এখানে 'মহীপতি' অর্থে রাজা, 'স্বামী' অর্থে জমির মালিক বা দান গ্রহীতা এবং 'কর্ষক' অর্থে চাষীকে বোঝানো হয়েছে। এই ব্যাখ্যার সমর্থন পাওয়া যায় সমকালীন সামাজিক বিধানে। সেকালের বিধান অনুযায়ী ব্রাহ্মণ বা ধর্মগুরুরা স্বহস্তে হলকর্ষণ বা কৃষিকাজ করতে পারতেন না। বৌদ্ধভিক্ষুদের ক্ষেত্রেও এই বিধান প্রযোজ্য ছিল। স্বভাবতই, প্রাপ্ত জমি থেকে উৎপাদনজাত আয় ভোগের জন্য চাষাবাদ করা আবশ্যিক ছিল। তাই কর্ষক বা কৃষক-চাষী নিয়োগ করে তাঁরা এই কাজ সম্পন্ন করতেন। এইভাবে অগ্রহার ব্যবস্থা ব্রাহ্মণ ও ধর্মপ্রাতিষ্ঠানগুলিকে মধ্যবর্তী ভূম্যাধিকারী শ্রেণীতে পরিণত করে।

ক্ষমতাবান ভূম্যাধিকারী শ্রেণীর আবির্ভাব চতুর্থ-পঞ্চম শতকেই রাজতন্ত্রকে আর্থিক বা প্রশাসনিক ক্ষমতার দিক থেকে দুর্বল করেছিল কিনা কিংবা কতটা করেছিল, তা বলা কঠিন। বানভট্ট 'হর্ষচরিত' গ্রন্থে লিখেছেন যে হর্ষবর্ধনের মোট ব্যয়ের পঁচিশ শতাংশ চলে যেত দান-ধ্যানমূলক কর্মসূচী রূপায়ণে। এই মন্তব্যের ভিত্তিতে ***ড. শর্মা*** মনে করেন যে অগ্রহার ব্যবস্থা পরিণামে রাজশক্তির আর্থিক ভিত্তি দুর্বল করেছিল। কিন্তু এই অভিমত যথেষ্ট যুক্তিগ্রাহ্য নয়। ***ড. চক্রবর্তী*** লিখেছেন যে, চম্মক তাম্রশাসনে ভূমিদান করার পর রাজা প্রবর সেন দান গ্রহীতার উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন যে, রাজদ্রোহ সমেত কিছু গর্হিত

কর্ম যদি দানগ্রহীতা করেন, তাহলে তার জমি কেড়ে নেওয়া হবে এবং কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। এই ঘোষণাটি রাজার রাজনৈতিক কর্তৃত্বের ইঙ্গিত দেয়। অন্যদিকে অগ্রহার দানের বহু জমি ছিল পতিত ও অনুর্বর। হস্তান্তরিত হওয়ার পর দান গ্রহীতারা ঐ সকল জমিকে কৃষিযোগ্য করে তোলেন। এর ফলে রাষ্ট্রের আয় বৃদ্ধি পায়। এই আয় সরাসরি রাজকোষে জমা না হলেও ; কৃষি-অর্থনীতির বিকাশ দ্বারা এই ব্যবস্থা রাষ্ট্রের ভিত্তি অবশ্যই দৃঢ় করেছিল।

○ কৃষি-অর্থনীতির সম্প্রসারণ ঃ

'অগ্রহার' দানব্যবস্থা আপাতভাবে কৃষি সম্প্রসারণের সহায়ক ছিল, এ কথা অধিকাংশ পণ্ডিত সমর্থন করেন। চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণ সেকালে ভারতে ক্রমবর্ধমান কৃষিকর্মের সাক্ষ্য দেয়। সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে এই বৌদ্ধ পণ্ডিত ভারতে আসেন এবং উত্তর ভারতের প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ শহর ও গৌতম বুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত স্থান পরিভ্রমণ করেন। তিনি ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে কৃষিকার্যের সাথে যুক্ত থাকতে দেখেন এবং ব্যাপক হারে কৃষি-নির্ভর অর্থনীতির অস্তিত্ব লক্ষ্য করেন। তাঁর বিবরণ থেকে অনুমান করা যায় যে তখন ভারতে স্বচ্ছন্দ কৃষি উৎপাদনের ধারা বহমান ছিল। ধান, আখ, তুলা, তিল, সরিষা, নীল, শন ইত্যাদি খাদ্যশস্য ও অর্থকরী ফসল উৎপাদন করা হত। বস্তুত নতুন ভূমিদান ব্যবস্থা (অগ্রহার) সপ্তম-অষ্টম শতকে ভারতে কৃষি-সম্প্রসারণের প্রেক্ষাপট তৈরি করেছিল।

আগেই দেখেছি যে, গুপ্ত ও গুপ্ত-পরবর্তী সময়ে তাম্রশাসন জারী করে জমি হস্তান্তরের ঘটনা যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। রাজা স্বয়ং যেমন দান করতেন, তেমনি ধনী ব্যক্তিরাও রাজার কাছে জমি ক্রয় করে ধর্মীয় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ভূখণ্ড দান করতেন। এই সকল জমির বেশির ভাগই ছিল পতিত ও অনাবাদী। সাতবাহন, গুপ্ত ও বকাটকদের রাজ্যে পতিত জমি অগ্রহার বা নিষ্কর হিসেবে দান করার রেওয়াজ ছিল। পরবর্তী কালেও এই ধারা অব্যাহত ছিল। অন্তত উত্তর ও পূর্ব ভারতে অনাবাদী জমিই অগ্রহার হিসেবে দান করা হত। সপ্তম শতকে প্রাচীন শ্রীহট্টের এক সামন্ত প্রায় দুইশত ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করেন। তাঁর টিপেরা তাম্রশাসনে (আনুঃ ৬৬৫ খ্রীঃ) বার বার বলা হয়েছে যে দান করা জমি হিংস্র পশুতে ভরা গভীর অরণ্যে অবস্থিত ছিল। সপ্তম শতকের মেদিনীপুর লেখ থেকে জানা যায় যে দণ্ডভুক্তি অঞ্চলের বহু অনাবাদী জমিকে 'ব্রাহ্মণ শাসন' গ্রামে রূপান্তরিত করা হয়। এইভাবে অষ্টম শতকে সামন্ত মরুগুনাথ ভগবান শ্রী বিষ্ণুর (অনন্তস্বামী) মন্দির নির্মাণের জন্য একটি 'জলাট বিভূখণ্ড' বা জলা ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ ভূমি দান করেছিলেন। এই সকল অনাবাদী জমিকে দান গ্রহীতারা আবাদী জমিতে রূপান্তরিত করেন। ফলে অঙ্কশাস্ত্রের সাধারণ নিয়মেই দেশের কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। তৎকালীন নিয়ম অনুসারে ব্রাহ্মণ, পুরোহিত বা ধর্মীয় ব্যক্তিরা দৈহিক শ্রম এবং বিশেষ করে হলকর্ষণ জাতীয় কর্মে লিপ্ত হতেন না। ফলে এই কৃষিকার্যে তাঁরা কৃষক নিয়োগ করতেন। ফলে কৃষি উৎপাদনে কাঙ্ক্ষিত দক্ষতার অভাব ঘটতো না। উন্নত কৃষি উৎপাদনের প্রমাণ হিসেবে সেকালে বড় লাঙল-এর ব্যবহার ছিল বলে জানা যায়। বিগ্রহরাজের 'হর্ষ' লেখতে (৯৭৫ খ্রীঃ) 'বৃহদহল' বা বড় লাঙলের কথা বলা হয়েছে। ***রণবীর চক্রবর্তী*** 'মধ্বকোষ' গ্রন্থের

ভিত্তিতে লিখেছেন যে সেকালে কাঠের তৈরি লাঙল ব্যবহার করা হত, যা গভীর গর্ত করতে সক্ষম।

উন্নত কৃষি-উৎপাদনের একটি আবশ্যিক শর্ত হল জলসেচের সুবন্দোবস্ত। বিশেষত অরণ্য অঞ্চলে বা উঁচু পতিত জমিতে চাষের ক্ষেত্রে সেচের ব্যবস্থা ছিল খুবই আবশ্যিক। আদি মধ্যযুগের প্রথমার্ধে সেচ ব্যবস্থার দিকেও যে নজর দেওয়া হয়েছিল সমকালীন লেখতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কল্হনের *'রাজতরঙ্গিনী'* থেকে জানা যায় যে কাশ্মীরের কৃষি উৎপাদন বিতস্তা নদীর খামখেয়ালীপনার জন্য ব্যাহত হত। বিতস্তার জলস্ফীতি বহুবার কৃষিজমিকে প্লাবিত করে বিপর্যয় ডেকে এনেছে। শেষ পর্যন্ত কাশ্মীরের রাজা অবন্তীবর্মনের (৮৩৬- '৫৫ খ্রীঃ) উদ্যোগে সূর্য নামক জনৈক প্রযুক্তিবিদ্ বিতস্তা নদের গতিপথ পরিবর্তন করে কাশ্মীরের কৃষি উৎপাদনে অনিশ্চয়তার অবসান ঘটান। একই সঙ্গে জল সেচের ব্যবস্থা করেও কৃষি-অর্থনীতিকে সবল করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই কাজে রাজকীয় উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতা যেমন ছিল, তেমনি ব্যক্তিগত উদ্যোগেরও অভাব ছিল না। ***সন্ধ্যাকর নন্দীর*** *'রামচরিত'* গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে রাজা রামপাল বরেন্দ্র অঞ্চলে এক বিশাল দীঘি খনন করে জল সেচের বন্দোবস্ত করেছিলেন। চোলদের লেখাতেও অনুরূপ জলাশয় নির্মাণে জনগণের উদ্যোগের কথা উল্লেখ আছে। চোল আমলের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার সাথে জলসেচ ব্যবস্থার পরিচালনাতেও মিল দেখা যায়। এখানে সেচ ব্যবস্থার পরিকল্পনা, রূপায়ণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নির্বাচিত প্রতিনিধি সভাগুলিই প্রধান ভূমিকা পালন করত। রামশরণ শর্মা গুজরাট ও রাজস্থান অঞ্চলে 'বাপী' নামক একধরনের গভীর কূপ খননের কথা বলেছেন। ভূপ্রকৃতিগত কারণে এই সকল অঞ্চলে সেচখাল খনন করা সহজসাধ্য ছিল না। পরিবর্তে 'বাপী' নামক গভীর কূপ জমিতে সেচের কাজে বেশি উপযোগী ছিল।

জল উত্তোলনের জন্য সেকালে *'অরঘট্ট'* নামক যন্ত্রের উল্লেখ ***ড. শর্মা, রোমিলা থাপার, হেমচন্দ্র চৌধুরী*** প্রমুখের গ্রন্থে পাওয়া যায়। হলায়ুধ-এর *'অভিধানরত্নমালা'* গ্রন্থে অনুরূপ এক সেচযন্ত্রকেই *'উদ্‌ঘাটক'* বলা হয়েছে। একটি চক্রাকার কাঠামোর গায়ে অনেকগুলি ঘটি জাতীয় পাত্র লাগিয়ে নিচু থেকে জল উত্তোলন করা যেত। রাজস্থানের মান্দোরের দুটি ভাস্কর্যে এই জাতীয় যন্ত্রের প্রতিকৃতি দেখা যায়। ***রণবীর চক্রবর্তীর*** মতে, অনেকে এই সেচ যন্ত্রটিকে 'পার্সিয়ান হুইল' (Persian wheel) বলে মনে করেন। কিন্তু ***ড. ইরফান হাবিবের*** গবেষণার ভিত্তিতে ***ড. চক্রবর্তী*** বলেছেন, 'পার্সিয়ান হুইল' যন্ত্রটি ভারতীয় অরঘট্টর তুলনায় অনেক উন্নত, জটিল ও বেশি কার্যকরী। চতুর্দশ শতকে ইবন বতুতা বাংলাদেশ পর্যটনকালে পূর্ববাংলা থেকে আসামের দিকে যাওয়ার সময় নদী থেকে জল তোলার জন্য একধরনের চক্রাকার যন্ত্র দেখেছিলেন। সম্ভবত এটি 'অরঘট্ট' জাতীয় কোন যন্ত্র ছিল।

সপ্তম শতক ও পরবর্তীকালে রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ ও লেখ থেকে সেকালের উন্নত কৃষি উৎপাদনের কথা প্রমাণিত হয়। সমকালে রচিত কয়েকটি কৃষি-বিষয়ক গ্রন্থ হল *'কৃষিপরাশর', 'শূন্যপুরান,' মন্ত্রকোষ'* ইত্যাদি। এই সকল গ্রন্থে তৎকালীন কৃষি প্রণালী, উৎপাদিত পণ্যাদি, সেচ ব্যবস্থা ইত্যাদির বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। এমন গ্রন্থের প্রণয়ন-প্রবণতা কৃষিকার্যের প্রতি সমকালীন সমাজের অনুরাগের পরিচয় বহন করে। বিভিন্ন লেখমালাগুলিও যথেষ্ট গুরুত্বের

সাথে কৃষি-বিষয়ক তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করেছে। ৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দের বিলহরি লেখতে শাক ও বেগুন চাষের উল্লেখ পাওয়া যায়। দক্ষিণ ভারত, কোঙ্কন উপকূল, আসাম ও বাংলাদেশে নারকেল ও সুপারি উৎপাদন হত। দক্ষিণ ভারতে ব্যাপক পানের চাষ হত। আদি-মধ্যযুগের বাংলার একটি লেখতে 'বারজিক' শব্দটির উল্লেখ আছে। অধ্যাপক ***দীনেশচন্দ্র সরকার*** 'বারজিক' শব্দটিকে পানচাষের ক্ষেত্র 'বরজ'-এর সাথে অভিন্ন বলে মত প্রকাশ করেছেন। সুস্বাদু মশলার উৎপাদক হিসেবে ভারতের নাম বিশ্বখ্যাত। আদি-মধ্যযুগের সাহিত্য ও লেখমালা থেকে সেকালে মশলা চাষের বিবরণ পাওয়া যায়। দ্বাদশ শতকে উৎকীর্ণ গুজরাটের একটি লেখতে কর্পূর, হিং, জায়ফল, জয়িত্রী, খেজুর, ইত্যাদি চাষের কথা উল্লেখ আছে। সম্ভবত মরিচ গুজরাটে চাষ হত না। মরিচ উৎপাদনে মালাবার উপকূল অঞ্চলের একাধিপত্যের কথা স্থানীয় লেখমালা এবং চৈনিক ও আরবী পর্যটকদের বর্ণনা থেকে জানা যায়। রাজতরঙ্গিনীতে কাশ্মীরে জাফরান চাষের উল্লেখ পাওয়া যায়। কার্পাস ও তৈল উৎপাদনের ক্ষেত্রেও আদি-মধ্যযুগের দক্ষতা প্রমাণিত। অধ্যাপক ***রণবীর চক্রবর্তীর*** মতে, গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যে কার্পাস উৎপাদনের অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ ছিল। কারণ ঐ অঞ্চলে কৃষি মৃত্তিকার অস্তিত্ব ছিল, যা তুলো চাষের উপযোগী। জনৈক চীনা রাজকর্মচারী চৌ-জু-কুয়া তাঁর *'চু-ফান-চি'* গ্রন্থে (১২২৫ খ্রীঃ) লিখেছেন যে, দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় (পং-কি-লো') প্রচুর তুলো উৎপাদিত হত। অধ্যাপক চক্রবর্তী লিখেছেন, *"আদি-মধ্যযুগের ফসলের এই তালিকা থেকে কৃষি উৎপাদনের দৃঢ় ভিত্তি, বহুল ফলন ও ফসলের বৈচিত্র্য অনুধাবন করতে কোনও দ্বিধা ও অসুবিধা হয় না।"*[1]

○ আদি-মধ্যযুগে সামন্তপ্রথা সম্পর্কিত বিতর্ক :

'অগ্রহার' ভূমিদান ব্যবস্থার ব্যাপকতার সাথে ভারতবর্ষে আদি-মধ্যযুগের সূচনা তথা সামন্ত ব্যবস্থার উদ্ভবের প্রসঙ্গটি গভীরভাবে সম্পর্কিত। ইউরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগের আবির্ভাবের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ভূমি-সম্পর্কের বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। এক বিশেষ ধরনের আর্থ-রাজনৈতিক সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে এক বিশেষ ধরনের উৎপাদন, নির্দিষ্টভাবে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাকে যুক্ত করে সামন্ত প্রথা ও মধ্যযুগের সূচনার বিষয়টি আলোচিত হয়। ভারতবর্ষে আদি-মধ্যযুগের সূচনাকাল নির্ধারণের ক্ষেত্রেও ইউরোপীয় মডেলটি বিচার করা হয়। অগ্রহার দান ব্যবস্থা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ব্রাহ্মণ শ্রেণীকে অতিক্রম করে ধর্মনিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হলে ভারতবর্ষেও সামন্ততান্ত্রিক উপাদানের আবির্ভাব ঘটে। বিশিষ্ট সমাজতান্ত্রিক দার্শনিক কার্ল মার্কস সামন্ত ব্যবস্থাকে এক বিশেষ ধরনের উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। মার্কসবাদী পণ্ডিতদের মতে, সামন্তপ্রথা মূল উপকরণ ভূমি। ভূসম্পদের উপর ভূস্বামীদের অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ এই ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। এখানে উৎপাদনের উপাদান ও উপকরণের উপর ভূস্বামীদের পূর্ণনিয়ন্ত্রণ থাকে। বলা বাহুল্য উৎপন্ন সামগ্রীর উপরেও ভূস্বামীর একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত থাকে। এই ভূস্বামীরা নানা স্তরে বিভক্ত। সর্বনিম্ন স্তরে থাকে ভূমিদাসরা (serf)। এই ভূমিদাস শ্রেণী জমির সাথে আবদ্ধ। তবে জমির উপর এদের কোন মালিকানা থাকে না। জমি হস্তান্তরিত বা বিক্রি হলে ঐ জমির সাথে যুক্ত

ভূমিদাসরাও হস্তান্তরিত হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, সামন্ত ব্যবস্থায় রাজা সামন্তদের উপর অর্থ ও সৈন্যবলের জন্য একান্তভাবে নির্ভরশীল থাকেন। স্বভাবতই সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার শক্তি বৃদ্ধি ঘটলে অনিবার্যভাবেই রাজশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। অর্থাৎ সামন্ত ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় শক্তির অবনমন ঘটে এবং আঞ্চলিক শক্তির উত্থান অনিবার্য হয়।

ঐতিহাসিক ***কোশাম্বী*** (D. D. koshambi) তাঁর *'অ্যান ইনট্রোডাকশন টু দি স্টাডি অফ্ ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি'* গ্রন্থে বলেছেন যে, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের গোড়ার দিকে ভারতে একটি কৃষি প্রধান গ্রামীণ অর্থনীতি বহাল ছিল। এই ব্যবস্থায় স্থানীয় সরকারী কর্তৃপক্ষ কৃষকদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করত। এর বাইরে প্রাথমিকভাবে তথাকথিত ভূস্বামী বা অধিস্বামী ছিল না। কিন্তু মাঝে মাঝে এই কর্মীগোষ্ঠী রাজ নির্দেশের বাইরে গিয়ে কৃষকদের সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন করে প্রচলিত ব্যবস্থার সরল কাঠামোটি বিপর্যস্ত করত। কোশাম্বী এই ব্যবস্থাকে *'উপর থেকে সামন্ততন্ত্র'* নাম দিয়েছেন। চতুর্থ ও পঞ্চম শতক (গুপ্তদের আমল) এবং সপ্তম শতকে (হর্ষবর্ধনের আমল) এই কর্তৃত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটে। সপ্তম শতকের শেষদিকে গ্রামীণ সমাজের অভ্যন্তরেই একটি ভূস্বামী শ্রেণীর অভ্যুদয় ঘটে। এই ভূস্বামীরা কৃষকের কাছ থেকে জোর করে উদ্বৃত্ত আদায় করত। এটিকে তিনি *"নিচু থেকে সামন্ততন্ত্র"* বলে চিহ্নিত করেছেন। ***ইরফান হাবিবের*** মতে, মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এইরূপ 'উপর থেকে সামন্ততন্ত্র' ও 'নিচু থেকে সামন্ততন্ত্র' শব্দ প্রয়োগ গ্রহণযোগ্য নয়। অধ্যাপক ***শর্মাও*** ভারতীয় সামন্ততন্ত্র সম্পর্কে এই 'দ্বি-স্তর' ভূমি-সম্পর্ক ব্যবস্থার অস্তিত্ব মানতে অস্বীকার করেছেন। তিনি যাজ্ঞবল্ক্যের একটি বিবৃতি (পঞ্চাশ শতক) উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে, ক্ষেত্রস্বামী (ভূস্বামী) কৃষকের উপরেই দায়িত্বভার ন্যস্ত করে। দ্বিতীয় শতকের গোড়ায় শক-রাজপুত্র উসবদত্তেব একটি দানপত্র থেকেও জমির উৎপন্নের উপর অ-কৃষকের ব্যক্তিগত অধিকারের স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। ***ইউ. এন. ঘোষাল*** তাঁর *'কনট্রিবিউশানস্ টু দি হিস্ট্রি অফ্ দি হিন্দু রেভেনিউ সিস্টেম'* গ্রন্থে চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ও হিউয়েন সাং-এর মন্তব্যের ভিত্তিতে প্রমাণ করেছেন যে সপ্তম শতকে ভারতে 'রাজস্ব-প্রদানকারী ব্যক্তিগত ভূমি-কর্ষকের' অস্তিত্ব ছিল।

কার্লমার্কস কথিত এশীয় উৎপাদন পদ্ধতির সাথে ভারতে সামন্ততন্ত্রের উপাদানের বিকাশের সম্পর্ক বিষয়ে ঐতিহাসিকদের দ্বিমত আছে। এশীয় রীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে তিনি জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার অভাব, জমির উপর উপজাতীয় গোষ্ঠী-মালিকানা, স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রামের অস্তিত্ব ও বদ্ধ অর্থনীতির বিকাশ, নগরের অভাব ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন। মার্কসীয় বোধের ভিত্তিতে এই উৎপাদন ব্যবস্থার দুটি উপাদান সক্রিয়—গ্রামীণ গোষ্ঠী এবং প্রাচ্য ঈশ্বরতন্ত্র। ইরফান হাবিবের মতে প্রথম উপাদানটি বেশি প্রামাণিক। এতে শ্রম-রীতির কাঠামোর সংজ্ঞা আছে। তাহল, একটি নির্দিষ্ট পেশার সাহায্যে ব্যক্তিগত দাসত্ব ছাড়াই একটি স্বাবলম্বী খুচরো উৎপাদন এবং রাষ্ট্রের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত আদায়ের ব্যবস্থা। এই স্বাভাবিক-অর্থনীতি গ্রামের বাইরে পণ্য-সঞ্চালনের মাধ্যমে উদ্বৃত্তের সদ্ব্যবহারের পথ সুগম করেছিল, এমনটা অসম্ভব নয়। অর্থাৎ প্রাক্-ঔপনিবেশিক ভারতীয় সমাজ হল উদ্বৃত্তের ভোগদখলকারী একটি শাসকশ্রেণি ও গ্রাম্য গোষ্ঠীর বাইরে বিনিময়ের ভিত্তিতে শ্রম-বিভাজন বিশিষ্ট একটি শ্রেণী-সমাজ। এই উৎপাদন পদ্ধতি সামাজিক-অচলতা ও রাষ্ট্রীয় স্বৈরাচার সৃষ্টির সহায়ক। অধ্যাপক ***কোসাম্বী,***

শর্মা প্রমুখ প্রাচীন ভারতীয় সমাজের এই স্থানুত্বের অস্তিত্ব মানতে অস্বীকার করেছেন। তাঁদের মতে, এশীয় উৎপাদন পদ্ধতির ধারণা ভারতীয় সমাজের সাথে খাপ খায় না। প্রাচীন ভারতে জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল এবং রাজাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা শাসকশ্রেণী জনসাধারণের উৎপাদনের উদ্বৃত্ত আদায় করত। আদি-মধ্যকালীন ভারতে নগরের অস্তিত্ব খুঁজে পেতে অসুবিধা হয় না। ***ইরফান হাবিব*** দেখিয়েছেন যে, স্বয়ং মার্কস কোভালস্কি রচিত (১৮৭৯ খ্রীঃ) গোষ্ঠীগত জমি অধিকার সম্পর্কিত প্রতিবেদনে ভারতীয় গ্রাম্য গোষ্ঠীর অভ্যন্তরেই ব্যক্তিগত সম্পত্তির উত্থানকে চিহ্নিত করেছেন। এর ফলে গোষ্ঠীর অভ্যন্তরেই দ্বন্দ্বের উৎপত্তি হয়েছিল। **ড. *হাবিব*** লিখেছেন, অতএব, ভারতীয় গোষ্ঠী তার গভীর অন্তর্দেশ অবধি সম্পূর্ণ রূপে (একটি) অচলাযতন—এ ধারণা দীর্ঘকাল আঁকড়ে ধরে রাখা আর সম্ভব নয়।[1]

খ্রীষ্টীয় ৬৫০ - ১২০০ অব্দে ভারতে সামন্ত ব্যবস্থার বিকাশ এবং পশ্চিম ইউরোপীয় সামন্ত-তন্ত্রের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে হুবহু মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবে অনেক ক্ষেত্রেই উভয়ের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের (৫৫০ বা ৫৭০ খ্রীঃ) পর তদর্থে ভারতে কোন কেন্দ্রীয় শক্তি ছিল না। পরবর্তী প্রায় ৬০০ বছর ভারতের রাজনীতিতে আঞ্চলিক শক্তির অবস্থান ছিল অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই কালপর্বে উত্তর ও পশ্চিম ভারতে গুর্জর প্রতিহার, পূর্ব ভারতে পাল ও সেন বংশ, দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রকূটগণ এবং সুদূর দক্ষিণে চোল রাজ্য শক্তিশালী আঞ্চলিক শাসনের প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই সকল রাজ্য ক্ষমতা ও সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য দীর্ঘ সংগ্রামে লিপ্ত থাকলেও, পরিণামে কোন কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ভারতে সামন্ততন্ত্রের বিকাশ সহজ হয়। বলা যায়, শক্তিশালী কেন্দ্রের অভাব সামন্ততান্ত্রিক উপাদানগুলিকে সমৃদ্ধ করে এবং সামন্ততান্ত্রিক উপাদানগুলির দৃঢ়ভিত্তি আঞ্চলিকতাবাদকে পুষ্ট করে। তবে পশ্চিম ইউরোপের 'ভূমিদাস' ব্যবস্থার প্রতিরূপ ভারতে দেখা যায় না। ভারতের সামন্ত ব্যবস্থার সর্ব-নিম্নস্তরে ছিল ভূমিহীন কৃষক। তবে তারা কেউই জমির সাথে আবদ্ধ ছিল না, জমি বিক্রয় বা হস্তান্তরের সাথে সাথে কৃষকদের হস্তান্তরিত করা হত না। অবশ্য ইউরোপের ভূমিদাসদের থেকে এদের আর্থিক অবস্থা খুব বেশি উন্নত ছিল না। শোষণ-নিপীড়নের মাত্রাও ছিল যথেষ্ট।

ড. রামশরণ শর্মা, বি. এন. এস. যাদব, ডি, এন. ঝা প্রমুখ মনে করেন যে, তাম্রশাসন জারী করে নিষ্কর ভূসম্পদ দানব্যবস্থা সপ্তম শতকে ভারতে সামন্ত ব্যবস্থার বীজ বপন করে। পরবর্তীকালে ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ভূমিস্বত্ব ও রাজস্ব হস্তান্তরের ঘটনা বৃদ্ধি পেলে সামন্ত ব্যবস্থার ভিত সবল হয়। **ড. *শর্মা*** সামন্ত প্রথার উদ্ভব ও বিকাশের ঘটনাকে ভারতীয় প্রেক্ষাপটে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। তাঁর মতে ৩০০-৬০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কালে সামন্ত ব্যবস্থার উন্মেষ ঘটে। ৬০০-৯০০ খ্রীষ্টাব্দে সামন্ত ব্যবস্থা ব্যাপকতা পায়। এবং ৯০০-১২০০ অব্দে একদিকে এর চূড়ান্ত কর্তৃত্ব জারী হয়, আবার অবক্ষয়েরও সূচনা হয়। **ড. *শর্মা*** পুরাণ গ্রন্থে 'কলিযুগ'-সংক্রান্ত বিবরণীটিকে তাঁর মতের সমর্থনে গ্রহণ করেছেন। পুরাণ কথিত চারটি যুগের (সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগ) মধ্যে কলিযুগ'কে অস্থির, অনিশ্চিত, বিশৃঙ্খলা ও দুর্যোগের কাল হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। খ্রীষ্টীয়

র্বর ইতিহাস প্রসঙ্গ (১৯৯৯) পৃঃ ২৫।

চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে রচিত পুরাণ গ্রন্থে কলিযুগকে যেভাবে আর্থিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে অবক্ষয়ের, অস্থিরতার কাল বলা হয়েছে, তাতে সামন্ত ব্যবস্থার আগমনবার্তা শোনা যায় বলে শর্মা মনে করেন।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, অগ্রহার ব্যবস্থা প্রবর্তনের সূত্রে প্রাপ্ত ভূখণ্ড বা গ্রামের উপর দান গ্রহীতার এক ধরনের কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। বস্তুত, তারা ভূস্বামীতে পরিণত হন। প্রাপ্ত ভূখণ্ডের রাজস্ব আদায় ও ভোগের সঙ্গে সঙ্গে লিখিত বা অলিখিত ভাবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার প্রশাসনিক দায়িত্বও দানগ্রহীতা গ্রহণ করেন। *ড. শর্মা* কলিযুগের বর্ণনার ভিত্তিতে মনে করেন যে, শাসকদের পক্ষে রাজস্ব আদায় তখন সম্ভব হত না বলেই, সম্ভবত ভূস্বামীদের হাতে স্থানীয় প্রশাসনিক দায়িত্ব ভাগ করে দেবার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তবে এই ব্যবস্থা যে রাজার সার্বভৌম কর্তৃত্বের পরিপন্থী ছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। গুপ্ত ও বকাটক রাজাদের আমলে 'অগ্রহার' দান ব্যবস্থার সৃষ্টি হলেও, ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তীকালে ভূমিদানের রীতি বহুল বৃদ্ধি পায়। পালদের তাম্রশাসন থেকে জানা যায় বৌদ্ধবিহার, শৈবমন্দির, নালন্দা মহাবিহার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিগত ভাবে ব্রাহ্মণ পুরোহিত, বৌদ্ধভিক্ষু প্রমুখ বহু জমি অগ্রহার দান হিসেবে ভোগদখল করতেন। সেনবংশ , প্রতিহার বংশীয় রাজাদের আমলেও এই রীতি বহাল ছিল। দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রকূট রাজাদের তাম্রশাসন থেকেও 'ব্রহ্মদেয়' দান, 'দেবদান' ইত্যাদির কথা জানা যায়। ড. *রণবীর চক্রবর্তী* লিখেছেন যে, একাদশ-দ্বাদশ শতকে দক্ষিণ ভারতের বিশাল মন্দিরগুলি এতটাই ভূসম্পদশালী হয়ে ওঠে যে সেগুলি রাজ্যের অর্থনৈতিক ক্রিয়া-কলাপকেও নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে।

অধ্যাপক শর্মা আসরাফপুর তাম্রশাসনের (৬৭৫ খ্রীঃ) ভিত্তিতে দেখিয়েছেন যে ভূমিদাস-সংক্রান্ত আদেশনামায় মালিকানা ছাড়াও ভোগাধিকারী (ভূজ্যমানক) ও কৃষক (কৃষ্যমানক)- এর উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ মালিকানার বাইরে জমি ভোগাধিকারের ধারণা ছিল, যা মালিকানা থেকে স্বতন্ত্র। আবার মালিক ও ভোগাধিকারীর বাইরে কৃষকের অস্তিত্বও ছিল। রাজস্থান, মালবদেশ প্রভৃতি স্থানে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে দান গ্রহীতাকে বলা হয়েছে যে, তিনি নিজে চাষ করতে পারেন, কিংবা কাউকে দিয়ে চাষ করিয়ে নিতে পারেন (কৃষতঃ কর্ষাপয়তঃ) ; নিজে ভোগ করতে পারেন বা কাউকে দিয়ে ভোগ করাতে পারেন (ভুঞ্জতো ভোজাপয়তঃ)। অধ্যাপক *রণবীর চক্রবর্তীর* মতে, এই ব্যবস্থা কৃষি অর্থনীতিতে স্তরীকরণের গতি বৃদ্ধি করে। এই রূপ স্তরবিন্যাস সামন্ততন্ত্রের চরিত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

পাল প্রতিহারদের তাম্রশাসনগুলিতে ভূমিদান করলেও ভূখণ্ডের চতুর্সীমা যথাযথভাবে নির্দিষ্ট করা হত না। এই সুযোগে দানগ্রহীতা জমির চৌহদ্দি বৃদ্ধি করতে পারতেন। এই অতিরিক্ত রাজস্ব ভূস্বামীর আর্থিক শক্তি বৃদ্ধির সহায়ক হত। দক্ষিণ ভারতের ক্ষেত্রেও ব্যক্তি মালিকানার প্রসার ঘটেছিল। নোবুরু কারাশিমা ভারতে সামন্ত ব্যবস্থার অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে চোল যুগে (নবম-দশম শতক) অ-ব্রহ্মদের গ্রামগুলি 'উর' নামক গ্রামসভার সমষ্টিগত অধিকারে ছিল। হস্তান্তর-সংক্রান্ত লেখগুলিতে দানকর্তা হিসেবে 'উর'-এর নামোল্লেখ আছে। কিন্তু তিনি স্বীকার করেছেন যে ব্রহ্মদের গ্রামগুলিতে ব্রাহ্মণ ভূস্বামীদের অস্তিত্ব ছিল। চোল সম্রাট তৃতীয় রাজরাজের আমলে ব্যক্তিগত ভাবে ভূমিদানের

প্রমাণ পাওয়া যায়। নিম্ন-কাবেরী উপত্যকার এই সকল জমি ক্রয়-বিক্রয়ের দলিলে 'উর'-এর নাম নেই। অর্থাৎ ব্যক্তি বিশেষ কর্তৃক জমি হস্তান্তরের ঘটনা থেকে দক্ষিণ ভারতেও ব্যক্তিগত মালিকানার অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়।

অষ্টম শতক ও পরবর্তীকালে ভূমিদান ও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাবল্য প্রসঙ্গে ড. শর্মা ধর্মনিরপেক্ষ ভূমিদান বিষয়টির উপর জোর দিয়েছেন। ব্রাহ্মণ ও ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলিকে 'অগ্রহার' দান ব্যবস্থার মাধ্যমে জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার সূচনা হয় ; কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান এবং প্রশাসক ও সেনাকর্মচারীদের রাজস্ব ভোগদখলের অধিকার দেওয়া হলে সামন্ততান্ত্রিক কর্তৃত্ব জোরালো রূপ পায়। অধ্যাপক শর্মার মতে, অষ্টম-দশম শতকে বাণিজ্যের সংকোচ ঘটলে মুদ্রা ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় সরকারী সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীদের নগদ বেতনের পরিবর্তে ভূমি-রাজস্ব ভোগের অধিকার দেওয়া হয়। এই সকল এলাকার উদ্বৃত্ত রাজস্ব সম্ভবত রাজকোষে জমা দেওয়া হত। এবং রাজার প্রাপ্য রাজস্ব যথাযথ জমা দিতে পারলে এরা নিজ নিজ এলাকায় ইচ্ছামত কর সংগ্রহ করতে পারতেন। *ড. রণবীর চক্রবর্তীর* মতে, *"সামন্তদের মধ্যে এক একটি এলাকা বরাদ্দ করে দেবার মধ্যে মধ্যযুগের জায়গীর ব্যবস্থার কিছু সাদৃশ্য আছে"*[৭]। গুর্জর প্রতিহারদের রাজ্যে 'বংশ পোতক ভোগ' অধিকার অর্থাৎ বংশানুক্রমিক ভাবে জমি ভোগদখলের অধিকার স্বীকৃত ছিল। এর মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট এলাকায় একটি বিশেষ বংশের ধারাবাহিক কর্তৃত্ব বজায় থাকত। এই প্রবণতা সামন্ততান্ত্রিক উপাদানকে শক্তিশালী করেছিল। *ড. শর্মা* পালরাজা রামপালের আমলে *'কৈবর্ত্ত'* বিদ্রোহের ঘটনাকে সামন্ততন্ত্রের প্রেক্ষাপট বর্ণনার কাজে ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে 'কৈবর্ত্ত' বিদ্রোহ ছিল মূলত একটি কৃষক বিদ্রোহ। সম্ভবত সামন্তদের শোষণ ও দমনমূলক নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ছিল এই অভ্যুত্থান। দেখা যায় পাল রাজা সামন্তদের সহায়তা নিয়ে এই বিদ্রোহ দমনে তৎপর হয়ে ছিলেন। এ থেকে দুটি সিদ্ধান্ত করা যায় (১) রাজা তাঁর অস্তিত্বের জন্য সামন্তদের উপর বিশেষ নির্ভরশীল ছিলেন এবং (২) কৈবর্ত-কৃষক বিদ্রোহের বিরুদ্ধে সামন্তদের প্রতিরোধ এই ভুস্বামী শ্রেণীর শোষণমূলক চরিত্রের প্রমাণ দেয়।

সপ্তম থেকে দশম শতকে ভারতে বাণিজ্যের অধোগতি ও নগরায়ণের অবক্ষয়ের ঘটনাকে ড. শর্মা সামন্ত ব্যবস্থার উদ্ভবের অন্যতম প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর মতে, এই সময়ে কৃষির উপর এতটাই প্রাধান্য ও নির্ভরতা বেড়েছিল, যার পূর্বদৃষ্টান্ত নেই। এর মূলে ছিল বাণিজ্যের ক্রমিক অবনতি। এই মতের সমর্থনে তিনি পুরাণের বিবরণ ও মুদ্রা অর্থনীতির ভাঙনের উল্লেখ করেছেন। *'বিষ্ণু পুরাণ'* ও *'স্কন্দ পুরাণ'* গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, কলিযুগে বৈশ্যদের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে অবনতি ঘটবে এবং তারা বাণিজ্য ত্যাগ করে কারিগরের হীন বৃত্তি গ্রহণ করবে। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের পরবর্তীকালে ভারত-রোম বাণিজ্যের অবসান ঘটলে ভারতের অর্থনীতির উপরেও তার প্রভাব পড়ে। জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা বৃদ্ধির সূত্রে স্বয়ম্ভর গ্রামীণ অর্থনীতি গড়ে ওঠে। উদ্বৃত্ত উৎপাদনে অনীহা তীব্রতর হয়। স্বভাবতই বাণিজ্যের গতি মন্থর হয়। আলোচ্যকালে মুদ্রা-অর্থনীতিও রক্তাল্পতার শিকার হয়। বকাটকদের আমলেই

মুদ্রার ব্যবহার সংকুচিত হয়। পাল ও সেন রাজারা কোন মুদ্রা প্রচলন করেননি। রাষ্ট্রকূটদেরও কোনও মুদ্রা ছিল না। গুর্জর-প্রতিহারদের কিছু মুদ্রার সন্ধান পাওয়া যায়। তবে সেগুলির আন্তর্জাতিক বিনিময় মূল্য ছিল না। তাই বাণিজ্যের কাজে সম্ভবত ব্যবহার করা হত না। *ড. শর্মার* মতে, কার্যত ৬০০-১০০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তীকালে মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতির বিলোপ চূড়ান্ত হয়েছিল। একই সময়ে নগর-অবক্ষয়ের ঘটনাও সামন্ততন্ত্রের উত্থানতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করে। অধ্যাপক *বি. এন. এস. যাদব* জিন প্রভসুরী'র 'বিবিধার্থকল্প'-এর একটি উদ্ধৃতির ভিত্তিতে মন্তব্য করেছেন যে, আদি-মধ্যযুগে নগরগুলি ভেঙে প্রায় গ্রামে রূপান্তরিত হয়েছিল। ড. শর্মা হিউয়েন সাং-এর বিবরণের ভিত্তিতে মনে করেন যে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের পরবর্তীকালে গাঙ্গেয় উপত্যকার কিছু সমৃদ্ধ নগর যেমন—শ্রাবস্তী, বৈশালী, কৌশাম্বী, কপিলাবস্তু, কুশীনগর ইত্যাদি অবক্ষয়ের কবলে পড়েছিল। হিউয়েন সাঙ কয়েকটি নগরকে প্রায় প্রাণহীন, রিক্ত ও গ্রামীণ চরিত্রবিশিষ্ট বলে উল্লেখ করেছেন। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে গড়ে ওঠা নগরগুলির পুরাতাত্ত্বিক অবশেষ বিশ্লেষণ করে ড. শর্মা সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, আদি-মধ্যযুগে শহরগুলি ক্রমে হতদরিদ্র রূপ নেয় এবং ধীরে ধীরে জনশূন্য হয়ে পড়ে। নগরের এই অবক্ষয়কে শর্মা সামন্ত ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষণ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন।

আদি-মধ্যযুগে ভারতে সামন্ত ব্যবস্থার সূচনা ও বিকাশ সম্পর্কে ড. শর্মা, যাদব প্রমুখের সিদ্ধান্ত সকলে মেনে নেননি। ভারতে আদি-মধ্যযুগের অর্থনৈতিক ছক সম্পর্কে শর্মা প্রমুখের মতের বিরোধিতা করেছেন *ড. দীনেশ চন্দ্র সরকার, হরবন্‌স মুখিয়া* প্রমুখ। অধ্যাপক *সরকারের* মতে, আদি-মধ্যযুগের তাম্রশাসনগুলিতে এমন কোন কথা উল্লেখ নেই, যা থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে ভূমিদানের ফলে রাজকোষের আয় হ্রাস পেয়েছিল। তাঁর মতে, দানগ্রহীতা জমির রাজস্ব ভোগ করতেন, কিন্তু কর সংগ্রহের অধিকার বা ক্ষমতা ছিল একমাত্র রাজার। তাছাড়া 'করশাসন' নামক সরকারী আদেশনামার ভিত্তিতে তিনি দেখিয়েছেন যে, এই সকল আদেশনামা দ্বারা রাজা 'অগ্রহার' এলাকা থেকেও প্রয়োজনে কর সংগ্রহ করতে পারতেন। তাঁর মতে, সামন্ত ব্যবস্থার ফলে রাজা বা ভূস্বামীদের তেমন ভাবে আর্থিক ক্ষতি ঘটেনি। এই ব্যবস্থায় প্রকৃত ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সাধারণ কৃষকশ্রেণী। *ড. রণবীর চক্রবর্তী* মনে করেন, অধ্যাপক সরকারের মতামত খুব স্পষ্ট নয়। কারণ তিনি সামন্ত রাজাদের *'ফিউডেটরী চিফ'* (Feudatory chiefs) এবং অভিজাতদের প্রাপ্ত ভূখণ্ড (ইনাম)-কে *'ফিফ'* (Fief) বলে নানা সময় উল্লেখ করেছেন।

অধ্যাপক *হরবন্‌স মুখিয়া* পশ্চিম ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে ড. শর্মা কথিত ভারতীয় সামন্ত ব্যবস্থার ধারার তুলনা করে ভারতে সামন্ত ব্যবস্থার অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, সামন্ততন্ত্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দুটি বৈশিষ্ট্য হল—(১) উৎপাদনের উপকরণের উপর সামন্তপ্রভুর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ এবং (২) চুক্তি (Contract)। আদি-মধ্যযুগের ভারতে এদুটি উপাদানের অস্তিত্ব ছিল না। ভারতে উৎপাদনের উপকরণগুলি কৃষকদের নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং ভূমি দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে কোনরূপ চুক্তি স্বাক্ষরিত হত না। এমনকি, কৃষক কোনভাবেই জমির সাথে আবদ্ধ ছিল না। অধ্যাপক শর্মা ভারতে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বাণিজ্যের অধোগতি ও নগরের ক্রমিক অবক্ষয়ের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু

ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় তাঁর *'Markets and Merchants in Early Medieval Rajastan'* প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ শতকে ভারতের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য যথেষ্ট উন্নত ছিল। তিনি লেখমালার ভিত্তিতে বহু ব্যস্ত বাণিজ্যকেন্দ্রের নাম উল্লেখ করেছেন। ***কীর্তিনারায়ণ চৌধুরী*** ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠার ফলে ভারত মহাসাগরে বাণিজ্যের নতুন ধারার উপর গবেষণা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন অষ্টম শতকের আগে পশ্চিম এশিয়ার জাহাজগুলি চীনের ক্যান্টন বন্দর পর্যন্ত চলাচল করত। মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে ভারতের পশ্চিম উপকূলে পৌঁছানো সহজ হয়। অষ্টম শতকে চীনা জাহাজগুলি দক্ষিণ ভারতের কালিকট ও কুইলন বন্দরে আসত। এখানেই আসত আরব জাহাজ গুলিও। এখান থেকে চীনাপণ্য আরব জাহাজে তোলা হয়। এইভাবে ভারতীয় বন্দরগুলি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কেন্দ্রে পরিণত হয়। অর্থাৎ বাণিজ্য হ্রাস, নগরের অবক্ষয় ইত্যাদি তত্ত্ব দ্বারা সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব সম্পর্কে ড. শর্মার যুক্তি সর্বজনগ্রাহ্য নয়।

সপ্তম শতকের পরবর্তীকালে ভারতে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে বিতর্ক চলছে। সামন্ততন্ত্রের কালগত কাঠামো এবং আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট মাপকাঠি ছাড়া এই বিতর্কের সমাধান সম্ভব নয়। তবে সপ্তম শতকে ভারতে ভূমিদান ব্যবস্থা ব্যাপকতা পাওয়ার ফলে জমির উপর যেভাবে ব্যক্তিগত মালিকানার সৃষ্টি হয়, তাতে সামন্ততান্ত্রিক উপাদানগুলির পোষণ ঘটা সহজ হয়। আক্ষরিক অর্থে আদি-মধ্যযুগের ভারতে সামন্ত ব্যবস্থা হয়তো গড়ে ওঠেনি ; তবে সেকালে ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তনের পথ ধরে সামন্ততান্ত্রিক উপাদানগুলির যে আবির্ভাব ঘটেছিল, তা বলা সম্ভবত অযৌক্তিক হবে না।

○ নগর কেন্দ্রসমূহ ঃ

ভারতবর্ষে নগরের উদ্ভব হয় আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ২৩৫০ অব্দে। হরপ্পা সংস্কৃতির মধ্যে এই প্রথম পর্বের নগরায়ণের প্রকাশ ঘটে। প্রথম পর্বের নগরায়ণের পতন ঘটে আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ১৭৫০ অব্দে।[1] ভারতবর্ষে দ্বিতীয় পর্বের নগরায়ণ ঘটে খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে। দ্বিতীয় পর্বের নগরায়ণের মূল কেন্দ্র ছিল মধ্যগাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চল। পূর্বে উত্তরপ্রদেশ ও বিহার সমভূমি এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দ্বিতীয় পর্বের নগরায়ণের বিকাশকাল খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতক পর্যন্ত সম্প্রসারিত ছিল বলে মনে করা হয়। এই পর্বের নগরগুলি অধিকাংশ ছিল মূলত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কেন্দ্র এবং গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যপথের উপর অবস্থিত। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের নগরায়ণের কিছু চরিত্রগত পার্থক্য লক্ষণীয়। হরপ্পীয় নগরায়ণ স্থায়ী হয়েছিল মোটামুটি ছয়শো বছর (খ্রীঃ পূঃ ১৭৫০-২৩৫০)। এর কিছু অবক্ষয়ী নিদর্শন আনুমানিক ১৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে পাওয়া যায়। যাকে *'পরবর্তী-হরপ্পা'* (Late Harappan) সংস্কৃতি বলা হয়। কিন্তু এর প্রায় এক হাজার বছর ভারতে নগর জীবনের কোন ছাপ খুঁজে পাওয়া যায় না। এমনকি এই উপমহাদেশ থেকে পোড়ামাটির ইঁটও অদৃশ্য হয়ে যায়। কিন্তু দ্বিতীয় পর্বের নগরায়ণ উদ্ভব কাল থেকে খ্রীষ্টীয় ৩০০ শতক পর্যন্ত অবাধ গতিতে এগিয়ে ছিল। পরবর্তীকালে অধিকাংশ নগরেরই পতন হয় এবং নগরের গুরুত্ব হ্রাস পায়। শর্মার মতে, সীমিত আকারে

বা পুনরুজ্জীবিত রূপে যেভাবেই হোক দ্বাদশ শতক ও তার পরেও নগরজীবনের অস্তিত্ব বজায় থাকে।

ভারতে তৃতীয় পর্যায়ের নগরায়ণ ঘটে আদি-মধ্যযুগে। কিন্তু এই নগরায়ণের সঠিক সময়কাল সম্পর্কে অধ্যাপক শর্মার সাথে অধ্যাপক *ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়ের* মতভেদ দেখা যায়। শর্মার মতে, ৩০০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ অধিকাংশ নগর বিলুপ্তির পথে এগোতে থাকে। সামান্য কিছু ৬০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত টিকে থাকে। তারপর সেগুলিও ধ্বংস হয়ে যায়। এমন নগর এদেশে খুব কমই আছে, যার অস্তিত্ব ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ছিল বলে মনে করা যায়।[1]

এই প্রসঙ্গে আদি-মধ্যযুগে বাণিজ্যের সংকোচন জনিত কারণে নগরায়ণ ব্যবস্থার অধোগতির বিষয়টি স্মরণীয়। নবম শতক থেকে আরবদের লেখার মধ্যে আরব ও ভারতীয় বণিকদের বাণিজ্যের কথা জানা যায়। সুলেমান (৮৫১ খ্রীঃ), ইবন খুরদাবাদ (৯৯২ খ্রীঃ), আল মাসুদি (৯১৫ খ্রীঃ), আল ইদ্রিসি (১১৬২ খ্রীঃ) প্রমুখের লেখায় গুজরাট, কোঙ্কন ও মালাবার উপকূলের ভারতীয় বন্দর ও শহরের অস্তিত্বের উল্লেখ পাওয়া যায়। চোল বন্দরে প্রায় দশহাজার মুসলমান বাস করতেন বলে আল মাসুদি লক্ষ্য করেছেন। নবম শতকের রাষ্ট্রকূট লেখমালাতে এই বক্তব্যের স্বীকৃতি পাওয়া যায়। ইহুদি বণিকদের গেনিজা পত্রমালার ভিত্তিতে *এস. ডি. গয়েতিয়েন* ভারত ও আলেকজান্দ্রিয়ার উজ্জ্বল বাণিজ্যের কথা বলেছেন। নবম শতকে আরব বণিকদের রচনা থেকে বাংলায় 'সমন্দর' নামক বন্দরের অস্তিত্ব জানা যায়। এই সকল বিবরণ থেকে ধরে নেওয়া যায় যে, আদি-মধ্যযুগে বাণিজ্যের গতি সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে যায়নি এবং নগরায়ণের কাজ সীমিত আকারে হলেও অব্যাহত ছিল।

অন্যদিকে *ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়* একথা বিশ্বাস করেন যে চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত সময়কালে উত্তর ভারতের বেশ কয়েকটি সমৃদ্ধ নগর অবক্ষয়ের কবলে পড়েছিল। কিন্তু এই অবক্ষয় সার্বিক ছিল বলে ড. চট্টোপাধ্যায় মনে করেন না। সমকালীন পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন ও লেখর ভিত্তিতে তিনি প্রমাণ করেছেন যে আদি-মধ্যযুগেও বেশ কিছু নগর নিজ নিজ চরিত্র বজায় রাখতে পেরেছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন থেকে তিনি প্রমাণ করেছেন যে দ্বিতীয় পর্বের বিখ্যাত নগর অহিচ্ছত্র (বেরিলি জেলা) ষষ্ঠ শতকের পরেও শহুরে চরিত্র বজায় রেখেছিল। দিল্লীর পুরানা কিল্লা, উত্তরপ্রদেশের অত্রঞ্জিঘেড়া প্রভৃতি স্থানে উৎখনন করে তুর্কি অভিযানের পূর্ব পর্যন্ত নগরের অবক্ষয়ের কোন চিহ্ন পাওয়া যায়নি। একইভাবে ৩০০-১২০০ খ্রীষ্টাব্দের অন্তর্বর্তীকালে বারাণসী নগরের অস্তিত্ব অব্যাহত ছিল। বারাণসীর সন্নিকটে রাজঘাটে চতুর্থস্তর (৩০০-৭০০ খ্রীঃ) এবং পঞ্চম স্তরে (৭০০-১২০০ খ্রীঃ) খননকার্যের ফলে এই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। বিভিন্ন লেখমালার সাক্ষ্য থেকেও আদি-মধ্যযুগের নগর-কেন্দ্রগুলির অনুসন্ধান পাওয়া যায়। ৮৬৭-৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে উৎকীর্ণ দশটি লেখ থেকে গাঙ্গেয় উপত্যকায় বুলন্দ শহরের সন্নিকটে *'তত্তানন্দপুর'* শহরের অস্তিত্ব জানা যায়। লেখমালাতে বিভিন্ন রাস্তার বর্ণনা (কুরথ্যা ও বৃহদ্রথ্যা), শহরের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত বাজার (পূর্ব হট্ট), বাজারে যাওয়ার পথ (হট্টমার্গ), ইত্যাদি উন্নত নগর জীবনের সাক্ষ্য বহন করে। অধ্যাপক *রণবীর চক্রবর্তী* লিখেছেন, তত্তানন্দপুর

যে নগরসুলভ আকার ও চরিত্র ধারণ করেছিল, 'আহাড়ের' উৎখনন থেকেও তার সমর্থন মিলেছে।[1] প্রতিহার সাম্রাজ্যের অন্তর্গত 'সিয়াডোনী'তে প্রাপ্ত লেখটি ৯০৭-৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দের সময়কালে সেখানে নগরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। এখানে *'পত্তন'* (শহর), *'হট্ট'* (বিপননকেন্দ্র), *'অপরসরক'* (বারান্দাযুক্ত বাড়ী) ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার নগর চরিত্রের আভাস দেয়। নগর জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য 'মণ্ডপিকার'ও অস্তিত্ব ছিল বলে অনুমান করা হয়। বাণিজ্যিক কেন্দ্রের পাশাপাশি সম্ভবত *'সিয়াডোনি'* রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ৮৭৫ ও ৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের দু'টি লেখ থেকে জানা যায় যে গুর্জর প্রতিহারদের আর একটি ব্যস্ত নগর ছিল 'গোপাদ্রি, (বর্তমান গোয়ালিয়র)। নগরটি সম্ভবত প্রাকার দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। সে কারণে নগরটিকে 'কোট্ট, বা কেল্লা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিহার রাজাগণ নিযুক্ত 'কোট্ট পাল' এই দুর্গের রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। 'বলাধিকৃত' উপাধিধারী উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারী গোপাদ্রিতে অবস্থান করতেন। এর থেকে এই নগরীর প্রশাসনিক গুরুত্ব বোঝা যায়। ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় গুর্জর ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত 'পৃথুদক' (আধুনিক পেহোয়া) নামক আদি-মধ্যযুগের একটি নগরের উল্লেখ করেছেন। ৮৮২-৮৩ খ্রীষ্টাব্দের একটি লেখর ভিত্তিতে তিনি বলেছেন, পৃথুদক ছিল উত্তরাপথের প্রধান অশ্ব বাণিজ্যকেন্দ্র। এই লেখ থেকে বিভিন্ন অশ্ব ব্যবসায়ীর বিবরণ জানা যায়। তবে পৃথুদকের তুলনায় সিয়াডোনী ও গোপাদ্রি অনেক বেশি সমৃদ্ধ, ব্যস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল বলে অধ্যাপক *চট্টোপাধ্যায়* মনে করেন। সিয়াডোনী প্রশাসনিক ও বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে খ্যাত ছিল। অন্যদিকে গোপাদ্রি সামরিক কেন্দ্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

দশম শতকে উৎকীর্ণ কলচুরি রাজ্যের শাসক দ্বিতীয় লক্ষ্মণরাজ-এর 'করিতলাই লেখ'র ভিত্তিতে ড. চট্টোপাধ্যায় ঐ অঞ্চলে (মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর) নগরায়ণের সাক্ষ্য উপস্থিত করেছেন। এই লেখতে পুরপত্তন কথাটি উৎকীর্ণ আছে। এছাড়া 'বিলহরি লেখতে ঐ অঞ্চলে বৃহদাকার 'পত্তন মণ্ডপিকার' কথা উল্লেখ আছে। সম্ভবত বিলহরির সুবিস্তৃত উৎপাদনক্ষেত্র ঐ অঞ্চলে প্রচুর কৃষিজাত উদ্বৃত্ত যোগান দিত। এইভাবে বিলহরি বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। একইভাবে রাজস্থানের 'নাডোল' কৃষি-বাণিজ্যের আর একটি কেন্দ্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। এখানে 'মণ্ডপিকা' গড়ে উঠলে নাডোল শহরে চরিত্র লাভ করে। পরবর্তীকালে চহমান রাজাদের রাজধানী হিসেবে নাডোল প্রতিষ্ঠা পায়।

আর চম্পকলক্ষ্মী (R. Champaklakshmi) মালাবার উপকূল সহ দক্ষিণ ভারতে বাণিজ্যের প্রসার সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা করেছেন। তিনিও আদি-মধ্যযুগে দক্ষিণ ভারতে বাণিজ্যকেন্দ্রিক নগরের উদ্ভবের কথা স্বীকার করেছেন। *"গ্রোথ অব আর্বান সেন্টার্স ইন সাউথ ইন্ডিয়া ...."* শীর্ষক প্রবন্ধে[2] 'কুড়ামুক্কু-পালাইয়ারাই' নামক জোড়া শহরের উত্থান ও বিকাশের কথা উল্লেখ করেছেন। কাবেরী ব-দ্বীপ অঞ্চলে গড়ে ওঠা এই যুগ্ম শহরের পটভূমিতে তিনি স্থানীয় ধনাঢ্য ব্যক্তিদের চাহিদা, সন্নিহিত পশ্চাৎভূমি থেকে উদ্বৃত্তের যোগান ইত্যাদি উপাদানের অস্তিত্ব লক্ষ্য করেছেন। বাণিজ্যের কারণে এখানে জনবসতি বৃদ্ধি পায়। শহরের উদ্ভবের

প্রাথমিক পর্বে স্থানীয় মন্দির কর্তৃপক্ষ নানাভাবে বণিকদের সাহায্য করেন। এইভাবে কুড়ামুক্কু পালাইয়ারাই শহরের প্রতিষ্ঠা ঘটে।

আদি-মধ্যযুগে তৃতীয় পর্বের নগরায়ণের চরিত্র প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের নগরায়ণ থেকে স্বতন্ত্র ছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের নগরায়ণের ভিত্তি ছিল কোন উন্নত ও বৃহৎ শক্তি হিসেবে তাদের গুরুত্ব। কিন্তু তৃতীয় পর্বের নগরগুলি ছিল আঞ্চলিক এবং বাণিজ্যক্ষেত্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। তাই আদি-মধ্যযুগের নগরগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভিন্ন ভিন্ন স্তর ও স্থানীয় শক্তির কেন্দ্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল।

○ আদি-মধ্যযুগের বাণিজ্য ঃ

আদি মধ্যযুগের অর্থনৈতিক চরিত্র সম্পর্কে ***রামশরণ শর্মা, বি. এন. এস. যাদব, রমেন্দ্রনাথ নন্দী, ডি. এন. ঝা*** প্রমুখের বিশ্লেষণের সাথে ***ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়, কীর্তিনারায়ণ চৌধুরী*** প্রমুখের বক্তব্যের মৌলিক পার্থক্য সমকালীন বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায়। *শর্মা* প্রমুখ মনে করেন যে অগ্রহার ব্যবস্থা ও ভূমিদাস কর্মসূচীর বহুমাত্রিক প্রয়োগ ব্যক্তিগত মালিকানার সৃষ্টি করে, যার পরিণতিতে একদল শক্তিশালী ভূম্যাধিকারীর উদ্ভব ঘটে। ক্রমে উৎপাদন ব্যবস্থায় সামন্ততান্ত্রিক উপাদানের প্রাধান্য ও প্রাবল্য ঘটে। স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ উৎপাদনে উদ্বৃত্ত সৃষ্টিতে বাধা সৃষ্টি করে। এবং অনিবার্যভাবে বাণিজ্যের অবক্ষয় দ্রুততর হয়। একইভাবে সামন্ত ব্যবস্থার বিকাশ ভারত-রোম বাণিজ্যের ধারাকে শিথিল করলে বহির্বাণিজ্যেও মন্দা প্রকটতর হয়। এঁরা মনে করেন যে একাদশ শতকের আগে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারতের ভূমিকা ছিল নগণ্য। সপ্তম শতক থেকে একাদশ শতকের অন্তর্বর্তীকালে সার্বিক স্তরে ভারতের বাণিজ্যের ধারা ছিল অতি ক্ষীণগতি। পক্ষান্তরে, ***ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়*** প্রমুখ গবেষক মুদ্রা ও লেখমালার ভিত্তিতে দেখিয়েছেন যে ষষ্ঠ শতক ও একাদশ শতকের মধ্যবর্তীকালে ভারতের অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ ও গতি কিছুটা দুর্বল হলেও, তাকে এককথায় অবক্ষয়ী বা নগণ্য বলা যায় না। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'Markets And Merchants in Early Medieval Rajastan[1] শীর্ষক প্রবন্ধে মধ্য ভারতের বিভিন্ন বাণিজ্যকেন্দ্র এবং বণিকদের ব্যস্ততার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। অধ্যাপক ***ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়*** *'Commerce And Money In Western And Central Sectors of Eastern India'*[2] শীর্ষক প্রবন্ধে শর্মার যুক্তি খণ্ডন করে মুদ্রার ব্যাপক প্রচলন ও সমৃদ্ধ বাণিজ্যের অস্তিত্ব সম্পর্কে মত প্রকাশ করেছেন। *'Industry And Internal Trade'*[3] শীর্ষক প্রবন্ধে গবেষক ***ভকত প্রসাদ মজুমদার*** দেখিয়েছেন যে, সপ্তম-ত্রয়োদশ শতকে উত্তর ভারতের শহর ও উপকূল ভাগে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রাণবন্ত চরিত্র অব্যাহত ছিল। তিনি মনে করেন আদি-মধ্যযুগে বাণিজ্যের মৌলিক পরিবর্তন হয়তো ঘটে, কিংবা নতুন নতুন অঞ্চলে বাণিজ্যের প্রসার লক্ষণীয় ভাবে ঘটেনি, তবে পূর্ব প্রচলিত বাণিজ্যকেন্দ্রগুলি সমস্ত সময় জুড়েই অতীতের ধারা বহমান রেখেছিল। এ বিষয়ে

রণবীর চক্রবর্তীর প্রবন্ধ *'মণ্ডপিকা'* ঃ আদি-মধ্যযুগে উত্তর ভারতের স্থানীয় বাণিজ্যকেন্দ্র। উল্লেখের দাবি রাখে।

সমকালীন লেখমালার সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, আদি মধ্যযুগে উত্তর ভারতে বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল মণ্ডপিকা সমূহ। রণবীর চক্রবর্তীর মতে, খ্রীষ্টীয় ৬০০ অব্দের আগে বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে মণ্ডপিকার বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় না। তাই অনুমান করা যায় যে স্তম্ভযুক্ত আচ্ছাদিত মণ্ডপ বা মণ্ডপিকা বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে আদি-মধ্যযুগেই গড়ে উঠেছিল। খ্রীষ্টীয় অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যবর্তীকালে কাংড়া, ভরতপুর, জব্বলপুর, রাজস্থান, গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলে বহু মণ্ডপিকা গড়ে ওঠে। ***ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়*** তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন যে, রাজস্থান ও গুজরাটে বহুসংখ্যক মণ্ডপ গড়ে উঠেছিল। ৬৪৪-১২৯৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তীকালে উৎকীর্ণ চব্বিশটি লেখ বিশ্লেষণ করে বারোটি মণ্ডপিকা ও বারোটি হাটের (হট্ট) অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন। রাজস্থানের মণ্ডপিকাগুলির অবস্থান গ্রাম ও শহর উভয় অঞ্চলে লক্ষ্য করা যায়। সম্ভবত, শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত বৃহদাকার মণ্ডপিকাগুলি 'মহামণ্ডপিকা' নামে অভিহিত হত। উত্তর ভারতের মণ্ডপিকার মত দক্ষিণ ভারতের বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে 'নগরম্' -এর উল্লেখ পাওয়া যায়। ***কেনেথ হল*** চোল আমলের লেখমালা থেকে এরকম তেত্রিশটি বাণিজ্যকেন্দ্রের নাম উদ্ধার করেছেন। তাঁর মতে, একাধিক গ্রামের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা প্রতিটি 'নাড়ুতে একটি করে 'নগরম্' থাকত। এই কেন্দ্র থেকে নাড়ুর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন গ্রামের সাথে যেমন বাণিজ্যসম্পর্ক গড়ে তোলা হত তেমনি অন্য নাড়ুর সাথেও বাণিজ্যসম্পর্ক গড়ে তোলা হত। কেনেথ হল দক্ষিণ ভারতে স্থলবাণিজ্যের বৃহত্তর কেন্দ্র হিসেবে *"এরিবীর পট্টিনম"*নামক কেন্দ্রের অস্তিত্ব ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। তবে হল (Hall) নাড়ুপিছু একটি করে নগরের অস্তিত্ব সম্পর্কে যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন অধ্যাপক রণবীর চক্রবর্তী সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য চলত প্রধানত স্থলপথে। সমকালীন লেখমালা থেকে স্থলপথগুলির বিশেষ তথ্য পাওয়া যায় না। যেটুকু পাওয়া যায় তা থেকে অনুমান করা হয় যে স্থলপথে ভারতের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যোগাযোগ ছিল। দুধপানি লেখ থেকে জানা যায় যে অষ্টম শতকে তিনভাই বাণিজ্যের কাজে অযোধ্যা থেকে স্থলপথে পশ্চিম বাংলার তাম্রলিপ্তে এসেছিল। কিয়াতানের চৈনিক বিবরণ (৭৮৫-৮০৫ খ্রীঃ) থেকে জানা যায় যে কামরূপ থেকে উত্তরবঙ্গ হয়ে পূর্ব ভারতের মধ্যস্থল মগধে পৌঁছানো যেত। আরবীয় লেখক আলবেরুণীর রচনা থেকে আদি-মধ্যযুগের শেষদিকের কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থলপথের বিবরণ জানা যায়। কনৌজের সাথে পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের স্থলপথে যোগাযোগ ছিল। একটি পথ কনৌজ থেকে বারাণসী, পাটনা, ও মুঙ্গের হয়ে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। আর একটি পথ কনৌজ থেকে প্রয়াগ, উড়িষ্যা হয়ে সুদূর দক্ষিণ ভারতের কান্যকুব্জ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আলবেরুণীর বিবরণী অনুসারে কনৌজের সাথে সুদূর কামরূপ, কাশ্মীর, নেপাল প্রভৃতি অঞ্চলের স্থলপথে যোগাযোগ ছিল। আর একটি পথ গুজরাটের সোমনাথ বন্দরের সাথে মথুরার যোগসাধন করেছিল। স্থলপথ ধরে বাণিজ্য করার জন্য সম্ভবত বণিকদের *'মার্গনিক'* নামক একটি কর দিতে হত।

বাণিজ্যে গতিশীলতার অন্যতম নিদর্শন হল বণিকদের সংঘবদ্ধতা ও সাংগঠনিক স্তরে বাণিজ্যের নিরাপত্তা বিধান। সেদিক থেকেও আদি-মধ্যযুগ পিছিয়ে ছিল না। মৌর্য ও গুপ্তযুগে' 'শ্রেষ্ঠী;' 'স্বার্থবাহ' নামাঙ্কিত বাণিজ্যজীবিদের অভিধাগুলির ব্যবহার আদি-মধ্যযুগেও দেখা যায়। দক্ষিণ ভারতের কোহলাপুর (১১৩৬ খ্রীঃ), সিরাজ (১১৪৩ খ্রীঃ), ও বেলগাঁও (১২০৫ খ্রীঃ)-তে প্রাপ্ত তিনটি লেখতে বণিকদের সমাবেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানে সমবেত বণিকদের নাম, পরিচয়, আবাসস্থল ইত্যাদির বিবরণ পাওয়া যায়। উত্তর ভারতে বণিক সংগঠনের অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতকের একটি লেখ থেকে *'মনিগ্রামম্'* ও *'নানাদেশী'* নামক বণিক সংগঠনের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। অধ্যাপক ***চট্টোপাধ্যায়ের*** মতে, এই সংগঠনের বণিকরা দূরবর্তী দেশ থেকে মূল্যবান পাথর, বিলাসদ্রব্য, সুগন্ধি, ধাতু ইত্যাদি নিয়ে আসতেন। বণিক সংগঠনগুলি নিজস্ব সেনাবাহিনী পোষণ করত, যা তাদের সাংগঠনিক ও বৃত্তিগত শক্তির পরিচয় দেয়। সম্ভবত, স্থানীয় শাসকবৃন্দ আর্থিক কারণে বণিকদের সাথে সহযোগিতা করতেন।

○ বৈদেশিক বাণিজ্য ঃ

খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে ভারত-রোম বাণিজ্যের সংকোচন, গুপ্ত-পরবর্তীকালে জমিতে ব্যক্তি মালিকানার বিকাশ, নগরের অবক্ষয়, বদ্ধ-অর্থনীতির প্রকাশ ইত্যাদি নানা ঘটনার প্রেক্ষাপটে ড. রামশরণ শর্মা, ডি. এন. ঝা. প্রমুখ বাণিজ্য সংকোচের যে তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন, তা সার্বিক বলে মানতে অস্বীকার করেছেন অধ্যাপক ***ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়, কীর্তিনারায়ণ চৌধুরী*** প্রমুখ অনেকেই। সমকালীন লেখমালা, পর্যটকদের বিবরণী, মুদ্রা ইত্যাদির ভিত্তিতে এঁরা দেখিয়েছেন যে সপ্তম শতকের পরবর্তীকালেও ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের গতি অব্যাহত ছিল। ***রণবীর চক্রবর্তী*** তাঁর *'Coastal Trade And voyages in konkan : The Early Medieval Scenario' (1998)* এবং *'Trade in Early India (2000)* গ্রন্থে আদি-মধ্যযুগে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য এবং বিশেষভাবে কোঙ্কন উপকূলের বাণিজ্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কীর্তিনারায়ণ চৌধুরীর গবেষণার সাথে একমত হয়ে তিনি লিখেছেন যে, সপ্তম শতকে ইসলামের প্রসার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে যে গুরুতর পরিবর্তন নিয়ে আসে, ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যেও তার প্রভাব পড়ে।

জর্জ হৌরানী ভারত সাগরে আরব বণিকদের কার্যকলাপের উপর গবেষণা করে বলেছেন যে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে আরব বণিকরা দূরপাল্লার সমুদ্রবাণিজ্যে অংশ নিয়ে চীন পর্যন্ত চলে যেতেন। চৈনিক বিবরণীতে 'পো-সো' এবং 'তা-সি' নামক জাহাজের উল্লেখ আছে। হৌরানীর মতে, যথাক্রমে পার্সী ও আরব জাহাজ বোঝাতে এই দু'টি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবসাগর ও বঙ্গোপসাগরের এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দেবার সময় এই জাহাজগুলি বিশ্রামের জন্য অবশ্যই ভারতের উপকূল বন্দর- গুলিতে নোঙ্গর ফেলত। তখন বাষ্পচালিত নৌ-যান আবিষ্কৃত হয়নি। ফলে নাবিকরা মৌসুমী বায়ুর উপর ভর করে দীর্ঘপথ পাড়ি দিত। স্বভাবতই ভারতের পশ্চিম উপকূলে আরব জাহাজগুলিকে সাময়িক বিরতি ঘটাতে হত। সেখান থেকে আবার চীনের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করত। ***কীর্তিনারায়ণ চৌধুরীর*** মতে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের আগে পর্যন্ত

পশ্চিম এশিয়া থেকে রওনা হয়ে বাণিজ্য জাহাজগুলি চীনের ক্যান্টন বন্দর (খান-ফু) পর্যন্ত চলাচল করত। কিন্তু এই দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা ছিল বেশ ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য। তাই অষ্টম শতকের পরবর্তীকালে পশ্চিম এশিয়ার জাহাজগুলি ভারতের পশ্চিম উপকূলে কুইলন ও কালিকট বন্দরে নোঙ্গর করত। মৌসুমী বায়ুর সাহায্য নিয়ে এই যাত্রা ছিল সহজ ও কম সময়সাপেক্ষ। অতঃপর চীনা জাহাজগুলি ঐ পণ্য সংগ্রহ করে চীনে যেত। এর ফলে ভারতের পশ্চিম উপকূলীয় বন্দরগুলি পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার জাহাজের যোগসূত্রে পরিণত হয়। এইভাবে ভারতবর্ষ সমৃদ্ধ পশ্চিম উপকূলীয় বন্দরগুলি চীন বাণিজ্যের মধ্যবর্তীর ভূমিকায় উত্তীর্ণ হয়। এইভাবে ভারতীয় বাণিজ্যে নতুন প্রাণপ্রতিষ্ঠা ঘটে। ইবন্ বতুতার বিবরণীতেও এই সিদ্ধান্তের সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন যে, আরব দেশীয় 'ধাও' জাহাজগুলি পশ্চিম ভারতের কুইলন ও কালিকট বন্দর পর্যন্ত আসত। অন্যদিকে চীনের 'জাঙ্ক' (জাহাজ) কুইলন ও কালিকট অতিক্রম করে যেত না। এইভাবে দু'প্রান্তের জাহাজ ভারতীয় বন্দরে পণ্য বিনিময় করার ফলে ভারতীয় বন্দর বৈদেশিক বাণিজ্যের অংশীদার হয়ে ওঠে।

সমকালীন আরব লেখকদের বর্ণনা থেকেও আদি-মধ্যযুগে আন্তর্জাতিক সমুদ্রবাণিজ্যে ভারতের এবং বিশেষভাবে পশ্চিম উপকূলের বন্দরগুলির অংশগ্রহণের তথ্য সমর্থিত হয়। সুলেমান (৮৫১ খ্রীঃ), আল মাসুদী (৯১৫ খ্রীঃ), ইবন খোরদাদবা (৯১২ খ্রীঃ), আবু জায়েদ (৯১৬ খ্রীঃ) আল ইশ্ তাখরি (৯৫১খ্রীঃ) ইবন হাউকল (৯৪৩-৬৮ খ্রীঃ), আল ইদ্রিসি (১১৬২ খ্রীঃ) প্রমুখ আরব লেখকরা অষ্টম শতক থেকে দ্বাদশ শতকের অন্তর্বর্তী কাল ভারতের অনেকগুলি ব্যস্ত বাণিজ্যের উল্লেখ করেছেন। পারস্যের বস্রা ও সিরাক থেকে আরব পণ্যবোঝাই জাহাজগুলি গুজরাটের কানবায়া (ক্যাম্বে), কোঙ্কনের সুবারা (সোপারা), সিন্দাবুর (গোয়া), সৈমূর (চৌল), মালাবারের কুলমমালি (কুইলন) প্রভৃতি বন্দরে এসে ভিড়ত।

রাষ্ট্রকূট আমলের লেখমালা ও আরব বণিকদের রচনা থেকে সেকালে আরব-ভারত বাণিজ্য ও সুসম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া যায়। আরব লেখকরা 'কামকাম' দেশের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। কেউ কেউ এর নাম করেছেন মাকামকাম বা কামকার। তাঁরা এই অঞ্চলটিকে 'বালহারা' শাসক গোষ্ঠীর অধীন বলে বর্ণনা করেছেন। রণবীর চক্রবর্তীর মতে, রাষ্ট্রকূট রাজাদের বংশগত উপাধি *'বল্লভরাজ'*-এরই উল্লেখ *'বালহারা'* শব্দে নিহিত আছে। চিনচানি থেকে পাওয়া রাষ্ট্রকূটদের তাম্রশাসন গুলিতেও এই মতের সমর্থন মেলে। রাষ্ট্রকূট তৃতীয় ইন্দ্রের তাম্রশাসনে (৯২৬ খ্রীঃ) স্বীকার করা হয়েছে যে তাঁর পিতা দ্বিতীয় কৃষ্ণের রাজত্বকালে (৮৭৮-৯১৫ খ্রীঃ) আরব বণিকরা (তাজ্জিক) কোঙ্কন উপকূলের বন্দরগুলির উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। রাষ্ট্রকূট ও আরব বণিকরা মিলিত ভাবে কোঙ্কন অঞ্চলের উপর যৌথ আধিপত্য দীর্ঘস্থায়ী করতে প্রয়াসী ছিলেন। রাষ্ট্রকূট লেখ থেকেই প্রমাণিত হয় তৃতীয় ইন্দ্র ও তৃতীয় কৃষ্ণের আমলেও কোঙ্কন উপকূলে আরব বণিকদের বাণিজ্যিক ব্যস্ততা অব্যাহত ছিল। রাষ্ট্রকূটদের পরে কোঙ্কনে 'শিলাহার' বংশের কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। শিলাহার রাজা ছিণ্ডুরাজের তাম্রশাসন থেকে (১০৩৪ খ্রীঃ) বোঝা যায় যে তাঁর আমলেও কোঙ্কন উপকূলে আরব বণিকদের বাণিজ্য গতিময় ছিল। তাঁর লেখতে আরব বণিকদের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। আল্ মাসুদীর বিবরণ থেকে জানা যায় যে দশম শতকে চৌল বন্দরে আরব বণিকদের স্থায়ী বসতি গড়ে উঠেছিল। ওমান, বসরা,

সিরাফ, বাগদাদ্ প্রভৃতি স্থানের বহু মুসলমান বণিক এখানে বাণিজ্যিক কাজে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

দশম শতকের মধ্যভাগে মধ্য প্রাচ্যের রাজনৈতিক পরিবর্তন ভারতের সমুদ্রবাণিজ্যে কিছু পরিবর্তন নিয়ে আসে। মিশরে ফতিমিদ সাম্রাজ্যের উত্থান (৯৬৯ খ্রীঃ) এবং সিরাফ অঞ্চলের গুরুত্ব হ্রাস পাওয়ার পরিণামে বাণিজ্য কর্মে পারস্য উপসাগরের গুরুত্ব কমে যায়। এই সময় লোহিত সাগরের বাণিজ্যিক ব্যস্ততা বৃদ্ধি পায়। লোহিত সাগরের দুই প্রান্তের দুটি বন্দর এডেন ও আলেকজান্দ্রিয়া বন্দর এশীয় বাণিজ্যে প্রসিদ্ধিলাভ করে। লোহিত সাগরের মাধ্যমে ভারত মহাসাগরের সমুদ্রবাণিজ্য ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্যের সাথে শহরে সংযুক্ত হয়ে যেতে পারে। এই সময় কোঙ্কনের বন্দরগুলির পরিবর্তে মালাবার উপকূলের বন্দরগুলির বাণিজ্যিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। কারণ এডেন থেকে জাহাজগুলি খুব সহজে এবং কম সময়ে কুইলন, কালিকট, ম্যাঙ্গালোর, গোয়া বারকুর ইত্যাদি বন্দরে উপস্থিত হতে পারে। মালাবার উপকূলে ইহুদী বণিকদের উপস্থিতির উপর ব্যাপক তথ্য উপস্থাপিত করেছেন ***এস. ডি. গয়টাইন***।[1] বাণিজ্যিক চিঠিপত্রের উপর গবেষণা করে তিনি প্রমাণ করেছেনে যে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে 'কিশ'-এর সাথে গুজরাট বন্দরগুলির নিয়মিত লেনদেন ছিল। তাঁর গবেষণা থেকে স্পষ্ট হয় যে একাদশ-ত্রয়োদশ শতকে এডেন ও আলেকজান্দ্রিয়াতে বিভিন্ন ভারতীয় পণ্যের প্রবল চাহিদা ও যোগান ছিল। এই কাজে বিশেষ ভূমিকা পালন করতেন ইহুদী বণিকেরা। পর্যটক *বেঞ্জামিন*-এর বিবরণীতেও (১১৯২ খ্রীঃ) মালাবার অঞ্চলে ইহুদী বণিকদের উপস্থিতি সমর্থিত হয়। আরব লেখকদের রচনায় 'সেরেনদিব' বা 'সিলানদিব' নামক স্থানের উল্লেখ আছে। সম্ভবত, তাঁরা সিংহলকে এই পথে অভিহিত করেছেন। সেক্ষেত্রে আদি-মধ্যযুগে আরব বণিকরা যে সিংহলের বাণিজ্যিক গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, তা অনুমান করা যায়।

আদি-মধ্যযুগে পূর্ব ভারতে এবং নির্দিষ্টভাবে বঙ্গদেশের বাণিজ্যচিত্রে নানা পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে ব্রহ্মদেশ, মালয়, ইন্দোনেশিয়া, সিংহল প্রভৃতি দেশের সাথে পূর্ব ভারতের বাণিজ্য যোগাযোগের অতি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল তাম্রলিপ্ত বন্দর। কিন্তু অষ্টম শতকে এই বন্দরের গুরুত্ব ভীষণ হ্রাস পায়। তবে বহির্বাণিজ্যের ধারা বন্ধ হয়ে যায়নি। নবম-দশম শতকের আরব লেখকদের রচনায় 'সমন্দর' নামক ব্যস্ত বন্দরের উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবত, এই বন্দরের অবস্থান ছিল বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত চট্টগ্রামের সন্নিকটে।[2] ইবন বতুতা ঐ বন্দরকেই *'সুদকাওয়ান'* (চট্টগ্রাম) নামে অভিহিত করেছেন। ইবন ঘোরদাদবা ও আলইদ্রিসির বিবরণেও চট্টগ্রাম অঞ্চলের সমৃদ্ধির কথা সমর্থিত হয়। উড়িষ্যা (উরানশিন), দক্ষিণ ভারত (কাঞ্জা), সিংহল (সিলানদিব) ইত্যাদি স্থানের সাথেও সমন্দরের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল বলে আরব লেখকরা উল্লেখ করেছেন। চোল রাজাদের আমলে দক্ষিণ ভারতের করমণ্ডল উপকূল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও চীনের সাথে বাণিজ্যের জন্য বিশেষ খ্যাতি পায়। খ্রীষ্ট্রীয় দশম

থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত সমুদ্রবাণিজ্যে চোল রাজাদের অংশ গ্রহণ নানা সূত্রে সমর্থিত হয়। চোলরাজা রাজরাজ, প্রথম রাজেন্দ্র এবং প্রথম কুলোতুঙ্গ প্রমুখের দীর্ঘ শাসন পর্বে (৯৮৫-১১২০ খ্রীঃ) চোলদের শক্তিশালী নৌ-বহরের উপস্থিতিও তাদের বাণিজ্যকর্মের আগ্রহকে সমর্থন করে। ড. *রোমিলা থাপার* লিখেছেন যে, চোল বণিকরা বহির্বাণিজ্যে বেশি উৎসাহী ছিলেন।[1] পূর্ব উপকূলে মহাবলীপুরম্ (মামল্লপুর), কাবেরী পত্তনম, শালিয়ুর, কোরাকাই বন্দর এবং মালাবার উপকূলে কুইলম বহির্বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। পারস্য, আরবদেশ ও চীনের সাথে ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সম্ভবত, চীনের মূল ভূখণ্ডে একটি ভারতীয় উপনিবেশ ছিল। আরব ব্যবসায়ীরা সবচেয়ে বেশি আমদানি করত উন্নতমানের ঘোড়া। দক্ষিণ ভারত থেকে বস্ত্র, ভেষজ, মূল্যবান পাথর, হাতির দাঁত, আবলুস কাঠ, কর্পূর ইত্যাদি চীনে রপ্তানি হত। চীনের সুংবংশের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে চু-লিয়েন (বা চোল) দেশের রাজা লোৎসা-লোৎসা[2] (রাজরাজ) চীনে বাণিজ্য প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেছিলেন। রাজরাজাদের পুত্র রাজেন্দ্র চোলের রাজত্বকালে (১০১২-৪৪ খ্রীঃ) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও চীনের সাথে ভারতের নিয়মিত ও ব্যাপক বাণিজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। ***রণবীর চক্রবর্তী*** লিখেছেন যে, শ্রীবিজয়ের রাজার সাথে চোলদের সম্পর্কের সাক্ষ্য লেখমালা থেকে পাওয়া যায়। শ্রীবিজয়ের রাজা সংগ্রাম বিজয়তুঙ্গ বর্মণ নাগপট্টমে একটি বিহার নির্মাণ করেছিলেন। চীনের মন্দিরে সোনা দান করেছিলেন শ্রীবিজয়ের রাজপ্রতিনিধি। অধ্যাপক চক্রবর্তীর মতে, উভয় দেশের মধ্যে নিয়মিত আর্থিক ও বাণিজ্যিক যোগসূত্র ছাড়া এই সাংস্কৃতিক বিনিময় সম্ভব হত না। চীনদেশ ও করমণ্ডল উপকূলের বাণিজ্যের অন্তর্বর্তী হিসেবে শ্রীবিজয় এই সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল।

রাজেন্দ্র চোলের পুট্টুর তাম্রলেখ (১০২০ খ্রীঃ) থেকে অনুমান করা হয় যে, মালয় উপদ্বীপের পশ্চিম উপকূলে কম্বোজ (কাম্বোডিয়া বা কাম্পুচিয়া)-এর সাথেও চোলদের নিয়মিত বাণিজ্যিক লেনদেন ছিল। সম্ভবত, কম্বোজ রাজ প্রথম সূর্য বর্মণ রাজেন্দ্রচোলের উদ্দেশ্যে কিছু উপহার পাঠিয়েছিলেন। ১০৯৮ ও ১১০২ খ্রীষ্টাব্দের দু'টি চোললেখ থেকে জানা যায় যে চোল রাজ প্রথম কুলোতুঙ্গ বাণিজ্যশুল্ক রহিত করে বৈদেশিক বাণিজ্যকে উৎসাহিত করেছিলেন। পাগানের (বর্তমান ব্রহ্মদেশ) রাজার সাথে কুলোতুঙ্গের কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। চৌ-জু-কুয়ার গ্রন্থ থেকে (১১২৫ খ্রীঃ) জানা যায় যে চীন থেকে পাগানের মধ্য দিয়ে চু-লিয়েন বা চোল দেশে যাওয়া যেত। অনুমান করা হয় যে, চীনের সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে কুলোতুঙ্গ পাগানের শাসকের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। ১০৬৮ ও ১০৯০ খ্রীষ্টাব্দের দুটি লেখ থেকে কুলোতুঙ্গের আমলের ব্যস্ততম বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে *'বিশাখাপত্তনম'* ও *'কুলোতুঙ্গ চোল পত্তনম'* নামক বন্দরের নাম জানা যায়। সম্ভবত, বিশাখাপত্তনমের নাম পাল্টে রাজার নামানুসারে কুলোতুঙ্গ চোলপত্তনম করা হয়েছিল। ***রণবীর চক্রবর্তীর*** মতে, করমণ্ডল উপকূলবর্তী বন্দরের পরিবর্তে বেঙ্গী উপকূলের বিশাখাপত্তনম বন্দরকে গুরুত্ব দেওয়ার পেছনে বাণিজ্যিক হিসেব সক্রিয় ছিল। কৃষ্ণা-গোদাবরীর ব-দ্বীপ

অঞ্চলের বিশাখাপত্তনম থেকে পাগানের সম্পর্ক স্থাপন সহজতর ছিল বলেই কুলোতুঙ্গ এই বন্দরের গুরুত্ব বৃদ্ধি করেন।

○ মুদ্রাব্যবস্থা ঃ

সাহিত্যগত উপাদানের ভিত্তিতে কেউ কেউ মনে করেন যে বৈদিক যুগে ভারতে মুদ্রার প্রচলন ছিল। সাহিত্যসূত্রে 'নিষ্ক' 'শতমান' ইত্যাদি স্বর্ণ নির্মিত উপকরণের অস্তিত্ব জানা যায়। কিন্তু ***রামশরণ শর্মা*** মনে করেন যে এগুলি সম্ভবত ধনী ব্যক্তিরা উপহার হিসেবে ব্যবহার করতেন। এগুলি বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হত কিনা বলা কঠিন। শর্মার মতে, প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রা খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের পূর্বের নয়। মৌর্যদের আমলে অঙ্ক চিহ্নিত মুদ্রার ব্যাপক ব্যবহার প্রচলিত ছিল। কুষাণরা রোমান স্বর্ণমুদ্রাকে নিজেদের মুদ্রায় রূপান্তরিত করেছিলেন। গুপ্তযুগেও স্বর্ণমুদ্রার ব্যাপক প্রচলন ছিল। গুপ্ত শাসকরা সবচেয়ে বেশি স্বর্ণমুদ্রা চালু করেন। তবে স্কন্দ গুপ্তের পরবর্তীকালে গুপ্তদের মুদ্রায় সোনার পরিমাণ যথেষ্ট কম ছিল। তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে গুজরাটের শকক্ষত্রপরা বিপুল পরিমাণ মুদ্রা চালু করেন। এগুলি গুপ্তদের মুদ্রার সমকালীন ছিল। শকদের এই মুদ্রা নির্মিত হত সীসা, তামা ও রূপা থেকে। তবে রূপায় ৮ ভাগের পরিবর্তে ১৪ থেকে ১৮ ভাগ তামার খাদ মেশানো হত। এথেকে অনুমিত হয় যে তখন রূপার যোগান সীমিত ছিল।

গুপ্তোত্তর যুগের পরবর্তী প্রায় চারশো বছর ধরে স্বর্ণমুদ্রার অনুপস্থিতি ও সাধারণ মুদ্রার অভাব দেখা যায়। ***শর্মা*** লিখেছেন, "উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে তিন শতাধিক বছর ধরে তিনটি প্রভাবশালী রাজবংশ রাজত্ব করলেও জোর দিয়ে বলা সম্ভব নয় যে কোন্ মুদ্রা পাল বা রাষ্ট্রকূটরা প্রচলন করেছেন।[1] ড. ***নীহাররঞ্জন রায়ের*** মতে, বাংলার কোথাও পাল বা সেনদের চালু করা একটিও স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যায়নি। এমনকি সমকালীন কোনও সাহিত্যেও স্বর্ণমুদ্রার উল্লেখ নেই।[2] পালদের মত রাষ্ট্রকূট ও গুর্জর-প্রতিহাররাও স্বর্ণমুদ্রা চালু করেননি। ষষ্ঠ শতকের পর দাক্ষিণাত্য ও দক্ষিণ ভারতে খুব কমই ধাতব মুদ্রার ব্যবহার দেখা যায়। ৬০০ থেকে ১০০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রাজত্বকারী পল্লব, পাণ্ড্য, চোল, চালুক্য প্রমুখের খুব কম মুদ্রাই চোখে পড়ে। তবে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশের অবস্থা কিছুটা স্বতন্ত্র ছিল। আদি-মধ্যযুগে (আনুমানিক ৬০০-১০০০ খ্রীঃ) এই অঞ্চলে আফগানিস্থানের শাসকদের মুদ্রা চালু ছিল। ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, খ্রীষ্টীয় সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব বাংলাদেশে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন ছিল। এই মুদ্রাগুলির উপর হরিকেল (নোয়াখালি, কুমিল্লা), পট্টিক (পাইটকারা) প্রভৃতি স্থানের নাম খোদিতও আছে। ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অনুমান এই মুদ্রাগুলির উপর আরাকানের মুদ্রার প্রভাব আছে। মুদ্রাগুলি রৌপ্য নির্মিত এবং এর একপিঠে বৃষমূর্তি ও অপরদিকে ত্রিশূল জাতীয় বস্তুর প্রতিকৃতি অঙ্কিত আছে। দশম শতকের পর মুদ্রাগুলির আকার পরিমাণ ও ওজন পরিবর্তন করা হয়। সম্ভবত, উত্তর ভারতে প্রচলিত *'পুরাণ', 'ধরণ', 'কার্ষাপণ', 'দ্রম্ম',* নামক মুদ্রাগুলির সাথে বিনিময়যোগ্য

করে তোলার জন্য এই পরিবর্তন ঘটানো হয়েছিল। পশ্চিম এশিয়ার *'দিরহাম'* জাতীয় মুদ্রাগুলির সাথে হরিকেল মুদ্রার ওজনগত সাদৃশ্য ঘটানো হয়। সম্ভবত, বাংলাদেশের মুদ্রাগুলিকে উত্তর ভারত ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য এই পরিবর্তন অনিবার্য হয়েছিল। পাহাড়পুর এলাকা থেকে খলিফা হারুণ-অল-রসিদের (৭৮৮ খ্রীঃ) গোলাকৃতি রৌপ্য মুদ্রার আবিষ্কার এবং ময়নামতী অঞ্চলে আব্বাসীয় খলিফা আবু আহম্মদ আবদাল্লার (১২৪২-৫৮ খ্রীঃ) স্বর্ণমুদ্রার আবিষ্কার থেকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে হরিকেলের অংশগ্রহণের বিষয়টি প্রমাণিত হয়। ইতিপূর্বে আলোচিত *'সমন্দর'* বা চট্টগ্রাম বন্দরটি এই অঞ্চলেই অবস্থিত ছিল।

পাল ও সেন রাজাদের আমলে কোন মুদ্রার প্রচলন সম্পর্কে নিশ্চিত প্রমাণ না পেলেও, বহু তাম্রশাসনে *'পুরাণ কপর্দক'* শব্দটি উল্লেখ আছে। শর্মা 'কপর্দক' অর্থে 'কড়ি' বুঝিয়েছেন। এবং এটি বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হত। তবে দূরপাল্লার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কড়ির মত নগণ্য দ্রব্যের ব্যবহার কতটা কার্যকরী ছিল, সে প্রশ্ন অনেকেই তুলেছেন। কারণ তখন ১টি রৌপ্যমুদ্রার জন্য ১২৮০ টি কড়ি দিতে হত। ১টি স্বর্ণমুদ্রার জন্য লাগত ২০৪৮০ টি কড়ি। স্বভাবতই এত বিপুল পরিমাণ কড়ি বহন করে ব্যবসা করা কষ্টকর ছিল। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে 'পুরাণ কপর্দক'-এর সাথে সাথে 'কার্যাপন' নামক একটি নতুন শব্দের উল্লেখ লেখমালায় দেখা যায়। বিশ্বরূপ সেনের মদনপাড়া লেখতে এবং দামোদর দেবের মেহার তাম্রপটে 'পুরাণ' ও 'চূর্ণী' কথাদুটি একই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। ১১৪১ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ উড়িষ্যারাজ অনন্ত বর্মণ চোড়গঙ্গের 'অলগুম শাসনে' 'পুরাণ', 'কার্ষাপন' ও 'চূর্ণী' শব্দগুলি সমঅর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে চূর্ণী বলতে সম্ভবত স্বর্ণ বা রৌপ্য চূর্ণ বা খণ্ডের কথা বলা হয়েছে। আরব বণিকদের রচনা থেকে জানা যায় যে আদি-মধ্যযুগে ধাতু চূর্ণ দ্বারা বিনিময় করা হত। এক তিব্বতী বিবরণীতেও এর সমর্থন মেলে। প্রখ্যাত বৌদ্ধপণ্ডিত অতীশ দীপঙ্করকে তিব্বতে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে তিব্বতী সন্ন্যাসী বিক্রমশীলা মহাবিহারে এসেছিলেন, তাঁকে দৈনন্দিন খরচ মেটানোর জন্য কিছু সোনা দেওয়া হয়েছিল। তিনি ঐ সোনাকে চূর্ণ করে ছোট ছোট পুঁটলিতে সংরক্ষণ করেন। অনুমান করা যায় যে, বঙ্গদেশে সোনা বা রূপার মুদ্রার সমান ওজনের ধাতুচূর্ণ পুঁটুলিতে রেখে লেনদেনের কাজে ব্যবহার করা যেত। ***রণবীর চক্রবর্তী*** আদি-মধ্যযুগের বাংলার বিনিময় ব্যবস্থায় মুদ্রার তিনটি স্তরের উল্লেখ করেছেন। এই ত্রিস্তর ব্যবস্থার সর্বনিম্ন পর্যায়ে ছিল কড়ি বা কপর্দক ; মধ্যবর্তী স্তরে ছিল ধাতবচূর্ণ (চূর্ণী) এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ে ছিল ধাতবমুদ্রা যেমন—কার্ষাপন, দ্রম্ম, পুরাণ ইত্যাদি। ***ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়*** মনে করেন ধাতুমুদ্রা চূর্ণী ও কপর্দকের সহাবস্থান ও বিনিময়যোগ্যতা উত্তর ভারতের অন্যত্র চালু ছিল বলে অনুমান করা যায়।

○ শিল্প উৎপাদন ঃ

কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষের শিল্প উৎপাদনের প্রধান উপাদান ছিল কৃষিজ উপাদান। আখ, পাট, শন, তুলা ইত্যাদি অর্থকরী ফসল উৎপাদনের মাত্রার উপরেই মূলত আদি-মধ্যযুগের শিল্প উৎপাদনের পরিধি নির্ভরশীল ছিল। আখ উৎপাদনে গোটা ভারতের মধ্যে বঙ্গদেশ, উত্তরপ্রদেশ,

মালবদেশ অগ্রণী স্থানে ছিল। ফলে প্রাচীনকাল থেকেই চিনি ও গুড় উৎপাদনে ভারতীয় কারিগরদের দক্ষতার প্রমাণ পাওয়া যায়। 'দেশীনামমালা'-তে 'হস্তযন্ত্র' বা 'পীড়নযন্ত্র' নামক আখ থেকে রস নিষ্কাশনের যন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। চৈনিক লেখক *চৌ-জু-কুয়া* মন্তব্য করেছেন যে, আদি-মধ্যযুগে মালবে প্রচুর চিনি উৎপাদন হত এবং তার অনেকটাই গুজরাট অঞ্চলে পাঠানো হত। চিনি ও গুড় শিল্প পৃথক ছিল বলে রাজস্থানের অর্যুনা লেখতে বলা হয়েছে।

অধ্যাপক *শর্মা* লিখেছেন যে, নবম-দ্বাদশ শতকে ভারতবর্ষে রবিশস্য উৎপাদনের ব্যাপকতা ছিল। তৎকালে প্রচুর পরিমাণে তৈলবীজের চাষাবাদ হত। তৈলবীজ অধিক উৎপাদিত হওয়ার ফলে এদেশে প্রচুর তেল উৎপাদন হত। সমকালীন লেখমালায় *'তৈলিক'* বা *'তৈলী'* নামক বৃত্তিজীবির উল্লেখ পাওয়া যায়। এদের আয়ের প্রধান উৎস ছিল তেলের ক্রয়-বিক্রয়। অধ্যাপক ***রণবীর চক্রবর্তী*** দশম শতকে তেল উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত দু'ধরনের যন্ত্রের উল্লেখ করেছেন। কামসূত্রের টিকা জয়মঙ্গলা'তে উদ্ধৃত কয়েকটি সূত্রের ভিত্তিতে *'ঔদ্র'* ও *'চক্রিক'* নামক দুটি বীজ-পেষায়ের যন্ত্রের নাম জানা যায়। *'ঔদ্র'* নামক যন্ত্রে সাধারণভাবে বীজ পেষাই করা যেত (ঔদ্রা হি পুতিক যন্ত্রেন পীড়য়ন্তি')। 'চক্রিক' ছিল ঘানি জাতীয় যন্ত্র যা চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে শস্যদানা পেষাই করত ('চক্রিক তু চতুর্ষ পাশ্বেষু চল্যা মানেন')। সমাকালীন লেখতে "ঘানি'র উল্লেখও পাওয়া যায়। ১০৩৪ খ্রীষ্টাব্দে শিলাহার ছিত্তরাজের চিনচানি তাম্রশাসনে একটি মন্দিরের উদ্দেশ্যে একটি ঘানি উৎসর্গ করার কথা উল্লেখ আছে। লেখটির শেষাংশে এক সতর্কবাণী উৎকীর্ণ করে বলা হয়েছে যে কেউ এই ঘানির অপঘাত ঘটালে তিনি অশেষ পাপের ভাগীদার হবেন এবং নরকযন্ত্রণা ভোগ করবেন। অধ্যাপক ***চক্রবর্তীর*** মতে, *"এই অভিশাপটি পরোক্ষভাবে ঘানির ব্যাপক ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে আমাদের অবহিত করে"।*

প্রাচীনকাল থেকেই বস্ত্রবয়ন শিল্পে ভারতীয়দের খ্যাতি ছিল। আদি-মধ্যযুগের সেই ধারা অব্যাহত ছিল। হেমচন্দ্র বিরচিত *'প্রবন্ধচিন্তামণি'* গ্রন্থে তুলো পেঁজা এবং পেঁজার জন্য ধনুর ব্যবহারের উল্লেখ আছে। সমকালীন সাহিত্য, লেখমালা ও আরব পর্যটকদের বিবরণ থেকে এদেশে বস্ত্র ব্যবসার ব্যাপকতা ও বস্ত্রশিল্পের কেন্দ্রগুলির নাম জানা যায়। একাদশ শতকে রচিত *'মানসোল্লাস'* গ্রন্থে মুলস্থান (মুলতান), বঙ্গ (বাংলাদেশ), অনহিলপত্তম (অনহিলওয়াড়া), চোলদেশ, নাগপট্টন প্রভৃতি অঞ্চলকে বস্ত্র উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। চৌ-জু-কুয়া মালব ও গুজরাটকে বস্ত্র শিল্পের কেন্দ্র হিসেবে প্রশংসা করেছেন। বস্ত্র উৎপাদনের কেন্দ্র হিসেবে পাটন-এর নাম পাওয়া যায় *'রাজতরঙ্গিনী'* গ্রন্থে। আল মাসুদি, ইবন ঘোরদাদবা প্রমুখ আরব লেখক। চীনা লেখক *চৌ-জু-কুয়া* প্রমুখ বাংলাদেশের বস্ত্র শিল্পের প্রশংসা করেছেন। মার্কোপোলো পূর্ব দাক্ষিণাত্যে বরঙ্গল রাজ্যের বস্ত্র শিল্পীদের দক্ষতার কথা উল্লেখ করেছেন। ***ভক্তপ্রসাদ মজুমদার*** কামরূপ রাজ ধর্মপালের আমলে উৎকীর্ণ দ্বাদশ শতকের একটি লেখর ভিত্তিতে ভারতের পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে তাঁত শিল্পীদের সক্রিয়তার অস্তিত্ব উল্লেখ করেছেন। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে প্রাক্-মধ্যযুগে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠশতক ও তার পূর্ববর্তীকালে তাঁত শিল্পের জন্য খ্যাত ভারতীয় অঞ্চলগুলির উল্লেখ আদি-

মধ্যযুগের উপাদানে পাওয়া যায় না। এথেকে অনুমান করা হয় সম্ভবত ষষ্ঠ শতকের পরবর্তীকালে মগধ, কৌশাম্বী, মথুরা প্রভৃতি বস্ত্রবয়ন কেন্দ্রগুলি অবক্ষয়ের গ্রাসে পড়েছিল।

আদি-মধ্যযুগে ধাতু শিল্পের ক্ষেত্রেও ভারতীয়দের সক্রিয়তা দেখা যায়। দ্বাদশ শতকে রচিত *'পর্যায়মুক্তাবলী'* গ্রন্থের ভিত্তিতে *ড. রামশরণ শর্মা* উল্লেখ করেছেন যে, সেখানে লোহার ব্যবহার শিল্পীদের করায়ত্ত ছিল। তিনি ছয় প্রকার লোহার অস্তিত্ব ছিল বলে মনে করেন। কোনারকের সূর্যমন্দির ও পুরীর গুণ্ডিচাবাড়িতে লৌহনির্মিত কড়ি-বর্গার ব্যবহার লক্ষণীয়। তামা ও ব্রোঞ্জের ব্যাপক ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায়। অসংখ্য তাম্রশাসনের ব্যবহার এবং ব্রোঞ্জনির্মিত ভাস্কর্য কর্মগুলি এর প্রমাণ দেয়। ধাতুর ব্যবহার করায়ত্ত হওয়ার কারণে ভারতীয় কারিগররা অস্ত্র নির্মাণে দক্ষতা দেখান। রাজা ভোজের *'যুক্তিকল্পতরু'* গ্রন্থে পাল সাম্রাজ্যের অধীনস্থ মগধ ও অঙ্গদেশে উন্নত-মানের তলোয়ার নির্মিত হত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আরব লেখকরাও পাল সাম্রাজ্যের তলোয়ারের প্রশংসা করেছেন। বারাণসী সৌরাষ্ট্র ও কলিঙ্গদেশ তলোয়ার নির্মাণে খ্যাতি অর্জন করেছিল।

○ শিল্প-সংগঠন বা গিল্ড ঃ

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠশতক থেকেই উত্তর ভারতে কারিগরী শিল্পে পেশাদারী সংগঠনের আবির্ভাব ঘটেছিল। বৌদ্ধায়ন ধর্মপুত্র, পাণিনির অষ্টাধ্যয়ী ও পালি সাহিত্যে এই জাতীয় বৃত্তিমূলক সংগঠনগুলিকে 'শ্রেণী', 'গণ', 'পুগ', 'সংঘ' ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়েছে। বিনয়পিটকের রচনাকাল থেকে বিভিন্ন কারিগরদের নিজ নিজ শ্রেণী বা সংগঠনের অধীনে কাজ করতে দেখা যায়। এগুলিকেই গিল্ড (Guild) বা শিল্পসংঘের অনুরূপ সংগঠন বলা হয়। প্রতিটি হস্তশিল্পের নিজস্ব ও স্বতন্ত্র সংগঠন ছিল। ধর্মশাস্ত্রগুলিতে পেশাদারী সংগঠনগুলির বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে। বৃহস্পতি স্মৃতি, নারদ স্মৃতি ইত্যাদিতে সমকালীন অনুশাসনের ভিত্তিতে বলা হয়েছে যে, 'আচার্য' বা 'প্রমুখ' অর্থাৎ প্রধান কারিগরদের অধীনে সংঘগুলি কর্মরত থাকবে। সংঘের কাজকর্ম তত্ত্বাবধানের জন্য *'কার্যচিন্তক'*, *'হিতবাদী'* নামক কর্মচারী নিযুক্ত হতেন।

গুপ্ত রাজাদের আমল থেকে কিছু লেখ ও সীলমোহরে গিল্ড-এর প্রধানদের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। স্কন্দ গুপ্তের ইন্দোর তাম্রশাসনে (৪৬৬ খ্রীঃ) জীবন্ত নামক জনৈক ব্যক্তিকে উক্ত এলাকার তৈলিক বা তেল উৎপাদন শ্রেণীর প্রধান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। নবম-দশক শতকে উৎকীর্ণ গুর্জর প্রতিহারদের কিছু লেখতে গোয়ালিয়র ও সিয়াডোনী অঞ্চলের সংঘ-প্রধানদের নাম পাওয়া যায়। বিজয় সেনের দেওপাড়া লেখতে শূলপাণি নামক ব্যক্তিকে 'বরেন্দ্রক শিল্পীগোষ্ঠী চূড়ামণি' বলা হয়েছে।

দ্বাদশ শতক থেকে শ্রেণী সংগঠনগুলির চরিত্র পরিবর্তিত হয়েছিল বলে সাম্প্রতিক কোন কোন গবেষক মনে করেন। বিজ্ঞানেশ্বর 'শ্রেণী' অর্থে বিভিন্ন জাতির এক একটি গোষ্ঠীকে বুঝিয়েছেন, যেমন—চর্মকার, কুবিন্দ (তাঁতী), তাম্বলিক ইত্যাদি। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ও বৃহৎ ধর্মপুরাণে ৩৬ টি মিশ্রজাতির উল্লেখ আছে। এদের জাতিভিত্তিক নিজস্ব সংগঠন ছিল। যেমন-কর্মকার, কুম্ভকার, শাঙ্খিক, রজক, মালাকার ইত্যাদি। সম্ভবত, আদি-মধ্যযুগে সংঘগুলির সদস্যসংখ্যা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে পুরানো সংঘগুলি ভেঙে যায় এবং ক্রমে জাতিভিত্তিক

সংঘ গড়ে ওঠে। স্বভাবতই সংঘগুলি আগেকার সাংগঠনিক শক্তি ও সংহতি থেকে বিচ্যুত হয়। এর সাথে আরো কিছু কারণের সমন্বয় ঘটলে আদি-মধ্যযুগের মাঝামাঝি সময়ে শিল্প-সংগঠনগুলির অবক্ষয় দেখা দেয়। ***রণবীর চক্রবর্তীর*** মতে, শ্রেণীর অভ্যন্তরীণ পরিচালন ব্যবস্থার উপর শাসকশ্রেণীর কর্তৃত্ব ক্রমে বৃদ্ধি পাওয়ায় 'শ্রেণী' গুলির স্বাতন্ত্র্য বিঘ্নিত ও ক্ষুণ্ণ হয়। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে রচিত লেখপদ্ধতিতে 'শ্রেণীকরণ' শব্দটির উল্লেখ আছে। এর অর্থ এক প্রশাসনিক দপ্তর বা 'করণ' বা শ্রেণীর উপর নজরদারি করার দায়িত্ব প্রাপ্ত। এর ফলে সমবায় সংঘ বা শ্রেণীর স্বাধীন অস্তিত্ব বিপন্ন হয়।

আদি-মধ্যযুগের 'শ্রেণী'গুলিকে নানা শাস্ত্রে জাতি অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের বৃহৎধর্ম পুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে শ্রেণীগুলিকে বলা হয়েছে 'শংকর' বা 'মিশ্র' জাতি, যা তৎকালীন সমাজে নিম্ন পর্যায়ভুক্ত বলেই বিবেচিত হত। 'জম্বুদ্বীপ প্রজ্ঞপ্তি' গ্রন্থে কুম্ভকার, তন্তুবায় প্রভৃতি শ্রেণীকে শুদ্ধ বলা হলেও চর্মকার, তৈলিক, কাঁসারী প্রভৃতি মিশ্র শ্রেণীকে (জাতি) অচ্ছুৎ ঘোষণা করা হয়েছে। জিনসেন সূরীর ভাষ্যেও শিল্প-কর্মকারদের সকলকে নীচ্ ও অধম বলা হয়েছে ('শিল্প কর্মকার সমুদয় অধম')। ***ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়ের*** মতে, আদি-মধ্যযুগে শিল্প সংগঠন গুলি 'শ্রেণী'তে বিভক্ত হয়ে পড়লে তাদের সাংগঠনিক ভিত্তি আপনা থেকেই দুর্বল হয়ে পড়ে। গোপগিরির দু'টি লেখতে (৮৭৫ ও ৮৭৬ খ্রীঃ) অন্তত ২০ জন 'তৈলিক প্রধান' ও ১৪ জন মালাকার প্রধান-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ একটি বৃত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের একাধিক সংগঠন ও একাধিক প্রধান ছিলেন। এই ঘটনা শ্রেণী-সংঘবদ্ধতার মূলে চিড় চড়াতে বাধ্য। ***ভক্তপ্রসাদ মজুমদার*** 'Decline of guilds in Early Medieval India [1] শীর্ষক প্রবন্ধে শিল্প-সংগঠনগুলির ক্রমিক অবক্ষয়ের কারণ বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে, আদি-মধ্যযুগে ভূমিদান ব্যবস্থার ব্যাপকতা, জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার উৎপত্তির ফলে যে নতুন ভূস্বামী শ্রেণীর অভ্যুত্থান ঘটে তারা জমিতে অধিক সংখ্যক কৃষক নিয়োগ করতে থাকে। ফলে শিল্প-সংগঠনে যথেষ্ট শ্রমিকের অভাব প্রকট হয়। এতে 'শ্রেণী' দুর্বল হয়। তাছাড়া ইতিপূর্বে শ্রেণীর বা সংঘ সাংগঠনিক ভাবে ব্যাংকের ভূমিকা পালন করত। সদস্যরা সংঘের হাতে তাদের আমানত জমা রাখত। কিন্তু আদি-মধ্যযুগে সংগঠনের পরিবর্তে সংঘের প্রধানের কাছে ব্যক্তিগত স্তরে আমানত সঞ্চয় রাখার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। ফলে শ্রেণীর আর্থিক ভিত্তি শিথিল হয়ে পড়ে। এইভাবে রাজকীয় হস্তক্ষেপ, শ্রেণীগুলির সামাজিক চরিত্রের পরিবর্তন, শ্রেণী সংগঠনের খণ্ডিতকরণ, শ্রমশক্তির অপ্রতুলতা ইত্যাদি একাধিক কারণে আদি-মধ্যযুগে শিল্প সংগঠন বা শিল্প ব্যবস্থা অবক্ষয়ের শিকার হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

আদি-মধ্যযুগের সংস্কৃতি (সাহিত্য, শিল্প, দর্শন ও বিজ্ঞান)

[Culture in Early Medieval India (Literature, Art, Philosophy, Science-Technology)]

(ক) আঞ্চলিক ভাষা-সাহিত্যের বিকাশ :

আদি-মধ্যযুগের ভারতের রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য ছিল কেন্দ্রীকরণের অভাব ও আঞ্চলিক রাজনীতির বিকাশ। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর যে রাজনৈতিক খণ্ডীকরণ শুরু হয় তার প্রভাব সভ্যতা-সংস্কৃতির উপরেও পড়ে। লক্ষণীয় যে, সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতকে ভারতে কোন শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার অস্তিত্ব না থাকলেও সংস্কৃতি চর্চার গতি প্রায় অব্যাহতই ছিল। উত্তর, উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের রাজবংশগুলি ভূখণ্ডগত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও শিল্প-সাহিত্য চর্চার কার্পণ্য করেনি। রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা কিংবা রাজকীয় সহনশীলতার মাধ্যমে আঞ্চলিক শাসকেরা সহনশীলতাকে সচল রাখতে সহায়তা করেছিলেন। এই পর্বে আঞ্চলিক স্তরে সংস্কৃত, তামিল, তেলেগু, কানাড়া, বাংলা ইত্যাদি ভাষায় সাহিত্যের ব্যাপক চর্চা লক্ষ্য করা যায়। আদি-মধ্যকালীন ভারতের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল নতুন ধর্মমতের উদ্ভব ও বিকাশ এবং প্রচলিত ধর্মের গণমুখী সংস্কার সাধনের প্রয়াস। শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত, তান্ত্রিক বৌদ্ধ ইত্যাদি নতুন নতুন ধর্মমতের দর্শনতত্ত্বের ভিত্তি হিসেবে বহু পুঁথি, গাথা ও শাস্ত্র রচিত হয়। এগুলিও আদি-মধ্যকালীন ভারতেরই ভাষা-সাহিত্য বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে খ্রীষ্টীয় ৭০০-১২০০ অব্দের মধ্যবর্তীকালে এদেশের সংস্কৃতির ধারা ক্রমশ এক-একটি নির্দিষ্ট ভাষাভাষী মানুষের দ্বারা অধ্যুষিত পৃথক জনপদভিত্তিক হয়ে পড়েছিল। এই পর্বে এক অঞ্চলের সংস্কৃতি অন্য অঞ্চলের সংস্কৃতি থেকে স্বাতন্ত্র্য গড়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে সেই স্বাতন্ত্র্যতা বজায় রাখতেও বিশেষ তৎপর ছিল। অবশ্য ভারতীয় জীবনধারার চিরাচরিত ঐতিহ্য অনুসারে আদি-মধ্যযুগের সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা, ধর্ম, দর্শন ইত্যাদি 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের' শাশ্বত উপাদানগুলিকেও সযত্নে লালিত করেছিল।

○ সংস্কৃত সাহিত্য :

পাল যুগে (৮ ম-১২ শতক) পূর্ব ভারতে সাহিত্য চর্চার প্রধান মাধ্যম ছিল সংস্কৃত ভাষা। সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় সংস্কৃত ভাষার ব্যাপক অনুশীলন হত। পাল রাজাদের বিভিন্ন তাম্রশাসনে ব্যবহৃত সংস্কৃত শ্লোকের বহুল প্রয়োগ থেকে অনুমান করা যায় যে, সেকালে সংস্কৃত ভাষায় কাব্যচর্চা পূর্বাপেক্ষা বেশি প্রসার লাভ করেছিল। ড *রমেশচন্দ্র মজুমদারের* মতে সংস্কৃত-সাহিত্যের উপর বাঙালীদের বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। দর্ভপানি চতুর্বেদে পারদর্শী ছিলেন; কেদার মিশ্র বেদ, আগমশাস্ত্র, জ্যোতিঃশাস্ত্র ইত্যাদিতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। চতুর্ভুজ-এর *'হরিচরিত'* কাব্য থেকে জানা যায় যে, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ শ্রেণী শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ব্যাকরণ

প্রভৃতিতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। হরিবর্মদেবের মন্ত্রী ভট্টভবদেব দর্শন, মীমাংসা, আয়ুর্বেদ, তন্ত্রসার, গণিত ইত্যাদিতে পারদর্শী ছিলেন। তিনি *'হোরাশাস্ত্র'* গ্রন্থ রচনা করে *'দ্বিতীয় বরাহ'* উপাধি পান। নবম শতকে অভিনন্দ নামক জনৈক বাঙালী কবি আবির্ভূত হন। তিনি *'গৌড়-অভিনন্দ'* নামে পরিচিত ছিলেন। সম্ভবত, 'কাদম্বরী-কথাসার' কাব্যগ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন গৌড় অভিনন্দ। মদন পালের রাজত্বকালে কবি সন্ধ্যাকর নন্দী বিরচিত *'রামচরিত'* একটি অতি-জনপ্রিয় কাব্যগ্রন্থ। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু দ্ব্যর্থবোধক। এক বিচারে এটি রামায়ণের রামচন্দ্রের গুণকীর্তন, অন্যদিকে এই গ্রন্থ পাল রাজা রামপালের কীর্তিগাথা হিসেবে চিহ্নিত হয়। শ্লেষাত্মক শ্লোকবিশিষ্ট এই গ্রন্থে ইতিহাসের আখ্যান বর্ণনা করায় এতে কাব্য সুষমা সর্বত্র পরিস্ফুট হয়নি। তবে ইতিহাসের উপাদান হিসেবে এর গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। বাঙালী লেখক শ্রীধর ভট্ট দশম শতকের গোড়ায় *'ন্যায়কন্দলী'* রচনা করেন। এই টীকাভাষ্যে তিনি ন্যায় বৈশেষিক মতের উপর আস্তিক্যবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া 'তত্ত্বপ্রবোধ', 'তত্ত্বসংবাদিনী', 'সংগ্রহটিকা' ইত্যাদি বেদান্ত ও মীমাংসা-বিষয়ক টীকাভাষ্য তিনি রচনা করেন।

ভেষজবিদ্যা-সংক্রান্ত কয়েকটি গ্রন্থ এ যুগের বাঙালী লেখকরা রচনা করেছিলেন। 'রোগ বিনিশ্চয়' বা 'নিদান' গ্রন্থের প্রণেতা ***মাধব*** সম্ভবত বাঙালী ছিলেন। চরক ও সুশ্রুতের টীকাকার ***চক্রপাণি দত্ত*** এ যুগেই আবির্ভূত হন। তিনি চরকের উপর 'চিকিৎসা সংগ্রহ' ও 'আয়ুর্বেদ দীপিকা' নামক টীকাভাষ্য রচনা করেন। চরকের উপরে লেখেন 'ভানুমতী' নামক টীকা। তাঁর অন্য দুটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হল *'শব্দচন্দ্রিকা'* ও *'দ্রব্যগুণ সংগ্রহ'*। সম্ভবত, *'রত্নপ্রভা'* নামক টীকাভাষ্যের লেখক নিশ্চলকর একজন বাঙালী এবং তিনি রামপালের সমসাময়িক ছিলেন। সুরেশ্বর বা সুর পাল নামক বৈদ্যক দ্বাদশ শতকে 'শব্দ-প্রদীপ' ও 'বৃক্ষায়ুর্বেদ' নামে দুটি গ্রন্থ লেখেন। এগুলিতে তিনি বিভিন্ন উদ্ভিদের ভেষজ গুণ ব্যাখ্যা করেন। এছাড়া লোহার ব্যবহার সম্পর্কে তিনি লেখেন *'লোহ-সর্বস্ব'* নামক একটি গ্রন্থ।

সংস্কৃত ভাষায় বৈদিক সাহিত্যের চর্চার কাজেও আদি-মধ্যযুগের অবদান স্মরণীয়. মীমাংসার উপর টীকা লেখেন ভবদেব ভট্ট। এই গ্রন্থের নাম *'তৌতালিক-মত-তিলক'*। উত্তর রাঢ় অঞ্চলের লেখক নারায়ণ বৈদিক ধর্মানুষ্ঠান বিষয়ে 'প্রকাশ' নামক টীকা লেখেন। ভবদেব ভট্ট ও দশকর্মপদ্ধতি বিষয়ে লেখেন *'ছান্দোগ্য কর্মানুষ্ঠান পদ্ধতি'* গ্রন্থ। দ্বাদশ শতকে আবির্ভূত বিশিষ্ট বাঙালী সাহিত্যকার ছিলেন জীমূতবাহন। হিন্দুসমাজ ও পরিবারের পালনীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং ভূ-সম্পত্তির অধিকার ও বণ্টন সম্পর্কে তিনি মহামূল্যবান গ্রন্থ লেখেন। *'কালবিবেক'* গ্রন্থে তিনি হিন্দু আচারের অন্তর্গত অনুষ্ঠানের কাল ও তিথি সম্পর্কে আলোচনা করেন। তবে তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় গ্রন্থের নাম *'দায়ভাগ'*। এই গ্রন্থে তিনি বাংলাদেশের ভূ-সম্পত্তির বণ্টন, উত্তরাধিকার, স্ত্রীধন ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মবিধি সংকলিত করেন। বর্তমান উত্তরাধিকার আইন প্রবর্তনের আগে পর্যন্ত বাংলায় জীমূত বাহনের আইন অনুসারেই সম্পত্তির বণ্টন চলত। ভারতের অবশিষ্ট অঞ্চলে প্রচলিত ছিল *'মিতাক্ষরা'* আইন। জীমূতবাহনের আর একটি বিশিষ্ট গ্রন্থ *'কালবিবেক'*।

পালযুগে বৌদ্ধধর্ম হিন্দুতন্ত্রবাদের সংস্পর্শে এসে রূপান্তরিত হয় এবং সহজযান বা সহজিয়া ধর্ম নামে প্রচারিত হয়। সহজিয়া বৌদ্ধধর্মের উপর অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এদের

অনেকগুলির রচয়িতা বাঙালী ছিলেন। তিব্বতীয় ভাষায় এই সকল সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবাদ পাওয়া যায়। এই সাহিত্যসৃষ্টির কেন্দ্র ছিল নালন্দা, বিক্রমশীলা, সোমপুরী, প্রভৃতি বৌদ্ধবিহার। বিশিষ্ট বাঙালী লেখকদের মধ্যে ছিলেন শীলভদ্র, শান্তিদেব, জেতারি, জ্ঞানমিশ্র প্রমুখ। জ্ঞানমিশ্র ন্যায়দর্শনের উপর *'কার্যকারণ-ভাব-সিদ্ধ'* নামক গ্রন্থ লেখেন। বিশিষ্ট পণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বৌদ্ধ দর্শনের উপর প্রায় ১৬৮টি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। শীলভদ্রের গ্রন্থ *'আর্য বুদ্ধভূমি-ব্যাখ্যান'* তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত হয়ে সংরক্ষিত আছে।

সেনযুগে (একাদশ-দ্বাদশ শতক) সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ঘটেছিল। পালযুগের শেষদিকে অপভ্রংশ ও বাংলা ভাষায় সহজিয়া সাহিত্যের যে জনপ্রিয়তা দেখা গিয়েছিল, সেনদের আমলে তাতে ভাটা পড়ে এবং পুনরায় সংস্কৃতসাহিত্যে নবজীবন ঘটে। বৌদ্ধ পালরাজাদের আনুকূল্যে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের দাপটে হিন্দু ধর্মও আবার বাংলায় অনেকটাই নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছিল। তাই সেন রাজাদের আনুকূল্যে একাধিক সংস্কৃত সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে হিন্দু ধর্মাচরণ পদ্ধতিকে জনপ্রিয় করার প্রয়াস দেখা যায়। অশৌচ, শ্রাদ্ধ, সন্ধ্যা তর্পণ প্রভৃতি বিষয়ে হিন্দু-নিত্যকর্মের উল্লেখ করে ***অনিরুদ্ধ ভট্ট*** রচনা করেন *'হারলতা'* ও *'পিতৃদয়িতা'* নামক গ্রন্থ। প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের উদ্ধৃতি সংকলন করে রাজা বল্লালসেন স্বয়ং রচনা করেন *'দান-সাগর', 'অদ্ভুত-সাগর', 'প্রতিষ্ঠা-সাগর', 'ব্রত-সাগর'* ও *'আচার-সাগর'* নামক পাঁচটি গ্রন্থ। তবে কেবল প্রথম দুটি গ্রন্থ পাওয়া গেছে। হিন্দুর ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, দানকর্মাদি এবং মঙ্গল-অমঙ্গলের লক্ষণ ইত্যাদি এইসব গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। সাহিত্যিক ***হলায়ুধ*** রচনা করেন বৈদিকমন্ত্রের তাৎপর্য ও হিন্দুর আহ্নিক অনুষ্ঠান সম্পর্কিত গ্রন্থ *'ব্রাহ্মণ-সর্বস্ব'*। এছাড়া শৈব-সর্বস্ব', 'মীমাংসা-সর্বস্ব', 'বৈষ্ণব-সর্বস্ব' ইত্যাদি একাধিক গ্রন্থ তিনি রচনা করেছিলেন। তবে এগুলি পাওয়া যায়নি। ভাষাতত্ত্বের উপরেও এসময় সংস্কৃত সাহিত্য রচিত হয়। ১১৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দে ***সর্বানন্দ*** রচনা করেন অমরকোষ গ্রন্থের উপর বিশ্লেষণমূলক *'টীকা-সর্বস্ব'*। ***পুরুষোত্তম*** লেখেন 'ভাষাবৃত্তি' ত্রিকান্ড শেষ', 'হারাবলী', 'বর্ণদেশনা' প্রভৃতি গ্রন্থ। আদি-মধ্যযুগের একেবারে শেষ পর্বে কবি ***ধোয়ী*** মেঘদূত কাব্যের অনুকরণে লেখেন *'পবণদূত'* কাব্য। জয়দেব ধোয়ীকে 'কবিক্ষ্মাপতি' (কবি-রাজ) ও 'শ্রুতিধর' বলে প্রশংসা করেছেন। লক্ষ্মণসেনের আমলের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন ***জয়দেব***। তাঁর অমর ও সর্বজনপ্রিয় গ্রন্থ ***'গীতগোবিন্দ'***। ড. ***রমেশচন্দ্র মজুমদারের*** মতে, *'আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাবাদ দিলেও কেবলমাত্র ভাব ও রসের বিচারে এই গ্রন্থ সংস্কৃত সাহিত্যের একটি উৎকৃষ্ট কাব্য হিসেবে মর্যাদা পাবে।'*

দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রকূটদের আমলে (৮ম-১০ম শতক) এবং দক্ষিণ ভারতে চোলদের আমলে (৯ম-১৩ শতক) স্থানীয় কানাড়া ও তামিল ভাষার পাশাপাশি সংস্কৃত ভাষাতেও সাহিত্যচর্চা চলত। রাষ্ট্রকূট দরবারের বহু পণ্ডিত সুবন্ধু বা বান ভট্টের মতই কাব্যচর্চা করতে পারতেন। আবার চোলযুগের বৈষ্ণবধর্ম-বিষয়ক গ্রন্থকারেরা সংস্কৃত ঘেঁষা তামিল ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টি করেন।[1] এমনই একটি বৈষ্ণব-সাহিত্য হল রামানুজের শিষ্য পিল্লন রচিত *'অরয়িরপ্পদি'*। দ্বিতীয় রাজরাজ

সংস্কৃত ও অভিধান রচনার জন্য কেশবস্বামিন্‌কে নিযুক্ত করেছিলেন। প্রথম পরন্তকের পৃষ্ঠপোষকতায় মাধব সংস্কৃত ভাষায় ঋগ্বেদের ভাষায় রচনা করেন হরিদত্তাচার্য।

○ তামিল সাহিত্য ঃ

দক্ষিণ ভারতে তামিল, তেলেগু, কন্নড় ইত্যাদি আঞ্চলিক ভাষায় কাব্য ও সাহিত্যচর্চায় নতুন ধর্ম সম্প্রদায়গুলির বিশেষ অবদান ছিল। মূলত ধর্মদর্শন ও আচারকে কেন্দ্র করে স্থানীয় ভাষাসাহিত্যগুলি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। শৈব-নায়নার সাধকরা তামিল সাহিত্যে ভক্তিবাদের প্রচলন করেন। ***নম্বি-আন্ডার-নম্বি*** শৈব রচনাগুলিতে এগারটি 'তিরুমুরাই'-এ সংগ্রহ করেন। প্রথম সাতটির সংকলন 'তেবারম' নামে পরিচিত। অষ্টমটির নাম 'তিরুবাচকম্'। দশম তিরুমুরাই-এর লেখক তিরুমূল। 'পেরিয়া পুরানম' নামক তামিল গ্রন্থের লেখক ***শেক্কিতার*** এখানে ৬৩ জন শৈব সাধকের জীবনী বর্ণনা করেন। এই নায়নার সাধকদের অনুসরণে কালক্রমে দক্ষিণ ভারতে 'শৈব সিদ্ধান্ত' নামক নতুন ধর্মমতের সৃষ্টি হয়েছিল। বিশিষ্ট শিবাচার্য ***উমাপতি*** এবং ***অরুনন্দি*** যথাক্রমে 'শিবজ্ঞান সিদ্ধিয়ার' এবং 'শিব প্রকাশম' গ্রন্থে এই ধর্ম সম্প্রদায়ের দর্শনতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। ত্রয়োদশ শতকের গোড়ায় ***মেইকন্দর*** রচনা করেন 'শিব-ননবোদম্'

ধর্মনিরপেক্ষ তামিল সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হল চোল রাজাদের প্রশস্তিগুলি। প্রথম রাজরাজকে কেন্দ্র করে 'রাজরাজেশ্বর নাটকম্' নামক একটি নাটক রচিত হয়। তাঁকে উপলক্ষ্য করে রচিত হয় 'রাজরাজ বিজয়ম্' নামক একটি জনপ্রিয় কাব্যগ্রন্থ। জৈন কবি তিরুত্তক্কদেব দশম শতকের প্রথম দিকে 'জীবক চিন্তামণি' নামে একটি কাব্য রচনা করেন। এটি তামিল সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য হিসেবে গণ্য হয়। তামিল সাহিত্যের বিশেষ জনপ্রিয় একটি গ্রন্থ হল কবি কঙ্গুবেলির 'বৃহৎকথা'র তামিল সংস্করণ। এসময়েই ***কল্লদনর*** রচনা করেন 'কল্লদম' নামক শিবস্তোত্র। তামিল কাব্যের 'ত্রিরত্ন' রূপে অভিহিত হন ***কম্বন, কুট্টন*** ও ***উগলেন্দি***। কবি কম্বন তামিল ভাষায় রামায়ণ রচনা করেন। এটি 'কম্ব-রামায়ণ নামে পরিচিত। কম্বনের আরো দুটি জনপ্রিয় রচনা হল 'সদ্‌কোপার'-অনথাথি' এবং 'এরুলুপাথু'। কবি কুট্টন রাজা বিক্রম চোল, দ্বিতীয় কুলোতুঙ্গ এবং দ্বিতীয় রাজরাজের সভা অলংকৃত করেছিলেন! তিনি রাজ-কাহিনীকে বিষয়বস্তু করে কাব্য রচনা করেন। যুদ্ধ ও শান্তি বিষয়ে তাঁর কাব্যগ্রন্থ হল 'পরনিস' ও 'উলাস'। কুট্টনের সমসাময়িক ছিলেন ***উগলেন্দি***। নল-দময়ন্তীর উপাখ্যানকে অবলম্বন করে তিনি তামিলভাষায় রচনা করেন 'নল-বেম্ব' কাব্য। তাঁর অন্য কয়েকটি বিশিষ্ট রচনা হল 'পভলাকোডিড', 'কলাম্বকম', 'অল্লি-অরাসনি' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ। প্রথম কুলোতুঙ্গের রাজত্বকালের শেষদিকে তাঁর সভাকবি ***জয়নগোন্দর*** কলিঙ্গ যুদ্ধের কাহিনী নিয়ে রচনা করেন 'কলিঙ্গত্তু-প্পরনী' কাব্য।

চোল যুগে তামিল ভাষায় অভিধান, ব্যাকরণ, ছন্দ ইত্যাদি বিষয়েও বহু সাহিত্য রচিত হয়। তৃতীয় কুলোতুঙ্গের আমলে 'নন্নুল' নামে একটি তামিল ব্যাকরণ লেখেন ***পবননন্দী***। ছন্দের প্রয়োগ ও বৈচিত্র্য সম্পর্কে 'ইয়প্পরুঙ্গলম্' নামক গ্রন্থ লেখেন জৈন সন্ন্যাসী ***অমিত সাগর***। আনুমানিক দশম শতকের শেষ দিকে এটি রচিত হয়েছিল। বীর রাজেন্দ্রর শাসনকালে ***বুদ্ধমিত্র*** রচনা করেন অলংকার-বিষয়ক গ্রন্থ 'বীরসোলিয়ম্'। জনৈক অজ্ঞাতনামা লেখক দণ্ডীর কাব্য

অনুসরণে লেখেন 'দণ্ডীয় মঙ্গলম্' কাব্য। দশম শতকে *আভ্ ভাই* (Avvai) নামক একজন মহিলা কবির রচনা পাওয়া গেছে। তাঁর প্রাপ্ত গ্রন্থগুলির নাম 'নাম্মুরকোভাই', কালভিয়ল্লুকম্', 'অনন্ত মিলমলাই' ইত্যাদি। তাঁর রচনার বিষয়বস্তু ছিল সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, বিরহ-ভালবাসা, দ্বেষ-হিংসা ইত্যাদি মানবিক আবেগ ও অনুভূতি। এ কারণে তিনি *'তামিল কাব্যের জননী'* নামে অভিহিত হন।

○ কানাড়া সাহিত্য ঃ

তামিল সাহিত্যের পরেই দক্ষিণ ভারতের প্রাচীনতম ভাষা-সাহিত্য হিসেবে কানাড়া (কন্নড়/Kannada) ভাষার নাম উচ্চারিত হয়। আদি-মধ্যযুগের সূচনার আগেই কানাড়া ভাষায় সমৃদ্ধ সাহিত্যচর্চা ঘটেছিল বলে মনে করা হয়। জৈন, বীর শৈব ও শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাধকরা তাঁদের মতাদর্শ প্রচারের কাজে কানাড়া ভাষাকে বেছে নিয়েছিলেন। তাঁদের রচনাবলী কানাড়া ভাষা ও সাহিত্যকে গণমুখী হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। রাষ্ট্রকূট রাজ প্রথম অমোঘবর্ষ (নৃপতুঙ্গ) রচিত 'কবি রাজমার্গ' (৮৫০ খ্রীঃ) ছিল কানাড়ী ভাষায় রচিত আদি অলংকার শাস্ত্র-বিষয়ক গ্রন্থ। এই গ্রন্থের ভাষ্য অনুসারে কাবেরী নদী থেকে গোদাবরী পর্যন্ত এই ভাষার জনপ্রিয়তা ছিল। অর্থাৎ মারাঠীভাষী অঞ্চলের অনেকটার উপরেও এই ভাষার প্রসার ঘটেছিল। তবে কানাড়া ভাষার প্রথম উচ্চগুণমান সম্পন্ন সাহিত্য সৃষ্টি করেন শিবকোটি (৯০০ খ্রীঃ)। 'ভদ্দারাধনা' গ্রন্থে তিনি গদ্যাকারে জৈন সাধকদের জীবনী তুলে ধরেন। রাষ্ট্রকূট রাজ তৃতীয় কৃষ্ণের অধীনস্থ সামন্ত দ্বিতীয় অরিকেশরীর সভাষদ পম্প ছিলেন দশম শতকের বিখ্যাত কানাড়া কবি। মাত্র ঊনচল্লিশ বছর বয়সে তিনি *'আদি পুরাণ'* ও *বিক্রমার্জ্জুন বিজয়'* নামক দুটি কাব্য সম্পূর্ণ করেন। প্রথমটিতে আদি জৈন তীর্থঙ্করের জীবন-ইতিহাস ব্যাখ্যা করেন এবং দ্বিতীয় কাব্যের বিষয়বস্তু মহাভারত। এখানে তিনি প্রভু অরিকেশরীকে অর্জুনের প্রতিরূপ হিসেবে তুলে ধরেন। ***পম্প'র*** শিষ্য ***পোন্ন*** ষোলজন তীর্থঙ্করের জীবনী নিয়ে রচনা করেন 'শান্তি পুরাণ'। সংস্কৃত ও কানাড়া ভাষায় গভীর ব্যুৎপত্তির জন্য . তৃতীয় কৃষ্ণ ***পোন্ন***কে 'উভয়কবি চক্রবর্তী' (Supreme poet in two languages) অভিধায় ভূষিত করেন। দশম শতকের আর একজন প্রখ্যাত কানাড়া কবি ছিলেন ***রন্ন***। ***রন্ন, পম্প*** ও ***পোন্ন*** ছিলেন কানাড়া সাহিত্যের 'তিন রত্ন' (The Three Gems)। রন্ন এক সামান্য চুড়ি বিক্রেতার গৃহে জন্মগ্রহণ করেও, নিজ সাহিত্য প্রতিভার বলে চালুক্য রাজ দ্বিতীয় তৈল ও তাঁর পরবর্তী শাসকদের সভাকবি পদে বৃত হন। এবং 'কবিচক্রবর্তী' উপাধিতে ভূষিত হন। দ্বিতীয় তীর্থঙ্করের জীবনীকে ভিত্তি করে তিনি 'অজিত পুরাণ' রচনা করেন (৯৯৩ খ্রীঃ)। মহাভারতে ভীম ও দুর্যোধনের যুদ্ধকে ভিত্তি করে লেখেন 'সাহস-ভীম কাব্য। তাঁর অন্য কয়েকটি জনপ্রিয় কাব্যসৃষ্টি হল 'পরশুরাম চরিত', 'চক্রেশ্বর চরিত', 'রন্নকাণ্ড', 'কবিরত্ন' ইত্যাদি। জনৈক ***চবুন্দরায়*** চব্বিশজন জৈন তীর্থঙ্করের ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে ৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে রচনা করেন 'চবুন্দ রায় পুরাণ'। এটি গদ্যে রচিত ছিল। দশম শতকের বিশিষ্ট কানাড়ী লেখক ছিলেন নাগবর্ম। তিনি 'চন্দকবোধি' ও 'কর্ণাটক-কাদম্বরী' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। একাদশ শতকে কানাড়া সাহিত্যের বিশিষ্ট প্রতিনিধি ছিলেন দুর্গাসিংহ। তিনি গুণধ্যায়ের 'বৃহৎকথা' অবলম্বনে রচনা করেন 'পঞ্চতন্ত্র'। তাঁরই সমসাময়িক লেখক ছিলেন

চন্দ্ররাজ। 'মদন তিলক' গ্রন্থে তিনি কথোপকথনের ছলে কাহিনী উপস্থাপন করেছেন। এই গ্রন্থে তিনি আধুনিক কন্নড় ভাষা (পোসা-কানাড়া) ব্যবহার করেছেন বলে দাবি করা হয়। ১০২৫ খ্রীষ্টাব্দে শৈবসাধক ***চাবুন্দ রায়*** রচনা করেন "লোকপকার" গ্রন্থ। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু ছিল জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতিষ, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, অসুখ ও তার প্রতিকার ইত্যাদি দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কে পথ নির্দেশিকা উপদেশ। জৈন ব্রাহ্মণ শ্রীধরাচার্য কানাড়া ভাষায় সর্বপ্রথম জ্যোতির বিদ্যা-বিষয়ক গ্রন্থ 'ফাটক-তিলক' রচনা করেন ১০৪৯ খ্রীষ্টাব্দে। জনৈক সামন্ত-সঙ্গ উদয়াদিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় একাদশ শতকের সত্তরের দশকে ***নাগবর্মাচার্য*** 'চন্দ্রচূড়ামণি শতক' গ্রন্থ রচনা করেন। দ্বাদশ শতকের গোড়ায় জৈন সাধক নাগচন্দ্র রচনা করেন 'মল্লিনাথ পুরাণ'। তবে তাঁর অধিক জনপ্রিয় কাব্যটির নাম 'রামচন্দ্র চরিত পুরাণ'। এখানে জৈন তীর্থঙ্কররূপে রামচন্দ্রকে ব্যাখ্যা করা হয়। এই গ্রন্থের কাব্যসুষমার বিচারে নাগচন্দ্রকে 'অভিনব-পম্প' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। জৈন কবি ব্রহ্মশিব 'সময়পরীক্ষা' গ্রন্থ প্রকাশ করে অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়ের উপরে জৈনধর্মকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। একই সময় কীতিবর্মা রচনা করেন পশুচিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থ 'গোবৈদ্য'। ১১৪৫ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণপারয় লেখেন বাইশতম তীর্থঙ্করের জীবনভিত্তিক গ্রন্থ 'নেমিনাথপুরান'। প্রায় একই সময়ে দ্বিতীয় নাগবর্মা কানাড়া ব্যাকরণ ও অলংকার শাস্ত্রের উপর রচনা করেন 'কাব্যাবলোকন' গ্রন্থ। কানাড়া ভাষার উপরে তাঁর আর একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হল 'কর্ণাটক ভাষা ভূষণ'। চোল বংশীয় যুবরাজ উদয়াদিত্য ১১৫০ খ্রীষ্টাব্দে কাব্যশৈলী সম্পর্কে আলোচনামূলক গ্রন্থ 'উদয়াদিত্যলংকার' রচনা করেন।

❍ তেলেগু সাহিত্য ঃ

দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্র অঞ্চলের ভাষা তেলেগু। প্রাথমিক পর্বে তেলেগু ভাষা কানাড়া ভাষার পাশাপাশি থেকে পথচলা শুরু করে এবং একে অপরের পরিপূরক হিসেবে টিকে থাকে। কানাড়া ভাষার দুই দিক্‌পাল লেখক পম্প ও পোন্ন তেলেগু দেশের সন্তান ছিলেন। আবার বিখ্যাত তেলেগু কবি নিজেকে কানাড়া ভাষার কবি বলেই দাবি করতেন। আদি তেলেগু ভাষার চর্চা শিলালিপিতেই শুরু হয়েছিল। নবম শতকের মাঝামাঝি সময়ে পাণ্ডুরঙ্গের দানপত্রে উন্মত্ত তেলেগু ভাষার প্রয়োগ দেখা যায়। ***ড. নীলকণ্ঠ শাস্ত্রীর*** মতে, অলিখিত অবস্থায় অবশ্যই তখন নিত্যজীবনের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, আনন্দ, ভালবাসা-বিষয়ক বহু কবিতা সৃষ্টি হয়েছিল। দেশী ও কথ্য ভাষায় রচিত এই সকল কবিতা নিশ্চয়ই খুব জনপ্রিয় ছিল। যেমন—দোলনার গান, 'লালিমাতালু', প্রত্যুষের গান 'সেলুকোলু পুলু', উৎসবের গান 'মঙ্গলহরতুলু', উপাসনার গান 'কীর্তনলু', শস্যের গান 'উদুপু-পাতালু' ইত্যাদি।

'মার্গ' ধারায় তেলেগু ভাষা চর্চার দৃষ্টান্ত একাদশ শতকের আগে পাওয়া যায়নি। সংস্কৃত ভাষা প্রভাবিত মার্গ তেলেগু সাহিত্যের আদি পর্বের কোন সাহিত্য উদ্ধার করা যায়নি। বর্তমান তেলেগু ভাষায় সাহিত্যচর্চার প্রথম উদাহরণ হল ***নান্নয়া*** কৃত মহাভারতের অনুবাদ। চোলরাজার উদ্যোগে নান্নয়া একাদশ শতকে এই কাজে হাত দেন। তাঁর প্রধান সহযোগী ছিলেন কবি ***নারায়ন ভট্ট***। তবে নান্নায় মহাভারতের আদি ও সভাপর্ব সম্পূর্ণ করতে পারেন। বন পর্বের আংশিক তিনি অনুবাদ করেন। অবশ্য এই কাব্যে তিনি হুবহু মহাভারত অনুসরণ না করে তাঁর নিজের

কল্পনা ও বিশ্বাসকে প্রকাশ করেন। নান্নয়া রচিত তেলেগু ব্যাকরণের নাম 'অন্ধ্র-শব্দ-চিন্তামণি'। এই গ্রন্থে তিনি তেলেগু শব্দে চয়ন ও তার শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রয়োগের দিক্ নির্দেশ করেন। এইজন্য তিনি 'ভাগানুশাসন' (Law-giver of the language) উপাধি পান। নান্নয়ার সমসাময়িক ছিলেন *ভীমকবি*। তাঁর জীবনী ও কর্মধারা সম্পর্কে নানা অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। তিনি ব্যাকরণগ্রন্থ 'কবিজনশ্চর্য্য' ও ভীমেশ্বর দেবকে কেন্দ্র করে 'ভীমেশ্বর পুরাণ' রচনা করেন। রামায়ণ ও মহাভারত অনুসরণে তিনি লেখেন 'রাঘব-পাণ্ডবীয়' কাব্য। দ্বাদশ শতকে তেলেগু দেশে বীর শৈব ধর্মের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। এই সময়ের তেলেগু কবিরা অধিকাংশই বীর শৈব ধর্মমত প্রচারের উদ্দেশ্যে কাব্যচর্চা করেন। মল্লিকার্জুন পণ্ডিত তাঁর 'শিব-তত্ত্ব স্মরম' গ্রন্থে শৈবধর্ম ব্যাখ্যা করেন। তাঁর শিষ্য *নানচোড়* রচনা করেন 'কুমারসম্ভব' মহাকাব্য। নানাচোড় তাঁর কবিতায় কানাড়া ও তামিল শব্দের সম্মিলিত প্রয়োগ ঘটান।

○ বাংলা সাহিত্য ঃ

সংস্কৃত ভাষা থেকে স্বাভাবিক বিবর্তনের মাধ্যমে পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ সৌরমেনী ও অন্যান্য দেশীয় ভাষার উৎপত্তি হয়েছে। স্বভাবতই বাংলা ভাষার জঠরও সংস্কৃত ভাষা। তবে বাংলা ভাষার সৃষ্টির নির্দিষ্ট সময় সম্পর্কে এখানো গবেষণা অব্যাহত আছে। সাধারণভাবে মনে করা হয় যে আদি-মধ্যযুগে বাংলা ভাষার প্রথম সূচনা হয়। বাংলা ভাষার প্রথম প্রয়োগ দেখা যায় *চর্যাপদে*। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালে 'বৌদ্ধচর্যাপদ' বা 'চর্যাগীতি'র সংকলন আবিষ্কার করে সেগুলিকে 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়' নামে পুনঃপ্রকাশ করেন। এগুলিকেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন বলে মনে করা হয়। *ড. শহীদুল্লার* মতে, চর্যাপদগুলি সপ্তম শতকে রচিত হয়েছিল। কিন্তু *ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার* মনে করেন যে, এগুলির রচনাকাল দশম শতক। এ সময় বাংলা ও বাংলার বাইরে শৌরসেনী অপভ্রংশ ভাষার ব্যাপক প্রয়োগ ছিল। এর পাশাপাশি প্রাচীন বাংলা ভাষার ব্যবহারও চলছিল। ধীরে ধীরে বাংলা ভাষা পরিশীলিত হয়ে সাহিত্যের উপযোগী হয়ে উঠে। একই লেখকের সৃষ্টিতে একই সময়ে শৌরসেনী অপভ্রংশও বাংলা ভাষার কাব্যচর্চার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সহজিয়া বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা দোঁহা ও চর্যাপদগুলির রচয়িতা। মোট ৫০ টি প্রাচীন বাংলায় লেখা চর্যাপদের সন্ধান পাওয়া যায়। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা অপভ্রংশ ভাষার চর্যাপদ রচনা করে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের গুহ্য নীতিগুলি জনগণের মধ্যে প্রচার করেন। *ড. মজুমদার* লিখেছেন। *"চর্যাপদগুলিকে বাংলা সাহিত্যের আদিম উৎস বলা যেতে পারে। এর প্রভাবেই পরবর্তী যুগের বাংলায় সহজিয়া গান, বৈষ্ণব পদাবলী, শক্তি ও বাউল গানের সৃষ্টি হয়েছে"*। চর্যাপদগুলি নিছক সাহিত্য হিসেবে উচ্চমানের অবশ্যই নয়। জটিল ও দুর্বোধ্য দর্শনতত্ত্বের চাপে এর সাহিত্যগত সৌন্দর্য বিকাশের সুযোগ পায়নি। তবে এদের মধ্যে মাঝে মাঝে প্রকৃতি কবিত্ব, আবেগ, অনুভূতির যুগ্মপ্রকাশ ইত্যাদি লক্ষ্য করা যায়।

চর্যাপদ ছাড়াও সমকালীন বাংলা ভাষায় রচিত কিছু গ্রন্থের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। চালুক্যরাজ তৃতীয় সোমেশ্বরের আমলে (১১২৭-১১৩৮ খ্রীঃ) রচিত 'মানসোল্লাস' গ্রন্থের 'গীত-বিনোদ' অধ্যায়ে বিভিন্ন দেশীয় ভাষায় রচিত কিছু গীত সন্নিবিষ্ট আছে। এখানে শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বিষয়ক কিছু গীত আছে, যা বাংলা ভাষায় রচিত। কবি জয়দেবের 'গীত গোবিন্দ' কাব্যের কবিতাগুলিতে

প্রচীন বাংলা ও শৌরসেনী অপভ্রংশ বা মাগধী অপভ্রংশের ভাষার অনুরূপ ভাষার ব্যবহার দেখা যায়। বস্তুত, আদি-মধ্যযুগের কাল সীমায় অর্থাৎ দ্বাদশ শতকের পূর্ববর্তীকালে সহজিয়া চর্যাপদগুলি ছাড়া প্রাচীন বাংলা ভাষার কোন সাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া যায় না। পরবর্তীকালে (১৩ ও ১৪ শতকে) এই মাগধী অপভ্রংশ ভাষাকে পরিশীলিত রূপদানের মাধ্যমেই উন্নত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সৃষ্টি হয়।

○ মারাঠী সাহিত্য ঃ

বাংলা ভাষার মত মারাঠী ভাষা ও সাহিত্যচর্চার আদি নিদর্শন পাওয়া যায় 'লেখ' সমূহ থেকে। এছাড়া অষ্টম ও দ্বাদশ শতকের মধ্যবর্তীকালে মহারাষ্ট্রে জনপ্রিয় নতুন ধর্ম-সম্প্রদায়ের তত্ত্ব ও দর্শন ব্যাখ্যাকে কেন্দ্র করে বহু সাহিত্য রচনা করা হয়েছিল। দশম শতকে শ্রাবণবেল গোলা (৯৮৩ খ্রীঃ) লেখটি মারাঠী ভাষার খোদিত হয়। নাথ ধর্ম সম্প্রদায়ের জনপ্রিয় আচার্য গোরক্ষনাথের জীবন ও দর্শনকে বিষয়বস্তু করে অনেকগুলি পুঁথি মারাঠা ভাষায় রচিত হয়েছিল। গোরক্ষনাথের মহিমাভিত্তিক মারাঠী ভাষার একটি গান পাওয়া যায়। মারাঠী গদ্যের প্রাচীনতম নিদর্শন হল 'গোরক্ষনাথ সংবাদ' নামক গ্রন্থটি। সেকালের প্রখ্যাত ব্যাখ্যাকার ছিলেন জ্ঞানদেব। তিনি মারাঠী ভাষায় বেদ, গীতা ইত্যাদি প্রাচীন শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করেন। 'ভগবৎ গীতা'র ব্যাখ্যা করে লেখা তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থটি হল 'জ্ঞানেশ্বরী' উপনিষদের' তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে তিনি রচনা করেন 'অমৃতানুভব' গ্রন্থ। দ্বাদশ শতকে মারাঠী সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য লেখক ছিলেন ***মুকুন্দরাজ***। তিনি ছিলেন সংস্কারক শংকরাচার্যের অনুগামী ও সুপণ্ডিত। তাঁর সর্বাধিক জনপ্রিয় গ্রন্থ 'বিবেক সিন্ধু' দ্বাদশ শতকের শেষদিকে (আনুঃ ১১৯০ খ্রীঃ) রচনা করেন। দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের উপর তিনি মারাঠী ভাষায় আরো কিছু গ্রন্থ লেখেন। আদি-মধ্যযুগের শেষ পর্বে এবং ত্রয়োদশ শতক ও পরবর্তী দুই শতকে মহারাষ্ট্রে তথা পশ্চিম ভারতে ধর্ম সম্প্রদায়গুলির দর্শন-তত্ত্বকে বিষয়বস্তু করে মারাঠা ভাষায় বহু গ্রন্থ রচিত হয়।

○ আদি-মধ্যযুগের শিল্পচর্চা ঃ

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে শিল্পচর্চার ঐতিহ্য অব্যাহত আছে। কালের করালগ্রাসে প্রাচীন ও আদি-মধ্যযুগের প্রায় অধিকাংশ শিল্পকর্ম হারিয়ে গেছে। অতীতের সাক্ষী হয়ে পড়ে আছে কিছু জঙ্গলাকীর্ণ ধ্বংসাবশেষ। পূর্ব ভারতের স্তূপ, বিহার ইত্যাদি, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের মন্দির স্থাপত্যের কিছু কিছু ক্ষীয়মান নিদর্শন থেকে ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকরা ভারতীয় শিল্প-ঐতিহ্যের ধারণা পাওয়ার চেষ্টা করেছেন। প্রাচীন যুগ ও আদি-মধ্যযুগের সংযোগকালে ভারত পরিভ্রমণরত চৈনিক পর্যটক ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাং প্রমুখ ভারতের শিল্পধারার যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন, তাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে তখন ভারতে এবং বিশেষভাবে পূর্ব ভারতে বহু বিচিত্র ও কারুকার্য খচিত স্তূপ, বিহার, প্রাসাদ, মন্দির ইত্যাদি নির্মিত হয়েছিল। ***রমেশচন্দ্র মজুমদার*** লিখেছেন, *"প্রাচীন প্রশস্তিকারের উচ্ছ্বসিত ভাষায় যে সকল বিশাল গগনস্পর্শী মন্দির 'ভূ-ভূষণ', 'কুল-পর্বত-সদৃশ' বা 'সূর্যের গতিরোধকারী' বলে বর্ণনা করেছেন, আজ তাদের চিহ্নমাত্র নেই।"*

○ স্থাপত্য ঃ

আদি-মধ্যযুগের ভারতে স্থাপত্য-শিল্পের কেন্দ্রে ছিল মন্দির। গুপ্তযুগে মন্দির স্থাপত্যের সূচনা হলেও, বৈচিত্র্য ও অলংকরণের দিক থেকে আদি-মধ্যযুগেই মন্দির শিল্প আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। ভারতীয় মন্দির শিল্পে তিনটি ধারার উপস্থিতি দেখা যায়—***নাগর রীতি, দ্রাবিড় রীতি* ও** *বেসরা রীতি*। নাগর শৈলীর মন্দিরগুলি সাধারণভাবে হয় বর্গাকৃতি। দ্রাবিড় শৈলী অষ্টকোণ বিশিষ্ট এবং বেসরা শৈলীর বৈশিষ্ট্য বৃত্তাকার গৃহ। অবশ্য এই শৈলী কঠোরভাবে কোন বিশেষ এলাকায় অনুসৃত হত, এমন নয়। সাধারণভাবে হিমালয় ও বিন্ধ্য পর্বতের মধ্যবর্তী অঞ্চলে নাগর রীতির জনপ্রিয়তা ছিল। দ্রাবিড় রীতির প্রকাশ ও প্রয়োগ দেখা যায় সুদূর দক্ষিণে কৃষ্ণানদী থেকে কন্যাকুমারিকার মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে। বিন্ধ্য থেকে কৃষ্ণা নদীর অন্তর্বর্তী ভূভাগে প্রচলিত ছিল বেসরা রীতি। তবে বেসরা রীতির মধ্যে মৌলিকত্বের অভাব আছে। আসলে এই শৈলী নাগর ও দ্রাবিড় শৈলীর সংমিশ্রণে সৃষ্টি হয়েছে। শুধুমাত্র হোয়সল রাজাদের স্থাপত্য কর্মে এই রীতির প্রয়োগ দেখা যায়। সে কারণে এটিকে 'চালুক্য শৈলী'ও বলা হয়। সাধারণভাবে উত্তর ও পূর্ব ভারতে নাগর রীতির ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায়। একইভাবে দক্ষিণ ভারত ও দাক্ষিণাত্যে দ্রাবিড় রীতিতেই প্রায় সকল স্থাপত্য সৃষ্টি গড়ে উঠেছে।

(ক) স্তূপ ঃ আদি মধ্যযুগে বাংলার শিল্পচর্চার মধ্যে স্থাপত্য, ভাস্কর্য, স্তূপ, বিহার, মন্দির ইত্যাদি সবই ছিল। 'রামচরিত' গ্রন্থের লেখক সন্ধ্যাকর নন্দী একাদশ শতকের বাংলায় প্রাংশু প্রাসাদ', 'মহাবিহার' ও কাঞ্চনখচিত প্রাসাদ ও মন্দির ছিল বলে গর্ববোধ করেছেন। কিন্তু তাদের সবই কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। ড. ***মজুমদারের*** ভাষায়, *'বাংলার স্থাপত্য শিল্পের কীর্তি আছে, কিন্তু নিদর্শন নাই'*। চীন দেশীয় পর্যটকরা বাংলাদেশে অসংখ্য স্তূপের কথা বলেছেন। কিন্তু পাথরের অভাবহেতু ইঁটে নির্মিত এই সকল স্তূপের অধিকাংশই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। অষ্টম শতকও পরবর্তীকালের স্তূপগুলির যে ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে সেগুলি অধিকাংশই 'নিবেদক স্তূপ'-এর পর্যায়ভুক্ত। বৌদ্ধ ধর্মাচরণে স্তূপ মন্দিরের মতই পবিত্র স্থান হিসেবে বিবেচিত হয়। জৈনরাও স্তূপ নির্মাণ করতেন। তবে বৌদ্ধধর্মে স্তূপ নির্মাণ করে 'বোধিসত্ত্ব'কে উৎসর্গ করার মধ্যে পুণ্যার্জনের ধারণা সম্পৃক্ত ছিল। পালযুগে বাংলার স্তূপগুলিকে স্তূপ স্থাপত্যের শেষ দিকের নিদর্শন বলে অনুমান করা হয়। এ সময় স্তূপের আকৃতি ছিল যথেষ্ট ক্ষুদ্র। সম্ভবত, পুণ্য অর্জনের জন্য সাধারণ মানুষ এগুলি নির্মাণ করেছিলেন। ঢাকা জেলার আসরাফপুর গ্রামে রাজা দেবখড়্গের তাম্রশাসনের সাথে ব্রোঞ্জ বা অষ্টধাতুর একটি স্তূপ পাওয়া গেছে। অনুমিত হয় যে এটি সপ্তম শতকে নির্মিত হয়েছিল। পাহাড়পুর ও চট্টগ্রামের অন্তর্গত বেওয়ারিতে আরো দুটি ধাতু নির্মিত স্তূপ পাওয়া গেছে। একাদশ দশকের একটি বৌদ্ধ পুঁথিতে বরেন্দ্রর 'মৃগস্থাপন স্তূপ'-এর একটি চিত্র দেখা যায়। সপ্তম শতকের চীনা পর্যটকদের বিবরণেও এই স্তূপটির উল্লেখ পাওয়া যায়। এই স্তূপের অধোভাগ ছয়টি স্তরবিশিষ্ট। প্রতি স্তরের আকার প্রস্ফুটিত পদ্মের মত। 'অণ্ড' অংশটি দীর্ঘ এবং এর চারদিকে ছোট ছোট কুলুঙ্গির মধ্যে চারটি বুদ্ধমূর্তি স্থাপিত। আর একটি বৌদ্ধপুঁথিতে দু'টি স্তূপের ছবি পাওয়া যায়। এর একটি 'তুলাক্ষেত্র বর্ধমান স্তূপ। কেউ কেউ এই বর্ধমান অর্থে মহাবীরকে বোঝান এবং সেক্ষেত্রে এটিকে প্রাচীন জৈন স্তূপ হিসেবে মনে করা যায়। এই স্তূপ

দুটির অধোভাগ নানা কারুকার্য শোভিত। চতুষ্কোণ ভিত, ধাপবিশিষ্ট বেদী, পদ্মাকৃতি সৌধগুলি ঊর্ধ্ব ও অধোমুখে বিকশিত। পাহাড়পুর ও বাঁকুড়ার বহুলাড়ায় কিছু স্তূপের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। সম্ভবত, দশম-দ্বাদশ শতকে এগুলি নির্মিত হয়েছিল। এদের ভিতগুলি গোল, চতুষ্কোণ বা ক্রুশের মত। ভিতের দেওয়ালের গায়ে বুদ্ধমূর্তি স্থাপিত। বিহারের প্রাচীন স্তূপের সাথে এগুলির সাদৃশ্য দেখা যায়। স্তূপগুলির গর্ভে বৌদ্ধসূত্র উৎকীর্ণ অসংখ্য মাটির সিলমোহর পাওয়া গেছে। অনুমান করা হয় যে বুদ্ধের শরীরের পরিবর্তে এই ধর্মশরীর স্থাপন করে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করা হত। বর্ধমানের ভরতপুরে একটি পঞ্চরথ স্তূপের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। গোলাকৃতি পাটাতনের উপর চারটি সমকোণবিশিষ্ট ভিত সম্পন্ন এই স্তূপটি সম্ভবত নবম শতকে নির্মিত হয়েছিল। যোগী-গুম্ফা নামক স্থানে পাথরের একটি ছোট স্তূপ পাওয়া গেছে। এর চূড়া এতটাই ধারালো যে এটিকে মন্দির বলে মনে হয়। সম্ভবত, এটিই বাংলায় স্তূপ স্থাপত্যের শেষ পর্বের নিদর্শন।

(খ) বিহার ঃ স্তূপের মতই 'বিহার'গুলির ধবংসাবশেষ মাত্র পাওয়া যায়। ভিক্ষুদের বাসস্থান হিসেবেই বিহারগুলির পরিকল্পনা ও নির্মাণ করা হত। পরে এগুলি বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে পরিণত হয়। রাজসাহীর অন্তর্গত পাহাড়পুরে একটি বিশালাকার বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। সম্ভবত, পাল রাজা ধর্মপাল অষ্টম শতকে এটি নির্মাণ করেছিলেন। 'সোমপুর মহাবিহার' নামে এটি বিশ্বখ্যাত হয়ে আছে। বিশালাকার এই বিহারের চতুষ্কোণ অঙ্গনটি প্রতিদিকে ৩০০ গজ দীর্ঘ ছিল। একটি উচ্চ প্রাচীর দ্বারা অঙ্গনটি পরিবেষ্টিত। প্রাচীরের চারদিকে ভিক্ষুদের বসবাসের জন্য প্রায় ১৮০ টি (মতান্তরে ১৭৭টি) ছোট ছোট কক্ষ নির্মিত ছিল। মধ্যস্থলে প্রশস্ত অঙ্গন এবং সেখানে নির্মিত ছিল একটি মন্দির। পোড়ামাটির ইঁটের তৈরি মন্দিরটি 'সর্বতোভদ্র' শিল্প রীতিতে নির্মিত হয়েছিল। এমন মন্দিরের নিদর্শন যবদ্বীপ ও ব্রহ্মদেশেও দেখা যায়। সমকালীন একটি লেখতে এই বিহারকে 'জগতে নয়নের একমাত্র বিশ্রামস্থল' (জগতাং নৈত্রৈক বিশ্রাম ভূ') অর্থাৎ নয়ন মনোহর কীর্তি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কুমিল্লার নিকট ময়নামতীতে কয়েকটি বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে।

(গ) মন্দির ঃ রামচরিত গ্রন্থে রামাবতীকে 'ঈশ্বরের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র' বলা হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল সেই সকল মন্দিরের অধিকাংশই কেবল ধ্বংসস্তূপের মধ্যে জেগে আছে। আদি-মধ্যযুগের মন্দির শিল্পের নিদর্শন হিসেবে সোমপুর বিহারের মধ্যবর্তী অঙ্গনের মন্দিরটিই নজরে পড়ে। *ড. সরসীকুমার সরস্বতী, কে. এন, দীক্ষিত* প্রমুখ এই মন্দিরটির বিশেষত্ব বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। মন্দিরের উপরের অংশটি ভেঙে পড়েছে। নিচের অবশিষ্ট অংশ থেকে এটিকে ভারতে প্রচলিত মন্দির স্থাপত্যের থেকে স্বতন্ত্র বলেই মনে হয়। ত্রিতলবিশিষ্ট মন্দিরের পরিধি উত্তর-দক্ষিণে ৩৫৬ ফুট এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৩১৪ ফুট।[1] অনুমিত হয় যে, বর্গাকৃতি অংশের উপরে মূল মন্দিরটি স্থাপিত ছিল। সম্ভবত, অন্যান্য মন্দিরের মত এর গর্ভগৃহ ছিল না, কেবল বর্গাকৃতি অংশের সামনের দিকে চারটি নাটমন্দিরে চারটি দেবমূর্তি ছিল। ***অধ্যাপক দীক্ষিত*** মনে করেন, পঞ্চম শতকে পাহাড়পুরে যে চতুর্মুখ জৈন মন্দিরটি ছিল, সেখান থেকেই সোমপুর মন্দিরের প্রেরণা গৃহীত হয়েছিল। ***অধ্যাপক সরস্বতীর*** মতে, ভারতে প্রচলিত 'সর্বতোভদ্র'

রীতিতেই এটি নির্মিত হয়েছিল। তবে এমন শিল্পরীতি বিশিষ্ট মন্দির ভারতের অন্যত্র পাওয়া যায়নি। তবে যবদ্বীপ ও ব্রহ্মদেশের কিছু মন্দিরে এই শিল্পধারা চোখে পড়ে। দিনাজপুর রাজবাড়ীতে কারুকার্য খচিত একটি প্রস্তরস্তম্ভ রক্ষিত আছে।.এর গাত্রে উৎকীর্ণ লিপি থেকে অনুমান করা হয় যে গৌড়রাজ প্রতিষ্ঠিত একটি শিবমন্দিরের অংশ। *ড. মজুমদারের* মতে, এই মন্দিরটি নবম শতকে নির্মিত হয়েছিল। এছাড়া, হাণ্ডিয়াল (পাবনা), পাইকোর (বীরভূম), বানগড় প্রভৃতি স্থানে যে সব প্রস্তরখণ্ড পাওয়া গেছে সেগুলিকে মন্দিরের অবশিষ্ট বলে অনুমান করা হয়।

আদি-মধ্যযুগে স্থাপত্য শিল্পের উজ্জ্বল কেন্দ্র দাক্ষিণাত্য ও দক্ষিণভারত। এ প্রসঙ্গে পল্লব রাজাদের কৃতিত্ব প্রথমেই উল্লেখের দাবি রাখে। প্রসঙ্গত, স্মরণীয় প্রাচীন যুগ ও আদি-মধ্যযুগের সংযোগকালে পল্লব রাজারা ক্ষমতাসীন ছিলেন। এই বংশের প্রথম দুই কৃতি শাসকের রাজত্বকাল আদি-মধ্যযুগের কালসীমার অন্তর্ভুক্ত নয়। এই পর্বে অনন্তশায়ন মন্দির, ভৈরবকোণ্ডের মন্দির, মহাবলিপুরমের (মামল্লপুরম) রথ মন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছিল। আদি-মধ্যযুগে পল্লবদের দ্বিতীয় ধারার মন্দিরগুলি নির্মিত হয়। এগুলি প্রথম অধ্যায়ের মত পাহাড় কেটে তৈরি নয়, এগুলি স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে নির্মিত হয়। এই মন্দিরগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে পড়ে রাজসিংহ গোষ্ঠীর রাজত্বকালে (৭০০-৮০০ খ্রীঃ) নির্মিত মন্দিরগুলি। দ্বিতীয় ভাগের অন্তর্ভুক্ত হল নন্দী বর্মন গোষ্ঠীর আমলে (৮০০-৯০০ খ্রীঃ) মন্দিরগুলি। প্রথম পর্বের দুটি বিখ্যাত মন্দির হল কাঞ্চীপুরমের কৈলাসনাথ মন্দির এবং বৈকুণ্ঠ পেরুমল মন্দির। এছাড়া রয়েছে তীর মন্দির, ঈশ্বর মন্দির ও মুকুন্দ মন্দির। এগুলি মহাবলীপুরমে অবস্থিত। ষষ্ঠটি হল দক্ষিণ আর্কটের পনমলই মন্দির। এই পর্বের মন্দিরগুলিতে শিল্পীদের কল্পনার স্বাধীনতা ও সৌন্দর্যবোধ ঐক্যবদ্ধভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে। নন্দী বর্মন গোষ্ঠীর মন্দিরগুলি আয়তনে ছোট এবং এগুলিতে পল্লব শিল্প ধারার অবনতির চিহ্ন স্পষ্ট। এই পর্বের স্থাপত্য কর্ম হল কাঞ্চীপুরমের 'মুক্তেশ্বর' 'মতঙ্গেশ্বর' মন্দির।

পল্লব যুগে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র মন্দির স্থাপত্যের যে রীতি চালু হয়েছিল। চোলদের আমলে তা পূর্ণতা পায়। পল্লব স্থাপত্যের দ্রাবিড় শিল্পরীতি চোলদের আরও পরিশীলিত হয়ে ওঠে। দ্রাবিড় রীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল প্রধান গর্ভগৃহের উপর পর পর তল নির্মাণ। পাঁচ থেকে সাতটি তল থাকত। একে বলা হত 'বিমান'। গর্ভগৃহের সম্মুখভাগে থাকত থামবিশিষ্ট হল ঘর। একে বলা হত 'মন্ডপ'। এই মণ্ডপে সমবেত হয়ে ভক্তমণ্ডলী নৃত্য-গীত পরিবেশন করতেন বা দেবতার পূজানুষ্ঠান উপভোগ করতেন। গর্ভগৃহের চারপাশে সরু পথ গর্ভগৃহকে বেষ্টন করে থাকত। এই পথে ভক্তরা মন্দির প্রদক্ষিণ করতেন। সমগ্র এলাকাটি উচ্চ পাচিল দিয়ে ঘেরা থাকত। এই দেওয়ালের একাংশে থাকত সুউচ্চ তোরণ। এই তোরণকে বলা হত 'গোপুরম'। *অধ্যাপক সতীশচন্দ্রে'র* মতে, কালক্রমে বিমান উচ্চ থেকে উচ্চতর হয়, মন্দির প্রাঙ্গন একাধিক হয় এবং গোপুরম সুবিন্যস্ত হয়। এইভাবে মন্দির ছোট ছোট নগর বা রাজপ্রাসাদে পরিণত হয়। এই মন্দিরের মধ্যেই থাকত পুরোহিতদের বাসগৃহ, অতিথি নিবাস ও অন্যান্য নানা জিনিস। চোলদের প্রথম যুগের অন্যতম উল্লেখযোগ্য মন্দির শিল্প হল নর্ত্তমলই -এ স্থাপিত বিজয়ালয় চোলেশ্বর মন্দির। পল্লব শিল্পরীতির প্রভাবমুক্ত চোল স্থাপত্যের প্রকাশ দেখা যায় রাজা প্রথম

পরন্তকের রাজত্বকালে। এই সময় ত্রিচিনোপল্লী জেলার সন্নিকটে শ্রীনিবাস নল্লুর নামকস্থানে 'কোরঙ্গনাথ' মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। এর নির্মাণ শৈলীতে পল্লব স্থাপত্যের সামান্য প্রভাব থাকলেও এটিকে দ্রাবিড় মন্দির স্থাপত্য রীতির এক স্বতন্ত্র ধারার প্রাথমিক প্রকাশ হিসেবে গণ্য করা যায়। স্বতন্ত্র দ্রাবিড় রীতির সুবিন্যস্ত ও সুপরিকল্পিত নিদর্শনগুলির অন্যতম হল প্রথম রাজরাজ নির্মিত তাঞ্জোরের 'বৃহদীশ্বর' মন্দির। এটিকে রাজরাজেশ্বর মন্দিরও বলা হয়। কারণ চোল রাজারা মন্দিরে দেবমূর্তি বাদে রাজা ও রানীর মূর্তিও স্থাপন করতেন। বৃহদাকার এই মন্দিরটি একাদশ শতকের গোড়ায় (১০০৯ খ্রীঃ) সম্পূর্ণ হয়। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ১৬৭ x ৮৪ মিটার প্রাচীরবেষ্টিত এই বিশাল মন্দিরটিকে মাত্রাজ্ঞান ও গঠনশৈলীর অপূর্ব সমন্বয়ের প্রতীক বলে শিল্প রসিকরা মনে করেন। ড. ***নীলকণ্ঠ শাস্ত্রীর*** মতে, *'The whole tample...is a magnificent example of solidity combined with proportion and grace of form".*[1] আনুমানিক ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্র চোল গঙ্গইকোণ্ড চোলপুরমের বিখ্যাত মন্দিরটি নির্মাণ করেন। একই পরিকল্পনায় এটি নির্মিত হলেও আকৃতি ও অলংকরণের দিক থেকে এই মন্দির বৃহদেশ্বরী মন্দিরকে ছাপিয়ে যেতে পারে। ১০০ ফুট চওড়া ভিত্তি ও ১৮৬ ফুট উচ্চতার এই মন্দিরের সাথে যুক্ত বিমানটি ও মণ্ডপ একটি গলিপথ দ্বারা যুক্ত। পিতা ও পুত্রের অবিস্মরণীয় স্থাপত্য কর্মের নিদর্শন এই দুটি মন্দিরের সৌন্দর্যের বিচার করে কোন কোন শিল্পরসিক প্রথমটির মধ্যে 'পুরুষোচিত গাম্ভীর্য, এবং দ্বিতীয়টির মধ্যে 'নারীসুলভ কমনীয়তা' লক্ষ্য করেছেন। একটি শক্তির প্রতীক, অন্যটি সৌন্দর্যের।

চোল স্থাপত্য শৈলী পরবর্তী শতকেও নিজেকে বিকশিত করে চলে এবং রাজ্যের নানা অংশে ছোট ছোট স্থাপত্য কর্মের মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ পায়। এগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে দু'টি মন্দির। এগুলি হল তাঞ্জোর জেলায় দারাসুরম মন্দির-এর 'ঐরাবতেশ্বর' মন্দির এবং কুম্ভকোনমের সন্নিকটে ত্রিভুবনেশ্বর 'কম্পহরেশ্বর' মন্দির। প্রথমটি নির্মিত হয় দ্বিতীয় রাজ-রাজের আমলে এবং দ্বিতীয়টির নির্মাতা 'তৃতীয় কুলোত্তুঙ্গ'।

পরবর্তী-চালুক্য ও হোয়সল বংশের কালেও মন্দির নির্মাণ কাজ অব্যাহত ছিল। কল্যাণীর চালুক্যদের উদ্যোগে পশ্চিম দাক্ষিণাত্যের মন্দির স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ দেখা যায় মহিশূরের হোয়সল মন্দিরগুলিতে। এই মন্দিরগুলির প্রধান তোরণ মন্দিরের সম্মুখভাগে না রেখে পাশে রাখা হত। যে দেওয়ালের বাইরের দিকটি সুঅলংকৃত হত এবং বিমানগুলির নির্মাণশৈলীতে আদি-চালুক্যদের সাধারণ ধাপবিশিষ্ট তল সমূহের সাথে হোয়সলদের ঘন সন্নিবিষ্ট তল পদ্ধতির সমন্বয় দেখা যায়। দশম শতকে নির্মিত কুক্কাসুরের 'নবলিঙ্গ' ও 'কল্লেশ্বর' মন্দিরে এই স্থাপত্যশৈলীর নিদর্শন দেখা যায়। একই ধরনের অন্যান্য নিদর্শনগুলি হল লাক্কুণ্ডির 'কাশী-বিশ্বেশ্বর' ইট্টাগির 'মহাদেব', কুরুভট্টির 'মল্লিকার্জুন' মন্দির ইত্যাদি। প্রথম পর্বের চালুক্য মন্দিরগুলিতে বৃহদাকার বেলেপাথর ব্যবহারের রীতি ছিল। কিন্তু হোয়সলরা সূক্ষ্ম দানাবিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ পাথর ব্যবহারেব সূচনা করেন। এর ফলে মহীশূরের মন্দিরগুলিতে সূক্ষ্ম পালিশ ও তীর্যক কোণ গড়ে তোলা সহজ হয়েছিল। চালুক্য মন্দিরগুলিতে দেব-দেবী ও তাদের অনুচরদের

মূর্তি ছাড়াও কর্মময় জীবনের নানাদিক নিয়ে তৈরি সুন্দর সুন্দর মূর্তি রাখা হত। এইভাবে ধর্ম বিশ্বাসের সাথে দৈনন্দিন জীবনকে জড়িত করা চালুক্য শিল্পরীতির এক অনবদ্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে স্বীকৃত হয়।

নবম ও ত্রয়োদশ শতকের অন্তর্বর্তীকালে উত্তর ভারতের নাগর রীতিতে কলিঙ্গ রাজ্য বা উড়িষ্যাতে বহু মন্দির নির্মিত হয়। মন্দিরময় উড়িষ্যার কেন্দ্রে আছে ভুবনেশ্বর যেখানে প্রায় ত্রিশটি মন্দির আছে। এর পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে অবস্থিত আছে দুটি বৃহৎ ও কারুকার্যময় স্থাপত্য কলার নিদর্শন— পুরীর জগন্নাথ মন্দির এবং কোনারকের সূর্যমন্দির। গঞ্জাম জেলায় সমুদ্র উপকূল অঞ্চলে মুখলিঙ্গম শিল্প ধারায় অনেকগুলি মন্দির নবম শতকে নির্মিত হয়। এদের স্থাপত্য-রীতির উপর চালুক্য মন্দির রীতির বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। 'মুখলিঙ্গেশ্বর' মন্দিরের প্রধান দেবতাকে ঘিরে চতুর্দিকে অন্য চারজন কম গুরুত্বপূর্ণ দেবমূর্তির অধিষ্ঠান দেখা যায়। এই মন্দিরের অলংকরণে চালুক্য ও গুপ্ত অলংকরণ শৈলীর সমন্বয় দেখা যায়।

উড়িষ্যার মন্দির স্থাপত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল চতুষ্কোণ দেবালয়। মূল মন্দির 'দেউল' নামে অভিহিত হয়। দেউলের সম্মুখভাগে থাকে প্রশস্ত প্রার্থনা কক্ষ। এর নাম 'জগমোহন'। বড় বড় মন্দিরে জগমোহনের সম্মুখভাগে আরো দুটি বৃহৎ কক্ষ নির্মিত হয়। এগুলি হল— নৃত্য কক্ষ' 'নাটমন্দির' এবং তার সামনে থাকে 'ভোগমন্দির'। এই কাঠামোর মধ্যে সমস্ত অংশগুলি ধরা থাকে। সাধারণভাবে থামের পরিবর্তে দেওয়ালের উপর ছাদ আঁটা থাকে। দেউলের শীর্ষদেশ পিরামিডের মত ক্রমশ সরু হয়ে অনেক ওপরে উঠে যায়। উড়িষ্যার মন্দির স্থাপত্যের বিশেষত্ব হল যে, এর অভ্যন্তর ভাগে বিশেষ অলংকরণ থাকে না, কিন্তু বহির্ভাগে নানা সূক্ষ্ম কারুকার্য দ্বারা শোভন সুন্দর করা হয়। খ্রীষ্টীয় ৭৫০-৯০০ অব্দের মধ্যে নির্মিত ভুবনেশ্বরের 'পরশুরামেশ্বর' ও 'ভিটল' মন্দিরে উড়িষ্যা স্থাপত্য রীতির প্রাথমিক প্রকাশ দেখা যায়। প্রথমটির দেউলও জগমোহনের দৈর্ঘ্য প্রায় ৪৮ ফুট। দেউলের চূড়ার উচ্চতা ৪৪ ফুট। তুলনামূলক ভাবে ভিটল মন্দিরের আয়তন ১৮ x ২৫ ফুট এবং শিখরের উচ্চতা মাত্র ৩৫ ফুট। এখানে উত্তর ভারত ও দাক্ষিণাত্য স্থাপত্যশৈলীর অপূর্ব সংমিশ্রণ দেখা যায়। ভুবনেশ্বরের 'মুক্তেশ্বর' মন্দির (৯৭৫ খ্রীঃ) এবং 'লিঙ্গরাজ' মন্দিরের (১০০০ খ্রীঃ) অভ্যন্তর ভাগের বিশেষ অলংকরণে জোর দেওয়া হয়। বর্গাকার লিঙ্গরাজ মন্দিরের আয়তন ৫২০ x ৪৬৫ ফুট। দেউলের শিখরের উচ্চতা ১২৫ ফুট। নাটমন্দির ও ভোগমন্দিরটি পরবর্তীকালের সংযোজন। এর অভ্যন্তর ভাগকে প্লাস্টিক অলংকরণ দ্বারা দৃষ্টি নন্দন করা হয়েছে। অভ্যন্তরের কারুকার্য সেকালের শিল্পীদের দক্ষতার অনবদ্য নিদর্শন হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের নির্মাণকার্য খ্রীষ্টীয় ১১০০ অব্দে শুরু করেন অনন্ত বর্মন চোড়গঙ্গ। তবে সম্পূর্ণ হয় অনেক পরে। লিঙ্গরাজ মন্দিরের আদলে নির্মিত এই মন্দিরের আয়তন দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে ৩১০ ফুট x ৮০ ফুট। শিখরের উচ্চতা প্রায় ২০০ ফুট। চারটি অংশ সমন্বিত জগন্নাথ মন্দির একটি কাঠামোর মধ্যে নির্মিত হয়েছে। তবে প্রশস্ত নাট মন্দিরে ১৬টি থাম প্রযুক্তিগত কারণে ব্যবহার করা হয়েছে। মূল মন্দিরের চারপাশের প্রায় ৩০/৪০ টি ছোট ছোট মন্দিরে নানা বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন।

আদি-মধ্যযুগের জৈন স্মৃতিস্তম্ভগুলিও স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন হিসেবে উল্লেখের দাবি রাখে।

স্মরণীয় এমন দুটি স্মৃতিস্তম্ভের নির্মাতা ছিলেন গঙ্গরাজা বা চতুর্থ রাকমল্ল'র মন্ত্রী চামুণ্ডা রায়। দুটিরই অবস্থান শ্রাবণবেলগোলায়। এর একটি 'চামুণ্ডারায় বসদি'। চন্দ্রগিরি পাহাড়ের পাদদেশে স্থাপিত এই সৌধের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ হল যথাক্রমে ৭০ ফুট ও ৩৬ ফুট। এটি নির্মিত হয় আনুমানিক ৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে। দ্বিতীয় শৌধটি প্রথম তীর্থঙ্করের পুত্র গোম্মত-এর উদ্দেশ্যে নিবেদিত এবং এর নির্মাণকাল ৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দ।

রাষ্ট্রকূটদের আমলে শিল্পকলার বিশেষ অগ্রগতি ঘটেনি। রাষ্ট্রকূট আমলের একমাত্র শিল্পনিদর্শন হল ইলোরার 'কৈলাসনাথ' মন্দির। রাষ্ট্রকূটরাজ প্রথম কৃষ্ণের আমলে এটি নির্মিত হয়। এটি ছাড়া এমন কোন ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়নি, যা থেকে সন্দেহে করা যেতে পারে যে সমগুরুত্বপূর্ণ কোন শিল্পসৃষ্টি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। অবশ্য কৈলাসনাথ মন্দিরের স্থাপত্যশৈলী শিল্পরসিকদের প্রভূত প্রশংসা অর্জন করেছে।

○ ভাস্কর্য ঃ

স্থাপত্যের মতই আদি-মধ্যযুগে ভারতীয় ভাস্কর্যের মূল কেন্দ্র ছিল মন্দিরে সৃষ্ট অসংখ্য দেবদেবী ও তাদের অনুচরদের মূর্তি। মন্দির ধ্বংস হবার সঙ্গে সঙ্গে স্থাপত্য নিদর্শনের মত বহু ভাস্কর্য নিদর্শনও হারিয়ে গেছে। অবশ্য ক্ষীয়মান অবস্থাতে হলেও, যে অসংখ্য ভাস্কর্য কর্ম এখনও টিকে আছে, তা থেকে সমকালের ভাস্কর্যশৈলী সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া সম্ভব। গুপ্ত রাজবংশের শাসনকালে ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের বিপুল চর্চা হয়েছিল। এই সময়ের সৃষ্টিতে ধ্রুপদী ঐতিহ্য (Classical Tradition) অনুসারে ভাস্কর্যে উৎকীর্ণ মূর্তিগুলিতে 'ত্রিমাত্রিক' (Trio-dimentional) বৈশিষ্ট্য আরোপিত হয়েছিল। কিন্তু আদি-মধ্যযুগে সেই ধ্রুপদী ধারণার প্রভাব কমতে থাকে। সপ্তম শতকের পরবর্তী চার শতকে ভারতের বৃহত্তর অংশের ভাস্কর্য কর্মে 'দ্বিমাত্রিক' গুণ আরোপিত হয়। এই সময়ের ভাস্কর্য আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রভাবিত হয়। অবশ্য গুজরাট, রাজপুতানা, উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারত বা মধ্য ভারতে দশম শতক পর্যন্ত ত্রিমাত্রিক ভাস্কর্য সৃষ্টির প্রবণতা অব্যাহত ছিল। আবার আদি-মধ্যযুগের ভারতে শিল্পকলা চর্চার প্রাণকেন্দ্র দক্ষিণ ভারত এবং পূর্ব ভারতে পাল রাজাদের ভাস্কর্যে প্রাচীন ধ্রুপদী শৈলীর প্রকাশ প্রায় একাদশ শতক পর্যন্ত যথেষ্ট জোরালো ছিল। আদি-মধ্যযুগের ভাস্কর্যের বিষয়বস্তু মূলত ধর্মকেন্দ্রিক। আরো নির্দিষ্টভাবে বলা যায় দেব-দেবীর মূর্তি-নির্ভর। তবে ধর্ম নিরপেক্ষ ভাস্কর্য একেবারে অনুপস্থিত ছিল, এমন নয়। মন্দিরের দেওয়াল অলংকরণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পৌরাণিক ঘটনা যেমন স্থান পেয়েছে, তেমনি মানব-মানবীর মূর্তি, দৈনন্দিন জীবনের দৃশ্য, পশুপাখী, লতাগুল্ম ইত্যাদির অলংকরণও ভাস্করদের আকৃষ্ট করেছে।

ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদারের মতে, ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত বাংলার ভাস্কর্যে কোন বিশেষ প্রণালী ও নতুন পরিকল্পনার ছাপ পাওয়া যায় না। তাঁর মতে সপ্তম শতকের শেষ পর্যন্ত বাংলার ভাস্কর্যে গুপ্ত যুগের সংযম ও গাম্ভীর্যের সাথে কমনীয়তা ও আবেগ প্রবণতার অপূর্ব সমন্বয় দেখা যায়। সপ্তম শতকের শেষ ভাগে নির্মিত দেবখড়্গের রানী প্রভাবতীর লিপিযুক্ত 'শার্বাণী ও একটি ক্ষুদ্র 'সূর্যমূর্তির' 'ভাস্কর্যশৈলী বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছেন যে, এগুলিতে গুপ্তযুগের ধ্রুপদী

ঐতিহ্য, সংযম, গাম্ভীর্যের পাশাপাশি পরবর্তী দ্বিমাত্রিক ভাস্কর্যের বৈশিষ্ট্যগুলির সমাবেশ ঘটেছে। অর্থাৎ সপ্তম শতকের ভাস্কর্যে গুপ্ত-ভাস্কর্যের অবসন্ন রূপ ধরা পড়ে। অষ্টম শতকে বাঙালী ভাস্কররা সেই অবসাদ মুক্ত হয়ে বাংলার ভাস্কর্যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সংযোজন করতে সক্ষম হন। পাহাড়পুরের মন্দিরে উৎকীর্ণ তেষট্টিটি প্রস্তর ও পোড়ামাটির ফলকে আদি-মধ্যযুগে বাংলার নিজস্ব ভাস্কর্য-শৈলীর প্রথম প্রকাশ দেখা যায়। ফলকগুলিতে উৎকীর্ণ ভাস্কর্যের বিষয়বস্তু ও উপস্থাপনার চরিত্রে বিভিন্নতা স্পষ্ট। বৈশিষ্ট্যগত প্রভেদের ভিত্তিতে পাহাড়পুরের ভাস্কর্যগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় যথা, লোকায়ত ভাস্কর্য, অভিজাত ভাস্কর্য এবং সমন্বিত ভাস্কর্য। এই ফলকগুলিতে উৎকীর্ণ ভাস্কর্যের শিল্পরীতি স্বাতন্ত্র। কয়েকটিতে পূর্বাঞ্চলীয় গুপ্ত ভাস্কর্যশৈলীর সার্বিক প্রভাব বিদ্যমান। কতকগুলিতে বাংলার স্বতন্ত্র ধারার প্রকাশ ঘটেছে। আবার কতকগুলি মূর্তির পরিকল্পনায় উপরোক্ত দু'টি প্রবণতার সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। এই তিন শ্রেণীর ভাস্কর্যে শিল্পশৈলীর বিভিন্নতার পাশাপাশি এদের নির্মাণের উপকরণের বৈচিত্র্যও লক্ষণীয়। অধ্যাপক ***সরসী কুমার সরস্বতীর*** মতে, এই তিন ধারা ভাস্কর্য শিল্প যথাক্রমে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শতকে নির্মিত হয়েছিল। প্রথম ধারার মূর্তিগুলিতে গুপ্ত আমলের ভাস্কর্যশৈলীর প্রভাব স্পষ্ট। দ্বিতীয় ধারাতে গুপ্ত-প্রভাব অনেকটা প্রচ্ছন্ন। এবং তৃতীয় শ্রেণীর মূর্তির পরিকল্পনা ও প্রকাশ এক স্বতন্ত্র, স্থানীয় বৈশিষ্ট্য দ্বারা শ্রীমণ্ডিত।

কয়েকটি প্রস্তর ফলক ও পোড়ামাটির ফলকে প্রথম শ্রেণীর ভাস্কর্যের প্রকাশ দেখা যায়। বাঙালীর জনপ্রিয় মহাকাব্যের কাহিনী ও অবতারের লীলা এই সকল ভাস্কর্যের বিষয়বস্তু। সাধারণ-মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, কর্মময় জীবন ধারা ইত্যাদি বিষয়কে ভিত্তি করেও এই শ্রেণীর বহু ভাস্কর্য সৃষ্টি হয়েছে। জলভরা কলসী বহনরতা রমণী, লাঙল কাঁধে কৃষক, তৈজসপত্র বহনকারী শীর্ণকায় কুব্জদেহ সন্ন্যাসী, পুজাপাঠরত পুরোহিত, তীর-ধনুক হস্তে শবর পুরুষ কিংবা মৃত পশু হাতে শবর রমণী—এমন অসংখ্য পরিচিত দৃশ্যাবলী ভাস্করদের সৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে ফলকের গায়ে। এই সকল ভাস্কর্যের উপস্থাপনা খুবই নিম্নমানের। মানব-মানবীর মূর্তির গঠন খুবই সাদামাটা, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে কুৎসিতও। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও পোশাক-পরিচ্ছদ অতি সাধারণ ও নিম্নমানের। শিল্পীর সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধের প্রকাশ এই শ্রেণীর ভাস্কর্যে অনুপস্থিত। ***ড. মজুমদারের*** মতে সম্ভবত, এই শ্রেণীর ভাস্কররা সমাজের নিম্নশ্রেণী থেকে এসেছিলেন এবং তাঁদের বিশেষ শিক্ষাও ছিল না। তবে সাধারণ মানের হলেও এঁদের পর্যবেক্ষণ শক্তির গভীরতা অস্বীকার করা যায় না। দৈনন্দিন জীবনের পরিচিত ছবিগুলি তাঁরা যেভাবে ভাস্কর্যে তুলে ধরে, তা তাঁদের সমাজ-সচেতনতার পরিচয় দেয়। পাহাড়পুরের পাথরের ফলকে খোদিত উচ্চ শ্রেণীর মূর্তিগুলিকে দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে ফেলা যায়। এগুলি প্রধানত কৃষ্ণ, বলরাম, রাধা ইত্যাদি দেবদেবীর মূর্তিকে ভিত্তি করে খোদিত হয়েছে। এখানে পুরুষ ও নারীর একটি প্রণয়-চিত্রকে রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়লীলা মনে করা হয়। কিন্তু মহাভারত বা পুরাণ গ্রন্থে রাধা-কৃষ্ণের প্রেম কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। তাই শিল্প সমালোচকদের অনুমান এই চিত্রে কৃষ্ণের পাশে দণ্ডায়মান নারী ছিলেন রুক্মিণী অথবা সত্যভামা। এই পর্বের ভাস্করদের সমাজচেতনা ও সৌন্দর্যানুভূতি ছিল উচ্চমানের। এঁদের প্রেরণা ছিল গুপ্তযুগের ধ্রুপদী শিল্পশৈলী। এখানে মূর্তিগুলির মুখশ্রী, শরীরের গঠন সৌষ্ঠব. পরিধেয় বসনের

আভিজাত্য ভাস্করদের সৌন্দর্য-চেতনা ও গভীর মননশীলতার পরিচয় বহন করে। মূর্তিগুলিকে পার্থিব ও অপার্থিব ভাবের অপরূপ সমন্বয় দেখা যায়। সংস্কৃত কাব্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়ার কারণে পুরুষ মূর্তির পৌরুষ কিংবা নারী মূর্তির লাস্যময়ীতা অতিরঞ্জিত হয়েছে। তবে অধ্যাত্মভাব-কল্পনার সাথে মানবিক ইন্দ্রিয় পরায়ণতার যে সমন্বয় ঘটানো হয়েছে, তা ভাস্করদের গভীর শিল্প দক্ষতার পরিচায়ক। পাহাড়পুরের কিছু ভাস্কর্যে প্রথম শ্রেণীর গ্রাম্যভাব ও দ্বিতীয় শ্রেণীর আভিজাত্যের সহাবস্থান দেখা যায়। কৃষ্ণের বাল্যলীলা, দিক্‌পালের মূর্তি, ইন্দ্রের মূর্তি ইত্যাদিতে এই সমাবেশ দেখা যায়। এগুলিকে তৃতীয় শ্রেণীর নিদর্শন বলা যায়। গুপ্ত-পরবর্তী ও অষ্টম শতকের অন্তর্বর্তীকালে এই সকল ভাস্কর্য সৃষ্টি হয়েছিল। তাই গুপ্ত শিল্প ধারার প্রভাব অস্বীকার করা যেমন সম্ভব হয়নি, তেমনি আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য শিল্পধারার প্রকাশ ঘটানোর প্রয়াস এই সকল ভাস্কর্যে লক্ষ্য করা যায়।

নবম থেকে দ্বাদশ শতকে গুপ্ত ভাস্কর্যশৈলীর প্রভাবমুক্ত স্বতন্ত্র বাংলাদেশী ভাস্কর্যশৈলী বিকাশ লাভ করে। কেবল পাল রাজবংশ নিয়ন্ত্রিত এলাকা নয় ; পূর্ব ভারতের বর্ম, চন্দ্র ইত্যাদি ছোট ছোট আঞ্চলিক রাজ্যগুলিতেও পাল রাজ্যের শিল্প ধারার বিকাশ ঘটেছিল। এই পর্বের ভাস্কর্যের বিষয়বস্তু ছিল দেবদেবীর মূর্তি। সাধারণ মানুষের পার্থিব জীবনের কোন ছবি এখানে পাওয়া যায় না। ভাস্কর্যের প্রধান উপকরণ ছিল অষ্টধাতু ও কৃষ্ণবর্ণ কষ্টি পাথর। সোনা রূপা ইত্যাদি ধাতুর ব্যবহার ছিল খুবই নগণ্য। পাল যুগের ভাস্কর্যশৈলীতে নানা বিবর্তন ঘটেছে। *ড. মজুমদারের* মতে, সে যুগের প্রাপ্ত মূর্তিগুলির সংখ্যাল্পতার ফলে বিবর্তনের ধারা সম্পর্কে গভীর ব্যাখ্যা কষ্টকর। অনেক সময় শিল্পীর ব্যক্তিগত শিল্পবোধ, আবার অনেক সময় পারিপার্শ্বিকতা শিল্পশৈলীর বিবর্তনে সক্রিয় থাকে। কিন্তু অধিকাংশ মূর্তিতে নির্মাণকার্য উল্লেখ না থাকায় সময়কালের নিরিখে বিবর্তনের ধারা ব্যাখ্যা করা যায় না। তিব্বতী ঐতিহাসিক তারানাথ সপ্তম শতকে পূর্ব ভারতের শিল্প ইতিহাস আলোচনা করেছেন। তিনি দেবপাল ও ধর্মপালের সময় বরেন্দ্রভূমির দুজন শিল্পীর নাম উল্লেখ করেছেন—ধীমান ও বীত- পাল। সম্পর্কে এঁরা পিতা ও পুত্র। তারানাথের মতে, বীতপাল ধাতু খোদাই-এর ক্ষেত্রে প্রাচ্য রীতি অনুসরণ করেন, কিন্তু ধীমান অনুসরণ করেছিলেন মধ্য দেশীয় রীতি। এঁরা চিত্রাঙ্কনেও পারদর্শী ছিলেন। কিন্তু এক্ষেত্রে পিতা-পুত্র ঠিক বিপরীত শৈলীর অনুসারী ছিলেন। পরবর্তীকালে খননকার্য থেকে পাল-সেন যুগের আরো ভাস্কর্য-নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। সেগুলি বিশ্লেষণ করে *ড. সরসী কুমার সরস্বতী* বলেছেন যে, এযুগের ভাস্কর্য রীতিকে বিভক্ত করা সঠিক হবে না। নবম শতকের পরবর্তী ভাস্কর্যকে সাধারণ ভাবে প্রাচ্যরীতির অনুসারী বলা যায়। কোন কোন সমালোচক মূর্তিগুলির অবয়বগত ভিন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে বিবর্তনের ধারা নির্দিষ্ট করেছেন। এঁদের মতে, নবম শতকের মূর্তি ছিল শান্ত-সৌম্য, কমনীয়। দশম শতকে দেহগুলি ছিল বলিষ্ঠ ও শক্তি ব্যঞ্জক। কিন্তু একাদশ শতকে মুখমণ্ডলে ছিল অপার্থিব ভাবের প্রকাশ। দেহের উর্ধ্ব ভাগ ছিল নমনীয় ও কোমল। মুখমণ্ডল ছিল ভাবলেশ হীন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিল আড়ষ্ট। কিন্তু *ড. মজুমদার* মনে করেন, এই ধরনের কাল-বৈশিষ্ট্যের বিভাজন যথেষ্ট যুক্তিগ্রাহ্য নয়। তাঁর মতে, পাল যুগের শ্রেষ্ঠ মূর্তিগুলিতে গুপ্তযুগের আধ্যাত্মিক ভাব এবং পালযুগের সৌন্দর্য ও লাবণ্যের সমন্বয় দেখা যায়। শিয়ালদি, বাখাউরা, সাগরদীঘি, রংপুর, বগুড়া, দেওপা. বানগড় ইত্যাদি স্থানের বুদ্ধমূর্তি, ঝিল্লীর

(মুর্শিদাবাদ) বরাহ অবতার, শঙ্কর বাঁধার নটরাজ মূর্তি উত্তরবঙ্গের কার্তিক মূর্তি ইত্যাদিতে আধ্যাত্মিকতা ও সৌন্দর্যের সমন্বয় দেখা যায়।

দক্ষিণ ভারতে ভাস্কর্য শিল্পের সূচনা পল্লবযুগেই (৬ ষষ্ঠ—৯ শতক) হয়েছিল। প্রথম মহেন্দ্র বর্মণ ও তাঁর পুত্র নরসিংহ বর্মণের গুহামন্দির ও রথমন্দিরগুলি সুন্দর ভাস্কর্য দ্বারা শ্রীমণ্ডিত করা হয়েছিল। উন্মুক্ত আকাশের নীচে পাহাড় খোদাই করে 'কিরাতার্জুনীয়' মহাকাব্যের কাহিনীর উপস্থাপনা পল্লব ভাস্কর্যের এক অনবদ্য দৃষ্টান্ত। প্রথম দিকের পল্লব ভাস্কর্যে শেষ দিকের বেঙ্গী ভাস্কর্যের প্রভাব দেখা যায়। অধ্যাপক সরস্বতী মনে করেন পল্লব ভাস্কররা কালক্রমে বেঙ্গীর প্রভাব মুক্ত হয়ে দ্রাবিড় ভাস্কর্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করেছিলেন। বেঙ্গীর ভাস্কর্যের ইন্দ্রিয়পরায়ণতা থেকে মুক্ত হয়ে পল্লব শিল্পীরা শান্ত, সংযত ও আধ্যাত্মিকতা দ্বারা উদ্ভাসিত মূর্তি নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আদি-মধ্যযুগে দক্ষিণ ভারতীয় ভাস্কর্যের দৃপ্ত প্রকাশ ঘটে চোল রাজ্যে। চোলযুগে পাথর ও ধাতুর সাহায্যে অসংখ্য অবিস্মরণীয় ভাস্কর্য সৃষ্টি হয়েছে। প্রস্তর খোদিত চোল ভাস্কর্যের নিদর্শন দেখা যায় মন্দিরের গায়ে, বিস্তৃত হল ঘরে, গো পুরমগুলিতে। শ্রীনিবাসনল্লুরে কোরঙ্গনাথ মন্দিরের দেওয়ালে এবং কুম্বকোনয়ে নাগেশ্বর মন্দিরে নরনারীর প্রতিকৃত খোদিত আছে। জীবন ও সৌন্দর্যবোধের প্রকাশ হিসেবে এই ভাস্কর্যগুলি অনবদ্য। তাঞ্জোরে বৃহদীশ্বর ও গোঙ্গইকোণ্ড চোল পুরম মন্দিরের অভ্যন্তর ও বহির্ভাগ অসংখ্য দেবদেবীর মূর্তি দ্বারা শোভিত। এসবই চোল যুগে উন্নত প্রস্তর-ভাস্কর্যের সাক্ষ্য বহন করে। চোল আমলের ভাস্কর্যের অবিস্মরণীয় নিদর্শন হল ব্রোঞ্জ-ধাতু নির্মিত মূর্তিগুলি। *এ. এল. ব্যাসামের* মতে, সমগ্র বিশ্বে এদের তুলনা মেলা কঠিন। বস্তুত, ভারতে ধাতু শিল্পের উন্নততর রূপটি চোলদের আমলেই বিকশিত হয়। তাঞ্জোর লিপিতে অসংখ্য ব্রোঞ্জ ভাস্কর্যের নামোল্লেখ আছে। শৈব ধর্ম ও দেবতাকেন্দ্রিক এই সকল নিদর্শন অধিকাংশই বিনষ্ট হয়ে গেছে। দক্ষিণ ভারতের মন্দির ও নানা দেশের জাদুঘরে রক্ষিত চোল যুগের নিদর্শগুলি থেকে সেকালের ধাতুনির্মিত ভাস্কর্যের বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা যায়। পূর্ণ গর্ভ ও শূন্য গর্ভ, উভয় ধরনের ব্রোঞ্জ মূর্তি তৈরি হত। বড় বড় মূর্তিগুলি ধর্মীয় শোভাযাত্রায় বহন করা হত কিংবা নানা অনুষ্ঠানে প্রদর্শন করা হত। ছোট ছোট মূর্তিগুলি ব্যবহার করা হত অলংকরণের কাজে। ধাতু মূর্তির অধিকাংশই ছিল দেব-দেবীর মূর্তি। শিবের নানা রূপ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, ভূদেবী, রাম-সীতা, কিছু শৈবসাধকের মূর্তি চোল ভাস্কর্যের নিদর্শন হিসেবে এখনো দেখা যায়। চোল মূর্তিগুলির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অনুপাত একান্তভাবে শিল্পসম্মত। ***নীলকণ্ঠ শাস্ত্রীর*** মতে, ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য বজায় রেখেও চোল যুগের ভাস্কর্যগুলি রুচিবোধ, দেহ সৌষ্ঠব, জাঁকজমক ইত্যাদির অতুলনীয় প্রতীক হিসেবে বন্দিত হবে। ধাতু নির্মিত মূর্তিগুলির মধ্যে 'নটরাজ' মূর্তিটি সবচেয়ে বড় এবং সর্বাধিক সুন্দর। নৃত্যের দেবতা নটরাজ তাঁর অনবদ্য নৃত্য ভঙ্গিমার মাধ্যমে বিশ্ব জগতের আধ্যাত্মিক রহস্যসৃষ্টি স্থিতি-লয়' কে প্রস্ফুটিত করেছেন। জীবন ও মৃত্যু উভয় ক্ষেত্রেই অচঞ্চলতার প্রকাশ করে হিন্দু দর্শনের গভীর তত্ত্ব এই ভাস্কর্যে শিল্পী প্রকাশ করেছেন। কুমার স্বামীর মতে, নটরাজ মূর্তিতে শিল্পীরা পরিবর্তন ও অস্থিরতার মধ্যে অন্তর্নিহিত চিরন্তন শান্তি ও স্থৈর্যকে প্রকাশ করতে প্রয়াসী হয়েছেন। *ড. নীহাররঞ্জন রায়* এই মূর্তিকে সারনাথের বিশ্বখ্যাত বুদ্ধ মূর্তির সমতুল্য বলে অভিহিত করেছেন।

○ চিত্রকলা ঃ

ভারতে চিত্রাঙ্কন শিল্পের ঐতিহ্য খুবই প্রাচীন। তবে স্থাপত্য-ভাস্কর্যের মত চিত্রকলারও বিষয়-বস্তু ছিল ধর্ম এবং মন্দির বা বিহার ইত্যাদি ছিল চিত্র চর্চার ক্ষেত্র। স্বভাবতই স্থাপত্য কর্মগুলি ধ্বংস হওয়ার কারণে চিত্রকলার নিদর্শনগুলিও অধিকাংশ বিনষ্ট হয়ে গেছে। প্রাচীন তাম্রলিপ্তি (তমলুক) নগরে যে চিত্রশিল্প জনপ্রিয় ছিল ফা-হিয়েনের বিবরণ থেকে তা জানা যায়। *ড. মজুমদার* মনে করেন যে, পরবর্তীকালের শিল্পশাস্ত্রের অনুশাসনের ভিত্তিতে ধরে নেওয়া যায় যে প্রাচীন ও বৌদ্ধবিহারের প্রাচীরগাত্র চিত্র দ্বারা সুসজ্জিত করা হত। এছাড়া তান্ত্রিক বৌদ্ধ গ্রন্থাদি থেকে কিছু চিত্রের নমুনা পাওয়া যায়। একাদশ-দ্বাদশ শতকের বৌদ্ধ পুঁথিতে বজ্রযান, তন্ত্রযান মতের দেবদেবীর কিছু ছবি পাওয়া যায়। পাল আমলের শেষদিকে রচিত 'অষ্টসাহস্রিকা' এবং 'পঞ্চবিংশতি সাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা' পুঁথিতে সমকালীন বাংলার চিত্রবিদ্যা সম্পর্কে কিছু আলোচনা পাওয়া যায়। রেখাবিন্যাস ও বর্ণসমাবেশ-এই দুটি ছিল প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য। অজন্তা, ইলোরার গুহাচিত্রে এই দুটি বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ দেখা যায়। বাংলার চিত্রশিল্পীরাও এই দুটি বৈশিষ্ট্যকে তাঁদের চিত্রকর্মে রূপদান করেছেন। প্রজ্ঞাপারমিতা পুঁথিতে যে চিত্র দেখা যায় তাতে সুক্ষ্মরেখা ও বর্ণের মাধ্যমে দৃষ্টিনন্দন সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটানো হয়েছে। *ড. মজুমদারের* মতে, বাংলার চিত্রশিল্পের নমুনা মুষ্টিমেয় ; কিন্তু এটি যে স্বর্ণমুষ্টি তাতে সন্দেহ নাই। দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতেও মূলত ধর্মভিত্তিক চিত্রকলা চর্চার নিদর্শন পাওয়া যায়। পল্লবরাজ রাজসিংহের রাজত্বকালে পনমলই ও কাঞ্জিপুরম মন্দিরে অলংকরণের কাজে চিত্রকল্পের ব্যবহার দেখা যায়। কাঞ্চির কৈলাসনাথ মন্দিরের দেওয়ালে প্লাস্টারে সোমস্কন্দ অর্থাৎ শিব, উমা ও স্কন্দের ছবি চিত্রিত হয়েছে। চোল আমলেও শৈব চিত্রকলার দক্ষতা দেখা যায়। বিজয়ালয় চোলেশ্বর মন্দির গাত্রে মহাকাল ও নটরাজশিবের মূর্তি চিত্রিত আছে। বৃহদেশ্বরী মন্দিরের গায়ে অঙ্কিত হয়েছে নটরাজ, ত্রিপুরান্তক ও কৈলাসবাসী মহেশ্বরের চিত্র। চালুক্য-পরবর্তীকালে গুজরাট অঞ্চলে চিত্রকলার চর্চা ছিল। ক্লাসিকাল ধ্যানধারণার সাথে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে রাজস্থান রীতির উদ্ভব ঘটেছিল। পরবর্তীকালে পরমার ও চৌহান শাসকদের আমলে চিত্রকলার বৈচিত্র্য বিঘ্নিত হয়।

○ ধর্মতত্ত্ব ও ধর্ম সম্প্রদায় ঃ

আদি-মধ্যযুগে ভারতের ধর্মভাবনা ও ধর্মাচারের ব্যাপক সংস্কার ও পরিবর্তন ঘটলেও ; সার্বিক ধর্মসহিষ্ণুতা ও ধর্মীয় সহাবস্থানের বৈশিষ্ট্য অব্যাহত থাকে। সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত সময়কালে শৈব, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের রূপান্তর ও উত্থান-পতন লক্ষ্য করা যায়। এই পর্বে হিন্দুধর্মের প্রতীক হিসেবে শিব ও বিষ্ণুর জনপ্রিয়তা যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের ক্রমাবনতি ঘটতে থাকে। অবশ্য খ্রীষ্টীয় দশম শতক পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতে জৈনধর্মের প্রসার অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং শেষ মুহূর্তে হিন্দুধর্মের নানা বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে কোনক্রমে বিহার ও বাংলাদেশে টিকে থাকে। কিন্তু সেন রাজবংশের শাসনকালে বাংলায় ব্রহ্মণ্যধর্ম বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে বৈদিক ধর্ম ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম দুই-ই ছিল। তবে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের অন্তর্ভুক্ত শৈবধর্ম ও বৈষ্ণব ধর্মের ব্যাপক জনপ্রিয়তা বৈদিক ধর্ম ও

দেবদেবীকে আড়াল করে দেয়। শিব ও কৃষ্ণ সামনের সারিতে অধিষ্ঠিত হন। এঁদের পাশাপাশি শাক্ত দেবতা, শৈব দেবদেবী যেমন দুর্গা, কার্তিক, গণেশ, বৈদিক দেবতা বৃহস্পতি, গঙ্গা, যমুনা, কুবের, অগ্নি প্রমুখের আরাধনাও চলত। শক্তি পূজার ভিত্তি হল সৃষ্টির কারণ হিসেবে নারীশক্তির আরাধানা। শক্তি পূজার প্রভাব বৌদ্ধ মহাযানবাদের উপরেও দেখা যায়। সেখানে প্রাচীন বুদ্ধদেবের সঙ্গিনী হিসেবে তারাদেবীর উপাসনা শুরু হয়। হিন্দুধর্মে শক্তিদেবী স্বরূপিনী রূপে দুর্গা, সরস্বতী, কালীদেবীর আরাধনা শুরু হয়।

খ্রীষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতকে বৌদ্ধধর্ম কেবল মাত্র পূর্ব ভারতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। বাংলার পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক। অষ্টম শতকে পূর্ব ভারতে বৌদ্ধধর্মের বিপুল জনপ্রিয়তাকে বৌদ্ধধর্মানুরাগী পালরাজ বংশের উত্থান ও প্রতিষ্ঠার অন্যতম উপাদান রূপেও গ্রহণ করা হয়। একই ভাবে দশম শতকে পাল রাজবংশের অবসানের ফলে বৌদ্ধধর্মের সামাজিক ভিত্তিও দুর্বল হয়। বৌদ্ধধর্মের শাখা হিসেবে হীনযান ও মহাযানবাদের উদ্ভব ঘটে ছিল খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে। গুপ্তযুগে মায়াবিদ্যা ও যৌন অতীন্দ্রিয়বাদের আদিম তত্ত্ব বৌদ্ধ দর্শনকে প্রভাবিত করেছিল। বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বদের পত্নী তারাগণের আরাধনা এই সময় জনপ্রিয় হয়েছিল। এখন আদি-মধ্যযুগের সূচনায় খ্রীষ্ট্রীয় অষ্টম শতকে মহাযানবাদের সাথে মোহিনী অতিন্দ্রীয়বাদের ধারণার সংযোগ ঘটলে বৌদ্ধধর্ম জটিলতর হয়ে ওঠে। এখন বৌদ্ধরা বিশ্বাস করেন যে মোহিনী শক্তি আয়ত্ত করে যোগাভ্যাস দ্বারা কাম্যবস্তু লাভ করা সম্ভব। এই শক্তিকে বলা হত 'বজ্র'। তাই বৌদ্ধধর্মের নতুন শাখা হিসেবে 'বজ্রযানের' আবির্ভাব হয়। বজ্রযানের আচারগত স্বাতন্ত্র্য থেকে 'সহজযান' ও 'কালচক্রযান'-এর উদ্ভব হয়। সেন রাজবংশের শাসনকালে বাংলায় ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরাভ্যুদয় ঘটে। ফলে ভারতে বৌদ্ধধর্মের শেষ আশ্রয় বিহার ও বাংলাদেশ থেকেও বৌদ্ধধর্মের অপসারণ ঘটে। দ্বাদশ শতকের পরবর্তীকালে শাক্ত ধর্মের সাথে বৌদ্ধ রহস্যবাদের মিশ্রণের ফলে নাথ, অবধূত, বাউল ইত্যাদি লোকায়ত ধর্মের মাঝে বৌদ্ধধর্ম কোনক্রমে বেঁচে থাকে।

আদি-মধ্যযুগে উত্তর ও পশ্চিম ভারতে জৈনধর্মও ক্রমিক-অবক্ষয়ের শিকার হয়েছিল। পশ্চিম ভারতে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে জৈনধর্ম তখনও টিকে ছিল। গুজরাটের চালুক্য বংশ জৈনধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই সময়ে রাজপুতানায় আবুপাহাড়ে দিলওয়ারা জৈনমন্দির নির্মিত হয়। প্রতিহার ও পরমার রাজারাও জৈনধর্মের অনুগামী ছিলেন। মালবে পরমার রাজাদের উদ্যোগে মহাবীর ও অন্যান্য জৈন তীর্থঙ্করদের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। নবম ও দশম শতকে জৈনধর্মের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। দক্ষিণের একাধিক রাজবংশ জৈনধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। রাষ্ট্রকূট রাজা প্রথম অমোঘবর্ষ নৃপতুঙ্গ সম্ভবত জৈনধর্মের অনুরাগী ছিলেন। কর্ণাটকের গঙ্গ রাজারা জৈনধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তাঁদের উদ্যোগে দক্ষিণ ভারতের নানাস্থানে বহু জৈনমন্দির (বসদি) ও স্তম্ভ নির্মিত হয়। জৈনতীর্থ রূপে খ্যাত শ্রবণবেলগোলার বিশাল জৈন মূর্তিটি আদি-মধ্যযুগেই স্থাপিত হয়। জৈনধর্মের সর্বপ্রাণীবাদ, জিনের প্রতি অবিচল আনুগত্য সাধারণ মানুষের আবেগকে আপ্লুত করে। জৈনধর্মের চারটি দান—বিদ্যা, খাদ্য, আশ্রয় ও ঔষধ জৈনধর্মকে জনপ্রিয় করে তোলে। হরিভদ্র, বপ্পভট্টি, শোভন, ধনপাল প্রমুখ জৈন লেখক জৈনধর্মের কল্যাণকামী আদর্শাবলী প্রচার করেন। কিন্তু জৈনধর্মের

কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন এবং রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাব কালক্রমে জৈনধর্মের পরিধিও সংকুচিত করে দেয়।

বৈদিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের সূচনা ও প্রসারের পথিকৃৎ ছিল উত্তর ভারত। কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের দাপটে ব্রাহ্মণ্যধর্ম যখন শক্তিহীন হয়ে পড়ে, তখন নবম-দশম শতকে ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানে নেতৃত্ব দেয় দক্ষিণ ভারত। ***সতীশচন্দ্র*** লিখেছেন, 'উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে দু'টি ধারায় হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন ও প্রসার ঘটে। একদল বেদ ও বৈদিক পূজাপদ্ধতির উপর নতুন করে জোর দেন। অন্যদল উত্তর ভারতে তন্ত্রসাধনা ও দক্ষিণ ভারতে ভক্তিবাদের কথা বলেন ; প্রথম দলের আন্দোলন ছিল জ্ঞান-ভিত্তিক। হিন্দুধর্মের দর্শনতত্ত্ব বিশ্লেষণ ও প্রচার করে মানুষকে ধর্মমুখী করতে সচেষ্ট হন। শংকরাচার্য, রামানুজ প্রমুখ যুক্তি-তর্ক, টীকাভাষ্য রচনা ইত্যাদির মাধ্যমে ধর্মীয় ঐতিহ্যের পুনঃপ্রকাশ ঘটান। এঁদের আন্দোলন ছিল পুঁথিগত, দর্শনভিত্তিক ও জ্ঞাননির্ভর। অন্যদিকে ভক্তিবাদী সাধকেরা দর্শনতত্ত্বের জটিলতা বর্জন করে মানুষের হৃদয়ের সাথে ঈশ্বরের যোগসাধনের কথা প্রচার করেন।

দক্ষিণ ভারতে ভক্তি আন্দোলনের সূচনা করেন ***বৈষ্ণব আলবার*** (আড়বার) ও ***শৈব নায়নার*** সাধকরা। তাঁরা প্রচার করেন যে, ধর্ম নিছক আচারসর্বস্ব প্রাণহীন আনুষ্ঠানিক পূজার্চনা নয়। ধর্ম হল এক গভীর সুখানুভূতি, যে অনুভূতি ঈশ্বর ও ভক্তের মধ্যে প্রাণময় প্রেমের বন্ধন সৃষ্টি করে। আলবার ও নায়নার সাধকরা সহজ, সরল কথ্যভাষায় তাঁদের মত প্রচার করেন। তেলেগু ও তামিল ভাষায় তাঁরা ভক্তিগীত রচনা করেন এবং নানা স্থান পরিভ্রমণ করে প্রেম ও ভক্তির বাণী প্রচার করেন। তাঁরা জাতিভেদ মানতেন না। তাঁরা দৃঢ়তার সাথে প্রচার করেন যে, ঈশ্বর কোন বিশেষ জাতি বা বর্ণের নয় ; ঈশ্বর সকল মানুষের তাই জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষই আন্তরিক প্রেম ও ভক্তি দ্বারা ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করতে সক্ষম। অবশ্য ভক্তিবাদীরা সরাসরি জাতিভেদ প্রথার বিরোধিতা করেননি। ভক্তি সাধকদের মধ্যে ব্রাহ্মণরা যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন নিম্নবর্ণের মানুষেরাও। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের বহু অনুগামী ভক্তিবাদের আশ্রয় নেন। কোন ধর্মীয় সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন উপজাতিভুক্ত বহু মানুষও ভক্তিবাদের অনুগামীতে পরিণত হন। এঁরা ইতিপূর্বে পশু, প্রকৃতি ইত্যাদি উপজাতীয় দেবদেবীর পূজা করেন। এখন এই সকল দেবদেবী শিব ও বিষ্ণুর সঙ্গিনী রূপে গৃহীত হন। ভক্তিধর্মের সার্বজনীন আদর্শ বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের বিলুপ্তি ত্বরান্বিত করে।

ভক্তিবাদের পাশাপাশি দ্বাদশ শতকে দক্ষিণ ভারতে *'লিঙ্গায়েত আন্দোলন,'* জনপ্রিয়তা অর্জন করে। লিঙ্গায়েত আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন শ্রীবাসব ও তাঁর ভাগিনেয় চন্নবাসব। তাঁরা কর্ণাটকের কলচুরী রাজসভায় ছিলেন। জৈনদের সাথে মতবিরোধের পর তাঁরা এই নতুন মতবাদ প্রচার করেন। লিঙ্গায়েতেরা আদতে ছিলেন শিবের উপাসক এবং শিবের প্রতীক হিসেবে শিবলিঙ্গের উপাসনা করতেন। এঁরাও জাতিভেদ প্রথাকে অস্বীকার করেন। উপবাস, তীর্থযাত্রা, পশুবলি ইত্যাদি বর্জন করেন। সামাজিক সংস্কারের দিকেও তাঁরা নজর দেন। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ইত্যাদি প্রথার বিরোধিতা এবং বিধবা বিবাহের সমর্থনে লিঙ্গায়েতরা জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা চালান। ভক্তি আন্দোলনের মত ব্যাপকতা না-পেলেও লিঙ্গায়েত সম্প্রদায় মধ্যযুগের ধর্মসংস্কারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন বলে স্বীকার করা হয়।

আলবার (আড়বার) ও নায়নার সাধকদের প্রয়াসে শিব ও বিষ্ণুর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেলে প্রায় নিষ্প্রভ হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের সম্ভাবনা তৈরি হয়। ভক্তিবাদীদের সহজ-সরল ধর্মমতের জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে হিন্দু সংস্কারকদের মধ্যেও আলোড়ন সৃষ্টি হয়। হিন্দু ধর্মদর্শনের জটিলতত্ত্ব যে তার অ-জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ এই সত্য স্পষ্ট হয়। এই অবস্থায় শংকরাচার্য, রামানুজ, মাধ্ব প্রমুখ হিন্দু দর্শনের সকল অস্পষ্টতা দূর করে বৈদিক দর্শনকে নতুন ভাবে ব্যাখ্যা করেন। একদিকে আলবার ও নায়নার সাধকদের ভক্তিবাদ, অন্যদিকে বৈদিক দর্শনের সরল ব্যাখ্যা বৈদিক হিন্দুধর্মকে শক্তিশালী করে। আনুমানিক অষ্টম শতকের শেষে বা নবম শতকের গোড়ায় কেরলে শংকরাচার্যের জন্ম হয়। তাঁর জীবনী সম্পর্কে বহু লোককাহিনী প্রচলিত আছে। কথিত আছে, জৈনদের অত্যাচারে তিনি মাদুরাই থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। এরপর উত্তর ভারতে গিয়ে তিনি বিভিন্ন ধর্ম-পণ্ডিতকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করেন। সারা দেশে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। এরপর তিনি পুনরায় মাদুরাইতে ফিরে আসেন এবং সহজ-সরল ভাষায় বৈদিক দর্শন ব্যাখ্যা করেন। তিনি বৈদিক ধর্মতত্ত্বের অস্পষ্টতা ও অসংগতি দূর করে তার নতুন ও সর্বজনগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দেন। শংকরাচার্যের দর্শন *'অদ্বৈতবাদ'* বা দ্বিতীয় রহিত মতবাদ নামে পরিচিত। *শংকরাচার্যের মতে,* ঈশ্বর ও তাঁর সৃষ্ট জগত অভিন্ন। বাহ্যত যে পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তার মূলে আছে মানুষের অজ্ঞানতা। ব্রহ্ম (আত্মা অচৈতন্য) একমাত্র সত্য, জগৎ মিথ্যা। অজ্ঞানতাবশত জীব তার স্বরূপ বিস্মৃত হয়। জ্ঞানের উদয় হলে জীব ব্রহ্মের সাথে তার অভিন্নতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। তিনি বলেন, বেদই সত্য জ্ঞানের চরম উৎস। অদ্বৈতবাদের উৎস বেদান্ত বা উপনিষদ। অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে জৈন সাধুরা নিরন্তর প্রচার চালান। শংকরাচার্য ভারতের সর্বত্র পরিভ্রমণ করে অদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য, গীতাভাষ্য, বিবেক চূড়ামনি প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করে তিনি জীব ও আত্মার অভিন্নতার মৌলিকতত্ত্ব প্রচার করেন। দেশের চারপ্রান্তে চারটি মঠ প্রতিষ্ঠা করে তিনি অদ্বৈতবাদ প্রচারের দায়িত্ব দেন। এই মঠগুলি হল— উত্তরে হিমালয়ের কোলে যোশী মঠ, দক্ষিণে শৃঙ্গেরী মঠ, পূর্বে নীলাচলে জ্যোতি মঠ এবং পশ্চিমে দ্বারকায় সারদা মঠ। এই মঠগুলি বৈদিক হিন্দুধর্ম প্রচারের কাজে রত আছে। শংকরাচার্য প্রধানত জ্ঞান যোগের গুরুত্ব দেন। জ্ঞানার্জনকে ঈশ্বর লাভের পথ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু জ্ঞানযোগের গভীর তত্ত্ব সাধারণ মানুষকে তেমনভাবে আকৃষ্ট করতে ব্যর্থ হয়। অতঃপর রামানুজ ভক্তিবাদের সাথে হিন্দু দর্শনের যোগসাধন ঘটান। তিনি দর্শনতত্ত্বে জ্ঞানের পরিবর্তে অন্তরের ভক্তিকেই ঈশ্বরলাভের উপায় হিসেবে তুলে ধরেন।

আলবার সম্প্রদায় প্রচারিত ভক্তিবাদকে অবলম্বন করে তামিল দেশে বৈষ্ণবধর্ম জনপ্রিয় হয়েছিল। নাথমুনি ও রঙ্গনাথাচার্য শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রবক্তা ছিলেন। নাথ মুনির পৌত্র যামুনাচার্য শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর রচিত 'সিদ্ধিত্রয়, 'আগম প্রামাণ্য, 'গীতার্থ সংগ্রহ', 'মহাপুরুষ নির্ণয় ও স্তোত্ররত্ন' গ্রন্থে শ্রীবৈষ্ণব ধর্মের দর্শন আলোচিত হয়। দ্বাদশ শতকে রামানুজ (১০১৬ - ১১৩৭ খ্রীঃ) 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' প্রচার করেন। তিনি 'গীতাভাষ্য', 'বেদান্তসার', 'বেদান্তসংগ্রহ' ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেন। এই মত অনুসারে চিৎ ও অচিৎ সর্ববস্তুর উৎস হলেন ব্রহ্ম। ব্রহ্ম সর্বভূতে বিরাজমান। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তবে ব্রহ্মের তিনপ্রকার রূপভেদ আছে—ভোক্তা, ভোগ্য ও প্রেরিতা। এই তিন নিত্য সত্তা হল 'চিৎ'

(জীবাত্মা), 'অচিৎ' (জড়জগৎ) ও 'ঈশ্বর'। দ্বাদশ শতকে অন্ধ্রপ্রদেশের তেলেগু ব্রাহ্মণ নিম্বার্ক *'সনকাদি সম্প্রদায়'* প্রতিষ্ঠা করেন। এই সম্প্রদায়ের দর্শনতত্ত্ব 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদ' নামে পরিচিত। এই মতানুসারে ঈশ্বর, জীব ও জড় জগৎ একই সময়ে পরস্পর থেকে অভিন্ন ও ভিন্ন। শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা বিষ্ণু এবং সনকাদি সম্প্রদায়ের প্রধান দেবতা হলেন গোপী-জন বল্লভ গোপালকৃষ্ণ। আদি-মধ্যযুগের শেষের দিকে মাধ্ব দক্ষিণ ভারতে 'ব্রহ্ম সম্প্রদায়' প্রতিষ্ঠা করেন। এঁরা দ্বৈতবাদে বিশ্বাসী। এঁদের মতে জীবাত্মা ও জড়জগৎ নিজে থেকে কিছু ঘটাতে পারে না। তাই এরা পরতন্ত্রী' এই শক্তি আছে একমাত্র ব্রহ্মের। তাই তিনি 'স্বতন্ত্র'। মাধ্বপন্থীদের উপাস্য দেবতা বিষ্ণু ও তাঁর শক্তি লক্ষ্মী।

আদি-মধ্যযুগের বহু আঞ্চলিক ভারতীয় শাসক **শৈবধর্মের** পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বাংলার সেনবংশীয় লক্ষ্মণ সেন, গাহড় বাল রাজা গোবিন্দচন্দ্র, চালুক্যরাজ মূলরাজ প্রমুখ শৈব ছিলেন। বৈষ্ণব ধর্মের মত শৈব ধর্মও একেশ্বরবাদী। উভয় ধর্মই ভক্তিবাদী। আদি-মধ্যযুগে উভয় ধর্মের ক্ষেত্রেই বেদান্তের 'দ্বৈত' ও 'অদ্বৈত' বাদী দর্শন গুরুত্ব পেয়েছিল। হরপ্পা সংস্কৃতির আমল থেকেই বহু ও বিচিত্র ধারার সমন্বয়ে শৈবধর্ম আদি-মধ্যযুগ ও মধ্যযুগে রূপ পরিগ্রহ করেছে। মহাভারতের ভাষ্য অনুযায়ী উমাপতি শিব শ্রীকণ্ঠ পাশুপত ধর্মের প্রবর্তক। ষষ্ঠ শতকের বহু রাজা ও রাজবংশ যেমন যশোবর্মন, মিহিরকুল, বকাটক বংশ, বলভীর মৈত্রকবংশ, গুপ্তরাজা দেবগুপ্ত, বিষ্ণুগুপ্ত প্রমুখ পাশুপত ধর্মের উপাসক ছিলেন। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে উত্তর ভারত, পশ্চিম ভারত ও পূর্ব ভারতের উড়িষ্যায় পাশুপত ধর্মের যথেষ্ট জনপ্রিয়তা ছিল। হিউয়েন সাং-এর বিবরণ এই বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করে। ৯৪৩ ও ১১০৩ খ্রীষ্টাব্দের দু'টি লেখ থেকে কর্ণাটকে পাশুপত ধর্মের জনপ্রিয়তার কথা জানা যায়। সপ্তম শতকে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর একটি তাম্রশাসন থেকে নাসিক অঞ্চলে কালামুখাদি সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। পাঞ্জাবের কাংড়া জেলার সমকালীন যার একটি লেখ থেকে জানা যায় যে নির্মন্ধ নামক স্থানে কপালেশ্বর শিবের একটি মন্দির ছিল এবং সেখানে অথর্ববেদী শৈব ব্রাহ্মণরা বসবাস করতেন। ***অধ্যাপক নীলকণ্ঠ শাস্ত্রীর*** মতে, খ্রীষ্টীয় নবম, দশম ও একাদশ শতকে দক্ষিণ ভারতের বহু স্থানে 'কালামুখ সম্প্রদায়ের' বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। দশম-একাদশ শতকে মধ্য ভারতের ত্রিপুরী এলাকায় *'মত্তময়ূর'* নামক একটি শৈব সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল। মহাভারতে উল্লিখিত 'মত্তময়ূর' নামক উপজাতির নামানুসারে এই সম্প্রদায়ের নামকরণ হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। এই সম্প্রদায়ের ঈশান শিব বিরচিত (একাদশ শতক) 'ঈশান শিব গুরুদেব পদ্ধতি' গ্রন্থ থেকে মত্তময়ূর সম্প্রদায়ের দর্শনতত্ত্ব জানা যায়। সম্ভবত, এঁরা যোগ সাধনায় বিশ্বাসী ছিলেন। ***ড. নরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্যের*** মতে, এঁরা নানারকম জনসেবামূলক কাজকে ধর্মের অংশ হিসেবে বিবেচনা করতেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আদি-মধ্যযুগে দক্ষিণ ভারতে শৈব-নায়নার সাধকদের আবির্ভাব ঘটেছিল। তিরুমূল, অম্পর, সম্বন্দর, মানিক্যবাচক (৬৬০-৬৯২), সুন্দরর (৭১০-৭৩৫) প্রমুখ সাধককবি এই ভক্তিবাদকে জনমুখী করে তোলেন। এই নায়নার সাধকদের রচনাবলীর উপর ভিত্তি করে দক্ষিণ ভারতে *'শৈব সিদ্ধান্ত'* নামে আর একটি মতবাদ গড়ে ওঠে। মেকেণ্ডদেব, অরুনন্দি উমাপতি প্রমুখ ছিলেন এই মতের প্রধান প্রবক্তা। অরুনন্দি রচিত 'শিবজ্ঞান সিদ্ধিয়ার'

এবং উমাপতির 'শিবপ্রকাশম্' গ্রন্থে এই নতুন মতবাদের তাত্ত্বিক দিকটি আলোচিত হয়েছে। এই মতে, ঈশ্বর স্বয়ং শিব যিনি স্বেচ্ছায় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করেন। তিনি সকল পরিণামের উৎস, কিন্তু তিনি নিজে পরিণামের অধীন নন। জগৎ সৃষ্টির প্রধান উপকরণ হল 'মায়া'। শিব তাঁর চিৎ শক্তির মাধ্যমে মায়ার উপর ক্রিয়া করেন। ধর্মাচরণের দিক থেকে শৈব সিদ্ধান্তিকরা ভক্তিবাদী। তাঁদের মতে, চর্যা, ক্রিয়া, যোগ ও জ্ঞানের দ্বারা আত্মার মুক্তি হয়। এই চারটি মার্গ অতিক্রম করলে 'শিবত্ব' উপলব্ধি হয়। এই শিবত্বই হল 'মুক্তি' বা 'মোক্ষ'। মুক্তি অর্জনের চারটি স্তর হল— 'সালোক্য', 'সামীপ্য', 'সারূপ্য, এবং 'সাযুজ্য'।

একাদশ-দ্বাদশ শতক থেকে দক্ষিণ ভারতে *'আগমান্ত শৈবধর্ম'* নামে আর একটি মতবাদের উদ্ভব ঘটে। চোল রাজারা আগমান্ত শৈবদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই মতের সাধকরা 'তন্ত্র'দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। এঁরা জাতিপ্রথার বিরোধিতা করেন। গুরুকরণ ও দীক্ষা এঁদের ধর্মাচারের আবশ্যিক কর্ম বিবেচিত হত। এঁরাও 'পতি' (শিব) 'পশু' (জীব), ও 'পাশ' (বন্ধন)-এই ত্রিতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। নবম শতকে কাশ্মীরে শৈববাদের উদ্ভব হয়। 'শিবসূত্র' গ্রন্থের প্রণেতা বসুগুপ্ত কাশ্মীর শৈববাদের প্রবক্তা ছিলেন। ত্রিতত্ত্বের দিকে ঝোঁক আছে বলে এটি 'ত্রিক' নামে অভিহিত হয়। এই ত্রিতত্ত্ব হল পতি (শিব), পাশ (শক্তি) ও পশু (অনু)। কাশ্মীর শৈববাদে শিব হলেন বিশুদ্ধ চৈতন্য, চরম অভিজ্ঞতা ও পরমেশ্বর। তিনি সকল জীবনের আত্মা-স্বরূপ, অপরিবর্তনীয় ও পূর্ণ। শিব তাঁর শক্তির মধ্য দিয়ে বিশ্ব জগতের প্রকাশ ঘটান। এই শক্তি পাঁচ প্রকার— চিৎ, আনন্দ, ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া।

আদি-মধ্যযুগে ভারতে ধর্ম চিন্তার দুটি বিশিষ্ট দিক ছিল ***শাক্ত ধর্ম*** ও ***তন্ত্রবাদের*** প্রসার। বস্তুত, সুপ্রাচীনকাল থেকেই ভারতে এই দুটি ধারার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। শাক্তধর্মের উৎস আদিম যুগে মাতৃকাদেবীর পূজা ও আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে পাওয়া যায়। ***ড. নরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য*** লিখেছেন যে, শাক্তধর্ম ও তন্ত্রকে অভিন্ন ভাবা সঠিক নয়। অবশ্য তন্ত্র অতি প্রাচীন হলেও অধিকাংশ তান্ত্রিক গ্রন্থ মধ্যযুগে রচিত হয়েছে।[1] শাক্তধর্মে সর্বোচ্চ দেবতা একজন নারী। তিনি নানা নামে ও নানা রূপে কল্পিত হন: প্রাচীন যুগে কাত্যায়নী, কন্যাকুমারী শক্তির আধার রূপে বন্দিত হতেন। তেমনি গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর ভারতে দুর্গা, উমা, গৌরী, কালী শাক্ত দেবীরূপে প্রচার পেয়েছেন। উড়িষ্যার জগন্নাথ উপাসনায় 'সুভদ্রা', বৈদান্তিক বৈষ্ণবদের বিচারে 'বৈষ্ণবী বা লক্ষ্মী,' নিম্বার্ক, শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায়ের কাছে 'রাধা' এই শক্তির প্রতীক হিসেবে পূজিতা হন। ঈশ্বর ও শাক্তধর্মের মূলতত্ত্ব একই। প্রভেদ একটিই। শৈবধর্মে পুরুষ প্রাধান্য এবং শাক্তধর্মে প্রকৃতির প্রাধান্য। বীর শৈবধর্মে শক্তির প্রাধান্য এত বেশি যে দার্শনিকরা এটিকে 'শক্তি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' বলে বর্ণনা করেন।

রোমিলা থাপারের মতে,[2] তন্ত্রবাদের জন্ম ষষ্ঠ শতকে, তবে তান্ত্রিক পদ্ধতির প্রচলন শুরু হয় অষ্টম শতকে। অনেকের মতে, তন্ত্রবাদ হল বৈদিক মতবাদের সরল সংস্করণ। উত্তর-পূর্ব ভারতে তন্ত্রবাদের প্রভাব বেশি লক্ষ্য করা যায়। তীব্বতীয় পূজা-পদ্ধতি ভারতীয় তন্ত্রবাদকে অনেকটাই প্রভাবিত করেছে। তান্ত্রিক পূজা-পদ্ধতির বিশেষ অঙ্গ হল উপাসনা, রহস্যময় মন্ত্র,

যাদুকরী প্রতীক, এবং কোন বিশেষ দেবতার আরাধনা। সকল বর্ণের মানুষ এবং নারী তন্ত্রবাদের চর্চা করার অধিকারী। তান্ত্রিক সাধনার তিনটি ধারা হল— পশু, বীর ও দিব্য। পশু হল সেই সকল জীবাত্মা যারা ষড় রিপুর অধীন। নৈতিক প্রচেষ্টা দ্বারা পশুর 'বীর' ভাব অর্জিত হয়। আর দিব্য স্তরে জীব সকল কলুষতা মুক্ত হয়। পশুভাবের মানুষকে দিব্য ভাবে উন্নীত করাই তন্ত্রের লক্ষ্য। এজন্য সাতটি আচার অনুশীলন করতে হয়। এগুলি হ'ল— বৈষ্ণব, শৈব, দক্ষিণ, বাম, সিদ্ধান্ত ও কৌল। এগুলি শুচিতা, ভক্তি, জ্ঞান, উপলব্ধি ও মোক্ষের পর্যায়ে উন্নীত হতে সাহায্য করে। তন্ত্রে 'গুরু'র প্রয়োজন সর্বাধিক। গুরু শিষ্যকে তার 'কুল' অনুসারে সঠিক পথের নির্দেশ দেন। নারীও গুরু হতে পারেন। শিষ্যের যোগ্যতা ও মানসিকতা অনুসারে তার দীক্ষা হয়, যেমন— ক্রিয়াদীক্ষা, বোধদীক্ষা, তত্ত্বদীক্ষা, শক্তিদীক্ষা, নামদীক্ষা ইত্যাদি। তন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল 'মন্ত্র'। মন্ত্রশক্তি দু-প্রকার—'বাচক ও 'বাচ্য'। বাচক আসলে বাচ্যের স্বরূপ প্রকাশ করে। অর্থাৎ প্রথমটি জানার পদ্ধতি এবং দ্বিতীয়টি জানার বিষয়। তান্ত্রিক পূজা-পদ্ধতিতে দু-রকম রহস্যের অনুকরণ করা হয়— (১) পঞ্চ-ম-কার সাধনা বা 'পঞ্চতত্ত্ব' এবং (২) 'ষট্‌চক্রভেদ'। পঞ্চ 'ম' কার হল মুদ্রা, মৎস্য, মাংস, মদ্য ও মৈথুন। মুদ্রা ও মাংস যথাক্রমে শস্য ও প্রজননের প্রতীক। মাংস ও মদ্য সৃষ্টি উপাদান কারণের প্রতীক অর্থাৎ জীবনীশক্তি। ষট্ চক্রভেদ হল শক্তির নিজস্ব উৎসে প্রত্যাবর্তন। কায়-সাধনার দ্বারা কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করে নিম্নতর চক্রগুলির মধ্য দিয়ে 'সহস্রারে' অর্থাৎ শক্তির উৎসে তাকে পৌঁছে দেওয়া হয়। কেবল বামাচারী, সিদ্ধান্তচারী ও কৌলাচারীরা পঞ্চ'ম' কার সাধনার অধিকারী হন। ড. ***রোমিলা থাপারের*** মতে, *'তন্ত্রবাদের জন্ম হয়েছিল গোঁড়া হিন্দু পূজা-পদ্ধতি ও ব্রাহ্মণ শাসিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য।'* তাছাড়া তন্ত্রবাদে যাদুবিদ্যার প্রতি আগ্রহ থেকে নানা ধাতু ও রাসায়নিক বস্তু নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয় এবং তার ফলে কিছু কিছু আবিষ্কার সম্ভব হয়। তিনি মনে করেন যে, ত্রয়োদশ শতকে নিকৃষ্ট ধাতুকে সোনায় পরিণত করার যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছিল, তন্ত্রবাদ তা নিয়েও চর্চা করে।

○ পালযুগে বৌদ্ধধর্মের রূপান্তর ঃ সহজিয়া ধর্ম ঃ

ধর্ম বিষয়ে পাল রাজারা উদার মতবাদ পোষণ করতেন। ব্যক্তিগত ভাবে তাঁদের অনেকেই বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পাল শাসনকালে প্রায় দীর্ঘ চার শতক বাংলাদেশ বৌদ্ধধর্মের শেষ আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছিল। ইতিমধ্যে বৌদ্ধ ধর্মমত ও আচারের মধ্যে নানা পরিবর্তন ঘটেছিল। হিউয়েন সাং সপ্তম শতকে ভারতে যে বৌদ্ধধর্ম দেখেছিলেন, তা গৌতম বুদ্ধ, অশোক বা কনিষ্কের আমলের বৌদ্ধধর্ম থেকে স্বতন্ত্র। আবার পালযুগে বাংলায় যে বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত ছিল তার প্রকৃতি অশোক বা কনিষ্কের রাজ্যে প্রচলিত ধর্ম থেকেও আলাদা। গৌতমবুদ্ধের দেহাবসানের পর সর্বাস্তিবাদ, মাহাসংঘিকা, মহাযান-হীনযান ইত্যাদি নানা বিবর্তন বৌদ্ধধর্মকে গ্রাস করেছিল। কিন্তু পাল যুগের বৌদ্ধধর্ম মহাযানবাদ থেকেও স্বতন্ত্র ও জটিলতর রূপে প্রতিভাত ছিল। এই সময় মহাযানবাদের সাথে নতুন দার্শনিক তত্ত্বের অনুপ্রবেশের ফলে যে নতুন বৌদ্ধধর্ম সৃষ্টি হয় তা 'তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম' বা 'সহজিয়া ধর্ম' বলে অভিহিত হয়।

তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম বা সহজিয়া ধর্মের আচার্যরা সিদ্ধাই বা সিদ্ধাচার্য নামে খ্যাত। মোট

চুরাশিজন সিদ্ধাচার্য ছিলেন বলে মনে করা হয়। দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে এঁদের আবির্ভাব ঘটেছিল। এঁরা অপভ্রংশ বা দেশীয় ভাষায় গ্রন্থ রচনা করতেন। তিব্বতীয় বৌদ্ধ আচার্যগণ বাংলা ও বিহারের বৌদ্ধ পণ্ডিতদের সহায়তায় এই সকল গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় তর্জমা করেন। এগুলি তিব্বতীয় 'তেঙ্গুল' নামক গ্রন্থে সংকলিত আছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালে যে সকল 'বৌদ্ধ চর্যাগীতি'র সংকলন আবিষ্কার করেন, তা এই সকল সিদ্ধাচার্যের রচনা। পণ্ডিত শাস্ত্রী এগুলিকে 'চর্যাচর্য বিনিময়' নামে প্রকাশ করেন। মূল গ্রন্থগুলি প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এই সকল চর্যাপদ ও সিদ্ধাচার্য রচিত দোঁহা কোষ থেকে সহজ যান সম্পর্কে জানা যায় । বাংলায় সহজিয়া ধর্মের আদি কবি বড়ুচণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' থেকেও নানা তথ্য পাওয়া যায়। সরহ ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধাচার্যদের অন্যতম ছিলেন নাগার্জুন, তিল্লোপাদ, কাহ্নপাদ, নারোপাদ, অদ্বয়বজ্র প্রমুখ। সরহ'র প্রধান শিষ্য ছিলেন নাগার্জুন। ওড়িয়া 'মাদলাপঞ্জি' অনুসারে উড়িষ্যার জনৈক রাজা সরহকে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন। তিল্লোপাদ ও নারোপাদ যথাক্রমে পালরাজা মহীপাল ও নয়াপালের সমকালীন ছিলেন।

কালচক্রযান, সহজযান, বজ্রযান ইত্যাদি সহজিয়া ধর্ম বা রহস্যময় তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের নানা রূপ আছে। বজ্র যান একান্তভাবে রহস্যময় আচারের উপর বিশ্বাসী। বজ্রযানে সাধক সাংকেতিক মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে পূজা করেন। এর ফলে দেবদেবীগণ পূজাস্থলে উপস্থিত হন। তখন আর সাধকের মন্ত্রোচ্চারণ ক্ষমতা থাকে না। তখন শুধুমাত্র হাত ও আঙুলের নানা রকম মুদ্রা দ্বারা আরাধনা চলতে থাকে। কালচক্রযানে যোগ-সাধনা গুরুত্বপূর্ণ। এই সাধনায় উপযুক্ত তিথি, মুহূর্ত, নক্ষত্র ইত্যাদির উপর বেশি জোর দেওয়া হয়। তিব্বতী ঐতিহ্য অনুসারে কালচক্রযান ছিল বিদেশাগত। বজ্রযানের সূক্ষ্মতম স্তরটির নাম সহজযান। সহজযানে রহস্যময়তার বিষয়টি আরো বেশি জটিল ও ব্যাপক। সহজযানে দেব-দেবী বা পূজা-পাঠের কোন বিধান নেই। এই মতটি চরম গুরুবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং গোপন রহস্যে আবৃত। এই মতানুসারে ধর্মের গূঢ় রহস্য গুরুর মুখ থেকে শুনতে হয়, কেবল ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে ধর্মতত্ত্ব জানা যায় না। সহজিয়া মতানুসারে গুরু তাঁর শিষ্যের আধ্যাত্মিক শক্তির গুণাগুণ বিশ্লেষণ করে তার উপযোগী সাধনমার্গ নির্দিষ্ট করতে সক্ষম। এই আধ্যাত্মিক শক্তিকে বলা হয় 'কুল'। কুলের সংখ্যা পাঁচ—ডোম্বী, নটী, রজকী, চণ্ডালী ও ব্রাহ্মণী। যে পঞ্চমহাভূত দেহের প্রধান উপকরণ তার উপরে এই কুলবিভাগ গড়ে উঠেছে। গুরু সাধকের প্রজ্ঞা বা শক্তির স্বরূপ নির্ণয় করে সে কোন্ কুলের অন্তর্ভুক্ত তা স্থির করে দেন এবং সেই অনুসারে সাধন প্রক্রিয়া দ্বারা সাধকশক্তি বৃদ্ধির প্রয়াস নেন।

সহজযানীদের মূল লক্ষ্য ছিল মহাসুখ অর্জন করা। কঠোর যোগসাধনার দ্বারা এই মহাসুখ লাভ করা সম্ভব। মস্তিষ্কের উর্ধ্বতম স্তরে এই মহাসুখ স্থানের অবস্থান। শরীরের মধ্যে যে বত্রিশটি নাড়ী আছে, তাদের মধ্য দিয়ে শক্তিকে মহাসুখ স্থানে পৌঁছে দিতে হয়। এই বত্রিশ নাড়ী ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হয়। যেমন— ললনা, রসনা, প্রবনা, সামান্যা, সুমনা, কৃষ্ণা, অবধূতী ইত্যাদি। দেহের মধ্যে নাড়ীগুলির বিরাম বা স্থিতি ও সংযোগস্থল আছে। এগুলিকে পদ্ম ও চক্রের সাথে তুলনা করা হয়। শক্তি মহাসুখস্থানে পৌঁছানোর আগে এই সকল স্থান অতিক্রম করতে বাধ্য থাকে। শক্তি মহাসুখ স্থানে পৌঁছালে সাধনার সমাপ্তি ঘটে। সাধক লাভ

করে 'মহাসুখ' বা পরমানন্দ। তখন সাধকের কাছে বহির্জগত লুপ্ত হয়। আমিত্ব, বুদ্ধত্ব, জগৎসংসার সব একাকার হয়ে যায়। এই অদ্বৈত জ্ঞান ছাড়া সাধকের কাছে বিশ্ব সংসার শূন্যতা প্রাপ্ত হয়। সহজযান মতে, প্রত্যেকেই বুদ্ধত্বের অধিকারী এবং এই বুদ্ধত্বের অধিষ্ঠান দেহের অভ্যন্তরেই। তাই কায় সাধনাকেই তাঁরা মুক্তির একমাত্র পথ বলে মনে করতেন।

রহস্যময় সহজিয়া ধর্মে সমকালীন প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে এক পরোক্ষ বিদ্রোহ ধ্বনিত হয়। বৈদিক ধর্ম, পৌরাণিক হিন্দুধর্ম, জৈনধর্ম, এমনকি আদি বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি তীব্র শ্লেষ ও ব্যঙ্গোক্তি সহজিয়া গ্রন্থগুলিতে দেখা যায়। *সরহ* তাঁর দোঁহায় লিখেছেন, *"হোম করলে মুক্তি হোক বা না-হোক ; ধোঁয়ায় চক্ষুপীড়া অবশ্যই হয়।"* জৈন দিগম্বরদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'যাহারা তত্ত্ব জানে না, মলিন বেশ ধারণ করিয়া থাকে এবং শরীরকে কষ্ট দেয় ; নগ্ন হইয়া থাকে ও আপন কেশোৎপাদন করে। যদি নগ্ন হইলে মুক্তি হয়, তাহা হইলে শৃগাল কুকুরের মুক্তি আগে হইবে'। সহজযানীদের মতে, দীপে নৈবিদ্যে, মন্ত্রোচ্চারণ অথবা তীর্থ তপোবনে গিয়ে লাভ নাই।' সরহ বলেন যে, *"সহজযানীরা অচিন্ত্যযোগী, জীবন-মৃত্যু তাঁদের কাছে একই বস্তু। যাঁরা জন্ম-মরণে ভয় পান তাঁরাই রস-রসায়নের আকাঙ্ক্ষা করেন। এঁদের স্বর্গ লাভ হয়তো হয় ; কিন্তু মোক্ষ হয় না। তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত, 'সহজ পন্থা ছাড়া পন্থা নাই' সহজ পন্থা গুরুর মুখে শুনিতে হয়।"*

চরম গুরুবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত অথচ সূক্ষ্ম সাধনচিন্তার সমর্থক সহজিয়া মতের এই পরস্পর বিরুদ্ধ মানব প্রবৃত্তির সহাবস্থান কিছুটা বিস্ময়কর। *ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের* মতে, চরম গুরুবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং গোপন রহস্যে আবৃত্ত থাকার ফলে সহজিয়া ধর্ম ক্রমে আধ্যাত্মিক অধঃপতনের পথে অগ্রসর হয়। বৌদ্ধধর্মের স্বকীয় ও স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য পরিহার করার ফলে হিন্দুধর্মের কালজয়ী দর্শনের সাথে পাল্লা দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। গৌতমবুদ্ধ যে কঠিন পরিস্থিতিতে বস্তুবাদী চিন্তা বা মানুষের অনুভূতিকে সমন্বিত করে জটিল ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সামনে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিলেন, অষ্টম - দ্বাদশ শতকে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম তার স্বকীয়তা বর্জন করে হিন্দুধর্মের কাছেই আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

○ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ঃ

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক বা তার আগে থেকেই ভারতে বিজ্ঞান সাধনার উল্লেখ পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষ দিকে বিজ্ঞানের নানা শাখায় ভারতীয় জ্ঞানসাধক ও গবেষকদের অবদানের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। গুপ্ত রাজবংশের রাজত্বকাল ভারতে গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র ও ভেষজ বিজ্ঞানে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছিল বলে জানা যায়। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে গণিতবিদ্যা ও জোতির্বিদ্যার ব্যাপক চর্চা হয়। এই দুটি বিষয়ে বহু নতুন তথ্য ও তত্ত্ব আবিষ্কার করে আর্যভট্ট ও বরাহ মিহির সারা দেশে সাড়া ফেলে দেন। চিকিৎসা বিজ্ঞান ও ভেষজ শাস্ত্রে অবিস্মরণীয় অবদান রেখে যান *চরক* ও *শুশ্রুত*। প্রাচীন যুগে বিজ্ঞানচর্চার এই সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে পাথেয় করে আদি-মধ্যযুগের পণ্ডিতরা গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, ভেষজ শাস্ত্র, রসায়ন ইত্যাদি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হন।

গুপ্তযুগে গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের যে গভীর অনুশীলন শুরু হয়েছিল, আদি-মধ্যযুগে তা অব্যাহত ছিল। অষ্টম শতকের বিশিষ্ট গণিতকার ছিলেন শ্রীধর। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের নাম

'গণিতসার'। এই গ্রন্থে তিনি শূন্যের বহুমাত্রিক ব্যবহার ও তার গুরুত্ব বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানের নাম অনুসন্ধানের কাজে গণিতের প্রয়োগ সম্পর্কে তিনি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেন। নবম শতকে গণিতের উপর একটি মূল্যবান গ্রন্থ লেখেন ***মহাবীর***। এর নাম *'সার সংগ্রহ'*। এই গ্রন্থে তিনি দ্বিঘাত সমীকরণের ত্রিমুখী সমাধান, উপবৃত্ত, ভগ্নাংশ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। নবম শতকের আর একজন বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ হলেন ***মুঞ্জাল***। দ্বাদশ শতকে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'লঘুমানস' প্রকাশিত হয়। আরব পর্যটক অলবেরুণী তাঁর গ্রন্থে পণ্ডিত মুঞ্জালের প্রশংসা করেছেন। আয়ন-বিদ্যা, আয়ন গতিবেগ ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্তগুলি পরবর্তীকালের লেখকদের গবেষণায় বিশেষ সাহায্য করে। দ্বাদশ শতকের জ্যোতির্বিজ্ঞানী ***আচার্য ভাস্কর*** আয়ন-গতি আলোচনার সময় মুঞ্জালের অবদান স্বীকার করেছেন। দশম শতকে ***ভট্টোৎপল*** রচনা করেন *'গণিতস্কন্ধ'* নামক গ্রন্থ। তাঁর সমসাময়িক গণিতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন ***বিজয়নন্দী, কল্যাণবর্মন*** প্রমুখ। এঁরা যথাক্রমে 'করণ তিলক' ও 'সারাবলী' নামক গ্রন্থ রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। আদি-মধ্যযুগে গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার উপর মহামূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন আচার্য ভাস্কর (১১১৪ খ্রীঃ)। তাঁর গ্রন্থের নাম 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি'। দু'খণ্ডে রচিত এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে তিনি লীলাবতী ও বীজগণিত সম্পর্কে আলোচনা করেন। দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয়বস্তু হল জ্যোতির্বিদ্যা। এই গ্রন্থ দুটি গণিতশাস্ত্রের এক উল্লেখযোগ্য অবদানরূপে বিবেচিত হয়। ভাস্করাচার্যের আর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ হল *'করণকুতুহল'*।

নবম শতকের বিশিষ্ট জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন কনৌজের ***বলভদ্র***। জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর অবস্থান সম্পর্কে তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। পতঞ্জলীর যোগসূত্রের উপরেও তিনি টীকা লেখেন। সম্ভবত, দশম শতকে জ্যোতির্বিজ্ঞানী দ্বিতীয় আর্যভট্ট আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম *'আর্য-সিদ্ধান্ত'*।

একাদশ শতকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর 'রাজমৃগাঙ্ক' ও 'ভাস্বতী' নামক দুটি মূল্যবান গ্রন্থ রচিত হয়। এদের রচয়িতা ছিলেন যথাক্রমে ***ভোজদেব*** ও ***শতানন্দ***।

গুপ্তযুগে চিকিৎসাশাস্ত্রের উপর ব্যাপক গবেষণা হয়েছিল। ভেষজ ও শল্য চিকিৎসা সম্পর্কে রচিত হয়েছিল একাধিক মূল্যবান গ্রন্থ। আদি-মধ্যযুগের ভারতেও চিকিৎসাশাস্ত্র রচনার সেই ধারা অব্যাহত ছিল। নবম থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যবর্তীকালে ভারতে অনেকগুলি চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থ রচিত হয়। নবম শতকে ***মাধবকর*** রচনা করেন 'রোগ বিনিশ্চয়' গ্রন্থ। এটির জনপ্রিয় নাম ছিল *'মাধব-নিদান'*। এই গ্রন্থে মাধব একাধিক রোগের লক্ষণ এবং তাদের নিরাময়ের উপায় সম্পর্কে পরামর্শ দিয়েছেন। পরবর্তীকালে আবির্ভূত লেখক চক্রপাণিদত্ত তাঁর গ্রন্থে 'মাধব-নিদান' গ্রন্থের গুরুত্ব শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেছেন। নবম শতকের আর একজন ভেষজশাস্ত্রবিদ্ ছিলেন ***দুধবল***। তিনি অগ্নিবেশ রচিত 'চরক-সংহিতা' গ্রন্থের বিশ্লেষণ করেন। 'মাধব-নিদান' গ্রন্থকে অনুসরণ করে দশম শতকে রচিত হয় 'বৃন্দ-মাধব' বা 'সিদ্ধিযোগ' নামক গ্রন্থ। এর রচয়িতা ছিলেন সম্ভবত শ্রীবৃন্দ। ভেষজ থেকে ঔষধ প্রস্তুত-সংক্রান্ত একটি মূল্যবান গ্রন্থ আদি-মধ্যযুগের গোড়ার দিকে রচিত হয়। অমরকোষ গ্রন্থেও এই বইটির নাম পাওয়া যায়। সম্ভবত, অষ্টম শতকে বইটির পরিবর্তিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। এই বইটির নাম 'নিঘন্টু' এবং লেখকের নাম ***'ধন্বন্তরি'***। ঔষধ প্রস্তুতের উপাদানরূপে পারদের ব্যবহার সম্পর্কে একটি মূল্যবান গ্রন্থ লেখেন

নাগার্জুন। এই গ্রন্থের নাম *'রস রত্নাকর'*। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মতে, এই গ্রন্থের রচনাকাল অষ্টম বা নবম শতক। কিন্তু উইন্টার নিজে মনে করেন এটি দশম শতকের আগে রচিত হয়নি।

একাদশ শতকের বিখ্যাত ভেষজশাস্ত্র রচয়িতা ছিলেন বাংলার *চক্রপাণিদত্ত*। বিভিন্ন রোগের উপসর্গ ও উপশম এবং ভেষজ দ্রব্যের রোগনিরাময় মূলক গুণাগুণ সম্পর্কে তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। চরক ও সুশ্রুতের ভেষজ-বিজ্ঞানের উপর তিনি যথাক্রমে 'আয়ুর্বেদ-দীপিকা' ও 'ভানুমতী' নামক দুটি টীকা লেখেন। *'চিকিৎসাসার সংগ্রহ'* নামক গ্রন্থে তিনি ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের ধারা বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করেন। চক্রপাণির *'শব্দচন্দ্রিকা'* গ্রন্থে বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ ও ধাতুজ দ্রব্যের গুণাগুণ আলোচিত হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের উপযুক্ত পথ্যের বিবরণ দিয়ে তিনি লিখেছেন *'দ্রব্যগুণ সংগ্রহ'* নামক একটি গ্রন্থ। ঔষধ প্রস্তুতের ক্ষেত্রে ধাতুর ব্যবহার সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দিয়েছিলেন বাগভট্ট ও মাধব। এখন চক্রপাণিদত্ত ঔষধে ধাতুর ব্যাপক প্রয়োগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে উন্নতমানের ঔষধ প্রস্তুতের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেন। পালরাজা ভীমপালের চিকিৎসক সুরেশ্বর (শূরপাল) চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিশেষ কৃতিত্ব দেখান। সুরেশ্বরের পিতা ও পিতমহ সুচিকিৎসক ছিলেন। সুরেশ্বর তাঁর 'শব্দপ্রদীপ' ও 'বৃক্ষায়ুর্বেদ' গ্রন্থ দুটিতে উদ্ভিদের গুণাগুণ সম্পর্কে আলোচনা করেন। এছাড়া 'লৌহপদ্ধতি' (বা 'লৌহ-সর্বস্ব') গ্রন্থে ঔষধ প্রস্তুতের উপাদান হিসেবে লৌহের প্রয়োগ ও উপকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করেন। একাদশ শতকের মধ্যভাগে বঙ্গসেন রচনা করেন 'চিকিৎসাসার সংগ্রহ'। এই গ্রন্থে তিনি মূলত সুশ্রুত ও মাধবকরের লেখাকে অনুসরণ করেছেন। দ্বাদশ শতকে *ভগভট্ট* রচনা করেন 'রসার্ণব' গ্রন্থ। ত্রয়োদশ শতকে রচিত হয় 'রসরত্ন সমুদ্বয়' নামক আরো একটি ধাতুর গুণ বিশ্লেষণ মূলক গ্রন্থ। এটির রচয়িতা সম্ভবত জনৈক অশ্বিনীকুমার বা নিত্যনাথ। ধাতুজ দ্রব্যের ব্যবহারে বার্ধক্যকে প্রতিরোধ করার বিষয়ে এতে আলোকপাত করা হয়েছে। ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে মিল্হণ লেখেন 'চিকিৎসামৃত' (১২২৪ খ্রীঃ) নামক গ্রন্থটি। একই সময়ে শারঙ্গধর লেখেন *'শারঙ্গধর সংহিতা'*। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু হল ঔষধ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে আফিং ও পারদের প্রয়োগ পদ্ধতি। আদি-মধ্যযুগে পশু-চিকিৎসা বিষয়ক একটি গ্রন্থ লেখেন ভোজ। এই গ্রন্থের নাম *'শলিহোত্র'*। এতে অশ্বের বিভিন্ন রোগের উপসর্গ ও তার নিরাময়ের জন্য ভেষজ প্রয়োগের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

চিকিৎসাবিদ্যায় রসায়নের গুরুত্ব অসীম। আয়ুর্বেদশাস্ত্রের ভেষজ রসের সাথে ধাতুর রাসায়নিক বিক্রিয়া দ্বারা রোগ প্রতিষেধক আবিষ্কারের দিকে আদি-মধ্যযুগের লেখকদের যে আন্তরিকতা ছিল তার নানা প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্ববর্তী আলোকপাতে আমরা দেখেছি যে নবম থেকে ত্রয়োদশ শতকে রচিত বিভিন্ন গ্রন্থে রস-রসায়ন সম্পর্কে নানা বিষয় আলোচিত হয়েছে। শারঙ্গধরের 'সংহিতা'য় শারীরবৃত্ত ও রসায়নের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে। পারদ, তামা, টিন, সিসা প্রভৃতি ধাতুর রাসায়নিক-যোগ এবং মানবদেহে তাদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেছেন। বাগভট্ট, বৃন্দ ও চক্রপাণিদত্তের রচনায় রাসায়নিক পদার্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। নাগার্জুনের *'রসরত্নাকর'* গ্রন্থে তামা, পিতল, ইত্যাদি ধাতু থেকে স্বর্ণ পরিণত করার প্রণালী আলোচিত হয়েছে। তিনি পেষণযন্ত্র, নালিকা, অধস্পাতন, পূর্বপাতন ইত্যাদি রাসায়নিক যন্ত্রপাতির কথাও উল্লেখ করেছেন।

পঞ্চম অধ্যায়

তুর্কী-আফগান যুগ (১২০০-১৫৫৬ খ্রীঃ)
[Turko-Afgan Period (1200-1556 A.D.]

ভারত-ইতিহাসের যুগবিভাগ সম্পর্কে মতভেদ আছে। হিন্দু যুগ, মুসলিম যুগ বা ব্রিটিশ যুগ ইত্যাদি জাতি-শাসনভিত্তিক বিভাজন অযৌক্তিক। কারণ শাসকের ভূমিকা ছাড়াও ভূখণ্ডের আর্থ-সামাজিক স্থিতি ও পরিবর্তন, ভূমি-পুত্রদের জীবনধারা ইত্যাদিও ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আবার প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগ ইত্যাদি বিভাজনেরও বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দেওয়া কঠিন। ভারতে মধ্যযুগের সূচনা ও শেষ সম্পর্কে ঐতিহাসিকেরা একমত হতে পারেন নি। ***অধ্যাপক আশরাফ***-এর মতে, *"ইউরোপীয় ইতিহাস থেকে ধার করা ধারণার ভিত্তিতে ভারতীয়-ইতিহাসের যুগনির্ণয় আদৌ সমীচীন নয়।"* ইউরোপে শিল্প-বিপ্লবের অভিঘাত যেভাবে সমগ্র সমাজব্যবস্থার মূলে নাড়া দিয়ে নতুন যুগের আগমন ঘটিয়েছিল, ভারতের ক্ষেত্রে তা ঘটে নি। ভারতে মুসলমানদের আগমন এবং প্রতিষ্ঠা সেই অর্থে ভারতীয় জীবনধারায় কোন বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটায় নি। এ দেশের সংস্কৃতির ধারা অনুসরণ করলে দেখা যায় যে, তথাকথিত তিনটি যুগের মধ্যে একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ও নির্ভরতা আছে। তবে নতুন যুগে পদার্পণ না-করলেও মুসলমান বা ইংরেজদের আগমনের ফলে সেই সামাজিক ক্রম-বিবর্তনের ধারায় একটা নতুন স্তরে উপনীত হওয়ার আভাস লক্ষ্য করা যায়। সেই বিচারে ভারতে তুর্কী ও আফগান শাসকদের আগমন একটা নতুনতর জীবন ও সংস্কৃতির আগমনকাল হিসেবে চিহ্নিত হয়। বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন ও স্থায়ী হিন্দু সমাজব্যবস্থা ইসলাম-সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার ফলে তার নিস্তরঙ্গ জীবনধারায় যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়, তা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী ফলে সমৃদ্ধ।

○ ইতিহাসচর্চা ও উপাদান ঃ

ইতিহাসের প্রধান ভিত্তি তার উপাদান। আধুনিক কালে শিক্ষা ও বিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতির ফলে ইতিহাসের উপাদানের কোন অভাব অনুভূত হয় না। কিন্তু প্রাচীন কালে যখন মানুষের সমাজ, সভ্যতা ও অর্থনীতি গঠনমূলক স্তরের প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল, তখন ইতিহাসের উপাদানের একান্ত অভাব ছিল। ভারতবর্ষের মত অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্ষেত্রে ইতিহাসচর্চাই তখন গুরুত্বহীন বলে বিবেচিত হত। প্রাচীন-সভ্যতার বিকাশভূমি ও সাহিত্যচর্চার প্রাচীনতম কেন্দ্র গ্রীসদেশের পণ্ডিতেরা ভারতীয়দের ইতিহাস-বিমুখতা দেখে একদা বিস্ময় প্রকাশ করেছেন প্রকাশ্যে। অবশ্য কালের গতিতে সেই অভাব ক্রমশ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়েছে। সাধরণভাবে মুসলমানদের অনুপ্রবেশের কাল থেকে ইংরেজদের ক্ষমতা-দখলের মধ্যবর্তী কালকে ভারত-ইতিহাসে *'মধ্যযুগ'* বলে চিহ্নিত করা হয়। এই পর্বে ভারত-ইতিহাসের বহু লিখিত উপাদান পাওয়া যায়। কারণ মুসলমান পণ্ডিতেরা যথেষ্ট ইতিহাস-সচেতন ছিলেন।

তাই আরবদের সিন্ধুদেশ আক্রমণের সময় থেকে পরবর্তীকালীন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে মুসলমান পণ্ডিতেরা নানাভাবে ইতিহাসমূলক উপাদানসমৃদ্ধ গ্রন্থ, কাব্য, সাহিত্য, রচনা করে সমকালীন ইতিহাস রচনার কাজকে কিছুটা মসৃণ করেছেন। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক **ডড্ওয়েল** (Dodwell) লিখেছেন ঃ *"The advent of Islam begins a great series of Indian chronicles....... The Muslim chronicles are far superior to our own (English) medieval chronicles —."*

মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাস বিদ্যায় আরবীয় ও পারসিক এই দুটি ইতিহাস রচনার ঐতিহ্যের প্রতিফলন দেখা যায়। এই দুটি ধারাকে ভিত্তি করেই মূলত মধ্যযুগের লেখকরা ইতিহাস রচনার করণকৌশল ও প্রেরণা গ্রহণ করেছেন। তুর্কো-আফগান যুগে ভারতের ইতিহাস চর্চার দর্শন ও নিয়মবিদ্যার উৎস ছিল আরবীয় ও পারসিক ধারা। তবে এই দুটি ধারার মধ্যে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীগত প্রভেদ লক্ষণীয়। আরবীয় ইতিহাস বিদ্যার লক্ষ্য ছিল প্রসারিত। এখানে রাজনৈতিক ঘটনাবলী ছাড়াও সমকালীন সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ইতিহাসের বিষয়বস্তু হিসেবে গুরুত্ব পেয়েছে। কিন্তু পারসিক ইতিহাস বিদ্যার পরিধি সংকীর্ণ। এখানে সামগ্রিকভাবে সমকালের বৈশিষ্ঠ্য গুরুত্ব পেত না। পারসিক লেখকরা প্রধানত শাসকশ্রেণীর কার্যকলাপের মধ্যেই ইতিহাসচর্চাকে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত বলে মনে করতেন। আরব ঐতিহাসিকেরা রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার বাইরে থেকে ইতিহাস চর্চার কাজে লিপ্ত থাকায় তাঁদের সঙ্গে নিরপেক্ষ ইতিহাস রচনার কাজ অনেকটাই সহজ ছিল। কিন্তু পারসিক ঐতিহাসিকেরা রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ধন্য হয়ে জীবনযাপন করায় রাজশক্তির স্তাবকতা করতে বাধ্য হতেন।

ভারতে তুর্কো-আফগান শাসনের প্রথম পর্বের ইতিহাসচর্চায় তুর্কো-আফগান সংস্কৃতির প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। এ যুগের ইতিহাসচর্চায় আরবীয় ইতিহাস চর্চার বৈশিষ্ট্য একান্তই অনুপস্থিত। কারণ এই পর্বের ইতিহাসকাররা বৃত্তিগত কারণে রাজপরিবার বা রাজকীয় দরবারের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। দশম শতকের পরবর্তীকালে পশ্চিম দিকে আনাতোলিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ভারত ভূখণ্ড পর্যন্ত তুর্কী অভিযান প্রসারিত হলেও ; আরবীয় সংস্কৃতির সাথে অপরিচয়ের ফলে ইতিহাসচর্চায় সংকীর্ণতা থেকে যায়। এ যুগে ভারতীয় ইতিহাস বিদ্যা ছিল মূলত ভারতের বাইরে বিকাশমান ঐশ্লামিক ইতিহাসচর্চার প্রতিস্ফুরণ। অধ্যাপক ***হার্ডি** (P. Hardy)* ভারতে ত্রয়োদশ শতক থেকে পঞ্চদশ শতকের মধ্যবর্তীকালীন ইতিহাসচর্চাকে *'মুসলিম ইতিহাস চর্চার ঔপনিবেশিক যুগ' (A colonial period in Indo-Muslim historiography')* বলে বর্ণনা করেছেন।

তুর্কো-আফগান যুগে ইন্দো-মুসলীম ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে ছিলেন সমাজের সর্বোচ্চতলার মানুষেরা। সুলতান, অভিজাত ও উচ্চ-প্রশাসক গোষ্ঠীর মহত্ব, কৃতিত্ব ও ক্ষমতার বিস্তার, শৌর্য-বীর্য ছিল ইতিহাসের মূল উপজীব্য। মুসলিম ইতিহাসচর্চার এই ধারা 'মনাফিব' বা 'ফজাইল' নামে পরিচিত। শিক্ষামূলক ইতিহাস বা সাহিত্যগুণ সমৃদ্ধ ইতিহাস রচনার দৃষ্টান্ত খুবই সীমিত। আমীর খসরু. জিয়াউদ্দিন বরণী, ইয়াহিয়া-বিন্-আহমেদ, সিরহিন্দী প্রমুখের রচনা, 'ফজাইল' রচনার শ্রেণীভুক্ত। এঁদের রচনা গদ্যে লিখিত রাজপ্রশস্তি মূলক। কিছুটা

ব্যতিক্রমী রচনা পাওয়া যায় ইসামীর ইতিহাসে। তুর্কো-আফগান যুগে ইতিহাসচর্চা প্রেরণাগত ও পদ্ধতিগত দিক থেকে ছিল ভারত-বহির্ভূত *(extra Indian)* একটি ধারণা। ভারতীয় ঐতিহ্যের সাথে তার কোন মিল ছিল না। প্রধান প্রধান পারসিক ইতিহাসকাররা পয়গম্বর, খলিফা, সুলতান ও উচ্চ-অভিজাতদের জীবন ধারা ও কর্মসূচীর মধ্যেই ইতিহাসকে আবদ্ধ করে রাখেন। ***এইচ. আর. গিব*** *(H.A.R. Gibb)* মনে করেন শিক্ষামূলক ও রচনাশৈলী বিশিষ্ট ভারতীয় ঐতিহ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ইতিহাস লেখা মুঘল আমলে শুরু হয়।

মধ্যযুগের শাসকরাও ইতিহাসভিত্তিক গ্রন্থরচনায় উৎসাহবোধ করতেন। সুলতানরা স্বয়ং বহু ইতিহাসমূলক গ্রন্থ রচনা করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অতীতকে সজীব করে রেখে গেছেন। এ ছাড়া, তাঁদের দরবারে ইতিহাস-লেখকদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেও তাঁরা বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। অবশ্য এই সকল দরবারী ইতিহাস-লেখকদের রচনা সম্পর্কে কিছুটা সতর্কতার প্রয়োজন আছে। কারণ সর্বশক্তিমান শাসকের পৃষ্ঠপোষকতাধন্য এই সকল ইতিহাসবিদ্‌দের রচনায় প্রভুর গুণকীর্তন বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। বহু ক্ষেত্রেই রাজকীর্তি সম্পর্কে অতিশয়োক্তি ঘটেছে। আবার বহু লেখক ধর্মীয়. চিন্তাভাবনা দ্বারা এতটাই আচ্ছন্ন ছিলেন যে, ইসলামবিরোধী কিংবা ইসলাম-স্বীকৃত নয় এমন সমস্ত কাজকেই তাঁরা বিরূপভাবে উপস্থিত করেছেন। এই কারণে ড. ***মহিবুল হাসান*** তাঁর *'Historians of Medieval India'* গ্রন্থে লিখেছেন যে, এই সকল ইতিহাসবিদ্‌দের মানসিক সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আধুনিক পাঠকদের সতর্ক থাকা খুব জরুরী।

মধ্যযুগের ইতিহাস-রচনার উপাদান হিসেবে অ-মুসলমান লেখকদের রচনাও বিশেষ মূল্যবান। সমসাময়িক শিখ, মারাঠা ও রাজপুত জাতিগোষ্ঠীর লোককথা থেকে তৎকালীন সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতির বহু তথ্য পাওয়া যায়। সর্বোপরি ছিল বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ। মধ্যযুগে ভারতে আগত এই সকল বহিরাগত পর্যটক ভারতে অবস্থানকালে তাঁদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যে সকল গ্রন্থ রচনা করেছেন, সেগুলি থেকে সমকালীন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলীর নানা তথ্য পাওয়া যায়।

মধ্যযুগের সূচনা থেকেই সরকারি দলিলপত্র সুরক্ষার দিকে নজর দেওয়া হয়। ইতিহাসের উপাদান হিসেবে সরকারি দলিল-দস্তাবেজ নিঃসন্দেহে খুবই নির্ভরযোগ্য উপাদান। তবে অনুন্নত সংরক্ষণ-ব্যবস্থার জন্য মধ্যযুগীয় সরকারি নথিপত্রের, বিশেষত সুলতানি আমলের, অধিকাংশই নষ্ট হয়ে গেছে। অবশ্য যেটুকু রক্ষিত হয়েছে, তার ইতিহাসগত মূল্য অপরিসীম।

সুলতানি-আমলের ইতিহাসের উপাদান হিসেবে, সম্ভবত সর্বাধিক সহায়ক তথ্য সরবরাহ করেছে সমকালীন ঐতিহাসিকদের রচনাবলী। সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বলা চলে, মূলত এগুলির উপর ভিত্তি করেই দাঁড়িয়ে আছে সুলতানি আমল সম্পর্কে পরবর্তী প্রজন্মের ধ্যান-ধারণা।

○ হাসান নিজামী ঃ মহম্মদ ঘুরীর একটি অভিযানের সঙ্গী হিসেবে হাসান নিজামী এদেশে আসেন এবং এখানেই স্থায়িভাবে বাস করেন। ***'তাজ-উল-মাসির'*** গ্রন্থে তিনি ১১৯২ থেকে ১২২৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালের ধারাবাহিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। কুতুবউদ্দিন আইবকের জীবনী ও কার্যাবলী এবং ইলতুৎমিসের আমলের প্রথম দিকের ঘটনাবলী

সম্পর্কে এই গ্রন্থটি বিশেষ উপযোগী। সুলতানি-আমলের প্রথম পর্বের নির্ভরযোগ্য উপাদান হিসেবে *'তাজ-উল-মাসির'* গ্রন্থের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তবে নিজামী এই ইতিবৃত্তে অকারণ ও অপ্রয়োজনীয় বহু ঘটনাবলী অলংকারবহুল বাক্যবিন্যাসের মাধ্যমে উপস্থিত করেছেন। ফলে এর ইতিহাসমূলক গুরুত্ব কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

O মিনহাজ-উস্-সিরাজ ঃ একই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ আর একটি গ্রন্থ হল ***মিনহাজ-উস-সিরাজের***[1] *'তবকত-ই-নাসিরি'* (১২৬০ খ্রীঃ)। সামগ্রিকভাবে মুসলমান-শক্তির প্রসার এবং নির্দিষ্টভাবে ১২৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সুলতানি শাসনাধীন ভারতবর্ষের ইতিহাসের আকর গ্রন্থ হিসেবে এটি স্বীকৃত। মিনহাজ সুলতান নাসিরউদ্দিনের সময় দিল্লীর প্রধান কাজী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। উচ্চপদস্থ রাজকর্মী হওয়ার ফলে সুলতানি-আমলের প্রশাসনিক ব্যবস্থার খুঁটিনাটি সম্পর্কে জানার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। এই গ্রন্থের ঘটনাবলী, সন ও তারিখ সঠিক বলেই অনুমান করা হয়। তবে বলবনের সিংহাসনারোহণ পর্যন্ত জীবিত থাকলেও তিনি এই গ্রন্থে নাসিরুউদ্দিনের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটনাবলী উল্লেখ করেছেন। ফলে ১২৬০ থেকে ১২৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইতিহাসের ধারা-সম্পর্কিত উপাদানের ঘাটতিলক্ষ্য করা যায়। বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মিনহাজ সুলতানি শাসনের প্রতি তাঁর দুর্বলতা গোপন করতে পারেন নি। মিনহাজউদ্দিনের লেখায় দরবারের রাজনীতি এবং আমীর-ওমরাহদের কাহিনী বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। তিনি তুর্কী-অভিজাতদের দ্বিধাহীন চিত্তে সমর্থন করেছেন। তুর্কীগোষ্ঠীর বিরোধী হিন্দুস্তানী ওমরাহ ইমাদ-উদ-দীন রাইহানের কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনা এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। মিনহাজউদ্দিনও ধর্মীয় ও নৈতিক বিধানের বাহক রূপেই ইতিহাসকে গ্রহণ করেন। দৈবশক্তির অনিবার্যতাকে ঘটনার নিয়ন্ত্রক বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। নীতিবাদ ও উপদেশাবলীর ভাণ্ডারে ইতিহাসকে পরিণত করায় তাঁর ইতিহাসও পারসিক ধারার আবর্তে ঘুরপাক খায়। আধুনিক ইতিহাসচর্চার মানবিকতাবাদ তাঁকে প্রভাবিত করতে পারেনি। মানুষ কেবল দৈব-ইচ্ছার ভিত্তিতেই কাজ করে। মানুষের কর্মধারা কোন স্বাধীন পরিবর্তনশীল চেতনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না—এই ধারণার ভিত্তিকেই তিনি ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করেন। ড. ***জগদীশ নারায়ণ সরকারের*** মতে, মিনহাজ-এর রচনা খুবই সংক্ষিপ্ত। কোন কোন আলোচনা এতটাই সংক্ষিপ্ত যে তার ব্যবহারিক মূল্য খুঁজে পাওয়া যায় না। ***পি. হার্ডির*** মতে, মিনহাজ এমন কিছু উপাদানের উল্লেখ করেছেন, যেগুলির অস্তিত্বই নেই। উপরন্তু তিনি উপাদানের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণের কোন চেষ্টা করেন নি। ***হার্ডি*** লিখেছেন, *"the 'Tabaquat-i-Nasiri' is literally composed to Strata upon Strata of frozen narratives"* 'বস্তুত মিনহাজ নীতিবোধকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইতিহাস লেখেন নি ; তাঁর লেখাকে অলংকৃত করার জন্যই নীতিবোধকে যুক্ত করেছেন। ঐতিহাসিক ***নিজামী*** *(K. A. Nizami)* মনে করেন, মিনহাজউদ্দিন ইতিহাসের কালানুক্রমের উপর অকারণ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এর পরিণামে তাঁর ইতিহাস একটি 'স্থূল, অনুজ্জ্বল ও নীরস' ঘটনায় পরিণত হয়েছে *(has made history a dull, dark and insipid affair')*।

তাঁর ইতিহাস থেকে সমকালের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার কোন ধারণা পাওয়া যায় না।

○ আমীর খসরু ঃ সুলতানি যুগের প্রখ্যাত লেখক ছিলেন আমীর খসরু। কার্যত তিনি ছিলেন একজন কবি। সভাকবি হিসেবে তিনি দিল্লীর দরবারে ১২৯০ থেকে আমৃত্যু (১৩২৫ খ্রীঃ) কর্মরত ছিলেন। অর্থাৎ সুলতান জালালউদ্দিন খলজী থেকে মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের আমল পর্যন্ত তিনি দরবারের ঘটনাবলীর সাথে জড়িত ছিলেন। ইতিহাসগত উপাদানে সমৃদ্ধ তাঁর গ্রন্থের নাম *'খাজাইনউল ফুতুহ'।* এটি মূলত আলাউদ্দিনের সভার বিবরণী। স্বভাবতই সুলতানের চারিত্রিক ত্রুটি বা দুর্বলতা সম্পর্কে তিনি নীরব থেকেছেন। আবার আলাউদ্দিনের সাফল্য সম্পর্কে নানা ক্ষেত্রেই উচ্ছ্বসিত হয়েছেন। তথাপি আলাউদ্দিনের রাজত্বের প্রথম ষোল বছর এবং মালিক কাফুর কর্তৃক দাক্ষিণাত্য বিজয়ের বিস্তারিত বিবরণ এই গ্রন্থ থেকে পাওয়া সম্ভব। এছাড়া খসরুর *'আশিকা'* বা *'মসনভী'* নামক কবিতাগুলিও ইতিহাসের উপাদান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। খসরুর *'তুঘলকনামা'* গ্রন্থে সুলতান গিয়াসউদ্দিনের সিংহাসন দখলের প্রেক্ষাপট ও রাজ্যাভিষেকের বিবরণ লিপিব্দ্ধ আছে। *'কিরণ-উস-সায়াদিন'* (১৮৮৯) গ্রন্থ থেকে বলবনের দ্বিতীয় পুত্র লখনৌতির শাসক বুগরা খাঁ'র সঙ্গে তাঁর পুত্র তথা দিল্লীর সুলতান কাইকোবাদের সম্পর্ক ও পারস্পরিক ভালবাসার টানাপোড়েনের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। ১২৯১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত *'সিকতা-উল-ফুতুহ'* গ্রন্থে খসরু সুলতান জালালউদ্দিন খলজীর যুদ্ধযাত্রার বিবরণ লিবিপদ্ধ করেছেন। *'আশিকা'* (১৩১৬)-র বিষয়বস্তু কিছুটা রোমান্টিক। এখানে গুজরাটের বন্দিনী রাজকন্যা দেবলাদেবীর সাথে শাহজাদা খিজির খাঁ'র প্রেম-কাহিনী, হিন্দুস্তানের রমণীদের সৌন্দর্য ও গুণাবলী ইত্যাদির বিবরণ স্থান পেয়েছে।

খসরু প্রথমে কবি, পরে ঐতিহাসিক। তাঁর রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য কাব্যমাধুর্য দ্বারা মানুষের হৃদয়কে শান্ত করা। এই কাব্যের বিষয়বস্তু হিসেবে ঐতিহাসিক ঘটনা স্থান পেয়েছে। তাই *পিটার হার্ডি* বলেছেন যে, খসরু ইতিহাস লেখনে নি ; কবিতা লিখেছেন *(Khasru did not write history, he wrote poetry)*। তাঁর যোগ ছিল সুলতানি দরবারের সাথে। তাই পৃষ্ঠপোষক শাসক অভিজাতদের সন্তোষ বিধানের জন্য তিনি যে কাব্যচর্চা করেছেন, সেখানে ঐতিহাসিকের নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ পাওয়া যায় না। তাঁর যোগছিল কেবল বর্তমানের সাথে। অতীতের ঘটনাবলীকে বর্তমানের কষ্টিপাথরে যাচাই করে ভবিষ্যতের রূপরেখা অঙ্কনের কোন চেষ্টা তিনি করেন নি। *কাউয়েল* (Cowell) লিখেছেন যে, আমীর খসরুর রচনা অলঙ্কার ও উপমা ভারাক্রান্ত। তাই ইতিহাসের স্বচ্ছন্দ্য গতি সেখানে ব্যহত হয়। তাছাড়া তাঁর বর্ণনায় অতিশয়োক্তি ও অতিরঞ্জনের বাহুল্য স্পষ্ট। সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও খসরুর রচনাবলীতে ইতিহাসের উপাদান হিসেবে গ্রহণ করা যায়; অতীতের বিবরণ যদি ইতিহাসের বিষয়বস্তু হয় ; তাহলে খসরুর রচনাকেও ইতিহাসের উপাদান হিসেবে মান্যতা দেওয়া যায়।

○ জিয়াউদ্দিন বরণী ঃ তুর্কো-আফগান যুগে ভারতের ইতিহাস রচনার অন্যতম প্রধান সূত্র ছিল *'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী'* (১৩৫৮ খ্রীঃ) নামক একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই গ্রন্থটির

রচয়িতা ছিলেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বরণী। তুর্কীস্তানের এক অভিজাত পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। তিনি তুঘলকবংশীয় সুলতান মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের আমলে উচ্চ রাজপদে আসীন ছিলেন। ফলে সমকালীন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন সম্বন্ধে তাঁর রচিত গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। তাঁর সৎ ও নির্ভীক ইতিহাস-চেতনা সম্বন্ধে ***সামসুল হকের*** বক্তব্যঃ *"Barani can Claim superiority to many a historian of the Middle Ages in having made the scope of his book wider and more comprehensive as well as in his fearlessness in the truth and condeming the action of great man when necessary."* সুলতানি প্রশাসনের উচ্চপদে আসীন থাকার সুবাদে বরণী সরকারি নথিপথের সাথে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাই তাঁর গ্রন্থে রাজস্ব-বিভাগের বিস্তৃত বিবরণ থেকে সরকারের রাজস্ব-নীতির লক্ষ্য সম্পর্কে নানা তথ্য পাওয়া যায়। তবে ব্যক্তিগতভাবে বরণী ছিলেন গোঁড়া মুসলমান। তাই সুলতানদের কার্যাবলী তিনি সংকীর্ণ ধর্মীয় চিন্তাভাবনা দ্বারা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। স্বভাবতই ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষতাবোধের অভাব তাঁর রচনাকে উপাদান হিসেবে কিছুটা দুর্বল করে রেখেছে। সম্ভবত এই কারণেই মহম্মদ-বিন-তুঘলকের কার্যাবলীর ভালো দিকগুলি তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। বরণীর লেখা আর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ হল ***'ফুতুহ্-ই-জাহান্দারী'।*** এই গ্রন্থে লেখক সুলতানদের শাসননীতির বিশ্লেষণ করেছেন। দাস বংশের শাসনব্যবস্থার সাথে তুঘলক বংশের আমল পর্যন্ত শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির গভীর বিশ্লেষণ এই গ্রন্থ থেকে পাওয়া যায়। কেবল রাজনৈতিক ঘটনাবলীর ধারাবাহিক বিবরণী নয় ; সুলতানি যুগের শাসনতান্ত্রিক আদর্শের বিশ্লেষণ হিসেবেও বরণীর এই গ্রন্থটি মূল্যবান। তবে নিজের পৃষ্ঠপোষকদের সৎ-সমালোচনা করতেও তাঁর দ্বিধা ছিল। এই কারণে পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক ***ফেরিস্তা*** বরণীর বিরূপ সমালোচনা করেছেন। ঐতিহাসিক ***হেনরী ইলিয়ট*** বরণীকে *'পক্ষপাতদুষ্ট ইতিহাসবিদ্'* বলে উল্লেখ করেছেন।

জিয়াউদ্দিন বরণী ছিলেন আদ্যোপান্ত একজন অভিজাত ব্যক্তি। তাঁর পরিবার তিন প্রজন্ম ধরে ইলবেরী তুর্কী, খলজী ও তুঘলকদের অধীনে কর্মরত ছিল। রাজপরিবারের সাথে ছিল তাঁদের আত্মিক যোগ। তাই লেখক হিসেবেও তিনি তাঁর শ্রেণীচরিত্রের বাইরে বেরিয়ে আসতে পারেন নি। সুলতানী রাজনীতির টানাপোড়েনও তাঁর রচনার উপর প্রভাব ফেলেছিল। মহম্মদ তুঘলকের সভাসদ ও 'নাদিম' হিসেবে তিনি প্রায় দুই দশক কর্মরত ছিলেন। সভাপণ্ডিত ও প্রাজ্ঞ মানুষ হিসেবে সুলতান তাঁর প্রশংসাও করতেন। বরণীর উত্থান, প্রতিষ্ঠা ও সুনামের মূল উৎস ছিলেন মহম্মদ তুঘলক। কিন্তু তথাপি বরণী মহম্মদের সার্বিক প্রশংসা করতে পারেন নি। এজন্য ঐতিহাসিকের নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গী দায়ী ছিল না ; এর কারণ ছিল মহম্মদ তুঘলকের ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী এবং ভণ্ড উলেমাদের প্রতি কঠোর আচরণ। বরণী সুলতানকে সৎ, নির্ভীক, পয়গম্বর সদৃশ যেমন বলেছেন, তেমনি অধার্মিক, হটকারী, নৃশংস বলতেও দ্বিধা করেন নি। এজন্য অনেকে বরণীর ভাগ্য বিপর্যয় ও তাঁর মননের উপর রাজনীতির প্রতিক্রিয়াকে দায়ী করেন। ফিরোজ তুঘলকের আমলে রাজনৈতিক টানাপোড়েনে তাঁর পদচ্যুতি ঘটে। সরকারীপদ, মর্যাদা, সম্পত্তি সবই তাঁর হস্তচ্যুত হয়। এজন্য তিনি মহম্মদ

তুঘলকের নিয়োগ নীতিকে দায়ী করেন। সরকারী উচ্চপদে নিম্নবর্ণের (লোধ্ধা, শেখ, বাবু, নাজরা, মান্‌কা) মানুষদের নিয়োগ করে মহম্মদ যে নতুন অভিজাতশ্রেণী গড়ে তোলেন, বারণী তাদেরকেই নিজ ভাগ্য বিপর্যয়ের জন্য দায়ী করেন।

সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বরণীর রচনার ইতিহাসমূল্য অসীম। ধর্মীয় আনুগত্য থাকলেও তিনি ধর্ম ও ঐতিহ্যকে অতিক্রম করে বাস্তব সত্যের অনুসন্ধান করতে প্রয়াসী হয়েছেন। ***মহম্মদ হাবিবের*** মতে, তিনি শুধু ঘটনার বিবরণের মধ্যে ইতিহাসকে সীমাবদ্ধ রাখেননি ; ইতিহাসকে তিনি সমাজের দর্পন রূপে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। ***নিজামীর*** মতে, গোঁড়া ও রক্ষণশীল হলেও বরণী স্বীকার করেছেন যে ভারতের রাজনীতিতে কঠোরভাবে শরিয়তী আইনের প্রয়োগ সম্ভব নয়। রাষ্ট্রের প্রয়োজনে সুলতানের অনুশাসন বা 'জাওবিৎ' জারীকে তিনি অনিবার্য বলেই মেনে নিয়েছেন। আসলে এক গভীর মানসিক দ্বিধা ও দোদুল্যমানতা তাঁকে আচ্ছন্ন করে রাখত। তাই তাঁর রচনায় বৈপরীত্য দেখা যায়।

O অন্যান্য গ্রন্থ ঃ সুলতানি যুগের আর একজন খ্যাতনামা ঐতিহাসিক হলেন ***মহম্মদ ইসামী।*** তাঁর ইতিহাসমূলক বিখ্যাত গ্রন্থের নাম ***'ফুতুহ্-উস-সালাতিন'।*** এই গ্রন্থে ইসামী সুলতান মামুদের আমল থেকে মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের আমল পর্যন্ত ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। একটি বিশেষ কারণে এই গ্রন্থটি গুরুত্বপূর্ণ। মিনহাজউদ্দিনের ***'তবকৎ-ই-নাসিরী'*** এবং বরণীর ***'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী'*** গ্রন্থ দুটির মধ্যে যোগসুত্র হিসেবে কাজ করেছে ইসামীর গ্রন্থটি। মিনহাজ নাসিরুদ্দিন মামুদের রাজত্বের প্রথম পর্ব পর্যন্ত আলোচনা করেছেন। বরণী তাঁর লেখা শুরু করেছেন বলবনের শাসনকাল থেকে। এর মধ্যবর্তী কয়েকটি বছর এঁরা কেউ উল্লেখ করেন নি। সেই ফাঁকাটি পূরণ করেছেন ইসামী। ইসামীর বিবরণ থেকে মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরের বিবরণ পাওয়া যায়। ইসামী তখন দিল্লীতেই স্থায়িভাবে বাস করছিলেন এবং সুলতানের নির্দেশে তাঁর বৃদ্ধ পিতামাতাকে দিল্লী নিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। এবং পথে তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল। এই কারণে খসরুর বিবরণে ব্যক্তিগত আক্রোশ কিছুটা প্রতিফলিত হয়েছে। তথাপি ইতিহাসের উপাদান হিসেবে এটি গুরুত্বপূর্ণ।

তুর্কো-আফগান সুলতানদের কেউ কেউ আত্মজীবনীমূলক সাহিত্য-রচনায় আগ্রহী ছিলেন। এঁদের রচনাও নির্বাচিতভাবে ইতিহাসের উপাদান হিসেবে উপযোগী। এ ধরনের একটি অতি বিখ্যাত গ্রন্থ হল সুলতান ফিরোজ শাহ্ তুঘলকের আত্মজীবনীমূলক রচনা ***'ফুতুহ্-ই-ফিরোজশাহী'।*** এছাড়া ফিরোজ তুঘলকের রাজত্বকালে ইতিহাসের উপাদান হিসেবে অতি গুরুত্বপূর্ণ দুটি গ্রন্থ হল ***শামস্-ই-সিরাজ আফিফ*** রচিত ***'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী'*** এবং অজ্ঞাতনামা সমকালীন জনৈক লেখকের ***'সিরাৎ-ই-ফিরোজশাহী'।*** সৈয়দ বংশের শাসনাধীন পর্বের ইতিহাসমূলক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হল *ইয়াহিয়া-বিন্-আহমদের* ***'তারিখ-ই-মুবারকশাহী'।*** ঘটনার উপস্থাপনা এবং সময়কাল নির্দেশের ক্ষেত্রে গ্রন্থটির সততা সর্বজনস্বীকৃত। *আব্বাস শেরওয়ানীর* ***'তারিখ-ই-শেরশাহী',*** *নিয়মাৎউল্লাহ্‌র* ***'মাখজান-ই-আফগান'*** (১৬৬২ খ্রীঃ)। আবদুল্লা রচিত ***'তারিখ-ই-দাউদি'*** (১৬২৭ খ্রীঃ) প্রভৃতি গ্রন্থ পরবর্তীকালে রচিত হলেও তুর্কো-আফগান শাসনের শেষ পর্ব বিশেষত লোদী বংশের রাজত্বকালের ইতিহাস-রচনার উপাদান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ।

○ বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ ঃ ভারত-ইতিহাসের উপাদান হিসেবে বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। সুপ্রাচীন কাল থেকে বহু জ্ঞানী-গুণী মানুষ ভারতভূমিতে উপস্থিত হয়েছেন এই সংস্কৃতির পীঠভূমির দুর্বার টানে। এঁদের অনেকেই অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন সৃষ্টির আনন্দে। ইতিহাসগত উপাদানে ভরপুর অতি নির্ভরযোগ্য একটি ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হল ইবন বতুতার *'কিতাব-ই-রেহালা'।* হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করে গজনী ও কাবুল হয়ে ইবন বতুতা ভারতে প্রবেশ করেন (১৩৩৩ খ্রীঃ)। তখন দিল্লীর সুলতান মহম্মদ-বিন্-তুঘলক। সুলতান তাঁকে দিল্লীর কাজী হিসেবে নিয়োগ করেন। প্রায় আট বছর তিনি এই পদে বহাল ছিলেন। ফলে প্রশাসনের খবরাখবর সরাসরি সংগ্রহ করা তাঁর পক্ষে সহজ হয়েছিল। সুলতানের সাথে সামরিক অভিযানেও ইবন বতুতা মাঝে মধ্যে অংশ নিতেন। ফলে যুদ্ধরত দেশগুলির শাসন-পদ্ধতি, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর জানার সুযোগ হয়েছিল। ব্যক্তিগতভাবে সুলতানের সাথে মেলামেশার ফলে মহম্মদ তুঘলকের চরিত্র ও কৃতিত্ব সম্পর্কে তিনি *'রেহলা'* গ্রন্থে যথেষ্ট আলোকপাত করতে পেরেছেন। ইবন বতুতা বাংলাদেশেও (বঙ্গ) এসেছিলেন। তাঁর বিবরণী থেকে বঙ্গদেশের আর্থিক সমৃদ্ধি ও জনগণের সুখী ও সচ্ছল জীবনধারার কথা জানা যায়। তখন বাংলায় অতি সস্তায় প্রচুর খাদ্যশস্য পাওয়া যেত। তবে তিনি বাংলার আবহাওয়ার সমালোচনা করেছেন। বাংলার অতিরিক্ত বর্ষণ ও স্যাঁতসেতে আবহাওয়া তাঁর পছন্দ হয় নি। একদিকে আর্থিক সচ্ছলতা, অন্যদিকে বসবাসের অযোগ্য পরিবেশ—এই কারণে তিনি বাংলাকে *'দোজখ-পুর-ই-নিয়ামত'* অর্থাৎ *'উত্তম জিনিসে পূর্ণ নরক'* বলে উল্লেখ করেছেন। ইবন বতুতা লিখেছেন যে, তাঁর বিবরণীতে এমন কিছু ঘটনার উল্লেখ আছে, যা সাধারণের দৃষ্টিতে অবিশ্বাস্য মনে হবে। কিন্তু তিনি দায়িত্ব নিয়ে বলেছেন যে, এই গ্রন্থের বিবরণী সম্পূর্ণ সত্য। এই দাবির যৌক্তিকতা পুরোপুরি অস্বীকার করা যায় না। কারণ তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা পর্যটক, ভারতীয় শাসকদের অনুগ্রহের প্রতি যেমন তাঁর লোভ ছিল না, তেমনি রাজনৈতিক নিগ্রহকেও তিনি ভয় করতেন না। অবশ্য ফার্সী বা হিন্দী ভাষায় তাঁর দখল ছিল না। স্বভাবতই অনেক ক্ষেত্রে তাঁকে মনগড়া কথা লিখতে হয়েছে। এটুকু সীমাবদ্ধতা ছাড়া *'রেহলা'* গ্রন্থের ইতিহাসগত মূল্য অপরিসীম।

ইতালীর পর্যটক মার্কোপোলো জলপথে চীন থেকে পারস্যে যাওয়ার সময় ভারতে আসেন। ত্রয়োদশ শতকের শেষদিকে তিনি দক্ষিণের করমণ্ডল উপকূলে অবতরণ করেন। দক্ষিণ ভারতের করমণ্ডল উপকূল, পাণ্ড রাজ্য এবং মালাবার, গুজরাট, সিংহল ইত্যাদি স্থান ঘুরে পারস্যের পথে এগিয়ে যান। জেনোয়ায় যুদ্ধবন্দী থাকাকালে তিনি এক সহচরের কাছে তাঁর ভ্রমন সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন। ***ইউল (Yule)*** মার্কোপোলোর বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন। এই বিবরণী থেকে সমসাময়িক দক্ষিণ-ভারতের নানা কথা জানা যায়।

দক্ষিণ-ভারতের হিন্দু রাজ্য বিজয়নগরের ইতিহাসের প্রধান উপাদানই হল বিদেশী পর্যটক ও দূতদের বিবরণ। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে একাধিক পর্যটক ও দূত এই রাজ্য আসেন ও অবস্থান করেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ইতালীয় পর্যটক নিকোলো কন্টি, পারসিক দূত রাজ্জাক (কামালউদ্দিন), পর্তুগীজ পর্যটক ডোমিনিগো পায়েজ, ফেরনাও

নুনিজ, বারবোসা, আলবুকার্ক প্রমুখ। রাজদরবার ও রাজার সাথে এঁদের অনেকেরই খানিকটা ঘনিষ্ঠতা ছিল। ফলে রাজনীতির উত্থান-পতন ও জনগণের আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে এঁদের পরিচয়ের সুযোগ এসেছিল। তাই দক্ষিণ-ভারতের রাজনীতি ও সমাজজীবন সম্পর্কে এঁদের বিবরণী প্রথম শ্রেণীর সূত্র সরবরাহ করে। খুরাসানের সুলতান শাহরুখ খানের দূত রূপে আব্দুর রেজ্জাক বিজয়নগরে আসেন এবং প্রায় দু' বছর (১৪৪২-'৪৩ খ্রীঃ) দাক্ষিণাত্যে অবস্থান করেন। মধ্য-এশিয়া সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থটি হল *'মাতলাউস-সাদাইন-ওয়া-মাজসুল-বাহরিন'* অর্থাৎ *'দুটি সৌভাগ্যের গ্রহের উত্থান এবং দুই সমুদ্রে মিলন'।* দুই খণ্ডে লিখিত এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে লেখক অন্যান্য বিষয়ের সাথে তৈমুর লঙ-এর ভারত আক্রমণের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে তৈমুরের বংশধরদের কীর্তি-কলাপের পাশাপাশি বিজয়নগর রাজ্যের রাজনৈতিক অবস্থা, রাজপরিবারের ব্যক্তিগত জীবনধারা এবং দক্ষিণ-ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বিজনয়গর রাজ্যের ইতিহাসচর্চার প্রাথমিক উপাদান হিসেবে স্বীকৃত। ভেনেসীয় (ইতালী) পর্যটক নিকোলো-ডি-কন্টি দেশভ্রমণের নেশায় বহু বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে ভারত, সিংহল, সুমাত্রা, চীন প্রভৃতি বহু রাজ্য পর্যটন করেন। তাঁর প্রাচ্য ভ্রমণের অভিজ্ঞতা পোপের সচিব পোজিও ব্রাসিওলিনি ল্যাটিন ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন। ১৪২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দক্ষিণ-ভারতের নানাস্থান পরিভ্রমণ করেন। এই বৃত্তান্ত থেকে বিজয়নগর রাজ-দরবার ও দক্ষিণ-ভারতের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি জানা যায়।

মূলত মুসলমান ঐতিহাসিক এবং বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ মধ্যযুগের নিরপেক্ষ ইতিহাস রচনায় উপাদান হিসেবে কতটা নির্ভরযোগ্য—এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। বিশেষ করে লেখকদের অধিকাংশই যখন একটা বিশেষ ধর্মের অনুসারী এবং দরবারের পৃষ্ঠপোষকতা ধন্য হয়ে জীবনযাপন করছিলেন, তখন এ সংশয় স্বাভাবিক। তাছাড়া লেখকদের ব্যক্তিগত ক্রোধ এবং ধর্মান্ধতা তাদের নিরপেক্ষতাকে অনেকক্ষেত্রেই সন্দেহপূর্ণ করে তুলেছে। এ প্রসঙ্গে *কে. এম. আশরাফ* লিখেছেন, *"মুসলিম ঐতিহাসিক বা সাহিত্যসেবীরা উদ্দেশ্যমূলকভাবে হিন্দু সমাজজীবনের বিকৃত ছবি উপস্থিত করেছেন এ ধারণা ভুল।... মুসলমানদের মধ্যে ঐতিহাসিক রচনার সুস্থ ক্রমবিকাশের এক সুদীর্ঘ ঐতিহ্য চলে আসছিল এবং গোঁড়া মতাবলম্বী ঐতিহাসিকদের রচনাতেও বুদ্ধিগত সততার দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে।"* তবে সমকালীন লেখকদের অন্য ধরনের কিছু ত্রূটি ছিল বলে তিনি মনে করেন। যেমন তাঁদের লেখনী প্রধানত রাজদরবার, অভিজাতবর্গ, শহর এবং ধর্মীয় বিষয়বস্তুতে সীমাবদ্ধ ছিল। 'মুসলিম-রচিত' ইতিহাসে সামাজিক বিষয় খুব কমই আলোচিত হয়েছে। সাধারণ হিন্দুসমাজ সম্পর্কে কিছু জানতে বা জানাতে তাঁদের বিশেষ আগ্রহ ছিল না। এমনকি নিম্নবর্গীয় মুসলমানদের জীবনধারা সম্পর্কেও তাঁরা উদাসীন ছিলেন। রাজপুত-সংস্কৃতির প্রকাশ-বিমুখতা এই সীমাবদ্ধতাকে আরো প্রকট করেছে। *ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারও 'Delhi Sultanate'* গ্রন্থে মুসলমান লেখকদের এই সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করেছেন। সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এগুলিই ছিল সমকালীন ইতিহাসের একমাত্র উপাদান।

○ প্রত্নতত্ত্ব ঃ ইতিহাসের উপাদান হিসেবে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের গুরুত্ব সম্পর্কে সন্দেহের

অবকাশ নেই। বিশেষ করে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস প্রধানত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের উপর ভিত্তি করেই দাঁড়িয়ে আছে। মধ্যযুগীয় ভারত-ইতিহাসের ক্ষেত্রেও এর গুরুত্ব কম নয়। তামা বা পাথরের উপর উৎকীর্ণ লিপি *(Epigraph)* এবং মুদ্রা *(coin)* সমকালীন শাসক বংশের ধারাবাহিকতা, রাজ্যের বিস্তৃতি, অর্থনৈতিক অবস্থা, বিশেষত বিভিন্ন রাজ্যের শাসনকালের সন, তারিখ জানার ক্ষেত্রে লিপি ও মুদ্রা বিশেষ উপযোগী। *Epigraphica Indo Moslemica, Epigraphica Indica* প্রভৃতি এ্যালবামে মধ্যযুগীয় বহু লিপি ও মুদ্রার ছবি সংকলিত আছে। এগুলি বিশ্লেষণ করে এবং জাদুঘরে রক্ষিত কিছু কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন দেখে পণ্ডিতেরা সমসাময়িক ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করতে পারেন। মুদ্রার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ্ *লেনপুল (Lanepool)* লিখেছেন ঃ *"As a rule we may look upon Muhammadan coins as the surest foundation for an exact history of the dynasties by which they were issued."* তিনি লিখেছেন, *"এই মুদ্রাগুলি থেকে নির্দিষ্ট কোন সুলতানের রাজত্বকাল সম্পর্কে যেমন জানা যায়, তেমনি তাঁর সিংহাসনে আরোহণের বছর, তাঁর রাজ্যসীমা, প্রতিবেশী রাজ্যের সাথে তাঁর সম্পর্ক, তাঁর ধর্মদর্শন ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।"*

প্রসঙ্গক্রমে সমকালীন শিল্প-স্থাপত্যের অবদানও উল্লেখের দাবি রাখে। সুলতানি আমলে বহু প্রাসাদ, মসজিদ, দুর্গ ইত্যাদি নির্মিত হয়েছিল। কালের গ্রাস উপেক্ষা করে তাদের অনেকগুলি আজও দাঁড়িয়ে আছে ঐতিহ্যের নির্বাক প্রতীক হিসেবে। সমকালীন সুলতানদের শিল্পভাবনা, শিল্পীদের দক্ষতা এবং সংস্কৃতির ধারা সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে এই সকল নিদর্শনের ইতিহাসগত গুরুত্ব অসীম।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রাজনৈতিক কাঠামো
[Political Structure]

○প্রথম পর্বের সুলতানগণ (দাসবংশ) ঃ

মহম্মদ ঘুরীর মৃত্যুকালে তাঁর অধিকৃত ভারতীয় ভূখণ্ডের শাসক ছিলেন তাঁর অন্যতম তুর্কী ক্রীতদাস *কুতুবউদ্দিন আইবক।* অপুত্রক মহম্মদ ঘুরীর মৃত্যু ঘটেছিল আকস্মিক। তাই মধ্য-এশিয়া বা ভারতে তাঁর অধিকৃত ভূখণ্ডের উত্তরাধিকারী মনোনয়নের সুযোগ তিনি পান নি। তবে তাঁর সংগৃহীত তুর্কী ক্রীতদাসদের উপরে যে তাঁর অগাধ আস্থা ছিল এবং তাদের যে তিনি পুত্রবৎ মনে করতেন, এ কথা মিন্‌হাজ-উস্‌-সিরাজের লেখা থেকে বোঝা যায়। তাঁর ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী সম্পর্কে এক সভাসদ প্রশ্ন করলে মহম্মদ ঘুরী নাকি বলেছিলেন ঃ *"অনেক রাজার এক বা দু'জন পুত্র থাকে। আমার রয়েছে কয়েক সহস্র পুত্রবৎ তুর্কী ক্রীতদাস, যারা আমার মৃত্যুর পরে আমার সাম্রাজ্য রক্ষা করবে এবং তাদের খুৎবায় আমার নাম স্মরণীয় করে রাখবে।"* যাই হোক, রাজনৈতিক ক্ষমতায় উত্তরণের প্রথম পর্বে মহম্মদ ঘুরী গুরুত্বপূর্ণ পদে তাঁর নিজের পরিবার-পরিজনদের কিংবা ঘুর অঞ্চলের বিশ্বস্ত উপজাতি সর্দারদের নিযুক্ত করতেন। কিন্তু এদের কর্মদক্ষতার উপর ক্রমে তিনি আস্থাহীন হয়ে পড়েন এবং তুর্কী ক্রীতদাসদের উপর নির্ভর করতে শুরু করেন। মহম্মদ ঘুরীর তুর্কী ক্রীতদাসদের মধ্যে কুতুবউদ্দিন আইবক, তাজউদ্দিন ইলদুজ, নাসিরউদ্দিন কুবাচা, ইখ্‌তিয়ারউদ্দিন প্রমুখ ছিলেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঘুরীর জীবিতকালেই এঁরা প্রত্যেকে নানাধরনের গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত হয়েছিলেন এবং প্রভুর প্রতি অনুগত থেকে প্রায় স্বাধীনভাবে কর্মসূচী গ্রহণের অধিকারী ছিলেন। মহম্মদ ঘুরীর আকস্মিক মৃত্যুর ফলে ইলদুজ যেমন গজনীর শাসক নিযুক্ত হন, তেমনি কুতুবউদ্দিন আইবক ঘুরীর ভারতীয় রাজ্যের সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন (১২০৬ খ্রীঃ)। গজনীর নবনিযুক্ত শাসক তথা মহম্মদ ঘুরীর ভ্রাতুষ্পুত্র গিয়াসউদ্দিন মহম্মদ এক সনদ দ্বারা ভারতীয় ভূখণ্ডে কুতুবউদ্দিনকে শাসক-পদে মনোনীত করেন।

সাধারণভাবে ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী সুলতানির শাসন শুরু হয়েছে এবং মুঘলদের আগমন পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল বলে মনে করা হয়। কারণ একমাত্র খিজির খাঁ ছাড়া সবাই 'সুলতান' উপাধি ধারণ করেছিলেন। 'সুলতান' বলতে সাধারণভাবে স্বাধীন নৃপতিকেই বোঝায়। আলোচ্যকালে খলিফার অস্তিত্ব থাকলেও, অন্তত ভারতীয় শাসকদের উপর তাঁর কার্যকরী কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। তাই এঁদের 'সুলতান' উপাধি গ্রহণ যথার্থ ছিল। অবশ্য 'সুলতান' উপাধি ধারণ করলেও খলিফার অনুমোদন- লাভের জন্য এঁদের কারো কারো চেষ্টা এবং সেই অনুমোদন

গ্রহণ করার ঘটনাটিকে জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতির একটা পরিবর্তন হিসেবেই ব্যাখ্যা করা যায়।

১২০৬ থেকে ১২৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লীতে যেসব বংশ রাজত্ব করত, তাদের পারসিক ইতিহাসবিদ্‌রা মুইজী, কুতবী, সামসী, বলবনী ইত্যাদি গোষ্ঠীভুক্ত বলে অভিহিত করেছেন। আধুনিক ইতিহাসবিদ্‌রা এদের পাঠান, দাস, আদি তুর্কী সুলতান, তুর্কী মামেলুক, ইলবেরী তুর্কী প্রভৃতি নামে অভিহিত করেছেন। অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে, এইসব শাসককে 'দাসবংশ' বলা অযৌক্তিক। কারণ জন্মসূত্রে এদের কেউই ক্রীতদাস ছিলেন না, এবং সিংহাসন আরোহণের মুহূর্তে একমাত্র কতুবউদ্দিন ছাড়া সবাই নিয়মানুগ ভাবে দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। এঁদের কেউই পাঠান ছিলেন না। তাই পাঠান-শাসন বলাও যুক্তিহীন। কেউ কেউ এঁদের *'মামেলুক সুলতান'* বলা বেশি যুক্তিসংগত বলে মনে করেন। আরবী শব্দ *'মামেলুক'* মানে 'স্বীয় অধিকারভুক্ত'। সাধারণ ক্রীতদাসদের থেকে সেনাবাহিনীর উচ্চপদে নিযুক্ত তুর্কী ক্রীতদাসদের বোঝাতে এই শব্দ ব্যবহৃত হত বলে অধ্যাপক ***সতীশচন্দ্র*** মনে করেন। অবশ্য নিজামী এই বিতর্কের পরিবর্তে এঁদের 'প্রথম পর্বের তুর্কী সুলতান' বলা শ্রেয় বলে মনে করেন।

○ কুতুবউদ্দিন আইবক (১২০৬-'১০ খ্রীঃ)

তুর্কীস্থানের এক 'আইবক' উপজাতি পরিবারে কুতুবউদ্দিনের জন্ম হয়। বাল্যকালেই তিনি নিশাপুরের কাজী ফক্‌রুদ্দিন আব্দুল আজিজ কুফী'র কাছে দাস হিসেবে বিক্রীত হন। ধর্মপ্রাণ ও জ্ঞানী আব্দুল আজিজ কুতুবউদ্দিনকে নানা শিক্ষায় পারদর্শী করে তোলেন। অশ্বারোহণ ও তীরন্দাজিতে তিনি বিশেষ পটুত্ব অর্জন করেন। কাজীর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্ররা কুতুবকে মহম্মদ ঘুরীর কাছে বিক্রি করে দেন। নিজের শৌর্য-বীর্য, নম্রতা, প্রভুভক্তি এবং সেবার দ্বারা কুতুব খুব সহজেই ঘুরীর মন জয় করে নেন এবং দ্রুত পদোন্নতির ফলে একসময় মহম্মদ ঘুরীর অন্যতম প্রধান ও বিশ্বস্ত সেনাপতিতে পরিণত হন। ঘুরীর ভারত অভিযানের সময় কুতুবউদ্দিন যে দক্ষতা প্রদর্শন করেছিলেন, তার বিনিময়ে ঘুরী তাঁকে ভারতীয় ভূখণ্ডের শাসক-পদে মনোনীত করেন। মহম্মদ ঘুরী যখন মধ্য-এশিয়ার রাজনীতিতে ব্যস্ত, তখন কুতুবউদ্দিন একান্ত অনুগত প্রতিনিধি হিসেবে ভারতে ঘুররাজ্য রক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গে তুর্কী অধিকারের সীমানাও বৃদ্ধি করে যান। আজমীর ও মীরাটের বিদ্রোহ তিনি কঠোর হাতে দমন করেন এবং মীরাট, হান্‌সী, দিল্লী, রনথম্বোর, কিউল প্রভৃতি অঞ্চলে তুর্কী অধিকার সম্প্রসারিত করেন। রাজা জয়চাঁদকে পরাজিত করে তিনি কনৌজ দখল করেন এবং চান্দেল্ল রাজা পরমার্দিদেবকে পরাজিত করে কালিঞ্জর, মাহোবা এবং খাজুরাহোর উপর তুর্কী-শাসন সম্প্রসারিত করেন। মহম্মদ ঘুরীর মৃত্যুর সময় দিল্লী থেকে কালিঞ্জর এবং গুজরাট ও লাহোর থেকে লক্ষ্মণাবতী পর্যন্ত ভূখণ্ডে তুর্কী-আধিপত্য কায়েম হয়ে যায়।

মহম্মদ ঘুরীর আকস্মিক মৃত্যু গজনীর রাজনৈতিক অস্থিরতার সাথে ভারতের ঘুররাজ্যকেও জড়িয়ে ফেলে। কুতুবউদ্দিন মুখোমুখি হন নানামুখী সমস্যার। কারণ কুতুবউদ্দিন এখানে নিজেকে শাসক হিসেবে ঘোষণা করলেও, তার কোন সরকারি অনুমোদন ছিল না। বিশেষত একজন ক্রীতদাস হিসেবে সিংহাসনে তাঁর অধিকারের বৈধতা ইসলামে স্বীকৃত ছিল না। পরন্তু

উচ্চাকাঙ্ক্ষী অন্যান্য তুর্কী ক্রীতদাসরা, যারা মহম্মদ ঘুরীর খুব বিশ্বস্ত ও স্নেহভাজন ছিলেন, তাঁরাও ভারত-ভূখণ্ডে কুতুবউদ্দিনের কর্তৃত্ব মেনে নিতে অস্বীকার করেন। এই ধরনের দু'জন বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তাঁর শ্বশুর তাজউদ্দিন ইলদুজ এবং উচের শাসনকর্তা নাসিরউদ্দিন কুবাচা। ইলদুজ ঘুরীর উত্তরাধিকারী গিয়াসুদ্দিন মামুদ কর্তৃক ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্তি এবং গজনী শাসনের স্বীকৃতি লাভ করার পরেই দিল্লীর উপর কর্তৃত্ব দাবি করেন। এই দাবি খুব একটা অযৌক্তিক ছিল না। কারণ দিল্লী গজনী রাজ্যের অংশ হিসেবেই অধিকৃত হয়েছিল। নাসিরউদ্দিন কুবাচাও দিল্লীর সিংহাসন দখলের জন্য লালায়িত ছিলেন। এদিকে খারিজমের শাহ আলাউদ্দিন মহম্মদও গজনী এবং দিল্লী অধিকারের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তা ছাড়া, তুর্কীদের ভারতীয় প্রতিপক্ষ রাজপুতগণও নতুন করে ঐক্যবদ্ধ হয়ে হৃত রাজ্যসমূহ পুনর্দখলের জন্য গোপন প্রস্তুতি শুরু করেছিলেন।

কুতুবউদ্দিন যথেষ্ট দক্ষতার সাথে এই সকল সমস্যার মুখোমুখি হন। তিনি দৃঢ়তার সাথে ইলদুজের দাবিকে অস্বীকার করেন এবং দিল্লী-দখলে অগ্রণী ইলদুজ-এর বাহিনীকে পাঞ্জাবে পরাজিত করে গজনী দখল করে নেন। ইলদুজ কুহিস্তানে পালিয়ে আত্মগোপন করেন। কিন্তু কুতুবউদ্দিনের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়ে গজনীর জনগণ ইলদুজকে ফিরে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানান। এমতাবস্থায় কুতুবউদ্দিন ভারতে ফিরে আসেন এবং সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে লাহোরে নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। তুর্কী অভিজাতদের সমর্থনলাভের জন্য তিনি বৈবাহিক সম্পর্কের জাল বিস্তার করেন। কুবাচার সাথে নিজ ভগ্নীর বিবাহ দেন এবং তাঁর জনৈক দক্ষ ক্রীতদাস ইলতুৎমিসের হাতে নিজকন্যাকে সমর্পণ করেন।

বাংলা-বিহারের অভ্যন্তরীণ সংকট কুতুবউদ্দিনকে সাময়িকভাবে বিব্রত করেছিল। বাংলা-বিহার-বিজেতা বখ্‌তিয়ার খলজীকে হত্যা করে আলিমর্দান সেখানকার ক্ষমতা দখল করেছিলেন। কিন্তু আলিমর্দানের আচরণে অসন্তুষ্ট খলজী মালিকরা মহম্মদ শিরানের নেতৃত্বে সংগঠিত হয়ে আলিমর্দানকে পদচ্যুত ও বন্দী করেন। আলিমর্দান কোনক্রমে মুক্ত হয়ে কুতুবউদ্দিনের সাহায্যপ্রার্থী হন। কুতুব আলিমর্দানের সাহায্যে অযোধ্যার শাসক কোয়াজ রুমি'কে অগ্রসর হবার নির্দেশ দেন। রুমি খান কূটকৌশল ও শক্তি প্রদর্শন করে খলজী মালিকদের বশীভূত করেন এবং আলিমর্দানকে বাংলার শাসন-কর্তৃত্বে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন।

কুতুবউদ্দিন মাত্র চার বছর শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দের পর অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করা ছাড়া নতুন রাজ্যদখলের কোন ইচ্ছা তাঁর ছিল না। কারণ নতুন রাজ্যদখলের পরিবর্তে দখলীকৃত রাজ্যে আইন ও প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করা তাঁর কাছে জরুরী মনে হয়েছিল। একাজে তাঁর সাফল্য নির্ভর করছিল তাঁর উপর তুর্কী অভিজাতদের আস্থা ও বিশ্বস্ততা স্থাপনের উপর। কিন্তু সেই কাজ সম্পন্ন করার আগেই চুঘান খেলার সময় ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে তিনি মৃত্যবরণ করেন (১২১০ খ্রীঃ)।

○ কৃতিত্বের মূল্যায়ন ঃ

১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে আমৃত্যু (১২১০ খ্রীঃ) ভারতীয় রাজনীতির অঙ্গনে কুতুবউদ্দিন আইবকের পদচারণা ঘটেছে। মহম্মদ ঘুরীর সহকর্মী হিসেবে

রণক্ষেত্রে তিনি যেমন দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন, তেমনি ঘুর-অধিকৃত ভারত-ভূখণ্ডের উপ-শাসক হিসেবেও যথেষ্ট কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। অর্থাৎ ভারতে তাঁর কর্মকাণ্ডের প্রথম পর্বে ১১৯২ থেকে ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে, তিনি একান্ত অনুগত শাসক এবং সমরকুশলী সৈনিক হিসেবে কৃতিত্বের দাবিদার। ১২০৬ থেকে ১২০৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে তিনি দিল্লীকে কেন্দ্র করে আধা-স্বাধীন শাসনের সূচনা করেন। অতঃপর গজনীর বৈধ-আধিকারিক কর্তৃক তিনি দাসত্বমুক্ত হন এবং এদেশে স্বাধীন শাসনের সূচনা করেন। এই তৃতীয় বা শেষ পর্বের বিস্তৃতি ১২০৮ থেকে ১২১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। প্রথম পর্বে তিনি ছিলেন দক্ষ যোদ্ধা, দ্বিতীয় পর্বে তিনি একজন কূটনীতিবিদ্ এবং শেষ পর্বে তিনি ছিলেন এক নতুন সাম্রাজ্যের সংগঠক।

কুতুবউদ্দিনের কৃতিত্ব প্রসঙ্গে অধিকাংশ ঐতিহাসিকেই একমত হয়ে তাঁকে ভারতে এক নতুন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে স্বীকার করেছেন। ড. ***শর্মা** (S. R. Sharma)* কুতুবউদ্দিনকে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের সাথে তুলনা করে বলেছেন ঃ *"Some of his successors might have added more glory to the empire as a whole, but the groundwork and examples were Aibak's"* ড. ***ঈশ্বরীপ্রসাদ*** তাঁকে 'ভারতবর্ষে মুসলিম বিজয়ের অন্যতম পথিকৃৎ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। বস্তুত সামান্য ক্রীতদাস রূপে জীবন শুরু করে কুতুবউদ্দিন নতুন ভারত-রাজ্যের অধীশ্বরের আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে অনন্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর কোন রাজতান্ত্রিক ঐতিহ্য ছিল না, দেশে-বিদেশে তাঁর শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভাবও ছিল না ; তথাপি তিনি বিচলিত না হয়ে ভারতীয় ভূখণ্ডে মহম্মদ ঘুরীর রাজ্যখণ্ডকে নিজ অধিকারে রাখতে এবং শেষ পর্যন্ত সেখানে স্বাধীনভাবে শাসনের বৈধ অধিকার অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ কৃতিত্ব কম নয়। কুতুবউদ্দিনের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাব ছিল না। তিনি গজনীর সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে মধ্য-এশিয়ার রাজনৈতিক উত্থান-পতনের স্রোত থেকে ভারতকে মুক্ত করতে সক্ষম হন। এর ফলে খারিজম শাহের শত্রুতা থেকে মুক্ত হয়ে তিনি ভারতবর্ষের রাজনীতিতে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করতে পারেন। অধ্যাপক ***সতীশচন্দ্রের*** মতে ঃ *"এ ব্যবস্থা ভারতের পক্ষে মঙ্গলজনক ছিল, কারণ এর ফলে ভারতকে মধ্য-এশিয়ার রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়তে হল না। তাছাড়া, এর দ্বারা বিদেশের উপর নির্ভর না-করে স্বাধীনভাবে দিল্লী-সুলতানির বিকাশের সুযোগ আসে।"* ভারতের তুর্কী অভিজাতদের আনুগত্যলাভের ক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট সংযম ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন। ইলদুজ এবং কুবাচারের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন এবং বিচক্ষণতার সাথে বাংলাদেশের বিদ্রোহী খলজীদের শান্ত করে আলিমর্দানকে ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার ঘটনা কুতুবউদ্দিনের রাজনৈতিক প্রজ্ঞার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

শাসক হিসেবে কুতুবউদ্দিন মৌলিকত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি। কোনরূপ শাসনতান্ত্রিক পরিকাঠামো তিনি গঠন করেন নি। তাঁর শাসনকালের স্বল্পায়ু এবং যুদ্ধবিগ্রহের প্রাবল্য সম্ভবত তাঁকে এ ব্যাপারে ভাবনাচিন্তার সময় দেয় নি। তবে দানশীলতা, শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ, ও জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা ইত্যাদি মানবিক গুণগুলি তাঁর মধ্যে ছিল। ***'তাজ-উল-মাসির'*** গ্রন্থের লেখক ***হাসান নিজামী*** তাঁর ন্যায়পরায়ণতার ও কর্তব্যবোধের প্রশংসা করে লিখেছেন ঃ *"He dispensed even handed justice to the people and exerted himself to*

promote the peace and prosperity of the realm. He was kind and generous to the people and practised charity liberally." দানশীলতার জন্যই তিনি 'লাখবক্স' অর্থাৎ লক্ষ্যদাতার খ্যাতি অর্জন করেন। সপ্তদশ শতকে ফিরিস্তার বিবরণেও দেখা যায় যে, দক্ষিণ ভারতে দানশীল ব্যক্তিকে 'যুগের আইবক' বলে আখ্যায়িত করা হত। সমকালীন প্রখ্যাত লেখক হাসান নিজামী, ফকরে মুদাব্বির প্রমুখ কুতুবউদ্দিনের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন। দিল্লী ও আজমীরে তিনি যথাক্রমে *'কোয়াত-উল-ইসলাম'* এবং *'দুই-দিন-কা ঝোপড়া'* নামক দুটি মসজিদও নির্মাণ করেন। দিল্লীর প্রখ্যাত কুতুবমিনারের নির্মাণকার্য তাঁর আমলেই শুরু হয়েছিল।

ব্যক্তিগতভাবে কুতুবউদ্দিন ছিলেন ধর্মপ্রাণ। তবে ধর্মীয় উদারতা তাঁর ছিল না। অনহিলবারা এবং কালিঞ্জর দখলের সময় তিনি বিনা দ্বিধায় বহু মন্দির ধ্বংস করে তার উপর মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। দানের কাজে তিনি যেমন 'লক্ষ্যদাতার' সম্মানে ভূষিত হয়েছেন, তেমনি লক্ষ্য লক্ষ্য মানুষকে হত্যা করতেও তিনি পিছপা হন নি। অবশ্য কোন কোন পণ্ডিতের মতে, কুতুবউদ্দিনের ধর্মান্ধতা বা নৃশংসতা কেবলমাত্র যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে লক্ষ্য করা যেত। শান্তির সময়ে তিনি অনর্থক রক্তপাতের তীব্র বিরোধী ছিলেন। *'তারিখ-ই-মুবারকশাহী'*তে বলা হয়েছে যে, কুতুবউদ্দিনের সেনাবাহিনী তুর্কী, ঘুরী, খোরাসান, খলজী, হিন্দুস্তানী প্রভৃতি নানা জাতির মানুষ দ্বারা গঠিত ছিল। কুতুবউদ্দিনের কঠোর নির্দেশের ফলে তারা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে সামান্যতম জিনিসও সংগ্রহ করার সাহস দেখাত না। তাই আবুল ফজল গজনীর সুলতান মামুদকে 'নিরপরাধীর হত্যাকারী' বলে অভিহিত করলেও কুতুবউদ্দিনকে 'ভালো এবং মহৎ গুণের অধিকারী' বলে উল্লেখ করেছেন।

অধ্যাপক ***হবিবউল্লাহ্*** কুতুবউদ্দিনের চরিত্রে তুর্কী ও পারসিক ধারার সমন্বয় ঘটেছে বলে মনে করেন। তিনি লিখেছেন : *"A military of great energy and high merit, he combined the intrepidity of the Turk with the refined taste and genorosity of the Persiam."* বস্তুত, তুর্কীজাতির নির্ভীকতা এবং পারসিকদের উদারতার সমন্বয়ে কুতুবউদ্দিন যে শক্তি ও মনের অধিকারী হয়েছিলেন, তা তাঁকে ভারতবর্ষে নতুন সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্থাপনের কাজে যথাযথভাবে পরিচালিত করেছিল, মধ্যযুগীয় শাসকদের সীমাবদ্ধতা তাঁর মধ্যেও ছিল। তবে সমকালীন অন্যান্য সামরিক নেতাদের তুলনায় তিনি ছিলেন মহত্তর গুণাবলীর ধারক।

কুতুবউদ্দিন দিল্লীর সুলতানি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করলেও, তাঁকে সার্বভৌম নরপতির মর্যাদা দেবার প্রশ্নে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। ড. ***ঈশ্বরীপ্রসাদ***, ড. ***কালীকিঙ্কর দত্ত*** প্রমুখ কুতুবউদ্দিনকে 'ভারতীয় সুলতান' বা 'সুলতানি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা' ইত্যাদি অভিধা দিলেও তিনি খলিফা কিংবা গজনী সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত একজন স্বাধীন শাসক ছিলেন কিনা, সে বিতর্কের গভীরে যান নি। কুতুবউদ্দিনের আমলের মাত্র চারটি তাম্রমুদ্রা পাওয়া গেছে। 'কুতবী' নামাঙ্কিত এই মুদ্রাগুলি কুমরান থেকে প্রচারিত হয়েছিল বলে ***নেলসন রাইট*** (Nelson Right) মন্তব্য করেছেন। ১২০৬ থেকে ১২০৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তীকালে তিনি যে নিজনামাঙ্কিত কোন মুদ্রা চালু করেন নি, এ কথা অনেকেই স্বীকার করেন। ইলদুজ মনে করতেন, ভারতে কুতুবউদ্দিন-অধিকৃত ভূখণ্ড আইনত গজনীর রাজ্যাংশ। এই কারণেই তিনি একাধিকবার ভারত-ভূখণ্ড দখল

করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বাংলাদেশের খলজী অভিজাতদের উপর কুতুবউদ্দিনের কোন আইনগত কর্তৃত্ব ছিল না। ইখ্‌তিয়ারউদ্দিনের মত উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও দক্ষ সেনাপতি বেঁচে থাকলে কুতুবউদ্দিনের ভাগ্যের কি পরিণতি ঘটত, তা বলা বেশ কঠিন। কারণ এঁদের দুজনের মধ্যে মর্যাদাগত কোন প্রভেদ ছিল না। এমন কি আলিমর্দান নিজের হৃতরাজ্য ফিরে পাবার জন্য কুতুবের সাহায্য প্রার্থী হলেও, পূর্বাঞ্চলীয় ভূখণ্ডের উপর কুতুবউদ্দিনের অধিকার তিনি স্বীকার করেন নি। এমন কি পরবর্তীকালে সুলতান ফিরোজ তুঘলক জুম্মাবারের খুৎবায় পাঠ করার জন্য দিল্লীর পূর্ববর্তী সুলতানের নামের যে তালিকা প্রকাশ করেছিলেন, তাতে কুতুবউদ্দিনের নাম ছিল না। ড. *ত্রিপাঠী* ***(R. P. Tripathy)*** লিখেছেন ঃ *"It is however not correct to regard Qutubuddin as the sovereign ruler of Muslim India, or Delhi, as yet the capital of the Indian Empire."* অবশ্য ড. *ত্রিপাঠী* এটা স্বীকার করেছেন যে, ভারতে বহির্দেশীয় প্রভাব থেকে মুক্ত স্বাধীন সুলতানি প্রতিষ্ঠার পথ কুতুবউদ্দিনই প্রশস্ত করে গিয়েছিলেন। ড. *হবিবউল্লাহ*ও স্বীকার করেছেন যে, দিল্লী রাজ্যের প্রধান স্থপতি ছিলেন কুতুবউদ্দিন। তিনি লিখেছেন ঃ *"Muizziudin merely supplied the motive power; Aibak was responsible for the detailed planning and initiation of the Delhi state."* তাই বলা যেতে পারে, কুতুবউদ্দিন আক্ষরিক অর্থে হয়তো সার্বভৌম শাসক হিসেবে স্বীকৃত ছিলেন না, তবে তাঁর ক্ষমতা ভোগদখলের মধ্যে বহিঃশক্তির উপর নির্ভরশীলতাও ছিল না। তিনি হয়তো সার্বভৌমত্ব পান নি, তবে সার্বভৌমত্ব দিল্লীর সুলতানির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনিই।

○ আরাম শাহ (১২১০ খ্রীঃ) ঃ

কুতুবউদ্দনের আকস্মিক মৃত্যুর ফলে সিংহাসনের উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত প্রশ্নে একটা জটিলতা সৃষ্টির সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠেছিল। এমতাবস্থায় তুর্কী আমীর ও মালিকগণ জনৈক আরাম বক্সকে সিংহাসনে বসিয়ে দেন। লাহোরে আরাম বক্স *'শাহ'* উপাধি নিয়ে শাসন শুরু করেন। আরাম শাহর পরিচয় সম্পর্কে বিভ্রান্তি আছে। অনেকেই এঁকে কুতুবউদ্দনের পুত্র বলে মনে করেন। কিন্তু আতামালিক জুয়াইনি *'তারিখ-ই-জাহান সুমা'* গ্রন্থে পরিষ্কার বলেছেন যে, কুতুবের তিনজন কন্যা-সন্তান ছিল' কোন পুত্র সন্তান ছিল না। সম্ভবত শূন্য সিংহাসনকে কেন্দ্র করে যে-কোন গোলযোগের সম্ভাবনা দূর করার জন্যই আরাম শাহকে সিংহাসন দেওয়া হয়েছিল। *নিজামী (K. A. Nizami)* তাই লিখেছেন ঃ *"It was availability rather than eminence or competence which led the Turkish officers stationed at Lahore to raise Aram to the throne."* যাই হোক, আরাম শাহের অপদার্থতার সুযোগে দেশের বিভিন্ন অংশে কর্মরত তুর্কী-আমীররা নিজ নিজ অঞ্চলকে মুলতানির কর্তৃত্বমুক্ত ঘোষণা করে স্বাধীনভাবে শাসন করতে শুরু করেন। কুবাচা উচ, মুলতান ছাড়াও ভাক্কার, শিউরান দখল করেন। বাংলায় খলজী মালিকরা বিদ্রোহী হয় এবং কিছু কিছু রাজপুত রাজাও তুর্কীদের অধীনতা থেকে তাদের হৃত রাজ্যাংশ পুনর্দখল করে নেয়।

এমতাবস্থায় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন তুর্কী অভিজাতগণ বদাউনের শাসনকর্তা সামসুউদ্দিন ইলতুৎমিসকে সিংহাসন দখলের জন্য আহ্বান জানান। ইলতুৎমিসও সিংহাসন দখলে আগ্রহী

ছিলেন। তাছাড়া কুতুবউদ্দিনের জামাতা হিসেবে সিংহাসনের উপর তাঁর একটা বৈধ দাবিও ছিল। ইতিপূর্বেই মহম্মদ ঘুরী তাঁকে দাসত্ব-বন্ধন থেকে মুক্তি দেবার ফলে সিংহাসন দখলের ব্যাপারে আইনগত বাধাও ছিল না। যাই হোক ইলতুৎমিস সসৈন্যে দিল্লীতে উপস্থিত হয়ে নিজেকে 'সুলতান' বলে ঘোষণা করেন। আরাম শাহ সামান্য অনুচরসহ তাঁকে বাধা দেবার একটা চেষ্টাও করেন। কিন্তু 'জুদ' নামক স্থানে ইলতুৎমিস আরাম শাহকে পরাজিত ও হত্যা করে সিংহাসন কন্টকমুক্ত করেন। অধ্যাপক *নিজামীর* মতে, আরাম শাহ ৮ মাসের বেশি সিংহাসনে আসীন ছিলেন না।

○ইলতুৎমিস (১২১০/১১-'৩৬ খ্রীঃ) ঃ

ইলতুৎমিস ছিলেন তুর্কীস্থানের ইলবেরী গোষ্ঠীভুক্ত ইলম খানের পুত্র। ইলতুৎমিস ছিলেন অতি সুদর্শন ও সুমধুর ব্যক্তিত্বের অধিকারী। ফলে বাল্যকালেই তিনি নিজগোষ্ঠীর লোকেদের কাছে খুব প্রিয় হয়ে ওঠেন। ফলে তাঁর আত্মীয়বর্গ ঈর্ষান্বিত হন এবং সেখানে ইলতুৎমিসকে এক দাসব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করে দেন। নানা হাত ঘুরে তিনি জালালউদ্দিন চুস্তকুবা নামক এক বণিকের কাছে আসেন। জালালউদ্দিন তাঁকে প্রথমে গজনীতে নিয়ে আসেন। মহম্মদ ঘুরী প্রথমে তাঁকে ক্রয় করতে ইচ্ছুক হন। কিন্তু দরদামের প্রশ্নে মতভেদ হওয়ায় তা সম্ভব হয় নি। অবশ্য ক্ষুব্ধ ঘুরী গজনী শহরে ইলতুৎমিসের বিক্রয়ের বিরুদ্ধে এক নির্দেশনামা জারি করেন। গুজরাট বিজয়ের পর কুতুবউদ্দিন আইবক গজনীতে এসে ইলতুৎমিসের বিষয়ে অবহিত হন এবং তাকে ক্রয় করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। শেষ পর্যন্ত মহম্মদ ঘুরীর অনুমতিক্রমে ইলতুৎমিসকে দিল্লীতে এনে কুতুবউদ্দিন ক্রয় করেন। নিজের রূপ, কর্মদক্ষতা ও বিশ্বস্ততা দ্বারা ইলতুৎমিস অল্পকালের মধ্যেই কুতুবউদ্দিনের মন জয় করে নেন। মুগ্ধ কুতুব নিজ কন্যাকে ইলতুৎমিসের হাতে অর্পণ করেন। খোক্কর উপজাতির বিদ্রোহ দমনের জন্য মহম্মদ ঘুরী যখন ভারতে আসেন, তখন ইলতুৎমিস তাকে ভীষণভাবে সাহায্য করেন। ইলতুৎমিসের ব্যবহার ও কর্মদক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে ঘুরী তাঁকে ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্তি দেন। লক্ষণীয় যে, মহম্মদ ঘুরী তখনও তাঁকে প্রবীণ দাস কুবাচা, ইলদুজ বা কুতুবউদ্দিনকে 'দাসত্ব-মুক্তির' আদেশ দেন নি। অর্থাৎ কুতুবউদ্দিনের আগেই ইলতুৎমিস একজন মুক্ত মানুষের অধিকার অর্জন করেছিলেন। মধ্যযুগের ইতিহাসে এটি একটি বিরল ঘটনা। কুতুবউদ্দিন কর্তৃক গজনী আক্রমণের সময়েও ইলতুৎমিস দক্ষতার পরিচয় দেন। এই কারণেই দিল্লীর আমির-ওমরাহগণ কুতবের যোগ্য উত্তরাধিকারী হিসেবে ইলতুৎমিসকেই বরণ করে নিয়েছিলেন।

ঈশ্বরীপ্রসাদের মতে, ইলতুৎমিসের ক্ষমতার উত্তরণ কোন অলৌকিক ঘটনা ছিল না। তিনি ব্যক্তিগত প্রতিভা ও দক্ষতার দ্বারা তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। তিনি লিখেছেন ঃ *"(He) rose to eminence by sheer dint of merit and it was solely by virtue of his fitness that he superceeded the hereditary claimants to the throne."* কোন কোন লেখক ইলতুৎমিসকে 'অন্যায় দখলদার' বলে নিন্দা করেছেন। কিন্তু ড. *ত্রিপাঠী* মনে করেন, সেই মুহূর্তে তুর্কী-সুলতানির কোন অস্তিত্ব ছিল না। কুতুবউদ্দিনের সাম্রাজ্য তুর্কী আমির ও স্থানীয় রাজাদের দখলে চলে গিয়েছিল। তাই দখল করার প্রসঙ্গটাই

অবান্তর। তাছাড়া, নানা দিক থেকে ইলতুৎমিসই ছিলেন যোগ্যতম ব্যক্তিত্ব। কারণ, (১) তুর্কী আমিরগণ তাঁকে সমর্থন জানিয়েছিলেন, (২) তিনি ছিলেন দক্ষ সামরিক নেতা। ইসলামের নিয়মানুযায়ী সিংহাসনে যোগ্যতম ব্যক্তির অধিকার স্বীকৃত, (৩) তিনি ইতিপূর্বেই মহম্মদ ঘুরী কর্তৃক 'দাসত্ব' থেকে মুক্ত হয়েছিলেন, এবং (৪) বাগ্দাদের খলিফা তাঁকে *'সুলতান-ই-আজম'* উপাধি দ্বারা সম্মান ও স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

○ইলতুৎমিসের সমস্যা ও তার সমাধান ঃ

সিংহাসনলাভের সঙ্গে সঙ্গে ইলতুৎমিসকে অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত একাধিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সেই মুহূর্তে তাঁর তিন প্রধান শত্রু ছিলেন—গজনীর শাসক তাজউদ্দিন ইলদুজ, মুলতানের শাসক নাসিরউদ্দিন কুবাচা এবং বাংলাদেশের শাসক আলিমর্দান। ইলদুজ মহম্মদ ঘুরীর উত্তরাধিকারী হিসেবে ঘুরী-বিজিত ভারতীয় ভূখণ্ড দখলের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। মুলতান ও উচের শাসনকর্তা কুবাচা নিজেকে স্বাধীন শাসক রূপে ঘোষণা করে সমগ্র পাঞ্জাব দখলের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন এবং আলিমর্দান দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করে এবং 'সুলতান আলাউদ্দিন' উপাধি গ্রহণ করে বাংলাদেশে স্বাধীন শাসনের সূচনা করেন। ইলতুৎমিসের সামনে দুটি পথ খোলা ছিল,—হয় এদের দাবিসমূহ মেনে নেওয়া, কিংবা এদের দমন করা। প্রথম কাজটি করলে দিল্লী-সুলতানির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হত, আবার দ্বিতীয় কাজটি সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজন ছিল ধৈর্য, বিচক্ষণতা এবং দক্ষতার সুষম সমন্বয়। ইলতুৎমিস দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটিই গ্রহণ করেন এবং সাফল্যের সাথে তা সম্পন্ন করে শিশু দিল্লী-সুলতানিকে সুদৃঢ় ভিত্তি দেন। এছাড়া গোয়ালিয়র, রণথম্বোর-সহ কয়েকটি রাজপুত রাজ্য তুর্কী-অধীনতা-মুক্ত হয়ে সুলতানের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছিল। এমন কি কিছু তুর্কী অভিজাতও (মুইজী, কুতবী) ইলতুৎমিসের অধীনতা মেনে নিতে দ্বিধান্বিত ছিলেন। সর্বোপরি দুর্ধর্ষ মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিজ খাঁ সসৈন্যে ভারতের উত্তর সীমান্তে উপস্থিত হয়ে ইলতুৎমিসকে কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি করেন।

ইলতুৎমিস ধৈর্য ও বিচক্ষণতার সাথে পরিস্থিতির মোকাবিলা করেন। তাঁর কর্মসূচীর প্রেক্ষিতে ইলতুৎমিসের ছাব্বিশ বছরের শাসনকালকে তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা যায় ঃ (১)১২১০-'২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময় যখন তিনি নিজের রাষ্ট্র-কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে শক্তিগুলির মোকাবিলা করেন, (২) ১২২১-'২৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে তিনি চেঙ্গিজ খাঁর উপস্থিতি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করেন এবং (৩) ১২২৮-'৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কাল, যখন তিনি সাম্রাজ্য সংগঠনের কাজে ব্যয় করেন।

ইলতুৎমিস প্রথমেই দিল্লী, বদাউন, অযোধ্যা, বেনারস, শিবালিক প্রভৃতি অঞ্চলের বিদ্রোহী মুইজি ও কুতবী আমিরদের দমন করে ঐ সকল অঞ্চলে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। ইতিমধ্যে খারিজম্ শাহ কর্তৃক গজনী অধিকৃত হলে গজনীর শাসক ইলদুজ ভারতে প্রবেশ করেন এবং কুবাচাকে বিতাড়িত করে লাহোর দখল করে নেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভারত-ভূখণ্ডের উপর ইলদুজের একটি দাবি ছিল। পাঞ্জাবে তাঁর কর্তৃত্ব স্থাপিত হলে ইলতুৎমিসের অস্তিত্ব বিপন্ন হত। ইলতুৎমিস দ্রুত ইলদুজের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। এই সময় ইলদুজ এক পত্র মারফত ইলতুৎমিসকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, তিনি মুইজউদ্দিনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী।

প্রত্যুত্তরে ইলতুৎমিস বলেছিলেন, *"সময় পাল্টেছে। চালু হয়েছে নতুন নিয়ম। গজনী ও ঘুরী বংশীয়দের ক্ষেত্রে কি ঘটেছে? বংশগত অধিকারের দিন চলে গেছে।" ("Times have changed. There is a new order now : What was hapened to the Gaznivides and the Ghurids? The times of hereditary descent are over.")* ইতিহাসখ্যাত তরাইনের যুদ্ধে (১২১৫-'১৬ খ্রীঃ) ইলতুৎমিস ইলদুজকে পরাজিত করেন। বন্দী অবস্থায় তাঁকে বদাউনে এনে হত্যা করা হয়। ঐতিহাসিক *নিজামী* এই সাফল্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ *"এই বিজয় দু'দিক থেকে ইলতুৎমিসের পক্ষে সুফলদায়ী ছিল। **প্রথমত**, এর মাধ্যমে তাঁর একজন বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতাদখলের দৌড় থেকে অপসারিত হয়েছিল এবং **দ্বিতীয়ত**, ইলদুজের পরাজয়ের ফলে গজনীর সাথে ইলতুৎমিসের সম্পর্কের বন্ধন সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন হয়েছিল। এর ফলে দিল্লীতে গজনীর খবরদারি-মুক্ত স্বাধীন সুলতানির প্রতিষ্ঠা সহজ হয়েছিল।" ("This was a double victory for Iltutmish : the removal of one of the most dangerous rivals to his power and the final break with Ghazni, which ensured an independent status for the kingdom of Delhi.")*।

অতঃপর ইলতুৎমিস নাসিরউদ্দিন কুবাচার উচ্চকাঙ্ক্ষা ও স্বাধীনতাস্পৃহা দমনে অগ্রসর হন। চিনাব নদীর নিকটে 'মনসুরার যুদ্ধে' (১২১৭ খ্রীঃ) তিনি কুবাচাকে পরাজিত করে লাহোর দখল করেন। কুবাচা পাঞ্জাব থেকে পালিয়ে যান। লাহোরের দায়িত্ব নিজ পুত্র নাসিরউদ্দিন মহম্মদের হাতে অর্পণ করেন। অবশ্য পরবর্তী এক দশকে কুবাচা সিন্ধু-অঞ্চলে নিজ অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হন। খারিজ্‌ম শাহ্ মঙ্গবরণীর পশ্চাদ্ধাবন করে মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিজ খাঁ ভারতের সীমান্তে উপস্থিত হওয়ার কারণে ইলতুৎমিস ব্যস্ত হয়ে পড়লে কুবাচা আপাতত রক্ষা পেয়ে যান। যাই হোক, ১২২৭ খ্রীষ্টাব্দে ইলতুৎমিস উচ্ দখল করে কুবাচাকে রাজ্যচ্যুত করেন। ইলতুৎমিসের কাছে পরাজিত হয়ে পলায়নের সময় সম্ভবত সিন্ধুনদে ডুবে তিনি প্রাণ হারান।

মধ্য-এশিয়ার এক দুর্ধর্ষ জাতি হল মোঙ্গলগণ। এরা ছিল যেমন হিংস্র, বর্বর এবং রক্তপিপাসু, তেমনি সুদক্ষ যোদ্ধা। চেঙ্গিজ খাঁর নেতৃত্বে ত্রয়োদশ শতকে মোঙ্গলগণ অসামান্য শক্তির অধিকারী হয়। মোঙ্গলগণ ঝড়ের গতিতে পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল পদানত করে খরিজ্‌ম রাজ্য আক্রমণ করে। খারিজ্‌ম শাহ্ জালালউদ্দিন মঙ্গবরণী মোঙ্গলদের কাছে পরাজিত হয়ে পাঞ্জাবে চলে আসেন। খোক্কর উপজাতির সহায়তায় মঙ্গবরণী উত্তর-পশ্চিম পাঞ্জাব এবং মুলতান দখল করেন। কুবাচাকেই তিনি সিন্ধু থেকে বিতাড়িত করেন। অতঃপর তিনি দিল্লীতে থাকার জন্য ইলতুৎমিসের সাহায্য ও অনুমতি প্রার্থনা করেন। এদিকে মঙ্গবরণীকে অনুসরণ করে চেঙ্গিজও সিন্ধুর তীরে উপস্থিত হন এবং মঙ্গবরণীকে সমর্থন না-করার জন্য ইলতুৎমিসকে অনুরোধ করেন। বিচক্ষণ ইলতুৎমিস যথার্থই উপলব্ধি করেন যে, মঙ্গবরণীকে আশ্রয় দিলে মোঙ্গলদের হাতে দিল্লী বিপর্যস্ত হবে। তাই তিনি মঙ্গবরণীকে আশ্রয় দিতে অস্বীকৃত হন। অতঃপর চেঙ্গিজ আফগানিস্তানের উদ্দেশ্যে ভারত ত্যাগ করেন। কিছুদিনের মধ্যেই মঙ্গবরণী পারস্যে চলে যান। সম্ভবত সেখানেই এক গুপ্তঘাতকের হাতে মঙ্গবরণী নিহত হন।

উত্তর-ভারতের সমস্যায় বিব্রত ইলতুৎমিস পূর্ব-ভারতের ব্যাপারে তাই নিস্পৃহ ছিলেন। এখন উত্তর-ভারতে ক্ষমতা সংহত করার পর তিনি বাংলার দিকে নজর দেন। কুতুবউদ্দিনের

মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আলিমর্দান বাংলায় স্বাধীন শাসন প্রবর্তন করেছিলেন। ইতিমধ্যে আলিমর্দানের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র হিসামউদ্দিন ইয়াজ 'গিয়াসউদ্দিন' উপাধি নিয়ে বাংলার শাসন চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি নিজনামে মুদ্রা প্রবর্তন করেন এবং খুৎবা পাঠ করে নিজের স্বাধীন অস্তিত্ব জাহির করেন। ১২২৫ খ্রীষ্টাব্দে ইলতুৎমিস ইয়াজ-এর বিরুদ্ধে অভিযান পাঠালে ইয়াজ তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে নেন। কিন্তু ইলতুৎমিস বাংলাদেশ ত্যাগ করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ইয়াজ বিহার দখল করে সুলতানের প্রতিনিধিকে বিতাড়িত করেন। অতঃপর ইলতুৎমিসের নেতৃত্বে তাঁর পুত্র নাসিরউদ্দিন বাংলা আক্রমণ করে ইয়াজকে হত্যা করেন এবং বাংলাকে দিল্লী-সুলতানির অন্তর্ভুক্ত করেন (১২২৬ খ্রীঃ)। নাসিরউদ্দিনের মৃত্যুর পর (১২২৯ খ্রীঃ) বাংলার খলজী মালিকগণ জনৈক বল্কার নেতৃত্বে দিল্লীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ইলতুৎমিস দ্রুত বাংলাদেশে উপস্থিত হয়ে বল্কাকে হত্যা করে বিদ্রোহ দমন করেন এবং আধিপত্য সুরক্ষিত করেন।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাজপুত রাজ্যগুলি তাদের হৃত রাজ্যাংশ পুনরুদ্ধারের জন্য সদা সচেষ্ট ছিল। কুতুবউদ্দিনের মৃত্যুর পর দিল্লী-সুলতানির রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগে অনেকগুলি রাজপুতগোষ্ঠী তাদের হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করে নিতে সক্ষম হয়। এইভাবে চান্দেল্লরা, কালিঞ্জর ও অজয়গড় ; প্রতিহাররা গোয়ালিয়র, নারোর ঝান্সী ; রণথম্ভোরের চৌহানরা যোধপুর ও সন্নিহিত অঞ্চল ; জালোরের চৌহানরা নাদোল, মন্দোর ভারমার, সাঞ্চোর, ঘেরা, রাসসিন প্রভৃতি ; ভাট্টিরা উত্তর-আলোয়ার প্রভৃতি অঞ্চল তুর্কীদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়। ইলতুৎমিসের পক্ষে এই ক্ষতি মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই তিনি উত্তর-সীমান্তের সমস্যা সমাধান করে রাজপুত রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। তিনি একে একে গোয়ালিয়র, রণথম্ভোর, মাণ্ডু, বেয়ানা, থঙ্গির, আজমীর প্রভৃতি স্থান পুনর্দখল করেন। তবে চান্দেল্ল, গুজরাটের চালুক্য এবং নাগদা'র রাজা ক্ষেত্র সিংহের বিরুদ্ধে ইলতুৎমিস সফল হতে পারেন নি। ১২৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মালব আক্রমণ করে ভিলসা ও উজ্জয়িনী ধ্বংস করেন। অবশ্য এসব স্থানের উপর তিনি কর্তৃত্ব স্থাপন করতে পারেন নি। ইলতুৎমিসের শেষ অভিযান ছিল সিন্ধু-সাগর দোয়াব অঞ্চলের পার্বত্য রাজ্য বানিয়ানের বিরুদ্ধে। কিন্তু এই অভিযানের মাঝপথে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং অসুস্থ অবস্থায় অভিযান অসমাপ্ত রেখে দিল্লী ফিরে আসেন। এর অল্পকালের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয় (২৯শে এপ্রিল, ১২৩৬ খ্রীঃ)।

○ইলতুৎমিসের কৃতিত্বের মূল্যায়ন ঃ

দিল্লীর সিংহাসনে ইলতুৎমিসের আরোহণের সাথে সাথে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয় এবং তখন থেকেই প্রকৃত অর্থে দিল্লীর সুলতানি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ঘটে। অধ্যাপক *নিজামী* লিখেছেন যে, ইলতুৎমিস *'অদম্য উৎসাহ এবং যুক্তিনিষ্ঠ নির্দিষ্ট লক্ষ্যের সাহায্যে হিন্দুস্থানের অসংবদ্ধ ঘুর অঞ্চলকে সুগ্রথিত দিল্লীর সুলতানি রাজ্যে পরিণত করেছিলেন।'* বস্তুত ইলতুৎমিস ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে ক্রীতদাস হিসেবে কুতুবউদ্দিনের সেবায় নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং দু'দশকের কম সময়ের মধ্যেই ভারতস্থ তুর্কী সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়েছিলেন। তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত যোগ্যতার ফলেই এটা সম্ভব হয়েছিল। তিনি যখন সিংহাসনে বসেন, তখন

কুতুবউদ্দিন কর্তৃক গঠিত সাম্রাজ্যের কোন অস্তিত্বই ছিল না। আরাম শাহের অপদার্থতার ফলে গোটা রাজ্য জুড়ে প্রকটিত হয়েছিল বিশৃঙ্খলা ও বিচ্ছন্নতা। স্বজাতীয় 'মুইজী', 'কুতবী' মালিকবর্গ স্ব স্ব অঞ্চলে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। ভারতের রাজপুত গোষ্ঠীগুলি পুনর্দখল করেছিল তাদের হৃত রাজ্যখণ্ড। ইলদুজ, কুবাচা প্রমুখ উচ্চাভিলাষী এবং ঈর্ষান্বিত তুর্কীমালিক এবং চেঙ্গিজ খাঁ নামক দুর্ধর্ষ মোঙ্গল নেতার আক্রমণ সম্ভাবনা এক বিরাট অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করেছিল দিল্লী-সুলতানির ভাগ্যরেখায়। এই বিরাট রাজনৈতিক আবর্তে ইলতুৎমিস ছিলেন একা। কিন্তু অদম্য মনোবল, বিচক্ষণতা ও ধৈর্যের সাথে সামরিক দক্ষতা ও নেতৃ-প্রতিভার সুষম মিলন ঘটিয়ে তিনি মাত্র ছাব্বিশ বছরের মধ্যে যে সুসংগঠিত রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন, পরবর্তী ত্রিশ বছরে সেই রাজ্যের অস্তিত্বগত কোন সংকট দেখা দেয় নি। বলা যায়, খলজী সুলতানদের গৌরবময় রাজত্বকালের ভিত্তি ইলতুৎমিস স্থাপন করে যান। ড. ***শ্রীবাস্তবের*** ভাষায় ঃ *"He laid the foundation of a military monarchy which reached a high watermark of despotism under the Khaljis."* ড. ***হবিবউল্লাহ*** ইলতুৎমিসের সংগঠনী-প্রতিভার প্রশংসা করে লিখেছেন ঃ *"তিনি আইবকের অসমাপ্ত কাজ হাতে নিয়েছিলেন এবং চরম প্রতিকূলতা ও দুর্বল ভিত্তির উপর গঠিত সেই রাজ্যের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য দরকার ছিল গভীর কূটনৈতিক দক্ষতা। ইলতুৎমিসের সেই দক্ষতা ছিল। মোঙ্গল আক্রমণের সম্ভাবনা থেকে ভারতভূমিকে রক্ষা করার জন্য মধ্যযুগের ভারত তাঁর কাছে কম ঋণী নয়। তাঁর দৃঢ় এবং উদ্যমী কর্মসূচী বিচ্ছিন্নতা থেকে রাজ্যকে রক্ষা করেছিল। এই সুদক্ষ সংগঠক দিল্লী-সুলতানির শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর প্রাথমিক রূপরেখা তৈরি করেন। তিনি যে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের সূচনা করেন, তাকে ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে খলজীদের সামরিক সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়।"* ঐতিহাসিক ***ত্রিপাঠী***ও এই কারণে লিখেছেন ঃ *"The history of Muslim sovereignty in India begins properly speaking with Iltutmish."*

বাল্যকালে আপন আত্মীয়-পরিজনের ষড়যন্ত্রে ভাগ্যবিড়ম্বিত এই সুদর্শন যুবক চরিত্রমাধুর্যে অনাত্মীয় প্রভুদের হৃদয় জয় করেছিলেন খুব সহজেই। তাই মহম্মদ ঘুরী তাঁর দাসের দাসকে প্রথমেই 'দাসত্বমুক্ত' করে ইতিহাস সৃষ্টি করেন। ১২২৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে বাগ্‌দাদের খলিফা তাঁকে *'সুলতান-ই-আজম'* উপাধিতে ভূষিত করে এবং শিরোপা প্রদান করে বৈধ ও স্বীকৃত রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করেন। অধ্যাপক ***শর্মা*** *(S. R. Sharma)*-র মতে, 'এই কারণে ইলতুৎমিসকে দিল্লীর সুলতানি সাম্রাজ্যের *"প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা"* বলা উচিত। 'ইলতুৎমিস সমর-দক্ষতা এবং রাষ্ট্রপ্রজ্ঞার দ্বারা কেবল বিদ্রোহদমন বা রাজ্যবিস্তার করেই থেমে যান নি ; একটি শাসনতান্ত্রিক কাঠামো প্রবর্তনের দিকেও নজর দেন। একাজে তাঁর প্রধান সহায়ক ছিলেন বহিরাগত কিছু তুর্কী ক্রীতদাস এবং অ-তুর্কী মুসলমান। এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন বলবন, শের খান এবং মালিক মহম্মদ জুনাইদ ও ফকরউদ্দিন ইসামী। ইলতুৎমিসের প্রশাসনে হিন্দুস্তানী মুসলমান নিয়োজিত ছিলেন কিনা জানা যায় নি। তবে স্থানীয় হিন্দু নায়েকরা আগের মতই নিজ নিজ দায়িত্বে বহাল ছিলেন। শাসনের সুবিধার্থে তিনি গোটা সাম্রাজ্যকে কয়েকটি 'ইক্‌তায়' বিভক্ত করেন। ইক্‌তার প্রশাসক অর্থাৎ ইক্‌তাদার নিজ অঞ্চলে রাজস্ব সংগ্রহ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করতেন। স্থানীয় ব্যয় মেটানোর পর উদ্বৃত্ত অর্থ কেন্দ্রে প্রেরণ

করাও ছিল তাঁর প্রধান কর্তব্য। ইক্‌তাদারের নিয়োগ ও পদচ্যুতি ছিল সুলতানের ইচ্ছাধীন। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে ইলতুৎমিস দূরবর্তী অঞ্চলে সুলতানের কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে সক্ষম হন। ***নিজামীর*** ভাষায় ঃ *"(He) used this institution as an instrument for liquidating the feudal order of Indian Society and linking up the far-flung parts of the empire to one centre."* ইলতুৎমিস প্রথম আরবীয় ধারায় ১৭৫ গ্রেনের রূপার মুদ্রা চালু করেন। খলিফার প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত এই মুদ্রায় তিনি নিজেকে খলিফার সেনাপতি বলে উল্লেখ করেন।

শিল্প ও সাহিত্যের প্রতিও ইলতুৎমিসের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। মধ্যযুগের দিল্লীনগরীর প্রধান স্থপতি ছিলেন তিনি। ঐতিহাসিক ***নিজামীর*** ভাষায় ঃ- *"'Illutmish was the real architect of the medieval Delhi. ....Its minarates, mosques, madrasas, khanas and tanks rose into prominence under him..."* ইলতুৎমিস কুতুবমিনার সৌধনির্মাণের কাজ সম্পন্ন করেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, সুলতান কুতুবউদ্দিন বাগ্‌দাদের নিকটবর্তী উচের ধর্মগুরু খাজা কুতুবউদ্দিন বখ্‌তিয়ার কাকী'র স্মৃতিরক্ষার্থে এই সৌধের কাজ শুরু করেছিলেন। অবশ্য ***উলসী হেগ (W. Haig)*** মনে করেন, ইলতুৎমিসের প্রভু কুতুবউদ্দিন আইবকের স্মৃতিরক্ষার্থেই এই সৌধের পরিকল্পনা। মিনাজউদ্দিন, ইসামী প্রমুখের রচনা থেকে বোঝা যায় যে, কৈশোরে ইলতুৎমিস কিছুদিন বাগদাদে অতিবাহিত করেছিলেন। এখানে তিনি সেখ শিহাবউদ্দিন সুরাবর্দী, শেখ আহাদুদ্দিন কিরমানী প্রমুখ ***মিস্টিক (Mystic)*** সন্তের সম্পর্শে আসেন এবং প্রভাবিত হন। সমকালীন প্রখ্যাত পণ্ডিত মিনহাজ-উস-সিরাজ, হাসান নিজামী, মহম্মদ আউফি, নূরউদ্দিন প্রমুখ ইলতুৎমিসের সভা অলংকৃত করেছিলেন।

অবশ্য নিজে ধর্মপ্রাণ মুসলমান হলেও, ধর্মীয় উদারতার অভাব ছিল তাঁর চরিত্রে। নিজে সুন্নী মুসলমান ছিলেন, তাই শিয়া সম্প্রদায়ের প্রতি তিনি ছিলেন খুব কঠোর। হিন্দুদের প্রতিও তিনি অনুদার ছিলেন। অ-সুন্নী মুসলমান বা হিন্দুদের ধ্বংসসাধনের একটা বাসনাও তাঁর ছিল। অবশ্য মধ্যযুগীয় পরিস্থিতিতে এরপ পরধর্মসহিষ্ণুতার অভাব খুব আশ্চর্যজনক বা নিন্দনীয় বিষয় ছিল না।

যে প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে ইলতুৎমিস দিল্লীর সিংহাসনে বসেছিলেন এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলিকে বশীভূত করে নবগঠিত সুলতানি সাম্রাজ্যকে একটি প্রশাসনিক পরিকাঠামোর মধ্যে স্থাপন করে যে দৃঢ় ভিত্তি প্রদান করেছিলেন, সেই পরিপ্রেক্ষিতে ঐতিহাসিকেরা যেমন ইলতুৎমিসকে দিল্লী-সুলতানির *'প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা'* বলেছেন, তেমনি কেউ কেউ তাঁকে *'আদিপর্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান'* বলেও আখ্যায়িত করেছেন। ***স্যার উলসী হেগ*** লিখেছেন ঃ *"তিনি ছিলেন সমস্ত দাস-সুলতানের মধ্যে সর্বোত্তম।"* ***ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার*** লিখেছেন ঃ *"Illtutmish may justly be regarded as the greatest ruler of the early Turkish Sultanate of Delhi which lasted till 1290 A.D."* কিন্তু ঐতিহাসিক ***শর্মা (S.R Sharma)*** মনে করেন, অর্জিত কৃতিত্বের নিরিখে ইলতুৎমিসকে দিল্লী-সুলতানির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিবেচনা করা যায় ; কিন্তু সর্বোত্তম সুলতান বলা যথার্থ নয়। তাঁর ভাষায় ঃ *'It is too much an exaggeration to call him the greatest of all slave kings."*

ড. হবিবউল্লাহও মনে করেন, ইলতুৎমিসকে দক্ষ শাসক বলা চলে, কিন্তু মহান শাসক বলা যথার্থ নয়। অবশ্য বৈধ সুলতান হিসেবে তাঁর অস্তিত্ব হবিবউল্লাহ স্বীকার করেন। তিনি লিখেছেন : *"Aibak outlined the Delhi Sultanate and its sovereign status ; Illtutmish was unquestionably its king"* যাই হোক্, ইলতুৎমিস আদিপর্বের শ্রেষ্ঠতম সুলতান ছিলেন কিনা, পণ্ডিতদের এই কূট বিতর্কের মধ্যে না গিয়েও আমরা একথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, তিনি আদিপর্বের শুধু নয়, দিল্লীর সুলতানদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

○ রুকন্‌উদ্দিন ফিরোজ (১২৩৬ খ্রীঃ) :

১২২৯ খ্রীষ্টাব্দে ইলতুৎমিসের জীবনে একাধারে আনন্দ ও বেদনার কাল হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। কারণ ঐ বছরে তিনি মহান খলিফার অনুমোদন ও শিরোপা অর্জন করে দিল্লীতে স্বাধীন সুলতানির সূচনা করার গৌরব অর্জন করেন। কিন্তু একই বছরে তাঁর প্রিয়তম পুত্র নাসিরউদ্দিন মহম্মদের মৃত্যু ঘটার ফলে তাঁর ভবিষ্যৎ স্বপ্ন ও পরিকল্পনা মিথ্যা হয়ে যায়। কারণ ইলতুৎমিস তাঁর এই সুযোগ্য পুত্রকেই নিজের উত্তরাধিকারী রূপে মনোনীত করে রেখেছিলেন। তাঁর অন্যান্য পুত্ররা ছিলেন অলস, ভীরু এবং অপদার্থ। এমতাবস্থায় ইলতুৎমিস নিজকন্যা রাজিয়াকে পরবর্তী সুলতানা হিসেবে মনোনীত করেন। তাঁর এই সিদ্ধান্তটি ছিল অভিনব। কারণ রাজসিংহাসনে কোন নারীর মনোনয়নের অভিজ্ঞতা কোন তুর্কী আমীরের ছিল না। তা ছাড়া, একজন নারীর কাছে মাথানত করা বা তাঁর আদেশ পালন করা তাদের পৌরুষে আঘাত করছিল। তাই তাঁরা ইলতুৎমিসকে তাঁর অন্যান্য জীবিত পুত্রদের যে-কোন একজনের পক্ষে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু ইলতুৎমিস তাঁর পুত্রদের অযোগ্যতা সম্পর্কে এত নিশ্চিত ছিলেন যে, তুর্কী আমীরদের অনুরোধের প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন : *"Ater my death it will be seen that no one of them will be found more worthy of the heir-apparentship that she,—my daughter."* মুদ্রায় নিজনামের পাশে রাজিয়ার নাম খোদাই করে ইলতুৎমিস তাঁর সিদ্ধান্তকে আইনগত ভিত্তি দেবারও চেষ্টা করেন। এতদ্‌সত্ত্বেও ইলতুৎমিসের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমীর মালিকগণ রাজিয়ার দাবিকে নস্যাৎ করে দিয়ে ইলতুৎমিসের জ্যেষ্ঠ পুত্র রুকন্‌উদ্দিন ফিরোজ শাহকে সুলতানপদে মনোনীত করেন (১২৩৬ খ্রীঃ)।

রুকন্‌উদ্দিন সিংহাসনে বসেই প্রমাণ করে দেন, তাঁর পিতার মূল্যায়ন কতটা সঠিক ছিল। অচিরেই তিনি গা ভাসিয়ে দেন বিলাস-বৈভব আর আমোদ-প্রমোদে। রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রে পরিণত হন তাঁর মা শাহ তুর্কান। উচ্চাকাঙ্ক্ষীনী ও হীনমনা এই মহিলা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে ক্ষমতার দম্ভে আত্মহারা হয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতার ব্যাপক অপপ্রয়োগ শুরু করেন। এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় সত্বর। রুকন্‌উদ্দিনের অন্য ভ্রাতা তথা আযোধ্যার গভর্নর গিয়াসউদ্দিন বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। একে একে মুলতান, লাহোর, হান্সী, বদাউনের শাসনকর্তারাও দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করেন। নিরুপায় তুর্কী আমীরগণ তখন রাজিয়াকেই সিংহাসনে বসানোর সিদ্ধান্ত নেন। শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহী আমীরদের সহায়তায় রাজিয়া শাহ তুর্কানকে বন্দী করে রুকন্‌উদ্দিনকে হত্যা করে দিল্লীর সিংহাসন দখল করেন (১২৩৬ খ্রীঃ)।

○ সুলতানা রাজিয়া (১২৩৬-'৪০ খ্রীঃ) ঃ

রাজিয়ার সিংহাসনারোহণের ঘটনা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল। যেমন, (১) দিল্লীর সরকারি কর্মী এবং সাধারণ মানুষ রাজিয়াকে সিংহাসনে বসিয়ে উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত কাজে সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। রাজিয়ার মূল রাজনৈতিক শক্তি ছিল দিল্লীর এই গণসমর্থন। (২) *'ফতুহ-উস্-সালাতিন'* থেকে জানা যায়, রাজিয়া এক ঘোষণা দ্বারা অঙ্গীকার করেন যে, তিনি জনস্বার্থরক্ষায় ব্যর্থ হলে জনগণের ইচ্ছায় তিনি এই পদ থেকে সরে যেতে বাধ্য থাকবেন। ফলে রাজার 'দৈবস্বত্ব'-তত্ত্ব খণ্ডিত হয়। (৩) এই ঘটনা দ্বারা ইলতুৎমিসের ইচ্ছা,—যা কতিপয় আমীরের ষড়যন্ত্রে ব্যর্থ হয়েছিল, তা আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। কারণ, সুলতান জীবিতাবস্থায় রাজিয়াকেই তাঁর উত্তরাধিকারিনী মনোনীত করেছিলেন। (৪) সিংহাসনে নারীর বসার অধিকার নেই—গোঁড়া উলেমাদের এই বক্তব্যকে তিনি ভ্রান্ত প্রমাণ করেছিলেন। (৫) ইতিপূর্বে দিল্লীর কর্তৃত্ব-দখলের প্রশ্নে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের একটা বড় ভূমিকা ছিল। রাজিয়ার মনোনয়নের বিরুদ্ধেও এরা সোচ্চার ছিল। কিন্তু রাজিয়া সিংহাসন দখল করে প্রমাণ করে দেন যে, এক্ষেত্রে প্রাদেশিক শাসকদের সম্মতি আবশ্যিক নয়।

রাজিয়ার শাসনকাল ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত, মাত্র তিন বছরের। কিন্তু প্রশাসক হিসেবে তিনি ছিলেন খুবই যোগ্য। ***মিন্‌হাজ-উস্-সিরাজ*** লিখেছেন ঃ *"She was endowed with all the admirable attributes and qualifications necessary for kings."* কিন্তু তিনি ছিলেন নারী, তাই পুরুষশাসিত সমাজে তাঁর অন্য সকল গুণ মূল্যহীন হয়ে গিয়েছিল। রাজিয়া সিংহাসনে বসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহের দামামা বেজে ওঠে। অবশ্য নারীশাসনের বিরুদ্ধে পুরুষের হুঙ্কার রাজিয়াকে বিব্রত করলেও, এটিই তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রীদের প্রধান অভিযোগ ছিল না। রাজিয়ার ব্যক্তিত্ব, স্বাধীনতাস্পৃহা এবং তুর্কী অভিজাতদের একাধিপত্য নাশ করার উদ্দেশ্যে অ-তুর্কী ব্যক্তিদের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত ইত্যাদি অভিজাতদের শংকিত করে এবং রাজিয়ার ক্ষমতাসীন হওয়াকে তারা অস্তিত্বের সংকট বলেই বিবেচনা করে। অধ্যাপক ***নিজামীর*** ভাষায় ঃ *"It was her attempt to offset the power of the Turkish nobles by creating a counter-nobility of the non-Turks which excited opposition against her."* বদাউন, মুলতান, হান্‌সী ও লাহোরের প্রাদেশিক শাসকগণ রাজিয়াকে সিংহাসনচ্যুত করার প্রথম উদ্যোগ নেন। এঁদের নেতৃত্ব দেন রুকন্‌উদ্দিন ফিরোজের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মালিক মহম্মদ জুনাইদি। বুদ্ধিমতী রাজিয়া শত্রুপক্ষের শক্তির প্রাধান্য বিবেচনা করে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের পরিবর্তে কূটকৌশলের প্রয়োগ করে পরিস্থিতির সামাল দিতে সচেষ্ট হন। মালিক মহম্মদ সালারী, মালিক কবির খান প্রমুখ বিরোধী অভিজাতকে তিনি স্বপক্ষে এনে বিরোধী জোটে ভাঙ্গন ধরিয়ে দেন। পলাতক অবস্থায় বিরোধীচক্রের পাণ্ডা জুনাইদি নিহন হন।

প্রাথমিক বিদ্রোহ দমন করার পরে রাজিয়া নিজের ক্ষমতা সুদৃঢ় করতে সচেষ্ট হন। খাজা মুহজাবউদ্দিনকে উজীর-পদে নিয়োগ করেন এবং প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন মালিক সইফউদ্দিন। সইফউদ্দিনের আকস্মিক মৃত্যুর ফলে 'মালিক-ই-লস্কর' পদে নিযুক্ত হন মালিক

কুতুবউদ্দিন হাসান ঘুরী। কবীর খাঁকে লাহোরের ইক্তাদার নিযুক্ত করা হয়। *মিনহাজ* লিখেছেন ঃ *"রাজিয়ার তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক বুদ্ধির সূক্ষ্ম প্রয়োগের ফলে লক্ষ্মণাবতী থেকে দেবল পর্যন্ত সমস্ত মালিক এবং আমীরগণ রাজিয়ার আনুগত্য স্বীকার করে নেন।"* ঐতিহাসিক *নিজামী* লিখেছেন ঃ *"Raziya gave exceptional proof of her political sagacity in dealing with the recalcitrant elements."*

রাজনৈতিক ক্ষমতা সংহত করার পর রাজিয়া স্বাধীনতাকামী রাজপুত রাজ্য রণথম্ভোরের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন। কিন্তু তাঁর এই অভিযান সফল ত হয় নি, পরন্তু এই সময় থেকে চৌহানরা মেওয়াটীদের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে গরিলা-পদ্ধতিতে বারবার দিল্লীর উপকণ্ঠে হানা দিয়ে সুলতানি প্রশাসনকে বিব্রত করতে থাকে। গোয়ালিয়রের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযানটিও নিষ্ফলা থেকে যায়।

রাজিয়ার মধ্যে বিচক্ষণতা, ন্যায়পরায়ণতা, রাষ্ট্রপ্রজ্ঞা ইত্যাদি রাজকীয় গুণের সমাবেশ ঘটলেও তাঁর শাসনকাল স্থায়ী হয়েছিল মাত্র তিন বছর ছয়মাস ছয় দিন। প্রতিভাময়ী এই শাসিকার ব্যর্থতার প্রধান কারণ ছিল ক্ষমতাবান তুর্কী-মালিক ও আমীরদের বিরূপতা ও ষড়যন্ত্র। তবে এই বিরূপতার মূল কারণ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে দ্বিমত আছে। ইসামীর *'ফুতুহ-উস্-সালাতিন'*-এর বিবরণ থেকে মনে হয় যে, রাজিয়া নারীসুলভ আচরণ ত্যাগ করে মৌলানা ও তুর্কী অভিজাতদের ক্ষোভ সঞ্চার করেছিলেন। প্রথমে রাজিয়া লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে শাসনকাজ পরিচালনা করতেন। দরবারে তাঁর সিংহাসন এবং সভাসদ্‌দের মাঝে একটা পর্দা রেখে আড়াল সৃষ্টি করা হত। কিন্তু এই ব্যবস্থা কার্যকরী রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের পক্ষে অসুবিধাজনক বিবেচনা করে রাজিয়া তা তুলে দেন। এখন তিনি প্রকাশ্যে দরবারে বসে রাজকার্য পরিচালনা করতে শুরু করেন। হাতির পিঠে বসে রাজ্যভ্রমণ কিংবা পুরুষের মত পোষাক পরে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। নিজ মুদ্রায় 'সুলতানা'র পরিবর্তে নিজেকে 'সুলতান' হিসেবে জাহির করেন। এই সকল কাজ তুর্কী অভিজাতবর্গ এবং উলেমাদের কাছে ব্যভিচারের নামান্তর রূপে পরিগণিত হয় এবং তারা রাজিয়াকে সিংহাসনচ্যুত করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু অধ্যাপক *নিজামী (K. A. Nizami)* মনে করেন, রাজিয়ার বিরুদ্ধে তুর্কী অভিজাতদের ক্ষোভের প্রধান কারণ তাঁর পুরুষসুলভ আচরণ নয়। রাজিয়ার ব্যক্তিত্ব, কর্তৃত্ব এবং দক্ষতা ইত্যাদি গুণ অভিজাতদের ঈর্ষান্বিত করেছিল। এবং ষড়যন্ত্রী মালিকরা জনৈক হাবসী ক্রীতদাস জামালউদ্দিন ইয়াকুৎ-এর উচ্চপদে নিয়োগের ঘটনাকে বিদ্রোহের তাৎক্ষণিক কারণ হিসেবে ব্যবহার করেছিল। রাজিয়া ইয়াকুৎকে আস্তাবলের প্রধান পদে উন্নীত করলে তুর্কী-অভিজাতদের মর্যাদা আহত হয়। মিন্‌হাজউদ্দিনের মতে, ইয়াকুৎ-এর সাথে রাজিয়ার প্রণয় ছিল। ইবন বতুতাও এই মত সমর্থন করেছেন।

রাজিয়া-বিরোধী জোটের মধ্যমণি ছিলেন 'আমীর-ই-হাজিব' ইখ্‌তিয়ারউদ্দিন আইতিগীন। আইতিগীনের পাশে ছিলেন রাজিয়ার অন্য দুই তথাকথিত বিশ্বস্ত আমীর আলতুনিয়া এবং কবীর খাঁ। এঁরা ছিলেন যথাক্রমে লাহোর ও ভাতিণ্ডার (তরবারহিন্দা) শাসক। বিদ্রোহীরা জানতেন যে, দিল্লীর বুকে বসে রাজিয়ার বিরুদ্ধে কোন আন্দোলনকে সফল করা যাবে না। তাই তাঁরা রাজিয়াকে দিল্লীর বাইরে এনে তাঁর কর্তৃত্বনাশের পরিকল্পনা করেন। গোপন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী

কবীর খাঁ লাহোরে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। রাজিয়া সসৈন্যে লাহোরে উপস্থিত হয়ে কবীর খাঁকে পরাজিত করেন। কবীর খাঁ বশ্যতা স্বীকার করে রক্ষা পান। এই ঘটনার পক্ষকালের মধ্যে আলতুনিয়া ভাতিণ্ডায় বিদ্রোহী হন। এবারেও রাজিয়া ইয়াকুৎ-সহ বিদ্রোহদমনে অগ্রসর হন। কিন্তু ষড়যন্ত্রী তুর্কী মালিকরা পথিমধ্যে ইয়াকুৎকে হত্যা করে এবং রাজিয়াকে বন্দী করে ভাতিণ্ডার দুর্গে আটকে রাখেন।

রাজিয়াকে বন্দী করে বিদ্রোহী তুর্কী আমীরগণ ইলতুৎমিসের তৃতীয় পুত্র বাহরাম শাহকে দিল্লীর সুলতান বলে ঘোষণা করেন (মে, ১২৪০ খ্রীঃ)। কিন্তু নতুন সুলতানের অধীনে গুরুত্বপূর্ণ পদের দখলকারীর প্রশ্নে অচিরেই অভিজাতদের মনান্তর তীব্র হয়ে ওঠে। আলতুনিয়া প্রত্যাশামত পদ না পেয়ে প্রতি-বিপ্লবের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি রাজিয়াকে মুক্ত করে দেন এবং তাঁকে বিবাহ করে দিল্লীর মসনদ পুনর্দখলের জন্য অগ্রসর হন। কিন্তু বাহরাম শাহের অগ্রবর্তী-বাহিনীর হাতে পরাজিত হয়ে রাজিয়া ও আলতুনিয়া ভাতিণ্ডা ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু পথিমধ্যে কাইথাল নামক স্থানে এসে রাজিয়ার সেনাবাহিনী এঁদের পরিত্যাগ করে। সম্ভবত হিন্দু উপজাতিদের হাতে এঁরা নিহত হন (অক্টোবর, ১২৪০ খ্রীঃ)।

দিল্লির সুলতানি সিংহাসনের একমাত্র মহিলা প্রতিনিধি ছিলেন রাজিয়া। তাঁর রাজত্বের সময়কাল সংক্ষিপ্ত হলেও, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তিনি ছিলেন যোগ্য এবং অসাধারণ শাসক। তাঁর সাহস এবং উদ্যোগেরও কোন অভাব ছিল না। রাজিয়ার কৃতিত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে ***মিন্‌হাজ-উস্‌-সিরাজ*** লিখেছেন ঃ *"She was a great sovereign and sagcions, just. beneficent, the patron of the learned, a dispenser of justice, the cherisher of her subjects and of warlike talent."* রাজতন্ত্রের উপর আমীর, মালিক বা উলেমাদের অশুভ প্রভাবকে তিনি দক্ষতার সাথে প্রতিহত করেন। আদিপর্বের সুলতানদের মধ্যে রাজিয়া ছিলেন প্রথম এবং একমাত্র শাসক যিনি অভিজাতদের প্রভাবমুক্ত থেকে শাসন পরিচালনা করার মত দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছেন। ঐতিহাসিক ***শ্রীবাস্তব*** লিখেছেন ঃ *"She was the first Turkish ruler of Delhi to have imposed the royal will upon the Amirs and Maliks."* রাজিয়ার প্রশাসনিক দক্ষতা এবং রাজনৈতিক দূরদর্শিতার দুটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল, (১) কূটকৌশলে বিদ্রোহী অভিজাতদের জোটে ভাঙ্গন ধরিয়ে ষড়যন্ত্রের বিনাশ ঘটানো এবং (২) খারিজম শাহের সামরিক চুক্তির প্রস্তাবকে সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে মোঙ্গল আক্রমণের হাত থেকে ভারতবর্ষকে রক্ষা করা। সমস্ত দক্ষতা এবং রাজকীয় গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও রাজিয়া ষড়যন্ত্রের বলি হয়েছিলেন ; কারণ স্বার্থান্বেষী তুর্কী আমীরদের সর্বময় কর্তৃত্ব অস্বীকার করে তিনি মৌচাকে ঢিল ছোঁড়ার দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন—যা বাঞ্ছিত হলেও সহজসাধ্য ছিল না।

○ বাহরাম শাহ (১২৪০-'৪২ খ্রীঃ) ঃ

ইলতুৎমিসের তৃতীয় পুত্র বাহরাম শাহ তুর্কী আমীর ও মালিকদের আনুকূল্যে দিল্লীর মসনদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ফলে প্রাথমিকভাবে তিনি ক্ষমতালোভী অভিজাতদের সমস্ত দাবি মেনে নিতে বাধ্য হন। সমস্ত ক্ষমতা তুর্কী অভিজাতদের কুক্ষিগত হয়। অভিজাতদের ইচ্ছানুযায়ী তিনি 'নায়েব-ই-মাম্‌লিকৎ' নামক একটি পদ সৃষ্টি করেন। মর্যাদার দিক থেকে এই পদাধিকারী ছিলেন

সুলতানের ঠিক পরেই। আইতিগীন এই পদে প্রথম মনোনীত হন। উজীর-পদে পূর্ববৎ মুহজাবউদ্দিন থেকে যান। ফলে আইতিগীনের সাথে উজীরের ব্যক্তিগত সংঘাত অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়। এদিকে আইতিগীন নানা ক্ষেত্রে সুলতানকে আড়ালে রেখে রাজকীয় কর্তৃত্ব ভোগ করতে শুরু করলে বাহরামও তাঁর উপর ক্ষুব্ধ হন। আইতিগীনের ক্ষমতায় উত্তরণে অন্যান্য তুর্কী মালিক ও আমীররাও সন্তুষ্ট ছিলেন না। এই সুযোগে বাহরাম আইতিগীনকে হত্যা করে কন্টকমুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেন। অতঃপর 'নায়েব-ই-মাম্‌লিকৎ' পদটি শূন্যই রাখা হয়। কিন্তু এই সময় প্রধান কঞ্চুকি (নায়েব-ই-হাজিব) বদরুদ্দিন শাংকর রুমি দ্রুত ক্ষমতার কেন্দ্রে উঠে আসেন। সুলতান বাহরাম শাহ অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করে শাংকরকে পদচ্যুত করে বদাউনের ইক্তাদার করে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু বদরুদ্দিন গোপনে দিল্লীর রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করলে বাহরাম তাকে হত্যা করেন।

আইতিগীন, বদরুদ্দিন, তাজউদ্দিন মুসাভী প্রমুখ ক্ষমতাবান ও প্রভাবশালী তুর্কী আমীরদের হত্যাকাণ্ড, বাহরাম সম্পর্কে অন্যান্য আমীর-মালিকদের শংকিত করে তোলে। বাহরাম কিছু ধর্মীয় নেতাকে কঠোর দণ্ড দেবার ফলে উলেমারও তাঁর বিরুদ্ধে তুর্কী অভিজাতদের সাথে হাত মেলান। এই সময় মোঙ্গলগণ পাঞ্জাব আক্রমণ করলে উজীর মুহজাবউদ্দিন তাঁর সুলতান বিরোধী ষড়যন্ত্রকে চূড়ান্ত রূপ দেবার সুযোগ পান। লাহোরের শাসনকর্তা মালিক কারাকাশ-এর সাহায্যার্থে বাহরাম সুলতানি-বাহিনী পাঞ্জাবে প্রেরণ করেন। এই দলে উজীব মুহজাবউদ্দিনও ছিলেন। ধূর্ত এবং অকৃতজ্ঞ উজীরের পরামর্শে বাহরাম এক আদেশনামা জারি করে বিদ্রোহী তুর্কী আমীরদের পাঞ্জাবের মাটিতেই চরম শাস্তিদানের নির্দেশ দেন। কুচক্রী মুহজাবউদ্দিন এই আদেশনামা তুর্কী আমীর ও মালিকদের সামনে প্রকাশ করে তাদের সুলতানের চরম শত্রুতে পরিণত করেন এবং সবাই জোটবদ্ধ হয়ে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করে বাহরাম শাহকে বন্দী ও হত্যা করেন (১২৪২ খ্রীঃ)।

○ আলাউদ্দিন মাসুদ শাহ (১২৪২-'৪৬ খ্রীঃ) ঃ

বাহরাম শাহের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে তুর্কী আমীররা যে ঐক্যবোধের জন্ম দিয়েছিলেন, তাতে তাঁদের মধ্যে যে কেউ দিল্লীর সিংহাসন দখল করে নতুন রাজতন্ত্রের সূচনা করতে পারতেন। কিন্তু আমীরদের পারস্পরিক ঈর্ষা ও সন্দেহ-প্রবণতা তাদের অচিরেই বিচ্ছিন্ন করে দেয়। যাই হোক, বাহরামকে হত্যা করার পর তুর্কী অভিজাতগণ ইলতুৎমিসের পৌত্র তথা রুকন্‌উদ্দিন ফিরুজের পুত্র মাসুদকে দিল্লীর সিংহাসনে বসান। অভিজাতবর্গের হাতের পুতুল মাসুদ শাহ নামে-মাত্র সুলতান থাকেন। সমস্ত ক্ষমতা বণ্টিত হয় চল্লিশ চক্রের (চাহেলগান) তুর্কী আমীরদের মধ্যে। এই পর্বের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল চল্লিশ আমীরের অন্যতম সদস্য বাহাউদ্দিন বলবনের উত্থান। ক্ষমতালোভী তুর্কী আমীর ও মালিকদের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিচ্ছিন্নতাকামী কর্মকাণ্ডের সুযোগে বাহাউদ্দিন ক্রমশ ক্ষমতার শীর্ষে আরোহন করেন। 'আমীর-ই-হাজিব'-পদে আসীন এই তুর্কী যুবক নিজ দক্ষতা, ব্যক্তিত্ব ও বিচক্ষণতা দ্বারা নায়েব-ই-মাললিকত্ কিংবা উজীরের পালের হাওয়া কেড়ে নিতে সক্ষম হন। মোঙ্গলদের আক্রমণ, রাজপুতদের বিদ্রোহ, বাংলা, বিহার, অযোধ্যা, মুলতান, উচ্ প্রভৃতির স্থানীয় প্রশাসকদের স্বাধীন ও বিচ্ছিন্নতাবাদী

কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে বলবনের লড়াই তাঁকে চল্লিশচক্রের নেতৃত্বের পথে অনেকটাই এগিয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত মাসুদ শাহকে সরিয়ে ইলতুৎমিসের পুত্র নাসিরুদ্দিন মামুদকে দিল্লীর সিংহাসনে বসানোর কাজও বলবনের নেতৃত্বে সম্পন্ন হয় (১২৪৬ খ্রীঃ)।

○ নাসিরুদ্দিন মামুদ (১২৪৬-'৬৬ খ্রীঃ) ঃ

তুর্কী অভিজাতদের হাত ধরে নাসিরুদ্দিন সুলতানি মসনদে বসেছিলেন (১২৪৬ খ্রীঃ)। ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন দয়ালু, ধর্মপ্রাণ ও সহজ-সরল চরিত্রের অধিকারী। তাঁর জীবন-যাপন পদ্ধতি ছিল খুবই অনাড়ম্বর। সময় অতিবাহিত করার জন্য তিনি কোরান নকল করতে ভালবাসতেন। নাসিরুদ্দিনের সততা ন্যায়পরায়ণতা প্রসঙ্গে সমকালীন জনৈক ইতিহাসবিদ্ লিখেছেন যে, একদিন তাঁর স্ত্রী (বলবনের কন্যা) রান্নার সময় আঙ্গুল পুড়িয়ে ফেলেন এবং একজন পরিচারিকা রাখার জন্য নাসিরুদ্দিনকে অনুরোধ করেন। কিন্তু সুলতান তাঁর দাবি নস্যাৎ করে দেন এই যুক্তিতে যে, *"তিনি জনগণের অর্থসম্পদের রক্ষক মাত্র, নিজের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তা ব্যবহারের অধিকার তাঁর নেই।"* অবশ্য আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে, এই বক্তব্যে অতিরঞ্জনের ছাপ স্পষ্ট। কারণ যে বলবন ছিলেন রাষ্ট্রক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু, তাঁর কন্যার এই সামান্য দাবি অপূর্ণ থাকবে, একথা স্বীকার করা যায় না। যাই হোক, নাসিরুদ্দিন ছিলেন নমনীয় চরিত্রের অধিকারী এবং হস্তাক্ষরবিদ্যায় পারদর্শী। অতি অল্পে সন্তুষ্ট এই যুবক-সুলতান রাজনীতির জটিলতার পরিবর্তে কোরান নকল করে সময় অতিবাহিত করাতেই বেশি আনন্দ পেতেন।

সুলতান ইলতুৎমিসের আমলে The Forty বা *'বন্দেগান-ই-চাহেলগান'* নামে খ্যাত চল্লিশ জন তুর্কী আমীরের যে কর্তৃত্বের সুচনা হয়েছিল, রাজিয়ার মৃত্যুর পরবর্তীকালে তা চূড়ান্ত আকার পায়। স্বভাবতই নাসিরুদ্দিনের মত অল্পবয়সী এবং সাদাসিধে সুলতানের পক্ষে 'চল্লিশ-আমীর'কে অস্বীকার করা সম্ভব ছিল না। এই গোষ্ঠীর নেতা হিসেবে বাহাউদ্দিন বলবন নাসিরুদ্দিনের আমলে রাষ্ট্রক্ষমতার শীর্ষে অধিষ্ঠিত হন। ১২৪৯ খ্রীষ্টাব্দে নিজকন্যার সাথে সুলতান নাসিরুদ্দিনের বিবাহ দিয়ে নিজ কর্তৃত্বকে বলবন আরো মজবুত করেন। একই বছরে বলবন *'নায়েব-ই-মামলিকাত্'* পদে আসীন হন। অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দপ্তরে নিজ আত্মীয় ও একান্ত বিশ্বস্ত-তুর্কী আমীরদের বসিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা কুক্ষিগত করেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই বলবনের প্রতি ক্ষুব্ধ এবং ঈর্ষান্বিত তুর্কী আমীরদের সহায়তায় নাসিরুদ্দিন নিজ ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার একটা উদ্যোগ নেন (১২৫৩ খ্রীঃ)। বলবনকে নিজরাজ্য হান্সীতে ফিরে যাবার নির্দেশ দেওয়া হয়। তাঁর পদে বসানো হয় ইতমাদউদ্দিন রাইহানকে। আবুবকরের পরিবর্তে উজীর-পদে বসানো হয় জুনাইদিকে। বলবনের ভাই এবং ভ্রাতুষ্পুত্র প্রমুখকেও পদচ্যুত করে প্রদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অবশ্য এই পরিবর্তন দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। কারণ হিন্দুস্তানী মুসলমান রাইহানের ক্ষমতাবৃদ্ধি অচিরেই তুর্কী-আমীরদের মর্যাদায় আঘাত করে। বলবনের নেতৃত্বে তুর্কী-আমীররা নাসিরুদ্দিনের উপর চাপ সৃষ্টি করে রাইহানকে পদচ্যুত করে বলবনকে পুনরায় *'নায়েব-ই-মামলিকাত'*-পদে প্রতিষ্ঠিত করতে সুলতানকে বাধ্য করেন। এই নীরব প্রাসাদ বিপ্লবের (১২৫৪ খ্রীঃ) পর বলবন আমৃত্যু দিল্লী-সুলতানির প্রধান ব্যক্তিত্বে অধিষ্ঠিত থাকেন।

১২৫৪ থেকে ১২৬৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নাসিরুদ্দিন সুলতান থাকলেও সমস্ত সুলতানি নিয়ন্ত্রিত হত বলবনের নির্দেশে। বস্তুত এই পর্বে বলবন তাঁর সংগঠনী শক্তির সফল প্রয়োগ দ্বারা দিল্লী-সুলতানির ভিত্তিকে মজবুত করে তোলেন। অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন, বহিরাগত মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহতকরণ এবং তুর্কী-অভিজাতদের কঠোর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে স্থাপন করে বলবন অনন্য শক্তি ও আস্থা অর্জন করেন। ফলে সুলতান নাসিরুদ্দিন মাত্র ৩৬ বছর বয়সে অকস্মাৎ মৃত্যুবরণ করলে (১২৬৬ খ্রীঃ) বলবন স্বয়ং দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। *ফিরিস্তি, ইসামী* প্রমুখ মনে করেন, ক্ষমতালোভী বলবন অপুত্রক নাসিরুদ্দিনকে হত্যা করে মসনদ দখল করেছিলেন। অধ্যাপক ***নিজামীও*** এঁদের সাথে সহমত পোষণ করেন। কিন্তু *ড. **হবিবউল্লাহ্**, উলসী হেগ* প্রমুখ মনে করেন, নাসিরুদ্দিনের মৃত্যু ছিল স্বাভাবিক এবং আকস্মিক। যেহেতু তাঁর কোন উত্তরাধিকারী ছিল না, তাই বলবন স্বয়ং মসনদে বসে সাম্রাজ্য রক্ষার দায়িত্ব নেন।

নাসিরুদ্দিন মামুদের রাজত্বকালের বিস্তৃতি ছিল কুড়ি বছর। এমন একজন নমনীয়, ব্যক্তিত্বহীন, সাদাসিধে ব্যক্তির পক্ষে যুদ্ধপ্রিয় তুর্কীজাতির প্রধান হিসেবে দিল্লীর সিংহাসনে দীর্ঘ দু'দশক টিকে থাকা অবশ্যই বিস্ময়কর। এই বিস্ময়কর অবস্থার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় *ড. **হবিবউল্লাহ'র*** বক্তব্যে। তিনি লিখেছেন, *'মামুদ রাজত্ব করতেন কিন্তু শাসন করতেন না।'* তথাপি তিনি টিকেছিলেন কারণ তুর্কী অভিজাতদের ক্ষমতার দ্বন্দ্বে তিনি যথার্থ শক্তির উপর আস্থাবান ছিলেন। তাঁর নমনীয়তা এবং দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির অভাব অবশ্যই যুগোপযোগী ছিল না। কিন্তু বাহাউদ্দিন বলবনের সুনেতৃত্বে নাসিরুদ্দিনের রক্ষাকবচের কাজ করেছিল। *ড. **হবিবুউল্লাহ'র*** ভাষায় ঃ *"A change on the throne became necessary even in his own times but Mahmud escaped his brother's fate because of the loyal and devoted service of his naib Bahauddin Balban, the Ulugh Khan."*

○ গিয়াসুউদ্দিন বলবন (১২৬৬-'৮৭ খ্রীঃ) ঃ

আদি পর্বের সুলতানদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হিসেবে চিহ্নিত, গিয়াসুদ্দিন বলবনের বাল্যনাম ছিল বাহাউদ্দিন। কৈশোরে মোঙ্গলগণ কর্তৃক ধৃত বাহাউদ্দিন 'দাস' হিসেবে বশরার খাজা জামালউদ্দিনের কাছে বিক্রীত হন। জামালউদ্দিনের কাছ থেকে তাঁকে ক্রয় করেন দিল্লীর সুলতান ইলতুৎমিস। বলবনের দক্ষতা ও বিশ্বস্ততায় মুগ্ধ হয়ে ইলতুৎমিস তাঁকে বিখ্যাত *'তুর্কান-ই-চাহেলগান'*-এর সদস্য মনোনীত করেন এবং নিজকন্যার সাথে বলবনের বিবাহ দেন। রাজিয়ার আমলে বলবন *'আমীর-ই-শিকার'*-পদে উন্নীত হন। প্রাথমিক পর্বে বলবন রাজিয়ার সমর্থক ছিলেন। কিন্তু ইয়াকুৎ নামক হাবসী ক্রীতদাসের সাথে রাজিয়ার ঘনিষ্ঠতায় ক্ষুব্ধ হয়ে বলবন রাজিয়ার বিরুদ্ধাচারণ করেন এবং বাহরাম শাহ'কে সুলতান-পদে বসানোর ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা নেন। এর পুরস্কার স্বরূপ তিনি রেওয়ার ও হান্সীর 'জায়গির' লাভ করেন। পরবর্তী সুলতান মাসুদ শাহের আমলে বলবন প্রধান কঞ্চুকীর পদে উন্নীত হন। এই সময় মোঙ্গল-নেতা মঙ্গুর আক্রমণের বিরুদ্ধে বলবন তাঁর অদম্য সাহসিকতা ও সামরিক প্রতিভার পরিচয় দেন। রাজপুত উপজাতির বিরুদ্ধেও তিনি সফল অভিযানের নেতৃত্ব দেন। ফলে 'চল্লিশ তুর্কী'র মধ্যে বয়ঃকনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও বলবনের কর্তৃত্ব ও মর্যাদা অন্যান্যদের অতিক্রম করে যায়। মাসুদ

শাহের অপসারণ এবং নাসিরুদ্দিন মামুদকে দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করার ষড়যন্ত্রেও বলবন মুখ্য ভূমিকা নেন।

নাসিরুদ্দিনের কুড়ি বছরের শাসনপর্বে এক বছরের (১২৫৩ খ্রীঃ) বিরতি ছাড়া বলবনই ছিলেন প্রকৃত শাসক। অধ্যাপক নিজামীর ভাষায় বলা চলে, এই পর্বে *'নাসিরুদ্দিন রাজত্ব করতেন, কিন্তু শাসন পরিচালনা করতেন বলবন।'* এই সময়ে বলবন তাঁর ভবিষ্যৎ উন্নতির সোপান তৈরি করেন। খোকর উপজাতি এবং মেওয়াটী দস্যুদের দমন করে, বাংলার বিদ্রোহী শাসক তুঘান তুঘ্রিল খাঁকে বশীভূত করে, পারস্যের মোঙ্গল শাসনকর্তা হলাগুর সাথে সমঝোতার মাধ্যমে আক্রমণের সম্ভাবনা হ্রাস করে বলবন দিল্লীর সুলতানি সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা ও নিরাপত্তা বিধান করেন। অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত সমস্যার সমাধানে তাঁর এই সাফল্য স্বভাবতই তুর্কী অভিজাতদের উপর বলবনের প্রভাব দৃঢ়তর করে এবং সুলতান নাসিরুদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁর সিংহাসন লাভ ঘটনার অনিবার্য পরিণতি হিসেবেই আসে।

○ বলবনের সমস্যাবলী ও তার সমাধান ঃ

বলবনের সিংহাসনারোহণের মুহূর্তে দিল্লীর সুলতানি সাম্রাজ্য বহুমুখী সমস্যায় আকীর্ণ ছিল। ***প্রথমত,*** বলবন *'তুর্কান-ই-চাহেলগান'*-এর সদস্য হিসেবে 'চল্লিশ চক্রের' ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন। যে সোপান বেয়ে তিনি ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করেছেন, তা অন্য কেউ যাতে ব্যবহার করতে না পারে সে সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। তাই 'চল্লিশ চক্রের' ক্ষমতা হ্রাস করা আবশ্যিক হয়েছিল। ***দ্বিতীয়ত,*** *'নায়েব-ই-মামলিকৎ'* হিসেবে বলবন নৃশংস অত্যাচার দ্বারা বহু অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করেছেন। কিন্তু দেশীয় শক্তিগুলির বিদ্রোহ-প্রবণতা ধ্বংস করতে পারেন নি। দিল্লীর নিকটবর্তী অঞ্চলে মেওয়াটী দস্যুদের ক্রিয়াকলাপ, দোয়াব, অযোধ্যার বাণিজ্যপথ এবং রোহিলাখণ্ডের (কাটেহার) অস্থিরতা ও আইনশৃঙ্খলার ভাঙ্গন সুলতানি সাম্রাজ্যের অস্তিত্বের সামনে সংকট সৃষ্টি করেছিল। বলবন উপলব্ধি করেন যে, সুলতান হিসেবে তাঁর মর্যাদা নিরূপিত হবে শান্তি তথা ন্যায় প্রবর্তনে তাঁর সাফল্যের নিরিখে। এবং সে কাজের জন্য আবশ্যিক ছিল একটি স্থায়ী ও শক্তিশালী সেনাবাহিনী। ***তৃতীয়ত,*** ইলতুৎমিসের মৃত্যুর পরবর্তীকালে দুর্বল শাসকদের আমলে উদ্ভূত রাজনৈতিক অস্থিরতা জনসাধারণের মনে সুলতানির প্রতি গভীর অনাস্থার জন্ম দিয়েছিল। দীর্ঘস্থায়ী অনাস্থা জন্ম দিয়েছিল অবজ্ঞাবোধের। উদ্ভূত পরিস্থিতির বর্ণনা প্রসঙ্গে ***জিয়াউদ্দিন বরণী*** লিখেছেন ঃ ***"Fear of the Governing power, which is the basis of all good government, and the source of the glory and splendour of the state, had departed from the hearts of all men and the country had fall into a wretched condition."*** ***চতুর্থত,*** মোঙ্গলদের পুনঃপুন আক্রমণ সুলতানি সাম্রাজ্যের মর্যাদা ও স্থায়িত্বের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল। অতীতে জনগণের জীবন রক্ষা করা সম্ভব হলেও মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধের কিংবা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপথের নিরাপত্তার কোন স্থায়ী ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। ফলে সীমান্ত-সমস্যা পূর্ববৎ প্রকট ছিল।

অভিজ্ঞ শাসক বলবন ধীরে অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে এক-একটি সমস্যার মূলোৎপাটনে

আত্মনিয়োগ করেন। ***বরণী*** লিখেছেন যে, বলবন তাঁর রাজত্বের প্রথম বছরটি দিল্লী ও নিকটবর্তী অঞ্চলের আইনশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যয় করেন। এক্ষেত্রে তাঁর প্রধান শত্রু ছিল মেওয়াটী দস্যুগণ। এদের ভয়ে বণিকের দল বাণিজ্য করতে পারত না। সাধারণ মানুষ রাত্রিকালে নির্ভয়ে নিদ্রা যেতে পারত না। দাস-রমণীরা জলসংগ্রহের জন্য প্রধান ফটকের বাইরে গেলে এদের হাতে হেনস্থা হত নানাভাবে। এমনকি এদের ভয়ে মধ্যাহ্নকালীন প্রার্থনার সময় রাজধানীর পশ্চিম ফটক বন্ধ করে রাখতে হত। বলবন এই অবস্থার অবসানকল্পে দিল্লীর চতুষ্পার্শ্বস্থ বনজঙ্গল কেটে পরিষ্কার করে দেন। অতর্কিত আক্রমণ দ্বারা হত্যা করেন বহু মেওয়াটীকে। গোপালগীরে একটি দুর্গ নির্মাণ করে এবং একাধিক পুলিশচৌকি নির্মাণ করে সেগুলির দায়িত্বে আফগান সৈন্যদের নিয়োজিত করেন। এই সকল চৌকির ব্যয়বহনের জন্য নিষ্কর জমি বন্দোবস্ত দেন। সুলতানি বাহিনীর নিরন্তর নজরদারির ফলে দিল্লী দীর্ঘদিনের এক অভিশাপমুক্ত হয়। ***বরণী*** লিখেছেন ঃ *"The Sultan with his sword secured many people of God from being molested and plundered by the Meos."*

মেওয়াটীদের দমন করার পর বলবন গঙ্গা-যমুনা-দোয়াব অঞ্চল এবং অযোধ্যার নিরাপত্তাবিধানে যত্নবান হন। দোয়াবের বিভিন্ন অংশে দক্ষ-ইক্‌তাদার নিযুক্ত করে তিনি আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী যে-কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে চরম শাস্তিবিধানের নির্দেশ দেন। ***বরণী*** লিখেছেন যে, দক্ষ ইক্‌তাদাররা নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে বিদ্রোহী প্রজাদের উপর নির্মম অত্যাচার চালিয়ে দোয়াবে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। অযোধ্যায় বাণিজ্যপথ তস্করমুক্ত করার জন্য বলবন স্বয়ং কাম্পিল ও পাতিয়ালিতে গিয়ে শিবির স্থাপন করে বসেন। দুষ্কৃতীদের প্রধান ঘাঁটি কাম্পিল, পাতিয়ালি এবং ভোজপুরে তিনটি দুর্গ-নির্মাণ করে আফগান সেনাদের দায়িত্বে অর্পণ করেন। এইভাবে দোয়াব অঞ্চল ও অযোধ্যার বাণিজ্যপথের নিরাপত্তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

দোয়াব অঞ্চলের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যস্ত থাকার সময় বলবন বদাউন, আমরোহা অঞ্চলে কাটেহার হিন্দু বিদ্রোহীদের কার্যকলাপের বিষয় অবহিত হন। কাটেহার (বর্তমানে রোহিলাখণ্ড)-এর বিদ্রোহীরা স্থানীয় ইক্‌তাদারদের পর্যন্ত ভয় করত না। এদের ক্ষমতায় ভীতসন্ত্রস্ত ওয়ালিরা (জেলা-প্রশাসক) বিনা প্রতিবাদে সবকিছু মেনে নিত। দোয়াবে নিরাপত্তাবিধানের পর বলবন দিল্লী হয়ে কাটেহার উপস্থিত হন। ***বরণী*** লিখেছেন, *'বলবন পৈশাচিক বর্বরতা দ্বারা বিদ্রোহীদের দমন করেন। বিদ্রোহীদের রক্তে কাটেহারের ভূমি রঞ্জিত হয়। স্তূপীকৃত শবের পূতিগন্ধ গঙ্গার তীর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।'* কিন্তু অধ্যাপক *নিজামী* মনে করেন, বরণীর বিবরণে অতিরঞ্জন আছে। কারণ যেহেতু উক্ত অঞ্চলের কৃষকদের নিরাপত্তাবিধানের জন্য অভিযানে গিয়েছিলেন, সেহেতু এত ব্যাপক হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হওয়া সম্ভব ছিল না। যাই হোক, বলবনের দৃঢ়তার ফলে কাটেহার অঞ্চলে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর বলবন যুদ অঞ্চলে (Salt Range) অভিযান চালিয়ে পার্বত্য উপজাতিদের দমন করেন।

এই সকল অভিযান দ্বারা বলবন যেমন সুলতানের কর্তৃত্ব ও আইনের শাসন প্রবর্তন করেন, তেমনি তিনি বহুসংখ্যক অশ্ব দখল করতে পারেন।

○ সাম্রাজ্য সুদৃঢ়করণ নীতি ঃ

ঐতিহ্য অনুযায়ী বলবনের পক্ষে সাম্রাজ্যবাদী শাসক হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। সিংহাসন দখল করার পরে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা দমন করেন। অতঃপর নতুন রাজ্য জয় করে দিল্লীর সুলতানি সাম্রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধি করাই ছিল পরিস্থিতির স্বাভাবিক পরিণতি। কিন্তু বলবন ছিলেন প্রকৃত অর্থেই বাস্তববাদী শাসক। তাই নতুন নতুন রাজ্য দখল করার পরিবর্তে তিনি তৎকালীন সুলতানি সাম্রাজ্যের সুদৃঢ়করণকেই প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন। অধ্যাপক ***নিজামী*** লিখেছেন ঃ *"Though every inch an imperialist, he prefered to adopt a policy of consolidation."* তাঁর এই সিদ্ধান্ত ছিল বাস্তব পরিস্থিতির অনুসারী। বিচক্ষণ শাসক বলবন অনুধাবন করেছিলেন যে, হিন্দু রাজপুত-সহ ভারতীয় শাসকদের স্বাধীনতাকামিতা এবং দুর্ধর্ষ মোঙ্গলদের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপথ বারবার আক্রমণের ঘটনা সুলতানি সাম্রাজ্যের সংহতি ও স্থায়িত্বের পক্ষে বিপজ্জনক। তাঁর দুই বিশ্বস্ত সেনাপতি আদিল খাঁ ও অমর খাঁ বলবনকে গুজরাট ও মালব জয় করে আইবকের সুলতানি সাম্রাজ্যকে পূর্বরূপ দেবার পরামর্শ দিলে বলবন উত্তরে বলেছিলেন ঃ *'এই বিশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তাহীনতার দিনে, যখন মোঙ্গলরা ইসলামের অধিকাংশ অঞ্চল দখল করে নিয়েছে, লাহোরকে বিধ্বস্ত করেছে এবং সেখান থেকে ভারতের বিরুদ্ধে বছরে অন্তত একবার আক্রমণ শানাচ্ছে, তখন দিল্লী ত্যাগ করে দূরদেশে অভিযানে বের হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। বিদেশী রাজ্য আক্রমণ ও দখল করার থেকে নিজরাজ্যের বিশৃঙ্খলা অবস্থার অবসান করে শান্তি-সংহতি পুনঃস্থাপন করা অধিক ভাল।'* মোঙ্গল আক্রমণের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, *'আমি যদি সুযোগ পাই, অবশ্যই অবশিষ্ট হিন্দুস্থানকে পদানত করে আমার সাম্রাজ্যের সীমানা সম্প্রসারিত করব।'*

○ রাজতান্ত্রিক আদর্শ ঃ

দিল্লীর সুলতানদের মধ্যে একমাত্র বলবন রাজতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর আদর্শ ও নীতি সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেছেন। জিয়াউদ্দিন বরণীর ***'ফতোয়া-ই-ফিরোজশাহী'*** গ্রন্থে বলবনের রাজতন্ত্রের আদর্শ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে ইসামী কিছু না-বলার ফলে বিষয়টির যথার্থতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। কারণ বরণী নিজেও বংশমর্যাদা বা জাতপাতের ভেদাভেদ সম্পর্কে বেশ গোঁড়া ছিলেন। বলবনের রাজতন্ত্রের আদর্শেও বংশমর্যাদার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হিসেবে গৃহীত হয়েছে। তাই এ সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে, বরণী তাঁর নিজের মনোভাব কোন কোন ক্ষেত্রে বলবনের মুখ দিয়ে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। যাই হোক, নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাবহেতু বরণীর বক্তব্যকেই সঠিক বলে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

রাজতন্ত্রের মর্যাদা ও সুলতানের শক্তিবৃদ্ধির গুরুত্ব সম্পর্কে বলবন সদা-সচেতন ছিলেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন, একমাত্র এইভাবেই ব্যক্তিগতভাবে তাঁর এবং সামগ্রিকভাবে সুলতানির অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব রক্ষা করা সম্ভব। বলবন নিজে ছিলেন ক্রীতদাস। দক্ষতার জোরে তিনি তুর্কান-ই-চাহেলগানী'র সদস্য হয়েছেন এবং ইলতুৎমিসের মৃত্যুর পরবর্তীকালে ইচ্ছামত

সুলতানি প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন। তুর্কী আমীর ও মালিকদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা যে সুলতান তথা সুলতানি সাম্রাজ্যের স্বাভাবিক বিকাশের পথে প্রধান অন্তরায়, এ সত্য তিনি উপলব্ধি করেছিলেন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে। তাই বলবন সুলতান এবং রাজতন্ত্রকে মর্যাদা ও কর্তৃত্বের এমন একটা স্তরে উন্নীত করতে চেয়েছিলেন, যাকে স্পর্শ করা তুর্কী আমীর বিশেষত, চাহেলগানীর সদস্যদের পক্ষে কেবল অসম্ভব নয়, অবাস্তব বলে মনে হবে। এই লক্ষ্যের সহায়ক হিসেবে ঘোষিত হয়েছিল তাঁর রাজতন্ত্রের আদর্শ। অধ্যাপক ***নিজামী*** তাই লিখেছেন : *"Apart from everything else it necessitated the re-establishment of the power and dignity of the Delhi Sultan and for India—a new, if transient, theory of kingship."*

বলবন পারস্যের সাসানীয় বংশের রাজতান্ত্রিক আদর্শের অনুকরণে তাঁর নরপতিত্বের আদর্শ প্রচার করেন। তিনি বলেন মানুষের পৃথিবীতে রাজা হলেন ঈশ্বরের প্রতিনিধি। বলবন নিজেকে *'খোদার নায়েব'* (নিয়াবৎ-ই-খুদাই) এবং *'ঈশ্বরের ছায়া'* (জিলুল্লাহ) বলে ঘোষণা করেন। তাঁর মতে, রাজার হৃদয় হল ঈশ্বরের স্বর্গীয় ধ্যান-ধারণার ভাণ্ডার এবং এখান থেকেই ঈশ্বরের ইচ্ছা জনগণের মধ্যে বিকিরিত হয়। রাজার ক্ষমতা ও মর্যাদা প্রসঙ্গে ***বলবন*** একদা তাঁর পুত্র বুগরা খাঁকে বলেছিলেন : *"The heart of the king is the special repository of God's favour and in this he has no equal among mankind."* এর দ্বারা তিনি রাজতন্ত্রের ঐশ্বরিক উৎস এবং অভিজাতবর্গ কিংবা প্রজাসাধারণের থেকে রাজার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও কর্তৃত্বের তত্ত্ব প্রচার করেন। ইতিমধ্যে মুসলিম অধিকৃত অধিকাংশ অঞ্চল মোঙ্গলদের অধীনে চলে গিয়েছিল। খলিফারও পতন ঘটেছিল। কিন্তু বলবন তাঁর রাজতন্ত্রের প্রতি খলিফার স্বীকৃতির কথা প্রায়শই প্রচার করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, মুসলিম রাজতন্ত্রের প্রধান শাসক হিসেবে খলিফার অনুমোদন আবশ্যিক। তাঁর মুদ্রায় খলিফার নাম উল্লেখ করে এবং খুৎবায় তাঁর নাম পাঠ করে তিনি ইসলামীয় রাজতন্ত্রের ঐতিহ্য রক্ষা করেন।

রাজার স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদার অসাধারণত্বকে তিনি রাজতন্ত্রের পক্ষে আবশ্যিক বলে মনে করতেন। নিজেকে তিনি পারস্যের বিখ্যাত আফ্রিসিয়াব বংশের শরিক বলে ঘোষণা করেন এবং অভিজাতবংশীয় নয় এমন কোন ব্যক্তির সংস্পর্শে আসাকে রাজার মর্যাদার হানিকর বলে বিশ্বাস করতেন। সাধারণ মানুষের সাথে বাক্যালাপকে তিনি ঘৃণা করতেন। এমনকি রাজকীয় পদে বংশ কৌলীন্যহীন কোন ব্যক্তির নিয়োগ তাঁর কাছে ছিল অমার্জনীয় অপরাধ। নীচবংশোদ্ভূত মানুষ সম্পর্কে বলবনের উক্তি পাওয়া যায় বরণীর গ্রন্থে। ***বলবন*** বলেছিলেন : *'যখনই আমি নীচবংশোদ্ভূত মানুষ দেখি, তখন রাগে আমার প্রতিটি শিরা-উপশিরা জ্বলতে শুরু করে। তাকে হত্যা করার জন্য আমি তরবারির দিকে হাত বাড়াই।'* ***বরণী*** আরো লিখেছেন, *'একদিন রাজসভা চলাকালে বলবন যখন জানতে পারেন কমল মাহিয়ার নামক জনৈক ধর্মান্তরিত মুসলমানকে আমরোহার মুতাশরিফ পদে নিয়োগ করা হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে তিনি উত্তেজিত হয়ে ওঠেন এবং সভাকক্ষ ত্যাগ করে চলে যান।'* ***'মকতুবৎ-ই-আসরিফ'*** গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, বলবন সরকারি পদে নিয়োগের পূর্বে সমস্ত পদপ্রার্থীর বংশকৌলীন্য পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাই করার ব্যবস্থা করেন। এজন্য বহু কুলাচার্য নিয়োজিত ছিলেন।

বলবন তাঁর রাজতান্ত্রিক আদর্শের পরিপূরক হিসেবে দরবারী আদব-কায়দা ঢেলে সাজান। দরবারে তিনি পারসিক রীতি-নীতি অনুসরণের কঠোর নির্দেশ দেন। সুসজ্জিত পোশাক এবং উন্মুক্ত তরবারি হস্তে বিশেষ রাজকীয়-বাহিনী দ্বারা পরিবৃত না-হয়ে তিনি কখনো দরবারে বা জনসমক্ষে বের হতেন না। দরবারে লঘু চপলতা বা হাস্য-পরিহাস ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তিনি মদ্যপানও নিষিদ্ধ করে দেন। পারসিক রীতি অনুযায়ী সুলতানের সামনে আসার সময় 'সিজদা' অর্থাৎ নতজানু হয়ে প্রণাম এবং 'পাইবস' অর্থাৎ সিংহাসনের পদচুম্বন করার নিয়ম প্রবর্তন করেন। যোড়শ শতকের জনৈক লেখক ***ফাজুনী অস্তারবাদী*** লিখেছেন যে, *"সুলতানের মুখমণ্ডল সর্বদা এক অদৃষ্টপূর্ব গাম্ভীর্য দ্বারা আবৃত থাকত, যাতে তাঁর দাম্ভিকতামিশ্রিত ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠত। দরবারে তিনি অতি নিম্নস্বরে একমাত্র উজীরের মাধ্যমে অভিযোগ শুনতেন এবং প্রতিবিধানের নির্দেশ দিতেন।"* ***লেনপুল*** লিখেছেন, দীর্ঘ শাসনকালে তিনি এক মুহূর্তের জন্যও কোন সাধারণ মানুষের সাথে কথোপকথোন করেন নি। প্রিয়পুত্র মহম্মদের মৃত্যুসংবাদ শুনেও তিনি দরবারে অচঞ্চল থাকেন, যদিও আপন কক্ষে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। বছরের বিশেষ বিশেষ দিনে বহু অর্থ ব্যয় করে দরবার সাজানো হত। দরবারের জাঁকজমক ও চাকচিক্যে ঝল্‌সে যেত সাধারণ মানুষের দৃষ্টি। ***বরণী*** লিখেছেন ঃ *"The shining of the sum, the glittering of the sword's and the brightness of the face (of Balban) all taken together made remarkable show."* এইভাবে শক্তি, মর্যাদা ও কর্তৃত্বের সম্মিলিত প্রকাশ দেশের অবাধ্য শক্তিগুলিকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করত এবং সাধারণ মানুষের হৃদয়ে সম্ভ্রম ও সন্ত্রাসের সঞ্চার করত,—যা ছিল বলবনের রাজাদর্শের মূল লক্ষ্য।

বলবনের রাজাদর্শের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল তুর্কী আমীর ও মালিকদের এবং সিংহাসনে আসীন রাজার মধ্যে অবস্থানগত এবং অনতিক্রম্য তারতম্যের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা। বলবন তাঁর একদা সহকর্মী চল্লিশচক্রের ক্ষমতাবান ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী আমীরদের মাঝে মাঝেই স্মরণ করিয়ে দিতেন যে, ষড়যন্ত্র বা গুপ্তহত্যা দ্বারা অভিজাতদের ক্ষমতা অর্জন বা বৃদ্ধি করা যায় ; কিন্তু রাজপদ শুধুমাত্র বিষ বা তরবারি দ্বারা অর্জনের বস্তু নয়। এজন্য প্রয়োজন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অনুমতি ও সাহায্য। তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী এই পদে উন্নীত হয়েছেন ; সাধারণের ইচ্ছায় নয়। তাই তাঁর কাজের কৈফিয়ত তিনি ঈশ্বর ছাড়া অন্য কারো কাছে দিতে বাধ্য নয়। ঈশ্বরের প্রতিভূ হিসেবে তিনি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকে রাজার কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করেন। অধ্যাপক ***নিজামীর*** ভাষায় ঃ *"Balban realised that his position as a sultan would be judged by the peace or the justice he gave to the country."* জনগণের আস্থা অর্জনের জন্য তিনি বিচারব্যবস্থায় পক্ষপাতিত্ব করার বিরোধী ছিলেন। এমনকি অপরাধী অভিজাতদের উপযুক্ত শাস্তি বিধানেও তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন না। নিজের গৃহভৃত্যকে পিটিয়ে হত্যা করার অপরাধে বলবন বদাউনের শাসক মালিক বারবককে প্রকাশ্যে বেত্রাঘাতের নির্দেশ দেন। অযোধ্যার গভর্নর হায়বৎ খাঁকে মদ্যপ অবস্থায় এক ব্যক্তিকে হত্যা করার অপরাধে পাঁচ শত বেত্রাঘাতের ও নিহত ব্যক্তির বিধবা-পত্নীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার আদেশ দেন। কথিত আছে হায়বৎ খাঁ অপমানে জর্জরিত হয়ে আমৃত্যু আর লোকচক্ষুর সামনে বের হন নি। চাহেলগানীর অন্যতম সদস্য-তথা আযোধ্যার গভর্নর আমীর খাঁ বাংলাদেশের বিদ্রোহদমনে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলে বলবন তাঁকে অযোধ্যা

নগরীর প্রধান ফটকের কাছে প্রকাশ্যে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করেন। তুর্কী-অভিজাতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিবিধান করে বলবন দুটি উদ্দেশ্য পূরণ করেন—(১) সুলতানের ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে জনমনে আস্থা স্থাপন করেন এবং (২) তুর্কী অভিজাতদের মধ্যে এমন সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেন যাতে তাঁরা ভবিষ্যতে সুলতানের কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ জানানোর সাহস দেখাতে না পারেন।

বলবন বিশ্বাস করতেন যে, পারসিক রীতি-নীতিকে বাদ দিয়ে রাজতন্ত্রের মর্যাদা রক্ষা করা সম্ভব নয়। তাই তিনি ব্যক্তি-জীবনে ও রাষ্ট্রীয়-জীবনে অন্ধের মত পারসিক আদবকায়দা অনুসরণ করেন। সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে তাঁর দুই পুত্রসন্তান জন্মেছিলেন। তাদের নামকরণের সময় মুসলিম সাধারণ রীতি অনুযায়ী 'মামুদ' ও 'মহম্মদ' রাখেন ; কিন্তু সুলতানি সিংহাসনে বসার পরবর্তীকালে আগত পৌত্রদের সময় তিনি পারসিক ধারা অনুযায়ী কাইখসরু, কাইকোবাদ, কাইকাউস ইত্যাদি নাম ব্যবহার করেন।

সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবন প্রচারিত রাজতন্ত্রের আদর্শ আপাতদৃষ্টিতে রাজতন্ত্রের মর্যাদা বৃদ্ধি, সাম্রাজ্যের সংহতি ও নিরাপত্তাবিধান, শরিয়তের নির্দেশানুযায়ী প্রজাপালন ও ন্যায়বিচার প্রবর্তনের প্রতিশ্রুতি বহন করে এনেছিল। কিন্তু অধ্যাপক *কে. এ. নিজামী, আর. পি. ত্রিপাঠী* প্রমুখ মনে করেন, এই রাজাদর্শ প্রচারের পিছনে বলবনের ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতা ও তা থেকে উত্তরণের একান্ত ইচ্ছা কাজ করেছিল। বলবনের রাজতান্ত্রিক কোন ঐতিহ্য ছিল না। ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তিনি সিংহাসন দখল করেছিলেন এবং এ কাজে তাঁর সহযোগী ছিলেন চাহেলগানীর অন্যান্য সদস্যরা। এখন বলবন তাঁর রাজকর্তৃত্বের উপর ঐশ্বরিক অনুমোদনের ছাপ লাগিয়ে অন্যান্য আমীরদের থেকে নিজেকে পৃথক করতে এবং রাজ-কর্তৃত্বকে বৈধতা দিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। মিনহাজ-উস্-সিরাজ বা জিয়াউদ্দিন বরণী বলবনের 'দাসত্বমুক্তি' সম্পর্কে কোন উল্লেখ করেন নি। সম্ভবত বলবনের দাসত্বমুক্তি আদৌ হয়নি। তাই রাজতন্ত্রের ঐশ্বরিক তত্ত্ব প্রচার করে তিনি নিজের দুর্বলতা আড়াল করতে সচেষ্ট হন। *নিজামীও* লিখেছেন ঃ *"Perhaps he was never manumitted and this basic disqualification to rule over the people, he tried to cover under a shrewdly designed mask of 'divine commitment' of regal authority."* বলবন রাজাদর্শ হিসেবে শরিয়তি আইনের রক্ষক বা ন্যায়পরায়ণতা প্রবর্তনের যে অঙ্গীকার করেছিলেন, তা-ও ছিল ছলনা মাত্র। ***বরণী*** লিখেছেন যে, সাধারণক্ষেত্রে বলবন ন্যায়বিচারের চেষ্টা করলেও, যখন তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থবিজড়িত ঘটনার সম্মুখীন হতেন, তখন তিনি ন্যায়বোধ বা শরিয়তের বিধানের তোয়াক্কা করতেন না। একজন মধ্যযুগীয় স্বেচ্ছাচারী শাসকের মতই তিনি আচরণ করতেন। এর পরিণামে তাঁর ভাবমূর্তি ও মর্যাদা নষ্ট হয়েছিল।

○ বাংলার বিদ্রোহ দমন ঃ

দিল্লী-সুলতানির সুচনাকাল থেকেই বাংলা একপ্রকার স্বাধীন রাজ্যের মর্যাদা ভোগ করে আসছিল। কুতুবউদ্দিন আইবক এবং ইখ্‌তিয়ারউদ্দিন বখ্‌তিয়ার খলজী উভয়েই ছিলেন মহম্মদ ঘুরীর ক্রীতদাস এবং সম্ভবত সমমর্যাদাসম্পন্ন। তাই কুতুবউদ্দিন দিল্লীর শাসক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেও তিনি বাংলা-বিহারে ইখ্‌তিয়ারউদ্দিনের কর্তৃত্বের পরিধি সম্পর্কে না-হস্তক্ষেপ

নীতি অনুসরণ করে চলেন। ইখ্‌তিয়ারউদ্দিনের মত প্রতিভাবান সৈনিকের আকস্মিক মৃত্যু দুঃখজনক হলেও ; দিল্লীতে কুতুবউদ্দিনের কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ জানানোর মত সম্ভাবনাময় একটা শক্তিরও যে অবসান ঘটেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। পরবর্তী-শাসক তুঘ্রিল তুঘান খান একইভাবে বাংলার স্বাধীন অস্তিত্ব কায়েম করার চেষ্টা করেন। কিন্তু ইলতুৎমিসের বিরোধিতার সামনে পূর্ণ সাফল্য অর্জন করতে ব্যর্থ হন। ইলতুৎমিসের মৃত্যুর পরবর্তী কয়েক বছর দিল্লী-সুলতানির অস্থিরতা ও দুর্বল শাসকদের ক্ষমতালোভের ফলে বাংলাদেশ একপ্রকার স্বাধীনভাবেই শাসিত হতে থাকে। বলবন সিংহাসন দখল করলে লখ্‌নৌতির গভর্নর তাতার খাঁ তেষট্টিটি হাতি দিল্লীতে উপঢৌকন হিসেবে প্রেরণ করে সুলতানের প্রতি বাংলার আনুগত্য প্রদর্শন করেন। অধ্যাপক *নিজামী* লিখেছেন : তাতার খাঁ'র পরে বলবনের অন্যতম ক্রীতদাস তুঘ্রিল খাঁ লখ্‌নৌতির গভর্নর নিযুক্ত হন। তুঘ্রিল খাঁ বিচক্ষণ, সাহসী এবং উদ্যোগী পুরুষ হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। স্বভাবতই ক্ষমতালোভের অল্পকালের মধ্যে তিনিও স্বাধীন রাজ্যপ্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। সুলতান মুঘিসউদ্দিন উপাধি গ্রহণ করে, নিজনামে মুদ্রা প্রচলন করে ও খুৎবা পাঠ করে দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করেন। তুঘ্রিল ঠিক কোন্ বছর বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। *ইসামীর* মতে, তুঘ্রিল বলবনের রাজত্বের অষ্টম বছরে অর্থাৎ ১২৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহী হন। কিন্তু *বরণীর* মতে, তুঘ্রিল পঞ্চদশ বা যোড়শ বছরে বিদ্রোহী হয়েছিলেন। অধ্যাপক *নিজামীর* মতে, বরণীর বিবরণ সঠিক নয়। বলবন ১২৮০/৮১ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার বিদ্রোহ দমন করেছিলেন। তার আগে তিনি আরো দুটি অভিযান বাংলার বিরুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন। তাই ধরা যেতে পারে, ১২৭৫ এবং ১২৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তীকালে তুঘ্রিলের বিদ্রোহ শুরু হয়ে বিকাশ লাভ করেছিল।

তুঘ্রিলের বিদ্রোহপ্রবণতা সম্ভবত দুটি কারণে প্রকট হয়েছিল—(১) ঘরে-বাইরে সুলতান বলবনের ব্যস্ততা এবং (২) বাংলাদেশে নিজের জনপ্রিয়তা ও জাজনগরের (উড়িষ্যা) বিরুদ্ধে সামরিক সাফল্য। তুর্কী আমীরদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা দমন করেই বলবন মোঙ্গল দস্যুদের আক্রমণ সম্ভাবনা রোধ করার কাজে লিপ্ত হয়েছিলেন। যখন মোঙ্গলদের আক্রমণে দিল্লী বিব্রত, ঠিক সেই মুহূর্তে তুঘ্রিল বিদ্রোহের ধ্বজা তুলে ধরেন। জাজনগর আক্রমণ করে তিনি বহু অর্থ ও হাতি সংগ্রহ করেছিলেন। নিয়মানুযায়ী এই লুণ্ঠিত অর্থের অংশ তিনি দিল্লীতে পাঠান নি। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, মোঙ্গল আক্রমণে বিপর্যস্ত সুলতানের পক্ষে বাংলা নিয়ে মাথাঘামানো সম্ভব হবে না।

তুঘ্রিলের বিদ্রোহ ঘোষণার সংবাদে বলবন প্রথমে হতাশ হন এবং পরে রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। একজন ক্রীতদাসের এই আস্পর্ধা তাঁর কাছে অসহনীয় মনে হয়। বলবন উপলব্ধি করেন যে, তুঘ্রিলের এই বিদ্রোহ অন্যান্য দাস-কর্মচারীদের কাছে প্রেরণা হিসেবে কাজ করতে পারে। তাছাড়া, বাংলা স্বাধীন হয়ে গেলে পূর্ব-ভারতে সুলতানি সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ এবং গাঙ্গেয়ভূমি থেকে অর্থাগমের সম্ভাবনা চিরতরে বিনষ্ট হয়ে যাবে। তাই দ্রুত তিনি বাংলার বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেন।

বলবনের নির্দেশে অযোধ্যার গভর্নর আমিন খাঁ এক বিশাল বাহিনীসহ তুঘ্রিলের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। তমর খাঁ, মালিক তাজউদ্দিন প্রমুখ দক্ষ ও অভিজ্ঞ মালিকগণ আমিন খাঁর সহযোগী

হিসেবে যান। কিন্তু সরযূ নদীর তীরে তুঘ্রিলের হাতে সুলতানি-বাহিনী দারুণভাবে বিপর্যস্ত হয়। বিধ্বস্ত সুলতানি ফৌজ প্রত্যাবর্তনের কালে হিন্দু উপজাতির আক্রমণে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এই বিপর্যয়ের সংবাদ বলবনের কাছে পৌঁছালে ক্ষিপ্ত সুলতান আমিন খাঁকে প্রকাশ্যে হত্যার নিদেশ দেন। একজন বিশ্বস্ত সেনাপতির প্রতি সুলতানের এই হীন আচরণ বলবনের প্রতি সাধারণ মানুষ ও তুর্কী মুসলমানদের আস্থাহীন করেছিল বলে বরণী মত প্রকাশ করেছেন। অতঃপর বলবন দিল্লীর এক দক্ষ যোদ্ধা বাহাদুরের নেতৃত্বে এক নতুন বাহিনী তুঘ্রিলের বিরুদ্ধে পাঠান। কিন্তু অসম-সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেও বাহাদুর পিছু হটতে বাধ্য হন। এবারেও বলবন ব্যর্থ বাহাদুরকে হত্যার কথা ভেবেছিলেন। তবে অন্যান্য আমীর ও মালিকদের অনুরোধে সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন।

পরপর দুটি অভিযানের ব্যর্থতা বলবনকে দারুণ ক্ষিপ্ত করে এবং তিনি স্বয়ং তুঘ্রিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার সিদ্ধান্ত নেন (১২৮০-'৮১ খ্রীঃ)। বলবন দিল্লীর প্রশাসনিক দায়িত্ব মালিক-উল-ফকরুদ্দিন নামক জনৈক আমীরের হাতে ন্যস্ত করে এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সম্পর্কে পুত্র মহম্মদকে বিশেষ নির্দেশ ও পরামর্শ প্রদান করে লখনৌতির উদ্দেশ্যে রওনা হন। অপর পুত্র বুগরা খাঁ সম্রাটের সঙ্গী হন। অযোধ্যায় এসে বলবন আরো দু'লক্ষ নতুন সৈন্য সংগ্রহ করেন। সুলতানের অগ্রগতির সংবাদে ভীত তুঘ্রিল ঢাকার নিকটবর্তী হাজিনগরের জঙ্গলে আত্মগোপন করেন। বলবন লখনৌতি হয়ে সোনারগাঁয়ে উপস্থিত হন। সুলতানি-বাহিনী ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে পূর্ববঙ্গের সমস্ত অঞ্চলে তুঘ্রিলের অনুসন্ধান চালাতে থাকে। শেষ পর্যন্ত মালিক মহম্মদ শেরান্দাজ তুঘ্রিলের গোপন অস্তানার সংবাদ জোগাড় করেন এবং দ্রুত সেই অংশ ঘিরে ফেলেন। সুলতানি বাহিনীর উপস্থিতি বুঝতে পেরে তুঘ্রিল একটি লাগামহীন ঘোড়ায় চড়ে নিকটবর্তী নদী অতিক্রম করে পালানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু আলি নামক জনৈক সুলতানি সৈন্য দ্রুত এগিয়ে গিয়ে তুঘ্রিলকে আঘাত করেন এবং মালিক মুকাদ্দর অস্ত্রাঘাতে তুঘ্রিলের মুণ্ডচ্ছেদ করেন। বলবন এই সাফল্যের জন্য উভয়কেই পুরস্কৃত করেন। লখ্নৌতিতে প্রত্যাবর্তন করে বলবন বিদ্রোহী তুঘ্রিলের সমস্ত সমর্থক আত্মীয়-পরিজনকে প্রকাশ্য রাস্তায় শূলবিদ্ধ করে হত্যা করেন। এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে বরণী লিখেছেন যে, দিল্লীর কোন সুলতান এত নৃশংসতার সাথে নরহত্যা সংঘটিত করেন নি। অতঃপর নিজ পুত্র বুগরা খাঁকে বাংলার শাসক পদে নিযুক্ত করে ***বলবন*** স্মরণ করিয়ে দেন—*'আমাকে বোঝার চেষ্টা কর। ভুলে যেও না, হিন্দ্ বা সিন্ধু, মালব, গুজরাট, লখ্নৌতি কোন রাজ্য দিল্লীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হলে তুঘ্রিল এবং তার আত্মীয়ের মতই চরম পরিণতি ভোগ করতে হবে।'* তিনি পরামর্শ দেন *'দিল্লীর প্রতি সদা অনুগত থেকো, এমনকি সেখানে যদি অন্য কোন বংশ রাজত্ব করে তা হলেও।'*

○ মোঙ্গল নীতি ঃ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সমস্যা ঃ

ভারতের চতুর্দিকে যে প্রাকৃতিক নিরাপত্তা রয়েছে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে তা খুবই দুর্বল। এই পথ দিয়ে প্রাচীনকালে শক্, হুন প্রভৃতি জাতি ভারতে প্রবেশ করে রাজ্য স্থাপন করেছে। পরবর্তীকালে একই পথ ধরে ভারতে এসেছে তুর্কীরা। কিন্তু তারাও এদেশে সাম্রাজ্য

প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্বে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তদেশের বিবাদ সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন না এবং ঐ পথ ধরে বহিঃশত্রুর আক্রমণ-সম্ভাবনা বিনষ্ট করার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেন নি। তাই দুর্ধর্ষ মোঙ্গলজাতি সমগ্র মধ্য-এশিয়া দখল করার পর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করে ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়মে। বাহ্‌রাম শাহ্ এবং নাসিরুদ্দিন মামুদের রাজত্বকালে চাহেলগানীর অন্যতম সদস্য এবং উচ্চপদাধিকারী হিসেবে বলবন মোঙ্গলদের আক্রমণের মুখোমুখি হয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। ১২৪৫ খ্রীষ্টাব্দে মোঙ্গলরা সিন্ধু ও মূলতানের একাংশ দখল করে নেয়। বলবন দ্রুত অগ্রসর হয়ে পরিস্থিতির মোকাবিলা করেন। কিন্তু ১২৪৭ খ্রীষ্টাব্দে মোঙ্গল-নেতা সালদি লাহোরের একাংশ দখল করে নেয়। মূলতানের শাসনকর্তা শের খাঁ সম্ভবত মোঙ্গলদের সাথে একটা গোপন বোঝাপড়ার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর নিজের স্বার্থে এই বোঝাপড়ার চেষ্টা সফল হয় নি ; তবে বলবন তাঁর এই আত্মীয়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও অসৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে বেশ শঙ্কিত হয়ে পড়েন। যাই হোক, এই সময় দিল্লীর সীমানা ঝিলাম নদী থেকে বিপাশা নদী পর্যন্ত পিছিয়ে আসে।

বলবন সিংহাসনে বসার পর এক বছরের মধ্যেই অভ্যন্তরীণ বিচ্ছিন্নতাবাদী ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী শক্তিগুলিকে দমন করার পর সীমান্তের সুরক্ষা সম্পর্কে ব্যবস্থাদি গ্রহণে উদ্যোগী হন। বলবনের আশঙ্কা ছিল যে, মোঙ্গলরা যে-কোন মুহূর্তে বিপাশা নদী অতিক্রম করে দিল্লী আক্রমণ করতে পারে। সেক্ষেত্রে দিল্লী-সুলতানির অস্তিত্বই বিপন্ন হবে। তাই সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি নতুন রাজ্যজয়ের লোভ সম্বরণ করেন। প্রধানত মোঙ্গলদের ভয়েই তিনি দিল্লী ছেড়ে বাইরে থাকার সিদ্ধান্ত ত্যাগ করেন। তাঁর সেনাপতিরা মালব, গুজরাট ইত্যাদি রাজ্য দখল করার কথা বললে বলবন বলতেন যে, তিনি দিল্লীর বাইরে গেলেই মোঙ্গলরা দিল্লী আক্রমণ করে বিধ্বস্ত করবে।

শাসক হিসেবে বলবন ছিলেন খুবই বিচক্ষণ ও দূরদর্শী। তাই উত্তর-পশ্চিম সীমান্তকে নিরাপদ করার জন্য তিনি শক্তিপ্রয়োগ ও কূটকৌশল—এই দ্বিবিধ নীতি অনুসরণ করেন। মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে বলবন কয়েকটি রক্ষণাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাঁর আপাত লক্ষ্য ছিল মোঙ্গলদের বিপাশার তীরে আটকে রাখা। তাই তিনি সীমান্তবর্তী ভাতিন্দা, সামান ও সুমানার দুর্গগুলির সংস্কারসাধন করেন এবং ঐসব দুর্গের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করেন। মোঙ্গল আক্রমণকারীদের সম্ভাব্য যাতায়াতের পথে কয়েকটি সেনাঘাঁটি নির্মাণ করে নিরন্তর প্রহরার ব্যবস্থা করেন। সুলতান স্বয়ং দিল্লীতে সর্বদা উপস্থিত থেকে সামগ্রিক পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখার সিদ্ধান্ত নেন। বলবনের রাজত্বের গোড়ার দিকে শের খাঁ নামক তাঁর জনৈক আত্মীয় ভাতিন্দা, দীপালপুর ও লাহোরকে কেন্দ্র করে মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। বরণী মনে করেন, শের খাঁ ছিলেন খুবই দক্ষ ও বিশ্বস্ত সেনাপতি। কিন্তু ১২৭০ খ্রীষ্টাব্দে শের খাঁর মৃত্যু হয়। অনেকে মনে করেন, বলবন বিষপ্রয়োগ করে শের খাঁকে হত্যা করেছিলেন। অধ্যাপক ***নিজামীর*** মতে, মোঙ্গলদের সাথে শের খাঁর একটা অশুভ আঁতাত তৈরি হয়েছিল। তাই তিনি শের খাঁকে মুলতান থেকে দিল্লী প্রত্যাবর্তনের আদেশ দেন। কিন্তু শের খাঁ বলবনের আদেশ পালনে অযথা বিলম্ব করতে থাকেন। নানা অজুহাতে তিনি কয়েকটা বছর কাটিয়ে দেন। তাই বলবন এ ধরনের কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য হয়েছিলেন। যাই হোক, শের খাঁর মৃত্যুর

ফলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের নিরাপত্তা রক্ষার ব্যাপারে একটা অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। এই সময় বলবন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেন। মুলতান, সিন্ধু ও উচের দায়িত্ব দেন জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদের হাতে এবং সুনাম, সামানা ও দীপালপুরের দায়িত্ব দেন তমর খাঁর হাতে। কিন্তু ইতিপূর্বে দুই তুর্কী আমীর কিশলু খাঁ এবং শের খাঁ গোপনে মোঙ্গলদের সাথে জোট গড়ার চেষ্টা করেছিলেন, এই ভয়ে অল্পদিনের মধ্যে তমর খাঁকে সরিয়ে ঐ অঞ্চলের দায়িত্ব দেন কনিষ্ঠ পুত্র বুগরা খাঁর হাতে। বুগরা খাঁর বিশ্বস্ততা সম্পর্কে বলবন নিশ্চিত ছিলেন, কিন্তু তাঁর সামরিক দক্ষতার অভাব ছিল। তাই গুপ্তচর মারফত সুনাম-সামানা অঞ্চলের উপর সুলতান সর্বদা নজর রাখতেন।

সামরিক প্রস্তুতির পাশাপাশি বলবন কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে মোঙ্গলদের আক্রমণ-সম্ভাবনা শিথিল করার চেষ্টা করেন। এজন্য তিনি ইরানের মোঙ্গল শাসক হলাকুর দরবারে দূত প্রেরণ করেন এবং হলাকু-প্রেরিত দূতকে সসম্মানে দিল্লীর রাজসভায় গ্রহণ করেন। অধ্যাপক সতীশচন্দ্র প্রমুখ বরণীর এই বিবরণ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অধ্যাপক *নিজামীর* মতে, বলবনের সিংহাসনারোহণের পূর্বেই হলাকুর মৃত্যু হয়েছিল। তাই এই ধরনের কোন কূট সম্পর্ক স্থাপনের সম্ভাবনা অন্তত হলাকুর আমলে ছিল না। তবে মোঙ্গলদের ইলখান গোষ্ঠীর সাথে বলবনের একটি অলিখিত সমঝোতা স্থাপিত হয়েছিল বলে মনে হয়। যাতে পাঞ্জাবের উপর মোঙ্গলদের কর্তৃত্ব বলবন স্বীকার করেছিলেন এবং মোঙ্গলরাও দিল্লী আক্রমণ না-করার একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও মোঙ্গলরা প্রায়শই সীমান্তে হানা দিত এবং সুলতানি-বাহিনীর সাথে সংঘর্ষ ঘটাত। ১২৭৯ খ্রীষ্টাব্দে এমনি একটি আক্রমণ মহম্মদ ও বুগরা খাঁর মিলিত প্রচেষ্টায় প্রতিহত করা হয়। অতঃপর বুগরা খাঁকে বলবন বাংলার গভর্নর নিযুক্ত করলে (১২৮১ খ্রীঃ) সমগ্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দায়িত্ব পড়ে মহম্মদের হাতে। ১২৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মোঙ্গল নেতা তৈমুর খাঁ বিশাল বাহিনী-সহ বিপাশা অতিক্রম করে দীপালপুর আক্রমণ করেন। মহম্মদ বীরত্বের সাথে মোঙ্গলদের প্রতিহত করেন। তবে এই যুদ্ধে তিনি নিহত হন। সাহসিকতা ও দেশপ্রেমের জন্য তিনি *'খান-ই-শহিদ'* উপাধিতে ভূষিত হন। তবে প্রিয় পুত্রের এহেন আকস্মিক মৃত্যু বলবনকে প্রচণ্ড আঘাত করে। সুলতানের শরীর দ্রুত ভেঙ্গে পড়ে। কারণ মহম্মদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পার্থিব আশা-আকাঙ্ক্ষা অনেকটাই নিঃশেষ হয়ে যায়। কারণ বলবনের অন্য পুত্র বুগরা খাঁ সুলতানি সিংহাসন সম্পর্কে আদৌ আগ্রহী ছিলেন না। তিনি লখনৌতির শাসক পদেই থাকার দৃঢ় ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। এমতাবস্থায় বলবন মৃত মহম্মদের নাবালক পুত্র কাইখসরু'কে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। এর চারদিন পরেই তাঁর মৃত্যু হয় (১২৮৭ খ্রীঃ)।

○ প্রশাসনিক ব্যবস্থা ঃ

সাধারণ প্রশাসন এবং সামরিক প্রশাসন সম্পর্কে বলবন দৃঢ় ও নির্দিষ্ট কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। মধ্যযুগীয় বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বলবন ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ দ্বারা সুলতানের স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বিবিধ ব্যবস্থা নেন। তাঁর সিংহাসনারোহণের মুহূর্তে সুলতানির শাসনকাঠামো ছিল সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলাপূর্ণ এবং অকার্যকরী। তুর্কী-আমীর ও মালিকদের আচরণ ছিল নিয়ন্ত্রণাধীন।

রাজকর্তৃত্ব সম্পর্কে জনসাধারণের মনে কোন আস্থা ছিল না। মধ্যযুগীয় প্রশাসনের মূলশক্তি যে রাজতন্ত্রের শৌর্য-বীর্য এবং কাঠিন্য, তা তখন অন্তর্হিত। বলবন অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে শাসন কাঠামোকে ত্রুটিমুক্ত করে কার্যকরী করার উদ্যোগ নেন।

মধ্যযুগীয় ধারা অনুযায়ী বলবনের শাসন-সংগঠনের প্রকৃতিও ছিল আধা-সামরিক-আধা-সামাজিক। তিনি প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের উপর সুলতানের একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। ইতিপূর্বে *'নায়েব-ই-মামলিকৎ'*-এর উজীর পদাধিকারীগণ কিভাবে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে প্রশাসনের দক্ষতা নষ্ট করতেন, সে অভিজ্ঞতা বলবনের ছিল। 'নায়েব' পদটি আগেই উঠে গিয়েছিল। বলবন উজীরের পদটি বহাল রাখলেও তাঁর হাত থেকে সামরিক ও অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা সুলতানের হাতে সরিয়ে এনে, উজীরকেও ক্ষমতাহীন করে দেন। অধ্যাপক *নিজামী* লিখেছেন ঃ *"With the separation of financial and military authority, the chances of usurpation of power by any government functionary were totally eliminated."*

একই পথের যাত্রী হিসেবে বলবন তুর্কী অভিজাতদের শক্তি ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত ছিলেন। তিনি জানতেন যে, তুর্কী অভিজাতশ্রেণীর সমর্থন ছাড়া তাঁর ক্ষমতা বজায় থাকবে না। আবার এটাও জানতেন যে, অভিজাতদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে না পারলে সুলতানির অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। এই কারণে তিনি 'তুর্কান-ই-চাহেলগানী'র অস্তিত্ব প্রায় লোপ করে দেন। দৃষ্টান্তমূলক ভাবে কয়েকজন দক্ষ অথচ উচ্চাকাঙ্ক্ষী তুর্কী মালিককে চরম শাস্তি প্রদান করে সুলতানের চূড়ান্ত কর্তৃত্বের তত্ত্ব জাহির করেন। শের খাঁ, আমিন খাঁ, হায়বৎ খাঁ প্রমুখের হত্যা কিংবা মর্যাদাহানি করে বলবন অভিজাতদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতাকে দমন করেন।

বিচক্ষণ বলবন জানতেন যে, স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্থায়িত্ব এবং উন্নতি নির্ভর করে সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুদক্ষ সেনাবাহিনীর উপর। ইলতুৎমিস যে সেনাসংগঠন গড়েছিলেন—ইতিমধ্যে তা ভেঙ্গে পড়েছিল। তাই বলবন নতুনভাবে সামরিক প্রশাসন গড়ে তোলেন। কেন্দ্রীয় সেনাবাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। বিশ্বস্ত এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের এই বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং তাদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি করা হয়। নগদ অর্থের পরিবর্তে এদের নিষ্কর জমি ইজারা দেওয়া হয়। বলবন নীতিগতভাবে বিশ্বাস করতেন যে, বর্ধিত পারিশ্রমিক সেনাবাহিনীর আনুগত্য ও সেবালাভের অন্যতম শর্ত। নিজপুত্র বুগরা খাঁকে একদা তিনি বলেছিলেন ঃ *"সেনাবাহিনীর জন্য অতিরিক্ত ব্যয়কে কখনো অপ্রয়োজনীয় মনে করো না।"* বাহিনীর কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য তিনি নিয়মিত অনুশীলনের উপর জোর দিতেন। বলবন অতি সুদক্ষ এবং বিশ্বস্ত এক হাজার সৈন্যের একটি দল সরাসরি নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতেন। যুদ্ধযাত্রার সময় সেনাবাহিনী যাতে বেসামরিক সম্পত্তি বা ফসল নষ্ট না করে, সেদিকে বলবনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং কঠোর নির্দেশ ছিল। কোন সামরিক অভিযান-কর্মসূচী গ্রহণের আগে বলবন তার উপযোগিতা এবং সম্ভাবনা সম্পর্কে গভীর বিচার-বিশ্লেষণ করতেন। তাই ব্যর্থ সামরিক অভিযান দ্বারা অর্থ নষ্ট করার দায় তাঁর উপর বর্তায় নি।

সামরিক-বাহিনীর পুনর্গঠন করতে গিয়ে বলবন 'ইক্‌তা'* ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন ঘটান। ইলতুৎমিসের আমলে দোয়াব অঞ্চলে প্রায় দু'হাজার সেনাকে 'ইক্‌তা' হিসেবে জমি দেওয়া হয়েছিল। 'ইক্‌তা'-ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য ছিল—

(১) দক্ষ সৈনিকদের সেবার পুরস্কার হিসেবে নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড ইক্‌তা হিসেবে প্রদান করে তার সম্মান ও কর্মপ্রেরণা বৃদ্ধি করা এবং (২) দিল্লীর দূরবর্তী অঞ্চলে ইক্‌তাদারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ বলবৎ রাখা। এছাড়া ইক্‌তার উদ্‌বৃত্ত রাজস্ব রাজকোষে জমা দেওয়া এবং সুলতানের প্রয়োজনে সামরিক সাহায্য দেওয়াও ইক্‌তাদারদের অবশ্য কর্তব্য ছিল। কিন্তু ইলতুৎমিসের মৃত্যুর পরবর্তীকালে রাজনৈতিক অস্থিরতার ফলে ইক্‌তা-ব্যবস্থা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। ইক্‌তাদারদের মধ্যে স্বাধীনতাস্পৃহা এবং দিল্লীর কর্তৃত্বকে অস্বীকার করার একটা প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় শক্তিকে সুদৃঢ় করার জন্য যে ইক্‌তা-প্রথার প্রচলন করা হয়েছিল, তাই এখন বিচ্ছিন্নতার কারণে পরিণত হয়েছিল। বলবন অনুসন্ধান করে দেখেন যে, ইতিমধ্যে বহু ইক্‌তাদার মারা গিয়েছেন। যাঁরা বেঁচে আছেন, তাঁরা তখন অতি বৃদ্ধ। তাই ***বলবন*** মনে করেন, *"যেহেতু সামরিক সেবার বিনিময়ে ইক্‌তা প্রদান করা হয়েছিল, তাই যেখানে সামরিক সেবা পাবার কোন সম্ভাবনা নেই সেখানে ইক্‌তা অনুদান বাতিল বলে গণ্য হওয়া উচিত।"*

ব্যাপক তথ্যানুসন্ধানের পর বলবন এক নির্দেশ জারি করে সমস্ত ইক্‌তা প্রত্যাহার করে নেন। বিনিময়ে বৃদ্ধ ইক্‌তাদারদের ২০/৩০ টাকা ভাতা দানের ব্যবস্থা করেন এবং সক্ষম ব্যক্তিদের নগদ বেতনের শর্তে নিয়মিত সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করে নেন। সুলতানের এই সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট ইক্‌তাদারদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ***বরণী*** লিখেছেন ঃ *"তাদের অনুরোধে দিল্লীর প্রখ্যাত কোতোয়াল মালিক ফক্‌রুদ্দিন সুলতানের কাছে ওকালতি করেন এবং ফক্‌রুদ্দিনের যুক্তিতে প্রভাবিত হয়ে বলবন ঐ নির্দেশ প্রত্যাহার করে নেন।"* অবশ্য ***হাবিবউল্লাহ*** লিখেছেন ঃ *"এই সময় বলবন কেবলমাত্র বৃদ্ধ ও অশক্ত ব্যক্তিদের উপর থেকে নির্দেশ প্রত্যাহার করেন ; অন্যান্যদের জন্য তা বলবৎ ছিল।"*

তুর্কী আমীর ও মালিকদের, বিশেষত *'তুর্কান-ই-চাহেলগানী'র* সদস্যদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও স্বাতন্ত্র্যবোধ সম্পর্কে বলবন সচেতন ছিলেন। তিনি তুর্কী-অভিজাতদের অবাধ কর্তৃত্বকে সুস্থ প্রশাসন ও রাজতন্ত্রের অস্তিত্বের পক্ষে বিপজ্জনক বলে মনে করতেন। তাই এই শাসকগোষ্ঠীকে কর্তৃত্বহীন করার জন্য তিনি নানা ব্যবস্থা নেন। বলবন ইচ্ছাকৃতভাবে তরুণ তুর্কী-যুবকদের দক্ষতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদে নিয়োগ করেন। সাধারণ মানুষের কাছে ক্ষমতাবান আমীর মালিকদের হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য কয়েকজনকে দৃষ্টান্তমূলক কঠোর শাস্তি প্রদান করেন। যেমন মুলতানের শাসক শের খাঁকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা, বদাউনের শাসক মালিক বরবককে প্রকাশ্যে বেত্রাঘাত করা, বাংলার বিদ্রোহদমনে ব্যর্থতার জন্য আমিন খাঁকে প্রকাশ্যে হত্যা করা ইত্যাদি।

বলবন মনে করতেন, সামরিক-বাহিনী যেমন সুলতানের শক্ত বাহু, তেমনি দক্ষ

গুপ্তচরবাহিনী সুলতানের প্রখর দৃষ্টিশক্তি বিশেষ। এই দু'য়ের মিলিত শক্তি স্বৈরতান্ত্রিক কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য অপরিহার্য। তাই বলবন এক দক্ষ গুপ্তচরবাহিনী গঠন করেন। 'বারিদ' নামে পরিচিতি এই গুপ্তচরবাহিনীতে শুধুমাত্র সৎ, দায়িত্ববান এবং মর্যাদাসম্পন্ন পরিবারভুক্ত ব্যক্তিদের নিয়োগ করা হত। এদের মাধ্যমে রাজ্যের ঘটনাবলীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ সর্বদা সুলতানের গোচরে থাকত। সুলতানের আত্মীয়-পরিজন, উচ্চপদস্থ কর্মচারীবৃন্দ, আমীর-মালিকগণ, এমনকি সুলতানের প্রিয় পুত্ররাও 'বারিদ'-এর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়িয়ে কিছু করতে পারত না। ***লেন্‌পুল*** লিখেছেন ঃ *"বলবনের রাজ্যে এমন কিছুই ছিল না যার খবর বারিদরা রাখত না।"* তবে নিয়োগকর্তার সাথে গুপ্তচরদের প্রকাশ্য যোগাযোগকে বলবন প্রশাসনের পক্ষে শুভ মনে করতেন না। একদা তিনি এক পুত্রকে বলেছিলেন, ***"Informers and spies should not be allowed to come near the court, for thier closeness to the ruler terrifies obedient and trustworthy friends and their confidence in the king—."***

পুত্র মহম্মদ এবং বুগরা 'খাঁ'র সাথে বলবনের মত বিনিময়ের ভিত্তিতে জিয়াউদ্দিন বরণী তাঁর শাসনতান্ত্রিক আদর্শ লক্ষ্যের একটি চিত্র অঙ্কন করেছেন। বরণীর বিবরণ অনুসারে সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বলবনের অভিমত হল, (১) সরকারের উচিত রক্ষণাত্মক আইন জারি করা এবং সবলের বিরুদ্ধে দুর্বলের স্বার্থ সুনিশ্চিত করা। (২) সরকারি নির্দেশ যথার্থ মর্যাদার সাথে বলবৎ করা উচিত এবং ঘনঘন সরকারি নীতির পরিবর্তন ঘটা বাঞ্ছনীয় নয়। (৩) সরকারের আচরণ অতি কঠোর বা অতি নমনীয় হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। প্রজার উপর করের বোঝা এমন বেশি হওয়া উচিত নয় যাতে তার গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব ঘটে ; কিংবা এমন হালকা হওয়া উচিত নয় যাতে তার মধ্যে বিদ্রোহপ্রবণতা জাগ্রত হয়। (৪) সেনাবাহিনীর বেতন ও ভাতা নিয়মিত প্রদান করে তাদের সন্তুষ্ট রাখা উচিত। (৫) কৃষি-উৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিকাশে সহায়তা করে দেশের আর্থিক সমৃদ্ধি আনা আবশ্যিক। (৬) সুপরিকল্পিতভাবে আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখা উচিত। মোট আয়ের অর্ধাংশ ব্যয় করে অবশিষ্টাংশ আপৎকালীন সময়ের জন্য রাখা উচিত। বরণীর মতে, এই শাসনাদর্শের বাস্তব প্রয়োগ দ্বারা বলবন জনগণকে দীর্ঘকাঙ্ক্ষিত 'শান্তি ও ন্যায়ের' রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

○ বলবনের কৃতিত্বের মূল্যায়ন ঃ

আদি পর্বের সুলতানদের মধ্যে গিয়াসউদ্দিন বলবন নিঃসন্দেহে ছিলেন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। সামান্য ক্রীতদাস হিসেবে জীবন শুরু করে তিনি ব্যক্তিত্ব, বিচক্ষণতা এবং কর্মদক্ষতার দ্বারা দিল্লীর সুলতান-পদে উন্নীত হয়েছিলেন এবং সাফল্যের সাথে প্রায় চার দশক কাল সুলতানি-সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রকরূপে অতিবাহিত করেছিলেন। প্রাক্-সুলতান পর্বে (১২৪০-'৬৬ খ্রীঃ) বলবন গুরুত্বপূর্ণ সরকারি-পদে অধিষ্ঠিত থেকে এবং অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহদমনে কিংবা মোঙ্গল আক্রমণের বিরুদ্ধে সফল প্রতিরোধ সৃষ্টি করে ক্রমশ ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করেন। বয়ঃকনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র দক্ষতা ও বিচক্ষণতা দ্বারা 'চল্লিশচক্র' বা চাহেলগানীর নেতৃত্বে উন্নীত হন। সুলতান হিসেবে তিনি সুলতানি-সাম্রাজ্যের রক্ষক ও সংগঠকের ভূমিকা পালন করেন। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে মেওয়াটি, খোকর প্রভৃতি উপজাতির

বিদ্রোহ দমন করে এবং বহিরাগত মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করে ও ভবিষ্যৎ আক্রমণ-সম্ভাবনা রোধ করার জন্য সীমান্ত সুরক্ষিত করে তিনি সুলতানি-সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব বিধান করেন। তাই ***ড. ঈশ্বরীপ্রসাদ*** বলবনকে মধ্যযুগীয় ভারত-ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব অভিহিত করে লিখেছেন ঃ *"...a great warrior, ruler and statesmen who saved the infant Muslim State from extinction at a critical time."* ***ড. ঈশ্বরীপ্রসাদ*** আরও মনে করেন যে, বলবন অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত ভারতের মুসলমান শক্তিকে যে নিরাপত্তা ও সংহতি দিয়েছিলেন, তা না হলে আলাউদ্দিন খলজীর পক্ষে মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করা বা নতুন নতুন রাজ্য জয় করে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকা সম্ভব হত না। ***ড. হবিবউল্লাহ*** লিখেছেন যে, বলবনের একটিমাত্র কৃতিত্বই তাঁকে ইতিহাসে অমর করে রাখার পক্ষে যথেষ্ট ; তা হল রাজতন্ত্রকে তার প্রকৃত মর্যাদার সাথে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। বিচ্ছিন্নতাবাদী ও শত্রুভাবাপন্ন শক্তিগুলিকে সুলতানির বশীভূত করার সুনির্দিষ্ট ও দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করে বলবন আইবক ও ইলতুৎমিসের অসমাপ্ত কাজকে পূর্ণতা এনে দেন। ***ড. হবিবউল্লাহ*** লিখেছেন ঃ *"By consolidating the conquered areas and destroying the forces of anarchy he fulfilled a historical need namely, preparing the Sultnate for further territorial expansion as a next stage of its development."*

অধ্যাপক ***অবন্তীলাল শ্রীবাস্তব*** লিখেছেন ঃ *"বলবন ছিলেন নিঃসন্দেহে একজন দৃঢ়চেতা প্রশাসক এবং সফল রাজনীতিবিদ্ ; তুর্কী অভিজাতদের স্বাধীনতাস্পৃহা দমন করে এবং সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা দ্বারা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের নিরাপত্তা বিধান করে তিনি হিন্দুস্তানের শিশু সাম্রাজ্যকে সংহতি দান করেছিলেন।"* ***ড. পি. শরণ*** মনে করেন, বলবন সমকালীন কঠিন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে অভ্যন্তরীণ বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিসমূহকে দমন করে এবং মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করে তাঁর পূর্বসূরীদের ত্রুটি থেকে সুলতানি সাম্র্যজ্যকে রক্ষা করেছিলেন।

ঐতিহাসিকেরা বলবনের কৃতিত্বের প্রতি যেমন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তেমনি তাঁর সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও উল্লেখ করেছেন। *কে. এ. নিজামী, শ্রীবাস্তব, পি. শরণ,* এমনকি *ড. হবিবুল্লাহ্* বলবনের কর্মধারা বিশ্লেষণ করে তাঁর কর্মসূচীর মধ্যে দূরদর্শিতার ও বাস্তবতার অভাব লক্ষ্য করেছেন। ***ড. নিজামী*** এবং ***ড. হবিবউল্লাহ্*** মনে করেন, বলবন বংশকৌলীন্যের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়ে এবং উচ্চ সরকারি-পদে অ-তুর্কীদের নিয়োগ না-করে বিরাট ভুল করেছিলেন। ***বলবন*** একদা তাঁর পুত্র বুগরা খাঁকে বলেছিলেন ঃ *"কখনো দিল্লীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করো না, কারণ দিল্লীর সুলতান নিমেষের মধ্যে লখ্নৌতির বিদ্রোহ দমনে সক্ষম।"* কিন্তু বাস্তবে তা দেখা যায়নি। বাংলার বিদ্রোহী শাসক তুঘ্রিলকে দমন করতে দিল্লীর লেগেছিল প্রায় ছয় বছর। এবং এই কাজের জন্য অযোধ্যাতে এসে অস্থায়িভাবে প্রায় দু'লক্ষ সৈন্য তাঁকে সংগ্রহ করতে হয়েছিল। তা ছাড়া কোন শক্তিশালী রাজপুতগোষ্ঠীর সাথে বলবন যুদ্ধ করেন নি। কোন নতুন রাজ্য তিনি সুলতানির সাথে যুক্ত করেন নি। এমনকি মোঙ্গলদের বিরুদ্ধেও তাঁর সেনাপতিরা প্রকৃত সাফল্য পায় নি। এর ভিত্তিতে বলা যায়, বলবনের সামরিক শক্তি যথেষ্ট সবল বা উপযুক্ত ছিল না। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ***ইসামী*** লিখেছেন যে, মোঙ্গলদের সাফল্যের কারণ ছিল তাদের সৈন্যের সংখ্যাধিক্য। ***ড. নিজামী*** প্রশ্ন তুলেছেন, *'বলবন কেন*

অধিক সংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করে বিজয়ী হবার চেষ্টা করলেন না?' এর উত্তরও তিনি দিয়েছেন। তাঁর মতে, গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদে কেবলমাত্র তুর্কী-অভিজাতদের নিয়োগ করার ফলে দেশীয় মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে সৈন্য সংগ্রহ করার ক্ষমতা কমে গিয়েছিল। তাই এই বিপত্তি। ড. ***নিজামী*** লিখেছেন যে, বলবন পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে তাল রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন। ড. ***হবিবউল্লাহও*** বলবনের এই সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ ***"He considered himself more the custodian of Turkish sovereignty than a king of the Musalmans."*** তুর্কীদের সার্বিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়ে বলবন ইলতুৎমিসের আদর্শকে অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি খেয়াল করেন নি যে ইতিমধ্যে বহু ভারতীয় ইসলামধর্ম গ্রহণ করে এবং ফারসী ভাষায় শিক্ষা নিয়ে নিজেদের প্রশাসনের উপযুক্ত করে তুলেছেন। কিন্তু বলবনের তীব্র অ-তুর্কীবিদ্বেষ এবং ঘৃণা এই নতুন মুসলমান সম্প্রদায়কে তুর্কীবিরোধী করে তোলে, যার পরিণতি ঘটে খলজী বিপ্লবের মাধ্যমে। এইভাবে তুর্কী অভিজাতদের প্রতি তাঁর অকারণ কঠোর আচরণ এই শাসকগোষ্ঠীর মনোবল এবং ঐক্যে ভাঙ্গন ধরিয়ে দিল্লী-সুলতানির তুর্কী আধিপত্যের মূল্যেই কুঠারাঘাত করেছিল। শের খাঁ কিংবা আমিন খাঁর মত দক্ষ সেনানায়কদের বিষপ্রয়োগ করে কিংবা প্রকাশ্য রাজপথে হত্যা করে বলবন আদৌ ন্যায়বোধের পরিচয় দেন নি, মানবিকতার ত নয়ই। নানাভাবে দক্ষ তুর্কী আমীর ও মালিকদের শক্তি খর্ব করার জন্যই বৃদ্ধ এবং দুর্বল জালালউদ্দিন খলজীর মতো ব্যক্তি তাঁর বিরুদ্ধে সফল বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিতে পেরেছিলেন। ড. ***নিজামী*** যথার্থই লিখেছেন ঃ ***"Balbans responsibility for the fall of the Turkish power in India cannot be denied—his attitude towards the Turkish nobility crippled it and reduced its life-span."***

ড. ***নিজামী*** এবং ড. ***হবিবউল্লাহ*** মনে করেন, সুলতান বলবনের রাষ্ট্র-প্রজ্ঞার অভাব ছিল। *অন্ধ জাতিচেতনা তাঁর দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রাখার ফলে তিনি দেশে-বিদেশে সংগঠিত সামাজিক* ও রাজনৈতিক পরিবর্তনগুলি দেখতে পান নি। ভারতে বহুসংখ্যক হিন্দুর ইসলামধর্ম গ্রহণ এবং অসবর্ণ বিবাহের ফলে যে অখণ্ড (integrated) ইন্দো-মুসলিম সমাজ গড়ে উঠেছিল, তাকে তিনি অচ্ছুত করে রেখে দেন। অন্যদিকে মধ্য-এশিয়ায় মোঙ্গল আক্রমণ ঘটার ফলে সেখান থেকে ভারতে তুর্কীদের আসা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এমতাবস্থায় প্রশাসনে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়, তা বলবনের দৃষ্টিগোচর হয় নি। তাই তাঁর মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এদেশে তুর্কী আধিপত্যের অবসান ঘটে।

অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে, বলবন শাসনক্ষেত্রে কোন মৌলিকত্বের পরিচয় দেন নি। ***নিজামী*** লিখেছেন ঃ *"পুলিশী দায়িত্ব পালন করে বলবন রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করলেও এমন কোন গঠনমূলক আইন তিনি রচনা করেন নি যা তাঁকে স্মরণীয় করে রাখতে পারে।"* অধ্যাপক ***শ্রীবাস্তব*** লিখেছেন ঃ ***"Balban was not a constructive genius."*** এই অভিযোগের সত্যতা অস্বীকার করা যায় না। বলবনের শাসননীতিতে কোন উদ্ভাবনী-শক্তির প্রমাণ মেলে না। সামরিক বা সামাজিক ক্ষেত্রে তিনি কোন নতুন প্রতিষ্ঠান কিংবা নতুন আইন-প্রণয়ন করে মৌলিক পরিবর্তনের উদ্যোগ নেন নি। বলবন ব্যক্তিগত ভাবে ধার্মিক ছিলেন ; কিন্তু তাঁর মধ্যে ধর্মসহিষ্ণুতার অভাব ছিল। আমীর খসরু, আমীর হাসানের মত কবি-সাহিত্যিক তাঁর

পৃষ্ঠপোষকতা অর্জন করেছিলেন ঠিকই, তবে সাহিত্যের অঙ্গনকে সমৃদ্ধতর করার জন্য তিনি উদ্যম বা অর্থব্যয় করেন নি।

উপরিলিখিত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, বলবনের মধ্যে দক্ষতা ও সীমাবদ্ধতার সমন্বয় ঘটেছিল। তবে যে যুগে এবং যে পরিস্থিতিতে তিনি একটি শিশু-রাষ্ট্রের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন, তখন তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই ছিল প্রধান কাজ। এবং তিনি অবশ্যই অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তা করেছেন। অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা এবং সীমান্তের নিরাপত্তা বিধান করে তিনি যুগের দাবি মিটিয়েছেন। এবং সুযোগ থাকা সত্ত্বেও দিল্লী-সুলতানির রাজ্যসীমা বৃদ্ধি করার পরিবর্তে তাকে সংহত ও নিরাপদ করার প্রতি মনোযোগী হয়ে প্রখর বাস্তববোধের পরিচয় দিয়েছেন। তাই বলা চলে, তাঁর ভ্রান্ত নীতির ফলে তুর্কীজাতির স্বার্থ হয়তো ক্ষুণ্ণ হয়েছিল; কিন্তু দিল্লী-সুলতানির ভিত্তি সুদৃঢ় হয়েছিল। তাই দিল্লী-সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হিসেবে আলাউদ্দিন যে সাফল্য অর্জন করেছিলেন, তার ভিত বলবন তৈরি করেছিলেন, এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না।

○ কাইকোবাদ (১২৮৭-'৯০ খ্রীঃ) ঃ

বলবন তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র মহম্মদকে নিজের উত্তরসুরী হিসেবে কল্পনা করেছিলেন। মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাঁর অকালমৃত্যুর ফলে তিনি কনিষ্ঠপুত্র বুগরা খাঁ'র কথা ভাবেন। কিন্তু বুগরা দিল্লীর সিংহাসনের পরিবর্তে বাংলার শাসক-পদে থাকা বেশি পছন্দ করেন। এমতাবস্থায় বলবন মৃত্যুশয্যায় আমীর ও মালিকদের ডেকে মহম্মদের পুত্র কাইখসরুকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। বলবনের মৃত্যুর পর দিল্লীর কোতোয়াল ফক্‌রুদ্দিন-সহ অন্যান্য অভিজাতবর্গ বুগরা খাঁর পুত্র কাইকোবাদকে পরবর্তী বাদশা হিসেবে ঘোষণা করলে কাইখসরু নীরবে সরে দাঁড়ান।

কাইকোবাদ দিল্লীর সিংহাসনে বসেন মাত্র ১৭ বছর বয়সে। কৈশোরে পিতামহ বলবনের কঠোর নিয়ন্ত্রণে তাঁর বিদ্যাচর্চা শুরু হয়। অস্ত্রবিদ্যা, অশ্বচালনা, তীরন্দাজি, খেলাধূলা, হস্তলিখন ইত্যাদি নানা বিভাগে তিনি পারদর্শিতা অর্জন করেন। তাই কাইকোবাদ যখন সিংহাসনে বসেন (১২৯০ খ্রীঃ) তখন তাঁর কাছ থেকে দেশবাসী অনেক কিছুই আশা করতে পারত। কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে তাঁর চারিত্রিক রূপান্তর সব হিসাব গোলমাল করে দেয়। যে ব্যক্তি এতদিন পর্যন্ত কোন সুন্দরী রমণীর মুখদর্শন কিংবা একফোঁটা সুরাপান করতে পেতেন না, তিনি অকস্মাৎ সুরা ও সাকিতে এত মত্ত হয়ে ওঠেন যে, তাঁর পদের মর্যাদা ও দায়িত্ববোধ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে যান। এই সুযোগ নেন ক্ষমতালোভী তুর্কী মালিক মহম্মদ নিজামউদ্দিন।

সুরা-সাকি আর বিলাস-ব্যসনে আকণ্ঠ ডুবে থাকার জন্য কাইকোবাদ যমুনার অপর তীরে কিলখোরী নামক স্থানে এক সুদৃশ্য প্রাসাদ নির্মাণ করে বসবাস শুরু করেন। সুলতানের হয়ে শাসন পরিচালনা করতে থাকেন দিল্লীর বৃদ্ধ কোতোয়াল ফক্‌রুদ্দিন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই ফক্‌রুদ্দিনের হাত থেকে ক্ষমতার দণ্ড সরে আসে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র তথা জামাতা নিজামউদ্দিনের হাতে। ফক্‌রুদ্দিনের আড়ালে থেকে উচ্চাকাঙ্ক্ষী নিজামউদ্দিন ধীরে ধীরে দিল্লীর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব নিজের হস্তগত করেন। সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে তিনি নিজের অনুগত ব্যক্তিদের নিয়োগ করেন। কাইখসরুর সমর্থক তুর্কী মালিকদের যেমন—বাকসারিখ, হাসান বাসরি, খাজা খতির

প্রমুখকে পদচ্যুত, বন্দী, হত্যা বা বিতাড়িত করেন। মোঙ্গলদের সাথে জোট বেঁধে সুলতানি দখলের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার মিথ্যা অভিযোগ এনে তিনি কাইখসরুকেও হত্যা করেন। মুলতানের গভর্নর মালিক আলাউদ্দিন শেখ এবং বরণের গভর্নর নাসিরুদ্দিন তুজকি প্রমুখ অতি দক্ষ ও বিশ্বস্ত তুর্কী মালিকদের অকারণে হত্যা করে তিনি দিল্লীর প্রশাসনকে প্রতিভাহীন করে দেন। নিজামউদ্দিনের বাড়াবাড়িতে ক্ষুব্ধ ফক্রুদ্দিন তাঁকে লোভসম্বরণ করার পরামর্শও দেন। কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষী নিজামউদ্দিন একইভাবে অন্যায় পথে এগোতে থাকেন।

কাইকোবাদ যখন সিংহাসনে বসেন সেই সময় তাঁর পিতা বুগরা খাঁ 'সুলতান নাসিরুদ্দিন' নাম নিয়ে লখনৌতিতে স্বাধীন শাসনের সূচনা করেন। বাংলায় বসেই তিনি পুত্রের ব্যভিচার এবং সেই ফাঁকে তাকে নিমজ্জিত করার কাজে মালিক নিজামউদ্দিনের অপচেষ্টার সংবাদ পান। পুত্রকে সৎপথে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে বুগরা খাঁ সসৈন্যে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হন। *আমীর খসরু* লিখেছেন যে, বুগরা খাঁর লক্ষ্য ছিল দিল্লীর মসনদ দখল করা। কিন্তু *বরণীর* মতে, তিনি পুত্রকে পরামর্শ দ্বারা কর্তব্যমুখী করার জন্যই দিল্লীর দিকে এসেছিলেন। যাই হোক, পিতা-পুত্রের সাক্ষাৎকারের সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশেই সম্পন্ন হয়। বুগরা কাইকোবাদকে নানা সদুপদেশ দিয়ে বাংলায় ফিরে যান।

নিজামউদ্দিন কর্তৃক-রাষ্ট্রক্ষমতার অপব্যবহার এবং অত্যাচার অপদার্থ সুলতান কাইকোবাদ মেনে নিলেও অন্যান্য তুর্কী-আমীররা নীরবে মেনে নিতে পারেন নি। তাই সামান্য সুযোগ পাওয়া মাত্রই তাঁরা বিষপ্রয়োগে নিজামউদ্দিনকে হত্যা করেন। বরণীর মতে, এই হত্যাকাণ্ডের ফলে একজন ক্ষমতাগর্বী এবং ষড়যন্ত্রী মানুষের বিনাশ ঘটেছিল ঠিকই ; কিন্তু একই সঙ্গে নিজামউদ্দিনের মত দক্ষ প্রশাসকের অবর্তমানে দিল্লীর প্রশাসন সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়েছিল এবং দরবারী রাজনীতি উত্তাল হয়েছিল। এদিকে অত্যধিক মদ্যপান ও ব্যভিচারের ফলে কাইকোবাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্রমশ শিথিল হয়ে পড়ে। এই সময় তিনি সামানা থেকে মালিক ফিরোজ খলজীকে এনে 'আর্জ-ই-মামালিক' পদে নিয়োগ করেন এবং 'শায়েস্তা খাঁ' উপাধি দিয়ে দিল্লীর দরবারি রাজনীতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেন। ফিরোজের নেতৃত্বে ১৩২০ খ্রীষ্টাব্দে 'খলজী বিপ্লব' সংঘটিত হয় এবং দিল্লী-সুলতানির কর্তৃত্ব তুর্কীদের পরিবর্তে খলজীবংশের হস্তগত হয়।

○ খলজী বংশ (১২৯০-১৩২০ খ্রীঃ) ঃ

খলজীদের আদি পরিচয় সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। মধ্যযুগীয় ঐতিহাসিক *নিজামউদ্দিন, ফেরিস্তা* প্রমুখের মতে, খলজীরা তুর্কীজাতির অন্তর্ভুক্ত। আধুনিক ইতিহাসবিদ্ *ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, সুকুমার রায়* প্রমুখও এই বক্তব্যের সাথে একমত। এঁদের মতে, ফিরোজ খলজীর পূর্বপুরুষরা তুর্কীস্থানে বসবাস করতেন। মামুদ গজনী, মহম্মদ ঘুরী এবং মোঙ্গলদের আক্রমণের সময় এঁরা মধ্য-এশিয়া থেকে আফগানিস্তানের আলমন্দ (বা হেলমন্দ) উপত্যকা ও লামঘানে এসে বসতি স্থাপন করেন। ফিরোজের পূর্বপুরুষেরা এখানে প্রায় দু'শো বছর বসবাস করেন। 'খলজ' নামে পরিচিতি এ অঞ্চলে বসবাস করার জন্য এঁরা *'খলজী'* নামে পরিচিত হন। দীর্ঘকাল আফগানিস্তানে বসবাসের ফলে এঁরা আফগানিস্তানের আচার-আচরণে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। তাই আদি তুর্কীরা এঁদের সমগোত্রীয় বলে মানতে অস্বীকার

করে। অন্যদিকে বরণীর মতে, খলজীরা তুর্কীদের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি জাতি এবং এঁরা সম্ভবত চেঙ্গিস খাঁর জামাতা কুলিজ খাঁর বংশধর। যাই হোক, খলজীরা গজনী ও ঘুর বংশের সেনাবাহিনীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। মামুদ ও মহম্মদ ঘুরীর ভারত-অভিযানের সূত্রে এঁদের অনেকে ভারতে প্রবেশ করেন এবং স্থায়িভাবে বসবাস শুরু করেন। তাই তুর্কী-মালিকদের চোখে এঁরা হিন্দুস্তানী মুসলমান হিসেবে পরিচিত হন।

○ খলজী বিপ্লব ও তার গুরুত্ব ঃ

সুলতান কাইকোবাদের বিলাসব্যসন এবং উচ্ছৃঙ্খল জীবনধারার সুযোগে মালিক নিজামউদ্দিন প্রকারান্তরে সুলতানি প্রশাসনের হর্তাকর্তায় পরিণত হয়েছিলেন। পিতা বুগরা খাঁর পরামর্শে সুলতান কাইকোবাদ কিছুটা দায়িত্বসচেতন হয়ে এই ক্ষমতালোভী অভিজাতকে মূলতানের দায়িত্ব দিয়ে দিল্লী ছাড়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু নিজামউদ্দিন নানা অজুহাতে ক্ষমতার উৎসভূমি দিল্লী ছাড়তে দেরি করেন। ইতিমধ্যে তাঁর আচরণে অন্যান্য তুর্কী অভিজাতরাও প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। এই সুযোগে তাঁরা কাইকোবাদের কাছে নিজামউদ্দিন কর্তৃক ইচ্ছাকৃতভাবে রাজাদেশ লঙ্ঘনের অভিযোগ এনে সুলতানকে উত্যক্ত করে তোলেন। শেষ পর্যন্ত এঁদের ষড়যন্ত্রে বিষপ্রয়োগ করে নিজামউদ্দিনকে হত্যা করা হয়।

নিজামউদ্দিনের মৃত্যু সুলতানি প্রশাসনে অস্থিরতা প্রকট করে। কারণ নিজামউদ্দিন উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও অত্যাচারী হলেও দক্ষ প্রশাসক ছিলেন। তাঁর স্থান পূরণ করার জন্য কাইকোবাদ খলজী মালিক ফিরোজকে সামানা থেকে দিল্লীতে নিয়ে আসেন। মালিক ফিরোজ ও তাঁর ভাই শিহাবউদ্দিন (আলাউদ্দিন খলজীর পিতা) সুলতান বলবনের অধীনে দীর্ঘকাল চাকরি করেছিলেন। ফিরোজ ছিলেন সাহসী সৈনিক ও দক্ষ প্রশাসক। তাই তিনি অল্পদিনের মধ্যে *'সর-ই-জন্দার'* (দেহরক্ষী বাহিনীর প্রধান)-পদে উন্নীত হন। একই সঙ্গে তিনি সীমান্ত রাজ্য সামানার গভর্নর নিযুক্ত হন। সামানার প্রশাসক হিসেবে তিনি মোঙ্গল আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে একাধিক যুদ্ধে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। নিজামউদ্দিনের মৃত্যুর পর সুলতান কাইকোবাদ এই দক্ষ যোদ্ধা এবং প্রশাসককে দিল্লীতে এনে বরণের গভর্নর নিযুক্ত করেন এবং *'আর্জ-ই-মামালিক'*-পদে মালিক চাজ্জুর স্থলাভিষিক্ত করেন।

ফিরোজ খলজীর এই পদোন্নতি ক্ষমতাগর্বী তুর্কী অভিজাতদের ঈর্ষান্বিত ও ক্ষুব্ধ করে তোলে। এঁদের মতে, খলজীবংশ মর্যাদাগতভাবে তুর্কীদের সমকক্ষ নয়। তুর্কীদের বিচারে খলজীরা হিন্দুস্তানী মুসলমান। একজন তুর্কী সুলতানের অধীনে একজন হিন্দুস্তানী সৈনিকের এই উন্নতি তাদের উষ্মার কারণ হয়। কাইকোবাদ এই সময় পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী হয়ে পড়লে জটিল অবস্থা আরও জটিলতর হয়। তুর্কী অভিজাতরা এই ভেবে আশঙ্কিত হন যে, অতঃপর পঙ্গু সুলতানকে আড়ালে রেখে ফিরোজ খলজী রাষ্ট্র-ক্ষমতা করায়ত্ত করবে এবং তুর্কী অভিজাতদের মর্যাদা ও অধিকার বিনষ্ট হবে। এর ফলে মালিক আইতিমার (কাচ্চন) এবং মালিক সুরখা'র নেতৃত্বে তুর্কী অভিজাতরা ফিরোজের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হন। অন্যদিকে তুর্কী আধিপত্যের বিরোধী তথা পরিবর্তনপন্থী অভিজাতবর্গ মালিক ফিরোজ খলজীর নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হন। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে, কাইকোবাদ জীবিত থাকা সত্ত্বেও, তুর্কী অভিজাতরা তাঁর

তিন বছরের শিশুপুত্র কায়ুমর্সকে সুলতান বলে ঘোষণা করেন এবং *'দ্বিতীয় সামসুউদ্দিন'* উপাধি দিয়ে রাজধানীর *'চবুতরা-ই-নাসিরী'* প্রাসাদে অভিষেক সম্পন্ন করেন। অতঃপর কাচ্চন ও সুরখা ফিরোজের প্রাণনাশের এক পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করেন।

এই সময় মালিক ফিরোজ *'ভূগাল পাহাড়ী'* (বরণীর মতে বাহারপুর)-তে সামরিক বাহিনী পরিদর্শনের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। *'নায়েব-ই-হাজির'* মালিক মহম্মদ চাপ মারফত ফিরোজ এই ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারেন এবং অতি সন্তর্পণে নিজের সমর্থকদের নিয়ে গিয়াসপুরে চলে যান। তুর্কীদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তিনি নির্লিপ্ততা দেখান এবং প্রচার করেন যে, সম্ভাব্য মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করার জরুরী প্রয়োজনেই তিনি রাজধানীতে ফিরে যেতে পারছেন না। এই সময় কায়ুমর্সের এক জরুরী নির্দেশ নিয়ে মালিক কাচ্চন ফিরোজের শিবিরে উপস্থিত হলে ফিরোজ তাঁকে হত্যা করেন। অতঃপর ফিরোজ খলজী দ্রুত রাজধানীতে উপস্থিত হন। তাঁর পুত্র প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করে শিশু-সুলতান কায়ুমর্সকে নিজেদের শিবিরে নিয়ে চলে আসেন। মালিক সুরখা ও অন্যান্য তুর্কী-মালিকরা খলজীদের বাধা দিতে এলে সুরখা-সহ অনেকে নিহত হন। ফক্‌রুদ্দিন কোতোয়াল দিল্লীর জনগণকে খলজীদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর চেষ্টা ফলপ্রসূ হয় নি। সুরখা ও কাচ্চনের মৃত্যুর ফলে তুর্কীদের মনোবল ভেঙ্গে যায় এবং তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। বহু তুর্কী এবং অ-তুর্কী আমীর ও মালিক ফিরোজ খলজীর পক্ষ অবলম্বন করলে তিনি অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হন।

ড. নিজামীর মতে, তুর্কী অভিজাতদের বিরুদ্ধে ফিরোজ খলজীর এই লড়াই ছিল নিতান্তই আত্মরক্ষামূলক। দিল্লীর রাজক্ষমতা দখলের আদৌ কোন ইচ্ছা যে তাঁর ছিল না সে-কথা প্রমাণ করে তাঁর পরবর্তী আচরণ। বিরোধী তুর্কীদের ষড়যন্ত্র ধ্বংস করার পর ফিরোজ কায়ুমর্সকে কিলঘোরী প্রাসাদে সুলতানি সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং মালিক চাজ্জুকে নাবালক সুলতানের অভিভাবকত্ব গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান। কিন্তু চাজ্জু কারা-মানিকপুরের গভর্নরপদে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করলে ফিরোজ কোতোয়াল ফক্‌রুদ্দিনকে অভিভাবকত্ব গ্রহণের প্রস্তাব দেন। কিন্তু বৃদ্ধ কোতোয়ালও সেই প্রস্তাব নাকচ করে দেন। অতঃপর ফিরোজ সুলতানের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন।

সম্ভবত এই সময় তাঁর মনে সুলতানি সিংহাসন দখলের পরিকল্পনা আসে। এই রাজনৈতিক প্রহসন শেষ করার জন্য তাঁর নির্দেশে জনৈক খলজী মালিক কিলঘোরী প্রাসাদে প্রবেশ করে পক্ষাঘাতে পঙ্গু এবং শয্যাশায়ী কাইকোবাদকে হত্যা করে তাঁর মৃতদেহ যমুনার জলে নিক্ষেপ করে। শিশু কায়ুমর্সকে কারারুদ্ধ করা হয়। অতঃপর ফিরোজ *'জালালউদ্দিন ফিরোজ শাহ'* নাম নিয়ে কিলঘোরী প্রাসাদে নিজেকে সুলতান বলে ঘোষণা করেন (১২৯০ খ্রীঃ)। ঐতিহাসিক ***আর. পি. ত্রিপাঠী*** ও ***কে. এস. লাল*** প্রমুখ এই ঘটনাকে 'খলজী-বিপ্লব' (**Khalji Revolution**) নামে অভিহিত করে বিশেষ ইতিহাসগত মর্যাদা দিয়েছেন।

ড. লাল, হবিবউল্লাহ ও ***ত্রিপাঠী*** প্রমুখ অধিকাংশ ঐতিহাসিক 'খলজী বিপ্লব'কে ভারত-ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী ঘটনা বলে মনে করেন। ***ড. কে. এস লাল***-এর মতে, *'এই বিপ্লব কেবল একটি রাজবংশ থেকে অন্য রাজবংশের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সাধারণ ঘটনা ছিল না। এটি ছিল তুর্কী একাধিপত্যের বিরুদ্ধে ভারতীয় মুসলমানদের জেহাদ*

ও সাফলের নিদর্শন।' মহম্মদ ঘুরীর আমল থেকে ভারতীয় মুসলিম সাম্রাজ্যে শুধুমাত্র তুর্কী মুসলমানদের কর্তৃত্ব ও মর্যাদা সরকারিভাবে স্বীকৃত ছিল। ইলতুৎমিস, বলবন প্রমুখ প্রত্যেক সুলতান গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদে তুর্কী-মুসলমান ছাড়া কাউকে নিয়োগ করতেন না।[1] অথচ ভারতবর্ষে তুর্কী-আধিপত্য প্রতিষ্ঠার একেবারে প্রাথমিক পর্ব থেকেই অবহেলিত খলজীরা অতি বিশ্বস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। 'তরাইনের প্রথম যুদ্ধে' (১১৯০ খ্রীঃ) তৃতীয় পৃথ্বীরাজ চৌহানের হাতে যখন মহম্মদ ঘুরী পরাজিত ও মারাত্মক রূপে আহন হত, তখন একজন খলজী অনুচরই চরম বিশ্বস্ততা ও সাহসের পরিচয় দিয়ে তাঁকে বিপদমুক্ত করেছিলেন। বখ্‌তিয়ার খলজী আপন শৌর্য্য ও দক্ষতা দ্বারা বাংলা-বিহারসহ পূর্ব-ভারতে মহম্মদ ঘুরীর বিজয় পতাকা উড্ডীন করেছিলেন। স্বভাবতই মামেলুক সুলতানদের আমলে সরকারি উচ্চপদে খলজী অভিজাতদের একটি দাবি পরোক্ষে স্থাপিত হয়েছিল। এদিকে ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে মোঙ্গল যোদ্ধারা হেলমন্দ উপত্যকা ও কাবুল আক্রমণ করে ধ্বংসলীলা চালালে খলজীরা দলে দলে ভারতে প্রবেশ করে এবং গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চলে বসবাস শুরু করে। মামেলুক সুলতানদের উন্নাসিকতার ফলে খলজীদের অধিকাংশই যোগ্যতা ও দক্ষতা সত্ত্বেও সাধারণ কৃষিজীবি রূপে জীবন কাটাতে বাধ্য হয়। ইলতুৎমিস, বলবন প্রমুখ তুর্কী ও খলজীদের মধ্যে জাতিগত ভেদাভেদের প্রাচীর তুলে শেষোক্তদের রাজনৈতিক অধিকার সংকুচিত করে রাখেন। বলবন তো প্রকাশ্যেই জাতি ও বংশকৌলিন্যকে সরকারি পদে নির্বাচনের প্রধান মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করার চেষ্টা করেন। ফলে খলজী ছাড়াও অন্যান্য বহিরাগত মুসলমান এবং ধর্মান্তরিত ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে তুর্কী-শাসনের প্রতি তীব্র ক্ষোভ সঞ্চারিত হয়। জালালউদ্দিন ফিরোজ খলজীর মামেলুক-বিরোধী প্রয়াস এইসব বিক্ষুব্ধগোষ্ঠীকে অনিবার্যভাবেই তাঁর সমর্থকে পরিণত করে। জালালউদ্দিন ফিরোজ ১২৯০ খ্রীষ্টাব্দে প্রাসাদ বিপ্লব ঘটিয়ে অ-তুর্কী মুসলমানদের বাসনাকে বাস্তব রূপ দেন। খলজী-বিপ্লব দ্বারা দিল্লীর সিংহাসন দখল করে ফিরোজ খলজী প্রমান করেছিলেন যে, দিল্লীর সিংহাসনে তুর্কীজাতির অধিকার একচেটিয়া নয়। এই বিপ্লব প্রমাণ করেছিল যে, রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য বংশকৌলিন্য বা নীলরক্ত আবশ্যিক নয়। ড. *লাল (K. S. Lal)* তাঁর *'History of the Khalji's'* গ্রন্থে লিখেছেন : *"The revolution resulted in the supercession of commoner's government over that of the Blue-blood's."*

খলজী-বিপ্লব প্রমাণ করে যে, ধর্ম এবং ধর্মগুরু বা উলেমাদের সাহায্য এবং প্রভাবমুক্ত হয়েও রাজনৈতিক লক্ষ্যে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব। ইলতুৎমিস কিংবা বলবন রাজনীতিতে উলেমাদের কর্তৃত্বকে যেভাবে স্বীকার করেছিলেন, তাতে রাষ্ট্রনীতির উপর ধর্মের সর্বগ্রাসী ছায়া প্রসারিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। *'ঈশ্বরসৃষ্ট রাজপদের সাফল্য ধর্মগুরুদের শুভেচ্ছার উপর নির্ভরশীল'*—এই তত্ত্বকে ভ্রান্ত প্রমাণ করেছিলেন ফিরোজ খলজী। ড. *ত্রিপাঠী* মন্তব্য করেছেন, *'খলজী-বিপ্লবের প্রধান অস্ত্র ছিল ফিরোজ খলজীর অস্ত্রশক্তি।'* এর ফলে সুলতানি রাষ্ট্রের

প্রকৃতিগত পরিবর্তন সম্ভব হয়। দিল্লী-সুলতানি ধর্মাশ্রয়ী রাষ্ট্র না হয়ে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে ওঠার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়।

খলজী-বিপ্লব দিল্লীর সিংহাসনে রাজবংশ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এক গতিশীল ও প্রাণবন্ত রাষ্ট্রব্যবস্থার সূচনা করে। অধ্যাপক *লাল* লিখেছেন ঃ *"It ushered in an era of ceaseless conquers, of unique experiment in state craft and of incomparable literary activity."* খলজী বংশের সুলতান আলাউদ্দিন খলজীর নেতৃত্বে দিল্লী-সুলতানির ভারতীয় সাম্রাজ্যে উত্তরণের যুগ শুরু হয়। উত্তর-ভারতের সীমানা অতিক্রম করে দক্ষিণ-ভারতের উপর সুলতানি প্রশাসনের কর্তৃত্ব সম্প্রসারিত হয় খলজীদেরই নেতৃত্বে। ইলতুৎমিস বা বলবন মহম্মদ ঘুরী এবং কুতুবউদ্দিনের সাম্রাজ্যকে সামান্যতম সম্প্রসারিত করেন নি। দিল্লী ভিত্তিক সুলতানি রাজ্যকে সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যে রূপান্তরের শুরু হয়েছিল খলজী সাম্রাজ্যবাদের মাধ্যমে। আর সেই খলজী সাম্রাজ্যবাদের সূচনা ছিল খলজী-বিপ্লব।

খলজী-বিপ্লব এবং পরবর্তী ঘটনাবলী একাধারে রাজনীতিতে সামরিক-বাহিনীর প্রভাব ও জনমতের ভূমিকা ও গুরুত্ব প্রমাণ করে। দিল্লীর মামেলুক সুলতানদের কেন্দ্র করে যে ধরনের আনুগত্য গড়ে উঠেছিল, তাতে সিংহাসন দখলের ক্ষেত্রে সামরিক শক্তির গুরুত্ব ক্রমশ শিথিল হচ্ছিল। তুর্কী অভিজাতবর্গ সুলতানের মনোনীত ব্যক্তি কিংবা তার পুত্র-কন্যাকেই উত্তরাধিকারী হিসেবে স্বীকার করে নিচ্ছিলেন। কিন্তু ফিরোজ খলজী সামরিক অভ্যুত্থানের দ্বারা সিংহাসন দখল করলে এই সত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় যে, সামরিক শক্তি দ্বারা ক্ষমতা দখলের মধ্যযুগীয় রীতি তখনও যথেষ্ট সক্রিয়। মামেলুক সুলতানদের আমলে সৃষ্ট জন-আনুগত্যের ভিত্তি খুবই শিথিল। আবার একই সঙ্গে ক্ষমতাদখলের অব্যবহিত পর ফিরোজ খলজীর কর্মধারা ঠিক বিপরীতধর্মী একটি উপাদানের অস্তিত্ব তুলে ধরে। ফিরোজ কর্তৃক জোরপূর্বক ক্ষমতাদখলের সংবাদে দিল্লীর মুসলমান জনতার মধ্যে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। প্রধানত উলেমা ও তুর্কী অভিজাতদের প্ররোচনায় অভ্যুত্থান-বিরোধী একটা গণ-মানসিকতার অস্পষ্ট আভাস অনুভূত হয়েছিল। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, ইতিমধ্যে দিল্লীর মুসলিম জনতার মধ্যে একটা রাজনৈতিক চেতনা ও আনুগত্যবোধ সৃষ্টি হয়েছিল। এই বিরূপতার সোচ্চার প্রকাশ হয়তো ছিল না, কিন্তু গভীরতা নিশ্চয়ই ছিল। অন্যথায় ফিরোজ খলজী ক্ষমতাদখলের অব্যবহিত পরেই দিল্লীতে প্রবেশ করতে দ্বিধা করতেন না। ক্রমে মুসলিম জনতার আস্থা অর্জন করার পর তিনি দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ঐতিহাসিকদের মতে, এই সময় সামরিক শক্তিভিত্তিক স্বৈরাচারিতা এবং গণ-সমর্থনভিত্তিক রাজতন্ত্রের ধারণা দোদুল্যমান অবস্থায় সহাবস্থান করছিল। পরিস্থিতি অনুযায়ী কোন একটি শক্তি অপরটিকে টপকে সামনে এসে পড়েছিল। যাই হোক, জনমতের এই পরিণতি স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষেত্রে একটা ক্ষীণ আশার সঞ্চার করেছিল।

○ জালালউদ্দিন ফিরোজ খলজী (১২৯০-'৯৬ খ্রীঃ) ঃ

খলজী মালিক ফিরোজ তথাকথিত 'খলজী-বিপ্লব' সংঘটিত করে এবং শেষ মামেলুক সুলতানদ্বয় কাইকোবাদ ও কায়ুমর্সকে যথাক্রমে হত্যা ও বন্দী করে দিল্লীর সিংহাসন দখল করেন।

১২৯০ খ্রীষ্টাব্দে কিলঘোরী প্রাসাদে তাঁর অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হয়। মালিক ফিরোজ রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের মাধ্যমে সিংহাসন দখল করলেও, তাঁর চরিত্রের মধ্যযুগীয় স্বৈরতান্ত্রিক নৃপতির কাঠিন্যের যথেষ্ট অভাব ছিল। মালিক ফিরোজ সুলতান জালালউদ্দিন ফিরোজ শাহে রূপান্তরিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আচরণের মধ্যেও বৈপ্লবিক রূপান্তর লক্ষ্য করা যায়। প্রচলিত 'রুধির ও লৌহ' (Blood and Iron) নীতির পরিবর্তে তিনি ক্ষমা ও সহনশীলতার নীতি অনুসরণ করেন। *ড. হবিবউল্লাহ* ফিরোজের শাসনকালকে *'প্রজাহিতৈষণা ও উদারতার প্রতীক'* বলে অভিহিত করেছেন। অধ্যাপক *এস. আর শর্মা* তাঁকে 'Clemency King Firus' বলে আখ্যায়িত করেছেন। কারণ যারা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে এবং অস্ত্রধারণ করেছে, যে তুর্কী আমীরদের তিনি পরাজিত করেছেন কিংবা যেসব মানুষ বা গোষ্ঠী দেশজুড়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করেছে,—সবাইকে তিনি গ্রহণ করেছেন ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে। সংঘর্ষের পরিবর্তে সহনশীলতার মাধ্যমে তিনি সকল সমস্যার ব্রতী হয়েছেন। এবং সম্ভবত এটিই ছিল তাঁর ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ।

O আভ্যন্তরীণ নীতি ঃ আগেই আমরা দেখেছি যে, তুর্কী বংশভূত হলেও খলজী মুসলানদের তুর্কী-মালিকরা সমপর্যায়ভুক্ত মনে করতেন না। দিল্লীর সাধারণ মুসলমানদের মধ্যেও ফিরোজকে সুলতান হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে একটা দ্বিধা ছিল। দীর্ঘকাল ইলবেরী তুর্কীদের শাসনাধীনে থাকার ফলে দিল্লীর জনসমাজ ফিরোজকে একজন জবরদখলকারী রূপেই প্রথমে গণ্য করেন। সামাজিক এই প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ফিরোজ যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তাই তিনি দিল্লীর পরিবর্তে কাইকোবাদ-নির্মিত কিলঘোরী প্রাসাদেই নিজের অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করেন এবং কিলঘোরীর অসমাপ্ত প্রাসাদকে সম্পূর্ণ করে সেখান থেকেই শাসন চালাতে থাকেন। অবশ্য এক বছরের মধ্যেই দিল্লীর জনমত পরিবর্তিত হয়। জালালউদ্দিনের উদারতা ও আপসমূলক মনোভাব তাঁকে জনপ্রিয় করে তোলে এবং জনমত সাদরে বরণ করে নেয়।

সম্ভবত বয়সের ভার (সিংহাসনে বসার সময় ছিল সত্তর) এবং তুর্কী-মালিকদের বিরোধিতার জন্য ফিরোজ তাঁর শত্রুদের সঙ্গেও উদার ও সহিষ্ণু নীতি অনসুরণ করেন। অধিকাংশ তুর্কী মালিককে তিনি স্বপদে বহাল রাখেন এবং বিদ্রোহীদেরও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন। বলবনের আত্মীয় এবং সিংহাসনের অন্যতম দাবিদার মালিক চাজ্জুকে কারা-মানিকপুরের গভর্নর নিযুক্ত করেন। বৃদ্ধ মালিক ফক্রুদ্দিন দিল্লীর কোতোয়াল-পদে বহাল থাকেন। খাজা কতির উজীরপদে নিযুক্ত হন। তাঁর এই বদান্যতা দিল্লীর মানুষকে অভিভূত করে। তারা দলবদ্ধভাবে অত্যন্ত সংকোচের সাথে ফিরোজকে দিল্লীর প্রাসাদে অধিষ্ঠিত হবার জন্য আমন্ত্রণ জানায়।

ফিরোজের বদান্যতা ও উদারতা অনেকের কাছে দুর্বলতা বলে প্রতিভাত হয়। এই কারণে মালিক চাজ্জু ১২৯১ খ্রীষ্টাব্দে ফিরোজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। সুলতানের পুত্র আরকলি খাঁ এই বিদ্রোহ দমন করে চাজ্জু ও তাঁর সহযোগীদের বন্দী করে সুলতানের সম্মুখে উপস্থাপিত করেন। আরকলি খাঁর আশা ছিল ফিরোজ বিদ্রোহীদের কঠোর শাস্তিবিধান দ্বারা এই জাতীয় অকৃতজ্ঞতার সমুচিত জবাব দেবেন। কিন্তু সুলতান ফিরোজ তাঁদের বন্দীদশা দেখে প্রকাশ্য রাজসভায় দুঃখ প্রকাশ করেন এবং তাঁদের সম্মানে রাজকীয় ভোজসভার আয়োজন

করেন। অতঃপর চাজ্জুকে সসম্মানে মুলতানে পুনর্বাসিত করেন। সুলতানের এহেন আচরণে আরকলি খাঁ ও আলাউদ্দিন অসন্তোষ প্রকাশ করলে ফিরোজ স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, 'সিংহাসনের জন্য তিনি মুসলমানের রক্তপাত করতে রাজি নয়।'

ঠগী দস্যুদের প্রতিও ফিরোজ এই ধরনের ক্ষমা প্রদর্শন করেন। এই সকল ঠগী অকারণে হত্যা ও লুণ্ঠন দ্বারা জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। রাজধানীর নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে সুলতানি-বাহিনী বহু দস্যুকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু ফিরোজ খলজী এদের শাস্তিদানের পরিবর্তে ক্ষমা প্রদর্শন করেন এবং নৌকাযোগে বাংলার সীমান্তে পাঠিয়ে দেন। বস্তুত এই দস্যুদের আগমনের ফলে বাংলাদেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি ঘটেছিল। ফিরোজের এই অস্বাভাবিক আচরণ খালজী মালিকদের দারুণ অসন্তুষ্ট করে। এমনকি তারা প্রকাশ্যে ফিরোজকে সিংহাসনচ্যুত করার বিষয় আলোচনা করতে থাকেন। কিন্তু বৃদ্ধ সুলতান সে বিষয়ে নিঃস্পৃহ থাকেন। ফিরোজ যখন রণথম্ভোর-বিজয়ে ব্যস্ত, সেই সময় কিছু খলজী মালিক তাজউদ্দিন কুচি নামক জনৈক খলজীকে সিংহাসনে বসানোর সিদ্ধান্ত নেন। জালালউদ্দিন এই ঘটনা জানার পর সমস্ত মালিকদের সভা আহ্বান করে তাদের মৃদু ভৎসনা করেন এবং নিজের তরবারি মাটিতে রেখে তাঁকে হত্যা করার যে-কোন আগ্রহী ব্যক্তিকে আহ্বান জানান। অবশ্য বিদ্রোহী খলজী মালিকেরা তাদের ভুল স্বীকার করে নেন এবং সুলতানও তাঁদের ক্ষমা করে দেন।

একমাত্র সিধি মৌলা নামক দরবেশের সাথে আচরণে ফিরোজ খলজী তাঁর স্বভাবসুলভ আচরণ থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন। সিধি মৌলা ছিলেন পাক্-পাটন-এর শেখ ফরিদউদ্দিন গঞ্জ-ই-শকর-এর শিষ্য। কাইকোবাদের আমল থেকেই তিনি দিল্লীর সন্নিকটে খান্‌কা নির্মাণ করে বসবাস করছিলেন। অভিজাতমহলে তাঁর ব্যাপক জনপ্রিয়তা ছিল। তাঁর শিষ্যসংখ্যা ছিল কয়েক হাজার। বলবনী অভিজাতদের অনেকেই সিধি মৌলার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। এমনকি ফিরোজের ধর্মপ্রাণ পুত্র 'খান-ই-খানান'ও মৌলার শিষ্য ছিলেন। যাই হোক, ফিরোজ যখন মান্দাবার অভিযানে ব্যস্ত ছিলেন, তখন বলবনী-অভিজাতরা সিধি মৌলাকে ফিরোজের পরিবর্তে দিল্লীর সিংহাসনে বসানোর একটি পরিকল্পনা করেন বলে কথিত আছে। ড. *নিজামীর* মতে, সিধি মৌলার প্রতিদ্বন্দ্বী কোন ধর্মীয় গোষ্ঠী এই ধরনের অপপ্রচার দ্বারা সিধি মৌলার জনপ্রিয়তা ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। এই ষড়যন্ত্রের সংবাদ পাওয়া মাত্র আরকলি খাঁ মৌলা-সহ ষড়যন্ত্রীদের বন্দী করেন এবং সুলতান মান্দাবার অভিযান থেকে ফিরলে তাঁর সামনে উপস্থিত করেন। এই প্রথম ফিরোজ খলজী বিদ্রোহের সংবাদে প্রচণ্ড উত্তেজিত হন এবং সিধি মৌলাকে নৃশংসভাবে হত্যার নির্দেশ দেন। আরকলি খাঁ এই সন্তকে উন্মত্ত হাতির পদতলে পিষ্ট করে হত্যা করেন। এই বছর এক অভূতপূর্ব খরা ও ধূলিঝড়ে দিল্লীতে শিবালিক পর্বত অঞ্চল বিপর্যস্ত হয়েছিল। দেখা দিয়েছিল ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। অনেকে মনে করেন, ধর্মপ্রাণ সন্ত সিধি মৌলার হত্যাকাণ্ডের পাপে দেশবাসীর উপর এই অভিশাপ বর্ষিত হয়েছিল।

০ মোঙ্গল আক্রমণ ঃ মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করার কাজে জালালউদ্দিন ফিরোজ দক্ষতা ও দৃঢ়তার পরিচয় দেন। ১২৯২ খ্রীষ্টাব্দে প্রাক্তন নেতা হলাকুর পৌত্র আবদুল্লার নেতৃত্বে

প্রায় দেড়লক্ষ মোঙ্গলের একটি দল ভারত আক্রমণ করে এবং সামান পর্যন্ত অগ্রসর হয়। জালালউদ্দিন তৎপরতার সঙ্গে মোঙ্গলদের গতিরোধ করেন এবং যুদ্ধে পরাজিত করে পিছু হটতে বাধ্য করেন। এই সময় চেঙ্গিজ খাঁর বংশধর হুলাগু'র নেতৃত্বে কয়েক হাজার মোঙ্গল ইসলামধর্ম গ্রহণ করে ভারতে বসবাস করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। ফিরোজ তাদের সেই অনুমতি দেন। এমনকি তিনি নিজের ভগিনীর সাথে হুলাগুর বিবাহ দেন এবং ধর্মান্তরিত মোঙ্গলদের বিভিন্ন সরকারি পদে নিয়োগ করেন। এরা *'নব-মুসলমান'* নামে পরিচিত হয়। জালালের এই কাজের মধ্যে দূরদৃষ্টির অভাব লক্ষ্য করা যায়। কারণ পরবর্তীকালে এই 'নব-মুসলমানরা' দিল্লী-সুলতানির অস্তিত্বের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল।

○ রাজ্যজয় ঃ জালালউদ্দিনের সামরিক কর্মসূচীর অধিকাংশই ছিল ব্যর্থতায় ভরা। ছয় বছরের রাজত্বে তিনি মাত্র দুটি অভিযান পাঠিয়েছিলেন, যার কোনটিই পূর্ণ সাফল্য পায়নি। ১২৯০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রণথম্ভোরের চৌহান রানা হামীরদেবের বিরুদ্ধে একটি অভিযান পরিচালনা করেন। সুলতানি-বাহিনীর প্রাথমিক সাফল্য সত্ত্বেও রাজপুতদের প্রচণ্ড প্রতিরোধের ফলে ফিরোজ এই অভিযান অসমাপ্ত রেখে দিল্লীতে ফিরে আসেন। যুক্তি হিসেবে তিনি বলেন, '*এই ধরনের একশত দুর্গের থেকে একজন মুসলমানের মাথার একটি চুলের দাম অনেক বেশি।*' এখানে একমাত্র ঝাইন অঞ্চল তাঁর হস্তগত হয়। তবে এখানকার হিন্দুমন্দির ও বিগ্রহাদি ধ্বংস করে তিনি ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার পরিচয় দেন।

জালালউদ্দিনের রাজত্বকালের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সফল সামরিক অভিযান ছিল দক্ষিণ-ভারতের সমৃদ্ধ রাজ্য দেবগিরির বিরুদ্ধে। তবে একটি সুলতান জালালউদ্দিনের অনুমত্যানুসারে বা জ্ঞাতসারে সংঘটিত হয়নি। এই অভিযানটি পরিচালনা করেছিলেন জালালের ভ্রাতুষ্পুত্র তথা জামাতা আলাউদ্দিন খলজী এবং সুলতানের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে। ইতিপূর্বে মালব আক্রমণকালে আলাউদ্দিন ভিলসা দুর্গ লুণ্ঠনের সময় দেবগিরির ধন-সম্পদের প্রাচুর্য সম্পর্কে অবহিত হন। মালব অভিযান থেকে ফিরেই তিনি দক্ষিণ ভারত অভিযানের গোপন প্রস্তুতি শুরু করেন। চান্দেরী ও মালবের সমৃদ্ধ অঞ্চল দখল করার অজুহাতে তিনি সৈন্যবল বৃদ্ধির অনুমতিও আদায় করেন ফিরোজের কাছ থেকে। অতঃপর মালিক আলা-উল মু-মুলক'কে কারা-মানিকপুরের দায়িত্ব দিয়ে ১২৯৪ খ্রীষ্টাব্দে আট হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে দক্ষিণ ভারত যাত্রা করেন। দেবগিরির রাজা রামচন্দ্রদেব তাঁর পুত্র শংকরদেবকে পরাজিত করে তিনি বিশাল পরিমাণ সম্পদ লাভ করেন। ***উলসী হেগ* (*Wolseley Haig*)**-এর মতে, *"আলাউদ্দিন দেবগিরি থেকে ১৭,২৫০ পাউন্ড সোনা, ২০০ পাউন্ড মুক্তা, ৫৮ পাউন্ড অন্যান্য মহার্ঘ পাথর, ২৮,২৫০ পাউন্ড রূপো এবং ১ হাজার সিল্কের থান কারায় নিয়ে এসেছিলেন।"*

এদিকে ১২৯৫-এর শেষদিকে জালালউদ্দিন গোয়ালিয়রে শিকার অভিযানের সময় আলাউদ্দিনের দক্ষিণ ভারত অভিযান ও সম্পদসংগ্রহের সংবাদ পান। এই সংবাদে আহম্মদ চাপ প্রমুখ বেশ শঙ্কিত হন এবং সত্বর কারায় গিয়ে আলাউদ্দিনকে কিছুটা শিক্ষা দেবার পরামর্শ দেন। কিন্তু ক্ষমাশীল সুলতান ফিরোজ এক্ষেত্রেও নিঃশঙ্কচিত্তে দিল্লী ফিরে যান। দিল্লীতে আলাউদ্দিনের ভ্রাতা উলুঘ খাঁ ছিলেন যথেষ্ট প্রভাবশালী ব্যক্তি। ফিরোজের উপর তাঁর প্রভাবও কম ছিল না। উলুঘ খাঁ ফিরোজকে বোঝান যে, কৃতকার্যের জন্য অনুতপ্ত আলাউদ্দিন সুলতানের

সম্মুখীন হতে লজ্জাবোধ করছেন। এমনকি ফিরোজের ক্ষমা না পেলে আলাউদ্দিন হয়তো দেশান্তরী হবেন কিংবা বিষপানে জীবন ত্যাগ করবেন —এই গল্প কথাও উলুঘ ফিরোজকে শোনান। সরলহৃদয় ফিরোজ নিজেই কারায় উপস্থিত হন ও অনুতপ্ত আলাউদ্দিনকে শান্ত করার সিদ্ধান্ত নেন।

উলুঘ খাঁ'র বক্তব্য পুরোটাই ছিল আলাউদ্দিনের ষড়যন্ত্রের মুখবন্ধ। উলুঘ খাঁর দূত মারফত আলাউদ্দিন সমস্ত ঘটনাই জানতে পারেন এবং স্নেহান্ধ পিতৃব্য সুলতানকে যথাযথ মর্যাদার সাথে অভ্যর্থনা করতে প্রস্তুত হন। সুলতান মানিকপুরে উপস্থিত হলে উলুঘ খাঁ তাঁকে সৈন্য ছাড়া দু'চারজন দেহরক্ষীসহ গঙ্গা অতিক্রম করে পশ্চিমতীরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। কারণ সসৈন্যে সুলতানকে দেখলে লজ্জিত ও ভীত আলাউদ্দিন হয়তো আত্মহত্যা করতে পারেন। এবারেও সরলহৃদয় ফিরোজ উলুঘের কথায় বিশ্বাস করলেন এবং সামান্য কয়েক জন অনুচরসহ গঙ্গা অতিক্রম করে আলাউদ্দিনের শিবিরে প্রবেশ করলেন। কিন্তু হায়রে ভাগ্য! বৃদ্ধ ফিরোজ স্নেহের আবেগে প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্রকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে আলাউদ্দিনের অনুচর মামুদ সেলিম ফিরোজের পিঠে অস্ত্রাঘাত করে। আহত ফিরোজ প্রাণরক্ষার জন্য ছুটতে শুরু করেন। কিন্তু আলাউদ্দিনের অপর অনুচর ইখ্‌তিয়ার উদ্দিন অস্ত্রাঘাতে তাঁর মুণ্ডচ্ছেদ করে। আহম্মদ চাপ গঙ্গার অন্য পারে ছিলেন। দ্রুত স্থান ত্যাগ করে তিনি কোনক্রমে প্রাণরক্ষা করেন। আলাউদ্দিন মৃত সুলতানের ছিন্নমুণ্ড বর্শাবিদ্ধ করে কারা-মানিকপুর ও অযোধ্যার মানুষকে প্রদর্শন করেন এবং নিজেকে দিল্লীর সুলতান করে ঘোষণা করেন (১২৯৬ খ্রীঃ)। জালালউদ্দিন ফিরোজের মৃত্যু আবার প্রমাণ করে যে, সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকার জন্য প্রয়োজন 'রুধির ও লৌহ' নীতির অনুশীলন ; সেখানে দয়া-মায়া-উদারতা বা মানবিকতার তত্ত্ব সম্পূর্ণ অসার। অধ্যাপক *শর্মা (S. R. Sharma)* যথার্থই লিখেছেন : "*He was too clement to be king in an age when blood and iron alone could tell. He was soon overtaken by a whirlwind of troubles that ended not only by removing the crown from his head, but also the head from his shoulders.*"

✪ ফিরোজের কৃতিত্বের মূল্যায়ন : সুলতান জালালউদ্দিন ফিরোজ খলজী বিপ্লব সংঘটিত করে ভারত-ইতিহাসে এক নবতম অধ্যায়ের সংযোজন করেছিলেন। সুদক্ষ সামরিক নেতা হিসাবে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য তিনি সত্তর বছর বয়সেও যথেষ্ট মনোবল ও দক্ষতার পরিচয় দেন। কিন্তু সুলতানি সিংহাসন দখলের পর তাঁর ভাবান্তর ঘটে। এই সময় তিনি যুদ্ধের পরিবর্তে শান্তি, সংঘাতের পরিবর্তে সমঝোতা, রূঢ়তার পরিবর্তে উদারতা এবং প্রতিহিংসার পরিবর্তে ক্ষমার নীতি অনুসরণ করে মধ্যযুগীয় স্বৈরতন্ত্রের চরিত্রকে পাল্টে দিতে চেষ্টা করেন। ফলে অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সুলতানির ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। তাঁর উদারতা ও ক্ষমার নীতির ব্যর্থতা কেবল তাঁর মাথা থেকে রাজমুকুট কেড়ে নেয়নি ; তাঁর বাহুদ্বয়ের উপর থেকে তাঁর মস্তিষ্ককেও বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তাই বলা চলে, যুগ-বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে জালালউদ্দিন খলজীর আচরণ ছিল ভ্রান্ত ; রাষ্ট্রনীতি ছিল অসার।

শাসক হিসেবে ব্যর্থ হলেও জালালউদ্দিন ছিলেন প্রকৃত অর্থেই একজন দরদী মানুষ। আত্মীয়-পরিজন ও প্রজাসাধারণের প্রতি তাঁর আচরণ ছিল পিতার মত। অভিজাতদের প্রতি

তাঁর আচরণ ছিল বন্ধুর মত। অধ্যাপক *নিজামী* লিখেছেন ঃ "*মৌর্য সম্রাট অশোকের মতই মানুষের প্রতি ভালবাসা ও আস্থার উপর ভিত্তি করে তিনি রাষ্ট্রশাসন পরিচালনা করেছিলেন।*" (*"Like the reformed Asoka, he aimed at ruling by human love and faith."*) ড. *এস. কে. লাল* লিখেছেন ঃ "*If his simplicity and his kindness were rediculed by the worldly people, his age and benevolence were revered by all.*" হত্যা, ষড়যন্ত্র ও অবিশ্বাসের যুগে জালালউদ্দিনের সহনশীলতা ও আপস নীতি হয়তো ব্যর্থ হয়েছিল, কিন্তু এর মাধ্যমে তিনি সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে সাম্য ও মৈত্রীর পটভূমি গড়ে দেন, তার উপরে ভিত্তি করেই খলজী সাম্রাজ্যবাদ তথা ভারত-সাম্রাজ্যের সূচনা হয়। ড. *নিজামী* যথার্থই লিখেছেন ঃ "*Jalal-ud-din's reign bridge the experimental age of the Memeluks with the planned imperialist economy of Alauddin.*" বস্তুত, তুর্কীদের প্রগতিবিরোধী জাতিভিত্তিক রাজনীতির অবসান ঘটিয়ে সুসংহত ইন্দো-মুসলিম রাষ্ট্রগঠনের পটভূমি রচনা করে জালালউদ্দিন স্মরণীয় হয়ে আছেন।

○ আলাউদ্দিন খলজী (১২৯৬-১৩১৬ খ্রীঃ) ঃ

সুলতান জালালউদ্দিন খলজীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শিহাবউদ্দিনের পুত্র ছিলেন আলাউদ্দিন। তাঁর আসল নাম ছিল (আলি গুরুশাস্প)। গুরুশাস্প-এর অন্য তিন ভ্রাতার মধ্যে একমাত্র আলমাস বেগ (অন্য দুজনের মান কুতলঘ তিঘিন এবং মহম্মদ)-এর নাম রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সাথে যুক্ত হয়েছে। ইনি আলাউদ্দিন কর্তৃক 'উলুঘ খাঁ' নামে সম্মানিত হন। সিংহাসনে আরোহণ করার পর গুরুশাস্প 'আলাউদ্দিন মহম্মদ শাহ উস্ সুলতান' উপাধি গ্রহণ করেন। আলাউদ্দিনের পারিবারিক জীবন খুব সুখের ছিল না। জালালউদ্দিনের কন্যাকে তিনি বিবাহ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর পত্নী কিংবা শ্বশ্রুমাতার সাথে তাঁর আদৌ সুসম্পর্ক ছিল না। ব্যক্তিত্বের সংঘাত এঁদের ক্রমশ দূরে সরিয়ে দেয়, সংসারজীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা তাঁকে বেশি করে রাজনীতিমুখী করে তোলে।

শাসক ও বিজেতা হিসেবে আলাউদ্দিন খলজী, কেবল শের শাহ ও মুঘল সম্রাট আকবরকে বাদ দিলে, ভারতের মুসলিম শাসকদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন। দিল্লীর সুলতানি সাম্রাজ্যকে ভারত-সাম্রাজ্যে উন্নীত করার প্রথম রূপকার তিনিই। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মেলবন্ধনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে তিনি ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছিলেন। দক্ষিণ ভারতে ইসলামের আদর্শ প্রসার এবং কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব আলাউদ্দিনের প্রাপ্য। *(... the credit for the penetration of muslim arms and plantation of Islamic faith and culture in the South goes exclusively to him"– J. L. Mehta)*। মোঙ্গল আক্রমণের বিরুদ্ধে জনমনে নিরাপত্তার ও আস্থার বাতাবরণ তৈরি করার ক্ষেত্রেও তাঁর সাফল্য ছিল অভূতপূর্ব। আলাউদ্দিন আক্ষরিক অর্থে শিক্ষিত ছিলেন না। কিন্তু রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, তা আলাউদ্দিনের বুদ্ধিবৃত্তি, লোকচরিত্র সম্পর্কে জ্ঞান ও বিচারবোধকে পুষ্ট করেছিল। *ভিনসেন্ট স্মিথ* আলাউদ্দিনকে 'একজন বর্বর স্বৈরাচারী' বলে সমালোচনা করেছেন। সিংহাসন দখলের জন্য এবং নিজের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে কণ্টকমুক্ত

করার জন্য আলাউদ্দিন নিজের পিতৃব্য, আত্মীয়-পরিজনসহ বহু মানুষকে হত্যা করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু মধ্যযুগীয় রীতি অনুযায়ী এই সকল কাজ অস্বাভাবিক বা অন্যায়মূলক ছিল না। ড. *নিজামীর* মতে, আলাউদ্দিনের কর্মজীবন পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়, যে, তাঁর চরিত্রে ধৈর্য, সাবধানতা, দৃঢ়তা, কঠোরতা, পরিকল্পনা-প্রবণতা এবং সংগঠন-প্রতিভার অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল।

সমকালীন লেখক *আমির খসরুর* মতে, আলাউদ্দিনের সিংহাসন লাভ ছিল ঈশ্বরনির্দিষ্ট একটি ঘটনা। তিনি লিখেছেন : " *When help from the unseen comes to the chosen man, his desires are realised beyond his expectation.*" পরবর্তীকালে ইসামীও আলাউদ্দিনকে *'a man of destiny'* বলে অভিহিত করেছেন। ড. *নিজামীর* মতে, এই সকল বক্তব্য ঘটনার অতি সরলীকরণ-দোষে দুষ্ট। কারণ আলাউদ্দিন শ্রম, উদ্যোগ ও বুদ্ধিমত্তার সাথে শক্তির সমন্বয় দ্বারা একটু একটু করে ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করেন। অবশ্য ঈশ্বরের শক্তির উপর তাঁর গভীর আস্থা ছিল এবং তিনি তাঁর সব কাজকে 'ঈশ্বরসৃষ্ট মানুষের' সেবার উদ্দেশ্যে কৃত বলে প্রচার করতেন। তবে ঈশ্বরে বিশ্বাস করলেও তিনি উলেমা বা অন্যান্য ধর্মীয় গুরুদের আদৌ পাত্তা দিতেন না। ইসলামের প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠানের উপরেও তাঁর একান্ত আস্থা ছিল না। তিনি আপনমনে সর্বশক্তিমানের কাছে প্রার্থনা করতেন, কিন্তু শুক্রবারের বিশেষ প্রার্থনায় যোগদান বা উপবাসী থাকাকে ধর্ম-পালনের আবশ্যিক শর্ত বলে মনে করতেন না। একমাত্র সুফীসন্ত নিজামউদ্দিন আউলিয়াকে তিনি আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করতেন। তবে নিজামউদ্দিন যেহেতু জাগতিক প্রভুর সাথে সাক্ষাৎকার পছন্দ করতেন না, তাই আলাউদ্দিন কখনো তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী হননি। আলাউদ্দিনের স্বাধীন ও গোঁড়ামিবর্জিত ধর্মভাবনা সম্পর্কে ড. *নিজামী* লিখেছেন : *"His mind was thus fortunately, free from all' a priori ; prejudices and fanaticisms, and he brought to his task a freshness of outlook-."*

○ সিংহাসনলাভ ও প্রাথমিক ব্যবস্থা :

জালালউদ্দিন খলজী সিংহাসনে বসার অব্যবহিত পরে কারা-মানিকপুরের শাসনকর্তা মালিক চজ্জু বিদ্রোহী হলে, জালালউদ্দিন কারা-মানিকপুরের শাসকপদে আলাউদ্দিনকে নিয়োগ করেন (১২৯১ খ্রীঃ)। অতঃপর মালব আক্রমণ করে আলাউদ্দিন ভিলসা লুণ্ঠন করেন এবং লুণ্ঠিত সম্পদ জালালউদ্দিনকে উপঢৌকন দিয়ে খুশী করেন। এর পুরস্কারস্বরূপ তিনি কারা-মানিকপুরের সাথে সাথে অযোধ্যার শাসকপদ লাভ করেন। ভিলসা আক্রমণকালে আলাউদ্দিন দক্ষিণ ভারতের সম্পদশালী দেবগিরি রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার পরিকল্পনা করেন। প্রাথমিক প্রস্তুতির পর ১২৯৪ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দিন গোপনে দেবগিরি আক্রমণ করে রাজা রামচন্দ্রদেবের কাছ থেকে বিশাল ধনসম্পদ যুদ্ধপণ হিসেবে সংগ্রহ করেন। বস্তুত, দেবগিরিতে অর্জিত বিশাল সম্পদ আলাউদ্দিনের পক্ষে দিল্লীর সিংহাসন দখলের পথ প্রশস্ত করে দেয়। জনৈক ঐতিহাসিক লিখেছেন : *"Delhi was really conquered at Devgiri for it was the gold of the Deccan that paved the way for Alauddin's accession to the throne."* এ মন্তব্য বহুলাংশে সত্য। কারণ বাস্তব থেকে দেখা যায় যে, আলাউদ্দিন সিংহাসন দখলের অব্যবহিত

পরে দিল্লীর বিরোধী আমির ও মালিকদের বশীভূত করার জন্য তাদের ঢালাও অর্থ-সম্পদ বিলিয়েছেন। এবং এই অর্থ তিনি পেয়েছিলেন দেবগিরি আক্রমণের সূত্রে।

যাই হোক্, আলাউদ্দিনের গোপন দেবগিরি অভিযান জালালউদ্দিন কিভাবে গ্রহণ করবেন, এ সম্পর্কে আলাউদ্দিন নিশ্চিত ছিলেন না। পিতৃব্যের ভালবাসার প্রতি তাঁর দৃঢ় আস্থা ছিল। কিন্তু আহম্মদ চাপ, আরকলি খাঁ প্রমুখের বিরূপ মন্ত্রণা সুলতানের মনে আলাউদ্দিনের প্রতি একটা বিরূপতার জন্ম দিতে পারে,—এরূপ একটা সন্দেহ আলাউদ্দিনের মনে এসেছিল। তাই এই মুহূর্তে তিনি দিল্লীর মসনদ দখল করার পরিকল্পনা নেন এবং সেইমত সাক্ষাৎকারের অজুহাতে নাটকীয় ভাবে বৃদ্ধ সুলতান জালালউদ্দিনকে হত্যা করেন (২০শে জুলাই, ১২৯৬ খ্রীঃ)।*

জালালউদ্দিনকে হত্যা করার পর আলাউদ্দিন নিজেকে 'সুলতান' বলে ঘোষণা করেন এবং কারা প্রদেশ থেকে দিল্লী দখলের পরিকল্পনা করেন। প্রথমে তিনি বিশ্বস্ত অভিজাতদের নানা উপাধিতে ভূষিত করেন। আলমাসবেগ 'উলুঘ খাঁ', 'নুসরৎ খাঁ', 'মালিক ইউসুফ হিজাবরুদ্দিন', 'জাফর খাঁ' এবং আলাউদ্দিনের শ্যালক সঞ্জর 'আল্‌প খাঁ' উপাধিতে ভূষিত হন। আলাউদ্দিনের উত্থান ও সাফল্যের মূলে এই চারজনের অবদান ছিল সর্বাধিক। এছাড়া তিনি কয়েকজন বিশ্বস্ত বন্ধুকে আমীর-পদে উন্নীত করেন এবং ইতিপূর্বে যাঁরা আমীর ছিলেন এমন কয়েকজন বিশ্বস্ত মিত্রকে 'মালিক' পদে উন্নীত করেন। অতঃপব আলাউদ্দিন দিল্লী অভিযানের জন্য বিশালসংখ্যক একটি বাহিনী গঠন করেন। লক্ষণীয় যে, তাঁর এই বাহিনী গুণগত দিক থেকে আদৌ উন্নত ছিল না। কারণ আলাউদ্দিন তখন বাহিনীর দক্ষতার পরিবর্তে সংখ্যার দিকটিতে গুরুত্ব দেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, বিশালসংখ্যক বাহিনী তাঁর অনুগামী হলে দিল্লীর অভিজাত ও জনগণ তাঁর বিরুদ্ধাচারণ করার মানসিক বল হারিয়ে ফেলবে। যাই হোক্, বিশাল বাহিনীকে দু'ভাগে বিভক্ত করে আলাউদ্দিন দিল্লীর দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। আলাউদ্দিন স্বয়ং ও নুসরৎ খাঁ বদাউন ও বরণ হয়ে অগ্রসর হন। জাফর খাঁর নেতৃত্বে অপর বাহিনী কইল (আলিগড়)-এর পথ ধরে অগ্রসর হয়। আলাউদ্দিন বরণপ্রদেশে উপস্থিত হলে বহু 'জালালী' মালিক, যেমন—তাজ-উলমুলক্ কুচি, আমির আলি, ওসমান, আমীর কালাম, ওমর সুরখা প্রমুখ দিল্লীর আনুগত্য অস্বীকার করে আলাউদ্দিনের পক্ষে যোগ দেন।

এদিকে দিল্লীর রাজনীতিও তখন অস্থির। জালালউদ্দিনের হত্যা-সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পত্নী মালিকা জাহান কনিষ্ঠপুত্র কাদর খাঁকে 'রুকন্‌উদ্দিন ইব্রাহিম' উপাধি দিয়ে দিল্লীর সুলতান বলে ঘোষণা করে দেন। কিলঘোরী প্রাসাদ থেকে সরে এসে দিল্লীর মধ্যে 'কাসর-ই-সব্জ' নামক প্রাসাদ থেকে রুকন্‌উদ্দিন রাজকার্য পরিচালনা করতে শুরু করেন। তখন জালালউদ্দিনের দ্বিতীয় পুত্র আরকলি খাঁ ছিলেন মুলতানের শাসক। দিল্লীর সংবাদে তিনি মর্মাহত হন এবং দিল্লীর রাজনীতি থেকে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত নেন। এই সময় আলাউদ্দিনের সাথে বরণপ্রদেশে জালালী মালিকদের যোগদানের সংবাদ মালিকাজাহানকে যেমন শঙ্কিত করে, তেমনি দিল্লীর রাজনীতি সম্পর্কে আরকলি খাঁর ক্ষোভ ও উদাসীনতা আলাউদ্দিনকে আশ্বাম্বিত

করে। কারণ একমাত্র আরকলি খাঁর সামরিক দক্ষতা সম্পর্কে আলাউদ্দিনের কিছুটা চিন্তা ছিল। এই সময় মালিকা জাহান আন্তরিকতার সাথেই আরকলিকে দিল্লীতে এসে সুলতানি গ্রহণের আহ্বান জানান। কিন্তু আরকলি তা প্রত্যাখ্যান করেন। আরকলি দিল্লীতে এলে পরিস্থিতি অন্যরকম হতে পারত। বিশেষ করে নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আরকলি কেন এত উদাসীন রইলেন, তা সত্যই আশ্চর্যের।

অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে আলাউদ্দিন যমুনা নদী অতিক্রম করে শিরিতে উপস্থিত হন। রুকন্উদ্দিন তাঁকে বাধা দিতে অগ্রসর হন, কিন্তু বিধ্বস্ত হন। অতঃপর গভীর রাতে মালিকাজাহান, আহম্মদ চাপ, উলঘু প্রমুখকে নিয়ে গোপনে মুলতানে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। আলাউদ্দিন বিজয়গর্বে দিল্লীতে প্রবেশ করেন এবং বলবনের লালপ্রাসাদে (কাসর-ই-লাল) অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করেন (২১ অক্টোবর ১২৯৬ খ্রীঃ)। ইতিমধ্যে প্রায় সকল রাজকর্মচারী আলাউদ্দিনের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন করেছিলেন। বিচক্ষণ আলাউদ্দিন এই মুহূর্তে কাউকে ক্ষুণ্ণ না-করে জালালউদ্দিন বা তাঁর পূর্বেকার মামেলুক অভিজাত এবং নিজ সমর্থকদের নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেন। ঐতিহাসিক 'জিয়াউদ্দিন বরণী' এই সময় কারা ও অযোধ্যার শাসক নিযুক্ত হয়েছিলেন। আলাউদ্দিনের রাজসভায় সংগঠন প্রসঙ্গে ***বরণী*** লিখেছেন : *"The court of Alauddin was adorned by the Jalali and Alai Khans and Maliks in a way that no previous reign had witnessed."* অবশ্য সুলতানের এই ব্যবস্থা ছিল সাময়িক এবং কূটনীতির অঙ্গবিশেষ। পরের বছরেই তিনি বিশ্বাসঘাতক জালালী মালিকদের ক্ষমতাচ্যুত ও বন্দী করে প্রমাণ করেন যে, আলাউদ্দিনের কাছে অকৃতজ্ঞের কোন স্থান নেই।

○ সমকালীন ভারতের রাজনৈতিক চিত্র :

আলাউদ্দিন সিংহাসনারোহণের সময় অবশিষ্ট ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিচারে দিল্লী-সুলতানির অবস্থান খুব উজ্জ্বল ছিল না। বিগত নব্বই বছরের তুর্কীশাসন দিল্লীর সুলতানদের ক্ষমতা সংহত করলেও ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ কিংবা প্রশাসনিক পরিকাঠামো গঠনের কাজ তখনও সম্পূর্ণতা পায়নি। পশ্চিমে রাভী, উত্তরে লাহোর, উত্তর-পশ্চিমে সামানা ও দীপালপুরকে কেন্দ্র করেই দাঁড়িয়ে ছিল সুলতানি সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব। পূর্বে বাংলা, বিহার ছিল একপ্রকার স্বাধীন। পাঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দেশ খোকর উপজাতির উপদ্রব এবং মোঙ্গলদের বারবার আক্রমণে ছিল জর্জরিত। মুলতানে তখন ছিলেন আলাউদ্দিনের শত্রু আরকলি খাঁ। মালিকা জাহান, নূরউদ্দিন, আহম্মদ চাপ প্রমুখ বিরোধীরা সেখানে রাজনৈতিক আশ্রয় পাওয়ার ফলে আলাউদ্দিনের দুশ্চিন্তার কারণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। চিতোর ও রণথম্ভোরকে কেন্দ্র করে মুসলমান-বিরোধী রাজপুতশক্তি তখন যথেষ্ট শক্তি সংগ্রহ করে সুযোগের জন্য অপেক্ষা করছিল। বাঘেলাবংশের নেতৃত্বে গুজরাট তখন যথেষ্ট ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী হয়েছিল। সুদূর দক্ষিণে চোল, চের, পাণ্ড্য, কাকতীয়, হোয়সল প্রভৃতি রাজ্য ও রাজবংশ নিজেদের মধ্যে নিরন্তর দ্বন্দ্বে লিপ্ত থেকে সেখানকার রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে সদা বিশৃঙ্খল করে রেখেছিল। এইসব রাজনৈতিক সমস্যা ছাড়াও আলাউদ্দিনের সামনে ছিল উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও অকৃতজ্ঞ আত্মীয়-পরিজন কিংবা আমীর-মালিকদের ধ্বংসাত্মক ষড়যন্ত্রের সমস্যা। অবশ্য

সামরিক শক্তি, বিচক্ষণতা ও রাষ্ট্রপ্রজ্ঞার সুষম প্রয়োগ দ্বারা আলাউদ্দিন অভূতপূর্ব সাফল্যের সাথে এই বহুমুখী সমস্যার মোকাবিলা করেন।

○ মূলতান ঃ আলাউদ্দিন প্রথমেই মুলতানকে শত্রুমুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেন। জালালউদ্দিনের পুত্রদ্বয় তথা দিল্লী-সুলতানির দাবিদার আরকলি খাঁ, রুকন্‌উদ্দিন (কদর খাঁ) এবং জালালউদ্দিনের সমর্থক আহম্মদ চাপ প্রমুখকে বন্দী করার জন্য আলাউদ্দিন তাঁর দুই বিশ্বস্ত অনুচর উলুঘ খাঁ ও নুসরৎ খাঁকে সসৈন্যে মুলতানে পাঠান। অল্প আয়াসেই এঁদের বন্দী করা সম্ভব হয়। সুলতানের নির্দেশে আরকলি, কদর, আহম্মদ চাপ, উলঘু প্রমুখকে অন্ধ করা হয়। আরকলির পুত্রদের হত্যা করা হয় এবং আরকলি ও কদর খাঁকে কিছুকাল বন্দী রাখার পর হত্যা করা হয়। অবশ্য মালিকা জাহান এবং আহম্মদ চাপ গৃহবন্দী অবস্থায় নুসরৎ খাঁর তত্ত্বাবধানে বাকি জীবন অতিবাহিত করার অধিকার পান।

○ মোঙ্গল আক্রমণ ঃ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতি ঃ

আলাউদ্দিন খলজী সিংহাসনে আরোহণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মোঙ্গলদের আক্রমণজনিত সমস্যার সম্মুখীন হন। ১২৯৬ থেকে ১৩০৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রায় বাৎসরিক অনুষ্ঠানের মত মোঙ্গলরা দিল্লী, পাঞ্জাব, মুলতান, সিন্ধু এবং গঙ্গা-যমুনা-দোয়াব অঞ্চলে উপর্যুপরি আক্রমণ চালায়। ইতিপূর্বে গিয়াসুদ্দিন বলবন উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের নিরাপত্তার জন্য কিছু স্থায়ী ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। তাছাড়া, মধ্য-এশিয়ার রাজনীতির উত্থান-পতনের সূত্রে মোঙ্গলদের আক্রমণে কিছুটা শিথিলতা এসেছিল। ইরানের 'ইলখান' মোঙ্গলদের সাথে দিল্লী-সুলতানির মোটামুটি একটা গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। ইলখানদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ট্রান্স অক্সিয়ানার চাঘতাই মোঙ্গলরা। এদের নেতা দবা খান মধ্য-এশিয়ার যুদ্ধে ইলখানদের বিরুদ্ধে সাফল্য না-পাওয়ার জন্য ভারতের দিকে আক্রমণ চালাতে শুরু করে। অবশ্য আলাউদ্দিন প্রায় প্রতিটি আক্রমণই অত্যন্ত দক্ষতার সাথে প্রতিহত করেন।

১২৯৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে কদর খাঁর নেতৃত্বে প্রায় একলক্ষ মোঙ্গল সেনা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে দিল্লীর দিকে এগিয়ে আসে। আলাউদ্দিনের বিশ্বস্ত অনুচর জাফর খাঁ জলন্ধরের কাছে মোঙ্গলদের বাধা দেন এবং বহু মোঙ্গলসেনাকে হত্যা করে সুলতানি-বাহিনীর মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। পরের বছরেই সালদির নেতৃত্বে মোঙ্গলরা আবার আক্রমণ চালায় এবং দিল্লীর নিকটবর্তী শিরিদুর্গ দখল করে নেয়। এবারেও জাফর খাঁ মোঙ্গলদের পরাজিত ও বিতাড়িত করেন। মোঙ্গল সেনাপতি সালদি সমেত প্রায় সতেরশ মোঙ্গলকে বন্দী করে তিনি দিল্লীতে পাঠিয়ে দেন।

১২৯৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে দবা খাঁর পুত্র কুতলখ খাজার নেতৃত্বে প্রায় দু'লক্ষ মোঙ্গল সেনা দিল্লী আক্রমণ করে। এবারে মোঙ্গলদের লক্ষ্য ছিল নিছক লুণ্ঠন নয়, দিল্লীর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব দখল করা! তাই তারা দিল্লী আসার পথে লুঠতরাজ বা ধ্বংসকার্য থেকে বিরত থাকে। মোঙ্গল সেনারা দিল্লীর সাথে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিতে সক্ষম হয়। এমনকি নগরের কোন কোন রাস্তাতেও তারা প্রবেশ করে। সুলতান আলাউদ্দিন এবারে বেশ সংকটের মধ্যে পড়েন। দিল্লীর কোতোয়াল আলাউলমুল্‌ক তাঁকে পরামর্শ দেন মুখোমুখি যুদ্ধের পরিবর্তে কূটকৌশলে কাল হরণ করার। কিন্তু অসমসাহসী আলাউদ্দিন তাকে স্পষ্ট জানিয়ে

দেন যে, *'চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা না-করে দিল্লীর রাজত্ব চালানো যায় না।'* আলাউদ্দিন দিল্লীনগরী ও প্রাসাদের দায়িত্ব কোতোয়ালের উপর অর্পণ করে যুদ্ধযাত্রার প্রস্তুতি নেন। যাওয়ার আগে কোতোয়ালকে ব্যঙ্গ করে বলে যান, *'দিল্লীর চাবি রইল। যে বিজয়ী হবে তার হাতে তুলে দেবেন এবং বিশ্বস্ততার সাথে তারই সেবা করবেন।'* জাফর খাঁ, নুসরৎ খাঁ, উলুঘ খাঁ, আকৎ খাঁ প্রমুখকে নিয়ে আলাউদ্দিন কিলিতে মোঙ্গলদের মুখোমুখি হন। আলাউদ্দিন সেনাপ্রতিরোধ তৈরি করে যথার্থ সময়ের জন্য সেনাপতিদের অপেক্ষা করার নির্দেশ দেন। কিন্তু ধৈর্যচ্যুত হয়ে জাফর খাঁ সুলতানের অনুমতি ছাড়াই এক কোণ দিয়ে মোঙ্গলদের আক্রমণ করেন। বহু মোঙ্গলকে হত্যা করলেও তিনি নিজে মোঙ্গলদের হাতে নিহত হন। এর দু'দিন পর বাকি মোঙ্গল সেনা ও কুলতখ খাজা যুদ্ধ না-করেই স্বরাজ্যে ফিরে যান। আলাউদ্দিনের সাহস ও দৃঢ়তা বিরাট সংকট থেকে সুলতানি সাম্রাজ্যকে রক্ষা করে। অবশ্য জাফর খাঁর মৃত্যুতে আলাউদ্দিন কিছুটা খুশিই হন। কারণ মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে জাফরের ধারাবাহিক সাফল্য তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা যেমন বৃদ্ধি করেছিল ; তেমনি যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে জনগণের মনেও তাঁর একটা রোমান্টিক ভাবমূর্তি অঙ্কিত হচ্ছিল, যা আলাউদ্দিনের অভিপ্রেত ছিল না। তিন বছর বিরতির পর ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে মোঙ্গল নেতা তারঘা আবার ভারত আক্রমণ করে দিল্লীতে ঢুকে পড়েন। এই সময় আলাউদ্দিন চিতোরজয়ে ব্যস্ত ছিলেন। মোঙ্গল আক্রমণের সংবাদ পেয়ে তিনি দ্রুত ফিরে আসেন এবং মোঙ্গলদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত না হয়ে সিরিদুর্গে প্রবেশ করে আত্মরক্ষামূলক প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত নেন। সম্ভবত, চিতোর ও তেলেঙ্গানা যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি সামলে তৎক্ষণাৎ মোঙ্গলদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবার মত যথেষ্ট শক্তি সুলতানের ছিল না। যাই হোক্, এই সময় মোঙ্গল সেনাদের অত্যাচারে সাধারণ মানুষের খুবই কষ্ট হয়। দু'মাস এইরকম চলার পর মোঙ্গলরা স্বদেশে ফিরে যায়। ***বরণী*** লিখেছেন ঃ *"দিল্লীর দরিদ্র জনসাধারণের কাতর আবেদন এবং সন্ত নিজামউদ্দিন আউলিয়ার প্রার্থনার ফলে মোঙ্গলরা দিল্লী ছেড়ে যেতে রাজী হয়েছিল।"* কিন্তু ***ড. কে. এস. লাল*** মনে করেন, আলাউদ্দিনের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ মোকাবিলার জন্য অনির্দিষ্টকাল দিল্লীতে থাকা দরকার ছিল। কিন্তু মধ্য এশিয়া থেকে বেশিদিন বাইরে থাকা মোঙ্গলবাহিনীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই তারা ভারত ত্যাগ করে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিল।

মোঙ্গলদের প্রতিটি আক্রমণ প্রতিহত করতে পারলেও, তাদের অবাধে দিল্লীর বুক পর্যন্ত ঢুকে পড়ার ঘটনায় আলাউদ্দিন কিছুটা চিন্তিত হন। এতদিন তিনি কেবল মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ করেছেন। এবার তিনি নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সীমান্তবর্তী দুর্গগুলির সংস্কারসাধন এবং নতুন নতুন দুর্গ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন। দুর্গগুলির সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করেন এবং আক্রমণের মুহূর্তে দ্রুত সাহায্যদানের উদ্দেশ্যে দিল্লীতে একটি বিশেষ বাহিনী মোতায়েন রাখেন। এই কাজ তত্ত্বাবধানের জন্য একটি নতুন পদ সৃষ্টি করেন।

আলাউদ্দিনের প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা সত্ত্বেও মোঙ্গল আক্রমণ অব্যাহত থাকে। ১৩০৫ খ্রীষ্টাব্দে আলিবেগ এবং তারতাক্-এর নেতৃত্বে মোঙ্গলরা পাঞ্জাবের পথ ধরে ধ্বংসকার্য চালাতে চালাতে আমরোহা পর্যন্ত ঢুকে পড়ে। অবশ্য গাজী মালিক এবং মালিক কাফুরের নেতৃত্বে সুলতানি-বাহিনী মোঙ্গলদের পরাজিত করে। দুই নেতাসহ বহু মোঙ্গল সৈন্য বন্দী হয়। সুলতানের নির্দেশে আলিবেগ ও তারাতাক্'কে হাতির পায়ে পিষ্ট করে হত্যা করা হয় এবং

বন্দী-সেনাদের ছিন্ন মুণ্ডগুলিকে গম্বুজের আদলে শিরির দুর্গের উপর সাজিয়ে দেওয়া হয়। এই সময় আলাউদ্দিন গাজী মালিককে পাঞ্জাবের প্রশাসক নিযুক্ত করেন। দক্ষ ও বিশ্বস্ত এই সেনানায়ক অতঃপর সাফল্যের সাথে মোঙ্গল আক্রমণগুলি প্রতিহত করেন।

১৩০৫ খ্রীঃ-এর বিপর্যয়ের প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে পরের বছরেই (১৩০৬ খ্রীঃ) বিশাল মোঙ্গলবাহিনী দু'দিক দিয়ে ভারত আক্রমণ করে। কুবাক-এর নেতৃত্বে মোঙ্গলদের একটি দল রাভী নদীর তীরে উপস্থিত হয়। ইকবালমন্দ-এর নেতৃত্বে দ্বিতীয় দলটি উপস্থিত হয় নাগৌরে। এবারেও গাজী মালিক ও মালিক কাফুর মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং তাদের পরাজিত করেন। কুবাক বন্দী হন। ইকবালমন্দ কোনক্রমে পালিয়ে প্রাণ বাঁচান। এবারেও সুলতানি-বাহিনীর হাতে বহু মোঙ্গল সেনা ও তাদের স্ত্রী-পুত্র (যুদ্ধের সময় মোঙ্গলরা সপরিবারে থাকত) বন্দী হয়। নারী ও শিশুদের দাস হিসেবে বিক্রি করা হয় এবং সেনাদের হত্যা করে তাদের ছিন্নমুণ্ডগুলিকে বদাউন গেটের কাছে গম্বুজাকারে সাজিয়ে দেওয়া হয়। আলাউদ্দিনের আমলে মোঙ্গলদের শেষ আক্রমণ ঘটে ১৩০৭-৮ খ্রীষ্টাব্দে। ইকবালমন্দের নেতৃত্বে মোঙ্গলরা সিন্ধুর তীরে উপস্থিত হওয়ামাত্র সুলতানি-বাহিনী তাদের ঘিরে ধরে। ইকবালমন্দ নিহত হন। বহু মোঙ্গল সেনাকে বন্দী করে দিল্লী এনে হত্যা করা হয়। এখন থেকে কুতুবউদ্দিন মোবারকের আমল পর্যন্ত মোঙ্গলরা ভারতের বিরুদ্ধে কোন অভিযান পাঠায়নি।

আলাউদ্দিন খলজীর অনমনীয় দৃঢ়তা এবং মধ্য এশিয়ার রাজনৈতিক অস্থিরতা মিলিতভাবে অন্তত কয়েক বছরের জন্য ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তকে কিছুটা শান্তি দিয়েছিল। পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার শাসকরা তখন মোঙ্গলদের প্রতিহত করে স্বীকার করেন যে, সুলতানি সেনাবাহিনীর সমরদক্ষতা মধ্য-এশীয় দেশগুলির থেকে কম তো নয়ই, বরং বেশি। তাই আলাউদ্দিনের আমলে মোঙ্গলরা ভারত-আক্রমণের ব্যাপারে যথেষ্ট দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। ১৩০৬ খ্রীষ্টাব্দে মোঙ্গল-নেতা দাবা খাঁর মৃত্যু তাদের মনোবল আরো ভেঙে দেয়। অতঃপর চাঘতাই মোঙ্গলদের নেতৃত্বের প্রশ্নে অস্থিরতা দেখা দেয়। তাই বহির্দেশে আক্রমণ সংগঠিত করা থেকে তারা বিরত থাকে। অবশ্য আলাউদ্দিনের সামরিক শক্তির প্রাধান্য ছিল মোঙ্গলদের পিছু হটার প্রধানতম কারণ। ড. *লাল* (K. S. Lal) লিখেছেন ঃ *"The Mongol menace which had made his predecessors tremble on their throne was put to an end by him (Alauddin)."* বরণী ও ফেরিস্তা এ ব্যাপারে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা গাজী-মালিকের ভূমিকার প্রশংসা করেছেন। মধ্য এশিয়ায় মোঙ্গলদের অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগে গাজী-মালিক দীপালপুরে সর্বক্ষণের জন্য একটি শক্তিশালী বাহিনী মোতায়েন রেখে এবং কাবুল ,গজনী, কান্দাহার প্রভৃতি স্থানে বারবার অভিযান চালিয়ে ঐ সকল অঞ্চল থেকে অর্থ সংগ্রহ করে মোঙ্গলদের মনোবল অনেকটা ভেঙে দিতে সক্ষম হন।

মোঙ্গল আক্রমণের সম্ভাব্যতা ও ভীতি দ্বারা আলাউদ্দিনের রাষ্ট্রনীতি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। যেমন—(১) মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য আলাউদ্দিন বিশালসংখ্যক ও শক্তিশালী একটি সামরিক বাহিনী গড়ে তুলতে বাধ্য হন। এই বাহিনী দ্বারা উত্তর-দক্ষিণ ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারের কাজ সহজ হয়। (২) বিশাল সামরিক-বাহিনীর ব্যয় মেটানোর জন্য প্রয়োজন হয় অতিরিক্ত অর্থের। এজন্য তিনি রাজস্ব-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করেন। নতুন নতুন কর

আরোপ করে এবং প্রচলিত করের হার বৃদ্ধি করে রাজকোষকে স্ফীত করতে বাধ্য হন। (৩) সেনাবাহিনীর জীবনযাত্রার মান বজায় রাখার জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম তিনি নির্দিষ্ট করে দিতে বাধ্য হন। (৪) মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে আলাউদ্দিনের ধারাবাহিক সাফল্য তাঁর মর্যাদা ও প্রতিপত্তি দারুণভাবে বৃদ্ধি করে। পরাজিত মোঙ্গল সেনাদের নৃশংসভাবে হত্যা করে এবং তাদের স্ত্রী-পুত্রদের দাস হিসেবে বিক্রি করে আলাউদ্দিন জনমনে সুলতান সম্পর্কে এমন একটা ভীতির ভাব গড়ে দেন, যার ফলে সুলতানের বিরুদ্ধে যে-কোন ধরনের আন্দোলনের সম্ভাবনা হ্রাস পায়। (৫) সর্বোপরি, মোঙ্গল আক্রমণ রোধ এবং সাম্রাজ্যবাদী কর্মসূচী রূপায়ণকে সুলতান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে গুরুত্ব দেন। কিন্তু এর ফলে দেশবাসীর নৈতিক ও বৈষয়িক উন্নয়নের দিকটি অবহেলিত থেকে যায়।

◘ খলজী সাম্রাজ্যবাদ ও আলাউদ্দিন : ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃত রূপকার ছিলেন আলাউদ্দিন খলজী। মহম্মদ ঘুরী বা কুতুবউদ্দিন আইবক যে সীমিত ভূখণ্ডের উপর দিল্লী-সুলতানির সূচনা করেছিলেন, ইলতুৎমিস বা বলবন তাকে আদৌ সম্প্রসারিত করেননি। ইলতুৎমিস তাঁর পূর্বসূরীদের একদা অধিকৃত কিন্তু পরে বিচ্ছিন্ন রাজ্যখণ্ডগুলি পুনর্দখল করার একটা ক্ষীণ প্রচেষ্টা চালান, আর বলবন ক্ষমতা বা ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মোঙ্গল আক্রমণের ভয়ে নতুন রাজ্যজয়ের জন্য দিল্লীর বাইরে যাওয়া নীতিগত ও কৌশলগত ভাবে অনুচিত ভেবে নিশ্চেষ্ট থাকেন। *ড. আর. ত্রিপাঠী* লিখেছেন যে, বলবন আলাউদ্দিনের তুলনায় কম সামরিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন ছিলেন না। কিন্তু তিনি সাম্রাজ্যবাদী অভীপ্সাকে পূরণ করার কোন উদ্যোগ নেননি ; কিন্তু আলাউদ্দিন তাঁর সাম্রাজ্যবাদী কর্মসূচী রূপায়িত করতে পেরেছিলেন। সিংহাসনের উপর নিজের অধিকার ও কর্তৃত্ব সুদৃঢ় করার পরই আলাউদ্দিন সাম্রাজ্যবিস্তারে উদ্যোগী হন। তাঁর ক্ষমতালাভের দু'দশকের মধ্যে গুজরাট, মালব, রাজস্থান-সহ উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল এবং সুদূর দক্ষিণে মাদুরাই পর্যন্ত ভূখণ্ডে আলাউদ্দিনের বিজয়-পতাকা উড্ডীন হয়। অধাপক ***সতীশ চন্দ্র*** লিখেছেন : *"এই বিরাট অঞ্চল দিল্লীর সরাসরি শাসন-কর্তৃত্বের মধ্যে আনারও চেষ্টা করা হয়। সুলতানি সাম্রাজ্যবিস্তারের এই নতুন পর্ব আলাউদ্দিন খলজী সুত্রপাত করেন।"*

সাম্রাজ্যবাদের রূপকার হিসেবে আলাউদ্দিন 'সিকন্দার-ই-সানি' বা দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার উপাধি গ্রহণ করেন এবং নিজের মুদ্রায় তা খোদিত করেন। ***বরণী*** লিখেছেন : *"গুজরাট-বিজয়ের পর আলাউদ্দিন একটি নতুন ধর্মের প্রচারক (নবী) এবং 'বিশ্ববিজেতা' হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার পরিকল্পনা নেন।"* আলাউদ্দিন মনে করতেন, হজরত মহম্মদ যেমন তাঁর চারজন প্রধান উত্তরসূরী আবুবকর, ওসমান, ওমর ও আলির সাহায্যে ধর্মবিজয় ও রাজ্যবিজয় সম্পন্ন করেছেন, তেমনি আলাউদ্দিনও তাঁর চার প্রধান অনুচর উলুঘ খাঁ, নুসরৎ খাঁ. জাফর খাঁ ও আলপ খাঁ'র সাহায্যে হজরত মহম্মদের মতই এক নতুন ধর্মের প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করতে সক্ষম। আবার নিজেব সামরিক দক্ষতার উপরে ছিল তাঁর অগাধ আস্থা। তাঁর এই বিশ্বাস জন্মেছিল যে, উপরোক্ত চার অনুগামীর সহায়তায় তিনি গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডারের মতই সারা বিশ্বে দিল্লী সুলতানির বিজয়পতাকা উড্ডীন করতে পারবেন। নিঃসন্দেহে এই দুটি পরিকল্পনাই ছিল আলাউদ্দিনের সীমাহীন দম্ভ ও অযৌক্তিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রকাশ। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তাঁর

মিত্র ও দিল্লীর কোতোয়াল আলাউল্-মুল্ক-এর পরামর্শে আলাউদ্দিন তাঁর পরিকল্পনা সংশোধিত করেন। কোতোয়াল সুলতানকে বোঝান যে, *'নতুন ধর্মের উদ্ভাবন ও প্রচার নবীর কাজ, সুলতানের নয়। তাছাড়া, কেবল শক্তি বা দম্ভ দ্বারা নবীর সাফল্য আসে না। নবী সফল হন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে। তাই ঈশ্বরের নির্দেশ ব্যতিরেকে সুলতান যদি এই চেষ্টা করেন তবে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য।'* দিগ্‌বিজয় প্রসঙ্গে কোতোয়াল বোঝান যে, এই হিন্দুস্তানের অধিকাংশ ভূখণ্ড সুলতানি সাম্রাজ্যের বাইরে রয়েছে। সুলতানের উচিত সেইসব অঞ্চল দখল করে সাম্রাজ্য গঠন করা, দিগ্‌বিজয় নয়। প্রবীণ কোতোয়ালের যুক্তি আলাউদ্দিনকে প্রভাবিত করে। তিনি নতুন ধর্মপ্রচারের ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন এবং দিগ্‌বিজয়ের পরিবর্তে ভারত-বিজয়ের কর্মসূচী নেন। অবশ্য বিশ্ববিজয়ের গভীর বাসনা যে আলাউদ্দিনের মনে লুকিয়ে ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর মুদ্রায়। বিশ্বজয়ের পরিকল্পনা ত্যাগ করলেও নিজ মুদ্রায় তিনি 'সিকন্দর সানি' বা 'দ্বিতীয় সিকন্দার' উপাধি নিতে দ্বিধা করেননি। অবশ্য নিজামী-সহ আধুনিক ঐতিহাসিকেরা বরণীর এই বিবরণকে আলাউদ্দিনের প্রকৃতির সাথে বেমানান বলে মনে করেন। যাই হোক্, প্রবীণ কোতোয়ালের পরামর্শ অনুসরণ করে যে তিনি ভুল করেননি, তার প্রমাণ কিছুদিনের মধ্যে অনুভূত হয়। মোঙ্গলদের দ্রুত আক্রমণ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী আঞ্চলিক শাসকদের বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপ দমনের জন্য এই সিদ্ধান্ত আবশ্যিক ছিল।

আলাউদ্দিনের রাজ্যজয়কে দু'ভাগে ভাগ করা যায়—উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারত। উত্তর ভারতের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান চলেছিল ১২৯৭ থেকে ১৩০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। দক্ষিণ ভারতের বিরুদ্ধে তাঁর প্রধান অভিযানগুলি পরিচালিত হয়েছিল ১৩০৬ থেকে ১৩১২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। তবে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বিরুদ্ধে আলাউদ্দিনের সমরাভিযানের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ অভিন্ন ছিল না। উত্তর ভারতের রাজ্যগুলির আর্থিক গুরুত্ব তাঁকে স্থায়িভাবে এ অঞ্চল দখল করে সুলতানির ভৌমিক ও আর্থিক শ্রীবৃদ্ধিকরণে প্রলুব্ধ করেছিল। দক্ষিণ ভারতের ক্ষেত্রে তাঁর লক্ষ্য ছিল তাৎক্ষণিক লাভ। অর্থাৎ দক্ষিণের রাজ্যগুলি থেকে ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে সুদৃঢ় করা। তাছাড়া উত্তরভারতীয় রাজ্যগুলিকে দখল করে তিনি সরাসরি সুলতানি শাসনের অন্তর্ভুক্ত করতে সচেষ্ট হন। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের ক্ষেত্রে তাঁর এ ধরনের ইচ্ছা থাকলেও, বাস্তব পরিস্থিতির বিচারে তা করেননি। দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলি থেকে বাৎসরিক কর ও আনুগত্যলাভের বিনিময়ে স্থানীয় শাসকদের হাতে ঐ সকল অঞ্চলের শাসন-দায়িত্ব ছেড়ে দেন। অবশ্য উভয়ক্ষেত্রেই তাঁর কর্মসূচী ছিল নিছক আগ্রাসনমূলক। ড. *শ্রীবাস্তব* লিখেছেন : ***"His wars were mostly unprovoked and undertaken in persuit of a resolute ideal, namely the conquest of the entire country".***

○ ক. উত্তর ভারত অভিযান : ১২৯৯ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দিন তাঁর দুই বিশ্বস্ত সেনাপতি উলুঘ খাঁ ও নুসরৎ খাঁ'র নেতৃত্বে গুজরাটের বিরুদ্ধে অভিযান পাঠান। 'রসমালা' কাব্যগ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, গুজরাটের জনৈক মন্ত্রী মাধবের অবর্তমানে গুজরাটের রাজা করণ বাঘেলা (রায় করণ) ঐ মন্ত্রীর স্ত্রীর অমর্যাদা করেন। এই অন্যায়ের প্রতিকারার্থে মাধব আলাউদ্দিনের সাহায্য প্রার্থনা করলে সুলতান গুজরাটের বিরুদ্ধে অভিযান পাঠান। এই কাহিনীর যথার্থতা অস্বীকার করা যায়নি। কারণ গুজরাটের বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে দিল্লীর সুলতানেরা সফল হননি। তাছাড়া

রাজস্থান ও মালবের মধ্য দিয়ে গুজরাটে পৌঁছানো সহজ ছিল। কিন্তু ঐ দুটি রাজ্য তখনও দিল্লীর কর্তৃত্বের বাইরে। তথাপি ঐ দূরদেশে আলাউদ্দিন প্রথম অভিযান পাঠান সম্ভবত ঐ রাজ্যের আমলার গোপন সাহায্যের আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে। অবশ্য গুজরাট অভিযানের এটি ছিল তাৎক্ষণিক কারণ। এই অভিযানের পশ্চাতে সুলতানের গভীর অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যও নিহিত ছিল। গুজরাট, মালব প্রভৃতি স্থানের ভূমি ছিল উর্বর। তাছাড়া, এখানকার সমুদ্র-বন্দরগুলি এবং গাঙ্গেয় উপত্যকার সাথে যুক্ত বাণিজ্য-পথগুলি এইসব দেশের নিয়ন্ত্রণে ছিল। বহির্বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করার ফলে, স্বাভাবিক ভাবেই এই অঞ্চলের কোষাগার ছিল পরিপূর্ণ। তাছাড়া, মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার মোঙ্গল আধিপত্য স্থাপিত হবার ফলে ঐ অঞ্চল থেকে স্থলপথে ভারতে ঘোড়া আমদানি প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অথচ তখন ভারতে ভাল জাতের ঘোড়া উৎপাদন হত না। এমতাবস্থায় পশ্চিম ভারতের সমুদ্রবন্দর মারফত আরব ও তুর্কীস্থান থেকে ঘোড়া আমদানি করা সহজ ছিল। তাই মালব, গুজরাট দখল করে আলাউদ্দিন যুগপৎ সুলতানির আর্থিক ও সামরিক চাহিদা পূরণ করতে চেয়েছিলেন।

সুলতানি-বাহিনীর আকস্মিক আক্রমণে বিভ্রান্ত হয়ে গুজরাটের শাসক রায়করণ কোনরূপ বাধা না দিয়ে কন্যা দেবলাদেবীকে নিয়ে দেবগিরিতে পালিয়ে যান। তাঁর পত্নী কমলাদেবী ধৃত হন এবং আলাউদ্দিন তাঁকে বিবাহ করেন। সুলতানি-বাহিনী অনহিলবারা-সহ বহু সুসজ্জিত নগর ধ্বংস করে। নবনির্মিত সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠিত হয়। ক্যাম্বের ধনী বণিকদের কাছ থেকেও সুলতানের ফৌজ বহু অর্থ-সম্পদ সংগ্রহ করে। ক্যাম্বে থেকেই মালিক কাফুর (হাজারদিনারী) নামক জনৈক ক্রীতদাসকে বন্দী করে দিল্লীতে আনা হয়। ইনি পরে আলাউদ্দিনের খুবই প্রিয়পাত্রে পরিণত হন এবং দক্ষিণ ভারতের বিরুদ্ধে সুলতানের অভিযানে নেতৃত্ব দেন। ড. *নিজামী, অধ্যাপক সতীশচন্দ্র* প্রমুখ মনে করেন, গুজরাটের শাসক জনপ্রিয় ছিলেন না এবং প্রশাসকগোষ্ঠীর মধ্যেও অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল। তাই এত সহজে গুজরাট সুলতানির অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়। আলপ খাঁ গুজরাটের শাসক নিযুক্ত হন। তবে রায়করণ কিছুদিন পরে দক্ষিণ গুজরাটের একাংশে নিজের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন এবং ১৩০৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল।

গুজরাট বিজয়ের পর আলাউদ্দিন রাজস্থানের উপর কর্তৃত্ব স্থাপনের উদ্যোগ নেন। রাজপুত বীরদের শৌর্যবীর্য এবং রাজপুত রাজ্যগুলির স্বাধীন অস্তিত্ব যেন দিল্লী-সুলতানির মান-মর্যাদা ও কর্তৃত্বের উজ্জ্বলতাকে কিছুটা ম্লান করে রেখেছিল। তাই আলাউদ্দিন এই রাজপুত রাজ্যগুলিকে গ্রাস করে সুলতানির সাম্রাজ্যিক মহিমা প্রসারিত করার জন্য সচেষ্ট হন। প্রথমে তিনি আক্রমণ করেন চৌহানবংশীয় হামীরদেব শাসিত রণথম্ভোর। সুলতানি-বাহিনী গুজরাট অভিযান সম্পূর্ণ করে প্রত্যাবর্তনের পথে 'নব-মুসলমান' নাম্নী মোঙ্গল সৈন্যগণ বিদ্রোহী হলে তাদের অধিকাংশকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়।* এই সময় মহম্মদ শাহ ও খবরু নামক দু'জন মোঙ্গল বিদ্রোহী রণথম্ভোরে আশ্রয় নেয়। আলাউদ্দিন ঐ দুই বিদ্রোহীকে প্রত্যর্পণের আদেশ দিলে রানা হামীর তা প্রত্যাখ্যান করেন। এমতাবস্থায় উলুঘ খাঁ ও নুসরৎ খাঁ রণথম্ভোর আক্রমণ

করেন। সুলতানি ফৌজ ঝইন ও রণথম্ভোরের উপর ব্যাপক ধ্বংসকার্য চালালেও দুর্গ দখল করতে ব্যর্থ হন। এবার আলাউদ্দিন স্বয়ং রণথম্ভোর অভিযানে অংশ নেন। তাঁর সঙ্গী হন সুপ্রসিদ্ধ পারসিক কবি আমির খসরু। রাজপুত যোদ্ধারা অসীম সাহসিকতার সাথে লড়াই চালিয়ে যায়। তিন মাস অবরোধের পর দুই রাজপুত রণমল ও রতিপালের বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে আলাউদ্দিন দুর্গ দখল করতে সক্ষম হন (১৩০১ খ্রীঃ)। রাজপুত রমণীরা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে মর্যাদা রক্ষা করেন। খসরুর বিবরণী থেকেই 'জহরব্রতের' কথা প্রথম জানা যায়। রণথম্ভোর জয় করার পর সুলতানি সেনা বহু মন্দির ও বিগ্রহ ধ্বংস করে দেয়। ঝইন-সহ রণথম্ভোরের শাসনাদায়িত্ব আলাউদ্দিন তাঁর সেনাপতি উলুঘ খাঁয়ের উপর ন্যস্ত করেন।

রণথম্ভোরের বিরুদ্ধে অভিযান চলার সময় আলাউদ্দিনকে একাধিক অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হয়। তাঁর নিকট-আত্মীয় আকৎ খাঁ, মালিক উমর, মঙ্গু খাঁ এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী সরকারি কর্মী হাজীমৌলা ইত্যাদি ক্ষমতা দখলের জন্য কয়েকটি ব্যর্থ প্রয়াস চালান। আলাউদ্দিন খলজী অত্যন্ত তৎপরতা ও কঠোরতার সাথে এইসব বিদ্রোহ দমন করে সসৈন্যে রণথম্ভোরে উপস্থিত হন এবং এই রাজপুত রাজ্যটিকেও জয় করেন। কিন্তু রণথম্ভোর থেকে আলাউদ্দিন সোজা দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করতে দ্বিধান্বিত ছিলেন। তাই শহরের উপকণ্ঠে প্রায় মাসাধিক কাল তিনি অতিবাহিত করেন। অধ্যাপক ***সাকসেনা, লাল*** প্রমুখ মনে করেন, দিল্লীতে নিজের সুরক্ষা সম্পর্কে সুনিশ্চিত হবার জন্যই তিনি এই ধরনের আচরণ করেছিলেন। পিতৃব্য জালালউদ্দিনের প্রতি তাঁর নিজের আচরণের কথা স্মরণ করে হয়তো তিনি একটু বেশি সাবধান হয়েছিলেন।

রণথম্ভোরের পতনের পর রাজস্থানের সর্বাধিক শক্তিশালী রাজ্য ছিল মেবার। মেবারের রাজধানী ছিল চিতোর। সুউচ্চ পাহাড়ের শীর্ষে নির্মিত চিতোরগড় দুর্গ ছিল যেমন সুন্দর তেমনি দুর্ভেদ্য। স্বাধীনতা ও শক্তির প্রতীক মেবারকে পদানত করার উদ্দেশ্যে আলাউদ্দিন স্বয়ং ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে চিতোর আক্রমণ করেন। দীর্ঘ সাতমাস প্রতিরোধ চালানোর পর রানা রতন সিংহ সুলতানের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। গোরা ও বাদল নামক দুই রাজপুত যোদ্ধা মুসলমান সৈন্যদের বিরুদ্ধে অপূর্ব কৃতিত্ব দেখান। আমীর খসরু ও ইসামীর বর্ণনা অনুসারে আলাউদ্দিন রতন সিংহকে বন্দী করলেও হত্যা করেননি। কিন্তু অতঃপর ইতিহাসে রানা রতন সিংহের কোন উল্লেখ পাওয়া যায়নি। তাই মনে হয়, তিনি যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন। শোনা যায়, এই সময় সুলতানি-বাহিনী একদিনে প্রায় ৩০ হাজার রাজপুতকে হত্যা করে। রাজপুত রমণীরা দুর্গের মধ্যে 'জহরব্রত' পালন করে অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দেন। আলাউদ্দিন তাঁর নাবালক পুত্র খিজির খাঁকে চিতোরের শাসক নিযুক্ত করেন এবং এই স্থানের নাম হয় 'খিজিরাবাদ'। তবে চিতোরে মুসলমান শাসন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। রাজপুতদের নিরন্তর ও প্রবল অসহযোগিতা এবং বিরোধিতার ফলে খিজির খাঁ জনৈক বংশধর রাজপুত মালদেবের হাতে চিতোরের দায়িত্ব ন্যস্ত করে ফিরে যান (১৩১১ খ্রীঃ)। রাজপুতরা হামিরের নেতৃত্বে মালদেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। ১৩২১ খ্রীষ্টাব্দে মালদেবের মৃত্যুর পর হামির সমগ্র মেবার দখল করে নেন।

আলাউদ্দিনের চিতোর অভিযানের সাথে পদ্মিনীর কাহিনী জড়িত হবার ফলে এই ঘটনা একটা রোমান্টিক চরিত্র পেয়েছে। প্রচলিত কাহিনী অনুসারে আলাউদ্দিন রতন সিংহের অনন্যা সুন্দরী রানী পদ্মিনীকে লাভ করার জন্য চিতোর আক্রমণ করেছিলেন। আবুল ফজল, হাজি-

উদ্-দরীর, ফেরিস্তা, নান্সী প্রমুখ লেখক এই কাহিনীকে সত্য বলে মনে করেন। কিন্তু *ড. কে. এস. লাল, ড. গৌরীশংকর ওঝা* প্রমুখ ইতিহাসবিদ্ এই ঘটনাকে 'কাল্পনিক ও যুক্তিহীন' বলে বর্ণনা করেছেন। এঁদের মতে, (১) চিতোর অভিযানে আলাউদ্দিনের সঙ্গী কবি আমির খসরু পদ্মিনীর বিষয়ে কোন উল্লেখ করেননি। এমনকি সমকালীন লেখক বরণী বা ইসামীও এ সম্পর্কে কোন উল্লেখ করেননি। পদ্মিনীর কাহিনী সত্য হলে এঁরা নিশ্চয়ই উল্লেখ করতেন। (২) একমাত্র মালিক মহম্মদ জয়সীর 'পদ্মাবৎ' কাব্যে এই কাহিনী উল্লেখিত হয়েছে। অথচ এই কাব্য রচিত হয়েছে ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ আলাউদ্দিন কর্তৃক চিতোরবিজয়ের ২৩৭ বছর পর। ফেরিস্তা লোকমুখে শোনা এই কাহিনীকে ইতিহাসের সাথে যুক্ত করেছেন। রাজস্থানী চারণকবিরা রাজনৈতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে আদৌ পরিচিত না হয়েই, এই কাহিনীকে সত্য বলে প্রচার করেছেন। (৩) এঁরা মনে করেন, আলাউদ্দিনের চিতোরবিজয়ের সময় মেবারের রানা ছিলেন রতন সিংহ। কিন্তু পদ্মিনী ছিলেন ভীম সিংহের স্ত্রী। ভীম সিংহের সাথে রতন সিংহের সময়ের ব্যবধান প্রায় দেড়শো বছরের। অর্থাৎ চিতোর আক্রমণকালে পদ্মিনীর জন্মই হয়নি। অন্যদিকে *ড. শ্রীবাস্তব* পদ্মিনী-কাহিনীর মধ্যে কিছুটা সত্য আছে বলে মনে করেন। তাঁর মতে, আমীর খসরু ইথিওপিয়ার সলোমন কর্তৃক মেবার রানী বিলকিস্‌কে পাওয়ার আকাঙক্ষাভিত্তিক যে রূপক রচনা করেছেন, তার মধ্যে পদ্মিনীর কাহিনী লুকিয়ে আছে। এখানে সলোমনকে আলাউদ্দিন এবং পদ্মিনীকে মেবার রানী রূপে কল্পনা করা হয়েছে। *ড. দশরথ শর্মা* তাঁর *'Rajasthan through the Ages'* (Vol-I) গ্রন্থে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, আমীর খসরুর *'খাজাইন-উল ফুতুহ'* গ্রন্থ থেকে উপাদান সংগ্রহ করে মালিক মহম্মদ জয়সী পদ্মিনীর রোমান্টিক কাহিনী রচনা করেছেন। 'পদ্মাবৎ' কাব্যের অধিকাংশ কাহিনীই কল্পনাভিত্তিক, কিন্তু রতন সিংহ কর্তৃক আয়নায় প্রতিবিম্বের মাধ্যমে আলাউদ্দিনকে পদ্মিনীর রূপ প্রদর্শন এবং সুলতান কর্তৃক রতন সিংহকে বন্দী—এই সংবাদে রাজপুত রমণীদের অগ্নিতে প্রাণবিসর্জন এবং কামনার আগুনে দগ্ধ সুলতান কর্তৃক হাজার হাজার রাজপুতকে হত্যার ঘটনার মধ্যে ইতিহাসগত ধারাবাহিকতাকে অস্বীকার করা কষ্টকর।

অতঃপর আলাউদ্দিন একে একে মালব (১৩০৫ খ্রীঃ), শিবানা (১৩০৮ খ্রীঃ), জালোর (১৩১১ খ্রীঃ) প্রভৃতি অঞ্চল দখল করেন। মাড়োয়ার রাজ্যটির অধিকার সম্পর্কে কোন লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় না। সম্ভবত, এটিও আলাউদ্দিনের কর্তৃত্বের বাইরে ছিল না। যাই হোক, কাশ্মীর, নেপাল, অসম এবং উত্তর-পশ্চিম পাঞ্জাবের একাংশ ছাড়া প্রায় সমগ্র উত্তর ভারত আলাউদ্দিনের কর্তৃত্বাধীনে আনীত হয়েছিল।

○ খ. রাজপুত নীতি : *অধ্যাপক মহম্মদ হাবিব* ও *নিজামী* মনে করেন, আলাউদ্দিন দিল্লীর অভ্যন্তরীণ শাসন এবং দাক্ষিণাত্যের নববিজিত রাজ্যগুলি সম্পর্কে এক স্থিরনীতি গ্রহণ করলেও, রাজস্থানের রাজ্যগুলি সম্পর্কে তাঁর কোন সুনির্দিষ্ট নীতি ছিল না। *অধ্যাপক সতীশচন্দ্র* লিখেছেন : *"সম্ভবত রাজপুত রাজ্যগুলির উপর প্রত্যক্ষ শাসন আরোপ করার চেষ্টা আলাউদ্দিন করেননি। রাজপুত রানারা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতেন। তবে সুলতানকে নিয়মিত কর প্রদান করা এবং সুলতানের আদেশ মান্য করা তাদের স্বাধিকার ভোগের অন্যতম প্রধান শর্ত ছিল।"*

সামরিক প্রয়োজনে রণথম্ভোর এবং ঝইন্ রাজ্য দুটি আলাউদ্দিন সরাসরি দিল্লীর অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন এবং একই অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন। কিন্তু চিতোরে প্রচুর রক্তপাত করা সত্ত্বেও সেখানে দিল্লীর রাজকীয় আইন বা জাত্তবিত প্রবর্তনের কোন চেষ্টা করেননি। রাজপুতনার কোন সামন্ত-সর্দার তাঁর কর্তৃত্ব অস্বীকার করলে আলাউদ্দিন সত্বর তাকে উৎখাত করেছেন। কিন্তু কোন স্থানীয় রাই দিল্লীর বশ্যতা স্বীকার করে অর্থপ্রদানে সম্মত হলে তাকে নিজ জাইগিরদারিতে বহাল রেখেছেন। রাজপুতানার কৃষক বণিকদের উপর সুলতানি শাসন চাপিয়ে দেবার কোন চেষ্টা তিনি করেননি। রাজস্ব আদায়ের কাজে সুলতানের নিযুক্ত কোন মুসলমান কর্মচারীর সমতুল্য কাজ যদি কোন স্থানীয় রাজপুত-সর্দার করতে পারতেন, তাহলে আলাউদ্দিন তাঁকেই ঐ দায়িত্বে নিযুক্ত করতেন। রাজস্থানের অধিকৃত অঞ্চলের সামাজিক সংগঠন বা অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তনের কোন চেষ্টা তিনি করেননি। অধ্যাপক *বি. পি. সাক্সেনা* লিখেছেন ঃ *"We can only say that the plan of annexing Rajasthan was attempted in part and then given up impracticable."* রাজপুতানার রাজ্যগুলি সম্পর্কে আলাউদ্দিনের এই দ্বিধাগ্রস্ততার অন্যতম কারণ ছিল রাজপুত রাজ্যগুলির অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অস্থিরতা। মুঘল আমলে রাজপুতদের যে ঐক্যবোধ জাগ্রত হয়েছিল এবং মুঘলদের বিরুদ্ধে তারা যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল, সুলতানি আমলে তা ছিল না। আলাউদ্দিন উপলব্ধি করেছিলেন যে, অন্তর্দ্বন্দ্বে দীর্ণ রাজপুতদের মিত্রতা তাঁর শক্তি বৃদ্ধি করতে যেমন পারবে না, তেমনি এরা কখনোই মিলিতভাবে দিল্লী-সুলতানির অস্তিত্ব ও কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ জানাতেও পারবে না। তাই ভৌগোলিক বাধা অতিক্রম করে এই আক্রমণে সরাসরি সুলতানি শাসন কায়েম করতে চেষ্টা করেননি। চিতোর, রণথম্ভোর ও জালোর দুর্গ দখল করার সময় দিল্লীর প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়েছিল। কিন্তু এখান থেকে উল্লেখযোগ্য সম্পদ তিনি ·ানেনি। তাই রাজপুতানার পরিবর্তে দক্ষিণ ভারতের সমৃদ্ধ নগর ও রাজ্যগুলির দিকে তাঁর মনোযোগ নিবদ্ধ হয়। অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে, একান্ত সাম্রাজ্যবাদী ইচ্ছা দ্বারাই তিনি রাজস্থানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়েছিলেন। এখানে দিল্লীর প্রত্যক্ষ শাসন কায়েম করার ইচ্ছাও তাঁর ছিল। কিন্তু পরিস্থিতির বিচারে তিনি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে বাধ্য হন।

○ দক্ষিণ ভারত অভিযান ঃ প্রকৃতি ঃ

আলাউদ্দিন ছিলেন প্রথম মুসলমান শাসক যিনি দক্ষিণ ভারত বিজয়ের পরিকল্পনা করেছিলেন। উত্তর ভারতীয় রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে উপর্যুপরি সাফল্য তাঁর মনে গভীর আত্মবিশ্বাসের জন্ম দেয় এবং উত্তর ভারতকে সুলতানি শাসনের অধীনে এনে তিনি প্রকৃত অর্থে 'ভারত-সাম্রাজ্য' প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন। তবে আলাউদ্দিনের দক্ষিণ ভারত অভিযানের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, অযোধ্যার শাসক হিসেবে (সুলতান জালালউদ্দিনের আমলে) দেবগিরি অভিযান করে আলাউদ্দিন যে বিশাল পরিমাণ সম্পদ সংগ্রহ করেছিলেন, তা তাঁর মনে গভীর প্রত্যাশা সৃষ্টি করেছিল। তাই সুলতান হওয়ার পর তিনি দক্ষিণ ভারতের বিরুদ্ধে অভিযানে লিপ্ত হন। অর্থাৎ দক্ষিণ ভারত জয় করে আলাউদ্দিন তাঁর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্য পূরণ করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

সমসাময়িক লেখক ***আমীর খসরু*** মনে করেন, দক্ষিণ ভারত অভিযানে আলাউদ্দিনের প্রধান লক্ষ্য ছিল ইসলামের প্রসার। উত্তর ভারতে সাফল্য অর্জনের পর দক্ষিণ ভারতে ধর্মের প্রসার ঘটানো তিনি সুলতানের নৈতিক কর্তব্য বলে বিবেচনা করেন। তাই দক্ষিণ ভারতে তিনি সরাসরি সুলতানি শাসন কায়েম করেননি। পরন্তু দাক্ষিণাত্যের মন্দির ভেঙে মসজিদ নির্মাণ কর্মসূচী আলাউদ্দিনের ধর্মীয় অনুপ্রেরণার সাক্ষ্য দেয়।

ড. কে. এস. আয়েঙ্গার, এস. কে লাল প্রমুখ খসরুর বক্তব্যের বিরোধিতা করে লিখেছেন যে, দক্ষিণ ভারতে অভিযানে আলাউদ্দিনের আদৌ ধর্মীয় উদ্দেশ্য ছিল না। সুলতানের একমাত্র লক্ষ্য ছিল দক্ষিণের অপরিমেয় ঐশ্বর্য-সম্পদ লাভ করা। ড. ***আয়েঙ্গার*** লিখেছেন ঃ ***"Ala-ud-din's object in these various invasions of the Deccan and fu1ther South, appears to have gone on further than making them milch cows for the gold that he was often much in need of."*** ড. লাল মনে করেন, গজনীর সুলতান মামুদ যেমন অর্থের জন্য উত্তর ভারত বিধ্বস্ত করেছিলেন, একইভাবে আলাউদ্দিন ধন-সম্পদের লোভে দক্ষিণ ভারত অভিযান করেন। তিনি লিখেছেন ঃ ***"Really speaking the motives behind the campaigns of Kafur in the South were the same as those of Mahamud (of Ghazni) in the North."*** আমীর খসরুর যুক্তি খণ্ডন করে ড. ***লাল*** লিখেছেন, আলাউদ্দিন দক্ষিণ ভারতে পৌত্তলিকতার অবসান ঘটানোর জন্য মন্দির ধ্বংস করেননি। তিনি মন্দির ধ্বংস করে সম্পদ সংগ্রহ করতে চেয়েছিলেন, কারণ দাক্ষিণাত্যে মন্দিরগুলিই ছিল সম্পদের সংগ্রহশালা। কিংবদন্তীর আলিবাবার মত বিশাল ধন-সম্পদ সংগ্রহ করাই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। ড. ***জে. এল. মেহতা*** লিখেছেন ঃ ***"Deogiri to Alauddin Khalji was a gateway to the treasure-trove of the legendary 'forty thieves' and the Sultan was ever eager to posses the treasury by playing the role of 'Ali Baba'*** ". আর মসজিদ নির্মাণ করে তিনি ইসলামের প্রসার নয় ; নিজের সামরিক সাফল্যের কীর্তি স্থায়ী করতে চেয়েছিলেন।

একথা অনস্বীকার্য যে, দক্ষিণী রাজ্যগুলির অপবিমেয় ঐশ্বর্য আলাউদ্দিনকে দক্ষিণ ভারত অভিযানে প্রলুব্ধ করেছিল। তবে এই অভিযানগুলিকে শুধুমাত্র অর্থের জন্য নিছক লুণ্ঠন-অভিযান বলা সঠিক হবে না। এখানেই সুলতান মামুদের সাথে আলাউদ্দিনের অভিযানের প্রকৃতিগত প্রভেদ। দক্ষিণ ভারতের হিন্দু রাজাদের পরাজিত করে সেখানে সুলতানি শাসন কায়েম করার একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও আলাউদ্দিনের ছিল। কিন্তু তীক্ষ্ণ বাস্তববোধ তাঁকে একাজ থেকে বিরত করে। তিনি উপলব্ধি করেন যে, দিল্লীতে বসে সুদূর দাক্ষিণাত্যে সুলতানি কর্তৃত্ব বজায় রাখা অসম্ভব। তাই তিনি হিন্দু রাজাদের আনুগত্য ও বার্ষিক কর প্রদানের শর্তে তাঁদের স্ব স্ব রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। দেবাগিরি রাজ্যের বিরুদ্ধে তাঁর প্রথম অভিযান (১২৯৬ খ্রীঃ) এবং তার পরিণতি থেকে এই সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয়। দেবগিরির বিপুল সম্পদ ও রাজা রামচন্দ্রদেবের আনুগত্য লাভের পর তিনি ঐ রাজ্যে সরাসরি দিল্লীর শাসন কায়েম না করে তা রাজা রামচন্দ্রদেবকেই ফিরিয়ে দেন। অবশ্য বাৎসরিক কর হিসেবে ইলিচপুর পরগণার রাজস্ব সুলতান পাবেন, এই শর্ত রামচন্দ্রদেব মেনে নেন। ড. ***ইউ. এন. দে*** লিখেছেন ঃ ***"Ala-ud-***

din was following a calculated policy of reducing the kingdoms of Deccan and the South as tributory states which would accept his sovereignty, pay annual tribute and act in all manners as his subordinates." উত্তর ভারতে সুলতানি বাহিনীর সামরিক সাফল্য, মোঙ্গল আক্রমণের তীব্রতা হ্রাস এবং দক্ষিণী রাজ্যগুলির নিরন্তর অন্তর্দ্বন্দ্বজনিত অনৈক্য শক্তিক্ষয় আলাউদ্দিনের দক্ষিণ ভারত বিজয়ের কাজ অনেক সহজ করে দেয়।

আলোচ্য পর্বে দাক্ষিণাত্যের চারটি প্রধান রাজ্য ছিল রামচন্দ্রদেব শাসিত দেবগিরি, কাকতীয় বংশের রাজা প্রথম রুদ্রদেব শাসিত তেলেঙ্গানা, তৃতীয় বীর বল্লাল শাসিত হোয়সল রাজ্য এবং কুলশেখর শাসিত পাণ্ড্যরাজ্য। এই চারটি রাজ্যের রাজধানী ছিল যথাক্রমে দেবগিরি (বা দৌলতাবাদ), বরঙ্গল, দ্বারসমুদ্র এবং মাদুরাই। এছাড়াও কয়েকটি ছোট ছোট রাজ্য ছিল, যেমন—মানমাসিধা, কোল্লাস, ম্যাঙ্গালোর ইত্যাদি।

১৩০৬-'৭ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দিন দক্ষিণ ভারতে দুটি অভিযান পাঠান। প্রথম অভিযান প্রেরিত হয় গুজরাটের বহিষ্কৃত রাজা রায়করণের বিরুদ্ধে। গুজরাট থেকে বিতাড়িত হবার পর রায়করণ প্রথমে দেবগিরির রাজা রামচন্দ্রদেবের আশ্রয় নেন। পরে মালব-সীমান্তে বগলানা অঞ্চলে কোনক্রমে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখেন। আলাউদ্দিনের নির্দেশে আলপ খাঁ বগলানা আক্রমণ করেন। সম্ভবত, এর পিছনে গুজরাটের প্রাক্তন রানী এবং বর্তমানে আলাউদ্দিনের অন্যতমা পত্নী কমলাদেবীর একটি ভূমিকা ছিল। যখন কমলাদেবী গুজরাট থেকে দিল্লীতে আনীত হন, তখন তাঁর শিশুকন্যা দেবলাদেবীকে নিয়ে গুজরাটের রাজা করণদেব দাক্ষিণাত্যে পালিয়ে যান এবং বগলানায় আশ্রয় নেন। এখন কমলাদেবী আলাউদ্দিনকে অনুরোধ করেন তাঁর কন্যাকে ফিরিয়ে আনার জন্য। এই কারণে উলুঘ খাঁ বগলানা আক্রমণ করেন। রায়করণ বরঙ্গলে পালিয়ে যান। দেবলাদেবীকে বন্দী করে আলপ খাঁ সসম্মানে দিল্লীতে পাঠিয়ে দেন। সেখানে আলাউদ্দিনের পুত্র খিজির খাঁর সাথে দেবলাদেবীর বিবাহ দেওয়া হয়।

একই সময়ে দ্বিতীয় অভিযানটি পাঠানো হয় দেবগিরির বিরুদ্ধে। এই অভিযানে বিশেষ ক্ষমতা ও মর্যাদাসহ মালিক কাফুরকে নেতৃত্ব দেওয়া হয়। মালব ও গুজরাটের শাসকদ্বয় যথাক্রমে আইন-উল্-মুল্ক ও আলপ খাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়, তারা যেন মালিক কাফুরকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেন। বস্তুত, এই সময় থেকে কাফুর দিল্লীর রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ও কর্তৃত্বব্যঞ্জক ভূমিকা নিতে শুরু করেন, যা শেষ পর্যন্ত আলাউদ্দিনকেও ছাপিয়ে যায়। যাই হোক্, দেবগিরির বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযানের মূল কারণ ছিল রামচন্দ্রদেব কর্তৃক সুলতানকে প্রতিশ্রুতিমত বাৎসরিক অর্থ প্রদানের ব্যর্থতা। ইসামীর বর্ণনায় দেখা যায় যে, রামচন্দ্রদেব তাঁর এই ব্যর্থতার জন্য নিজপুত্র ভিল্লামা এবং অভিজাতদের দায়ী করে আলাউদ্দিনকে এক গোপন পত্র দ্বারা নিজের অসহায়ত্বের কথা জানান। ***অধ্যাপক নিজামীর*** মতে, রামচন্দ্রদেব এই পত্র দ্বারা প্রকারান্তরে সুলতানকে দেবগিরি অভিযান করে দিল্লী-বিরোধী গোষ্ঠীকে ধ্বংস করার সংকেত দেন। রামচন্দ্রদেবের প্রতি সুলতানের পরবর্তী আচরণ অবশ্য এই ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করে। ***খসরুর*** বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, দেবগিরি একপ্রকার বিনা প্রতিরোধে সুলতানি-বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। ***ইসামী*** লিখেছেন, মালিক কাফুর এবারেও দেবগিরি নগর

ধ্বংস করেন। কিন্তু ***ফেরিস্তার*** মতে, *'মালিক কাফুর দেবগিরির অধিবাসী ও তাদের সম্পত্তি রক্ষায় এতই আন্তরিক ছিলেন যে, একটি পিপীলিকাও একারণে আঘাত পায়নি।'* ***অধ্যাপক সাক্সেনাও*** এই মত সমর্থন করে লিখেছেন ঃ *"It was a part of Ala-ud-din's policy to win over both the Raj and his people."*

রামচন্দ্রদেব আত্মসমর্পণ করলে কাফুর অত্যন্ত মর্যাদার সাথে তাঁকে দিল্লীতে নিয়ে আসেন। আলাউদ্দিনও তাঁর প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করেন। সুলতানের অতিথি হিসেবে রামচন্দ্র দিল্লীতে প্রায় ৬ মাস অতিবাহিত করেন। ***খসরু*** লিখেছেন ঃ *"Everyday his status and honour increased till, like a crescent moon, in the course of time he attained the full circle of light."* ***ফেরিস্তা*** লিখেছেন ঃ *'রামচন্দ্রদেবকে যে বিশাল সম্মান দেওয়া হয়েছিল, তাতে সভাসদ্গণ সুলতানের সাথে তাঁর কোন প্রভেদ খুঁজে পাচ্ছিলেন না'*। আলাউদ্দিন রামচন্দ্রকে 'রায়-রায়াণ' উপাধিতে ভূষিত করেন এবং ১ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করেন। সম্মানী হিসেবে একটি 'স্বর্ণবর্ণ ছত্র' দেন এবং গুজরাটের নভসরী অঞ্চলটি দেবগিরির সাথে যুক্ত করে রামচন্দ্রকে অর্পণ করেন। এই সময় রামচন্দ্র তাঁর কন্যা ঝট্যাপল্লীকে আলাউদ্দিনের সাথে বিবাহ দেন। দক্ষিণী-রাজ্যের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন এবং মিত্রতাপূর্ণ কূটনৈতিক আচরণ আলাউদ্দিনের মর্যাদা ও ক্ষমতাবৃদ্ধির সহায়ক হয়। পরবর্তীকালে দেবগিরিকে কেন্দ্র করে তিনি দক্ষিণের অন্যান্য রাজ্যগুলিকেও পরাস্ত করেন।

দেবগিরির সাফল্যের পর আলাউদ্দিন তেলেঙ্গানা রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান পাঠান। এবারেও সৈনাপত্য পান মালিক কাফুর। তাঁর সহকারী হিসেবে থাকেন খাজা হাজী। ইতিপূর্বে ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে সুলতানি-বাহিনী বরঙ্গল আক্রমণ করে ব্যর্থ হয়েছিল। সেই পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ এবং তেলেঙ্গানা রাজ্যের ধনসম্পদ সংগ্রহ করাই ছিল এই অভিযানের মূল লক্ষ্য। ***বরণীর*** বিবরণ থেকে জানা যায়, অভিযানের প্রাক্কালে সৈনাপত্য অর্পণের পর আলাউদ্দিন কাফুরকে বলেছিলেন, *'বরঙ্গল দখল এবং রাজা প্রতাপরুদ্রদেবকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করবে ; কিন্তু রাজা তাঁর ধনসম্পদ, হাতি, ঘোড়া ইত্যাদি সমর্পণ করতে রাজী হলে এবং বার্ষিক করপ্রদানে সম্মত হলে অনর্থক কঠোর হয়ো না।'* অর্থাৎ এক্ষেত্রেও সুলতানের লক্ষ্য ছিল তেলেঙ্গানার আনুগত্য ও নিয়মিত অর্থ আদায় করা।

তেলেঙ্গানায় প্রবেশ করে সুলতানী-বাহিনী প্রথমে শিবপুর দুর্গ দখল করে। ১৩১০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তারা 'বরঙ্গল দুর্গ' অবরোধ করে। প্রতাপরুদ্র প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। কিন্তু এক মাস প্রতিরোধের পর তিনি উপলব্ধি করেন যে, সুলতানি-বাহিনীকে পরাস্ত করা অসম্ভব। ফলে তিনি সন্ধির প্রস্তাব দেন এবং আলাউদ্দিনের নির্দেশ অনুযায়ী কাফুর সাদরে তা গ্রহণ করেন। প্রতাপরুদ্র কাফুরকে একশ হাতি, সাত হাজার ঘোড়া ও প্রচুর ধনসম্পদ প্রদান করেন। কাফি খাঁর বিবরণ থেকে জানা যায়, এই সময় প্রতাপরুদ্র 'কোহিনুর মণি' আলাউদ্দিনকে প্রদান করেন। দিল্লীকে বাৎসরিক কর দিতেও তিনি সম্মত হন।

দেবগিরি এবং বরঙ্গল বিজয়ের ফলে আলাউদ্দিনের সেনাপতিদের সাহস, আত্মপ্রত্যয় এবং দুঃসাহসিক কাজের উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়। অতঃপর সুলতানের পরামর্শে তারা বিনা দ্বিধায় আরো দক্ষিণে হোয়সল রাজ্য আক্রমণে অগ্রসর হয় (১৩১০-১১ খ্রীঃ)। মালিক কাফুর ও তাঁর সহকারী

খাজা হাজী দেবগিরিতে পৌঁছে গোদাবরীর তীরে 'জালনা' নামক স্থানে একটি মধ্যবর্তী ঘাঁটি স্থাপন করেন। কারণ দেবগিরির ভাবী রাজা শংকরদেবের ভূমিকা সম্পর্কে এঁরা নিশ্চিন্ত ছিলেন। তাই দিল্লীর সাথে অগ্রবর্তী-বাহিনীর সংযোগরক্ষার প্রয়োজন অনুভূত হয়। দ্বারসমুদ্রের রাজা তৃতীয় বীরবল্লাল ঠিক সেই সময় পাণ্ড্যরাজ্য আক্রমণে ব্যস্ত ছিলেন। সুলতানি-বাহিনীর আক্রমণ-সংবাদ বীরবল্লার দ্রুত রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং পাণ্ড্যরাজ্যের সহায়তায় সুলতানি-বাহিনীকে প্রতিরোধ করার উদ্যোগ নেন। তবে প্রায় বিনাযুদ্ধেই তিনি কাফুরের কাছে আত্মসমর্পণ করেন এবং প্রভূত পরিমাণ ধন-সম্পদ দান করেন। ভবিষ্যতে দিল্লীর অধীনতা মেনে চলতে এবং বাৎসরিক কর প্রদান করতেও স্বীকৃত হন। আলাউদ্দিন প্রতিদানে বীরবল্লালকে স্বরাজ্য শাসনের অধিকার দান করেন।

দ্বারসমুদ্র অভিযান সম্পন্ন করে কাফুর মাবার বা পাণ্ড্যরাজ্য আক্রমণ করেন। এই সময় পাণ্ড্যরাজ্যে এক গৃহবিবাদ চলছিল। রাজা কুলশেখরের মৃত্যুর পর তাঁর দুই পুত্র সুন্দর পাণ্ড্য এবং বীর পাণ্ড্য সিংহাসন দখলের লড়াইয়ে মত্ত হন। বীর পাণ্ড্য এই ভ্রাতৃযুদ্ধে সফল হলে সুন্দর পাণ্ড্য আলাউদ্দিনের সাহায্য প্রার্থনা করেন। সম্ভবত, এই ইতিবাচক দিকটি ছিল বলে কাফুর বিনা বাধায় রাজধানী মাদুরাতে উপস্থিত হন। বীর পাণ্ড্য দিল্লীর বশ্যতা স্বীকার না করেই আত্মগোপন করেন। কাফুর তাঁর সন্ধান না পেয়ে মাদুরা লুণ্ঠন করেন। আমীর খসরুর বিবরণ অনুসারে কাফুর তাঁর সন্ধান না পেয়ে মাদুরা লুণ্ঠন করেন। আমীর খসরুর বিবরণ অনুসারে কাফুর সেতুবন্ধন, রামেশ্বর পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং সেখানকার বিখ্যাত মন্দিরটি ধ্বংস করে তার স্থানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। কিন্তু ইসামী বা বরণী এ প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ নীরব থেকেছেন। তাই ঐতিহাসিক ***Sewell, Dr. K. S. Lal*** প্রমুখ বিরুদ্ধ-মত পোষণ করেন। ড. ***লালের*** মতে, কাফুর মাদুরা থেকেই দিল্লীতে ফিরে যান, রামেশ্বরে তিনি আদৌ যাননি। খসরুর 'আশিকা' গ্রন্থে কাফুর কর্তৃক রামেশ্বরে মসজিদ নির্মাণের কথা বলা হলেও, 'খাজাইন-উল্-ফুতুহ' গ্রন্থে এর উল্লেখ নেই। এই বিতর্কে না গিয়েও বলা যায় যে, পাণ্ড্যরাজ্য থেকে কাফুর যে বিশাল ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করেছিলেন, তা ইতিপূর্বে কোন অভিযান থেকে পাননি। এবং এর পরিমাণ জানতে পারলে কবরে শায়িত সুলতান মামুদও (গজনী) চমকে উঠতেন। জনৈক ঐতিহাসিক তাই লিখেছেন : ***"The treasures that were looted might have made Mahmud turn in his grave at Ghazni with wistful eyes."*** আলাউদ্দিন লুণ্ঠিত ধনরত্নের অনেকটাই আনন্দে সামরিক-বাহিনীর সদস্য ও দিল্লীর অভিজাতদের মধ্যে বণ্টন করে দেন।

দাক্ষিণাত্যের বিরুদ্ধে আলাউদ্দিনের শেষ অভিযান প্রেরিত হয় দেবগিরির বিরুদ্ধে। দ্বিতীয়বার দেবগিরি আক্রমণের কারণ হলো মৃত রাজা রামচন্দ্রদেবের পুত্র শংকরদেবের স্বাধীনতাকামিতা। সিংহাসনে আরোহণ করে (১৩১২ খ্রীঃ) শংকরদেব দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করেন এবং বার্ষিক করদান বন্ধ করে দেন। ফলে মালিক কাফুর আবার দেবগিরিতে উপস্থিত হয়ে শংকরদেবকে পরাজিত ও হত্যা করেন। অতঃপর তিনি নিজহাতে দেবগিরির শাসনভার গ্রহণ করেন। এখান থেকে কাফুর কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগ জয় করে রাইচুর ও মুদ্‌গলে সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করেন। দাভোল এবং চাউল বন্দরও তাঁর হস্তগত হয়। দিল্লী প্রত্যাবর্তনের পথে হোয়সল রাজ্য পুনরায় আক্রমণ করে তিনি বহু ধনরত্ন সংগ্রহ করেন।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আলাউদ্দিন দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলির প্রতি 'বশ্যতার বিনিময়ে স্বরাজ্যশাসন' নীতি অনুসরণ করেছিলেন। দাক্ষিণাত্যের প্রভূত সম্পদ তাঁর বিশাল সেনাবাহিনীর ব্যয়ভার মেটানোর কাজে সহায়ক হয়েছিল। তথাপি পণ্ডিতদের মতে, আলাউদ্দিনের দাক্ষিণাত্য অভিযান ছিল প্রায় নিষ্ফল। ঐতিহাসিকের ভাষায় : *"It was neither complete nor permanent."* কারণ পাণ্ড্যরাজ্য দিল্লীর বশ্যতা স্বীকার করেনি। দেবগিরি কিছুদিন পরে বশ্যতা অস্বীকার করেছিল। এমনকি চুক্তিবদ্ধ রাজ্যগুলির কর-সংগ্রহের জন্য বার্ষিক অভিযান চালাতে হত। এতদ্‌সত্ত্বেও দুটি কারণে আলাউদ্দিনের দাক্ষিণাত্য অভিযানকে ফলপ্রসূ বলা চলে—(১) দাক্ষিণাত্যের লব্ধ সম্পদ দিল্লীর রাজকোষকে স্ফীত ও শক্তিশালী করে এবং (২) দক্ষিণ ভারতের রাজনৈতিক মেলবন্ধন দ্বারা ভারত-সাম্রাজ্য গঠনের পথ প্রশস্ত করেন।

○ আলাউদ্দিনের বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ :

আলাউদ্দিন খলজীর রাষ্ট্রনীতি রূপায়ণে তাঁর কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে সংঘটিত বিদ্রোহগুলির বিশেষ ভূমিকা ছিল। দিল্লীর সিংহাসন দখল করার পরেও তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল। সুলতান ও তাঁর সুযোগ্য অনুচরবৃন্দ অবশ্য এই সকল অভ্যুত্থান দমন করে দেন।

১২৯৯ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাটবিজয় সম্পন্ন করে দিল্লী প্রত্যাবর্তনের পথে নব-মুসলমানদের একাংশ প্রথম রাজদ্রোহী হয়। ইসলামে ধর্মান্তরিত মোঙ্গলদের 'নব-মুসলমান' বলা হত। জালালউদ্দিনের আমল থেকেই এরা দিল্লীতে বসবাস শুরু করে এবং সুলতানি-বাহিনীতে যোগ দেয়। গুজরাটে অভিযানকালে সৈনিকেরা যে অর্থ লুণ্ঠন করে, নিয়মানুযায়ী তার একাংশ সুলতানের প্রাপ্য। কিন্তু নব-মুসলমানদের একাংশ এই অর্থ দিতে অসম্মত হয় এবং বিদ্রোহ ঘোষণা করে। জলোর নামক স্থানে মহম্মদ শাহ্, খবরু, ইলহক্ এবং বুরাক্ নাম্নী চার নেতার প্ররোচনায় দুই থেকে তিন হাজার অশ্বারোহী উলুঘ খাঁর শিবির আক্রমণ করে। উলুঘ খাঁ পিছনের দরজা দিয়ে নুসরৎ খাঁর তাঁবুতে পালিয়ে প্রাণরক্ষা করেন। বিদ্রোহীরা নুসরৎ খাঁর ভ্রাতা আইজউদ্দিন ও আলাউদ্দিনের ভাগিনেয়কে হত্যা করে। ইতিমধ্যে সুলতানি অনুগত যোদ্ধারা রুখে দাঁড়ালে বিদ্রোহী নেতারা রণথম্ভোরে গিয়ে রানা হামিরের কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় নেয়। সুলতানের নির্দেশে বিদ্রোহীদের পুত্রকন্যা ও পত্নীদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালানো হয়। ***বরণীর*** মতে, এইভাবে আলাউদ্দিন গৃহকর্তার অপরাধের শাস্তি তার স্ত্রী-পুত্রের উপর আরোপের রীতি চালু করেন। কিন্তু ***উলসী হেগ*** মনে করেন, *'এই ধরনের রীতি আগেও চালু ছিল ; আলাউদ্দিন রাষ্ট্রনীতির সাথে একে যুক্ত করেছিলেন।'*

আলাউদ্দিনের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আকৎ খাঁ। আকৎ ছিলেন ভকিলদার। রণথম্ভোর বিজয়ের জন্য যাত্রা শুরু করে আলাউদ্দিন সৈন্যসংগ্রহের জন্য তিলপত্ নামক স্থানে কয়েকদিন অবস্থান করেন। এই সময় একদিন যখন তিনি শিকারের উদ্দেশ্যে মাচায় বসেছিলেন, তখন আকৎ খাঁ ও তার সঙ্গীরা 'বাঘ' 'বাঘ' চিৎকার করে সুলতানের দিকেই তীর নিক্ষেপ করতে থাকে। জনৈক বিশ্বস্ত ক্রীতদাস মানিক (মতান্তরে নায়েক) সুলতানকে নিজের দেহ দিয়ে আড়াল করার চেষ্টা করে। তবুও দু'টি তীর আলাউদ্দিনকে বিদ্ধ

করে এবং তাঁর প্রচুর রক্তপাত হয়। সুলতান অজ্ঞান হয়ে যান। আকৎ খাঁ সম্মুখে এসে তরবারি দ্বারা তাঁর মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে উদ্যত হন। সুলতানের অতি বিশ্বস্ত পাইকরা ঘটনার আকস্মিকতায় বিভ্রান্ত হলেও আকৎ খাঁকে বলেন যে, সুলতান যখন মারাই গেছেন, তখন আর তাঁর মুণ্ডচ্ছেদ করা কেন? পাইকদের কথায় আশ্বস্ত হয়ে আকৎ ফিরে যান এবং নিজেকে 'সুলতান' বলে ঘোষণা করেন। অতঃপর আকৎ খাঁ সুলতানের হারেমে প্রবেশ করতে চাইলে হারেমের প্রধান রক্ষক মালিক দিনার বাধা দেন এবং মৃত সুলতানের ছিন্নমুণ্ড প্রদর্শনের দাবি করেন। ঠিক সেই মুহূর্তেই আলাউদ্দিনের মুণ্ড সেখানে আনীত হয়, তবে, *লেনপুরের* ভাষায় : ছিন্ন অবস্থায় নয়, আলাউদ্দিনের সচল গর্দানের সাথেই। জীবিত আলাউদ্দিনকে দেখেই আকৎ খাঁ অর্ধমৃত হয়ে পড়েন। তাঁকে বন্দী ও হত্যা করা হয়। তাঁর ভাইসহ অন্যান্য অনুচরদেরও হত্যা করা হয়। আলাউদ্দিন কয়েকদিনের মধ্যেই রণথম্ভোর যাত্রা করেন।

রণথম্ভোরের যুদ্ধে আলাউদ্দিন যখন ব্যস্ত, সেই সুযোগে তাঁর দুই ভাগিনেয় মালিক উমর ও মঙ্গ খাঁ বিদ্রোহী হন। এঁরা তখন যথাক্রমে বদাউন ও অযোধ্যার শাসনকর্তা ছিলেন। সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য এঁরা সৈন্য সংগ্রহ শুরু করেন। সংবাদ পাওয়ামাত্র আলাউদ্দিনের নির্দেশে এঁদের গ্রেপ্তার করে রণথম্ভোরে আনা হয় এবং সুলতানের নির্দেশে প্রথমে চক্ষু উৎপাটন করে পরে হত্যা করা হয়। এদের পরিবারবর্গ ও অনুচরদেরও হত্যা করা হয়।

১৩০১ খ্রীষ্টাব্দের মে-জুন মাসে দিল্লীতে আলাউদ্দিনের অনুপস্থিতির সুযোগে সেখানে এক গভীর ষড়যন্ত্র রূপ নেয়। এই ষড়যন্ত্রের নায়ক ছিলেন হাজী মোল্লা নামক জনৈক সরকারি কর্মচারী। দিল্লীর কোতোয়াল আলা-উল্-মূল্ক-এর মৃত্যুর পর দিল্লীর কোতোয়াল-পদে নিযুক্ত হন বায়াজিদ তিরমিজ। এই সময় সিরিতে নতুন রাজধানী নির্মাণের কাজ চলছিল। তাই সেখানে স্বতন্ত্র কোতোয়াল হিসেবে মহম্মদ আয়াজ'কে নিয়োগ করা হয়েছিল। তিরমিজ তাঁর রুক্ষ ব্যবহারের জন্য খুবই অ-জনপ্রিয় ছিলেন। সেই সময় আলাউদ্দিন রণথম্ভোর দখলের কাজে সেখানে ব্যস্ত ছিলেন। এই সুযোগে হাজী মৌলা আলাউদ্দিনকে সিংহাসনচ্যুত করার এক ষড়যন্ত্র করেন। *বরণীর* মতে, *'হাজী মৌলা ছিলেন একজন দুঃশ্চরিত্র, দুর্নীতিপরায়ণ এবং বেপরোয়া ষড়যন্ত্রী প্রকৃতির মানুষ'*।

হাজী মৌলা বিদ্রোহের জন্য মে-জুন মাসে রমজানের সময়টাকে বেছে নেন। আলাউদ্দিনের নামাঙ্কিত একটা জাল নির্দেশনামা প্রদর্শন করে বেশ কিছু অনুগামী জোগাড় করে তিনি প্রথমে কোতোয়াল তিরমিজকে হত্যা করেন। অতঃপর আয়াজের সন্ধানে সিরিতে উপস্থিত হন। কিন্তু আয়াজ ইতিমধ্যেই হাজী মৌলার ষড়যন্ত্রের আঁচ পেয়ে যান এবং আত্মগোপন করে থাকেন। সিধি মৌলা লালপ্রাসাদ দখল করে সরকারি কোষাগার হস্তগত করেন। বহু বন্দীকে তিনি মুক্তি দেন। অর্থ ও মুক্তির লোভে অনেকেই মৌলাকে সমর্থন করে। অতঃপর মৌলা ইলতুৎমিসের কন্যার বংশধর জনৈক আলাভি'কে দিল্লীর সুলতান বলে ঘোষণা করেন। আলাভি অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাজী মৌলার ভয়ে সিংহাসনে বসতে বাধ্য হন। হাজী মৌলা উদার হাতে অর্থ, অস্ত্র আর ঘোড়া বিতরণ করে বহু অনুচর সংগ্রহ করতে এবং দিল্লীর অধিবাসীদের আতঙ্কগ্রস্ত করে রাখতে সক্ষম হন।

আলাউদ্দিন রণথম্ভোরে যুদ্ধের চরম মুহূর্তে এই বিদ্রোহের সংবাদ পান। কিন্তু বিচক্ষণ

সুলতান সমস্ত সংবাদ গোপন করে রাখেন। কারণ তাঁর লক্ষ্য ছিল প্রথমে রণথম্ভোর অভিযানের নিষ্পত্তি করা। এদিকে আমরোহা থেকে 'আমীর-ই-কোহ্' মালিক হামিউদ্দিন দিল্লীতে সৈন্য পরিদর্শনের (আর্জ) কাজে এসে পরিস্থিতির মুখোমুখি হন। *ড. কে. এস. লালের* মতে, আলাউদ্দিনই গোপন নির্দেশ দিয়ে হাজী মৌলার বিদ্রোহদমনের জন্য হামিদউদ্দিনকে প্রেরণ করেছিলেন। কিছুদিনের মধ্যে উলুঘ খাঁকেও সুলতান দিল্লীতে পাঠিয়ে দেন। অবশ্য উলুঘ খাঁ আসার আগেই হামিদউদ্দিন বিদ্রোহীদের ছত্রভঙ্গ করে দেন। বিদ্রোহের চতুর্থ দিনে হামিদউদ্দিন দিল্লীতে ঢোকেন এবং দু'দিন বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষের পর প্রকাশ্য রাজপথে হাজী মৌলাকে হত্যা করেন। হামিদউদ্দিনও প্রতিপক্ষের অস্ত্রাঘাতে দারুণ জখম হন। এই অবস্থায় হামিদ 'লালপ্রাসাদে' প্রবেশ করে অসহায় এবং নিরপরাধী আলভিকে হত্যা করে তার ছিন্নমুণ্ড বর্শাফলকে গেঁথে দিল্লীর রাজপথে প্রদর্শন করেন। ইতিমধ্যে উলুঘ খাঁও দিল্লীতে পৌঁছে যান। তাঁর নির্দেশে সমস্ত বিপ্লবীকে হত্যা করা হয়। এমনকি প্রাক্তন কোতোয়াল মালিক ফক্‌রুদ্দিনের পৌত্রগণ, যাঁরা কোনভাবেই এই অভ্যুত্থানের সাথে জড়িত ছিলেন না, তাঁদেরও নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। হাজী মৌলার বিদ্রোহদমনের সংবাদ পাওয়ার পরেও আলাউদ্দিন রণথম্ভোর থেকে ফিরে সরাসরি শহরে প্রবেশ না করে মাসাধিককাল শহরের উপকণ্ঠে অবস্থান করেন। বরণী, খসরু প্রমুখের মতে, দিল্লীর জনসাধারণের অকৃতজ্ঞতায় ক্ষুব্ধ হয়ে সুলতান শহরে প্রবেশ করতে বিলম্ব করেন। বেণীপ্রসাদও এই মত সমর্থন করেন। কিন্তু অধ্যাপক লাল মনে করেন, দিল্লীর অভ্যন্তরে নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কে সুনিশ্চিত হবার জন্যই আলাউদ্দিন শহরের বাইরে কিছুটা সময় অতিবাহিত করেন।

○ আলাউদ্দিনের শাসনব্যবস্থা ঃ

বিদ্রোহাত্মক প্রবণতা দমনের ব্যবস্থাদি ঃ আলাউদ্দিন সুলতানের নিরঙ্কুশ স্বৈরাচারী ক্ষমতার তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই আত্মীয়-পরিজন এবং রাজকর্মচারীদের উপর্যুপরি বিদ্রোহ তাঁকে গভীরভাবে চিন্তান্বিত করে। তিনি অনুভব করেন যে, প্রচলিত রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যেই বিদ্রোহাত্মক প্রবণতার বীজ লুক্কায়িত আছে। তাই রণথম্ভোর অবরোধের সময় তিনি বিদ্রোহের সম্ভাব্য কারণ অনুসন্ধানের জন্য তাঁর একান্ত পরিষদ 'মজলিস-ই-খাস'-এর সদস্যদের সাথে আলোচনা করেন। সমস্ত দিন বিচার করার পর সুলতান বিদ্রোহের চারটি সম্ভাব্য কারণ স্থির করেন। এগুলি হল ঃ (১) প্রজাসাধারণের শুভাশুভ সম্পর্কে সুলতানের অজ্ঞতা, (২) অবাধ মদ্যপানের সুবাদে বিভিন্ন মানুষের একত্রিত হওয়া এবং মিত্রতাবদ্ধ হয়ে সুলতানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়া, (৩) অভিজাতদের অবাধ মেলামেশা, পারস্পরিক আত্মীয়তা এবং পারিবারিক মিলনসূত্রে সুলতানের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জোটবদ্ধ হওয়া এবং (৪) জনগণের হাতে অধিক অর্থ-সম্পদ সঞ্চিত হওয়া এবং সেই সূত্রে তাদের মনোবল বৃদ্ধি পাওয়া এবং প্রচুর অবসরের সুযোগে 'অলস মস্তিষ্ককে শয়তানের কর্মশালায়' পরিণত করা ইত্যাদি।

উপরিলিখিত কারণগুলি নির্মূল করার উদ্দেশ্যে আলাউদ্দিন চারটি জরুরী নির্দেশনামা জারি করেন। প্রথম নির্দেশনামা দ্বারা রাষ্ট্রপ্রদত্ত সমস্ত রকমের ধর্মীয় দান (ওয়াকফ্), অনুদান (মিল্‌ক), উপহার (ইনাম) ইত্যাদি হিসেবে প্রদত্ত জমি অধিগ্রহণ করে 'খাসিয়া' জমিতে পরিণত করা হয়।

ইতিপূর্বে ইনাম, মিল্ক, ওয়াকফ্ ইত্যাদি সূত্রে সম্পত্তি লাভ করার ফলে বহু পরিবার সম্পদশালী হয়ে উঠেছিল। এমনকি আলাউদ্দিনও সিংহাসনে আরোহণ করার সময় এইসব খাতে বহু জমি দান করেছিলেন। অবশ্য দু'একটি ব্যতিক্রমও ছিল। যেমন, ইসামীর বংশধরদের প্রদত্ত দুটি গ্রাম ফিরিয়ে নেওয়া হয়নি। তবে সামগ্রিকভাবে এই ব্যবস্থা অনেক পরিবারের মুখের গ্রাস কেড়ে নেয়। একই সঙ্গে আলাউদ্দিন তাঁর কর্মচারীদের আদেশ দেন যে, আইন বাঁচিয়ে প্রজাদের কাছ থেকে বেশি সম্ভব অর্থ আদায় করে নেবার ব্যাপারে তাঁরা যেন যত্নবান হন। *বরণী* লিখেছেন ঃ *'এই আদেশের ফলে 'দিল্লীতে মালিক, আমীর, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মী, মুলতানি বণিক ও হিন্দু ব্যাঙ্কারগণ ব্যতীত খুব কম লোকের হাতেই স্বর্ণ সঞ্চিত ছিল'*। ফলে জনসাধারণকে জীবিকা অর্জনের জন্য সদাব্যস্ত থাকতে বাধ্য হতে হয় এবং সুলতানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অবকাশ চলে যায়।

দ্বিতীয় নির্দেশনামা দ্বারা রাজ্যের গুপ্তচর-বাহিনী পুনর্গঠন করা হয়। হাট-বাজার এবং অভিজাতদের আবাস থেকে সমস্ত ধরনের সংবাদ সংগ্রহ করে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তা সুলতানের কর্ণগোচর করার জন্য বারিদ্ মুনসি, জাসুস্ নামক অসংখ্য গুপ্তচর নিয়োগ করা হয়। *বরণী* লিখেছেন ঃ *'গুপ্তচর-ব্যবস্থার ব্যাপকতার ফলে অভিজাতগণ সর্বদা সংকুচিত ও সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতেন। এমনকি প্রকাশ্য স্থানে তাঁরা নিজেদের মধ্যে মতবিনিময়ের একান্ত প্রয়োজন হলেও মুখে না বলে আকারে-ইঙ্গিতে তা ব্যক্ত করতেন।' মোরল্যাণ্ডের* মতে, *"গুপ্তচর-ব্যবস্থার ব্যাপকতা সাম্রাজ্যের হাসিখুশিপূর্ণ প্রাণোচ্ছল জীবনধারাকে সন্দেহ ও হতাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত করেছিল। একই সঙ্গে ষড়যন্ত্রের সামান্যতম সম্ভাবনাও নষ্ট করেছিল।"*

তৃতীয় নির্দেশনামা দ্বারা দিল্লীতে মদ্যপান ও মদ প্রস্তুত করা নিষিদ্ধ করা হয়। সরকার অনুমোদিত মদ প্রস্তুতকারকদের দিল্লী থেকে বহিষ্কার করা হয়। সুলতান স্বয়ং মদ্যপান ত্যাগ করেন এবং সমস্ত মদের পিপ বদাউন গেটের কাছে ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেন। শোনা যায়, এখানে এত মদ ঢালা হয়েছিল যে, বিস্তীর্ণ এলাকা বর্ষাকালের মত কাদায় পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য মদের চোরাই আমদানী বন্ধ করার উদ্দেশ্যে এই নির্দেশ কিছুটা সংশোধিত হয়। বলা হয় যে, কোন ব্যক্তি একান্তভাবে নিজের ব্যবহারের জন্য নিজের গৃহাভ্যন্তরে আইনানুগ ভাবেই মদ প্রস্তুত করতে পারবেন। এই সংশোধনি থেকে বোঝা যায় যে, আলাউদ্দিনের এই ব্যবস্থা ধর্মীয় বা নৈতিক বোধ সঞ্জাত ছিল না, এটি ছিল রাজনৈতিক প্রয়োজনবোধের ফসল। এই আইনে জুয়াখেলা কিংবা ভাং খাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়।

চতুর্থ নির্দেশনামা দ্বারা অভিজাতদের মধ্যে অবাধ মেলামেশা. কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে আনন্দ-সভায় একত্রিত হওয়া এবং সুলতানের অনুমতি ব্যতিরেকে নিজেদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়া নিষিদ্ধ করা হয়। বস্তুত, এই ব্যবস্থার ফলে সমাজজীবন থেকে আনন্দরস সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়। *ড. ঈশ্বরীপ্রসাদ* লিখেছেন ঃ *"…. the inevitable result that the amenities of social life disappeared and the life became an intolerable burden."* তবে অভিজাতদের গোষ্ঠীচক্র গড়ে উঠার সম্ভাবনা এই নির্দেশে দূরীভূত হয়। *ড. নিজামী* লিখেছেন ঃ *"The esprit de corps, which had been the course of the Mameluk nobility, was not allowed to grow up in the nobility of Alauddin."*

○ আলাউদ্দিনের অর্থনৈতিক সংস্কার ঃ

ক. রাজস্ব নীতি ঃ আলাউদ্দিন খলজীর লক্ষ্য ছিল মোঙ্গলদের যে-কোন রকমের আক্রমণ প্রতিহত করা এবং একই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী কর্মসূচী রূপায়িত করা। বলবনের মত মোঙ্গলদের ভয়ে রাজ্যবিজয় নীতি পরিত্যাগ করার ইচ্ছা আলাউদ্দিনের ছিল না। তাঁর এই দুটি কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য আবশ্যিক ছিল একটি সুসজ্জিত ও সুবিশাল সেনাবাহিনী। সেনাবাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজন ছিল সমৃদ্ধ রাজকোষের। তাই আলাউদ্দিন সামরিক কর্মচারীর পাশাপাশি সংস্কারমূলক কর্মসূচীও রূপায়িত করার উদ্যোগ নেন। কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষে রাজকোষের আয়ের প্রধান সূত্র যে ভূমি-রাজস্ব,—এ বিষয়েও তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। আলাউদ্দিনের পূর্ববর্তী সুলতানেরা রাজস্ব-ব্যবস্থার সংস্কার বিষয়ে কোন উদ্যোগ নেননি। তাঁরা চিরাচরিত রাজস্ব-ব্যবস্থার সাথে তাল রেখেছিলেন মাত্র। কিন্তু আলাউদ্দিন রাজস্ব-ব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন আনার প্রয়োজন অনুভব করেন। কেবল রাজকোষকে সমৃদ্ধ করা নয় ; রাজনৈতিক কর্তৃত্ব, সামাজিক ন্যায়বিচার ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতেও তিনি রাজস্ব-প্রশাসনের খোলনলচে পরিবর্তনের গুরুত্ব অনুভব করেন।

ড. সাক্সেনা মনে করেন, আলাউদ্দিনের পূর্ববর্তী শাসকেরা রাজস্ব-ব্যবস্থার পরিবর্তনে অনাগ্রহী ছিলেন, কারণ এই কাজ দক্ষতার সাথে সম্পাদন করার মত যথেষ্ট গ্রামীণ কর্মচারী সরকারের ছিল না। তাই হিন্দু আমল থেকে প্রতিষ্ঠিত কৃষিনির্ভর কায়েমী গোষ্ঠীকে অব্যাহত রেখে তাঁরা যথাসম্ভব সরকারের প্রাপ্য আদায় করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু আলাউদ্দিন এই প্রথম রাজস্ব-ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটান।

আলাউদ্দিনের সিংহাসন আরোহণের সময় প্রচলিত ভূমি-ব্যবস্থা অনুসারে কৃষিযোগ্য জমিগুলি কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। সুলতানের 'খাসিয়া' জমিগুলির রাজস্ব সরাসরি রাজকোষে জমা পড়ত। দেওয়ান-ই-উজিরত-এর অধীনে আমিল, কারকুন প্রমুখ কর্মী এই রাজস্ব সংগ্রহ করত। কিছু জমি 'ইজারা' হিসেবে ইক্তাদার বা মাক্‌তি'রা ভোগ-দখল করতেন। এই জমিকে বলা হত ইক্‌তা। মাক্‌তি জমির রাজস্ব সংগ্রহ করে ইক্‌তার ব্যয় বাদ দিয়ে উদ্বৃত্ত অংশ কেন্দ্রীয় রাজকোষে পাঠাতে বাধ্য ছিলেন। তবে এই সময় ইক্‌তা প্রশাসন নানা অজুহাতে সমস্ত রাজস্বই ভোগ করত। খুৎ, মুকদ্দম, চৌধুরী নামধারী রাজস্ব সংগ্রাহকবৃন্দ ইক্‌তার রাজস্ব আদায় এবং কারচুপি কাজে জড়িত ছিল। স্বাধীন হিন্দু-রাজাদের অনেকেই সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন। এঁরা দিল্লীর আনুগত্য স্বীকার এবং নিজ নিজ ভূখণ্ড থেকে আদায়ীকৃত রাজস্বের নির্দিষ্ট অংশ সুলতানের কোষাগারে জমা দেবার শর্তে কিছু ভূমি ভোগ-দখল করতেন। এছাড়া কিছু জমি দান বা উপহার হিসেবে (মিল্‌ক, ইনাম, ওয়াকফ্‌) জ্ঞানী, বা ধার্মিক ব্যক্তিদের বরাদ্দ করা হয়েছিল। বহু সরকারি কর্মী বা অভিজাতও এরূপ জমি ভোগ-দখল করতেন।

রাজস্ব-সংস্কার কর্মসূচী হিসেবে আলাউদ্দিন এক জাওবিৎ জারি করে বিভিন্ন সরকারি কর্মী, অভিজাত বা অন্যান্যদের হাতে বরাদ্দ মিল্‌ক, ইনাম, ওয়াকফ্‌ভুক্ত সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত করে নেন। এগুলি সুলতানের খালিসা জমির অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং সরকারি সংগ্রাহকবৃন্দ মারফত সরাসরি রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। হিন্দু-মুসলমান, সরকারি-বেসরকারি নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর কাছ থেকেই এ ধরনের জমি কেড়ে নেওয়া হয়। অতঃপর আলাউদ্দিন গ্রামীণ রাজস্ব

সংগ্রাহকদের দিকে দৃষ্টি দেন। 'খুৎ' 'মুকদ্দম', 'চৌধুরী', নামধারী এই মধ্যস্বত্বভোগী গোষ্ঠী পূর্বরীতি অনুযায়ী নির্দিষ্ট গ্রাম বা গ্রাম-সমষ্টির রাজস্ব সংগ্রহ করে তা চুক্তিমত রাজকোষে জমা দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলেন।

ড. *বেনারসীপ্রসাদ সাক্সেনা* লিখেছেন ঃ *"Alauddin was the first ruler to take a step in organising a new revenue system in villages which had been subject to group assessment.' Group assessment'* শব্দটির যথার্থ প্রয়োগ মোরল্যাণ্ড করেছেন বলে ড. সাক্সেনা মনে করেন। কিন্তু মোরল্যাণ্ড হিন্দু সামন্ত-রাজা এবং খুৎ, মুকদ্দম, চৌধুরী প্রমুখের অবস্থানগত পার্থক্য নির্দিষ্ট করেননি। এ ব্যাপারে বরণীর বিবরণ আমাদের কিছুটা পরিষ্কার ধারণা দেয়। 'রায়', বা 'রনক', 'রানা' 'রাওত' ইত্যাদি নামে পরিচিত সামন্ত-রাজাদের সাথে 'খুৎ' 'মুকদ্দম' ও 'চৌধুরী' নামধারী ব্যক্তিদের মৌলিক প্রভেদ ছিল। সামন্তরা নিজ নিজ অঞ্চলের রাজস্ব সরাসরি রাজকোষে চুক্তিমত জমা দিতেন। এক্ষেত্রে চুক্তিভঙ্গ না করলে সুলতান তাদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতেন না. আলাউদ্দিনের সংস্কার-পরিকল্পনার প্রায় বাইরে ছিলেন এঁরা। অবশ্য ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত ছিল। এঁদের অধিকারের বাইরে ছিল আলাউদ্দিনের 'খালিসা' জমি। সেগুলিতে গ্রামভিত্তিক বা একাধিক গ্রামভিত্তিক রাজস্ব আদায়ের দায়িত্বে থাকতেন 'চৌধুরী', 'মুকদ্দম', প্রভৃতি গ্রাম-প্রধান বা মুখিয়া। 'খুৎ' নামের উৎপত্তি সম্ভবত 'খৎ' থেকে, যার অর্থ চুক্তি বা অঙ্গীকার। 'খুৎ' সম্ভবত সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট গ্রাম থেকে অঙ্গীকারমত রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত ছিল।

আলাউদ্দিন এই সকল গ্রামীণ রাজস্ব-সংগ্রাহকদের বিলাস-বৈভব ও অসাধুতা সম্পর্কে অবহিত হয়ে এদের কঠোরভাবে দমন করার সিদ্ধান্ত নেন। বেয়ানার কাজী মুঘিসউদ্দিনের সাথে আলোচনা প্রসঙ্গে আলাউদ্দিন জানান যে, 'খুৎ', 'মুকদ্দম' প্রমুখ মহার্ঘ পোশাক পরেন, ঘোড়ায় চড়েন, শখের শিকার খেলায় অর্থব্যয় করেন, কিন্তু নিজেদের জমি থেকে এঁরা খিরাজ, জিজিয়া, ঘরী, চরাই ইত্যাদি খাতে এক জিতল'ও রাজকোষে প্রদান করেন না। অথচ এঁরা সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট জমি থেকে যথারীতি, অনেক ক্ষেত্রে বেশি, 'খুতি' আদায় করেন এবং নিজেদের ভোগে লাগান। ফলে সাধারণ চাষী (বলাহার) শোষিত হয়, কিন্তু সরকার উপকৃত হয় না। এই অব্যবস্থা দূর করার উদ্দেশ্যে আলাউদ্দিন কয়েকটি সংশোধনমূলক আইন (জাওবিৎ) জারি করেন। এই প্রসঙ্গে বরণী 'হিন্দুদের দমনের উদ্দেশ্যে' কথাটি ব্যবহার করে বিতর্কের সৃষ্টি করেছেন। এ প্রসঙ্গে আমরা পরে আলোচনা করেছি। তবে এক্ষেত্রে বরণী 'হিন্দু' অর্থে কেবলমাত্র গ্রামীণ অভিজাতদের (খুৎ, মুকদ্দমদের) বোঝাতে চেয়েছেন বলে অধিকাংশ পণ্ডিত মনে করেন। আলাউদ্দিনের প্রথম জাওবিৎ অনুযায়ী চাষযোগ্য জমি জরিপ করে খুৎ, মুকদ্দম এবং বলহার বা সাধারণ কৃষককে একই হারে প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়। রাজস্বের হার নির্দিষ্ট করা হয় উৎপাদনের ৫০ শতাংশ অর্থাৎ রাজস্ব প্রদানের ক্ষেত্রে খুৎ এবং বলহারের মধ্যে রাজস্বের তারতম্য তুলে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় জাওবিৎ অনুযায়ী ভূমি-রাজস্ব ছাড়াও 'ঘরী' বা গৃহকর, চরাই বা পশুচারণ-কর, 'করহি' নামের একটি করের উল্লেখ পাওয়া যায়, যদিও এর অর্থ সম্পর্কে ঐতিহাসিকেরা নিঃসন্দেহ নন। *কে. এস. লালের* মতে, এটি সম্ভবত এক ধরনের বাণিজ্য-কর। আবার অধ্যাপক *হোডিভালা* (Hodivala)-র মতে, 'করহি' এবং 'ঘরাই' একই জিনিস ছিল।

'Group assessment' ব্যবস্থা এবং গ্রামীণ মধ্যস্বত্বভোগীদের অস্তিত্ব লুপ্ত করার ফলে প্রশাসন পরিচালনার জন্য একদল সুদক্ষ সরকারি রাজস্ব-কর্মীর প্রয়োজন হয়। আলাউদ্দিন এই কাজের জন্য মুহশিল (রাজস্ব-নির্ধারক), আমিল (কর-সংগ্রাহক), গোমস্তা (প্রতিনিধি), মুতাশরিফ (হিসাব-পরীক্ষক), দফতরী (অফিস-কর্মী), নভীসদাস (করণিক) প্রমুখকে নিয়োগ করেন। পাটোয়ারী বা গ্রামীণ হিসাবরক্ষকের কাছে সমস্ত দলিল-দস্তাবেজ সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়। ***বরণী*** লিখেছেন যে, পাটোয়ারী লিপিবদ্ধকরণের কাজে পারসী শব্দ ব্যবহার করতে পারতেন না। এ থেকে অনুমিত হয় যে, রাজস্ব-প্রশাসনে নিযুক্ত ব্যক্তিদের অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু।

আলাউদ্দিনের রাজস্ব-ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল জমির পরিমাপ বা জরিপ। তবে জরিপের অন্তর্ভুক্ত এলাকা সম্পর্কে বরণীর বিবরণ ভৌগোলিক দিক থেকে কিছুটা বিভ্রান্তিকর। তবে এ ব্যাপারে মোরল্যাণ্ডের বিবরণ অনেক বেশি যুক্তিগ্রাহ্য বলে ভারতীয় ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করেন। মোরল্যাণ্ডের বিবরণ থেকে জানা যায়—দিল্লী, যমুনা ও দোয়াবের সন্নিহিত অঞ্চল জরিপের আওতাভুক্ত ছিল। পূর্বদিকে অযোধ্যা ও বিহার বাদে রোহিলাখণ্ড এবং পশ্চিমদিকে মালব এবং রাজপুতানা জরিপ করা হয়েছিল। তবে গুজরাট এর বাইরে ছিল। পশ্চিমে মুলতান ছাড়া সমগ্র পাঞ্জাব জরিপের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সমগ্র রাজ্য জরিপের অন্তর্ভুক্ত করতে না-পারলেও জমির পরিমাপের ভিত্তিতে রাজস্ব-নির্ধারণের রীতি প্রবর্তন করে আলাউদ্দিন রাজস্ব-ব্যবস্থাকে বিজ্ঞানসম্মত রূপ দেন। অধ্যাপক ***সতীশচন্দ্র, কে. এস. লাল*** প্রমুখ মনে করেন, আলাউদ্দিন খলজীই সর্বপ্রথম জমি জরিপেব রীতি প্রবর্তন করেন। ***ড. লাল.*** লিখেছেন ঃ *"Measurement of land was unknown before Alauddin's time and that the reform was original"* অবশ্য ***ড. ইউ. এন. ঘোষাল***-এর মতে, প্রাচীন ভারতে জমি জরিপ করে রাজস্ব নির্ধারণের রীতি ছিল। তবে মুসলমানদের আগমনের পূর্বে কিছুকাল এবং সুলতানি প্রতিষ্ঠিত হবার পরে কিছুকাল রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে এই ব্যবস্থা মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিল। একথা সত্য হলেও বলা চলে যে, আলাউদ্দিন একটা বিস্মৃতপ্রায় অথচ যুক্তিবাদী ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন দ্বারা প্রশাসনকে ন্যায়সঙ্গত রূপ দিতে পেরেছিলেন।

আলাউদ্দিন রাজস্ব আদায়ের কাজে নিয়োজিত কর্মীদের অসাধুতা বা বেয়াদপি বন্ধ করার বিষয়েও যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। এ কাজে তাঁর প্রধান সহায়ক ছিলেন 'নায়েব-উজীর' শরাফ কইনি। সুলতানের নির্দেশে গোমস্তা, মুতাশরিফ, মুহশিল প্রভৃতি রাজস্ব-কর্মচারীর উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখার জন্য ' দেওয়ান-ই-মুস্তাকরাজ' নামে একটি স্বতন্ত্র দফতর খোলা হয়। কোন কর্মচারী তার কাজে ফাঁকি দিলে কিংবা সংগৃহীত অর্থ রাজকোষে জমা না দিয়ে পুরোপুরি বা আংশিক আত্মসাৎ-এর চেষ্টা করলে তাদের উপর কঠোর শাস্তি নেমে আসত। বেত্রাঘাত, শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা, মুচলেকা নেওয়া ইত্যাদি নানারকম শাস্তি দেওয়া হত। পাটোয়ারীর মাধ্যমে মুস্তাকরাজ দপ্তর যেভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব সংগ্রহ করত, তাতে কারো ফাঁকি দেওয়া ছিল অসম্ভব। তাই ড. ***ত্রিপাঠী*** (R.P. Tripathy) লিখেছেন ঃ *"Alauddin was apparently the first muslim ruler whose hands reached as far as patwaris who were the best source of information in all matters pertaining to the land and its revenue."*

আলাউদ্দিনের রাজস্ব-ব্যবস্থার সংস্কারের ফলে গ্রামীণ মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণী অর্থাৎ খুৎ, মুকদ্দম চৌধুরী ইত্যাদির আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত করুণ হয়ে উঠেছিল। *বরণী* লিখেছেন : *'তাদের বশ্যতা এত চরমে উঠেছিল যে, শহরের রাজস্ব-দপ্তরের একজন চাপরাশী (footman) কুড়িজন খুৎ, মুকদ্দম এবং চৌধুরীর গলা একত্রে বেঁধে রাজস্ব আদায়ের জন্য বেত্রাঘাত ও পদাঘাত* করতে পারত।' *বরণী* আরো লিখেছেন : *'রাজস্ব-সংস্কার হিন্দুদের কপর্দকশূন্য করে ছেড়ে দেয়। অর্থাভাবের দরুন খুৎ ও মুকদ্দমদের পত্নীরা মুসলমানদের ঘরে দাসীবৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।'* প্রায় একই রকম করুণ অবস্থা হয় নবনিযুক্ত রাজস্ব আদায়কারী অসৎ কর্মচারীদের। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, রাজস্ব-সংগ্রাহকদের কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় বন্দী অবস্থায় নিপীড়নের মধ্যে কাটাতে হত এবং কোন পিতা নিজ কন্যার সাথে এদের বিবাহ দিতে রাজী হতেন না।

আলাউদ্দিনের রাজস্ব-নীতি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে *ড. ইরফান হাবিব* লিখেছেন যে, *'আলাউদ্দিন রাজস্ব-সংস্কারের মাধ্যমে সক্রিয়ভাবে গ্রামীণ দুই শ্রেণীর সংঘাতে সবলের বিরুদ্ধে দুর্বলের রক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন।' ("Alauddin consciously utilized the conflict between the two rural 'classes' by standing forth as the protector of the 'weak' against the 'strong.")* অর্থাৎ খুৎ, মুকদ্দম প্রমুখের শোষণ থেকে আলাউদ্দিন সাধারণ কৃষক বা বলহারদের রক্ষা করেন। সাধারণ কৃষকদের গ্রাসাচ্ছাদনের প্রতি আলাউদ্দিনের সহানুভূতিসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় বরণীর একটি বিবরণে। আলাউদ্দিন একটি নির্দেশে বলেছেন যে, রাজস্ব এমনভাবে আদায় করতে হবে যাতে কৃষকদের খাদ্যশস্য, দুধ, দই ইত্যাদির অভাব না হয়, আবার তাদের হাতে যেন অতিরিক্ত সম্পদ সঞ্চিত না হয়। *ড. সাক্সেনার* মতে, আলাউদ্দিনের বাস্তব দর্শন অনুসারে দুর্ভিক্ষ বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব রাষ্ট্র বহন করত। কারণ দৈনিক খাদ্য-পানীয়ের অতিরিক্ত সঞ্চয় চাষীদের হাতে থাকত না, যা দিয়ে আপৎকালীন অবস্থা তারা সামাল দিতে সক্ষম। তথাপি ইতিপূর্বে কখনোই মোট উৎপাদনের ২৫ থেকে ৩০ শতাংশের বেশি রাজস্ব হিসেবে আদায় করা হত না। কিন্তু আলাউদ্দিন কলমের খোঁচায় এই হার বাড়িয়ে ৫০ শতাংশ করে দেন। এই বৃদ্ধিকে কখনোই সুস্থ অর্থনৈতিক চিন্তাপ্রসূত সিদ্ধান্ত বলা যায় না।

আলাউদ্দিনের রাজস্ব-নীতির সাথে তাঁর হিন্দু-নীতির প্রশ্নটি সম্পর্কিত। হিন্দুদের প্রতি আলাউদ্দিনের দৃষ্টিভঙ্গি এবং আচরণের বিষয়টি বিতর্কিত। ঐতিহাসিকেরা এ প্রসঙ্গে একাধিক এবং পরস্পরবিরোধী মতপ্রকাশ করেছেন। *ড. ইউ. এন. দে* মনে করেন, হিন্দুদের প্রতি আলাউদ্দিনের আচরণ কোনভাবেই কঠোর বা অমর্যাদাকর ছিল না। *ড. আর. পি. ত্রিপাঠীর* মতে, আলাউদ্দিন মুসলমানদের যেমন বিশেষ সুযোগ দেননি, তেমনি হিন্দুদেরও বিশেষ সুযোগ দিতে অস্বীকার করেছেন। পক্ষান্তরে *ড. কে. এস. লাল* মনে করেন, হিন্দুদের সম্পর্কে আলাউদ্দিনের গৃহীত ব্যবস্থাদি সত্যই ছিল নিপীড়নমূলক। *এলিয়ট* ও *ডাউসন* লিখেছেন, হিন্দু ও মুসলমানদের প্রতি আলাউদ্দিন সম-আচরণ করেননি। মুসলমানদের প্রতিও তিনি কঠোর ছিলেন, কিন্তু তাদের হিন্দুদের মত ভিক্ষুকের শ্রেণীতে নামিয়ে আনেননি।

এই বিতর্কিত বিষয় আলোকপাত করার কাজে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল জিয়াউদ্দিন

বরণীর বিবরণ, বেয়ানার কাজী মুঘিসউদ্দিনের সাথে আলাউদ্দিনের কথোপকথন এবং মোরল্যাণ্ডের বিশ্লেষণ: মোরল্যাণ্ড এবং বরণীর বিবরণ থেকে একথা স্পষ্ট হয়েছে যে, চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী 'খুৎ', 'মুকদ্দম', 'চৌধুরী' প্রমুখ প্রতিনিধি গ্রামভিত্তিক বা গ্রামের সমষ্টিভিত্তিক রাজস্ব সংগ্রহ করে চুক্তিমত রাজকোষে জমা দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলেন। কিন্তু এঁরা কৃষকদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করলেও তা রাজকোষে জমা না দিয়ে নিজেরা আত্মসাৎ করতেন। এই মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর অর্থবল তাদের মধ্যে বিদ্রোহ-প্রবণতার জন্ম দিত। এই বিপত্তিকর দিক সম্পর্কে সচেতন হয়ে আলাউদ্দিন এদের সম্পর্কে কি শাস্তিমূলক ব্যবহার করা যায়, সে সম্পর্কে আইনবিদ্‌দের সঙ্গে পরামর্শ করেন। *মোরল্যাণ্ড* লিখেছেন : *"Alauddin demanded from learned man rules and regulations, so that the Hindu should be ground down, and property and possessions, which are the causes of disaffection and rebellion, should not remain in his house."* এখানে 'হিন্দু' শব্দটি বিপত্তি ও বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। কারণ আলাউদ্দিন কেবল 'হিন্দু'দের দমন করার পথ অনুসন্ধানের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, অন্যের নয়। এই সন্দেহ তীব্রতর হয় মুঘিসউদ্দিনের উক্তি থেকে। তিনি আলাউদ্দিনকে নাকি বলেছিলেন যে, *'পবিত্র কোরানে হিন্দু-বিধর্মীদের জন্য কঠোরতর শাস্তির বিধান দেওয়া হয়েছে। একজন হিন্দুর মুখে রাজস্ব-সংগ্রাহক যদি থুথু ছিটিয়ে দিতে চায়, তাহলে বিনা প্রতিবাদে মুখ খুলে তার গ্রহণ করা উচিত।'* অবশ্য কাজীর এই উক্তি কতটা সত্য এবং কতটা বরণীর বানানো-তা বলা বেশ কঠিন। বরণী নিজে ছিলেন গোঁড়া। তিনি মনে করতেন, পৌত্তলিকদের ধ্বংস না করলে ইসলামের মহিমা প্রচার করা সম্ভব হবে না। তাই ***P. Hardy*** মনে করেন, বরণী নিজের মতটাকে মুঘিসউদ্দিনের মুখ দিয়ে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। প্রসঙ্গটি তর্কসাপেক্ষ। কিন্তু আলাউদ্দিনের 'রাজতন্ত্রের আদর্শ' অনুসরণ করে বলা যায় যে, নিছক ধর্মীয় সংকীর্ণতা থেকে তিনি হিন্দুদের দুর্বল করতে চাননি। ***ড. নিজামী*** ও ***মহম্মদ হাবিব*** মনে করেন যে, আলাউদ্দিন ছিলেন বাস্তববোধসম্পন্ন রাজনীতিবিদ্। অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি বুঝেছিলেন যে, একটি হিন্দুপ্রধান দেশের তিনি একজন মুসলমান শাসক। তাই হিন্দুদের কাছে গ্রহণযোগ্য শাসনব্যবস্থাই তাঁর রাজত্বকে স্থায়িত্ব দিতে পারে। সমকালীন লেখক আমীর খসরুর বিবরণ থেকে জানা যায় যে, আলাউদ্দিনের প্রতি আনুগত্য-প্রদর্শনকারী হিন্দুরাজাদের প্রতি সুলতান অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহারই করতেন। হিন্দু রীতি-নীতির প্রতিও আলাউদ্দিনের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। তাই হিন্দু রাজা (রায়, রনক, সামন্ত ইত্যাদি)-দের ঐতিহ্যগত অধিকার ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেই আলাউদ্দিন তাঁর রাষ্ট্রনীতি প্রবর্তন করেছিলেন। বরণীর হতাশাব্যঞ্জক কিছু উক্তি থেকেও এই ধারণা সমর্থিত হয়। তিনি লিখেছেন : *'অবিশ্বাসীদের ছুঁড়ে ফেলা এবং পৌত্তলিকদের ধ্বংস করার ইচ্ছা ভারতের মুসলমান শাসকদের হৃদয়ে স্থান পায়নি। পক্ষান্তরে 'জিজিয়া' প্রদানের শর্তে এইসব সংরক্ষিত (জিম্মী) মানুষ শাসকদের সাহায্য ও সহানুভূতি অর্জন করেছে, সমৃদ্ধিশালী হয়েছে, প্রতিষ্ঠা পেয়েছে উচ্চ রাজপদে—"।*

ড. ত্রিপাঠী, ড. লাল প্রমুখ মনে করেন, হিন্দুদের প্রতি আলাউদ্দিনের নীতি নিছক ধর্মীয় সংকীর্ণতা দ্বারা সৃষ্ট ছিল না। এর পশ্চাতে ছিল মূলত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনবোধ। রাজকোষে প্রয়োজন ছিল অর্থের এবং এই কাজের দায়িত্বে ছিল যে খুৎ, মুকদ্দম, চৌধুরীরা,

ঘটনাচক্রে তারা ছিল হিন্দু। তাই এই মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীকে শায়েস্তা করার প্রসঙ্গে হিন্দুদের শায়েস্তা করার প্রসঙ্গটি জড়িয়ে পড়েছে। সম্ভবত, সত্যের অনেকটা কাছাকাছি পৌঁছাতে পেরেছেন স্যার *উলসী হেগ*। তিনি লিখেছেন ঃ *"Alauddin framed a special code of laws against Hindus, who were obnoxious to him, partly by reason of their faith, partly by the reason of the wealth which many of them enjoyed and partly by reason of their turbulance especially in the Doab?"* আলাউদ্দিন হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে একই দৃষ্টিতে দেখতেন, একথা যেমন সত্য নয় ; তেমনি এও সত্য নয় যে, তিনি কেবল হিন্দুদের জব্দ করার জন্যই তাঁর রাজস্ব-নীতি প্রবর্তন করেছিলেন। প্রাচীনকাল থেকেই রাজস্ব-প্রশাসনে হিন্দুদের একচেটিয়া প্রাধান্য ছিল। তাই রাজস্ব-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করার কারণে মূলত হিন্দুরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

খ. বাজার-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ঃ আলাউদ্দিন খলজীর বিভিন্ন সংস্কার-কর্মসূচীর মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং সুদূরপ্রসারী একটি পরিকল্পনা ছিল বাজার-নিয়ন্ত্রণ বা মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। জিয়াউদ্দিন বরণীর 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী' এবং 'ফুতুহ-ই-জাহান্দারী' গ্রন্থদ্বয় থেকে এই ব্যবস্থার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। সমকালীন লেখক আমীর খসরুর 'খাজাইন-উল্-ফুতুহ' গ্রন্থও এ ব্যাপারে আমাদের বিশেষভাবে সাহায্য করে। সুফীসন্ত নাসিরুদ্দিন চিরাগের 'খয়ের-উল্-মজলিস্' এবং ফেরিস্তার বিবরণীতেও এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা পাওয়া যায়। তবে বরণীর বিবরণই এক্ষেত্রে আমাদের প্রধান উপাদান হিসেবে সাহায্য করে।

বরণী লিখেছেন যে, চিতোর অভিযানের সময় (১৩০৩ খ্রীঃ) তার্ঘীর নেতৃত্বে মোঙ্গলদের আক্রমণ দিল্লী-সুলতানি তথা আলাউদ্দিনের সামনে যে অস্তিত্বের সংকট খাড়া করেছিল, তাতে আলাউদ্দিন নিজের কর্তব্য-কর্ম সম্পর্কে নতুন করে চিন্তা শুরু করেন। এই বিপর্যয় আলাউদ্দিনকে অবাস্তব স্বপ্নের স্বর্গ থেকে বাস্তবের মাটিতে নামিয়ে আনে। সুলতান এই মুহূর্তে নতুন নতুন রাজ্যজয়ের পরিবর্তে দিল্লীর নিরাপত্তা-ব্যবস্থা সুদৃঢ়করণের কাজে হাত দেন। এই কর্মসূচীর অন্যতম বিষয় ছিল ন্যায্য মূল্যের বাজার প্রতিষ্ঠা করা এবং সরকার নির্ধারিত মূল্যে নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ। এই উদ্দেশ্যে আলাউদ্দিন দিল্লীতে কয়েকটি ন্যায্য মূল্যের বাজার প্রতিষ্ঠা করেন, যেমন—মাণ্ডি বা শস্যবাজার, সেরা-ই আদল বা ফল, বস্ত্র-বাজার, পশু ও দাস-বাজার, অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার ইত্যাদি। এই সকল বাজারে দ্রব্যাদি সরবরাহ, বাজারের পরিচালনা, বিনিময় মূল্য নির্ধারণ প্রভৃতির জন্য সুলতান একাধিক নির্দেশনা (জাওবিৎ) জারি করেন।

'মাণ্ডি' ছিল প্রধান শস্য-বাজার। মূল মাণ্ডি বাজারের পাশাপাশি দিল্লী নগরীর বিভিন্ন মহল্লায় এই ধরনের ছোট ছোট একাধিক বাজার প্রতিষ্ঠা করা হয়। এক নির্দেশনামা দ্বারা এই সকল বাজারে খাদ্যশস্যের বিনিময়-মূল্য নির্দিষ্ট করা হয়। যেমন— প্রতি মণ গম ৭ $^{১}/_{২}$ জিতল, বার্লি ৪ জিতল, চাউল (শালী) ৫ জিতল, ডাল ৫ জিতল ইত্যাদি। কিসের ভিত্তিতে খাদ্যশস্যের মূল্য নির্ধারিত হয়েছিল—এ বিষয়ে সুনিশ্চিত বলা যায় না। এ বিষয়ে বরণী তাঁর উভয় গ্রন্থেই উল্লেখ করেছেন যে, আলাউদ্দিন স্বয়ং উৎপাদন-ব্যয়ের ভিত্তিতে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করতেন। খাদ্যশস্য ছাড়া অন্যান্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের মুনাফা এবং দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকদের

মজুরির বিষয়টিও বিবেচনা করা হত। আলাউদ্দিনের জীবিতাবস্থায় কোন পরিস্থিতিতেই উপরিলিখিত মূল্যমানের সামান্যতম বৃদ্ধি ঘটেনি। অধ্যাপক *বেনারসীপ্রসাদ সাক্সেনা* লিখেছেন : *"শস্য-বাজারের এরূপ স্থির মূল্যমান ছিল, যা সে যুগের এক বিস্ময়কর ঘটনা।"*

অতঃপর শস্য-বাজার পরিচালনা, শস্য-সরবরাহ, অন্যায় লেনদেন বন্ধ করা, পরিবহণ সুনিশ্চিত করা ইত্যাদির জন্য একাধিক নির্দেশনামা জারি করা হয়। শস্য-বাজারের প্রধান নিয়ন্ত্রক বা 'শাহানা-ই মাণ্ডি' হিসেবে আলাউদ্দিনের বিশ্বস্ত ও দক্ষ কর্মচারী মালিক কাবুল (উলুখ ঘানী)-কে নিয়োগ করা হয়। পদামর্যাদা অনুযায়ী তাঁকে 'ইক্তা' প্রদান করা হয় এবং তাঁর পছন্দমত একজন সহকারী নিয়োগ করার ব্যবস্থা রাখা হয়। বাজারের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং অসৎ ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য 'সাহানা'-র অধীনে অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য রাখা হয়। আলাউদ্দিন মাণ্ডির খবরাখবর নিয়মিত সংগ্রহের জন্য 'বারিদ' ও 'মুনশি' নামক গুপ্তচর নিয়োগ করেন।

শস্য-সংগ্রহের বিষয়ে জারি-করা নির্দেশনামায় বলা হয়, দোয়াব অঞ্চলের সমগ্র খালিসা জমির 'খিরাজ' দিল্লীর সরকারি গুদামে জমা করতে হবে। ঝইন অঞ্চলে সুলতানের প্রাপ্য রাজস্ব অবশ্যই শস্য দিয়ে মেটানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। সংগৃহীত শস্য প্রথমে ঝইনে জমা করা হত এবং পরে সবটাই দিল্লীতে পাঠানো হত। এই ব্যবস্থার ফলে দিল্লীর প্রতিটি মহল্লায় দু'-তিনটি বাড়ি সুলতানের শস্যে সর্বদা পরিপূর্ণ থাকত। চতুর্থ নির্দেশনামায় শস্য-সরবরাহকারী বণিকগোষ্ঠী 'নায়েক'দের ন্যায্য মূল্যে এবং নিয়মিত দিল্লীর বাজারে শস্য সরবরাহের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়। সরকার-নির্দিষ্ট শস্য সরবরাহ সম্পূর্ণ না-করা পর্যন্ত এদের গলায় এক ধরনের 'চাকতি' ঝুলিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। কৃতকর্মের জন্য এদের পরিবার-পরিজনকে জামিন রাখা হয়। নির্দেশে আরো বলা হয় যে, এরা শস্য সরবরাহের ক্ষেত্রে 'যৌথ দায়িত্ব' পালনে বাধ্য থাকবে। বেআইনী মুনাফা অর্জন বন্ধ করা এবং খাদ্যশস্য সরবরাহ অব্যাহত রাখার ব্যাপারে সরকারি প্রতিনিধি, অফিসার ও অন্যান্য কর্মচারীদের দায়িত্ব সম্পর্কে দুটি নির্দেশনামা জারি করা হয়। দোয়াব অঞ্চলে রাজস্ব-আদায়কারী সমস্ত সরকারি কর্মী ও প্রতিনিধিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে হত যে, তারা নিজ নিজ অঞ্চলে অন্যায় মুনাফা অর্জনের (Regrating বা ইহতিকার) যে-কোন প্রচেষ্টা কঠোর হাতে দমন করবেন। এ ধরনের কোন কাজ সংগঠিত হলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে জবাবদিহি করতে হবে। উক্ত শস্যাদি বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। অপর নির্দেশনামা অনুসারে দেশের শাসন ও রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীদের লিখিত অঙ্গীকার করতে হত যে, তারা নিজ নিজ এলাকার চাষীরা যাতে শস্য ঝাড়াই করার সঙ্গে সঙ্গে মাঠ থেকেই নগদ মূল্যে বণিকদের কাছে বিক্রি করে দেয়, সেদিকে কড়া নজর রাখবে। এরূপ ব্যবস্থা হলে কৃষকেরা বাড়িতে শস্য লুকিয়ে রেখে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের সুযোগ পাবে না। অবশ্য উৎপাদকরা ইচ্ছা করলে স্থানীয় বণিকের পরিবর্তে নিকটবর্তী বাজারে গিয়ে ন্যায্য মূল্যে শস্য বিক্রয় করতে পারত। *ফেরিস্তার* মতে, কেবল দিল্লীর বাজারে নয়, যে-কোন স্থানীয় বাজারে শস্য বিক্রয় করা যেত। স্থানীয় রাজস্ব-কর্মীরা যাতে নির্দিষ্ট মূল্যের কমে শস্য দিতে উৎপাদকদের বাধ্য করতে না পারে, সম্ভবত, সেই কারণে স্থানীয় বাজারে শস্যবিক্রয়ের বিকল্প অধিকার দেওয়া হয়েছিল। মাণ্ডির সমস্ত খবর সুলতান তিনটি সূত্র থেকে

সংগ্রহ করতেন। এরা হলো, মাণ্ডির প্রধান, সুলতানের গোয়েন্দা অফিসার (বারিদ) এবং বিশ্বস্ত গুপ্তচরবাহিনী (মুনহি)। জনসাধারণ বা ব্যবসায়ীরা কোনভাবেই সরকারি নির্দেশ অমান্য করার দুঃসাহস দেখাত না। ফলে ন্যায্য মূল্যে প্রচুর খাদ্যশস্য সর্বদা দিল্লীর বাজারে পাওয়া যেত।

আলাউদ্দিনের রাজত্বকালে দিল্লীতে কখনোই দুর্ভিক্ষ হয়নি। কারণ— (১) সরকারি গুদামে খাদ্যশস্যের যথেষ্ট মজুত এবং (২) খরা বা দুর্ভিক্ষের পূর্বাভাস পাওয়ামাত্রই সরকারি ভাণ্ডার থেকে 'রেশনিং' ব্যবস্থানুযায়ী সমস্ত শ্রেণীর মানুষকে খাদ্যশস্য সরবরাহের ব্যবস্থা। খাদ্যাভাবে কারও অপমৃত্যু ঘটলে শাহানাকে জবাবদিহি করতে ও শাস্তিভোগ করতে হত।

'সেরা-ই-আদল' বা ন্যায়-ভবন ছিল বস্ত্র, চিনি, ঘি, মাখন, শুকনো ফল, জ্বালানী তেল ইত্যাদির বাজার। সুলতানের নির্দেশে বদাউন গেটের পাশে 'সবুজ প্রাসাদের' সংলগ্ন মাঠে এই বাজার গড়ে তোলা হয়। সুলতানি বণিক ও অন্যান্য ব্যবসায়ীদের উপর নির্দেশনামা জারি করে বলা হয় যে, তারা প্রত্যেকে ব্যক্তিগত বা সরকার প্রদত্ত অর্থে ক্রীত সমস্ত দ্রব্যাদি নিজগৃহ বা অন্য কোন বাজারে না নিয়ে সরকারি 'সেরা-ই-আদল' বাজারে আনবে। এই আইন লঙ্ঘন করলে কিংবা ১/২ জিতল বেশি দামেও কোন জিনিস বিক্রি করলে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীর সমস্ত মাল বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। ***ফেরিস্তা*** লিখেছেন ঃ *"If any one open his packages elsewhere, his joints were to be 'opened' with the swords."* এক্ষেত্রেও সুলতান বিভিন্ন বস্ত্র ও দ্রব্যাদির দাম নির্দিষ্ট করে তালিকা বাজারে টাঙিয়ে দেন। দিল্লী বা দিল্লীর বাইরের হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত বণিককে বাণিজ্য-মন্ত্রক বা 'দিওয়ান-ই-রিয়াসত্'-এর দপ্তরে নাম নথিভুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। দ্রব্য আমদানিকারী বণিকদের অঙ্গীকার করতে হত যে, তারা নিয়মিত এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্যাদি 'সেরা-ই-আদলে' আমদানি কববে এবং নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয় করবে। এইসব 'মিজানী সওদাগর' এত মাল আমদানি করে যে 'সেরা-ই-আদল' বাজার সর্বদা ভরপুর থাকে।

বস্ত্র আমদানির কারবারে মুল ভূমিকা ছিল মুলতানি হিন্দু বণিকদের। উন্নতমানের বস্ত্র ও পোশাক সংগ্রহ করা ছিল চরম প্রতিযোগিতামূলক এবং সর্বদা সরকার নির্ধারিত মূল্যে তা বিক্রি করা সম্ভব হত না। তাই আলাউদ্দিন এক নির্দেশনামা দ্বারা 'মিজানী সওদাগরদের' ২০ লক্ষ টঙ্কা অনুদান দেবার ব্যবস্থা করেন, যাতে মুলতানি বণিকরা দেশের সমস্ত প্রান্ত থেকে উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি 'সেরা-ই-আদলে' এনে নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রি করতে পারে। অতি মূল্যবান দ্রব্যাদি যাতে সাধারণ মানুষ বেশি দামে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রয় করতে না পারে সেজন্য সুলতান একজন বিশেষ অফিসার (পরোয়ানা রায়) নিয়োগ করেন। এই অফিসার ক্রেতার মর্যাদা ও অর্থবলের বিচারে এই জাতীয় মহার্ঘ বস্ত্র ক্রয়ের অনুমতি দিতেন। সাধারণত আমীর, মালিক ও অন্যান্য অভিজাতদের এই অনুমতি দেওয়া হত।

মাণ্ডি এবং 'সেরা-ই-আদল' ছাড়া আরো দু'ধরনের নিয়ন্ত্রিত বাজার আলাউদ্দিন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। একটি হলো ঘোড়া, গোরু, মহিষ ইত্যাদি পশু ও ক্রীতদাসদের বাজার এবং অন্যটি হলো নিত্য-ব্যবহার্য অন্যান্য জিনিসপত্রের বাজার। ঘোড়ার মূল্য-নিয়ন্ত্রণ সুলতানের পক্ষে বিশেষ জরুরী ছিল, কারণ ন্যায্যমূল্যে উন্নতমানের ঘোড়া সংগ্রহ করতে না পারলে সেনাবাহিনীর দক্ষতা হ্রাস পাবে। প্রচলিত নিয়মানুযায়ী একজন ব্যক্তি নিজের অর্থে ঘোড়া ক্রয় করে তাকে প্রশিক্ষণ

দেবার পর 'মামালিক-ই-আর্জ'-এর দপ্তরে হাজির করত। এই দপ্তর ঘোড়া পরীক্ষার পর মূল্য স্থির করে ঐ ব্যক্তিকে তা প্রদান করত। এই সকল অশ্বসংগ্রাহক মূলধনের অভাবে মহাজন ও দালালদের খপ্পরে পড়ত এবং অতিরিক্ত মূল্যে ঘোড়া ক্রয় করতে বাধ্য হত। তাই আলাউদ্দিন প্রথমে ঘোড়ার মূল্য বেঁধে দেন। উৎকৃষ্ট ঘোড়ার মূল্য স্থির হয় ১০০ থেকে ১২০ টঙ্কা। মধ্যম ও নিকৃষ্ট ঘোড়া যথাক্রমে ৮০-৯০ টঙ্কা এবং ৬০-৭০ টঙ্কার মধ্যে বেঁধে দেওয়া হয়। ভারতীয় টাট্টু ঘোড়ার দাম হয় ১০ থেকে ২৫ টঙ্কা। অপর নির্দেশনামায় সমস্ত দালাল ও মহাজনদের পশু-বাজারে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। অসৎ ঘোড়া-ব্যবসায়ীদের অনেককে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হয়। ফেরিস্তার মতে, অশ্ব-ব্যবসায়ীদের প্রতি এই কঠোর নির্দেশ ছিল সাময়িক। মূল্যের স্থিতাবস্থা আসার পর এই কঠোরতা হ্রাস করা হয়েছিল। দাস-বাজার এবং গবাদি পশুর বাজারের ক্ষেত্রেও কঠোরতা ছিল, তবে কম। গুণমানের ভিত্তিতে দাস ও পশুর সরকার-নির্ধারিত দাম উল্লেখ করে এইসব বাজারে ঝোলানো থাকত। মূল্য-তালিকা অনুসরণ করা ছিল বাধ্যতামূলক।

আলাউদ্দিনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাঁর বাজার-নিয়ন্ত্রণ বা মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার ফলে নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম খুব কমে গিয়েছিল। ফেরিস্তা এবং নাসিরুদ্দিন চিরাগ দিল্লীর জনগণের স্বাচ্ছন্দ্যের বর্ণনা দিয়েছেন নানাভাবে। কিন্তু আলাউদ্দিন আকস্মিক অর্থব্যবস্থা নিয়ে ব্যস্ত হলেন কেন? নিশ্চয়ই এর পিছনে তাঁর একান্ত কোন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য ছিল। কিন্তু কি সেই উদ্দেশ্য? ইতিহাসবিদ্‌গণ এ বিষয়ে ব্যাপক বিশ্লেষণ করেছেন ;—যদিও কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেননি। 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী' গ্রন্থে ***বরণী*** লিখেছেন যে, মোঙ্গল আক্রমণের বিরুদ্ধে একটি বিশাল ও শক্তিশালী সেনাবাহিনী গড়ার উদ্দেশ্যে আলাউদ্দিন বাজার-নিয়ন্ত্রণ নীতি কার্যকর করেছিলেন। এই সেনাবাহিনী কেবল সংখ্যায় বিশাল হবে না, কার্যদক্ষতা ও আনুগত্যের দিক থেকেও হবে সর্বশ্রেষ্ঠ। ***বরণীর*** মতে, সেনাবাহিনীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি আলাউদ্দিনের পিতৃসুলভ দৃষ্টি ছিল। কারণ সাম্রাজ্যবাদী একজন শাসক হিসেবে তিনি জানতেন যে, এই বাহিনীর আনুগত্য, সেবা ও দক্ষতার উপরেই তাঁর কর্তৃত্ব ও সাম্রাজ্য দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু সমস্যা হলো রাজকোষের উপর বিরাট চাপ সৃষ্টি না করে বিশাল সেনাবাহিনী গঠন কিভাবে সম্ভব! নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ঘন ঘন মূল্যবৃদ্ধি সেনাবাহিনীর বেতন বৃদ্ধির দাবিকেও জোরদার করবে। এবং সেক্ষেত্রে রাজকোষের ক্ষমতা কয়েক বছরের মধ্যেই ভেঙে পড়বে। এমতাবস্থায় আলাউদ্দিন তাঁর পরামর্শদাতাদের সাথে আলোচনা করে স্থির করেন যে তিনি সেনাবাহিনীর বার্ষিক বেতন স্থায়িভাবে বেঁধে দেবেন। ফলে রাজকোষের উপর অকারণ চাপ পড়বে না। অন্যদিকে নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সর্বোচ্চ মূল্য এমনভাবে এমনহারে নির্দিষ্ট করা হবে যাতে নির্দিষ্ট বেতনভোগী সৈন্যদের সুখী ও সুস্থভাবে জীবনধারণ অসম্ভব না হয়। অতঃপর তিনি একজন পদাতিক সৈন্যের বার্ষিক বেতন ৭৮ টঙ্কা স্থির করেন। একজন অশ্বারোহী সৈনিক বার্ষিক ১৫৬ টঙ্কা পাবেন বলে স্থির হয়। যদি কোন সৈনিক সরকার প্রদত্ত ঘোড়ার অতিরিক্ত ঘোড়া রাখেন তাহলে তিনি অতিরিক্ত ৭৮ টঙ্কা পাবেন। অর্থাৎ একজন অশ্বারোহী সৈনিকের পক্ষে বার্ষিক ২৩৫ টঙ্কা বেতন পাওয়ার সুযোগ রাখা হয়। জিয়াউদ্দিন বরণীর এই যুক্তি আধুনিক গবেষকদের অনেকেই সত্য বলে মনে করেন। ড. ***পি. শরণও*** মনে করনে, সীমিত বেতনে সৈন্যদের স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে আলাউদ্দিন মূল্য-নিয়ন্ত্রণ

আরোপ করেছিলেন। তিনি লিখেছেন ঃ *"The problem of maintaining the huge army in a good state of equipment and efficiency with limited resources..... was the sole motive which prompted control of prices of all necessities of life....."* ***ড. কে. এস. লাল***ও ড. শরণের মন্তব্যকে সমর্থন করেন। তিনি লিখেছেন ঃ *"আলাউদ্দিনের সীমাহীন রাজ্যজয়ের আকাঙক্ষা এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপথে মোঙ্গলদের উপর্যুপরি আক্রমণ তাঁকে যে বিশাল সেনাবাহিনী গঠনে বাধ্য করেছিল, তাদের ক্রমবর্ধমান বেতন মেটানো রাজকোষের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। দেবগিরির বিপুল সম্পদ কিংবা ৫০ শতাংশ রাজস্ব আরোপ করেও এই বিশাল ব্যয় মেটানো কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। তাই তিনি সৈন্যদের বেতন স্থির রেখে এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যহ্রাস করে সমস্যা মেটাতে উদ্যোগী হন।"* ***ড. লাল*** লিখেছেন ঃ *"It was simple arithmetical calculation and simple economic principle ; since he had decided to reduce and fix the salary of soldiers, he also decided to reduce and fix the price of things of common use."* কিন্তু লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, যে বিচারে তৎকালীন একজন সৈন্যের বেতনকে সামান্য বলা হচ্ছে তা যথার্থ নয়। কারণ সম্রাট আকবরের সময়, যখন দ্রব্যমূলের আনুপাতিক হার ছিল ১ ঃ ২, তখন একজন অশ্বারোহী সেনার মাসিক বেতন ছিল ২০ টঙ্কা, অর্থাৎ বার্ষিক ২০ x ১২ = ২৪০ টঙ্কা। শাহজাহানের সময় এই বেতন ছিল বার্ষিক ২০০ টঙ্কা। স্বভাবতই আলাউদ্দিনের আমলে দুই ঘোড়ার অধিকারী একজন সৈনিক ১৫৬ + ৭৮ = ২৩৪ টঙ্কা বেতনকে জীবনধারণের পক্ষে অল্প বলা চলে না। অবশ্য সতীশচন্দ্রের মতে, চতুর্দশ শতকে একজন তুর্কী অশ্বারোহী সৈনিক প্রাচুর্যের সাথে জীবনযাপনে ইচ্ছুক ছিল, সে বিচারে আলাউদ্দিনের আমলে নির্দিষ্ট বেতনকে কম বলা চলে।

বরণী তাঁর 'ফুতুহ-ই-জাহান্দারী' গ্রন্থে 'মূল্যনিয়ন্ত্রণ-বিষয়ক উপদেশ' অংশে উল্লেখ করেছেন যে, *'সৈন্যবাহিনী রাজকোষ থেকে প্রদেয় বেতনের উপর নির্ভরশীল ; বেতনের অর্থমূল্য নির্ভরশীল দ্রব্যের মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উপর। তেমনি দ্রব্যমূলের নিম্নহার ব্যতীত জনসাধারণের সুখ, সমৃদ্ধি এবং স্থিরতা সম্ভব নয়।'* অর্থাৎ দ্রব্যমূল্য স্থির রাখার পশ্চাতে শাসকের মনে একটা গণ-কল্যাণমুখী চিন্তা থাকা স্বাভাবিক। আলাউদ্দিনও হয়তো এই ধারার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই বক্তব্যকে পুষ্ট করে সুফীসন্ত নাসিরুদ্দিন চিরাগের 'খয়ের-উল্-মজলিস' এবং আমীর খসরুর 'খাজাইন-উল্-ফ্তুহ' গ্রন্থের বিবরণ। দুটি গ্রন্থের রচনাকালের মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান থাকলেও বক্তব্যের মধ্যে যথেষ্ট মিল খুঁজে পাওয়া যায়। নাসিরুদ্দিনের বিবরণ থেকে জানা যায়, কাজী হামিদউদ্দিন এবং মালিক কারাবেগের সাথে কথোপকথন প্রসঙ্গে সুলতান ***আলাউদ্দিন*** নাকি বলেছিলেন ঃ *"সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আমার উপর জীবজগতের মঙ্গলসাধনের যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, সে বিষয়ে কি আমার করণীয়? আমি যদি রাজকোষের সব অর্থ বিলিয়ে দিই, তা সমস্ত মানুষের কাছে পৌঁছাবে না ; আমি যদি সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি বিলিয়ে দিই, তা-ও সকল মানুষের কল্যাণের পক্ষে যথেষ্ট হবে না। তাই আমি ভেবেছি সমস্ত পণ্য-শস্যের মূল্য বেঁধে দেব এবং সেই সুযোগ গ্রহণ করবে দেশের সমস্ত মানুষ।"* ***খসরু*** তাঁর গ্রন্থে আলাউদ্দিনের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারগুলিকে জনকল্যাণের প্রেক্ষিতে প্রশংসা

করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ *"বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই 'জাহাঙ্গীর' অর্থাৎ রাজ্যবিজেতা অপেক্ষা 'জাহান্দার' অর্থাৎ দক্ষ প্রশাসককে অধিক মর্যাদা দেন। ঈশ্বরের সন্তানদের প্রতি সুলতানের ভালবাসা চাঁদ বা নক্ষত্রের প্রতি সূর্যের ভালবাসার থেকে অনেক বেশি ছিল। তাই আলাউদ্দিন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য বেঁধে দেন। তীক্ষ্ণ নজরদারির ব্যবস্থা করেন। পাথরের বাটখারার পরিবর্তে লোহার বাটখারা ব্যবহার বাধ্যতামূলক করেন। এবং ওজনে কম দিয়ে ক্রেতাকে বঞ্চিত করলে বিক্রেতার শরীর থেকে মাংস কেটে নেবার কঠোর নির্দেশ দেন।"* অর্থাৎ কেবল সেনাবাহিনী নয় ; সাধারণ প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের চিন্তাও আলাউদ্দিনকে বাজার ও মূল্য-নিয়ন্ত্রণের কাজে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

বরণীর বক্তব্য থেকে এও মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, হিন্দুদের জব্দ করার একটা পরোক্ষ ইচ্ছা আলাউদ্দিনকে মূল্য-নিয়ন্ত্রণের কাজে উৎসাহিত করেছিল। কারণ তখন খাদ্যশস্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবসায় হিন্দু নায়েকদের প্রাধান্য ছিল। মূল্য-নিয়ন্ত্রণের ফলে সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এরাই। তবে অধ্যাপক ***সতীশচন্দ্র*** প্রমুখ অনেকেই মনে করেন, এমন ধারণা ভিত্তিহীন। কারণ পশ্চিম ও পূর্ব এশিয়ায় স্থলপথে বহির্বাণিজ্যে মুলতানি ও খোরাসানী বণিকদের প্রাধান্য ছিল। এদের অধিকাংশ ছিল মুসলমান এবং মূল্য-নিয়ন্ত্রণের শৃঙ্খলে এরাও বাঁধা পড়েছিল।

ড. ইউ. এন. দে আলাউদ্দিনের মুল্য-নিয়ন্ত্রণ নীতির এক স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে, একমাত্র সেনাবাহিনী কিংবা সামগ্রিকভাবে দেশের জনসাধারণের কথা চিন্তা করে আলাউদ্দিন মূল্য-নিয়ন্ত্রণ নীতি কার্যকর করেননি। তাঁর লক্ষ্য ছিল দিল্লীর সেনাবাহিনী এবং জনগণের স্বার্থচিন্তা। ড. *দে* লিখেছেন যে, তখন দিল্লী ছিল রাজধানী তথা বাণিজ্যিক কেন্দ্র। তাই সেখানে সর্বদা বিশাল সেনাবাহিনী হাজির থাকত। বাণিজ্যসূত্রে সেখানে আসত বহু লোকজন। ফলে দিল্লীর লোকসংখ্যা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায় এবং স্বাভাবিক কারণে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। সুলতান এই মুদ্রাস্ফীতি রোধ এবং খাদ্যশস্যের যোগান অব্যাহত রাখার প্রয়োজনেই বাজার-নিয়ন্ত্রণ বা মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতি রূপায়ণ করেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিতর্ক দেখা দেয় যে, আলাউদ্দিনের বাজাব-নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা কেবল দিল্লী শহরে বলবৎ ছিল, নাকি সাম্রাজ্যের সর্বত্র প্রযোজ্য ছিল। বরণীর বিবরণ থেকে মনে হয় যে, এটি কেবল দিল্লীতে বলবৎ ছিল। এরই ভিত্তিতে **Moreland** লিখেছেন ঃ *"No attempt was made to keep down prices throughout the country, effort was limited to Delhi, where the standing army was concentrated."* এক্ষেত্রে বরণীর মধ্যে স্ববিরোধিতা লক্ষণীয়। কারণ তিনিই লিখেছেন, মূলত সেনাবাহিনীর প্রয়োজনে এই ব্যবস্থার উদ্ভাবন। ড. ***সাক্সেনা*** (B. P. Saxena) এখন প্রশ্ন তুলেছেন যে, সেনাবাহিনী সংগ্রহ করা হত সারা দেশ থেকে। কেবল দিল্লীতে মূল্য-নিয়ন্ত্রণ বলবৎ থাকলে, দেশের নানাপ্রান্তে ছড়িয়ে থাকা সেনা-পরিবারগুলি কিভাবে উপকৃত হত? ফেরিস্তার বিবরণ থেকে অনুমিত হয় যে, দিল্লীর মূল্যব্যবস্থা সমগ্র দেশে প্রযোজ্য ছিল। কিন্তু ***ড. শরণ, ড. লাল*** প্রমুখ এর বিরোধিতা করেছেন। ***সতীশচন্দ্রের*** মতে, *'তথ্যের অভাবে এ বিষয়ে নিশ্চিত কিছু বলা সম্ভব নয়।'*

যাই হোক্, আলাউদ্দিনের বাজার-নিয়ন্ত্রণ নীতির উদ্দেশ্য ও প্রয়োগক্ষেত্র সম্পর্কে যেমন

বিতর্কের অবসান হয়নি, তেমনি এই ব্যবস্থার ফলাফল সম্পর্কেও কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানো কষ্টকর। অধ্যাপক ***শরণের*** মতে, আলাউদ্দিনের বাজার-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ছিল অযৌক্তিক, অর্থনীতির নিয়মবহির্ভূত একটি প্রয়াস। সুলতানের একমাত্র লক্ষ্য ছিল ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে বলপ্রয়োগে কার্যকরী করা। ড. ***লাল*** মনে করেন, বাজার-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ফলে সাধারণ ক্রেতা উপকৃত হয়নি, কিন্তু দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল উৎপাদকগোষ্ঠী ও বণিকসম্প্রদায়। চাহিদা, যোগান ও উৎপাদন-ব্যয়—অর্থনীতির এই তিনটি মূল শর্ত লঙ্ঘিত হবার ফলে, এই ব্যবস্থা আলাউদ্দিনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে পড়ে। এতদ্‌সত্ত্বেও ঐতিহাসিক লেনপুল আলাউদ্দিনের অর্থনীতির বিশ্লেষণ করে তাঁকে একজন *'Political economist'* বলে অভিহিত করেছেন। ড. ***সাক্সেনা*** লিখেছেন : *'The economic regulations of Alauddin are the greatest administrative achievement of the Sultanate period.'* ***ফেরিস্তা*** লিখেছেন : *"It was a unique and remarkable achievement. Nothing like this had been accomplished before and no one can say whether it will be possible again."* বস্তুত, আলাউদ্দিনের মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কঠোর ছিল এবং ত্রুটিমুক্তও ছিল না। কিন্তু মৌলিক ব্যবস্থা হিসেবে এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সম্ভবত, অধ্যাপক ***সতীশচন্দ্র*** এ বিষয়ে যথার্থই বলেছেন : *"হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর বণিকরা হয়তো এই নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল ; কিন্তু কেবল সেনাবাহিনী নয়, সকল শ্রেণীর নাগরিক খাদ্যশস্য ও অন্যান্য সস্তা মূল্যের জন্য উপকৃত হয়েছিল।*

○ নরপতিত্বের আদর্শ :

দিল্লীর সুলতানদের মধ্যে গিয়াসউদ্দিন বলবন সর্বপ্রথম রাজতন্ত্রের আদর্শ সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। বংশকৌলীন্য, রাজার দৈবস্বত্ব, সাধারণ যে-কোন স্তরের মানুষের থেকে শাসকের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও অধিকার ইত্যাদির ভিত্তিতে তিনি রাজার অধিকার ও কর্তব্য ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। অতঃপর আলাউদ্দিন খলজী রাজাদর্শ সম্পর্কে আরও বিশদ ও স্পষ্টভাবে তাঁর অভিমত জ্ঞাপন করেন। তবে বলবনের বক্তব্যের সাথে আলাউদ্দিনের বক্তব্যের মধ্যে মূলগত মিল থাকলেও প্রকৃতিগত স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়। বলবন বাজার স্বৈরতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন, তবে সিংহাসনকে কোন প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদাদানের চেষ্টা তিনি করেন নি। বলবন সুলতানের ব্যক্তিগত মর্যাদা ও দৈবনির্দিষ্ট প্রতিপত্তির তত্ত্ব প্রচার করেন। কিন্তু আলাউদ্দিন সিংহাসনকে নির্দিষ্ট কর্তৃত্ব ও মর্যাদাদানের মাধ্যমে রাজতন্ত্রকে একটি স্বনির্ভর ও লৌকিক নিয়ন্ত্রণমুক্ত প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করার উদ্যোগ নেন।

বলবনের মত আলাউদ্দিনও নিজেকে 'সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রতিনিধি' বলে মনে করতেন। তাঁর মতে, ঈশ্বরের 'মনোনীত ব্যক্তি' হিসেবে সুলতান যে-কোন মানুষের তুলনায় অধিক প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন। তাই সুলতানের ইচ্ছাই ছিল আইন। *"Kingship knows no Kin ship"*– এই তত্ত্বানুসারে আলাউদ্দিন মনে করতেন, রাষ্ট্রের সমস্ত মানুষ সুলতানের চাকর কিংবা প্রজা। সুলতান অতুলনীয়। যে-কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রভাবমুক্ত হয়ে রাষ্ট্রপরিচালনা করা রাজার পবিত্র কর্তব্য শুধু নয় ; এটি রাজতন্ত্রের মহান অধিকারও বটে। ব্যক্তিগতভাবে আলাউদ্দিন ছিলেন

মুসলমান এবং একথা তিনি গর্বের সাথে প্রকাশও করতেন। কিন্তু রাজতন্ত্রের উপর ধর্মতন্ত্রের প্রাধান্য কিংবা রাষ্ট্রনীতির উপর ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রভাব স্থাপন করতে দিতে তিনি রাজী ছিলেন না। আলাউদ্দিনের রাজতান্ত্রিক আদর্শের বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্র্য এবং মহানুভবতা হলো ধর্ম থেকে রাষ্ট্রনীতির বিচ্ছিন্নকরণ।

মধ্যযুগীয় রীতি অনুযায়ী তখন রাজতন্ত্রের উপর অভিজাতশ্রেণী এবং উলেমাদের প্রভাব ছিল সর্বময়। আমীর, মালিক প্রভৃতি অভিজাতশ্রেণীর মানুষ ছিলেন রাজনৈতিক পদাধিকারবলে সুবিধাভোগী শ্রেণী এবং প্রবল কর্তৃত্বের অধিকারী। নবপ্রতিষ্ঠিত দিল্লী-সুলতানির রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তির উৎসভূমি এই শ্রেণীর বিরুদ্ধাচরণ করার ক্ষমতা বা সাহস আলাউদ্দিনের পূর্ববর্তী শাসকদের ছিল না। বলবন সুলতান হিসেবে তাঁর নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট ছিলেন ; কিন্তু শ্রেণী হিসেবে অভিজাতদের মর্যাদা তিনি খর্ব করতে চাননি। অন্যদিকে ইসলামীয় রাষ্ট্রের ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী বিশ্বের যে-কোন অঞ্চলের মুসলমান রাজতন্ত্র খলিফার অধীন এবং পবিত্র কোরান, হাদিস, শরিয়ত ইত্যাদির ভিত্তিতে শাসিত হতে বাধ্য। এবং ধর্মের রক্ষক ও ব্যাখ্যাকার হিসেবে 'উলেমা'দের রাজনৈতিক প্রাধান্য অর্জন অনিবার্য। কিন্তু আলাউদ্দিন দৃঢ়ভাবে অভিজাতশ্রেণী এবং উলেমাদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব অস্বীকার করে রাজতন্ত্রকে একটি নতুন মর্যাদা দেন। আলাউদ্দিন অভিজাতদের দমন করার জন্য একাধিক আইন প্রণয়ন করেন এবং কঠোরভাবে তা প্রয়োগ করেন। অভিজাতদের 'গোষ্ঠীতন্ত্র'কে ভেঙে দিয়ে তিনি প্রমাণ করেন যে, সুলতানের ইচ্ছানুসারে এবং রাজ্যের প্রয়োজনানুসারে তাঁরাও নিয়ন্ত্রিত হতে দায়বদ্ধ।

একইভাবে আলাউদ্দিন রাষ্ট্রনীতির উপর থেকে উলেমাদের মৌরুসীপাট্টার অবসান ঘটান। কোরানে উলেমাদের স্থান নির্দিষ্ট করা আছে। *কে. এম. আসরাফ* লিখেছেন ঃ *'উলেমাদের দায়িত্ব ছিল কর্মাদর্শের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে 'ধর্মপথে আকৃষ্ট করা।'* কিন্তু কোরানের ব্যাখ্যাকার হিসেবে ভারতে সুলতানি শাসনের সূচনা থেকেই উলেমারা রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ভোগ করতে শুরু করেন। এমনকি বলবনের আমলেও রাষ্ট্রনীতির উপর উলেমাদের প্রভাব অব্যাহত ছিল। কিন্তু আলাউদ্দিন দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন যে, 'রাষ্ট্রনীতি' এবং 'ধর্মনীতি' সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দুটি দিক। উলেমাদের কাজ ধর্মনীতি চর্চা করা, রাজনীতি করা নয়। তিনি বলেন, রাষ্ট্রের ন্যায়বিধান সম্পর্কে উলেমাদের তুলনায় সুলতানের জ্ঞান অনেক বেশি। বেয়ানার কাজী মুঘিসউদ্দিন উলেমাদের কর্তৃত্বের প্রশ্নে সুলতানের সাথে একমত ছিলেন না। তাই তিনি পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রব্যবস্থার উপর ধর্মের প্রভাবকে স্বাভাবিক বলে বর্ণনা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু *আলাউদ্দিন* তাঁর সঙ্গে কথোপকথন প্রসঙ্গে পরিষ্কার জানিয়ে দেন, *'আমি জানি না কোন্‌টি আইনসম্মত এবং কোন্‌টি বে-আইনী। রাষ্ট্রের পক্ষে যা মঙ্গলজনক কিংবা আপৎকালে যা জরুরী বলে মনে করি, আমি তাই বাস্তবায়িত করি ; এবং সেক্ষেত্রে চূড়ান্ত বিচারের দিন আমার কি হবে সে চিন্তা আমি করি না'* (*"I do not know whether this is lawful or unlawful ; whatever I think to be for the good of the state or suitable for the emergency that I decree, and as for what may happen to me on the approaching day of judgement that I know not."*)। *আলাউদ্দিন* কথা প্রসঙ্গে কাজীকে বলেন, *'সাধারণ মানুষ একরোখা এবং রাজাদেশ অগ্রাহ্য করার প্রবণতাই তাদের বেশি। তাই সুলতানের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা*

করার জন্য আমি তাদের উপর কঠোরতম শাস্তি চাপিয়ে দিতে বাধ্য।' ঐতিহাসিক ***ঈশ্বরীপ্রসাদের*** মতে, সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে আলাউদ্দিনের এই ধারণা হলো ঘটনাপ্রবাহের অনিবার্য পরিণতি। মোঙ্গলদের আক্রমণ এবং অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা থেকে আলাউদ্দিন যেভাবে সাধারণ মানুষকে মুক্তি দিয়েছিলেন ; তাতে ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত ব্যক্তিত্ব হিসেবে আলাউদ্দিনকে গ্রহণ করার ব্যাপারে প্রজাদের মনে কোন দ্বিধা ছিল না। নিজের এই ভিত্তি সম্পর্কে আলাউদ্দিন সচেতন ছিলেন বলেই ত্রয়োদশ শতকের এত বড় একটা ঐতিহ্যকে ভেঙে বেরিয়ে আসার সৎ সাহস দেখিয়েছিলেন।

সুলতানের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠান জন্য খলিফার অনুমোদন একান্ত আবশ্যিক বলে আলাউদ্দিন মনে করতেন না। তাই তিনি কখনোই খলিফার অনুমোদনলাভের চেষ্টা করেননি বা নিজেকে 'খলিফার ভৃত্য' বলে অভিহিত করেননি। অবশ্য তিনি নিজেকে খলিফার সহকারী হিসেবে প্রতিভাত করার জন্য 'ইয়াসিন-উল্‌-খলিফা' উপাধি গ্রহণ করেন। ***শ্রীবাস্তবের*** মতে, আলাউদ্দিন রাজনৈতিক প্রভু হিসেবে খলিফাকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে এই উপাধি নেননি। আসলে আলাউদ্দিন খিলাফতের তত্ত্বীয় ঐতিহ্য ও ঐক্যকে রক্ষা করার জন্যই এই উপাধি ধারণ করেছিলেন।

আলাউদ্দিন রাজনীতিকে ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত করার চেষ্টা করলেও, তাঁর রাজাদর্শ কতখানি ধর্মনিরপেক্ষ ছিল, তা বলা কঠিন। নাসিরুদ্দিন চিরাগ বা আমীর খসরু তাঁদের গ্রন্থে যথাক্রমে 'খয়ের-উল্‌-মজলিস' এবং 'খাজাইন-উল্‌-ফুতুহ'তে আলাউদ্দিনের চরিত্রের যে চিত্র এঁকেছেন, তাতে তাঁকে 'মুসলমান শাসক' বলা চলে কিন্তু 'মুসলমানের শাসক' নয়। 'খয়ের-উল্‌-মজলিসে' সুলতানের একটি উক্তিতে শাসক হিসেবে প্রজাসাধারণের প্রতি তাঁর কর্তব্যবোধ এবং তাকে রূপায়িত করার আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠেছে। সুলতান আন্তরিকভাবে বলছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সৃষ্ট অসংখ্য জীব আছে। কিন্তু তিনি আমাকে তাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সুতরাং এখন তাদের মঙ্গলার্থে আমার এমন কিছু করা উচিত যার সুযোগ সকলের কাছে পৌঁছাতে পারে। ***আমীর খসরু*** লিখেছেন ঃ *"The Sultan's fostering care for the sons of Adam is greater than that of the sun for the moon and stars ;"* অর্থাৎ আলাউদ্দিন সামগ্রিকভাবে প্রজাদের মঙ্গলবিধান করা সুলতানের অন্যতম কর্তব্য বলে মনে করতেন। আধুনিক কোন কোন লেখকও এই মত পোষণ করেন। কিন্তু ড. ***শ্রীবাস্তবের*** মতে, আলাউদ্দিন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আদর্শে আদৌ আস্থাবান ছিলেন না। হিন্দুদের উপর দমনমূলক আইনপ্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন দ্বিধাহীন। তাই হিন্দুদের অধিকার সম্পর্কে ***কাজী মুঘিসউদ্দিন*** যখন বলেন যে, *'রাজস্ব-সংগ্রাহক হিন্দুদের কাছে রৌপ্যমুদ্রা দাবি করলে তাদের স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া উচিত , কিংবা 'ঈশ্বর স্বয়ং তাদের লাঞ্ছিত করার বিধান দিয়েছেন,'* তখন আলাউদ্দিন প্রতিবাদ না করেই হৃষ্টচিত্তে তা অনুমোদন করেন। অথচ ইমাম আবু হানিফা পরিষ্কার ব্যাখ্যা করেছেন যে, *'জিজিয়া প্রদানের পরিবর্তে হিন্দুরা রাজনৈতিক অধিকার ও নিরাপত্তা ভোগের অধিকারী।'* আসলে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা নয় ; আলাউদ্দিনের লক্ষ্য ছিল তাঁর ব্যক্তিগত অধিকার ও কর্তৃত্ব যাতে উলেমাদের হস্তক্ষেপের দ্বারা বিঘ্নিত না হয়, তা সুনিশ্চিত করা। *তাই ড. আর. পি. ত্রিপাঠী বলেছেন ঃ 'যে অর্থে আকবরকে ধর্মনিরপেক্ষ বলা যায়, সেই*

অর্থে আলাউদ্দিনকে বলা চলে না। কারণ আলাউদ্দিনের ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা ছিল প্রয়োজনভিত্তিক, আদর্শভিত্তিক নয়।' **ড. শ্রীবাস্তব** মনে করেন, আলাউদ্দিন সচেতন ভাবেই হিন্দুদের উপর নিষ্পেষণ চালান এবং তা ধর্মের জন্যই। তিনি লিখেছেন : ***"His policy which was one of repressing them completely, was not due to a momentory vagary, but formed part of his settled ideology."*** **ড. কে. কে. দত্ত** মনে করেন, উদারনৈতিক প্রজাকল্যাণমূলক আদর্শের উপর ভিত্তি করে আলাউদ্দিনের রাজতান্ত্রিক আদর্শ গড়ে উঠলে, তা স্থায়ী হত। কিন্তু রাজনৈতিক চোরাবালির উপর গড়ে ওঠা তাঁর সাম্রাজ্য তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ধ্বসে পড়ে।

সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আলাউদ্দিনের রাজতান্ত্রিক আদর্শ নতুন পথের দিশারী হিসেবে স্মরণীয়। মধ্যযুগীয় পরিমণ্ডলে তিনি প্রবল প্রতাপশালী অভিজাত এবং উলেমাদের প্রভাব থেকে রাজতন্ত্রকে মুক্ত করার যে উদ্যোগ নেন তা অভূতপূর্ব। এইভাবে আলাউদ্দিন সিংহাসনকে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে মর্যাদাদানের যে কাজ শুরু করেন, মহম্মদ-বিন-তুঘলক তাকেই পূর্ণতা দেবার চেষ্টা করেন।

○ আলাউদ্দিনের শেষজীবন ও মৃত্যু : মালিক কাফুরের ক্ষমতাদখল :

সুলতান আলাউদ্দিনের কর্মময়তা এবং কর্তৃত্বের চূড়ান্ত কাল ছিল ১৩১২ খ্রীষ্টাব্দ। এর পর থেকেই শারীরিক ও মানসিক ভাবে তিনি ভেঙে পড়েন এবং অসহায়ভাবে একটু একটু করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যান। জীবনের শেষ তিনটা বছর তাঁর জীবন ছিল অভিশাপের নামান্তর। দীর্ঘ পরিশ্রম আর উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনের অনিবার্য ফলস্বরূপ এই সময় তাঁর শরীর খুব ভেঙে পড়ে। বরণীর মতে সুলতান এই সময় শোথরোগে (ইস্তিস্কা—Dropsy) আক্রান্ত হন। ***আমীর খসরুর*** মতে, সুলতান যকৃতের রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। ***ইসামী*** লিখেছেন : *"অসুখটা যাই হোক্, সুলতান মাঝে মাঝে অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর হতেন, তাঁকে পাণ্ডুর ও দুর্বল দেখাত। একই সঙ্গে জীবনের শেষলগ্নে আলাউদ্দিনের মানসিক যন্ত্রণাটাও কম ছিল না।"* ***খসরু, ফেরিস্তা*** প্রমুখ স্বীকার করেছেন যে, সুলতানের অসুস্থতার মুহূর্তে তাঁর পুত্র তথা ভাবী সুলতান খিজির খাঁ এবং পত্নী মালিকা জাহান নিরন্তর আমোদ-আহ্লাদ, পান-ভোজন ইত্যাদি কাজেই ব্যস্ত থাকতেন। সুলতানের সেবা বিষয় ছিল তাঁদের কল্পনার অতীত। এই পরিণতি সুলতানকে যুগপৎ ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ করে। তিনি ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা চূড়ান্ত করার জন্য দাক্ষিণাত্য থেকে মালিক কাফুর এবং গুজরাট থেকে আলপ খাঁকে ডেকে পাঠান।

নুসরৎ খাঁ ও জাফর খাঁ'র মৃত্যুর পরে মালিক কাফুর এবং আলপ খাঁ-ই ছিলেন আলাউদ্দিনের সর্বাধিক কাছের মানুষ। সুলতানের বিশ্বাসভাজন হওয়ার জন্য কাফুর ভোগ করছিলেন 'মালিক-নায়েব'-এর গুরুত্বপূর্ণ পদ। আর আলপ খাঁ নিযুক্ত হয়েছিলেন গুজরাটের গভর্নর। সুলতানের প্রধানা মহিষীর ভাই এবং সুলতানের দুই পুত্র খিজির খাঁ ও সাদি খাঁ-র শ্বশুর হিসেবে রাজপরিবারের উপর আলপ খাঁ একটা বিশেষ দাবি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উচ্চাকাঙ্ক্ষী মালিক কাফুর আলপ খাঁ-র হাতে অধিক কর্তৃত্ব ছেড়ে দিতে আদৌ রাজী ছিলেন না। তাই সুলতানের অসুস্থতার সুযোগে তিনি ধীরে এবং সন্তর্পণে ক্ষমতাদখলের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। 'মালিক-নায়েব'

হিসেবে সুলতানের সহকারী রূপে শাসনকার্য পরিচালনা করার বৈধ অধিকার কাফুরের লক্ষ্যপূরণে সহায়ক হয়েছিল। কাফুর আলপ খাঁ, খিজির খাঁ এবং প্রধানা মহিষীর বিরুদ্ধে সুলতানকে নানাভাবে উত্তেজিত করেন। *বরণী* লিখেছেন ঃ *"সুলতানের আদেশক্রমে কাফুর আকস্মিক আলপ খাঁ'কে হত্যা করেন"*। ইসামীর মতে, আলাউদ্দিন নিজে এই হত্যার আদেশ দেননি ; তবে সিদ্ধান্তগ্রহণের দায়িত্ব কাফুরের উপর ন্যস্ত করেছিলেন। অতঃপর খিজির খাঁকে সমস্ত রাজকীয় উপাধি ও প্রতীক প্রত্যর্পণ করার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং তাঁকে আমরোহায় অবস্থান করতে বলা হয়। প্রথমে এই আদেশ মেনে নিয়েও খিজির বিনা অনুমতিতে দিল্লী ফিরে এলে আলাউদ্দিনের নির্দেশে তাঁকে বন্দী করে গোয়ালিয়র দুর্গে নিক্ষেপ করা হয়। অবশ্য কাফুর 'ঈশ্বর, নবি, শরিয়ত, অস্ত্র ইত্যাদির নামে শপথ নেন যে, তাঁর উপর কোন শারীরিক নিপীড়ন করা হবে না।' মালিকা জাহানকেও দিল্লীর 'লালপ্রাসাদে গৃহবন্দী' করা হয়।

ইসামী লিখেছেন ঃ *'এই সময় কাফুর সুলতানের রোগশয্যার পাশে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের এক সভা আহ্বান করেন। এখানে আলাউদ্দিন তাঁর পুত্র শিহাবউদ্দিন ওমরকে (জাঠ্যাপল্লীর গর্ভজাত সন্তান) উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। ১৩১৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারী ভোররাতে সুলতান শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।'*

আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পরদিন কাফুর আমীরও মালিকদের এক সভা আহ্বান করেন। এখানে তিনি আলাউদ্দিনের এক উইল পাঠ করে জানান যে, মৃত সুলতান খিজির খাঁ-র পরিবর্তে শিহাবউদ্দিনকে তাঁর পরবর্তী সুলতান মনোনীত করে গেছেন। তদানুযায়ী তিনি শিহাবউদ্দিনকে সিংহাসনে বসিয়ে নিজে তার অভিভাবক হিসেবে শাসন শুরু করেন।

মালিক কাফুর যোদ্ধা হিসেবে ছিলেন মহান কিন্তু বন্ধু হিসেবে ছিলেন ঘৃণ্য। সামান্য মানবিকতাবোধ তাঁর ছিল না। দক্ষিণ ভারতের একাধিক যুদ্ধে তিনি আলাউদ্দিনের নামে বিজয়-পতাকা উড্ডীন করে সামরিক দক্ষতার পরিচয় দেন। তাই পুরস্কার হিসেবে আলাউদ্দিন কাফুরকে দশ বছর প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের আগেই 'মালিক-নায়েব' পদে মনোনীত করেন। আলাউদ্দিন অসুস্থ অবস্থায় পরম মিত্র হিসেবে দাক্ষিণাত্য থেকে দিল্লীতে কাফুরকে ডেকে আনেন সৎপরামর্শ ও সাহায্যের জন্য। কিন্তু ক্ষমতার মোহে কাফুর ন্যায়নীতি বিসর্জন দিয়ে লিপ্ত হন ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে! সুলতানের কানে মিথ্যা মন্ত্রণা দিয়ে তাঁকে উত্তেজিত করেন পুত্র-পত্নী ও আত্মীয়দের বিরুদ্ধে। 'ঈশ্বর-নবী-শরিয়ত'-এর নামে শপথ নিয়েও নির্দ্বিধায় চক্ষু উৎপাটিত করেন বন্দী খিজির খাঁ-র। শিহাবউদ্দিনকে সামনে রেখে শুরু করেন সুলতানির সর্বময় কর্তৃত্ব দখলের জঘন্য খেলা। শাহজাদা শাদি খাঁকে অন্ধ করে, মুবারক খাঁকে বন্দী করে এবং মালিকা জাহানকে সমস্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে কাফুর তাঁর অন্নদাতার ঋণ পরিশোধ করেন। অবশেষে খোজা হয়েও আলাউদ্দিনের বিধবা পত্নী জাঠ্যাপল্লীকে বিবাহ করে কাফুর নিজের দাবিকে একটা আইনগত ভিত্তি দেবারও চেষ্টা করেন।

কাফুরের বেইমানি ও নৃশংসতা সুলতানের দেহরক্ষী-বাহিনী (পাইক)-কে শেষ পর্যন্ত চরম সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে। মুবাসিরের নেতৃত্বে কয়েকজন পাইক কাফুরের মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাঁর ৩৫ দিনের অপশাসনের অবসান ঘটায়। *ড. বেনারসীপ্রসাদ সাক্সেনা* মনে করেন, কাফুরের দক্ষতা ও যোগ্যতার অভাব ছিল না। তিনি যদি দুটি আদর্শ অনুসরণ করতেন

অর্থাৎ, (১) প্রভুর পরিবারের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতেন এবং (২) মালিকদের সহযোগিতায় দেশের প্রশাসনকে সচল রাখতেন, তাহলে তাঁর জীবনের হয়তো এমন করুণ পরিণতি হত না।

○ আলাউদ্দিনের কৃতিত্বের মূল্যায়ন ঃ

সুলতান হিসেবে আলাউদ্দিনের কর্মময় জীবনের দৈর্ঘ্য ছিল কুড়ি বছর। অবশ্য শেষ তিন বছর তিনি নামে মাত্র সুলতান ছিলেন। ঐ পর্বে প্রকৃত প্রশাসনিক কর্তৃত্ব ছিল মালিক কাফুরের হস্তগত। যাই হোক্, দীর্ঘ দু'দশক কাল আলাউদ্দিনের পরিকল্পনা ও তার রূপায়ণ এবং রাষ্ট্রনৈতিক বিবর্তনে তাঁর অবদান সম্পর্কে ইতিহাসবিদ্ ও পণ্ডিতদের মধ্যে ভিন্ন মত লক্ষ্য করা যায়। ***হ্যাভেল, এলফিন্‌স্টোন, কে. এস. লাল*** প্রমুখ আলাউদ্দিনকে সুলতানি যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান বলে মনে করেন। এঁরা স্বীকার করেন যে, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আলাউদ্দিন একাধিক মৌলিক পরিবর্তনের জন্য কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন। এলফিন্‌স্টোনের মতে, আলাউদ্দিন ছিলেন একজন সফল শাসক যিনি ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করার কাজে ছিলেন পারদর্শী। ***আগা মেহদি হুসেন*** মনে করেন, *'শের শাহ্ শূর এবং আকবরের মতই আলাউদ্দিন ছিলেন ভারতের একজন মহান শাসক।'* আলাউদ্দিনের অগ্রণী চিন্তাশক্তির প্রশংসা করে ***হ্যাভেল*** (Havell) লিখেছেন ঃ ***"Alauddin was far advanced of his age. In his reign of twenty years there are many parallels with the events of our own times."*** পর্যটক ***ইবন বতুতাও*** মনে করেন, *"তিনি ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক।"*

পক্ষান্তরে, ***ভি. স্মিথ*** প্রমুখ মনে করেন, মানুষ ও শাসক হিসেবে আলাউদ্দিনের কৃতিত্ব এমন কিছু ছিল না যা তাঁর রাজত্বকালকে গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত করতে পারে। আলাউদ্দিনকে একজন 'অসভ্য স্বৈরাচারী' আখ্যায়িত করে ***স্মিথ*** লিখেছেন ঃ ***"facts do not warrent the assertion that he exhibited a just exercise of his own powers and that his reign was glorious."*** গবেষক ***সুকুমার রায়*** লিখেছেন ঃ *"রাজা হিসেবে আলাউদ্দিন ছিলেন নিষ্ঠুর ও স্বেচ্ছাচারী এবং মানুষ হিসেবে বিশ্বাসঘাতক ও অকৃতজ্ঞ।"* এই গোষ্ঠী মনে করেন, আলাউদ্দিনের রাজত্বকাল ছিল 'ভীতি ও সন্দেহের' উপর প্রতিষ্ঠিত। এর চালিকাশক্তি ছিল তাঁর গুপ্তচরবাহিনী ও সামরিক শক্তি। তাই তিনি তাঁর অর্জিত সাফল্যকে স্থায়িত্ব দিতে পারেননি। এই কারণে ড. ***কে. কে. দত্ত*** লিখেছেন যে, *আলাউদ্দিনের সাম্রাজ্য ছিল চোরাবালির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাই ভঙ্গুর।*

সাধারণভাবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, ভারতে মুসলমান শাসকদের মধ্যে আলাউদ্দিন সর্বপ্রথম প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষে দিল্লীর আধিপত্য সম্প্রসারিত করেছিলেন। উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা এবং পূর্বে বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমে গুজরাট ও সিন্ধু পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। তাঁর পূর্ববর্তী দুই বিখ্যাত শাসক ইলতুৎমিস ও বলবন মহম্মদ ঘুরী অধিকৃত ভূখণ্ডের নিরাপত্তা বিধান করতেই সমস্ত উদ্যম ও সময় ব্যয় করেছিলেন। কিন্তু আলাউদ্দিন বিপজ্জনক মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করার সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের কাজেও আত্মনিয়োগ করেন এবং সফল হন। দক্ষিণ ভারতের দিকে দিল্লীর দৃষ্টি নিবদ্ধ করার কৃতিত্ব তাঁরই। দক্ষিণ ভারতের অর্থনৈতিক গুরুত্ব এবং ভারতরাষ্ট্র হিসেবে উত্তর-দক্ষিণের মেলবন্ধনের

গুরুত্ব উপলব্ধি করে তিনি দূরদর্শিতা ও রাষ্ট্র-প্রজ্ঞার পরিচয় দেন। উত্তর ভারতের বিজিত রাজ্যকে সরাসরি দিল্লীর অধীনস্থ করলেও, দক্ষিণ ভারতের ক্ষেত্রে তিনি আনুগত্য ও বার্ষিক কর লাভের শর্তে স্থানীয় রাজাদের স্বরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে দূরদর্শিতার পরিচয় দেন। কেউ কেউ বলেন আলাউদ্দিনের সামরিক সাফল্যের প্রধান কৃতিত্ব প্রাপ্য তাঁর চার প্রধান সেনাপতির। একথা ঠিক জাফর খাঁ, আলপ খাঁ, নুসরৎ খাঁ এবং মালিক কাফুর বিভিন্ন রণক্ষেত্রে আলাউদ্দিনের বিজয়-পতাকা বহন করে নিয়ে গেছেন ; কিন্তু এই কারণে আলাউদ্দিনের সামরিক কৃতিত্বকে অস্বীকার করা যায় না। ব্যক্তিগতভাবে তিনি যে সুযোদ্ধা ও সংগঠক ছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় মোঙ্গল ও রাজপুতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা ভিলসার বিরুদ্ধে অর্জিত সাফল্যে। একই সাথে উত্তর ও দক্ষিণে রাজ্য-সম্প্রসারণ, বহিরাগত সীমান্তদস্যু মোঙ্গলদের প্রতিরোধ এবং অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করার জন্য যে সংগঠনী প্রতিভা, মানসিক দৃঢ়তা, লক্ষ্যের একাগ্রতা প্রয়োজন,— তা আলাউদ্দিনের চরিত্রে বর্তমান ছিল। তাই ড. *শ্রীবাস্তব* স্বীকার করেছেন যে, *'আলাউদ্দিন ছিলেন একজন সাহসী সৈনিক ও সফল সেনাপতি।*

রণক্ষেত্রের সফল নায়ক আলাউদ্দিন সাম্রাজ্যের সংগঠক হিসেবেও ছিলেন অনবদ্য। ড. *এস. রায়* লিখেছেন ঃ *"Alauddin was the first Muslim imperialist and the first great Muslim administrator of India."* ড. *রায়ের* মতে, *'রাজা হিসেবে আলাউদ্দিন ছিলেন দয়াহীন, স্বৈরাচারী* এবং *মানুষ হিসেবে বিশ্বাসঘাতক এবং অকৃতজ্ঞ ; কিন্তু শাসক হিসেবে ছিলেন তেজস্বী ও দক্ষ* এবং *সংস্কারক হিসেবে দৃঢ়চেতা ও সৃজনশীল।'* আলাউদ্দিনই প্রথম ধর্মীয় প্রভাব থেকে রাজনীতিকে মুক্ত করার উদ্যোগ নেন। উলেমাদের কাজ ও ক্ষমতার সীমারেখা নির্দিষ্ট করার দৃঢ়তা তিনিই প্রথম দেখান। ধর্মীয় প্রভাব থেকে রাজনীতিকে মুক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে আলাউদ্দিন বেশ কিছু মৌলিক সংস্কার সাধন করেন। অধ্যাপক *এস. আর. শর্মা* আলাউদ্দিনকে শাসনক্ষেত্রে একজন 'উদ্ভাবক' বলে আখ্যায়িত করেছেন। মুসলমান শাসকদের মধ্যে তিনিই প্রথম ভূমি-সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণ করেন। জমি জরিপ করে রাজস্ব নির্ধারণের নীতি তিনিই প্রথম প্রয়োগ করেন। উৎপাদক যাতে সরকারি কর্মচারী বা মধ্যস্বত্বভোগীদের হাতে শোষিত ও নিপীড়িত না হয়, সেজন্য আলাউদ্দিন সরাসরি কৃষকদের সাথে বন্দোবস্ত করেন। রাজস্ব-আদায়কারী গ্রামীণ অভিজাতশ্রেণীর ক্ষমতা খর্ব করে আলাউদ্দিন 'সবলের বিরুদ্ধে দুর্বলকে রক্ষা' করার আদর্শ স্থাপন করেন। আলাউদ্দিনের ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থাকে ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে শের শাহ ভূমি-সংস্কারের কাজে মহান কৃতিত্বের অধিকারী হন। তাই ড. *শর্মা* লিখেছেন ঃ *"...his administrative system supplied the foundation on which all later Muslim rulers in India built."*

শাসনক্ষেত্রে তাঁর আর একটি মৌলিক পরিকল্পনা ছিল বাজার-নিয়ন্ত্রণ বা মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। এর দ্বারা তিনি ন্যায্য-মূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের নিশ্চয়তা এবং আপৎকালীন পরিস্থিতিতে সরকারি ভাণ্ডার থেকে অনুদানলাভের নিরাপত্তা বিধান করেন। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে প্রজাসাধারণের প্রতি কর্তব্যপালনের নৈতিক দায়িত্ব তিনি অস্বীকার করেন নি। 'খয়ের-উল-মসলিস', 'খাজাইন-উল-ফুতুহ' গ্রন্থে তাঁর এই নৈতিক মূল্যবোধের কথা প্রকাশ করা হয়েছে। রাষ্ট্রের স্বার্থে যা মঙ্গলজনক তা করতে তিনি ছিলেন

'দৃঢ়প্রতিজ্ঞ'—এ কথা আলাউদ্দিন ঘোষণা করেছেন যথেষ্ট জোরের সঙ্গেই। অধ্যাপক ***লাল*** তাই মনে করেন, সংগঠক হিসেবে আলাউদ্দিনের সাফল্যের কাছে যোদ্ধা হিসেবে সাফল্য ছিল খুবই কিঞ্চিৎ। ড. ***লাল*** লিখেছেন ঃ *"It is as administrator than anything else that Ala-ud-din stands head and shoulders above his predecessors. His accomplishments as a warrior were dwarfed by his achievements as an organiser."* আলাউদ্দিনের বাজার-নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে অভূতপূর্ব। এই ব্যবস্থার ফলাফল সম্পর্কে দ্বিমত অবশ্যই আছে। কিন্তু এই কর্মসূচীর জন্য ঐতিহাসিক ***লেনপুল*** তাঁকে ***'Political economist'*** উপাধিতে ভূষিত করে সত্যকেই স্বীকার করেছেন। মধ্যযুগীয় শাসকদের সীমাবদ্ধতার মাঝে আলাউদ্দিনের এই পরিকল্পনা অবশ্য প্রশংসার যোগ্য। তাই ***ঈশ্বরীপ্রসাদ*** লিখেছেন ঃ *"He possessed the qualities of a born military commander and a civil administrator...........a rare combination in medieval history."*

আলাউদ্দিন ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষিত ছিলেন না, কিন্তু তাঁর শিক্ষানুরাগ ছিল যথেষ্ট। ***বরণী*** লিখেছেন, তাঁর দরবারে বহু জ্ঞানীগুণী ব্যক্তির সমাবেশ ঘটেছিল। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ***"ভারতের তোতাপাখি"*** নামে খ্যাত আমীর খসরু, ***'ভারতের সাজি'*** নামে খ্যাত আমীর হাসান। এছাড়া আরসালন কোহী, কবিরুদ্দিন, শেখ নিজামউদ্দিন, শেখ রুকনউদ্দিন প্রমুখ আলাউদ্দিনের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। স্থাপত্যশিল্পের প্রতিও তাঁর যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। আলাউদ্দিনের স্মরণীয় স্থাপত্যকর্ম হিসেবে 'আলাই-দরওয়াজা' আজও ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করে। কুতুবমিনারের প্রায় দ্বিগুণ উচ্চতাসম্পন্ন একটি নতুন মিনার তৈরির কাজও তিনি শুরু করেন। অবশ্য এই প্রকল্প তিনি বাস্তবায়িত করতে পারেন নি। একাধিক সুদৃশ্য ও সুরক্ষিত দুর্গও তাঁর আমলে নির্মিত হয়। এগুলির মধ্যে সিরি দুর্গ এবং হাজার স্তম্ভের প্রাসাদ বা হাজারসিতান-এর নাম স্মরণীয়।

আলাউদ্দিন কীর্তিমান ছিলেন ; কিন্তু তাঁর কৃতিত্ব গ্লানিমুক্ত ছিল না। ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন স্বার্থপর, অকৃতজ্ঞ এবং বিবেকহীন। স্নেহশীল পিতৃব্যকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করতে তাঁর হাত কাঁপেনি কিংবা জালালী অভিজাতদের তোষণ করে সিংহাসন দখল করার অব্যবহিত করেই তাঁদের ছিন্নবস্ত্রের মত ছুঁড়ে ফেলে দিতেও দ্বিধা করেন নি। কয়েকজন নবমুসলমানের ষড়যন্ত্রের অজুহাতে তিনি একই দিনে ২০ থেকে ৩০ হাজার নবমুসলমানকে হত্যা করে নৃশংসতার এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। ***বরণী*** লিখেছেন যে, রাষ্ট্রের স্বার্থে আলাউদ্দিন আত্মীয়তা বা ধর্মবিশ্বাসকেও বিসর্জন দিতে দ্বিধা করতেন না। কিন্তু আলাউদ্দিনের কল্পিত রাষ্ট্র এবং আধুনিক কালের 'কল্যাণকর রাষ্ট্রের' ধারণা এক ছিল না। আলাউদ্দিনের রাষ্ট্র ছিল সুলতানের স্বৈরাচারী কর্তৃত্বের প্রশ্নহীন একাধিপত্য। আলাউদ্দিনের রাষ্ট্র এবং প্রশাসন দাঁড়িয়েছিল কঠোর শাসন এবং পুলিশি নজরদারির উপর। তাঁর গুপ্তচর-ব্যবস্থার ব্যাপকতা সারা দেশে প্রতিটি মুহূর্তের জন্য যে আতঙ্ক ও আশঙ্কার পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছিল, তাতে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-শান্তি অন্তর্হিত হয়েছিল। হিন্দুদের প্রতি তাঁর আচরণ ছিল আস্বাভাবিকভাবে কঠোর এবং সংকীর্ণ মানসিকতার জঘন্য প্রতিফলন। তাঁর বাজার-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কিছু লোকের কাছে স্বল্পমূল্যে জিনিস পৌঁছে দিতে পারলেও এই ব্যবস্থা শিল্প-বাণিজ্যের

স্বাভাবিক বিকাশের পথ রুদ্ধ করেছিল। ব্যবসায়ীদের ন্যূনতম বাণিজ্যিক স্বাধীনতা না-থাকার ফলে তাদের উৎসাহ শিথিল হয়েছিল। আলাউদ্দিন ক্রেতাদের স্বার্থ দেখেছিলেন, কিন্তু উৎপাদকের স্বার্থ সম্বন্ধে ছিলেন উদাসীন। দ্রব্যমূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে তিনি কি নীতি গ্রহণ করেছিলেন সে বিষয়ে বরণী বা খসরু যা বলেছেন তা তত্ত্বকথামাত্র ; অর্থনীতির মূল সত্যের সাথে তার সম্পর্ক সম্ভবত ছিল ক্ষীণ। ড. *পি. শরণ* মনে করেন, আলাউদ্দিনের শাসন-পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল একান্তভাবে শাসকশ্রেণীর স্বার্থের দিকে তাকিয়ে। তবে এর দ্বারা যদি কোন সাধারণ নাগরিক উপকৃত হয়ে থাকে, তবে তা ছিল দুর্ঘটনামাত্র। ড. *শরণের* ভাষায় ঃ "....*if any good acrued to the people, it was only accidental, a by-product of their measures and not an outcome of any deliberate steps for such purposes.*" উৎপাদনের ৫০ শতাংশ করধার্যের ব্যবস্থাকে অনেকেই অর্থনীতির বিরোধী বলে মনে করেন।

ড. *আর. পি. ত্রিপাঠী*, ড. *কে. এস লাল* প্রমুখ আলাউদ্দিনের চারিত্রিক বা প্রশাসনিক ত্রুটিগুলিকে স্বাভাবিক ও গুরুত্বহীন বলে মনে করেন। এঁদের মতে, আলাউদ্দিন দিল্লীর একটা ছোট রাজ্যকে বিশাল ভারতীয় সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত করে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ড. *শ্রীবাস্তবও* স্বীকার করেছেন যে, *"তিনি ছিলেন নিঃসন্দেহে দিল্লীর সুলতানদের মধ্যে যোগ্যতম। তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতা এবং লক্ষ্যের ব্যাপকতার সাথে একমাত্র মহম্মদ-বিন-তুঘলকের তুলনা করা চলে। তবে মহম্মদ তুঘলক তাঁর অধিকাংশ পরিকল্পনা রূপায়ণে ব্যর্থ হয়েছিলেন, কিন্তু আলাউদ্দিন প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই ছিলেন সফল রূপকার।* "অধ্যাপক *এস. রায়* আলাউদ্দিনকে মহান শের শাহ এবং আকবরের পূর্বসূরী হিসেবে চিহ্নিত করে যথার্থই বলেছেন ঃ "*Ala-ud-din, Sher Shah and Akbar each marks a distinctive step in the evolution of Indo-Muslim histoy.*"

○ কুতুবউদ্দিন মুবারক শাহ (১৩১৬-২০ খ্রীঃ) ঃ

মালিক কাফুরকে হত্যা করার পর আলাউদ্দিনের তৃতীয় পুত্র কুতুবউদ্দিন মুবারক নাবালক সুলতান শিহাবউদ্দিনের অভিভাবক নিযুক্ত হন। কিন্তু মাত্র দু'মাস প্রতিনিধিত্ব করার পর কুতুবউদ্দিন বালক শিহাবউদ্দিনের চক্ষুদ্বয় উৎপাটিত করে এবং কারারুদ্ধ করে নিজেকে 'সুলতান' বলে ঘোষণা করেন। তিনি *'কুতুবউদ্দিন মুবারক শাহ'* নাম নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৯ এপ্রিল, ১৩১৬ খ্রীঃ)। আলাউদ্দিনের কোন গুণই তাঁর পুত্রের চরিত্রে ছিল না। ড. *এস. রায়* লিখেছেন ঃ "*Mubarak was an unworthy successor of his father. In him the vices of Alauddin were magnified, but his virtues were lacking.*" ব্যভিচারিতা ছিল মুবারকের অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তিনি কেবল বহুকামী ছিলেন না, সমকামীও ছিলেন। তাঁর সমকামী-প্রবণতার ফলেই হাসান বর্দ্দু এবং হুসামউদ্দিন বর্দ্দু নামক দুই যুবক মুবারকের অতি প্রিয়পাত্রে পরিণত হন। এদের মধ্যে হাসান ছিলেন মুবারকের বেশি পছন্দের। তাঁকে মুবারক 'খসরু শাহ' উপাধিতে ভূষিত করে নানা গুরুত্বপূর্ণ রাজপদে নিয়োগ করেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য খসরু খাঁ মুবারককে হত্যা করে সিংহাসন দখল করেন।

মুবারক সিংহাসনে বসেই আলাউদ্দিনের আমলের কঠোর নিয়ন্ত্রণ-বিধি শিথিল করে দেন।

রাজনৈতিক অপরাধের জন্য বন্দীদের মুক্তি দিয়ে এবং নির্বাসিতদের পুনর্বাসিত করে মুবারক সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জনের চেষ্টা করেন। দ্রব্যমূল্য বা বাজারের উপর আরোপিত কঠোর নিয়ন্ত্রণও তিনি শিথিল করে দেন। ফলে উৎপাদক, ব্যবসায়ী প্রভৃতি শ্রেণীর মানুষ তাঁর সমর্থকে পরিণত হয়। ***বরণীর*** মতে, আলাউদ্দিন যে ভীতির পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে একাধারে অভিজাত ও সাধারণ মানুষকে সুলতানির প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্য জ্ঞাপনে বাধ্য করেছিলেন ; মুবারক শাহের যুক্তিহীন তোষণনীতির ফলে তা অন্তর্হিত হয়। ফলে কর্মচারীদের নৈতিক অধঃপতন দেখা দেয়, সাধারণ মানুষের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দানা বাঁধে এবং অভিজাতদের মধ্যে উচ্চাকাঙক্ষা ও ষড়যন্ত্রপ্রিয়তা প্রকট হয়ে ওঠে। সুলতানের ব্যভিচার ও অসংযমী জীবনযাপনের নগ্ন দৃষ্টান্ত প্রশাসনিক অবক্ষয়কে দ্রুত পুষ্ট করে।

গুজরাট, দেবগিরি এবং বরঙ্গলের বিরুদ্ধে মুবারক অবশ্য কয়েকটি সফল সামরিক অভিযানের ব্যবস্থা করেন। গুজরাট দখল করার পর সুলতানের শ্বশুর জাফর খাঁ সেখানকার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। খসরু বরঙ্গলের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে প্রচুর ধনসম্পদ লুণ্ঠন করেন। দাক্ষিণাত্যের বিদ্রোহদমনের পর মুবারকের ঔদ্ধত্য ও অহঙ্কার সীমাহীন হয়ে পড়ে। গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী তিন ভাই সাদি খাঁ, খিজির খাঁ ও শিহাবউদ্দিনকে তিনি নৃশংসভাবে হত্যা করেন। প্রকাশ্য রাজসভায় নর্তকী বা বারনারীদের এনে সভার মর্যাদা কলঙ্কিত করেন দ্বিধাহীন চিত্তে। বরণীর বিবরণে দেখা যায়, মুবারকের চার বছর চার মাস ব্যাপী রাজত্ব কালের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হয়েছিল নাচ, গান আর মদ্যপানে।

খসরু শাহ সুলতান মুবারকের বিকৃত লিপ্সার সঙ্গী ছিলেন। সুলতানের অনুগ্রহে উজীর-পদ তাঁর করায়ত্ত হয়েছিল। একজন ধর্মান্তরিত মুসলমানের এহেন পদোন্নতি ও প্রতিপত্তি ছিল কিছুটা আশ্চর্যজনক। তথাপি খসরু কোনদিনই মুবারকের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। মুবারকের অসংযমী আচরণ তাঁকে অবশ্যই ব্যথিত করত। তাই প্রথম থেকেই মুবারকের হাত থেকে মুক্তিলাভের বাসনা এই তরুণ যুবকের মনের গোপনে বাসা বেঁধেছিল। সুলতানের দুর্বলতার সুযোগে খসরু একটু একটু করে তাঁর লক্ষ্যপথে অগ্রসর হন। সুলতানের অনুমতিক্রমে খসরু গুজরাট থেকে নিজ গোষ্ঠীভুক্ত বহু লোককে দিল্লীতে এনে ৪০ হাজার অশ্বারোহীর এক বাহিনী গড়ে তোলেন। রাত্রিকালে প্রাসাদের অভ্যন্তরে নিজের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের সাথে আলাপ-আলোচনায় মিলিত হবার বিশেষ অনুমতিও তিনি পান। সুলতানের শুভাকাঙক্ষী কেউ কেউ খসরুর অভিপ্রায় সম্পর্কে সুলতানের কাছে সন্দেহ প্রকাশ করলেও মুবারক নির্লিপ্ত থাকেন। অতঃপর ১৩২০ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল খসরু এক গোপন পরিকল্পনা অনুসারে আকস্মিক আক্রমণ দ্বারা মুবারককে হত্যা করেন।

○ নাসিরুদ্দিন খসরু শাহ (১৩২০ খ্রীঃ) ঃ

মুবারক শাহকে হত্যা করে খসরু *'নাসিরুদ্দিন খসরু শাহ'* উপাধি নিয়ে সুলতানি সিংহাসনে বসেন। খসরুর রাজত্বকালকে খলজীবংশের অবসান এবং তুঘলক শাসনের সূচনার যোগসূত্র বলা চলে। সমকালীন মুসলমান লেখকরা খসরুকে 'নীচজাতিভুক্ত হিন্দু এবং অকৃতজ্ঞ ও বিশ্বাসঘাতক' বলে বর্ণনা করেছেন। বরণী খসরু কর্তৃক সিংহাসনদখলের ঘটনাকে 'ইসলামের

সংকট' এবং 'হিন্দুত্ববাদের পুনর্জাগরণ' বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু কোন বক্তব্যটিই যথার্থ নয়। ***প্রথমত,*** খসরু ষড়যন্ত্র দ্বারা ক্ষমতালাভ করলেও, তিনি অন্তত মুবারক শাহ্ বা আলাউদ্দিন খলজীর থেকে অধিক অকৃতজ্ঞ বা নিষ্ঠুর ছিলেন না। ***দ্বিতীয়ত,*** জন্মসূত্রে হিন্দু হলেও তিনি বাল্যকালেই ইসলামধর্মে দীক্ষিত হন এবং তাঁর নাম হয় 'হাসান'। তাঁর ক্ষমতাদখলের সময় তাঁরই উপজাতিভুক্ত গুজরাটের বহু হিন্দু এই কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। এমনকি তারা দিল্লী-প্রাসাদের অভ্যন্তরে হিন্দু ধর্মাচরণের সুযোগও পেয়েছিল। তবুও এই ঘটনাকে ইসলামের পরিবর্তে হিন্দুর অভ্যুত্থান বলা চলে না। কারণ খসরু কখনোই হিন্দুত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা বলেন নি। তিনি ইসলামের রীতি অনুযায়ী 'খুৎবা' পাঠ করেন এবং নিজেকে *'আল্লাহ্র সেনাপতি'* বলে অভিহিত করেন। এমনকি খসরুর বিরুদ্ধে যখন গাজীমালিক (তুঘলক) প্রাদেশিক মুসলমান শাসকদের ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানান, তখন অধিকাংশ শাসকই নির্লিপ্ত থাকেন। তাই খসরুর সিংহাসনদখলকে মধ্যযুগীয় ক্ষমতাদখলের রাজনীতির একটা অধ্যায় মাত্র বলে অধ্যাপক *কে. এস. লাল* অভিমত প্রকাশ করেছেন।

সিংহাসন দখল করে খসরু তাঁর আত্মীয়-বন্ধু এবং অন্যান্য যাঁরা ক্ষমতাদখলের সহায়ক ছিলেন, তাঁদের অর্থ দিয়ে কিংবা উচ্চপদে আসীন করে পুরস্কৃত করেন। বহু আলাই অভিজাতকে সম্মানিত করে তাদের সমর্থনলাভেরও চেষ্টা করেন। অবশ্য আলাউদ্দিনের জীবিত সমস্ত বংশধরকে হত্যা করে নিজের সিংহাসন কণ্টকমুক্ত করার ব্যাপারেও তিনি উদ্যোগ নেন। বহু ব্যক্তি খসরুর সমর্থকদের হাতে লাঞ্ছিত হন। ***ইবন বতুতা*** লিখেছেন, বেশ কিছু উঁচুপদে হিন্দুদের নিয়োগ করে মুসলমানদের জব্দ করা হয়। অবশ্য এ অভিযোগ যথেষ্ট যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত নয়।

খসরুর বিরুদ্ধে হিন্দুদের অভিযোগ প্রচার করে দিপালপুরের শাসনকর্তা গাজী তুঘলক জনমত গঠনে তৎপর হন। গাজী তুঘলকের পুত্র জুনা খাঁ তখন দিল্লীর দরবারে নিযুক্ত ছিলেন। পিতার নির্দেশে জুনা দিল্লী থেকে দিপালপুরে পালিয়ে যান। অতঃপর গাজী তুঘলক উচ্, মুলতান, সিস্তান, সামানা, জালোর প্রভৃতি প্রদেশের শাসনকর্তাদের খসরুর বিরুদ্ধে সমবেত হবার আহ্বান জানান। অবশ্য উচের শাসক বাহরাম আইবা ব্যতীত কেউই তাঁর আহ্বানে সাড়া দেননি। এমনকি সুফীসন্ত নিজামউদ্দিন আউলিয়াও খসরুর বিরোধিতা করতে অস্বীকার করেন। দিল্লী থেকে ***'আইন-উল-মুলক্'*** (আলম খাঁ) অবশ্য আসন্ন সংগ্রামে নিরপেক্ষতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেন। দিল্লীর সন্নিকটে তিলপত নামক স্থানে খসরুর সাথে গাজী মালিকের চূড়ান্ত যুদ্ধ হয় (৬ সেপ্টেঃ, ১৩২০ খ্রীঃ)। খসরু অপূর্ব বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে যখন জয়ের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত, তখন আইন-উল-মুলক্ আকস্মিক যুদ্ধ ত্যাগ করে মালবের পথে পালিয়ে যান। খসরু হতোদ্যম হয়ে পরাজয় মেনে নিতে বাধ্য হন। খসরুকে হত্যা করা হয়। অতঃপর অভিজাতদের অনুরোধক্রমে গাজী মালিক 'গিয়াসউদ্দিন তুঘলক শাহ' উপাধি নিয়ে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। শুরু হয় সুলতানি ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়।

○ খলজী-শাসনের পতনের কারণ ঃ

ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে খলজী-শাসনের গুরুত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে ***মহম্মদ হাবিব*** লিখেছেন ঃ ***"খলজী বংশের ক্ষমতালাভের ফলে যে ধারাবাহিক পরিবর্তন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা***

ঘটে, তাকে প্রায় বৈপ্লবিক বলা যায়।" ("The successive changes that coincided with the Khalji ascendency to prower and the various experiments.... may be dubbed as nothingshort of revolutionary.") **ড. কে. এস. লাল** মন্তব্য করেছেন ঃ *"অবিরাম রাজ্যবিস্তার, রাষ্ট্র-পরিচালনার নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে তাঁরা এক নবযুগের সূচনা করেন।"* মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করে সীমান্তের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা, অভিজাতদের কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করে বিচ্ছিন্নতাবাদকে ধ্বংস করা, উলেমাদের প্রভাব থেকে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনকে মুক্ত করা, নতুন নতুন রাজ্য জয় করে দিল্লী সুলতানিকে প্রকৃত সাম্রাজ্যের মর্যাদায় উন্নীত করা ইত্যাদি নানাক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন দ্বারা আলাউদ্দিন খলজীবংশের শাসনকে একটা প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। তথাপি খলজীবংশের শাসন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। আলাউদ্দিনের মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সাম্রাজ্যের অবক্ষয় সূচিত হয় এবং চার বছরের মধ্যেই দিল্লীর রাজপ্রাসাদ থেকে খলজীবংশের কর্তৃত্ব চলে যায়। বিরাট সাড়া জাগিয়ে খলজী-শাসনের এহেন দ্রুত পতনের জন্য ঐতিহাসিকেরা একাধিক কারণের অবতারণা করেছেন।

প্রথমত, খলজী সাম্রাজ্যবাদ গড়ে উঠেছিল আলাউদ্দিন খলজীর ব্যক্তিগত প্রতিভা ও উদ্যোগকে ভিত্তি করে। প্রতিভাবান উত্তরাধিকারীর মাধ্যমে সেই ধারা অব্যাহত থাকা সম্ভব ছিল। কিন্তু আলাউদ্দিনের উত্তরাধিকারীরা ছিলেন সম্পূর্ণ অদক্ষ এবং অপদার্থ। নিজ বংশধরদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে সাম্রাজ্যের ভার-বহনের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার কোন চেষ্টা তিনি করেননি। ফলে তাঁর পুত্রদের মধ্যে বিলাস-ব্যসন ও অনাচার এমনভাবে বাসা বেঁধেছিল যে, মসনদে বসার পরেও সেই অভিশপ্ত জগতের দুর্বার আকর্ষণ থেকে তাঁরা বেরিয়ে আসতে পারেননি। সন্দেহপ্রবণ মানসিকতা দ্বারা পরিচালিত হবার ফলে আলাউদ্দিন যতক্ষণ সক্ষম ও সবল ছিলেন, ততক্ষণ কাউকেই, এমনকি নিজের পুত্রদেরও, ক্ষমতার কেন্দ্রে আসার সুযোগ দেননি। স্বভাবতই সাধারণ গুণসম্পন্ন মুবারক খলজী বা অন্যদের পক্ষে এতবড় দায় বহন করা সম্ভব হয়নি।

দ্বিতীয়ত, খলজীদেরও কোন নির্দিষ্ট উত্তরাধিকার আইন ছিল না। ফলে ক্ষমতাদখলের জন্য দলাদলি, ষড়যন্ত্র এবং গুপ্তহত্যা প্রভৃতি এসেছিল অনিবার্যভাবে। ক্ষমতাবান মালিক ও আমীরগণও এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতেন। ফলে কেন্দ্রীয়-প্রশাসন দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং মাথাচাড়া দিয়েছিল বিচ্ছিন্নতাবাদ ও স্বাধীনতাকামিতা।

তৃতীয়ত, আলাউদ্দিন যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, তার ভিত্তি ছিল সামরিক শক্তি। এর পিছনে কোন গণ-সমর্থন ছিল না। এ ধরনের সরকারের স্থায়িত্ব নির্ভর করে সুলতানের ব্যক্তিত্ব, প্রতিভা ও দক্ষতার উপর। আলাউদ্দিন ছাড়া তাঁর বংশের অন্য কারও সেই গুণাবলী ছিল না। পরন্তু আলাউদ্দিন বিভিন্ন সংস্কার-কর্মসূচী দ্বারা আলাদা আলাদা ভাবে প্রায় প্রতিটি শ্রেণীর মানুষকে ক্ষুব্ধ করেছিলেন। স্বাধীনভাবে মেলামেশা নিয়ন্ত্রিত করার ফলে ক্ষুব্ধ ছিলেন তুর্কী-অভিজাতরা। হিন্দুদের প্রতি সুলতানের ব্যবহার ছিল বিমাতৃসুলভ। বাজার-নিয়ন্ত্রণের ফলে উৎপাদক ও ব্যবসায়ীশ্রেণী অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। *'নব-মুসলমান'*নামে পরিচিত মোঙ্গলগণ অধিক অধিকার ও মর্যাদার দাবিতে সর্বদাই ছিল সোচ্চার এবং প্রতিষ্ঠিত শাসনের বিরোধী। অর্থাৎ প্রায় সমস্ত শ্রেণীর নাগরিক খলজী-শাসনের অবসান ঘটানোর জন্য ছিল উন্মুখ। এই কারণে **ড. কে. কে.**

দত্ত বলেছেন ঃ *"The foundation of the military monarchy that Alauddin tried to build up was laid upon sand."*

○ তুঘলক বংশের শাসন (১৩২০-'৮৮ খ্রীঃ) ঃ

গাজী মালিক দিল্লীর সিংহাসনে বসার পর 'সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক' নামে পরিচিত হন। কিন্তু 'তুঘলক' শব্দটির অবস্থান সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। আমীর খসরু *'তুঘলকনামা'* গ্রন্থে গাজী মালিককে *'তুঘলক গাজী'* নামে অভিহিত করে লিখেছেন যে, তখন মোঙ্গল নেতারও 'তুঘলক' নাম গ্রহণ করত। খসরুর বিবরণীর ভিত্তিতে *কেনারসীপ্রসাদ সাক্সেনা* মনে করেন, 'তুঘলক' ছিল গিয়াসউদ্দিনের ব্যক্তিগত নাম, কোন বংশ বা জাতির নাম নয়। প্রমাণ হিসেবে পরবর্তী সুলতানের নামের উল্লেখ করা যায়। তিনি 'মহম্মদ-বিন-তুঘলক' নামে পরিচিত ছিলেন যার অর্থ তুঘলকের সন্তান মহম্মদ। সাম্‌স্‌-ই সিরাজ আফিফ তাঁর *তারিখ-ই-ফিরোজশাহী'* গ্রন্থে এই বংশের প্রথম শাসককে সুলতান তুঘলক এবং দ্বিতীয় শাসককে সুলতান মহম্মদ বলে উল্লেখ করেছেন। এমনকি ফিরোজও *'সুলতান ফিরোজ শাহ'* নামে পরিচিত ছিলেন। অর্থাৎ উপাধি বা বংশের নাম হিসেবে 'তুঘলক' শব্দটিকে গ্রহণ করা হয়নি। তবে মধ্যযুগে প্রতিষ্ঠাতার নামে শাসকগোষ্ঠীর সামগ্রিক পরিচয় প্রদানের রীতি অপরিচিত ছিল না। তাই অধিকাংশ ইতিহাসবিদ্ মনে করেন, *'সম্পূর্ণ সঠিক না হলেও এই বংশকে 'তুঘলক বংশ' নামে অভিহিত করা সুবিধাজনক'।*

তুঘলকদের উৎপত্তি সম্পর্কেও পণ্ডিতেরা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেননি। ইবন বতুতা *'রেহালা'* গ্রন্থে তুঘলকদের তুর্কীস্থানের *'কোরানা'*-গোষ্ঠীর লোক বলে অভিহিত করেছেন। এরা সম্ভবত তুর্কীস্থান ও সিন্ধুর মধ্যবর্তী পার্বত্য অঞ্চলে বসবাস করত। সমসাময়িক ইতালীয় পর্যটক মার্কোপোলো 'কোরানা' অর্থে তাতারবংশীয় পিতা ও ভারতীয় মাতার সন্তানকে বুঝিয়েছেন; আবার কেউ কেউ 'কোরানা' শব্দটিকে সংস্কৃত শব্দ 'করনা'-র সমার্থক বলে মনে করেন, যার অর্থ ক্ষত্রিয় পিতা ও শূদ্র মাতার বিবাহজাত সন্তান। অবশ্য গাজী মালিকের বাল্য-ইতিহাস অনুযায়ী তাঁর এই সম্পূর্ণ ভারতীয় সৃষ্টিতত্ত্ব মানা যায় না। 'তারিখ-ই-রসিদি' গ্রন্থের ভিত্তিতে *ইলিয়াস (Nay Elias)* মনে করেন, কোরানা-তুর্কীরা ছিল মোঙ্গলদের একটি শাখা। ফেরিস্তা তুঘলকদের উৎপত্তি সম্পর্কে নানা তথ্য বিশ্লেষণ করে লিখেছেন যে, গিয়াসউদ্দিনের পিতা ছিলেন তুর্কী ক্রীতদাস এবং মাতা ছিলেন লাহোরের জনৈকা জাঠ রমণী। এই বিতর্কের ভিত্তিতে মোটামুটিভাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, ভারতবর্ষ, মধ্য-এশিয়া এবং পারস্যে 'সংকরজাতি' বোঝাতেই 'কোরানা' শব্দটি ব্যবহৃত হত। এবং এই শব্দ দ্বারা মোঙ্গল বা তুর্কী পিতা এবং অ-তুর্কী মাতার মিলনজাত সন্তানকে বোঝাত।

○ গিয়াসউদ্দিন তুঘলক শাহ গাজী (১৩২০-'২৫ খ্রীঃ) ঃ

গিয়াগউদ্দিনের বাল্যকাল সম্পর্কেও পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, তিনি তুর্কী পিতা ও হিন্দু মাতার সন্তান ছিলেন। তাই তাঁর চরিত্রের মধ্যে তুর্কীর উদ্যম ও শক্তি এবং হিন্দুর সহনশীলতার সমন্বয় ঘটেছিল। *আফিফ* ও *ইবন বতুতার* মতে, তিনি প্রথমে

জালালউদ্দিন খলজীর আমলে সামরিক বৃত্তিতে নিযুক্ত হন। *খসরুর* মতে, জালালের মৃত্যুর পর গিয়াসউদ্দিন আলাউদ্দিনের ভাই উলুঘ খাঁ'র অধীনে চাকরি নেন। উলুঘ খাঁ'র মৃত্যুর পর তিনি আলাউদ্দিনের অধীনে নিযুক্ত হন এবং মোঙ্গল আক্রমণের বিরুদ্ধে উপর্যুপরি সাফল্য প্রদর্শন করে সুলতানের সুনজরে আসেন। সম্ভবত মোঙ্গল নেতা ইকবালমন্দের বিরুদ্ধে সাফল্য অর্জনের পর পুরস্কার হিসেবে তিনি দীপালপুরের ইক্তা লাভ করেন। *ইবন বতুতা* লিখেছেন : গিয়াসউদ্দিন উনত্রিশবার মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। তবে খসরুর মতে, এই সংখ্যা আঠার এবং এর অনেকগুলিই ছিল ছোটখাট সংঘর্ষ। যাই হোক্, বিশ্বস্ত যোদ্ধা হিসেবে গাজী মালিক দিল্লীর সুলতানের বিশ্বস্ততা অর্জন করেছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে আশ্চর্যের বিষয় হল যে, প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও মালিক কাফুর কর্তৃক প্রশাসনিক ক্ষমতা কুক্ষিগতকরণের ঘটনা জেনেও তিনি নিস্পৃহ থাকলেন কেন? যাই হোক মুবারক শাহের রাজত্বকালেও তাঁর মর্যাদা ও প্রতিপত্তি অব্যাহত থাকে। অবশেষে খসরু কর্তৃক দিল্লীর মসনদ অধিকৃত হলে গাজী মালিক বিদ্রোহী হন। এবং খসরুকে হত্যা করে অভিজাতদের অনুরোধক্রমে সিংহাসনে আরোহণ করেন (৮ই সেপ্টেঃ, ১৩২০ খ্রীঃ)।

ড. ডি. বি. পাণ্ডের মতে, তিনটি কারণে গিয়াসউদ্দিনের ক্ষমতালাভ তাৎপর্যপূর্ণ : (১) সুলতানি ইতিহাসে এই প্রথম সুলতান সর্বসম্মতিক্রমে মনোনীত হলেন, (২) জনগণের প্রতি কর্তব্যবোধ থেকেই দক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে তাঁকে গ্রহণ করা হল এবং (৩) কোন রাজতান্ত্রিক ঐতিহ্য না-থাকা সত্ত্বেও অভিজাতগণ গিয়াসউদ্দিনের কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ জানালেন না।

ক. গিয়াসউদ্দিনের সমস্যাদি : প্রতিপত্তিশালী মালিক ও আমিরগণ কর্তৃক সমর্থিত হয়ে সিংহাসনে বসলেও গিয়াসউদ্দিনকে নানামুখী সমস্যা দ্বারা বিব্রত হতে হয়। মুবারক শাহ এবং খসরুর দুর্বল শাসনকালে দিল্লীর কর্তৃত্ব বেশ শিথিল হয়ে পড়েছিল। সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলির অবস্থা ছিল বেশি খারাপ। সিন্ধুর শাসক অমর থাট্টাও নিম্ন-সিন্ধুর কিছু অংশ দখল করে দিল্লীর কর্তৃত্ব একপ্রকার অগ্রাহ্য করেই শাসন চালাচ্ছিলেন। গুজরাটেও দিল্লীর কর্তৃত্ব ছিল নামেমাত্র। রাজপুতানা, চিতোর, নাগৌর, জালোর প্রভৃতি স্থানে ক্ষমতা পুনর্দখলে উৎসাহী রাজপুত নেতাদের আক্রমণের তীব্রতা অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছিল। পূর্ব ভারতে 'চিরবিদ্রোহী' বাংলাদেশের প্রাক্তন শাসক সামস্উদ্দিন ফিরোজের মৃত্যুর পর এক গৃহযুদ্ধ দ্বারা ফিরোজের অন্যতম পুত্র বাহাদুর শাহ সোনারগাঁও, লখনৌতি দখল করে প্রায় স্বাধীন শাসনের সূচনা করেছিলেন। তিরহুত, জাজনগর (উড়িষ্যা) প্রভৃতি অঞ্চলে হিন্দু জমিদারদের স্বাধীন কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল। দক্ষিণ ভারতের অবস্থাও খুব আশাপ্রদ ছিল না। আলাউদ্দিন বাৎসরিক কর প্রদানের শর্তে দাক্ষিণাত্যের রাজাদের স্বরাজ্যে বহাল রেখেছিলেন। অবশ্য মুবারক শাহ দেবগিরির উপর সুলতানের প্রতিনিধি স্থাপন করে ঐ রাজ্যে সরাসরি দিল্লীর কর্তৃত্ব কায়েম করেছিলেন। কিন্তু মুবারক ও খসরুর মৃত্যুর পর তেলেঙ্গানার শাসক প্রতাপরুদ্র কিংবা হোয়সলরাজা বীরবল্লাল দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করে একপ্রকার স্বাধীনভাবে রাজত্ব চালাতে থাকেন।

রাজনৈতিক সংকটের মত প্রশাসনিক সংকটও ছিল বেশ ব্যাপক। গিয়াসউদ্দিনের পূর্ববর্তী দুই সুলতান ছিলেন চরম অপদার্থ। তাৎক্ষণিক ক্ষমতার লোভে বিভোর হয়ে এঁরা উদার হস্তে রাজকোষের সঞ্চিত অর্থ বিতরণ করেন আমীর, মালিক-সহ সেনাবাহিনীর বিভিন্ন সদস্যদের

মধ্যে। ফলে একদিকে যেমন রাজকোষ শূন্য হয়, অন্যদিকে তেমনি সুলতানি কর্তৃত্ব একান্তভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে অভিজাতবর্গ ও সেনাবাহিনীর মর্জির উপর। আলাউদ্দিনের কঠোর নিয়ন্ত্রণ-নীতি কিংবা ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা থেকে সরে আসার ফলে রাজা এবং রাজকোষ দুই-ই দুর্বল হয়ে পড়ে। এক কথায় গিয়াসউদ্দিনের সামনে সমস্যা ছিল অনেক এবং তাদের প্রকৃতি ছিল বেশ জটিল। এই কারণে ড. *সাক্সেনা* লিখেছেন ঃ "*The problems which confronted Ghiyasuddin Tughluq were not only vast in their magnitude, but also complicated in their nature.*"

বহুমুখী ও বহুব্যাপী সমস্যার সামনে গিয়াসউদ্দিন বিব্রত বা বিভ্রান্ত না হয়ে, ধীর-স্থির ভাবে তাদের মূলোৎপাটনে অগ্রসর হন। বয়স্ক হলেও তাঁর চরিত্রে ছিল অপ্রতিরোধ্য উদ্যম, নির্ভুল বিচারবোধ, দৃঢ় প্রত্যয় এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর ঐকান্তিক ইচ্ছা। গিয়াসউদ্দিনের কর্মদক্ষতার প্রশংসা করে *বরণী* লিখেছেন ঃ "*অন্যের যে কাজ সম্পন্ন করতে কয়েক বছর লেগে যায়, সেখানে তিনি কয়েক দিনেই তা সমাধান করতে পারেন।*" গিয়াসউদ্দিনের কর্মধারার মধ্যে বরণী সুলতান 'আলাউদ্দিনের ছায়া' দেখে পুলকিত বোধ করেছেন। বস্তুত, বরণীর মূল্যায়ন সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ছিল না। গিয়াসউদ্দিন রণনৈপুণ্যের সাথে রাষ্ট্রপ্রজ্ঞার সমন্বয়সাধন করে উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলা করেন।

খ. অভ্যন্তরীণ-নীতি ঃ গিয়াসউদ্দিন বাস্তববাদী শাসক। তিনি আলাউদ্দিনের কঠোর নীতি কিংবা মুবারক খলজীর অতি-নমনীয় শাসন-নীতি পরিহার করে মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন। দৃঢ় অথচ নমনীয় বা *'Kich and kiss'* নীতি গ্রহণ করে তিনি নিজের হাত শক্ত করেন এবং শত্রুদের দুর্বল করে দেন। প্রথমেই তিনি তাঁর আত্মীয় ও শুভানুধ্যায়ীদের গুরুত্বপূর্ণ রাজপদ ও রাজকীয় উপাধি প্রদান করে সম্মানিত করেন। খলজী আমলের সেনাপতি আমলাদেরও জায়গির বা পদমর্যাদা বহাল রাখেন। এমনকি যাঁরা খসরুকে সাহায্য করেছিলেন, সেই সকল অভিজাতগণকেও তিনি ক্ষমা করেন। খলজীবংশের বিবাহযোগ্য কন্যাদের বিবাহের ব্যবস্থাও তিনি করেন। এইভাবে তিনি নিজের এক উজ্জ্বল ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে গক্ষম হন।

'সমৃদ্ধ রাজকোষ শক্তিশালী রাজতন্ত্রের প্রধান উপাদান'—এই সত্য অনুধাবন করতে গিয়াসউদ্দিনের দেরি হয়নি। তাই ক্ষমতা সংহত করার পরেই তিনি ভেঙে-পড়া রাজকোষকে সমৃদ্ধ করার উদ্যোগ নেন। খসরুর আমলে বিশাল পরিমাণ অর্থ তাঁর বশংবদ ব্যক্তিদের দান করা হয়েছিল। গিয়াসউদ্দিন এক নির্দেশ জারি করে তা ফিরিয়ে দিতে বলেন। তিনি বলেন, *'রাজকোষের সম্পদ কেবলমাত্র জনকল্যাণে ব্যয় করা উচিত।'* কিন্তু খসরু ব্যক্তিগত সম্পত্তির মতই তা অকাতরে দান করেছেন। যাই হোক, অনেকেই স্বেচ্ছায় প্রাপ্ত অর্থ ফিরিয়ে দেন। অনেকের কাছ থেকে জোর করে তা আদায় করা হয়। শেখ নিজামউদ্দিনের মত কেউ কেউ তা প্রত্যর্পণের অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। ক্ষুব্ধ হলেও ধর্মীয় কারণে গিয়াসউদ্দিন এই ব্যতিক্রম মেনে নেন।

কৃষিক্ষেত্রে উৎসাহবৃদ্ধির জন্য গিয়াসউদ্দিন আলাউদ্দিনের ভূমিব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস ঘটান। *বরণীর* মতে, এক্ষেত্রেও গিয়াসউদ্দিন আলাউদ্দিনের কঠোর নীতির পরিবর্তে 'মধ্যপন্থা' গ্রহণ করেন। তখন ভূমি-রাজস্বব্যবস্থার সাথে জড়িত ছিল তিনটি শ্রেণী, সাধারণ কৃষক (বলাহার),

গ্রামপ্রধান (মুকদ্দম) এবং প্রাদেশিক শাসক (মাক্তা)। আলাউদ্দিনের ভূমিব্যবস্থা উক্ত তিনটি শ্রেণীকেই ক্ষতিগ্রস্ত ও নিরুৎসাহী করেছিল। রাজস্বের হার অত্যধিক হবার ফলে কৃষক চাষ-আবাদের বিকল্প জীবিকা অনুসন্ধানে অধিক আগ্রহী ছিল। মুকদ্দমদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা কেড়ে নেবার ফলে রাজস্ব-সংগ্রহের কাজে তারা নিরুৎসাহিত ছিল। আর মধ্যস্বত্বভোগীদের অবর্তমানে মাক্তাদের পক্ষে ভূমি-রাজস্ব যথাযথভাবে আদায় করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছিল। গিয়াসউদ্দিন ভূমিব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করে এই তিন শ্রেণীকেই ন্যায়ানুগ ভাবে পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবার ব্যবস্থা করেন। তিনি জমি-জরিপের (হুকুম-ই-মাসাহাত) ভিত্তিতে রাজস্ব নির্ধারণের পরিবর্তে কৃষি-জমিতে রাজস্ব-কর্মীর উপস্থিতিতে উৎপন্ন ফসল ভাগ করার (হুকুম-ই-হাসিল) ব্যবস্থা চালু করেন। এর ফলে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় রাজস্ব প্রদানের বাধ্যবাধকতা থেকে কৃষক মুক্তি পায়। আলাউদ্দিন উৎপাদনের ৫০ শতাংশ ভূমি-রাজস্ব হিসেবে আদায়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। গিয়াসউদ্দিন এই হার কমিয়ে দেন। সম্ভবত তিনি চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী উৎপাদনের এক-পঞ্চমাংশ স্বাভাবিক রাজস্ব নির্ধারণ করেন। এর উপরে কালক্রমে সর্বাধিক শতকরা $\frac{১}{১০}$ বা $\frac{১}{১১}$ ভাগ বৃদ্ধির অনুমোদন দেন। কারণ গিয়াসউদ্দিন উপলব্ধি করেছিলেন যে, কৃষকের উপর আকস্মিক রাজস্বের চাপ বৃদ্ধি পেলে উৎপাদন ব্যাহত হবে এবং দেশের অগ্রগতি থমকে যাবে। তাই বারবার সুলতান রাজস্ব-কর্মীদের সাবধান করে দেন যে, তারা যেন আকস্মিক রাজস্বের হার অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি না করে। কৃষকের উন্নতি এবং উৎসাহ যাতে কোনভাবেই নষ্ট না হয় সেদিকে সুলতানের তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল।

আলাউদ্দিন যেভাবে মুকদ্দম প্রভৃতি গ্রাম-প্রধানের মান-অবনমন করে সাধারণ কৃষকের সমপর্যায়ভুক্ত করেছিলেন, তা গিয়াসউদ্দিনের মনঃপূত ছিল না। তিনি মনে করতেন, দীর্ঘকাল ধরে রাজস্ব আদায়ের কাজে লিপ্ত, দায়িত্বসচেতন এবং ক্ষমতাবান এই গোষ্ঠীর সহায়তা ব্যতীত রাজস্ব-প্রশাসন সুষ্ঠুভাবে চালানো সম্ভব নয়। তাই তিনি পুনরায় নির্দিষ্ট কমিশনের ভিত্তিতে মুকদ্দমদের হাতে রাজস্ব-সংগ্রহের দায়িত্ব ন্যস্ত করেন। গ্রাম-প্রধানদের নিজেদের আবাদী জমিকে করমুক্ত করে দেওয়া হয়। অবশ্য কৃষক বা গ্রাম-প্রধান উভয়ের ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা এমনভাবে বৃদ্ধি করা হয়, যাতে তাদের স্বাচ্ছন্দ্য থাকে ; কিন্তু এমন সম্পদ যাতে সৃষ্টি না হয় যা কৃষকদের কর্মবিমুখ করে তুলতে পারে বা গ্রাম-প্রধানদের বিদ্রোহাত্মক কাজে লিপ্ত হতে উৎসাহ দেয়। প্রাদেশিক শাসক বা মাক্তাদের ক্ষেত্রেও গিয়াসউদ্দিন রাজস্ব-বিলিব্যবস্থা *(Practice of farming)* মেনে নেন। অবশ্য এই ব্যবস্থার কুফল সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। কিন্তু প্রশাসনের সর্বোচ্চ পর্যায়ে, যেমন মাক্তারা, রাজস্ব বিলিব্যবস্থার উপর নির্ভর করেই কাজ করতেন। বরণীর বিবরণ থেকে জানা যায় যে, গিয়াসউদ্দিন নির্দিষ্ট শর্তে *Farming* ব্যবস্থা চালু করেন। মাক্তারা প্রদেশের আদায়ীকৃত রাজস্বের $\frac{১}{১৫}$ রেখে বাকিটা কেন্দ্রীয় কোষাগারে পাঠাতে বাধ্য ছিল। কারকুন বা মুতাসরিফ প্রমুখ প্রতিনিধি হাজার প্রতি ৫ টঙ্কা কমিশন হিসেবে নিলেও নিতে পারতেন। তবে এর বেশি রাখলে সুলতান তাদের কঠোর শাস্তি দিতেন। উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য গিয়াসউদ্দিন নতুন নতুন এলাকাকে কৃষিকার্যের অধীনে আনার জন্য চাষীদের উৎসাহ দেন। একাধিক খাল খনন করে জলসেচের ব্যবস্থা করেন এবং অনাবৃষ্টির সময় কৃষকদের 'তাকাবি' ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। গিয়াসউদ্দিনের ভূমি-রাজস্বব্যবস্থার সুফল

খুব শীঘ্রই অনুভূত হয়। ড. *সাক্সেনা* লিখেছেন ঃ *"এর ফলে রাজকোষ এতই সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে যে, সুলতানের পক্ষে সামরিক কর্মসূচী দ্বারা রাজনৈতিক আধিপত্য প্রসারের লক্ষ্যে এগোনো সহজ হয়ে ওঠে।"* ভূমি-রাজস্বব্যবস্থার সংস্কারের কাজে গিয়াসউদ্দিনের নমনীয় বাস্তববাদী পরিকল্পনার প্রশংসা করে ড. *শর্মা (S. R. Sharma)* লিখেছেন ঃ ***"We do not come across such tender consideration for the country until the days of Sher Shah Suri two centuries later."***

দেশের উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণেও গিয়াসউদ্দিন তৎপরতা দেখান। যোগাযোগ-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য তিনি নতুন রাস্তা নির্মাণ করেন এবং পুরানো রাস্তার সংস্কারসাধন করেন। ডাক-যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের দিকেও তিনি দৃষ্টি দেন। *ইবন বতুতা* লিখেছেন ঃ 'তখন ২০০ মাইল দূরের চিঠি চব্বিশ ঘণ্টায় যথাস্থানে পৌঁছে যেত। বিচারবিভাগকেও তিনি ঢেলে সাজান। সাধারণ অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তি নিষিদ্ধ করে দেন। বিচারকদের দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য তিনি সদা সচেতন ছিলেন। ঐতিহাসিকদের মতে, গিয়াসউদ্দিনের আমলে বিচারবিভাগের দক্ষতা এমন স্তরে পৌঁছেছিল যে, '*নেকড়ে মেষশাবককে আক্রমণ করতে ভয় করত কিংবা হরিণ সিংহের পাশে একই ঝরনায় জল পান করতে পারত।*'

গ. সামরিক অভিযান ঃ গিয়াসউদ্দিন জীবন শুরু করেছিলেন একজন সৈনিক হিসেবে। পরবর্তী কালে সীমান্তরক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে তিনি সামরিক দক্ষতার পরিচয় দেন। তাই সুলতানি-কর্তৃত্ব দখল করার পরে তিনি বিশেষ গুরুত্বের সাথে সামরিক-বাহিনীর পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। মুবারক শাহ এবং খসরু শাহের আমলে সুলতানি বাহিনীর শৃঙ্খলা এবং দক্ষতার ব্যাপক অবনতি ঘটেছিল। গিয়াসউদ্দিন সামরিক বাহিনীর মধ্যে শৃঙ্খলাস্থাপন ও কর্মদক্ষতাবৃদ্ধির উদ্যোগ নেন। আলাউদ্দিনের আমলের 'দাগ' ও 'হুলিয়া' প্রথা কঠোরভাবে বলবৎ করেন। সামরিক বাহিনীর বেতন ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেন। *বরণীর* মতে, গিয়াসউদ্দিনের সামরিক-নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল তাদের সার্বিকভাবে সন্তুষ্ট রাখা। এমনকি তাদের পিতামাতার থেকেও সুলতান সৈন্যদের সুখ-সমৃদ্ধির জন্য বেশি কাতর ছিলেন। যাই হোক, দু'বছরের মধ্যেই তিনি সেনাবাহিনীর দক্ষতা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন এবং অভিযান-পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

গিয়াসউদ্দিন ১৩২১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ফকরউদ্দিন মহম্মদ জুনা খাঁ (উলুঘ খাঁ)-র নেতৃত্বে বরঙ্গলের বিরুদ্ধে এক অভিযান পাঠান। বরঙ্গল আলাউদ্দিনের আমলে দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করে বাৎসরিক করপ্রদানে সম্মত হয়েছিল। কিন্তু আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পর দিল্লীর দুর্বল শাসকদের আমলে বরঙ্গলের রাজা প্রতাপরুদ্রদেব দিল্লীর বশ্যতা অগ্রাহ্য করেন এবং কর পাঠানো বন্ধ করে দেন। গিয়াসউদ্দিন পূর্ব অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য জুনা খাঁকে সসৈন্যে বরঙ্গল আক্রমণের জন্য প্রেরণ করেন। জুনা খাঁ দেবগিরি হয়ে বরঙ্গলে উপস্থিত হন এবং বরঙ্গলদুর্গ অবরোধ করেন। এই দুর্গটি ছিল প্রায় দুর্ভেদ্য। তাই ছয় মাস অবরোধ করেও জুনা খাঁ দুর্গ দখল করতে ব্যর্থ হন। প্রতাপরুদ্রদেব দীর্ঘকাল অবরুদ্ধ থাকার ফলে ধৈর্যহীন হয়ে পড়েন। তিনি আশা করেছিলেন, অতীতের মতই করদানে স্বীকৃত হলে দিল্লী অবরোধ তুলে নেবে। তাই তিনি জুনা খাঁর কাছে সন্ধির প্রস্তাব পাঠান। কিন্তু জুনার লক্ষ্য ছিল তেলেঙ্গানা রাজ্য দিল্লী-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা। তাই তিনি অবরোধ চালিয়ে যেতে থাকেন। এদিকে

দীর্ঘকাল অবরোধে লিপ্ত থাকার ফলে সুলতানি-বাহিনীর মধ্যে অসন্তোষ ধূমায়িত হতে থাকে এবং বিদ্রোহাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। তবে এই বিদ্রোহের কারণ সম্পর্কে মতভেদ আছে। বরণীর মতে, ছয় মাসের নিষ্ফল অবরোধে সুলতানি-বাহিনী ধৈর্যহীন হয়ে পড়েছিল। তাদেরই কয়েকজন নেতা যাদের প্রধান ছিলেন উবাইদ, সুলতানের মৃত্যুসংবাদ-প্রচার করে বাহিনীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেন। পক্ষান্তরে ইবন বতুতা মনে করেন, জুনা খাঁ নিজেই সিংহাসন দখলের জন্য এই অপপ্রচারের সাহায্য নেন। *স্যার উলসী হেগ* এই মত সমর্থন করেন। কিন্তু *আগা মাহদী হোসেন* প্রমুখ ইবন বতুতার বক্তব্যকে সমর্থনযোগ্য বলে মনে করেন না। যাই হোক, বরঙ্গলের বিরুদ্ধে প্রথম অবরোধ ব্যর্থ হয় এবং জুনা খাঁ দিল্লী ফিরে আসেন। কিন্তু চার মাসের মধ্যেই আবার জুনা খাঁর নেতৃত্বে বরঙ্গলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযান প্রেরণ করেন। জুনা ১৩২৩ খ্রীষ্টাব্দে বরঙ্গলে উপস্থিত হন। এবারেও প্রতাপরুদ্রদেব প্রবল বাধা দেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণে বাধ্য হন। সপরিবারে তাঁকে বন্দী করে দিল্লীতে আনা হয়। প্রতাপরুদ্রদেবের ভাগ্যে কি জুটেছিল, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। ড. *সাক্সেনার* মতে, দিল্লীতে পৌঁছেই অপমানে দগ্ধ রাই প্রতাপরুদ্র আত্মহত্যা করে জীবন বিসর্জন দেন। তবে ড. *রমেশচন্দ্র মজুমদারের* মতে, প্রতাপরুদ্র সুলতানের নজরবন্দী হিসেবে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে বাধ্য হন। যাই হোক, বরঙ্গল দিল্লীর অন্তর্ভুক্ত হয়। জুনা খাঁ সেখানকার শাসক নিযুক্ত হন।

বরঙ্গল অভিযানের অঙ্গ হিসাবে জুনা খাঁ উড়িষ্যার জাজনগর রাজ্য আক্রমণ করেন (১৩২৪ খ্রীঃ)। জাজনগরের রাজা ভানুদেব (১৩০৬-'২৮ খ্রীঃ) বরঙ্গলের রাজা প্রতাপরুদ্রকে সাহায্যদান এবং গণ্ডোয়ানার শাসকের সাথে মিত্রতাস্থাপনের জন্য সুলতানের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। সুলতানি বাহিনী জাজনগরে উপস্থিত হলে ভানুদেব প্রচণ্ড বাধা দেন। কিন্তু সুলতানি-বাহিনীর কাছে তিনি পরাজিত হন। জুনা খাঁ জাজনগর থেকে প্রচুর ধনসম্পদ এবং ৫০টি যুদ্ধহস্তী সংগ্রহ করেন। এই সাফল্যের জন্য গিয়াসউদ্দিন জুনা খাঁকে নতুন সম্মানে ভূষিত করেন। একটি সমসাময়িক মুদ্রা থেকে জানা যায় যে, তাঁকে *'জগতের নেতা' (Khan of the World)* নামে সম্মানিত করা হয়েছিল।

প্রায় একই সময়ে উত্তর-সীমান্তে মোঙ্গল হানা এবং গুজরাটের স্থানীয় শাসক কর্তৃক বিদ্রোহের ঘটনা গিয়াসউদ্দিনের সামনে বিপদের বার্তা বয়ে আনে। শের মুঘুল-এর নেতৃত্বে মোঙ্গলরা সিন্ধু অতিক্রম করে ভারতে ঢুকে পড়ে। সীমানার শাসক গুরুসাস্প সুলতানের কাছে সাহায্যের আবেদন জানালে, গিয়াসউদ্দিন মালিক সাদির নেতৃত্বে সেনাসাহায্য প্রেরণ করেন। গুরুসাস্প ও সাদি খাঁ মোঙ্গলদের পরাজিত ও বিতাড়িত করেন। বহু মোঙ্গলকে বন্দী করা হয়। সাদি খাঁ গুজরাটের বিদ্রোহ দমন করেন। তবে বিদ্রোহীদের হাতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

চিরবিদ্রোহী বাংলাদেশকে দিল্লীর অধীনস্থ করার একটা সুযোগ গিয়াসউদ্দিনের সামনে উপস্থিত হলে সুলতান স্বয়ং বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। আগা মাহ্দী হোসেন-এর মতে, গিয়াসউদ্দিন দাক্ষিণাত্য বিজয়ের তুলনায় বাংলাদেশে কর্তৃত্ব স্থাপনকে বেশি গুরুত্ব দেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, সুলতান কাইকোবাদের আমলে তাঁর পিতা তথা বলবনের পুত্র বুগ্‌রা খাঁ বাংলাদেশে একপ্রকার স্বাধীন শাসনের সূচনা করেছিলেন। বুগ্‌রা খাঁর বংশধর ফিরোজ শা ১৩২২ খ্রীষ্টাব্দে মারা গেলে তাঁর চার পুত্র শিহাবউদ্দিন, নাসিরুদ্দিন, গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর ও

কুতলু খাঁ ক্ষমতাদখলের দ্বন্দ্বে লিপ্ত হন। গিয়াসউদ্দিন ইতিপূর্বেই সোনার গাঁও-এর শাসক হিসেবে কিছুটা শক্তি সঞ্চয় করেছিলেন। ফলে তিনি কুতলুকে হত্যা করে এবং অপর দুই ভাইকে বিতাড়িত করে বাংলাদেশের উপর কর্তৃত্ব কায়েম করেন। ***ইবন বতুতার*** মতে, এই বিপদকালে শিহাবউদ্দিন ও নাসিরুদ্দিন সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের সাহায্য প্রার্থনা করেন। এই সুযোগে বাংলাদেশের উপর দিল্লীর কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে গিয়াসউদ্দিন স্বয়ং বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হন। দিল্লীর নিরাপত্তার ভার থাকে জুনা খাঁর উপর। গিয়াসউদ্দিন খুব সহজেই গিয়াসউদ্দিন বাহাদুরকে পরাজিত ও বন্দী করেন। তাঁকে দিল্লীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। নাসিরুদ্দিনকে লখ্নৌতির শাসক নিযুক্ত করা হয়। সাতগাঁও এবং সোনারগাঁও-এর শাসনভার দেওয়া হয় তাতার খাঁর হাতে।

বাংলাদেশ থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে গিয়াসউদ্দিন তিরহুত (ত্রিহুত) আক্রমণ করেন। তিরহুতের রাজাও দীর্ঘকাল দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করে আসছিলেন। সুলতানের আগমন সংবাদে ভীত হয়ে তিনি জঙ্গলে আশ্রয় নেন। তিরহুতের শাসনভার আহমেদ খাঁর হাতে ন্যস্ত করে সুলতান দিল্লীর পথে অগ্রসর হন।

ঘ. গিয়াসউদ্দিনের মৃত্যু—ষড়যন্ত্র অথবা দুর্ঘটনা ঃ বাংলাদেশ থেকে নবনির্মিত রাজধানী তুঘলকাবাদের উদ্দেশ্যে প্রত্যাবর্তনের মাঝে আফগানপুর নামক এক ছোট্ট গ্রামে সদ্যনির্মিত একটি কাঠের অস্থায়ী প্রাসাদে গিয়াসউদ্দিনের রাত্রিকালীন বিরতির ব্যবস্থা করা হয়। সম্ভবত, সুলতানের আদেশে তাঁর পুত্র জুনা খাঁর তত্ত্বাবধানে এই অস্থায়ী প্রাসাদ নির্মিত হয়। প্রচলিত রীতি ছিল যে, সুলতান সফল অভিযান শেষে রাজধানীতে প্রবেশ করতেন শুভমুহূর্তে। তাই প্রয়োজনে রাজধানীর সন্নিকটে কোন স্থানে কিছুটা সময় অতিবাহিত করতেন। তাই আফগানপুরে সুলতানের অস্থায়ী বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সুলতান পাত্র-মিত্রদের সাথে রাত্রিকালীন আহার সমাপ্ত করেন। অতঃপর অধিকাংশ অভিজাত হাত-মুখ ধোয়ার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে যান। এই সময় অকস্মাৎ প্রাসাদটি ভেঙে পড়ে এবং সুলতান স্বয়ং ও অন্য দু-চার জন ব্যক্তি ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে নিহত হন। প্রাসাদটি কেন ভেঙ্গে পড়ল এবং এর পিছনে জুনা খাঁর কোন দূরভিসন্ধি ছিল কিনা—এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকদের মধ্যে পরিষ্কার মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। ***জিয়াউদ্দিন বরণী*** লিখেছেন ঃ এক আকস্মিক বজ্রাঘাতে অস্থায়ী মণ্ডপটি ধসে পড়েছিল। কিন্তু ইবন বতুতা ভিন্ন কথা বলেন। দুর্ঘটনার কয়েক বছর পরে (১৩৩৩ খ্রীঃ) তিনি ভারতে আসেন। তবে সুলতানের সহযোগী এবং ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী শেখ রুক্ন্উদ্দিনের কাছ থেকে বিবরণটি শুনেছেন বলে দাবি করেন। ***ইবন বতুতা*** লিখেছেন ঃ *আহার সমাপনের পর জুনা খাঁ প্রার্থনার জন্য অন্যান্যদের ঘরের বাইরে যাওয়ার অনুরোধ করেন এবং সুলতানকে বাংলাদেশ থেকে দখল-করা হাতির কুচকাওয়াজ দেখার অনুরোধ করেন। এই হাতির চাপে মণ্ডপটি ভেঙ্গে পড়ে এবং সুলতান চাপা পড়েন। তাঁর আর্ত চিৎকার শোনা সত্ত্বেও জুনা খাঁ ইচ্ছাকৃতভাবে উদ্ধার-কার্যে দেরি করেন।*

ইয়াহিয়া বিন্ আহমেদ-এর *'তারিখ-ই মুবারকশাহী'*, নিজামউদ্দিন আহমেদের *'তাবাকৎ-ই-আকবরী'* এবং বদাউনির *'মুন্তাখাব-উৎ-তোয়ারিখ'* গ্রন্থসমূহে ইবন বতুতার মতকেই সমর্থন করা হয়েছে এবং এই দুর্ঘটনার পিছনে জুনা খাঁর দূরভিসন্ধির ছাপ স্বীকার করা হয়েছে।

নিজামউদ্দিন মনে করেন, ফিরোজ শাহ ক্ষুব্ধ হবেন এই ভয়ে বরণী সত্য গোপন করে মনগড়া বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর মতে, সুলতানের বাংলা অভিযানের সময় নিজামউদ্দিন আউলিয়া এবং জুনা খাঁ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন। নিজামউদ্দিনের প্রতি সুলতান অসন্তুষ্ট ছিলেন। কারণ সুলতান আগের দান-করা সম্পত্তি ফেরত চাইলে নিজামউদ্দিন তা দিতে অস্বীকার করেছিলেন। তাই ক্ষুব্ধ সম্রাট বাংলা থেকে দিল্লী ফেরার আগেই সুফীসন্তকে দিল্লী ত্যাগের নির্দেশ দেন। এ কথা শুনে *সন্ত* নাকি বলেছিলেন ঃ 'দিল্লী বহু দূর' (দিল্লী হনুঁজ দূর অস্ত্)। অর্থাৎ তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, সুলতান দিল্লীতে ফিরতে পারবেন না।

পক্ষান্তরে *ফেরিস্তা*, হিন্দু ঐতিহাসিক *রাই বৃন্দাবন* প্রমুখ মনে করেন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলেই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল এবং এজন্য জুনা খাঁকে দায়ী করা যায় না। গবেষক *মজিক* (Mzik) মনে করেন, শেখ নিজামউদ্দিনের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা অকল্পনীয়, অসম্ভব এবং মহান সুফীসাধকের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যহীন।

এ সম্পর্কে আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যেও মতভেদ স্পষ্ট। *স্যার উলসী হেগ* মনে করেন, বরণীর বিবরণ সত্য গোপনের ব্যর্থ প্রয়াসমাত্র এবং তাই দুর্বল। মিঃ হেগ বরণী কর্তৃক 'স্বর্গ থেকে বজ্রপাত' বাক্যটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, এটি হওয়া উচিত ছিল 'আকাশ থেকে বজ্রপাত'। তিনি সত্যগোপন করতে চেয়েছেন বলেই এ ধরনের কল্পিত শব্দ (স্বর্গ) ব্যবহার করেছেন। ড. *ঈশ্বরীপ্রসাদও* এই মত পোষণ করেন। তিনি লিখেছেন ঃ *"That the sultan's death was the result of pre-meditation and conspiracy and not of accident."* কিন্তু ড. *মাহ্দী হোসেন*, ড. *বেনীপ্রসাদ সাক্সেনা* প্রমুখ ভিন্ন মত পোষণ করেন। ড. হোসেন আইন-ই-মুলুক রচিত *'ইনসা-ই-মবরু'* গ্রন্থ থেকে প্রমাণ করেছেন যে, ১৩২৫-এর ১৫ই মে দুর্ঘটনা ঘটেছিল, যখন ঝড়-বিদ্যুৎ-বজ্রপাত যে-কোন সময় ঘটা সম্ভব। তিনি লিখেছেন ঃ *"In tropical countries on a summer's afternoon storms offen occur."* আসলে ইসামীর কাব্যগ্রন্থ *'ফুতুহ-উস্-সালাতিন'* বরণীর *'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী'* থেকে বেশি জনপ্রিয় ছিল। বাকি সমস্ত রচনাই পরবর্তীকালের। স্বভাবতই এই সকল লেখক ইসামীর বক্তব্যকেই অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সঠিক বলে গ্রহণ করেছেন। 'মালিকজাদা আহমদ-বিন্-আয়াজ', যিনি মণ্ডপ নির্মাণের দায়িত্বে ছিলেন, সুলতানি লাভ করার পর জুনা খাঁ কর্তৃক তাঁর পদোন্নয়নের ঘটনাকে ষড়যন্ত্রের প্রমাণ হিসেবে উপস্থিত করা হয়েছে। কিন্তু যুক্তি ও পরিস্থিতির বিচারে ষড়যন্ত্রের তত্ত্বকে স্বীকার করা যায় না। *মাহ্দী হোসেন* ও ড. *নিজামী* মনে করেন, প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটনের ক্ষেত্রে কয়েকজন লেখকের পরস্পরবিরোধী বক্তব্য শেষ কথা হতে পারে না। ঘটনার অগ্রগতি ও পরিণতি এবং পারিপার্শ্বিক প্রমাণ, এক্ষেত্রে অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য। (১) সুলতান গিয়াসউদ্দিনের সাথে তাঁর পুত্র জুনা খাঁর কখনোই আস্থা বা বিশ্বাসহানির ঘটনা ঘটেনি। গাজী মালিক বিদ্রোহী হলে জুনা খাঁ দিল্লী থেকে ছুটে গিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। গাজী মালিক গিয়াসউদ্দিন শাহ হবার পর জুনা খাঁকে সম্মানসূচক 'উলুঘ খাঁ' উপাধি প্রদান করেছিলেন। একাধিক বৃহৎ অভিযানে সুলতান পুত্রের হাতে সৈনাপত্য অর্পণ করেছিলেন। এমনকি পরবর্তী সুলতান হিসেবে কেউ, কখনোই জুনা খাঁর দাবিকে চ্যালেঞ্জ জানাননি। তাহলে জুনা পিতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবেন কেন? (২) সেনাপতি ও যোদ্ধা হিসেবে গিয়াসউদ্দিন ছিলেন খুবই

জনপ্রিয়। সেনাবাহিনী তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে যে রাজী ছিল না, একথা ইবন বতুতা নিজেই লিখেছেন। তেলেঙ্গানা অভিযানকালে সুলতানের মৃত্যুসংবাদ এবং জুনা খাঁর সিদ্ধান্তের সাথে সেনাবাহিনী সহমত হতে অস্বীকার করে এবং তাঁকে ত্যাগ করেই দিল্লী প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এমতাবস্থায় সেই প্রিয় সুলতানকে অকারণে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে তারা জুনা খাঁর সহায়তা করতে রাজী হবে কেন? (৩) ইবন বতুতা শেখ রুকন্উদ্দিনের কাছ থেকে ঘটনার বিবরণ শুনেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। রুকন্উদ্দিনের সাথে মহম্মদ তুঘলকের (জুনা খাঁ) সু-সম্পর্ক ছিল। তিনি একজন বিদেশীর কাছে বর্তমান সুলতানের বিরুদ্ধে বিবৃতি দেবেন— এ কথা স্বীকার করা কষ্টকর। ড. *সাক্সেনা* লিখেছেন : *"Perhaps Iban-Battuta's memory failed him or he deliberately and maliciously associated a saint's name to lend an air of authenticity to his otherwise incredible statement."* (৪) সুলতান হওয়ার পরেও জুনা খাঁর সাথে তাঁর মায়ের মধুর সম্পর্ক ছিল। পিতৃহন্তা হলে তা সম্ভবত থাকত না। (৫) মহম্মদ-বিন্-তুঘলক নিজের আত্মজীবনীতে আলাউদ্দিন খলজীকে বিশ্বাসঘাতক, হন্তারক ও সিংহাসন জবরদখলকারী বলে অভিহিত করেছেন। নিজে একই কাজ করলে এত দৃঢ়তার সঙ্গে আলাউদ্দিনের বিরূপ সমালোচনা করতে পারতেন না। (৬) মহম্মদ তুঘলকের শিক্ষা-দীক্ষা এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বিচারে একটা অপ্রয়োজনীয় এবং যুক্তিহীন ষড়যন্ত্রের নায়করূপে তাঁকে কল্পনা করা কষ্টকর। বস্তুত, নবনির্মিত প্রাসাদটি ছিল দুর্বল। ইসামী বা বরণীর এই বিবরণ সত্য। অস্থায়ীভাবে নির্মিত একটা প্রাসাদ খুব শক্ত না হওয়া কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। তবে তার ভেঙ্গে পড়ার সঙ্গে জুনা খাঁর নাম যুক্ত করার বিষয়টি অযৌক্তিক এবং পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি দ্বারা সমর্থিত নয়, তাই বর্জনীয়।

○ কৃতিত্বের মূল্যায়ন :

গিয়াসউদ্দিন তুঘলক শাসন-দায়িত্বে ছিলেন পাঁচ বছরেরও কম সময় (মৃত্যু : মার্চ/মে ১৩২৫ খ্রীঃ)। কিন্তু এই সামান্য সময়কালেই তিনি যোদ্ধা ও প্রশাসক হিসেবে কৃতিত্বের উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেছেন। বলবনের মতই অতি সামান্য অবস্থা থেকে তিনি ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করেছিলেন ; কিন্তু নিজের অস্তিত্ব দৃঢ় করার জন্য তাঁকে বলবনের মত কোন 'দৈব-অনুগ্রহ' বা 'বংশমর্যাদা'র আবরণে নিজেকে আড়াল করে রাখতে হয়নি। গিয়াসউদ্দিনের সাফল্যের চাবিকাঠি ছিল তাঁর চারিত্রিক সততা, কর্মে আন্তরিকতা এবং প্রজাকল্যাণের একান্ত ইচ্ছাবোধ। *ড. এ. পি. পাণ্ডে* সুলতান জালালউদ্দিন, বলবন ও আলাউদ্দিনের সাথে গিয়াসউদ্দিনের তুলনা করে লিখেছেন : *"He avoided their faults and incorporated their merits."* সামান্য সৈনিক থেকে সুলতানের আসনে অধিষ্ঠিত হলেও তাঁর মানসিক ভারসাম্য বিনষ্ট হয় নি। অহংবোধ তাঁর দৃষ্টির স্বচ্ছতা আচ্ছন্ন করতে পারেনি। *বরণী* লিখেছেন : *'তাঁর ব্যক্তি-জীবন ছিল স্বচ্ছ এবং পবিত্র। মধ্যযুগীয় যে-সকল পাপ অধিকাংশ সুলতানকে গ্রাস করেছিল, তা থেকে গিয়াসউদ্দিন ছিলেন মুক্ত।' ঈশ্বরীপ্রসাদের* মতে, *'তিনি ছিলেন কোমল হৃদয় ও প্রজাদরদী শাসক।'*

গিয়াসউদ্দিনের সিংহাসনে আরোহণকালে দিল্লী-সুলতানির রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ছিল শিথিল

এবং রাজকোষ ছিল প্রায় শূন্য। স্থানীয় শাসকদের স্বাধীনতাকামিতা এবং মুবারক শাহ ও খসরু শাহ'র অমিতব্যয়িতার ফলে সামাজিক অখণ্ডতা বিপন্ন হয়েছিল এবং অর্থনীতি পঙ্গু হয়ে পড়েছিল। গিয়াসউদ্দিন অত্যন্ত ধৈর্য ও বিচক্ষণতার সাথে রাজনৈতিক সংহতি ও রাজকোষের সমৃদ্ধি ফিরিয়ে এনে প্রমাণ করে দেন যে, অভিজাতবর্গ তাঁকে সিংহাসনে মনোনীত করে ভুল করেননি। ভূমি-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে তিনি আলাউদ্দিনের কঠোর নীতির পরিবর্তে 'মধ্যপন্থা' অনুসরণ করে বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। এর ফলে সরকারি আয়ের পথ যেমন সুগম হয়, তেমনি কৃষকশ্রেণীও উপকৃত হয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় কৃষকদের রাজস্ব-প্রদানের দায় থেকে অব্যহতি দিয়ে তিনি মানবিকতা ও কল্যাণমুখী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেন। মুকদ্দম এবং খুতদের রাজস্ব-ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত করে গিয়াসউদ্দিন তাদের সামাজিক মর্যাদা এবং বংশানুক্রমিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। বরণী যথার্থই বলেছেন যে, আলাউদ্দিন রক্তপাত, ষড়যন্ত্র এবং নিপীড়নের মাধ্যমে যে সাফল্য অর্জন করেছিলেন ; গিয়াসউদ্দিন তুঘলক মাত্র চার বছরে মিথ্যাচার, কঠোরতা বা হত্যাকাণ্ড ছাড়াই তা অর্জন করেছিলেন। বংশমর্যাদার প্রতি তাঁর কোন ভ্রান্ত আনুগত্যবোধ ছিল না। গিয়াসউদ্দিন সরকারি কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে দক্ষতা বা যোগ্যতাকে প্রধান মাপকাঠি হিসেবে গুরুত্ব দিতেন। তাঁর সামরিক-বাহিনী এবং সাধারণ প্রশাসনে বহু হিন্দু নিযুক্তি হয়েছিল মূলত তাদের দক্ষতা ও সততার জন্যই।

গিয়াসউদ্দিনের ব্যক্তিজীবন ছিল মধ্যযুগীয় কলুষতামুক্ত। তাঁর চরিত্র ছিল স্বচ্ছ, তাঁর আচরণ ছিল নৈতিকতাপূর্ণ। কবি *আমির খসরু* সুন্দরভাবে লিখেছেন : *"He never did any thing that was not replete with wisdom and sense. He might be said to wear a hundred doctors hoods under his crown."* বিদ্যা ও বিদ্বানের প্রতি তাঁর ছিল গভীর শ্রদ্ধাবোধ। তাঁর রাজসভায় বহু জ্ঞানীগুণী ও পণ্ডিতের সমাবেশ ছিল। শিল্পানুরাগী হিসেবেও গিয়াসউদ্দিনের সুনাম ছিল। সিংহাসনে আরোহণের পরেই তিনি দিল্লীর সন্নিকটে একটি নতুন প্রাসাদময় শহর নির্মাণ শুরু করেন। তেলেঙ্গানা বিজয়ের বছরে এটির নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়। এই নতুন শহরের নাম দেন 'তুঘলকাবাদ'। তুঘলকাবাদের অদূরে তিনি নিজের একটি অনন্যসুন্দর স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেন। লাল পাথর আর সাদা মার্বেলে তৈরি এই স্মৃতিসৌধ আজও শিল্প-রসিকদের আকর্ষণ করে।

সব মিলিয়ে বলা যায়, সুদক্ষ ও বিশ্বস্ত সৈনিক গিয়াসউদ্দিন শাসক হিসেবেও ছিলেন নমনীয়, প্রজাদরদী এবং ন্যায়বাদী। তিনি মৌল উদ্ভাবক হয়তো ছিলেন না। কিন্তু সংরক্ষক হিসেবে ছিলেন সফল। ড. *বেনারসীপ্রসাদের* ভাষায় বলা যায় : *"In short, the founder of the Tughluq dynasty was a sovereign of wide sympathies, of firm determination and sound judgement."*

ড. *রমেশচন্দ্র মজুমদার* , ড. *ঈশ্বরীপ্রসাদ* প্রমুখ গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের নানা গুণের কথা স্বীকার করেও মনে করেন যে, হিন্দুদের প্রতি আচরণে তিনি সমদর্শী ছিলেন না। ড. *মজুমদারের* মতে, *"গিয়াসউদ্দিন যুগের প্রভাব অস্বীকার করতে পারেননি, সাধারণ প্রশাসনে তিনি অন্ধের মতই কোরানের আইন অনুসরণ করতেন।"* তাঁর আমলে হিন্দুদের অবস্থা বিশ্লেষণ করে ড. *ঈশ্বরীপ্রসাদ* লিখেছেন : *"হিন্দুদের প্রতি কঠোর আচরণ করা হত এবং রাজনীতিতে*

মর্যাদাহীনতার গ্লানি ভোগ করতে হত।" ("Hindus were treated with a great severity and were made to feel their position of inferiority in the body politic.") হিন্দুদের প্রতি তাঁর আচরণের মূল লক্ষ্য ছিল এমন কিছু করা, যাতে তারা হতাশাগ্রস্ত হয়ে চাষ-আবাদ বন্ধ না করে, আবার এমন কিছু না-করে যাতে তারা সম্পদশালী হয়ে উদ্বেলিত হতে পারে। এক্ষেত্রে আলাউদ্দিনের সাথে গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের নীতিগত প্রভেদ খুব বেশি ছিল না। অর্থাৎ ব্যক্তি হিসেবে গিয়াসউদ্দিন উদারমনা হলেও, রাষ্ট্রনীতি নির্ধারণের সময় তিনি ধর্মীয় অনুশাসনের উর্ধ্বে উঠতে পারেননি। *ড. মজুমদারের* মতে ঃ *"This was clearly based upon discrimination between Muslims and Hindus, and the later were relegated to an inferior position without any political status or civil rights in the land of their birth."* অবশ্য এই যুগনির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতার কথা স্বীকার করেও বলা যায় যে, গিয়াসউদ্দিন তুঘলক ছিলেন 'উদার হৃদয়' ও 'প্রজাদরদী' প্রশাসক।

○ মহম্মদ-বিন্-তুঘলক (১৩২৪-'৫১ খ্রীঃ) ঃ

পিতা গিয়াসউদ্দিনের মৃত্যুর পরে জুনা খাঁ (উলুঘ খাঁ) সিংহাসনে বসেন। সুলতানি পদে বসার পর তিনি মহম্মদ-বিন্-তুঘলক, মহম্মদ তুঘলক বা মহম্মদ শাহ্ ইত্যাদি নানা নামে সমসাময়িক লেখকগণ কর্তৃক উল্লিখিত হয়েছেন। আমরা মহম্মদ তুঘলক নামেই তাঁকে উল্লেখ করব। সম্ভবত, দিল্লীর সুলতানদের মধ্যে মহম্মদ তুঘলকের মত বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না। কেউ তাঁকে বলেছেন 'অসভ্য বর্বর', কারও ভাষায় তিনি ছিলেন 'বিকৃত মস্তিষ্ক', আবার কেউ তাঁকে বলেছিলেন, 'দয়ার সাগর'। মধ্যযুগ থেকে আজও তাঁর চরিত্র এবং পরিকল্পনা সম্পর্কে নিরন্তর বিতর্ক চলে আসছে পণ্ডিতদের মধ্যে।

সুলতান মহম্মদ তুঘলকের রাজত্বকাল সম্পর্কে মূল আকর গ্রন্থ তিনটি হল—জিয়াউদ্দিন বরণীর '*তারিখ-ই-ফিরোজশাহী*', ইসামীর '*ফুতুহ-উস্-সালাতিন*' এবং ইবন বতুতার '*রেহালা*'। কিন্তু এঁরা কেউই মহম্মদ তুঘলক সম্পর্কে আন্তরিক ও নিরপেক্ষ ছিলেন না। সুলতানের শিক্ষা, ব্যক্তিত্ব, ধর্মীয় উদারতা, হিন্দু ও সুফী-সন্তদের সাথে সুসম্পর্ক এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্র থেকে 'উলেমা' প্রমুখ ধর্মীয় নেতাদের বিচ্ছিন্ন করা প্রভৃতির জন্য এঁরা সুলতানের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। পরন্তু এঁদের বিবরণীতে ঘটনাবলীর সময়কাল কিংবা কালানুক্রম উল্লেখ করা হয়নি। এমনকি সুলতান কর্তৃক পরিকল্পিত এবং রূপায়িত কার্যাবলীর উদ্দেশ্য, প্রকৃতি ও ফলাফল বিশ্লেষণের কোন চেষ্টা এঁরা করেননি। স্বভাবতই এঁদের রচনা থেকে ইতিহাস-ভিত্তিক বিবরণ প্রস্তুত করার কাজ বেশ দুরূহ। এছাড়া আমীর খসরু'র '*তুঘলকনামা*', ফেরিস্তা'র '*তারিখ-ই-ফেরিস্তা*', ইয়াহিয়া বিন্ আহমেদ (শিরহিন্দী)-এর '*তারিখ-ই-মুবারকশাহী*', শামস্-ই-সিরাজ আফিফের '*তারিখ-ই-ফিরোজশাহী*' গ্রন্থ থেকেও মহম্মদ তুঘলকের রাজত্বকালের নানা তথ্য পাওয়া যায়। তবে এই সকল গ্রন্থের ক্ষেত্রেও ঘটনার ধারাবাহিকতা সম্পর্কিত ত্রুটি বর্তমান। আধুনিক গবেষক ও ইতিহাসবিদ্‌দের মধ্যে *ড. আগা মাহদী হোসেন, এন. এইচ. রিজভী, কে.এস. নিজামী, ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ আকর গ্রন্থ*-সমূহের ভিত্তিতে মহম্মদ তুঘলকের কর্মসূচীর কালানুক্রম ও প্রকৃতি বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। তবে মধ্যযুগীয় লেখকদের মতই

আধুনিক গবেষক ও ইতিহাসবিদ্গণও মহম্মদ তুঘলকের চরিত্র ও রাজতন্ত্রের প্রকৃতি সম্পর্কে মতৈক্যে পৌঁছাতে পারেননি।

গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের জ্যেষ্ঠপুত্র ফকরউদ্দিন মহম্মদ জুনা খাঁ সৈনিক হিসেবেই জীবন শুরু করেন। সুলতান মুবারক খলজী এবং খসরু শাহ'র অধীনে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। খসরু শাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সময় জুনা খাঁ পিতার পাশে এসে দাঁড়ান এবং সাহায্য করেন। পিতা গিয়াসউদ্দিন সিংহাসনে বসে জুনা খাঁ কে '*উলুঘ খাঁ*' উপাধিতে ভূষিত করেন। বরঙ্গলের বিরুদ্ধে দুটি সামরিক অভিযানে উলুঘ খাঁ সুলতানি-বাহিনীর নেতৃত্ব দেন। অতঃপর পিতার দুর্ঘটনাজনিত কারণে মৃত্যুর পরে 'মহম্মদ তুঘলক শাহ' উপাধি ধারণ করে তিনি দিল্লীর সিংহাসনে বসেন।

বরণীর মতে, মহম্মদ তুঘলক ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে তুঘলকাবাদে সিংহাসনে বসেন। ***ইসামীর*** বিবরণ অনুযায়ী তাঁর সিংহাসনারোহণের কাল ১৩২৪ খ্রীঃ। খসরুর *'তুঘলকনামা'র বিবরণ* অনুযায়ী গিয়াসউদ্দিন সিংহাসনে বসেন ১৩২০-র সেপ্টেম্বরে এবং রাজত্ব করেন ৪ বছর ৩ মাস। ১৩২৪-এর নভেম্বরে জারি করা মহম্মদ তুঘলকের একটি সরকারি দানপত্রও পাওয়া গেছে। সম্ভবত ১৩২৪ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে মহম্মদ সিংহাসনে বসেন এবং ৪০ দিন পরে অর্থাৎ ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে তাঁর অভিষেক সম্পন্ন হয়। বরণী মহম্মদের অভিষেক অনুষ্ঠানের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। অভিষেক উপলক্ষ্যে সমগ্র দিল্লী শহরকে সুসজ্জিত করা হয়। নির্মিত হয় একাধিক বিশাল ও অলংকৃত তোরণ। শোভাযাত্রার গমন পথগুলিকে রঙীন কাপড়ে ঘিরে দেওয়া হয়। মুঠো মুঠো স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা ছুঁড়ে দেওয়া হয় পথের দু'পাশে অপেক্ষমান, দর্শনার্থীদের উদ্দেশ্যে। এমনকি হাতির পিঠে চড়ে মুদ্রা ছুড়ে দেওয়া হয় পথিপার্শ্বের গৃহের বারান্দার অভ্যন্তরেও। ফলে শিশু-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ, হিন্দু-মুসলমান, মুক্ত মানুষ বা ক্রীতদাস সবাই সুলতানের দীর্ঘায়ু ও শুভেচ্ছা কামনা করতে থাকে। বস্তুত, আলাউদ্দিন খলজী ছাড়া অন্য কোন সুলতান সিংহাসন লাভের মুহূর্তে এত উদার হস্তে জনসাধারণের মধ্যে অর্থ বিতরণ করেননি।

○ কালানুক্রম ঃ

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বরণী বা ইসামী প্রমুখ মহম্মদ তুঘলকের রাজত্বকালে সংঘটিত ঘটনাবলীর ধারাবাহিক বিবরণ দেননি। বরণী তাঁর নিজের বিচারে ঘটনার গুরুত্ব বা প্রকৃতি অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করেছেন ; সংগঠনের কাল অনুযায়ী নয়। ইবন বতুতা এদেশে আসার পর যা ঘটেছে, সেগুলির ধারাবাহিক বিবরণ দেবার চেষ্টা করেছেন ; কিন্তু তাঁর আগমন-পূর্বের ঘটনা সম্পর্কে তাঁর আলোচনা পরিষ্কার নয়। তুলনামূলক ভাবে ইসামী ও বদর-ই-চার্চ-এর বিবরণ অনেক বেশি উপযোগী। যাই হোক, এঁদের বিবরণ সমকালীন কাব্য-সাহিত্য, মুদ্রা ও লিপি, মরমিয়া সাহিত্য এবং বিদেশি পর্যটকদের বিবরণের ভিত্তিতে মহম্মদের রাজত্বকালের প্রধান ঘটনাবলীর একটা ধারাবাহিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে।

মহম্মদ তুঘলকের সিংহাসনে বসার অব্যবহিত পরবর্তী প্রধান ঘটনা হিসেবে তরমাশিরিন খাঁর নেতৃত্বে মোঙ্গল আক্রমণের কথা উল্লেখ করা যায়। ফেরিস্তা মোঙ্গল আক্রমণের কাল হিসেবে ১৩২৬-'২৭ খ্রীষ্টাব্দের কথা লিখেছেন। *শিরহিন্দী 'মুবারক শাহী'* গ্রন্থে এই সময়কাল

নির্দিষ্ট করেছেন ১৩২৮ খ্রীষ্টাব্দে। ড. নিজামী ইসামীর একটি বক্তব্যের ভিত্তিতে ১৩২৫-'২৬ খ্রীষ্টাব্দের কথা লিখেছেন। শির্‌হিন্দী *'মুবারক শাহী'* গ্রন্থে এই সময়কাল নির্দিষ্ট করেছেন ১৩২৮ খ্রীষ্টাব্দ। ড. নিজামী, ইসামীর একটি বক্তব্যের ভিত্তিতে ১৩২৫-২৬ খ্রীষ্টাব্দকে মোঙ্গল আক্রমণের সঠিক কাল বলে মনে করেন। *ইসামী* লিখেছেন ঃ *সিংহাসনে আরোহণের অব্যবহিত পরেই সুলতান কালানুর ও ফারাসুর (পেশোয়ার) অভিযান করেছিলেন।* ড. *নিজামীর মতে,* মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করার পরেই সম্ভবত সুলতান সীমান্ত নিরাপত্তা সুদৃঢ় ও সুনিশ্চিত করার জন্য এই দুটি সীমান্তপ্রদেশে অভিযান চালান।

ইসামীর বিবরণ অনুসারে সুলতানের ক্ষমতালাভের দুই বছর পরে তাঁর আত্মীয় বাহাউদ্দিন গুরুসাস্প বিদ্রোহ করেছিলেন। অর্থাৎ এর সময়কাল ছিল ১৩২৬-'২৭ খ্রীষ্টাব্দ। এটি ছিল সুলতানের বিরুদ্ধে প্রথম চ্যালেঞ্জ। এই ঘটনার পর সম্ভবত তিনি কোন্ধানা দুর্গ দখলের চেষ্টা করেন। *ইসামী* লিখেছেন ঃ *"এই দুর্গের অবরোধ ভাঙতে লেগেছিল প্রায় ৮ মাস। গুরুসাস্প-এর বিদ্রোহ করতে সময় ব্যয় হয়েছিল কম করেও পাঁচ থেকে ছয় মাস। তাহলে সুলতান কোন্ধানা বিজয় সম্পন্ন করেছিলেন ১৩২৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্ধে।"*

কোন্ধানা দুর্গ জয়ের পর সুলতান যখন দেবগিরিতে বিশ্রামরত ছিলেন, তখন তিনি বাহরাম আইবা কিসলু খাঁ'র বিদ্রোহের সংবাদ পান। বরণী এই বিদ্রোহের কোন সময় উল্লেখ করেন নি, তবে এটিকে প্রথম বিদ্রোহ বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু তাঁর বক্তব্য কালানুক্রম অনুযায়ী ঠিক নয়। নিজামী, ইসামীর বিবরণের ভিত্তিতে এই বিদ্রোহের কাল ১৩২৭-'২৮ খ্রীষ্টাব্দ বলে মনে করেন।

প্রায় একই সময়ে গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহ্ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন বলে ইসামী উল্লেখ করেছেন। সুলতান আইবার বিদ্রোহদমনের পরে সংবাদ পান যে, গিয়াসউদ্দিনের বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হয়েছে। সুতরাং, ধরা যেতে পারে গিয়াসউদ্দিনের বিদ্রোহ ১৩২৮-এর শেষদিকে সংঘটিত হয়েছিল। মুদ্রা থেকেও এই অভিমতের সমর্থন পাওয়া যায়। ১৩২৮-এর পর সুলতান মহম্মদ ও বাহাদুর শাহর যুগ্মনামাঙ্কিত কোন মুদ্রা পাওয়া যায়নি।

মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের দুটি অতি গুরুত্বপূর্ণ তথা বিতর্কিত পরিকল্পনা দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর এবং তাম্রমুদ্রার প্রচলনের সময়কাল যথাক্রমে ১৩২৮-২৯ এবং ১৩২৯-৩০ খ্রীষ্টাব্দে স্থির করা যায়। ইসামীর বিবরণ অনুযায়ী তামার মুদ্রা চালু ছিল তিন বছর। এই কাজ শুরু করা হয়েছিল রাজধানী স্থানান্তরের পরে। আবার রাজধানী স্থানান্তর কর্মসূচী গৃহীত হয়েছিল সুলতান কর্তৃক মুলতানে আইবার বিদ্রোহ দমন করে দিল্লী ফেরার পরে। তাহলে তামার মুদ্রা চালু ছিল ১৩৩১-৩২ খ্রীঃ পর্যন্ত। অর্থাৎ মুদ্রা চালু হয়েছিল ১৩৩১/৩২-৩ অর্থাৎ ১৩২৯-৩০ খ্রীষ্টাব্দে। এবং রাজধানী স্থানান্তর ঘটেছিল ১৩২৮-২৯ খ্রীষ্টাব্দে।

মহম্মদ কর্তৃক খোরাসান বিজয়ের জন্য বাহিনী গঠন এবং কারাচল অভিযানের সময়কাল নিরূপণ করা কিছুটা কঠিন। কারণ সমকালীন লেখকেরা এ সম্পর্কে নীরব থেকেছেন। পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিচারে বলা চলে যে, এই দুটি প্রকল্পের সময় ১৩৩৩ খ্রীষ্টাব্দের পরে নিশ্চয় ছিল না। কারণ ১৩৩৩ খ্রীষ্টাব্দের অনাবৃষ্টি দেশে প্রচণ্ড খাদ্যাভাব সৃষ্টি করেছিল। ১৩৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ইবন বতুতা দিল্লীতে পৌঁছে লক্ষ্য করেন যে, তখনো সরকারের তরফ থেকে জনগণকে

খাদ্য সরবরাহ করা হচ্ছে। এর পরে দক্ষিণ ভারতের বিশৃঙ্খলা দমনের কাজে সুলতান প্রায় আড়াই বছর ব্যস্ত ছিলেন। সুতরাং খোরাসান বা কারাচল প্রকল্প গৃহীত হয়েছিল অবশ্যই ১৩৩৩-এর আগে। মির খুর্দ-এর *'সিয়াল-উল-আউলিয়া'* গ্রন্থের ভিত্তিতে *ড. নিজামী* মনে করেন, ১৩৩০-৩১ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান খোরাসান জয়ের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করেছিলেন এবং এই সময়কালেই তা ভেঙ্গে দেন। এর এক বছরের মধ্যেই সম্পন্ন করেন কারাচল অভিযান।

সম্ভবত, এর পরে সংঘটিত হয়েছিল মাবার ও বাংলাদেশের দুটি বিদ্রোহ। মাবারের শাসক জালালউদ্দিন শাহের শেষ মুদ্রার তারিখ ১৩৩৪ খ্রীষ্টাব্দ। তাই ধরা যেতে পারে এই সময়ের পরেই তিনি ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিলেন। ড. নিজামীর হিসেবে বাংলাদেশের বিদ্রোহ ঘটেছিল ১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দের কোন এক সময়ে। *ইসামী লিখেছেন ঃ ' দৌলতাবাদ থেকে সুলতানের প্রত্যাবর্তনের পর বাংলাদেশে বিদ্রোহ ঘটেছিল। 'ইবন বতুতা* লিখেছেন ঃ *'সুলতান দৌলতাবাদে ছিলেন প্রায় আড়াই বছর। অর্থাৎ তিনি ফিরেছিলেন ১৩৩৬-৩৭-এর কোন এক সময় এবং এর পরে বাংলাদেশের বিদ্রোহের সম্মুখীন হয়েছিলেন।'*

ইসামীর বিবরণ অনুযায়ী সুলতান ১৪ বছর পর দিল্লীর অধিবাসীদের পুনরায় স্বস্থানে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দেন। সেই অনুসারে দিল্লীর নবজীবন লাভের বছরটিও ছিল ১৩৪২ খ্রীষ্টাব্দ। কিন্তু বরণী তথ্য সহকারে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, ১৩৩৫-৩৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই ইচ্ছুক ব্যক্তিরা দক্ষিণ ভারত থেকে উত্তর ভারতে ফিরে আসার কাজ সম্পূর্ণ করেছিলেন। মহম্মদ তুঘলকের অন্যান্য ঘটনাবলী সম্পর্কে মোটামুটিভাবে নির্দিষ্ট সময়কাল সমকালীন রচনা থেকে পাওয়া যায়।

○ মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের রাজতান্ত্রিক (নরপতিত্বের) আদর্শ ঃ

মহম্মদ-বিন্-তুঘলক উত্তরাধিকার সূত্রে যে বিশাল সাম্রাজ্য ও অতিসমৃদ্ধ রাজকোষ পেয়েছিলেন, সম্ভবত দিল্লীর অন্য কোন মুসলমান শাসক তা পাননি। কাশ্মীর, আফগানিস্তান ও বালুচিস্তান ছাড়া সমগ্র ভারত ছিল দিল্লীর অধীনস্থ। সুলতানি রাজ্যের সীমানা প্রসারিত ছিল উত্তর-পূর্বে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে উত্তর-পশ্চিমে সিন্ধু পর্যন্ত। পূর্ব-পশ্চিমে এর বিস্তৃতি ছিল সমুদ্র থেকে সমুদ্র। সাম্রাজ্য বিভক্ত ছিল প্রায় ২৪টি প্রদেশে। অবশ্য প্রদেশের সংখ্যা সম্পর্কে বরণী কিছুই লেখেননি। ইবন বতুতা কেবল আংশিক উল্লেখ করেছেন। তবে সাম্রাজ্যের পরিধি ছিল বিশাল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু চিরাচরিত অর্থে মহম্মদ তাঁর রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে রক্ষা করতে উৎসাহী ছিলেন না। তাঁর মস্তিষ্ক ছিল উর্বর। কল্পনাপ্রবণ ছিল তাঁর মন। যুক্তি, তর্ক ও দর্শনের সমন্বয়ে তিনি একদিকে ভারতীয় সীমারেখার মধ্যে জাতীয় রাষ্ট্র গড়ে তুলতে এবং অন্য দিকে দেশের সীমানা অতিক্রম করে আন্তর্জাতিকতার আদর্শ প্রচার করতে উদ্যত হয়েছিলেন। রাজনৈতিক এবং ধর্মনৈতিক চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে মহম্মদ তুঘলক যে অসাধারণ এবং অস্বাভাবিক মৌলিকত্বের অধিকারী ছিলেন, তা বোঝাতেই বরণী *'ইক্‌তিরাহ্'*, *'তহকিমত্-ই-মুজাদ্দিদ'* প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেছেন।

মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের রাজনৈতিক আদর্শের মূল কথা ছিল ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক ঐক্য। তাঁর সিংহাসনারোহণের কালে ভারত-রাষ্ট্রের ধারণা ছিল অসম্পূর্ণ। কারণ উত্তর-

ভারত ও দক্ষিণ-ভারত রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক বিচারে একই ধারার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। উত্তর ভারতে ছিল সুলতানির প্রত্যক্ষ শাসন, কিন্তু দক্ষিণ ভারতে ছিল স্থানীয় রাজাদের আনুগত্যমূলক স্বশাসন। উত্তর ভারতে ছিল হিন্দু-মুসলিম মিশ্র সংস্কৃতির অবস্থান, কিন্তু দক্ষিণে ছিল হিন্দু সংস্কৃতির প্রাধান্য। সুলতান মহম্মদ দিল্লী থেকে দৌলতাবাদে রাজধানী স্থানান্তর করে দক্ষিণ ভারতের সাংস্কৃতিক রূপান্তরের সূচনা করেন। দিল্লী থেকে দৌলতাবাদ হয়ে মুলতান কিংবা বাংলাদেশ থেকে গুজরাট পর্যন্ত সুলতানি-বাহিনীর পদচারণার সাথে সাথে বণিক, পণ্ডিত, মরমিয়া সাধক, কবি, ছাত্র ইত্যাদি সমাজের নানাস্তরের মানুষের যাতায়াতের সুবাদে এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন সম্ভাবনাপূর্ণ হয়। মহম্মদ তুঘলকের কর্তৃত্বে এই সংহত ভারতরাষ্ট্র গঠনের প্রয়াসের প্রশংসা করে ড. *কে. এ. নিজামী* লিখেছেন : *"Perhaps no ruler after Asoka had visualised India as a political and administrative unit in the same way as Muhammad bin Tughluq."*

সমসাময়িক এশিয়ার রাজনৈতিক শূন্যতার পরিপ্রেক্ষিতে সুলতানের মনে মধ্য-এশিয়ার রাজনৈতিক কর্তৃত্ব স্থাপনের পরিকল্পনা দানা বাঁধে। ইল খাঁ-দের ক্ষমতা তখন অন্তর্হিত, তৈমুরের তখনও জন্ম হয়নি। এমতাবস্থায় মহম্মদের রাজনৈতিক উচ্চাশা কোন অস্বাভাবিক বিষয় ছিল না। খোরাসান বিজয়ের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির মধ্যে সুলতানের এই ইচ্ছার প্রমাণ পাওয়া যায়। অধ্যাপক নিজামী একেই 'উচ্চ সাম্রাজ্যবাদ' বলে অভিহিত করেছেন। বরণীর বিবরণ থেকেও মহম্মদ তুঘলকের বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদী অভীপ্সার আভাস পাওয়া যায়। *বরণী* লিখেছেন : *"সুলতানের তুলনাবিহীন ব্যক্তিত্বের মধ্যে তাঁর উচ্চাকাঙক্ষা এত গভীরভাবে প্রোথিত যে, বিশ্বের এক-চতুর্থাংশ বাসভূমি (তখন মনে করা হত বাকি তিন-চতুর্থাংশ জল এবং বাসযোগ্য নয়) যদি তাঁর ক্রীতদাসদের অধীনে থাকত, পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণে প্রসারিত ভূ-খণ্ডের সমস্ত মানুষ যদি তাঁকে কর প্রদান করত এবং তাঁর নিয়ন্ত্রণে স্থাপিত হত,........এবং তার পরেও যদি সুলতান কারও কাছে জানতে পারতেন যে, কোন দ্বীপের সামান্যতম অংশ কিংবা কোন দেশের একটা ঘরের সমপরিমাণ ভূখণ্ড তাঁর অধীনস্থ হয়নি, তাহলে সেই স্থানটি দখল না করা পর্যন্ত তাঁর নদী-সদৃশ হৃদয় এবং তাঁর বিশ্বজয়ের উদ্দীপনা শান্ত হত না।"* সাম্রাজ্যবাদী মনস্কতার দিক থেকে মহম্মদ তুঘলক গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারকেও অতিক্রম করেছিলেন বলে বরণী উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, আলেকজাণ্ডারের মর্যাদায় উন্নীত হয়েও সুলতান সন্তুষ্ট হতেন না। তিনি ডেভিডের পুত্র সলোমনের মত মানুষ ও অদৃশ্য জিন—উভয়ের উপর কর্তৃত্ব করতে ইচ্ছুক ছিলেন। নবী এবং সুলতানি, ধর্মপ্রচারক এবং শাসকের দ্বৈত-ক্ষমতা ভোগ করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য।

ভারতের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা সুলতান মহম্মদকে ব্যথিত করত। তিনি বহির্বিশ্বের সাথে কূটনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক যোগস্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। এই কারণে ১৩৪০-'৪১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বহু জিনিসের উপর থেকে আমদানি-শুল্ক তুলে দেন। চীন, মিশর, ইরাক, ইরান, সিরিয়া প্রভৃতি দেশের সাথে দূত বিনিময় এবং উপঢৌকন বিনিময়ের মাধ্যমে সুলতান মহম্মদ-বিন্-তুঘলক ভারতবর্ষের রাজনীতিতে আন্তর্জাতিকতার প্রবেশ ঘটান। ড. *নিজামী* এটিকে *'ভারতের রাজনীতির এক নতুন অধ্যায়'* বলে অভিহিত করেছেন।

সুলতানের কর্তৃত্ব ও সাম্রাজ্যের সংহতির পরিপন্থী উপাদান হিসেবে মুসলিম অভিজাতশ্রেণীর স্বাধীনতাবোধ ও কর্তৃত্ববোধের বিপদ সম্পর্কে সুলতান মহম্মদ তুঘলক সচেতন ছিলেন। তাই বংশানুক্রমিক অভিজাতবর্গের উচ্চাকাঙক্ষা ও ঔদ্ধত্যকে দমন করার জন্য তিনি যোগ্যতার ভিত্তিতে উচ্চরাজপদে কর্মী নিয়োগ শুরু করেন। এইভাবে বংশকৌলিন্যহীন এক দল নতুন অভিজাত তৈরি করে তিনি অভিজাত বংশগুলির আমলাতান্ত্রিক একাধিপত্য বিনষ্ট করেন। এ প্রসঙ্গে ড. *ত্রিপাঠী* (R.P.Tripathy) লিখেছেন : *"পুরাতন, উন্নাসিক এবং সংশোধনের অতীত অভিজাতদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তিনি সুবিধাহীন ও নিম্নশ্রেণীর মানুষের মধ্য থেকে এক নতুন আমলাতন্ত্র সৃষ্টি করেন" ("To get rid of the high browed nobility which was old and incorrigible he began to gradually raise a new class of official from among the lower and non-privileged class.")*। মহম্মদের এই নীতির ফলে ধর্মান্তরিত মুসলমান এবং অনুগত হিন্দুদের মধ্য থেকে বহু যোগ্য ব্যক্তি উচ্চরাজপদে নিযুক্ত হবার সুযোগ পায়। ড. *নিজামীর* মতে, মহম্মদ তুঘলক তাঁর গভীর জ্ঞান ও রাষ্ট্রপ্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেছিলেন যে, ভারত-সাম্রাজ্যকে স্থায়িত্ব ও বিস্তৃতি দিতে গেলে সমস্ত শ্রেণীর মুসলমানকে যেমন প্রশাসনের সাথে যুক্ত করতে হবে, তেমনি যোগ্যতাসম্পন্ন হিন্দুদেরও সরকারের দায়িত্বশীল পদে নিযুক্ত করতে হবে। তাঁর মতে, বরণী ছিলেন প্রাচীনপন্থী এবং গোঁড়া। তাই মহম্মদ তুঘলকের দৃষ্টিভঙ্গির যথার্থতা তিনি অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। কায়েমী স্বার্থবোধে অন্ধ প্রাচীন অভিজাতদের সম্পর্কে সুলতানের কঠোর মনোভাব ছিল বাস্তব অভিজ্ঞতার ফল। গুরুসাম্প, বাহাউদ্দিন প্রমুখের বিদ্রোহ সুলতানকে কঠোর হাতে তাদের ক্ষমতাচ্যুত করতে এবং বিকল্প হিসেবে যোগ্যতার ভিত্তিতে নতুন আমলাতন্ত্র গড়ে তুলতে বাধ্য করেছিল।

○ মহম্মদ তুঘলকের ধর্মীয় আদর্শ ঃ

মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের ধর্মীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠিত ছিল প্রখর যুক্তিবাদের উপর। মোঙ্গলগণ কর্তৃক ইসলামের সার্বিক প্রসার রুদ্ধ হবার পরবর্তী পর্যায়ে ইসলামের মধ্যে দু'ধরনের প্রতিক্রিয়া জন্ম নেয়। একদিকে উত্থান ঘটে অতিন্দ্রীয়বাদী বা মরমিয়া সাধকগোষ্ঠীর যাঁরা সর্বৈবরূপে রাজনীতি-মুক্ত থেকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অনুশীলনের মাধ্যমে মুসলমান সমাজের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে উদ্যোগী হন। অন্য দিকে ইমাম ইবন তিমিয়া'র নেতৃত্বে মৌলবাদী গোষ্ঠী সাধারণ মুসলমান উলেমা, শাসকশ্রেণী এবং মরমিয়া প্রভৃতি সমস্ত শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করে মুসলমান সমাজকে নবজাগরিত করার কথা প্রচার করেন। অবশ্য এঁরা মনে করতেন, মরমিয়া সাধকগণ হতাশাবাদী এবং অসম্পূর্ণ একটি ধারণার অনুসারী। সুলতান মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের সাথে এই দুটি ধারারই গভীর সম্পর্ক ছিল। তিমিয়ার শিষ্য মৌলানা আব্দুল আজিজ কিংবা সুফী সাধক শেখ রুকনউদ্দিন মুলতানির পদচুম্বন করে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতেও সুলতান দ্বিধা করেননি। মহম্মদ তুঘলকই দিল্লীর প্রথম সুলতান যিনি আজমীরে শেখ নিজামউদ্দিনের সমাধিতে উপস্থিত হয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপক করেন। কিন্তু এদের কোন পক্ষের বক্তব্যই সুলতান পুরোপুরি গ্রহণ করতেন না। মহম্মদ তাঁর ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা গড়ে তুলেছিলেন যুক্তি, তর্ক, বিশ্বাস আর দর্শনের সমন্বয়ে।

ধর্ম ও দর্শনের গভীর তত্ত্ব জানার ব্যাপারে মহম্মদ তুঘলকের আগ্রহ ছিল গভীর ও আন্তরিক। অজ্ঞেয়বাদ, নিরীশ্বরবাদ ইত্যাদি বিভিন্ন তত্ত্ব সম্পর্কে তিনি ব্যাপক আলোচনা-পর্যালোচনা করেন। ***আল-উমারি*** লিখেছেন ঃ *'সুলতান প্রায় সন্ধ্যাকালে উলেমাদের সাথে মিলিত হয়ে ইসলাম ধর্মের নানা দিক সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করতেন।'* ***ইবন বতুতা*** *এবং* ***ইসামী*** *লিখেছেন যে,* প্রতিদিন সকালের প্রার্থনার পর সুলতান নানা ধর্মের দার্শনিকদের সাথে দর্শনতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতেন। হিন্দুযোগী বা জৈনদের সাথে তাঁর সাক্ষাৎকার এবং ধর্মালোচনার কথা সমকালীন সব ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন। জৈন পণ্ডিত রাজশেখর এবং জিনপ্রভা সুরী মহম্মদ তুঘলকের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। ***জিমার (Zimmer)***-এর মতে, সুলতানের উপর যোগীদের প্রভাব ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ***আগা মেহেদী হোসেন*** লিখেছেন ঃ *"মহম্মদ-বিন্-তুঘলক গভীর রাতে ঘরের আলো নির্বাপিত করে যোগাভ্যাস করতেন। এবং এর দ্বারা যে আত্মবল অর্জন করতেন, তা তাঁকে বিপদে অচঞ্চল এবং লক্ষ্যে অটল থাকার শক্তি যোগাত।"*

অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি মহম্মদ তুঘলক কেবল সহনশীল ছিলেন না, সহযোগীও ছিলেন। সম্ভবত, তিনি প্রথম সুলতান যিনি হিন্দুদের দোল উৎসবে হোলী খেলায় যোগ দিতেন। তিনি গিরনার হিন্দু-মন্দির এবং পালাটিনার জৈনমন্দির পরিদর্শন করেন। জৈন সন্ন্যাসীদের জন্য আশ্রম নির্মাণ এবং একটি গো-মঠ নির্মাণের জন্য সরকারি অর্থও ব্যয় করেন। ড. ***নিজামীর*** মতে *"মহম্মদ-বিন্-তুঘলক এক উদার ধর্মীয় পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছিলেন বলেই তাঁর রাজত্বকালে হিন্দুযোগীদের সাথে মুসলমান শিষ্য ঘুরতে পারত, কিংবা শান্তিপূর্ণভাবে নানা ধর্মমত বিবাজ করতে পারত।"*

গোঁড়া ধর্মভাবাপন্ন বরণী বা ইসামীর বিবেচনায় ধর্ম বিষয়ে মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের যুক্তিবাদ ছিল ধর্মদ্রোহিতার নামান্তর। বরণীর মতে, বাল্যকাল থেকেই মহম্মদের সাথে তর্কবিদ্ সাদ, নাস্তিক্যবাদী উবাইদ, দার্শনিক নাজম প্রমুখের ঘনিষ্ঠতা ছিল। এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী ও কট্টর সমালোচক। এঁদের সাথে নিরন্তর দর্শন আলোচনা করার ফলে মহম্মদ তুঘলকের মনে ইসলামের আদর্শ ও ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে গভীর সন্দেহ ও অনীহাবোধ জন্মেছিল। এদের যুক্তিবাদী দর্শন দ্বারা প্রভাবিত না হলে সুলতান ইসলাম ধর্মপ্রাণ উলেমাদের রক্তে হাত রাঙাতে সাহস করতেন না। ইসামীও মহম্মদ-বিন্-তুঘলককে 'হিন্দু-মনোভাবাপন্ন পৌত্তলিক সুলতান' বলে ব্যঙ্গ করেছেন।

বরণী বা ইসামী উভয়েই ছিলেন মহম্মদের বিরোধী। তাই তাঁদের বক্তব্য অনুযায়ী মহম্মদ-বিন্-তুঘলককে এক কথায় ধর্মদ্রোহী বা ইসলাম-বিরোধী বলা অযৌক্তিক। ***ইবন বতুতা'র*** বিবরণ থেকে জানা যায় যে, মহম্মদ-বিন্-তুঘলক ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী প্রতিদিন নামাজ পড়তেন এবং যাতে প্রতিটি মুসলমান নিয়মানুযায়ী প্রার্থনা করে সেদিকে কড়া নজর রাখতেন। প্রার্থনার সময় কোন মুসলমান ঘুরে-বেড়ালে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হত। বরণীর শেষের দিকে, রচনাতেও ইসলামীয় আইনের প্রতি সুলতানের আগ্রহের কথা লেখা হয়েছে। এ বিষয়ে একটা নতুন বিশ্লেষণ দিয়েছেন ***আগা মাহ্দী হোসেন।*** তাঁর মতে, মহম্মদ তুঘলক শাসনদায়িত্ব গ্রহণ করার অব্যবহিত পরে রাষ্ট্র ও ধর্ম সম্পর্কে একটা নতুন দার্শনিক-তত্ত্ব দ্বারা উদ্বুদ্ধ

হয়েছিলেন। তাঁর গভীর তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা ও জ্ঞানের সাথে কোরানের ব্যাখ্যাকার বা বিচারকদের একটা অমিল দেখা দিত। তাই তিনি সুলতান হিসেবেই তাদের ক্ষমতা কেড়ে নিতেন বা হ্রাস করতেন। সুলতান নিজেই ধর্ম ও রাজনীতিকে যমজ বলে বর্ণনা করেছেন এবং সুলতান হিসেবেই নিজের বিবেচনা দ্বারা তাকে রক্ষা করতে চেয়েছেন। ইসলামকে বর্জন করার কোন ইচ্ছা তাঁর ছিল না। তাই ১৩২৬-২৭ খ্রীষ্টাব্দের একটি মুদ্রায় তিনি নিজেকে *'শেষ নবীর ঐতিহ্যের রক্ষক'* (মুহি-ই-সুনম-ই-খাতিন-উন-নবিন) বলে ঘোষণা করেছেন। বরণী যুক্তিবাদী দার্শনিক এবং ইসলামের রক্ষক উভয় ভূমিকাতেই মহম্মদ তুঘলকের চূড়ান্ত প্রকাশ লক্ষ্য করেছেন। তাই তাঁর কাছে মহম্মদের চরিত্র 'পরস্পরবিরোধী উপাদানের সমন্বয়' (Mixture of opposits) বলে প্রতিভাত হয়েছে। *ড. হোসেনের* মতে, মহম্মদ বিন্-তুঘলক ছিলেন ধৈর্যহীনতা ও সীমাহীন ক্রোধের বশীভূত। তাই তাঁর কাজগুলি কাঙ্ক্ষিত পরিণতি লাভে ব্যর্থ হয়েছে। রাজনীতি বা ধর্মনীতি উভয়ক্ষেত্রেই এই বিপত্তি তাঁকে গ্রাস করেছে।

○ মোঙ্গল আক্রমণ ও মহম্মদ-বিন্-তুঘলক :

১৩২৬ থেকে ১৩২৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কোন এক সময় চাঘতাই মোঙ্গল নেতা তরমাশিরিন খাঁ ভারতে এসেছিলেন। তরমাশিরিনের ভারতে আগমনের নির্দিষ্ট সময়, উদ্দেশ্য এবং পরিণতি সম্পর্কে সমকালীন ও পরবর্তী ঐতিহাসিকদের বিবরণে বহু অসামঞ্জস্যতা লক্ষ্য করা যায়। ইসামীর বিবরণ থেকে জানা যায় যে, সুলতান মুলতান থেকে আগত এক দূত মারফত জানতে পারেন যে, তরমাশিরিনের নেতৃত্বে বিশাল মোঙ্গলবাহিনী সিন্ধুদেশে প্রবেশ করে ব্যাপক লুঠতরাজ ও হত্যাকাণ্ড চালিয়ে দ্রুত ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করছে। সংবাদ পাওয়ামাত্র মহম্মদ তুঘলক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন এবং দেশের নানাপ্রান্ত থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে প্রায় পাঁচ লক্ষ অশ্বারোহী যোদ্ধা প্রস্তুত করেন। তবে এই বাহিনীকে মোঙ্গলদের প্রতিরোধের জন্য অগ্রসর হবার কোন নির্দেশ তখনও দেওয়া হয় নি। আবার খবর আসে যে, মোঙ্গলরা মিরাটে প্রবেশ করেছে এবং নাগরিকদের উপর অকথ্য নিপীড়ন চালাচ্ছে। এই সময় সুলতান ইউসুফ বুঘরা খাঁকে দশ হাজার সৈন্যসহ মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হবার নির্দেশ দেন। বুঘরা খাঁ অসম শক্তি নিয়ে বীরত্বের সাথে মোঙ্গলদের আক্রমণ করেন এবং প্রাথমিক বিপর্যয় সত্ত্বেও মোঙ্গলদের বিতাড়িত করতে সক্ষম হন।

ইসামীর মতে, মহম্মদ-বিন্-তুঘলক এক্ষেত্রে চূড়ান্ত কাপুরুষতার পরিচয় দেন এবং পাঁচ লক্ষের বাহিনী প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও মাত্র দশ হাজার বাহিনীকে দুর্ধর্ষ মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করে ভীরুতা ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার নগ্ন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। মোঙ্গলদের পরাজিত হবার সংবাদ পাওয়ার পর সুলতান দিল্লীর বাইরে এসে কিছু সৈন্যকে তাদের পশ্চাদ্ধাবনের নির্দেশ দেন। ***ইয়াহিয়া-বিন্-আহমদ্***-এর মতে, মোঙ্গল আক্রমণের সংবাদ পাওয়ার পর (১৩২৮ খ্রীঃ) মহম্মদ-বিন্-তুঘলক সসৈন্যে কালানুর পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং সেখানকার অগ্রবর্তীবাহিনীর দায়িত্ব মালিক মুজিরুদ্দিনের হাতে ন্যস্ত করে দিল্লী ফিরে যান। মহম্মদ-বিন্-তুঘলক যে মোঙ্গলদের প্রতিহত না করে দিল্লীর মধ্যে নিষ্ক্রিয়ভাবে বসেছিলেন, একথা ইয়াহিয়া তাঁর *'তারিখ-ই-মুবারকশাহী'* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এমনকি তৈমুরের আত্মজীবনীতেও এই বক্তব্যের সমর্থন

পাওয়া যায়। বদাউনিও প্রায় একই কথা লিখেছেন। ফেরিস্তার বিবরণে কিছুটা নতুনত্ব আছে। ইসামী, ইয়াহিয়া-বিন্-আহমদ বা বদাউনির বিরোধিতা করে তিনি লিখেছেন ঃ তরমাশিরিন ভারতে এসেছিলেন ১৩২৭ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ মহম্মদ-বিন্-তুঘলক কর্তৃক দৌলতাবাদে রাজধানী স্থানান্তরের আগে। ***ফেরিস্তা*** লিখেছেন ঃ দবা খাঁ'র পুত্র তরমাশিরিন সসৈন্যে ভারতে প্রবেশ করে মুলতান, লামাঘান-সহ দিল্লী পর্যন্ত বিশাল অঞ্চল লুঠতরাজ করেন। ভীত সুলতান মহম্মদ তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে অর্থের বিনিময়ে শান্তি প্রার্থনা করেন। বিশাল অঙ্কের অর্থ নিয়ে তরমাশিরিন ভারত ত্যাগ করেন।

ড. আগা মেহদী হোসেন মনে করেন, ফেরিস্তার বিবরণের মধ্যে অন্তর্বিরোধিতার ছাপ স্পষ্ট। ফেরিস্তা এবং বরণী উভয়েই স্বীকার করেছেন যে, রাজত্বের সূচনাপর্বে মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের শাসনব্যবস্থা এত দক্ষ ছিল যে, সমস্ত প্রকার বাধা-বিপত্তি তিনি অতিক্রম করতে সক্ষম ছিলেন। সুতরাং, রাজত্বের দ্বিতীয় বছরে মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করতে তিনি ব্যর্থ হবেন, কিংবা অর্থের বিনিময়ে রাজ্যের নিরাপত্তা ভিক্ষা করবেন—একথা স্বীকার করা যায় না। ***ড. হোসেন*** লিখেছেন ঃ এ ধরনের দুর্বলতা নিয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষী আমির ও মালিকদের আনুগত্য পাওয়া সম্ভব নয়। অথচ মহম্মদ তুঘলক-এর পরেও প্রায় পঁচিশ বছর দাপটের সাথে রাজত্ব করেছিলেন। ইসামী, ইয়াহিয়া আহমদ, ফেরিস্তা প্রমুখ তরমাশিরিনের যাত্রাপথের যে বিবরণ দিয়েছেন তাও পরস্পরবিরোধী। ***ইসামীর*** মতে, তরমাশিরিন সিন্ধু থেকে মুলতান হয়ে মিরাট পর্যন্ত আঁকাবাঁকা পথে অগ্রসর হয়েছেন। ***ইয়াহিয়া-বিন্-আহ্মদের*** মতে, এই পথ ছিল পাঞ্জাব, সিরহিন্দ, লাহোর, সামানা, বদাউন হয়ে দিল্লীর সন্নিকট পর্যন্ত। ***ফেরিস্তা*** লিখেছেন ঃ মুলতান, লামঘান হয়ে দিল্লীতে মোঙ্গলরা উপস্থিত হয়েছিল। আবার ***হাজিদবির*** লিখেছেন যে, তরমাশিরিন ও তাঁর বাহিনী একাধিক ভাগে বিভক্ত হয়ে নানা পথ ধরে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। মোঙ্গলদের ভারত ছেড়ে যাবার বর্ণনা প্রসঙ্গেও এই বিরোধ লক্ষ্য করা যায়। ইসামীর মতে, সুলতান মহম্মদ থানেশ্বর পর্যন্ত মোঙ্গলদের পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন। ইয়াহিয়া-র মতে, সুলতান মোঙ্গলদের কালানুর পর্যন্ত তাড়া করেছিলেন। অন্যদিকে তৈমুরের চতুর্থ পুত্র উলুঘবেগ মির্জার উদ্যোগে রচিত ***'শাহ্জারাত-উল-আত্রক'*** গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, দিল্লীর সুলতান মহম্মদ মোঙ্গলদের আদৌ পশ্চাদ্ধাবন করেন নি। তরমাশিরিন স্বেচ্ছায় দিল্লী থেকে গুজরাট হয়ে সোমনাথ ও সুরাট লুণ্ঠন করে স্বরাজ্যে ফিরে যান। ***ড. হোসেন*** লিখেছেন ঃ *"Here is a complex network of paths, not adjustable harmoniously on any atlas of physical and political geography."*

ইবন বতুতা'র বিবরণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাঁর বিবরণ থেকে অনুমিত হয়, তরমাশিরিন ছিলেন ইসলাম ধর্মাবলম্বী এবং দিল্লীর সুলতান তথা মুসলমানদের সুহৃদ। পারিবারিক কিছু রীতিভঙ্গ করার জন্য তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন এবং সমরখন্দের কাছে নিহত হন। অন্য কোন ব্যক্তি তরমাশিরিনের নাম ভাঁড়িয়ে মুলতানে প্রবেশ করেছিলেন। একথা জানতে পেরে মহম্মদ-বিন্-তুঘলক তাঁকে তিরস্কৃত করেন এবং পাঁচ হাজার টঙ্কা অনুদান হিসেবে দান করে স্বদেশে পাঠিয়ে দেন। ***ড. মেহদী হোসেন*** মনে করেন, ইবন বতুতার বক্তব্যের মধ্যে কিছুটা সারবত্তা আছে। তবে তরমাশিরিন ভারতে আসার আগেই নিহত হয়েছিলেন কিনা তা বলা সম্ভব নয়। সম্ভবত, ভাগ্যবিপর্যয়ের ফলে তিনি মিত্র-শাসক দিল্লীর সুলতানের সাহায্যপ্রার্থী হন। অনুগত সেনাবাহিনী

ও পাত্রমিত্রসহ তরমাশিরিন মুলতান, পাঞ্জাব হয়ে দিল্লীর সন্নিকটে উপস্থিত হন। সুলতান তাঁকে পাঁচ হাজার দিনার সাহায্য হিসেবে দেন। অতঃপর মোঙ্গলনেতা ভারত ছেড়ে চলে যান। অবশ্য *ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার* মনে করেন, *ড. হোসেনের* বক্তব্য বহুলাংশে অনুমান-ভিত্তিক এবং সমসাময়িক অন্যান্য তথ্য দ্বারা সমর্থিত নয়। *ড. উলসী হেগ*-এর মতে, তরমাশিরিন আক্রমণ অবশ্যই করেছিলেন, তবে সুলতান উৎকোচ প্রদান করে মোঙ্গল নেতাকে সন্তুষ্ট করেছিলেন, একথা বিশ্বাস করা কঠিন। ***ড. ঈশ্বরীপ্রসাদও*** মনে করেন, ফেরিস্তার বিবরণ অন্যান্যদের তুলনায় বেশি গ্রহণযোগ্য। বিভিন্ন সূত্র বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে যে, মোঙ্গলদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য মহম্মদ-বিন্-তুঘলক ব্যাপক উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তবে ইউসুফ বুঘরা মোঙ্গলদের পরাজিত ও বিতাড়িত করার ফলে মহম্মদ তুঘলক ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ছাড়াই এই বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন।

○ মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের প্রশাসনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ঃ

মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের উদ্ভাবনী-শক্তি ছিল অসীম। নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত এই মধ্যযুগীয় শাসক প্রচলিত ব্যবস্থার গণ্ডীর মধ্যে থেকে দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদনের পরিবর্তে নিত্যনতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করে তাঁর শাসন-প্রতিভাকে বিকশিত করতে অধিক আগ্রহী ছিলেন। জিয়াউদ্দিন বরণী সুলতানের সংস্কারকামী পরিকল্পনা হিসেবে যে-সব কর্মসূচীর উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল দোয়াবে রাজস্ববৃদ্ধি, দিল্লী থেকে দেবগিরিতে রাজধানী পরিবর্তন, তামার মুদ্রার প্রচলন, খোরাসান অভিযান এবং কারাচল (বা কুর্মাচল) অভিযান। বরণীর গ্রন্থ মহম্মদের রাজত্বকালের বিবরণের অন্যতম প্রধান উপাদান ; কিন্তু তিনি ঘটনার সব তারিখ বা ধারাবাহিকতা সম্পর্কে উদাসীনতা দেখিয়েছেন। অন্যান্য বিবরণের ভিত্তিতে অনুমান করা যায় যে, সুলতান ১৩২৫-১৩৩৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তীকালে এই পরিকল্পনাগুলি রূপায়িত করতে সচেষ্ট ছিলেন।

○ ক. ভূমি-সংস্কার ও দোয়াবে করবৃদ্ধি ঃ সিংহাসনে আরোহণ করার অল্পকালের মধ্যেই মহম্মদ-বিন্-তুঘলক ভূমি-সংস্কার বিষয়ে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন। এক নির্দেশ জারি করে বিভিন্ন প্রদেশের আয়-ব্যয়ের হিসেব লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করেন। দাক্ষিণাত্য, বাংলাদেশ, গুজরাট-সহ অন্যান্য প্রদেশ থেকে নিয়মিত বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসেব দিল্লীতে পাঠানোর নিয়ম চালু করা হয়। সুলতান সম্ভবত বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে প্রচলিত ভূমিব্যবস্থার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রক্ষার উদ্দেশ্যে এই সকল ব্যবস্থা নিয়েছিলেন।

ভূমিব্যবস্থার ক্ষেত্রে যে কাজটি মহম্মদের হটকারিতা ও উদাসীনতার দৃষ্টান্তরূপে সমালোচিত হয়েছে, তা হল গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী দোয়াব অঞ্চলে ভূমি-রাজস্বের হার বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত। ঠিক কোন্ সময়ে সুলতান এই ব্যবস্থা আরোপ করেছিলেন, তা বলা কঠিন। বরণী এ বিষয়ে কিছু লেখেননি। ফেরিস্তা, বদাউনি প্রমুখের মতে, নতুন কর আরোপিত হয়েছিল ৭২৫-৭৩০ আল হিজরতে। ***ড. ঈশ্বরীপ্রসাদ, ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার*** প্রমুখ এই ঘটনাকে ১৩২৫-'২৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সম্পাদিত হয়েছিল বলে মনে করেন। ড. আগা মেহদী হোসেন মনে করেন, সুলতানের খোরাসান অভিযানের পরিকল্পনা ভেস্তে যাবার পর করবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছিল। তাঁর ব্যাখ্যা হল খোরাসান পরিকল্পনা ব্যর্থ হবার পর সুলতান সেনাবাহিনী ভেঙ্গে দিলে তাদের অনেকেই কৃষিকার্যে লিপ্ত হয়। এই গোষ্ঠী নতুন কর আরোপ হলে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। অর্থাৎ দোয়াবে

করবৃদ্ধির ঘটনা ঘটেছিল ১৩৩০ খ্রীষ্টাব্দের পর। অবশ্য অধিকাংশ আধুনিক ঐতিহাসিক এই মতের সাথে এক হতে পারেননি।

জিয়াউদ্দিন বরণী এই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন ঃ *'দোয়াবে রাজস্বের হার ১০ থেকে ২০ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছিল। সেই সঙ্গে রাজকর্মচারীরা অন্যান্য কর বা আবওয়াব আদায় করার জন্য কঠোরতা অবলম্বন করলে রায়তগণ দারিদ্র্য ও ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। কৃষকদের মধ্যে বিদ্রোহ সংগঠিত হয়। অধিকাংশ জমি পতিত পড়ে থাকে। ফলে দিল্লীর সন্নিকটস্থ অঞ্চল ও দোয়াবে ব্যাপক খাদ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। একই সময়ে দীর্ঘ অনাবৃষ্টিজনিত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে পরিস্থিতি শোচনীয় ও অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। কৃষকেরা জমি ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে সুলতান তাদের বন্য পশুর মত আক্রমণের নির্দেশ দেন।'* বরণী ছিলেন ঘটনার একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী লিপিকার। তাঁর বিবরণ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সুলতানের রাজস্ব-নীতি এবং বর্ধিত রাজস্ব আদায় করার নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত দেশের কৃষক-সমাজের উপর চরম আঘাত হেনেছিল। তাদের দুঃখ-দুর্দশার অন্ত ছিল না। ভূমি-রাজস্বের পাশাপাশি গৃহ-কর, পশুচারণভূমি-কর ইত্যাদি বৃদ্ধি করে মহম্মদ তুঘলক কৃষক-সমাজকে নিশ্চিত সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন।

বরণীর বিবরণের সত্যতা সম্পর্কে আধুনিক ইতিহাসবিদ্‌রা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। ***গার্ডনার ব্রাউন*** (Gardner Brown) -এর মতে, দোয়াবে আরোপিত করভার খুব বেশি ছিল না এবং বরণীর বিবরণে অতিরঞ্জনের ছাপ স্পষ্ট। ড. ***ঈশ্বরীপ্রসাদ*** মনে করেন, বরণীর নিজস্ব জেলা বরণ এই ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ছিল বলেই তিনি ঘটনার বিবরণে মনগড়া দুর্দশার ছবি এঁকেছেন। ফেরিস্তার মতে, দোয়াবে কর-বৃদ্ধির হার ছিল ৩ গুণ থেকে ৪ গুণ। ড. *আর. পি. ত্রিপাঠী* মনে করেন, মহম্মদ তুঘলক রাজস্ব যেভাবেই বৃদ্ধি করুন, তিনি আলাউদ্দিনের আমলের মোট উৎপাদনের ৫০ শতাংশের নিয়মকে নিশ্চয়ই অতিক্রম করেননি। আলাউদ্দিনের আমলের ৫০ শতাংশ রাজস্বের নিয়ম মুবারক খলজী ও গিয়াসউদ্দিন তুঘলক তুলে দিয়েছিলেন। মহম্মদ তুঘলক তাঁর পূর্বসূরীদের নমনীয় রাজস্ব-নীতির পরিবর্তন ঘটাতে চেয়েছিলেন বলেই জনমনে বিক্ষোভ সঞ্চারিত হয়েছিল। ব্রাউন মনে করেন, মহম্মদের রাজস্বের বর্ধিত হার জনগণের দুর্দশা বা দুর্ভিক্ষের মূল কারণ ছিল না। সুলতানের দুর্ভাগ্য যে, প্রায় একই সময়ে দীর্ঘস্থায়ী অনাবৃষ্টি তাঁর পরিকল্পনাকে বিপর্যয় ও সমালোচনার সম্মুখীন করেছিল। ড. ***ঈশ্বরীপ্রসাদও*** এই মত পোষণ করেন। ***হাজি-উদ্-দবির*** লিখেছেন ঃ *"রাজকর্মচারীরা রাজস্ব আদায়ের জন্য বাড়াবাড়ি করলে এবং নিপীড়ন করলে কৃষকেরা হতাশায় বিদ্রোহী হয়েছিল এবং জমি ছেড়ে চলে গিয়েছিল।"* ঘটনা যাই হোক্, অধিকাংশ গবেষক মনে করেন, মহম্মদ তুঘলকের এই সিদ্ধান্ত জনসাধারণের দুর্দশার কারণ হয়েছিল। ড. ***মজুমদার*** লিখেছেন ঃ ***"On the whole...the step taken by the Sultan was highly reprehensible and the method of its execution, extremely cruel"***. সুলতানের পরিকল্পনার ত্রুটি তাঁর কর-ব্যবস্থার ব্যর্থতার জন্য যতটা দায়ী ছিল, তাঁর দুর্ভাগ্যও তার থেকে কম দায়ী ছিল না। তাই ড. ***ঈশ্বরীপ্রসাদ*** লিখেছেনঃ ***"Never were benevolent schemes of reform more cruelly frustrated by an evil fate than in the case of Muhammad-bin-Tughluq."***

মহম্মদ-বিন্-তুঘলক একই সাথে রাজকোষকে সমৃদ্ধ করতে এবং কৃষকশ্রেণীকে জব্দ করার উদ্দেশ্যে দোয়াবের কর-বৃদ্ধি করেছিলেন বলে বদাউনি অভিমত প্রকাশ করেছেন। স্যার উলসী হেগ এই মত সমর্থন করেন। কিন্তু আধুনিক লেখকেরা এই মন্তব্যের বিরোধিতা করেছেন। কারণ জনসাধারণের দুর্দশার সংবাদ পাওয়ার পরে সুলতান তাদের অর্থ, খাদ্য এবং বলদ সাহায্য দিয়ে পরিস্থিতি মোকাবিলা করার চেষ্টা করেছিলেন। জলাভাব মেটানোর জন্য সরকারি খরচে বহু কূপও খনন করেছিলেন। অবশ্য তাঁর এইসব কল্যাণমূলক ব্যবস্থা সময়োচিত না-হওয়ার কারণে এবং কর্মচারীদের অসাধুতা ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার জন্য কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যপূরণে ব্যর্থ হয়েছিল। প্রজাদের দুর্দশা আদৌ লাঘব হয়নি। ব্যর্থ হলেও সুলতানের উদ্যোগ ছিল প্রশংসনীয়। কৃষি-উন্নয়নের ব্যাপারে মহম্মদের যে আন্তরিকতা ছিল তার আর একটি দৃষ্টান্ত হল 'দেওয়ান-ই-কোহ' নামক স্বতন্ত্র কৃষি-দপ্তর প্রতিষ্ঠা করা। এই দপ্তরের কাজ ছিল নির্দিষ্ট এলাকায় কৃষি-উৎপাদনের জন্য সরকারি অনুদান ও ঋণ প্রদান করা। প্রথমে এজন্য ৬০ বর্গ মাইল জমি নির্দিষ্ট করা হয়। গরীব চাষীদের মধ্যে এই জমি বিলিবণ্টন করে সেখানে বিভিন্ন শস্য-উৎপাদনের জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়। এজন্য প্রথম দু-বছরে সরকারি কোষাগার থেকে ব্যয় হয় ৭০ লক্ষেরও বেশি অর্থ। অবশ্য এক্ষেত্রেও মহম্মদ-বিন্-তুঘলক সাফল্য থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। এই ব্যর্থতার কারণ সমগ্র পরিকল্পনা ও পরিস্থিতির মধ্যে লুকিয়ে ছিল। ***প্রথমত,*** সুলতান পরীক্ষামূলকভাবে আবাদের জন্য যে অঞ্চলটিকে বেছে নিয়েছিলেন তা আদৌ কৃষিকাজের উপযোগী ছিল না। একটা সম্পূর্ণভাবে অনাবাদী ভূখণ্ড এবং কৃষি উৎপাদনের দিক থেকে ভীষণভাবে অনিশ্চিত একটা অঞ্চলের উপর এই পরীক্ষা করতে গিয়ে সুলতান ভুল করেছিলেন। ***দ্বিতীয়ত,*** মহম্মদের এই পরিকল্পনাটি ছিল অভিনব এবং অভূতপূর্ব। এই ধরনের একটা প্রকল্প সফল রূপায়ণের জন্য দক্ষ নজরদারি ছিল আবশ্যিক। কিন্তু মহম্মদের কৃষি-দপ্তর আগাগোড়া এই কাজে উদাসীন ছিল। ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে, যখন প্রকল্পটির ভবিষ্যত সম্পর্কে আভাস পাওয়া যাচ্ছিল, তখনই প্রতিকারমূলক ব্যবস্থাদি নেওয়া সম্ভব হয়নি। যদি নেওয়া হত তাহলে জনগণের দুর্দশা এতটা অসহনীয় হয়ে উঠত না। ***তৃতীয়ত,*** কৃষিক্ষেত্রে যে-কোন পরীক্ষামূলক কর্মসূচীর রূপায়ণের জন্য দীর্ঘ প্রাক্-সমীক্ষা, প্রস্তুতি এবং সময় প্রয়োজন। কিন্তু সুলতানের তাৎক্ষণিক ফললাভের সহজাত ত্রুটি তাঁকে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে প্ররোচিত করেছিল। মাত্র তিন বছর সময়কালে এই ধরনের কোন পরিকল্পনার সফল রূপায়ণ ছিল একটি অবাস্তব চিন্তা-নির্ভর সিদ্ধান্ত। তাই ব্যর্থতা এসেছিল অনিবার্যভাবে। ***চতুর্থত,*** চরম দারিদ্র্যগ্রস্ত কৃষকদের কাছে সুদূরপ্রসারী উন্নয়ন কর্মসূচীর তুলনায় তাৎক্ষণিক সুখ ও ভোগের আবেদন ছিল বেশি। তাই তাদের অনেকেই প্রাপ্ত সরকারি অনুদানের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে চায়নি। অনেকেই কৃষি-উন্নয়নের পরিবর্তে প্রাপ্ত অর্থকে অনুৎপাদক খাতে ব্যয় করেছিল। ***পঞ্চমত,*** যে-কোন উদ্ভাবনমূলক সংস্কার কর্মসূচীর সফল রূপায়ণের জন্য একটি সংগঠিত ও দক্ষ কর্মীমণ্ডলীর প্রয়োজন। কিন্তু মহম্মদ তুঘলকের আমলে কৃষি-পরিকল্পনার সাথে যুক্ত কর্মচারীদের সততা, দক্ষতা ও উদ্যমের যথেষ্ট অভাব ছিল। ফলে কৃষকদের কাছে সুলতানের প্রকৃত ইচ্ছা বা লক্ষ্য সম্পর্কে ভুল সংকেত পৌঁছেছিল। এমতাবস্থায় প্রজাসাধারণ প্রথম থেকেই মহম্মদ তুঘলকের পরিকল্পনার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করেছিল। এইভাবে সুলতান মহম্মদ তুঘলকের একটি সম্ভাবনাময় পরিকল্পনা

কেবল ব্যর্থ হয়নি, সাম্রাজ্যের সংহতিকেও বিপন্ন করেছিল। *অধ্যাপক এ. এল. শ্রীবাস্তব লিখেছেন, "এইভাবে ভূমি-রাজস্বের ইতিহাসে একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ ও পরিত্যক্ত হয়েছিল।"*

○ খ. রাজধানী স্থানান্তর ঃ সুলতান মহম্মদ-বিন-তুঘলকের শাসনতান্ত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল দিল্লী থেকে দৌলতাবাদে রাজধানী স্থানান্তর (১৩২৮-'২৯ খ্রীঃ)। পর্বতময় ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর এই স্থানটির আদি নাম ছিল দেবগিবি। সুলতান কুতুবউদ্দিন মুবারক খলজী এর নাম পরিবর্তন করে 'কুতুবাবাদ' রাখেন। আবার মহম্মদ-বিন্-তুঘলক দক্ষিণের এই রাজ্যে রাজধানী প্রতিষ্ঠার পূর্বে এই এর নতুন নাম দেন দৌলতাবাদ। এই তথাকথিত রাজধানী পরিবর্তন ব্যবস্থা ছিল মহম্মদ তুঘলকের সবথেকে বিতর্কমূলক পদক্ষেপ। বরণী, ইসামী, ইবন বতুতা, নিজামউদ্দিন আহমদ, ফেরিস্তা প্রমুখ মধ্যযুগীয় ঐতিহাসিক এবং ড. আগামেহদী হোসেন, মহম্মদ হবিবউল্লাহ, মহম্মদ হাবিব, সৈয়দ মইনউল হক্, ঈশ্বরীপ্রসাদ প্রমুখ আধুনিক ঐতিহাসিক ও গবেষক সুলতানের এই পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বরণী, ইবন বতুতা, ইসামী প্রমুখের বিবরণ থেকে যে-সকল বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে, তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল—এই ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণে সুলতানের উদ্দেশ্য, পরিকল্পনাটি রূপায়ণের পদ্ধতি এবং এর প্রতিক্রিয়া ও পরিণতি।

দৌলতাবাদে রাজধানী স্থানান্তরের উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে *বরণী* লিখেছেন যে, সুলতান মহম্মদ-বিন্-তুঘলক ভারতের ভৌগোলিক পরিস্থিতির বিচারে দিল্লীর তুলনায় অধিকতর একটি কেন্দ্রীয় অঞ্চলে রাজধানী স্থাপনের কথা চিন্তা করেন। সুলতানের বিচারে দৌলতাবাদ (দেবগিরি বা কুতুববাদ) ছিল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। এখান থেকে দিল্লী, গুজরাট, বাংলাদেশ, তেলেঙ্গানা, দ্বারসমুদ্র, কাম্পিল প্রভৃতি অঞ্চল ছিল প্রায় সম-দূরত্বে অবস্থিত। অর্থাৎ একটি কেন্দ্রবর্তী অঞ্চল থেকে সমগ্র সাম্রাজ্যের উপর প্রশাসনিক নজরদারি জোরদার করার উদ্দেশ্যে সুলতান রাজধানী স্থাপনের জন্য দেবগিরিকে বেছে নিয়েছিলেন। ইবন বতুতার বিবরণে সুলতানের কোন প্রশাসনিক লক্ষ্যের কথা নেই। তিনি লিখেছেন ঃ দিল্লীর অধিবাসীরা সুলতানের প্রতি বিরূপ ছিলেন এবং তাঁরা সুলতানের নামে কুৎসাপূর্ণ চিঠি প্রেরণ করে তাঁকে উত্যক্ত করতেন। তাই তাদের জব্দ করার জন্য সুলতান দিল্লী ত্যাগ করে প্রজাদের দৌলতাবাদে যাবার নির্দেশ দেন। সুলতানের কঠোর নির্দেশের ফলে প্রায় সবাই দিল্লী ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের চরিত্রের নৃশংসতা বোঝানোর জন্য ইবন বতুতা দুটি ঘটনার অবতারণা করেছেন—(১) সুলতানের কর্মচারীরা অনুসন্ধান করে যখন দেখে যে, একজন অন্ধ ও একজন পঙ্গু ব্যক্তি দিল্লী ত্যাগ করেনি, তখন সুলতান পঙ্গু ব্যক্তিটিকে দূরে ছুঁড়ে হত্যার এবং অন্ধ ব্যক্তিটিকে টেনে-হিঁচড়ে দৌলতাবাদ নিয়ে যাবার নির্দেশ দেন। দীর্ঘ চল্লিশ দিন পরে দৌলতাবাদে পৌঁছে দেখা যায় যে, লোকটির একটি পা ছাড়া শরীরের সমস্ত অংশই টুকরো টুকরো হয়ে রাস্তায় থেকে গেছে। এবং (২) সুলতান গভীর রাত্রে প্রাসাদের উপর থেকে দিল্লী-শহরের দিকে তাকিয়ে যখন দেখতেন কোথাও আলোর রেশমাত্র নেই, ধোঁয়া বা প্রদীপের সামান্যতম শিখাও দেখা যাচ্ছে না, তখন সুলতানের হৃদয় ও আত্মা শান্তি অনুভব করত। ইসামীও প্রায় অনুরূপ ধারণা পোষণ করেন। তাঁর মতে, দিল্লীর অধিবাসীদের সুলতান শত্রু বলেই মনে করতেন।

এবং দক্ষিণ ভারতেস্থানান্তরিত করে তাদের শক্তি খর্ব করাই ছিল সুলতানের লক্ষ্য। জনগণের প্রতি মহম্মদের আচরণকে ইসামী প্রাচীন ইরানের নৃশংস রাজা জাহাকের থেকেও কঠোর ও অমানবিক বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ *'জাহাক ছিলেন ধর্মহীন, শয়তানের অনুচর। তিনি প্রতিদিন দু'টি মানুষের মৃত্যু ঘটাতেন ; কিন্তু আমাদের সুলতান যে-কোন মুহূর্তে কয়েক হাজারের প্রাণনাশ করেন। জাহাক বেঁচে থাকলে, তার আচরণ মহম্মদ তুঘলকের তুলনায় উদার বলেই মনে হত।'*

ড. নিজামী এই তিনটি বিবরণের যথার্থতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। দিল্লী থেকে দেবগিরি শাসন করা যদি অসম্ভব হয়, তবে দেবগিরি থেকে দিল্লীসহ উত্তর ভারত শাসন করাও একই রকম কষ্টকর হবে,—এ সত্য উপলব্ধি করার মত বিচক্ষণতা মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের মত শাসকের নিশ্চয়ই ছিল। তাই কেন্দ্রস্থল হিসেবে নয়, বিশেষত দক্ষিণ-ভারতে কার্যকর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার জন্য হয়তো সুলতান এই পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। ইবন বতুতার বিশ্লেষণকে রাজধানী পরিবর্তনের উদ্দেশ্য না বলে প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেখাই সঙ্গত। তাছাড়া, তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, সুলতান ন্যায্যমূল্যে দিল্লীবাসীর ঘরবাড়ি ও অন্যান্য সম্পত্তি ক্রয় করে তাদের ক্ষতিপূরণ দিয়েছিলেন। সুতরাং, দিল্লীবাসীর প্রতি সুলতানের ক্ষোভের তত্ত্ব টেকে না। *ড. নিজামী* মনে করেন, সুলতান গুরুসাস্প-এর বিদ্রোহ দমন করার পর দাক্ষিণাত্যের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য সেখানে একটি শক্তিশালী শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলার আশু প্রয়োজন উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর সভসদ্‌রা এজন্য উজ্জয়িনীকে কেন্দ্র করার পরামর্শ দেন। কিন্তু সম্রাট দেবগিরিকেই বেছে নেন এবং সেখানে একটি প্রশাসনিক কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। এটি ছিল সুলতানের সুপরিকল্পিত সিদ্ধান্ত, কোন হটকারী পরিকল্পনা নয়।

অধ্যাপক মহম্মদ হাবিব এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, আলাউদ্দিন দক্ষিণ ভারতের সাথে দিল্লীর দূরত্বের বিবেচনায় সেখানে সরাসরি নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা থেকে বিরত ছিলেন। কিন্তু মুবারক শাহ্ সিংহাসনে বসে দেবগিরি থেকে যাদবদের হটিয়ে দেন এবং সেখানে দিল্লীর শাসন কায়েম করেন। সদাহ আমির (আমিরান-ই-সদাহ্) দের উপর প্রশাসন ও কর-সংগ্রহের দায়িত্ব দেন। মহম্মদ তুঘলক উপলব্ধি করেন যে, বরঙ্গলে দিল্লীর কর্তৃত্ব স্থাপিত না-হলে দেবগিরিতেও দিল্লীর আধিপত্য স্থায়ী হবে না। তাই তিনি বরঙ্গলকে দিল্লীর অন্তর্ভুক্ত করে সেখানেও সদাহ-আমিরদের হাতে শাসনভার ন্যস্ত করেন। কিন্তু তাতেও দাক্ষিণাত্যে মুসলমান শাসনের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত থেকে যায়। কারণ সমগ্র দাক্ষিণাত্যে মুসলমানের সংখ্যা ছিল নগণ্য। গুজরাট, রাজপুতানা ও মালবে সামান্যসংখ্যক মুসলমান বাস করত। আর দেবগিরিতে সরকারি কর্মী ছাড়া প্রায় সবাই ছিল হিন্দু। দাক্ষিণাত্যের হিন্দু-সামন্তরা সংঘবদ্ধভাবে ক্ষমতা পুনর্দখলের ইচ্ছা পোষণ করতেন। এমনকি সদাহ আমিরগণ মুসলমান হলেও দিল্লীর অধীনতাকে অমর্যাদাকর বলেই মনে করতেন। এমতাবস্থায় মহম্মদ-বিন্-তুঘলক দেবগিরিকে শাসনের কেন্দ্রে পরিণত করে দাক্ষিণাত্যে মুসলমান শাসন সুনিশ্চিত করার উদ্যোগ নেন। অধ্যাপক ***হাবিব*** লিখেছেন ঃ *'এই কাজের জন্য সুলতান দপ্তর স্থানান্তরের সঙ্গে সঙ্গে অতিন্দ্রীয়বাদী (Mystic) সুফী-সাধকদের দেবগিরিতে আনার সিদ্ধান্ত নেন। কারণ তিনি দেখেছেন যে, উত্তর ভারতে এই সকল সুফী-সাধক নিম্নবর্ণের বহু হিন্দুকে ইসলামে ধর্মান্তরিত*

করতে সক্ষম হয়েছেন। এঁরা ইসলামের শাসনকে দৃঢ় ভিত্তি দিয়েছেন। তাই দাক্ষিণাত্যেও এই সকল ধর্মগুরুদের এনে মুসলমানের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত সুলতান গ্রহণ করেন।' *ড. মেহদি হোসেনও এই মত সমর্থন করেন। তাঁর মতে, সুফী-সাধকদের ধর্মভাবনা হিন্দু ও* মুসলমানের মধ্যে সমন্বয়সাধন করতে সক্ষম হবে এবং ধর্মীয় উত্তেজনা হ্রাস পাবার ফলে সুলতানির ভিত্তি সুদৃঢ় হবে, এই কারণে সুলতান রাজধানী স্থানান্তরের সাথে সুফী-সন্তদের নতুন রাজধানীতে গিয়ে খানকা স্থাপন ও মুসলিম-সংস্কৃতি প্রসারের আহ্বান জানান।

গার্ডনার ব্রাউনের মতে, মহম্মদ তুঘলক কর্তৃক দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর ছিল একান্তভাবে আর্থ-রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত এবং অনিবার্য। মোঙ্গলদের পুনঃ পুনঃ আক্রমণের ফলে দিল্লীর নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক ভিত্তি শিথিল হয়ে পড়েছিল। সুলতান উপলব্ধি করেন যে, উত্তরের তুলনায় দক্ষিণ ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা অনেক সুদৃঢ়। তাই তিনি দক্ষিণ ভারতের কোন শহরে রাজধানী স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আধুনিক লেখকদের বিশ্লেষণ থেকে প্রতিষ্ঠিত হয় যে, মহম্মদ তুঘলক নিছক উদ্ভাবনী প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য কিংবা দিল্লীর অধিবাসীদের উপর প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে, অথবা দক্ষিণ ভারতে ইসলামের সম্প্রসারণের জন্য রাজধানী স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেননি।

বরণী ও ইবন বতুতা দৌলতাবাদে রাজধানী স্থানান্তরের পদ্ধতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে যে বিবরণ দিয়েছেন, আধুনিক গবেষকরা তার যথার্থতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। ইয়াহিয়া সিরহিন্দির মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে *ড. নিজামী* প্রমুখ লিখেছেন যে, অন্তত দু'বছর আগে থেকে সুলতান রাজধানী পরিবর্তনের প্রস্তুতি শুরু করেছিলেন। শিরহিন্দি লিখেছেন, সুলতান ১৩২৬-'২৭ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী ও দৌলাতাবাদের মাঝে প্রশস্ত রাস্তা, অসংখ্য সরাইখানা, বিশ্রামের জন্য রাস্তার দু'পাশে বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করেন। অতঃপর দলে দলে বিভক্ত হয়ে স্থানান্তরের কাজ শুরু হয়। প্রথমে সুলতানের মা মুকদুমা জাহান, আমীর, মালিক উচ্চপদস্থ কর্মচারীবৃন্দকে দেবগিরিতে পাঠানো হয়। অতঃপর শেখ, সৈয়দ, উলেমা প্রমুখকে নতুন রাজধানীতে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। শিরহিন্দির মতে, ১৩২৮-'২৯ খ্রীষ্টাব্দে স্থানান্তরের নির্দেশ কার্যকরী হয়। ***বরণী*** লিখেছেন, দিল্লী পরিত্যাগ করার মুহূর্তে এবং দৌলতাবাদে প্রবেশ করার মুহূর্তে সুলতান প্রত্যেককে প্রীতি-উপহার প্রদান করে উৎসাহিত করেন। ***শেখ মুবারক*** লিখেছেন ঃ দৌলতাবাদে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে সুলতান বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য আলাদা আলাদা উপনগরী গড়ে তোলেন। প্রতিটি এলাকায় বাজার, স্নানাগার, মসজিদ, বেকারি ইত্যাদি এমনভাবে গড়ে তোলা হয় যাতে প্রতিটি এলাকা স্বনির্ভর হয়ে নিজেদের চাহিদা মেটাতে পারে।

সুলতান সমস্ত শ্রেণীর মানুষ, এমনকি দিল্লীর কুকুর-বেড়ালকেও, নতুন রাজধানীতে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন বলে যা বলা হয়েছে, তা-ও সঠিক নয়। ড. হোসেন তৎকালীন লেখকদের মন্তব্য বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করেছেন যে, সাধারণ মানুষ বা হিন্দুদের নতুন রাজধানীতে যাওয়ার জন্য কোন চাপ সুলতান দেননি। স্বয়ং বরণী এই ঘটনাকে ***"misfortune to the upper classes, as well as decline of the select and distinguished people"*** বলে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ সুলতানের এই সিদ্ধান্তের ফলে সাধারণ মানুষের কোন অসুবিধা হয়নি। *'মতলব-উৎ-তালিবন'* গ্রন্থে মহম্মদ বল্‌ক লিখেছেন যে, কেবলমাত্র অগ্রণী মুসলমানরাই

দেবগিরি রওনা হয়েছিলেন ; সাধারণ মানুষ নয়। ১৩২৭ ও ১৩২৮ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে প্রাপ্ত দুটি সংস্কৃত লিপি থেকে প্রমাণিত হয় যে, ঐ সময়ে দিল্লীতে হিন্দুরা সুখেই বসবাস করছিল এবং কূপ-খনন ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কাজও অব্যাহত ছিল। সুলতান মহম্মদকে ঐ লিপিতে সুশাসক বলেও বর্ণনা করা হয়েছে। তাছাড়া, দক্ষিণ ভারতে হিন্দু-আধিপত্য শিথিল করার জন্য সুলতান দিল্লী থেকে হিন্দুদেরই সেখানে নিয়ে যাবেন এমন ধারণা করা হাস্যকর।

'মাসালিক-ই-আবসর, গ্রন্থের বিবরণ এবং ১৩৩০-'৩১ খ্রীষ্টাব্দে খোদিত দু'টি মুদ্রার ভিত্তিতে আধুনিক কোন কোন গবেষক মনে করেন যে, সুলতান কখনোই দিল্লীকে রাজধানী শহর হিসেবে বর্জন করতে চাননি। মাসালিকে বলা হয়েছে, দিল্লী ছিল মহম্মদের প্রধান রাজধানী এবং দৌলতাবাদ ছিল দ্বিতীয় রাজধানী। দুই রাজধানীর মধ্যে যোগাযোগ রাখার জন্য নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে ঢোলের বাদ্য-সংকেত ব্যবহার করা হত। মুদ্রা দুটিতে 'তাখতাঘ-ই-দিল্লী' এবং 'তাখতাঘ-ই দৌলতাবাদ' শব্দ দুটি ব্যবহার করে দু'টি রাজধানীর অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। এমনকি ইবন বতুতা স্বয়ং ১৩৩৪ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে এসে নগরীর ব্যস্ততা, বিশালতা ও ব্যাপক জনসমাবেশ লক্ষ্য করেছেন। সেখানে জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের সংস্পর্শেও তিনি এসেছেন। অ৵চ এর তিন বছর পর আনুষ্ঠানিকভাবে দৌলতাবাদ থেকে পুনরায় দিল্লীতে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। তাই *ড. হোসেন* দৃঢ়তার সাথে বলেছেন ঃ ***"Delhi never ceased to be the capital, and as such, was never depopulated or deserted."*** অধ্যাপক *এন. বি. রায়* ঐতিহাসিকদের মতবৈচিত্র্যকে সমন্বিত করে লিখেছেন ঃ *'পুরানো রাজধানী (দিল্লী) কখনোই চূড়ান্তভাবে বর্জিত হয়নি। প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে এর অধিষ্ঠান অব্যাহত ছিল। ১৩২৭-'৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কালেও সুলতানের ক্ষণিক উপস্থিতির কালে রাজপ্রাসাদে কলগুঞ্জন শোনা যেত। অবশ্য নগরীর জনস্ফীতি বা ব্যস্ততা কিছুটা ক্ষীণ হয়েছিল।'* ড. *নিজামীর* মতে, মহম্মদ তুঘলক কর্তৃক রাজধানী স্থানান্তরের ঘটনাটির এত বিরূপ সমালোচনা হবার মূল কারণ হল বরণী, ইসামী প্রমুখের ভ্রান্ত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ব্যাখ্যা। বরণীর কাছে দিল্লী ছিল শুধুমাত্র অভিজাতদের শৌর্যবীর্য, বিলাসব্যসনের কেন্দ্রভূমি এবং সাধু, সন্ত, ফকির ইত্যাদি ধর্মাচরণদের ক্ষেত্র। তাই এই দুই শ্রেণীর অপসারণের ফলে দিল্লী তাঁর চোখে শ্মশানভূমিতে পরিণত হয়েছিল। ইসামীর বৃদ্ধ পিতামহ দৌলতাবাদ যাওয়ার পথে তিলপতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। তাই সুলতানের এই পরিকল্পনা ইসামীর লেখনীতে একটা বীভৎস রূপ পেয়েছে। ইবন বতুতা দিল্লীর দুরবস্থার কথা লিখেছেন লোকমুখে শুনে। তাই ঘটনার ৪/৫ বছর পরে স্বয়ং দিল্লীতে এসে যে বিবরণ লেখেন, তাতে বিপরীত চিত্রই ফুটে উঠেছে।

একথা সত্য যে, সুলতানের রাজধানী স্থানান্তরের পদ্ধতি, সময়কাল ও লক্ষ্য সুচিন্তিত ছিল না। বিগত ১৬০/১৭০ বছর ধরে দিল্লী তার প্রশাসনিক ঐতিহ্য গড়ে তুলেছে। ধর্মগুরুদের পীঠস্থান হিসেবেও দিল্লী একটা নির্দিষ্ট মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। সুলতানি-প্রাসাদকে কেন্দ্র করে যেমন অভিজাতদের জীবনধারা, সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতন বয়ে চলেছিল, তেমনি হাজার হাজার 'খানকা', ধর্মশালা, ধর্মগৃহকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছিল মৌলানা, দরবেশ, প্রমুখ সন্ত-সাধকদের জীবনদর্শন। এক ধরনের একাত্মতা সৃষ্টি হয়েছিল ভূমির সাথে তার অধিবাসীদের। ফলে সুলতান যখন তাদের অজানা প্রান্তরে যাওয়ার নির্দেশ দেন, তখন জনমনে একটা বিরূপ

প্রতিক্রিয়া হওয়া ছিল খুবই স্বাভাবিক। পরিবর্তনের সময়টাও সঠিক ছিল না। প্রচণ্ড গ্রীষ্মে দীর্ঘ পথ (কম করে ৪০ দিনের যাত্রা) অতিক্রম করে নির্দিষ্ট স্থানে অনেকেই পৌঁছাতে পারেনি। যাঁরা পৌঁছাতে পারেন তারাও দুঃখ-দুর্দশার জন্য সুলতানের সমালোচনায় মুখর হন। কিছুদিনের মধ্যে সুলতানও বুঝতে পারেন তার পরিকল্পনা যথার্থ হয়নি। কারণ সুদূর দক্ষিণ ভারত থেকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের নিরাপত্তা বজায় রাখা দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত ১৩৩৫-'৩৭ খ্রীষ্টাব্দে আবার তিনি সদলবলে দিল্লী প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন। বহু সমালোচনা, অজস্র অর্থব্যয় আর জনগণের চরম দুগর্তির পরে পরিত্যক্ত হয় সুলতানের এই পরিকল্পনা।

দেবগিরিতে দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপনের প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হলেও এর সুদূরপ্রসারী সুফল লক্ষ্য করা যায়। অধ্যাপক ***সতীশচন্দ্রের*** মতে, যোগাযোগ-ব্যবস্থার উন্নতি ঘটার ফলে উত্তর-ভারত ও দক্ষিণ-ভারত পরস্পরের নিকটে আসে এবং মুসলিম অভিজাত ও ধর্মগুরুদের দৌলতাবাদে বসবাসের ফলে উত্তর-ভারতের তুর্কী-সংস্কৃতি, ধর্মীয় ও সামাজিক ভাবধারা দক্ষিণ-ভারতে প্রসারিত হয়েছিল। এর ফলে উত্তর-ভারত ও দক্ষিণ-ভারতের মধ্যে এক নতুন সাংস্কৃতিক যোগসূত্র রচিত হয়। ড. নিজামী মনে করেন, মহম্মদ-বিন্-তুঘলক কর্তৃক দৌলতাবাদে মুসলিম জনসমাবেশের পরোক্ষ ফলই হল বাহমনী রাজ্যের সৃষ্টি। ড. ***সৈয়দ মইনুল হক্*** এই মত সমর্থন করে লিখেছেন ঃ "*We cannot ignore the fact that the foundation and maintenance of Independent Musalman kingdom in the Deccan would not have been possible if we had not plated a strong muslim colony there.*"

○ গ. মুদ্রা-সংস্কার ঃ মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের পরীক্ষামূলক সংস্কার-কর্মসূচীর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন ছিল প্রতীক-মুদ্রা (Token currency)-র প্রচলন। এই ধরনের শেষ মুদ্রার তারিখ ১৩৩১-'৩২ খ্রীষ্টাব্দ। ***ইসামী*** লিখেছেন ঃ তিন বছর চালু থাকার পর এই প্রতীক-মুদ্রা তুলে নেওয়া হয়েছিল। তাই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, ১৩২৯-'৩০ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান প্রতীক-মুদ্রার প্রবর্তন করেছিলেন। ভারতে প্রথম হলেও প্রতীক-মুদ্রার ব্যবহার তখনও বিশ্বের অন্যান্য দেশে চালু ছিল। বর্তমানকালে বিশ্বের প্রায় সকল দেশে স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রার পরিবর্তে কাগজের প্রতীক-মুদ্রা (নোট) বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে চালু আছে। স্বাভবতই মধ্যযুগে এই ধরনের অর্থব্যবস্থার প্রবর্তন মহম্মদ তুঘলকের উদ্ভাবনী প্রতিভা ও দূরদর্শিতার পরিচায়ক। তবে এই ব্যবস্থায় সুলতানের নতুন উদ্ভাবন ছিল না। ত্রয়োদশ শতকে চীন ও পারস্যে প্রতীক-মুদ্রার প্রচলন করা হয়েছিল। চীনে কুবলাই খাঁ (১২৬০-'৯৪ খ্রীঃ) এবং পারস্যে কাইঘাটু খাঁ (১২৯৩ খ্রীঃ) নিজ নিজ দেশে প্রতীক-মুদ্রার প্রচলন করে খ্যাত হয়েছিলেন। অবশ্য চীনে এই নতুন মুদ্রা-ব্যবস্থা সফল হলেও পারস্যে হয়নি। যাই হোক, অতীত থেকে দৃষ্টান্ত গ্রহণ করে মহম্মদ তুঘলক ভারতে প্রতীক-মুদ্রা চালু করেন। এই নতুন মুদ্রায় ব্যবহৃত ধাতু সম্পর্কে প্রাথমিক কিছুটা মতভেদ আছে। ***বরণী*** লিখেছেন ঃ প্রতীক-মুদ্রায় তামা ব্যবহার করা হয়েছিল। কিন্তু ফেরিস্তার মতে, এই ধাতুটি ছিল ব্রোঞ্জ। দেশের নানা অংশ থেকে সংগৃহীত এবং জাদুঘরে সংরক্ষিত মহম্মদের প্রতীক-মুদ্রা পরীক্ষা করে তর্কবিশারদরা এটিকে ব্রোঞ্জ বলেই স্বীকার করেছেন। ইতিপূর্বে বিনিময়-অর্থ হিসেবে স্বর্ণমুদ্রা 'দিনার', রৌপ্যমুদ্রা 'টঙ্কা' এবং তাম্রমুদ্রা 'জিতল' চালু ছিল। মহম্মদ-বিন্-তুঘলক এখন টঙ্কার সমমানে (value) ব্রোঞ্জের নতুন মুদ্রা চালু করেন। বলা যেতে পারে, তিনি

এখন জিতলকে কিছুটা পরিবর্তিত করে রূপার টঙ্কার সমান মূল্যে বাজারে চালু করেন। ইতিপূর্বে প্রচলিত মুদ্রাগুলিতে আবরী ভাষা খোদিত থাকত। নতুন ব্রোঞ্জ মুদ্রায় আরবীর সাথে সাথে ফারসী ভাষাও খোদাই করা হয়। ফরাসীতে লেখা হয় 'সরকারি' টাকশালে প্রস্তুত এই টঙ্কা মহম্মদ তুঘলকের আমলে প্রচলিত, যিনি (মহম্মদ) ঈশ্বরের কৃপাপ্রার্থী। অন্যদিকে আরবীতে লেখা হয় ঃ *'যিনি সুলতানকে মান্য করেন, তিনি ঈশ্বরকেও মান্য করেন ; ঈশ্বরকে মান্য কর ; নবীকে মান্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যাঁরা কর্তৃত্ব করেন, তাঁদের মান্য কর।'* সম্ভবত, এই প্রতীক-মুদ্রা জনগণকে আগ্রহী করে তোলার উদ্দেশ্যে সুলতান এরূপ ধর্মীয় প্রেরণামূলক বাক্য ব্যবহার করেছিলেন।

মহম্মদ-বিন্-তুঘলক কর্তৃক প্রতীক-মুদ্রা প্রবর্তনের কারণ সম্পর্কেও কিছুটা বিতর্ক আছে। ***বরণী*** লিখেছেন ঃ সুলতান রাজকোষের শূন্যতা দূর করার জন্যই প্রতীক-মুদ্রা চালু করেছিলেন। তাঁর মতে, সুলতানের কয়েকটি ব্যর্থ সামরিক পরিকল্পনা, বদান্যতা ও দান-খয়রাতের ফলে রাজকোষ শূন্য হয়ে পড়েছিল। তাঁর প্রয়োজন হয়েছিল প্রচুর অর্থের। তাই স্বল্পমূল্যের ধাতু ব্যবহার করে নতুন মুদ্রা চালু করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ড. *নিজামী*, ড. *হোসেন* প্রমুখ অর্থাভাবকে প্রতীক-মুদ্রা প্রচলনের একমাত্র কারণ না বলে অন্যতম কারণ বলার পক্ষপাতী। দোয়াবের রাজস্ব আদায়ের ব্যর্থতা, মহামারী, রাজধানী স্থানান্তরের প্রস্তুতি প্রভৃতির ফলে রাজকোষের উপর বিরাট চাপ পড়েছিল সত্য ; কিন্তু রাজকোষ শূন্য হয়ে যায়নি। কারণ বরণী নিজেই স্বীকার করেছেন যে, প্রতীক-মুদ্রা-ব্যবস্থা ব্যর্থ হবার ফলে সুলতান জনসাধারণের কাছ থেকে সংগৃহীত সমস্ত ব্রোঞ্জ টঙ্কার পরিবর্তে রাজকোষ থেকে সোনা বা রূপার টঙ্কা দিয়ে ক্ষতিপূরণ করেছিলেন। রাজকোষ শূন্য হলে এটা করা সম্ভব হত না। পক্ষান্তরে আধুনিক ঐতিহাসিকেরা মুদ্রাবিশারদ *নেলসেন রাইট* (Nelson Wright)-এর মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে মনে করেন যে, চতুর্দশ শতকে বিশ্বব্যাপী রৌপ্য-সংকট দেখা দিয়েছিল। বাংলা ও দক্ষিণ-ভারত থেকে রূপা সংগ্রহের পরিমাণও কমে গিয়েছিল। মহম্মদ তুঘলক চরিত্রগতভাবে যে-কোন সমস্যার মূলে প্রবেশ করে তার স্থায়ী সমাধান করার চেষ্টা করতেন। তাই রূপার সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি দেশের মুদ্রাব্যবস্থার একটা স্থায়ী সমাধানের জন্য ব্রোঞ্জ-মুদ্রার প্রবর্তনে উদ্যোগী হন।

মহম্মদ-বিন্-তুঘলক মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতীক-মুদ্রা চালু করলেও তার পরিণতি ছিল খুবই দুঃখজনক। সহজলভ্য ধাতু দ্বারা মুদ্রা তৈরি হওয়ার ফলে দেশে জাল-মুদ্রায় ভরে যায়। আসল ব্রোঞ্জ-মুদ্রা এবং জালমুদ্রার প্রভেদীকরণ সহজ ছিল না বলে জনসাধারণ সহজেই তা গ্রহণ করে। ***বরণী*** লিখেছেন ঃ *'প্রতিটি হিন্দুর গৃহ জাল-মুদ্রার কারখানায় পরিণত হয়েছিল।'* এখানে 'হিন্দু' বলতে তিনি সম্ভবত স্বর্ণকারদের কথা বলেছেন। কারণ তখন অধিকাংশ স্বর্ণকার ছিলেন হিন্দু। অবশ্য ঈশ্বরীপ্রসাদের মতে, বরণী এত গোঁড়া ও পরধর্মবিদ্বেষী ছিলেন যে, এ ক্ষেত্রেও তিনি মুসলমানদের অব্যাহতি দিয়ে কেবল হিন্দুদের নামে দোষারোপ করেছেন, যদিও মুদ্রা জাল করার বিদ্যা সকলের অধিগত ছিল। যাই হোক্, জাল মুদ্রার যে ব্যাপক লেনদেন শুরু হয়েছিল তা বোঝা যায়। এমতাবস্থায় সাধারণ মানুষ সরকারি রাজস্ব-প্রদানের কাজে কেবলমাত্র ব্রোঞ্জমুদ্রা ব্যবহার করে ; এবং রৌপ্যমুদ্রা হস্তগত হলেও তা ঘরে লুকিয়ে ফেলে। ফলে সরকারি কোষাগারে রূপার আমদানি শূন্য হয়ে যায়। বিদেশী বণিকরা প্রতীক-মুদ্রার ধাতুমূল্য বিচার করে

তাদের বাণিজ্যকর্মে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। সরকারকে দেয় শুল্ক বা দেশের মধ্যে কেনাকাটার সময় তারা ব্রোঞ্জমুদ্রা ব্যবহার করে, কিন্তু তাদের দ্রব্যাদি বিক্রয়ের সময় স্বর্ণমুদ্রা বা রৌপ্যমুদ্রা ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। ক্রমে বিদেশী বণিকরা ভারতে দ্রব্য-আমদানি প্রচণ্ডভাবে কমিয়ে দেয়। সুলতান তাঁর প্রতীক-মুদ্রার এই করুণ পরিণতি লক্ষ্য করে তিন বছরের মধ্যেই ব্রোঞ্জমুদ্রা প্রত্যাহার করে নেন। সমস্ত ব্রোঞ্জমুদ্রার পরিবর্তে মুদ্রার গ্রাহকদের স্বর্ণমুদ্রা বা রৌপ্যমুদ্রা প্রদান করা হয়।

এডোয়ার্ড টমাস মনে করেন, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা হিসেবে সুলতানের প্রতীক-মুদ্রা প্রচলন অন্যায্য ছিল না। ড. ***মেহদী হোসেন*** সুলতানের এই পরিকল্পনার প্রশংসা করে লিখেছেন ঃ ***"On the whole it was quite good and statesmanlike."*** এঁদের বক্তব্য যে যথার্থ তার প্রমাণ বর্তমানে বিশ্বে প্রতীক-মুদ্রা (কাগজী নোট)-এর একচ্ছত্র আধিপত্য। তাই অর্থনীতির বিচারে সুলতানের এই পরিকল্পনা তাঁর প্রজ্ঞার পরিচায়ক। কিন্তু দুখঃজনক হলেও সত্য যে, সুলতানের এই পরিকল্পনাও ব্যর্থ হয়েছিল এবং তাঁর উদ্ভাবনী প্রতিভা কিছুটা সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিল। প্রতীক-মুদ্রার বিফলতার কারণ হিসেবে ইতিহাসবিদেরা একাধিক কারণ উল্লেখ করেছেন। এল্‌ফিনস্টোন রাজকোষের দেউলিয়া অবস্থা ও সরকারের অস্থায়িত্বকে প্রতীক-মুদ্রার বিফলতার কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ঈশ্বরীপ্রসাদ মনে করেন,—এ দুটি অভিযোগই যথার্থ নয়। কারণ সুলতান পরবর্তীকালে রৌপ্যমুদ্রা ও স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে সমস্ত ব্রোঞ্জমুদ্রা বাজার থেকে তুলে নিয়েছিলেন। মুদ্রাবিশারদ ***এডোয়ার্ড টমাসের*** বিশ্লেষণটি বহুলাংশে সত্য। তিনি লিখেছেন ঃ *'সরকারি টাকশালে এবং বেসরকারি দক্ষ কারিগররা প্রায় একই ধরনের যন্ত্রে মুদ্রা তৈরি করত। কারণ এই সকল যন্ত্র বাজারে সহজলভ্য ছিল। সরকারি টাকশালে প্রস্তুত মুদ্রা এবং ব্যক্তিগতভাবে দক্ষ কারিগরদের তৈরি মুদ্রার প্রভেদ ধরার মত কোন ব্যবস্থা সরকারের ছিল না।'* অথচ এটিই ছিল সহজলভ্য ধাতু-মুদ্রা সচল রাখার প্রধানতম শর্ত। ***ব্রটমাস*** লিখেছেন ঃ *'চীনে প্রচলিত কাগজী-মুদ্রার নকল আটকানোর জন্য সরকার যতখানি সতর্ক ছিলেন, মহম্মদ তুঘলক তাঁর ব্রোঞ্জমুদ্রার ক্ষেত্রে ততটা ছিলেন না।'* ফলে দেশে জাল মুদ্রা ছেয়ে গিয়েছিল। এখানে মহম্মদ হাবিবের ব্যাখ্যাটি প্রণিধানযোগ্য। ***হাবিব*** লিখেছেন ঃ সেখানে মানুষ সোনা বা রূপার মুদ্রা গ্রহণ করার সময় পরশপাথরে ঘষে ধাতু পরীক্ষা করে নিত। সরকারি টাকশালে প্রস্তুত ব্রোঞ্জ-মুদ্রাতেও ধাতু মিশ্রণের বৈশিষ্ট্য এমন ছিল যা পাথরে ঘষলে ধরা পড়ত কিন্তু ধাতুর অনুপাত সহজে ধরা যেত না। সুলতান আশা করেছিলেন ব্রোঞ্জ মুদ্রা গ্রহণের কালেও জনগণ ধাতু পরীক্ষা করে নেবে। কিন্তু সুলতানের আশা পূরণ হয়নি। সকলে সাধারণভাবে নতুন মুদ্রা গ্রহণ করার ফলেই জাল মুদ্রার ব্যাপক প্রসার রোধ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ***উলসী হেগ্‌*** লিখেছেন ঃ *'সুলতান এরূপ নোট প্রচলনের কথা জানতেন, কিন্তু এর নীতি বা পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর কোন ধারণা ছিল না।'* তিনি স্বীকার করেছেন যে, উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে নতুন মুদ্রাব্যবস্থা বিফল হত না। ড. ***ঈশ্বরীপ্রসাদ*** লিখেছেন ঃ ***"The scheme failed more on account of prejudice, ignorance and lack of proper safeguards than on account of any inherent defect."*** টমাস বা ঈশ্বরীপ্রসাদের যুক্তি স্বীকার করে নিয়েও ড. ***রমেশচন্দ্র মজুমদার*** মনে করেন, এধরনের একটি অভিনব ব্যবস্থা গ্রহণের মুহূর্তে কেবল

তত্ত্বগত দিক নয়, প্রায়োগিক দিক সম্পর্কেও গবেষকের সচেতন থাকা উচিত ছিল। তিনি লিখেছেন ঃ *"One who cannot properly judge of the fitness or ripeness of the time for it or provide for and even think of adequate precaution to ensure its success, fully deserves condemnation."*

ঘ. সামরিক পরিকল্পনা ঃ মহম্মদ-বিন্-তুঘলক ছিলেন উচ্চাকাঙক্ষী শাসক। সাম্রাজ্যের পরিধি বিস্তারের দিকেও তাঁর বিশেষ নজর ছিল। এমনকি ভারতের চিরাচরিত সীমানা অতিক্রম করে পার্শ্ববর্তী পার্বত্য অঞ্চলে সুলতানি কর্তৃত্ব সম্প্রসারিত করার দুঃসাহসিক পরিকল্পনাও তিনি গ্রহণ করেছিলেন। সামরিক পরিকল্পনাগুলির ক্ষেত্রে সুলতানের সাফল্য ও অসাফল্য দুইই ছিল। পরিকল্পনার মধ্যে অভিনবত্ব যেমন ছিল, তেমনি ছিল চিন্তাশক্তির গভীরতা। সম্ভবত, মোঙ্গল আক্রমণের পরে তিনি সীমান্তবর্তী কালানুর ও ফারাসুর (বা পেশোয়ার) আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। এজন্য তিনি সৈন্যদের একমাসের অগ্রিম বেতন এবং যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য আরো কিছু অর্থ প্রদান করেন। মহম্মদ তুঘলক স্বয়ং এই অভিযানের নেতৃত্ব দেন। সুলতান নিজে লাহোরে অবস্থান করেন এবং মূল বাহিনীকে পেশোয়ারে যাওয়ার নির্দেশ দেন। বস্তুত, সম্ভাব্য মোঙ্গল আক্রমণের বিরুদ্ধে দিল্লীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্যই সুলতান এই অভিযানের পরিকল্পনা করেছিলেন। মোঙ্গলরা এই সকল অঞ্চলে মাঝেমাঝেই লুঠতরাজ চালাত এবং এখান থেকে রসদ সংগ্রহ করে ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করত। সুলতানি বাহিনী এই অভিযান দ্বারা এখানে বসবাসকারী মোঙ্গলদের বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়। কিন্তু শস্যজাত খাদ্যের অভাবে সুলতানি-বাহিনীর পক্ষে এখানে স্থায়িভাবে অবস্থান করা সম্ভব হয়নি। রাজধানী স্থানান্তরের সময়কালেই সুলতান পুনার আট মাইল দক্ষিণে অবস্থিত কোন্ধালা দুর্গ (সিংহগড়)-টির বিরুদ্ধে এক অভিযান পাঠান। কোলি উপজাতীয়দের প্রচণ্ড প্রতিরোধ সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত এটি দিল্লীর অধীনস্থ হয়।

মহম্মদ তুঘলকের সিংহাসনে আরোহণের সূচনাপর্বে চিতোরের বিরুদ্ধে সুলতানি বাহিনীর সংঘর্ষ ও তার পরিণাম সম্পর্কে কিছুটা বিতর্ক আছে। *টড়* (Tod)-এর বিবরণী থেকে জানা যায় যে, আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পর দিল্লী সুলতানির দুর্বলতার সুযোগে রাজপুতরা, বিশেষত মেবার, পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করে দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করতে শুরু করেছিল। প্রতিভাবান যোদ্ধা ও সংগঠক রানা হামির (১৩০০-১৩৬৪ খ্রীঃ) ১৩২৬ খ্রীষ্টাব্দে চিতোর দখল করে নেন এবং ক্রমে সমগ্র মেবারের উপর নিজ কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। তিনি 'মহারাজা' উপাধিও গ্রহণ করেন। তখন দিল্লী-সুলতানের প্রতিনিধি হিসেবে মালদেবের পুত্র জইজা মেবার শাসন করছিলেন। হামির কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত হয়ে তিনি সুলতান মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের সাহায্যপ্রার্থী হন। এবং সুলতান স্বীয় ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মেবারের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। কিন্তু সুলতান যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হন এবং তিন মাস বন্দীজীবন কাটিয়ে বহু ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে মুক্তি পান। ড. মেহদি হোসেনের মতে, সম্পূর্ণ ঘটনাটাই ভিত্তিহীন। বস্তুত, অন্য কোন সূত্র থেকে এই ঘটনার সমর্থনও পাওয়া যায় না। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন, বিষয়টাকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলা চলে না। ১৪৩৮ খ্রীষ্টাব্দের একটি জৈনলিপি থেকে জানা যায় যে, রানা হামির একটি মুসলমান বাহিনীকে যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন। সুতরাং মহম্মদ তুঘলকের

আমলে একটা রাজপুত-মুসলমান সংঘর্ষ হয়েছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাছাড়া মহম্মদ তুঘলকের আমলে মেবারসহ সমগ্র রাজপুতানা অঞ্চল যে একপ্রকার স্বাধীন ছিল এবং অন্যান্য রাজপুত রাজ্যগুলি যে মেবারকে নেতৃত্বের মর্যাদা দিত, তা সমসাময়িক বিবরণ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। সুতরাং রানা হামির কোন যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজিত করেছিলেন, এটা অসম্ভব নয়। তবে সেই পরাজিত বাহিনী সুলতানি বাহিনী ছিল এবং তার নেতা ছিলেন স্বয়ং সুলতান—এ কথা বিশ্বাস করা যায় না। এক্ষেত্রে ড. গৌরীশংকর ওঝা-র মন্তব্যটি গ্রহণযোগ্য। **ড. *ওঝা-র*** মতে, মহম্মদ তুঘলকের আমলে প্রায় সমগ্র রাজপুতানা দিল্লীর অধীনতামুক্ত হয়ে গিয়েছিল। তবে মেবারের সাথে যুদ্ধে সুলতান পরাজিত হয়েছিলেন, এ কথা প্রমাণ করা কষ্টকর। সম্ভবত, সেই সংঘর্ষে কোন সাধারণ সেনাপতি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং মেবারের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন।

○ ঙ. খোরাসান অভিযানের প্রস্তুতি ঃ তরমাশিরিনের অভিযানের অল্পকালের মধ্যে মহম্মদ-বিন্-তুঘলক ট্রান্স-অক্সিয়ানা, খোরাসান এবং ইরাক জয়ের এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রকল্প গ্রহণ করেন। বরণী সম্ভবত ভৌগোলিক জ্ঞানের অভাবহেতু খোরাসান অঞ্চলের সাথে ইরাককে যুক্ত করেছেন। ফেরিস্তা প্রমুখের বর্ণনা ও সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতি থেকে মনে করা হয়, সুলতান মধ্য এশিয়ার খোরাসান ও তুরান অঞ্চলে অভিযান পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ***ফেরিস্তা*** লিখেছেন ঃ *"খোরাসান ও তুরানের কিছু অভিজাত সুলতানের দরবারে অতিথি হিসেবে অবস্থান করছিলেন এবং এঁরাই খোরাসানের অপদার্থ, অত্যাচারী শাসক আবু সৈয়দের বিরুদ্ধে অভিযান পাঠানোর জন্য সুলতানকে প্ররোচিত করেছিলেন।"* তবে মহম্মদ তুঘলক কি উদ্দেশ্যে এই পরিকল্পনা নিয়েছিলেন, সে বিষয়ে বরণী কিছু বলেননি। **ড. *নিজামী*** মনে করেন, ইল খাঁ বংশের পতন এবং তৈমুর লঙের উত্থানের মধ্যবর্তী কালে মধ্য এশিয়ার রাজনীতিতে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল, তাকে কাজে লাগিয়ে মহম্মদ তুঘলক ঐ অঞ্চলে নিজ কর্তৃত্ব সম্প্রসারিত করতে আগ্রহী হয়েছিলেন। এজন্য তিনি ইজিপ্ট-সহ কয়েকটি বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে মিত্রতাও গড়ে তোলেন। কিন্তু এক বছর প্রস্তুতির পর সুলতান এই পরিকল্পনা বাতিল করে দেন। সুলতান দীর্ঘ প্রস্তুতি ও প্রচুর অর্থব্যয়ের পরেও আকস্মিক কেন এই পরিকল্পনা বাতিল করলেন, সে বিষয়ে বরণী কিছু বলেননি। **ড. *আগা মেহদী হোসেনের*** মতে, *'ইরান, ইজিপ্ট ও ট্রান্স-অক্সিয়ানার রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক পালাবদলের মধ্যেই সুলতানের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কারণ নিহিত আছে।'* আবু সৈয়দের সাথে 'ইজিপ্টের আল-নাসের'-এর মিত্রতা এবং তরমাশিরিনের ক্ষমতাচ্যুতির ফলে পরিস্থিতি পাল্টে যায়। এবং মহম্মদ তুঘলক বাধ্য হয়ে পরিকল্পনাটি বাতিল করে দেন।

বরণী মহম্মদ তুঘলকের এই কাজটিকে তাঁর ভ্রান্ত বিদেশনীতির আর একটি দৃষ্টান্ত বলে উল্লেখ করেছেন। একথা সত্য যে, এই পরিকল্পনা রূপায়ণের উদ্দেশ্যে সুলতান রাজকোষের বহু অর্থ ব্যয় করেছিলেন। এজন্য সুলতান প্রায় ৩ লক্ষ ৭০ হাজার নতুন অশ্বারোহী সৈন্য সংগ্রহ করেছিলেন। সম্ভবত, এদের বেতনের হার ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ছিল খুবই বেশি। নচেৎ এত অল্প সময়ের মধ্যে প্রায় ৪ লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করা অসম্ভব ছিল। এই খোরাসান-বাহিনীতে কেবল ভারতীয় নয়, মোঙ্গল, আফগান ইত্যাদি বহির্ভারতীয় জাতীয় লোকও ছিল। এই বাহিনী

ছিল একান্ত অস্থায়ী এবং মূল সুলতানি বাহিনীর অতিরিক্ত। স্বভাবতই এদের পেছনে যে অতিরিক্ত অর্থ অকারণে ব্যয়িত হয়েছিল, তা দেশের আর্থিক ভিতকে দুর্বল করেছিল। আধুনিক ঐতিহাসিকেরাও মনে করেন যে, সামগ্রিক বিবেচনায় এটিকে সুলতানের একটি হটকারী সিদ্ধান্ত বলেই অভিহিত করা যায়। পরিকল্পনা রূপায়ণের আগে তিনি ভৌগোলিক পরিস্থিতিকে বিচারের মধ্যে আনেননি। হিমালয় ও হিন্দুকুশের দুর্গম গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে ঐ দূরদেশে সেনাদল, রসদ ও সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে যাওয়া এবং স্থানীয় উপজাতির বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল লড়াই করে টিকে থাকা ছিল প্রায় অসম্ভব একটা চিন্তা। তাছাড়া, রাজধানী স্থানান্তর, প্রতীক-মুদ্রার প্রচলন, অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ইত্যাদি কারণেও সুলতানি প্রশাসন তখন বিব্রত ছিল। স্বভাবতই, আপাতবিচারে মধ্য-এশীয় অঞ্চলে কর্তৃত্ব-প্রসারের সম্ভাবনা থকলেও, মহম্মদ তুঘলকের এই পরিকল্পনা সুবিবেচনা-প্রসূত ছিল না। মন্দের ভাল এই যে, সুলতান অন্তত পরিকল্পনাটি বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিতে বেশি দেরি করেননি। নাহলে বিপত্তি আরও বৃদ্ধি পেত।

খোরাসান পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হলেও মহম্মদ-বিন্-তুঘলক রাজ্যবিস্তারের আশা সম্পূর্ণ ত্যাগ করেননি। ১৩৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হিমালয়ের কাংড়া অঞ্চলে নগরকোট দুর্গের বিরুদ্ধে একটি অভিযান পাঠিয়েছিলেন। সামরিক গুরুত্বপূর্ণ এই দুর্গটি আলাউদ্দিনের সাম্রাজ্যবাদের যুগেও নিজের স্বাধীন অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছিল। এখন সুলতান মহম্মদ এটিকে দখলের চেষ্টা করেন এবং শেষ পর্যন্ত সফল হন। অবশ্য বশ্যতাস্বীকারের বিনিময়ে তিনি স্থানীয় অধিপতিকেই দুর্গের শাসন-দায়িত্বে বহাল রেখেছিলেন।

● চ. কারাচল অভিযান ঃ মহম্মদ-বিন্-তুঘলক আনুমানিক ১৩৩৭-৩৮ খ্রীষ্টাব্দে পার্বত্যভূমি কারাচল দখলের জন্য একটি অভিযান প্রেরণ করেন। এই স্থানটির নাম বিভিন্ন লেখক বিভিন্নভাবে দিয়েছেন, যেমন—কারাচিল, কারাজল, কূর্মাচল প্রভৃতি। কেবল নাম নয়, স্থানটির অবস্থান সম্পর্কেও কিছুটা বিরোধ লক্ষ্য করা যায়। ইবন বতুতা ও গার্ডনার ব্রাউনের বিশ্লেষণ থেকে অনুমান করা যায় যে, কারাচল বলতে হিমালয়ের কুমায়ুন-গাড়োয়াল অঞ্চলের কাংড়া জেলার কুলু অঞ্চলকে বোঝানো হয়েছে। বরণীও এই স্থানটিকে ভারত ও চীনের মধ্যবর্তী অঞ্চল বলে উল্লেখ করেছেন। ড. মজুমদারও মনে করেন, এই স্থানটি হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত এবং বর্তমান কুমায়ুন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। মহম্মদ তুঘলক কর্তৃক কারাচল অভিযানের উদ্দেশ্য সম্পর্কেও কিছুটা মদভেদ আছে। ***বরণী*** লিখেছেন ঃ সুলতান খোরাসান অভিযানের পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে কারাচল দখল করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এ মত গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ দিল্লী থেকে খোরাসান অভিযানের পথে হিমালয়ের এই অঞ্চলটি পড়ে না। বরঞ্চ কারাচল পর্বতমালা চীন ও তিব্বত যাত্রাপথের অন্তর্ভুক্ত। সেই কারণে ***ফেরিস্তা*** লিখেছেন ঃ সুলতান মহম্মদ চীন অভিযানের অংশ হিসেবে কারাচল অভিযান করেছিলেন। কিন্তু মহম্মদ চীন দখল করতে চেয়েছিলেন এমন কোন প্রমাণ আদৌ পাওয়া যায় না। ইবন বতুতা সুলতানের সামরিক উদ্দেশ্যের কথা লিখেছেন। তাঁর মতে, কুমায়ুনের রাজপুত রাজ্যগুলিতে চীনারা প্রবেশ করে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখলের চেষ্টা চালাতো। মহম্মদ চীনের গ্রাস থেকে এই সীমান্ত অঞ্চলকে রক্ষা করার জন্যই কারাচল অভিযানের সিদ্ধান্ত নেন। ***ড. মেহদী হোসেনের*** মতে, উত্তর সীমান্তের নিরাপত্তা-বৃদ্ধির জন্য সুলতান এই অভিযানের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি

লিখেছেন ঃ *"The Qarachil expedition seems to have been sent to complete the chain of fortifications in the north."* *'তারিখ-ই-মুবারকশাহী'* গ্রন্থেও এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়। এতে বলা হয়েছে যে, কুমায়ুনের পার্বত্য রাজ্যগুলি দিল্লী-সুলতানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহে রত ব্যক্তিদের রাজনৈতিক আশ্রয় দিত। স্বভাবতই, এই অঞ্চল দখল করে সুলতান বিদ্রোহীদের আশ্রয়হীন করতে চেয়েছিলেন। *হাজী দবীর* লিখেছেন ঃ *'কারাচলের সুন্দরী রমণীদের হারেমে বন্দী করার উদ্দেশ্যে সুলতান এই অভিযান করেছিলেন।'* কিন্তু এটা সম্পূর্ণ অবাস্তব ও অসম্ভব একটা কল্পনা। কারণ মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের চরিত্রে ধৈর্যহীনতা ছিল, কল্পনা-বিলাস ছিল, কিন্তু সামান্যতম ব্যভিচারিতা ছিল না।

মহম্মদ তুঘলকের ভাগিনেয় খসরু মালিকের নেতৃত্বে কারাচল অভিযান প্রেরিত হয়। বদাউনি ও হাজী দবীর-এর মতে, সুলতানের সৈন্যসংখ্যা ছিল ৮০ হাজার। ইসামীর মতে, ১ লক্ষ সৈন্য কারাচল অভিযানে অংশ নিয়েছিল। বরণী কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা দেননি। যাই হোক্, সুলতানি-বাহিনী 'জিদ্যা' নামক স্থানটি দখল করতে সক্ষম হলে সুলতান তাঁর বাহিনীকে সেখানেই অবস্থান করার ও কর্তৃত্ব দৃঢ় করার নির্দেশ দেন। কারণ সুলতান জানতেন যে, আরও উঁচুতে উঠলে সুলতানি-বাহিনীর পক্ষে সংকীর্ণ পাহাড়ী পথ ও জলবায়ু বিপজ্জনক হতে পারে। কিন্তু খসরু মালিক জয়ের আনন্দে সংকীর্ণ পথ ধরে আরো উঁচুতে উঠে যান এবং তিব্বত অভিমুখে এগোতে থাকেন। ইতিমধ্যে বর্ষা নেমে গেলে জলবায়ুর দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। আকস্মিক প্লেগের আক্রমণ সুলতানি সেনার মনোবল নিঃশেষ করে দেয়। এই সুযোগ নেয় পার্বত্য উপজাতি। তাদের নিক্ষিপ্ত পাথর ও প্লেগের দাপটে সুলতানি-বাহিনী প্রায় নিঃশেষিত হয়ে যায়। ইসামীর মতে, মাত্র ৬ হাজার সৈন্য প্রাণ নিয়ে দিল্লী ফিরে আসে। বরণীর মতে, ৬ জন এবং ইবন বতুতার মতে, মাত্র ৩ জন কোনক্রমে দিল্লী ফিরতে পারে। সংখ্যা যাই হোক্ ক্রুদ্ধ সুলতান তাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। অবশ্য সামরিক অভিযান ব্যর্থ হলেও পার্বত্য অধিবাসীরা স্বেচ্ছায় সুলতানকে কর প্রদানে সম্মত হয়। ইবন বতুতা এবং 'মাসালিক-উল্-আবসর' গ্রন্থে পার্বত্য উপজাতির বশ্যতা স্বীকার ও করদানের প্রসঙ্গ থাকলেও বরণী বা ইসামী সম্ভবত সুলতানের প্রতি অন্ধবিরূপতার কারণে ও প্রসঙ্গে নীরব থেকেছেন।

○ মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঃ

মহম্মদ-বিন্-তুঘলক দিল্লীর সিংহাসনে আসীন ছিলেন পঁচিশ বছরের কিছু বেশি সময়। কিন্তু এর মধ্যে তাঁকে প্রায় বাইশটি বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। উত্তর-পশ্চিমে মুলতান থেকে পূর্বে বাংলাদেশ এবং দক্ষিণে মালাবার উপকূল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল বিদ্রোহের আগুন। স্থানভেদে এই সকল বিদ্রোহের উৎস ও প্রকৃতির মধ্যে স্বাতন্ত্র্য অবশ্যই ছিল। কিন্তু গভীরভাবে অনুধাবন করলে ভারতব্যাপী এই সকল ছোট-বড় বিদ্রোহের মধ্যে কয়েকটি মিল খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়। যেমন—(১) অভিজাতদের প্রতি সুলতানের নীতি এই শাসকশ্রেণীকে ক্ষুব্ধ করেছিল। খলজী বংশের শাসনকাল তুর্কী ছাড়াও অন্যান্য শ্রেণীর মুসলমান এমনকি ধর্মান্তরিত ভারতীয়দেরও অভিজাতর মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। মহম্মদ তুঘলক আরও এক ধাপ অগ্রসর হয়ে নিম্নবংশজাত লোকেদেরও উচ্চ সরকারিপদ দিয়ে নতুন অভিজাতশ্রেণী গড়ে তোলেন।

এদের মধ্যে ধর্মান্তরিত মুসলমান এবং হিন্দু উভয়েই ছিলেন। এঁরা অশিক্ষিত বা অযোগ্য ছিলেন না। তথাপি এঁদের অভিজাত হিসেবে মেনে নিতে উচ্চবংশজাত ও পুরানো অভিজাতরা রাজী ছিলেন না। বরণীর মতে, সুলতান কিছু বিদেশীকেও অভিজাত শ্রেণীভুক্ত করেন। অধ্যাপক ***সতীশচন্দ্রের*** মতে, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক নিয়ে মহম্মদ তুঘলকের অভিজাতশ্রেণী গড়ে ওঠার ফলে তাদের মধ্যে সংহতিবোধ এবং আনুগত্যবোধের অভাব দেখা দেয় এবং সামান্য কারণে এঁরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। (২) মহম্মদের আমলে সাম্রাজ্যের বিরাট বিস্তৃতি ছিল, কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল অপ্রতুল। সাম্রাজ্যের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে গিয়ে বিদ্রোহ দমন করা ছিল প্রায় অসম্ভব। স্বভাবতই বিপ্লবীরা স্বরাজ্য গড়ে তোলার অনুকূল সুযোগ পেয়েছিল। (৩) মহম্মদ তুঘলকের ক্রোধ ও হটকারিতা এবং সন্দেহজনক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রতি অমানবিক আচরণ অনেকের সাধারণ ক্ষোভকে বিদ্রোহের আগুনে রূপান্তরিত করেছিল। (৪) সুলতান বিদ্রোহ দমনের কাজে কাউকে বিশ্বাস করতেন না। তিনি নিজেই রাজ্যের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত ছুটে ছুটে বিদ্রোহ দমন করতেন। এই সুযোগ নিয়েছিলেন বিদ্রোহীরা। বিশেষত, সুলতান উত্তর ভারত বা পূর্ব ভারতে ব্যস্ত থাকলেই দক্ষিণ ভারতে বিদ্রোহের আগুন প্রজ্জ্বলিত হত। (৫) বিদ্রোহের মূল কারণ অনুসন্ধান করা এবং রাজনৈতিক বা কূটনৈতিক ভাবে তা দূর করে বিপ্লবের সম্ভাবনা রোধ করার প্রচেষ্টা অস্থিরমতি সুলতান করতেন না। তাই মহম্মদ তুঘলকের রাজত্বকালে একদিকে দিল্লী-সুলতানি যেমন উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হয়, তেমনি অন্যদিকে সাম্রাজ্যের ভাঙনেরও সূত্রপাত তখনই হয়।

মহম্মদ তুঘলকের সিংহাসনারোহণের একেবারে গোড়ায় (১৩২৬-'২৭ খ্রীঃ) তাঁর সম্পর্কিত ভাই বাহাউদ্দিন গুরুসাস্প প্রথম সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন। গুরুসাস্প দাক্ষিণাত্যে গুলবর্গার কাছে সাগর অঞ্চলে জায়গির ভোগ করতেন। এই সূত্রে তিনি ধন-সম্পত্তির অধিকারী হন এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জায়গিরদারদের সমর্থনে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ***ইসামীর*** মতে, সুলতান মহম্মদ সিংহাসনে বসার এক বছর পরেই ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের প্রতি সন্দেহপরায়ণ হয়ে ওঠেন এবং হিন্দুদের সমর্থনলাভের আশায় উলেমা ও অন্যান্য তুর্কী-অভিজাতদের সাথে দুর্ব্যবহার করতে শুরু করেন। তাঁর ন্যায়পরায়ণতা নৃশংসতায় রূপান্তরিত হয় এবং দয়ালু সুলতান পরিণত হয় দয়াহীন নিপীড়কে। এই কারণে গুরুসাস্প ক্ষুব্ধ হন। এর সঙ্গে যুক্ত হয় তাঁর ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙক্ষা ও ক্ষোভ। ***ফেরিস্তা*** লিখেছেন ঃ সুলতানের নিকটাত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও গুরুসাস্প কোন সম্মানজনক রাজপদ পাননি। তাঁর পদোন্নতিও ঘটেনি। তাঁর থেকে কম বয়স্ক ও কম যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরাও উঁচুপদে উঠে যান, কিন্তু গুরুসাস্প সামান্য জায়গিরদার থেকে যান। এইভাবে ব্যক্তিগত ক্ষোভ ও ধর্মীয় আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ***ইসামী*** লিখেছেন ঃ সুলতানের আদেশ অমান্য করে গুরুসাস্প সৈন্য সংগ্রহ শুরু করেন এবং প্রকাশ্যে দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে নিজকর্তৃত্ব সম্প্রসারিত করতে থাকেন। ইবন বতুতার মতে, গিয়াসউদ্দিনের মৃত্যুর সময় থেকেই গুরুসাস্প মহম্মদ তুঘলকের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন।

আহম্মদ-বিন্-আয়াজ (মালিকজাদা)-এর নেতৃত্বে সুলতানি-বাহিনী দেবগিরিতে উপস্থিত হলে গুরুসাস্প তাদের অক্রমণ করেন। কিন্তু পরাজিত হয়ে সপরিবারে পার্শ্ববর্তী হিন্দুরাজ্য

কাম্পিলিতে পালিয়ে যান। বেলারী, রায়চুর ও ধারওয়ার জেলা নিয়ে গঠিত কাম্পিলির ছোট্ট রাজ্যটি প্রথমে দেবগিরির যাদব-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আলাউদ্দিন খলজীর আমলে দেবগিরি দিল্লী-সুলতানির অন্তর্ভুক্ত হলে কাম্পিলি স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং মালিক কাফুরের আক্রমণ (১২১৩-'১৫ খ্রীঃ) প্রতিহত করে নিজ-স্বাধীনতা রক্ষা করে। ক্রমে কাম্পিলি প্রভূত ক্ষমতা ও সম্পদের অধিকারী হয় এবং অনন্তপুর, চিতলদুর্গ, সিমোগা প্রভৃতি অঞ্চলে তার কর্তৃত্ব সম্প্রসারিত হয়। রাজা কম্পিলদেব একজন রাজদ্রোহীকে নিছক মানবিক কারণে অথবা রাজনৈতিক কারণে আশ্রয় দিয়েছিলেন, তা বলা কঠিন। ***ফেরিস্তার*** মতে, গুরুসাস্প-এর সাথে কাম্পিলদেবের গোপন মিত্রতা ছিল। সম্ভবত, দিল্লী-সুলতানির বিরোধী এই হিন্দু-রাজ্যটি দিল্লীর শত্রু হিসেবে রাজনৈতিক্ কারণে গুরুসাস্পের পক্ষাবলম্বন করেছিল। যাই হোক্, সুলতান এই রাজ্যের বিরুদ্ধে দ্রুত এক অভিযান প্রেরণ করেন। কাম্পিলদেব বীরত্বের সাথে সুলতানি বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দেন। দুর্গের মহিলাগণ জহরব্রত করে প্রাণ বিসর্জন দেন। কাম্পিলি দখল করে সুলতানি শাসন প্রবর্তন করা হয়। গভর্নর নিযুক্ত হন মালিক মহম্মদ। কিছু অভিজাত, তাদের পরিবারবর্গ এবং নিহত রাজার দুই পুত্র হরিহর ও বুক্ক'কে বন্দী করে দিল্লীতে আনা হয়। এদের ইসলামধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা হয়। স্মরণীয় যে, পরবর্তীকালে এই দুই ভাই স্বাধীন বিজয়নগর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে সুলতানি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে হিন্দু প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন।

কম্পিলদেব মৃত্যুর পূর্বে গুরুসাস্প ও তার পরিবারবর্গকে হোয়সলরাজ তৃতীয় বীরবল্লালের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে কাম্পিলি দখল করার পর সুলতানী বাহিনী হোয়সলরাজ্যের রাজধানী দ্বারসমুহ আক্রমণ করে। ***ফেরিস্তা*** লিখেছেন যে, বীরবল্লার সুলতানের শত্রুতার ভয়ে গুরুসাস্পকে বন্দী করে সেনাপতি খাজাজাহনের কাছে পাঠিয়ে দেন এবং দিল্লীর বশ্যতা স্বীকার করে নেন। কিন্তু রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, এই বিবরণ সত্য নয়। কারণ জনৈক মুসলিম লেখকের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, সুলতানি-বাহিনী ১৩২৭ খ্রীষ্টাব্দে দ্বারসমূহ ধ্বংস করে। আবার ১৩২৮ খ্রীষ্টাব্দের একটি লিপিতে জানা যায়, এই সময় পর্যন্ত তৃতীয় বীরবল্লাল স্বাধীন রাজা হিসেবে রাজত্ব করেছিলেন। তাই অনুমান করা যায় যে, বীরবল্লাল প্রথমে দিল্লীর বাহিনীকে প্রতিরোধের চেষ্টা করেছিলেন। তবে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী বুঝতে পেরে আত্মসমর্পণ করেন এবং সুলতানের অনুমতি-স্বাপেক্ষে আরো কিছুকাল সাম্রাজ্যের একাংশে রাজত্ব করার সুযোগ পান। যাই হোক্, সুলতানের নির্দেশে জীবন্ত অবস্থায় গুরুসাস্প-এর গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে নেওয়া হয়েছিল এবং তাঁর মাংস রান্না করে তাঁরই পরিবারবর্গকে ভক্ষণ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। এটি নিঃসন্দেহে সুলতান মহম্মদের নৃশংসতা ও বিকৃত মানসিকতার অন্যতম দৃষ্টান্ত।

গুরুসাস্প-এর বিদ্রোহের ফলে দক্ষিণ ভারতে স্বাধীন হিন্দু রাজ্যের অস্তিত্ব প্রায় বিলীন হয়ে যায়। আলাউদ্দিন যাদব-রাজ্য দেবগিরি দখল করেছিলেন। তুঘলক-বংশের আমলে বরঙ্গল, মাদুরা, কাম্পিলি এবং হোয়সল রাজ্যের অধিকাংশ অঞ্চল দিল্লী-সুলতানির অন্তর্গত হয়। একমাত্র কাশ্মীর, উড়িষ্যা, রাজস্থান এবং মালাবার উপকূলের একাংশ ছাড়া প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ দিল্লী-সুলতানির অধীনে চলে আসে।

গুরুসাস্প-এর বিদ্রোহের অল্পকালের মধ্যে মুলতানের শাসনকর্তা বাহরাম আইবা কিশলু

খাঁ বিদ্রোহ করেন (১৭২৭-'২৮ খ্রীঃ)। বরণী এটিকে মহম্মদের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, সুলতান দিল্লীর অভিজাতবর্গ ও তাদের পরিবার-পরিজনকে নতুন রাজধানী দিল্লী যাবার নির্দেশ দিলে বাহরাম তা মানতে অস্বীকার করেন এবং বিদ্রোহী হন। *আহম্মদ সিরহিন্দির* মতে, সুলতান বাহরামের জামাতা আলি খাতাতিকে হত্যা করলে বাহরাম বিদ্রোহী হন। ইবন বতুতার বিবরণ অনুযায়ী সুলতানি বাহিনী গুরুসাস্প ও গিয়াসুদ্দিন বাহাদুরের মৃতদেহ প্রদর্শন করে ঘুরতে ঘুরতে মুলতানে এলে কিশলু খাঁ তা কবরস্থ করার নির্দেশ দেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে সম্রাট কিশলু খাঁকে রাজধানীতে তলব করেন। কিন্তু কিশলু খাঁ সেই নির্দেশ অমান্য করে বিদ্রোহী হন। কিন্তু ইবন বতুতার মন্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ গুরুসাস্প ও গিয়াসউদ্দিন বাহাদুরের বিদ্রোহ ঘোষণার মাঝে কম করেও পাঁচ বছরের ব্যবধান ছিল। স্বভাবতই, দু'জনের মৃতদেহ একই সঙ্গে প্রদর্শন করা সম্ভব ছিল না। অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে, দিল্লী ত্যাগ করে দৌলতাবাদ যাবার নির্দেশের বিরুদ্ধেই বাহরামের বিদ্রোহ ধ্বনিত হয়েছিল। যাই হোক্, সীমান্তরাজ্যে এই বিদ্রোহ সুলতানকে শঙ্কিত করেছিল। তিনি দ্রুত দাক্ষিণাত্য থেকে মুলতানে অগ্রসর হন এবং বাহরামকে পরাজিত করেন। *ড. হোসেনের* মতে, কিশলু খাঁর বিদ্রোহ কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না। সুলতানও এই বিদ্রোহকে উলেমাতন্ত্র এবং অভিজাততন্ত্রের বিদ্রোহী মানসিকতার অন্যতম প্রতিফলন হিসেবে বিবেচনা করেন। তাই সুলতান মুলতানের কাজীকেও চরম শাস্তি দেন এবং কিশলু খাঁ'র ছিন্ন মুণ্ড শহরের প্রবেশদ্বারে ঝুলিয়ে রেখে বিদ্রোহের করুণ পরিণতি সম্পর্কে সবাইকে সাবধান করে দেন।

এর অল্পকালের মধ্যে সিন্ধুর নিকটে কমলপুরের কাজী ও খাতিব বিদ্রোহী হন। ইবন বতুতার বিবরণ থেকে জানা যায় যে, সুলতানের নির্দেশে উজীর খাজা জাহান কমলপুরে উপস্থিত হয়ে বিদ্রোহীদের নৃশংসভাবে হত্যা করেন এবং সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। *স্যার উলসী হেগ*-এর মতে, মুলতান থেকে সুলতান দৌলতাবাদে ফিরে যান এবং ১৩৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সেখানেই থাকেন। কিন্তু বরণী, ইসামী ও ইবন বতুতার লেখা থেকে জানা যায় যে, মুলতান থেকে ফিরে সুলতান দিল্লীতে অবস্থান করেন এবং সেই সময় তিনি আরো কিছু বিদ্রোহ দমন করেন।

১৩৩০-'৩১ খ্রীষ্টাব্দে সোনারগাঁ'র (বাংলাদেশ) শাসক গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর বুরা বিদ্রোহী হন। বাংলাদেশের শাসনক্ষেত্রকে লখনৌতি, সোনারগাঁ এবং সাতগাঁ—এই তিন অংশে বিভক্ত করে মহম্মদ স্বতন্ত্র শাসক নিয়োগ করেন। সোনারগাঁ'র শাসনভার অর্পণ করেন যৌথভাবে গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর ও তাঁর ভাই বাহরাম খাঁর হাতে। শর্ত ছিল যে শাসকদের পুত্ররা সুলতানের অধীনে জামিন হিসেবে রক্ষিত থাকবে। কিন্তু গিয়াসউদ্দিন নানা অজুহাতে তাঁর পুত্রকে দিল্লী পাঠাতে অস্বীকার করেন। ক্ষুব্ধ সম্রাট তাঁকে দমন করার জন্য নিজ ভ্রাতা বাহরামকে সোনারগাঁ প্রেরণ করেন। তিনি বিদ্রোহী গিয়াসউদ্দিনকে পরাজিত করে তার গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে তা সুলতানের কাছে পাঠিয়ে দেন।

ড. মেহদী হোসেনের মতে, মহম্মদের বিরুদ্ধে পঞ্চম বিদ্রোহ ঘটেছিল সিওয়ান (Sehwan) প্রদেশে। বিদ্রোহের কারণ হিসেবে তিনি লিখেছেন যে, সুলতান জনৈক হিন্দু রতনকে সিওয়ান প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত করলে উনুর এবং রুমীর নেতৃত্বে সামরিক বাহিনীর সদস্যরা ক্ষুব্ধ হয়।

তারা রতনকে হত্যা করে উনুরকে সিওয়ান-এর গভর্নর নিযুক্ত করে। কিন্তু উনুর নিজের করুণ ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে সিওয়ান ছেড়ে পালিয়ে যান। এখন বিদ্রোহীরা রুমীকে নেতা মনোনীত করে। মুলতানের গভর্নর মালিক সারতাজ এই বিদ্রোহের সংবাদ পাওয়ামাত্র সিওয়ানে উপস্থিত হয়ে বিদ্রোহীদের হত্যা করেন। ইবন বতুতা সিওয়ানে পদার্পণ করে ক্রুশবিদ্ধ বিদ্রোহীদের সারিবদ্ধ মৃতদেহ লক্ষ্য করেছিলেন। তাই অনুমতি হয় ১৩৩৩ খ্রীষ্টাব্দে এই বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল।

মহম্মদ তুঘলকের বিরুদ্ধে পরবর্তী বিদ্রোহের আগুন প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল দোয়াব অঞ্চলে। সুলতান সেখানে নতুন করে কর বসালে কৃষকরা বিদ্রোহী হয় এবং ঘরবাড়ি, জমি ত্যাগ করে পালিয়ে যেতে থাকে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আগেই করা হয়েছে। যাই হোক্, সুলতান শেষ পর্যন্ত কঠোরতা ত্যাগ করে সহানুভূতির সাথে দোয়াবের কৃষকদের সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করেছিলেন।

দোয়াবের কৃষক-বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে সুলতান যখন উজ্জয়িনীতে অবস্থান করছিলেন, তখন সুদূর দক্ষিণে মাবারের শাসনকর্তা সৈয়দ আহশান শাহ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন (১৩৩৪-'৩৫ খ্রীঃ)। দিল্লী থেকে মাবারের দূরত্ব, দোয়াব, মালব, পূর্ব পাঞ্জাবের দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি সম্ভবত আহশান শাহ'কে বিদ্রোহী হতে প্ররোচিত করে। মহম্মদ তুঘলক বিদ্রোহের সংবাদ পাওয়া মাত্র কনৌজ থেকে দিল্লীতে ফিরে আসেন এবং সসৈন্যে মাবারের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে দৌলতাবাদে উপস্থিত হন। সেখান থেকে তিনি বরঙ্গলে আসেন। কিন্তু এখানে তিনি স্বয়ং এবং তাঁর সেনাবাহিনী ভয়াবহ প্লেগ রোগে আক্রান্ত হন। সুলতান ভাগ্যক্রমে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এলেও, তাঁর সেনাবাহিনীর বহু সদস্য প্রাণ হারায়। সুলতানের বিশ্বস্ত আমলাদের প্রায় অর্ধেক এবং সেনাবাহিনীর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যান। এমতাবস্থায় সুলতান মাবার অভিযান বাতিল করে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন। মাবার স্বাধীন হয়ে যায়। আহশান শাহ মাদুরায় স্বাধীন-সুলতানির সূচনা করেন। দৌলতাবাদে পৌঁছে মহম্মদ তুঘলক দক্ষিণের রাজ্যগুলির দায়িত্ব বাৎসরিক রাজস্ব প্রদানের শর্তে তাঁর বিশ্বস্ত আমীরদের হাতে ন্যস্ত করেন। মানসিক ও শারীরিকভাবে বিপর্যস্ত সুলতান দিল্লীর ইচ্ছুক নাগরিকদের দিল্লীতে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দেন।

ড. *নিজামীর* মতে, ১৩৩৫ খ্রীষ্টাব্দের পর মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের সামরিক ক্ষমতা এমন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলে যে, সাম্রাজ্যের সংহতি রক্ষা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। প্রাদেশিক শাসকদের সাহায্যে বিদ্রোহ দমন করা সুলতানের পক্ষে ছিল দুরূহ। এই সময়ে সুলতানি সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক জীবনে দুটি বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন— (১) সুলতান সামান্যতম সন্দেহ হলেই যে-কোন ব্যক্তিকে কঠোর শাস্তি দিতে শুরু করেন। তিনি ভেবেছিলেন, নৃশংসতা দ্বারা অন্তত কিছুদিন বিক্ষুদ্ধদের দমন করে রাখা যাবে। কিন্তু এর ফলে বহু নিরপরাধ ব্যক্তিও সুলতানের রোষের শিকার হয়। (২) সুলতানের সামরিক দুর্বলতা সম্পর্কে নিশ্চিত হবার ফলে বহু অভিজাত সংগঠিত বিদ্রোহের দিকে এগিয়ে যান। কারণ তাঁরা বুঝেছিলেন যে, অকারণে সুলতানের অত্যাচারের মুখে পড়ার থেকে বিদ্রোহ করে নতুন জীবনের সন্ধান করাই ভাল। ধর্মান্তরিত মোঙ্গল নেতা হলাগু, দৌলতাবাদের শাসক মালিক হুসাং এবং সুলতানের বৈমাত্রেয়

ভ্রাতা মাসুদ খাঁ প্রমুখের বিদ্রোহগুলিকে (১৩৩৫-'৩৬ খ্রীঃ) এই বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

একই ধারায় বহিঃপ্রকাশ দক্ষিণ ভারতে ছিল আরো স্পষ্ট। তবে এখানকার বিদ্রোহ বা আন্দোলন অন্য কারণে ছিল নতুন। পূর্বে বর্ণিত বিদ্রোহগুলির নায়ক ছিলেন মুসলমান ; কিন্তু দক্ষিণের আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন হিন্দু নায়েকগণ। ড. *রমেশচন্দ্র মুজমদার* হিন্দু নায়েকদের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার মধ্যে 'হিন্দু জাগরণবাদ'-এর আভাস লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি লিখেছেন : *"it appears that the organisation of a sort of Hindu Confederacy was attempted in the south in order to free the country from the yoke of the Muslims."* এই সংঘের উদ্যোক্তা ছিলেন দক্ষিণ অন্ধ্রের জনৈক প্রলয় নায়ক। তাঁর প্রধান সহায়ক ছিলেন প্রলয় ভেমা এবং ভক্তিরাজা নামক দুই দক্ষিণী রাজপুরুষ। প্রবল নায়কের নেতৃত্বে হিন্দুরা অন্ধ্র-উপকূল অঞ্চল থেকে মুসলমানদের বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়। অতঃপর প্রলয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র কৃষ্ণ নায়কের নেতৃত্বে দক্ষিণ ভারতে হিন্দু প্রতিরোধ আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে মহম্মদ তুঘলক তেলেঙ্গানা অঞ্চলকে দু'টি প্রশাসনিক এককে বিভক্ত করেন। বরঙ্গল ও কাম্পিলিতে সদর-দপ্তর করে দু'টি বিভাগের দায়িত্ব দু'জনের উপর ন্যস্ত করেন। কিন্তু কৃষ্ণ নায়ক ও হোয়সলরাজ তৃতীয় বল্লালের নেতৃত্বে প্রায় ৭৫ জন হিন্দু নায়েকের শক্তিসংঘ বরঙ্গলের শাসক মালিক মকবুলকে বিতাড়িত করে অন্ধ্রকে মুসলিম শাসনমুক্ত করে। একইভাবে চালুক্য সোমদেব এবং প্রলয় ভেমার নেতৃত্বে কাম্পিলিতেও হিন্দুরা সুলতানি শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে। মহম্মদ তুঘলক কাম্পিলির ধর্মান্তরিত দুই রাজপুত্র হরিহর এবং বুক্ককে মালিক মহম্মদের পরিবর্তে কাম্পিলির শাসক ও উপশাসক নিয়োগ করে হিন্দু প্রতিরোধকে সামাল দিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু এবারেও হিন্দুরা প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ইতিমধ্যে হরিহর ও বুক্ক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মাধব বিদ্যারণ্যের সংস্পর্শে এসে মত পরিবর্তন করেন। এঁরা ইসলামধর্ম ত্যাগ করে পুনরায় হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন এবং হিন্দু জাগরণের নেতা হিসেবে ১৩৩৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীন বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। এইভাবে মহম্মদ-বিন্-তুঘলক দাক্ষিণাত্যে দিল্লী-সুলতানির কর্তৃত্ব সম্প্রসারিত করার দশবছরের মধ্যেই, আপন দুর্বলতার জন্য, সেখান থেকে সরে আসতে বাধ্য হন। কৃষ্ণা-তুঙ্গভদ্রার সমগ্র দক্ষিণ ভাগ, বরঙ্গলের একাংশ এবং অন্ধ্রের উপকূল অঞ্চল দিল্লীর সুলতানি সাম্রাজ্যের বাইরে চলে যায়।

কেবল দক্ষিণ ভারত নয়, উত্তর, পূর্ব এবং মধ্য ভারতেও বিদ্রোহের আগুন সুলতানকে বিব্রত করে। সুলতান বরঙ্গল থেকে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করে এক সর্বনাশা দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর মুখোমুখি হন। জীবন রক্ষার তাগিদে সুলতান তাঁর পরিবারবর্গ এবং সভাসদ্দের নিয়ে সামসাবাদের সন্নিকটে 'স্বর্গদ্বারি' নামক নবনির্মিত শহরে এসে কিছুদিন অতিবাহিত করেন। এই সময় বাংলা, মুলতান, গুজরাট, সামানা, কারা, বিদর, গুলবর্গা, অযোধ্যা প্রভৃতি স্থানে সংঘটিত বিদ্রোহ সুলতানকে বিব্রত করতে থাকে।

দিল্লী থেকে দূরত্বের কারণে বাংলাদেশ কোনদিনই দিল্লীর কার্যকর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকেনি। তুঘলক আমলে বাংলাকে তিনভাগে বিভক্ত করে শাসন করার ব্যবস্থা করা হয়।

কিন্তু এই ব্যবস্থাও স্থায়ী হতে পারেনি। সুলতানের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বাহরাম খাঁ মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শিলদার মালিক ফকরউদ্দিন নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন (১৩৩৮-'৩৯ খ্রীঃ) এবং 'সুলতান ফকরউদ্দিন' উপাধি নিয়ে সোনারগাঁ শাসন করতে শুরু করেন। লখনৌতির শাসক কদর খাঁ ফকরউদ্দিনকে জব্দ করার জন্য উদ্যোগ নেন। কিন্তু তাঁর ব্যবহারে সেনাদল অসন্তুষ্ট ছিল। ফলে তিনি সহজেই ফকরউদ্দিনের হাতে নিহত হন এবং লখনৌতি ফকরউদ্দিনের হস্তগত হয়। সুলতান মহম্মদ তুঘলক রাজ্যের খরা পরিস্থিতি নিয়ে ব্যস্ত থাকার ফলে বাংলাদেশের দিকে দৃষ্টি দিতে পারেননি। ফলে সোনারগাঁ ও লখনৌতি দিল্লীর হাতছাড়া হয়ে যায়। মালিক হাজি ইলিয়াসের নেতৃত্বে কালক্রমে বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয় এক শক্তিশালী রাজতন্ত্রের।

বাংলার বিদ্রোহের অব্যবহিত পরেই (১৩৪০-'৪১ খ্রীঃ) অযোধ্যা ও জাফরাবাদের শাসক আইন-উল্-মুল্‌ক-এর সাথে সুলতানের বিরোধ বাধে। দোয়াবের দুর্ভিক্ষ কিংবা কারার শাসক নিজাম মিঞার বিদ্রোহদমনের সময় 'আইন-উল্-মুল্‌ক' নানাভাবে সুলতানকে সাহায্য করেছিলেন। স্বভাবতই উভয়ের সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ। কিন্তু আইন-উল্-মুল্‌ক-এর শক্তি ও সম্পদ সুলতানকে সন্দিগ্ধ করে তুলেছিল। পরন্তু দিল্লী, দোয়াব অঞ্চল থেকে আগত বহু অভিজাতকে তিনি অযোধ্যায় পুনর্বাসিত করেন, যদিও সুলতান এই কাজ নিষিদ্ধ করেছিলেন। ক্ষুব্ধ সুলতান আইন-উল্-মুল্‌ককে জব্দ করার জন্য দৌলতাবাদের শাসক নিযুক্ত করেন। অবশ্য শাসক হিসেবে আইন-উল্-মুল্‌ক ছিলেন পারদর্শী এবং তখন দৌলতাবাদে তাঁর মত দক্ষ ও অভিজ্ঞ শাসকের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সুলতানের দূরভিসন্ধি জানতে পেরে তিনি দৌলতাবাদে যেতে অস্বীকার করেন। সুলতানি-বাহিনী তাঁকে অল্প আয়াসে বন্দী করে দিল্লীতে নিয়ে আসে। সুলতান অবশ্য বিশ্বস্ত মালিকদের সাথে আলোচনা করে আইন-উল্-মুলকের অপরাধ তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতার জন্য মাপ করে দেন।

প্লেগ, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ এবং বিদ্রোহের উপর্যুপরি ঢেউ, এই পর্যায়ে এসে, মহম্মদ তুঘলকের মনে কিছুটা ভাবান্তর এনেছিল। সুলতান উপলব্ধি করেন যে, কেবল উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা ক্ষোভের রাজনৈতিক বহিঃপ্রকাশ রূপে বিদ্রোহগুলি সংগঠিত হচ্ছে না। উলেমা, কাজী প্রমুখ মুসলিম ধর্মগুরুদের ইন্ধনও বিদ্রোহগুলিকে সংগঠিত হতে সাহায্য করছে। তাই সুলতান দীর্ঘ ঔদাসীন্যের পর খলিফার অনুমোদন লাভের জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠেন। বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফাবংশ তখন নেই। মিশরে ছিল ফতেমীয় খলিফাদের অবস্থান। তাই সুলতান মিশরের খলিফার অনুমোদন প্রার্থনা করেন এবং নিজ মুদ্রায় খলিফার নাম খোদাই করে তাঁকে আনুগত্য ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। ১৩৪৩-'৪৪ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ তুঘলক খলিফার 'মনশুর' বা পরোয়ানা পান। ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির উগ্র সমর্থক মহম্মদ-বিন্-তুঘলক অকস্মাৎ খলিফার অনুমোদন লাভের জন্য এত ব্যগ্র হলেন কেন এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। *'শিরাত-ই-ফিরোজশাহী'* গ্রন্থের মতে, সুলতান নানা গ্রন্থ পাঠ করে নিশ্চিত হন যে, খলিফার অনুমোদন ছাড়া তাঁর পক্ষে রাজনৈতিক ন্যায়বিধান করা সম্ভব হবে না। *'তারিখ-ই-আলফী'র* মতে, সুলতানের শিক্ষক কুতলঘ খাঁ একাজে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু *ড. নিজামীর* মতে, সুলতান তাঁর রাজনৈতিক জীবনের এক জটিলতম মুহূর্তে খলিফার কথা চিন্তা করেছিলেন। তাই এটিকে কেবল ধর্মীয় প্রেরণাসঞ্জাত বলা চলে

না। সুলতান তাঁর বিরুদ্ধে সংগঠিত বিদ্রোহের ঢেউ ভাঙার জন্য একটা অস্ত্র হিসেবেই খলিফার অনুমোদনের কথা ভেবেছিলেন। *বদর-ই-চাচ*-এর মন্তব্যেও এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়।

এই সময় দৌলতাবাদ এবং গুজরাট ছাড়া প্রায় সারা দেশই দিল্লী-সুলতানির কর্তৃত্বমুক্ত হয়ে গিয়েছিল। মহম্মদ তুঘলকের কয়েকটি হটকারী সিদ্ধান্ত এই দুটি সুলতানি রাজ্যেও বিদ্রোহের আগুন প্রজ্জ্বলিত করে এবং সেই আগুনই সুলতান মহম্মদ-বিন্-তুঘলককে গ্রাস করে। এই দুটি অঞ্চলে 'সদাহ আমীর' (আমীরান-ই-সদাহ) নামক একশ্রেণীর মুসলিম কর্মচারী রাজকার্যে নিয়োজিত ছিল। এরা ছিল সম্ভবত বিদেশী এবং মোঙ্গলদের মধ্য থেকেই এদের সৃষ্টি হয়েছিল। ড. ***ঈশ্বরীপ্রসাদের*** মতে, এরা একশত জন সৈন্যের অধিনায়ক ছিল, নাকি একশত গ্রামের নিয়ন্ত্রক ছিল, তা বলা কঠিন। তবে এরা যে সামরিক ও অসামরিক উভয় কাজের দায়িত্ব পালন করত এরূপ মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। যাই হোক্, সুলতান দৌলতাবাদের অভিজ্ঞ শাসক কুতলুঘ খাঁকে অপসারিত করে তাঁর ভাই নিজামউদ্দিনকে ঐ পদে বসালে সদাহ আমীররা ক্ষুব্ধ হয়। কারণ কুতলুঘ খাঁ নানা সময়ে সুলতানের রোষ থেকে এই বহিরাগত আমীরদের রক্ষা করতেন। এখন কুতলুঘ খাঁর অপসারণের ঘটনায় তারা সুলতানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হয়।

সদায় আমীরদের আশঙ্কা সত্য প্রমাণিত হয় সুলতানের আর একটি সিদ্ধান্তে। সুলতান এই সময় আজিজ খামার নামক জনৈক ব্যক্তিকে মালবের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। সুলতান সদাহ আমীরদের কাজকর্ম সম্পর্কে সচেতন থাকতে এবং সামান্যতম সন্দেহ হলে তাদের কঠোর শাস্তি দেবার নির্দেশ দেন। আজিজ রাজ্যে পৌঁছেই নানাভাবে সদাহ আমীরদের বিব্রত করতে থাকেন। সন্দেহবশত তিনি ৮৯ জন সদাহ আমীরকে হত্যা করেন। এই কাজের জন্য সুলতান আজিজকে নানা সম্মানে ও পুরস্কারে অভিনন্দিত করেন। এই ঘটনা দৌলতাবাদ থেকে গুজরাট সর্বত্রই সদাহ আমীরদের মধ্যে ভীতি ও ক্ষোভ সঞ্চার করে। তারা বিদ্রোহমুখী হয়ে ওঠে। ড. ***নিজামীর*** ভাষায় ঃ *"Their petty acts of insubordination and misbehaviour were now replaced by organised rebellions and pitched battles."* গুজরাটের নায়েব উজীর মুকবিল-এর বিরুদ্ধে দাভোয় এবং বরোদায় সদাহ আমীররা সংঘবদ্ধ হয়ে সরকারি কোষাগার লুঠ করে এবং বহু সরকারি কর্মীকে বন্দী করে। জুরানবল, কাজী জালাল, ইবন লালা এবং ঝুল্লা'র নেতৃত্বে বিদ্রোহী আমীররা ক্যাম্বেতে উপস্থিত হয় এবং প্রাক্তন সাহানা-ই-বার্গ তাঘীকে বন্দীমুক্ত করে নিজেদের বিদ্রোহের সামিল করে নেয়। কিন্তু তাঘী বিদ্রোহীদের সঙ্গ ত্যাগ করে পালিয়ে যান এবং মুকবিলের সাথে যোগ দেন। বিদ্রোহীদের দমন করার উদ্দেশ্যে আজিজ খামার সসৈন্যে গুজরাটে উপস্থিত হন। ইসামীর মতে, সুলতানি সৈন্যের সংখ্যা দাঁড়ায় ছয় হাজারে। কিন্তু বিদ্রোহীদের সৈন্য ছিল সাকুল্যে সাতশ'! কিন্তু এই অসমযুদ্ধেও সদাহ আমীররা বিজয়ী হয়। আজিজ খামার বন্দী ও নিহত হন। মুকবুল সমস্ত রসদ, অর্থ ইত্যাদি বিদ্রোহীদের হাতে তুলে দিয়ে রক্ষা পান।

আজিজের মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পর সুলতান দিল্লী থেকে গুজরাটের উদ্দেশ্যে রওনা হন বলে ইসামী লিখেছেন। কিন্তু বরণীর মতে, এই সময় সুলতানপুরে ঘাঁটি গেড়ে তিনি গুজরাটের পরিস্থিতির উপর লক্ষ্য রাখছিলেন। যাই হোক্, মালিক কবিরের হাতে দিল্লীর দায়িত্ব ন্যস্ত করে সুলতান গুজরাটের দিকে রওনা হন। সদাহ আমীরদের বিদ্রোহের ক্ষেত্র ছিল নানা অংশে

প্রসারিত। তাই সুলতান একই সাথে বহুমুখী আক্রমণ রচনার কৌশল নেন। *ইসামী* লিখেছেন ঃ সুলতান নাগৌর থেকে আজম মালিককে ব্রোচে পাঠান, মাউন্ট আবু থেকে শেখ মুইজউদ্দিনকে পাঠান অনহিলবারার উদ্দেশ্যে এবং ব্রোচ থেকে মালিক মুকবিলকে পাঠান দৌলতাবাদে। ব্রোচ-এর যুদ্ধে বিদ্রোহী আমীর ঝুল্লা নিহত হয় এবং অন্যেরা ছত্রভঙ্গ অবস্থায় নানা দিকে পালিয়ে যায়।

এই সময় সুলতানের একটা ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত দৌলতাবাদের পরিস্থিতিকে আবার অগ্নিগর্ভ করে তোলে। সুলতান দৌলতাবাদের শাসনকর্তা আইন-উল্-মুল্ক-এর কাছে এক গোপন নির্দেশ পাঠিয়ে সেখানকার সদাহ আমীরদের ব্রোচে পাঠাতে বলেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও আইন-উল্-মুল্ক সুলতানের নির্দেশ পালন করেন। কিন্তু ব্রোচের উদ্দেশ্যে কিছুটা অগ্রসর হবার পরেই আমীরগণ সুলতানের অশুভ উদ্দেশ্য বুঝতে পারে এবং সুলতানের প্রহরীদের হত্যা করে দৌলতাবাদ আক্রমণ করে। তিন দিন যুদ্ধ করে দৌলতাবাদ তাদের অধীনে আসে। অবশ্য আইন-উল্-মুল্ককে বন্দী করেও, তাঁকে নিরপরাধী বিবেচনা করে বিদ্রোহীরা মুক্তি দেয়। অতঃপর বিদ্রোহী আমীররা মালিক ইসমাইল মুখ নামক জনৈক আফগানীকে তাদের শাসক মনোনীত করে। এই ব্যর্থতার সংবাদে সুলতান এতটাই বিচলিত হন যে তিনি তিন দিন তিন রাত নিদ্রাহীন অবস্থায় কাটিয়ে দেন। অতঃপর ছ'মাস ধরে তিনি সৈন্য সংগ্রহ করে দৌলতাবাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। দৌলত বাদ ও গুলবার্গ থেকে সুলতান সাফল্যের সাথে বিদ্রোহীদের বিতাড়িত করে নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। এই সময়ে তিনি গুজরাট থেকে তার্ঘীর বিদ্রোহের সংবাদ পান এবং তৎক্ষণাৎ গুজরাটের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এদিকে সুলতান দৌলতাবাদ ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহী আমীররা সুলতানের প্রতিনিধি ইমাদ-উল্-মুল্ককে পরাজিত ও বিতাড়িত করে দৌলতাবাদ দুর্গ পুনরাধিকার করে। এবারে বিদ্রোহীরা হাসান গঙ্গুকে তাদের নেতা মনোনীত করে। হাসান আলাউদ্দিন আবুল মুজফ্ফর বহমান শাহ উপাধি নিয়ে দাক্ষিণাত্যে বাহমনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন (১৩৪৭ খ্রীঃ)। ***বরণীর*** মতে, সুলতান মহম্মদ তুঘলক তখন এতটাই শ্রান্ত, ক্লান্ত ও বিপর্যস্ত ছিলেন যে, দক্ষিণ ভারতের উপর সত্বর দিল্লীর আধিপত্য পুনরুদ্ধারে কোন চেষ্টাই আর করেননি।

বিদ্রোহী তাঘীর বিরুদ্ধে অভিযানই ছিল মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের জীবনের শেষ সামরিক কর্মসূচী। তাঘী ছিলেন শক্তিহীন, কিন্তু চতুর। তাই সুলতানের মুখোমুখি না হয়ে তার্ঘী স্থান থেকে স্থানান্তরে আত্মগোপন করে সুলতানের ধৈর্য্য ও শক্তি ক্ষয় করতে থাকেন। ব্রোচ থেকে ক্যাম্বে, সেখান থেকে অসওয়াল হয়ে পাতন, এবং শেষ পর্যন্ত গিরনার হয়ে সিন্ধুদেশে চলে আসেন তার্ঘী। সুলতানও মরিয়া হয়ে এবং প্রচণ্ড অসুস্থতা সত্ত্বে সিন্ধুর উদ্দেশ্যে রওনা হন। কিন্তু থাট্টার সন্নিকটে সোণ্ডা নামক স্থানে পৌঁছে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং এক সপ্তাহ পরে সেখানেই প্রাণত্যাগ করেন (২০শে মার্চ, ১৩৫১খ্রীঃ)।

○ মহম্মদ তুঘলকের চরিত্র ও কৃতিত্বের মূল্যায়ন ঃ

ভারতীয় শাসকদের মধ্যে সম্ভবত সর্বাধিক বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব হলেন সুলতান মহম্মদ-বিন্-তুঘলক। তাঁর সমকালীন ঐতিহাসিক বরণী, ইবন বতুতা এবং ইসামী ও আধুনিক ঐতিহাসিক

ড. ঈশ্বরীপ্রসাদ, ড. মেহদী হোসেন, এলফিন্‌স্টোন, ড. নিজামী, লেন্‌পুল প্রমুখ সবাই মহম্মদের চরিত্র ও কৃতিত্বের মূল্যায়নে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। ঐতিহাসিকেরা বিভিন্ন প্রসঙ্গে সুলতানকে দয়ালু, রক্তপিপাসু, স্বপ্নবিলাসী, পরস্পরবিরোধী গুণের সংমিশ্রণ, হটকারী, উন্মাদ, সৃষ্টির বিস্ময়, ভাগ্যবিড়ম্বিত, আদর্শবাদী ইত্যাদি নানা অভিধায় ভূষিত করেছেন। স্বভাবতই সুলতানের চরিত্র ও কৃতিত্বের নিরপেক্ষ এবং ইতিহাসমুখী মূল্যায়ন অসম্ভব না-হলেও কিছুটা কষ্টকর। ইতিহাসের পাতায় সেইসব শাসক বহুল আলোচিত হন যাঁরা ভাল-মন্দ, সাফল্য-ব্যর্থতা উভয় ক্ষেত্রেই আলোড়ন সৃষ্টিকারী এবং নতুন পরিকল্পনা গ্রহণের সাহস বা দুঃসাহস দেখান। মহম্মদ-বিন্-তুঘলক ছিলেন এমনই একজন শাসক যিনি মধ্যযুগের হলেও মধ্যযুগীয় সীমাবদ্ধতার নিগড়ে বদ্ধ ছিলেন না, যিনি রাজনীতিবিদ্ হলেও দর্শনশাস্ত্র বা চিকিৎসাবিদ্যার গভীরে প্রবেশ করতে ছিলেন উন্মুখ, যিনি ইসলাম হলেও ইসলামের তথাকথিত রক্ষকদের সান্নিধ্য বর্জন করাকে শ্রেয় মনে করতেন। মধ্যযুগে অবস্থান করে আধুনিক যুগের স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি। তাই তাঁর জীবন সরলরেখায় অগ্রসর হয়নি, কিংবা তাঁর পরিকল্পনা স্বাভাবিক ধারায় রূপায়িত করা সম্ভব হয়নি।

ব্যক্তিগতভাবে মহম্মদ ছিলেন চারিত্রিক কলুষতামুক্ত। নারীসঙ্গ বা মদ্যপান বিষয়ে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ও আসক্তিমুক্ত। অবশ্য ঔরঙ্গজেবের মত অন্ধ গোঁড়ামি তাঁর ছিল না। তাই নর্তকীদের কাজকে তিনি অসামাজিক বা বর্জনীয় বলে মনে করেননি। শিক্ষা ও শিক্ষিতের প্রতি ছিল মহম্মদের আন্তরিক অনুরাগ। মধ্যযুগীয় শিক্ষার এমন কোন শাখা ছিল না, যা কোন-না-কোন ভাবে তাঁর জ্ঞাত ছিল না। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, অলংকারশাস্ত্র, কাব্য, তর্কবিদ্যা, গণিত, চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, হস্তাক্ষরবিদ্যা ইত্যাদি প্রতিটি বিষয়ে ছিল তাঁর গভীর আগ্রহ। কোরান ও হাদিস্ সম্পর্কেও তাঁর জ্ঞান ছিল গভীর। ***বরণী*** লিখেছেন ঃ *'বাক্‌পটু এই সুলতান হাস্যরস-সৃষ্টির কাজেও ছিলেন দক্ষ'* *ড.* ***ঈশ্বরীপ্রসাদ*** লিখেছেন ঃ ***"of all kings who had sat upon the throne of Delhi since the Muslim conquest, he was undoubtedly the most learned and accomplished".*** মহম্মদের উদ্যোগে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির সাথে ভারতের সাংস্কৃতিক ভাব-বিনিময় ঘটে। ইরাক, সিস্তান, মিশর, হিরাট, টাঞ্জিয়ার্স প্রভৃতি দেশ থেকে সাংস্কৃতিক দূতরা ভারতে আসেন। অলস সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি রুক্ষ, হৃদয়হীন সমরাঙ্গনেও মহম্মদের ছিল স্বাভাবিক পদচারণা। কৈশোর থেকেই তাঁর পরিচয় যুদ্ধক্ষেত্রের সঙ্গে। সম্ভবত, ব্যক্তিগতভাবে মহম্মদ তুঘলকের মত এত যুদ্ধে অংশগ্রহণ কিংবা বিদ্রোহদমনে অগ্রসর অন্য কোন মুসলমান শাসক হননি। মুবারক খলজীর অধীনে 'আমীর-ই-আখুর' হিসেবে মহম্মদের রাজনৈতিক জীবন শুরু এবং শেষ হয় সিন্ধুর জনহীন প্রান্তরে সামরিক ছাউনির মধ্যেই। উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে সুদূর দক্ষিণে দ্বারসমুদ্র এবং পূর্বে বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমে সিন্ধু পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল ছিল মহম্মদের অধীনস্থ। ড. ***নিজামীর*** মতে, *'ইতিপূর্বে কখনোই দিল্লীর সুলতানির কর্তৃত্ব ও মর্যাদা এমন উচ্চতা স্পর্শ করতে পারেনি।'* তেইশটি রাজ্যে বিভক্ত সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক প্রতিটি দিকে ছিল সুলতানের তীক্ষ্ণ নজর।

মহম্মদ তুঘলকের বিরুদ্ধে দুটি প্রধান অভিযোগ হল যে, —তিনি ছিলেন রক্তপিপাসু এবং খামখেয়ালী বা উন্মাদপ্রায়। ইবন বতুতা, সুলতানের কয়েকটি নৃশংস আচরণের উল্লেখ করে

তাঁকে রক্তপিপাসু হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। একথা ঠিক সুলতান একাধিক ক্ষেত্রে অন্যায়কারীর গায়ের চামড়া জীবন্ত অবস্থায় ছাড়িয়ে নেবার কিংবা মৃতের মাংস রান্না করে তারই আত্মীয়-পরিজনকে ভক্ষণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। শেখ শিহাবউদ্দিনের সমস্ত শ্মশ্রু টেনে তুলে নেওয়া কিংবা সুলতানকে স্বৈরাচারী বলার অপরাধে তাঁকে নরবিষ্ঠা ভক্ষণ করানোর মত কিছু অমানবিক সিদ্ধান্ত মহম্মদ তুঘলক নিয়েছেন। তবে *'সুলতানি প্রাসাদের বাইরে প্রতিদিন মৃতদেহ স্তূপীকৃত থাকত কিংবা প্রাসাদের প্রবেশদ্বারে রক্তস্রোত সদাবহমান থাকত'*—এ ধরনের বক্তব্যের মধ্যে অতিরঞ্জন স্পষ্ট। ইবন বতুতা নিজেই লিখেছেন যে, ন্যায়বিচারের প্রতি মহম্মদের ছিল তীক্ষ্ণ নজর। সুলতানের বিরুদ্ধে জনৈক হিন্দু একদা অভিযোগ পেশ করলে সুলতান স্বয়ং খালিপায়ে এবং নিরস্ত্র অবস্থায় কাজীর সামনে নতমস্তকে এসে দাঁড়ান। কাজী সুলতানকে দেখে ইতস্তত করলে এবং আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালে সুলতান তাঁকে পরামর্শ দেন যে, বিচারকের সামনে একজন সাধারণ নাগরিক ও সুলতানের মর্যাদা একই। বিচারকের উচিত নিরপেক্ষভাবে বিধান দেওয়া। অতঃপর সুলতান কাজির দেওয়া দণ্ড নত মস্তকে মেনে নেন। ইবন বতুতার এই বিবরণ থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে, সুলতানের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতার অভাব ছিল না। তাই বলা চলে খামখেয়ালবশত তিনি কাউকে চরম শাস্তি দিতেন না। ***বরণী*** লিখেছেন যে, সুলতান তাঁকে একবার বলেছিলেন, *'যতদিন না জনগণ বিদ্রোহ বর্জন করে, সৎভাবে আচরণ করে, ততদিন আমি তাদের চরম শাস্তি দিতে দ্বিধা করব না।'* অর্থাৎ সুলতানের নৃশংসতা ছিল প্রয়োজনভিত্তিক, ইচ্ছাভিত্তিক নয়। কঠোরতা তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল না, সাম্রাজ্যের সংহতির প্রয়োজনেই তিনি কঠোরতা অবলম্বন করতেন।

মহম্মদ তুঘলকের খামখেয়ালীপনার দৃষ্টান্ত হিসেবে বরণী প্রমুখ দোয়াবে কর বৃদ্ধি, রাজধানী স্থানান্তর, প্রতীক-মুদ্রার প্রচলন, খোরাসান পরিকল্পনা প্রভৃতির কথা উল্লেখ করেছেন। *ড. **ঈশ্বরীপ্রসাদের*** মতে, আপাতদৃষ্টিতে এই কাজগুলিকে খামখেয়ালী মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ মনে হতে পারে। কিন্তু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে পরিষ্কার হয় প্রতিটি পরিকল্পনা ছিল প্রশাসনিক প্রয়োজন থেকে উদ্ভূত এবং যুক্তিপূর্ণ। পুনঃপুনঃ মোঙ্গল আক্রমণের ফলে দিল্লীর নিরাপত্তাহীনতা কিংবা দাক্ষিণাত্যে সুলতানি কর্তৃত্ব সম্প্রসারণের জন্য দক্ষিণেরই কোন রাজ্যে থেকে দেশ শাসন করার চিন্তা আর যাই হোক্ হটকারী বা অবিজ্ঞজনোচিত কোন সিদ্ধান্ত ছিল না। প্রতীক-মুদ্রার ব্যবহার বিশ্বে নতুন নয়। রূপার যোগানের অভাব হেতু প্রতীক-মুদ্রা প্রচলনের সিদ্ধান্ত সুলতানের গভীর অর্থনৈতিক জ্ঞানের পরিচায়ক। আর জনগণের উপর করের বোঝা কিছুটা বাড়িয়ে রাজকোষের অভাব পূরণ করার চেষ্টা ইতিহাসের অতি পুরাতন একটি ঘটনা। তাই এগুলিকে সুলতানের অজ্ঞতা বা হটকারিতার দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। সুলতানের এইসব পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু সেজন্য পরিকল্পনা দায়ী ছিল না ; দায়ী ছিল পরিকল্পনা রূপায়ণের পদ্ধতি। *ড. **ঈশ্বরীপ্রসাদ, লেনপুল*** প্রমুখ ঐতিহাসিকরা স্বীকার করেছেন যে, মহম্মদের চিন্তা ছিল যুগের তুলনায় অগ্রণী। সাধারণ মানুষ যেমন তাঁর পরিকল্পনার তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না, তেমনি প্রকল্পগুলি রূপায়ণের জন্য যে ধৈর্য ও পদ্ধতি গ্রহণ করা দরকার ছিল, সে বিষয়ে সুলতান বা তাঁর আমলারা কেউ সচেতন ছিলেন না। তাই ***লেনপুল*** লিখেছেন : "*Hence with the best intention, excellent ideas, but no balance cf*

patience or sense of proportion, Muhammad Tughlak was transcendent failure." ড. ***মজুমদারের*** মতে, সুলতানের এই ধৈর্যহীনতা কিংবা প্রকল্প রূপায়ণের যথার্থ পথ উদ্ভাবনের ব্যর্থতা তাঁর ত্রুটি হিসেবেই বিবেচিত হবে। মন্দের ভাল এই যে, তিনি প্রকল্পগুলির সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করার সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলি বাতিল করেছেন এবং এই কারণে ক্ষতিগ্রস্ত নাগরিকদের যথাযথ ক্ষতিপূরণেরও ব্যবস্থা করেছেন।

বরণী এবং ইসামী মহম্মদ তুঘলকের বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহীতার অভিযোগ এনেছেন। ***বরণীর*** মতে, ইসলামের রক্ষক ও সেবকদের প্রতি মহম্মদ ছিলেন বিদ্বেষপরায়ণ। ***ইসামীর*** মতে, মহম্মদ ছিলেন কাফের। হিন্দু যোগীদের সাথে ছিল তাঁর গভীর সম্পর্ক, যা ইসলামের প্রতি তাঁর অশ্রদ্ধা বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে। ইসামী সুলতানের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধের ডাক দিতেও দ্বিধা করেননি। বাস্তব ঘটনা হলো যে, সুলতান উলেমা, কাজী, খাতিব, কাফি, মাসাইঘ প্রভৃতি মুসলিম ধর্মবিদ্, বিচারক, প্রচারক, সন্ত প্রমুখকে পূর্ববর্তী সুলতানের মত অতিরিক্ত গুরুত্ব ও সুযোগ-সুবিধা দিতে রাজী ছিলেন না। দুর্মুখ ও দুর্বিনীত মুসলিম রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কর্তাদের মহম্মদ খুব সাধারণের পর্যায়ে নামিয়ে এনেছিলেন। দিল্লী থেকে সুফী-সাধকদের জোর করে দৌলতাবাদে টেনে নিয়ে যাওয়ার ফলে তাঁরাও সুলতানের উপরে রুষ্ট ছিলেন। অর্থাৎ গোঁড়াপন্থী ও উদারপন্থী উভয় শ্রেণীর মুসলীম ধর্মবিদ্গণ মহম্মদের কাজে ক্ষুব্ধ ছিলেন। তাই তাঁদের বিচারে মহম্মদ ছিলেন ধর্মদ্রোহী। কিন্তু ড. ***মজুমদারের*** মতে, ইসলামের ধর্মবিদ্দের প্রতি মহম্মদের ঔদাসীন্য এবং রূঢ়তার মূল কারণ ছিল সুলতানের ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক কর্তৃত্ববোধ, ধর্মীয় নেতাদের অবাধ্যতা এবং সুলতানের রুক্ষ মেজাজ। এর পেছনে কোনরূপ ধর্মীয় প্রেরণা বা ঘৃণা ছিল না।

বরণীর বিবরণের উপর ভিত্তি করে *ভিন্সেন্ট স্মিথ, এলফিন্স্টোন* প্রমুখ মহম্মদ তুঘলককে 'পরস্পর-বিরোধী গুণের সংমিশ্রণ' (Mixture of opposits) বলে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু *ড. নিজামী, গার্ডনার ব্রাউন, লেন্পুল, আগা মেহদী হোসেন* প্রমুখ এই মন্তব্যের বিরোধিতা করেছেন। ড. ***নিজামীর*** মতে, বরণীর বক্তব্যে অন্তর্বিরোধ লক্ষণীয়। সুলতানের ধর্মনিরপেক্ষতা, বংশমর্যাদার পরিবর্তে যোগ্যতার প্রতি বিশ্বস্ততা, অন্ধ ধর্মানুসরণের পরিবর্তে ধর্মের সত্যাসত্য মানার একান্ত ইচ্ছা প্রভৃতি বরণীর মনঃপূত ছিল না। তাই তিনি সুলতানের কাজের বিরূপ সমালোচনা করেছেন। কিন্তু বরণীর এই সিদ্ধান্ত বা অবস্থান স্থায়ী ছিল না। অতীতের স্মৃতিচারণা ছেড়ে যখন তিনি সদ্য বর্তমানের বর্ণনা দিতে গিয়েছেন, তখন তাঁর বিচারে মহম্মদ তুঘলক ছিলেন প্রজাদরদী এবং প্রশংসার যোগ্য ব্যক্তিত্ব। ড. ***নিজামীর*** ভাষায় : "*When Barni is in the present, he has love for Muhammand bin Tughluq ; when he is in the past, he has nothing but hatred for him.*" ড. ***হোসেন*** মনে করেন যে, মহম্মদ তুঘলকের প্রকৃতিতে স্ববিরোধিতা হয়তো ছিল ; কিন্তু এই বৈপরীত্য এসেছিল তাঁর জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে। এবং তার পিছনে যথেষ্ট কারণও ছিল। বরণী প্রমুখ নানা পর্যায়ের ঘটনাকে একসূত্রে গ্রথিত করে তাঁর চরিত্রকে 'বৈপরীত্যের সমাবেশ' বলে প্রচার করতে চেয়েছেন। অবশ্য ড. ***শ্রীবাস্তবের*** মতে, ড. *হোসেনের* ব্যাখ্যা যথার্থ নয়। তিনি লিখেছেন : "*Muhammad did posses contradictory qualities at one and the same period of his character throughout*

his life." এই বিতর্কের একটা সমাধানসূত্র পাওয়া যায় **ড. *মজুমদারের*** ব্যাখ্যায়। তিনি লিখেছেন ঃ *"মহম্মদ তুঘলক বিকৃতরুচি বা উন্মাদগ্রস্ত ছিলেন না, কিন্তু তাঁর আচরণের মধ্যে বৈপরীত্য ছিল লক্ষণীয়। তাঁর হৃদয় ও মস্তিষ্কে এমন বহু সদ্ গুণ ছিল, যা তাঁর অনেক আচরণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। প্রতিদিন চল্লিশ হাজার ভিক্ষুকদের ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে তিনি যেমন আন্তরিক ছিলেন, তেমনি তাঁর কথা অমান্য করার জন্য নৃশংসভাবে কাউকে হত্যা করতেই তিনি দ্বিধা করতেন না।"* তাই মহম্মদ-বিন্-তুঘলককে একাধারে *'দয়ার সাগর ও রক্তপিপাসু'* বললে হয়তো প্রকৃত সত্য বলা হয় না ; কিন্তু এই ব্যাখ্যা দ্বারা তাঁর চরিত্রের আংশিক আভাষ হয়তো পাওয়া সহজ হয়।

○ দিল্লী-সুলতানির পতনে মহম্মদ তুঘলকের দায়িত্ব ঃ

সুলতান মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের জীবন ও পরিণতির সাথে আব্বাসিদ খলিফা আল্-মামুন (৭৮৬-৮৩৩ খ্রীঃ)-এর জীবনের অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। মামুনের নেতৃত্বে খিলাফত শক্তিও মর্যাদার শীর্ষে আরোহণ করেছিল। মহম্মদ তুঘলকের নেতৃত্বে দিল্লী-সুলতানিও স্পর্শ করেছিল মর্যাদা ও প্রতিপত্তির শীর্ষ দেশ। উভয়েই ছিলেন যুক্তিবাদী ও গোঁড়ামিমুক্ত। দু'জনেই মনে করতেন যে, দার্শনিক ও বিজ্ঞানী ঈশ্বর নির্দিষ্ট পুরুষ হিসেবে মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠার কাজ করবেন। দেশবিদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতি দুজনেরই ছিল গভীর শ্রদ্ধাবোধ। আবার এঁদের আমলেই স্ব স্ব রাজ্যের অবক্ষয় ও পতনমুখী প্রক্রিয়া স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। মহত্ত্ব ও উদারতা সত্ত্বেও ওঁরা দুজনেই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিলেন। মহম্মদ তুঘলকের প্রশাসনিক দক্ষতা এবং একজন 'প্রায় বিকৃত মস্তিষ্ক' শাসক হিসেবে সাম্রাজ্যের ভাঙন ডেকে আনার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে সমকালীন লেখকের বিবরণী থেকে। ইবন বতুতা, বরণী ও ইসামী নানা দিক থেকে মহম্মদ তুঘলকের কার্যাবলীর বিরূপ সমালোচনা করে জনমনে এই ধারণার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন যে, ইলতুৎমিস, বলবন ও আলাউদ্দিনের আত্মত্যাগ যে সাম্রাজ্যের ভিত্তি গড়ে দিয়েছিল, মহম্মদ তুঘলকের ভ্রান্ত ও হটকারী সিদ্ধান্তের ফলেই তা তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়েছিল। কিন্তু মধ্যযুগে ভারতীয় শাসকদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী ও নিরপেক্ষ একজন শাসকের মূল্যায়নে এত সরলীকরণ সিদ্ধান্ত সঠিক নয়। আমরা যেন ভুলে না যাই যে বরণী, ইসামী ও ইবন বতুতা—তিনজনেই নানা কারণে মহম্মদ তুঘলকের উপর ক্ষুব্ধ ছিলেন। তাই ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষতা তাঁদের লেখনীতে ছিল না। এঁদের ইতিহাস চর্চা ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়ার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়েছে। এবং সেই কারণে এঁদের বিশ্লেষণে স্ববিরোধিতার ছাপ পাওয়া যায়। যেমন, বরণী যে সকল কঠোরতার কারণে মহম্মদ তুঘলকের নিন্দাবাদ করেছেন ; ঠিক সেই ধরনের কঠোরতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও আলাউদ্দিন খলজীর প্রশংসা করে গেছেন।

মহম্মদ তুঘলকের কিছু সীমাবদ্ধতা নিশ্চয়ই ছিল। তাঁর কিছু কিছু সিদ্ধান্ত সাম্রাজ্যের পক্ষে সুদূরপ্রসারী বিরূপ প্রতিক্রিয়াও সৃষ্টি করেছিল। আদর্শ ও বাস্তবের টানাপোড়েনে শেষ পর্যন্ত আদর্শ অকার্যকর প্রতিপন্ন হয়েছিল. কিন্তু এটাও সত্য যে, তাঁর আমলের সবকিছুই অবিমিশ্র অশুভ ছিল না। এক্ষেত্রে স্মরণে রাখা আবশ্যিক যে, মহম্মদ-বিন্-তুঘলক দিল্লী-সুলতানির

প্রতিষ্ঠার ১১৯ বছর পরে সিংহাসনে বসেছিলেন। এবং তাঁর মত্যুর পরেও ১৭৫ বছর সুলতানি টিকেছিল। তাঁর আগমনের পূর্বে ইলতুৎমিস, বলবন, আলাউদ্দিন খলজীর মত প্রতিভাবান শাসকেরা সিংহাসনে বসেছিলেন। কিন্তু মহম্মদের মৃত্যুর পর একমাত্র ফিরোজ তুঘলক ছাড়া প্রকৃত অর্থে কোন দক্ষ ব্যক্তি দিল্লীর সিংহাসনে বসেননি। তবুও সাম্রাজ্য টিকেছিল একশ পঁচাত্তর বছর। এ থেকে প্রমাণ করা সম্ভব যে, মহম্মদ-বিন্-তুঘলক এককভাবে এমন কিছু ভুল বা অন্যায় করেননি, যা সুলতানির পতন অনিবার্য করে তুলেছিল। আরো লক্ষণীয় যে, মহম্মদের আমলেই সুলতানি সাম্রাজ্যের সীমানা সর্বাধিক বিস্তৃতি লাভ করেছিল। অসম, উড়িষ্যা ও কাশ্মীর ছাড়া সমগ্র ভারতবর্ষে প্রসারিত হয়েছিল মহম্মদের রাজ-কর্তৃত্ব। সুদূর দক্ষিণে উড্ডীন হয়েছিল দিল্লী-সুলতানির বিজয়-পতাকা। মহম্মদ স্বয়ং ছিলেন দক্ষ যোদ্ধা এবং কর্মোদ্যোগী। তাঁর কট্টর সমালোচক বরণীও স্বীকার করেছেন যে, রাজ-কর্তব্য সম্পাদনে মহম্মদ তুঘলক কখনোই ক্লান্তিবোধ করতেন না। সৈনিক হিসেবে তিনি কর্মজীবন শুরু করেছিলেন, আবার যুদ্ধক্ষেত্রেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর জনপ্রিয়তারও অভাব ছিল না। বরণী, ইসামী ও ইবনবতুতা উল্লেখ করেছেন যে, হাজার হাজার মানুষ মহম্মদের আচরণে ক্ষুব্ধ ছিলেন এবং প্রতিশোধ গ্রহণে উন্মুখ ছিলেন। অথচ আশ্চর্যের বিষয় যে, মহম্মদের প্রাণনাশের জন্য কোন ষড়যন্ত্র করা হয়নি। মহম্মদ মৃত্যুকালে নিজ উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যাননি। তথাপি সেনাবাহিনী বা প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ তুঘলকবংশকে উচ্ছেদ করে ক্ষমতাদখলের বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কোন চেষ্টা করেননি। মহম্মদের রাজত্বকালে বিদ্রোহের দাবানল দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল উত্তর থেকে দক্ষিণে, পূর্ব থেকে পশ্চিম ভারতে। সুলতান দক্ষিণের বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থ হলেও, উত্তরের ও অন্যান্য অংশের সমস্ত বিদ্রোহ, কেবল বাংলা ছাড়া, দমন করেছিলেন দক্ষতার সাথেই। শিক্ষা-দীক্ষা এবং সাংস্কৃতিক মনস্কতার দিক থেকেও মহম্মদ দিলেন অতুলনীয়।

তথাপি মহম্মদের রাজত্বকালেই দিল্লী-সুলতানির অবক্ষয়ের সূচনা হয়েছিল বলে পণ্ডিতদের অনুমান। এবং এজন্য কিছুটা দায়ী ছিল মহম্মদ তুঘলকের ব্যক্তিগত ভুল-ভ্রান্তি এবং কিছুটা দায়ী ছিল সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি। সুলতানি শাসনব্যবস্থা প্রকৃতিগতভাবে ধর্মাশ্রয়ী না হলেও প্রশাসনের স্থায়িত্ব ও শক্তি বিধানে উলেমা, খাতিব প্রমুখ ধর্মীয় নেতাদের বিশেষ ভূমিকা ছিল। কিন্তু মহম্মদ তুঘলক দর্শন ও যুক্তিবাদ দ্বারা চালিত হবার ফলে ধর্মগুরুদের যুক্তিহীন কর্তৃত্বে আস্থাহীন হয়ে পড়েছিলেন। ফলে এই শ্রেণী মহম্মদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। *'ফুতুহ-উস্-সালাতিন'* গ্রন্থে পরিষ্কার লেখা হয়েছে যে, *'সমস্ত মানুষ ঐক্যবদ্ধ হলে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করা সম্ভব। তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আইনানুগ, শরয়িত অনুমোদিত।'* এইভাবে একজন উদারপন্থী শাসকের বিরুদ্ধে গোঁড়াপন্থী ও স্বার্থান্বেষীদের জেহাদ ঘোষিত হয়েছে। অন্যদিকে উদারপন্থী অতিন্দ্রীয়বাদী সুখী সাধকরাও মহম্মদের প্রতি বিদ্বিষ্ট ছিলেন। দিল্লী থেকে তাঁদের জোরপূর্বক দৌলতাবাদে স্থানান্তরের নির্দেশ এই সর্বত্যাগী এবং জনপ্রিয় ধর্মগোষ্ঠীকেও বিরোধী শক্তিতে পরিণত করেছিল। নিজ সম্প্রদায়ের প্রভাবশালী গোষ্ঠীর বিরূপতা নিঃসন্দেহে সাম্রাজ্যের ভিতকে দুর্বল করেছিল।

মহম্মদ তুঘলকের শাসনতান্ত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলি সাম্রাজ্যের সংহতির পক্ষে ক্ষতিকারক হয়েছিল। রাজধানী স্থানান্তর, প্রতীক-মুদ্রার প্রচলন, দোয়াবে করবৃদ্ধি—সবই ছিল প্রয়োজনভিত্তিক

সিদ্ধান্ত। কিন্তু প্রকল্পগুলির রূপায়ণে ভুল পদ্ধতির প্রয়োগ এবং ব্যর্থতা নিঃসন্দেহে সুলতানি শাসনকে দুর্বল করেছিল। সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল নানা ভাবে। প্রকল্পগুলি তাদের দৈহিক ও আর্থিক নির্যাতনের শিকারে পরিণত করেছিল। ফলে সুলতান দ্রুত জনসমর্থন হারিয়েছিলেন এবং আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা ইন্ধন পেয়েছিল। অথচ বাস্তববাদী এই সকল প্রকল্প রূপায়ণে প্রায়োগিক দিক সম্পর্কে একটু সচেতন হলে প্রকল্পগুলি ব্যর্থ হত না, পরন্তু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে সেগুলি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতির সূচনা করতে পারত। কিন্তু এই কাজের জন্য যে ধৈর্য্য ও স্থিরতার প্রয়োজন, তা সুলতানের ছিল না। মহম্মদ তুঘলক পরিবর্তন চেয়েছিলেন। কিন্তু কোন বিরাট পরিবর্তন আনার জন্য যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা আবশ্যিক, তা তিনি মানতে রাজী ছিলেন না। তাই অষ্টাদশ শতকে অস্ট্রিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় যোশেফ-এর মতই সৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রকল্পগুলি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল।

মহম্মদ বিদেশীদের উচ্চপদে নিয়োগ করে সঠিক কাজ করেননি। তিনি নিম্নশ্রেণীর মানুষ এবং মোঙ্গল বা আফগানদের দায়িত্বশীল পদে নিয়োগ করে তুর্কী ও খলজী অভিজাতদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। অথচ এইসব বিদেশী অভিজাত সুলতানের প্রতি অনুগত ছিলেন না। সুলতানের বিরুদ্ধে যেসব বিদ্রোহ হয়েছিল, তাতে এদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। লাহোরে শাহু আফগান, গুজরাট ও সিন্ধুতে মালিক তার্ঘী, দৌলতাবাদে সদাহ আমীরগণ বিদ্রোহের আগুন প্রজ্জ্বলিত করে দিল্লীর কর্তৃত্বকে দুর্বল ও পতনোন্মুখ করেছিলেন। স্বাধীন বিজয়নগর ও বাহমনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা এবং বাংলাদেশে ইলিয়াস শাহী বংশের উত্থান সুলতানি সাম্রাজ্যের মানচিত্রকে যথেষ্ট সংকুচিত করেছিল। মহম্মদের ব্যর্থতা সাম্রাজ্যের যে ভাঙনের সূচনা করেছিল, তা শেষ পর্যন্ত পরিণতি পেয়েছিল সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত পতনে।

দুর্ভাগ্য মহম্মদের যে, তাঁর আমলেই প্রকৃতির বিরূপতা প্রকাশ পেয়েছিল নানা ভাবে। অনাবৃষ্টির কারণে দিল্লী, দোয়াব, মালব প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যাপক খাদ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষ এবং দক্ষিণ ভারতের প্লেগরোগ মহম্মদের ব্যর্থতাকে প্রকট করে তোলে। সুলতানের কর-নীতির সাথে প্রাকৃতিক বিপর্যয় যুক্ত হয়ে তাঁকে ঘৃণ্য খলনায়কে পরিণত করে। আর ভয়াবহ প্লেগরোগ শেষ করে দেয় সুলতানের সামরিক শক্তিকে। এর প্রতিক্রিয়া ঘটে দু'ভাবে। সারাদেশে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে দ্রুত ; কিন্তু তখন তা দমনের মত সামরিক শক্তি সুলতানের হাতে নেই। তিনি নিজে ছুটে বেড়িয়েছেন দেশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত। কিন্তু রাজ্যের ভাঙন রোধ করতে পারেননি। তাই বলা চলে সুলতান মহম্মদ-বিন্-তুঘলক ছিলেন দারুণ প্রতিভাবান একজন ব্যক্তি কিন্তু প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর জন্য যে ধৈর্য্য ও সহনশীলতা প্রয়োজন, তা তাঁর ছিল না। তাই তাঁর শাসন মহৎ উদ্দেশ্য পরিচালিত হলেও তিনি সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের পথ দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন।

○ ফিরোজ শাহ তুঘলক (১৩৫১-'৮৮ খ্রীঃ) ঃ

মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের মৃত্যুর (২০ শে মার্চ ১৩৫১ খ্রীঃ) দু'দিন পরে (২৩শে মার্চ) সিন্ধুতে সামরিক ছাউনির ভেতর অভিজাত ও সেনাপতিগণ ফিরোজ তুঘলককে পরবর্তী সুলতান মনোনীত করেন। ফিরোজ ছিলেন মহম্মদ তুঘলকের কাকা রজবের পুত্র। ফিরোজের মা ছিলেন

ভাট্টি রাজপুতগোষ্ঠীর কন্যা নীলা। বাল্যকাল থেকেই ফিরোজ ছিলেন মহম্মদের স্নেহধন্য ও সহযোগী। মহম্মদের আকস্মিক মৃত্যু সুলতানি-বাহিনীর মধ্যে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। সিন্ধু অভিযানে মোঙ্গলরা মহম্মদ তুঘলককে সৈন্য ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিল। মোঙ্গলনেতা তরমাশিরিনের জামাই নওরোজ এই অভিযানে দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সুলতানের আকস্মিক মৃত্যুর সংবাদে নওরোজের নেতৃত্বে মোঙ্গল সৈন্যরা সুলতানি-বাহিনীকেই আক্রমণ করে। থাট্টার স্থানীয় জনগণও সুলতানি-বাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করে। নেতৃত্বহীন সুলতানি-বাহিনী দিশাহারা অবস্থায় কেবল মারই খেতে থাকে। এমতাবস্থায় সেনাপতি ও অভিজাতগণ ফিরোজকে সুলতান হিসেবে মনোনীত করে পরিস্থিতির সামাল দেয়।

দিল্লীর সিংহাসনে ফিরোজের দাবির বৈধতা সম্পর্কে কিছুটা মতভেদ আছে। মহম্মদ তুঘলক মৃত্যুর পূর্বে ফিরোজকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করে গিয়েছিলেন কিনা, সে বিষয়ে নির্দিষ্ট কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এদিকে সুলতানের মৃত্যুসংবাদ পাওয়ামাত্র সুলতানের সহকারী খাজা-ই-জাহান এক নাবালককে মৃত সুলতানের পুত্র হিসেবে সিংহাসনে বসিয়ে ফিরোজকে তার অভিভাবক হিসেবে কর্মসম্পাদনের জন্য আহ্বান জানান। আবার সুলতানের ভগিনী খুদাবন্দজাদা নিজ পুত্রকে পরবর্তী সুলতান মনোনীত করার দাবি উত্থাপন করে বিষয়টিকে আরো জটিলতর করে তোলেন। *বরণীর* মতে, ফিরোজ সুলতান-পদে মহম্মদ তুঘলক কর্তৃক মনোনীত হয়েছিলেন। কিন্তু *স্যার উলসী হেগ* নির্দিষ্ট তথ্যের অভাবহেতু বরণীর বক্তব্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে, খাজা জাহান কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি ছিলেন সিংহাসনের বৈধ দাবিদার। আবার *ড. ঈশ্বরীপ্রসাদ* মনে করেন, মহম্মদ তুঘলকের কোন পুত্রসন্তান বর্তমান থাকলে তাঁর ভগিনী কখনোই নিজপুত্রের দাবি উত্থাপনের সাহস পেতেন না। তাঁর মতে, উলসী হেগ ফিরোজকে 'জবরদখলকারী' বলে যে অভিমত করেছেন, তা-ও যথার্থ নয়। কারণ সুলতানি আমলে নির্দিষ্ট কোন উত্তরাধিকারী আইন ছিল না। সিংহাসনের অধিকারী ফিরোজ ছিলেন বুদ্ধিমান ও শক্তিমান ব্যক্তি। পরন্তু সেনাপতি ও অভিজাতদের স্বীকৃতি ফিরোজকে যথেষ্ট বৈধতা প্রদান করেছিল। যাই হোক্, *খাজা-ই-জাহান* শেষ পর্যন্ত ফিরোজের দাবি মেনে নেন এবং আনুগত্য প্রকাশ করেন।

ফিরোজের সিংহাসনারোহণ কয়েকটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ। *প্রথমত,* এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হিন্দুমাতার সন্তানও মসনদে স্বীকৃতিলাভের যোগ্য, জাতি চিন্তা বা ধর্মচেতনা মনোনয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বহীন প্রতিভাত হয়। *দ্বিতীয়ত,* ফিরোজের মনোনয়ন প্রমাণ করেছিল যে মধ্যযুগেও সামরিক প্রতিভাধর না হয়েও সুলতানি সিংহাসনে বসা যায়। *তৃতীয়ত,* আবার প্রমাণিত হয় যে, সুলতান মনোনয়নের কাজে অভিজাতদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকা সম্ভব। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সিন্ধুতে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ ফিরোজকে সিংহাসনে বসার অনুরোধ করলে ফিরোজ প্রথমে তা গ্রহণে দ্বিধান্বিত ছিলেন। পরে দিল্লীর উলেমা এই অভিজাতদের ইতিবাচক মনোভাব সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে সিংহাসন গ্রহণ করেন। *ড. আগা মেহদী হোসেনের* মতে, ফিরোজ সিংহাসনে বসার জন্য অনেক আগে থেকেই উলেমাদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করেছিলেন। সিংহাসনে বসার পর তাঁর উলেমা-প্রীতি ড. হোসেনের মন্তব্যকেই সমর্থন করে। যাই হোক্, ফিরোজ বিদ্রোহী মোঙ্গলদের দমন করে বাহিনীর মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন এবং দিল্লীর

পথে অগ্রসর হন। খাজা-ই-জাহান উপায়ান্তর না দেখে ফিরোজের বশ্যতা স্বীকার করে নেন। ফিরোজ প্রথমে তাঁকে ক্ষমা প্রদর্শন করেন ; কিন্তু পরে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন। দিল্লীতে প্রবেশ করে একুশদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁর অভিষেক ক্রিয়া পালন হয়।

○ ফিরোজের অর্থনৈতিক সংস্কার ও জনহিতকর কার্যাবলী ঃ

ফিরোজ তুঘলকের রাজত্বকাল সামরিক কর্তৃত্ব বা সাফল্যের দিক থেকে ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, যতটা গুরুত্বপূর্ণ অভ্যন্তরীণ সংস্কার বা জনহিতকর সামাজিক কর্মসূচীর দিক থেকে। ফিরোজ যখন সিংহাসনে বসেন তখন তাঁর বয়স চল্লিশ অতিক্রান্ত। মহম্মদ তুঘলকের সঙ্গী হিসেবে তিনি দেখেছেন কিভাবে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষোভ মুসলমানদের কাছ থেকে সুলতানকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। কিভাবে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। তাই ফিরোজ প্রথম থেকেই ধর্মীয় নেতা ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ অভিজাতদের প্রতি তোষণ-নীতি অনুসরণ করতে থাকেন। দীর্ঘ সাঁইত্রিশ বছরের শাসনকালে তিনি এমন কিছু সংস্কার-কর্মসূচী গ্রহণ করেন যা তাঁর সামরিক দুর্বলতাকে ঢেকে দিতে পারে। তাঁর কিছু সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে ছিল যুগোত্তীর্ণ। রাজ্যজয় দ্বারা গৌরব অর্জনের পরিবর্তে জনকল্যাণমুখী দ্বারা প্রজাসাধারণের সুখ-শান্তি প্রতিষ্ঠাকে তিনি অধিক গুরুত্ব দেন। ড. *রমেশচন্দ্র মজুমদার* লিখেছেন ঃ *"He was probably the first Muslim ruler in India, who regraded the promotion of material welfare of subjects as a more important duty of the king than wars and conquests."* ফিরোজের এই কাজে প্রধান সহায়ক ছিলেন তাঁর প্রধানমন্ত্রী খান-ই-জাহান মকবুল। তেলেঙ্গানার ব্রাহ্মণবংশজাত এই ধর্মান্তরিত হিন্দু ছিলেন বিচক্ষণ ও দক্ষ প্রশাসক। সুলতান প্রকাশ্য সভায় এঁকেই প্রকৃত সুলতান বলে সম্মানিত করতেন। প্রতিদানে ইনিও স্বার্থশূন্য ভাবে সুলতান ফিরোজের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির কাজে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সঁপে দিয়েছিলেন। সুলতানের কর্তব্য হিসেবে ফিরোজ শাহ যে উচ্চ আদর্শ পোষণ করতেন, তার বহু উল্লেখ সমসাময়িক রচনা থেকে পাওয়া যায়। সামস-ই-শিরাজ আফিফ-এর 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী, এবং ইয়াহিয়া শিরহিন্দের *'তারিখ-ই-মুবারকশাহী'* গ্রন্থে ফিরোজকে তাঁর উদারতা ও আদর্শবাদের জন্য একজন মহান ও সফল শাসক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ফিরোজ তুঘলক স্বয়ং তাঁর *'ফুতুহ-ই-ফিরোজশাহী'* গ্রন্থে তাঁর রাজাদর্শের কথা উল্লেখ করেছেন। *'তাবাকত্-ই-আকবরী'* গ্রন্থের মতে, ফিরোজের 'ফতোয়াৎ' হলো একটি অনুশাসন যা প্রধানত সুন্নী-গোষ্ঠীভুক্ত মুসলমানদের জন্য জামা-মসজিদে উৎকীর্ণ করা আছে। এখানে ফিরোজ অতীতে অপরাধীদের, বিশেষত মুসলমানদের উপর অঙ্গচ্ছেদ, অগ্নিদগ্ধ করা, জীবন্ত চামড়া খুলে নেওয়া ইত্যাদি নৃশংস শাস্তিবিধানের জন্য দুঃখপ্রকাশ করেছেন এবং দয়ালু ঈশ্বর কর্তৃক নির্দিষ্ট পুরুষ হিসেবে মুসলমান ও অন্যান্যদের উপর এই অন্যায় জুলুম বন্ধ করার দায়িত্ব স্বীকার করেছেন। ফিরোজ এখানে মূলত মুসলমানদের কথা উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে ড. *নিজামী* লিখেছেন যে, এই সকল শাস্তি দেওয়া হত প্রধানত দুটি অপরাধের জন্য—বিদ্রোহ এবং সরকারি অর্থ প্রদান না করা। এবং একাজে অংশ নিত প্রধানত মুসলমানরা। তাই ফিরোজ কেবল মুসলমানদের কথাই উল্লেখ করেছেন। ফিরোজ এইসকল অত্যাচার নিষিদ্ধ করেন এবং

অরাজনৈতিক অপরাধীদের বিচারের দায়িত্ব কাজীর উপর ন্যস্ত করেন। কিন্তু ফিরোজ চুরি, রাহাজানি, হত্যা ইত্যাদির জন্য বিকল্প শাস্তির উল্লেখ না-করার ফলে স্বাভাবিকভাবেই সামাজিক অপরাধ বৃদ্ধি পায়।

ফিরোজ শাহর অর্থনৈতিক কর্মসূচীর মধ্যে উদারতার ছাপ স্পষ্ট। তাঁর সিংহাসনারোহণের কালে দেশের ভূমি-রাজস্ব-ব্যবস্থা ও কর-ব্যবস্থা প্রায় পঙ্গু হয়ে পড়েছিল। প্রথমেই তিনি মহম্মদ তুঘলকের আমলে প্রদত্ত সমস্ত 'তক্‌ভী' ঋণ মকুব করার সিদ্ধান্ত নেন। এর ফলে রাজকোষ কিছুটা আঘাত পায় ঠিকই, কিন্তু জনসাধারণের মনে সুলতানের প্রতি আস্থাও স্থাপিত হয়। তিনি সমস্ত রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করেন এবং চাষীদের কাছ থেকে বেআইনী ভাবে অর্থ আদায় কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে দেন। কর আদায়ের জন্য প্রজাসাধারণের উপর দৈহিক নির্যাতনের রীতিও তিনি নিষিদ্ধ করে দেন।

বরণীর মতে, ফিরোজ উৎপাদনের ভিত্তিতে কর-ব্যবস্থা নির্ধারণ করে তাঁর রাজত্বকে দৃঢ়ভিত্তি দিয়েছিলেন। ***আফিফ*** লিখেছেন ঃ সারাদেশের জমি ও উৎপাদন সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহের ভার সুলতান খাজা হাসিমউদ্দিন জুনাইদ নামক ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করেন। জুনাইদ প্রায় ৬ বছর সারাদেশ ভ্রমণ করে দেশের বার্ষিক আয় স্থির করেন ৬ কোটি ৭৫ লক্ষ তঙ্কা। তবে জুনাইদ জমি জরিপ করে কিংবা উৎপাদনের গড় বিশ্লেষণ করে করের এই হার নির্ধারণ করেননি। মোটামুটিভাবে সহকারী কর্মচারীদের অনুমানের উপর ভিত্তি করেই এই হার নির্ধারিত হয়েছিল। তবে আফিফ সরকারি প্রাপ্য হিসেবে প্রাথমিক যে অংকের উল্লেখ করেছেন, সেটিকেই ফিরোজের রাজত্বের শেষ দিন পর্যন্ত সরকারি প্রাপ্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মোরল্যান্ড, ড. নিজামী প্রমুখ আফিফের বিবরণ সঠিক নয় বলে মনে করেন। কারণ ফিরোজ কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। ফলে কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সরকারি আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছিল। সরকারি প্রাপ্য তঙ্কা বা জিতলের হিসেবে স্থির হয়েছিল। এর কারণ সম্ভবত দেশের সর্বত্র শস্যের দাম এক ধরে নিয়ে এই হার নির্ধারণ করা হয়েছিল। মোরল্যান্ড মনে করেন, সমস্ত প্রদেশে সরকারি পাওনার পরিমাণ সমান ছিল না। কারণ স্থানীয় উৎপাদনের অর্ধেক শস্যের বাজারমূল্য রাজস্ব হিসেবে সংগৃহীত হত। যেহেতু সমস্ত অঞ্চলের উৎপাদনের হার সমান নয়, তাই শস্যমূল্য এক ধরে নিলেও প্রাপ্য রাজস্বের তারতম্য ছিল অনিবার্য।

ফিরোজ প্রজাদের করভার লাঘব করার জন্য প্রথমেই পঁচিশটি 'তুচ্ছ, বেআইনী ও অন্যায্য কর' রহিত করে দেন। ***'কেম্ব্রিজ হিস্ট্রী অফ ইন্ডিয়া'***তে বলা হয়েছে ঃ ***"Firuz abolished some twenty five vaxatious cessess mostly in the nature of octroi duties which had weighted heavily upon merchants and tradesmen."*** কিন্তু ফতোয়া-ই-ফিরোজশাহী'তে এই ধরনের ছাব্বিশটি কর মুকুবের কথা বলা হয়েছে। যাই হোক্, সুলতান ফিরোজ যে অনেকগুলি অজনপ্রিয় শুল্ক মকুব করেছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বণিকদের কাফেলার উপর অন্যায় জুলুম এবং বিনা পারিশ্রমিকে সরকারি ইট বহন করে ফিরোজাবাদ শহর নির্মাণে সহযোগিতা করার রীতি বহিরাগত বণিকদের মধ্যে ক্ষোভ সঞ্চার করেছিল। শুল্ক বিভাগের কর্মচারীদের অসততা ও অর্থ-আত্মসাতের বিষয়টিও সুলতানের জ্ঞাত ছিল। বণিকদের অসন্তোষ

প্রশমন এবং শুল্ক-কর্মচারীদের অসাধুতা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ফিরোজ শাহ্ শরিয়তে উল্লেখ নেই এমন সমস্ত কর বিলোপ করে দেন।

রাজকোষে অর্থাগমের জন্য তিনি শরিয়তের নির্দেশ মোতাবেক খরাজ, জাকৎ, জিজিয়া ও খামস—এই চার প্রকার কর বহাল রাখেন। 'খরাজ' বা ভূমিরাজস্ব ছিল কোষাগারের আয়ের প্রধান উৎস। সাধারণভাবে উৎপাদনের এক-দশমাংশ খরাজ হিসেবে গ্রহণ করা হত। আলাউদ্দিন খলজীর আমলে ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ ছিল মোট উৎপাদনের অর্ধেক। এই বিচারে ফিরোজের সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে কৃষি উৎপাদকশ্রেণীর কষ্ট অনেকটাই লাঘব করেছিল। 'জাকৎ' হলো মুসলমানদের দেয় সম্পত্তি-কর। মোট সম্পত্তির উপর দুই থেকে আড়াই শতাংশ হারে এই কর দিতে হত। সাধারণভাবে এই অর্থ দরিদ্র মুসলমান ও ইসলাম ধর্মের কাজে ব্যয় করা হত। 'জিজিয়া' হলো অ-মুসলমানদের উপর আরোপিত একপ্রকার ধর্ম-কর। পবিত্র গ্রন্থে অবিশ্বাসীদের 'জিম্মি' বা সুরক্ষিত নামে উল্লেখ করা হয়েছে। একটি মুসলিম রাষ্ট্রে এই সুরক্ষা বা নিরাপত্তার বিনিময়ে অবিশ্বাসীদের উপর জিজিয়া কর আরোপ করা হয়। অবশ্য এই কর প্রদানের কারণে অ-মুসলমান 'জাকৎ' প্রদান থেকে রেহাই পেত এবং তাদের ক্ষেত্রে সামরিক বাহিনী বা যুদ্ধে যোগদান বাধ্যতামূলক ছিল না। ইতিপূর্বে ব্রাহ্মণরা জিজিয়া প্রদান থেকে রেহাই পেতেন। কিন্তু ফিরোজ শাহ্ ব্রাহ্মণদের উপরেও জিজিয়া আরোপ করেন। আয়ের ভিত্তিতে অ-মুসলমানদের তিনটি স্তরে ভাগ করে তিনটি হারে জিজিয়া আদায় করা হত। রাজত্বের মাঝামাঝি সময়ে ফিরোজ উলেমাদের অনুমোদনক্রমে একটি সেচ-কর আরোপ করেছিলেন। সরকারি উদ্যোগে যে-সকল জমি সেচের অন্তর্ভুক্ত ছিল সেগুলির উৎপাদনের এক-দশমাংশ সেচ-কর হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়।

আফিফের বিবরণ থেকে জানা যায়, ফিরোজ সামরিক ও অসামরিক কর্মচারীদের জীবিকার জন্য তঙ্কার বিনিময়ে তাদের ভূমি-রাজস্ব বিলি-বণ্টন করে দেন। ১০ হাজার, ৫ হাজার ও ২ হাজার তঙ্কা বেতনের পরিবর্তে সমপরিমাণ রাজস্বের জমি তিনি সরকারি কর্মচারী, বিশেষত সেনাবাহিনীর সদস্যদের বিলিবন্দোবস্ত দেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ফিরোজের পূর্ববর্তী কোন সুলতানই কর্মচারীদের নগদ বেতনের পরিবর্তে ভূমি-রাজস্ব বণ্টনের নীতি নেননি। আলাউদ্দিন স্পষ্টতই এই ব্যবস্থার বিরোধী ছিলেন। কারণ কোন গ্রাম কোন বিশেষ কর্মচারীদের অধীনে বন্দোবস্ত থাকলে সেই গ্রামের বসবাসকারী মানুষেরা উক্ত সরকারি কর্মীর অধীনে ও নেতৃত্বে রাজদ্রোহী হতে পারত। *আফিফ* লিখেছেন ঃ ফিরোজ দেশের সমস্ত গ্রাম, জেলা (খাতাত) এবং শহর সেনাদের মধ্যে বিলি করে দিয়েছিলেন। অধ্যাপক নিজামীর মতে, আফিফের এই বিবরণ তাঁর অজ্ঞতা ও মূর্খামির ফল। *নিজামীর* মতে, ফিরোজের আমলেও সরকারি কর্মচারীরা রাজস্ব আদায় করত। যে সকল সামরিক কর্মী বেতন হিসেবে জমির রাজস্ব বন্দোবস্ত পেতেন, তাঁরা সুলতানের নির্দেশনামা (ইত্‌লাক) দেখিয়ে নির্দিষ্ট জমির রাজস্ব আদায়কারীর কাছ থেকে সংগ্রহ করতেন। সাধারণভাবে আদায়ীকৃত রাজস্বের অর্ধাংশ কর্মচারীর বেতন হিসেবে দিতে হত। অর্থাৎ খাজনা আদায়ের ব্যাপারে assignee বা স্বত্বাধিকারী-সরকারি কর্মীর (সৈন্য) কোন ভূমিকা ছিল না। আফিফ নিজেই উল্লেখ করেছেন যে, সৈন্যরা অনেক ক্ষেত্রে নগদ অর্থে বেতন পেত। অবশ্য রাজস্বের স্বত্বাধিকারী ইচ্ছা করলে তাদের 'ইত্‌লাক' দালালের কাছে অল্প দামে

বিক্রি করে দিতে পারত। এর ফলে একশ্রেণীর দালাল প্রচুর অর্থ রোজগার করতে সক্ষম হয়েছিল।

অসামরিক কর্মচারীরা প্রাপ্ত বন্দোবস্তের অধীনে রাজ্যাংশের শাসন-দায়িত্বও পালন করতেন,—যা সামরিক কর্মীরা করতেন না। সরকারি কর্মী ছাড়া উলেমা, বিদ্বান, ধর্মীয় স্থান, প্রাক্তন কর্মী ইত্যাদিও দান-খয়রাত হিসেবে ভূমি-রাজস্ব বন্দোবস্ত ভোগ করতেন। সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নয়, এমন কোন কর আদায় না-করার বিষয়ে ফিরোজ রাজস্ব-কর্মচারীদের কঠোর নির্দেশ দেন। কয়েকটি অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য-শুল্কও ফিরোজ রহিত করে দেন।

আফিফের মতে, ফিরোজের রাজস্ব-সংস্কারের ফলে দেশ ও সাধারণ মানুষ উপকৃত হয়েছিল। তাঁর মতে, *'প্রজাদের গৃহ শস্য, সম্পদ, স্বর্ণ, অশ্ব ও মহার্ঘ আসবাবে পরিপূর্ণ থাকত। প্রত্যেক রমণী স্বর্ণ বা রৌপ্যালংকারে ভূষিতা থাকতেন। প্রত্যেকের ঘরে শোভা পেত মহার্ঘ আসবাব।'* আফিফের মতে, এই সুফল কেবল শহর নয়, সমগ্র দেশেই সম্প্রসারিত হয়েছিল। কিন্তু ***নিজামী*** মনে করেন, ফিরোজের এই ব্যবস্থা সাধারণ প্রজাকে সরকারি কর্মচারীদের লোভ ও শোষণের শিকারে পরিণত করেছিল। তারা ইচ্ছামত অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় করে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পেরেছিল এবং এটিই ছিল সুলতানির পতনের অন্যতম একটি কারণ।

অর্থনৈতিক কর্মসূচীর অন্যতম অঙ্গ হিসেবে ফিরোজ সেচব্যবস্থার উন্নয়নে ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। তিনি পাঁচটি অতি গুরুত্বপূর্ণ খাল খনন করেন। ১৫০ মাইল দীর্ঘ একটি খাল কেটে যমুনা নদী থেকে হিসার-এ জল আনা হয়। শতদ্রু থেকে ঘর্ঘরাতে জল আনার জন্য কাটা হয় প্রায় ৯৬ মাইল দীর্ঘ একটি খাল। সিরমুর উপত্যকা থেকে একটি খাল টানা হয় হান্সী পর্যন্ত। অন্য দুটি খাল কাটা হয় যথাক্রমে ঘর্ঘরা থেকে ফিরোজাবাদ এবং যমুনা থেকে ফিরোজাবাদ পর্যন্ত। এছাড়া দেড় শতাধিক কূপ খনন করে তিনি কৃষি-সেচ ও পানীয় জলের সুরাহা করেন। এই সকল সেচ-পরিকল্পনার ফলে কৃষি-উৎপাদনের এলাকা অনেকটাই বৃদ্ধি পায় এবং সরকারি কোষাগারের আয়ও বৃদ্ধি পায়।

সুনির্মাতা হিসেবেও ফিরোজ তুঘলক কম কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন না। ***ফেরিস্তার*** মতে, ফিরোজ ৫০টি বাঁধ, ৪০টি মসজিদ, ৩০টি কলেজ, ২০টি প্রাসাদ, ১০০টি সরাইখানা, ২০০টি শহর, ৩০টি জলাধার, ১০০টি চিকিৎসালয়, ৫টি সমাধি-সৌধ, ১০০টি স্নানাগার, ১৫০টি সেতুসহ অসংখ্য বাগিচা, বিনোদন-গৃহ ইত্যাদি নির্মাণ করেন। ফিরোজ শাহ নির্মিত শহরগুলির মধ্যে অন্যতম হলো ফিরোজাবাদ, ফতেয়াবাদ, হিসার, জৌনপুর, ফিরোজপুর ইত্যাদি। আফিফ তাঁর রচনায় ফিরোজাবাদ শহরের বিশালতা ও বৈভবের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বর্তমান নিউ দিল্লীর কোটলা ফিরোজ শাহ সেই সমৃদ্ধ নগরের অংশবিশেষ বলে চিহ্নিত হয়। নির্মাণকার্যে ফিরোজের প্রধান সহায়ক ছিলেন তাঁর প্রধান স্থপতি মালিক গাজী সাহানা। স্থাপত্যকর্মে নিজের একান্ত অনুরাগ সম্পর্কে বর্ণনা প্রসঙ্গে ***ফিরোজ*** লিখেছেন ঃ *"ঈশ্বর আমার উপর যে সকল গুণাবলী সম্প্রসারিত করেছেন, তার মধ্যে অন্যতম হল নির্মাণের একান্ত ইচ্ছা। সেজন্য আমি বহু মসজিদ, বিদ্যালয় ও ধর্মক্ষেত্র নির্মাণ করেছি, যেখানে ত্যাগী, পবিত্র জ্ঞানীগণ ঈশ্বরের আরাধনা করতে এবং নির্মাতাদের জন্য প্রার্থনা জানাতে পারেন।"* ঐতিহাসিক উলসী হেগ নির্মাতা হিসেবে ফিরোজের দক্ষতা ও কৃতিত্বকে রোমক সম্রাট আগস্টাস-এর সাথে তুলনা

করেছেন। ড. *স্মিথও* (V. A. Smith) মনে করেন যে, পূর্বসূরীদের নির্মাণকর্মকে রক্ষা করার যে সহজাত অনাগ্রহ এশীয় রাজাদের ছিল, ফিরোজ তা অতিক্রম করতে সক্ষম হন এবং তাঁর পূর্বসূরীদের নির্মিত স্থাপত্যকর্মগুলিকে সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের দিকে বিশেষ নজর দেন। *("Asiatic kings, as a rule show no interest in buildings erected by their predecessors,......Firuz Shah was peculiar in devoliting much attention to the repair and re-building of the structures of the former kings. ....giving the resotoration of those buildings the priority over his own construction.")*

শাসনতন্ত্রকে ফিরোজ এক 'প্রজাহিতকর মিশন' বলে গণ্য করতেন। তাই প্রজাদের বৈষয়িক উন্নয়নের পাশাপাশি সরকারি উদ্যোগে দুঃখী ও দুঃস্থদের সামাজিক ও নৈতিক দায়বদ্ধতার ভার লাঘবের চেষ্টা করেন। মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের আমলে রাজনৈতিক কারণে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে তিনি সরকারি সাহায্য দেন এবং শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে 'মার্জনা-পত্র' সংগ্রহ করে সেগুলিকে মহম্মদ তুঘলকের সমাধির পাশে রাখেন, যাতে ঈশ্বর মহম্মদের কৃত-অপরাধ মার্জনা করেন। ড. *রমেশচন্দ্র মজুমদারের* মতে, এটি ফিরোজের কোমল ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ মনোভাবের অন্যতম নিদর্শন। তিনি লিখেছেন ঃ *"There is however, no doubt that in doing this Firuz was actuated by a spirit of piety and benevolence rarely witnessed among the rulers of the age."* এই মানবিকতা ও মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছিল তাঁর আরো কয়েকটি প্রজাকল্যাণমূলক কাজের মধ্যে। জনসাধারণের চিকিৎসার জন্য তিনি দিল্লীতে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। 'দার-উল্-সিফা' নামক এই চিকিৎসালয়ে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ঔষধ বিতরণের ব্যবস্থা ছিল। এই হাসপাতালের ব্যয়নির্বাহের জন্য সুলতান কয়েকটি গ্রামের রাজস্ব স্থায়িভাবে বরাদ্দ করেছিলেন। সম্ভবত, রাজ্যের অন্যত্র এ ধরনের আরো কয়েকটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়েছিল। দুঃস্থ পরিবারের বিবাহযোগ্য মেয়েদের বিবাহে অর্থসাহায্য প্রদানের উদ্দেশ্যে সুলতান 'দেওয়ান-ই-খয়রাত্' নামে একটি দপ্তর গঠন করেন। এখান থেকে অনাথ ও দুঃস্থ বিধবাদেরও অর্থসাহায্য দেওয়া হত। এছাড়া দেশের যোগ্য ব্যক্তিদের অর্থসাহায্য করার জন্য 'দেওয়ান-ই-হস্তিহক' নামে আরো একটি দপ্তর স্থাপন করেন। *আফিফ* লিখেছেন ঃ প্রতি বছর এই দপ্তর থেকে প্রায় ৪,২০০ ব্যক্তি সাহায্য পেতেন এবং বরাদ্দের পরিমাণ ছিল প্রায় ৩৬ লক্ষ টাকা। বেকার যুবকদের চাকুরির সংস্থান করে দেওয়ার দিকেও তিনি দৃষ্টি দেন। দিল্লীর কতোয়ালকে তিনি বেকার যুবকদের একটি তালিকা প্রস্তুত করার নির্দেশ দেন এবং যোগ্যতা অনুসারে চাকুরিতে নিয়োগের ব্যবস্থা করেন।

বিদ্যাচর্চা ও বিদ্বান ব্যক্তির প্রতি ফিরোজের অনুরাগের অভাব ছিল না। ব্যক্তিগতভাবে ফিরোজ শাহ জ্ঞানচর্চায় আন্তরিকভাবে আগ্রহী ছিলেন। আগ্রহী ব্যক্তিদের জ্ঞানান্বেষণে যাতে বাধা না পড়ে, সেদিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল। বিদ্যানুশীলনের জন্য তিনি বহু মাদ্রাসা এবং কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। রাজকোষ থেকে পণ্ডিত ব্যক্তিদের নিয়মিত অর্থ সাহায্যেরও ব্যবস্থা করেন। ইতিহাস-চর্চার প্রতি তাঁর আন্তরিক আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। তাঁর উৎসাহে জিয়াউদ্দিন বরণী এবং সামস্-ই-সিরাজ আফিফ যথাক্রমে 'ফুতুহ-ই-জাহান্দারী' ও 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী' গ্রন্থ দুটি রচনা করেন। ইতিহাসমূলক উপাদানে সমৃদ্ধ এই গ্রন্থ দুটিকে সমকালীন ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য

উপাদান হিসেবে গ্রহণ করা হয়। তাঁর বিদ্যানুরাগের আর একটি প্রমাণ হিসেবে বলা যায় যে, নগরকোট অভিযানের শেষে প্রায় ৩০০টি সংস্কৃত গ্রন্থ তাঁর দখলে আসে। সুলতান সেই অমূল্য পুঁথিগুলিকে সযত্নে একটি পাঠাগারে সংরক্ষিত করেন। আজাজউদ্দিন খালিদ ঘানী নাম্নী জনৈক পণ্ডিতের সাহায্যে বেশ কয়েকটি সংস্কৃত পুঁথি তিনি ফার্সীতে অনুবাদ করেন। এগুলি 'দালাল-ই-ফিরোজশাহী' নামে সংকলিত হয়। সরকারি ব্যয়ে বিদেশ থেকে পণ্ডিতদের এনে শিক্ষাদানের কাজে নিয়োগ এবং শিক্ষার্থীদের অনুদান মঞ্জুর করার ব্যবস্থা ফিরোজ শাহ্-র আন্তরিক শিক্ষানুরাগের পরিচয় দেন।

○ সামরিক কর্মসূচী ঃ

প্রকৃতিগতভাবে ফিরোজ শাহ ছিলেন শান্তিপ্রিয় মানুষ। একজন সমর-নায়কের যে সকল গুণাবলী আবশ্যিক, সেগুলি তাঁর ছিল না। সম্ভবত সে বিষয়ে ফিরোজ সচেতন ছিলেন। তাই দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিকে পুনর্বার দিল্লীর অন্তর্ভুক্ত করার কোন চেষ্টা তিনি করেননি। তাছাড়া সুলতানের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্য রাজ্যবিজয়ের নামে সমধর্মী মুসলমানদের রক্তপাত ও হত্যাকাণ্ডকে তিনি প্রকৃত ইসলামীয় আচরণের পরিপন্থী বলে বিবেচনা করতেন। এই কারণে সামরিক অভিযান কর্মসূচী তাঁর আমলে বিশেষ গুরুত্ব পায়নি। তবে রাজধানীতে থেকে কয়েকটি অঞ্চলকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য তিনি কয়েকটি সামরিক অভিযান চালান।

ফিরোজ শাহ ১৩৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রথম সামরিক অভিযান চালান। বাংলার শাসক হাজী ইলিয়াস শাহ ইতিমধ্যে *'সুলতানসামস্উদ্দিন ইলিয়াস শাহ'* উপাধি নিয়ে স্বাধীন শাসনের সূচনা করেছিলেন। ফিরোজ শাহ সসৈন্যে বাংলায় উপস্থিত হলে সামস্উদ্দিন দুর্ভেদ্য একডালা দুর্গের* ভিতর থেকে প্রতিরোধ চালিয়ে যান। শেষ পর্যন্ত ফিরোজ শাহ অভিযান অসমাপ্ত রেখেই রাজধানীতে ফিরে আসতে বাধ্য হন (১৩৫৫ খ্রীঃ)। ড. *স্মিথের* মতে, ফিরোজ শাহ বাংলার প্রতিরোধ ভেঙে ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু দুর্গের অবস্থানকারী শিশু, নারী ইত্যাদির ক্রন্দনধ্বনিতে বিচলিত হয়ে তিনি অভিযান বন্ধ করে দেন। তাছাড়া, মুসলমান হয়ে মুসলমানের রক্তপাতেও তিনি আগ্রহী ছিলেন না। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, আসন্ন বর্ষাঋতুর বিপজ্জনক দিকটি ফিরোজকে অভিযান অসমাপ্ত রাখতে বাধ্য করে। যাই হোক্, ফিরোজ বাংলার অভিযান অসমাপ্ত রেখে প্রত্যাবর্তন করে পরোক্ষভাবে বাংলার স্বাধীনতা স্বীকার করে নেন। ড. ***রমেশচন্দ্র মজুমদার*** লিখেছেন যে, ১৩৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ফিরোজ শাহ এবং ইলিয়াস শাহের মধ্যে দূত ও উপঢৌকন বিনিময় হয় এবং উভয়েই নিজ নিজ অবস্থান মেনে নেন।

ইলিয়াস শাহের পুত্র সিকন্দর শাহের আমলে ফিরোজ শাহ তুঘলক আবার বাংলাদেশ আক্রমণ করেন (১৩৫৯ খ্রীঃ)। সিকন্দরও তাঁর পিতার মতই একডালা দুর্গে আশ্রয় নেন। ফিরোজ বহু দিন দুর্গ অবরুদ্ধ রেখেও দুর্গ দখল করতে ব্যর্থ হন। শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষই ক্লান্ত হয়ে সন্ধি স্থাপন করে। আফিফের মতে, সিকন্দর শাহ প্রথমে সন্ধির প্রস্তাব দেন। কিন্তু ড.

** সম্ভবতঃ গৌড় নগরীর পাশে গঙ্গাতীরে এই দুর্গটির অবস্থান ছিল।*

মজুমদারের মতে, একথা সর্বাংশে সত্য নয়। কারণ এই সন্ধি থেকে ফিরোজ কোনভাবেই লাভবান হননি। পরন্তু তিনি সিকন্দর সাহের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নেন এবং সমকক্ষ রাজার মতই দূত ও উপঢৌকন বিনিময় করেন। দ্বিতীয়বার বাংলা অভিযানের সময় ফিরোজ শাহ কনৌজ ও অযোধ্যার মাঝে গোমতীর তীরে জৌনপুর নামে একটি নতুন শহরের পত্তন করেন।

বাংলা থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে জৌনপুরে উপস্থিত হয়ে ফিরোজ শাহ্ জাজনগর (উড়িষ্যা) আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। সম্ভবত, জগন্নাথধাম পুরী দখল করাই তাঁর এই আকস্মিক সিদ্ধান্তের প্রধান কারণ ছিল। আফিফ-এর গ্রন্থ থেকে এই অভিযানের করুণ চিত্র পাওয়া যায়। একপ্রকার বিনা প্রতিরোধে বহু সাধারণ রক্ষীকে হত্যা করে সুলতানি ফৌজ উড়িষ্যায় প্রবেশ করে। রাজা তৃতীয় ভানুদেব ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে দুর্গম জঙ্গলে আত্মগোপন করেন। ফিরোজ শাহ্ পুরীর জগন্নাথ মন্দির আক্রমণ করে মূর্তিগুলি ভেঙে চুরমার করে দেন। পুরী থেকে সুলতানি বাহিনী চিল্কা হ্রদের নিকট উপস্থিত হয়। এখানে তখন আশ্রয় নিয়েছিল প্রায় এক লক্ষ ভীতি-বিহ্বল হিন্দু নরনারী। ফিরোজ নির্বিচারে সেই সকল নিরস্ত্র, নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করেন (*"The Sultan converted the island into a basin of blood by massacre of the unbelievers."— quoted from Afif*)। বহু নারীকে ক্রীতদাসী হিসেবে সৈন্যদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত উড়িষ্যার রাজা সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করে সন্ধির প্রস্তাব দেন। বাৎসরিক কিছু হাতি ও অর্থ দিতেও ভানুদেব রাজী হন। ফিরোজ শাহ এই প্রস্তাব মেনে নেন এবং অবরোধ তুলে নিয়ে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করার সিদ্ধান্ত নেন।

জনৈক আধুনিক গবেষক ফিরোজ শাহের এই অভিযানের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ *"it was an audacious campaign, briliantly conceived and mightily executed....the successful execution of this campaign testifies to Firuz's undoubted skill as a general."* বস্তুত, একটা সামরিক অভিযানের গুরুত্ব বহুলাংশে নির্ভর করে সেই অভিযানের উদ্দেশ্য ও পরিণতির উপর। ফিরোজ শাহ্ তুঘলকের এই আকস্মিক জাজনগর অভিযান উপরোক্ত দুটি দিক থেকেই ছিল দুর্বল ও নিষ্ফলা। এই অভিযানের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে আফিফ এবং আইন-উল্-মুল্ক লিখেছেন যে, উড়িষ্যার বিখ্যাত জগন্নাথদেবের মন্দির ধ্বংস করা, অবিশ্বাসীদের শায়েস্তা করা এবং হাতিসংগ্রহের জন্য সুলতান জাজনগর আক্রমণ করেছিলেন। (*"The object of the expedition was to break the idols, to shed the blood of the enemies of islam, (and) to hunt elephants."*)। সাম্প্রতিক কোন কোন গবেষক প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, ফিরোজের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হাতি শিকার করা, অন্যান্যগুলি এসেছে প্রসঙ্গক্রমে এবং ঘটনাচক্রে। কিন্তু ড. *মজুমদার* মনে করেন, এটি ফিরোজের চরিত্রকে উজ্জ্বল করার একটা ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র। কারণ একজন উদাসী শাসকের পক্ষে এত দুর্গম অঞ্চলে শুধুমাত্র হাতি শিকারের জন্য অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিল না। পরন্তু এটি প্রমাণিত সত্য যে, তিনি পুরীর জগন্নাথ-মন্দির ধ্বংস করেছেন এবং বহু হিন্দুকে হত্যা করেছেন। এমনকি উড়িষ্যা দখল করাও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। তার প্রমাণ গজপতিদের বশ্যতা স্বীকার করার পরেও ফিরোজ সেখানে সুলতানি শাসন কায়েম করার চেষ্টা করেননি। তাই ধরে নেওয়া যায় যে, জগন্নাথের মন্দির ধ্বংস করা এবং হিন্দুদের শাস্তি দেওয়াই ছিল ফিরোজের উড়িষ্যা অভিযানের মূল লক্ষ্য

*(—"The destruction of the temple of Jagannatha and the chastisement of the Hindus were the main objects. The subjugation of Orissa and the elephant-hunting were at best subsidiary issues"—**Dr. Majumdar**)*। তাই উদ্দেশ্যের দিক থেকে এই পরিকল্পনার মধ্যে মহৎ কিছু ছিল না। পরিণতির দিক থেকেও এই অভিযান ছিল ব্যর্থ। উড়িষ্যা থেকে ভৌমিক কোন লাভ সুলতানের হয়নি। বহু অর্থ, সময় ও সৈন্যর প্রাণের বিনিময়ে তিনি পেয়েছিলেন কিছু হাতি ও সামান্য অর্থের প্রতিশ্রুতি। তাছাড়া, ***আফিফ*** লিখেছেন যে, জাজনগর থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় সুলতান পথ হারিয়ে উড়িষ্যার গভীর জঙ্গলে অসহায়ভাবে ছয় মাস অতিবাহিত করেছিলেন। এই সময় রসদের অভাব ঘটে এবং বহু সেনা মারা যায়। ড. ***মজুমদারের*** ভাষায় বলা চলে, *"It was neither planned nor executed in a manner worthy of a skillful general."*

১৩৬১ খ্রীষ্টাব্দে নগরকোট (কাংড়া)-এর বিরুদ্ধে ফিরোজ শাহ্ একটি অভিযান প্রেরণ করেন। কয়েকমাস অবরোধের পর তিনি কাংড়া দুর্গটি দখল করতে সক্ষম হন। এখানে হিন্দুদের 'জাওলামুখী মন্দির' লুঠ করে তিনি বহু অর্থ ও তিন শতাধিক সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ করেন। নগরকোটের রাজা সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করার অনুমতি পান।

পরের বছরেই ফিরোজ শাহ নিম্ন-সিন্ধু ও থাট্টার বিরুদ্ধে অভিযানে অগ্রসর হন। নিজামীর মতে, এই অভিযানটি এত বিশৃঙ্খলার সাথে পরিচালিত হয়েছিল যে, সুলতানির ইতিহাসে তার তুলনা পাওয়া যাবে না। ফিরোজ ভুলে গিয়েছিলেন যে, থাট্টাতে তার্ঘীর বিদ্রোহ দমন করতে গিয়েই মহম্মদ তুঘলক মারা গিয়েছিলেন। অবশ্য মহম্মদের মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ এবং সিন্ধুর বিদ্রোহী শাসকদের শায়েস্তা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে ফিরোজ শাহ্ প্রকৃত সুলতানের কাজই করেছেন। ৯০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য ও ৪৮০টি রণহস্তীসহ ফিরোজ সিন্ধুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। পথে একটি নৌ-বহরও গঠন করেন। কিন্তু সেনাপতি ও যোদ্ধা হিসেবে অক্ষমতার জন্য এই অভিযানটিও চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা ও ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়। সিন্ধুর জাম বনহবিনা অতি দক্ষতার সাথে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। সুলতানি অসংখ্য সৈন্য ও ঘোড়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বিভ্রান্ত সুলতান গুজরাটে পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু যুদ্ধের বিপর্যয়ের থেকেও পশ্চাদপসরণ বেশি বিপর্যয়কর হয়ে দাঁড়ায়। খাদ্যাভাব এবং অজানা রোগে বহু সৈন্য ও ঘোড়া মারা যায়। কচ্ছের রাণ-এলাকায় পানীয় জলের অভাবেও অনেকের প্রাণনাশ ঘটে। প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে কোনক্রমে সুলতান গুজরাটে পৌঁছাতে পারেন। গুজরাটে ফিরোজ আবার সৈন্য সংগ্রহ করেন। এই সময় বাহমনা রাজ্যের বিক্ষুব্ধ যুবরাজ বাহরাম শাহ্, ঐ রাজ্য আক্রমণ করার জন্য ফিরোজকে আমন্ত্রণ জানান। বাহমনী রাজ্যে দিল্লীর আধিপত্য স্থাপনের সুবর্ণ সুযোগ ফিরোজের সামনে উপস্থিত হয়। কিন্তু অদূরদর্শী ফিরোজ শাহ্ সিন্ধুর ব্যর্থতার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বাহমনী রাজ্য আক্রমণ থেকে বিরত থাকেন। অবশ্য দ্বিতীয় অভিযানে তিনি সফল হন। নিম্ন-সিন্ধু ও থাট্টার শাসকদ্বয় আনুগত্য প্রদর্শনসহ সুলতানকে বাৎসরিক কর দিতে সম্মত হন। আড়াই বছর পর ফিরোজ দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন।

ঠিক রাজনৈতিক কারণে নয়, কিছুটা ব্যক্তিগত আক্রোশ দ্বারা চালিত হয়ে ফিরোজ ১৩৮০ খ্রীষ্টাব্দে কাটিহার (রোহিলাখণ্ড) রাজ্য আক্রমণ করেন। কাটিহারের রাজা খরকু বদাউনের

গভর্নর সৈয়দ মহম্মদ ও তাঁর দুই ভ্রাতাকে হত্যা করেছিলেন। খরকুকে উপযুক্ত শাস্তিদানের উদ্দেশ্যে ফিরোজ শাহ সসৈন্যে কাটিহারে উপস্থিত হন এবং নির্বিচারে হিন্দুদের হত্যা করেন। ফিরোজ নির্দেশ দেন যে, পরবর্তী পাঁচ বছর একইভাবে কাটিহারকে বিধ্বস্ত করা হবে। এই নির্দেশ যথাযথ পালিত হয়। পাঁচ বছর ধরে কাটিহারের হিন্দুদের উপর ধর্মান্ধ সুলতান চরম অত্যাচার চালান। এই অত্যাচারের ফলে নিহত হয় কয়েক হাজার হিন্দু। শ্মশানে পরিণত হয় কাটিহার অঞ্চল। সমকালীন জনৈক লেখকের ভাষায় ঃ *"ঐ বছরগুলিতে এক একর জমিতেও চাষ-আবাদ হয়নি, সমস্ত মানুষ কাটিয়েছে বিনিদ্র রজনী, তিনজন সৈয়দের প্রাণের বিনিময়ে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে কয়েক হাজার নিরপরাধ হিন্দুর জীবন।"*

○ ফিরোজ শাহ তুঘলকের ধর্মনীতি ঃ

সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক একজন নিষ্ঠাবান সুন্নী মুসলমানের মতই আচরণ করতেন। তিনি নিজেকে ইসলামের অনুগত সেবক বলে ঘোষণা করেন এবং কোরান-নির্দেশিত পথে রাষ্ট্রশাসনের অঙ্গীকার করেন। সিন্ধু থেকে দিল্লী প্রত্যাবর্তনের সময়েই তিনি উলেমা ও ধর্মগুরুদের মূল্যবান ধাতু ও অর্থ প্রদানের কথা ঘোষণা করেন। শরিয়তের বিধান অনুসারে প্রায় আঠাশ প্রকার বে-আইনী শুল্ক রহিত করে দেন। অধ্যাপক মহম্মদ হাবিবের মতে, উলেমাদের চাপে পড়েই তিনি শরিয়ত-বিরোধী শুল্কগুলি নিষিদ্ধ করেন। হিন্দুদের উপর তিনি 'জিজিয়া' কর আরোপ করেন। এমনকি ব্রাহ্মণদেরও 'জিজিয়া কর' দিতে বাধ্য করেন। সুলতানের যুক্তি ছিল এই যে, শরিয়তে এমন কথা বলা নেই যে, ব্রাহ্মণরা 'জিজিয়া' থেকে মুক্ত থাকবে। তাঁর মতে, অ-মুসলমানরা সপরিবারে নিরাপত্তাসহ বসবাস করার অধিকারের বিনিময়ে এই কর দিতে বাধ্য। শরিয়তের বিধান অনুসারে 'খামস'-এর ভাগ পরিবর্তন করেন। ইতিপূর্বে খামসের তিন-চতুর্থাংশ ভাগ সুলতান নিজে নিতেন এবং এক-চতুর্থাংশ ভাগ সেনাদলকে দিতেন। শরিয়তের বিধান অনুযায়ী ফিরোজ এক-চতুর্থাংশ ভাগ সেনাদের প্রদান করেন। একজন মুসলমান সুলতান হিসেবে সমধর্মী মুসলমানের রক্তপাতকে তিনি অনৈতিক ও ইসলামের আদর্শবিরোধী বলে ঘোষণা করেন। এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রেও বিরোধী মুসলমানের হত্যাকাণ্ডকে যথাসম্ভব পরিহার করার চেষ্টা করেন। ইসলামীয় ধর্মরাষ্ট্রের আদর্শ অনুযায়ী তিনি খলিফার অনুমোদন প্রার্থনা করেন। সিংহাসনে বসার ছয় বছরের মধ্যে তিনি দু'বার খলিফার স্বীকৃতি অর্জন করেন। খলিফার প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্যের নিদর্শন হিসেবে মুদ্রায় নিজের নামের সাথে তিনি খলিফার নামও খোদাই করেন। মুসলমান শাসকদের মধ্যে ফিরোজই প্রথম নিজেকে 'খলিফার প্রতিনিধি' বা 'খলিফার নায়েব' বলে ঘোষণা করেন। ড. *আর. পি. ত্রিপাঠীর* মতে, খলিফার প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে ফিরোজ দু'টি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছিলেন। এর ফলে মুসলমান প্রজাদের কাছে তাঁর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছিল এবং ধর্মের আবরণে তিনি নিজের দুর্বলতা ঢেকে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ফিরোজ সিংহাসনে বসেই উলেমা ও মৌলবীদের প্রতি প্রশ্নহীন আস্থা জ্ঞাপন করেন। উলেমাদের ইচ্ছানুযায়ী রাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ করেন। গোঁড়া উলেমারা যে সকল রীতি বা কাজকে ইসলাম-বিরোধী মনে করতেন, ফিরোজ শাহ সেগুলি নিষিদ্ধ করেন। অধ্যাপক *সতীশচন্দ্র* মনে

করেন, ফিরোজ শাহ উলেমাদের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে মৌলবাদীদের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেন।

ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন, ফিরোজ শাহ ছিলেন গোঁড়া ও ধর্মান্ধ। এই ধর্মীয় সংকীর্ণতা তাঁর চরিত্রকে কলঙ্কিত করেছে। *ঈশ্বরীপ্রসাদ, এ. এল. শ্রীবাস্তব, আগা মেহদী* হোসেন প্রমুখ ইতিহাসবিদ্‌ও ফিরোজের ভ্রান্ত ধর্মনীতির বিরূপ সমালোচনা করেছেন। *ড. মজুমদার* লিখেছেন যে, *'ফুতুহ-ই-ফিরোজশাহী'* গ্রন্থ পাঠ করলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তাঁর চরিত্রে একজন গোঁড়া মুসলমানের দোষ-গুণের সমাবেশ ঘটেছিল। এই দোষগুলির মধ্যে প্রধান ছিল সুন্নী-ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য ধর্মমতের প্রতি অনুদারতা। তিনি মুসলমান সমাজকে দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন—সুন্নী-মুসলমান এবং অ-মুসলমান। শিয়া-সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানরাও অ-মুসলমানের পর্যায়ে বিবেচিত হত। প্রথম শ্রেণীভুক্তরাই তাঁর সহানুভূতি লাভের অধিকারী ছিল। পরন্তু, সুলতান মনে করতেন অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের বিনাশ এবং সুন্নী-মতবাদের প্রসার ঘটানোও তাঁর অন্যতম প্রধান কর্তব্য। *এ. এল. শ্রীবাস্তব* লিখেছেন যে, ফিরোজের মা ছিলেন হিন্দু রমণী। তাই হিন্দুদের বিরুদ্ধাচরণ, গোঁড়া সুন্নী-মুসলমানদের তোষণ এবং কোরান ও শরিয়তের পথে রাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ করে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে, বিশুদ্ধ তুর্কী মুসলমানদের থেকে তিনি কোন অংশে কম নন। ধর্ম এবং প্রশাসনে উলেমা, মাশাইক প্রমুখের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ার অনিবার্য ফলস্বরূপ রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র ক্ষুণ্ণ হয়। *ড. মেহদী হোসেন* লিখেছেন যে, এই উলেমারা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে ব্যর্থ হন এবং সংকীর্ণতা ও অনুদারতা দ্বারা অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়কে আহত করেন।

সমকালীন গ্রন্থে উল্লেখিত কয়েকটি ঘটনা ফিরোজ শাহের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বহন করে। হিন্দুদের উপর 'জিজিয়া কর' আরোপের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ব্রাহ্মণদেরও তিনি এই কর প্রদানে বাধ্য করেন, যদিও ইতিপূর্বে ব্রাহ্মণদের কখনোই এই কর দিতে হত না। এর প্রতিবাদে ব্রাহ্মণদের একটি প্রতিনিধিদল আত্মহত্যার হুমকি দিলে সুলতান সানন্দে তা পালন করতে বলেন। অবশ্য পরে তিনি এই আদেশ সামান্য সংশোধন করেন। ব্রাহ্মণদের পরিবার এবং বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের প্রদেয় জিজিয়ার হার কমিয়ে বার্ষিক দশ তংকা ৫০ জিতল করেন। ফিরোজ হিন্দুদের নবনির্মিত বহু মন্দির ভেঙে দেন এবং সংগঠকদের কঠোর শাস্তি দেন। হিন্দুদের ধর্মীয় মেলা উপলক্ষ্যে সমবেত মুসলমান ব্যবসায়ীদের কঠোর শাস্তি, এমনকি প্রাণদণ্ডেরও আদেশ দেন। ফিরোজ নিজেই উল্লেখ করেছেন যে, মন্দির নির্মাণের অপরাধে তিনি কয়েকজন সংগঠককে মন্দিরের সামনেই হত্যা করেন। একটি মুসলমান রাষ্ট্রে কোন 'জিম্মি' যাতে মন্দিরনির্মাণ ও মূর্তিপূজার দুঃসাহস না দেখায়। আফিফ একটি ঘটনার উল্লেখ করে লিখেছেন যে, মূর্তিপূজার প্রচার ও মুসলমান মহিলাদের মূর্তিপূজায় আকৃষ্ট করার অভিযোগে জনৈক ব্রাহ্মণকে গ্রেপ্তার করা হয়। সুলতান ঐ ব্রাহ্মণকে শাস্তি হিসেবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ অথবা অগ্নিদগ্ধ করে হত্যার নির্দেশ দেন। ঐ ব্রাহ্মণ ধর্মত্যাগে অস্বীকৃত হলে তাকে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। লক্ষণীয় যে, কাউকে পুড়িয়ে হত্যা করা ইসলামধর্মের বিরোধী। অথচ ধর্মান্ধ ফিরোজ কোরানের একটি নির্দেশ পালন করতে গিয়ে আর একটি নির্দেশ অমান্য করেন।

অ-মুসলমানদের নানাভাবে দমনের সাথে সাথে *ফিরোজ শাহ* তাদের মধ্যে ইসলাম ধর্ম

প্রসারের কাজেও হাত দেন। তিনি লিখেছেন যে, *"আমি আমার পৌত্তলিক প্রজাদের নবীর ধর্মগ্রহণে উৎসাহিত করি এবং নির্দেশ দিই যে, যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে, তাদের 'জিজিয়া' প্রদান থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে। এই সংবাদে বহু মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং তাদের জিজিয়া থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় এবং পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত করা হয়।"* ভারতে মুসলমান আক্রমণের পর ফিরোজ শাহই প্রথম রাষ্ট্রকে ধর্মান্তরিত করার সংস্থায় পরিণত করার দুঃসাহস দেখান।

ফিরোজের সংকীর্ণ ধর্মচিন্তার প্রতিফলন দেখা যায় তাঁর অভিযানের মধ্যেও। বাংলাদেশ আক্রমণের সময় তিনি 'মুসলমানের রক্তপাত' হবে এই অজুহাত দেখিয়ে অবরোধ তুলে নেন। পুরীর জগন্নাথ-মন্দির আক্রমণ করে জগন্নাথদেবের নাসিকা ছেদন করে মূর্তিকে ভূলুণ্ঠিত করেন। নগরকোট আক্রমণকালে জাভালামুখী মন্দির ধ্বংস করেন ও মূর্তিকে অপবিত্র করেন। ফেরিস্তার বিবরণ থেকে এই মর্মস্পর্শী বিবরণ পাওয়া যায়। জাভালামুখীর মূর্তিগুলি টুকরো টুকরো করে গো-মাংসের সাথে মিশিয়ে কাপড়ে বেঁধে ব্রাহ্মণদের নাকের সামনে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। ফিরোজ শাহের এই সকল কাজ নিঃসন্দেহে বিকৃত চিন্তার ফল। ধর্মের প্রতি আনুগত্যকে তিনি নগ্ন প্রতিহিংসার পর্যায়ে নামিয়ে এনেছিলেন বলা যায়। তবে তাঁর এই আচরণের কারণ বা প্রেরণা সম্পর্কে বিতর্ক আছে। অনেকের মতে, ফিরোজ ছিলেন ধর্মান্ধ। কিন্তু সতীশচন্দ্র এর ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে, ফিরোজ জানতেন যে আলাউদ্দিন বা মহম্মদ তুঘলক উলেমাদের ক্ষমতা খর্ব করেছিলেন। ফলে এই সম্প্রদায় সর্বদা তাঁদের বিরোধিতা করে গেছেন। আলাউদ্দিন তাঁর সাহস ও শক্তির দ্বারা এই বিরোধিতাকে নস্যাৎ করেছিলেন। মহম্মদ তা হয়তো পারেননি ; কিন্তু তাঁর যুক্তিবাদী মন কোন অবস্থাতেই আপসের পথে অগ্রসর হয়নি। আলাউদ্দিনের মত সামরিক শক্তি বা মহম্মদ তুঘলকের মত যুক্তিবোধ ফিরোজ শাহের ছিল না। তাই তিনি আপসের পথ বেছে নেন। ***সতীশচন্দ্র*** লিখেছেন ঃ *"ফিরোজ রাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে উলেমা ও মোল্লাদের নির্দেশ দেবার অধিকার সম্ভবত দেননি। তবে তাদের কতকগুলি বিশেষ অধিকার তিনি মেনে নিয়েছিলেন। উলেমাদের ইচ্ছানুযায়ী মুসলিম মহিলাদের সাধুসন্তদের কবরে পূজা দিতে বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ করেন, অ-সুন্নীদের ইসলাম-বিরোধী বলে ঘোষণা করেন, ব্রাহ্মণদের উপর জিজিয়া আরোপ করেন ইত্যাদি।"* তবে সুলতানের এই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি যে সাম্রাজ্যের পক্ষে ক্ষতিকর ছিল, তা সতীশচন্দ্রও স্বীকার করেছেন। ***ড. মেহদী হোসেন*** মনে করেন, রাজত্বের শেষ পনের বছরে ফিরোজের ধর্মনীতি অতিরিক্ত অনুদার, সংকীর্ণ ও অত্যাচারমূলক হয়ে পড়েছিল। নিজেকে সাচ্চা ইসলাম প্রতিপন্ন করতে গিয়ে তিনি এমন কিছু কাজ করেছিলেন—যা তাঁর প্রজাকল্যাণমূলক সংস্কার-কর্মসূচীর সাথে আদৌ খাপ খায় না।

○ শাসক হিসেবে ফিরোজ শাহ-র মূল্যায়ন ঃ সুলতানির পতনে দায়িত্ব ঃ

সুলতান হিসেবে ফিরোজ শাহ তুঘলকের মূল্যায়নে ঐতিহাসিকেরা একমত হতে পারেননি। সাধারণভাবে ভারত-ইতিহাসে ফিরোজ শাহ প্রজাহিতৈষী শাসক হিসেবে চিহ্নিত হন। কেউ কেউ আবেগপ্রবণতার বশে ফিরোজ শাহকে *"সুলতানি যুগের আকবর"* বলেও অভিহিত করেছেন। কিন্তু তাঁর চরিত্র ও কার্যাবলী গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে এই সকল বক্তব্যের সাথে একমত

হওয়া যায় না। তাঁর শাসন-নীতিতে মৌলিক পরিবর্তনের কোন চেষ্টা করা হয়নি। পরন্তু, মধ্যযুগীয় শাসনব্যবস্থা ও সামাজিক সম্পর্কের নেতিবাচক দিকগুলিকে তিনি, অজান্তে হলেও লালন-পালন করেছেন। মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের ভ্রান্ত নীতির ফলে সাম্রাজ্যের ভিত্তি দুর্বল হয়েছে—এ সত্য বারবার উচ্চারণ করলেও ; সেই সকল সংশোধন করার নামে তিনি নতুন ভাবে এবং নতুন রূপে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতাকেই জাগরিত করেছেন। অধ্যাপক **ইউ.** *এন. দে* *লিখেছেন* : *"He was a typical product of his age, ambitious and shrewed enough to wear a mask of disinterestedness, capable of assuming false appearance of virtue and goodness...."*

প্রাথমিক ভাবে ফিরোজ শাহের স্বপক্ষেও কিছু কথা বলা যায়। দীর্ঘ ৩৭ বছর (১৩৫১-'৮৮ খ্রীঃ) তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই দীর্ঘ সময়ে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। অভ্যন্তরী-। বা বহির্দেশীয় কোন বৃহত্তর সংকট দ্বারা সুলতানি সাম্রাজ্য জর্জরিত হয়নি। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পরে তিনি এমন কিছু কাজ করেছিলেন, যা মানবতাবাদী শাসক হিসেবে তাঁকে প্রতিভাত করেছে। প্রজাদের উপর থেকে করের গুরুভার তিনি অনেকটা লাঘব করেন। প্রায় চব্বিশ প্রকার উপকর ও উপশুল্ক বিলোপ করেন। সেচব্যবস্থার সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধি করেন। আলাউদ্দিনের মত দমন-নীতি প্রয়োগ ছাড়াই খাদ্যের সরবরাহ নিয়মিত রাখেন এবং দ্রব্যমূল্যের হারও ন্যায্য থাকে। তাঁর আমলে দুর্ভিক্ষ বা অনাহারে মানুষকে জর্জরিত হতে হয় না। আফিফ ফিরোজ শাহ-র আর্থিক নীতির ভূয়সী প্রশংসা করে জনসাধারণের পার্থিব সমৃদ্ধিতে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

কেউ কেউ মনে করেন, ফিরোজ শাহ রাজশক্তিকে একটি প্রজাকল্যাণকামী মিশন বলে মনে করতেন। তাঁর কয়েকটি সিদ্ধান্তে মানবতাবাদী গুণের প্রকাশ লক্ষ্য করা কষ্টকর নয়। দীন-দরিদ্র মানুষের সাহায্যার্থে, জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের আর্থিক দুরবস্থা লাঘবের উদ্দেশ্যে, দরিদ্র পিতামাতার অবিবাহিতা কন্যার বিবাহ সম্পাদনের জন্য তিনি সরকারি অর্থমঞ্জুরের ব্যবস্থা করেন। বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের সুব্যবস্থার জন্যও তিনি স্থায়ী দপ্তর প্রতিষ্ঠা করেন। শিক্ষার প্রসার ও চিকিৎসার সুব্যবস্থার জন্যও তিনি নানা পরিকল্পনা নেন। গড়ে তোলেন একাধিক দাতব্য চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয়। এই হিতবাদী চিন্তার কারণে কেউ কেউ তাঁর মধ্যে সম্রাট অশোকের ছায়া প্রত্যক্ষ করেন। তাঁর চারিত্রিক উৎকর্ষতারও অভাব ছিল না। একান্ত ধর্মনিষ্ঠ, প্রথম জীবনে রাজনৈতিক উচ্চাশাবিমুক্ত এই মানুষটি ব্যক্তিগতভাবে বিদ্যানুরাগী ছিলেন। নিজেই রচনা করেছেন অতি মূল্যবান গ্রন্থ *'ফুতুহ-ই-ফিরোজশাহী'*। অর্থ এবং উৎসাহ দিয়ে সাহিত্য-চর্চায় অনুপ্রাণিত করেছেন অন্যদের। তাঁর উৎসাহে বহু সংস্কৃত গ্রন্থ ফার্সীতে অনূদিত হয়েছে, সংকলিত হয়েছে অনুবাদ-গ্রন্থ 'দালাইল-ই-ফিরোজশাহী'।

এই সকল গুণাবলীর জন্য সমকালীন মুসলমান ইতিহাসকার বরণী ও আফিফ ফিরোজ শাহ তুঘলকে একজন *'আদর্শ মুসলমান শাসক'* বলে অভিহিত করেছেন। এঁরা ফিরোজের কাজের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতা, প্রজাকল্যাণ ও ক্ষমাশীলতার চূড়ান্ত প্রকাশ লক্ষ্য করেছেন। এঁদের বর্ণনায় আপ্লুত হয়ে *হেন্‌রী ইলিয়ট, এল্‌ফিন্‌স্টোন* প্রমুখ ফিরোজের সাথে মুঘল সম্রাট আকবরের তুলনা করে ফিরোজকে 'সুলতানি যুগের আকবর' বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু

ভি. স্মিথ, ঈশ্বরীপ্রসাদ, ড. মজুমদার, ডি. আর শর্মা প্রমুখ ইতিহাসবিদ্ এই তুলনার তীব্র বিরোধিতা করেছেন। বস্তুত, আকবরের প্রতিভা, প্রজ্ঞা, সাফল্য ইত্যাদির পাশে ফিরোজ শাহ তুঘলকের কার্যাবলীকে অত্যন্ত নিষ্প্রভ বলেই মনে হয়। আকবর ছিলেন সুযোদ্ধা, সুসংগঠক, একান্তভাবে ধর্মনিরপেক্ষ, প্রকৃত অর্থে ভারতের প্রথম জাতীয় সম্রাট। মুঘল প্রশাসনকে তিনি দিয়েছিলেন একটি সুনির্দিষ্ট ধাঁচ, যাকে 'ইস্পাত-কাঠামো' বলে অভিহিত করা হয়। ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল এবং নানা ভাষা, নানা ধর্মের লোককে ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ করে তিনি 'জাতীয় রাষ্ট্র' গড়ার চেষ্টা করেছিলেন। আকবরের ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল আদর্শভিত্তিক, প্রয়োজনভিত্তিক নয়। একাধিক মৌলিক নীতি রূপায়ণের দ্বারা তিনি একটি সুন্দর ও দৃঢ় প্রশাসনিক পরিকাঠামো গড়ে তুলেছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গিয়েছিলেন একটি দৃঢ় ও ঐক্যবদ্ধ ভারতসাম্রাজ্য। আকবরের এই বহুমুখী প্রতিভা ও গুণাবলীর সাথে ফিরোজ শাহের কৃতিত্বের তুলনাকে ঐতিহাসিক স্মিথ এক 'অবাস্তব চেষ্টা' বলে মনে করেন। ড. *মজুমদারের* ভাষায় ঃ এই তুলনা এক 'জঘন্য' প্রচেষ্টা। ড. *ঈশ্বরীপ্রসাদ* মনে করেন, আকবরের প্রতিভার এক-শতাংশও ফিরোজের মধ্যে ছিল না। তিনি লিখেছেন ঃ *"Firuz had not even a hundredth part of the genius of that great-hearted and broad-minded monarch (Akbar)."* ফিরোজের কার্যাবলী বিশ্লেষণ করলে এই মন্তব্যের সত্যতা বোঝা যায়। শাসক, সাম্রাজ্যের সংগঠক, সমরনায়ক ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা ছিল স্পষ্ট। সংস্কারক ও মানবতাবাদী হিসেবে তিনি যে কাজগুলি করেছিলেন ; তা আপাতদৃষ্টিতে কল্যাণধর্মী মনে হলেও বাস্তবে সেগুলিই দিল্লী-সুলতানির ভিতকে দুর্বল করে তুলেছিল। তাই ড. *আর. পি. ত্রিপাঠী* লিখেছেন ঃ *"....the very qualities that had contributed to the popularity of Firuz were also largely responsible for the weakness of the Sultanate of Delhi."*

ফিরোজ শাহ যখন সিংহাসনে বসেন তখন দিল্লী-সুলতানির ভগ্নদশা চলছে। দক্ষিণ ভারতসহ বিস্তীর্ণ অঞ্চল চলে গেছে সুলতানির নিয়ন্ত্রণের বাইরে। অভিজাতদের অসন্তোষ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষাজনিত বিদ্রোহ, উলেমাদের সংঘবদ্ধ বিরোধিতা প্রভৃতি কারণে দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থা তখন সংকটাপন্ন। সমগ্র পরিস্থিতি সম্পর্কে ফিরোজ অবহিত ছিলেন। কিন্তু কঠোর-নীতি দ্বারা পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে তিনি নমনীয় নীতি গ্রহণ করে আপসের পথ ধরেন। ড. *ঈশ্বরীপ্রসাদ* লিখেছেন ঃ *"অবাধ্য ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী অভিজাতদের দমন করতে বা সাম্রাজ্যের সীমা সম্প্রসারিত করতে কোন উদ্যোগ ফিরোজ নেননি"* ***("Firuz did nothing to win back the allegiance of disloyal governors and to restore the way of Delhi to its former extent.")*** স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার প্রধানতম শর্ত যে 'কঠোরতা ও সুলতানের প্রতি ভীতি' তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার কোন উদ্যোগই তিনি নেননি। অভিজাতদের সন্তুষ্ট করার জন্য ফিরোজ ভূতপূর্ব সুলতানের আমলে অভিজাতদের প্রদত্ত সমস্ত সরকারি ঋণ মকুব করে দেন। নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী খাজা-ই-জাহান মকবুল বহু অভিজাতকে রাজকোষ থেকে সোনা, রূপা উপঢৌকন প্রদান করেন। ঋণের দলিলপত্র নষ্ট করে অভিজাতদের নিশ্চিন্ত করেন। এমনকি রাষ্ট্রদ্রোহিতার কারণে মহম্মদ তুঘলক যে সকল ব্যক্তি বা পরিবারকে শাস্তি দিয়েছিলেন,

ফিরোজ তাদের ক্ষতিপূরণ দিয়ে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেন। অভিজাতদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করার জন্য যে গুপ্তচরবাহিনী ছিল, তা-ও তিনি ভেঙে দেন। রাজনৈতিক অপরাধীদের দৈহিক শাস্তি প্রদানের রীতি রদ করে দেন। তাঁর এই সকল কাজ অভিজাতদের হয়তো সন্তুষ্ট করে ; কিন্তু সুলতানের কর্তৃত্বের প্রতি তাদের আস্থা ও ভীতি দূর হয়ে যায়। বলবন বা আলাউদ্দিন যে শক্তি বা Force দ্বারা সুলতানির ভিত্তি সুদৃঢ় করেছিলেন, সেই 'শক্তি' কে ফিরোজ দুর্বল করে দেন।

আলাউদ্দিন, মহম্মদ-বিন্-তুঘলক প্রমুখ জায়গির-প্রথার বিরোধী ছিলেন। কারণ এই ব্যবস্থা সামন্ততান্ত্রিক প্রবণতার জন্ম দেয় এবং কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থার ভিতকে শিথিল করে তোলে। কিন্তু ফিরোজ শাহ ব্যাপক হারে জায়গির প্রদান করেন। সামরিক, বেসামরিক উভয় শ্রেণীর কর্মী নগদ বেতনের পরিবর্তে জায়গির হিসেবে জমি ভোগ করতেন। এরা চড়া-হারে রাজস্বকে অগ্রাহ্য করে নিজেদের আর্থিক শক্তি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করতে সক্ষম হন। স্বভাবতই কেন্দ্রীয় সরকারকে অগ্রাহ্য করার একটা প্রবণতা এদের মনে জন্ম নেয়। পরন্তু, এরা অনেক ক্ষেত্রে জায়গিরের রাজস্ব নিজেরা আদায় না করে 'ইজারা' দিয়ে দেন। এই সকল ইজারাদারও প্রজাসাধারণের উপর জুলুম চালিয়ে নিজেদের শক্তিশালী করে তোলেন। ড. আর. পি. ত্রিপাঠী দেখিয়েছেন যে, ফিরোজ ভূমি-রাজস্ব আদায়ের জন্য খাসিয়া জমিগুলিকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইজারা দিয়ে দেন। বিভিন্ন সরকারি কর্মচারী, ইক্তাদার, হিন্দু, খুত্, মুকদ্দম এই ইজারা লাভ করেন। এরা রাজস্বের একটা অংশ এই কাজের বেতন হিসাবে ভোগ করতেন। কিন্তু এই শ্রেণী ক্রমে দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে ওঠে। এরা নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি রাজস্ব আদায় করলেও রাজকোষে জমা দিতেন না। অনেক ক্ষেত্রে এঁরা চুক্তির টাকা দিতে অস্বীকৃত হতেন। এঁদের অবাধ্যতা ও দুর্নীতি দূর করার কোন চেষ্টা ফিরোজ করেননি। *'আইন-ই-মহরু'* গ্রন্থে এজন্য ফিরোজের বিরূপ সমালোচনা করা হয়েছে। আফিফ লিখেছেন যে, সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তিদের প্রদত্ত জায়গির জমির উপর দয়ালু সুলতান বংশানুক্রমিক ভোগদখলের অধিকার স্বীকার করে নেন। এমনকি জায়গিরদারের মৃত্যুর পর ভারপ্রাপ্ত জায়গির জীবিত পুত্রদের মধ্যে ভাগ করে দেবার রীতিও সরকার মেনে নেয়। সরকারি 'খালিসা' জমি ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়। ফলে রাজকোষ দুর্বল হয় এবং কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতা প্রকট হয়ে ওঠে। অভিজাতরা সন্তুষ্ট হয় ; কিন্তু ক্ষীণ হয়ে আসে দিল্লী সুলতানির স্থায়িত্ব।

এই ধরনের আর একটি বড় ভ্রান্তি ছিল ফিরোজের উলেমা-প্রীতি। সিংহাসনে অধিবেশনের প্রাক্কালে তিনি মুসলিম বুদ্ধিজীবী, উলেমা প্রমুখ মুসলমান ধর্মগুরুদের জন্য ভূমিদানের আদেশ দেন। তিনি খলিফার প্রতি আনুগত্য জানান, এবং নিজেকে খলিফার ইসলামিক সাম্রাজ্যের 'রক্ষক' বা 'অছি' বলে অভিহিত করেন। উলেমাদের সন্তোষবিধানের জন্য 'শরিয়তি' আইন অনুসারে শাসন পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেন। হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর স্থাপন করেন এবং অবিশ্বাসীদের ও পৌত্তলিকদের ইসলামধর্মে দীক্ষিতকরণকে সুলতানের পবিত্র কর্তব্য বলে ঘোষণা করেন। আকবরের দূরদর্শিতা ও চিন্তার স্বচ্ছতা থেকে ফিরোজের তফাত যে কত বেশি, এই একটি কাজই তা প্রমাণ করে দেয়। এমনকি আলাউদ্দিন খলজী ও মহম্মদ-বিন্-তুঘলক ধর্মনীতির সাথে রাষ্ট্রনীতিকে জড়িত করার বিপদ সম্পর্কে যে আভাস দিয়ে গিয়েছিলেন ফিরোজ তা-ও অনুধাবন করতে পারেননি। আকবর ও আলাউদ্দিনের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রনীতির উৎসমূলে

প্রভেদ ছিল। আকবরের ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল আদর্শমূলক, আলাউদ্দিনের ক্ষেত্রে তা ছিল প্রয়োজনমূলক। কিন্তু উভয়েই বুঝেছিলেন যে, রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত রাখতে না পারলে রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ক্ষুণ্ণ হবে। অথচ ফিরোজ এই সত্য উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন, যদিও তাঁর পূর্ববর্তী শাসক উলেমাদের প্রভাবমুক্ত শাসন-প্রবর্তনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল ফিরোজের অসহিষ্ণু ধর্মীয় নীতি। হিন্দু-মন্দির অপবিত্রকরণ ও ধ্বংসসাধন এবং অ-সুন্নী সম্প্রদায়ের প্রতি রূঢ় আচরণ করে তিনি দেশের বিরাট সংখ্যক মানুষের সমর্থন ও সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হন। জনসমর্থনের পরোয়া তিনি করেননি। স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থায় সেটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সেজন্য যে শক্তি (Force) ও মনোবল প্রয়োজন, ফিরোজের তা-ও ছিল না। ফলে কেন্দ্রীয় শাসনের ভিত্তিমূল দুর্বল হয়ে সুলতানি সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব নষ্ট হয়েছিল। ড. *মজুমদার* লিখেছেন ঃ *"The active interest and influence of the Ulama and Mushaikhs in affairs of state which Firuz permitted, partly as policy and as an article of faith, was a retrograde step."* ভারতের সহনশীল ধর্মীয় ঐতিহ্য অনুধাবন করার মত চিন্তার গভীরতা ফিরোজ শাহের ছিল না। এদিক থেকে আকবরের স্থান ছিল অনেক উর্ধ্বে। এক সার্বজনীন ধর্মীয় বন্ধনে তিনি সমগ্র ভারতকে বাঁধতে চেয়েছিলেন। কোন ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ নয়, সর্বধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ছিল তাঁর নীতির মূল উৎস। তাই অধ্যাপক *শর্মা* (S. R. Sharma) লিখেছেন ঃ *"Firuz was neither an Ashoka nor an Akbar, both of whom have been noted of their religious toleration. Firuz was a fanatic like Aurangzeb..."*

সমরনায়ক ও সেনাবাহিনীর সংগঠক হিসেবেও ফিরোজ শাহ্ ব্যর্থতার পরিচয় দেন। তাঁর আলস্য ও যুদ্ধবিমুখ মন তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে থাকতে প্ররোচিত করেছিল। মহম্মদ তুঘলকের মৃত্যুর সময় সুলতানি সাম্রাজ্যের যে ভাঙন শুরু হয়েছিল, তা রোধ করার কোন চেষ্টাই তিনি করেন নি। মধ্যযুগীয় স্বৈরাচারী শাসকের ক্ষমতার মূল উৎস যে রণদক্ষতা, তার একান্ত অভাব ছিল ফিরোজের চরিত্রে। দক্ষিণ ভারতকে পুনরায় সুলতানির অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ আসা সত্ত্বেও তিনি নিঃস্পৃহ থাকেন। বিদ্রোহী বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দু'টি অভিযান করেও তিনি সেখানে সুলতানির কর্তৃত্ব স্থাপনে অসমর্থ হন। মুসলমান শিশু ও রমণীর রক্তপাত না করার অজুহাত দেখিয়ে তিনি বাংলা থেকে ফিরে আসেন। সিন্ধুর বিরুদ্ধে প্রথম অভিযানে তিনি চরমভাবে হেনস্থা হন। এমনকি পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির অভাবে কচ্ছের দুর্গম অঞ্চলে বহু সেনা ও অশ্বের মৃত্যু ঘটে। স্বভাবতই সুলতানের সামরিক নেতৃত্বের প্রতি সেনাদলের অনাস্থা জন্মে এবং তাদের মনোবল ভীষণভাবে ভেঙে যায়। তাঁর অপর দু'টি মূল অভিযান ছিল ধর্মীয় সংকীর্ণতায় আচ্ছন্ন। জগন্নাথ দেবের মন্দির ধ্বংস করার ধর্মীয় মোহ থেকে তিনি জাজনগর আক্রমণ করেণ। আর কাটিহার আক্রমণ করে মাত্র তিনজন সৈয়দের হত্যাকাণ্ডের বদলা হিসেবে তিনি কয়েক হাজার হিন্দুকে হত্যা করেন এবং অনেককে দাসে পরিণত করেন। তাঁর এই সকল কাজ আর যাই হোক্ সুলতানের সামরিক দক্ষতার পরিচয় দেয় না।

সেনাবাহিনীর সংগঠনের ক্ষেত্রেও তিনি ধারাবাহিক দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছিলেন। সামরিক সংগঠনে তিনি এমন কিছু নতুন উপাদান সন্নিবিষ্ট করেন, যা বাহিনীর কর্মদক্ষতা ও শৃঙ্খলা দ্রুত

নষ্ট করে দেয়। সৈন্যদের বেতন নগদ অর্থে দেবার পরিবর্তে ফিরোজ তাদের 'ইক্‌তা' বা জমি বন্দোবস্ত দেন। ফলে সেনাবাহিনীতে সামন্ততান্ত্রিক প্রবণতার প্রকাশ ঘটে। সুলতানকে বাহিনীর জন্য স্থায়ী আমীর মালিকদের উপর নির্ভরশীল হতে হয়। পরন্তু, সামরিক কর্মচারীদের ক্ষেত্রে বংশগত অধিকারের নীতি প্রয়োগ করে তার মেরুদণ্ড ভেঙে দেন। ইতিপূর্বে এক নির্দেশনামা জারি করে তিনি অভিজাতদের মৃত্যুর পর তার 'ইক্‌তা'র উপর ঐ অভিজাতের পুত্রের অধিকার স্বীকার করেছিলেন। পুত্রের অবর্তমানে তাঁর জামাতা এবং জামাতা না থাকলে তাঁর ক্রীতদাস ঐ সম্পত্তি পাবে বলে স্থির হয়। এই ব্যবস্থার ফলে ফিরোজের প্রশাসনে যোগ্য ব্যক্তির একান্ত অভাব প্রকট হয়ে উঠেছিল। এখন এই বিষময় বংশানুক্রমিক অধিকারের নীতি ফিরোজ সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেন। অর্থাৎ একজন সৈন্যের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র অথবা জামাতা অথবা ক্রীতদাস ঐ পদে যোগদানের অধিকার পায়। এজন্য ব্যক্তিগত যোগ্যতা বা দক্ষতা যাচাইয়ের কোন সুযোগ ছিল না। এর অনিবার্য ফল হিসেবে অদক্ষ ও অযোগ্য ব্যক্তিতে সেনাবাহিনী ভরে ওঠে এবং তার কর্মদক্ষতা ক্রমে শূন্যের কোঠায় পৌঁছে যায়। সমকালীন লেখকের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, সেনাবাহিনীর ও অশ্বের নিয়মমাফিক যোগ্যতা পরীক্ষার সময় তারা পরিদর্শকদের উৎকোচ দিয়ে অকেজো ঘোড়া চালিয়ে নিত। বদান্যতা দেখাতে গিয়ে ফিরোজ নিজেও নাকি একবার এক সৈনিককে পরিদর্শককে উৎকোচ দেবার জন্য অর্থসাহায্য করেছিলেন। দয়ালু ফিরোজ শেষ পর্যন্ত সৈন্য ও অশ্বের দক্ষতা পরিদর্শনের ব্যবস্থাটাকেই তুলে দেন। ফলে সুলতানি বাহিনীর কর্মদক্ষতা নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। *'কেম্ব্রিজ হিস্ট্রী অব ইণ্ডিয়ার'* তৃতীয় খণ্ডে লেখা আছে, *"Firuz Shah's connivance of corruption and his culpable leniency destroyed the effects of his own reforms."*

ক্রীতদাস সংগ্রহে ফিরোজ শাহের বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি প্রাদেশিক শাসকদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, কোন স্থান আক্রমণ করলে সেখানকার সুদর্শন ও সদ্বংশজাত যুবকদের বাছাই করে যেন ক্রীতদাস হিসাবে সুলতানের কাছে পাঠানো হয়। এইভাবে ফিরোজ প্রায় এক লক্ষ আশি হাজার ক্রীতদাস সংগ্রহ করেন। এই বিশাল সংখ্যক ক্রীতদাস সংগ্রহের পিছনে তাঁর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। এদের অনেককে প্রশিক্ষণ দিয়ে কারিগর হিসেবে বিভিন্ন কারখানায় নিযুক্ত করা হয়। প্রায় ১২০০ ক্রীতদাস দক্ষ কারিগর হিসেবে উৎপাদনের কাজে দক্ষতা দেখায়। অন্যদের নিয়ে তিনি এক বিশাল রক্ষীবাহিনী গড়ে তোলেন। এই ক্রীতদাস-বাহিনী সরাসরি সুলতানের নিয়ন্ত্রণে থাকে। সাময়িকভাবে এরা সুলতানের হাতকে শক্তিশালী করেছিল। কিন্তু এই ব্যবস্থার পরিণতি ভাল হয়নি। ফিরোজের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই এই সংগঠিত ক্রীতদাস বাহিনী দিল্লীর ক্ষমতাদখলের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। ফিরোজের ক্রীতদাসরা (এরা 'ফিরোজী ক্রীতদাস' নামে অভিহিত হত) নিজেদের মনোনীত ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসিয়ে ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকার চেষ্টা করে।

সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের মানবিক গুণাবলীর অভাব হয়তো ছিল না ; কিন্তু শাসক হিসেবে তিনি ছিলেন দুর্বল ও অলস। কোন মৌলিক বা সৃজনশীল কর্মপ্রেরণা তাঁর ছিল না। রাষ্ট্রকে স্থিতিশীল ও শক্তিশালী করার কোন উদ্যোগ তিনি নেননি। তাঁর সর্বোচ্চ লক্ষ্য ছিল স্থিতাবস্থা বজায় রাখা। এজন্য তিনি প্রথম থেকেই ছিলেন আপোষপন্থী। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই

তাঁর এই আপোষনীতি সুলতানির দুর্বলতা ও অক্ষমতা হিসেবে প্রকট হয়েছে। আফিফের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, বহু ক্ষেত্রে অভিজাত ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের দুর্নীতি সম্পর্কে অবহিত থেকেও ফিরোজ তার প্রতিকার করেননি। যেমন—(১) টাকশালের অধ্যক্ষ তাতার খাঁ মুদ্রায় অন্যায়ভাবে রূপার মাত্রা কমিয়ে দিত। সুলতান সব জেনেও তাকে অপসারিত করেন নি। (২) সেনাপ্রধান ইমাদ-উল্-মুল্ক (দেওয়ান ই-আর্জ) দুর্নীতি দ্বারা বহু অর্থ সং"য় করেন এবং মাটির মধ্যে কূপ খুঁড়ে তা লুকিয়ে রাখেন। ফিরোজ এই সংবাদ পাওয়া সত্ত্বেও নিশ্চুপ থাকেন। (৩) সরকারি কারখানাগুলিতে দুর্নীতির ও অর্থ অপচয়ের সংবাদ জেনেও তিনি প্রতিবিধানের ব্যাপারে নিশ্চেষ্ট থাকেন। এই নগ্নতোষণ-নীতি প্রশাসনের সর্বস্তরে ভাঙনের বীজ রোপণ করে।

যে কল্যাণমূলক কাজ ইতিহাসে ফিরোজ শাহকে মানবতাবাদের প্রতীক রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে, তাও ত্রুটিমুক্ত ছিল না। ফিরোজ দিল্লীর সুলতানি সাম্রাজ্যকে 'মুসলিম রাষ্ট্র' বলে বিবেচনা করতেন। তাই তাঁর অধিকাংশ কল্যাণমুখী কর্মসূচী, যেমন—শিক্ষা, দারিদ্র্যের সাহায্য, অনাথদের সাহায্য, কুমারী কন্যার বিবাহ, পণ, ধর্মীয় দান প্রভৃতি, প্রধানত মুসলমান নারী-পুরুষের সাহায্যার্থে গৃহীত হয়েছিল। আফিফের লেখাতেও এই মন্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ রাজপদে কেবল মুসলমানরাই নিযুক্ত হতেন, যোগ্যতা থাকলেও হিন্দুরা, কেবল ধর্মীয় কারণে, গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কর্ম সম্পাদনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হতেন। ***সিরাজুল ইসলাম*** লিখেছেন ঃ "*Political power remained exclusively in Muslim hands and no post of influence is known to have been held by any Hindu.*" উলেমা বা মুসলমান ধর্মগুরুদের প্রতি ফিরোজের দুর্বলতা ও নির্ভরতার কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। এই দিক থেকে ফিরোজ শাহ কেবল মুঘল সম্রাট আকবরের থেকে অনেক পিছনে ছিলেন তাই নয় ; আকবরের বিপরীতে ছিলেন বলা যায়। ড. ***মজুমদার*** লিখেছেন ঃ "*In all these respects Firuz offers a striking contrast to Akbar and to a certain extent to Sher Shah.*" ফিরোজের চরিত্র ও কার্যাবলীর ভিত্তিতে ড. মজুমদার মনে করেন যে, ফিরোজের রাজত্বকালকে সম্রাট আকবরের শাসনপূর্ব কালের সর্বোত্তম অধ্যায় বলাও যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ উভয়ের মাঝে আগত আফগান শাসক শের শাহ শাসক, সংগঠক ও সমরনায়ক হিসেবে ফিরোজের থেকে কোন অংশে কম ছিলেন না। তাই ড. মজুমদার ফিরোজ শাহ তুঘলককে সুলতানি সাম্রাজ্যের শেষ উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধি *(last of the notable Sultans of Delhi)* বলার পক্ষপাতী। একথা সত্য যে, ফিরোজ শাহ তুঘলকের বহু কাজ সাধারণ মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করেছিল। কিন্তু পরিণতিতে সেই সকল কাজই সুলতানি সাম্রাজ্যের পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল। ড. ***ত্রিপাঠী*** (R. P. Tripathy) যথার্থই বলেছেন ঃ *"ইতিহাসের পরিহাস এরূপ দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হয়, যেসব গুণাবলী ফিরোজের জনপ্রিয়তা অর্জনে সাহায্য করেছে, সেগুলি অধিক পরিমাণে দিল্লীর সুলতানির দুর্বলতার কারণ হয়ে উঠেছে।"*

অনুরূপভাবে ড. ***রমেশচন্দ্র মজুমদারও*** সুলতানির অবক্ষয় ও পতনের জন্য ফিরোজ শাহকে দায়ী করেছেন। তাঁর মতে, ফিরোজ শাহের সাফল্য ছিল আপাত এবং সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক উপাদানে ভরা। একথা ঠিক তাঁর রাজত্বকালে শান্তি ও সমৃদ্ধির পক্ষে বিপজ্জনক কোন শক্তির

সক্রিয়তা চোখে পড়ে না। কিন্তু তাঁর রাষ্ট্রনীতি, ধর্মনীতি ইত্যাদি বহুজাতিক একটি রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও প্রগতির অনুকূল ছিল না। ফিরোজের আপোষমুখীনতা সাম্রাজ্যের মূল ভিত্তিকে দুর্বল করে ছিল। তাঁর প্রশাসনিক ব্যবস্থাদি দিল্লী-সুলতানির অবক্ষয় ও পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল। তিনি লিখেছেন ঃ *"On the whole inspite of peace and prosperity and contentment that prevailed during the reign of Firuz Shah.... his policy and administrative measures contributed to a large extent to the downfall of the Delhi Sultanate, and accelerated the process of decline..."*

○ ফিরোজ শাহ্ তুঘলকের উত্তরাধিকারীগণ ঃ

ফিরোজ শাহের শেষ জীবন খুব সুখের ছিল না। জ্যেষ্ঠ পুত্র ফত্ খাঁর অকালমৃত্যু তাঁর মন ভেঙে দেয়। অত্যধিক বয়সের ভারে তাঁর বিচারবুদ্ধিও দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সময় অপর পুত্র নাসিরউদ্দিন মহম্মদ খানের সহায়তায় তিনি প্রশাসন চালাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু নাসিরউদ্দিনের আচার-ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়ে বহু প্রভাবশালী অভিজাত তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। নাসিরউদ্দিন রাজধানী ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। বৃদ্ধ ও অসমর্থ ফিরোজ শাহ মৃত ফত্ খাঁর পুত্র তুঘলক শাহকে নিজ উত্তরাধিকার মনোনীত করেন। ফিরোজের মৃত্যুর (২০ শে সেপ্টেম্বর, ১৩৮৮ খ্রীঃ) পর তুঘলক শাহ 'দ্বিতীয় গিয়াসউদ্দিন তুঘলক' উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন (১৩৮৮- '৮৯ খ্রীঃ)। শাসক হিসেবে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এবং মানুষ হিসেবে অবিবেচক ও বিলাসপ্রিয়। অল্পদিনের মধ্যেই প্রভাবশালী আমীর ও মালিকদের তিনি শত্রুতে পরিণত করেন। ফলে তিনি এক প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের বলি হন। অতঃপর সিংহাসনে বসেন ফিরোজের তৃতীয় পুত্র জাফর খাঁর পুত্র আবু বকর (১৩৮৯-'৯০ খ্রীঃ)। এই সময় দিল্লী-সুলতানি দরবারী ষড়যন্ত্রের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। বিভিন্ন আমীর ও মালিক নিজ নিজ স্বার্থচিন্তা অনুসারে সিংহাসনের বিভিন্ন দাবিদারকে সমর্থন করতে থাকেন। সামানা'র সদাহ্ আমীররা ফিরোজের পুত্র নাসিরউদ্দিন মহম্মদকে সিংহাসন দখলের জন্য আহ্বান জানালে নাসিরউদ্দিন সসৈন্যে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু তাঁর পর পর দু'টি প্রচেষ্টা আবু বকর ব্যর্থ করে দেন। ব্যর্থতা সত্ত্বেও লাহোর, মুলতান, হিসার, হান্সী প্রভৃতি অঞ্চলে মহম্মদের সমর্থন বাড়তে থাকে। বহু অভিজাত তাঁকে গোপনে সমর্থন জানান। শেষ পর্যন্ত নাসিরউদ্দিন দিল্লীর সিংহাসন দখল করেন। আবু বকরকে মিরাট দুর্গে বন্দী করা হয়। কিন্তু গৃহবিবাদ ও অভিজাতদের ষড়যন্ত্রের প্রবল চাপে নাসিরউদ্দিনের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। পাঁচ বছর রাজত্ব করেই তিনি মারা যান (১৩৯৪ খ্রীঃ)। এরপর সিংহাসনে বসেন নাসিরের পুত্র হুমায়ুন শাহ। কিন্তু তিনিও মাস তিনেকের মধ্যে মারা যান।

অতঃপর সিংহাসনে বসেন মহম্মদের কনিষ্ঠ পুত্র নাসিরউদ্দিন মামুদ তুঘলক (১৩৯৪-১৪১৩ খ্রীঃ)। নাসিরউদ্দিন মামুদও দৃঢ়চেতা ব্যক্তি ছিলেন না। প্রশাসকের দক্ষতা ও দূরদৃষ্টিরও একান্ত অভাব ছিল তাঁর চরিত্রে। ফলে দিল্লী-সুলতানি আমির, মালিকদের স্বার্থসিদ্ধির লীলাক্ষেত্রে পরিণত হয়। ফিরোজ শাহ তুঘলকের এক পুত্র নসরৎ শাহ সিংহাসন দাবি করলে কিছু অভিজাত তাঁকেই সমর্থন করে। নাসিরউদ্দিন ও নসরৎ শাহ যথাক্রমে দিল্লী ও ফিরোজাবাদ

থেকে সুলতানি চালাতে থাকেন অভিজাতরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনকে সমর্থন করতে থাকেন। দোয়াব, ফিরুজাবাদ, সম্বল, পানিপথ, রোটক অঞ্চলের আমিরগণ নসরৎ শাহকে সমর্থন করেন, অন্যদিকে দিল্লীর আমিররা দাঁড়ান মামুদ শাহ'র পিছনে। প্রকৃত অর্থে এঁদের কারো প্রতিই অভিজাতদের আনুগত্য ছিল না। তাঁরা কেবল স্বার্থসিদ্ধির চিন্তায় এক এক পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। এই গৃহযুদ্ধের অনিবার্য ফলস্বরূপ কেন্দ্রীয় শাসন-শৃঙ্খলা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে। ফেরিস্তা তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থা বর্ণনা করে লিখেছেন ঃ *"প্রশাসন সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে ; গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে ; এবং এক অশ্রুতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয় যে একই রাজধানীতে অবস্থান করে দু'জন রাজা পরস্পরের মধ্যে সংগ্রামে লিপ্ত থাকেন।"* এই পরিস্থিতিতে প্রাদেশিক শাসক ও হিন্দু সামন্তরা দিল্লীর আধিপত্য অগ্রাহ্য করতে শুরু করে। খাজা জাহান নিজেকে পূর্বাঞ্চলের শাসক ('মালিক-উস্-সার্ক') বলে ঘোষণা করেন। জৌনপুরে তিনি স্বাধীন সুলতানি প্রতিষ্ঠা করেন। একে একে গুজরাট, মালব, খান্দেশ, কাল্পী, বিয়ানা, গোয়ালিয়র অঞ্চলের শাসকরা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। দোয়াব, মেওয়াট অঞ্চল চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে পতিত হয়। এইরূপ সংকটজনক রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে মোঙ্গল বীর তৈমুরলঙ্গ ভারত আক্রমণ করেন। দুর্বল সুলতানি সরকার তৈমুরের বিরুদ্ধে সামান্যতম প্রতিরোধও গড়ে তুলতে পারেনি। নির্বিচারে হত্যা ও লুণ্ঠন চালিয়ে তৈমুর স্বদেশে ফিরে যান। অতঃপর মামুদশাহ পুনরায় দিল্লীতে ফিরে আসেন। তবে এই সময় তিনি স্বাধীনতা হারিয়ে কিছুদিন মল্লুইকবাল ও কিছুদিন দৌলত খাঁর নিয়ন্ত্রাধীনে থেকে কোনক্রমে সুলতানের অভিনয় করে যান। ১৪১৩ খ্রীষ্টাব্দে নাসিরউদ্দিন মামুদ শাহ মারা যান। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ভারতে দুশো বছরের বেশি স্থায়ী তুর্কী-শাসনের অবসান ঘটে।

○ তৈমুর লঙ্গের আক্রমণ ও পরিণতি ঃ

আমির তৈমুর ১৩৩৬ খ্রীষ্টাব্দে মধ্য এশিয়ার সমরখন্দের পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত 'কেচ' (শহর-ই-শজ্ৎ) শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আমির তাঘী বারলা তুর্কী উপজাতিদের সুরগান বা চাঘতাই তুর্কী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। বাল্যকালে যুদ্ধ করার সময় তৈমুরের পা তীরবিদ্ধ হয়। এই সময় থেকে তিনি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে বাধ্য হন। তাঁর বিরুদ্ধ গোষ্ঠী 'আক্শক্ তৈমুর' বা খোঁড়া তৈমুর বলে পরিহাস করতে শুরু করে। ক্রমে তিনি 'তৈমুর লঙ্গ' *(Taimur the lame)* নামেই পরিচিত হয়ে যান। ১৩৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তৈমুর সমরখন্দের সিংহাসনে বসেন। দুর্ধর্ষ সামরিক নেতা হিসাবে পৃথিবীর ইতিহাসে যাঁরা অমর হয়ে আছেন তৈমুর লঙ্গ ছিলেন তাঁদের অন্যতম। খুব সাধারণ অবস্থা থেকে তিনি মধ্য এশিয়া ও এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নিজ কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। ট্রান্স অক্সিয়ানা ও তুর্কীস্থানের একাংশের সাথে তিনি সমগ্র আফগানিস্তান, পারস্য, সিরিয়া, তুর্কীস্থান ও এশিয়া মাইনরের অধিকাংশ অঞ্চলে নিজ কর্তৃত্ব প্রসারিত করেন। রাজনৈতিক জীবনের শেষ দিকে তৈমুর ভারতের বিরুদ্ধে অভিযানের সিদ্ধান্ত নেন। চেঙ্গিজ খাঁর সঙ্গে তাঁর রক্তের সম্পর্ক আছে বলে তিনি দাবি করতেন। তাই চেঙ্গিজ খাঁর সাম্রাজ্য পুনর্গঠনের পরিকল্পনা তিনি নেন।

কোন প্ররোচনা ছাড়াই তৈমুর ভারতবর্ষ আক্রমণের সিদ্ধান্ত কেন নিলেন? কোন কোন

ঐতিহাসিকের মতে, সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা থেকেই তিনি ভারতের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। সেই সময় দিল্লী-সুলতানি ছিল অন্তর্দ্বন্দ্বে জীর্ণ। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছিল। ভারতের এই রাজনৈতিক দুরবস্থা তৈমুরকে উৎসাহিত করে। অধ্যাপক ***শ্রীবাস্তব*** (A.L. Srivastava)-এর মতে, তৈমুর লঙ্গ কেবল দুর্ধর্ষ ছিলেন না, যথেষ্ট বিচক্ষণতা ও কূটনৈতিক বোধও তাঁর ছিল। তাই ভারত-আক্রমণের লক্ষ্য হিসেবে তিনি সম্পদ-লুব্ধতার সাথে ধর্মকে জুড়ে দেন। ভারতের সুলতানদের পৌত্তলিকদের সাথে আপোষ ও সহাবস্থানের অবসান ঘটানোকে তিনি ভারত-আক্রমণের অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা করেন। নিজ আত্মজীবনীমূলক 'মিলফুজাৎ-ই-তৈমুরী' (বা তুজুক-ই-তৈমুরী) গ্রন্থে তিনি লিখেছেন যে, *'পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে 'গাজী' বা 'শহীদ হওয়াই' তাঁর হিন্দুস্থান অভিযানের মূল উদ্দেশ্য'।* আবার দু-এক জায়গায় তিনি 'পৌত্তলিকদের সম্পত্তি ধ্বংস করে ইসলামের সৈনিকদের কিছু পাইয়ে দেওয়াকে' ভারত আক্রমণের অন্যতম উদ্দেশ্য বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর ভারত-অভিযানের গতি-প্রকৃতি থেকে একথা স্পষ্ট যে, ভারতে ভূমি দখল বা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কোন ইচ্ছা তাঁর ছিল না। সম্ভবত, ধর্মীয় প্রেরণা ও অর্থনৈতিক লোভ—দুটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে তিনি ভারত-আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। এই প্রেক্ষিতে ড. ***মজুমদার*** লিখেছেন ঃ ***"As a matter of fact, he combined in himself the savage ferocity of Ceinghiz Khan and the fanaticism of Sultan Mahmud."***

১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে তৈমুর তাঁর পৌত্র পীরমহম্মদের নেতৃত্বে একটি অগ্রবর্তী বাহিনী ভারতের বিরুদ্ধে পাঠান। পীরমহম্মদ ছমাস অবরোধের পর মুলতান দখল করেন। ঐ বছরের এপ্রিল মাসে স্বয়ং তৈমুর এক বিশাল বাহিনীসহ সমরখন্দ থেকে রওনা হন। সিন্ধু, ঝিলাম ও রাভী নদী পার হয়ে তিনি মুলতানের পঁচাত্তর মাইল উত্তর-পূর্বে তালম্বা শহরে উপস্থিত হন। এখানে বহু লোককে হত্যা করে এবং প্রচুর ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে তৈমুর লঙ্গ বছরের শেষদিকে দিল্লীর প্রান্তে এসে পৌঁছান। যাত্রাপথে পাক-পাতন, দিপালপুর, ভাতনার, শিরসা, কৈথাল প্রভৃতি অঞ্চল তিনি শ্মশানে পরিণত করে দেন। হাজার হাজার হিন্দু-পুরুষ তাঁর বাহিনীর হাতে প্রাণ দেয়। নারী ও শিশুদের দাসে পরিণত করা হয়। অপদার্থ সুলতান নাসিরউদ্দিন মামুদ তৈমুর লঙ্গের এই নারকীয় হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠন নীরবে লক্ষ্য করে যান। শেষ পর্যন্ত দিল্লী হাতছাড়া হবার সম্ভাবনা প্রকট হলে মন্ত্রী ও পরামর্শদাতা মল্লু ইক্‌বালের সাথে মিলিতভাবে একটা দুর্বল প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তৈমুর অনায়াসে সুলতানি-বাহিনীকে পরাস্ত করেন। ভীত-সন্ত্রস্ত সুলতান পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করেন (১২ ই ডিসেঃ, ১৩৯৮ খ্রীঃ)। অথচ সুলতানের এহেন হটকারী আচরণের বদলা হিসেবে তৈমুর লঙ্গ প্রায় এক লক্ষ হিন্দু বন্দীকে হত্যার নির্দেশ দেন। কথিত আছে যে, দু'জন আমির তৈমুর লঙ্গকে জানায় যে দিল্লীর সুলতানের আক্রমণের সংবাদে হিন্দু-বন্দীরা দারুণ উল্লসিত হয়েছে এবং তৈমুরের বিরুদ্ধে ধ্বনি দিয়েছে। এমন সম্ভাবনা আছে যে সুযোগ পাওয়া মাত্রই এই বিশাল সংখ্যক বন্দী শত্রুপক্ষের সাথে যোগ দিয়ে তৈমুরের বাহিনীকে আক্রমণ করবে। এই সংবাদে তৈমুর উত্তেজিত হন এবং বিভিন্ন সৈনিকের হাতে বন্দী হিন্দুদের হত্যার নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশ সত্বর পালিত হয় এবং এক লক্ষ্য হিন্দুর রক্তে দিল্লীর মাটি রঞ্জিত হয়।

এই ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে তৈমুর লিখেছেন : *"মৌলানা নাসিরউদ্দিন উমর, যিনি এতাবৎকাল একটি চড়ুই পাখিকেও হত্যা করেননি, এখন আমার নির্দেশে পনের জন পৌত্তলিক বন্দী-হিন্দুকে হত্যা করেন।"*

১৭ ডিসেম্বর সুলতান মামুদ ও মন্ত্রী মল্লুইকবাল আবার তৈমুরকে বাধা দিতে অগ্রসর হন। প্রায় দশ হাজার অশ্বারোহী, চল্লিশ হাজার পদাতিক ও শতাধিক রণহস্তিসহ সুলতান তৈমুরের মুখোমুখি হন। কিন্তু এবারেও সুলতান পরাজিত হন। মল্লু বরণপ্রদেশে এবং সুলতান মামুদ গুজরাটে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচান। পরের দিন (১৮ই ডিসেঃ) তৈমুর সসৈন্যে দিল্লীতে প্রবেশ করেন। অতঃপর শুরু হয় হিন্দুনিধন যজ্ঞ। টানা তিনদিন তৈমুরের বাহিনী তাণ্ডব চালায় গোটা দিল্লী জুড়ে। *তৈমুর* নিজেই লিখেছেন : *"তখন বাহিনী ছিল আমারও নিয়ন্ত্রণের বাইরে। হত্যা, লুণ্ঠন ও বন্দী করা ছাড়া কিছুই তাদের চিন্তার মধ্যে ছিল না। সৈয়দ, উলেমা ও অন্যান্য মুসলমানদের গৃহ ছাড়া গোটা শহরটাই ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছিল।"* এই বীভৎস হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসলীলার জন্য তৈমুর দিল্লীবাসী হিন্দুদের প্রতিরোধক দায়ী করে বলেন, *"আমার ইচ্ছায় নয়, ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী দিল্লীর তিনটি শহর ধ্বংস হয়েছে।"* জনৈক ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, হিন্দুদের ছিন্নমুণ্ড দিয়ে সৌধ নির্মাণ করে তৈমুরের সেনাদল উল্লাস প্রকাশ করে। হাজার হাজার নরদেহ মাংসাশী পশু ও পাখির খাদ্যে পরিণত হয়। ***লেনপুল** (Lane Pool)* লিখেছেন : *"the unhappy city was turned into a place of bloodshed, ruin and destruction. There were inmense spoils of rubies, diamonds, pearls, gold and silver ornaments... Only the followers of Muslim religion escaped the general sack."*

প্রায় পনের দিন দিল্লীতে অবস্থান করার পর তৈমুর প্রত্যাবর্তনের পথ ধরেন। ফেরার পথে ফিরোজাবাদ, মীরাট, হরিদ্বার অঞ্চলেও তিনি লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড চালান। শিবালিক পাহাড়ের পথ ধরে উত্তরে যাওয়ার সময় কাংড়া ও জম্মু তিনি লুণ্ঠন করেন। ভারত ত্যাগের পূর্বমুহূর্তে খিজির খাঁকে তিনি মুলতান, লাহোর ও দীপালপুরের শাসক নিযুক্ত করেন (৬ই মার্চ, ১৩৯৯ খ্রীঃ)। অনেকের মতে, তৈমুর তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে দিল্লীর দায়িত্বও খিজির খাঁর হাতে অর্পণ করেছিলেন। ১৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে মার্চ সিন্ধুনদ অতিক্রম করে তৈমুর লঙ্গ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের উপর তৈমুর লঙ্গের আক্রমণের প্রভাব ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিক ***উলসী হেগ*** (W. Haig) লিখেছেন : *"ইতিপূর্বে কোন একটি আক্রমণে অন্য কোন আক্রমণকারী তৈমুরের মত হিন্দুস্থানে এত তীব্র দুঃখ-কষ্টের সৃষ্টি করেননি।" ("Timur recrossed Indus–after inflicting on India more misery than had ever before been inflicted by any conqueror in a single invasion.")* সুলতান মামুদ নৃশংসতম হত্যাকারী রূপে ভারত-ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে আছেন। কিন্তু তৈমুর লঙ্গের মত একটি মাত্র অভিযানে এত রক্তপাত তিনিও করেননি। এই হত্যাকাণ্ড এত ব্যাপক ছিল যে, *"স্তুপীকৃত মৃতদেহের দুর্গন্ধে এবং রক্তপাতের আতঙ্কে দুমাস দিল্লীর আকাশে কোন পাখিও উড়তে দেখা যায়নি।"* ঐতিহাসিক ***স্মিথের*** ভাষায় : *"Timur quitted India, leaving*

anarchy, famine and pestilence behind him." নির্বিচার হত্যা ও সীমাহীন লুণ্ঠনের অনিবার্য ফলস্বরূপ দুর্ভিক্ষ আর মড়ক নামে দেশ জুড়ে। তৈমুরের বাহিনী সঞ্চিত খাদ্যশস্য লুণ্ঠন করে নিয়ে যায়। নষ্ট করে দেয় মাঠের ফসল। ফলে নেমে আসে দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস। একদিকে অনাহার আর অন্যদিকে বায়ু ও জল দূষণের ফলে মড়কের কবলে পড়ে দিল্লী ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল। *'তারিখ-ই-মোবারকশাহী'*তে লেখা হয়েছে : *"Many died of sickness and many of hunger. For a couple of months Delhi presented a scene of desolation and woe."* ড. **মজুমদার** লিখেছেন : *"দিল্লীর মুসলমান সুলতানের রাজধানী শহরের এই বেদনাময় পরিণতি ঘটেছিল এমনই একজনের হাতে যিনি নিজেকে ইসলামের রক্ষক হিসেবে দাবি করেন।"*অধ্যাপক **সতীশচন্দ্র** লিখেছেন : *"এই আক্রমণে নিঃস্ব হয়ে যায় হিন্দুস্থান। স্বর্ণ, রৌপ্য, মণিমুক্তা প্রভৃতি প্রচুর ধনসম্পদ চলে যায় ভারত থেকে।"* **মহম্মদ হাবিবের** মতে, তৈমুর লঙ্গ হত্যাকাণ্ডের সময় সাধারণ মুসলমানদেরও রেহাই দেননি। সম্ভবত, ধর্মজ্ঞানী কিছু মানুষ তাঁর রোষ থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। কারণ তাঁদের কাছ থেকে অর্থ-সম্পদ পাওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না। নচেৎ অর্থ লুণ্ঠনের কাজে তাঁর তরবারির সামনে হিন্দু-মুসলমানের ভাগ্য একাকার হয়ে গিয়েছিল।

ক্ষয়িষ্ণু তুঘলক সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক অস্তিত্বের উপর চরম আঘাত হেনেছিল তৈমুরের আক্রমণ। তৈমুর লঙ্গের প্রায় প্রতিরোধহীন অগ্রগতি এবং সাফল্য আরো একবার স্পষ্ট করেছিল ভারতের সামরিক দৈন্য। দিল্লীর সুলতানের পলায়নী মনোবৃত্তি, প্রজাসাধারণের ধনমান রক্ষায় নির্লিপ্ততা, শাসক হিসেবে দায়িত্ববোধের একান্ত অভাব যুগপৎ উচ্চাকাঙ্ক্ষী আমীর, মালিকদের স্বাধীনতাস্পৃহা বৃদ্ধি করেছিল এবং প্রজাসাধারণের মনে চরম হতাশার জন্ম দিয়েছিল। চূড়ান্ত রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সুযোগে বহু অঞ্চল দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করে স্বাধীন শাসনের সূচনা করেছিল। বাংলা ও দক্ষিণ ভারত আগেই স্বাধীন হয়ে গিয়েছিল। এখন তৈমুর লঙ্গের আক্রমণের পরে গুজরাট, সামানা, বিয়ানা, কালপি, মাহাবা, মুলতান, পাঞ্জাব, সিন্ধু প্রভৃতি বহুস্থানে গড়ে ওঠে স্বাধীন রাজ্য। সুবিস্তৃত সুলতানি সাম্রাজ্য 'দিল্লী থেকে পালামের' ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সংকুচিত হয়ে পড়েছিল।

সামাজিক জীবনেও তৈমুরের আক্রমণ প্রভাব ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তৈমুর লঙ্গ ধর্মের নামে হিন্দুদের উপর নৃশংস অত্যাচার চালিয়েছিলেন। ফলে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রদায়গত বিরোধ বৃদ্ধি পায়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় হিন্দু-মুসলমানের সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের ধারা। হিন্দু পিতামাতা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে তাদের কন্যাদের বাল্যবিবাহের জন্য সচেষ্ট হন। কারণ নারীর মর্যাদা রক্ষার অন্যতম উপায় হিসেবে এই কাজটাই তাদের কাছে সহজসাধ্য বলে মনে হয়। এর অনিবার্য ফলস্বরূপ সমাজের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে।

ভারতের সাংস্কৃতিক অগ্রগতিও আক্রমণের ফলে ব্যাহত হয়। তৈমুরের বাহিনী বহু সুদৃশ্য অট্টালিকা ও মন্দির ধ্বংস করেছিল। তাছাড়া তিনি বহু সুদক্ষ ভারতীয় কারিগর, রাজমিস্ত্রী ও শিল্পীকে স্বদেশে ধরে নিয়ে যান। এদের প্রতিভার অবদান থেকে ভারত বঞ্চিত হয় এবং সমৃদ্ধ হয় সমরখন্দের শিল্পধারা। এই সকল ভারতীয় শিল্পীর মাধ্যমে ভারতীয় শিল্পের ধারা সম্প্রসারিত হয় মধ্য এশিয়ার নানা অঞ্চলে।

○ সৈয়দ বংশ (১৪১৪-১৪৫১ খ্রীঃ) ঃ

তুঘলক বংশের শেষ সুলতান নাসিরউদ্দিন মামুদের মৃত্যুর পর দিল্লীর আমীর ও মালিকরা জনৈক অভিজাত দৌলত খাঁকে দিল্লীর শাসক মনোনীত করেন (১৪১২-১৩ খ্রীঃ)। সিংহাসনে তাঁর কোন বৈধ অধিকার ছিল না। কোন রাজতান্ত্রিক ঐতিহ্যও তাঁর ছিল না। স্বভাবতই অভিজাতদের সার্বিক সমর্থক থেকে তিনি শীঘ্রই বঞ্চিত হন। দিল্লীর অভিজাতদের একাংশ তৈমুরের প্রতিনিধি ও মুলতানের শাসক খিজির খাঁকে দিল্লী দখলের পরামর্শ দেন। খিজির খাঁ ১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে সসৈন্যে দিল্লীতে উপস্থিত হন। প্রায় চার মাস অবরুদ্ধ থাকার পর দৌলত খাঁ আত্মসমর্পণ করেন (৬ই জুন, ১৪১৪ খ্রীঃ)। সিংহাসনে বসেন খিজির খাঁ সৈয়দ।

○ খিজির খাঁ (১৪১৪-'২১ খ্রীঃ) ঃ

'তারিখ-ই-মুবারকশাহী', গ্রন্থের মতে, খিজির খাঁ ছিলেন হজরত মহম্মদের বংশধর। এই কারণে তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ *'সৈয়দ বংশ'* নামে পরিচিত হয়। ড. *নিজামীর* মতে, খিজির প্রকৃতই সৈয়দ ছিলেন কিনা তা প্রমাণ করা কঠিন। তাঁর পূর্বপুরুষেরা আরবদেশ থেকে এসেছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। যাই হোক্, খিজির মুলতানের শাসক মর্দান খাঁ-র তত্ত্বাবধানে সাহিত্য ও সামরিক শিক্ষা লাভ করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি সামরিক পারদর্শিতা দেখান। দৌলত খাঁর পুত্রের মৃত্যুর পর সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক খিজির খাঁকে মুলতানের 'জায়গির' অর্পণ করেন। পরে মল্লুইকবালের ভ্রাতা সারঙ্গ খাঁ মুলতান দখল করে নিলে খিজির মেওয়াটে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। তৈমুর লঙ্গ ভারত আক্রমণ করলে খিজির খাঁ ভাগ্য-পরিবর্তনের আশায় তৈমুরের সাথে যোগ দেন। পুরস্কার হিসেবে তৈমুর ভারত ত্যাগের প্রাক্কালে খিজির খাঁকে দিল্লীতে তাঁর প্রতিনিধি নিয়োগ করেন। তবে সেই মুহূর্তে মুলতান, দিপালপুর ও সিন্ধুর একাংশ ছাড়া অন্যত্র খিজিরের কর্তৃত্ব স্বীকৃত হয়নি। পরে দিল্লীর রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অভিজাতদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের সুযোগে তিনি সিংহাসন দখল করেন। সিংহাসনে বসেই তিনি শাসনসংস্কারে মন দেন। অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ পদে নিজের বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের বসান। মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের আমলের দক্ষ অভিজাতদেরও তিনি দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেন।

খিজির খাঁ আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, তৈমুরলঙ্গের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া তাঁর ভাগ্যের এই পরিবর্তন সম্ভব হত না। তাই তিনি তৈমুরের পুত্র শাহরুখ খানের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখেন। তিনি কখনোই 'সুলতান' উপাধি গ্রহণ করেননি। পরিবর্তে নিজেকে *'রায়ত-ই-আলা'* উপাধিতে ভূষিত করেন। নিজনামে মুদ্রাও তিনি চালু করেননি। উচ্চাকাঙক্ষী তুর্কী ও আফগান আমীরদের শত্রুতার বিরুদ্ধে তৈমুরবংশের প্রতি এই আনুগত্যকে তিনি 'রক্ষাকবচ' হিসেবে ব্যবহার করে অবশ্যই কূটনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

খিজির খাঁ দিল্লীর মসনদ দখল করেছিলেন ; কিন্তু দিল্লী-সুলতানির সেই ভৌমিক বিস্তৃতি বা রাজনৈতিক স্থিতি—কিছুই তখন অবশিষ্ট ছিল না। খিজিরের কর্তৃত্ব দিল্লী ছাড়া দোয়াব ও মেওয়াটে একাংশের উপর সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। এই ছোট্ট অংশের প্রাপ্য রাজস্ব থেকে অভ্যন্তরীণ বা বৈদেশিক ক্ষেত্রে কোন বড় পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। তাই প্রথমেই তিনি পার্শ্ববর্তী কয়েকটি অঞ্চলকে বশীভূত করে বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ বাড়ানোর উদ্যোগ

নেন। তাঁর মন্ত্রী তাজ-উল্-মুল্‌ক এই উদ্দেশ্যে একাধিক অভিযান পরিচালনা করেন। কাটিহার, এটাওয়া, খোর, কাম্পিল, পাতিয়ালি, গোয়ালিয়র, বায়ানা প্রভৃতি অঞ্চলের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে স্থানীয় শাসকদের আনুগত্য ও বার্ষিক রাজস্বের প্রতিশ্রুতি পান। অবশ্য এই আনুগত্য সম্পূর্ণভাবে মৌখিক এবং অল্পস্থায়ী। সিরহিন্দ ও বদাউনের বিদ্রোহী তুর্কীদের বিরুদ্ধেও তিনি সাময়িক সাফল্য অর্জন করেন। এটাওয়া অভিযানের সময় খিজির অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেখান থেকে দিল্লী প্রত্যাবর্তনের কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি মারা যান। (২০শে মে, ১৪২১ খ্রীঃ)।

খিজির খাঁ প্রশংসনীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। ***ইয়াহিয়া সিরহিন্দী*** লিখেছেন ঃ *"তিনি ছিলেন দয়ালু, সাহসী, নম্র এবং প্রতিশ্রুতি ও কর্তব্যের প্রতি বিশ্বস্ত।"* ***ফেরিস্তার মতে ঃ*** *'খিজির খাঁ ছিলেন মহৎ ও পণ্ডিত শাসক। নিজ কর্তব্যে অবিচল। তাঁর প্রতি সাধারণের ভালবাসা এত গভীর ছিল যে মৃত্যুর পরেও তিন দিন উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, প্রভু-ভৃত্য সবাই তাঁর জন্য শোক পালন করেছিলেন।"* **ড. *মজুমদার*** তাঁর ব্যক্তি চরিত্রের প্রশংসা করে লিখেছেন ঃ *"He (Khizir) was wise, just and benevolent, and was free from the vices common on those days."* প্রকৃত সৈয়দদের মতই ছিল তাঁর ধর্মীয় জীবন ও আচার-আচারণ। অকারণে রক্তপাত কিংবা শত্রুর প্রতি প্রতিহিংসামূলক আচরণ তিনি কখনোই সমর্থন করেননি। **ড. *ঈশ্বরীপ্রসাদের*** মতে, খিজির খাঁ শাসক হিসেবে সাফল্যের পরিচয় দিতে পারেননি। তবে এজন্য তাঁকে সম্পূর্ণভাবে দায়ী করা যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ দিল্লী-সুলতানির এক ভঙ্গুর ও অস্থির অবস্থায় তিনি ক্ষমতা পেয়েছিলেন। তাঁর পূর্ণ উদ্যোগ ও সময় ব্যয়িত হয়েছিল শান্তি-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে। স্বভাবতই কার্যকর প্রশাসনিক সংস্কারসাধনের যথেষ্ট সময় তিনি পাননি।

○ মুবারক শাহ (১৪২১-'৩৪ খ্রীঃ) ঃ

খিজির খাঁর মৃত্যুর পর দিল্লীর সিংহাসনে বসেছিলেন তাঁর পুত্র মুবারক শাহ। এই মনোনয়নে অভিজাতদের সম্মতি থাকার ফলে সিংহাসনকে কেন্দ্র করে প্রাথমিক সমস্যা দেখা দেয়নি। পিতার মতই মুবারক ভাষা, সাহিত্য ও সামরিক বিদ্যার যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন। প্রথম আট বছর মুবারক তৈমুরবংশের প্রতি আনুগত্য বজায় রেখে শাসন পরিচালনা করেন। অতঃপর মুবারক 'শাহ' (সুলতান) উপাধি গ্রহণ করে তৈমুরবংশের অধীনতা বর্জন করেন। নিজের নামে মুদ্রা খোদাই করে এবং 'খুৎবা' পাঠ করে বিদেশী নিয়ন্ত্রণমুক্ত শাসনের সূচনা করেন। কেন্দ্রীয় শাসনের ভিত্তি সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে মুবারক অভিজাতদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করেন। কোন অভিজাতকে তিনি অবশ্য জায়গিরচ্যুত করেননি, তবে কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে যাতে কারো কায়েমী স্বার্থ গড়ে উঠতে না পারে সেজন্য জায়গির পরিবর্তন করেন। বদায়ুন, এটাওয়া, কাটিহার গোয়ালিয়র প্রভৃতি স্থানের অবাধ্য মালিকদের বিরুদ্ধে তিনি কঠোর সামরিক ব্যবস্থা নেন এবং যথারীতি করপ্রদানে বাধ্য করেন।

দেশের ভিতর ও বাইরের একাধিক শক্তি মুবারক শাহকে বিব্রত করে। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে খোকরগণ এবং মালব ও জৌনপুরের শাসকগণ এবং বহিরাগত মুঘলদের পুনঃপুনঃ আক্রমণ মুবারক শাহকে যথেষ্ট ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। মুবারক অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এই সকল

আক্রমণ প্রতিহত করেন। দিল্লী-সুলতানির রাজ্যসীমা তিনি বর্ধিত করেননি ঠিকই ; তবে লব্ধ সাম্রাজ্যের সীমানা তিনি সংকুচিত হতেও দেননি। তাঁর রাজত্বের শেষদিকে কাবুল থেকে মুঘল আক্রমণ ঘটে। শাহরুখ-এর পৌত্র মামুদ মীর্জার পক্ষে কাবুলের সহকারী গভর্নর শেখ আলি দিল্লী আক্রমণ করেন। *ফেরিস্তার* মতে, মুবারক শাহ তৈমুর বংশের অধীনতা অস্বীকার করে স্বাধীন সুলতানির সূচনা করার জন্য মুঘলরা ক্ষুব্ধ হয় এবং দিল্লী আক্রমণ করে। কিন্তু *সিরহিন্দীর* বিবরণ থেকে অনুমান করা যায় যে, দিল্লীর পক্ষে লাহোরের শাসক নিয়মিত কাবুলে উপঢৌকন পাঠাতেন। এমনকি শাহরুখ খাঁ মুবারক শাহ ও তাঁর উত্তরাধিকারী মহম্মদ শাহ'কে স্বীকৃতির নিদর্শনস্বরূপ ছাতা প্রেরণ করেছিলেন। সম্ভবত, শেখ আলি কাবুল ও গজনীর শাসক মামুদ মীর্জার ইচ্ছানুসারে দিল্লী আক্রমণ করেছিলেন ; শাহরুখ এ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। যাই হোক্, এ ক্ষেত্রেও মুবারক শাহ দক্ষতার পরিচয় দেন এবং আক্রমণকারী মুঘল-বাহিনীকে বিতাড়িত করেন। যুদ্ধক্ষেত্রে সফল এই সৈয়দ শাসকের প্রাণনাশ ঘটে এক অভ্যন্তীণ ষড়যন্ত্রে। আমীর ও মালিকদের একাংশ সুলতানের কর্তৃত্ব সহ্য করতে পারছিল না। এর মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় গোষ্ঠীর অভিজাতই ছিলেন। এদের নেতৃত্বে ছিলেন তাঁর প্রধানমন্ত্রী সরওয়ার-উল্-মুল্‌ক। ইনিও ছিলেন ধর্মান্তরিত হিন্দু। ১৪৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ শে ফেব্রুয়ারী সুলতান যখন তাঁর নির্মীয়মাণ মুবারকাবাদ শহর পরিদর্শনে যান, তখন সিধপাল ও রণু নামক দুই আততায়ী মুবারক শাহকে হত্যা করেন।

ড. *হামিদউদ্দিন* সুলতান মুবারক শাহকে সৈয়দবংশের শ্রেষ্ঠ শাসক বলে অভিহিত করে লিখেছেন : *"He was just and kind towards all of his subjects and though a firm Muslim in belief and action was free from taint of bigotry."* পিতার সাম্রাজ্য তিনি দক্ষতার সাথে রক্ষা করেন এবং একজন সমরনায়কের মতই অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত শত্রুর মোকাবিলা করেন। তাঁর ধর্মীয় নিরপেক্ষতা ছিল লক্ষণীয়। অভিজাতদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য মুবারক শাহর নীতি নিঃসন্দেহে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সহায়ক ছিল। তাঁর অনন্য কৃতিত্ব হলো যে, তিনি বিদেশী মোঙ্গলদের অধীনতা থেকে সৈয়দ বংশের শাসনকে মুক্ত করে স্বাধীন শাসনের পত্তন করেন। অবশ্য কায়েমী স্বার্থে আঘাত হানার জন্য যে ধারাবাহিক সচেতনতা দরকার, তা মুবারক শাহের ছিল না। তাই তাঁকে ক্ষুব্ধ ও স্বার্থান্ধ অভিজাতদের ষড়যন্ত্রের শিকার হতে হয়েছিল।

শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসেবেও তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দেন। যমুনা নদীর তীরে তিনি মুবারকাবাদ নামে সুদৃশ্য শহর নির্মাণ করেন (১৪৩৩ খ্রীঃ)। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় ইয়াহিয়া সিরহিন্দী *"তারিখ-ই-মুবারকশাহী"* নামক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন।

○ মহম্মদ শাহ (১৪৩৪-'৪৫ খ্রীঃ) :

নিঃসন্তান মুবারক শাহের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র মহম্মদ-বিন্-ফরিদ সিংহাসনে বসেন এবং *'সুলতান মহম্মদ শাহ'* উপাধি নেন। রাজকীয় কোন গুণই তাঁর ছিল না, তবে রাজকীয় অপগুণসমূহ—যেমন বিলাস ও ব্যভিচার ইত্যাদিতে তিনি ছিলেন খুবই রপ্ত। সুলতান মুবারক শাহের হত্যা-ষড়যন্ত্রের নায়ক জেনেও সরওয়ার খাঁর বিরুদ্ধে মহম্মদ শাহ কোন ব্যবস্থাই নেননি।

পরন্তু তাঁকে *'খান-ই-জাহান'* উপাধিতে ভূষিত করে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করে দেন। সরওয়ার খাঁ ইচ্ছামত আমীর ও মালিকদের বদলী, পদচ্যুতি ও নিয়োগ ঘটিয়ে নিজের প্রভাব জাহির করতে চেষ্টা করেন। শেষ পর্যন্ত অভিজাতরা মিলিত হয়ে সরওয়ারকে ক্ষমতাচ্যুত ও বন্দী করেন, নতুন প্রধানমন্ত্রী হন কামাল-উল-মুল্‌ক।

মহম্মদ শাহের অকর্মণ্যতা ও রাজধানী দিল্লীর অস্থির ও দুর্বল রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে মদত দেয়। জৌনপুরের শাসক ইব্রাহিম শাহ দিল্লীর কয়েকটি অঞ্চল দখল করে নেন। গোয়ালিয়রের রাই-সহ কিছু হিন্দু জমিদার বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। মালবের শাসক মামুদ শাহ খলজী এই সুযোগে দিল্লী দখল করার উদ্দেশ্যে এক অভিযান পাঠান। সৈয়দ শাসনের এই বিপদের মুহূর্তে মহম্মদ শাহের অনুরোধে সিরহিন্দ ও লাহোরের শাসনকর্তা বহলুল লোদী সুলতানকে সামরিক সাহায্য দিয়ে বিপন্মুক্ত করেন। মামুদ খলজীর পশ্চাদ্ধাবন করে বহলুল তাঁর বহু সৈন্যকে হত্যা করেন এবং প্রচুর সম্পদ দখল করেন। কৃতজ্ঞ সুলতান মহম্মদ শাহ বহলুলকে নিজের পুত্রতুল্য বলে অভিহিত করেন এবং *'খান-ই-খানান'* উপাধিতে ভূষিত করেন। সুলতান দিপালপুর ও লাহোরের জায়গির বহলুলের হাতে অর্পণ করেন।

মহম্মদ শাহের মৃত্যুর (১৪৪৫ খ্রীঃ) পর তাঁর পুত্র আলাউদ্দিন *'আলম শাহ'* উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন। নিজের অদক্ষতা সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তাই রাজ-ক্ষমতা বিস্তারের স্বপ্ন না দেখে তিনি স্বেচ্ছায় শাসন-দায়িত্ব হামিদ খাঁ নামক জনৈক আত্মীয়ের হাতে তুলে দিয়ে বদাউনে চলে যান। অবশ্য হামিদ খাঁ-র আচরণে আলম শাহ ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেন। এমতাবস্থায় হামিদ খাঁ বহলুল লোদীকে দিল্লী দখলের জন্য গোপনে আমন্ত্রণ জানান। বহলুল লোদী বহু আগে থেকেই দিল্লী দখলের ইচ্ছা পোষণ করতেন। এই সুযোগের তিনি সদ্ব্যবহার করেন এবং হামিদ খাঁকে প্রথমে বন্দী ও পরে হত্যা করে দিল্লীর ক্ষমতা হস্তগত করেন (১৪৫০ খ্রীঃ)। অবশ্য বহলুল সুলতান আলম শাহকে দিল্লীতে এসে শাসন পরিচালনার আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু আলম শাহ দিল্লীর উপর বহলুলের কর্তৃত্ব মেনে নিয়ে স্থায়িভাবে বদাউনে বসবাসের সিদ্ধান্ত নেন। এখানেই তিনি বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেন (১৪৫১-'৬৪ খ্রীঃ)।

এইভাবে রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কোন স্থায়ী অবদান ছাড়াই সৈয়দ বংশের সাঁইত্রিশ বছরের শাসনের সমাপ্তি ঘটে। মুলতানের একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের মধ্যে সৈয়দদের উত্থান হয় ; আর পতন ঘটে বদাউনের একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসক হিসেবে। ড. *নিজামীর* ভাষায় : *"Emerging as the principality of Multan, it ended as the principality of Badaun. Neither politicaly nor culturally did it contribute anything worth while to the history of medieval Idnia."*

○ লোদী বংশ (১৪৫১ - ১৫২৬ খ্রীঃ) :

'লোদী'-রা ছিল আফগানিস্তানের অধিবাসী। আফগান 'লোদী' উপজাতির 'শাহু খেল' গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মালিক বাহরাম সুলতান ফিরোজ তুঘলকের আমলে মুলতানে আসেন এবং সেখানকার গভর্নর মর্দান দৌলতের অধীনে চাকুরি নেন। বাহরামের এক পুত্র সুলতান শাহ শিরহিন্দের শাসক নিযুক্ত হন এবং খিজির খাঁ কর্তৃক *'ইসলাম খাঁ'* উপাধিতে ভূষিত হন।

বাহ্‌রামের অপর পুত্র মালিক কারার পুত্র ছিলেন বহলুল। বহলুল তাঁর কাকা ইসলাম খাঁ-র খুব প্রিয়পাত্র ছিলেন। আরবী ও ফার্সীতে তাঁর যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। সামরিক শিক্ষাতেও তিনি পারদর্শিতা দেখান। সুলতান শাহ'র ইচ্ছানুয়ায়ী তাঁর মৃত্যুর পর বহলুল লোদী শিরহিন্দের গভর্নর নিযুক্ত হন। দিল্লীর সুলতান মহম্মদ শাহের স্বপক্ষে যুদ্ধ করে মালবের শাসক মহম্মদ খলজীকে বহলুল পরাজিত করে পুরস্কার হিসেবে লাহোরের শাসক-পদ পান। অতঃপর দিল্লীর উজীর হামিদ খাঁকে পরাজিত করে দিল্লী দখল করেন। সেই সময় সুলতান আলম শাহ্ বদাউনে অবস্থান করছিলেন। বহলুল লোদী সুলতানকে দিল্লী এসে সিংহাসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু আলম শাহ্ স্বেচ্ছায় সিংহাসন বহলুলকে সমর্পণ করে 'বদাউনে' থাকার সিদ্ধান্ত নেন। আঞ্চলিক শাসক রূপেই তিনি জীবনের শেষ দিনগুলি কাটিয়ে দেন। বহলুল সিংহাসনে বসে 'লোদী বংশের' শাসনের সূচনা করেন (১৪৫১ খ্রীঃ)।

○ বহলুল লোদী, (১৪৫১-'৮৯ খ্রীঃ) ঃ

বহলুল লোদী ১৪৫১ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে এপ্রিল *'সুলতান আবুল মুজাফর বহলুল শাহ্ গাজী'* উপাধি নিয়ে দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। সাম্রাজ্যের সংগঠক ও সামরিক নেতা হিসেবে বহলুল যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দেন। তাঁর সিংহাসন আরোহণের সময় সুলতানি রাজ্য দিল্লীও সন্নিহিত ক্ষুদ্র অংশে সীমিত হয়ে পড়েছিল। দরবারী ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তেরও অভাব ছিল না। বহলুল অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে এই সকল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির মুখোমুখি হন। বহলুল উপলব্ধি করেন যে, আলাউদ্দিন খলজীর আমলের রাষ্ট্রনীতি এই মুহূর্তে অচল। আফগান সর্দারদের স্বাধীনতাস্পৃহা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষাও তাঁর অজানা ছিল না। তাই সুলতানের চূড়ান্ত স্বৈর-শাসন প্রবর্তনের পরিবর্তে তিনি সুলতান ও অভিজাতদের 'যৌথ দায়িত্ব' মূলক শাসননীতি গ্রহণ করেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী আফগান-সর্দারদের জায়গির ও উচ্চপদ প্রদান করেন। বিদ্রোহী অভিজাতদের দমন করার জন্য সামরিক শক্তিপ্রয়োগেও তিনি দৃঢ়তা দেখান। মেওয়াট, সম্বল, কোয়েল, রেওয়ারী, চান্দেরী, গোয়ালিয়র প্রভৃতি স্থানের আঞ্চলিক শাসকদের দমন করে দিল্লীর আনুগত্য স্বীকারে ও করপ্রদানে বাধ্য করেন।

লোদী শাসনের পক্ষে সম্ভবত সবথেকে বড় বিপদ ছিল মালবের শাসক মামুদ শাহ্ শার্কী'র উচ্চাশা। সৈয়দ বংশীয় শেষ সুলতান আলম শাহের জামাতা মামুদ শার্কী মনে করতেন দিল্লীর সিংহাসনের বৈধ দাবিদার তিনিই। এই যুক্তিতে মামুদ দিল্লী আক্রমণ করেন (১৪৫১ খ্রীঃ)। বহলুল তখন ছিলেন শিরহিন্দ-এ। মামুদ বহলুলের জ্যেষ্ঠ পুত্র খাজা বায়াজিদকে পরাজিত করেন। এই সংবাদ পাওয়ামাত্র বহলুল দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন। দিল্লীর সন্নিকটে নারেলা নামক স্থানে উভয় পক্ষ মুখোমুখি হয়। জৌনপুরের সৈন্যাধ্যক্ষ দারিয়া খাঁ লোদীকে বশীভূত করে বহলুল মামুদ শার্কীর বাহিনীর মধ্যে ভাঙন ধরিয়ে দেন এবং বিভ্রান্ত শার্কীকে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তনে বাধ্য করেন। মামুদ শার্কীর মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র ও পৌত্রের আমলেও দিল্লীর সাথে জৌনপুরের বিরোধ ও সংঘাত অব্যাহত থাকে। শেষ পর্যন্ত হুসেন শাহ্ শার্কীকে বিতাড়িত করে বহলুল জৌনপুর দখল করতে সক্ষম হন (১৪৮৩ খ্রীঃ)। জৌনপুরের শাসক হন বহলুলের পুত্র বরবক। বস্তুত, রাজনৈতিক প্রতিপত্তির বিচারে জৌনপুর দিল্লী থেকেও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। স্বভাবতই এই

রাজ্য দখল করার ফলে দিল্লীর প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। কালপি, ঢোলপুর, গোয়ালিয়র-সহ বহু অঞ্চল দিল্লীর বশ্যতা স্বীকার করে। গোয়ালিয়র অভিযানের পরে বহলুল অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কিছুদিনের মধ্যে মারা যান (১৪৮৯ খ্রীঃ)।

সাম্রাজ্যের সংগঠক ও সমরনায়ক হিসেবে বহলুল লোদী দক্ষতার পরিচয় দেন। দিল্লীতে লোদীবংশের শাসনপত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাকে দৃঢ়ভিত্তি দেবার জন্যও তিনি উদ্যোগী হন। জৌনপুর, গোয়ালিয়র-সহ বহু অঞ্চলকে দিল্লীর আনুগত্যাধীনে স্থাপন করে দিল্লীর কর্তৃত্ব পানিপথ থেকে বিহার সীমান্ত পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেন। বাস্তববাদী বহলুল অবশ্য দক্ষিণ ভারত, বাংলাদেশ বা মালব, রাজস্থান প্রভৃতি অঞ্চলের উপর আধিপত্য স্থাপনের প্রয়াস নেননি। কারণ সীমিত ক্ষমতার মধ্যে সে কাজে সাফল্যের সম্ভাবনা ছিল খুবই কম। বেসামরিক প্রশাসনের উন্নয়নেও তিনি মন দিতে পারেননি। কারণ সামরিক কাজেই তাঁর অধিকাংশ উদ্যম ব্যয়িত হয়েছিল। তথাপি ফিরোজ তুঘলক ও সৈয়দ বংশীয় আলাউদ্দিন আলম শাহের মধ্যবর্তীকালীন সুতলানদের মধ্যে বহলুলই ছিলেন সর্বাধিক সফল। ড. *শ্রীবাস্তবের* ভাষায় ঃ *"both as a military leader and as an administrator he was superior to his immediate predecessors, from the death of Firuz to that of Alauddin Alam Shah."*

আফগান-সর্দারদের সাথে বহলুল বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করতেন। জাতি-বৈশিষ্ট্য হিসেবে আফগানগণ ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতায় বিশ্বাস করত। একজন আফগান হিসেবে বহলুল লোদী সেই জাতিগত বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেননি। অভিজাতদের গৃহে উপস্থিত হয়ে একাসনে বসে আহার করা বা ক্ষুব্ধ অভিজাতকে সন্তুষ্ট করার জন্য সনম্র জবাবদিহি করাকে তিনি কূটনৈতিক অস্ত্র হিসেবে প্রয়োগ করেন। অনেকের মতে, বহলুল লোদীর এই তোষণ-নীতি সুলতানি এবং কেন্দ্রীয় প্রশাসনকে দুর্বল করেছিল। তিনি সুলতানের মর্যাদাকে *'সমকক্ষদের নেতা' (chief among equals)* এই পর্যায়ে নামিয়ে এনেছিলেন। অভিজাতদের এই সমমর্যাদাবোধ সম্ভবত পরবর্তীকালে সুলতানের কর্তৃত্ব অস্বীকার করতে প্ররোচিত করেছিল। এই অভিযোগ নীতিগত দিক থেকে সত্য। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি এতটা খারাপ ছিল না। বহলুল বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই তোষণ-নীতি অনুসরণ করেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সফলও হন। ড. *ইক্তিদার হুসেন সিদ্দিক* লিখেছেন ঃ *"Bahlul himself believed in a despotic monarchy like the Turks but he had to compromise his principle with the independer.. tribal institutes of the Afgan nobels."*

ধর্মনিরপেক্ষতা এবং উদারতা ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ব্যক্তিগত ভাবে ধর্মপ্রাণ এই মুসলিম শাসক হিন্দুসহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বী প্রজাদের প্রতি যথেষ্ট উদারতা দেখান। বহু হিন্দু সামন্ত যেমন— রাজা করণ, রাজা প্রতাপ, রাজা ভির সিং, রাজা ত্রিলোকচাঁদ প্রমুখ, সুলতানের সেবায় আন্তরিকভাবে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর মধ্যে মানবিক গুণেরও অভাব ছিল না। দরিদ্র ও অসহায়ের প্রতি তিনি ছিলেন দয়াবান ও সহানুভূতিশীল। বহলুলের প্রশংসা করে *এ. বি. পাণ্ডে* যথার্থই লিখেছেন ঃ *"...a man of human spirit and wanted to promote public welfare by ensuring law and order, administering justice and refraining from burdening his people with insupportable taxes."*

○ সিকন্দর লোদী (১৪৮৯-১৫১৭ খ্রীঃ) ঃ

বহলুল লোদী তাঁর পুত্র নিজাম খাঁকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন। এই সিদ্ধান্ত সমস্ত আমীর ও মালিকদের মনঃপূত ছিল না। কয়েকজন অভিজাত ও আত্মীয় ক্ষুব্ধ হয়ে নিজামের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত হন। এই সময় বহলুলের দ্বিতীয় পুত্র বরবক শাহ এবং পরলোকগত খাজা বায়াজিদের পুত্র আজম হুমায়ুনকে দিল্লীর সিংহাসনে বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত সিকন্দর শাহ প্রভাবশালী পাঠান সর্দারদের স্বপক্ষে এনে নিজের দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। নিজাম খাঁ *'সিকন্দর শাহ'* উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন। প্রথমেই তিনি বিদ্রোহী অভিজাত ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়দের দমন করার উদ্যোগ নেন। একে একে পিতৃব্য আলম খাঁ, ভ্রাতুষ্পুত্র আজম হুমায়ুন এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বরবক শাহকে সুলতানের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। আত্মীয়দের আনুগত্যের বিনিময়ে সিকন্দর তাদের প্রতি যথেষ্ট উদার ও সহনশীল আচরণ করেন। প্রভাবশালী জায়গিরদার ও জমিদারদের দমন করার জন্য তিনি দ্বিমুখী ব্যবস্থা নেন—(১) সমস্ত জায়গিরের হিসেবপত্র কঠোরভাবে পরীক্ষার নির্দেশ দেন এবং (২) দক্ষ গুপ্তচরবাহিনীর মাধ্যমে তাদের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখার ব্যবস্থা করেন। বলা বাহুল্য, সুলতানের কাজে অসন্তুষ্ট জায়িগরদাররা তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত হন। সিকন্দর সঙ্গে সঙ্গে কঠোর হাতে তাদের দমন করেন। বিহার ও ত্রিহুতে বিদ্রোহী জায়গিরদারদের সুলতান সামরিক অভিযানে পাঠান। বিহারকে তিনি সুলতানির অন্তর্ভুক্ত করে নেন এবং দরিয়া খাঁকে বিহারের শাসক নিযুক্ত করেন। ত্রিহুত বিনাযুদ্ধে দিল্লীর বশ্যতা স্বীকার করে কর-প্রদানে রাজী হয়। বিহার দিল্লীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে বাংলার স্বাধীন সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের সাথে দিল্লীর সংঘাত-সম্ভাবনা প্রবল হয়। বিচক্ষণ সিকন্দর বাংলার সুলতানের সাথে এক অনাক্রমণ-চুক্তি স্বাক্ষর করে সীমান্তে শান্তির বাতাবরণ তৈরি করেন। রাজপুত রাজ্যগুলিকেও তিনি দমন করেন। ধোলপুর, নারওয়ার, মান্দ্রাইল, নাগাউর প্রভৃতি অঞ্চল তিনি জয় করেন। গোয়ালিয়রের শাসককেও সিকন্দর শাহ পরাজিত করেন, তবে বার্ষিক করপ্রদানের শর্তে ঐ রাজ্য গ্রাস করা থেকে বিরত থাকেন।

সমসাময়িক ও আধুনিক ঐতিহাসিকেরা মোটামুটি একমত যে, লোদীবংশীয় সুলতানদের মধ্যে সিকন্দর ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক। মধ্যযুগীয় শাসকদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় গুণাবলীর অধিকাংশই তাঁর চরিত্রে ছিল। শাসক হিসেবে তিনি ছিলেন দৃঢ়মনা ও কঠোর। মানবিক গুণাবলীরও অভাব ছিল না। অসহায় ও জ্ঞানীগুণীদের প্রতি তাঁর করুণা ও শ্রদ্ধাবোধ ছিল যথেষ্ট। *স্যার উলসী হেগ্* লিখেছেন ঃ *"তিন লোদীবংশীয় নৃপতির মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বোত্তম, যিনি পিতার অসমাপ্ত কাজ সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করেছিলেন।"* সিকন্দরের অন্যতম কৃতিত্ব হলো যে, তিনি ক্ষমতালোভী ও স্বার্থান্ধ আফগান অভিজাতদের করুণা থেকে সুলতানির কর্তৃত্বকে উদ্ধার করে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বহলুলের আপস-নীতি সিকন্দর বর্জন করেন এবং এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করেন যে, *"সুলতানই সমস্ত কর্তৃত্বের আধার"।* দেশের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মানোন্নয়নেও তিনি সচেষ্ট ছিলেন। বাণিজ্য-শুল্ক রহিত করে তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যকে উৎসাহিত করেন। মূল্যমান নিয়ন্ত্রণে রাখার কাজেও তিনি সজাগ

ছিলেন। দরিদ্র ও অনাথদের প্রতি তাঁর গভীর করুণা ছিল। প্রতিবছর তিনি দরিদ্র ব্যক্তিদের একটি তালিকা প্রস্তুত করে তাদের অন্তত ছয়মাসের রেশন দেবার ব্যবস্থা করেন। কথিত আছে, তিনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং কয়েকটি ফার্সী কবিতা রচনা করেছিলেন। শাসক ও মানুষ হিসেবে তাঁর প্রশংসা করে **ড. *এস. লাল*** লিখেছেন ঃ *"Sikander Shah had ruled for twenty-nine years full of glory and distinction. He was the greatest ruier of the Lodi dynasty, and outshone both his father Bahlol and his son Ibrahim."* মানবিক গুণাবলী তাঁর রাজনৈতিক দৃঢ়তাকে কোন কোন ক্ষেত্রে আচ্ছন্ন করেছে। যেমন—বরবক শাহের অপদার্থতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে অবহিত হয়েও তিনি ভ্রাতার বিরুদ্ধে কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে পারেন নি। যোদ্ধা হিসেবেও তাঁর দক্ষতা প্রশ্নাতীত নয়।

ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও অনুদার নীতি সিকন্দর শাহের চরিত্রে কিছুটা কালো দাগ লেপন করেছে। সমকালীন লেখক নিজামউদ্দিন আহমেদ লিখেছেন যে, সিকন্দর লোদীর ধর্মীয় গোঁড়ামি অন্ধত্বের শেষ পর্যায়কেও অতিক্রম করেছিল। নগরকোটের জাভালামুখি মন্দির ধ্বংস করে দেবমূর্তিগুলিকে তিনি টুকরো টুকরো করে কসাইখানায় বাটখারা হিসেবে ব্যবহারের নির্দেশ দেন। হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর ও তীর্থ কর আরোপ করেন। অন্য ধর্মাবলম্বীদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করার জন্যও চাপ দেন। সাধারণভাবে তাঁর এই সংকীর্ণতা হিন্দুপ্রধান ভারতবর্ষের রাজনীতিতে স্বাভাবিক ভাবেই প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছিল। অবশ্য *ড. কে. এস. লাল* ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর মতে, পঞ্চদশ শতকের ভক্তিবাদী আন্দোলন তথা কবীর ও শ্রীচেতন্য প্রমুখের উদারতাবাদের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে সিকন্দর লোদীর ধর্মনীতি অসহনীয় ও সংকীর্ণ বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু চতুর্দশ শতকে এহেন ধর্মীয় আচরণ স্বাভাবিক বলেই বিবেচিত হত। ড. লালের বিশ্লেষণে আবেগপ্রবণতার আধিক্য লক্ষণীয়। পঞ্চদশ শতকের মরমীয়া ভক্তি-সাধকদের উদারতাবাদের সাথে তাল মিলিয়ে চলার ব্যর্থতার দায় সিকন্দর শাহ কোনভাবেই অস্বীকার করতে পারেন না।

উপরিলিখিত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সিকন্দর শাহকে লোদীবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি বলে অধিকাংশ পণ্ডিত স্বীকার করেছেন। আফগান-সর্দারদের গোষ্ঠীপ্রাধান্যের দাপট থেকে তিনি সুলতানি শাসনকে মুক্ত করেন। সাম্রাজ্যের সংহতি ও প্রসারের কাজে সাফল্য দেখান। উলেমাতন্ত্রের নির্দেশে চালিত না হয়ে তিনিই উলেমাদের পরিচালনা করতে সক্ষম হন। জনহিতকর কাজেও তিনি কিছু কিছু সাফল্য দেখান। তাই **ড. *পাণ্ডে*** (A. B. Pandey) যথার্থই লিখেছেন ঃ *"with all his faults and failings, Sikandar was undoubtedly the greatest ruler of Lodi dynasty."*

○ ইব্রাহিম লোদী (১৫১৭-'২৬ খ্রীঃ) ঃ

সিকন্দরের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ্যপুত্র ইব্রাহিম লোদী সিংহাসনে বসেন। এই সময় অভিজাতদের একাংশ সুলতানের কনিষ্ঠ ভ্রাতা জালাল খাঁকে জৌনপুরে স্বাধীন শাসকরূপে ঘোষণা করে সুলতানিকে দু'ভাগে ভাগ করার উদ্যোগ নেন। এই প্রচেষ্টার ভয়ংকর পরিণতি ইব্রাহিমের অজানা ছিল না। তাই জালাল খাঁ-র ক্ষমতাবৃদ্ধির আগেই তাঁকে নিরস্ত করার চেষ্টা

করেন এবং দিল্লীতে ডেকে পাঠান। কিন্তু জালাল খাঁ সুলতানের আদেশ অমান্য করলে ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে ওঠে। ইব্রাহিমের বাহিনী দ্বারা তাড়িত হয়ে জালাল জৌনপুর ছেড়ে কালপি, আগ্রা, গোয়ালিয়র, মালব হয়ে গোণ্ডপ্রদেশে উপস্থিত হন। গোণ্ডরা বিশ্বাসঘাতকতা করে জালালকে সুলতানের হাতে তুলে দেয়। ইব্রাহিম তাঁকে হত্যা করে বিপদমুক্ত হন।

বিদ্রোহী জালালকে আশ্রয় দেবার অপরাধে ইব্রাহিম গোয়ালিয়র রাজ্য আক্রমণ করে রাজা বিক্রমজিৎকে পরাজিত করেন ও দিল্লীর বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। *টড* (Tod)-এর বিবরণ থেকে জানা যায় যে, রাজপুত শৌর্যের প্রতীক মেবাররাজ্যকেও দখল করার চেষ্টা ইব্রাহিম করেছিলেন। এই সূত্রে রানা সংগ্রাম সিংহের (বা রানা সঙ্ঘ) সাথে ইব্রাহিম লোদীর একাধিক সংঘর্ষ হয়। রানা বীরত্বের সাথে সুলতানি-বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করেন। এই যুদ্ধে রানার একটি পা ও বাম হাত নষ্ট হয়ে যায়। তথাপি তিনি সাহসিকতার সাথে মুসলিম-বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যান এবং শেষ পর্যন্ত নিজের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখেন। অবশ্য কেউ কেউ এই যুদ্ধের বাস্তবতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এঁদের মতে এত বড় একটা ঘটনা সত্য হলে, বদাউনি বা ফেরিস্তা অবশ্যই তা উল্লেখ করতেন। কিন্তু তাঁদের লেখায় এই বিবরণী অনুপস্থিত।

সামরিক নেতা হিসেবে ইব্রাহিম লোদী মোটামুটি কৃতিত্বের পরিচয় দিলেও সাম্রাজ্যের সংগঠক ও কূটনীতিক হিসেবে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ ব্যর্থ। সিংহাসনে বসেই তিনি সুলতানের স্বৈরাচারী ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ করার সিদ্ধান্ত নেন। অভিজাতরা যে মর্যাদা ও ক্ষমতা ভোগ করত, তা তিনি সংকুচিত করার উদ্যোগ নেন। দরবারে আফগান-সর্দারদের আচার-আচরণ সম্পর্কে কিছু কঠোর নিয়মাবলী চালু করেন। সুলতানের উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে মহৎ ছিল ; কিন্তু তা আদৌ যুগোপযোগী ছিল না। ব্যক্তিগতভাবে ইব্রাহিম ছিলেন হঠকারী ও বদমেজাজী। আফগান অভিজাতদের কাছ থেকে তুর্কী-অভিজাতদের সম-আনুগত্য আশা করেছিলেন। তিনি ভুলে যান যে, আফগানদের জীবনধারা অনুযায়ী অভিজাতরা রাজাকে একজন নেতৃস্থানীয় সহকর্মী বলেই গণ্য করত। তাদের জাতিতত্ত্ব অনুসারে রাজা সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী ছিলেন না। অথচ সুলতান ইব্রাহিম অতি দ্রুত এবং অত্যন্ত রূঢ়তার সাথে আফগান সর্দারদের উপর সুলতানের সর্বময় কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। প্রকাশ্য দরবারে আফগান-অভিজাতদের সহবৎ প্রসঙ্গেও তিনি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও তিরস্কার করেন। সুলতানের ব্যবহারে আফগান-সর্দাররা ক্ষুব্ধ হন এবং সুলতানের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হন। তাঁর পিতা সিকন্দর লোদীও আফগান অভিজাতদের স্বাধীনতাস্পৃহা কমাতে সচেষ্ট ছিলেন ; কিন্তু তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন খুব ধীরে এবং সাবধানতার সাথে।

ইব্রাহিম অকারণে আজম হুমায়ুন শেরওয়ানীকে কারারুদ্ধ করেন। অথচ জালাল খাঁর বিদ্রোহদমনে শেরওয়ানী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। সুলতানের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেন শেরওয়ানীর পুত্র ইসলাম খাঁ। কারাপ্রদেশে তিনি বিক্ষুব্ধ আফগানদের সংগঠিত করেন। ইব্রাহিম শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহীদের দমন করেন এবং ইসলাম খাঁকে হত্যা করেন। মিঞা ভুওয়া এবং হুমায়ুন শেরওয়ানীকেও কারাগারে হত্যা করা হয়। সুলতানের নির্দেশে প্রবীণ হুসেন ফরমুলীকে হত্যা করা হয়। হঠকারী আচরণে অন্যান্য অভিজাতরা ভীত না হয়ে বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে লোদী ও ফরমুলী আমীররা নিজ নিজ নিরাপত্তার কারণে ঐক্যবদ্ধ

হতে থাকেন। দরিয়া খাঁর পুত্র বাহার খাঁ লোহানী বিহারে নিজেকে 'স্বাধীন সুলতান' বলে ঘোষণা করেন। ফৎ খাঁ, শের খাঁ (পরবর্তীকালে শের শাহ্) প্রমুখ অনেকেই বাহার খাঁর পক্ষে যোগ দেন।

পূর্ব ভারতের অভিজাতদের সাথে ইব্রাহিমের সংঘাত পশ্চিম প্রান্তেও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তখন পাঞ্জাবের গভর্নর ছিলেন দৌলত খাঁ লোদী। কার্যত তিনি স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করতেন। দৌলতের পুত্র দিলওয়ার খাঁ দিল্লীতে গিয়ে নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করেন সুলতান কি নির্মম আচরণ করেন বন্দী অভিজাত ও তাদের পরিবারের সাথে। স্বভাবতই দৌলত খাঁ ইব্রাহিমের হাত থেকে স্থায়িভাবে মুক্তি পাওয়ার পথ খুঁজতে থাকে। ঠিক তখনই তৈমুরের বংশধর রাজ্যচ্যুত জহিরুদ্দিন বাবর কাবুলের অনিশ্চিত আশ্রয় থেকে হিন্দুস্থানের সমৃদ্ধ ও সহজ ভূমিতে অভিযানের পরিকল্পনা করেছিলেন। দৌলত খাঁ বাবরকে দিয়ে ইব্রাহিমকে জব্দ করার সিদ্ধান্ত নেন। অবশ্য একাজে তিনি সিংহাসনের আর এক দাবিদার আলম খাঁ (ইব্রাহিমের কাকা)-এর মদত পান। বিচক্ষণ বাবর সানন্দে এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। পানিপথের প্রান্তরে মুঘল-বাহিনীর সাথে ইব্রাহিম লোদীর চূড়ান্ত সংঘর্ষ হয়। অন্তর্দ্বন্দ্বে দীর্ণ সুলতানি-বাহিনী শক্তিশালী মুঘলদের হাতে বিধ্বস্ত হয় (১৫২৬ খ্রীঃ)। পানিপথের প্রান্তরে সূচিত হয় ভারত-ইতিহাসের এক নবতম অধ্যায়ের।

সপ্তম অধ্যায়

সুলতানির প্রশাসনিক ও আর্থিক নীতি
[Administrative and Economic Policy of the Sultanate]

○ সুলতানি শাসনে রাষ্ট্রের প্রকৃতি ঃ

'রাষ্ট্র' প্রাথমিকভাবে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু দেশ বা জাতির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলির বিকাশের উপযোগী ক্ষেত্র হিসেবে রাষ্ট্রের স্থান সর্বাগ্রে। স্বভাবতই মধ্যকালীন ভারতবর্ষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারার উত্থান-পতনের গতি-প্রকৃতি জানার জন্য ভারতে সুলতানি শাসনের প্রকৃতি বিচার গুরুত্বপূর্ণ। তুর্কো-আফগান শাসকগণ সমকালীন ভারত-রাষ্ট্রকে একটি *'ইসলামিক রাষ্ট্র'* হিসেবে প্রতিভাত করার ক্ষীণ চেষ্টা করেছেন। অন্তত, তাঁরা প্রকাশ্যে সুলতানি রাষ্ট্রকে *'ধর্মনিরপেক্ষ'* বলে অভিহিত করেননি। ইসলামের প্রসারের প্রাথমিক পর্বে সে ধরনের চেষ্টা হয়তো তাঁদের পক্ষে আত্মবিনাশের সমার্থক হত। কিন্তু তত্ত্ব এবং তার প্রয়োগের মধ্যে পার্থক্য খুবই স্পষ্ট। এবং এখান থেকেই শুরু হয়েছে একটি জ্বলন্ত বিতর্কের। এবং তা হল সুলতানি রাষ্ট্র *'ধর্মাশ্রয়ী'* (Theocratic) ছিল, নাকি *'ধর্মনিরপেক্ষ'* (Secular) ছিল।

ভারতে তুর্কো-আফগান সুলতানদের আমলে রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে স্পষ্ট মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। *আর. পি. ত্রিপাঠী. ঈশ্বরীপ্রসাদ, এ, এল, শ্রীবাস্তব* প্রমুখ মনে করেন, তুর্কো-আফগান যুগে ভারতরাষ্ট্র ছিল ধর্মাশ্রয়ী (Theocratic)। *ঈশ্বরীপ্রসাদের* মতে, সুলতানদের সীমাহীন ক্ষমতা অবশ্যই ছিল ; এক বিচারে প্রশাসনিক ও ধর্মীয় বিচারে সুলতান ছিলেন সর্বেসর্বা ('both Caeser as well as Pope')। কিন্তু সুলতানেরা শরিয়তের নির্দেশ লঙ্ঘন করতে পারতেন না। শরিয়ত বা ধর্মশাস্ত্রের বিধান ছিল সুলতানি আমলের নীতি নির্ধারণের মাধ্যম। উলেমাদের চিন্তা-ভাবনাকে মর্যাদা দিতে শাসককুল দায়বদ্ধ ছিলেন। মধ্যযুগে সুলতানদের শাসন বিষয়ে অনুসৃত পথ ও পদ্ধতির অন্যতম লক্ষ্য ছিল ইসলামধর্মের অনুশাসনগুলিকে বাস্তবায়িত করা। ড. *ত্রিপাঠী* লিখেছেন ঃ *"All the institutions that the Muslims either evolved or adopted were intended to subserve the law."* অন্যদিকে ***ড. কুরেশী (I. H. Qureshi), মহম্মদ হাবিব, সতীশচন্দ্র প্রমুখ অনেকেই ঠিক বিপরীত মত পোষণ করেন***। এঁদের মতে, *সুলতানি রাষ্ট্র প্রকৃত অর্থে 'ধর্মাশ্রয়ী' বা 'পুরোহিততান্ত্রিক' ছিল না। ধর্মাশ্রয়ী রাষ্ট্রের অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যই ভারতের সুলতানি আমলে হয় অনুপস্থিত ছিল, অথবা লঙ্ঘিত হয়েছিল। এই গোষ্ঠীর মতে, সুলতানি রাষ্ট্র ছিল ধর্মনিরপেক্ষ, সামরিক এবং অভিজাততান্ত্রিক*।

এই বিতর্কের সমাধানে পৌঁছানোর জন্য ধর্মাশ্রয়ী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য এবং ইসলামের ধর্মতত্ত্ব সুলতানি আমলে কতখানি বা কিরূপে প্রযুক্ত ছিল, তা জানা আবশ্যিক। *'Theocracy'* বা দেবতন্ত্র শব্দটির উৎপত্তি গ্রীক শব্দ *'Theos'* থেকে। এর অর্থ ঈশ্বর (God)। দেবতান্ত্রিক বা ধর্মাশ্রয়ী

রাষ্ট্র সরাসরি ঈশ্বর কর্তৃক কিংবা তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে যাজকশ্রেণী (Sacerdotal class) দ্বারা শাসিত হয়।[১] একটি ধর্মাশ্রয়ী রাষ্ট্রে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী। এই ধরনের রাষ্ট্রে ধর্মীয় আইনই চূড়ান্ত এবং পুরোহিত বা যাজকশ্রেণী অনিবার্যভাবে সেই অদৃশ্যমান ঈশ্বরের পক্ষে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন।[২] অর্থাৎ একটি ধর্মাশ্রয়ী রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল— (ক) সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, (খ) যেখানে মানব-সৃষ্ট আইনের পরিবর্তে ঈশ্বর নির্দিষ্ট বিধান আইন হিসেবে প্রযুক্ত হয় এবং (গ) অদৃশ্যমান ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে পুরোহিতশ্রেণী ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত ভাবে রাষ্ট্রীয় কাজ সম্পাদন করেন। এই প্রেক্ষাপটে ভারতে সুলতানি রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিচার করা যেতে পারে।

মহানবী হজরত মহম্মদের আবির্ভাবের পর নানা বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে ইসলামীয় রাষ্ট্রের পত্তন ও বিকাশ ঘটেছে। হজরত মহম্মদ পরিস্থিতিগত কারণে মক্কা থেকে মদিনায় পরিযান কালে তাঁর অনুগামীদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার্থে রাজনৈতিক নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এইভাবে তিনি বিশ্বে প্রথম মুসলিম রাষ্ট্রের পত্তন করেন এবং একাধারে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদিষ্ট বাণী প্রচার ও 'বিশ্বাসী'দের ইহজাগতিক জীবনের রক্ষকের ভূমিকা পালন করেন। হজরতের তিরোধানের পর ইসলামীয় রাষ্ট্রের পরিচালনভার খলিফার উপর অর্পিত হয়েছিল। একটি সংগঠিত গোষ্ঠী হিসেবে মুসলমানদের কিছু কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করতে হত। ইসলামের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরানের ভিত্তিতে মুসলমানদের জন্য পালনীয় দায়িত্ব ও কর্তব্যভিত্তিক যে আইনবিধি রচিত হয়েছে, তা হল *'শর'* বা *'শরিয়ত'।* খলিফা শরিয়ত-এর ভিত্তিতে মুসলমান জগতকে পরিচালনা করার জন্য দায়বদ্ধ। ইবন খালদুন-এর ব্যাখ্যা অনুসারে অনুশাসনিক প্রয়োজনে খিলাফৎ-এর সৃষ্টি, তাই ইসলামীয় আইন অনুসারে খলিফার প্রতি আনুগত্য প্রতিটি মুসলমানের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক। অবশ্য খলিফাকে অন্যান্য ধর্মের মত প্রধান পুরোহিত আখ্যা দেওয়া যায় না। কারণ ইসলামধর্মে পুরোহিততন্ত্রের কোন অস্তিত্ব নেই। যাই হোক, ইসলামের অস্তিত্ব রক্ষা ও প্রসারের জন্য আবশ্যিক ইসলামীয় বন্ধনসৃষ্টির ভিত্তি হিসেবে খলিফাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। এখানে মুসলমানদের স্বাধীন ও সার্বভৌম গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত করার ইচ্ছা একটি রাজনৈতিক ধারণা। এবং সেই রাজনৈতিক কাজটি সম্পন্ন করেন খলিফা। এই অর্থে খলিফাতন্ত্র বা খিলাফৎ একটি রাজনৈতিক সংগঠন ; যার উৎস ধর্মীয় অনুশাসন থেকেই। ড. *কুরেশীর* (I. H. Quershi)-এর ভাষায় ঃ *"The Caliphate is a political institution so far as its functions are concerned ; though its basis and Sanctions are canonical"* অর্থাৎ ইসলামীয় রাষ্ট্রের রাজনৈতিক শক্তি, সংগঠন ও ভিত্তিস্বরূপ ধর্মের অস্তিত্ব অনিবার্য। সার্বভৌম ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী ছিলেন ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে প্রথমে পয়গম্বর এবং তাঁর তিরোধানের পর *'খলিফা'* ইসলামীয় রাষ্ট্রমণ্ডলের সর্বোচ্চ পরিচালক। অন্যান্য শাসকেরা কখনোই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নন, তারা খলিফার নায়েব মাত্র। অর্থাৎ ইসলামীয় তত্ত্ব অনুযায়ী এই রাষ্ট্রের লক্ষ্য হল *'ঈশ্বরের রাজত্ব'* প্রতিষ্ঠা করা এবং খলিফা 'আল্লার নির্দেশে আল্লার জীবকুলের বিচার

১. *Consises Oxford Dictionary : 1968 P-1344*

২. *Chamber's 20th Century Dictionary, 1968 : P-1005.*

ও শাসন করতে' দায়বদ্ধ। এই বিচারে একটি ইসলামিক রাষ্ট্র, ত্রিবিধ কিন্তু অবিচ্ছেদ্য, বৈশিষ্ট্য দ্বারা মণ্ডিত—*'এক প্রত্যাদেশ, এক সার্বভৌম এবং একজাতি' (one scripture, one sovereign and one nation)*। এই প্রত্যাদেশ হল পবিত্র কোরান, সার্বভৌম হল 'ইমাম' (খলিফা) এবং জাতি হল 'মিল্লাত' বা ইসলামিক সৌভ্রাতৃত্ব। ইসলামিক রাষ্ট্রের মৌল বৈশিষ্ট্য হল এই তিনটি শর্তের অবিভাজ্যতা। সাধারণভাবে একটি ইসলামিক রাষ্ট্র হল মুসলমানদের নিয়ে গঠিত, মুসলমান দ্বারা পরিচালিত এবং মুসলমানদের সুখ ও মঙ্গলবিধানের জন্য একান্তভাবে দায়বদ্ধ।

ইসলামীয় রাষ্ট্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল উলেমাদের অস্তিত্ব। ইবন হুসেন-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী যে শিক্ষিতশ্রেণী শরিয়ত-এর গূঢ় অর্থ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করে তা ব্যাখ্যা ও প্রচার করেন তিনি *'উলেমা'*। এঁদের মধ্য থেকে নির্বাচিত একজন রাষ্ট্র-শাসন বিষয়ে শাসককে পরামর্শ দেবার জন্য দায়িত্ব পান। তিনি হলেন *'শেখ-উল্-ইসলাম'*। অর্থাৎ ইসলামীয় রাষ্ট্রব্যবস্থায় উলেমাগণ বা তাদের প্রতিনিধি 'শরা'র ব্যাখ্যা, প্রচার ও পরামর্শদানের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ভূমিকা পালনের অধিকারী। ইসলামীয় রাষ্ট্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল *'মিল্লাত'*। মিল্লাত হল ইসলামধর্মাবলম্বী জনগণের সৌভ্রাতৃত্ব। একটি প্রকৃত ইসলামীয় রাষ্ট্রে মিল্লাত সর্বমুখী সুযোগ-সুবিধা ও নিরাপত্তাভোগের অধিকারী। মিল্লাত নয় এমন মানুষকে দু'ভাগে চিহ্নিত করা হয়—(১) 'আইন-ই-কিতাব' অর্থাৎ ধর্মশাস্ত্রে যাদের নাম পাওয়া যায়, যেমন ইহুদি ও খ্রীষ্টান প্রভৃতি। এরা হল জিম্মি। নির্দিষ্ট শর্তপালনের পরিবর্তে এরা ইসলামীয় রাষ্ট্রের সেবা পেতে সক্ষম। এবং (২) অন্যান্য সবাই, যারা পৌত্তলিক। ধর্মশাস্ত্রে এই পৌত্তলিকদের জন্য কোন অধিকার স্বীকৃত নয়।

প্রাথমিকভাবে এবং আপাতবিচারে দিল্লী-সুলতানির ধর্মাশ্রয়িতা সম্পর্কে *ঈশ্বরীপ্রসাদ, শ্রীবাস্তব* প্রমুখ ঐতিহাসিকের বক্তব্যকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। তত্ত্বগতভাবে সুলতানেরা ভারতে বিধর্মী বা শত্রুর রাজত্বের (দার-উল্-হার্ব) অবসান ঘটিয়ে ইসলামের রাজত্ব ও বিশ্বাসীদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার নৈতিক দায়িত্ব অস্বীকার করেননি। দিল্লীর তুর্কো-আফগান সুলতানেরা নিজেদের ইসলামীয় জগতের একটি অংশ বলে মনে করতেন। দু'-একটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত ছাড়া অধিকাংশ সুলতান ইসলামীয় আদর্শ অনুসরণে রাষ্ট্র-পরিচালনার চেষ্টা করতেন। দিল্লীর সুলতানেরা ইসলামীয় বিধি অনুসারে খলিফাকে নিজেদের 'প্রভু' বলে গণ্য করতেন। আলাউদ্দিন খলজী ও মুবারকশাহ খলজী ছাড়া অন্যান্য সুলতানেরা নিজেদের খলিফার সহকারী বলেই গণ্য করতেন। খলিফার কাছ থেকে এঁরা নিজ পদের স্বীকৃতি হিসেবে *'নাসির-ই-আমীর-উল্-মুমনিন'* (খলিফার সহকারী) বা *'ইয়ামিন-উল্-খলিফা'* (খলিফার দক্ষিণহস্ত) ইত্যাদি উপাধি গ্রহণ করে কৃতার্থ বোধ করেছিলেন। ইলতুৎমিস ১২২৯ খ্রীষ্টাব্দে 'খলিফার প্রতিনিধি' হিসেবে স্বীকৃতি-পত্র (মনসুর) লাভ করেন। গিয়াসউদ্দিন বলবন নিজেকে খলিফার সহকারী নামে অভিহিত করে গর্ববোধ করেন। মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিজ খাঁর পৌত্র হলাকু ১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দে আব্বাসীয় খলিফা মুস্তাসিম বিল্লাহকে হত্যা করে বাগদাদে খলিফাতন্ত্রের অবসান ঘটান। কিন্তু তার পরেও ভারতের সুলতানেরা খলিফার প্রতি আনুগত্যের বন্ধন ছিন্ন করার সাহস দেখাননি। খলিফার অবর্তমানেও দিল্লীর সুলতানেরা নিজেদের 'খলিফা সহকারী' বলে অভিহিত করতেন, তাঁদের মুদ্রায় খলিফার নাম উৎকীর্ণ করতেন এবং খলিফার নামে 'খুৎবা' পাঠ করতেন। মহম্মদ-

বিন্-তুঘলক তাঁর রাজত্বের প্রথমদিকে তাঁর মুদ্রা থেকে খলিফার নাম বাদ দেন। সুলতানি শাসনের প্রায় পঁচাত্তর বছর ধরে চলে-আসা ব্যবস্থার বাইরে কিন্তু তিনিও বেশিদিন থাকতে পারেন নি। অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহে বিব্রত মহম্মদের শেষ পর্যন্ত মনে হয়েছিল যে, খলিফার অদৃশ্য অনুমোদন ছাড়া তাঁর পক্ষে এই রাজনৈতিক দুর্যোগমুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। তাই শেষ পর্যন্ত তিনি রাজত্বের শেষদিকে মুদ্রায় খলিফার নাম পুনঃপ্রবর্তন করেন। তখন বাগদাদ থেকে অপসারিত হয়ে আব্বাসীয় খলিফার বংশধরেরা মিশরে বসবাস করছিলেন। মহম্মদ তুঘলক মিশর থেকে আব্বাসীয় খলিফার জনৈক বংশধরের স্বীকৃতি-পত্র আদায়ের মাধ্যমে *'মিল্লাত'*-এর কাছে নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণের চেষ্টা করেন। এমনকি খলিফার জনৈক আত্মীয় দৌলতাবাদে উপস্থিত হলে সুলতান তাঁকে অভূতপূর্ব সম্মান প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন। ফিরোজ তুঘলক একাধিকবার দূত প্রেরণ করে মিশর থেকে খলিফার অনুমোদনপত্র সংগ্রহ করেন। তিনি *'নায়েব-ই-আমীর-উল্-মুমনিন'* বা খলিফার নায়েব উপাধি গ্রহণ করে কৃতার্থ হন। খলিফার নামে 'খুৎবা' পাঠ করেন এবং মুদ্রা খোদাই করেন। ফিরোজ-এর আমলে সরকারিভাবে ধর্মান্তরিতকরণকে উৎসাহিত করা হত। কেবল হিন্দু নয়, অ-সুন্নী মুসলমানদের প্রতিও তিনি অসহিষ্ণু আচরণ করতেন। অবশ্য ফিরোজ শাহের পর কোন সুলতান খলিফার অনুমোদন প্রার্থনা করেননি।

সুলতানি শাসনের ধর্মাশ্রয়িতা প্রসঙ্গে রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর উলেমাশ্রেণীর প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণের কথা উল্লেখ করা হয়। অভিযোগটি অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ। সুলতানি আমলে উলেমাতন্ত্র কোন প্রতিষ্ঠানিক চরিত্র পায়নি কিংবা উলেমাগণ বংশানুক্রমিক ভাবে পদ ভোগ করার অধিকারী ছিলেন না। তথাপি সুলতানি আমলের রাষ্ট্রব্যবস্থায় উলেমারা বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। উলেমারা মূল ইসলামী আইন 'শরিয়ত' ব্যাখ্যা করতেন এবং সুলতান তা মান্য করতেন। সুলতানি শাসনের প্রথমদিকে রাষ্ট্র-পরিচালনার ক্ষেত্রে উলেমাদের প্রচণ্ড প্রভাব লক্ষ্য করা অসম্ভব নয়। আলাউদ্দিন খলজীর পূর্ববর্তী প্রায় সব সুলতানই উলেমাদের সম্মতি ছাড়া কোন কাজ করতে ভীতি বোধ করতেন। আলাউদ্দিন খলজী ও মহম্মদ-বিন্-তুঘলক উলেমাদের এবং উলেমাতন্ত্রের প্রভাব থেকে রাষ্ট্রনীতিকে মুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু এই ব্যতিক্রম ছাড়া সমগ্র সুলতানি আমলে উলেমাদের কর্তৃত্ব ছিল অবাধ। ***ড. ইউসুফ হুসেন*** লিখেছেন যে, উলেমারা ছিলেন গোঁড়া ও পরিবর্তন-বিরোধী। এদের শিক্ষা হত মাদ্রাসায়। এদের পাঠ্যসূচীর সাথে ধর্মের গভীর যোগ আছে। সুলতানি আমলে বিচার ও প্রশাসকের অধিকাংশ পদে উলেমারা নিয়োজিত হতেন। ফলে সামগ্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় তাঁদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা সম্ভব হয়েছিল। ***ড. রোমিলা থাপার*** লিখেছেন ঃ *"ধর্ম ও রাজনীতির মিলনের ফলে রাজ্যশাসনের ক্ষেত্রে উলেমাদের প্রভাব অস্বীকার করা সম্ভব ছিল না। ইসলামীয় প্রতিষ্ঠান ও উলেমাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন সুলতানের পক্ষে আবশ্যকীয় হয়ে দাঁড়ায়। ফলে সুলতানরা উলেমাদের ভূমিদান করতেন, মসজিদ নির্মাণ করতেন এবং উলেমাদের সন্তুষ্টির জন্য মাঝে মাঝে হিন্দুদের দেবমূর্তি ও মন্দির ধ্বংস করে অ-মুসলমান বিরোধী ভাবমূর্তি তুলে ধরতেন।"*

ড. ঈশ্বরীপ্রসাদ, এ. এল. শ্রীবাস্তব, আর. পি. ত্রিপাঠী প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ সুলতানি আমলে উলেমাদের একাধিপত্যের বিষয়ে সহমত পোষণ করেছেন। এঁদের মতে, এই উলেমারা ছিলেন প্রায় ধর্মান্ধ এবং মূলত হিন্দুবিদ্বেষী। ধর্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করে প্রাণ বিসর্জন দেওয়াকে এঁরা মহান

ও পূণ্যকর্ম বলে প্রচার করেন। মুসলিম শাসকশ্রেণীকে এই ধর্মযুদ্ধ করার জন্য নিরন্তর প্ররোচিত করতে থাকেন। রাষ্ট্রনীতি হিসেবে উলেমারা অ-মুসলমানদের বিনাশসাধন, মূর্তিপূজার অবসান ঘটানো এবং অবিশ্বাসীদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করাকে মুসলিম রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য বলে প্রচার করেন।

ড. *ঈশ্বরীপ্রসাদ* লিখেছেন ঃ *"The Muslim State in India, as else-where, was a theocracy. The king was Caesar and Pope combined in one. But he is merely to carryout God's will."* তিনি লিখেছেন ঃ সুলতানি আমলের সামাজিক আইনগুলি ইসলামীয় ধর্মশাস্ত্রের নির্দেশের ভিত্তিতেই রচিত হয়েছিল। দিল্লীর সুলতানেরা উলেমাদের পরামর্শ নিয়ে রাষ্ট্রীয় আইনবিধি রচনা করতেন। রাজকীয় অনুশাসনের ভিত্তি ছিল শরিয়তের নির্দেশনামা। উলেমারা শরিয়তের ভিত্তিতে সুলতানকে ১২টি কর্তব্য পালনের যে পরামর্শ দিয়েছিলেন, তা একমাত্র মহম্মদ তুঘলক ছাড়া সবাই মান্য করতেন। এমনকি আলাউদ্দিন খলজীও রাষ্ট্রনীতিকে ধর্মের বন্ধনমুক্ত করার যে প্রত্যয় ঘোষণা করেছিলেন, তা ছিল প্রয়োজনভিত্তিক। মুসলিম রাষ্ট্রে পৌত্তলিকদের অধিকার প্রসঙ্গে কাজী মুঘিসউদ্দিন তাদের (হিন্দুদের) দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক এবং অতিরিক্ত করদানে বাধ্য জাতীয় মনোভাব ব্যক্ত করলে আলাউদ্দিন তার প্রতিবাদ করতে পারেননি। ঈশ্বরীপ্রসাদের মতে, সুলতানি আমলের করব্যবস্থা শরিয়ত অনুসারে প্রযুক্ত ছিল। অ-মুসলমানদের ধর্মান্তরিত করার কাজে রাষ্ট্রযন্ত্রকে সরাসরি ব্যবহার করা হত। মুসলমান রাষ্ট্রে বাস করার মতই 'জিম্মি'দের কাছ থেকে 'জিজিয়া' কর আদায় করা হত। ধর্মাশ্রিত রাষ্ট্র ছাড়া নাগরিকদের ক্ষেত্রে এই করবৈষম্য সম্ভব ছিল না। তিনি লিখেছেন ঃ *"Toleration under Muslim domination in India in the early middle ages was not the rule but the exception."* ড. *ত্রিপাঠী* (R. P. Tripathy)-র দৃঢ় অভিমত হল যে, *"সুলতানি আমলে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের একমাত্র লক্ষ্য ছিল শরিয়তের নির্দেশ বাস্তবায়িত করা। এঁরা নিশ্চিত যে, 'সুলতানি রাষ্ট্র ছিল ধর্মাশ্রয়ী ও পুরোহিততান্ত্রিক।"*

রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের উপর যাজকশ্রেণীর বা উলেমাদের এই প্রভাব রাষ্ট্রের সংহতির সহায়ক ছিল না। প্রশাসনের উপর উলেমাদের প্রভাবের ব্যাপকতা সম্পর্কে দ্বিমত থাকলেও (পরে এ প্রসঙ্গে আলোচনা আছে) এ কথা সত্য যে, ভারতের সদ্যপ্রতিষ্ঠিত সুলতানি রাষ্ট্রে এই ধর্মতাত্ত্বিকদের যথেষ্ট রাজনৈতিক প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল। পরে এদের প্রভাবের চরিত্র পাল্টেছে ; কিন্তু প্রভাবটা কোন-না-কোন ভাবেই থেকে গেছে। এই গোষ্ঠীর সংকীর্ণ মানসিকতা রাষ্ট্রের সর্বজনীন আদর্শের পরিপন্থী ছিল অবশ্যই। 'রাজার ধর্ম প্রজার ধর্ম'—এই ধারণা যে ভারতের মত দেশে অচল, এ কথা তাঁরা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

এক্ষেত্রে স্মরণীয় যে, কোরানে বা হাদিশে জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করার বিধান নেই। মানুষের কাছে প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটনের মাধ্যমে তার মত পরিবর্তনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু উলেমারা সংকীর্ণ দৃষ্টিতে ধর্মকে বিচার করার ফলে আইনের অপব্যাখ্যা ঘটে। উলেমারা শিক্ষিত হয়তো ছিলেন ; কিন্তু তাঁরা রাষ্ট্রনেতা বা প্রশাসক ছিলেন না। তাঁদের আচরণে সার্বিক মানবতাবোধ অনুপস্থিত ছিল। উলেমাদের এই ত্রুটি সম্পর্কে ক্রমে সুলতানরাও সচেতন হয়েছিলেন। সুলতানদের বাস্তবমুখী দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে উলেমারাও তাঁদের অবস্থান পাল্টে ছিলেন। এ বিষয়ে

আমরা পরে আলোচনা করেছি। এখন এটুকু বলা যায় যে, উলেমাদের সামগ্রিক আচরণ ভারতবর্ষের মত বহু ধর্ম ও জাতির রাষ্ট্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছিল।

খলিফার স্বীকৃতি-পত্র পাওয়ার জন্য কিংবা প্রশাসনে উলেমাতন্ত্রের উপর নির্ভরতার কারণে অনেকেই সুলতানি রাষ্ট্রকে 'ধর্মাশ্রয়ী' বলে আখ্যা দিয়েছেন, তার বিরোধী মতের বক্তব্যও বেশ জোরালো এবং তুলনামূলক ভাবে অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য। *ড. মহম্মদ হাবিব, ইফতিকার আলম খান, কে. এম, আসরাফ, ড. মুজিব, সতীশচন্দ্র* প্রমুখ ইতিহাসবিদ্ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এবং ঘটনা পরম্পরা বিচার করে প্রমাণ করেছেন যে, ভারতে মধ্যযুগের সুলতানি রাষ্ট্র আদৌ 'ধর্মাশ্রয়ী' ছিল না। সমকালীন লেখক জিয়াউদ্দিন বরণীর *'ফুতুহ-ই-জাহান্দারী'* গ্রন্থে সুলতানের রাষ্ট্রদর্শন সম্পর্কে যে মানবিক, সর্বজনীন ও বাস্তবমুখী তত্ত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার সাথে ইসলামে রাষ্ট্রদর্শনের বহু অমিল খুঁজে পাওয়া সম্ভব। ড. ***কুরেশীর*** মতে, 'শরা' বা শরিয়তের প্রাধান্যবশত অনেকে সুলতানি রাষ্ট্রকে 'ধর্মাশ্রয়ী' বলে ভুল করেন। ***রোমিলা থাপারের*** মতে, *'মধ্যযুগে সুলতানি আমলের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে খাঁটি ইসলামী আখ্যা দেওয়া অসম্ভব।'* ***ড. মহম্মদ হাবিব*** লিখেছেন : *"It was not theocratic state in any sense of the word and that its foundation was non-religious and secular."*

পবিত্র কোরানে বর্ণিত ইসলামীয় ধর্মরাজ্যের সাথে ভারতে প্রতিষ্ঠিত সুলতানি রাষ্ট্রে মিলের থেকে অমিলের পাল্লাটাই বেশি ভারি। ***প্রথমত,*** কোরান বর্ণিত রাষ্ট্রব্যবস্থায় স্বতন্ত্র সুলতান শাহীর কোন স্থান নেই। হজরত মহম্মদ এবং চারজন মহান খলিফার শাসনকালের পর মুসলিম রাষ্ট্রব্যবস্থায় "সুলতান" নামক এক নতুন কর্তৃপক্ষের অধিষ্ঠান ঘটে। "সুলতান" শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল 'ক্ষমতা' বা 'কর্তৃত্ব'। ইসলামের আইনে এই ধরনের কোন কর্তৃপক্ষের অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু ভারতবর্ষে এই 'সুলতানশাহী' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অধ্যাপক আশরাফ-এর মতে, দিল্লীর সুলতানদের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার ধারণা কোরানের ভাবনায় অনুপস্থিত এবং একটি পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এই ধারণার উদ্ভব ঘটেছে, যা বিশ্ব-ঐস্লামিক আন্দোলনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাঁর মতে, কোরানের রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থা মদিনার সুদৃঢ় গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ও উপজাতীয় পারিপার্শ্বিকতায় কার্যকরী ছিল। কিন্তু ইসলাম ধর্মের দ্রুত প্রসার ও রাজনৈতিক বৃহত্তর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যবস্থা অপ্রতুল হয়ে পড়ে। এই সময় আরব চিন্তাবিদ্‌দের একাংশ অরাজকতা নিরসনের প্রয়োজনে 'ন্যায়বোধহীন অত্যাচারী রাজতন্ত্র'[১] ও কাম্য বলে প্রচার করেন। এইভাবে কোরান-অতিরিক্ত বা বহির্ভূত একটি রাজনৈতিক তত্ত্বের উদ্ভব ঘটে। ভারতের সুলতানি শাসন এই তত্ত্বেরই ফসল।

দ্বিতীয়ত, মদিনার পতনের পর বাগদাদ খলিফার প্রধান কর্মকেন্দ্রে পরিণত হলে কোরানের অনুশাসন ও হজরতের 'সুন্নাহ' ভিত্তিক ধর্মরাষ্ট্রের ভাবনায় পরিবর্তন লক্ষণীয়ভাবে এসে পড়ে। পারসিক সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে আরবদের রাষ্ট্রচিন্তার মধ্যে কিছু মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। পারসিক রাজতন্ত্রের অধিকাংশ বৈশিষ্ট্য মুসলমানরা গ্রহণ করে। এদের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হল *'রাজার ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতার তত্ত্ব'* (Divine power of the king)। কিন্তু দৈবশক্তির সাথে

শাসকের কোনরূপ সম্পর্কের কথা কোরানে বলা হয়নি। কিন্তু পারস্যের শসানীয় বংশের রাজনৈতিক তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভারতে তুর্কীরা রাজতন্ত্র সম্পর্কে একটা নতুন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এঁরা দাবি করেন যে, সুলতান তাঁর রাজতান্ত্রিক ক্ষমতা পেয়েছেন ঈশ্বরের কাছ থেকে। 'সুলতান' কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল 'ক্ষমতা' বা 'কর্তৃত্ব'। সেই অধিকারটিকে নিরঙ্কুশ করার জন্য এঁরা সুলতানকে 'আল্লাহ'র ছায়া' (জিল-উল্-আহ) বলে প্রচার করেন ('the vicegerent of God and His shadow on the earth')। এরূপ রাষ্ট্রদর্শন গড়ে ওঠার পিছনে পরিস্থিতিগত প্রয়োজন ছিল যথেষ্ট। ইসলামের প্রসারের গোড়ার দিকে সুলতান-শাসিত রাজতন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে বিশ্বের নানা অঞ্চলে ইসলামধর্ম প্রসারিত হবার পর শাসকশ্রেণী অনুভব করেন যে, কোরান বর্ণিত অনুজ্ঞার সাহায্যে এই বিস্তৃত ও বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডে ইসলামের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা সম্ভব নয়। ফলে মধ্যযুগে ইসলামের রাষ্ট্রদর্শনে নতুন কথা বলা শুরু হয়।[১] এতে বলা হয় যে, মানুষ সামাজিক জীব এবং সংঘবদ্ধতার মধ্যেই তাঁর পূর্ণ বিকাশ সম্ভব। কিন্তু ব্যক্তি-মানুষের সংকীর্ণ স্বার্থচিন্তা এই সংঘবদ্ধ জীবনে ভাঙন ধরাতে সদা তৎপর ; এবং তা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক কোন আচরণ নয়। এই বৈপরীত্যের মধ্যে সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণের জন্যেই ইসলামীয় আইনবিধির সৃষ্টি। কিন্তু কিছু মানুষ স্বার্থান্ধতার জন্য এবং কিছু মানুষ অজ্ঞতার জন্য সেই আইনকে অস্বীকার করতে সচেষ্ট। এমতাবস্থায় প্রয়োজন একজন ক্ষমতাবান শাসকের, যিনি শক্তি প্রয়োগ করে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করবেন। অল্ গজালী এই শাসককে (সুলতান) 'রাষ্ট্রদেহের হৃদ্‌যন্ত্র' বলে অভিহিত করেছেন। সুলতানের একক কর্তৃত্ব, অভিজাতবর্গের ক্ষমতার দম্ভ এবং 'মিল্লাত' থেকে তাদের বিচ্ছিন্নতা কোরানের অনুশাসন ভেঙে দেয়। পারস্যের সম্ভোগময় জীবনধারা মুসলমানদের আকর্ষণ কবে। ভারতবর্ষের অফুরন্ত সম্পদ নবাগত যোদ্ধাদের কাছে সহজেই গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। তাই বলা চলে শরিয়তের 'রাজ্য' এবং মধ্যযুগীয় সুলতানি রাষ্ট্রের ধারণা সম্পূর্ণ এক নয়।

তৃতীয়ত, খলিফাতন্ত্রের প্রতি দিল্লীর সুলতানদের আনুগত্য ছিল বাহ্যিক। সুলতানেরা প্রত্যেকেই ছিলেন ভাগ্যান্বেষী সৈনিক। ব্যক্তিগত প্রতিভা ও উদ্যোগের দ্বারা এঁরা ক্ষমতা দখল করেছিলেন। এঁদের নিয়োগ বা পদচ্যুতি কিছুই খলিফার ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভরশীল ছিল না। এঁদের কেউ কেউ খলিফার অনুমোদন গ্রহণ করেছিলেন সত্য ; কিন্তু তা ধর্মীয় আনুগত্যের জন্য নয়, রাজনৈতিক প্রয়োজনের দাবিতে। এঁরা বুঝতে সক্ষম ছিলেন যে, খলিফার অনুমোদনের তক্‌মা থাকলে ভারতের অভ্যন্তরে ও বাইরে বৃহত্তর মুসলিম সমাজের নৈতিক-সমর্থন পাওয়া সম্ভব হবে। এই সমর্থন দ্বারা ভারতের আদি শক্তিগুলির (রাজপুত/হিন্দু) উপর একটা মানসিক চাপ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। অর্থাৎ ধর্মানুগত্য নয়—রাজনৈতিক ভীতি থেকে তাঁরা একাজে আগ্রহী হয়েছিলেন। আলাউদ্দিন খলজীর মত সমরনায়ক বা মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের মত জ্ঞানী সুলতান খলিফার অনুমোদনের প্রত্যাশী ছিলেন না। সুলতানদের অনেকেই নিজ নামে 'খুৎবা' পাঠ করতেন, নিজ নামে 'মুদ্রা' খোদাই করতেন। সুলতান মুবারক খলজী নিজেই 'খলিফা' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। তাই শরিয়ত-এ খলিফার কর্তৃত্ব ও মর্যাদার সাথে দিল্লীর সুলতানি রাষ্ট্রের কর্মবীরদের আচরণের মধ্যে সমন্বয়সাধনের চেষ্টা *'ভাবের ঘরে চুরি'* ছাড়া কিছুই নয়।

চতুর্থত, ভারতে সুলতানি শাসনব্যবস্থার উপর 'উলেমা' শ্রেণীর প্রভাব সম্পর্কিত ব্যাখ্যা অতিরঞ্জন দোষে দুষ্ট। কোরান ও শরিয়ত বিশেষজ্ঞ এই গোষ্ঠী প্রকৃত ইসলামিক রাষ্ট্রে যে ধরনের প্রতিপত্তির অধিকারী হতে পারতেন ভারতের ক্ষেত্রে তা সম্ভব ছিল না। স্বৈরাচারী সুলতানি শাসনে সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া (যেমন, ফিরোজ তুঘলক-এর আমল) রাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে উলেমাদের কর্তৃত্ব আদৌ স্বীকৃত হত না। কেবল সুলতানের ইচ্ছানুযায়ী ধর্ম-সংক্রান্ত কিছু পরামর্শ দান এবং বিচারবিভাগের কিছু উচ্চপদ লাভ করেই এঁরা সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হতেন। প্রসঙ্গত, সুলতান ইলতুৎমিসের আমলের একটি ঘটনা স্মরণীয়। একবার উলেমারা দলবদ্ধভাবে সুলতানের কাছে গিয়ে ইসলামীয় আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তাঁরা বলেন যে, হিন্দুরা হয় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে, নতুবা মৃত্যুবরণ করবে। প্রত্যুত্তরে সুলতানের মতানুযায়ী উজীর উলেমাদের জানিয়ে দেন যে, এই ব্যবস্থা বাস্তবসম্মত নয় এবং রাজনীতিসম্মতও নয়। কারণ ভারতে মুসলমানরা সংখ্যালঘিষ্ঠ ;—যেন ভাতের থালায় লবণ-এর মত। অনুরূপভাবে আলাউদ্দিন খলজী একদা বেয়ানার কাজী এবং প্রখ্যাত কোরান বিশেষজ্ঞ মুঘিসউদ্দিনকে রাজস্ব সম্পর্কে ধর্মীয় নির্দেশ ব্যাখ্যা করতে বললে ***কাজী*** সভায় বলেছিলেন, *'বুঝতে পারছি আমার ইহকাল শেষ হয়েছে। কারণ আমি ইসলামের প্রকৃত ব্যাখ্যা দিলে সুলতান কুপিত হবেন।'* অতঃপর আলাউদ্দিনের অভয় পেয়ে কাজী ধর্মের নির্দেশ ব্যাখ্যা করলে ***সুলতান*** জানিয়ে দেন, *"আপনার কথা আমি বুঝি না। আমার সিদ্ধান্ত আমি নিয়েছি এবং প্রজাদের অটুট আনুগত্য সুনিশ্চিত করেছি।"* অর্থাৎ আলাউদ্দিন বুঝিয়ে দেন যে, সুলতানের ইচ্ছাই আইন। বস্তুত, ভারতে সুলতানি শাসনের সূচনাপর্বে উলেমাকুল প্রশাসনে কর্তৃত্ব স্থাপনের জন্য শরিয়তকে নিজেদের মত করে সামনে আনতে সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু ইলতুৎমিসের আমলেই তাঁরা বুঝতে পারেন যে, সুলতানের ইচ্ছা-অনিচ্ছার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে না পারলে তাঁদের অস্তিত্বের সংকট দেখা দিতে পারে। তাই তাঁরা সুলতানের কার্যকলাপের সমর্থনে ধর্মীয় ও নৈতিক ব্যাখ্যা প্রচার শুরু করেছিলেন। উলেমারা ঈশ্বরের দূত হিসেবে সুলতানকে স্বীকার করে নিয়ে প্রচার করেন যে, সুলতানই আল্লা নির্দেশিত 'মান্যব্যক্তি' (উলুল-অম্র-এ-মিন্-কুস)। কোরানের অনুজ্ঞার নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন যে, সুলতানের (ইমাম) আদেশ মান্য করাই আল্লার বিধান বা হজরতের নির্দেশ মান্য করা। সুলতানের নির্দেশ অমান্য করার অর্থ ঈশ্বরের নির্দেশ অমান্য করা। অর্থাৎ উলেমাদের নির্দেশ অনুসারে সুলতান চালিত হতেন না ; সুলতানের ইচ্ছানুযায়ী উলেমারা শরিয়তের ব্যাখ্যাকে পরিবর্তন করে নিতেন।

পঞ্চমত, শরিয়তের ছোটখাট বহু নির্দেশ রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে সুলতানি আমলে ভঙ্গ করা হত। (ক) ইসলামের তত্ত্বানুযায়ী মুসলমানের প্রাণদণ্ড নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু ফিরোজ শাহ তুঘলক ছাড়া অন্যান্য সুলতানের আমলে শাস্তি হিসেবে মুসলিমদেরও প্রাণদণ্ড দেওয়া হত। (খ) শরিয়তের বিধানে সুদ গ্রহণ নিষিদ্ধ। কিন্তু সুলতানি আমলে ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির স্বার্থে ঋণদান ও সুদ গ্রহণ সরকারিভাবে স্বীকৃত ছিল। (গ) শরিয়তে পৌত্তলিকদের জন্য ইসলামীয় রাষ্ট্রে নাগরিক অধিকার স্বীকৃত নয়। কিন্তু সুলতানি রাষ্ট্রে হিন্দুরা কমসংখ্যায় হলেও, সরকারি পদে নিযুক্ত হত। রাজস্ববিভাগে হিন্দুদের একাধিপত্য ছিল। (ঘ) 'জিম্মি' হিসেবে হিন্দুদের গ্রহণ করলেও ব্রাহ্মণ, স্ত্রীলোক, শিশু ও সহায়সম্বলহীন ব্যক্তিদের 'জিজিয়া' কর প্রদান থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছিল।

(ঙ) মধ্যযুগে শরিয়ত-এর আইন সুলতানদের উপর আদৌ বাধ্যতামূলক ছিল না। ***বরণী*** লিখেছেন যে, '*সুলতান রাষ্ট্রের প্রয়োজনে নিয়মকানুন (জাওবিৎ) তৈরি করেন। আলাউদ্দিন খলজী বিয়ানার কাজীকে স্পষ্ট জানিয়েছিলেন যে, কোন্‌টা আইনসম্মত বা কোন্‌টা আইনসম্মত নয়, তা তিনি জানেন না, যা তিনি রাষ্ট্রের পক্ষে প্রয়োজনীয় মনে করেন, তাকেই তিনি আইন হিসেবে গ্রহণ করেন।*' অর্থাৎ রাষ্ট্রের প্রয়োজনে শরিয়তের বাইরেও আইন প্রণয়ন করা হত। এবং তা যে সব সময় শরিয়তের বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকত তাও নয়। (চ) তুর্কো-আফগান সুলতানেরা ছিলেন স্বৈরাচারী ক্ষমতার অধিকারী। সুলতান ছিলেন সমস্ত ক্ষমতার আধার। সাম্প্রতিক কিছু গবেষক জোরালো যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, সাধারণভাবে ইসলামীয় রাষ্ট্রতত্ত্বে ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ যথেষ্ট দুর্বল এবং ব্যক্তিগত স্বৈরশাসনের সম্ভাবনা সেখানে প্রবল।[১] ভারতের সুলতানি রাষ্ট্রও সেই নিয়মের ব্যতিক্রম ছিল না। এই ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থায় সামন্ততান্ত্রিক ধাঁচের পরিষদ বা সংগঠিত যাজকশ্রেণীর অনুপস্থিতি সুলতানকে একচ্ছত্র আধিপত্য ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বৈরশাসনের সুযোগ করে দেয়। পার্থিব ও অপার্থিব সমস্ত বিষয়ে সুলতানের ইচ্ছাই ছিল চূড়ান্ত। শরিয়ত বা উলেমা কেউই সুলতানদের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করতে পারত না। তাই ***কে. এম. আশরাফ*** লিখেছেন ঃ '*কোরানে রাজনৈতিক আদর্শের যতই উদার ভাষ্য করা হোক না কেন ; রাজশক্তির এহেন জ্বলন্ত ও নির্লজ্জ স্বেচ্ছাচারিতার সাথে তাকে খাপ খাওয়ানো যায় না।*'

ভারতে সুলতানি রাষ্ট্র 'ধর্মাশ্রিত' বা 'পুরোহিততান্ত্রিক' ছিল না—এ কথা মেনে নিলেও প্রশ্ন থেকে যায়—তাহলে ভারতে সুলতানি রাষ্ট্রের প্রকৃতি কি ছিল? এ প্রসঙ্গে দু'টি মত খুবই জোরালো এবং যথেষ্ট যুক্তিসমর্থিত। ***জিয়াউদ্দিন বরণীর*** *মতে,* সুলতানি আমলে ভারত ছিল পার্থিব বা ধর্মনিরপেক্ষ (জাহান্দারি) রাষ্ট্র। ইসলামের নামে শপথ গ্রহণ করে সুলতান হয়তো প্রকাশ্যে শরিয়তের অনুশাসন ও ইসলামের ঐতিহ্য অস্বীকার করতে পারতেন না ; কিন্তু তাঁরা এটাও উপলব্ধি করেছিলেন যে, স্বৈরশাসন বজায় রাখতে হলে ধর্ম-দর্শনকে রাষ্ট্র-দর্শনে পরিণত করা চলবে না। কঠোর ধর্মীয় অনুজ্ঞা নানাভাবে সুলতানের কর্তৃত্ব ও স্থায়িত্বকে বিব্রত করতে সক্ষম। তাই সুলতানেরা এই অপ্রিয় কাজ থেকে যথাসম্ভব বিরত থাকতেন। ***ড. নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের*** মতে, শাসকের ব্যক্তিগত উদারতা বা ধর্মান্ধতা দ্বারা রাষ্ট্রনীতি নির্ধারিত হত না। বাস্তব রাজনৈতিক পরিস্থিতির দাবি, গোষ্ঠী ও দলগত আনুগত্যের ঘাত-প্রতিঘাত থেকেই রাষ্ট্রনীতি নির্ধারিত হত। মুসলমান শাসকেরা এদেশে ক্ষমতা দখলের প্রাথমিক পর্বে নিজেদের একপ্রকার কর্মবৃত্তির মধ্যে আবদ্ধ রেখেছিলেন। কিন্তু বেশিদিন এই অবস্থা বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। ক্রমে তাদের ভারতীয় জীবনধারার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হয়েছিল। আর্থ-রাজনৈতিক প্রয়োজনেই তাঁরা হিন্দুদের উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছিলেন। ক্ষমতার জন্য বিভিন্ন মুসলিম গোষ্ঠীর সংঘাত অনিবার্যভাবেই শাসকদের হিন্দু সামন্ত ও জমিদারদের উপর নির্ভরশীল করেছিল। ***ড. ভট্টাচার্যের*** ভাষায় ঃ "*ব্যবহারিক জীবনে এই সহাবস্থানটাই মুখ্য হয়ে উঠেছিল, ধর্মটা গৌণ।*"[২] উলেমাদের সপক্ষে রাখার প্রয়োজনে কোন কোন সুলতান

অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি বা ধর্মাধিষ্ঠানের প্রতি কঠোর আচরণ করতেন। কিন্তু তা সীমাবদ্ধ থাকত শহরাঞ্চলের ক্ষুদ্র পরিসরে বা মুসলমানপ্রধান স্থানগুলিতে। কিন্তু বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত রীতিনীতির কোন ভাঙন দেখা যায়নি। বরণী সুলতানদের ধর্মনিরপেক্ষতার কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। ***বলবন*** একবার বলেছিলেন ঃ *'আমার প্রভু ইলতুৎমিস প্রায়শই বলতেন যে, সুলতানের পক্ষে ধর্মবিশ্বাস মেনে কাজ করা সম্ভব নয়। তাঁর পক্ষে এটাই যথেষ্ট যে, তিনি ধর্মবিশ্বাস রক্ষা করতে সক্ষম। কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে ন্যায়বিচার করতে পারলেই খুশী থাকব।'* ***জালালউদ্দিন খলজী*** *একবার বলেছিলেন যে, "হিন্দুরা দেব-দেবীর মূর্তি যমুনা নদীতে বিসর্জন দেবার জন্য নৃত্য-গীত সহযোগে রাজপ্রাসাদের পাশ দিয়ে চলে যেত। সুলতানকে অসহায়ভাবে তা সহ্য করতে হত।"* **ড. *সতীশচন্দ্র*** লিখেছেন যে ঃ *"জিজিয়ার মাধ্যমে বলপূর্বক হিন্দুদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হত না। এমনকি তরবারির ভয় দেখিয়েও ধর্মান্তরিত করা হয়নি।'* ***নিজামউদ্দিন আউলিয়া*** লিখেছেন ঃ *'হিন্দুরা জানে ইসলাম সত্যকার ধর্ম, তথাপি তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেনি।'* আসলে বাস্তববাদী সুলতানেরা জানতেন জোর করে ঐতিহ্যশালী হিন্দুধর্মকে ধ্বংস করা যাবে না। এবং তাঁদের লক্ষ্যও তা ছিল না। এঁরা ছিলেন ভাগ্যান্বেষী সৈনিক। বিলাসব্যসনের মধ্যে যত বেশি দিন সম্ভব রাজত্ব করাই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। তাই ধর্ম বা রাজনীতির খুঁটিনাটি নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামাতেন না। তাই দেখা যায়, ইসলামে আত্মহত্যা অপরাধ। সতীদাহ এক ধরনের আত্মহত্যাই। তথাপি সুলতানি আমলে তা মেনে নেওয়া হয়েছে। সুলতানি আমলে হিন্দুদের ইসলামে ধর্মান্তরিত হওয়ার যত ঘটনা ঘটেছে, তার জন্য জিজিয়ার চাপ বা বলপ্রয়োগ যতটা দায়ী ছিল তাঁর থেকে অনেক বেশি দায়ী ছিল হিন্দুদের রাজনৈতিক লাভ, অর্থনৈতিক সুযোগ বৃদ্ধি ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির একান্ত আকাঙ্ক্ষা।

সুলতান ইলতুৎমিসের 'ন্যায়বিচার' তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে অধ্যাপক ***নুরুল হাসান*** তাঁর *'মধ্যযুগের ভারতে রাষ্ট্র ও ধর্ম-সংক্রান্ত কিছু সমস্যা'* নামক প্রবন্ধে লিখেছেন যে, মধ্যযুগের ভারতে ন্যায়বিচারের অর্থ ছিল সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা করা, অর্থাৎ সমাজের কোন অংশ যেন অপর অংশের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে তা সুনিশ্চিত করা। ধর্মনির্বিশেষে সকল সামাজিক গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেই এই আদর্শ প্রযুক্ত ছিল। ***অধ্যাপক হাসানের*** মতে, ধর্ম অপেক্ষা রাষ্ট্রের প্রয়োজনই সুলতানের কাছে অধিক জরুরী বলে বিবেচিত হত। এটিই ছিল ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি। সুলতান আলাউদ্দিন খলজী প্রয়োজনবোধ দ্বারা চালিত হয়ে এই আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন, আবার মহম্মদ তুঘলকের নিরপেক্ষতার ভিত্তি ছিল আদর্শবোধ। অন্যান্যদের ক্ষেত্রে এটি এসেছিল উদাসীনতা থেকে। আর সিকন্দর লোদীর মত সংকীর্ণমনা হিন্দুপীড়নকারী সুলতানের দৃষ্টান্ত নিছক ব্যতিক্রম মাত্র।

ভারতে সুলতানি রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে অধিকাংশ আধুনিক ইতিহাসবিদ্‌দের মত হল যে, এটি ছিল *'সামরিক ও অভিজাততান্ত্রিক'।* ধর্ম, দর্শন বা প্রজাকল্যাণ কোন কিছুই নির্দিষ্ট রাষ্ট্রদর্শন হিসেবে গৃহীত হয়নি। সবই ছিল আপেক্ষিক। আসলে রাষ্ট্র ছিল সামরিক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং অভিজাতগোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত একটি সংগঠন। সুলতান অস্ত্রবলে সিংহাসন দখল করতেন এবং অস্ত্রের মাধ্যমেই তা রক্ষা করতেন। সুলতানের ব্যক্তিগত সামরিক দক্ষতার উপর নির্ভর

করত তাঁর স্থায়িত্ব। প্রজাকল্যাণমূলক বা সৃজনধর্মী যা কিছু তাঁরা করতেন, তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সম্রাটের 'মহানুভব' ভাবমূর্তি তুলে ধরা। সুলতানি রাষ্ট্র ছিল একপ্রকার *'পুলিশীরাষ্ট্র'* (Police State) যার প্রধান কাজ ছিল শক্তির দ্বারা রাজ্যজয়, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং রাজস্ব আদায়। এই কাজের জন্য সুলতানের একার ক্ষমতা যথেষ্ট ছিল না। তাই সুলতানেরা একটি দক্ষ ও বিশ্বস্ত অভিজাতগোষ্ঠী গড়ে তোলেন। রাষ্ট্রের উচ্চ পদগুলি তুর্কী অভিজাতদের একচেটিয়া ছিল। গ্রামাঞ্চলে হিন্দু অভিজাতগোষ্ঠী আগের মতই স্ব-স্ব পদে নিয়োজিত ছিলেন। 'গ্রামীণ হিন্দু অভিজাত ও শহুরে তুর্কী অভিজাতদের মধ্যে অকথিত ক্ষমতার বিভাজন দিল্লী-সুলতানির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল।' ড. *মুজিব* 'Gazetteer of India'-র দ্বিতীয় খণ্ডে সুলতানি যুগের অভিজাততন্ত্রের প্রাধান্য বিশ্লেষণ করে একটু নতুন কথা বলেছেন। তার মতে, প্রকৃতিগতভাবে দিল্লী-সুলতানি ছিল স্বৈরতান্ত্রিক ও এককেন্দ্রিক। কিন্তু বাস্তবে আঞ্চলিক শাসকেরা ছিলেন প্রায় স্বাধীন। এঁদের মৌলিক আনুগত্যের উপর সুলতানি রাষ্ট্রের ঐক্য দাঁড়িয়েছিল। তিনি লিখেছেন : *"Delhi Sultanate was in theory a unitary government but it was actually a confederation of semi-independent territorial units..."*

○ কেন্দ্রীয় শাসন কাঠামো ঃ

সুলতানি আমলে শাসনব্যবস্থার চরিত্র আক্ষরিক অর্থেই ছিল স্বৈরতান্ত্রিক। ধর্ম ও রাজনৈতিক স্বার্থ-চিন্তাকে সমখণ্ডিত করে সুলতানি আমলে যে শাসন-পদ্ধতির প্রচলন করা হয়, তাতে সুলতান রাষ্ট্রের পার্থিব ও অপার্থিব উভয় ক্ষেত্রেই চূড়ান্ত কর্তৃত্বের অধিকারী ছিলেন। ধর্ম ও রাজনীতির এই মিলনের ফলে রাষ্ট্রনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে মুসলিম ধর্মতাত্ত্বিক উলেমাদের প্রভাববৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল ; কিন্তু সামরিক ভাগ্যান্বেষী দিল্লীর সুলতানেরা সচেতনভাবেই তা প্রতিহত করেন। সুলতান দৈবশক্তির সাথে রাজশক্তির সম্পর্কের তত্ত্ব প্রচার করলে ক্ষমতালোভী উলেমারা তা মেনে নেন। এইভাবে সুলতান ধর্ম ও রাজনীতির চূড়ান্ত নীতি-নির্ধারকের আসনে উত্তীর্ণ হন। আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের সর্বময় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে সুলতানের হাতে। অবশ্য তাঁরা সরাসরি কোরান বা শরিয়তের সাথে সংঘাতে যেতেন না। তা সম্ভবও ছিল না, বাঞ্ছিতও ছিল না। তবে কেবল ধর্মশাস্ত্রের নির্দেশনামা সুলতানি আমলে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের চালিকা-শক্তিতে পরিণত হতে পারেনি।

সুলতানি আমলে রাজপদে নির্বাচন-সংক্রান্ত কোন আইন বা রীতি সুনির্দিষ্ট ছিল না। সুলতান সিংহাসনে বসতেন তাঁর শক্তির জোরে। সুলতানির স্থায়িত্বও নির্ভর করত সুলতানের সার্বিক দক্ষতার উপর। অন্যান্য প্রশাসনিক সংস্থাগুলি সুলতান পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়ে যেত অথবা নতুন সুলতানের প্রতি আনুগত্য জানিয়ে টিকে থাকত। কোন কোন ক্ষেত্রে সুলতান তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যেতেন। তবে সেই ব্যক্তির সিংহাসনে বসা কিংবা টিকে থাকা একান্তভাবে নির্ভর করত তাঁর ব্যক্তিগত দক্ষতা ও প্রতিভার উপর। এ কাজে অভিজাতদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তাঁরা ইচ্ছা করলে নিজেদের মনোনীত যে-কোন ব্যক্তিকে, এমনকি প্রাক্তন সুলতানের বংশের বাইরের লোককেও, সিংহাসনে মনোনীত করতে পারতেন। অবশ্য এই ব্যবস্থার একটা শুভদিক ছিল। এর ফলে যোগ্য ব্যক্তির সর্বোচ্চ পদে

মনোনয়ন সম্ভাবনা ছিল বেশি। ড. *কুরেশীর* ভাষায় ঃ *"The absence of an heridetary principle of succession, the rough and ready methods of selecting the Sultan not only worked well, but were the only means of finding the right man at the right time."*

সুলতান স্বৈরাচারী ক্ষমতার অধিকারী হলেও, তা অনিয়ন্ত্রিত বা স্বেচ্ছাচার ছিল না। এর মূলে ছিল বাস্তব প্রয়োজনবোধ। আমরা আগেই দেখেছি (সুলতানি রাষ্ট্রের প্রকৃতি) যে মধ্যযুগে সুলতানের স্বৈরতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করার মত কোন সংগঠিত রাজনৈতিক সংস্থা ছিল না। অভিজাতরা ছিলেন স্বার্থান্বেষী এবং গোষ্ঠী-রাজনীতির শিকার, উলেমারাও পদের মোহে ক্ষমতাবান সুলতানের বিরুদ্ধাচরণ করতে দ্বিধান্বিত ছিলেন। সর্বোপরি তখন কোন জনপ্রতিনিধিমূলক পরিষদ বা সাংবিধানিক রীতি ছিল না, যা জনগণের ইচ্ছার সাথে প্রশাসকের যোগস্থাপন করতে সক্ষম। স্বভাবতই সুলতান ছিলেন অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু বিচক্ষণ সুলতানেরা এই অর্জিত ক্ষমতার অপব্যবহার কদাচ করতেন। যাঁরা অন্ধের মত আচরণ করতেন তাঁদের স্থায়িত্ব ছিল খুবই অল্প। বিচক্ষণ সুলতানেরা উপলব্ধি করেন যে, সুবিস্তৃত রাজ্যের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ তাঁর একার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই রাষ্ট্রের প্রয়োজনে তাঁরা একটা শাসন-পরিকাঠামো গড়ে তোলেন। এখানে নিয়োজিত হন বিভিন্ন স্তরের কর্মমণ্ডলী। এঁরা ব্যক্তিগতভাবে বা সংঘবদ্ধভাবে সুলতানকে পরামর্শ দিতেন। এখনকার মন্ত্রী-পরিষদের সমতুল্য না হলেও '*মজলিস-ই-খল্ওয়াত*' নামক সভা সুলতানকে নানা বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করত। উচ্চ অভিজাত ও দায়িত্বশীল কর্মীদের সভা '*বার-ই-খাস*' জরুরী অবস্থায় সুলতানকে মতামত প্রদান করে সাহায্য করত। এই সকল সভার পরামর্শ গ্রহণ করা বা না-করা ছিল সম্পূর্ণভাবে সুলতানের ইচ্ছাধীন। তথাপি একথা সত্য যে, সুলতানের শুভবুদ্ধি জাগ্রত করার ক্ষেত্রে এদের একটা ভূমিকা ছিল।

কেন্দ্রীয় প্রশাসনে সুলতানের পরেই ছিল 'উজীর' (প্রধানমন্ত্রী স্বরূপ)-এর স্থান। তাত্ত্বিকদের মতে, '*উজীরের সাহায্য ও সমর্থন ছাড়া সার্বভৌমত্ব ও সাম্রাজ্য গৌরবের চরমে উঠতে পারে না; উজীরের সুপরামর্শ সাম্রাজ্যের উন্নতি এবং প্রজাদের সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করে।*' সাধারণভাবে উজীরের ক্ষমতা নির্দিষ্ট ছিল না। তা নির্ভর করত পদাসীন ব্যক্তির দক্ষতা এবং সুলতানের সাথে সম্পর্কের উপর। যেমন—মহম্মদ তুঘলকের উজীর-খাজা-জাহান সুলতানের অবর্তমানে রাজধানীতে সুলতানের কাজ পরিচালনার অধিকারী ছিলেন। ফিরোজ তুঘলকের উজীর খান-ই-জাহান ছিলেন ধর্মান্তরিত ব্রাহ্মণ। কিন্তু সুলতানের অতি বিশ্বস্ত এবং কর্মদক্ষ এই উজীর রাজস্ববিভাগের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন। এই সময়কে উজীরৎ-এর চরম গৌরবের কাল বলা হয়। যাই হোক্, প্রথমদিকে সাধারণত সামরিক কাজে দক্ষ ব্যক্তিরাই উজীর-পদে নিযুক্ত হতেন। চুতর্দশ শতকে রাজস্ব-কাজে দক্ষ ব্যক্তিদের উজীর-পদে প্রাধান্য দেওয়া হয়। উজীরের প্রধান কাজ ছিল রাজস্ব আদায় ও প্রশাসন পরিচালনা করা। তবে সাধারণভাবে তিনি ছিলেন সমগ্র অসামরিক প্রশাসনের তত্ত্বাবধায়ক। সাম্রাজ্যের আয়ব্যয়-সংক্রান্ত বিষয়ে উজীরকে সাহায্য করার জন্য একজন হিসাবরক্ষক ও একজন হিসাবপরীক্ষক থাকতেন। ড. *আর. পি. ত্রিপাঠী* 'উজীর' পদের গুরুত্ব প্রসঙ্গে লিখেছেন যে, তিনি প্রজাসাধারণ ও সুলতানের মধ্যে যোগসূত্রস্বরূপ ছিলেন। সুলতানির স্বার্থে উজীর-পদের ক্ষমতা ও মর্যাদা অব্যাহত থাকা আবশ্যিক ছিল। কারণ সুলতানের

খেয়ালীমনের নিয়ন্ত্রণ এবং শাসক ও শাসিতের যোগসূত্র হিসেবে উজীর প্রশাসনকে স্থায়িত্বদানের দায়প্রাপ্ত ছিলেন। কিন্তু সুলতানেরা প্রায়শই সন্দেহবশত উজীরের ক্ষমতা খর্ব করে নিজেদের অস্তিত্বকে বিপন্ন করতেন।

উজীরৎ ছাড়া সুলতানি প্রশাসনের অপর তিনটি স্তম্ভ ছিল *'দিওয়ান-ই-আরজ', 'দিওয়ান-ই-রিসালত্'* এবং *'দিওয়ান-ই-ইন্‌সা'।* উজীরৎ-এর পরে সবেচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল *'দিওয়ান-ই-আরজ'।* এই বিভাগের প্রধান ছিলেন *'আরিজ-ই-মমালিক'।* সুলতানি সেনাবাহিনীর সংগঠন ও পরিচালনার দায়িত্ব ছিল এই বিভাগের। আরিজ-ই-মমালিক সৈন্যসংগ্রহ, তাদের বেতন নির্ধারণ ও প্রদান, যুদ্ধকালে সেনা-প্রস্তুতি, বাহিনীর কুচকাওয়াজ পরিদর্শন ও দক্ষতা বিচার, যুদ্ধের পরে সংগৃহীত অর্থ-সম্পদের বণ্টন, তদারক ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করতেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, আরিজ সেনাবিভাগের দায়প্রাপ্ত হলেও সর্বাধিনায়ক ছিলেন না। এই পদটি ছিল সুলতানের নিজের হস্তগত। *'দিওয়ান-ই-রিসালত্'-এর দয়িত্ব সম্পর্কে কিছুটা বিতর্ক আছে। ড. **কুরেশীর*** মতে, এই বিভাগ ধর্মীয় বিষয়াদি তত্ত্বাবধান করত। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা এবং জ্ঞানী-গুণী পণ্ডিতদের বৃত্তিদান সম্পর্কে তদারকি রিসালত্-দপ্তর করত। কিন্তু ড. ***হবিবউল্লাহ্-র*** মতে, এই দপ্তর পররাষ্ট্র সম্পর্কের কাজ পরিচালনা করত। বিভিন্ন দেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন, কূটনীতিকদের নিয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে এই দপ্তর দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল। ***কুরেশীর*** মতে, ধর্মীয় কাজের তত্ত্বাবধান করতেন, *'সদর-উস্-সুদুর'।* কিন্তু সতীশচন্দ্র সদর-উস্-সুদুর এবং প্রধান কাজীকে একই ব্যক্তি হিসেবে বর্ণনা করে দিওয়ান-ই-রিসালতের প্রধান কর্মাধ্যক্ষ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। *'দিওয়ান-ই-ইনসা'* ছিলেন সরকারি চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ ও যোগাযোগের দায়িত্বপ্রাপ্ত। স্বভাবতই সুলতানের একান্ত বিশ্বস্ত ব্যক্তি এই পদে নিযুক্ত থাকতেন। বিভিন্ন প্রাদেশিক শাসক, অন্যান্য ভারতীয় রাজ্য ও সরকারি কর্মচারীদের সাথে সুলতানের বা সরকারের গোপন এবং সরকারি মতবিনিময় দিওয়ান-ই-ইনসার মাধ্যমে সম্পন্ন হত। এঁর অধীনে বহু দবীর কর্মরত থাকতেন। সরকারি নির্দেশনামায় খসড়া প্রস্তুত করা এবং সুলতানের অনুমোদনের পর তা কপি করে উপযুক্ত স্থানে প্রেরণ ও নথিভুক্ত করার কাজ *'দিওয়ান-ই-ইন্‌সা'* ও তাঁর সহযোগীরা সম্পন্ন করতেন।

সুলতানি শাসনকাঠামোর বর্ণিত চারটি বিভাগের প্রায় সমতুল্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল *'কাজী-উল্-কাজাৎ'* বা প্রধান কাজীর পদটি। ইনি ছিলেন বিচারবিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত। সুলতানের পক্ষে ইনি বিচারের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করতেন। নিম্ন-আদালতের বিচারকদের নিয়োগ এবং দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিচারের আপীল বিচারও প্রধান কাজী করতেন। মুসলিম আইনবিধি 'শরিয়ত' অনুযায়ী কাজী দেওয়ানি বিচার নিষ্পত্তি করতেন। 'মুফ্‌তি' নামক কর্মীরা কাজীকে আইনের ব্যাখ্যা করে বিচারকার্যে সাহায্য করতেন। অ-মুসলমানরা নিজ নিজ আইনে বিচার পেতেন। নতুন আইন শহর ও মুসলমানপ্রধান অঞ্চলে প্রথমে প্রয়োগ করা হত। গ্রামাঞ্চলে পুরানো আইন চলত। গ্রামে বিচারের ভার ছিল গ্রাম-পঞ্চায়েতের উপর। সুলতানি যুগে দণ্ডবিধির কঠোরতা ছিল। অপরাধ কবুল করানোর জন্য কঠোর শাস্তি দেওয়া হত। অপরাধ হিসেবে ধৃত ব্যক্তির আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ ছিল খুবই কম। প্রধান কাজী *'সদর-উস্-সুদুর'* নামেও পরিচিত ছিলেন।

স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থায় অধীনস্থ প্রজা, কর্মচারী ও আঞ্চলিক প্রশাসনের উপর কেন্দ্রীয়

সরকারের নিরন্তর অনুসন্ধান আবশ্যিক। তাই দিল্লীর সুলতানেরা সর্বদা অতি দক্ষ ও সুসংগঠিত গুপ্তচরবাহিনী পোষণ করতেন। '*বারিদ-ই-মমালিক*' ছিলেন গুপ্তচরবিভাগের প্রধান। বারিদ নামক গুপ্তচরবৃন্দ দেশের নানা অংশে কর্মরত থেকে রাজ্যের খুঁটিনাটি প্রতিটি সংবাদ প্রধান বারিদকে জানাতেন। দ্রুত সেই সংবাদ সুলতানের কর্ণগোচর করা হত। সুলতানরা নীতিগত ভাবে গুপ্তচরদের প্রকাশ্যে দরবারে হাজির হওয়া পছন্দ করতেন না। কিন্তু গোপন সংবাদ যথাসময়ে সুলতানের কাছে পৌঁছে দিতে না পারলে বা ভুল সংবাদ দিলে সংশ্লিষ্ট বারিদকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হত। ***বরণী*** লিখেছেন ঃ *"সৎ, দয়ালু ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের এই পদ গ্রহণে বাধ্য করা হত। কারণ মনে করা হত এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় কর্তব্য।"*

উপরিলিখিত দপ্তরগুলি ছাড়াও বহু কর্মচারী সুলতানি প্রশাসনের সাথে যুক্ত থাকতেন। সুলতানের প্রাসাদ ও রাজকীয় কারখানা সম্পর্কে তদারকির জন্য একটি বিশেষ বিভাগ ছিল। এর প্রধানকে বলা হত *'ভকিল-ই-দার।'* ইনি সুলতানের ব্যক্তিগত সুখসুবিধা ও রাজপরিবারের সমস্ত সদস্যের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের তত্ত্বাবধান করতেন। সরকারি কারখানা থেকে রাজপরিবার ও ক্ষেত্রবিশেষে অভিজাতদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করা হত। এই সকল কারখানায় বহু ক্রীতদাস নিযুক্ত থাকত, দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব ছিল *'কতোয়াল'*-এর উপর। কতোয়ালের অধীনে বহু কর্মচারী নিযুক্ত থাকতেন। এ ছাড়া সুলতানের দেহরক্ষী বাহিনীর তত্ত্বাবধায়ক *'সর-ই-জান্দার'*, কৃষিবিভাগের ভারপ্রাপ্ত *'আমীর-ই-কোহ'*, গৃহনির্মাণ-বিষয়ক প্রধান *'আমীর-ই-ইমারত'*, দাতব্যবিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত *'দিওয়ান-ই-খয়রাত'*, নৌ-যান নিয়ন্ত্রক *'আমীর-ই-বেহর'*, সহকারি উজীর *'নায়েব-ই-মমালিক'* প্রভৃতি নানা ধরনের কর্মীবৃন্দ সুলতানি আমলের প্রশাসনের সাথে জড়িত ছিলেন।

○ প্রাদেশিক শাসন কাঠামো ঃ

সুলতানি আমলে রাজধানীর নিকটবর্তী অঞ্চল সরাসরি কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে থাকত। দূরবর্তী অঞ্চলে কেন্দ্রের অনুরূপ প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত ছিল। প্রদেশের সংখ্যা প্রথমে ছিল কম। পরে সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির ফলে প্রদেশের সংখ্যাও বাড়ানো হয়। প্রদেশগুলির আয়তন এক ছিল না বা প্রাদেশিক শাসকদের (গভর্নর) ক্ষমতার পরিধিও নির্দিষ্ট ছিল না। প্রাদেশিক শাসকদের পদের স্থায়িত্ব এবং কর্তৃত্বের চরিত্র নির্ভর করত সুলতানের সাথে তাঁর সম্পর্কের উপর। তাছাড়া দুর্বল সুলতানদের আমলে প্রাদেশিক শাসকদের যতটা স্বাধীনতা বা কর্তৃত্ব থাকত, ক্ষমতাবান সুলতানদের আমলে, স্বভাবতই তা কিছুটা কমে যেত। তবে করদ-রাজ্যগুলি অভ্যন্তরীণ প্রশাসনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করত। সাধারণভাবে সুলতানি সাম্রাজ্যের স্বার্থবিরোধী কাজে লিপ্ত না হলে, মুসলমান অধিবাসীদর নিরাপত্তা ও মর্যাদা ক্ষুণ্ণ না করলে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে সমর্থ হলে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের কাজে বাধা সৃষ্টি না করলে রাজ্যের প্রশাসনিক স্বাধীনতায় সুলতান হস্তক্ষেপ করতেন না। কিন্তু অন্যান্য প্রদেশের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের তীক্ষ্ণ নজরদারি সর্বদা বলবৎ থাকত। প্রদেশগুলিকে 'ইকতা' নামক সামরিক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করে একজন করে সামরিক শাসকের অধীনে রাখা হত। ইক্‌তা'র শাসকেরা 'মাক্‌তি', 'ওয়ালি', নায়েব সুলতান বা 'ইক্‌তাদার' নামে অভিহিত হতেন। আলাউদ্দিন খলজীর আমলে দু'ধরনের ইক্‌তা ছিল—(১) যেগুলি তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন এবং

(২) যেসব নতুন স্থান তিনি দখল করেছিলেন। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সুলতান প্রাদেশিক শাসকদের অতিরিক্ত স্বাধীনতা ও কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন। বস্তুত, সুলতানি যুগে প্রাদেশিক শাসকরা নিজ নিজ রাজ্যে সুলতানের মতই কর্তৃত্ব ও মর্যাদা ভোগ করতেন। এটা নির্ভর করত তাঁদের আনুগত্য, বিশ্বস্ততা, কর্মদক্ষতা ইত্যাদির উপর। এঁরা সেনাবাহিনী পোষণ করতেন এবং সুলতানের প্রয়োজনে তাঁকে বাহিনী দিয়ে সাহায্য করতেন। এই বাহিনীর উপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য আঞ্চলিক 'আরিজ'কে কেন্দ্রের 'আরিজ-ই-মমালিকা'-র অধীনে কাজ করতে হত। প্রাদেশিক শাসকগণ রাজস্ব আদায় করতেন কিন্তু স্থানীয় ব্যয়সংকুলানের পর উদ্বৃত্ত অর্থ কেন্দ্রে পাঠাতে দায়বদ্ধ ছিলেন। প্রাদেশিক শাসকগণ নিয়মিত আয়ব্যয়ের হিসেব কেন্দ্রে পাঠাতে বাধ্য ছিলেন। সুলতান তাঁর দক্ষ গুপ্তচরবাহিনীর সাহায্যে প্রদেশগুলির উপর অদৃশ্য নিয়ন্ত্রণ কায়েম রাখতেন। সুলতানি শাসনের গৌরবময় যুগের তেইশটি প্রদেশের নাম হল দিল্লী, দেবগিরি, বদাউন, মুলতান, মাবার, শিরসুত, তেলেঙ্গা, উচ, দ্বারসমুদ্র, হান্সী, সামানা, কারা, লাহোর, কনৌজ, খুরম, জাজনগর, বিহার, কালানুর, অযোধ্য, লখনৌতি, গুজরাট, শেওয়ান এবং মালব। ভৌগোলিক কারণে বাংলাদেশ (লখনৌতি-এর অন্তর্ভুক্ত) স্বাধীন রাজ্য হিসেবেই প্রায় সারা সুলতানি আমলে নিজের অবস্থান রক্ষা করেছিল। সুলতান মৌখিক আনুগত্যের বিনিময়ে এবং নামমাত্র উপঢৌকনে সন্তুষ্ট থেকে বাংলার স্বাধীনতা মেনে নিয়েছিলেন।

সুলতানি সাম্রাজ্যের বিস্তার এবং আঞ্চলিক প্রশাসনে উন্নতির ফলে পরবর্তীকালে প্রদেশগুলিকে আরো ছোট এককে ভাগ করা হয়। এগুলিকে বলা হত *'শিক'।* শিকের শাসনকর্তা ছিলেন *'শিকদার'।* মহম্মদ-বিন্-তুঘলক দাক্ষিণাত্যকে চারটি 'শিক'-এ বিভক্ত করেছিলেন। দোয়াবকে ভেঙে দুটি 'শিক' গঠন করা হয়েছিল। সম্ভবত, 'শিকদার'ও একজন সামরিক ব্যক্তি ছিলেন এবং নিজ নিজ অঞ্চলের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দায়বদ্ধ ছিলেন। শিকগুলির মধ্যে আরো ছোট শাসনতান্ত্রিক বিভাগ ছিল 'পরগণা'। প্রশাসনিক বিভাগ হিসেবে 'পরগণা'র বিশেষ গুরুত্ব এই যে, এখানেই সরকারি কর্মচারীরা কৃষকদের সাথে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসত। পরগণার কর্মচারীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন *'আমিল'।* আমিল-এর নেতৃত্বে একটি কর্মগোষ্ঠী কাজ করত। পরগণার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারীর মধ্যে ছিলেন মুশারিফ, হিসাবরক্ষক, দু'জন কারকুন, কানুনগো প্রমুখ। মুশারিফ *'আমিন'* বা *'মুনসেফ'* নামেও অভিহিত হতেন। মুসারিফ-এর প্রধান কাজ ছিল রাজস্ব নির্ধারণ। মুশারিফ-কে সৎ বিশ্বস্ত (আমিন) বা ন্যায়পরায়ণ (মুনসেফ) নামে অভিহিত করার দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায় যে, সুলতানি আমলে উৎপাদকদের প্রতি সরকারের আচরণ ছিল মোটামুটি সহনশীল ও যুক্তিপূর্ণ। দু'জন কারকুন বা নথিলেখক ফার্সী ও হিন্দীতে পরগণার নথিপত্র লিপিবদ্ধ করতেন, এইজন্য তাঁরা যথাক্রমে *'ফার্সীনবিস'* ও *'হিন্দীনবিস'* নামে পরিচিত হতেন। কানুনগো পূর্ববর্তী বছরগুলির উৎপাদন ও নির্ধারিত করের হিসেব রক্ষা করতেন। ইবন বতুতা পরগণার সমতুল্য শাসনবিভাগ হিসেবে *'সাদি'* শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অবশ্য সমকালীন অন্য কোন নথিতে এই নাম ব্যবহৃত হয়নি। যাই হোক্, পরগণায় *'চৌধুরী'* নামে একটি পদের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইনি সম্ভবত উৎপাদক ও সরকারের মধ্যে মধ্যস্থ হিসেবে কাজ করতেন।

শাসনব্যবস্থার ক্ষুদ্রতম একক ছিল 'গ্রাম'। গ্রামের মুখ্য আধিকারিক ছিলেন *'গ্রাম-প্রধান'।*

তাঁকে সাহায্য করতেন *'পাটোয়ারী'* বা *'হিসাবরক্ষক'।* পাটোয়ারী চাষযোগ্য এলাকা ও মোট উৎপাদনের হিসেব রক্ষা এবং রাজস্ব নির্ধারণ এবং সরকারের প্রাপ্য প্রদানের কাজ তত্ত্বাবধান করতেন। গ্রামীণ প্রজারা যাতে শাসকশ্রেণী বা শক্তিশালীশ্রেণীর অত্যাচারের শিকার না হয় সেদিকে সুলতানেরা বিশেষ দৃষ্টি দিতেন। তবে সাধারণভাবে সুলতানেরা গ্রামের প্রশাসনে হস্তক্ষেপ করতেন না।

সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে, সুলতানি আমলের অসামরিক শাসনব্যবস্থা সুলতানি পূর্ব-আমলের অনুসৃতি মাত্র। শাসনকাঠামোর কোন মৌলিক পরিবর্তন সুলতানি যুগে করা হয়নি। কেবল কর্মচারীদের নামগুলি পাল্টে দেওয়া হয়েছিল। গ্রাম ও পরগণার শাসকশ্রেণী একই ছিল। অর্থাৎ আগের মতই হিন্দুরা বংশানুক্রমিক ভাবে এখানে শাসনদায়িত্ব প্রতিপালন করতেন। ***সতীশচন্দ্রের*** মতে, *"তুর্কীরা যে গ্রামাঞ্চলে দ্রুত প্রভুত্ব স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিল, তার অন্যতম কারণ হল গ্রামের শাসনব্যবস্থায় পূর্বের কর্মচারীদের বহাল রাখা।"*

সুলতানি প্রশাসনে অভিজাতদের, বিশেষত, মুসলমান অভিজাতদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। বাস্তব প্রয়োজন থেকেই সুলতানরা উপলব্ধি করেন যে, একটি *'যুদ্ধ-রাষ্ট্র'* (War-state)-কে টিকিয়ে রাখার জন্য অতি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য একদল প্রশাসকের প্রয়োজন। এদের মাধ্যমে সুলতান সামরিক ও বেসামরিক ক্ষেত্রে তাঁর কর্তৃত্ব রাখতে প্রয়াসী ছিলেন। তবে সেকালে যেহেতু যুদ্ধের মধ্যেই একটি দেশের উপর শাসকশ্রেণীর কর্তৃত্ব বা স্থায়িত্ব নির্ভর করত সেহেতু অভিজাতদের অধিকাংশই ছিলেন যুদ্ধবিশারদ। সুলতানি শাসনের প্রথমদিকে কেবলমাত্র বহিরাগত মুসলমানরাই অভিজাত হিসেবে মর্যাদা ও কর্তৃত্ব ভোগ করতেন। এঁদের মধ্যেও গোষ্ঠীভেদ ছিল, যেমন—তুর্কী, আফগান, পার্সী ও আরবী। তবে মর্যাদা ও প্রতিপত্তিতে সর্বাগ্রে ছিল তুর্কীদের স্থান। তার পরে আফগানদের এবং অন্যান্যদের। রাজনৈতিক উচ্চপদগুলি তুর্কী ও আফগান অভিজাতদের কুক্ষিগত ছিল। প্রথমদিকে বহিরাগত অভিজাতবাও গোষ্ঠীভিত্তিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতেন। কিন্তু দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে বসবাস করার ফলে এবং একই সুলতানের অধীনে কর্মরত অবস্থায় একই সমাজে অবস্থানের ফলে তাদের আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যবোধ ক্ষীণ হয়ে আসে। পরবর্তীকালে ধর্মান্তরিত এদেশীয় মুসলমানরাও বহিরাগত অভিজাতদের কাছাকাছি চলে আসেন। সুলতান জাতি বা বংশ নির্বিশেষে যে-কোন ব্যক্তিকে অভিজাতের মর্যাদা দিতে পারতেন। এই পদ বংশানুক্রমিকও ছিল না। পরে বংশানুক্রমিক হলে পদমর্যাদার ভিত্তিতে অভিজাতশ্রেণী গড়ে ওঠে। এই সময় এদেশীয় মুলমানরা নিজেদের বিদেশী বংশজাত দাবি করে জাতে ওঠার চেষ্টা করেন। আরো পরে ধর্মান্তরিত মুসলমানদের সাথে তুর্কো-আফগানদের বিবাহ-সম্পর্ক চালু হলে জাতে ওঠার প্রবণতা কমে যায়।

কাজের ভিত্তিতে অভিজাতদের দু'ভাগে ভাগ করা হয়, যথা—*'অহল-ই-সৈফ'* এবং *'অহল-ই-কলম'।* প্রথম দলে ছিলেন মূলত সামরিক কাজের সাথে যুক্ত অভিজাতরা। দ্বিতীয় দলে ছিলেন ধর্মীয় নেতা ও সাধারণ প্রশাসকগণ। 'যুদ্ধ-রাষ্ট্র' হবার ফলে সুলতানি আমলে প্রথম শ্রেণীর অভিজাত সংখ্যায় এবং প্রতিপত্তিতে অগ্রণী ছিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর অভিজাতদের অধিকাংশই ছিলেন *'ধর্মতত্ত্ববিদ্'* বা *'উলেমা'।* এঁরা ছিলেন গোঁড়া 'সুন্নি' সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। উলেমারা শরিয়ত সম্পর্কে সুলতানকে পরামর্শ দান করতেন। বিচারবিভাগে এঁদের একাধিপত্য ছিল।

অভিজাতদের আয়ের প্রধান উৎস ছিল ইক্‌তার রাজস্ব কিংবা নগদ বেতন। অভিজাতরা প্রচণ্ড বিলাসব্যসনের মধ্যে জীবনযাপন করতেন। সুলতানের অনুকরণে তাঁরা প্রসাদ নির্মাণ করতেন, হারেম পরিচালনা করতেন, বহুসংখ্যক দাস-দাসী ও পারিষদ পোষণ করতেন। নানা অনুষ্ঠান উপলক্ষে অভিজাতদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলত এবং সেক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হত। সাধারণ অভিজাতদের বিষয়সম্পত্তি অক্ষত থাকত এবং বংশানুক্রমিক ভাবে তা ভোগদখল করা যেত। জমি ক্রয় করে চাষ-আবাদের সূত্রেও অভিজাতদের প্রচুর আয় হত। অভিজাতদের অস্বাভাবিক অর্থবল মাঝে মাঝে সুলতানদের শঙ্কার কারণ সৃষ্টি করত। সুলতান আলাউদ্দিন অভিজাতদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কয়েকটি কঠোর ব্যবস্থাও নেন। তবে সামগ্রিকভাবে অধিকাংশ সুলতানই অভিজাতদের তোষণ করে চলতেন। গ্রামীণ হিন্দু অভিজাতদের প্রতিপত্তি ও অর্থবল ছিল তুলনামূলক ভাবে কম।

○ ইক্‌তা ব্যবস্থা ঃ

আক্ষরিক অর্থে *'ইক্‌তা'* বলতে বোঝায় 'এক অংশ'। কিন্তু আসলে এটি ছিল এক ধরনের ভূমিদান ও ভূমি-রাজস্ব বন্দোবস্ত ব্যবস্থা,—যা একজন শাসক ও বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে সম্পাদিত হত। ড. ***নিজামী*** লিখেছেন ঃ *"It (Iqta) existed since the early days of Islam as a form of reward for service to the state and passed through various phases of development... to meet different situations and problems of political life."* মামেলুক সুলতানদের আমলে ভারতে এই ধরনের ভূমি-বন্দোবস্ত ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল। ভারতে প্রচলিত রাজপুতদের সামন্ততান্ত্রিক রীতি ও অধিকার থেকে ইক্‌তাব্যবস্থা স্বতন্ত্র ছিল। এমনকি মুঘলদের জায়গিরদারি ব্যবস্থাও পুরোপুরি সমবৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ছিল না। *কে. এম. আশরাফ*-এর মতে সম্ভবত খলিফা মুক্‌তদির এই প্রথার উদ্ভাবক ছিলেন। প্রায়-স্বাধীন প্রদেশপালদের কাছ থেকে নিয়মিত রাজস্ব আদায়ের অন্যতম পন্থা হিসেবে তিনি এই ব্যবস্থার প্রচলন করেছিলেন। ইক্‌তার প্রাপক তার সেনাবাহিনী ও প্রশাসনিক ব্যয় মেটানোর পর উদ্বৃত্ত অর্থের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ বাগদাদে প্রেরণ করত। ড. ***নিজামী*** (K.A. Nizami)-র মতে ইসলামের উত্থানের আদি পর্ব থেকেই রাষ্ট্রীয় সেবার বিনিময়ে পুরস্কার হিসেবে ইক্‌তা প্রদানের ব্যবস্থা চালু ছিল। এবং পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এবং রাজনৈতিক প্রয়োজন অনুসারে ইক্‌তাব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটেছে।

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রকৃতির অনুদানের উপর ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে খলিফার প্রাথমিক অধিকার স্বীকৃত ছিল। এইভাবে কৃষকদের উৎপাদেনের উদ্বৃত্ত অংশের একাংশ রাষ্ট্রের প্রাপ্য বলে বিবেচিত হত। তাই ইসলামীয় সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদের উৎপাদনের উদ্বৃত্তের অংশ সংগ্রহ করা এবং তা শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে বণ্টন করার পন্থা-পদ্ধতি উদ্ভাবনের প্রয়োজন অনুভূত হয়। এই ধরনের একটি পদ্ধতি হল 'ইক্‌তা'। সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক কাঠামোকে কোনভাবে দায়বদ্ধ না করে এই ব্যবস্থার মাধ্যমে রাজস্ব সংগ্রহ ও তা বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়। একজন শাসকের অধীনে দু'ধরনের জমি থাকত, যথা—(১) সুলতানের খাস জমি বা রাজকীয় জমি। একে বলা হত *'খালিসা'*। এই জমির রাজস্ব সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে আদায় করতেন সরকারি কর্মী আমিল প্রমুখ। এই অর্থ সম্পূর্ণটা রাজকোষে জমা পড়ত।

(২) দ্বিতীয় ধরনের জমি সুলতান নির্দিষ্ট শর্তে ও কাজের বিনিময়ে তাঁর সৈনাধ্যক্ষ, সৈনিক বা অভিজাতদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। এই জমিকে বলা হত 'ইক্‌তা' এবং 'ইক্‌তা'র প্রাপককে বলা হত 'মুক্‌তি' এবং সাধারণভাবে ইক্‌তাদার। কখনো কখনো এঁরা '*ওয়ালি*' বা '*উলিয়াৎ*' নামেও অভিহিত হতেন। মাওয়ারদি দু'-ধরনের ইক্‌তার কথা উল্লেখ করেছেন—'*ইক্‌তা-ই-তমলিক্*' এবং '*ইক্‌তা-ই-ইস্তিঘলাল*'। '*ইক্‌তা-ই-তমলিক্*' ছিল ভূমিব্যবস্থা ও প্রশাসনের অঙ্গ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয় ইক্‌তাটি ছিল সরকারি অনুদান এবং প্রায় গুরুত্বহীন। সুলতানি আমলে ভাবতবর্ষে প্রথমোক্ত ব্যবস্থাটিও বিকাশলাভ করেছিল। ভারতে প্রবর্তিত হওয়ার আগে ইক্‌তা-ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্যগুলির আভাস পাওয়া যায়। নিজাম-উল্‌-মুল্‌ক তুসীর লেখা '*সিয়াসৎনামা*' গ্রন্থে। ইক্‌তার প্রাপক মুক্‌তি নিয়মিত রাজস্ব আদায় ছাড়া প্রজাদের উপর অন্য কোন অধিকার বা দাবি আরোপ করতে পারতেন না। নির্ধারিত রাজস্ব প্রদান করার পর প্রজা তার পরিবার-পরিজন ও সম্পত্তি-সম্পদ বিষয়ে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার অধিকারী হতেন। জমি ও কৃষকদের উপর মুক্‌তি'র কোন স্থায়ী অধিকার ছিল না। মুক্‌তি জানতেন যে, দেশ ও প্রজাকুলের উপর একমাত্র সুলতানের অধিকার আইনত স্বীকৃত ; মুক্‌তি ছিলেন সুলতান নিযুক্ত 'অছি' (Trustee) মাত্র। এখানে নিজাম-উল্‌-মুল্‌ক ইক্‌তা প্রথার গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে ইক্‌তাদার বা মুক্‌তির কিছু কর্তব্যের উল্লেখ করেছেন। যেমন—মুক্‌তি সুলতানের ইচ্ছানুসারে ইক্‌তা থেকে আদায়ীকৃত রাজস্বের একাংশ ভোগ করতে পারতেন। বিনিময়ে তিনি একটি সেনাবাহিনী পোষণ করতেন ; এবং সুলতানের প্রয়োজনে এই বাহিনী দ্বারা তাঁকে সাহায্য করতেন। অর্থাৎ মুক্‌তি ছিলেন একাধারে রাজস্ব-সংগ্রাহক ও সেনাবাহিনী-পোষক ও পরিচালক। *ড. ইরফান হাবিবের* ভাষায় ঃ *"The Muqti was thus tax collector, and army paymaster (also commander), rolled in to one."*

ভারতে সুলতানি শাসনের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের সাথে 'ইক্‌তা' ব্যবস্থা গভীরভাবে জড়িত। ভারতে তুর্কী-আগ্রাসনের প্রাথমিক পর্বে অভিযানকারীদের উপর প্রতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণের দিকটি ছিল খুবই দুর্বল। ব্যক্তিগত দক্ষতা ও গোষ্ঠীগত উদ্যোগের উপরে ভিত্তি করেই তারা এই বিদেশভূমিতে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালাচ্ছিল। আক্রমণকারীদের তুলনায় আক্রান্তদের সংখ্যা ছিল বহুগুণ বেশি। অথচ ভারতের কেন্দ্রীয় শক্তির অনুপস্থিতি, সাধারণ ভারতবাসীর যুদ্ধবিমুখতা, কৃষি-ভিত্তিক গ্রামীণ জীবনধারার প্রতি আস্থা ইত্যাদি একাধিক কারণে আক্রান্তরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও, অভিযানকারীদের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধ গড়তে ব্যর্থ হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে মহম্মদ ঘুরীর উচ্চাকাঙক্ষী সেনানায়কদের অনেকেই নিছক নেতৃপ্রতিভা (Leadership) প্রদর্শন করে উত্তর-ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তুর্কী-আধিপত্য কায়েম করতে সক্ষম হন। কিন্তু তখনও বিশাল ভারত ভূ-খণ্ডের বিস্তীর্ণ অঞ্চল তুর্কী-আধিপত্যের বাইরে ছিল। তুর্কী-অভিভাষণের এই প্রাথমিক পরিস্থিতিতে সুলতানের সামনে দু'টি বিষয় জরুরী অনুভূত হয়েছিল। এগুলি হল—(১) সদ্য অধিকৃত অঞ্চলগুলির উপর কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা এবং অনধিকৃত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের উপর সুলতানি নিয়ন্ত্রণের প্রসার ঘটানো এবং (২) ভাগ্যান্বেষী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী তুর্কী সেনানায়কদের প্রশাসনিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রেখে তাদের সর্বোচ্চ সেবা আদায় করে নেওয়া। তুর্কী সেনানায়কদের 'ইক্‌তা' বিতরণ করে সুলতান এই দুটি জরুরী

প্রয়োজন মেটাবার ব্যবস্থা করেন। ড. *মেহতা* (J. L. Mehta) লিখেছেন : *"The 'Iqta' was a half-conquered and poorly administered territory over which the 'assignee' was expected to establish a firm hold, and introduce civil administration there as he thought fit or feasible."*

'ঘুর' রাজ্য কর্তৃক উত্তর-ভারত অভিযানের পর ঘুরীর অনুগামী সেনাপতিগণ দখলীকৃত অঞ্চলে স্ব-স্ব অধিকার কায়েম করেন এবং 'মুক্তি' নামে অভিহিত হন। লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড দ্বারা নির্দিষ্ট অঞ্চলে কর্তৃত্ব করলেও ঐসব স্থান 'ইক্তা' নামেই পরিচিত হয়। দিল্লী-সুলতানির প্রতিষ্ঠার পর ধীরে ধীরে এই সকল স্বঘোষিত ইক্তাদারের ভূ-খণ্ড প্রকৃত অর্থে 'ইক্তা'র বৈশিষ্ট্য লাভ করতে থাকে। সুলতান ইলতুৎমিস ইক্তা-ব্যবস্থাকে ভারতে বৈধ প্রতিষ্ঠানিক রূপ দেন। তিনি তুর্কী-অভিজাতগণ কর্তৃক বিজিত বা নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলিকে সুলতানি অধীনস্থ বৈধ শাসনতান্ত্রিক 'একক' রূপে স্বীকার করে নেন। ইক্তা ব্যবস্থার মাধ্যমে অপ্রতুল যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পন্ন নববিজিত ভূ-খণ্ডের উপর দিল্লি-সুলতানির কর্তৃত্ব রক্ষা, স্থানীয় হিন্দু সামন্তদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ এবং রাজস্ব সংগ্রহ করা সহজসাধ্য হয়। ড. *নিজামীর* ভাষায় : *"The early Turkish Sultans of Delhi, particularly Iltutmish, used this institution as an instruments for liquidating the feudal order of Indian society and linking up the far-flung parts of the empire to one centre."*

ইলতুৎমিস মূলত, তুর্কী সেনাপতিদের মধ্যে ইক্তা বিলি করেন এবং ইক্তা-ব্যবস্থাকে প্রাদেশিক শাসনের ভিত্তি হিসেবে গড়ে তোলেন। তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল নববিজিত অঞ্চলের উপর দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা এবং ভারতীয় সামন্ততান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিচ্ছিন্ন করা। এজন্য তিনি তুর্কী সমরনায়কদের মধ্যে নববিজিত স্থানগুলিকে ইক্তা হিসেবে বিলি করে দেন। কিন্তু ইক্তা-ব্যবস্থার মধ্যে সামন্ততন্ত্রের উপাদান লুকিয়ে ছিল। তাই বিচক্ষণ ইলতুৎমিস ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ রোধ করার উদ্দেশ্যে মুক্তিদের বিভিন্ন ইক্তায় বদলী করার নীতি নেন কেবল দোয়াব অঞ্চলে। তিনি প্রায় ২ হাজার তুর্কী সৈনিকদের মধ্যে ইক্তা বিলি করেন। এক্ষেত্রে তাঁর দ্বিবিধ লক্ষ্য ছিল—(১) সুলতানি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় তুর্কী সৈনিকদের অবদানের পুরস্কার প্রদান এবং (২) দেশের প্রধানতম উর্বর অঞ্চলে সুলতানির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার কাজে তাঁদের নিয়োজিত রাখা। এইসব ছোট ছোট ইক্তাদারের কোন প্রশাসনিক দায়িত্ব ছিল না। তবে ইক্তা'র নির্দিষ্ট রাজস্বভোগের বিনিময়ে এঁরা সুলতানকে সামরিক সাহায্য দিতেন। ইলতুৎমিসের তীক্ষ্ণ নজরদারির ফলে এই সকল ইক্তাদার সুলতানির সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করতে বাধ্য ছিলেন। কিন্তু ইলতুৎমিসের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে এবং গিয়াসউদ্দিন বলবন কর্তৃক সিংহাসনে আরোহণের মধ্যবর্তীকালে ইক্তা-ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত বিপজ্জনক দিকটি প্রকট হতে থাকে। মুক্তিরা কেন্দ্রীয় সরকারকে অগ্রাহ্য করতে শুরু করেন। ফলে সুলতানি সাম্রাজ্যের সংহতি ও শক্তিবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত ইক্তা-ব্যবস্থা সুলতানির দুর্বলতা ও বিচ্ছিন্নতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

বলবন সুলতানি গ্রহণ করে ইক্তা-ব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন ঘটান। প্রথমেই তিনি দোয়াবের ইক্তাগুলির বিলি-বন্দোবস্তের শর্তাদি তদন্ত করে সিদ্ধান্ত নেন যে, (১) নির্দিষ্ট সামরিক সেবার বিনিময়ে এই ইক্তা সৈনিকদের বৃত্তি হিসেবে দেওয়া হয়েছিল। (২) বর্তমানে ইক্তা-প্রাপকদের

অনেকেই মৃত কিংবা এত বৃদ্ধ যে, সামরিক সেবাপ্রদানে অক্ষম। (৩) সেইহেতু প্রাপ্ত ইক্‌তার উপর প্রাপকের কিংবা তাদের বংশধরের আইনগত কোন অধিকার নেই। বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের পর বলবন বৃদ্ধ বা অক্ষম ব্যক্তিদের ২০/৩০ টাকা পেনশন প্রদানের এবং সক্ষম ব্যক্তিদের নগদ মজুরির ভিত্তিতে সমস্ত ইক্‌তা কেড়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এই সিদ্ধান্ত স্বাভাবিক কারণেই ইক্‌তা ভোগদখলকারীদের ক্ষুব্ধ ও ভীত করে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত দিল্লীর কতোয়াল মালিক ফকরউদ্দিনের মধ্যস্থতায় দোয়াবের ইক্‌তাগুলি পূর্ববৎ বজায় থাকে। তবে বরণীর বক্তব্যের সাথে একমত হতে পারেননি ড. হবিবউল্লাহ। তাঁর মতে, কতোয়ালের অনুরোধের ফলে শুধুমাত্র বৃদ্ধ সৈনিকদের ইক্‌তাগুলি সুলতান বজায় রেখেছিলেন।

বলবন ইক্‌তার উপর কেন্দ্রের কর্তৃত্ব সুদৃঢ় ও নিশ্চিত করার জন্য কিছু ব্যবস্থা নেন। বড় ইক্‌তার মুক্‌তিদের প্রধান কর্তব্য ছিল ইক্‌তার ব্যয়-সংকুলানের পর উদ্বৃত্ত অর্থ কেন্দ্রীয় রাজকোষে জমা দেওয়া। কিন্তু সাধারণত মুক্‌তি এমনভাবে ইক্‌তার আয়ব্যয়ের হিসেব প্রস্তুত করতেন যে, কখনোই অর্থ উদ্বৃত্ত হত না। বলবন ইক্‌তার হিসেবে রক্ষা ও কেন্দ্রের প্রাপ্য যথাযথ আদায়ের জন্য কঠোর ব্যবস্থা নেন। খোয়াজা নামক একশ্রেণীর হিসেব-পরীক্ষক নিয়োগ করে ইক্‌তার প্রকৃত আয়, প্রকৃত ব্যয় এবং উদ্বৃত্ত অর্থের সঠিক হিসেব রক্ষার ব্যবস্থা করেন।

সুলতান আলাউদ্দিন খলজীর আমলে ইক্‌তা-প্রশাসনে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটানো হয়। আলাউদ্দিনের সাম্রাজ্যবাদী নীতির ফলে সুলতানি সাম্রাজ্যের পরিধি অনেক বেড়েছিল। দূরবর্তী অঞ্চলগুলিকে ইক্‌তায় পরিণত করে আলাউদ্দিন স্থানীয় প্রশাসন ও রাজস্ব সংগ্রহ ব্যবস্থাকে সুনিশ্চিত করেন। দিল্লীর নিকটবর্তী অঞ্চলগুলিকে তিনি 'খালিসা' জমিতে পরিণত করেন। সুলতানি অশ্বারোহী-বাহিনীর (হাস্‌ম) সদস্যদের বেতন বাবদ 'ইক্‌তা' প্রদানের পরিবর্তে নগদ অর্থে বেতনদানের ব্যবস্থা করেন। ১৩৫১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই ব্যবস্থা বলবৎ ছিল। সেনাপতিদের ক্ষেত্রে তিনি 'ইক্‌তা' বরাদ্দ করার নীতি চালু রাখেন। তবে ইক্‌তার প্রশাসনে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব তিনি আরো সুদৃঢ় করেন। স্থির হয় যে, দেওয়ান-ই-উজিরৎ প্রতি ইক্‌তার রাজস্বের পরিমাণ স্থির করে দেবেন। এই রাজস্বের একটি নির্দিষ্ট অংশ মাক্‌তি বা ওয়ালির অধীনস্থ সৈনিকের (হাস্‌ম) বেতন (ময়াজিব) বাবদ ব্যয় করা হবে। এই অর্থ আদায়ের ক্ষেত্রে হিসেবে ইক্‌তার একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলও স্থির করে দেন দেওয়ান। বাকী অংশ থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব মুক্‌তির ব্যক্তিগত খরচ ও প্রশাসনিক খরচের জন্য নির্দিষ্ট থাকে। সেনাবাহিনীর ব্যয় এবং মুক্‌তির ও ইক্‌তার ব্যয়-সংকুলানের পর উদ্বৃত্ত অর্থ কেন্দ্রীয় রাজকোষে জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়। উদ্বৃত্ত অর্থ জমা না দিলে কিংবা মিথ্যাচার দ্বারা কেন্দ্রকে তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করলে কঠোর শাস্তিদানের ব্যবস্থা রাখা হয়। কিন্তু মুক্‌তিরা তাদের আয়ব্যয়ের হিসেবে কারচুপি করে সুলতানকে তথা কেন্দ্রীয় কোষাগারকে ফাঁকি দিতে চেষ্টা চালাতেন। অবশ্য অধীনস্থদের কাছ থেকে নিজের প্রাপ্য পাই পয়সা আদায় করার কাজে মুক্‌তি কোনরকম ফাঁকি সহ্য করতেন না। দূরদর্শী আলাউদ্দিন মুক্‌তিদের এই প্রবণতা সম্পর্কে সজাগ ছিলেন। তাই তিনি মুক্‌তিদের অসাধুতা ও ফাঁকি বন্ধ করার ব্যাপারে কঠোর মনোভাব পোষণ করতেন। প্রতিটি ইক্‌তার বার্ষিক আয়ব্যয় পরীক্ষার উপর তিনি জোর দেন এবং সামান্যতম ফাঁকি বা বিচ্যুতি ধরা পড়লে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতেন। বরণী লিখেছেন আলাউদ্দিনের জনৈক মন্ত্রী শরাফ কোই কঠোর হাতে

ইক্‌তার প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করে কেন্দ্রীয় কোষাগারে আয়বৃদ্ধিতে সফল হয়েছিলেন। তিনি গ্রামের পাটোয়ারী (হিসাবরক্ষক)-দের খাতা পরীক্ষা করে ইক্‌তার প্রকৃত আয় সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করতেন এবং মিথ্যাচারের ক্ষেত্রে অমানুষিক শাস্তি দিতেন। সমকালীন লেখক *শাম্‌স-ই-সিরাজ-আফিফ্‌* লিখেছেন যে, শরাফ কোই-এর কঠোরতার ফলে রাজস্ব আদায়ে গতি এসেছিল ঠিকই ; কিন্তু মুক্‌তিদের উপর এই অস্বাভাবিক কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছিল। এবং পরিণামে সুলতানি সাম্রাজ্যের ভিত্তি শিথিল হয়েছিল।

গিয়াসউদ্দিন তুঘলক ইক্‌তা-ব্যবস্থায় কোন ব্যাপক পরিবর্তন ঘটাননি। তিনি কেবল ইক্‌তা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় নীতির কঠোরতা কিছুটা শিথিল করে দেন। এজন্য তিনি প্রচলিত ব্যবস্থায় কয়েকটি সংশোধনী যোগ করেন, যেমন—(১) 'দেওয়ান-ই-উজিরৎ রাজস্ব নির্ধারণের সময় লক্ষ্য রাখবেন যাতে বার্ষিক এক দশমাংশ $\left(\frac{১}{১০}\right)$বা এক একাদশাংশের $\left(\frac{১}{১১}\right)$ বেশি না হয় ; (২) মুক্‌তিগণ আদায়ীকৃত রাজস্বের (খারাজ) এক দশমাংশ থেকে এক দ্বাদশাংশ শতাংশ $\left(\frac{১}{১২}\right)$ অর্থ তাঁদের পূর্ব-নির্দিষ্ট আয়ের উপর গ্রহণ করলেও কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে না ; (৩) সামরিক-বাহিনীর খরচ বাবদ নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের রাজস্বের কোন অংশ মুক্‌তি নিতে পারবেন না ; (৪) মুক্‌তিগণও তাঁদের অধীনস্থ কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রাপ্য বেতনের অতিরিক্ত অর্থ বা এক শতাংশ অতিরিক্ত সংগ্রহ দণ্ডযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করবেন না ইত্যাদি।

মহম্মদ-বিন্‌-তুঘলকের আমলে ইক্‌তা-ব্যবস্থায় আরো কিছু পরিবর্তন ঘটানো হয়। বরণী, ইসামী, ইবন বতুতা প্রমুখের রচনা থেকে জানা যায় যে, মহম্মদ তুঘলক রাজস্ব সংগ্রহ এবং সৈন্য রক্ষণাবেক্ষণ-কাজ দু'টিকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেন। রাজস্ব সংগ্রহের দায়িত্ব নিলামের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ রাজস্ব প্রদানে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে ইজারা হিসেবে দেওয়া হয়। এইভাবে নিজাম মঈন কয়েক লক্ষ টাকা প্রদানের শর্তে 'কারা' নামক ইক্‌তার দায়িত্ব পান। জনৈক নসরৎ খাঁ এক কোটি তঙ্কা প্রদানের শর্তে বিদারা অঞ্চলের ইজারা পান। ইসামীর বিবরণ থেকে জানা যায় যে, আলি শাহ্ খলজী নামক জনৈক ব্যক্তি 'গোবর' নামক স্থান দখল করে সরকারি কোষাগারে নির্দিষ্ট রাজস্ব প্রদানের শর্তে প্রশাসনিক কর্তৃত্ব ভোগ করতেন। কিন্তু গুলবর্গার ইজারাদার শরণ নামক জনৈক হিন্দু 'গোবর' অঞ্চলের জন্য আরো দেড়গুণ বেশি রাজস্ব দিতে আগ্রহী হলে সুলতান শরণের হাতে 'গোবরের' ইজারা তুলে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ এই সময় অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে ইক্‌তার উপর ইজারাদারী ব্যবস্থা (contract system) প্রবর্তন করা হয় এবং ইক্‌তার মৌল বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটে। কারণ রাজস্ব আদায়কারী ইজারাদারদের কোনভাবেই সেনা পোষণ বা সেনাবাহিনীর ভরণ-পোষণের দায় বহন করতে হত না। ইবন বতুতার বিবরণী থেকেও জানা যায় যে, একই ইক্‌তায় কিভাবে দু'টি পৃথক শাসনদায়িত্ব পাশাপাশি অবস্থান করত। আমরোহা বাজারের ইজারাদার শর্তানুযায়ী সুলতানকে তাঁর প্রাপ্য নিয়মিত মিটিয়ে দিতেন। তথাপি স্থানীয় আমীরের সৈন্যরা তাঁকে অর্থ প্রদানের জন্য অন্যায়ভাবে চাপ সৃষ্টি করত। এজন্য ঐ ইজারাদার সুলতানের কাছে অভিযোগও পেশ করেন। সম্ভবত, সেনা পোষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত আমীর শক্তি প্রয়োগ করে ইজারাদারের কাছ থেকে কিছু অর্থ আদায় করে নিতে চেষ্টা করেছিলেন। এরূপ দৃষ্টান্ত মধ্যযুগে আরো খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়। তবে এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, মহম্মদ-বিন্‌-তুঘলক ইক্‌তা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কিছুটা মৌলিক পরিবর্তন এনেছিলেন।

মহম্মদ-বিন্-তুঘলক সাধারণ সেনাদের নগদ বেতন দানের ব্যবস্থা করেন। তবে সর্বনিম্নে 'সিপাহ্শালার থেকে উর্ধ্বে 'খান' পদমর্যাদার সৈনাধ্যক্ষগণ কেবল তাঁদের বেতনবাবদ একখণ্ড ইক্তা ভোগ করতেন! এঁদের নগদে বেতন দেওয়া হত না। অবশ্য এঁদের যা বেতন ছিল, তার থেকে কম আয়সম্পন্ন ইক্তা এঁদের বরাদ্দ করা হত। কারণ সুলতান জানতেন যে, এঁরা সর্বদাই উৎপাদকের উপর জুলুম করে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করতে অভ্যস্ত। সম্ভবত, অভিজাতদের হাত থেকে ইক্তা প্রশাসনের দায়িত্ব সরিয়ে নেওয়ার জন্য পুরানো অভিজাতবর্গ মহম্মদের উপর ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। দাক্ষিণাত্যে 'সদাহ্-আমীরদের' (আমিরান-ই-সদাহ্) বিদ্রোহ ছিল এই ব্যবস্থার অন্যতম প্রতিক্রিয়া ও ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ।

ফিরোজ-শাহ-তুঘলক নীতিগতভাবে অভিজাতবর্গ ও উলেমাদের পোষণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাই তিনি 'অভিজাতদের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রচুর বৃদ্ধি করেন। স্বভাবতই ইক্তা ব্যবস্থার উপরেও তার প্রভাব পড়ে। মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের আমলে 'খান' পদমর্যাদার একজন অভিজাত বেতন পেতেন ২ লক্ষ তঙ্কা। ফিরোজ তুঘলক সেই হার ৪ লক্ষ থেকে ৮ লক্ষ তঙ্কা পর্যন্ত বৃদ্ধি করেন। উজীরের ক্ষেত্রে এই হার ছিল সর্বোচ্চ ১৩ লক্ষ তঙ্কা। এই আয়ের বিনিময়ে তাঁরা 'ইক্তা' এবং পরগণা বন্দোবস্ত পেতেন। ***দ্বিতীয়ত,*** ফিরোজ শাহ ইক্তার আয় বার্ষিকভাবে নির্ধারণের পরিবর্তে সমগ্র আমলের জন্য (১৩৫১-১৩৮৮ খ্রীঃ) নির্দিষ্ট করে দেন। রাজত্বের চতুর্থ বছরে উজিরাৎ দপ্তর ইক্তার আয় ৬ কোটি ৭৫ লক্ষ তঙ্কা থেকে ৬ কোটি ৮৫ লক্ষ তঙ্কা ধার্য করে দেয়। এই জমার অঙ্ক তাঁর আমলে অপরিবর্তিত ছিল। স্বভাবতই মুক্তিরা নিশ্চিত ছিল যে, সরকারকে দেয় রাজস্ব বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা এবং তা প্রদানের ঝক্কি তাদের সামলাতে হবে না। এই ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় পরীক্ষকের ঝামেলা থেকেও মুক্তিরা রেহাই পেয়ে যান। *তৃতীয়ত,* আফিফের বিবরণ থেকে অনুমান করা যায় যে, ফিরোজের আমলে একজন মুক্তির ব্যক্তিগত বেতন বাবদ প্রাপ্ত ইক্তা এবং সেনাবাহিনীর ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য নির্দিষ্ট ইক্তা পৃথকীকরণ স্পষ্ট ছিল না। ফিরোজ শাহ'র আমলে ইক্তা প্রশাসনের উপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ যে হারে শিথিল করা হয়েছিল, তাতে এই ধরনের সূক্ষ্ম বিভাজন কার্যকরী না-থাকাই ছিল স্বাভাবিক।

ফিরোজ শাহ ঈশ্বর কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে সমস্ত রাজস্ব জনগণের মধ্যে বিলিবণ্টন করে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আফিফের বিবরণ অনুযায়ী ফিরোজ সমস্ত রাজস্ব, ইক্তা এবং পরগণাগুলি জনগণের মধ্যে বণ্টন করে দেন *(By an inspiration from God he distributed the revenues of the empire among the people (nobility) ; even parganas and iqtas were distributed-S. Afif)*। ফলে খালিসা জমির পরিমাণ দারুণ হ্রাস পায়, সংকুচিত হয় কোষাগারের আয়। অবশিষ্ট খালিসার গ্রামগুলির রাজস্বকে ওয়াঝ (Wajh) বেতনের বিকল্প (মোয়াজব) হিসেবে বরাদ্দ করে দেন। এর বাইরে যেসব সৈনিক ছিল তাদের 'ইতলাক্' দেওয়া হয়। 'ইতলাক্' হল কোন ইক্তা থেকে প্রাপ্তব্য রাজস্বের ভিত্তিতে প্রদত্ত হুকুমনামা। সেনারা অনেক সময় এই 'ইতলাক্' ফড়ে-মহাজনদের এক-তৃতীয়াংশ মূল্যে বিক্রয় করে দিত। অবশ্য ইতলাকের ক্রেতারা শেষ পর্যন্ত উল্লিখিত অর্থের অর্ধেক আদায় করেই সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হত বলে আফিফ উল্লেখ করেছেন।

ফিরোজ শাহ ইক্‌তা-ব্যবস্থায় উত্তরাধিকার স্বীকার করে একটা মৌল পরিবর্তন ঘটান। তিনি সরকারিভাবে ইক্‌তার উপর প্রাপকের বংশানুক্রমিক অধিকার মেনে নেন। এমনকি কোন মুক্‌তি অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে সেই ইক্‌তার উপর তার কন্যা, জামাতা, এমনকি পুত্র-কন্যার অবর্তমানে মৃতের ক্রীতদাসের উত্তরাধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয়। এই ব্যবস্থার ফলে ইক্‌তা প্রাপকের সামরিক বা প্রশাসনিক দক্ষতা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে এবং সেবার (Service) বিনিময়ে ইক্‌তা বন্দোবস্তের মৌল বৈশিষ্ট্য অন্তর্হিত হয়। অবশ্য লোদী সুলতানদের আমলে এই বংশানুক্রমিক অধিকার অস্বীকার করার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

ফিরোজ শাহের বংশধরদের পক্ষে ইক্‌তার উপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা আর সম্ভব হয়নি। দু-একটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত ছাড়া এই পর্বে ইক্‌তার উপর বংশানুক্রমিক অধিকার বজায় ছিল। '*তারিখ-ই-মুবারকশাহী*'র সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, সুলতান মুবারক শাহ (১৪২১-'৩৪ খ্রীঃ) লাহোরে জনৈক অভিজাতকে ইক্‌তা প্রদানের (১৪২১ খ্রীঃ) সময় দু'হাজার সৈন্য পোষণের শর্ত আরোপ করেছিলেন। এক ইক্‌তা থেকে অন্য ইক্‌তায় বদলীর দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। অবশ্য সামগ্রিকভাবে ফিরোজের আমলের রীতি অনুসৃত হত।

লোদীবংশের শাসনকালে (১৪১১-১৫২৬ খ্রীঃ) ইক্‌তার সাধারণ বৈশিষ্ট্য একই ছিল। তবে এই সময় থেকে ইক্‌তার পরিবর্তে 'সরকার' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। রাজ্যের খণ্ডিত অংশ 'সরকার' নামে অভিহিত হত। প্রতিটি সরকার কয়েকটি 'পরগণা'র সমন্বয়ে গঠিত হত। প্রতিটি সরকারের রাজস্ব 'জমা' অনুমানের ভিত্তিতে স্থির করে দেওয়া হত। এই 'জমা' বিশিষ্ট সরকার অভিজাতদের বন্দোবস্ত দেওয়া হত এবং সেই ভিত্তিতে প্রাপকের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হত। মুখ্য গ্রহীতা তাঁর সরকার বা পরগণাকে খণ্ডিত অংশে এবং নির্দিষ্ট রাজস্ব আদায়ের শর্তে তাঁদের অধীনস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে 'ইজারা' হিসেবে বণ্টন করে দিতে পারতেন। এই ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করেই মুঘলদের শাসনকালে 'জায়গির' প্রথার প্রসার ঘটেছিল।

দিল্লীর সুলতানেরা মূলত দুটি ইতিবাচক লক্ষ্যপূরণের জন্য 'ইক্‌তা' ব্যবস্থা প্রচলন করেছিলেন। দূরবর্তী অঞ্চলের উপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ সুনিশ্চিত করা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী অভিজাতদের ক্ষমতার স্বাদ দিয়ে কেন্দ্রের প্রতি অনুগত রাখা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছু নেতিবাচক প্রবণতা এখান থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। যে-কোন ভূমিদান-ব্যবস্থার মধ্যেই সামন্ততান্ত্রিক উপাদান লুকিয়ে থাকে। ইক্‌তা-ব্যবস্থাও শেষ পর্যন্ত সেই পরিণতি থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি। প্রাথমিক ভাবে ইক্‌তার উপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ বলবৎ রাখার জন্য একাধিক নিয়ম ছিল। মুক্‌তিদের বদলি, কেন্দ্র কর্তৃক নিয়মিত হিসেব পরীক্ষা, হিসেবে গরমিল বা কর্তব্যে অবহেলার জন্য মুক্‌তিদের কঠোর শাস্তিবিধান ইত্যাদি ব্যবস্থা সামন্ততান্ত্রিক উপাদানকে নিষ্ক্রিয় রাখার ক্ষেত্রে কম কার্যকরী ছিল না। প্রচলিত নিয়ম অনুসারে কোন ব্যক্তির 'ইক্‌তা' বা কোন খেতাবের উপর শুধুমাত্র তারই অধিকার ছিল ; বংশধরদের নয়। রাষ্ট্র সর্বদাই ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং সরকারি পদ বা খেতাবের মধ্যে সুস্পষ্ট প্রভেদ বজায় রাখতে চাইত। যাতে কোনরূপ কায়েমী স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে। কিন্তু কেবল প্রতাপশালী সম্রাটদের আমলে এই নিয়মের কার্যকরী প্রয়োগ সম্ভব হত। কিন্তু দুর্বল শাসকদের আমলে অভিজাতশ্রেণী 'ইক্‌তা' বা খেতাবের উপরে বংশানুক্রমিক অধিকার কায়েম করতে সক্রিয় ছিলেন এবং সফলও হয়েছিলেন।

ইলতুৎমিসের বংশধরদের আমলে এহেন প্রবণতা প্রথম দেখা যায়। ফিরোজ তুঘলক সরকারি ভাবেই এই অধিকার মেনে নিয়ে কায়েমী স্বার্থের জয় ঘোষণা করেন। এই কারণে ***কোশাম্বী (D. D. Kosambi)*** মন্তব্য করেছেন যে, *'ফিরোজ তুঘলক নিম্নস্তর থেকে উপর পর্যন্ত সামন্ততান্ত্রিক অধিকার স্বীকার করে নিয়ে নিশ্চিন্তে শাসন চালিয়েছিলেন (Ultimately Firuz Tughlaq yielded to feudalism from below, and ruled without rebellion till nearly the end of his riegn)'*।[1] এই নতুন প্রক্রিয়াতে কৃষককুল অতিরিক্ত শোষণের শিকারে পরিণত হয়েছিল। *অধ্যাপক* ***ইরফান হাবিব*** মনে করেন, এই ব্যবস্থায় কৃষকদের অবস্থা আধা-ভূমিদাস (Semi-Serf)-দের মতই হয়েছিল। এই দিক থেকে প্রচলিত ব্যবস্থার মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক উপাদান খুঁজে পাওয়া সম্ভব। আবার কর্তৃত্বের প্রবল কেন্দ্রীকরণের ভিত্তি এই অবস্থাকে *'প্রাচ্যদেশীয় স্বৈরতন্ত্র'* (Oriental despotism) বলা যায়। লোদীবংশীয় সুলতান সিকন্দর লোদী ইক্তা বা সরকারি খেতাবের উপর বংশানুক্রমিক দাবি শিথিল করার একটা বিচ্ছিন্ন প্রয়াস করেছিলেন। বিখ্যাত আমীর 'মসনদ-এ-আলা'র বংশধর জৈনউদ্দিনকে জায়গির প্রদানের সময় জারী করা সনদে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছিল যে, মসনদ-এ-আলার বংশধর হিসেবে জৈনউদ্দিনকে এই জায়গির দেওয়া হচ্ছে না। একান্তভাবেই তার ব্যক্তিগত যোগ্যতার বিবেচনায় তাকে এই বিশেষ সম্মানে ভূষিত করা হচ্ছে। কিন্তু এই প্রয়াসের কার্যকারিতা ছিল শূন্য। ***অধ্যাপক আশরাফ*** লিখেছেন ঃ *"ক্রমাগত একের পর এক দুর্বল সুলতান সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার কারণে ইক্তার অধিকারী নিরবচ্ছিন্নভাবে ইক্তা ভোগদখলের সুযোগ পেত এবং তার ফলে ঐ জায়গির প্রায় তার নিজস্ব ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয়ে দাঁড়াত।"* নীতিগত ভাবে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব রক্ষার প্রয়াস সত্ত্বেও ; ইক্তা প্রশাসনের ক্রমবিকাশের ধারায় সামন্ততান্ত্রিক প্রবণতার ঝোঁক খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়।

❍ ওয়াঝদারি ব্যবস্থা ঃ আরবী শব্দ 'ওয়াঝ' (Wajh)-এর অর্থ রাজস্ব। এই গ্রামীণ রাজস্ব আদায়কারী *'ওয়াঝদার'* নামে পরিচিত হন। ওয়াঝদারি ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন মূলত ফিরোজ-শাহ-তুঘলক। সুলতান ইলতুৎমিসের আমল থেকে ভারতে প্রচলিত 'ইক্তা' ব্যবস্থা ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের আমল পর্যন্ত অগ্রসর হয়। ১৩৫১ খ্রীষ্টাব্দে ফিরোজ-শাহ-তুঘলক সিংহাসনে বসলে ইক্তা ব্যবস্থার প্রচলিত প্রবণতাগুলি প্রায় বিপরীতমুখী হয়। মহম্মদ-বিন্-তুঘলক যে ভাবে ইক্তা ব্যবস্থাকে সরকার নিয়ন্ত্রিত একটি সীমিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পরিণত করেছিলেন, এখন তা আমূল পাল্টে যায়। সুলতান ফিরোজ বিভিন্ন স্তরের রাজকর্মচারীদের জন্য নানারকম সুযোগ-সুবিধা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সম্প্রসারণ ঘটান। তিনি রাজস্ব খাতে আয় স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট করে দেন, যাতে স্বত্ব নিয়োগীরা প্রকৃত রাজস্ব আদায়ের বৃদ্ধির সুযোগ নিশ্চিন্তে ভোগ করতে পারে। আইনগতভাবে ইক্তার হস্তান্তর প্রথা তখনও বলবৎ ছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তার কোন প্রয়োগ ছিল না।

আফিফের বিবরণ অনুযায়ী, ফিরোজ ঈশ্বর কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর রাজ্যের সমস্ত রাজস্ব অভিজাতদের মধ্যে বণ্টন করে দেন ; এমনকি, পরগণা এবং ইক্তাগুলিও বণ্টিত

হয়ে যায়। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, তাঁর আমলে খালিসার পরিমাণ অনেকটাই হ্রাস পেয়েছিল। যেটুকু জমি খালিসা হিসেবে তখনও টিকেছিল, ফিরোজ সেগুলির রাজস্বও সৈনিকদের বেতনের পরিবর্তে তাদের হাতে তুলে দেন। একে বলা হত *'ওয়াঝা'।* প্রাপককে বলা হত *'ওয়াঝদার'* এবং সমগ্র প্রক্রিয়াটির নাম ছিল *'ওয়াঝদারী ব্যবস্থা'।* যাঁরা ওয়াঝ পেতেন না, তাঁদের কোষাগার থেকে নগদে বেতন দেওয়া হত। অনেক সময় ইক্‌তার উদ্বৃত্ত রাজস্বের উপর এদের 'ইত্‌লাক' বা 'বরাত' দেওয়া হত। ***আফিফ*** লিখেছেন যে, এক্ষেত্রে সৈন্যরা তাদের প্রাপ্য বেতনের অর্ধেক উক্ত 'ইত্‌লাক' বা 'বরাত' থেকে সংগ্রহ করতে পারত। তবে এটাও আদায় করা সহজসাধ্য ছিল না। তাই সৈন্যরা তাদের 'ইত্‌লাক' অন্যের কাছে এক-তৃতীয়াংশ মূল্যে বিক্রি করে দিতেন। এই দালালরা সৈন্যের বেতনের অর্ধেক ইক্‌তা থেকে আদায় করতো। ওয়াঝদারী ব্যবস্থাকে ***ড. ইরফান হাবিব*** ইক্‌তার *'ক্ষুদ্র সংস্করণ'* বলে অভিহিত করেছেন।

○ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সমস্যা ঃ

সাধারণভাবে ভারতবর্ষ তার তিন দিকেই স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিরাপত্তা দ্বারা বেষ্টিত। কিন্তু উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত কয়েকটি গিরিপথ প্রাচীনকাল থেকেই ভারতের শান্তি ও নিরাপত্তার পথে স্থায়ী বাধা হিসেবে অবস্থান করছে। এই কারণে বার বার উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পথ দিয়ে ভারতে বিদেশী আক্রমণকারী ও শরণার্থীদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্তের পথ ধরেও কিছু বিদেশী শক্তি ভারতে এসেছে, কিন্তু উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের অনুপ্রবেশের তুলনায় তা নগণ্য। প্রাচীনকালে শক, হূণ প্রভৃতি জাতি উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপথে ভারত আক্রমণ করে এদেশে প্রবেশ করেছে এবং কালক্রমে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অংশ হিসেবে মিশে গেছে। মধ্যযুগেও এই পথ বার বার ভারতের নিরাপত্তার বুকে প্রশ্নচিহ্ন এঁকে দিয়েছে। তুর্কী যোদ্ধারা এই পথ ধরে ভারতে প্রবেশ করে ভারত-ইতিহাসে সূচনা করেছে এক নতুন অধ্যায়ের। কিন্তু পরবর্তীকালে তারাই সবচেয়ে বেশি বিব্রত ও নিরাপত্তাহীনতা বোধ করেছে এই পথকে কেন্দ্র করে। কাবুল, গজনী ও কান্দাহার অঞ্চল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পথ ধরে ভারতে ঢোকার পথ নিয়ন্ত্রণ করত। সেই কারণে তুর্কী অনুপ্রবেশকারীরা খুব সহজে ভারতের সীমান্তদেশ দখল করতে সক্ষম হয়েছিল। আবার এই কারণেই বিচক্ষণ ব্রিটিশ শাসকেরা ভারতে ক্ষমতা দখলের পর কাবুল-কান্দাহার-গজনী লাইনকে *'ভারতের বিজ্ঞানসম্মত সীমানা'* (Scientific frontier) বলেই গ্রহণ করেছিল। যাই হোক, দিল্লীর তুর্কো-আফগান শাসকেরা এই সীমান্ত পথের গুরুত্ব ও সমস্যা দুইই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই প্রথম থেকেই দিল্লীর সুলতানের এই সীমান্তপথকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রয়াসী ছিলেন।

মহম্মদ ঘুরী গজনী ও সন্নিহিত অঞ্চল থেকে ভারতের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছিলেন। স্বভাবতই উত্তর-পশ্চিমের গিরিপথ দিয়ে ঘুরী যোদ্ধারা সহজেই ভারতের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করতে পেরেছিল। দিল্লীর প্রথম তুর্কী সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবক এই সীমান্তপথের গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যক সচেতন ছিলেন। তাই মহম্মদ ঘুরীর মৃত্যুর পর গজনী দখল করে দিল্লী সুলতানির নিরাপত্তা ও নিজের রাজ্যসীমা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেন। ১২০৮ খ্রীষ্টাব্দে কুতুবউদ্দিন গজনী দখল

করে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সমস্যায় সাময়িক ছেদ টানতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর এই সাফল্য স্থায়ী হতে পারেনি। কিছুদিনের মধ্যেই গজনীর শাসক তাজউদ্দিন ইলদুজ কুতুবউদ্দিনকে গজনী থেকে বিতাড়িত করেন।

কাবুল ও গজনীর ভৌগোলিক গুরুত্ব সম্পর্কে সুলতান ইলতুৎমিস অবহিত ছিলেন। দিল্লীর উপর গজনীর আইনগত অধিকার সম্পর্কে তিনি বেশি বিব্রত ছিলেন। গজনীর শাসক ইলদুজও তাঁরই মত মহম্মদ ঘুরীর একজন ক্রীতদাস ছিলেন। দিল্লী-সুলতানির উপর গজনীর কর্তৃত্ব কায়েম করার একটা সুপ্ত বাসনাও তাঁর ছিল। মধ্য-এশিয়ার খারজিম (খিবা) সাম্রাজ্যের উত্থান ঘটলে গজনী ও দিল্লীর রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে জটিলতা দেখা দেয়। খারিজমের শাহ কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হয়ে ইলদুজ ভারতে প্রবেশ করেন এবং লাহোর দখল করে দিল্লীর সুলতানি সাম্রাজের উপর তাঁর বৈধ কর্তৃত্ব দাবি করেন। মহম্মদ ঘুরীর প্রকৃত উত্তরাধিকার হিসেবে ইলদুজের দাবির সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই ইলতুৎমিস দৃঢ়তার সাথে ইলদুজের দাবি অস্বীকার করেন এবং 'তরাইনের যুদ্ধে' (১২১৫-'১৬ খ্রীঃ) তাঁকে পরাজিত করেন। বদাউনে এনে বন্দী ইলদুজকে হত্যা করে ইলতুৎমিস একদিকে একজন বড় প্রতিদ্বন্দ্বীর হাত থেকে মুক্ত হন এবং অন্যদিকে গজনীর সাথে দিল্লীর রাজনৈতিক সম্পর্কে ছেদচিহ্ন এঁকে দেন।

ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দশকের শেষদিকে মধ্য-এশিয়ার রাজনৈতিক পট পরিবর্তন উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আবার উত্তেজনার সঞ্চার করে। এই সময় মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিজ খাঁ মধ্য-এশিয়ার বিচ্ছিন্ন ও যাযাবর মোঙ্গল গোষ্ঠীগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে এক দুর্ধর্ষ শক্তিতে পরিণত করেছিলেন। মোঙ্গলরা ঝড়ের গতিতে পশ্চিম ও মধ্য-এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল পদানত করেছিল। সমরখন্দ, বোখরা, খিবা-সহ মুসলিম সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমিগুলিতে মোঙ্গল যোদ্ধারা নির্বিচারে লুণ্ঠন ও ধ্বংস কাজ চালায়। খারাজম-শাহ মোঙ্গলদের ভয়ে রাজ্য ছেড়ে কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে আত্মগোপন করেন। খারাজমের শাহজাদা জালালউদ্দিন মঙ্গবরণী মোঙ্গলদের ভয়ে পাঞ্জাবে প্রবেশ করেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে খোক্কর নামক উপজাতির বসবাস ছিল। এরাও দিল্লী সুলতানের বিরোধী ছিল। মঙ্গবরণী খোক্করদের সহায়তায় উত্তর-পশ্চিম পাঞ্জাব ও মুলতান দখল করতে সক্ষম হন। অতঃপর মঙ্গবরণী বিধর্মী মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে সুলতান ইলতুৎমিসের সাহায্য ও সমর্থন প্রার্থনা করেন। এদিকে মোঙ্গল-নেতা চেঙ্গিজ খাঁও মঙ্গবরণীকে পশ্চাদ্ধাবন করে সিন্ধুর তীরে উপস্থিত হয়ে তাঁর গতিবিধির উপর নজর রাখছিলেন। ফলে ইলতুৎমিস এক গভীর সংকটের মুখোমুখি হন। তিনি এই সত্য উপলব্ধি করতে পারেন যে, মঙ্গবরণীকে সাহায্য করলে বা রাজনৈতিক আশ্রয় দিলে মোঙ্গল-নেতা দিল্লীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন। এমতাবস্থায় ইলতুৎমিস কূটকৌশলের আশ্রয় নেন এবং অত্যন্ত বিনীতভাবে মঙ্গবরণীর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। এতে মঙ্গবরণী অসন্তুষ্ট হলেও চেঙ্গিজ খাঁ তুষ্ট হন এবং দিল্লীর বিরুদ্ধে কোন অভিযান থেকে বিরত থাকেন। কিছুদিনের মধ্যে চেঙ্গিজ ও মোঙ্গলবাহিনী ভারত সীমান্ত থেকে স্বরাজ্যে ফিরে যায়। মঙ্গবরণী প্রায় তিন বৎসর পশ্চিম-পাঞ্জাবে অবস্থান করেছিলেন। মঙ্গবরণীও নাসিরুদ্দিন কুবাচার ক্ষমতার দ্বন্দ্ব পরস্পরের ক্ষমতা খর্ব করেছিল। তাই ইলতুৎমিস এই অঞ্চলের পরিস্থিতির উপর কেবল নজর রেখে চলছিলেন। শেষ পর্যন্ত মঙ্গবরণীও পারস্যে চলে যান। অতঃ পর কুবাচাকে পরাজিত করে সিন্ধু-মুলতান অঞ্চলে সুলতানির কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। অবশ্য

এই সময় সিন্ধুর উত্তর তীরে মোঙ্গলরা বেশ সক্রিয় ছিল। ফলে দিল্লীর প্রকৃত নিরাপদ সীমা সিন্ধুর আরো কিছুটা পূর্বে লাহোর-মুলতান রেখা বরাবর সরে এসেছিল।

ইলতুৎমিসের মৃত্যুর পর দিল্লীর দুর্বল সুলতানেরা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের নিরাপত্তা বিধানের বিষয়ে বিশেষ তৎপর ছিলেন না। ইলতুৎমিস ও বলবনের মধ্যবর্তীকালে আগত সুলতানদের মধ্যে একমাত্র রাজিয়াই মোঙ্গল আক্রমণ সম্পর্কে কিছুটা বাস্তববাদী কর্মসূচী নিতে পেরেছিলেন। এই সময় মোঙ্গলরা খোরাসান ও আফগানিস্থান অঞ্চলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার কিছু বিক্ষিপ্ত উদ্যোগ নিয়েছিল। সিন্ধুর উত্তর তীরে মোঙ্গলদের ঘাঁটি গড়ার প্রচেষ্টা বানচাল করার উদ্দেশ্যে মঙ্গবরণীর জনৈক অনুগামী হুসেন কারলুগ দিল্লীর সুলতানের সাথে মোঙ্গল-বিরোধী জোট গঠনে উদ্যোগী হন। কিন্তু সুলতান রাজিয়া মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে সরাসরি কোন সংঘাতে যেতে প্রস্তুত ছিলেন না। পরন্তু চেঙ্গিজ খাঁ'র মৃত্যুর (১২২৬ খ্রীঃ) পর থেকে মোঙ্গলরা মাঝে মাঝে সিন্ধুর উত্তরে অভিযান চালালেও, দিল্লীর-সুলতানির নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক কোন অভিযান চালায় নি। বরং ইরাক, সিরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে ক্ষমতা সংহত করার কাজে তারা বেশি তৎপর ছিল। তাই সুলতান রাজিয়াও মোঙ্গল-বিরোধী কোন সক্রিয় পদক্ষেপ নেন নি।

১২৪০ খ্রীষ্টাব্দে রাজিয়ার অপসারণ, হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি দিল্লী-সুলতানির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং দুর্বলতা স্পষ্ট তুলে ধরেছিল। ১২৪১ থেকে মোঙ্গলদের ভারত-নীতিতেও মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। এতকাল পর্যন্ত মোঙ্গলরা দিল্লীর সুলতানের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা ও সার্বভৌম অধিকারকে মর্যাদা দিয়েছিল। দিল্লীর সীমান্তদেশ পর্যন্তই তাদের সামরিক কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ রেখেছিল। কিন্তু এখন থেকে মোঙ্গলরা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করে দিল্লী-সুলতানির অধীনস্থ অঞ্চল আক্রমণ ও লুণ্ঠন করতে শুরু করে। ১২৪১ খ্রীষ্টাব্দে বাহাদুর তৈর-এর নেতৃত্বে মোঙ্গলরা লাহোর আক্রমণ করে। তখন দিল্লীর সুলতান বাহরাম শাহ। লাহোরের শাসক দিল্লীর সাহায্য চেয়ে ব্যর্থ হন। ফলে প্রায় বিনাযুদ্ধে মোঙ্গলরা লাহোর দখল করে লুণ্ঠন ও ধ্বংসকার্য চালায়। সুলতান আলাউদ্দিন মামুদ শাহের আমলে মোঙ্গলরা মুলতান ও সিন্ধুর উপর আক্রমণ চালায় (১২৪৫ খ্রীঃ)। মুলতানের স্থানীয় শাসক ইরানের মোঙ্গলনেতা হলাগু খাঁ'র প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে এবং এই অঞ্চল মোঙ্গলদের হাতে অর্পণ করে একটা সমঝোতায় আসতে বাধ্য হন। দিল্লীর দুর্বলতার সুযোগে মোঙ্গলরাও ভারতের উপর আক্রমণের তীব্রতা বাড়িয়ে দেয়। *'বন্দেগান-ই-চাহেলগানী'*-র প্রভাবশালী সদস্য গিয়াসউদ্দিন বলবন আপোষনীতির মাধ্যমে মোঙ্গল আক্রমণ থেকে দিল্লী-সুলতানিকে রক্ষার প্রয়াস চালান। সুলতান মাসুদশাহ মোঙ্গলিয়া ও চীনের মোঙ্গল শাসক মাংগু খাঁ'র বশ্যতা স্বীকার করে স্থিতাবস্থা বজায় রাখেন। পরবর্তী শাসক নাসিরউদ্দিন মামুদ মোঙ্গল নেতা হলাগু খাঁর সাথে সীমান্ত বিষয়ে একটি শান্তি চুক্তি স্থাপনে প্রয়াসী হন। ১২৬০ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর আমন্ত্রণে হলাগুর দূত দিল্লীতে উপস্থিত হন। তাঁকে রাজকীয় মর্যাদার সাথে অভ্যর্থনা জানান হয়। বলবনের উদ্যোগে সুলতান নাসিরউদ্দিন ও হলাগু খাঁ'র মধ্যে এক সমঝোতা চুক্তি দ্বারা স্থির হয় যে, মোঙ্গলরা বিতস্তা নদীর তীর পর্যন্তই তাদের কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ রাখবে।

❍ গিয়াসউদ্দিন বলবনের আমল ঃ বাহরাম শাহ এবং নাসিরউদ্দিন মামুদের রাজত্বকালে চাহেলগাণীর অন্যতম সদস্য এবং উচ্চপদাধিকারী হিসেবে বলবন মোঙ্গলদের

আক্রমণের মুখোমুখি হয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। ১২৪৫ খ্রীষ্টাব্দে মোঙ্গলরা সিন্ধু ও মুলতানের একাংশ দখল করে নেয়। বলবান দ্রুত অগ্রসর হয়ে পরিস্থিতি মোকাবিলা করেন। কিন্তু ১২৪৭ খ্রীষ্টাব্দে মোঙ্গল-নেতা সালদি লাহোরের একাংশ দখল করে নেন। মুলতানের শাসনকর্তা শের খাঁ সম্ভবত মোঙ্গলদের সাথে একটা গোপন বোঝাপড়ার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর নিজের স্বার্থে এই বোঝাপড়ার চেষ্টা সফল হয়নি ; তবে বলবন তাঁর এই আত্মীয়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও অসৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে বেশ শঙ্কিত হয়ে পড়েন। যাই হোক, এই সময় দিল্লীর সীমানা ঝিলাম নদী থেকে বিপাশা পর্যন্ত পিছিয়ে আসে।

বলবন সিংহাসনে বসার এক বছরের মধ্যেই অভ্যন্তরীণ বিচ্ছিন্নতাবাদী ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারি শক্তিগুলিকে দমন করার পর সীমান্তের সুরক্ষা সম্পর্কে ব্যবস্থাদি গ্রহণে উদ্যোগী হন। বলবনের আশঙ্কা ছিল যে, মোঙ্গলরা যে-কোন মুহূর্তে বিপাশা নদী অতিক্রম করে দিল্লী আক্রমণ করতে পারে। সেক্ষেত্রে দিল্লী-সুলতানির অস্তিত্বই বিপন্ন হবে। তাই সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি নতুন রাজ্যজয়ের লোভ সম্বরণ করেন। প্রধানত মোঙ্গলদের ভয়েই তিনি দিল্লী ছেড়ে বাইরে থাকার সিদ্ধান্ত ত্যাগ করেন। তাঁর সেনাপতিরা মালব, গুজরাট ইত্যাদি রাজ্য দখল করার কথা বললে বলবন বলতেন যে, তিনি দিল্লীর বাইরে গেলেই মোঙ্গলরা দিল্লী আক্রমণ করে বিধ্বস্ত করবে।

শাসক হিসেবে বলবন ছিলেন খুবই বিচক্ষণ ও দূরদর্শী। তাই উত্তর-পশ্চিম সীমান্তকে নিরাপদ করার জন্য তিনি শক্তিপ্রয়োগ ও কূটকৌশল—এই দ্বিবিধ নীতি অনুসরণ করেছিলেন। মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে বলবন কয়েকটি রক্ষণাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাঁর আপাত-লক্ষ্য ছিল মোঙ্গলদের বিপাশার তীরে আটকে রাখা। তাই তিনি সীমান্তবর্তী ভাতিন্দা, সামান ও সুমানার দুর্গগুলির সংস্কারসাধন করেন এবং ঐসব দুর্গের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করেন। মোঙ্গল আক্রমণকারীদের সম্ভাব্য যাতায়াতের পথে কয়েকটি সেনাঘাঁটি নির্মাণ করে নিরন্তর প্রহরার ব্যবস্থা করেন। সুলতান স্বয়ং দিল্লীতে সর্বদা উপস্থিত থেকে সামগ্রিক পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখার সিদ্ধান্ত নেন।

বলবনের রাজত্বের গোড়ার দিকে শের খাঁ নামক তাঁর জনৈক আত্মীয় ভাতিন্দা, দীপালপুর ও লাহোরকে কেন্দ্র করে মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। *বরণী* মনে করেন, শের খাঁ ছিলেন খুবই দক্ষ ও বিশ্বস্ত সেনাপতি। কিন্তু ১২৭০ খ্রীষ্টাব্দে শের খাঁর মৃত্যু হয়। অনেকে মনে করেন, বলবন বিষপ্রয়োগ করে শের খাঁকে হত্যা করেছিলেন। *অধ্যাপক নিজামীর* মতে, মোঙ্গলদের সাথে শের খাঁর একটা অশুভ আঁতাত তৈরি হয়েছিল। তাই তিনি শের খাঁকে মুলতান থেকে দিল্লী প্রত্যাবর্তনের আদেশ দেন। কিন্তু শের খাঁ বলবনের আদেশ পালনে অযথা বিলম্ব করতে থাকেন। নানা অজুহাতে তিনি কয়েকটা বছর কাটিয়ে দেন। তাই বলবন এ ধরনের কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য হয়েছিলেন। যাই হোক, শের খাঁর মৃত্যুর ফলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের নিরাপত্তা রক্ষার ব্যাপারে একটা অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছিল। এই সময় বলবন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেন। মুলতান, সিন্ধু ও উচের দায়িত্ব দেন জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদের হাতে এবং সুনাম, সামানা ও দীপালপুরের দায়িত্ব দেন তমর খাঁর হাতে। কিন্তু ইতিপূর্বেই দুই তুর্কী আমীর কিশলু খাঁ এবং শের খাঁ গোপনে মোঙ্গলদের সাথে জোট গড়ার চেষ্টা করেছিলেন। এই ভয়ে অল্পদিনের মধ্যে তমর খাঁকে সরিয়ে ঐ অঞ্চলের দায়িত্ব দেন কনিষ্ঠ

পুত্র বুগরা খাঁর হাতে। বুগরা খাঁর বিশ্বস্ততা সম্পর্কে বলবন নিশ্চিন্ত ছিলেন, কিন্তু তার সামরিক দক্ষতার অভাব ছিল। তাই গুপ্তচর মারফত সুনাম-সামানা অঞ্চলের উপর সুলতান সর্বদা নজর রাখতেন।

সামরিক প্রস্তুতির পাশাপাশি বলবন কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে মোঙ্গলদের আক্রমণ-সম্ভাবনা শিথিল করার চেষ্টা করতেন। এজন্য তিনি ইরানের মোঙ্গল শাসক হলাকুর দরবারে দূত প্রেরণ করেন এবং হলাকু-প্রেরিত দূতকে সসম্মানে দিল্লীর রাজসভায় গ্রহণ করেন। ***অধ্যাপক সতীশচন্দ্র*** প্রমুখ বরণীর এই বিবরণ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ***অধ্যাপক নিজামীর*** মতে, বলবনের সিংহাসনারোহণের পূর্বেই হলাকুর মৃত্যু হয়েছিল। তাই এই ধরনের কোন কূট সম্পর্ক স্থাপনের সম্ভাবনা অন্তত হলাকুর আমলে ছিল না। তবে মোঙ্গলদের ইলখান গোষ্ঠীর সাথে বলবনের একটা অলিখিত সমঝোতা স্থাপিত হয়েছিল বলে মনে হয়। এতে পঞ্জাবের উপর মোঙ্গলদের কর্তৃত্ব বলবন স্বীকার করেছিলেন এবং মোঙ্গলরাও দিল্লী আক্রমণ না-করার একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও মোঙ্গলরা প্রায়শই সীমান্তে হানা দিত এবং সুলতানি-বাহিনীর সাথে সংঘর্ষ ঘটত। ১২৭৯ খ্রীষ্টাব্দে এমনি একটি আক্রমণ মহম্মদ ও বুগরা খাঁর মিলিত প্রচেষ্টায় প্রতিহত করা হয়। অতঃপর বুগরা খাঁকে বলবন বাংলার গভর্নর নিযুক্ত করলে (১২৮১ খ্রীঃ) সমগ্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দায়িত্ব পড়ে মহম্মদের হাতে। ১২৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মোঙ্গল-নেতা তৈমুর খাঁ বিশাল বাহিনী-সহ বিপাশা অতিক্রম করে দীপালপুর আক্রমণ করেন। মহম্মদ বীরত্বের সাথে মোঙ্গলদের প্রতিহত করেন। তবে এই যুদ্ধে তিনি নিহত হন। সাহসিকতা ও দেশপ্রেমের জন্য তিনি *'খান-ই-শহিদ'* উপাধিতে ভূষিত হন। তবে প্রিয় পুত্রের এহেন আকস্মিক মৃত্যু বলবনকে প্রচণ্ড আঘাত করে। সুলতানের শরীর দ্রুত ভেঙ্গে পড়ে। কারণ মহম্মদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পার্থিব আশা-আকাঙ্ক্ষা অনেকটাই নিঃশেষ হয়ে যায়। বলবনের অন্য পুত্র বুগরা খাঁ সুলতানি সিংহাসন সম্পর্কে আদৌ আগ্রহী ছিলেন না। তিনি লখনৌতির শাসকপদেই থাকার দৃঢ় ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। এমতাবস্থায় বলবন মৃত মহম্মদের নাবালক পুত্র কাইখসরু'কে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। এর চারদিন পরেই তাঁর মৃত্যু হয় (১২৮৭ খ্রীঃ)।

○ খলজী আমলে মোঙ্গল আক্রমণ ঃ

মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করার কাজে জালালউদ্দিন ফিরোজ দক্ষতা ও দৃঢ়তার পরিচয় দেন। ১২৯২ খ্রীষ্টাব্দে প্রাক্তন মোঙ্গল নেতা হলাকুর পৌত্র আবদুল্লার নেতৃত্বে প্রায় দেড়লক্ষ মোঙ্গলের একটি দল ভারত আক্রমণ করে এবং সামান পর্যন্ত অগ্রসর হয়। জালালউদ্দিন তৎপরতার সঙ্গে মোঙ্গলদের গতিরোধ করেন এবং যুদ্ধে পরাজিত করে পিছু হটতে বাধ্য করেন। এই সময় চেঙ্গিজ খাঁর বংশধর হুলাগু'র নেতৃত্বে কয়েক হাজার মোঙ্গল ইসলামধর্ম গ্রহণ করে ভারতে বসবাস করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। ফিরোজ তাদের সেই অনুমতি দেন। এমন কি তিনি নিজের ভগিনীর সাথে হলাগুর বিবাহ দেন এবং ধর্মান্তরিত মোঙ্গলদের বিভিন্ন সরকাবি পদে নিয়োগ করেন। এরা *'নব-মুসলমান'* নামে পরিচিত হয়। জালালের এই কাজের মধ্যে দুরদৃষ্টির অভাব লক্ষ্য করা যায়। কারণ পরবর্তীকালে এই 'নব মুসলমানরা দিল্লী-সুলতানির অস্তিত্বের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল।

○ আলাউদ্দিন খলজীর মোঙ্গল নীতি ঃ

আলাউদ্দিন খলজী সিংহাসন আরোহণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মোঙ্গলদের আক্রমণজনিত সমস্যার সম্মুখীন হন। ১২৯৬ থেকে ১৩০৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রায় বাৎসরিক অনুষ্ঠানের মত মোঙ্গলরা দিল্লী, পাঞ্জাব, মুলতান, সিন্ধু এবং গঙ্গা-যমুনা-দোয়াব অঞ্চলে উপর্যুপরি আক্রমণ চালিয়েছিল। ইতিপূর্বে গিয়াসউদ্দিন বলবন উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের নিরাপত্তার জন্য কিছু স্থায়ী ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। তাছাড়া, মধ্য-এশিয়ার রাজনীতির উত্থান-পতনের সূত্রে মোঙ্গলদের আক্রমণে কিছুটা শিথিলতা এসেছিল। ইরানের 'ইলখান' মোঙ্গলদের সাথে দিল্লী-সুলতানির মোটামুটি একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। ইলখানদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ট্রান্স-অক্সিয়ানার চাঘতাই মোঙ্গলরা। এদের নেতা দবা খান মধ্য-এশিয়ার যুদ্ধে ইলখানদের বিরুদ্ধে সাফল্য না-পাওয়ার জন্য ভারতের দিকে আক্রমণ চালাতে শুরু করে। অবশ্য আলাউদ্দিন প্রায় প্রতিটি আক্রমণই অত্যন্ত দক্ষতার সাথে প্রতিহত করেন।

১২৯৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে কদর খাঁর নেতৃত্বে প্রায় একলক্ষ মোঙ্গল সেনা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে দিল্লীর দিকে এগিয়ে আসে। আলাউদ্দিনের বিশ্বস্ত অনুচর জাফর খাঁ জলন্ধরের কাছে মোঙ্গলদের বাধা দেন এবং বহু মোঙ্গলসেনাকে হত্যা করে সুলতানি-বাহিনীর মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। পরের বছরেই সালদির নেতৃত্বে মোঙ্গলরা আবার আক্রমণ চালায় এবং দিল্লীর নিকটবর্তী শিরিদুর্গ দখল করে নেয়। এবারও জাফর খাঁ মোঙ্গলদের পরাজিত ও বিতাড়িত করেন। মোঙ্গল সেনাপতি সালদি-সমেত প্রায় সতেরশ' মোঙ্গলকে বন্দী করে তিনি দিল্লীতে পাঠিয়ে দেন।

১২৯৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে দবা খাঁর পুত্র কুতলখ খাজার নেতৃত্বে প্রায় দু'লক্ষ মোঙ্গল সেনা দিল্লী আক্রমণ করে। এবারে মোঙ্গলদরে লক্ষ্য ছিল নিছক লুণ্ঠন নয়, দিল্লীর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব দখল করা। তাই তারা দিল্লী আসার পথে লুঠতরাজ বা ধ্বংসকার্য থেকে বিরত থাকে। মোঙ্গল সেনারা দিল্লীর সাথে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিতে সক্ষম হয়। এমনকি নগরের কোন কোন রাস্তাতেও তারা প্রবেশ করে। সুলতান আলাউদ্দিন এবারে বেশ সঙ্কটের মধ্যে পড়েন। দিল্লীর কতোয়াল আলাউলমুলক তাঁকে পরামর্শ দেন মুখোমুখি যুদ্ধের পরিবর্তে কূটকৌশলে কাল হরণ করার। কিন্তু অসমসাহসী *আলাউদ্দিন* তাকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, *"চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা না-করে দিল্লীর রাজত্ব চালানো যায় না।"* আলাউদ্দিন দিল্লীনগরী ও প্রাসাদের দায়িত্ব কোতোয়ালের উপর অর্পণ করে যুদ্ধযাত্রার প্রস্তুতি নেন। যাওয়ার আগে কোতোয়ালকে ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন *'দিল্লীর চাবি রইল। যে বিজয়ী হবে তাঁর হাতে তুলে দেবেন এবং বিশ্বস্ততার সাথে তারই সেবা করবেন।'* জাফর খাঁ, নুসরৎ খাঁ, উলুঘ খাঁ, আকৎ খাঁ প্রমুখকে নিয়ে আলাউদ্দিন কিলিতে মোঙ্গলদের মুখোমুখি হন। আলাউদ্দিন সেনা-প্রতিরোধ তৈরি করে যথার্থ সময়ের জন্য সেনাপতিদের অপেক্ষা করার নির্দেশ দেন। কিন্তু ধৈর্যচ্যুত হয়ে জাফর খাঁ সুলতানের অনুমতি ছাড়াই এক কোণ দিয়ে মোঙ্গলদের আক্রমণ করেন। বহু মোঙ্গলকে হত্যা করলেও তিনি নিজে মোঙ্গলদের হাতে নিহত হন। এর দু'দিন পর বাকি মোঙ্গল সেনা ও কুলতখ খাজা যুদ্ধ না-করেই স্বরাজ্যে ফিরে যান। আলাউদ্দিনের সাহস ও দৃঢ়তা বিরাট সংকট থেকে সুলতানি সাম্রাজ্যকে রক্ষা করে। অবশ্য জাফর খাঁর মৃত্যুতে আলাউদ্দিন কিছুটা খুশিই হয়েছিলেন। কারণ মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে জাফরের ধারাবাহিক সাফল্য তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা যেমন বৃদ্ধি

করেছিল ; তেমনি যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে জনগণের মনেও তাঁর একটা রোমাণ্টিক ভাবমূর্তি অঙ্কিত হচ্ছিল, যা আলাউদ্দিনের অভিপ্রেত ছিল না। তিন বছর বিরতির পর ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে মোঙ্গল নেতা তারঘী আবার ভারত আক্রমণ করে দিল্লীতে ঢুকে পড়েন। এই সময় আলাউদ্দিন চিতোরজয়ে ব্যস্ত ছিলেন। মোঙ্গল আক্রমণের সংবাদ পেয়ে তিনি দ্রুত ফিরে আসেন এবং মোঙ্গলদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত না হয়ে সিরিদুর্গে প্রবেশ করে আত্মরক্ষামূলক প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত নেন। সম্ভবত চিতোর ও তেলেঙ্গানা যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি সামলে তৎক্ষণাৎ মোঙ্গলদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবার মত যথেষ্ট শক্তি সুলতানের ছিল না। যাই হোক, এই সময় মোঙ্গল সেনাদের অত্যাচারে সাধারণ মানুষের খুবই কষ্ট হয়েছিল। দু'মাস এইরকম চলার পর মোঙ্গলরা স্বদেশে ফিরে যায়। ***বরণী*** লিখেছেন ঃ *"দিল্লীর দরিদ্র জনসাধারণের কাতর আবেদন এবং সন্ত নিজামউদ্দিন আউলিয়ার প্রার্থনার ফলে মোঙ্গলরা দিল্লী ছেড়ে যেতে রাজী হয়েছিল।"* কিন্তু ***ড. কে. এস. লাল*** মনে করেন, *"আলাউদ্দিনের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ মোকাবিলার জন্য অনির্দিষ্টকাল দিল্লীতে থাকা দরকার ছিল। কিন্তু মধ্য-এশিয়া থেকে বেশিদিন বাইরে থাকা মোঙ্গল-বাহিনীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই তারা ভারত ত্যাগ করে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিল।"*

মোঙ্গলদের প্রতিটি আক্রমণ প্রতিহত করতে পারলেও, তাদের অবাধে দিল্লীর বুক পর্যন্ত ঢুকে পড়ার ঘটনায় আলাউদ্দিন কিছুটা চিন্তিত হন। এতদিন তিনি কেবল মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ করেছেন। এবার তিনি নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সীমান্তবর্তী দুর্গগুলির সংস্কারসাধন এবং নতুন নতুন দুর্গ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন। দুর্গগুলির সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করেন এবং আক্রমণের মুহূর্তে দ্রুত সাহায্যদানের উদ্দেশ্যে দিল্লীতে একটি বিশেষ বাহিনী মোতায়েন রাখেন। এই কাজ তত্ত্বাবধানের জন্য একটি নতুন পদ সৃষ্টি করেন।

আলাউদ্দিনের প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা সত্ত্বেও মোঙ্গল আক্রমণ অব্যাহত থাকে। ১৩০৫ খ্রীষ্টাব্দে আলিবেগ ও তারতাক্-এর নেতৃত্বে মোঙ্গলরা পাঞ্জাবের পথ ধরে ধ্বংসকার্য চালাতে চালাতে আমরোহা পর্যন্ত ঢুকে পড়ে। অবশ্য গাজী মালিক এবং মালিক কাফুরের নেতৃত্বে সুলতানি—বাহিনী মোঙ্গলদের পরাজিত করে। দুই নেতাসহ বহু মোঙ্গল সৈন্য বন্দী হয়। সুলতানের নির্দেশে আলি বেগ ও তারতাক্'কে হাতির পায়ে পিষ্ট করে হত্যা করা হয় এবং বন্দী-সেনাদের ছিন্ন মুণ্ডগুলিকে গম্বুজের আদলে শিরির দুর্গের উপর সাজিয়ে দেওয়া হয়। এই সময় আলাউদ্দিন গাজী মালিককে পাঞ্জাবের প্রশাসক নিযুক্ত করেন। দক্ষ ও বিশ্বস্ত এই সেনানায়ক অতঃপর সাফল্যের সাথে মোগল আক্রমণগুলি প্রতিহত করেন।

১৩০৫-এর বিপর্যয়ের প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে পরের বছরেই (১৩০৬ খ্রীঃ) বিশাল মোঙ্গলবাহিনী দু'দিক দিয়ে ভারত আক্রমণ করে। কুবাক-এর নেতৃত্বে মোঙ্গলদের একটি দল রাভী নদীর তীরে উপস্থিত হয়। ইকবালমন্দ্-এর নেতৃত্বে দ্বিতীয় দলটি উপস্থিত হয় নাগৌরে। এবারেও গাজী মালিক ও মালিক কাফুর মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং তাদের পরাজিত করেন। কুবাক বন্দী হন। ইকবালমন্দ্ কোন ক্রমে পালিয়ে প্রাণ বাঁচান। এবারেও সুলতানি-বাহিনীর হাতে বহু মোঙ্গল-সেনা ও তাদের স্ত্রী-পুত্র (যুদ্ধের সময় মোঙ্গলরা সপরিবারে থাকত) বন্দী হয়। নারী ও শিশুদের দাস হিসেবে বিক্রি করা হয় এবং সেনাদের হত্যা করে তাদের ছিন্নমুণ্ডগুলিকে বদাউন গেটের কাছে গম্বুজাকারে সাজিয়ে দেওয়া হয়। আলাউদ্দিনের আমলে মোঙ্গলদের শেষ আক্রমণ

ঘটে ১৩০৭-৮ খ্রীষ্টাব্দে। ইকবালমন্দের নেতৃত্বে মোঙ্গলরা সিন্ধুর তীরে উপস্থিত হওয়ামাত্র সুলতানি-বাহিনী তাদের ঘিরে ধরে। ইকবালমন্দ নিহত হন। বহু মোঙ্গল-সেনাকে বন্দী করে দিল্লী এনে হত্যা করা হয়। এখন থেকে কুতুবউদ্দিন মোবারকের আমল পর্যন্ত মোঙ্গলরা ভারতের বিরুদ্ধে কোন অভিযান পাঠায়নি।

আলাউদ্দিন খলজীর অনমনীয় দৃঢ়তা এবং মধ্য-এশিয়ার রাজনৈতিক অস্থিরতা মিলিতভাবে অন্তত কয়েক বছরের জন্য ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তকে কিছুটা শান্তি দিয়েছিল। পশ্চিম ও মধ্য-এশিয়ার শাসকরা যখন মোঙ্গলদের প্রতিহত করতে ব্যর্থ হচ্ছিল তখন তাদের প্রতিহত করে আলাউদ্দিন প্রমাণ করেন যে, সুলতানি সেনাবাহিনীর সমরদক্ষতা মধ্য-এশীয় দেশগুলির থেকে কম ত নয়ই, বরং বেশি। তাই আলাউদ্দিনের আমলে মোঙ্গলরা ভারত-আক্রমণের ব্যাপারে যথেষ্ট দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। ১৩০৬ খ্রীষ্টাব্দে মোঙ্গল-নেতা দাবা খাঁর মৃত্যু তাদের মনোবল আরো ভেঙ্গে দেয়। অতঃপর চাঘতাই মোঙ্গলদের নেতৃত্বের প্রশ্নে অস্থিরতা দেখা দেয়। তাই বহির্দেশে আক্রমণ সংগঠিত করা থেকে তারা বিরত থাকে। অবশ্য আলাউদ্দিনের সামরিক শক্তির প্রাধান্যই ছিল মোঙ্গলদের পিছু হটার প্রধানতম কারণ। *ড. লাল* (K. S. Lal) লিখেছেন ঃ *"The Mongol menace which had made his predecessors tremble on their throne was put to an end by him (Alauddin"*। বরণী ও ফেরিস্তা এ ব্যাপারে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা গাজী-মালিকের ভূমিকার প্রশংসা করেছেন। মধ্য-এশিয়ায় মোঙ্গলদের অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগে গাজী-মালিক দীপালপুরে সর্বক্ষণের জন্য একটি শক্তিশালী বাহিনী মোতায়েন রেখে এবং কাবুল, গজনী, কান্দাহার প্রভৃতি স্থানে বারবার অভিযান চালিয়ে ঐ সকল অঞ্চল থেকে অর্থ সংগ্রহ করে মোঙ্গলদের মনোবল অনেকটা ভেঙ্গে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

মোঙ্গল আক্রমণের সম্ভাব্যতা ও ভীতি দ্বারা আলাউদ্দিনের রাষ্ট্রনীতি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। যেমন—(১) মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য আলাউদ্দিন বিশালসংখ্যক ও শক্তিশালী একটি সামরিক-বাহিনী গড়ে তুলতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই বাহিনীর দ্বারা উত্তর-দক্ষিণ ভারতে সাম্রাজ্যবিস্তারের কাজ সহজ হয়। (২) বিশাল সামরিক-বাহিনীর ব্যয় মেটানোর জন্য প্রয়োজন হয় অতিরিক্ত অর্থের। এজন্য তিনি রাজস্বব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করেন। নতুন নতুন কর আরোপ করে এবং প্রচলিত করের হার বৃদ্ধি করে রাজকোষকে স্ফীত করতে বাধ্য হন। (৩) সেনাবাহিনীর জীবনযাত্রার মান বজায় রাখার জন্য নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম তিনি নির্দিষ্ট করে দিতে বাধ্য হন। (৪) মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে আলাউদ্দিনের ধারাবাহিক সাফল্য তাঁর মর্যাদা ও প্রতিপত্তি দারুণভাবে বৃদ্ধি করে। পরাজিত মোঙ্গল সেনাদের নৃশংসভাবে হত্যা করে এবং তাদের স্ত্রী-পুত্রদের দাস হিসেবে বিক্রি করে আলাউদ্দিন জনমনে সুলতান সম্পর্কে এমন একটা ভীতির ভাব গড়ে দেন, যার ফলে সুলতানের বিরুদ্ধে যে-কোন ধরনের আন্দোলনের সম্ভাবনা হ্রাস পায়। (৫) সর্বোপরি মোঙ্গল আক্রমণ রোধ এবং সাম্রাজ্যবাদী কর্মসূচী রূপায়ণকে সুলতান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে গুরুত্ব দেন। কিন্তু এর ফলে দেশবাসীর নৈতিক ও বৈষয়িক উন্নয়নের দিকটি অবহেলিত থেকে যায়।

○ মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের আমল ঃ

১৩২৬ থেকে ১৩২৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কোন এক সময় চাঘতাই মোঙ্গল-নেতা তরমাশিরিন খাঁ ভারতে এসেছিলেন। তরমাশিরিনের ভারতে আগমনের নির্দিষ্ট সময়, উদ্দেশ্য এবং পরিণতি সম্পর্কে সমকালীন ও পরবর্তী ঐতিহাসিকদের বিবরণে বহু অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। ইসামীর বিবরণ থেকে জানা যায় যে, সুলতান মুলতান থেকে আগত এক দূত মারফত জানতে পেরেছিলেন যে, তরমাশিরিনের নেতৃত্বে বিশাল মোঙ্গলবাহিনী সিন্ধুদেশে প্রবেশ করে ব্যাপক লুঠতরাজ ও হত্যাকাণ্ড চালিয়ে দ্রুত ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করছে। সংবাদ পাওয়া মাত্র মহম্মদ তুঘলক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন এবং দেশের নানাপ্রান্ত থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে প্রায় পাঁচ লক্ষের অশ্বারোহী যোদ্ধা প্রস্তুত করেন। তবে এই বাহিনীকে মোঙ্গলদের প্রতিরোধের জন্য অগ্রসর হবার কোন নির্দেশ তখনও দেওয়া হয়নি। আবার খবর আসে যে, মোঙ্গলরা মিরাটে প্রবেশে করেছে এবং নাগরিকদের উপর অকথ্য নিপীড়ন চালাচ্ছে। এই সময় সুলতান ইউসুফ বুগরা খাঁকে দশ হাজার সৈন্যসহ মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হবার নির্দেশ দেন। বুগরা খাঁ অসম শক্তি নিয়ে বীরত্বের সাথে মোঙ্গলদের আক্রমণ করেন এবং প্রাথমিক বিপর্যয় সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত মোঙ্গলদের বিতাড়িত করতে সক্ষম হন। ***ইসামীর*** মতে, মহম্মদ-বিন্-তুঘলক এক্ষেত্রে চূড়ান্ত কাপুরুষতার পরিচয় দেন এবং পাঁচ লক্ষের বাহিনী প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও মাত্র দশ হাজার বাহিনীকে দুর্ধর্ষ মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করে ভীরুতা ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার নগ্ন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। মোঙ্গলদের পরাজিত হবার সংবাদ পাওয়ার পর সুলতান দিল্লীর বাইরে এসে কিছু সৈন্যকে তাদের পশ্চাদ্ধাবনের নির্দেশ দেন। ***ইয়াহিয়া-বিন-আহমদ্***-এর মতে, মোঙ্গল আক্রমণের সংবাদ পাওয়ার পর (১৩২৮ খ্রীঃ) মহম্মদ-বিন্-তুঘলক সসৈন্যে কালানুর পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং সেখানকার অগ্রবর্তী বাহিনীর দায়িত্ব মালিক মুজিরুদ্দিনের হাতে ন্যস্ত করে দিল্লী ফিরে যান। মহম্মদ-বিন্-তুঘলক যে মোঙ্গলদের প্রতিহত না-করে দিল্লীর মধ্যে নিষ্ক্রিয়ভাবে বসেছিলেন, একথা ইয়াহিয়া তাঁর *'তারিখ-ই-মুবারকশাহী'* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এমন কি তৈমুরের আত্মজীবনীতেও এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। বদাউনিও প্রায় একই কথা লিখেছেন। ফেরিস্তার বিবরণে কিছুটা নতুনত্ব আছে। ইসামী, ইয়াহিয়া-বিন্-আহমদ্ বা বদাউনির বিরোধিতা করে তিনি লিখেছেন ঃ *তরমাশিরিন ভারতে এসেছিলেন ১৩২৭ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ মহম্মদ-বিন্-তুঘলক কর্তৃক দৌলতাবাদে রাজধানী স্থানান্তরের আগে।* ***ফেরিস্তা*** লিখেছেন দবা খাঁ'র পুত্র তরমাশিরিন সসৈন্যে ভারতে প্রবেশ করে মুলতান, লামাঘান-সহ দিল্লী পর্যন্ত বিশাল অঞ্চল লুঠতরাজ করেন। ভীত সুলতান মহম্মদ তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে অর্থের বিনিময়ে শান্তি প্রার্থনা করেন। বিশাল অঙ্কের অর্থ নিয়ে তরমাশিরিন ভারত ত্যাগ করেন।

ড. আগা. মেহদী হোসেন মনে করেন, ফেরিস্তার বিবরণের মধ্যে অন্তর্বিরোধিতার ছাপ স্পষ্ট। ফেরিস্তা এবং বরণী উভয়েই স্বীকার করেছেন যে, রাজত্বের সূচনাপর্বে মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের শাসনব্যবস্থা এত দক্ষ ছিল যে, সমস্ত প্রকার বাধা-বিপত্তি তিনি অতিক্রম করতে সক্ষম ছিলেন। সুতরাং, রাজত্বের দ্বিতীয় বছরে মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করতে তিনি ব্যর্থ হবেন, কিংবা অর্থের বিনিময়ে রাজ্যের নিরাপত্তা ভিক্ষা করবেন—একথা স্বীকার করা যায় না। ***ড. হোসেন*** লিখেছেন ঃ এ ধরনের দুর্বলতা নিয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষী আমির ও মালিকদের আনুগত্য পাওয়া সম্ভব নয়। অথচ

মহম্মদ তুঘলক-এর পরেও প্রায় পঁচিশ বছর দাপটের সাথে রাজত্ব করেছিলেন। *ইসামী, ইয়াহিয়া আহমদ, ফেরিস্তা* প্রমুখ তরমাশিরিনের যাত্রাপথের যে বিবরণ দিয়েছেন তাও পরস্পর-বিরোধী। *ইসামীর* মতে, তরমাশিরিন সিন্ধু থেকে মুলতান হয়ে মিরাট পর্যন্ত আঁকাবাঁকা পথে অগ্রসর হয়েছেন। *ইয়াহিয়া-বিন্-আহমদের* মতে, এই পথ ছিল পাঞ্জাব, সিরহিন্দ, লাহোর, সামানা, বদাউন হয়ে দিল্লীর সন্নিকট পর্যন্ত। *ফেরিস্তা* লিখেছেন ঃ মুলতান, লামঘান হয়ে দিল্লীতে মোঙ্গলরা উপস্থিত হয়েছিল। আবার *হাজিদবির* লিখেছেন যে, তরমাশিরিন ও তাঁর বাহিনী একাধিক ভাগে বিভক্ত হয়ে নানা পথ ধরে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। মোঙ্গলদের ভারত ছেড়ে যাবার বর্ণনা প্রসঙ্গেও এই বিরোধ লক্ষ্য করা যায়। ইসামীর মতে, সুলতান মহম্মদ থানেশ্বর পর্যন্ত মোঙ্গলদের পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন। ইয়াহিয়া-র মতে, সুলতান মোঙ্গলদের কালানুর পর্যন্ত তাড়া করেছিলেন. অন্যদিকে তৈমুরের চতুর্থ পুত্র উলুঘবেগ মির্জার উদ্যোগে রচিত *'শাহজারাত-উল-আতরক'* গ্রন্থে বলা হয়েছে দিল্লীর সুলতান মহম্মদ মোঙ্গলদের আদৌ পশ্চাদ্ধাবন করেন নি। তরমাশিরিন স্বেচ্ছায় দিল্লী থেকে গুজরাট হয়ে সোমনাথ ও সুরাট লুণ্ঠন করে স্বরাজ্যে ফিরে গিয়েছিলেন। *ড. হোসেন* লিখেছেন ঃ *"Here is a complex network of paths, not adjustable harmoniously on any atlas of physical and political geography."*

ইবন বতুতা'র বিবরণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাঁর বিবরণ থেকে অনুমিত হয়, তরমাশিরিন ছিলেন ইসলাম ধর্মাবলম্বী এবং দিল্লীর সুলতান তথা মুসলমানদের সুহৃদ। পারিবারিক কিছু রীতিভঙ্গ করার জন্য তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন এবং সমরখন্দের কাছে নিহত হন। অন্য কোন ব্যক্তি তরমাশিরিনের নাম ভাঁড়িয়ে মুলতানে প্রবেশ করেন। একথা জানতে পেরে মহম্মদ-বিন্-তুঘলক তাঁকে তিরস্কৃত করেন এবং পাঁচ হাজার তঙ্কা অনুদান হিসেবে দান করে স্বদেশে পাঠিয়ে দেন। *ড. মেহদী হোসেন* মনে করেন, ইবন বতুতার বক্তব্যের মধ্যে কিছুটা সারবত্তা আছে। তবে তরমাশিরিন ভারতে আসার আগেই নিহত হয়েছিলেন কিনা তা বলা সম্ভব নয়। সম্ভবত ভাগ্যবিপর্যয়ের ফলে তিনি মিত্র-শাসক দিল্লীর সুলতানের সাহায্য-প্রার্থী হয়েছিলেন। অনুগত সেনাবাহিনী ও পাত্রমিত্রসহ তরমাশিরিন মুলতান, পাঞ্জাব হয়ে দিল্লীর সন্নিকটে উপস্থিত হন। সুলতান তাঁকে পাঁচ হাজার দিনার সাহায্য হিসেবে দেন। অতঃপর মোঙ্গল-নেতা ভারত ছেড়ে চলে যান। অবশ্য *ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার* মনে করেন, ড. হোসেনের বক্তব্য বহুলাংশে অনুমানভিত্তিক এবং সমসাময়িক অন্যান্য তথ্য দ্বারা সমর্থিত নয়। *ড. উলসী হেগ*-এর মতে, তরমাশিরিন আক্রমণ অবশ্যই করেছিলেন, তবে সুলতান উৎকোচ প্রদান করে মোঙ্গল-নেতাকে সন্তুষ্ট করেছিলেন, একথা বিশ্বাস করা কঠিন। *ড. ঈশ্বরীপ্রসাদও* মনে করেন, ফেরিস্তার বিবরণ অন্যান্যদের তুলনায় বেশি গ্রহণযোগ্য। বিভিন্ন সূত্র বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে যে, মোঙ্গলদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য মহম্মদ-বিন্-তুঘলক ব্যাপক উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তবে ইউসুফ বুঘরা মোঙ্গলদের পরাজিত ও বিতাড়িত করার ফলে মহম্মদ তুঘলক ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ছাড়াই এই বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন।

○ মোঙ্গল আক্রমণের ফলাফল ঃ

মোঙ্গলরা ছিল স্বভাবে হিংস্র ও রক্তপিপাসু। স্বভাবতই ভারতের বিরুদ্ধে মোঙ্গলদের সফল

অভিযানগুলির একমাত্র ফল ছিল ভারতের অসংখ্য নিরীহ প্রাণের বিনাশ এবং সম্পদের লুণ্ঠন। ঐতিহাসিক ***শ্রীবাস্তব*** (A. L. Srivastave) এই সহজ-সরল ব্যাখ্যাকে অস্বীকার করে রক্তপিপাসু মোঙ্গলদের আক্রমণের মধ্যে একটা শুভ সম্ভাবনার আভাস লক্ষ্য করেছেন। *'The Sultanate of Delhi'* গ্রন্থে তিনি লিখেছেন যে, মোঙ্গলরা ভারতের উপর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব পেলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয় থেকে ভারতবর্ষ রক্ষা পেত। তাঁর মতে, মোঙ্গলরা সফল হলে দিল্লী সুলতানির পতন ঘটত। এবং যেহেতু মোঙ্গলরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিল, তাই তারাও গ্রীক, শক বা হূণদের মতই একদিন ভারতীয় সংস্কৃতি গ্রহণ করে এদেশের সমাজ-সংস্কৃতির সাথে একাকার হয়ে যেত। তিনি লিখেছেন ঃ *"Had the Mongols succeeded, the history of our country would have taken a different course. The Sultanate would have come to an end, and the Mongols being virtual Buddhists would have gradually merged in the Hindu society.."*।

শ্রীবাস্তবের এই মূল্যায়ন নেহাতই কষ্টকল্পনা মাত্র। কারণ মোঙ্গলদের মধ্যে যে সহিষ্ণুতা ও সমন্বয়ী আদর্শের একান্ত অভাব ছিল, তা অধ্যাপক শ্রীবাস্তব তাঁর বিবেচনার মধ্যে রাখেন নি। মধ্য-এশিয়ার সুসজ্জিত নগরী ও জনপদগুলি আক্রমণ করে মোঙ্গলরা যে নিষ্ঠুরতা চালিয়েছিল, তার পরিণামে আশ্রয়ের সন্ধানে দলে দলে মানুষ ভারতে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। দিল্লী দখল করলেও সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটত, অন্য কিছু নয়। এই প্রসঙ্গে মোঙ্গলদের জীবনদর্শন সম্পর্কে ***মাইকেল প্রাউডিন*** তাঁর *'The Mughol Empire ; its Rise and Fall'* গ্রন্থে যে তথ্য দিয়েছেন, তা লক্ষণীয়। মানুষ জীবনের সর্বাধিক আনন্দ প্রসঙ্গে স্বয়ং ***চেঙ্গিজ খাঁ*** মন্তব্য করেছিলেন, *"একজন মানুষের সর্বাধিক আনন্দ হল শত্রুদের জয় করা ও তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া। তাদের ঘোড়ায় আরোহণ করা ও সম্পদ লুঠ করা। তাদের প্রিয়জনদের চোখের জলে ভরা মুখ দেখা এবং তাদের স্ত্রী-কন্যাদের নিজ বাহুবন্ধনে জড়ানো।"* তাই মোঙ্গলদের আক্রমণ প্রতিহত করে এবং আক্রমণের সম্ভাব্যতা হ্রাস করার জন্য সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে যথেষ্ট দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন।

মোঙ্গল আক্রমণের ভীতি দিল্লীর সুলতানদের সদা বিব্রত রেখেছিল। এর ফলে সীমান্ত নিরাপত্তা বিধানে ব্যয়িত হয়েছিল প্রভূত সম্পদ, শক্তি ও সময়। তবে মোঙ্গলদের উত্থান পরোক্ষভাবে ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে গুরুতর পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। মধ্য-এশিয়ার মোঙ্গলদের উত্থান ও ক্ষমতা দখলের ফলে সেখানকার রাজ্যগুলি থেকে বহু জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি ও ভাগ্যান্বেষী সৈনিক দিল্লীতে চলে এসেছিলেন। এদের আগমনে দিল্লীর তুর্কী অধ্যুষিত রাজনীতিতে অস্থিরতা দেখা দেয়। এবং খলজীদের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রেক্ষাপটে মধ্য-এশিয়ায় মোঙ্গল আক্রমণের গুরুত্ব বিবেচনা করা অপ্রাসঙ্গিক নয়।

অষ্টম অধ্যায়

উত্তর ভারতের সমাজ ও অর্থনীতি
[Society and Economy in North India]

○ সুলতানি আমলের (১২০০-১৫৫৬ খ্রীঃ) অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য :

তুর্ক-আফগান শাসনকালে ভারতের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মতভেদ লক্ষণীয়। মুসলমান শাসকরা ভারতের প্রচলিত অর্থনৈতিক জীবনধারাকে পূর্ববৎ অনুসরণ করেছিলেন, নাকি তাঁরা ভারতের অর্থনীতিতে মৌলিক পরিবর্তনের সূচনা করেছিলেন, এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকেরা কিছু ভিন্ন মত পোষণ করেন। ঐতিহাসিক ***কোশাম্বী*** (D.d. Kosambi) তাঁর *'অ্যান ইনট্রোডাক্সন টু দি স্টাডি অফ ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি'* গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, 'ইসলামী আক্রমণকারীরা' একটা পরিবর্তন এনেছিল, তবে ভারতে বর্তমান 'সামন্ততন্ত্রে'র উপাদানগুলিকে অধিকতর সক্রিয় করার বেশি নতুন কিছু তা ছিল না। ঐতিহাসিকদের একটি গোষ্ঠী মনে করেন যে, সুলতানি শাসন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের ধারায় একটি ছেদ এনেছিল। এবং সেই পরিবর্তন ভারতীয় সমাজের অর্থনৈতিক স্বার্থকে এগিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে এদেশের বস্তুগত ও মানবিক সম্পদ ও সম্ভাবনাকে উন্মোচন ও ধ্বংসের পথে এগিয়ে দিয়েছিল। অধ্যাপক ***লালনজী*** গোপালের মতে, মুসলমানদের আগমনের ফলেই ভারতে দারিদ্র্যের সূত্রপাত হয়।[1] অধ্যাপক লাল (K.S. Lal) এই মত সমর্থন করে মন্তব্য করেছেন যে, মুসলমানরা ভারতের জনসংখ্যা এক-তৃতীয়াংশের বেশি হ্রাস করেছিলেন।

সুলতানি আমলের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের স্বতন্ত্র মূল্যায়ন করেছেন অধ্যাপক ***মহম্মদ হাবিব***। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত *'সুলতান মামুদ অফ গজনী'* গ্রন্থে তিনি মন্তব্য করেন যে, সুলতানি শাসন এবং পূর্ববর্তী শাসনের মধ্যে গুণগত পরিবর্তন ছিল স্পষ্ট। সুলতানি শাসন যে নতুন সামাজিক শক্তির জন্ম দেয়, তা পূর্ববর্তী অর্থনৈতিক সংকটের থেকে উন্নততর ছিল। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থের পরিমার্জিত সংস্করণে অধ্যাপক হাবিব তাঁর বক্তব্যকে যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করেন। তাঁর মতে, সুলতানি আমলে নগরের বিস্তার ঘটে এবং কৃষি সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সূচিত হয়। তিনি নগর ও গ্রামীণ ক্ষেত্রে দুটি মৌলিক পরিবর্তনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ***প্রথমত,*** মুসলিম শাসকেরা শিল্পপণ্যের উৎপাদনে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। শিল্পীর জাতপাত নিয়ে তাঁদের কোনরূপ ছুৎমার্গ ছিল না। কিন্তু প্রাক্-সুলতানি যুগে শিল্পী-কারিগরদের জাত-পাতের বিধি-নিষেধ আন্তঃবৃত্তিজীবি সচলতার (inter-professional mobility) বাধা সৃষ্টি করত। এখন সেই বাধা দূর হয়। ***দ্বিতীয়ত,*** সুলতানেরা গ্রাম থেকে অধিকতর রাজস্ব সংগ্রহ করতে আগ্রহী ছিলেন। তাই আলাউদ্দিন খলজী কৃষকের উদ্বৃত্ত উৎপাদন আত্মসাৎকারী ও শোষক মধ্যস্বত্বভোগীদের অপসারিত করেন। অধ্যাপক ***হাবিবের*** মতে, এই দুটি পরিবর্তন এতটাই মৌলিক যে, এদের যথাক্রমে 'নগর-বিপ্লব' ও 'গ্রামীণ-বিপ্লব' আখ্যা দেওয়া যায়। অবশ্য অধ্যাপক হাবিব স্বীকার

করেন যে, দিল্লীর নতুন শাসকগোষ্ঠী বিশুদ্ধ জনহিতকারী চেতনা থেকে এই উন্নয়নের কাজ করেননি। বস্তুত, তাঁদের মূল লক্ষ্য ছিল 'ব্যক্তিগত উন্নতির ইচ্ছা।

এই দুটি পরস্পর বিরোধী মূল্যায়নের একটা সমাধান সূত্র পাওয়া যায় ড. ***ইরফান হাবিবের*** বিশ্লেষণে। সুলতানি শাসনব্যবস্থা ছিল গতানুগতিক ও সমাজতান্ত্রিকতার প্রসারমাত্র—এই মতের প্রবক্তাদের সম্পর্কে তাঁর অভিমত হলো যে, এঁদের মন্তব্যের ভিত্তি হলো হেনরী এলিয়ট (H. Elliot)-এর সেই বিশ্লেষণ যেখানে তিনি মুসলমান যোদ্ধাদের নিছক 'হত্যা ও গণহত্যার' ('Murders and massacres') খলনায়ক বলে অভিহিত করেছেন। স্বভাবতই এঁদের ব্যাখ্যা সংকীর্ণতা দোষে দুষ্ট। অন্য দিকে অধ্যাপক মহম্মদ হাবিবের মন্তব্য সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া মিশ্র। সুলতানি শাসন যে পূর্ববর্তী শাসন ধারার অন্ধ অনুসরণ ছিল না, এ বিষয়ে ড. হাবিব একমত। তবে অধ্যাপক মহম্মদ হাবিবের বক্তব্যগুলি সবক্ষেত্রে যথেষ্ট যুক্তি ও তথ্য দ্বারা সমর্থিত হয়নি। তাছাড়া সুলতানি আমলের পরিবর্তনগুলিকে আধুনিক অর্থে 'সামাজিক বিপ্লব' বলা কিছুটা অতিরঞ্জন। তিনি লিখেছিলেন, *"What the Sultanate brought about was not a social revolution in any modern sense but creation of a new system of agrarian exploitation, with a parasitical urban growth based upon it."*[1] তাঁর মতে, সুলতানি শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। বিশাল উদ্বৃত্ত পুঞ্জীভূত হয়েছিল শাসকশ্রেণীর হাতে। জনগণের ইচ্ছা-অনিচ্ছা নয়, শাসকের মর্জিই ছিল সমস্ত প্রক্রিয়ার চালিকাশক্তি। সাধারণ কৃষকদের আর্থ-সামাজিক স্বাধীনতার অস্বীকৃতি তাদের কার্যত 'প্রায়-দাসত্বে'র পর্যায়ে থাকতে বাধ্য করেছিল। অন্য দিকে শহর ও বাণিজ্যের প্রসার এবং বিপুল পরিমাণে শিল্পপণ্যের উৎপাদন এই নতুন শাসনব্যবস্থাকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছিল।[2]

○ কৃষিজ উৎপাদন ও প্রযুক্তি ঃ

ভারত মূলত কৃষিনির্ভর দেশ। স্বভাবতই ভারতের কর্মক্ষম অধিকাংশ সাধারণ মানুষ কৃষিকার্যের সাথেই যুক্ত। এমনকি প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতের শিল্পী-কারিগরদের অধিকাংশই কৃষিকার্যেব সাথে যুক্ত ছিলেন এবং অবসর সময়ে শিল্পকার্যে লিপ্ত হতেন। আবার এদেশের কৃষিজ উৎপন্নের মূল ভিত্তি ছিল খাদ্যশস্যের উৎপাদন। উত্তর আফ্রিকার তাঞ্জিয়ার অধিবাসী ***ইবন বতুতা*** খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকে ভারত পর্যটনে এসে মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের রাজসভায় আট বছর অবস্থান করেন। সারা ভারত পরিভ্রমণ করে তিনি এদেশের ফল, ফুল, খাদ্যশস্য ইত্যাদি কৃষিদ্রব্য ও মানুষের জীবনযাত্রা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। খারিফ ও রবিশস্য উভয় প্রকার শস্যের চাষ একই জায়গায় হত। ইরফান হাবিবের মতে, উভয় প্রকার চাষ খুব কম স্থানে হত। তবে একই কৃষক যে বছরে দু'বার ফসল ফলাত তেমন প্রমাণ স্পষ্ট।

উৎপন্ন শস্যের মধ্যে প্রধান ছিল ডাল, গম, যব, চাল, তিল, তৈলবীজ, জোয়ার, ইক্ষু ও তুলা ইত্যাদি। ইবন বতুতার *'রেহলা'* গ্রন্থ থেকে জানা যায় এলাহাবাদের সন্নিকটে কারা, মানিকপুরের জমি ভীষণ উর্বর ছিল। এই দুটি স্থানেই উন্নতমানের গম, চাল ও আখ উৎপন্ন

হত। ফিরোজ তুঘলকের আমলে জলসেচ ব্যবস্থার পরে সেচ-সেবিত হিসার, ফিরোজাবাদ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ডাল, গম, তিল ও আখ চাষের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল। চালের মধ্যে বিশেষ মিহি চাল হিসেবে 'সিরসূতী' চালের কদর ছিল। দিল্লীতে এই চালের চাহিদা ছিল সর্বাধিক। সাধারণভাবে রাজধানীর শস্যগোলাতে চাল সংরক্ষিত রেখে দীর্ঘদিন ধরে বাজারে যোগান দেওয়া হত। *ইবন বতুতার* মতে, ভারতীয় ফলগুলির মধ্যে আমের চাহিদা ছিল বেশি। গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলে সুস্বাদু আমের ফলন হত। *আমীর খসরু* লিখেছেন যে, ঐস্লামিক দেশগুলির নিজস্ব ফল তরমুজ, খরমুজ ইত্যাদির তুলনায় আম ছিল অধিক জনপ্রিয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাবর তাঁর *'তুজুক-ই-বাবরী'* গ্রন্থে ভারতীয় ফলের মান বা স্বাদ সম্পর্কে হতাশাই প্রকাশ করেছেন। তাই কাবুল থেকে উৎকৃষ্ট মানের খরমুজের চারা এনে আগ্রার বাগানে লাগিয়ে ছিলেন। অন্যান্য ফলের মধ্যে ছিল নানাজাতের আঙুর, কমলালেবু, মৌসুম্বী, খেজুর, কলা, জাম, কাঁঠাল, বেদানা, আপেল ইত্যাদি। মহম্মদ-বিন্-তুঘলক কৃষকদের আঙুর ও খেজুরের চাষ বাড়ানোর জন্য উৎসাহিত করেছিলেন। ফিরোজ শাহ তুঘলক দিল্লীর আশেপাশে বাগিচা স্থাপন করে নানাজাতের আঙুর ফলাতেন। যোধপুরে প্রচুর উন্নতমানের বেদানা চাষ হত। 'তারিখ-এ-দাউদী'-এর বিবরণ অনুসারে সুলতান সিকন্দর লোদী পারস্যের বেদানার থেকেও যোধপুরের বেদানাকে অধিক সুস্বাদু ও সুগন্ধি বলে গর্ববোধ করতেন।

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে নানাজাতের ফুলের চাষ হত। মধ্যযুগেও সেই ধারা অব্যাহত ছিল। *কে. এম. আশরাফ* লিখেছেন, *"সৌন্দর্য, সৌরভ ও বৈচিত্র্যে ভারতীয় ফুল অতুলনীয়।"* ধর্মাচরণ, পূজার্চ্চনা ইত্যাদির ক্ষেত্রে ফুল পবিত্রতার প্রতীক রূপে বিবেচিত হয়। আবার যে-কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে ফুলের সৌরভ ও বর্ণময় অলংকরণ ভারতীয়দের কাছে খুবই আকর্ষণীয় বলে বিবেচিত হয়। আমীর খসরু ও মালিক মহম্মদ জয়সীর গ্রন্থে ভারতে ফুলের জনপ্রিয়তা ও ফুল চাষের ব্যাপকতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ভারতের কাঠ মসৃণতা ও স্থায়িত্বের জন্য বিশেষ খ্যাত। সুলতানিযুগেও নানাধরনের বৃক্ষরোপণ করা হত। প্রকৃতিদত্তভাবে ভারতের চন্দন ও ঘৃতকুমারী কাঠের সুগন্ধ ছিল বিশ্বখ্যাত। ঘৃতকুমারী কাঠ উৎপাদনের জন্য আসামের প্রসিদ্ধি ছিল। উপঢৌকন হিসেবেও সুগন্ধি কাঠ পাঠানোর রেওয়াজ ছিল। বিষক্রিয়ার প্রতিষেধক এবং বিশেষ করে সর্পাঘাতের প্রতিষেধক হিসেবে বেশ কিছু উদ্ভিদ ভারতে জন্মাত। মশলার উৎপাদক হিসেবে ভারতের খ্যাতি এশিয়ার নানাদেশে ছড়িয়ে ছিল। লঙ্কা, আদা, দারুচিনি, লবঙ্গ ইত্যাদির বিশেষ উৎপাদনক্ষেত্র ছিল গুজরাট।

মধ্যযুগের ভারতে কৃষি উৎপাদনের মূল উৎস ছিল জমির প্রকৃতিদত্ত উৎপাদিকাশক্তি এবং বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত কিছু সেচব্যবস্থা। চাষের কাজে উন্নতমানের প্রযুক্তি ব্যবহারের বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। পরবর্তীকালে মুকুন্দরামের রচনায় হাল, লাঙল ইত্যাদি চিরাচরিত যন্ত্রের উল্লেখ থেকে অনুমান করা যায় যে মধ্যযুগেও এই সকল যন্ত্র ব্যবহার করা হত। লোহার দাম অতিরিক্ত হওয়ায় কৃষকের পক্ষে তার ব্যবহার ব্যাপক ছিল না।[1] অধিকাংশ এলাকায় কূপ থেকে জমিতে সেচ দেওয়া হত। মহম্মদ বিন তুঘলক কূপ খনন করার জন্য কৃষকদের টাকা আগাম দিতেন

বলে জানা যায়। কোন কোন স্থানে বাঁধ দিয়ে জল ধরে রেখেও সেচ দেওয়া হত। তবে বাংলাদেশে সেচকার্যে কূপের বিশেষ ব্যবহার ছিল না। কারণ, অসংখ্য নদনদী ও তাদের সাথে যুক্ত খাল থেকে জল ব্যবহারের প্রবণতা ছিল বেশি।

চতুর্দশ শতকে সরকারি উদ্যোগে খাল কেটে জমিতে সেচ দেবার কিছু প্রয়াস নেওয়া হয়েছিল। গিয়াসউদ্দিন তুঘলক (১৩২০-২৫ খ্রীঃ) প্রথম কৃষি সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে সেচখাল খননের উদ্যোগ নেন। ফিরোজ তুঘলকের আমলে (১৩৫১-৮৬ খ্রীঃ) সেচখাল ব্যবস্থা একটা কার্যকরী রূপ পায়। তাঁর আমলে কাটা দুটি খাল যমুনা নদী থেকে হিসার পর্যন্ত টানা হয়েছিল। এ'দুটি 'রজব-ওয়াহ' এবং 'উলুখ-ঘানী' নামে পরিচিত। আর একটির নাম 'ফিরোজশাহী'। এটি শতদ্রু থেকে কাটা হয়। আর একটি খাল কালী নদী থেকে দিল্লীর নিকট যমুনা পর্যন্ত কাটা ছিল। পূর্ব-পাঞ্জাবের ঘর্ঘরা নদী থেকে ফিরোজাবাদ পর্যন্ত আরো একটি খাল তিনি খনন করেন।

এছাড়া প্রায় দেড় শতাধিক কূপ খনন করে তিনি সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করেন। ইরফান হাবিবের মতে হিসারের চতুষ্পার্শের এলাকায় সেচ ব্যবস্থা এতটাই সুবিন্যস্ত ছিল যে খারিফ শস্য ছাড়া সেখানে রবি চাষও ব্যাপকভাবে শুরু করা সম্ভব হয়েছিল। সুলতানি আমলে কূপ ও খাল থেকে জল উত্তোলনের জন্য এক নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে ভারতে জল তোলার জন্য *'আর্ঘহাট্টা'* (arghahtta) নাম ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। এই ব্যবস্থায় কানায় কানায় কলসী বেঁধে দড়ির সাহায্যে জল তোলা হত। মুসলমানদের আগমনের পরে 'পিন-ড্রাম গিয়ারিং' (Pin-drum gearing) ব্যবস্থা দ্বারা একটি চাকার সাথে ধাতুর কলসী বেঁধে গোরুর সাহায্যে সেই চাকাকে ঘুরিয়ে অবিরাম জল তোলার ব্যবস্থা করা হয়। বাবর তাঁর আত্মজীবনী গ্রন্থে এই যন্ত্রের ব্যাপক ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন। তাই ধরে নেওয়া যায় যে সুলতানি আমলেই এই গীয়ারযুক্ত উত্তোলন ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। একেই বলা হয় 'পারসিয়ান চরকা' (Persian wheel)। পাঞ্জাব ও হরিয়ানা অঞ্চলে পারসিয়ান চরকার সাহায্যে জল তোলার প্রথা বিশেষ জনপ্রিয় ছিল।

কৃষি-সরঞ্জামের অন্যান্য বিষয়গুলি ছিল গতানুগতিক। যেমন—কাঠের লাঙল, দাঁতালো মই, জমি সমান করার পাটা, গাঁইতি, কোদাল, কাস্তে ইত্যাদি। লাঙল টানার জন্য গোরু, মহিষ ইত্যাদি পশুপালনও কৃষির অঙ্গ ছিল।

○ পল্লীসমাজ ঃ

তুর্কী-আফগান যুগে ভারতের গ্রাম্যজীবন ছিল অনগ্রসর ও গতানুগতিক। তবে মানুষের জীবনধারা ছিল সহজ, সরল, আনন্দময়। সাধারণভাবে একই কুল-গোষ্ঠীর মানুষ পাশাপাশি বসবাস করত। সামাজিক নানা বন্ধন ও ধর্মসূত্রে বিভিন্ন পরিবার পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল। এরকম একাধিক গোষ্ঠীর বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থান বা 'বরাদরী' থেকে এক একটি গ্রাম গড়ে ওঠে। গ্রামের মানুষের প্রত্যাশা ছিল খুবই কম। সরকারি শোষণ মাত্রাছাড়া বা অসহনীয় না হলেই কিংবা ন্যূনতম খাদ্যের সংস্থান নিশ্চিত হলেই তারা সন্তুষ্ট ছিল। *কে. এম. আশরাফ* লিখেছেন, *"জীবনের চরম সর্বনাশকেও তারা ভাগ্যলিপি (কিসমৎ) জ্ঞানে নির্বিবাদে মেনে নেয়—দুর্ভাগ্য ও দুর্দশাকে অতি মানবিক প্রশান্তি ও ঔদাসীন্যে শিরোধার্য করে।"*[1] জীবন সম্পর্কে এই ধারণা

ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই ভারতের পল্লীসমাজ ও জীবনধারা গড়ে ওঠে। এই পল্লীসমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে আন্তরিক সমন্বয়। পৃথক পৃথক কর্মে লিপ্ত এক একটি পরিবার বা গোষ্ঠী বংশানুক্রমিক বৃত্তিতে লিপ্ত থেকে পল্লীসমাজের পারস্পরিক চাহিদা পূরণ করে। যেমন—কৃষক খাদ্য উৎপাদন করে পল্লীসমাজের খাদ্যশস্যের চাহিদা পূরণ করে। কামার তৈরি করে মানুষের প্রয়োজনীয় লোহার যন্ত্রপাতি, কুমোর গড়ে দেয় মাটির তৈজসপত্র ইত্যাদি। পুরোহিত, চিকিৎসক, শিক্ষক, ধোপা, নাপিত প্রমুখ প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে পল্লীজীবনকে সচল রাখে।

জমির ফসলকে কেন্দ্র করে গ্রামে গড়ে উঠেছিল নানাবিধ কুটীরশিল্প। দড়ি, ঝুড়ি, তেল, গুড় ইত্যাদি তৈরি করে গ্রামের মানুষ উপজীবিকা দ্বারা কিছু পার্শ্ব-উপার্জনের পথ খুঁজে নেয়। তাঁতী, রজক, সূতাকাটুনী, ছুতোর, চর্মকার প্রমুখ ছোট ছোট উপজীবিকা দ্বারা নিত্য দারিদ্র্য থেকে আংশিক মুক্তির পথ খুঁজে পায়। গ্রামের নিজস্ব শিল্প-উৎপাদন বিনিময় করার কাজেও কিছু নির্দিষ্ট মানুষ লিপ্ত থাকত। পল্লীর কোন একটি অঞ্চল নির্দিষ্ট থাকত দ্রব্য বিনিময়ের কেন্দ্র হিসেবে। এখানেই বসত বাজার। মাঝে মাঝে গ্রামে মেলার আয়োজন হত। এখানে বড় আকারে পণ্য লেনদেন চলত। পল্লীর কৃষকরা মেলা থেকে বাসন, গয়না, শিশুদের খেলনা ক্রয় করে। মধ্যযুগের পল্লীসমাজে রাজনীতিবিদ্ ও কূটনীতিতে দক্ষ ব্যক্তিদেরও দেখা পাওয়া যেত। রাজনীতি, সমাজনীতি থেকে ব্যক্তিগত বিবাদ, জাতিগত আচার-বিচার ইত্যাদি নানা বিষয় এঁদের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল। কিন্তু নিজের গ্রাম এবং নিকটবর্তী দু'একটি গ্রামের ঘটনাবলীর বাইরে বিশ্বজগৎ সম্পর্কে এঁদের কোন ধারণাই থাকত না।

স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী ভোগ্যপণ্য উৎপাদন করাই ছিল সেকালের পল্লীসমাজের বিশেষত্ব। তবে নদীর তীরে অবস্থিত এবং আনুষঙ্গিক কাঁচামালে সমৃদ্ধ কয়েকটি স্থানে কিছুটা বৃহৎ শিল্পের অস্তিত্ব দেখা যেত। এক্ষেত্রে কিছুটা এগিয়ে ছিল বাংলা এবং গুজরাট। কারণ এই দুটি রাজ্য থেকে জাহাজযোগে পণ্য আমদানি-রপ্তানির সুবিধা ছিল। এইভাবে কয়েকটি বড় বড় শহরে নগর-সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে এই ধরনের শহরগুলিই শাসকদের পছন্দ ছিল। নগরগুলি দুর্ভেদ্য প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত থাকায়, সেগুলি পল্লীসমাজের মানুষের আপৎকালের আশ্রয়স্থল হিসেবে গুরুত্ব পেত।

○ গ্রামীণ রাজস্ব ব্যবস্থা ঃ

সুলতানি সাম্রাজ্য ছিল চরিত্রগতভাবে একটি 'যুদ্ধ-রাষ্ট্র'। নিরন্তর যুদ্ধ বিগ্রহ দ্বারা যেমন এই সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল , তেমনি এই রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও নির্ভরশীল ছিল মূলত যুদ্ধজয়ের উপরেই ' তাই সরকারের প্রয়োজন ছিল এক বিশাল সেনাবাহিনীর। বলা বাহুল্য, এই বাহিনীর ভরণ-পোষণের জন্য প্রয়োজন ছিল প্রচুর অর্থের। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল সুলতান ও অভিজাতদের ব্যক্তিগত বিলাস-ব্যসন। শাসকশ্রেণীর ছোট-বড় সকল সদস্যই পারসিক আদব-কায়দা অনুকরণ করতে আগ্রহী ছিলেন। সুদৃশ্য ও বিশালাকার রাজপ্রাসাদ, দরবারের জাঁকজমকপূর্ণ কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য প্রয়োজন ছিল বিপুল অর্থের। অভিজাতদের ব্যক্তিগত বিলাসী জীবন পরিচালনার জন্যও প্রয়োজন ছিল প্রভূত অর্থের। কিন্তু দেশের আয়ের উৎস ছিল সীমাবদ্ধ। শিল্প-উৎপাদন

বা ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে আয় হত কিঞ্চিৎ। স্বভাবতই প্রত্যেকেই অর্থের জন্য তাকিয়ে থাকতেন সেই গ্রামীণ কৃষকদের দিকে। এক কথায়, সুলতানি আমলে গোটা সমাজের প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দিতে হত কৃষকদের। ভূমিরাজস্ব হিসেবে সুলতান ও অন্যান্য অন্তর্বর্তীশ্রেণী এই অর্থ চূড়ান্ত নিপীড়নের মাধ্যমে কৃষকদের কাছ থেকে আদায় করতেন।

ভারতে তুর্কীদের অনুপ্রবেশের আগে শাসকশ্রেণী কৃষি-উৎপাদনের কতটা সংগ্রহ করতেন কিংবা জমিদারী কর হিসেবে উৎপাদক কিছু প্রদান করতে বাধ্য ছিলেন কিনা, সে বিষয়ে বিশেষ তথ্য পাওয়া যায় না। সমকালীন লেখমালা থেকে নানা ধরনের করের নাম জানা যায়। কিন্তু তাদের প্রকৃতি বা পরিমাণ কি ছিল, সে বিষয়ে লেখগুলির বক্তব্য আদৌ স্পষ্ট নয়। ভারতে তুর্কী শাসন প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই সম্ভবত কর ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটেনি। সুলতানেরা মোটামুটি ভাবে পুরানো ব্যবস্থাতেই সন্তুষ্ট ছিলেন। উৎপাদকদের কাছ থেকে এককালীন উপঢৌকন শাসকশ্রেণী গ্রহণ করতেন। তবে অনেক অঞ্চলই শাসকদের রাজস্ব দিতে অস্বীকৃত হত। এই সকল বিদ্রোহী এলাকায় অভিযান চালিয়ে সরকারি ফৌজ খাদ্যশস্য, গবাদি পশু, দাস-দাসী ইত্যাদি লুঠ করে নিয়ে আসত। বলা বাহুল্য এই ব্যবস্থায় সুলতানি শাসনের অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় ছিল না। গিয়াসউদ্দিন বলবনের আমলে (১২৬৬—৮৬ খ্রীঃ) দিল্লীর অভিজাতরা প্রায়ই সুলতানি বণিকদের কাছে ঋণ নিয়ে অর্থাভাব মেটাতে বাধ্য হতেন। আলাউদ্দিন খলজীর আমলে (১২৯৬ - ১৩১৬ খ্রীঃ) এই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে।

সুলতানি আমলে মোটামুটি চারশ্রেণীর জমি ছিল—খালিসা, ইকতা, অধীনস্থ জমি এবং ওয়াকফ সম্পত্তি। খালিসা-জমি সুলতান ইচ্ছামত বন্দোবস্ত দিতেন। রায়তওয়ারী ব্যবস্থার মত এক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারীরা সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে এই জমির কর আদায় করতেন। পরগণায় *'আমিল'* এবং গ্রামে *'পাটোয়ারী', 'চৌধুরী' 'মুকদ্দম'* নামক কর্মচারী এই রাজস্ব আদায় করতেন। 'ইক্তা' ছিল একধরনের সামরিক-প্রশাসনিক বিভাগ। এই বিভাগের অধিকর্তা অর্থাৎ ইক্তাদার বা মাক্তি (বা মুক্তি) সুলতান কর্তৃক নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের রাজস্ব আদায় করতেন এবং ইক্তার প্রশাসনিক খরচ বাদে উদ্বৃত্ত অর্থ কেন্দ্রীয় কোষাগারে জমা দিতেন। খাজা নামক কেন্দ্রীয় কর্মচারী ইক্তাদারের রাজস্ব-বিষয়ক কাজ পরিদর্শন করতেন। তৃতীয় শ্রেণীর সম্পত্তি ছিল হিন্দু জমিদারদের হাতে, যাঁরা আগে থেকেই এই সকল জমি চাষ-আবাদের অধিকার ভোগ করছিলেন। এঁরা সুলতানকে বাৎসরিক নির্দিষ্ট রাজস্ব প্রদানের শর্তে পূর্ব-অধিকার বজায় রাখতে পেরেছিলেন। *'ওয়াকফ্'* বা *'ইনাম'* ছিল নিষ্কর সম্পত্তি। সুলতান মুসলিম ধর্মজ্ঞানী, পণ্ডিত ও সন্তদের সেবায় এই জমি দান করতেন। তবে আলাউদ্দিন খলজী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে ওয়াকফ্ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে রাজস্বের বিনিময়ে বন্দোবস্ত দেন। তিনি খুৎ, চৌধুরী, মুকদ্দম প্রমুখ গ্রামীণ রাজস্ব আদায়কারী কর্মীগোষ্ঠীর উপরেও কর আরোপ করেন। ইতিপূর্বে এই মধ্যস্বত্বভোগী-গোষ্ঠী কৃষকদের শোষণ করে বহু রাজস্ব আত্মসাৎ করতেন ; কিন্তু কোনরকম কর দিতেন না।

সাধারণভাবে সরকারি আয়ের উৎস ছিল ইক্তার উদ্বৃত্ত অর্থ। মাক্তি বা ইক্তাদার তাঁর ইক্তার ভূমিরাজস্ব আদায় করে এবং ইক্তার প্রশাসনিক ও সামরিক ব্যয় নির্বাহের পর উদ্বৃত্ত রাজস্ব দিল্লীর রাজকোষে জমা দিতে বাধ্য থাকতেন। এই ভূমি-রাজস্বের নাম ছিল *'খারাজ'*

(খারাজ-ই-জিজিয়া)। ইক্তার খারাজ ও অন্যান্য কর আদায় করতেন ইক্তাদার। অবশিষ্ট খালিসা জমির খারাজ সরাসরি আদায় করতেন সরকারি কর্মচারীরা। আলাউদ্দিন খলজী ৫০ শতাংশ হারে খারাজ আদায়ের পাশাপাশি *'খরাই'* ও *'চরাই'* নামক দুটি কর আরোপ করেন। এগুলি যথাক্রমে গৃহ-কর ও গবাদি পশু-কর হিসেবে নেওয়া হত।

কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা ও দেয় রাজস্বের হার সম্পর্কে সমকালীন মুসলিম ঐতিহাসিকরা নীরব। তাঁরা সুলতান ও দরবারী ঘটনাবলী সম্পর্কেই বেশি আগ্রহী ছিলেন। তবে সেকালে আগত বিদেশী পর্যটকদের বিবরণী থেকে এ-সম্পর্কে একটা আভাস পাওয়া যায়। সম্ভবত, তুর্কী-শাসকরা উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশ অথবা এক-পঞ্চমাংশ ভূমিরাজস্ব হিসেবে আদায় করতেন। ব্যতিক্রম হিসেবে আলাউদ্দিন খলজী ৫০ শতাংশ রাজস্ব ধার্য করেছিলেন এবং মহম্মদ-বিন্-তুঘলক দোয়াব প্রভৃতি উর্বর অঞ্চলে উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক রাজস্ব হিসেবে আদায় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। অবশ্য মহম্মদ তুঘলক দোয়াবে শস্যহানি ও বিদ্রোহের কারণে শেষ পর্যন্ত অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় করেন নি। রাজস্বের হার নির্ধারণের কোন নির্দিষ্ট বিধি ছিল না। তবে কোরানের অনুশাসন অনুসারে এই হার নির্ধারণের একটা প্রবণতা ছিল। গিয়াসউদ্দিন তুঘলক নীতিগত ভাবে কোন একটি বছরে সর্বোচ্চ এগারো বা দশ শতাংশের বেশি রাজস্ববৃদ্ধির বিরোধী ছিলেন। মহম্মদ তুঘলক কৃষিকার্যের উন্নতি বিধানের উদ্দেশ্যে *'দিওয়ান-ই-কোহী'* নামে একটি কৃষিদপ্তর গঠন করেন। ফিরোজ-শাহ-তুঘলক কৃষকদের কৃষিঋণ 'তকাভি' পরিশোধ থেকে রেহাই দেন। তিনি আরো প্রায় চব্বিশটি সাধারণ কর মুকুব করে চাষীদের বোঝা লাঘব করেন। কর নির্ধারণ করা হত শস্যে, তবে নগদ টাকায় কর নেবার ব্যবস্থা ছিল। এ-বিষয়ে বরণীর বক্তব্য কিছুটা পরস্পর বিরোধী। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন যে, আলাউদ্দিনের কর্মচারীরা ফসল ওঠার সঙ্গে সঙ্গে রাজস্বের জন্য এতটাই চাপ দিতেন যাতে কৃষক তার পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য হত। আবার অন্যত্র লিখেছেন যে, আলাউদ্দিনের কঠোর নির্দেশ ছিল রাজস্ব শস্যের মাধ্যমে নিতে হবে এবং তা শহরে পাঠাতে হবে। সম্ভবত, নগদ অর্থেই খাজনা নেবার প্রবণতা ছিল। আবার কৃষকদের উৎসাহিত করার জন্য এবং দিল্লীর শস্যভাণ্ডার গড়ে তোলার জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে শস্যে রাজস্ব নেওয়া হত।

গিয়াসউদ্দিন তুঘলক খুৎ ও মকদ্দমদের উপর থেকে গবাদি পশু ও চাষের উপর থেকে কর তুলে দেন। তবে এরা কৃষকের ওপর কোন কর আরোপ করতে পারবে না বলে স্থির হয়। কৃষকদের উপর থেকেও বকেয়া কর মুকুব করে দেন। মহম্মদ তুঘলকের সময় করের বোঝা বেশ কঠোর করা হয়। বরণীর মতে, সুলতান কৃষকদের উপর নতুন কর চাপিয়ে ছিলেন। কিন্তু ইয়াহিয়া-বিন্-সিরহিন্দের মতে, সুলতান খারাজ-এর সাথে নতুন করে খরাই ও চরাই আদায় করতে শুরু করেন। সিরহিন্দের মতে, উৎপন্ন শস্যের গড় হার ধরে মুল্য নির্ধারণের ফলে খাজনার পরিমাণ প্রকৃত মূল্যের চেয়ে বেশিই হত। এর প্রতিবাদে দিল্লী ও দোয়াব অঞ্চলে কৃষক বিদ্রোহ শুরু হয়। অনেকেই কৃষিকার্য ছেড়ে দেয়। সুলতানের নির্দেশে শিকদার ও ফৌজদাররা গ্রামীণ কৃষিজীবিদের উপর অকথ্য দমন-পীড়ন চালান। বারণীর বিবরণ অনুযায়ী খুৎ ও মুকদ্দম শ্রেণীও এই বিদ্রোহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। তবে দুর্ভিক্ষ মোকাবিলার জন্য সুলতান কূপ খনন ও কৃষি সম্প্রসারণের জন্য কৃষকদের ঋণ দানের ব্যবস্থা করেন। সুলতানি যুগে এর নাম ছিল

'সঞ্জার', মোগল যুগে একে বলা হত *'তাকাভি'*। মহম্মদ তুঘলক ছিলেন প্রথম সুলতান যিনি এই ঋণদানের ব্যবস্থা করেন। 'দিওয়ান-ই-আমির কোহি' নামক দপ্তর এই কাজের দায়িত্ব পায়।

বারণীর মতে, সুলতানের সাহায্য দান প্রকল্প সফল হয়নি। সম্ভবত, সরকারি সুবিধা প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে পৌঁছাতে পারেনি। তাই ফিরোজ তুঘলক খরাই, চরাই সহ প্রায় চব্বিশ প্রকার আবওয়ার তুলে দেন। তবে তিনি হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর চালু করেন। ফিরোজের পরবর্তীকালে কৃষি-কর সম্পর্কে খুব কম তথ্য পাওয়া যায়। সম্ভবত, এই সময় স্থানীয় শাসকেরা কর আদায় ও ভোগ করতেন।

'জাকত' হলো একপ্রকার ধর্মীয় ও সেবামূলক কর, যা মুলত মুসলমানদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়। *ড. এ. বি. পাণ্ডের* মতে, 'জাকত' তিন ভাবে আদায় করা হত। (১) সম্পদের অধিকারী ও উপার্জনশীল মুসলমানরা তাঁদের মোট আয়ের দুই থেকে আড়াই শতাংশ দরিদ্র মুসলমানদের সেবার জন্য রাষ্ট্রকে প্রদান করতেন। (২) ব্যক্তিগত জমির ভোগদখলকারীগণ উৎপন্ন শস্যের একাংশ 'আশরা' বা ভূমি-কর হিসেবে দিতেন। চাষযোগ্য এলাকায় দশ শতাংশ এবং অ-চাষযোগ্য এলাকায় পাঁচ শতাংশ হারে 'আশরা' আদায় করা হত। (৩) বাণিজ্যরত মুসলমানদের বাণিজ্য-আয় থেকে আড়াই শতাংশ হারে এই কর দিতে হত। এইসব কর আলাদাভাবে সংরক্ষিত করা হত এবং সদর-উস্-সুদুর-এর মাধ্যমে মুসলমানদের সেবায় ব্যয় করা হত।

অ-মুসলমানদের উপর 'জিজিয়া' কর ধার্য করা হত। এটাও ছিল একপ্রকার ধর্ম-কর। মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী অ-মুসলমানদের জীবন, সম্পত্তি ও ধর্মস্থানের নিরাপত্তার জন্য এই কর দিতে হত। এরও কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ ছিল না। সাধারণভাবে তিন ভাবে এই কর আদায় হত। ধনী ব্যক্তিরা বার্ষিক ৪৮ দিরহাম, মধ্যবিত্তরা ২৪ দিরহাম এবং অন্যান্যরা ১২ দিরহাম 'জিজিয়া' হিসেবে প্রদান করতেন। অবশ্য অনেকেই জিজিয়া প্রদান থেকে রেহাই পেতেন। মহিলা, শিশু, ভিক্ষুক, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী, সাধু-সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ এবং যাদের কোন আয় নেই এমন লোকেদের 'জিজিয়া' দিতে হত না। অবশ্য ফিরোজ তুঘলক ব্রাহ্মণদের উপরেও জিজিয়া আরোপ করেছিলেন। যাই হোক্, জিজিয়া থেকে খুব কম রাজস্বই আদায় হত। *ড. রোমিলা থাপার* মনে করেন, *"শহুরে উচ্চ-আয়সম্পন্ন মানুষের উপরেই জিজিয়া আরোপিত হত। গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের সম্ভবত এই করভার বহন করার ক্ষেত্রে কড়াকড়ি ছিল না।"*

খনিজ আয় বা যুদ্ধে লুণ্ঠিত দ্রব্যের ভাগ হিসেবে আদায় করা হত 'খাম্‌স'। ইসলামীয় আইন অনুসারে রাষ্ট্র এক-পঞ্চমাংশ হারে খাম্‌স আদায়ের অধিকারী ছিল। যদিও সুলতানেরা এই আইন ভঙ্গ করে প্রায়শই পাঁচ ভাগের চার ভাগ রাষ্ট্রে বাজেয়াপ্ত করে নিতেন। ফিরোজ তুঘলক এক-পঞ্চমাংশ হারে খাম্‌স আদায় করতেন। সিকন্দর লোদী আদৌ এই কর আদায় করতেন না।

উপরিলিখিত করসমূহ ছাড়াও সুলতানি আমলে বিভিন্ন সময়ে নানারকমের কর আদায় হত। ফিরোজ তুঘলক সেচযুক্ত এলাকায় দশ শতাংশ হারে সেচ-কর আদায় করতেন। এইভাবে আলাউদ্দিন খলজী গৃহ-কর এবং পশুচারণক্ষেত্র-কর আদায় করতেন। উত্তরাধিকারীবিহীন কোন মুসলমানের মৃত্যুর পর তার সম্পত্তিও রাষ্ট্রের সম্পত্তি হিসেবে অধিকৃত হত। বিভিন্ন প্রাদেশিক শাসক এবং অনুগত-সামন্তদের কাছ থেকে উপঢৌকন হিসেবেও কেন্দ্রীয় কোষাগারে কিছু অর্থসম্পদ জমা পড়ত।

○ নগরায়ণ ঃ

ভারতে নগরায়ণ ও নগর-সভ্যতার ইতিহাস খুবই প্রাচীন, তবে ভারতে নগরের বিকাশের ইতিহাস ধারাবাহিক নয়। পশ্চিমী লেখকরা ভারতীয় শহরের চরিত্রকে গ্রামীণ সভ্যতা বলেই চিহ্নিত করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এই বক্তব্য ঘটনার সঠিক প্রকাশ নয়। ড. *অনিরুদ্ধ রায়* লিখেছেন যে, বর্তমানে ভারতে পাঁচ হাজার জনসমষ্টি সমন্বিত বারো হাজারেরও বেশি শহর আছে। এই বিচারে ভারতীয় সভ্যতাকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় শহরাশ্রয়ী সভ্যতা বলা যায়।[1] আমরা আগেই দেখেছি যে, ভারতে শহর তৈরি শুরু হয়েছিল হরপ্পা সংস্কৃতির যুগে। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ১৭৫০ থেকে ২৩৫০ অব্দের মধ্যে এই নগরায়ণের সূচনা, বিকাশ ও অবক্ষয় ঘটেছিল। দ্বিতীয় পর্বের নগরায়ণ ঘটে খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে। খ্রীষ্টীয় ৩০০ অব্দ পর্যন্ত এই পর্বের শহরগুলি টিকেছিল। গুপ্তযুগের পরবর্তীকালে এই পর্বের শহরগুলি নিস্তেজ হয়ে পড়ে। অধ্যাপক *রামশরণ শর্মা, বি. এন. এস. যাদব* প্রমুখের মতে, ভারতে তৃতীয় পর্বের নগরায়ণ ঘটে ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে। কিন্তু ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় মনে করেন, ৩০০ - ১২০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তীকালে ভারতে নগরের অবক্ষয় সার্বিক ছিল না। তিনি প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানে সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, আদি মধ্যকালীন ভারতেও (আনুঃ ৬৫০—১২০০ খ্রীঃ) নগরের অস্তিত্ব ছিল। বাণিজ্যকেন্দ্রিক কিছু নতুন শহরও গড়ে উঠেছিল। তিনি তাকেই 'তৃতীয় পর্বের নগরায়ণ' (Third urbanisation) বলে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য তিনিও স্বীকার করেছেন যে, মুসলমান শাসনের সূচনার পর অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতকে ভারতে নগরায়ণে আবার জোয়ার আসে।

ঐতিহাসিক *এলিয়ট, লালনজী গোপাল, কে. লাল.* প্রমুখ মনে করেন যে, ভারতে মুসলমান শাসনের ফলে দেশের অর্থনীতি ভেঙে পড়ে এবং ভারতবর্ষ একটি দরিদ্র দেশে পরিণত হয়। কিন্তু অধ্যাপক *মহম্মদ হাবিব* ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত *এলিয়ট ও ডাউসনের 'হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া অ্যাজ টোল্ড বাই ইট্‌স ওন্ হিস্টোরিয়ান্‌স'* গ্রন্থের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, মুসলমানদের আগমনের ফলে ভারতে পূর্বাপেক্ষা উন্নত এক সামাজিক শক্তির বিকাশ ঘটে। ভারতের অর্থনৈতিক সংগঠন উন্নততর হয় এবং ব্যাপক নগরায়ণ ঘটে। তিনি বলেন যে, মুসলমানদের আসার পরে যে ইক্‌তা প্রথার শুরু হয়েছিল,তা ছিল শহরভিত্তিক। ইক্‌তাদারদের বিরাট সেনাবাহিনীর জন্য কুটিরশিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এবং নতুন নগরগুলির চাহিদা নগরায়ণের পথ প্রশস্ত করেছিল। অধ্যাপক হাবিবের মতে, ভারতে মুসলমানদের আগমনের সূত্রে 'দ্বিতীয় নগর বিপ্লবের' সূচনা হয়। এই নগর বিপ্লবে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল বিদেশ থেকে আসা কারিগররা। উপরন্তু, সামাজিক বৈষম্য এড়াতে ও আর্থিক লাভের আশায় বহু হিন্দু কারিগর এই সময় ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে শহরে অর্থনীতির গতি ত্বরান্বিত করে।

পরবর্তীকালে অধ্যাপক ইরফান হাবিব এই মতের আংশিক পরিবর্তন করেন। তিনি বলেন যে, দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে ভারতীয় অর্থনীতির পরিবর্তনগুলিকে আধুনিক অর্থে 'সামাজিক বিপ্লব' বলা কিছুটা অতিকথন, যদিও ভারতীয় অর্থনীতির পরিবর্তনগুলি সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন

যথার্থ। অধ্যাপক ইরফান হাবিব দেখিয়েছেন যে, শাসকশ্রেণীর শোষণের ফলে নতুনভাবে কৃষি সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এর ফলে পরগাছার মত নতুন শহরের জন্ম হয় যেখানে শাসকশ্রেণী তাদের সেনাবাহিনী ও অনুচরদের মধ্যে উদ্বৃত্ত বণ্টন করে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে। তাঁর মতে, ইক্তা প্রথার প্রচলনের ফলে এই নতুন অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ইক্তার প্রধান কেন্দ্র বা সদর দপ্তর শহর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং তার অধীনস্থ গ্রামগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। মুসলমানদের আগমনের আগে যে শহরগুলি ছিল, তাদের জীবনের উৎস ছিল বাণিজ্য। এখন ইক্তা প্রথা প্রচলনের ফলে এই শহরগুলি বড় হতে থাকে। শহর সভ্যতার এই নবজন্মের অন্যতম কারণ হলো শহরগুলির কুটিরশিল্পজাত দ্রব্য ও বিলাস দ্রব্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা। বড় বড় শহরগুলির মধ্যে কিছু ছোট ছোট শহরেরও পত্তন ঘটে। গুজরাট, রাজস্থান প্রভৃতি অঞ্চলে বাণিজ্য চলাচলকারী পথের উপর এই ধরনের শহরগুলি গড়ে ওঠে। ইরফান হাবিব তাঁর *'ইকনমিক হিস্ট্রি অফ মিডিয়াভ্যাল ইন্ডিয়া'* গ্রন্থে (২০০১) স্বীকার করেছেন যে, সুলতানি আমলে নগর অর্থনীতির বিকাশ প্রধানত তিনটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত অগ্রগতির মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়েছিল। এগুলি হলো—(১) শহরের সংখ্যা ও আয়তনে বৃদ্ধি, (২) হস্তশিল্প উৎপাদনে লক্ষণীয় অগ্রগতি এবং (৩) বাণিজ্যের যথেষ্ট বিস্তার।

প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য থেকে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে ভারতে ঘনবসতিপূর্ণ বহু শহরের অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায়। বিশেষত দিল্লীকে কেন্দ্র করে কুতুব-দিল্লী, কিলখোরী, সিরি, তুঘলকাবাদ, ফিরোজাবাদ ইত্যাদি শহর সুলতানি যুগে যথেষ্ট জনবহুল সমৃদ্ধ ও ব্যস্ত শহর হিসেবে খ্যাত ছিল। দিল্লী নামের উৎপত্তি 'ধিল্লী' বা 'ধিল্লিকা' নাম থেকে।[1] প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কানিংহাম ও পারসিক ঐতিহাসিক ফেরিস্তার মতে রাজা ধিলু বা দিলু'র নাম থেকে দিল্লী নামের উৎপত্তি। কিংবদন্তী অনুসারে রাজপুত তোমর বংশীয় কোন রাজা ৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী শহরের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তবে ইতিহাসগত ভাবে এই ধারণা সমর্থিত হয়নি। কুতুবমিনারের পাশে অবস্থিত লৌহস্তম্ভের (চন্দ্র রাজার স্তম্ভ নামে পরিচিত) উপর রাজা অনঙ্গপালের একটি লেখতে বলা হয়েছে যে, '১১০৯ সম্বত বর্ষে রাজা অঙ্গ দিল্লীতে লোকবসতি করেন।' অর্থাৎ ১০৫২ - ৫৩ খ্রীষ্টাব্দে শহর হিসেবে দিল্লীর আবির্ভাব ঘটে। পুরাণ, মহাভারতে দিল্লী নামের বিক্ষিপ্ত উল্লেখের ভিত্তিতে কেউ কেউ মনে করেন যে, দিল্লীর অধিষ্ঠান কয়েক শত বছর আগেই ঘটেছিল। কিন্তু **ড. *অনিরুদ্ধ রায়*** দেখিয়েছেন যে, আলেকজান্ডারের সাথে আগত গ্রীক ঐতিহাসিক কিংবা হিউয়েন সাং-এর ভারত-ভ্রমণ পর্যন্ত সময়ে আগত চীনা পর্যটকদের রচনাতেও দিল্লী নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না। এমনকি গজনীর সুলতান মামুদ মথুরা ও কনৌজ লুঠ করলেও, দিল্লীর কোন প্রসঙ্গ তখনও পাওয়া যায়নি। অধ্যাপক রায়ের মতে, প্রাচীনকালে দিল্লীর অস্তিত্ব থাকলেও, তা পরে পরিত্যক্ত হয়েছিল। একাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে অনঙ্গপাল নতুন করে দিল্লীর পত্তন করেন।

ত্রয়োদশ শতকে দিল্লীতে জলের সমস্যা ছিল প্রকট। পাহাড়ী এলাকা হওয়ায় কূপ খনন করাও সহজ ছিল না। ইলতুৎমিস 'হাউজ-ই-সামশি' নামে একটি জলাশয় খনন করে জলসমস্যার সাময়িক সমাধান করেন। এই সময় মানুষ ক্রমশ যমুনা নদীর দিকে সরে গিয়ে বসবাস করার

চেষ্টা করে। একই সময় বলবনের নাতি (বুগরা খাঁর পুত্র) কাইকোবাদ দিল্লী প্রাসাদের কঠোর নিয়ম-কানুন থেকে মুক্ত হয়ে আমোদ-প্রমোদ করার জন্য যমুনার তীরে কিলঘোরী প্রাসাদ তৈরি করেন। বারণী লিখেছেন যে, বহু আমির, মালিক ও সাধারণ মানুষ কিলঘোরী প্রাসাদের সন্নিকটে এসে বসবাস করতে থাকেন। এইভাবে এখানে নতুন শহর গড়ে ওঠে। এটি 'শহর-ই-নৌ' নামে পরিচিত ছিল। জালালউদ্দিন খলজীর আমলে এই শহরের আরো প্রসার হয় এবং নতুন নতুন বাজারের পত্তন হয়। আলাউদ্দিন খলজী অস্থায়ীভাবে কিলঘোরীতে থাকার পর মহাসমারোহে দিল্লীর 'কওশকে লাল' শহরে রাজধানী স্থানান্তর করেন। তবে মোঙ্গল আক্রমণের প্রেক্ষিতে দিল্লী ও কিলঘোরীর মধ্যবর্তী স্থানে সিরি দুর্গ ও প্রাসাদ প্রতিষ্ঠা করেন। জনবসতির ক্রমবৃদ্ধির ফলে এই তিনটি শহরের মধ্যে প্রভেদ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে।

গিয়াসউদ্দিন তুঘলক সিংহাসনে বসার (১৩২০ খ্রীঃ) পর কুতুবমিনারের প্রায় ৫ মাইল দূরে একটি দুর্গ নির্মাণ করে মালিক, আমির ও নিজ পরিবার-পরিজনসহ বসবাস শুরু করেন। অনেকে মনে করেন এখানেই তুঘলকাবাদ শহরের উৎপত্তি ঘটে। জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার মতে, তুঘলকাবাদ শহরটি পরিকল্পিত ভাবেই নির্মিত ছিল। অধ্যাপক *আজহার আলির* মতে, এই শহরে প্রধানত সুলতান ও তাঁর সেনানায়করা বসবাস করতেন। দিল্লীর পরিবর্ত শহর হিসেবে এটির পরিকল্পনা করা হয়নি। মহম্মদ-বিন্-তুঘলক এক দীর্ঘ পাঁচিল দিয়ে দিল্লী, সিরি ও তুঘলকাবাদকে ঘিরে দেন। ফলে তিনটি শহর মিলিত হয়ে একটি বৃহত্তর শহরের পত্তন ঘটে। এর নতুন নামকরণ হয় *'জাহানপনা'*। মহম্মদ তুঘলকের রাজধানী স্থানান্তরের সূত্রে দেবগিরি শহরে চরিত্র পরিগ্রহ করে। এর নতুন নাম হয় *'দৌলতাবাদ'*। *ইবন বতুতা* বলেছেন যে, দৌলতাবাদ তার বিশালতা ও বৈভবের বিচারে দিল্লী থেকে খুব পিছিয়ে ছিল না। অবশ্য তিনি এও বলেছেন যে, দৌলতাবাদে নতুন রাজধানী স্থানান্তরিত হলেও, ব্যস্ত শহর হিসেবে দিল্লীর রমরমা অক্ষুণ্ণ ছিল। জিয়াউদ্দিন বারণীর রচনা থেকে জানা যায় যে, ফিরোজ শাহ তুঘলক যমুনার নিকটে একটি বৃহৎ দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। পরে এখানেই রাজধানী সরিয়ে আনেন। এটির নাম হয় *'ফিরোজাবাদ'*। এই শহর তুঘলকাবাদের চেয়ে বড় ছিল। দেড়শো বছর পরে এটি পরিত্যক্ত হয়। বর্তমানে এর ধ্বংসস্তুপ টুকুই দেখা যায়। সুলতান মুইজউদ্দিন মুবারক শাহ পঞ্চদশ শতকের গোড়ার দিকে মুবারকাবাদ শহরের পত্তন করেন। এর প্রায় এক শতক পরে হুমায়ুন নির্মাণ করেন *'দিন পনাহ'* শহর। তীব্র জলাভাব, তৈমুর লং-এর আক্রমণ (১৩৯৯ খ্রীঃ) ও ধ্বংসকার্যের ফলে দিল্লীর জৌলুষ ম্লান হয়ে যায়। ষোড়শ শতকের প্রথম দিকেই দিল্লীর পরিবর্তে আগ্রা রাজধানী-শহর হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

দিল্লীর সাথে দূরের শহরগুলির পথ যোগাযোগ ছিল। বদায়ুন, কনৌজ, অযোধ্যা, কারা, আজমির, মুলতান, দৌলতাবাদ প্রভৃতি শহরের সাথে স্থলপথে যোগাযোগ ছিল। মহম্মদ তুঘলক রাজধানী স্থানান্তরের সময় দিল্লী ও দৌলতাবাদের মধ্যে পথ সংযোগ তৈরি করেন। মুলতান ও কান্দাহারের রাস্তা ধরে মধ্য-পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলিতে যাওয়া যেত। বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে দিল্লী ও পার্শ্ববর্তী রাজধানী শহরগুলি সদাব্যস্ত থাকত। তাই দিল্লীর শহরগুলিতে দেশীয় ও বিদেশী বণিকদের ব্যাপক উপস্থিতি দেখা যেত। দেশী বণিকদের মধ্যে হিন্দু মুলতানি বণিকদের দেখা যায়। অবশ্য মুলতানি মুসলমান বণিকরাও ছিল। বিদেশীদের মধ্যে প্রধান ছিল আরব, তুর্কী,

খোরাসানী, চীন ও মধ্য-এশিয়ার বণিকেরা। বণিকদের জন্য গোয়া শহর জুড়ে সরাইখানা নির্মিত ছিল। ফিরোজ তুঘলক প্রায় ১২০ টি সরাই নির্মাণ করেছিলেন। সাধারণত সরাইখানায় থাকা-খাওয়ার জন্য ভ্রমণকারীদের কোন খরচ করতে হত না। ধনী ও সাধারণ পর্যটকদের সরাইখানা ঘরগুলি পৃথক পৃথক মানের তৈরি করা হত।

তিনটি কেন্দ্রীয় বাজারে খাদ্যশস্য, পোশাক-পরিচ্ছদ ও অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যেত। খাদ্যশস্যের বাজারকে বলা হত 'মাণ্ডভি'। এখান থেকে শহরের ছোট ছোট বাজারে শস্য যোগান দেওয়া হত। কাপড়ের বাজারকে বলা হত 'বাজাজজীত'। শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে এদের শাখা ছিল। পশু-পাখি ও দাসদের জন্য পৃথক বাজার ছিল। এই বাজারের নাম ছিল 'নাখখাস'। চতুর্দশ শতকে দিল্লীতে দুটি 'নাখখাস' ছিল। তবে সুলতানি আমলে দাসদের কোনরকম হীন চোখে দেখা হত না। দাস ব্যবসাও বৈধ ছিল। দাসত্ব মুক্ত হয়ে সাধারণ মানুষের মত জীবনধারণ করা যেত। ১২০৬ থেকে ১২৮৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে দিল্লীর ইলবেরী তুর্কী সুলতানরা সবাই ছিলেন প্রাক্তন দাস।

দিল্লীর শহরের কাঠামোর মধ্যে ধর্মীয় বা জাতিগত বিভেদ দেখা যায় না। ***অনিরুদ্ধ রায়*** লিখেছেন যে, পরিকল্পনাহীন ভাবে শহর গড়ে ওঠায় ঘন ঘন শহর কেন্দ্রের পরিবর্তন হবার ফলে বিশ্বাস বা জাতের ভিত্তিতে শহর গড়ে ওঠেনি।

রাজস্থানের শহরগুলি প্রধানত দুর্গকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল। আদি-মধ্যযুগে এখানকার শহরগুলির মধ্যে অবাধ বাণিজ্যসম্পর্ক ছিল। কালক্রমে শহরগুলিকে পাঁচিল দ্বারা বেষ্টনী করে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়। অবশ্য দুর্গগুলিও পৃথক পাঁচিল দ্বারা সুরক্ষিত ও স্বতন্ত্র ছিল। তুর্কী-আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সময় (১৩-১৪ শতক) রাজস্থানের শহরগুলির বিকাশ কিছুটা বাধাপ্রাপ্ত হয়। রাজপুতদের উপজাতীয় গোষ্ঠীদ্বন্দ্বও এজন্য কিছুটা দায়ী ছিল। চতুর্দশ শতকে দিল্লী সুলতানির অবক্ষয়ের কালে আঞ্চলিক শক্তির বিকাশ শুরু হলে পুরানো শহরগুলির পুনরুজ্জীবন ঘটে এবং নতুন শহরের পত্তন শুরু হয়। প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠা কয়েকটি শহর হলো যোধপুর, নাগোর, জারে, পোখরান ইত্যাদি। বাণিজ্যিক কারণেও কয়েকটি ছোট ছোট শহরের আবির্ভাব ঘটে। উত্তর ভারত থেকে দক্ষিণ ভারত বা পশ্চিম ভারতে যাতায়াতের বড় বড় পথগুলি রাজস্থানের মধ্য দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। এই পথ ধরে বাণিজ্য কারাভান যাতায়াত করত। এই বাণিজ্য সূত্রে হনুমানগড়, বারমের, মেরতা প্রভৃতি ছোট শহরগুলির উৎপত্তি হয়েছে। রাজস্থানের শহরগুলির গঠন কাঠামো প্রায় একই রকম। প্রতিটি শহর পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পাঁচিলের বাইরে জল ভর্তি পরিখা। পাঁচিলের ভেতরে জলহীন টানা কৃত্রিম খাদ কাটা। নিরাপত্তার কারণে এই ব্যবস্থা। রাস্তাগুলি অপরিকল্পিত। শহর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এলোমেলো ভাবে রাস্তাগুলি গজিয়ে উঠেছে। উচ্চশ্রেণী ও নিম্নশ্রেণীর লোকেরা সাধারণত শহরের ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তে বসবাস করত।

আল-মাসুদির রচনা থেকে গুজরাটে ক্যাম্বে উপসাগরের দু'পারে বহু গ্রাম ও শহরের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা যায়। মাহি নদীর উত্তরে ছিল ক্যাম্বে বা বর্তমানে খাম্বাজ বন্দর। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ছয় শতকে এই বন্দরের পত্তন হয়। দশম শতকের শেষ দিকে মূলরাজ শোলাঙ্কি গুজরাট জয় করে নতুন খাম্বাজ শহরের পত্তন করেন। মার্কোপোলো তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে খাম্বাজকে একটি

গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকেন্দ্র বলে বর্ণনা করেছেন। পঞ্চদশ শতকের গোড়ায় প্রথম আহ্‌মদ শাহ্ দধিমতি নদীর তীরে দোহাদ শহরের প্রতিষ্ঠা করেন। দোহাদে প্রাপ্ত একটি শিলালেখ থেকে চম্পানীর, আহমদাবাদ, বাগলানা ইত্যাদি শহরের অস্তিত্ব জানা যায়। মহম্মদ বেগব্‌হা পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে চম্পানীর শহরকে নতুনভাবে সজ্জিত করেন। তিনি আহমদাবাদের পঁচিশ মাইল দূরে মহম্মদাবাদ নামে একটি শহর প্রতিষ্ঠা করেন।

আহ্‌মদ শাহ্ গুজরাট দখল করে অসওয়াল গ্রামে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেছিলেন (১৪১১ খ্রীঃ)। ১৪২৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজপুতদের হাত থেকে ইদর দখল করে আহ্‌মদ শাহ্ সেখানে রাজধানী সরিয়ে আনেন। এর নাম দেন আহমদাবাদ। পরবর্তীকালে এটি হিম্মতনগর নামে পরিচিত হয়েছিল। পর্যটক বারথোমা, উইলিয়াম ফিঞ্চ, প্রমুখ আহমদাবাদ শহরের ব্যস্ততা ও গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেছেন।

চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি সময় দিল্লী সুলতানদের ক্ষমতা হ্রাস পেলে দক্ষিণ ভারতে স্বাধীন রাজ্য হিসেবে বিজয়নগর ও বাহমনী রাজ্যের উত্থান ঘটে। পূর্ব ভারতে স্থাপিত হয় বাংলার স্বাধীন সুলতানি। এই সকল আঞ্চলিক রাজ্যের নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নতুন নতুন শহরের পত্তন ঘটে। ড. *অনিরুদ্ধ রায়ের* মতে, বাংলা, বিজয়নগর ও বাহমনি-তিনটি রাজ্যের ক্ষেত্রেই স্থানীয় শক্তির স্বাধীনতা প্রকাশের মধ্যে নগরায়ণের প্রশ্ন জড়িয়ে আছে।[1] দাক্ষিণাত্যের সদাহ আমিরদের বিদ্রোহের সুযোগ নিয়ে আলাউদ্দিন হাসান বাহমন শাহ্ স্বাধীন বাহমনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন (১৩৪৭ খ্রীঃ)। নতুন রাজ্যের রাজধানী হিসেবে গুলবর্গা শহর জনবহুল ও সম্পদশালী হয়ে ওঠে। কালক্রমে গুলবর্গায় জনসংখ্যার চাপ অত্যধিক বৃদ্ধি পেলে সুলতান ফিরোজ শাহ ভীমা ও বুহরা নদীর সঙ্গমস্থলে 'ফিরোজাবাদ' শহরের প্রতিষ্ঠা করেন। এখানকার স্থাপত্য শিল্প বিস্ময়ের উদ্রেক করে। তুঘলক স্থাপত্যশৈলীর প্রভাব মুক্ত হয়ে স্বতন্ত্র আঞ্চলিক শিল্পশৈলীর প্রথম প্রকাশ ঘটে ফিরোজাবাদের মসজিদ ও প্রাসাদগুলিতে। সুলতান আহমদ শাহ ১৪২৪ খ্রীষ্টাব্দে বিদরে রাজধানী স্থানান্তর করেন। সম্ভবত, রাজধানী শহর হিসেবে ফিরোজাবাদের আয়তন যথেষ্ট ছিল না। তাছাড়া এই শহরটি বাহমনী সাম্রাজ্যের ঠিক কেন্দ্রস্থলে ছিল না। তুলনামূলকভাবে দাক্ষিণাত্যের পাহাড়ের কোল ঘেঁষা বিদরের অবস্থান অধিক নিরাপদ ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সুবিধাজনক ছিল। নিকিতনের বিবরণ অনুযায়ী বিদরে লোকসংখ্যার চাপ ছিল প্রচুর। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য ছিল দৃষ্টিকটু রূপে প্রকট। তবে রাজনৈতিক প্রয়োজনে গড়ে তোলা বহু শহরের মত বিদর পরিত্যক্ত হয়নি। রাজনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে গুরুত্ব চলে যাওয়ার পরেও সাধারণ শহর হিসেবে বিদর আকর্ষণীয় ছিল।

তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে স্বাধীন বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন (১৩৩৬ খ্রীঃ) হরিহর ও বুক্ক নামক দুই ভাই। তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণ তীরে গড়ে ওঠে বিজয়নগর শহর। অসংখ্য সুদৃশ্য প্রাসাদ ও মন্দিরে সুসজ্জিত বিজয়নগর ছিল সম্ভবত ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় মধ্যযুগীয় শহর। অনেকগুলি পাহাড়ের গায়ে ছড়িয়ে থাকা বিজয়নগর ছিল অনেকটা রোম শহরের মত। পর্যটক পায়েজ বিজয়নগর শহরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, পরিকল্পনা, বৈচিত্র্য, জনসংখ্যা ও স্বচ্ছলতার

1. *পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৯০।*

ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। অসংখ্য হ্রদ, ফল ও ফুলের বাগিচা, পাহাড়ী ঝরণা, প্রশস্ত পথঘাট, সুদৃশ্য প্রাসাদ ও মন্দিরে সুসজ্জিত বিজয়নগর শহরটি ছিল যে-কোন পর্যটকের কাছেই আকর্ষণের বস্তু। ষোড়শ শতকের শেষদিকে (১৫৬৫ খ্রীঃ) মুসলমান যোদ্ধাদের অবাধ ধ্বংসকার্য এবং কিছু স্থানীয় অভিজাত ও গ্রামীণ উপজাতীয় মানুষের বিদ্রোহের ফলে এই সুন্দর শহরটি ধ্বংস হয়। রাজা কৃষ্ণদেব রায় নাগলপুরে (বর্তমান হসপেট) একটি শহর নির্মাণ করেছিলেন বলে পর্তুগীজ পর্যটক নুনিজ উল্লেখ করেছেন।

মধ্যযুগের একটি গুরুত্ব শহর ছিল গোয়া। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দে কাদম্ব বংশের প্রতিষ্ঠাতা-রাজা ত্রিলোচন কাদম্ব গোয়া শহরের পত্তন করেছিলেন। পরে একে একে বিজয়নগর ও বাহমনী রাজ্য এবং পর্তুগীজ বণিকরা গোয়া দখল করে। পর্তুগীজ ঐতিহাসিকদের মতে, পর্তুগীজরা ১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দে গোয়াকে বিজয়নগর থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়। আলবুকার্ক-এর আমলে গোয়া শহরের পৌর সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির নানা কর্মসূচী রূপায়িত হয়। মিশনারী সেন্ট জেভিয়ার ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে গোয়া শহর পরিদর্শন করে এই শহরের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

দ্বাদশ শতকের শেষদিকে বারেন্দ্র ও রাঢ় এলাকায় ভাগীরথীর তীরে কয়েকটি নগরের উদ্ভব বা বিকাশ ঘটেছিল বলে ড. অনিরুদ্ধ রায় উল্লেখ করেছেন। সন্ধ্যাকর নন্দীর রচনা থেকে বারেন্দ্রভূমির 'রামাবতী' নগরের কথা জানা যায়। কবি ধোয়ী সেন রাজাদের রাজধানী হিসেবে 'বিজয়পুরা' শহরের কথা উল্লেখ করেছেন। মিনহাজউদ্দিন সিরাজের রচনা থেকে জানা যায় যে, সেন বংশীয় রাজা লক্ষ্মণ সেনকে নদীয়া'তে পরাজিত করে ইখতিয়ারউদ্দিন বাংলা দখল করেছিলেন। নদীয়া যে একটি বড় শহর ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে নদীয়ার অবস্থান বিতর্কিত। অনেকের মতে, উক্ত নদীয়া এবং রাজশাহী জেলার 'নৌদিয়া' অভিন্ন। এছাড়া পাণ্ডুয়া, লক্ষ্ণণাবতী, গৌড় ইত্যাদি মধ্যযুগে বাংলার প্রখ্যাত শহর হিসেবে ব্যস্ত ও জনবহুল ছিল।

○ সুলতানি আমলে প্রযুক্তি ও অ-কৃষি উৎপাদন ঃ

সুলতানি আমলে কৃষিকার্য ও কৃষি-উৎপাদন ভারতবাসীর প্রধান জীবিকা ও ভারতীয় অর্থব্যবস্থার ভিত্তি ছিল। তবে অ-কৃষি উৎপাদনের কাজেও যে ভারতীয়রা দক্ষ ও উৎসাহী ছিলেন, এমন বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। মধ্যযুগে নগরায়ণ ও নগরের বিকাশের পূর্বশর্ত হিসেবে অ-কৃষি উৎপাদনের বিষয়টি অনেকটাই সম্পর্কিত। নগরের উত্থান ও অস্তিত্বের সাথে সাথে হস্তশিল্পের বিকাশ ঘটে। এই বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল তুলনামূলক ভাবে উন্নত প্রযুক্তির প্রয়োগ। সুলতানি আমলে ভারতে হস্তশিল্প উৎপাদনের গুণমান উন্নত করার পিছনে প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের অবদান অনস্বীকার্য। অধ্যাপক ***ইরফান হাবিব*** সুলতানি আমলে হস্তশিল্পের বিকাশের অন্যতম কারণ হিসেবে প্রযুক্তির পরিবর্তন বা আধুনীকিকরণের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, *"The increase in craft production that accompanied urban growth also reinforced by a number of changes or improvements in technology which can be ascribed to the period of the Sultanate."*[1]

সুতীবস্ত্র শিল্পের বিকাশের জন্য প্রয়োজন ছিল উন্নতমানের সুতো এবং যা অল্পসময়ে বেশি

উৎপাদন করা সম্ভব। সুলতানি যুগে চরকা'র আগমনের ফলে সেই কাজটি সম্ভব হয়। ঐতিহাসিক ইসামী তাঁর 'ফুতুহ্-উস্-সালাতনি' গ্রন্থে (১৩৫০ খ্রীঃ) এই যন্ত্রটির কথা প্রথম উল্লেখ করেন। তিনি এই যন্ত্রটিকে (চরকা) মহিলাদের পক্ষে ব্যবহারের উপযোগী বলেও মন্তব্য করেছেন। লিন হোয়াইট জুনিয়র (Lynn white junior)[2] মন্তব্য করেছেন যে, প্রাচীন ভারতে চরকার ব্যবহার জানা ছিল না। প্রাচীনকালে চীনদেশে চরকার প্রচলন ছিল। পারসিক কবিদের রচনা থেকে জানা যায় দ্বাদশ শতকে ইরানে চরকার আবির্ভাব ঘটেছিল। *ইরফান হাবিবের* মতে চীনদেশ থেকে ইরান বা মধ্য এশিয়া হয়ে ত্রয়োদশ শতকে ভারবর্ষে চরকার প্রথম আবির্ভাব ঘটে। অতঃপর এদেশে চরকার ব্যবহার দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। বস্ত্রবয়ন শিল্পের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি 'পাদানি যন্ত্র' (treadle machine)-এর সাথেও প্রাচীন ভারতের পরিচিতি ছিল না। প্রাচীন সংস্কৃত অভিধানগুলিতে তাঁতের নানা অংশের উল্লেখ থাকলেও পাদানি-যন্ত্রের কোন উল্লেখ নেই। দ্বাদশ শতকের শেষ দিকে ইউরোপে পাদানি-যন্ত্রের প্রথম প্রয়োগ দেখা যায়। মহম্মদ শাদিয়াবাদীর গ্রন্থ 'মিফ্‌তা-উল্-ফুজালা'-এর ভিত্তিতে *ইরফান হাবিব* বলেছেন যে, ১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে পাদানি-যন্ত্রের উল্লেখ প্রথম পাওয়া যায়। অর্থাৎ পঞ্চদশ শতকের শেষদিকে ভারতে বয়ন শিল্পের সাথে পাদানি-যন্ত্রের সংযোজন ঘটেছিল। এইভাবে 'চরকা' উদ্ভবের ফলে অল্প সময়ে বেশি পরিমাণ উন্নতমানের সুতো বোনা সম্ভব হয় এবং পাদানি-যন্ত্র ব্যবহারের ফলে অল্প সময়ে অধিক কাপড় বোনা সম্ভব হলে সুলতানি আমলে বস্ত্র শিল্পের বিকাশ দ্রুততর হয়।

সুলতানি আমলে প্রযুক্তিগত উন্নতির কারণেই বিলাস সামগ্রী হিসেবে রেশমবস্ত্র-বয়ন শুরু হয়েছিল বলে ইরফান হাবিব মনে করেন। তাঁর মতে, সুলতানি যুগের আগে ভারতবর্ষে রেশম গুটি বা তুঁত পোকার চাষ অজানা ছিল। *মা-হুয়ান*-এর বিবরণ থেকে জানা যায় পঞ্চদশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলায় প্রথম গুটি চাষের সূচনা হয়। মীর্জা হায়দার দৌলত-এর 'তারিখ-ই-রশিদি' গ্রন্থের বয়ান অনুযায়ী বাংলার পরে ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে কাশ্মীরে গুটিপোকার চাষের প্রচলন হয়। অধ্যাপক হাবিবের মতে, এর আগে ভারতে রেশমবস্ত্র বয়নের জন্য প্রধানত আমদানি করা কাঁচামালের উপর নির্ভর করা হত। এখন পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে গুটি চাষের প্রক্রিয়া ভারতের দখলে এলে রেশমবস্ত্র উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। কিন্তু পঞ্চদশ শতকের পূর্বে ভারতে রেশম-গুটির চাষ আদৌ হত না, অধ্যাপক হাবিবের এই মন্তব্যের যথার্থতা সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়। অধ্যাপক *এস. কে. মাইতি* তাঁর গবেষণাপত্র *'ইকনমিক লাইফ অফ ইন্ডিয়া ইন গুপ্ত পিরিয়ড'*-এ লিখেছেন যে গুপ্ত শাসনকালে ভারতে রেশম-গুটি চাষের প্রচলন ছিল। 'অমরকোষ' গ্রন্থে রেশম-বয়ন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা আছে। 'মান্দাসোর লেখ' থেকে জানা যায় যে তখন বহু কারিগর রেশম শিল্পে নিয়োজিত ছিল এবং তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য রেশম শিল্পীদের সমবায় বা 'গিল্ড' গঠিত হয়েছিল। সম্ভবত, গুপ্তদের পতনের পর রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বাণিজ্যে মন্দার ফলে রেশম উৎপাদনে গভীর মন্দা দেখা দিয়েছিল। পরবর্তীকালে মুসলমানদের শাসন সুদৃঢ় হলে নতুন উদ্যমে রেশম চাষ শুরু হয়েছিল। সম্ভবত, পারস্য থেকে উল্লম্ব তাঁতে (vertical loom) কার্পেট বোনার প্রযুক্তিও সুলতানি আমলে ভারতে এসেছিল। অবশ্য এ-বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য মুঘল যুগের আগে পাওয়া যায় না।

সুলতানি আমলে গৃহ-নির্মাণশিল্পে লক্ষণীয় প্রযুক্তিগত পরিবর্তন দেখা যায়। এই সময় গাঁথুনির কাজে চুনের ব্যবহার ঘটে। ফলে খিলান ও গম্বুজ শোভিত গৃহ-নির্মাণ সম্ভব হয়। ইতিপূর্বে কাঠ ও খড় বা গোলপাতা দিয়ে গৃহাদি নির্মিত হত। সুলতানি যুগে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে বিশালাকার সুদৃশ্য প্রাসাদ নির্মাণ শুরু হয়। তুঘলকাবাদের ধ্বংসস্তুপের নিদর্শন তার সাক্ষ্য বহন করে। আলাউদ্দিন গৃহ-নির্মাণ কাজে প্রায় ৭০ হাজার কারিগর নিযুক্ত করেছিলেন বলে বারণী উল্লেখ করেছেন। এই বক্তব্যে কিছুটা অতিরঞ্জন থাকলেও, খলজী ও তুঘলক বংশের শাসনকালে যে বহু বিশালাকার খিলান ও গম্বুজ যুক্ত প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

মধ্যযুগের ভারতে হস্তশিল্পের এক নতুন সংযোজন হলো কাগজ তৈরি। ***দীনেশচন্দ্র সরকার*** দেখিয়েছেন যে ভারতে প্রাচীনতম কাগজের নিদর্শন পাওয়া যায় ত্রয়োদশ শতকে গুজরাট রাজ্যে। ***ইরফান হাবিবও*** মনে করেন ত্রয়োদশ শতকে ভারতে প্রথম কাগজ উৎপাদন শুরু হয়। চতুর্দশ শতকের মধ্যেই উন্নতমানের কাগজ তৈরি করা সম্ভব হয়। এই সময় কাগজের উৎপাদন এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে মিষ্টান্ন বিক্রেতারা কাগজের প্যাকেটে মিষ্টান্ন বিক্রয় করতে পারত।

ধাতু শিল্পের ক্ষেত্রেও সুলতানি আমলে গুরুত্বপূর্ণ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। সম্ভবত, দশম শতকে চীনে পাতন প্রক্রিয়া দ্বারা দস্তাশোধন শুরু হয়েছিল। ভারতে এই প্রক্রিয়া প্রবেশ করে চতুর্দশ শতকে। রাজস্থানের মেবারের খনিতে দস্তা শোধনক্রিয়ার প্রমাণ সমকালীন প্রত্নলেখ থেকে জানা যায়। গৃহস্থালির বাসনপত্রাদি নির্মাণের জন্য পেতল সংগ্রহের জন্য দস্তা শোধন প্রক্রিয়ার জ্ঞান জরুরী ছিল।

○ শিল্প উৎপাদন ঃ

সুলতানি রাজত্বকালে কৃষির বিকাশ ও প্রযুক্তিগত রূপান্তরের ফলে অ-কৃষিজ উৎপাদন বা কারিগরী শিল্পের বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ভারতে সুলতানি শাসন শুরুর আগেও গ্রামীণ শিল্প উৎপাদনের ঐতিহ্য ছিল। তবে কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে না ওঠার কারণে প্রাচীন কারিগরী শিল্প তার গ্রামীণ চরিত্র নিয়ে টিকে ছিল। তুর্কী-আফগান সুলতানদের আমলে শহরের বিকাশ এবং নতুন নতুন প্রযুক্তির আবির্ভাব কারিগরী শিল্প-উৎপাদনের গুণগত পরিবর্তন সম্ভব করে। অধ্যাপক ইরফান হাবিব অ-কৃষিজ উৎপাদনের এই রূপান্তরের তিনটি উপাদানকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এগুলি হলো—(১) মুসলমানদের সাথে সাথে একদল দক্ষ কারিগর তাদের উন্নত প্রযুক্তিজ্ঞান সহ ভারতে প্রবেশ করেছিল। (২) দাস ব্যবস্থার প্রচলন থাকায় এদেশে অদক্ষ শ্রমিকের সুলভ যোগান ছিল। এবং (৩) নগরায়ণের ফলে উদ্বৃত্ত কৃষি উৎপাদন ভোগ করার ক্ষমতাসম্পন্ন অভিজাত ও বুর্জোয়া শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল। তবে এই পরিবর্তন আকস্মিক হয়নি। চিরাচরিত শিল্প পদ্ধতির পরিবর্তে এদেশে ধীরে ধীরে নতুন প্রযুক্তি ও শৈলীর সাথে শিল্পী কারিগরদের পরিচয় ঘটেছিল।

গ্রামীণ বা কুটিরশিল্প গড়ে উঠেছিল স্থানীয় প্রয়োজনবোধ থেকে। সাধারণত কৃষিকার্যের পাশাপাশি গ্রামীণ কারিগররা শিল্পকর্মে নিয়োজিত থাকত। প্রতিটি গ্রামের শিল্পী কারিগররা তাঁতে কাপড় বোনা, গোরুর গাড়ির চাকা তৈরি, হাল, লাঙল, জোয়াল তৈরি, ছুরি, কাঁচি, ছোরা,

তলোয়ার, ঘোড়ার নাল, বাসনপত্র, দড়ি ইত্যাদি তৈরির কাজ করত। নির্মাণ-পদ্ধতি ছিল পুরানো, তবে স্থানীয় প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে ছিল যথেষ্ট। ড. *রোমিলা থাপার* লিখেছেন : "*তখন কারিগররা পেশা অনুসারে নানা বর্ণে বিভক্ত ছিল। ইসলামে ধর্মান্তরিত হিন্দুদের মধ্যেও বর্ণপ্রথা ছিল। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে কারিগররা বংশানুক্রমে একই কারিগরী-বিদ্যার চর্চা করত।*" কৃষিদ্রব্য থেকে নির্মিত শিল্পোৎপাদনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল সুগন্ধি ও সুরা। মালিক মহম্মদ জায়সী '*মৈদু*' ও '*চুবাই*' নামক দুটি উগ্রগন্ধি আতর উৎপাদনের কথা লিখেছেন। ভেষজ নির্যাস থেকে এগুলি তৈরি হত। তবে নির্দিষ্ট ভেষজটি সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। বাংলাদেশে গন্ধদ্রব্য ব্যবসায়ীরা 'গন্ধ-বণিক' নামে একটি পৃথক শ্রেণী হিসেবে চিহ্নিত হতেন। ভারতে সুরা তৈরি ও সুরার ব্যবহার খুবই প্রাচীন রেওয়াজ। *আমীর খসরু, মা-হুয়ান* প্রমুখের রচনা থেকে জানা যায় যে, সুলতানি আমলে আখের রস, খেজুরের রস ও নারকেলের রস থেকে উগ্র পানীয় তৈরি করা হত। এছাড়া ভাত ও মহুয়া থেকে সুরা তৈরির রেওয়াজ আগের মতই চালু ছিল। বাংলাদেশের বাজারে প্রকাশ্যে মদ বিক্রি হত।

গ্রামীণ শিল্প ছাড়াও মধ্যযুগে এমন কিছু শিল্প গড়ে উঠেছিল যা নিছক স্থানীয় চাহিদার কারণে সৃষ্টি হয়নি। এই ধরনের দুটি প্রধান শিল্প হলো সরাসরি সুলতানদের তত্ত্বাবধানে গড়ে-ওঠা সরকারি কারখানা এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে স্থাপিত বস্ত্রবয়ন-শিল্প। সরকারি কারখানাগুলিতে শাসকপরিবার ও উচ্চ-অভিজাতদের চাহিদা অনুযায়ী নানা ধরনের দ্রব্য তৈরি হত। যেমন—টুপি, ওড়না, জুতো, ঘোড়ার রেকাবি, চাদর ইত্যাদি। বিদেশী শাসকদের কাছে প্রেরণের জন্য নানা ধরনের উপহারসামগ্রীও এখানে তৈরি করা হত। মহম্মদ তুঘলক প্রতি বছর শরৎ ও বসন্তকালে প্রায় দু'লক্ষ মহার্ঘ পরিচ্ছদ 'সম্মানী' হিসেবে বিতরণ করতেন। শরৎকালের পোশাকের কিছু উপকরণ সরকারি কারখানায় প্রস্তুত হত। অভিজাত মহিলাদের পোশাকে সোনার সুতো ব্যবহার করা হত। কয়েক হাজার মহিলা কারিগর এই স্বর্ণতন্তু নির্মাণের কাজে নিয়োজিত থাকতেন।

○ বস্ত্রশিল্প : সুলতানি আমলে ভারতের বস্ত্রবয়ন শিল্প ছিল বেশ উন্নত এবং উৎপাদিত বস্ত্রের পরিমাণও ছিল যথেষ্ট। বস্ত্র-শিল্পের জন্য আবশ্যিক প্রাথমিক উপাদানগুলির, যেমন—তুলো, রেশম, বুনন যন্ত্র ইত্যাদির সহজলভ্যতা ভারতীয় বয়ন শিল্পের দ্রুত অগ্রগতির সহায়ক হয়েছিল। সারা দেশেই তুলার চাষ জনপ্রিয় ছিল। পার্বত্য এলাকায় ব্যাপক মেষ পালনের রেওয়াজ ছিল। ফলে পশমের যোগানে টান পড়ত না। আর ভারতে, বিশেষত বাংলাদেশে রেশমকীটের (গুটি পোকা) চাষের জন্য বিখ্যাত ছিল বলে মা-হুয়ানের বিবরণী থেকে জানা যায়। অবশ্য 'ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার' (১৯০৮)-এর সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, তখন বিদেশ থেকে বিপুল পরিমাণ রেশমী সুতো আমদানি করে তাঁতিদের চাহিদা মেটানো হত।

অভিজাত ও ধনী ব্যক্তিদের পশমী বস্ত্র সাধারণভাবে বিদেশ থেকে আমদানি করা হত। তবে স্বদেশে তৈরি সূক্ষ্ম সূতীবস্ত্র, ক্ষৌমবস্ত্র, পশুর লোমে প্রস্তুত শীতবস্ত্র ইত্যাদিও ধনীদের অঙ্গে শোভা পেত। সূক্ষ্ম সূতীবস্ত্র তৈরির কাজে হিন্দুস্তানের তাঁতীরা খুবই দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। বিদেশী পর্যটকদের প্রায় সবাই একবাক্যে ভারতীয় সূতীবস্ত্রের উন্নতমানের প্রশংসা করেছেন। অধ্যাপক *ইরফান হাবিবের* মতে ত্রয়োদশ শতকে তকলীর পরিবর্তে চরকার ব্যবহার এবং তুলো পেঁজার জন্য 'ধুনুরীর' প্রয়োগ হিন্দুস্তানের উন্নত বস্ত্রবয়ন শিল্পের উপযুক্ত প্রেক্ষাপট তৈরি

করেছিল। এই দুটি বয়ন-যন্ত্রের ব্যবহার কোন সময় শুরু হয়েছিল, তা সঠিক বলা যায় না, তবে ত্রয়োদশ শতকে এগুলির দক্ষ প্রয়োগ জানা ছিল বলে অধ্যাপক হাবিব দাবি করেছেন।

উন্নতমানের বস্ত্র উৎপাদন ও রপ্তানির দু'টি অগ্রণী অঞ্চল ছিল গুজরাট এবং বাংলাদেশ। গুজরাটের ক্যাম্বে অঞ্চল উচ্চমান অথচ স্বল্প-মূল্যের বস্ত্র উৎপাদনের জন্য পর্যটক বারবোসার ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছে। তাঁর মতে, ইউরোপের ফ্ল্যান্ডার্সের মতই দক্ষ শিল্পীদের সমাবেশ ঘটেছিল ক্যাম্বেতে। শুভ্র সূতীবস্ত্র, রেশম, মখমল, সাটিন এবং কার্পেট ইত্যাদির বুননে এখানকার শিল্পীরা যথেষ্ট দক্ষতা দেখান। উচ্চমান ও নিম্নমূল্যের কারণে ক্যাম্বের বস্ত্রসম্ভার পশ্চিম ইউরোপ ও দক্ষিণ আফ্রিকায় যথেষ্ট সমাদৃত ছিল। ইবন বতুতার আগমনকালে মালাবার অঞ্চল ও সূতীবস্ত্র উৎপাদনে খ্যাতি অর্জন করেছিল। চীনা পর্যটক মা-হুয়ানের বিবরণী থেকে জানা যায় যে, কোয়েম্বাটুর অঞ্চলেও উন্নতমানের সূতীবস্ত্র তৈরি হত। একইভাবে এখানকার ছাপা সিল্কবস্ত্রও বিদেশে রপ্তানি হত বলে মা-হুয়ান লিখেছেন। ত্রয়োদশ-পঞ্চদশ শতকে সুখ্যাত ও জনপ্রিয় সূক্ষ্ম কাপড়ের মধ্যে সলাহিয়, বৈরামিয়, শিরিন, কাতান-এ-রানী প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। পূর্ব ভারতে বয়ন-শিল্পের প্রাণকেন্দ্র ছিল বাংলাদেশ চতুর্দশ শতকে বাংলাদেশ পর্যটনের সময় (১৩৪৬ খ্রীঃ) ইবন বতুতা সেখানে অতি অল্পমূল্যে অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র বিক্রয়ের ঘটনা লক্ষ্য করেছেন। চতুর্দশ শতকে আগত চীনা পর্যটক মা-হুয়ান প্রায় ছয় ধরনের সূক্ষ্ম বস্ত্র উৎপাদনে বাংলার খ্যাতি ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। চীনা লেখক *ওয়ান-তা-ইউয়ান* ও *ফেই সিন্* এবং পর্তুগীজ পর্যটক *বারবোসা* বাংলাদেশের উন্নতমানের তুলাজাত বস্ত্রসম্ভারের প্রশংসা করেছেন। বাংলার সূক্ষ্ম 'মসলিন' বস্ত্রের খ্যাতি ও চাহিদা ছিল জগৎজোড়া। বাংলার শাসনকর্তা বুগরা খাঁ তাঁর পুত্র সুলতান কাইকোবাদকে বাংলায় প্রস্তুত যে সূক্ষ্ম কাপড় উপহার দিয়েছিলেন, *আমির খসরু* তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাঁর ভাষায় এই কাপড়ের মান এতই সূক্ষ্ম যে, তার ভিতর দিয়ে শরীরের প্রতিটি রেখা স্পষ্ট দেখা যেত। পর্যটক বার্থেমা বাংলায় প্রস্তুত উন্নতমানের বস্ত্র হিসেবে বৈরম, নমন, লিজতি, কৈঁতার, দৌজারা ইত্যাদির নাম উল্লেখ করেছেন। তিনি কিছুটা আবেগাপ্লুত হয়ে লিখেছেন যে, পৃথিবীর অন্য কোন দেশে তিনি বাংলাদেশের মত সূতীবস্ত্রের এত প্রাচুর্য দেখেননি। পর্যটক বারবোসা উল্লেখ করেছেন যে, বাংলায় প্রস্তুত 'সিনবফ' নামক কাপড় আরব পর্যটকদের খুবই প্রিয় ছিল। এই কাপড় দিয়ে তারা কামিজ বানাত বলে *অধ্যাপক আশরাফ* উল্লেখ করেছেন। এছাড়া 'শিরবস্ত্র' নামক এক প্রকার কাপড়ের উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন যে, ইউরোপীয় মহিলাদের মাথার স্কার্ফ হিসেবে এবং পারসিক ও আরব বণিকদের পাগড়ি হিসেবে এর প্রভূত চাহিদা ছিল। কার্পেট, কুশন ইত্যাদি বুননের ক্ষেত্রেও মধ্যযুগের ভারতীয় বয়ন-শিল্পীরা বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। মধ্যযুগের শিল্পীরা রঞ্জন-শিল্পে যথেষ্ট দক্ষ ছিলেন। বারবোসা ও বার্থেমা প্রমুখ রঙীন পাড়যুক্ত শাড়ী ও রঙীন সিল্ক, মসলিন ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন। এছাড়া রঙীন চাঁদোয়া ও লেপের ব্যবহারও তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়েছিল।

০ ধাতুশিল্প ঃ সুলতানি আমলে বস্ত্রশিল্পের পরেই ছিল ধাতুশিল্পের স্থান। ধাতু-শিল্পীরা নানাধরনের ধাতু, যেমন—লোহা, ত:মা, রূপা, দস্তা ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। বিভিন্ন ধরনের সামরিক অস্ত্র ছাড়াও ছুরি, কাঁচি, গামলা, কাপ ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে তৈরি করা হত। মধ্যযুগের উন্নত ধাতুশিল্পের নিদর্শন হিসেবে দিল্লীর লৌহস্তম্ভ আজও বিজ্ঞানীদের বিস্ময় উদ্রেক

করে। লৌহ তরবারি ও ছোরা নির্মাণেও তৎকালীন শিল্পীদের দক্ষতা ছিল। দিল্লীর সুলতানেরা উৎকৃষ্ট ইস্পাত উৎপাদনের ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। ফকরুদ্দিন মোবারক শাহের মতে কাঠিন্যের দিক থেকে ভারতে প্রস্তুত তরবারি ছিল বিশ্বের সেরা। ভারতে প্রস্তুত নানাধরনের তরবারির মধ্যে 'মান-মোহর' নামক তরবারি ছিল সর্বোৎকৃষ্ট। তবে এর নির্মাণে বহু সময় ও অর্থ ব্যয় হত। তাই সুলতানদের অস্ত্রশালায় এই জাতীয় তরবারি বেশি থাকত না। চামড়া-শিল্পেও মধ্যযুগের শিল্পীরা দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন। তখন চামড়া থেকে ঘোড়ার জিন ও লাগাম, তরবারির খাপ, জুতো এবং অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় নানা দ্রব্য প্রস্তুত করা হত। সাধারণ কৃষকেরা চামড়া সেলাই করে জলবাহী পাত্র তৈরি করত। মধ্যযুগে পশুপাখির চিত্র সমন্বিত চামড়ার আসন চর্ম-শিল্পীদের দক্ষতার চূড়ান্ত নিদর্শন হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। গোরু, ছাগল, মহিষ, গণ্ডারের ছাল এবং অন্যান্য বন্য পশুর চামড়া সংগ্রহ করে শিল্পীরা কাজ করত। চর্ম শিল্পে সবথেকে অগ্রণী ছিল গুজরাট। এদের উৎপাদনের গুণগত উৎকর্ষ ছিল সর্বজন স্বীকৃত। মার্কোপোলো গুজরাটের সূক্ষ্ম কারুকার্য শোভিত চামড়ার মাদুরের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। প্রতি বছর গুজরাট থেকে চর্ম দ্রব্য আরব সহ নানাদেশে রপ্তানি করা হত। এছাড়া চিনি-শিল্প, কাগজ-শিল্প, প্রবাল, গজদন্ত ও অলংকার-শিল্পেও মধ্যযুগের শিল্পীদের দক্ষতা ছিল। স্বর্ণ শিল্পীদের দক্ষতা সম্পর্কে অনেকেই প্রশংসা করেছেন। সোনা-রূপার ফলমূল, অলংকার, মুকুট, কোমরবন্ধ ইত্যাদির সূক্ষ্ম কারুকার্য তৈমুর লঙ'কে এতটাই মুগ্ধ করেছিল যে, তিনি ভারতে গণহত্যা চালানোর সময় এই সকল কারুশিল্পীকে হত্যা করেননি। এদের অনেককেই তিনি বন্দী করে স্বদেশে নিয়ে গিয়েছিলেন। নিকলো কন্টি এবং সমকালীন লেখক খসরু 'শামি' নামক একপ্রকার কাগজের উপস্থিতি সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। খসরু উল্লেখ করেছেন যে, তখন অতি সাধারণ ও মসৃণ—দু'ধরনের কাগজ উৎপাদন হত। তবে মসৃণ বা রেশমী কাগজের উপাদান সম্পর্কে তিনি আলোকপাত করেননি। *অধ্যাপক আশরাফের* মতে, সম্ভবত 'ফেল্ট' থেকে তা তৈরি করা হত। খসরু দিল্লীতে পুস্তক-বিক্রেতার অবস্থানের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, সেকালে সাধারণ মানুষ কাগজের ব্যবহারে রপ্ত ছিলেন। সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, সুলতানি আমলে ভারতের নৌ-শিল্পেব ক্রমাবনতি ঘটেছিল। কিন্তু নিকলো কন্টি উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর দেশে প্রস্তুত নৌ-যানের থেকেও ভারতে বড় নৌ-যান প্রস্তুত হত। সুতরাং নৌ-শিল্পে তখন ভারত সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল একথা মানা যায় না। তবে নৌ-নির্মাণশিল্প কেন্দ্রীভূত ছিল প্রধানত পূর্ব-উপকূল অঞ্চলে।

○ কারিগরদের অবস্থা : সাধারণভাবে কারিগরশ্রেণীর অবস্থা ভাল ছিল না। কৃষকশ্রেণীর মত এরা সরাসরি জমি-মালিক দ্বারা হয়তো শোষিত হত না ; কিন্তু সার্বিকভাবে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত ছিল বলে কারিগরদের বৃত্তি কখনোই আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা জাগাতে পারত না। কামার, কুমোর. ছুতোর, ধোপা, ধাঙড় ইত্যাদি গ্রামীণ কারিগরশ্রেণী কৃষিজীবীদের মতই কোনক্রমে জীবনধারণের ন্যূনতম রসদ জোগাড় করেই সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হত। সরকারি কারখানায় নিযুক্ত শিল্পশ্রমিকদের অবস্থা তুলনামূলকভাবে ভাল ছিল। অন্যান্যদের অবস্থা গ্রামীণ কারিগরদের প্রায় সমতুল্য ছিল। অতি সাধারণ যন্ত্রপাতি নিয়ে এদের কাজ করতে হত। স্বভাবতই দ্রুত এবং উন্নতমানের উৎপাদন এদের ক্ষমতার বাইরে ছিল। তথাপি সহজাত দক্ষতা ও

আন্তরিকতার মাধ্যমে শিল্পী-কারিগররা যে উৎপাদন করত, তা বিদেশীদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে এই সকল ব্যক্তিগত বা পারিবারিক শিল্পে নিয়োজিত কারিগরদের উৎপাদন পদ্ধতির উন্নতিবিধান কিংবা আর্থিক নিরাপত্তার দিকে কোন নজর দেওয়া হত না। শিল্পসংঘগুলিও জাতিভেদ-প্রথার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। জাতিভিত্তিক এবং বংশগত উৎপাদন পদ্ধতি পরোক্ষে কারিগরি শিল্পের বিকাশের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করত। কারণ এই ব্যবস্থায় কোন একটি বিশেষ শিল্পের সৃষ্টি-তত্ত্ব ঐ বিশেষ গোষ্ঠী বা বংশের কাছে গোপন থেকে যেত। কোন কারণে ঐ গোষ্ঠী বা পরিবার শিল্পোৎপাদন থেকে আকস্মিক সরে গেলে ঐ শিল্পে অবলুপ্তি ঘটে যেত। বার্থেমা বর্ণিত 'বিশ্বের মহত্তম ও শ্রেষ্ঠ' ভারতীয় কারিগরশ্রেণী সমাজ বা সরকার থেকে উপযুক্ত সমর্থন ও সাহায্য না পেলেও জীবন ও জীবিকা সম্পর্কে খুব একটা অসন্তুষ্ট ছিল না।

○ বাণিজ্য ঃ

ইবন বতুতা এবং বারবোসার বিবরণ থেকে আমরা সুলতানি আমলের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য, উপকূল বাণিজ্য ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের বিস্তারিত বিবরণ জানতে পারি। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য চলত প্রধানত স্থলপথে। উপকূল-বাণিজ্য ও সমুদ্র-বাণিজ্য কিছুটা ব্যয়বহুল ও বিপজ্জনক ছিল। তথাপি সুলতানি আমলে সমৃদ্ধ উপকূল ও সমুদ্র বাণিজ্য চালু ছিল। কারণ এই বাণিজ্যে প্রভূত মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনা দেশী-বিদেশী বণিকদের এই কাজে প্রলুব্ধ করত। মধ্যযুগের বাণিজ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই যুক্ত ছিলেন। কোন কোন জাতিগোষ্ঠী অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে বিশেষ পরিচিত লাভ করেছিল। এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল গুজরাটের বেনে সম্প্রদায়, রাজস্থানের মারোয়াড়ী সম্প্রদায় এবং মুলতানিদের। মারোয়াড়ী ও গুজরাটীদের অনেকেই ছিলেন জৈনধর্মাবলম্বী। মুসলমান বোহ্‌রা বণিকেরাও এই ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশ নিতেন। মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার সাথে ভারতের স্থলপথ-বাণিজ্যে মুলতানি, খোরাসানি ও পারসিকদের আধিপত্য ছিল। মুলতানি বণিকদের অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু এবং খোরাসানিরা ছিলেন মুসলমান। 'বান্‌জারা' নামক একদল যাযাবর ব্যবসায়ীগোষ্ঠী অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিত। এরা ছিল অনেকটা ইউরোপীয় 'জিপ্‌সী'দের মত। এরা চাষীদের কাছ থেকে পণ্য সংগ্রহ করে নানা বাণিজ্য-কেন্দ্রে ঘুরে ঘুরে তা বিক্রি করত। অনেক সময় কোন ব্যবসায়ীর সংগৃহীত পণ্য এরা মালবাহী পশুর পিঠে চড়িয়ে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দিত। পথিমধ্যে স্থাপিত সরাইখানাগুলি স্থানীয় বাণিজ্যকেন্দ্র রূপে ব্যবহৃত হত। অনেক সময় দু'দল ব্যবসায়ীর মধ্যে পণ্য আদান-প্রদান হত সরাইখানাতেই। দেশের অভ্যন্তরে ও উপকূলবর্তী বাণিজ্যে একদল সংগঠিত দালাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। এই দালালশ্রেণী ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের কাছ থেকেই 'দস্তুরি' (মধ্যস্থতাবাবদ কমিশন) আদায় করত। ফলে জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি ঘটত। সুলতান আলাউদ্দিন খলজী এই মধ্যবর্তী শ্রেণীর অবস্থানজনিত বিপদ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাই তিনি কঠোর হাতে এদের নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন। কিন্তু ফিরোজ তুঘলকের আমলে এদের দাপট আবার বেড়েছিল। সুলতানি আমলের বাণিজ্যে সুদখোর মহাজনশ্রেণীরও বিশেষ ভূমিকা ছিল। 'সাহু' ও 'মহাজন' নামক অর্থলগ্নীর কারবারীরা চড়া সুদের বিনিময়ে ব্যবসায়ীদের টাকা

ধার দিতেন। 'হুণ্ডি' বা 'তমসুক' নামক জামিনপত্র (Security Bond) রেখে অর্থ লেনদেন হত। আমীর খসরুর মতে টাকার পরিমাণ অনুসারে বার্ষিক ১০ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশ টংকা সুদ হিসেবে দিতে হত। সুদের হার নির্ধারণ ও এই সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য যথাযথ নিয়মবিধি ও বিচারবিভাগ সক্রিয় ছিল।

সমুদ্র-বাণিজ্যে ভারতীয় বণিকদের পাশাপাশি ছিল বিদেশী বণিকগণ। ষোড়শ শতকে বহিরাগত ভারতীয় মুসলমান এবং বিদেশী মুসলমান বণিকেরা সামুদ্রিক-বাণিজ্যে আধিপত্য স্থাপনে সক্ষম হয়েছিলেন। ইবন বতুতা উল্লেখ করেছেন যে, ভারতের বাণিজ্যকেন্দ্রগুলিতে বহু বিদেশী বণিক বসবাস করতেন। রপ্তানি-বাণিজ্য লাভজনক হওয়ার কারণে কোন কোন বিদেশী ভারতীয় মেয়েকে বিবাহ করে এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যেতে পারতেন। ইবন বতুতা স্বয়ং মালদ্বীপে চারটি বিবাহ করেছিলেন। সাধারণভাবে বণিকদের নৈতিকতা কখনোই খুব উচ্চস্তরের ছিল না। বিশেষ করে অভ্যন্তরীণ স্থলবাণিজ্যে ব্যবসায়ীদের প্রধান লক্ষ্য ছিল যত বেশি সম্ভব মুনাফা অর্জন করা। ***অধ্যাপক আশরাফ*** লিখেছেন ঃ "*ব্যবসায়ীরা অর্থ উপার্জনের জন্য যে-কোন অসাধু উপায় অবলম্বন করতে দ্বিধা করত না।... কোন নীতিবাক্যের সাধ্য ছিল না এদের স্বভাব শোধরায়।*" সম্ভবত, এই কারণে ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আলাউদ্দিন খলজীকে কঠোরতর একাধিক 'জাওবিৎ' জারী করতে হয়েছিল। কিন্তু সামুদ্রিক বাণিজ্যে নিয়োজিত বণিকদের ক্ষেত্রে ন্যায়-নীতির অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যেত। বিদেশী পর্যটকদের প্রায় সবাই নৌ-বাণিজ্যে লিপ্ত বণিকদের উন্নত নৈতিকমানের প্রশংসা করেছেন। ড. ***রোমিলা থাপার*** মনে করেন, "*সেকালে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সততার মান খুব উন্নত ছিল।*"

অভ্যন্তরীণ স্থলপথ-বাণিজ্যের সহায়ক হয়েছিল সুপ্রশস্ত রাজপথ। পেশোয়ার থেকে সোনারগাঁও পর্যন্ত একটি রাজপথ ছিল। মহম্মদ-বিন্-তুঘলক দিল্লী থেকে দৌলতাবাদ পর্যন্ত একটি রাজপথ নির্মাণ করেছিলেন। পায়ে হেঁটে এই পথ অতিক্রম করতে লাগত চল্লিশ দিন। দৌলতাবাদ থেকে এই রাজপথ সম্প্রসারিত হয়েছিল তেলেঙ্গানা এবং মাবার পর্যন্ত। সাধারণভাবে তখন পথঘাট দস্যু-তস্করের উপদ্রবে বিপজ্জনক ছিল। তবে রাজপথগুলিতে যাত্রীদের নিরাপত্তা ও বিশ্রামের জন্য বহু সরাইখানা থাকত। এগুলি বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে গুরুত্ব পেত। বাণিজ্য-কেন্দ্র হিসেবে রাজধানী দিল্লী ছিল খুবই জমজমাট। ইবন বতুতার মতে, দিল্লী শুধু ভারতের নয়, সারা মুসলিম দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ শহর ছিল। ***ইউ. এন. ঘোষালের*** মতে, দিল্লীতে সারাদেশ থেকে ভাল ভাল পণ্য আমদানি করা হত। সারসুতের সরু চাউল, কনৌজের চিনি, মাড়-এর গম, ধর-এর পান ইত্যাদির প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল দিল্লী। বহু রাষ্ট্রীয় কারখানা দিল্লীতে ছিল। বারবোসার বিবরণ অনুযায়ী খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকে গুজরাটের লিমোদরা শহর, রন্দের বন্দর, দাক্ষিণাত্যের ভাটকল বন্দর, গোয়াবন্দর এবং পুলিকট ইত্যাদি অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে গরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত।

তবে সেকালেও ব্যবসার প্রধান আকর্ষণ ছিল বৈদেশিক বাণিজ্য এবং এই বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্রগুলি ছিল উপকূল অঞ্চলে। ইবন বতুতা ও বারবোসার বিবরণ থেকে জানা যায় যে, দেশের পশ্চিম উপকূলে বহু ব্যস্ত বন্দরের অস্তিত্ব ছিল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো দিউ (গুজরাট), গোয়া (দাক্ষিণাত্য), কালিকট, কোচিন, কুইলন (মালাবার) ইত্যাদি। দাক্ষিণাত্যের উপকূল-

বাণিজ্যে গুজরাটী ও মালাবারী ব্যবসায়ীরা সমানভাবে অংশ নিত। গুজরাটীরা প্রধানত সিল্ক, সূতীবস্ত্র, আফিং, গম ইত্যাদি আমদানি করতেন এবং তুলা ও ক্ষৌমবস্ত্র রপ্তানি করতেন। অন্যদিকে মালাবারী বণিকেরা নানারকমের মশলা, ঔষধ, নারকেল, তালমিছরি, মোম, তামা ইত্যাদি আমদানি করতেন এবং রপ্তানি করতেন সূতীবস্ত্র, চাল, গম, মসলিন ইত্যাদি। প্রতিবেশী উপকূল-রাষ্ট্র সিংহলের বাণিজ্যেও ভারতীয় বণিকদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ঘটত। করমণ্ডল উপকূল, মালাবার অঞ্চল, বিজয়নগর, গুজরাট প্রভৃতি স্থানের বণিকদের সিংহলের রাজধানী কলম্বো শহরে যাতায়াত ছিল। করমণ্ডল ও বিজয়নগরের উপকূল-বাণিজ্যে মালাবার অঞ্চলের হিন্দু ও মুসলিম বণিকরা অংশগ্রহণ করতেন। এখানে দুর্ভিক্ষের সময়ে শিশু-পুত্র-কন্যাদের ক্রীতদাস হিসেবে ক্রয়-বিক্রয়ের ঘটনাও ঘটত। মুসলিম বণিকেরা বাংলাদেশের মসলিনবস্ত্র সংগ্রহ করে নিজ নিজ জাহাজে মালাবার, ক্যাম্বে ও অন্যান্য কেন্দ্রে প্রেরণ করতেন।

আগের মতই সুলতানি আমলে ব্যাপক সামুদ্রিক বাণিজ্য চলত। সামুদ্রিক বাণিজ্য পথেরও বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। পূর্বে প্রচলিত দুটি সমুদ্রপথ মধ্যযুগেও ব্যবহৃত হত। একটি পথে পশ্চিম ভারতীয় উপকূল থেকে পারস্য উপসাগর হয়ে মেসোপটেমিয়ার মধ্য দিয়ে ভূমধ্যসাগরে যাওয়া যেত। এবং অন্যটি ছিল লোহিত সাগর এবং মিশরের মধ্য দিয়ে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত। সেখান থেকে ভেনেসীয় ও অন্যান্য ইতালীয় বণিকদের মাধ্যমে পশ্চিম-ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ত। প্রথম পথটি ধরে ওরমুজ বন্দরে এবং দ্বিতীয় পথ ধরে এডেন ও জেড্ডাবন্দরে ভারতীয় জাহাজগুলি উপস্থিত হত এবং মাল খালাস করত। এডেন বন্দরে ভারতীয় বণিকদের একটি উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। পার্শ্ববর্তী বন্দর ঝাকর (বা ডোকার)-এও কিছু ভারতীয় জাহাজ চাউল ও তুলা নিয়ে আসত। এখান থেকে ঐ জাহাজগুলি ঘোড়া নিয়ে স্বদেশে ফিরে যেত। পশ্চিম ইউরোপের সাথে ভারতের লাভজনক সামুদ্রিক-বাণিজ্যের কথা বারবোসার বিবরণ থেকেও জানা যায়। ষোড়শ শতকে ভারতের দিউ, চাউল, দাভোল, গোয়া, ভাটকল, কালিকট ও অন্যান্য বন্দর থেকে জিড্ডা, এডেন, ওরমুজ প্রভৃতি বন্দরের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক লেনদেন চলত। ভারতে আমদানি দ্রব্যের মধ্যে প্রধান ছিল ধনী ব্যক্তিদের জন্য হরেক বিলাস সামগ্রী এবং সামরিক ও বেসামরিক কাজে ব্যবহারের জন্য উন্নতমানের ঘোড়া ও অন্যান্য পশু। আলেকজান্দ্রিয়া, চীনদেশ ও ইরাক থেকে মহামূল্যবান রেশমী মখমল, নক্সাদার পর্দার কাপড় ও গৃহসজ্জার বিবিধ উপকরণ আমদানি করা হত। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ আমদানি দ্রব্য ছিল উন্নতমানের ঘোড়া। স্থলপথে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়েও কিছু ঘোড়া ভারতে আসত। তবে জলপথেই ঘোড়া আমদানি হত বেশি। এ ব্যপারে বেশি ব্যবহৃত গোয়াবন্দর। ইরাক, ইরান, তুর্কিস্তান, বল্ক, ভূটান থেকে নানাজাতের ঘোড়া হরমুজ ও এডেন হয়ে এদেশে আসত। মুসলমান শাসকদের পাশাপাশি হিন্দু-ভারতীয় রাজারাও যুদ্ধের কাজে ঘোড়ার উপযোগিতা উপলব্ধি করলে ঘোড়ার চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। রাজপুতানা ও দাক্ষিণাত্যে উন্নতমানের অশ্ব উৎপাদন সম্ভব হত না। কারণ ঐ স্থানের জলবায়ু অশ্বপালনের পক্ষে যথেষ্ট উপযোগী ছিল না। তাই ঐ অঞ্চলে ঘোড়া আমদানির বিশেষ চাহিদা ছিল। এছাড়া আমদানি-দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল খেজুর, কিসমিস, লবণ, প্রবাল, সিসা, সিন্দুর, সোনা, রূপা, পারদ, ফটকিরি, কর্পূর, জাফরান, একপ্রকার লাল রং ইত্যাদি। ভারতে আমদানিকৃত দ্রব্যাদির মধ্যে গোলাপজল, ধুনা এবং ঘোড়া ছিল প্রধানত আরবদেশীয় সামগ্রী। অন্যান্য জিনিসের যোগানদার ছিল

ইউরোপীয় দেশগুলি। ভারত থেকে রপ্তানি-দ্রব্যের মধ্যে ছিল সূতীবস্ত্র, মসলিন, চন্দনকাঠ, চাউল, নীল, নারকেল, চিনি, মোম, লোহা, দামী পাথর, গোলমরিচ ইত্যাদি। ইবন বতুতা বলেছেন, পারস্য উপসাগরবর্তী কোন কোন দেশ যেমন—কলহট, ইয়েমেন প্রভৃতি তাদের মূল খাদ্য যোগানের জন্য ভারতের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করত। *বারবোসা* লিখেছেন যে, সূতী ও অন্যান্য বস্ত্রই ভারতের প্রধান রপ্তানি দ্রব্য। পারস্য উপসাগরীয় দেশগুলি ও মালয় দ্বীপপুঞ্জে বোরখা বানানোর জন্য ভারত থেকে প্রচুর সূতী, মসলিন কাপড় রপ্তানি হত। গুজরাট থেকে রপ্তানি হত সূতী কাপড়, মসলিন ও রেশমী ছাপা কাপড়। *নিকিতন*-এর বিবরণে গুজরাট থেকে বিদেশে কম্বল রপ্তানির কথা বলা হয়েছে। বাংলা ও গুজরাটে বন্দরগুলির মাধ্যমেই ভারতের মূল রপ্তানি বাণিজ্য পরিচালিত হত।

চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে পূর্ব আফ্রিকার সাথে ভারতের বাণিজ্য-সম্পর্কের তথ্য ইবনবতুতা ও বারবোসার বিবরণ থেকে জানা যায়। আফ্রিকার উপকূল অঞ্চলে আরবীয় উপনিবেশ স্থাপিত হলে এবং চীনা দূত চেঙ-হো'র উদ্যোগে ঐসব অঞ্চলের সাথে ভারতীয় বণিকদের যোগসূত্র স্থাপিত হয়। ষোড়শ শতকে আফ্রিকার সাথে ভারতের ব্যাপক বাণিজ্য-সম্পর্কের নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় বারবোসার বিবরণ থেকে। ঐ সময় ক্যাম্বে থেকে ভারতীয় বস্ত্র ও মশলা বোঝাই জাহাজ আফ্রিকার মাকদাসাউ উপকূলে ভিড়ত। সেখান থেকে ঐসব জাহাজ দেশে ফিরত সোনা, গজদন্ত ও মোম বোঝাই করে। গুজরাটী বণিকেরা ক্যাম্বে থেকে বস্ত্র ও রুদ্রাক্ষ বোঝাই জাহাজ নিয়ে উপস্থিত হতেন আফ্রিকার মেলিন্দে, মোম্বাসা ও কিলোয়া বন্দরে। সেখান থেকে স্থানীয় মুসলমান বণিকেরা ঐ পণ্যসম্ভার আরো দক্ষিণে চালান দিত। ফেরার পথে ভারতীয় জাহাজগুলি সোনা ও গজদন্ত নিয়ে আসত।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সাথে ভারতের বাণিজ্য-সম্পর্কের ধারা খুবই পুরানো। সুলতানি আমলেও সেই ধারা অব্যাহত ছিল। চতুর্দশ শতকের গোড়া থেকেই চীনা জাহাজগুলি ভারতের দক্ষিণ উপকূলের বন্দরগুলিতে যাতায়াত করত। চীনা সম্রাট ইউং-লো'র উদ্যোগে এই বাণিজ্য দ্রুত বৃদ্ধি লাভ করেছিল। চীনা লেখকদের বিবরণী থেকেও চীন-ভারত বাণিজ্যের ব্যাপকতার কথা জানা যায়। এই পর্বে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৃহত্তম ও ব্যস্ততম বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল মালাক্কা। মালাক্কার পরেই ছিল পেগু'র স্থান। এই স্বাধীন মুসলিম রাজ্যটিতে ভারতীয়-সহ বহু বিদেশী বণিক বসবাস করতেন। বাংলাদেশ, পুলিকট, করমণ্ডল, মালাবার, গুজরাট প্রভৃতি ভারতীয় বন্দর থেকে প্রতিবছর বহু মালবোঝাই জাহাজ এখানে আসত। ভারত থেকে রপ্তানি-দ্রব্যের মধ্যে ছিল মরিচ, রুদ্রাক্ষ, ধূপ, জাফরান, প্রবাল, রঙিন ও সাদা বস্ত্র, সিন্দুর ইত্যাদি। এই দ্রব্য এখান থেকে চালান দেওয়া হত জাভা, সুমাত্রা, তিমোর, বোর্নিও, বান্দা, ইত্যাদি অঞ্চলে। ফেরার পথে জাহাজগুলি নিয়ে আসত শ্বেত-চন্দন, সোনা, লবঙ্গ, জৈত্রী, জায়ফল, কর্পূর, ঘৃতকুমারী ইত্যাদি। পূর্ব-এশীয় বাণিজ্যে ভারতীয় বণিকেরা সরাসরি সুরাট এবং বাংলাদেশ থেকে পেগু, তেনাসেরিম, সুমাত্রা ও মালাক্কাতে যাতায়াত করতেন।

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে হিন্দু বণিকদের তুলনায় বিদেশী 'মুর' মুসলমান বণিকদের আধিপত্য ছিল অনেক বেশি। ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্য বেশ কিছুকাল এদের কুক্ষিগত ছিল। ***বার্থেমা*** লিখেছেন ঃ "*The Pagans (hindu) do not nevigate much,*

but it is the Moors who carry the merchandise.". আরবীয় ও পারসিক বণিকদের সাথে প্রতিযোগিতা করে এরা সামুদ্রিক বাণিজ্যে টিকে থাকতে সক্ষম হয়েছিল। পর্তুগীজদের আধিপত্য বিস্তারের আগে পর্যন্ত মুসলমান বণিকদের এই আধিপত্য অব্যাহত ছিল। মুসলিম বণিকদের এই বাণিজ্যিক কর্তৃত্ব বিশেষ করে লক্ষণীয় ছিল পশ্চিম এশিয়া ও পূর্ব আফ্রিকার সাথে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে। ইবন বতুতার বিবরণ থেকে জানা যায় যে, তৎকালীন ভারতের প্রধানতম বাণিজ্যকেন্দ্র ক্যাম্বেতে বিদেশী মুসলমানদের সংখ্যাই ছিল সর্বাধিক। এই সকল বহিরাগত বা বিদেশী মুসলমান বণিক ছিল খুবই সম্পদশালী এবং বৃহৎ জাহাজের মালিক। হিন্দু-বণিকেরা প্রধানত অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে লিপ্ত থাকতেন। ***বারবোসা*** উল্লেখ করেছেন যে, গুজরাটী বণিকরা (বেনে) বা দক্ষিণী ও মালাবারী হিন্দু-বণিকেরা প্রধানত দেশের অভ্যন্তর থেকে পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করে উপকূলবর্তী বন্দরে বিদেশী বণিকদের বিক্রি করার কাজে লিপ্ত ছিলেন। প্রায় অর্ধশতক আগে ভারতে আগত চীনা পর্যটক মা-হুয়ানও কোচিন ও কালিকটের 'চেট্টী' সম্প্রদায়ভুক্ত বণিকদের বাণিজ্যধারা সম্পর্কে একই কথা লিখেছেন। মালাবারের 'মোপলা' বণিকেরা অবশ্য উপকূল-বাণিজ্যে কিছুটা কর্তৃত্ব করতেন। তাছাড়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সাথে বাণিজ্যে মুসলমানদের পাশাপাশি হিন্দুরাও কর্তৃত্ব ভাগাভাগি করে নিতে পেরেছিলেন। মালাক্কাতে বহু সমৃদ্ধশালী হিন্দু-বণিক যে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন, একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। মুসলমান শাসকদের সমর্থন ও সহানুভূতির জন্যই যে মুসলমান বণিকদের আধিপত্য বৃদ্ধি পেয়েছিল, তা নয়। দেখা গেছে তৎকালীন হিন্দু রাজা-শাসিত রাজ্যেও মুসলমান বণিকদের ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য নানারকম সরকারি সাহায্য দেওয়া হত এবং তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হত। মালাবার, কালিকট, কুইলম, বিজয়নগর ইত্যাদি হিন্দুরাজাশাসিত অঞ্চলে মুসলিম বণিকদের জন্য সরকারি সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির একাধিক দৃষ্টান্ত ইবন বতুতার বিবরণে লিপিবদ্ধ আছে।

○ সুলতানি যুগে মুদ্রা ব্যবস্থা :

সুলতানি যুগে মুদ্রা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন ঘটে। তুর্কী শাসনের আগে ভারতীয় মুদ্রার একপাশে রাজা বা রাজার মস্তিষ্কের ছবি এবং অন্যপাশে দেব-দেবী, পশু-পাখি ইত্যাদির খোদিত অলংকরণ করা থাকত। প্রাচীন ভারতে রোমান মুদ্রার সাথে তাল রেখে ভারতীয় মুদ্রার ওজন নির্ধারিত হত। সাধারণভাবে ১২৪ গ্রেন, ১৪৫.১ গ্রেন, ১৪৬.৪ গ্রেন ইত্যাদি ওজনের মুদ্রা চালু ছিল। কোন কোন মুদ্রায় প্রবর্তকের নাম, উপাধি ও তারিখ খোদাই করা হত। দিল্লীতে তুর্কী শাসন প্রতিষ্ঠার পর ভারতীয় মুদ্রার ধারায় ব্যাপক পরিবর্তন আসে। ইসলাম ধর্মের রীতি মান্য করে মুদ্রায় দেব-দেবী বা মানুষের মূর্তি বা পশু-পাখির ছবি খোদাই করা নিষিদ্ধ হয়। পরিবর্তে লোককথা বা নীতিবাক্য খোদাই করার রীতি চালু হয়। সাধারণত ইসলামের ধর্মীয় বাণী 'কলিমা' ও খলিফার নামে একপাশে উৎকীর্ণ করা হত এবং অপর পার্শ্বে সুলতানের নাম, উপাধি ও খোদাই করার তারিখ উৎকীর্ণ থাকত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মুসলিম শাসন শুরুর পূর্বে ভারতে মুদ্রার উপর তার টাকশালের স্থান খোদাই করার রীতি ছিল না। মুদ্রার ওজন ও মানের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আসে। মুদ্রামান হিসেবে 'তোলা'র প্রচলন হয়। স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা-উভয়ক্ষেত্রে নানা 'একক'-এর প্রচলন করা হয়। অর্থাৎ তুর্কো-আফগান শাসনকালে ভারতীয় মুদ্রা ব্যবস্থার প্রকৃতি গঠনে

মধ্য-এশিয়ার মুদ্রা ব্যবস্থার বিশেষ প্রভাব ছিল। অবশ্য সামান্য আকারে হলেও প্রাচীন ভারতে প্রচলিত মুদ্রা ব্যবস্থার কাছে সুলতানি ও মুঘলযুগের মুদ্রা ব্যবস্থা ঋণী ছিল। আদি-মধ্যযুগের মুসলমান শাসকদের মুদ্রার প্রাচীন ভারতীয় রীতির কিছু প্রভাব দেখা যায়। যেমন, গজনীর সুলতান মামুদ ১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দে (হিজরী সন ৪১৮ - ১৯) যে মুদ্রা চালু করেন তাতে হিন্দু প্রভাব স্পষ্ট। এই মুদ্রায় প্রথম পিঠে আরবী শব্দে 'কলিমা' খোদাই করা ছিল। এবং অন্য পিঠে কলিমার সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদসহ রাজার নাম (মামুদ), খোদাই স্থান (মামুদপুর অর্থাৎ লাহোর) এবং খোদাই করার সন (হিজরী ৪১৮ - ১৯) ইত্যাদি উৎকীর্ণ করা ছিল। সম্ভবত, এটিই একমাত্র মুদ্রা যেখানে 'কলিমা'র সংস্কৃত অনুবাদ পাওয়া যায়। মহম্মদ ঘুরীর কিছু মুদ্রায় রাজপুত রীতি অনুসারে দেবী লক্ষ্মীর খোদিত মূর্তি লক্ষ্য করা যায়। আদি-মধ্যযুগে প্রধানত তামা ও ব্রোঞ্জের মুদ্রা চালু ছিল। রৌপ্যমুদ্রা ছিল নগণ্য এবং স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন ছিলই না।

সুলতানি আমলে মধ্য এশিয়ার সাথে ভারতের বাণিজ্যসম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হলে এদেশে আবার রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন ঘটে। এই সময় রৌপ্যটংকার প্রবর্তন করেন সুলতান ইলতুৎমিস। তিনি নানাধরনের রৌপ্যটংকা চালু করেন। একটি টংকার আকার ছিল গোল এবং সম্মুখভাগে ছিল অশ্বরূঢ় রাজা'র, যা হিন্দুযুগের মুদ্রা থেকে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিপরীত দিকের কাজটি ছিল স্বতন্ত্র। এখানে একটি চতুষ্কোণের মধ্যে আরবী শব্দে খোদিত ছিল 'সর্বশক্তিমান সুলতান, বিশ্বের আলোক ও বিশ্বাসের উৎস, বিজয়ীদের নেতৃস্বরূপ, সুলতান ইলতুৎমিস'। এই মুদ্রার ওজন ছিল ১৬৫ গ্রেন। ১২২৮ খ্রীষ্টাব্দে বাগদাদের খলিফার কাছ থেকে স্বীকৃতি লাভের পর তিনি আর এক ধরনের মুদ্রা চালু করেন যা ইসলামিক ঐতিহ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই মুদ্রা সম্পূর্ণরূপে হিন্দু-প্রভাব রহিত। এর একদিকে মহান খলিফা ও অন্যদিকে সুলতান ইলতুৎমিসের গুণকীর্তন করা হয়েছে। আলাউদ্দিন খলজীর আমলে রৌপ্যমুদ্রায় খলিফার নাম খোদাই বন্ধ হয়ে যায়। তবে দক্ষিণ ভারত জয়ের সূত্রে তিনি বিপুল সম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন। তাই তিনি স্বর্ণমুদ্রারও প্রচলন করেন। অবশ্য তিনি পরোক্ষভাবে খলিফাকে সম্মান জানান। তাঁর মুদ্রায় উৎকীর্ণ একটি বাণী ছিল এরূপ "দ্বিতীয় আলেকজান্ডার, খলিফার দক্ষিণ হস্ত এবং বিশ্বাসীদের প্রধান সেনাপতি।" আলাউদ্দিনের উত্তরাধিকারী কুতুবউদ্দিন মুবারক আরও একধাপ এগিয়ে নিজ মুদ্রায় সুলতানকেই 'ইসলামের সর্বোচ্চ নেতা', 'স্বর্গ ও মর্ত্যের খলিফা', 'ঈশ্বরের প্রতিনিধি (খলিফা)' এবং 'প্রধান ইমাম' ইত্যাদি উপাধিতে বর্ণনা করেন।

সুলতানি আমলে রৌপ্য ও স্বর্ণমুদ্রার পাশাপাশি রূপা ও তামার সংমিশ্রণে নতুন মুদ্রার (Billion) প্রচলন হয়। সাধারণভাবে এই মুদ্রার ওজন ছিল ৫৬ গ্রেইন। তবে মুদ্রায় রূপা ও তামার অনুপাত অনুসারে মুল্যের তারতম্য ঘটত। এই মুদ্রার আকৃতি ও ওজন ছিল প্রায় একইরকম। 'দেহলিওয়ালা' নামক মুদ্রার একদিকে চৌহান বংশীয় মুদ্রার অনুকরণে 'অশ্বারূঢ় ব্যক্তি' এবং অন্যদিকে কুঁজবিশিষ্ট বৃক্ষের প্রতিকৃতি এবং 'নাগরী' অক্ষরে সুলতানের নাম খোদাই করা থাকত। কোন কোন ক্ষেত্রে আরবী হরফ ব্যবহৃত হত। সুলতান রাজিয়ার একটি স্বর্ণ মুদ্রার একপৃষ্ঠে এক অশ্বারূঢ় ব্যক্তিকে ঘিরে নাগরী রীতিতে লেখা ছিল 'শ্রী হামির' (আমীর) এবং অন্যপৃষ্ঠে আরবীতে রাজিয়ার নাম খোদিত ছিল। এর ওজন ছিল ৫৪ গ্রেইন। বলবন ৫৫ গ্রেইন যুক্ত মুদ্রা চালু করেন। এর একদিকে মাঝখানে গোলাকারে সুলতানের নাম খোদিত ছিল।

অন্যদিকে সুলতানের নাম ও উপাধি খোদিত থাকে। কুতুবউদ্দিন মুবারক শাহ চতুষ্কোণ বিশিষ্ট মুদ্রা প্রচলন করেন। এর একদিকে 'ঘটশ্বরের খলিফা, মুবারক শাহ এবং অন্যদিকে 'আল্লাহর অনুগত সুলতান, বিশ্বাসীদের নেতা' খোদিত ছিল। এই মুদ্রার ওজন ছিল ৮০ গ্রেইন। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, আলাউদ্দিন খলজীই সর্বপ্রথম প্রকাশের তারিখসহ বিলিয়ন মুদ্রা চালু করেন। ইলবেরী তুর্কীদের তাম্র মুদ্রায় সুলতানের নাম থাকলেও তারিখ দেওয়া হত না। কিছু মুদ্রায় কেবল 'আদিল' কথাটি থাকত।

মুদ্রা-বৈচিত্র্যের দিক থেকে সর্বাধিক আকর্ষণীয় ছিল মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের আমল। তাঁর মুদ্রার আকৃতি ও খোদাই কর্ম ছিল খুবই উন্নতমানের। বিভিন্নমানের বহু স্বর্ণমুদ্রা তিনি চালু করেন। মুদ্রা ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য তাঁর নাম ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে। শাসনকালের সূচনায় তিনি প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ১৭২.৮ গ্রেইন-এর স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা চালু রাখেন। দক্ষিণ ভারত অভিযানের সূত্রে উত্তর ভারতে সোনা-রূপার অন্তঃপ্রবাহের প্রতিক্রিয়ায় মুদ্রার মূল্যমান হ্রাস হলে তিনি রাজাদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সোনা ও রূপার মুদ্রার ওজন কমিয়ে ২০১.৬ ও ১৪৪ গ্রেইন করে দেন। স্বর্ণমুদ্রা 'দিনার' ও রৌপ্যমুদ্রা 'আদলি' নামে পরিচিত হয়। অবশ্য নির্ধারিত ওজনের কমেও কিছু কিছু মুদ্রা পাওয়া যায়। ৭২৬ হিজরী সনের একটি স্বর্ণ মুদ্রার ওজন ছিল ১৯৯ গ্রেইন। মহম্মদ তুঘলকের আমলে প্রায় ছয় ধরনের স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা চালু ছিল। রৌপ্য ও তামা মিশ্রিত (Billion) মুদ্রার পরিবর্তে তামা ও পেতলের (Copper and Bronz) মুদ্রা প্রচলনের প্রয়াস। আনুমানিক ১৩২৯ থেকে ১৩৩২ খ্রীষ্টাব্দের (হিজরী সন ৭৩০ - ৭৩২) অন্তর্বর্তীকালে তাঁর প্রতীকি মুদ্রা চালু ছিল। কিন্তু এমন স্বল্পমূল্যের ধাতু নির্মিত প্রতীক মুদ্রা ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত নানা কারণে ব্যর্থ হয়ে যায় (বিস্তারিত আলোচনা 'মহম্মদ তুঘলকের পরিকল্পনার শীর্ষক অংশে আছে)।

ফিরোজ তুঘলকের মুদ্রায় বিশেষ নতুনত্ব ছিল না। তবে খলিফার প্রতি অতিরিক্ত আনুগত্য হেতু তাঁর আমলের মুদ্রার একপিঠে খলিফাদের নামোল্লেখ থাকত এবং অন্যপিঠে খলিফার সেবক হিসেবে সুলতানের নাম খোদাই করা থাকত। তাঁর (Billion) মুদ্রার ওজন ছিল ১৪৪ গ্রেইন। ফিরোজের পরবর্তীকালে ভারতে সোনা-রূপার আমদানি হ্রাস পেলে শুধুমাত্র তামা ও রূপার Billion কিংবা তামার মুদ্রা চালু থাকে। লোদী সুলতানদের মুদ্রায় জৌনপুরের শার্কীশাসকদের মুদ্রা ব্যবস্থার বিশেষ প্রভাব ছিল। 'বহুমুখী' মুদ্রার ওজন ছিল ১৪৫ গ্রেইন। দিল্লী ও জৌনপুর থেকে তাঁদের মুদ্রা প্রচলিত হত।

○ সামাজিক অবস্থা ঃ

ত্রয়োদশ শতকে ভারতীয় সমাজের মূল জনগোষ্ঠীতে প্রাথমিকভাবে দু'টি প্রধান সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল—হিন্দু এবং মুসলমান। হিন্দুসমাজ ও জনগোষ্ঠীর একক ও প্রবল অস্তিত্বের মাঝে মুসলমানদের আগমন ও প্রতিষ্ঠা ভারতের সমাজজীবনে একটা উত্তেজনাকর অধ্যায়ের সূচনা করে। ত্রয়োদশ শতক থেকে চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি ভাগ পর্যন্ত সময়ে ভারতীয় জীবনে এই দুটি স্বতন্ত্র এবং বহুলাংশে পরস্পরবিরোধী জীবনধারা ও সামাজিক-ব্যবস্থার সংঘাত অব্যাহত থাকে। একদিকে পুরাতন হিন্দু সমাজব্যবস্থার অস্তিত্ব রক্ষার রূঢ় ও দৃঢ় প্রয়াস এবং অন্যদিকে

নবাগত ইসলাম সংস্কৃতির সামাজিক ভিত্তি পাওয়ার ঐকান্তিক প্রয়াস ভারতের সামাজিক ক্ষেত্রে এক দীর্ঘ ও বৈচিত্র্যময় অস্থিরতার সূচনা করে। হিন্দুদের প্রধান শক্তি ছিল তার সুদীর্ঘ ঐতিহ্য ও কঠোর সামাজিক শৃঙ্খলা। অন্যদিকে নবাগত ইসলামের প্রধান শক্তি ছিল তার ধর্মভিত্তিক আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন দর্শন এবং সাম্য ভাবনা। ইতিপূর্বে শক্, কুষাণ প্রভৃতি বহু বিদেশী শক্তি ভারতে প্রবেশ করলেও সামাজিক ক্ষেত্রে কোন অস্থিরতা ছিল না। কারণ ঐ সকল শক্তি বা জাতি কোনরূপ সংগঠিত জীবনধারা বা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়ে এদেশে আসেনি। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই তারা ভারতীয় জীবনধারা ও সংস্কৃতির সাথে একীভূত হতে পেরেছিল। কিন্তু ইসলাম এসেছিল একটি সুসংবদ্ধ ও পরীক্ষিত জীবনধারা উত্তরাধিকার হিসেবে। স্বভাবতই সামাজিক ক্ষেত্রে স্বাঙ্গীকরণের সম্ভাবনা ছিল কম এবং সংঘাত ছিল অনিবার্য। অবশ্য ঈশ্বরের (বা প্রকৃতির) শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানবকুল শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতির অনিবার্যতাকে মেনে নিতে ভুল করেনি। তাই চতুর্দশ শতকে সামাজিক উত্তেজনা ও অস্থিরতার দাপট অনেকটাই শিথিল হয়ে গিয়েছিল।

হিন্দু সমাজের ভিত্তি ছিল তার ঐতিহ্যের গৌরব ও কঠোর সামাজিক বিন্যাস। কিন্তু অসার, অবাস্তব ও জীবনবিমুখ হিন্দু সমাজব্যবস্থার অন্তর্নিহিত অবক্ষয়ী প্রক্রিয়া পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দ্রুত ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছিল। জাতিভেদ, বর্ণভেদের কাঁটায় ক্ষত সমাজ-[illegible] রক্তপাত ও তার যন্ত্রণা তথাকথিত ব্রাহ্মণ সমাজপতিদের দৃষ্টিশক্তি ও হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারেনি। সেই মূক সমাজ-যন্ত্রণা ইসলামের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার ফলে সৃষ্ট পরিবর্তিত স্থিতিতে মুক্তির পথ খুঁজে নিতে প্রয়াসী হয়ে ওঠে। শাসকশ্রেণী রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অধীনে এসে নিশ্চিত নিরাপত্তার আশায় কিছু মানুষ ধর্মান্তরিত হয়। আবার অনেকে আকৃষ্ট হয় ইসলামের সামাজিক সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বের আদর্শে। হিন্দু-সমাজের উপর এই দুটি ধারারই পরিণাম এক হলেও ; এই দুটি ধারণার সামাজিক তাৎপর্য ছিল স্বতন্ত্র। প্রথমটিতে অসহায় স্বার্থ-চিন্তা সক্রিয় ছিল, কিন্তু দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে সক্রিয় ছিল প্রতিবাদের আকাঙ্ক্ষা। অবশ্য পরবর্তী পর্যায়ে একটি সমন্বয়ী ধারার সক্রিয়তা প্রকাশ পেয়েছিল। এই তৃতীয় ধারাটির বিকাশে হিন্দু ও মুসলমান উভয় পক্ষের ইতিবাচক ও বাস্তবমুখী চিন্তাভাবনা সক্রিয় ছিল।

অন্যদিকে মুসলমান সমাজের সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বের ধারণাও আক্ষরিক অর্থে কার্যকরী ছিল না। *রোমিলা থাপার* এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, অ-মুসলিম অধ্যুষিত দেশে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ থাকার চেষ্টাও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। সুলতানি শাসনের একেবারে প্রাথমিক পর্বে আন্তঃসম্প্রদায় সংঘাত শুরু হয়েছিল এবং এই ধরনের একটি সংঘাত থেকে সুলতান রাজিয়ার আমলে সুলতানির সংকট তীব্রতর হয়েছিল। তাঁর মতে, আরবদের সিন্ধু বিজয়ের সময় ভারতে 'শিয়া' মুসলমানদের আগমন ঘটেছিল। সিন্ধু ও মুলতান অঞ্চলে 'শিয়া'দের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। কিন্তু গোঁড়াপন্থী 'সুন্নী' মুসলমানরা শিয়াদের পছন্দ করত না। ভারতে তুর্কী আক্রমণের ফলে এদেশে সুন্নীদের রাজনৈতিক প্রতিপত্তির সূচনা ঘটে। ইতিপূর্বে গজনীর সুলতান মামুদ ভারতে (মুলতান ও সিন্ধু) শিয়াদের ধ্বংস করার চেষ্টা করেও সফল হননি। কিন্তু এখন তুর্কীদের প্রবল দাপটের মুখে শিয়াদের অস্তিত্বের সংকট দেখা দেয়। তাই তারা অন্যান্যদের সহায়তায় সুলতান রাজিয়াকে ক্ষমতাচ্যুত করার একটা প্রয়াস নেয়। যদিও শিয়াদের এই প্রয়াস সফল হয়নি। এর পরে 'সুফী'দের সাথেও সুন্নীদের একটা দীর্ঘ সংঘাত শুরু হয়। শিয়াদের মধ্য

থেকেই 'সুফী'দের উদ্ভব ঘটেছিল। তুর্কী শাসনের মাঝপথে এরা ভারতে প্রবেশ করেছিল। সুন্নী মতবাদ ও বিশেষ করে উলেমাশ্রেণীর বিরুদ্ধে এদের জেহাদ ঘোষিত হয়েছিল। এরা মনে করত যে, রাজক্ষমতার সাথে ধর্মের যোগসাধন করে উলেমারা কোরানের আদি গণতান্ত্রিক নীতিকে বিকৃত করেছে। ফলে, উলেমারাও সুফীদের ধর্মবিরোধী বলে আখ্যায়িত করে। এছাড়া মুসলিম সমাজে জাতি বা গোষ্ঠীভিত্তিক ভেদাভেদ ও রেষারেষী তো ছিলই।

○ সুলতান ঃ সামাজিক অবস্থা ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ঃ

রাষ্ট্র ও সমাজের সর্বোচ্চে ছিল সুলতানের স্থান। সাধারণ মানুষের কাছে সুলতান ছিলেন অতি সামাজিক একজন পুরুষ। আসলে যে অভূতপূর্ব নিরাপত্তা, ব্যস্ততা ও আড়ম্বরের মধ্যে সুলতান বাস করতেন, তাতে সাধারণ মানুষের কাছে সুলতান কল্পরাজ্যের একজন বাসিন্দা রূপেই প্রতিভাত হতেন। পারস্যের রাজকীয় ঐতিহ্যের আকাশস্পর্শী মহিমা, দম্ভ ও কর্তৃত্বের অতলস্পর্শী অবস্থান গজনীর মাটি ছুঁয়ে ভারতের মাটিতে পৌঁছেছিল। সুলতানের সেই অদৃষ্টপূর্ব কর্তৃত্বের সাথে চোখ-ঝল্সানো ঐশ্বর্য্য-সম্পদ, সুবিশাল রাজপ্রাসাদ, অসংখ্য দাসী-বাঁদি, সশস্ত্র অনুচরবর্গ, সদা সন্ত্রস্ত লোক-লস্কর, হাতি, ঘোড়া ইত্যাদির মেলবন্ধন সুলতানকে সামাজিক ভাবেও এক স্বতন্ত্র জগতের বাসিন্দা রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সুলতানের কর্তৃত্বের সাথে 'ঐশী' শক্তির সম্পর্ক এবং 'ঈশ্বরের ছায়া' (জিল-উল্-আহ) রূপে সুলতানের প্রতিষ্ঠা তাঁর গৌরব মুকুটে ঔজ্জ্বল্য দিয়েছিল, তা মুক্ত চোখে অবলোকন করা সত্যিই ছিল কষ্টকর। তবুও মধ্যযুগে সুলতান (বা বাদশা)-ই ছিলেন সমাজের প্রতিবিম্ব। কারণ প্রশাসনের সাথে যুক্ত মানুষেরা তাঁদের অর্থ ও সামর্থ্য অনুযায়ী সুলতানকেই অনুসরণ করতেন। ***বরণীর***[1] ভাষায় ঃ *"সুলতানের ব্যক্তিগত প্রভাব অনুযায়ী সাধারণভাবে গোটা সমাজের সুর বাঁধা হত। আর নিম্নবর্গীয়দের অবস্থান, কি মুসলিম, কি হিন্দু, তৎকালীন চালচিত্রে ছিল ঝাপসা।"*

সুলতানের মহিমা ও মর্যাদার অন্যতম প্রতীক ছিল তাঁর দরবার ও হারেম। অপ্রতিহত ও ঐশী ক্ষমতার তত্ত্বে গড়ে-ওঠা সুলতানি রাষ্ট্রে দরবারের কার্যকরী উপযোগিতা ছিল শূন্য। বর্তমানকালের সংসদীয় ব্যবস্থায় ছায়া মাত্রও ছিল না। আসলে পারসিক রীতি অনুযায়ী রাজকীয় ঐতিহ্যের নিদর্শন হিসেবেই সুলতানি আমলে দরবার অনুষ্ঠানের প্রচলন হয়েছিল। দরবারে উপস্থিত ব্যক্তিদের পোশাক-পরিচ্ছদ, আদব-কায়দা, শিষ্টাচার সবই ছিল কঠোরভাবে নির্দিষ্ট। রীতি-পদ্ধতির সামান্যতম বিচ্যুতি বা শিথিলতা সহ্য করা হত না। সাধারণত অভিজাতবর্গ ও উচ্চ অমাত্যবর্গ স্বয়ং দরবারে উপস্থিত থাকতেন। প্রয়োজনে তাঁদের প্রতিনিধি (ভকিল) উপস্থিত থাকতে পারতেন। পদমর্যাদা অনুসারে প্রত্যেকে সারিবদ্ধভাবে নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করতেন। *'বারবক'*, *'হাজিব'* ও *'ভকিল'* ছিলেন দরবারের প্রথম তিনজন কর্মী। এরাও অভিজাত ছিলেন। সুলতান উপস্থিত হলে উপস্থিত সবাই উঠে দাঁড়াতেন। তারপর বারবক-এর আহ্বান অনুযায়ী একে একে সুলতানকে 'কুর্নিশ' ও 'তসলিম' দ্বারা শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতেন এবং 'নজর' নিবেদন করতেন। বিশেষ সম্মানিত বক্তিদের সুলতান স্পর্শ বা আলিঙ্গনও করতেন। তবে এরূপ দৃষ্টান্ত কদাচিৎ দেখা যায়। মেজর র‍্যাভার্টি অনূদিত 'তবকাৎ-ই-নাসিরী'র ভাষ্য অনুযায়ী সুলতানকে

1. *তারিখ-ই-ফিরোজশাহী—বরণী*

'স্বর্গচ্যুত সূর্য', অভিজাতদের 'গ্রহরাজি' এবং দরবারকে 'উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কপুঞ্জের সভা' রূপে বর্ণনা করা যায়।

○ মুসলিম সমাজ :

তত্ত্বগতভাবে মুসলিম সমাজে জাতিভেদ বা বর্ণভেদ জাতীয় বৈষম্য ছিল না। কিন্তু তাই বলে মুসলমান সমাজকে কঠোরভাবে শ্রেণীহীন সম্পর্ক দ্বারা চালিত, একথা বলা যাবে না। বংশ, অর্থ কৌলিন্য, রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ইত্যাদি বিভিন্ন উপাদান মুসলমান জনসমষ্টির মধ্যে গভীর ব্যবধান সৃষ্টি করেছিল। সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে সম্রাট ও রাজপরিবারের পরেই ছিল অভিজাতদের স্থান। ত্রয়োদশ শতকে মুসলিম অভিজাত শ্রেণীকে প্রধানত দুটি অংশে ভাগ করা যায়—(১) অহল-এ-সঈফ্ (বা অহল-এ-সামশির/অহল-এ-তীগহ্) এবং (২) অহল-এ-কলম।

'অহল-এ-সঈফ্'রা ছিলেন সৈনিক বৃত্তিধারী উচ্চ রাজপুরুষ। ভারতে মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠাপর্বে এঁরাই দক্ষ ও সাহসী নেতৃত্ব দ্বারা রাজপুত প্রতিপক্ষের পরাস্ত করে এদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠায় মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। স্বভাবতই এঁদের সামরিক পদমর্যাদা সামাজিক স্তর নির্ণয়ে বিশেষ গুরুত্ব পেত। তাই সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিপত্তির ক্রম নিম্নস্তর হিসেবে খান, মালিক, আমীর, সিপাহশালার ইত্যাদি অভিধা বিবেচিত হত। সাধারণভাবে সবাই 'ওমরাহ' (আমীরের বহুবচন) নামে পরিচিত হতেন। ওমরাহরা ছিলেন সুলতানি শাসনের মেরুদণ্ড বিশেষ এবং সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতীক ও রক্ষক। সামরিক ও অ-সামরিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত পদে এঁদের ছিল একচ্ছত্র আধিপত্য। স্থানীয় প্রশাসক বা ইক্তাদার পদে নিযুক্ত বহু আমীরই প্রায়-স্বাধীন কর্তৃত্ব ভোগ করতেন। ক্রীতদাসত্ব থেকে সুলতানপদে উন্নীত শাসকের সাথে দাস-অভিজাত বা স্বাধীন অভিজাতদের অহং-এর সংঘাত অভিজাতদের সামাজিক সম্পর্কের একটি অতি সংবেদনশীল বৈশিষ্ট্য ছিল। এই কারণে অভিজাতরা যেমন সুলতানকে মদত যোগাত, তেমনি কখনো কখনো সুলতানের কাজে অনধিকার হস্তক্ষেপ করতেন। এমনকি সুলতান দুর্বল হলে নিজেদের হাতে শাসনভার তুলে নিতেও দ্বিধা করতেন না। কোন কারণে একজন অভিজাত ক্ষমতা ও মর্যাদার আসন থেকে বিতাড়িত না হলে ; আভিজাত্যের শিরোপা তার অধস্তন পুরুষেরাও লাভ করত। তবে একজন অভিজাত-সন্তান প্রথমে সুলতান বা অন্য কোন অভিজাত ব্যক্তির পোষ্য বা কর্মী হিসেবে জীবন শুরু করত এবং ব্যক্তিগত দক্ষতা ও অর্জিত সরকারি পদের ভিত্তিতে ক্রমোচ্চ স্তরে উন্নীত হতে পারত। আভিজাত্যের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছালে একজন অভিজাত 'খান' উপাধি পেতেন। এর নীচে ছিল যথাক্রমে 'মালিক' ও 'আমীর' খেতাবধারীরা। ***অধ্যাপক আশরাফ*** দেখিয়েছেন যে, দিল্লীর সুলতানদের দরবারে অভিজাতশ্রেণীর জন্য আমীরের নীচে কোন খেতাব ছিল না। সাধারণভাবে সকল শ্রেণীর অভিজাতই প্রভূত মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতেন। নিজ নিজ গণ্ডীতে সকল অভিজাতই নিজেদের এক একজন সুলতান বলেই ভাবতেন। কেবল প্রকাশ্যে চলাফেরা বা দরবারে উপস্থিত হওয়ার সময় তাদের জন্য কিছু পৃথক আদবকায়দা মানতে হত।

○ উলেমাশ্রেণী : মুসলিম সুবিধাভোগীশ্রেণীর অপর অংশ ছিল 'অহল-এ-কলম' (men to pen) অর্থাৎ বুদ্ধিজীবিশ্রেণী। মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদ, জ্ঞানী-গুণী পণ্ডিত প্রমুখ 'অহল-এ-কলম' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সামগ্রিকভাবে এঁরা 'উলেমা' (একবচনে আলীম') নামে পরিচিত

হতেন। অভিজাত বা ওমরাহদের যদি সুলতানি শাসনের 'শক্তি' (Power) বলা হয়, তাহলে উলেমারা ছিলেন তার 'বুদ্ধি' (Brain)। এঁদের অধিকাংশই ছিলেন অ-তুর্কী আরবীয় ও পারসিক ধর্মতত্ত্ববিদ্ এবং গোঁড়া সুন্নী। সুলতানের প্রিয়পাত্র ও মুখ্য সহযোগী হিসেবে এঁরা ওমরাহদের সমান কর্তৃত্ব ও মর্যাদা ভোগ করতেন। কোরান, হাদীস, কালান ইত্যাদি ধর্মীয় শাস্ত্র, শরিয়তী আইন-কানুন, আরবী ভাষা ইত্যাদি বিষয়ে এঁদের নির্দিষ্ট পাঠক্রম অধ্যয়ন করতে হত। উলেমাদের প্রধান কাজ হিসেবে পবিত্র কোরান সাধারণ মানুষকে 'ধর্মপথে আকৃষ্ট করার' কথা বলা হয়েছে। এই ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের জন্য কোরানে উলেমাদের 'শ্রেণী' হিসেবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শিক্ষাবিদ্ ও ধর্মবিশারদ উলেমাদের জন্য সামাজিক মর্যাদা ও শ্রদ্ধার আসন নির্দিষ্ট থাকলেও, অতিমানবিক কোন অস্তিত্ব স্বীকৃত ছিল না। কিন্তু নিজ শ্রেণীর সামাজিক প্রতিষ্ঠাকে অন্যান্য সামাজিক শক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণমুক্ত রাখার জন্য এঁরা স্বকল্পিত নতুন নতুন ধর্মীয় বিধান প্রচার করতে থাকেন।[1] যেমন হজরত মহম্মদের ভাষ্য হিসেবে প্রচার করা হয় 'উলেমারা সত্যদ্রষ্টাদের সার্থক উত্তরসাধক, তাই তাদের সম্মান দেখাও। এদের শ্রদ্ধা করলেই আল্লাহকে ভক্তি করা হয়' কিংবা "শাস্ত্রবিধির শিক্ষক, শাস্ত্রবিধির ছাত্র, নিদেনপক্ষে শাস্ত্রবিধি ব্যাখ্যাকারের ধৈর্যশীল শ্রোতা—এই তিনটির যে-কোন একটি দলের অন্তর্ভুক্ত হতে ভুলো না। যারা এই তিন দলের সদস্য নয় তাদের জন্যে 'দোজখ-নাজেল' অনিবার্য ইত্যাদি।[2]

ভারতবর্ষে মুসলিম সমাজের বিকাশের ধারায় উলেমারা প্রত্যাশিতভাবে অতিরিক্ত কর্তৃত্ব ও সুযোগ-সুবিধার অধিকারী ছিলেন। ধর্মীয় অনুমোদন ও সমর্থনের উপর নির্ভর করে ভারতে সুলতানি শাসনকে স্থায়ী ভিত্তি দিতে আগ্রহী সুলতানেরা অনেকেই রাজনীতির উপর উলেমাশ্রেণীর খবরদারি মেনে নেন। ভারতে সুলতানি শাসন আক্ষরিক অর্থে ধর্মাশ্রয়ী ছিল না। কিন্তু খলিফার অনুমোদন অর্জন দ্বারা নিজ কর্তৃত্বকে আইনের স্বীকৃতি প্রদানের ইচ্ছা অধিকাংশ সুলতানেরই ছিল। এমতাবস্থায় রাজনীতির উপর উলেমাদের প্রভাব অনিবার্যভাবেই বেড়েছিল। প্রধান সদর, প্রধান কাজী প্রভৃতি ধর্মীয় ও বিচার বিভাগীয় পদে উলেমাদের নিযুক্তি সেই ক্ষমতার দ্রুত বৃদ্ধি সম্ভব করেছিল। ইলতুৎমিস, বলবন প্রমুখ নানাভাবে উলেমাদের সন্তুষ্টি বিধানের চেষ্টা করতেন। আলাউদ্দিন খলজী তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না হলে উলেমাদের গোঁড়া মানসিকতা বা ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার প্রতিবাদ করতেন না।

কিন্তু কোরান নির্দিষ্ট কর্তব্য এবং উলেমাশ্রেণীর ক্রিয়াকলাপের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান ছিল। *ড. আশরাফের* ভাষায় : *"উলেমার মুসলিম সম্প্রদায়কে নৈতিক সদ্গুণ ও ধর্মানুরাগের পথে যোগ্য নেতৃত্ব দেওয়ার মহৎ দায়িত্ব ত্যাগ করে বসেছিলেন।"* সুলতান বলবন, বুগরা খাঁ, মহম্মদ-বিন্-তুঘলক প্রমুখ অনেকেই উলেমাশ্রেণীর নৈতিক অধঃপতনের জন্য প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। ***বলবনের*** মতে, সমগ্র উলেমা সম্প্রদায় সত্যনিষ্ঠা ও সৎ সাহস থেকে বঞ্চিত ছিল। ***বুগরা খাঁ*** ব্যথিত চিত্তে বলেছিলেন, *"এরা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়। এরা অর্থগৃধ্নু, প্রবঞ্চক, পরকালের চিন্তা করে না, ইহলোকই এদের আরাধ্য দেবতা।"* ***আমীর খসরু*** লিখেছেন যে,

"আইনের (কোরানীয়) ব্যাখ্যাকার এই উলেমারা ইসলামীয় আইন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। স্বেচ্ছাচারী ও প্রজাপীড়ক সুলতানকে সমর্থন করাই ছিল উলেমাদের একমাত্র ধর্ম।" খসরু এমনও বলতে দ্বিধা করেননি যে, উলেমারা দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত রীতির জোরেই সাধারণের কাছ থেকে সম্মান আদায় করে নিতেন। কিন্তু মানসিক ও প্রকৃত গুণাবলী যদি সামাজিক সম্মানের মানদণ্ড হত, তাহলে *"মোল্লার তুলনায় যে-কোন অ-যাজক সাধারণ মানুষের সম্মানলাভের অধিকার সহস্রগুণ বেশি ছিল।"*।

বস্তুত, সুবিধাভোগী ওমরাহ ও উলেমাশ্রেণী নিজেদের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি রক্ষার জন্য সদাসতর্ক ছিলেন। অ-মুসলমান কিংবা নিম্নবংশীয় মুসলমানরা যাতে ক্ষমতা ও মর্যাদার কেন্দ্রে উন্নীত হতে না-পারে, সেজন্য সুবিধাভোগীশ্রেণী সর্বদা বংশকৌলিন্য ও মিথ্যা ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যের আবরণে নিজেদের আচ্ছাদিত করার চেষ্টা করতেন। সংকীর্ণ গোষ্ঠী-স্বার্থ রক্ষার কাজে এই শ্রেণীর ঐক্য ছিল লক্ষণীয়। কিন্তু অভিজাতদের মধ্যেও জাতিগত ও বংশগত ভেদাভেদ ছিল প্রকট। স্বয়ং মহানবীর রক্তের অধিকারী শেখ ও সৈয়দরা ছিলেন সমগ্র মুসলিম-সমাজে সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী। দ্বিতীয় স্তরে ছিল তুর্কী দাসদের অবস্থান। পরবর্তী স্তরে ছিল হিন্দুস্থানী মুসলিম অভিজাতদের স্থান।

❍ সাধারণ মুসলিম জনতা ঃ সুবিধাহীন মুসলিম জনতা (আওয়াম-ও-খাল্‌ফ) এবং সাধারণ হিন্দুদের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ ছিল না। মুসলিম জনসাধারণ বলতে বোঝাত মূলত ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হিন্দুরা এবং দাসরা। ত্রয়োদশ শতকে মুসলমান-সমাজে তথাকথিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর অস্তিত্ব প্রায় ছিলই না। অবশ্য কোন কোন বৃত্তিধারীর মধ্যে মধ্যবিত্তশ্রেণীর কিছু কিছু উপাদান অস্পষ্টভাবে বর্তমান ছিল। সামরিক ও সাধারণ প্রশাসনে নিয়োজিত নিম্ন পর্যায়ের কিছু কর্মচারী, ইক্‌তাদার-সহ নগদ বেতনের পরিবর্তে জমি ইজারা পেতেন এমন কিছু ভাগ্যবান ব্যক্তি এবং বিচার ও শিক্ষাব্যবস্থার সাথে জড়িত কিছু মানুষকে মধ্যবিত্তশ্রেণীর উপাদানের ধারকরূপে চিহ্নিত করা যায়। সংখ্যায় অতি অল্প হলেও কিছু মুসলমান বণিক ও ক্যারাভান পরিচালককেও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

সাধারণ মুসলমান জনতার অধিকাংশই ছিলেন অশিক্ষিত ও দরিদ্র। কারণ প্রধানত নিম্নবর্ণীয় হিন্দুরাই ধর্মান্তর গ্রহণ করেছিল। এই কাজে দু'ভাবে তারা আগ্রহ বা উৎসাহ বোধ করেছিল। ***প্রথমত,*** হিন্দুধর্মের বর্ণভেদের কঠোরতা এবং সামাজিক শোষণ থেকে রেহাই পাওয়ার আশা এবং ***দ্বিতীয়ত,*** শাসকশ্রেণীর ধর্ম গ্রহণ করে সামাজিক সাম্য পাওয়ার পাশাপাশি সরকারি পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাওয়ার বাসনা। কিন্তু শিক্ষার অভাব এবং সাংস্কৃতিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতার কারণে এই সকল ধর্মান্তরিত মুসলমানের পক্ষে বহিরাগত, শিক্ষিত ও উচ্চবংশীয় মুসলমানদের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা আদৌ সম্ভব হয়নি। কালক্রমে এই শ্রেণীর এক অতি ক্ষুদ্র অংশ শিক্ষাদীক্ষা লাভ করে এবং ব্যক্তিগত দক্ষতা প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়। স্বভাবতই তাদের উচ্চাশা বৃদ্ধি পায় এবং মামেলুক সুলতানদের উন্নাসিকতা তাদের ক্ষুব্ধ করে তোলে। ১২৯০ খ্রীষ্টাব্দে খলজী বিপ্লব-এর

সময় এই সকল হিন্দুস্থানী মুসলমান তুর্কী-আধিপত্য বিনাশের কাজে বিশেষ ভূমিকা পালন

O ক্রীতদাস-দাসী ঃ মুসলিম জনসাধারণের সর্বনিম্ন স্তরে ছিল অসংখ্য ক্রীতদাস-দাসী। ভারতে মুসলিম শাসন শুরু হওয়ার আগে থেকেই সামাজিক ভাবে দাসপ্রথা চালু ছিল। তবে মুসলমান শাসনের সূচনা হলে এই ব্যবস্থা একটি বৃহত্তর প্রতিষ্ঠানিক রূপ পায়। প্রাচীন গ্রীসের মতই ভারতেও দাসদাসীরা ছিল যে-কোনরূপ সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। মালিকের সম্পত্তি বিশেষ, কায়িক শ্রমদানের বাধ্য এবং অতি নিকৃষ্টমানের জীবনযাপনে অভ্যস্ত। সুলতানদের অধীনে অনেক ক্ষেত্রেই লক্ষাধিক দাসদাসী থাকত। সম্ভ্রান্ত প্রতিটি মুসলিম পরিবারেও দাসদাসী রাখার রেওয়াজ ছিল। ***অধ্যাপক আশরাফ*** লিখেছেন যে, মুসলিম অভিজাত ব্যক্তির জীবন হয় 'সংগ্রাম' (বজম), অথবা 'আমোদ-প্রমোদ' (বজম)-এই দুয়ের মধ্যে অতিবাহিত হয়। তাই নিজের সংসারের প্রয়োজনীয় কাজের জন্য দাসদাসীর সংরক্ষণ অনিবার্য হয়েছিল। ক্রমে দাসদাসী সংরক্ষণ সামাজিক মর্যাদার প্রতীকে পরিণত হয়।

বিশ্বের নানাদেশ থেকে ভারতে দাস-দাসীদের আমদানি করা হত। যুদ্ধবন্দী বা উপঢৌকন হিসেবেও দাস-দাসী পাওয়া যেত। ভারতীয় দাসদের মধ্যে কষ্টসহিষ্ণু বলে অসমীয়াদের খ্যাতি ছিল। অন্দরমহলের (হারেম) কাজকর্মের জন্য খোজা দাস নিয়োগ করা হত। শিশু দাসদের নপুংসক করে খোজা করা হত। ত্রয়োদশ শতকে বাংলাদেশে খোজাদের কেনাবেচা বেশি হত। অনেক সময় মালয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে 'খোজা' আমদানি করা হত। সাধারণভাবে ক্রীতদাসরা মালিকের অস্থাবর সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হত। মালিকের প্রয়োজন অনুসারে এদের ভাড়া শ্রমিক, সৈনিক, উপঢৌকন ইত্যাদির কাজে ব্যবহার করা হত। ক্রীতদাসী সংরক্ষণের রেওয়াজ তখন বেশ জনপ্রিয় ছিল। এদের প্রধানত দু'ভাবে ব্যবহার করা হত—(১) ঘর-গৃহস্থালীর কর্মী হিসেবে এবং (২) মালিককে সঙ্গদান ও তাঁর চিত্ত-বিনোদনের যন্ত্র হিসেবে। এক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর তুলনায় দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদা ছিল কিছুটা উন্নত। দাসী সংগ্রহের সাধারণ নীতি হিসেবে ***অধ্যাপক আশরাফ*** জনৈক মুঘল অভিজাতর একটি কৌতুক ভাষ্য তুলে ধরেছেন ঃ *"গৃহকর্মের জন্য খোরাসানী নারী ক্রয় কর, শিশু পরিচর্চার জন্য হিন্দু নারী, আমোদ-প্রমোদে সঙ্গদানের জন্য পারস্যসুন্দরী ক্রয় কর, আর এই তিন শ্রেণীর দাসীকে কঠোর শাসনে বশীভূত রাখার জন্য ঘরে এনো অক্ষু নদীর ওপারের মেয়েকে।" ("Buy a khurasani women for her work, a hindu woman for her capacity for nurshing children, a persian woman for the pleasure of her company, and a trans oxianian for thrashing her as a warning for the other three."*[1]

তত্ত্বগতভাবে সাম্যভাবাপন্ন ইসলাম সমাজে একজন ক্রীতদাস ও একজন স্বাধীন মানুষের সম-অধিকার ভোগ করার কথা। কিন্তু বাস্তবে চিত্রটি ছিল ঠিক বিপরীত। একজন ক্রীতদাস প্রকৃত অর্থেই ছিল সুবিধাহীন এবং আধুনিক সর্বহারাশ্রেণীর থেকেও সর্বহারা। একজন মালিক তার দাসকে বিক্রয়, দাস অথবা ভাড়াশ্রমিক—যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারত। যুদ্ধবন্দী

দাসদাসীদের বাঁচার অধিকারটুকু দেওয়ার জন্যই বিজয়ী প্রভুকে 'মানবতাবাদী ও উদার' অভিধায় ভূষিত করা হত। তবে সুলতানের বা অতি-অভিজাত ব্যক্তির দাসরা তুলনামূলক ভাবে অধিক সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হত। এরা অনেক ক্ষেত্রেই দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভের সুযোগ পেত। তবে এরূপ ভাগ্যবানের সংখ্যা ছিল সমুদ্রে জলকণার সাথে তুল্য।

সামাজিক ক্ষেত্রে এই ব্যাপক দাসপ্রথার বিরূপ প্রতিক্রিয়া ছিল স্বাভাবিক। এইচ. জে. নাইবুয়র তাঁর *'স্লেভারী অ্যাজ অ্যান ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সিস্টেম'* গ্রন্থে লিখেছেন যে কঠোর ও ব্যাপক দাসপ্রথা সামাজিক প্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করেছিল। যথাযথ শিক্ষা ও স্বাভাবিক পারিবারিক বন্ধনের অভাব দাসদের আত্মবিশ্বাস নষ্ট করে তাদের একশ্রেণীর কর্কশ জীবে পরিণত করত। ***অধ্যাপক আশরাফ*** মনে করেন, ভারতের ক্ষেত্রেও দাসপ্রথার এই নেতিবাচক প্রভাব ছিল। হয়তো মধ্যযুগীয় ভারতে এই অসুস্থতা প্রকট ছিল না, কিন্তু সামাজিক অগ্রগতির পক্ষে এটি যে বাধা সৃষ্টি করেছিল, তাতে সন্দেহ নাই।

○ হিন্দু সমাজ ও তার উপর ইসলামের প্রভাব ঃ

ভারতবর্ষের আদি হিন্দু সমাজব্যবস্থা মানবসমাজের অন্যতম অগ্রণী, দৃঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী সমাজব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃত। ভারতে মুসলমানদের আগমন ও মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠা সেই সামাজিক ক্রমবিবর্তনের ধারায় একটি নতুন পর্বের সূচনা করে। ***অধ্যাপক কে. এম. আশরাফ*** মনে করেন, মুসলিম শাসনের প্রথম যুগে ভারতীয় সংস্কৃতির গঠনাত্মক শক্তিগুলির বিকাশ ঘটেছিল। সুলতানি আমলে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির পারস্পরিক প্রভাবের ফলে যে উন্নত জীবনধারা ও সংস্কৃতির সূচনা হয়েছিল, তার উপর ভিত্তি করেই মুঘল শাসকেরা সংস্কৃতির গৌরবময় সৌধ রচনা করেছিলেন। *"মুসলিম-সভ্যতার প্রভাবে হিন্দুদের প্রাচীন ব্যবস্থা প্রায় ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়। রাজনৈতিক ও সামাজিক স্তরভেদ প্রায় ঘুচে যায়। জাতিভেদ-প্রথার ক্ষেত্রেও কিছু কিছু সংস্কার প্রবর্তিত হয়। ধর্মীয় প্রবণতার দিক পরিবর্তন ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত ভারতের এক অখণ্ড রূপকল্পনাও সম্ভব হয়।"*[1]

প্রাক্-মুসলিম ভারতীয় সমাজের চিত্র মৌর্য ও গুপ্তবংশীয় শাসনকালের সমাজ থেকে উল্লেখযোগ্য ভাবে স্বতন্ত্র ছিল না। হর্ষবর্ধনের মৃত্যু থেকে উত্তর ভারতে মুসলমানদের প্রতিষ্ঠার মধ্যবর্তীকালকে (সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ খ্রীষ্টাব্দ) কেউ কেউ ভারতে 'রাজপুত-সংস্কৃতির' পর্ব বলে অভিহিত করেছেন। এ ধরনের নামকরণের যৌক্তিকতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করার যথেষ্ট কারণ আছে।[2] কারণ রাজপুতরা ভারতীয় জনসমষ্টির ভগ্নাংশ মাত্র। একথা হয়তো সত্য যে, তারা সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের বহু মহান ধারার ধারক ও বাহক ছিলেন। কিন্তু সেই উন্নত সংস্কৃতির ধারা সীমাবদ্ধ ছিল সমাজের সচ্ছল ও উচ্চবর্গীয় মানুষদের মধ্যে। সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতবাসীর সাথে এদের কোন সম্পর্কই ছিল না। সমকালীন রাষ্ট্রনেতা বা সংস্কারকগণ সাধারণ জনতার শ্রদ্ধা বা আস্থা অর্জন করতে পারলে একটা নবোত্থিত শক্তি ও সংস্কৃতির চাপে সুপ্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি তাসের ঘরের মত ধ্বসে পড়ত না। যাই হোক, আরবদের ভারত আক্রমণের

সূত্রে ভারতীয় সমাজ ও রাজনীতির অগ্রণী গোষ্ঠী 'ক্ষত্রিয়'রা দ্বিতীয় সারিতে সরে যায় এবং তাদের স্থান নেয় 'অগ্নিকুল' রাজপুত গোষ্ঠী।

অধ্যাপক দশরথ শর্মা তাঁর *'লেকচারস্ অন রাজপুত হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার'* শীর্ষক রচনায় ভারতীয় রাজনীত ও সংস্কৃতির সম্মুখভাগে ক্ষত্রিয়দের পরিবর্তে অগ্নিকুল রাজপুতদের আগমনকে আরব আক্রমণের গুরুত্বপূর্ণ ফল বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতির কোন মৌলিক রূপান্তর আনতে পারেনি বা আনতে চায়নি। প্রায় আগের মতই ভারতীয় সমাজ বর্ণবিভাগের কাঁটাজালে আবদ্ধ ছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র—এই চতুর্বর্ণের সামাজিক অবস্থানের বিশেষ হেরফের ঘটেনি। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় রাজপুতরা সুবিধাভোগীশ্রেণী হিসেবে সংস্কৃতি ও রাজনীতির একচেটিয়া কর্তৃত্ব ভোগ করত। বৈশ্য ও শূদ্রদের সাথে তাদের ছিল দূরতিক্রম ব্যবধান। অবশ্য ***অধ্যাপক সতীশচন্দ্র*** দেখিয়েছেন যে, অষ্টম শতকে *'ব্যক্তি বা গোষ্ঠী উচ্চবর্ণে উন্নীত হতে পারত।'* তবে সামাজিক মৌল-চরিত্র পরিবর্তনের দিক থেকে তা ছিল নগণ্য। তবে বৃত্তি পরিবর্তন করে বর্ণাক্রম পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যেমন—ব্রাহ্মণ যুদ্ধে যোগ দিয়েছে কিংবা ক্ষত্রিয় বাণিজ্যকর্মে লিপ্ত হয়েছিল। কিন্তু এর ফলে বর্ণভেদের কঠোরতা হ্রাস পায়নি। কেবল বৈশ্য ও শূদ্রদের ব্যবধান কিছুটা শিথিল হয়েছিল। এবং তারও গতি ছিল নিম্নমুখী। অর্থাৎ সমাজের মূল জনগোষ্ঠী ব্রাহ্মণ্য-হিন্দুবাদের কঠোর শৃঙ্খলপাশে আবদ্ধ অবস্থায় এক অসহায়-ক্রোধ সম্বল করে দিনাতিপাত করছিল। সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সাধারণভাবে নারীজাতির জীবনও ছিল আবদ্ধ এবং পুরুষ-নিয়ন্ত্রিত। সতীদাহ, বহুবিবাহ, দেবদাসী-প্রথা যথাপূর্ব চালু ছিল। উচ্চবর্ণের কিছু মহিলা হয়তো শিক্ষা-সংস্কৃতি চর্চায় কিছুটা স্বাধীনতা পেয়েছিলেন ; কিন্তু মূলস্রোতের অবস্থা ছিল পূর্ববৎ করুন। ***ড. আর. সি. দত্ত*** তাঁর *'লেটার হিন্দু সিভিলাইজেশন'* গ্রন্থে দশম-একাদশ শতকীয় ভারতীয় সমাজকে ইউরোপের 'অন্ধকার যুগে'র মতই সার্বিক সংকীর্ণতায় আকীর্ণ বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, ইউরোপের সামন্তপ্রভু ও ভারতের রাজপুত-ক্ষত্রিয়রা ছিল সমচরিত্রের অধিকারী। তবে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, ইউরোপের সামন্তপ্রভুরা পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের সহযোদ্ধা, সহকর্মী মানুষদের কাছে টেনে নিতে পেরেছিলেন, কিন্তু ভারতে রাজপুত-ক্ষত্রিয়রা সেই উদারতা বা দূরদর্শিতা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। আরবীয় পণ্ডিত ***অলবেরুণীর*** মতে, ভারতের সমাজ পরিচালকদের কূপমণ্ডুকতা, বহির্জগতের সাথে যোগাযোগের একান্ত অনাগ্রহ ভারতীয় সমাজকে আপন সংকীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ করে রেখেছিল। ঐতিহাসিক ***টয়েনবি*** (A. Toynbee) হিন্দুদের পারস্পরিক সম্পর্ককে *'a social enormity'* বলে অভিহিত করেছেন।

ভারতে ইসলামের আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা এবং ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতির উপর ইসলামের প্রভাবে ভারতীয় সমাজের উপরোক্ত প্রেক্ষাপটের অস্তিত্ব গুরুত্বপূর্ণ। কেবল একহাতে তরবারি ও অন্যহাতে কোরান নিয়ে ইসলাম ভারতবর্ষে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে—এরূপ ধারণা আদৌ ইতিহাসসিদ্ধ নয়। ভারতীয় রাজনীতি ও সমাজব্যবস্থার নানা উপাদান ভারতে ইসলামের আগমন ও প্রসারকে ত্বরান্বিত করেছিল।[1] ভারতের গ্রামীণ সমাজের সীমাবদ্ধ জীবনযাত্রা, অভ্যন্তরীণ

গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, বৃত্তিকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি যে রাজনৈতিক শূন্যতা তৈরি করেছিল, তাতে মুসলমানদের প্রতিষ্ঠা সহজতর হয়েছিল। ভারতে ইসলামের প্রসারের জন্য বলপূর্বক ধর্মান্তরের ঘটনা কিছু অবশ্যই আছে। তবে এগুলি ঘটেছিল একান্তই বিচ্ছিন্নভাবে। আমরা আগেই দেখেছি যে, কোন মুসলমান শাসকই সরকারিভাবে হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করেননি। এদেশে ইসলামের প্রসার সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতবাসীর কাছে আদৌ কোন বিপদ সংকেত ছিল না। জাতিভেদ, বর্ণভেদ, বৃত্তিভেদ ইত্যাদির দাপটে ভারতীয় সমাজ এতটাই বিচ্ছিন্ন ছিল যে, সামগ্রিকভাবে হিন্দুচেতনা দানা বাঁধার সুযোগ ছিল না। মুসলিম শাসকদের আমলে হিন্দুদের ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তার বিকাশ বিশেষ বাধাও পায়নি। ড. *নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য* লিখেছেন, *"রাজকীয়. প্রচেষ্টায় যেসব ধর্মান্তরকরণের ঘটনা ঘটেছে সেগুলি মূলত বিদ্রোহী সামন্ত রাজাদের ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হয়েছে। সকলের ক্ষেত্রে নয়। ঔরঙ্গজেবের মত গোঁড়া মুসলমান ও সর্বশক্তিমান সম্রাটও শিবাজীর পৌত্র শাহুকে ইসলামে দীক্ষিত করেননি, সুযোগ থাকা সত্ত্বেও।"* ড. ভট্টাচার্যের মতে, ধর্মান্তরের ব্যাপারটা ছিল প্রধানত রাজনৈতিক। প্রচলিত হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধে অসন্তোষ, উচ্চবর্ণের উৎপীড়ন ইত্যাদি কারণে অধিকাংশ মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এর পেছনে জবরদস্তি ছিল কম। অনেকে শাসকশ্রেণীর কৃপাভাজন হবার জন্য, আবার কেউ কেউ আদর্শগত কারণে ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। আরো স্পষ্ট করে বলা যায়, জাতিভেদপ্রথায় বিচ্ছিন্ন এবং কর্মফলবাদের অসার তত্ত্বে বিশ্বাসী ভারতীয় গ্রামীণ সমাজ সুবিধাভোগী ভারতীয় রাজন্যবর্গ এবং আগন্তুক মুসলমান যোদ্ধাদের মধ্যে কোন প্রভেদ খুঁজে পায়নি। ভারতীয় সমাজের উপর ইসলামের প্রভাব কিংবা ভারতীয়দের কাছে ইসলামের গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রেও একই উপাদান সক্রিয় ছিল।

প্রাথমিক পর্যায়ে ভারতীয় (হিন্দু) সমাজে ইসলামের গ্রহণযোগ্যতা ছিল শূন্য। কারণ ইসলামের দর্শন ও আচারাদি হিন্দু সংস্কৃতির প্রায় বিপরীতধর্মী ছিল। বহু ঈশ্বরবাদী ও পৌত্তলিক হিন্দুদের কাছে 'একেশ্বরবাদী' এবং পৌত্তলিক-প্রথার বিরোধী ইসলাম দর্শন তাদের অস্তিত্বের পক্ষে চ্যালেঞ্জ রূপেই প্রতিভাত হয়েছিল। এই বিরোধ ছিল খুবই স্বাভাবিক। ইতিপূর্বে ভারতে যে সকল বিদেশী এসেছিল, তাদের স্বনির্ভর বা সম্পূর্ণ কোন সংস্কৃতি ছিল না। ফলে তারা সহজেই ভারতীয় সংস্কৃতির সাথে একাত্ম হতে পেরেছিল। কিন্তু মুসলমানরা ভারতে আসার আগেই তাদের ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্রদর্শন একটা পূর্ণরূপে ধারণ করেছিল। সমাজ ও রাষ্ট্রদর্শনের সমন্বয়ে ইসলাম সংস্কৃতি পেয়েছিল দৃঢ় ভিত্তি। এহেন দুটি পরস্পর বিরোধী জীবনধারার সংঘাত ছিল অনিবার্য। *অলবেরুণী* স্বীকার করেছেন যে, মামুদ গজনীর ধ্বংসাত্মক অভিযান এবং লুণ্ঠন হিন্দুদের কাছে ইসলামের গ্রহণযোগ্যতাকে দারুণভাবে শিথিল করেছিল। ***মহম্মদ হাবিব*** লিখেছেন যে, হিন্দুরা ইসলামের দর্শনের প্রতি ততটা বিতশ্রদ্ধ ছিলেন না, যতটা ছিল মুসলমানদের রীতি-নীতি ও আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি *('it was not the principles of Islam they disliked but the manners and customs of the Mussalmans')*। অস্তিত্ব-রক্ষার তাগিদ হিন্দুদের কঠোরতর রক্ষণশীলতার বর্মে আবৃত হতে প্ররোচিত করে। *রঘুনন্দন, সায়ন, মাধবাচার্য, বিজ্ঞানেশ্বর* প্রমুখ হিন্দু শাস্ত্রকার কঠোর অনুশাসনের মাধ্যমে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষার বিধান দেন। সার্বিকভাবে হিন্দুদের দৃষ্টিতে মুসলমানদের 'ম্লেচ্ছ' হিসেবে তুলে ধরা হয়। অন্যদিকে

মুসলমানরাও, বিশেষ করে গোঁড়াপন্থী উলেমারা, পৌত্তলিক হিন্দুদের উপর রাষ্ট্রীয় বিধিনিষেধ আরোপ করে বশীভূত করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালান। এইভাবে একটি রক্ষণশীল শক্তি আর একটি রক্ষণশীল প্রতিপক্ষের উত্থান সহজ করে দেয়। 'ম্লেচ্ছ' মুসলমানদের সাথে 'কাফের' হিন্দুদের সামাজিক মিলন কিছুটা জটিল হয়ে ওঠে।

তুর্কো-আফগান যুগের প্রথম পর্বের এই সামাজিক চালচিত্র কালক্রমে পরিবর্তিত হয়। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির এই বিরোধ ও বিচ্ছেদ ক্রমশ শিথিল হয়ে আসে। ***প্রথমত,*** এই সামাজিক বিরোধ মূলত উভয় সম্প্রদায়ের উপর তলায় সীমাবদ্ধ ছিল। আমরা আগেই দেখেছি যে, নিম্নবর্ণীয় হিন্দুরা মুসলমানদের আগমন ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে উদাসীন ছিল। তেমনি সাধারণ মুসলমানদের মধ্যেও সামাজিক ভাবে হিন্দুদের সম্পর্কে বিদ্বেষ বা ঘৃণা আক্ষরিক অর্থে ছিল না। যেটুকু ছিল তার ভিত্তি ছিল রক্ষণশীলপন্থীদের নিরন্তর জেহাদের ফল। পরন্তু, হিন্দুধর্মের কঠোরতা, জাতিভেদ ইত্যাদি নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মনে, ইসলামের প্রতি এক সুপ্ত অনুরাগের জন্ম দিয়েছিল। মুসলমান সমাজের সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের কাছে সামাজিক উচ্চক্রমে উত্তরণের বিকল্প হিসেবে প্রতিভাত হয়েছিল। ফলে বৈষম্যভরা হিন্দুসমাজ থেকে নিস্তার লাভের আশায় স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এদের অনেকে ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছিল। ***অধ্যাপক আশরাফ*** লিখেছেন ঃ *"এইভাবে হিন্দু-ধর্মত্যাগীদের নিয়ে ইসলাম ধর্ম পুষ্ট হতে লাগল। এই জোয়ারের বিরুদ্ধে প্রতিকার হিসেবে ধর্মত্যাগী উচ্চবংশীয় হিন্দুদের স্বধর্মে প্রত্যাবর্তনের পথ খুলে দেওয়া হল। কিন্তু নিম্নবর্ণীয়দের ব্যাপারে কোন উদ্যোগ নেওয়া হল না। পরিণামে বহিরাগত ইসলামের গণতান্ত্রিক আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ এই পতিত শ্রেণীর হিন্দুরা 'ভক্তি-নির্ভর একটি উদার ও জনপ্রিয় ধর্মদর্শনের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হতে থাকে।"*

দ্বিতীয়ত, অধ্যাপক ***মহম্মদ হাবিব*** দিল্লীতে সুলতানি শাসনের প্রতিষ্ঠাকে 'উত্তর ভারতে নগর বিপ্লবের সূচনা' বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, এই নগরায়ণের পশ্চাৎপটে সামাজিক উপাদান বিশেষ সক্রিয় ছিল। তাঁর মতে, তুর্কী শাসকরা প্রশাসনিক বা আর্থিক প্রয়োজনে নতুন নতুন শহর-নগর প্রতিষ্ঠা করে শহুরে-শ্রমিকদের (city labours) মধ্যে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এতে আকৃষ্ট হয়েছিল হিন্দু-সমাজের নিম্নশ্রেণীভুক্ত অসংখ্য মানুষ। বস্তুত, সামাজিক বৈষম্যমুক্ত জীবনযাপনের আশায় এই সকল শ্রমজীবী হিন্দু (মুসলমানও ছিল) সুলতানি সাম্রাজ্যের সংস্কৃতির ও অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ়করণের বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। অবশ্য নগরায়ণে তুর্কী শাসকদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কোন প্রভাব ছিল না। নিতান্তই বাস্তব প্রয়োজনবোধ, অর্থাৎ শত্রুভাবাপন্ন ভারতীয় (হিন্দু) রাজন্যবর্গ ও স্বতন্ত্র সামাজিক ধারা থেকে নিজেদের অস্তিত্ব সুরক্ষিত করার জন্য তুর্কী সুলতান ও প্রাদেশিক শাসকগণ স্বয়ংসম্পূর্ণ লোকালয় তৈরি করে বসবাস করতে বাধ্য হয়েছিলেন। প্রকারান্তরে তাঁদের এই উদ্যোগ একদিকে ভারতে নগর-বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করেছিল, অন্যদিকে হিন্দু-সমাজের বর্ণভেদ ও জাতিভেদ-প্রথার বিরুদ্ধে নিম্নবর্গীয় ও নিম্নবর্ণীয় মানুষদের আশ্রয় দিয়েছিল। ভারতীয় হিন্দু সমাজের শতাব্দী-লালিত সামাজিক ভেদ ও বিচ্ছিন্নতাবোধকে সামান্যভাবে হলেও শিথিল করার কাজে এই 'মিশ্র নগর-সভ্যতার' অবদান অনস্বীকার্য।

তৃতীয়ত, সামাজিক ও আর্থ-সামাজিক কারণে বহু হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। আবার বহু

মুসলমান এক বিশেষ ধারণাবশত হিন্দু মহিলাকে বিবাহ করে। এই সকল ধর্মান্তরিত নারী-পুরুষ তাদের অতীতের আচার-আচরণ বা সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণভাবে ভুলে যেতে পারেনি। ফলে মুসলিম সমাজের মধ্যে হিন্দুরীতির নীরব অনুপ্রবেশ ঘটে। পূজা-পার্বণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-আচরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে এই মিশ্র-সংস্কৃতির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য এর দ্বারা ইসলাম সংস্কৃতির মৌল ধারার কোন পরিবর্তন ঘটেনি। কিন্তু উভয় সংস্কৃতির মধ্যস্থিত কৃত্রিম বিরোধের তীব্রতা হ্রাস পায় এবং উন্মুক্ত হয়।

চতুর্থত, ভারতীয় সমাজ ধর্মনির্ভর। স্বভাবতই ধর্মভাবনার রূপান্তরের উপর সামাজিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা অনেকটাই নির্ভরশীল। ইসলামের সামাজিক সাম্যভাবনা এবং সুফীবাদী সাধকদের মানবিক আহ্বান হিন্দুদের চিন্তা ও চেতনায় আলোড়ন তোলে। এই কারণে হিন্দু ভক্তিবাদী আন্দোলনের উপর ইসলামের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। ইসলামের সান্নিধ্যে আসার ফলেই হিন্দুদের ভক্তিযোগ দর্শনশাস্ত্রের সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করে নতুনরূপে সমাজের অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া মানুষের বাস্তব জীবনের সাথে যুক্ত হতে পারে। ইসলামের অন্তর্নিহিত সত্য ভারতীয় সমাজে বৈপ্লবিক চেতনার সঞ্চার ঘটায়।

○ শাসকশ্রেণীর গঠন ঃ

দিল্লী-সুলতানির গঠন-বৈশিষ্ট্য আক্ষরিক অর্থে সামন্ততান্ত্রিক ছিল না। এই স্বতন্ত্রতার দুটি প্রধান কারণ ছিল 'ইক্‌তা'-কেন্দ্রিক প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা এবং শাসকশ্রেণীর চরিত্র। 'ইক্‌তা' ব্যবস্থায় শক্তিশালী সুলতানদের আমলে সামন্ততান্ত্রিক ক্ষমতার ভিত্তি সুদৃঢ় হওয়ার সম্ভাবনা ছিল কম। এ বিষয়ে অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে। অন্যদিকে সুলতানি আমলে শাসকশ্রেণীর গোষ্ঠী ও জাতিভিত্তিক ধারাবাহিক পরিবর্তনশীলতা সাধারণভাবে সুলতানির প্রবণতাকে পুষ্ট করেছিল।

ভারতে সুলতানি শাসনের প্রতিষ্ঠায় প্রাথমিক অবদান ছিল আফগানিস্তানের 'ঘুর' রাজ্যের। মহম্মদ ঘুরীর উদ্যোগেই মূলত সুলতানি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল। এই কারণে ভারতে সুলতানি আমলের শাসকশ্রেণীর চরিত্র অনুধাবনের ক্ষেত্রে 'ঘুর' রাজ্যের শাসকশ্রেণীর বিন্যাস প্রাসঙ্গিক। দশম শতকে ইরানীয় তাজিক (শাসাবনী) বংশের শাসনকালে 'শিসানী' (Shishani) এবং 'খারমিল' (Kharmil) জাতিগোষ্ঠীর লোকেরাই সামরিক ও বেসামরিক গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিল এবং কালক্রমে এরাই 'অভিজাত'-র মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল। কালক্রমে আলাউদ্দিন জাহানসোজ-এর আমলে (১১৪৯-'৬১ খ্রীঃ) ঘুর রাজ্যের প্রতিপত্তি ও সীমানা প্রসারিত হলে শাসকশ্রেণীর বিন্যাসে পরিবর্তন ঘটে। এই সময় অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মানুষ 'ঘুর' শাসকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়। এদের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল 'খলজ' জাতিগোষ্ঠীর মানুষেরা। খলজ প্রদেশ নামানুসারে এরা 'খলজী' নামে পরিচিত হয়। কেউ কেউ এদের তুর্কীজাতির মত অবয়ব, পোশাক ও ভাষাযুক্ত গো-পালক শ্রেণী' বলে মনে করেন। *বরণীর* মতে, খলজীরা অ-তুর্কী এবং চেঙ্গিস খাঁ'র জামাতা কুলিজ খাঁ'র বংশধর। কিন্তু বসওয়ার্থ এদের তুর্কী যাযাবর গোষ্ঠীর মানুষ বলে উল্লেখ করেছেন।[1] আধুনিক ঐতিহাসিকেরা অধিকাংশই খলজীদের তুর্কী গোষ্ঠীভুক্ত

বলে মনে করেন। কিন্তু ভারতে তুর্কী শাসনের প্রাথমিক পর্বে শাসকগোষ্ঠীর দৃষ্টিতে খলজীরা তুর্কীজাতির সাথে অভিন্ন বলে স্বীকৃতি পায়নি। তবে গজনীতে 'ঘুরী' বংশের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা এবং মহম্মদ ঘুরীর প্রাথমিক সাফল্যগুলির পেছনে 'খলজী' অনুচরদের বিশিষ্ট অবদান ছিল। এমনকি তরাইনের প্রথম যুদ্ধে (১১৯১ খ্রীঃ) মহম্মদ ঘুরীর প্রাণরক্ষার কাজে প্রধান ভূমিকা ছিল জনৈক খলজী অনুচরের। কিন্তু মহম্মদ তাঁর নব অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে উচ্চ রাজপদে শুধুমাত্র 'ঘুরী' বংশীয় অভিজাতদের নিয়োগ করেন।

তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের (১১৯২ খ্রীঃ) পর 'ঘুর' রাজ্যের শাসকশ্রেণীর চরিত্র দ্রুত পাল্টে যায়। পরবর্তী অভিযানগুলিতে এবং প্রশাসনিক পথে ঘুরীদের পরিবর্তে ধর্মান্তরিত তুর্কী ক্রীতদাসদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। মহম্মদ ঘুরী কর্তৃক শাসকশ্রেণীর চরিত্র পরিবর্তনের ব্যাখ্যা করেছেন ***অধ্যাপক ইরফান হাবিব***।[1] মহম্মদ ঘুরীর শাসনকালের শেষ পনের বছরে এই রূপান্তর ঘটেছিল। এই রূপান্তরের মূল কারণ হল বৃহত্তর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করার কাজে 'ঘুর' রাজ্যের রাজনৈতিক পরিকাঠামোর সীমাবদ্ধতা। ধ্রুপদী 'ঘুর' রাষ্ট্রনীতি অনুযায়ী রাজনীতিতে গোষ্ঠী (clan) বা পারিবারিক নিয়ন্ত্রণ কায়েম ছিল। সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে তার বিলি-বণ্টন দ্বারা শাসন পরিচালনার রীতি ছিল। এই রীতি অনুযায়ী 'সুলতান' না হয়েও মহম্মদ 'ঘুরী' গজনী'র স্বাধীন কর্তৃত্ব পেয়েছিলেন (১১৭৩)। মহম্মদ ঘুরী অসংখ্য তুর্কী ক্রীতদাস সংগ্রহ করে (বন্দেগান-ই-তুর্ক) সন্তান-স্নেহে গড়ে তোলেন এবং এদের সমন্বয়ে নিজস্ব একটি নির্ভরযোগ্য শক্তিসংঘ গড়ে তোলেন। তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত গজনী রাজ্য এবং অভিযান দ্বারা দখলীকৃত ভারতীয় ভূখণ্ডে দুটি স্বতন্ত্র শাসকগোষ্ঠীর সেবালাভের ব্যবস্থা করেন। গজনীতে প্রধানত 'ঘুরী' অভিজাতদের নিয়োজিত রাখেন কিন্তু অধিকৃত ভূখণ্ডের দায়িত্ব দেন তুর্কী ক্রীতদাসদের উপর। এই ব্যবস্থার সুফল ও কুফল দুইই ছিল। এর দ্বারা উপজাতিভিত্তিক কেন্দ্রবিমুখী উপাদান থেকে তাঁর নবার্জিত রাজ্য মুক্ত হয়েছিল। কিন্তু বিরূপ প্রভাবও কম ছিল না। ***প্রথমত,*** নবগঠিত বাহিনীর উঁচু পদগুলিতেই তুর্কীদের প্রাধান্য ছিল। সাধারণ যোদ্ধাদের মধ্যে ঘুরী বা খলজীরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। ফলে অ-তুর্কীদের হাতে সেনাবাহিনীর ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। বখতিয়ার খলজী কর্তৃক বাংলা, বিহার দখল এবং স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠাকে সেই সম্ভাবনার প্রকাশ হিসেবে দেখা যেতে পারে। ***দ্বিতীয়ত,*** তুর্কী ক্রীতদাসদের এই আকস্মিক ক্ষমতার উত্তরণ পুরাতন ঘুরী ও খলজী অভিজাত বা সেনাপতিদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। কারণ তারা মনে করত যে, ভারতীয় রাজ্যের উপর তাদের অবদান ও অধিকার তুর্কীদের থেকে কম নয়। স্বভাবতই অভিজাতগোষ্ঠীর মধ্যে এবং 'অভিজাত' পদ দখলের প্রশ্নে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে ওঠে।

মহম্মদ ঘুরীর মৃত্যুর পর কুতুবউদ্দিন আইবক দিল্লী-সুলতানির সর্বময় কর্তৃত্ব হস্তগত করে তুর্কী আমীরদের সাফল্য ঘোষণা করেন। কিন্তু ক্ষমতার কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত হওয়া অথবা উপগোষ্ঠীর নেতাকে সুলতানিয়াত দেওয়ার লক্ষ্যে তুর্কী আমীরদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব পরবর্তী সুলতানির ইতিহাসে প্রকট হয়ে ওঠে। কুতুবউদ্দিনের মৃত্যুর পর ইলতুৎমিসের সিংহাসন আরোহণকে কেন্দ্র

করে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'কুতবী'-তুর্কী[1] দাস ও আমীররা ইলতুৎমিসের সমর্থনে দিল্লীতে সমবেত হলে, 'মুইজী' দাস ও আমীররা তাদের বিরুদ্ধাচরণে ঐক্যবদ্ধ হয়। মহম্মদ ঘুরী যেমন 'ঘুরী' অভিজাতদের হটিয়ে তুর্কী দাসদের ক্ষমতার চূড়ায় তুলেছিলেন ; ঠিক তেমনি কুতুবউদ্দিনের অনুগত দাসরা মহম্মদ ঘুরীর তুর্কী দাসদের ক্ষমতাচ্যুত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিলেন। তুর্কী দাসদের এহেন অন্তর্দ্বন্দ্ব পরিণামে দিল্লীতে ক্ষমতার অলিন্দে তথাকথিত অ-তুর্কীদের উত্থানের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছিল।

ইলতুৎমিস তাঁর অধীনস্থ শাসকশ্রেণীর বিন্যাসে বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। তিনি 'ঘুর' অভিজাতদের সক্রিয় সমর্থন ও সাহায্যের ক্ষমতার কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই শাসকগোষ্ঠীকে 'বিচ্ছিন্ন করে শাসন' (Divide and Rule) চালানোর নীতি নেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি তুর্কী ক্রীতদাসদের সংখ্যাবৃদ্ধি করে নিজ শক্তি দৃঢ় করেন। মিনহাজউদ্দিন ও বরণীর বিবরণ থেকে ইলতুৎমিসের আমলের যে পঁচিশজন ক্ষমতাবান 'সামসী' দাসের কথা জানা যায়, তাদের কুড়ি জন বিভিন্ন তুর্কী উপজাতিভুক্ত ছিলেন (৬ জন কুইপেক, ৫ জন কারা খিটা, ৩ জন রুমী বা সেলজুক, ৩ জন ইলবেরী, ১ জন গর্জী এবং ১ জন খারিজম গোষ্ঠীভুক্ত)। মাত্র একজন 'সামসী' অভিজাত ছিলেন অ-তুর্কী বা হিন্দু, সম্ভবত মথুরা অঞ্চলের মানুষ। এদের মধ্যে তিন বা চার জনকে ইলতুৎমিস মোঙ্গলরাজ ঐতিহ্যের অনুসরণে সর্বোচ্চ 'খান' পদমর্যাদায় ভূষিত করেছিলেন। এদের সম্পদ ও ক্ষমতার ভিত্তি ছিল অধিকৃত 'ইক্তা' ও সামরিক দায়িত্ব। ইলতুৎমিসের আমলে সুলতানির শাসকশ্রেণীতে তাঁর তুর্কী ক্রীতদাসদের যেমন প্রাধান্য ছিল, তেমনি অ-তুর্কী দাস এবং স্বাধীন তুর্কী ও অ-তুর্কী অভিজাতর অবস্থানও ছিল। অধ্যাপক ***ইরফান হাবিব*** লিখেছেন : *"Iltutmish accordingly presided over a nobility in which his own corps of Turkish slaves, who held a large number of 'iqtas', and free-born immigrants, who occupied high offices at the court—were almost evenly matched."* ১২২২ ও ১২২৩ খ্রীষ্টাব্দে মোঙ্গলগণ কর্তৃক ঘোর রাজ্য অধিকৃত হলে বহু ঘুরী অভিজাত ভাগ্যান্বেষণে ভারতে চলে আসেন এবং ইলতুৎমিসের সহানুভূতি অর্জন করেন। খারিজম ও তুর্কিস্তান-এর রাজপুরুষদ্বয় ফিরোজ শাহ্ এবং মালিকজানি ইলতুৎমিসের অধীনে সরকারি উচ্চপদে যোগ দেন। এঁরা ছিলেন, তুর্কী, কিন্তু স্বাধীন। মিনহাজউদ্দিন ইলতুৎমিসের আমলের অভিজাতদের 'তুর্কী' ও 'তাজিক' এই দুটি জাতিগত উপাদানে গঠিত বলে উল্লেখ করেছেন। ***অধ্যাপক হাবিবের*** মতে, মিনহাজ তুর্কী বলতে তুর্কী ক্রীতদাস এবং তাজিক বলতে অ-ক্রীতদাস বা স্বাধীন ব্যক্তিদের বুঝিয়েছেন।

ইলতুৎমিসের মৃত্যু এবং গিয়াসউদ্দিন বলবনের সিংহাসনে আরোহণের (১২৩৬-১২৬৬ খ্রীঃ) মধ্যবর্তী দশকগুলিতে সুলতানি শাসকশ্রেণীর জাতিগত এবং ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শঙ্কাজনক রূপে প্রতিভাত হয়। *বরণী* লিখেছেন, এই পর্বে 'চল্লিশ তুর্কী অভিজাত' (বন্দেগান-ই-তুর্ক-ই-চাহেলগানী) অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হয় এবং পুরাতন ঘোর ও খলজী অভিজাতদের দ্রুত

ক্ষমতা থেকে হটিয়ে দেয়। তাঁর মতে, 'সামসী' দাসদের সবাই 'খান' উপাধি দ্বারা সম্মানিত হয়েছিল। ***ইরফান হাবিবের*** মতে, এই মন্তব্য সঠিক নয়, কারণ তখন চল্লিশ জন তুর্কী দাস ক্ষমতার চূড়ায় ছিলেন কিনা-তা সঠিকভাবে প্রমাণিত নয়। তবে এই পর্বে তাজিক ও অন্যান্য স্বাধীন অভিজাতদের ক্ষমতার যে অবনমন ঘটেছিল,—এ কথা মিনহাজউদ্দিনও স্বীকার করেছেন। সুলতান রুকনউদ্দিনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মূল চারজন অভিজাতর মধ্যে একমাত্র কবীর খাঁ ছিলেন সামসী দাস। বাকি তিনজনই ছিলেন 'তাজিক'। এদের নেতা 'উজীর' নিজাম-উল্-মুল্‌ক জুনাইদি'ও ছিলেন একজন 'তাজিক'। কিন্তু শীঘ্রই এই সংঘাত 'জাতিগত' চরিত্র নেয়। তুর্কী আমীররা সংঘবদ্ধ হয়ে বহু 'তাজিক' অভিজাতকে হত্যা করে এবং রাজিয়াকে সিংহাসনে বসিয়ে দেয়। রাজিয়ার উত্তরাধিকারী মুইজউদ্দিন বাহ্‌রাম শাহ্‌র অপসারণে ষড়যন্ত্রকারী অভিজাতদের নেতা ছিলেন তাজিকগোষ্ঠীর উজীর মুহজাবউদ্দিন। এক বিশৃঙ্খলাপূর্ণ পরিস্থিতিতে মুহজাব তুর্কী অভিজাতদের হাত থেকে গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলি নিজ গোষ্ঠীর অভিজাতদের হাতে সরিয়ে আনতে থাকেন। এমতাবস্থায় *'তুর্কান-ই-সুলতানি'* সদস্যদের হাতে তিনিও নিহত হন। এই সময় তুর্কী ক্রীতদাস বলবন (উলুঘ খাঁ) দ্রুত চল্লিশচক্রের ক্ষমতার শীর্ষে উঠে আসেন। ঘোরীবংশীয় অভিজাত, সুপণ্ডিত ও সুদক্ষ প্রশাসক কুতুবউদ্দিন হাসানকে অপসারিত করে ১২৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বলবন *'নায়েব-ই-মামলিকৎ'* পদে অধিষ্ঠিত হন। বলবনের ক্ষমতাবৃদ্ধিকে কেন্দ্র করেও অভিজাতদের অন্তর্বিরোধ প্রকটিত হয়েছিল। হিন্দুস্থানী মুসলিম আমীর ইমাদউদ্দিন রাইহানের নেতৃত্বে যে বিরোধীগোষ্ঠী সক্রিয় হয়ে উঠে, তার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সদস্যরা যেমন কিশলু খাঁ, কুতলঘ খাঁ প্রমুখ ছিলেন তুর্কী। এই বিরূপতার কারণে বলবন ১২৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষমতাচ্যুত হন। কিন্তু এক বছরের মধ্যেই তিনি পুনরায় কর্তৃত্বে ফিরে আসেন। ১২৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ঘোরী অভিজাত কুতুবউদ্দিন মারা যান। অতঃপর তুর্কী আমীরদের আধিপত্য প্রশ্নহীন হয়ে ওঠে। ***ইরফান হাবিব*** মনে করেন, এই পর্বে (১২৩৬-'৬৬ খ্রীঃ) তুর্কী বনাম তাজিক কিংবা দাস বনাম স্বাধীন অভিজাতদের গোষ্ঠীসংঘাত সত্ত্বেও শাসকশ্রেণীর মধ্যে এক ধরনের 'মিশ্র' চরিত্র বজায় ছিল *(inspite of the great cleavage between the Turks and Taziks, and the slave and the freeborn, the concept of a composite ruling class still existed)*।[1] এবং এই সহাবস্থানের মূল কারণ ছিল বহিরাগত তৃতীয় শক্তি, যেমন রাজিয়ার আমলে হাবসী জামালউদ্দিন ইয়াকুৎ-এর উত্থান প্রতিরোধ করা। ১২৫৪ খ্রীষ্টাব্দে আমীর বলবনের বিরুদ্ধে তুর্কী, তাজিক, ঘোরী ও হিন্দুস্থানী আমীরদের হাতে হাত রেখে রুখে দাঁড়ানোর পেছনেও ব্যক্তিগত অস্তিত্ব রক্ষার মানসিকতা সক্রিয় ছিল।

'চল্লিখ চক্রের' (চাহেলগান) অন্যতম নেতা ছিলেন বলবন। স্বভাবতই তুর্কী অভিজাতদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ক্ষমতার লোভ সম্পর্কে তিনি সম্যক অবহিত ছিলেন। তুর্কী ক্রীতদাস থেকে সুলতান পদে উন্নীত হলেও, বলবনের সামাজিক মর্যাদা যে অন্যান্য অভিজাতদের তুলনায় উন্নত নয়, এ বিষয়ে তাঁদের একটি ধারণা দৃঢ়মূল ছিল। তাই বলবন সুলতান ও রা[illegible]পদকে মর্যাদা ও কর্তৃত্বের এমন একটা স্তরে উন্নীত করতে চেয়েছিলেন, যাকে স্পর্শ করা চাহেলগানীর সদস্যদের পক্ষে কেবল অসম্ভব নয়, অবাস্তবও মনে হয়। রাজপদকে তিনি ঈশ্বরের স্বীকৃতি বলে ঘোষণা

করেন এবং মানসিক গুণাবলীসম্পন্ন অভিজাতদের সাথে সুলতানের দুরতিক্রম্য ব্যবধানের কথা ঘোষণা করেন। সুকৌশলে চাহেলগানীর ক্ষমতাবান সদস্যদের হত্যা কিংবা অপসারিত করেন এবং ক্রমে এই সংস্থাকে ভেঙে দেন। বংশকৌলিন্য এবং নীলরক্তের অধিকারীদের শুধুমাত্র উচ্চরাজ পদের উপযুক্ত বলে জানিয়ে দেন। তবে জন্মগত কৌলিন্যের বেড়াজাল দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। বলবনের পৌত্র ও উত্তরাধিকারী কাইকোবাদ বংশকৌলিণ্যের পরিবর্তে যোগ্যতাকে উচ্চপদে নিয়োগের প্রধান শর্ত হিসেবে গ্রহণ করেন। ***অধ্যাপক ইকতিদার হুসেন সিদ্দিকী*** *'Social mobility in the Delhi Sultanate'* শীর্ষক প্রবন্ধে[1] বলেছেন শিক্ষার প্রসার, কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা, সুফীবাদের প্রচার, শিল্প-কারখানার প্রসার ইত্যাদি কারণে বহিরাগত মুসলমানদের প্রশাসনিক একাধিপত্য ভেঙে যায় এবং সমাজের অধিকারহীন শ্রেণীর উচ্চক্রমে উত্থান সম্ভব হয়। কাইকোবাদের আমলে উচ্চ অভিজাত রূপে ধর্মান্তরিত মুসলমান কমল মাহিয়ার নিযুক্তি (এঁকে বলবন উচ্চপদ দিতে অস্বীকৃত হয়েছিলেন) এই বক্তব্যকে সমর্থন করে।

'খলজী'দের শাসন শুরু হলে সুলতানির উচ্চপদে নিয়োগনীতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। ড. ***কে. এস. লাল খলজী*** শাসনের সূচনাকে 'তুর্কী একাধিপত্যের বিরুদ্ধে ভারতীয় মুসলমানদের জেহাদ ও সাফল্যের দৃষ্টান্ত' বলে উল্লেখ করেছেন। বস্তুত, তুর্কী দাস ও তুর্কী অভিজাতগণ কর্তৃক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে আফগানী বা ভারতীয় মুসলমানদের সাথে খলজীদের একটা নৈকট্য সৃষ্টি হয়েছিল। ঐতিহাসিক কারণে খলজীরা শাসকপদে নিয়োগের ক্ষেত্রে ধর্ম, জাতি বা বংশগৌরব ইত্যাদিকে প্রথম থেকেই অগ্রাহ্য করেন। সুলতান জালালউদ্দিন খলজী 'ভকিল-ই-দার' পদে মান্দাহার জাতিভুক্ত জনৈক হিন্দুকে নিয়োগ করে এই পরিবর্তনের সুচনা করেছিলেন। আলাউদ্দিন খলজী এই পরিবর্তন সম্পর্কে প্রথমে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। কিন্তু বাস্তববাদী রাজনীতিক আলাউদ্দিন বুঝেছিলেন যে, বহিরাগত অভিজাতশ্রেণীর একচেটিয়া আধিপত্য তাঁর কর্তৃত্বের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। তাই তিনি অ-তুর্কী এবং ভারতীয় অভিজাতদের ক্ষমতা ও পদমর্যাদা দিয়ে দরবারে নিয়ে আসেন। ***বরণী*** লিখেছেন যে, তাঁর রাজত্বের তৃতীয় তথা শেষ পর্বে দরবারে নিম্নবংশীয় ব্যক্তিদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁর বিবরণ থেকে দেখা যায় যে, ধর্মীয় ও আধাধর্মীয় পদ, যেমন—প্রধান কাজী (কাজাৎ-ই-মামালিক), প্রধান সদর (Sadar-us-sudar) ইত্যাদিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে আলাউদ্দিন প্রথমদিকে কেবল শেখ্, সৈয়দ প্রভৃতি বংশভুক্ত ব্যক্তিদের প্রাধান্য দিতেন। কিন্তু ক্রমে তিনি বংশকৌলিন্যহীন, জালালউদ্দিন লিভালজী, মৌলানা জিয়াউদ্দিন, হামিদউদ্দিন সুলতানি প্রমুখকে নিয়োগ করে এই সকল পদের গুরুত্ব ও মর্যাদা হ্রাস করেন। সমসাময়িক কালের চিস্তি সাধক শেখ নাসিরউদ্দিন চিরাগ হামিদউদ্দিন-এর দক্ষতা ও গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করলেও, বরণী নীচবংশীয়দের উচ্চপদ লাভে খুবই অসন্তুষ্ট ছিলেন। যাই হোক্, এই পরিবর্তনের পথ বেয়েই মুবারক শাহ খলজীর আমলে হিন্দু পারোয়ারী জাতিভুক্ত খসরু খান পারোয়ারী *'নায়েব-ই-সুলতানৎ'* পদে উন্নীত হতে পেরেছিলেন। গিয়াসউদ্দিন তুঘলক খসরু খাঁর শাস্তির দাবি তুলে অভিজাতদের সন্তুষ্ট করেন এবং খসরু খাঁকে সরিয়ে নিজের কর্তৃত্ব সুদৃঢ় করেন।

অবশ্য তিনিও হিন্দু খোক্কর উপজাতীয়দের উচ্চপদে নিয়োগ করে এবং 'ইক্‌তা' প্রদান করে নিম্নবংশীয়দের উচ্চক্রমে গতিশীলতাকে অব্যাহত রেখেছিলেন।

মহম্মদ-বিন্‌-তুঘলকের আমলে সূক্ষ্ম কিছু কূটনৈতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাসহ এই গতিশীলতা সক্রিয় ছিল। বলবন মূলত তুর্কী অভিজাতদের এবং আলাউদ্দিন হিন্দুস্থানী অভিজাতদের বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু কোন পক্ষই এককভাবে সুলতানি প্রশাসনকে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা দিতে পারেনি। এই কারণে তিনি রাজত্বের প্রথম পর্বে ভারতে স্থায়িভাবে বসবাসকারী তুর্কী অভিজাত এবং হিন্দুস্থানী অভিজাতদের পরিবর্তে বিদেশী মুসলমানদের উচ্চ পদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেন। বিদেশীদের আকর্ষণ করার জন্য উচ্চ পদ, দরবারী মর্যাদা, রাজকীয় খেতাব, মহার্ঘ উপহার ও পারিতোষিক প্রদানের অঙ্গীকার করেন। স্বভাবতই বহু বিদেশী মুসলমান সরকারি পদের লোভে ভারতে প্রবেশ করেন। বহিরাগত 'অইজ্জা' (মাননীয় বন্ধু)-দের অভিজাতর মর্যাদা দিয়ে মহম্মদ তুঘলক তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন। কিন্তু এই সকল ভাগ্যান্বেষী বিদেশী মুসলমান ছিলেন একান্তই পেশাদার। রাষ্ট্রের শুভাশুভ বিষয়ে তাঁদের সামান্যতম আগ্রহ ছিল না। দ্রুত ভারতীয় সম্পদের অধিকারী হয়ে স্বদেশে ফিরে যাওয়াই ছিল এঁদের লক্ষ্য। এমতাবস্থায় সুলতান আবার একটা দুঃসাহসী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এবারে তিনি জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে হিন্দুস্থানের সাধারণ মানুষকে যোগ্যতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে উচ্চ প্রশাসনিক পদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেন। ***অধ্যাপক আশরাফ*** লিখেছেন, *"রাজ্যের সামরিক ও বেসামরিক সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন পদগুলিতে সর্বশ্রেণীর ভারতীয়দের অধিকার স্বীকৃত হয় এবং এইসব পদে নিযুক্তির আবশ্যিক যোগ্যতা হয় প্রার্থীর সহজাত দক্ষতা ও কর্মদক্ষতা।"* বরণী এবং ইবন বতুতা উভয়েই মহম্মদ তুঘলকের আমলে উচ্চপদে অতি নিম্নবর্গীয় সাধারণ মানুষের নিযুক্তির কথা বলেছেন। এদের মধ্যে সাম্রাজ্যে 'আবর্জনার মত পরিত্যক্ত' নাপিত, পাচক, মালি, ছোট দোকানদার, নর্তক-নর্তকী, ক্রীতদাস ইত্যাদি সবাই ছিল। যেমন, হিন্দু নাপিত রতন সিন্ধু প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন। অঙ্কশাস্ত্রে গভীর ব্যুৎপত্তির কারণে তিনি সুলতানের দাক্ষিণ্য পান। গায়ক নাজির পেয়েছিলেন, গুজরাট, মালব ও বদাউনির শাসনভার। অনুরূপভাবে আজিজ খুমার, নাজিব, মাসুদ (মদ প্রস্তুতকারী), শেখবাবু (মালি), মকবলু (দাস) প্রমুখ অসংখ্য নিম্নবর্ণজাত মানুষ উচ্চপদে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। বরণী ও ইবন বতুতার বিবরণ থেকে স্পষ্ট যে, নিম্নবর্ণীয়দের অভিজাতর মর্যাদা প্রদানে মহম্মদ তুঘলক কেবল রাজনৈতিক ভাবনা দ্বারা চালিত হননি। এঁদের শিক্ষাদীক্ষা, সহজাত দক্ষতা ইত্যাদি গুণাবলীও সুলতানের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করেছিল।

সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের আমলে নিম্ন প্রশাসনিক পদে আফগানদের নিয়োগ শুরু হয়েছিল। নতুন স্থাপিত পুলিশ চৌকি এবং আঞ্চলিক সেনাবাহিনীতে আফগানদের নিয়োগ করা হত। আমীর খসরুর দৃষ্টিতে এই সকল বহিরাগত মুসলমান, যারা ধর্মান্তরিত মুসলমানের সাথে তুল্য, ছিল অসংস্কৃত, অশিক্ষিত এবং সুসংস্কৃত তুর্কী সমাজে বসবাসের অযোগ্য। কিন্তু ক্রমে এদের মধ্যে শিক্ষালাভের প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং আলাউদ্দিন খলজীর আমলে একটি শিক্ষিত ও দক্ষ গোষ্ঠী হিসেবে আফগানরা রাজনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদার অংশীদার হয়। মহম্মদ-বিন্‌-তুঘলকের আমলে আফগান অভিজাতদের প্রতিপত্তি প্রবল হয়ে ওঠে। সুলতানের গণতান্ত্রিক নিয়োগ নীতি আফগানদের প্রবল ক্ষমতাশালী করে তোলে। তৈমুরের আক্রমণের পরেও এরা

ক্ষমতা ধরে রাখতে সক্ষম হয় এবং শেষ পর্যন্ত দিল্লীর উপর কর্তৃত্ব কায়েম করে। এই পর্বে সরকারি উচ্চপদে অ-তুর্কী মুসলমান ও ভারতীয় (হিন্দু)-দের কর্তৃত্ব প্রশ্নহীন হয়ে উঠেছিল।

O সুলতানি আমলে সামাজিক সচলতা ঃ

দিল্লীর সুলতানি শাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল প্রাক্-মুসলিম হিন্দু (রাজপুত) সামাজিক ধ্রুপদীয়ানার ভাঙন এবং সামাজিক বিভিন্ন স্তরের গতিশীলতা। ত্রয়োদশ শতকে দিল্লী-সুলতানির প্রতিষ্ঠা উত্তর ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনধারার রূপান্তরের সূচনা করেছিল। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পরবর্তী পর্যায়ে ভারতের রাজনীতিতে যে বহু রাষ্ট্রীয় চরিত্র সন্নিবিষ্ট হয়েছিল, তার পরিবর্তন ঘটে এবং কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক সংগঠনের আবির্ভাব ঘটে। ঐতিহাসিক *মহম্মদ হাবিব, নিজামী, ইক্‌তিদার হুসেন সিদ্দিকি* প্রমুখ নানা প্রবন্ধে সুলতানি আমলে সামাজিক সচলতার প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন।

সুলতানি আমলে সামাজিক গতিশীলতার দুটি প্রধান উপাদান ছিল ব্যাপক নগরায়ণ (urbanisation) এবং সমৃদ্ধ বাণিজ্য। মহম্মদ হাবিব দিল্লী-সুলতানির প্রতিষ্ঠাকে 'উত্তর ভারতে নগর-বিপ্লবের পর্ব' *(the urban revolution in North India)* বলে উল্লেখ করেছেন। সুলতানি শাসনের দুটি সামাজিক প্রতিক্রিয়া ছিল লক্ষণীয়। ***প্রথমত,*** সুলতানি শাসনের প্রতিষ্ঠা শাসকশ্রেণীর চরিত্র বদলে দিয়েছিল। রাজপুত ঠাকুরদের পরিবর্তে ভারতের প্রধান শাসকশ্রেণী হিসেবে বহিরাগত তুর্কীদের প্রতিষ্ঠা ঘটে। ***দ্বিতীয়ত,*** সমস্ত স্তরের নগর-কর্মীদের জাতিগত ভেদাভেদের অবসান ঘটেছিল। অধ্যাপক হাবিবের মতে, হিন্দু-রাজপুত আমলে সমস্ত স্তরের হিন্দু নগর-শ্রমিক (Hindu city labour) অর্থাৎ কারিগর, শ্রমিকসহ সাধারণ হিন্দু জনতা বর্ণভেদ ও জাতিভেদের আবদ্ধ থেকে তাদের স্বাভাবিক অধিকার ও বিকাশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল। মুসলমানদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় এই শ্রেণীর সমর্থন ছিল গুরুত্বপূর্ণ। দিল্লী-সুলতানির প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্ব বিধানে মুসলমানদের পাশাপাশি সামাজিকভাবে অবহেলিত হিন্দুদের অবদান অনস্বীকার্য। ***অধ্যাপক সিদ্দিকির*** মতে, সুলতানি আমলে নব প্রতিষ্ঠিত শহরগুলিতে তথাকথিত নিম্নবর্ণের হিন্দু কারিগর ও শিল্পীরা শাসকশ্রেণীর পাশাপাশি থেকে তাদের প্রতিভার বিকাশ ও শ্রমশক্তির সদ্-ব্যবহার করার পূর্ণ সুযোগ পায়। এই নগরায়ণ ব্যবস্থা কারিগরশ্রেণীর সামাজিক গতিশীলতা নিয়ে আসে। তিনি লিখেছেন ঃ *"This process of uranization, started under the Sultans, soon led to soci.l mobility among craftsmen in the urban centres"*।[1] প্রসঙ্গত লক্ষণীয় যে মুসলিম শাসকগোষ্ঠী তাঁদের আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বৃহৎ সংখ্যক কারিগর, শিল্পী ও শ্রমিকদের নগর বিন্যাসের সাথে যুক্ত করতেন। এরা নগরবাসী হিসেবে সামাজিক মর্যাদা ও অধিকার ভোগ করত। কিন্তু যারা ভূমিহীন বা কোনরকম উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে যুক্ত নয়, তাদের পক্ষে কি সামাজিক সচলতার শরিক হওয়া সম্ভব হয়েছিল?

সামাজিক সচলতার আর একটি উপাদান ছিল বাণিজ্যিক প্রসার। সুলতানি আমলের নতুন আর্থ-সামাজিক পরিবেশে কারিগরশ্রেণী আর্থিক প্রগতির নানা সুযোগ পেয়েছিল। সীমান্ত

গুজরাট ও মালবের প্রশাসনে 'ক্ষত্রী'দের প্রাধান্য ছিল লক্ষণীয়। স্বাধীন গুজরাট রাজ্যের স্থপয়িতা সুলতান মুজফ্ফর শাহের অতি বিশ্বস্ত ও প্রভাবশালী আমলা হিসেবে জীবন ক্ষত্রী, রাইদাস ক্ষত্রী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

পাঞ্জাব ও মুলতান অঞ্চলের আর একটি হিন্দুগোষ্ঠী 'কম্বো'রাও সুলতানি আমলে উচ্চক্রমে উত্থানের সুযোগ পেয়েছিল। প্রধানত কৃষিজীবী এই শ্রেণী সুফী সাধকদের সংস্পর্শে এসে ইসলামধর্মে আকৃষ্ট হয় এবং প্রশাসনিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা পায়। শেখ সুরাবর্দী, শেখ বাহাউদ্দিন জাকারিয়া প্রমুখের সংস্পর্শে এসে এরা ইসলামে ধর্মান্তরিত হয় এবং শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহ বোধ করে। বাহাউদ্দিনের বংশধর ইউসুফ কুরেশী পঞ্চদশ শতকে মুলতানে স্বাধীন শাসনের সূচনা করলে কম্বো সম্প্রদায় তাঁকে সমর্থন জানায় এবং একটি সামাজিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। এই সময় উলেমা ও সুফী সাধক (মুশাইক) হিসেবেও কম্বোদের অনেকে খ্যাতি পান। লোদী বংশের আমলে শেখ সাম্সউদ্দিন কম্বো, শেখ জামালি প্রমুখ বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন।

কম্বো, ক্ষত্রী, কালালদের মত ব্যবসাবৃত্তিধারী জৈনদেরও সামাজিক উচ্চক্রমে উত্তরণের ঘটনা লক্ষ্য করা যায়। অভিজ্ঞ রত্ন বিষারদ ফেরু জৈন আলাউদ্দিন খলজীর আমলে সরকারি টাঁকশালের সুপারিনটেন্ডেন্ট নিযুক্ত হয়েছিলেন। মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের আমলেও তাঁর যথেষ্ট মর্যাদা ও প্রতিপত্তি ছিল। আগামাহদী হুসেন-এর বিবরণ থেকে জানা যায় যে, মুবারক শাহ্ খলজীর আমলে জনৈক সমর সিং জৈন সরকারি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। গুজরাট, নাগাউরসহ বিভিন্ন আঞ্চলিক রাষ্ট্রে জৈন সম্প্রদায়ভুক্তদের সামাজিক মর্যাদার ক্রমোন্নতি অব্যাহত ছিল। সুলতানি আমলের পতনের কালেও জৈনদের সামাজিক অগ্রগতির ধারা অব্যাহত ছিল।

সামাজিক সচলতার ক্ষেত্রে সুফী দর্শনের প্রভাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সুফী মতাদর্শে সমস্ত সামাজিক স্তরের মানুষ সমমর্যাদা ও অধিকার ভোগের অধিকারী ছিল। উচ্চশ্রেণীর তুলনায় তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মুসলমান, সামাজিক বা অর্থনৈতিক উভয় দিক থেকেই, সুফীবাদের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সুফী-সন্তদের শিষ্য (মুরিদ) গ্রহণের ক্ষেত্রে এই উদারতা স্বাভাবিকভাবেই সামাজিক সচলতার সহায়ক হয়েছিল। শেখ হুসেন নাগাউরি চিস্তির অন্যতম মুরিদ জনৈক ঝাড়ুদার পরবর্তীকালে সুফী-সন্ত হিসেবে প্রভূত খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন। অধ্যাপক সিদ্দিকি উল্লেখ করেছেন যে, সুফী সাধক হিসেবে এই নিম্নবর্ণীয় ধর্মান্তরিত হিন্দু যে শ্রদ্ধা ও সম্মান অর্জন করেছিলেন, তা পঞ্চদশ শতকের সামাজিক গতিশীলতায় অনন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হবে। কারণ অন্যথায় তাঁকে একজন অস্পৃশ্য হিসেবেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হত।

দিল্লী-সুলতানির আমল এবং তৈমুর লঙ-এর আক্রমণকাল থেকে মুঘলশাসন প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত সময়কালের সামাজিক সচলতার ধারা প্রায় একই গতিতে সক্রিয় ছিল। কারণ এই পর্বে রাজনৈতিক স্থিতির পরিবর্তন ঘটলেও শাসকশ্রেণীর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রায় অভিন্ন ছিল। সামাজিক সচলতার উপাদানগুলিও একই বৈশিষ্ট্য ও শক্তিসহ অবস্থান করছিল। নগরায়ণের ধাবা এবং উদারতান্ত্রিক ধর্ম ও সমাজ দর্শনের প্রসার নিঃসন্দেহে এই সচলতার প্রক্রিয়াকে মূল শক্তি

যোগান দিয়েছিল। রাজকীয় দাস-ব্যবস্থাকে সামাজিক সচলতার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে অবশ্যই স্বীকৃতি দিতে হয়। অর্থাৎ আলোচ্য পর্বে একাধিক উপাদান স্বতন্ত্রভাবে এবং মিলিতভাবে এই প্রক্রিয়াকে একটা লক্ষণীয় রূপ দিতে সাহায্য করেছিল। অধ্যাপক সিদ্দিকির ভাষ্য থেকে আমরা সেই উপাদানগুলিকে চিহ্নিত করতে পারি। এদের মধ্যে প্রাথমিক উপাদানগুলি হল সুলতানি শাসনের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, নগরায়ণ প্রক্রিয়া, কয়েকজন সুলতানের আলোকপ্রাপ্ত দৃষ্টিভঙ্গি, সুফী সাধকদের কর্মধারা ও আদর্শ ইত্যাদি।

○ হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি সমন্বয় ঃ

সাধারণভাবে বলা হয় যে, অভ্যন্তরীণ বা বহিরাগত উপাদানের ফলে উদ্ভূত নব-সংস্কৃতির সাথে গঠনমূলক সমঝোতার (Adjustment) ধারাবাহিক প্রক্রিয়া থেকে সমাজব্যবস্থার রূপান্তর ঘটে।[1] সুলতানি আমলে ভারতীয় সমাজব্যবস্থার রূপ পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও এই মন্তব্য যথার্থ। এই পর্বে তিনটি পর্যায়ে গতিশীল শক্তির অভিঘাতে ভারতীয় সমাজের রূপান্তর লক্ষ্য করা যায়। যথা—(১) হিন্দু-সমাজের অভ্যন্তরীণ শক্তির প্রয়াস, (২) নবাগত মুসলিম-সমাজ ও সংস্কৃতির ধারা এবং (৩) হিন্দু ও মুসলিম-সমাজের মিলিত ধারা। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি কিভাবে হিন্দুসমাজ মুসলিম ধর্ম ও সংস্কৃতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আরো বেশি করে নিয়ম রীতির কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপ করে কিছুটা আত্মঘাতী পথে অগ্রসর হয়েছিল। আবার মুসলমানরাও সামাজিকভাবে অস্তিত্ব রক্ষা ও কর্তৃত্ব করার আশায় প্রাথমিকভাবে গোঁড়াপন্থী নেতৃত্ব দ্বারা চালিত হয়ে শাসকশ্রেণীর অহংসর্বস্বতা জাহির করতে ব্যগ্র ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই দু'টি চমপন্থী ধারাই আসার প্রতিপন্ন হয়। উত্থান ঘটে তৃতীয় ধারাটির। নীরবে এবং অতি ধীর গতিতে সমন্বয়ের উপাদানগুলি সামাজিক সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রিত করতে থাকে।

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারায় সমন্বয়বাদী চরিত্র প্রাচীনকাল থেকেই লক্ষ্য করা যায়। মুসলমানদের অনুপ্রবেশের আগে বহু জাতি ভারতে প্রবেশ করেছে এবং তাদের বাহিত সংস্কৃতির সাথে ভারতীয় সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটিয়ে নতুনতর ও উন্নততর সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে। অতি প্রাচীনকালে আর্য-সংস্কৃতির সাথে দ্রাবিড়-সংস্কৃতির মিলন ঘটেছে। তার পরে এসেছে গ্রীক, শক্, হুন প্রভৃতি জাতি। এরাও কালক্রমে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির সাথে মিলিত হয়ে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ভুলে গিয়ে পুরোপুরি ভারতীয় হয়ে গিয়েছে। অনুরূপভাবে মধ্যযুগে মুসলমানদের অনুপ্রবেশ ও স্থায়িভাবে বসবাসের সূত্রে ভারতীয় তথ্য হিন্দু-সংস্কৃতির সাথে ইসলামীয়-সংস্কৃতির মিলন-সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়মে। তবে এ ক্ষেত্রে সমন্বয়ের ধারা কিছুটা ব্যতিক্রমী চরিত্রের। মধ্যযুগে হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির আত্তীকরণ প্রক্রিয়া অগ্রসর হয়েছে নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে এবং অত্যন্ত ধীর গতিতে।

মুসলমানরা ভারতে আসার আগেই তাদের ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্রদর্শন একটা পূর্ণ রূপ ধারণ করেছিল। সংগঠনগতভাবে ধর্মের সাথে সমাজ ও রাষ্ট্রদর্শনকে যুক্ত করার ফলে ইসলাম-সংস্কৃতি অতি দ্রুত দৃঢ় ভিত্তি পেয়েছিল। ইসলামের এই স্বকীয়তা ও স্বয়ম্ভরতার দরুন প্রায় সম্পূর্ণ বিপরীত ভারতীয় সংস্কৃতির সাথে তার মিলন সহজ ছিল না। ইসলাম ধর্ম একেশ্বরবাদী এবং

প্রচণ্ডভাবে পৌত্তলিকতা-বিরোধী। কিন্তু হিন্দু বহু ঈশ্বরবাদী ও পৌত্তলিক। আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেও উভয় ধর্মের মধ্যে নানা বিষয়ে প্রত্যক্ষ বৈপরীত্য ও বিরোধ স্পষ্ট। স্বভাবতই এহেন দুটি ধর্মদর্শন ও জীবনধারার সমন্বয় বা সহাবস্থান নয় ; প্রথম পর্বে তীব্র বিদ্বেষভাব দেখা দিয়েছিল স্পষ্টরূপে। ইসলাম রাষ্ট্রতত্ত্ব অনুসারে কোন মুসলিম রাষ্ট্রে মুসলমান এবং '*অহল-ই-কিতাব*'—যেমন ইহুদী, খ্রীষ্টান প্রমুখ ছাড়া অন্য কারো অবস্থান বা অস্তিত্ব আইনগ্রাহ্য নয়। বিশেষ করে পৌত্তলিকদের সেখানে কোন স্থানই নেই। অহল-ই-কিতাব'রা 'জিম্মি' হিসেবে জিজিয়া কর প্রদানের শর্তে বসবাসের অধিকারী হলেও, পৌত্তলিকদের জন্য প্রকৃত ইসলামী রাষ্ট্রে কোন স্থান স্বীকৃত ছিল না। তাই তাত্ত্বিক দিক থেকে ভারতে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে হিন্দুরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করেন এবং মুসলমানরা বিজয়ী পক্ষ হিসেবে ইসলামীয় রাষ্ট্রতত্ত্বকে যথাযথভাবে অনুসরণ করতে আগ্রহী থাকেন। ফলে অনিবার্যভাবে দেখা দেয় সংঘাত। সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে এই সংঘাত তীব্রভাবে প্রকাশ পায়। গোঁড়া মুসলমানদের চোখে 'কাফের' হিন্দুদের এবং গোঁড়া হিন্দুদের চোখে 'ম্লেচ্ছ' মুসলমানদের সহাবস্থান বা উভয় সম্প্রদায়ের সৌভ্রাতৃত্ববোধের বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। তাছাড়া, উভয় ধর্মের শাস্ত্রবিদ্‌রা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে রাজনীতিবিদ্‌রা হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিরোধ জিইয়ে রাখতে আগ্রহী ছিলেন, কারণ ধর্মের দোহাই দিয়ে গোষ্ঠীভুক্ত মানুষকে একত্রিত করে স্ব স্ব স্বার্থ পূরণ করা সম্ভব হত। হিন্দু তাত্ত্বিকরাও সামাজিক স্তরে একীকরণের দ্বারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদাবৃদ্ধির গুরুত্ব অনুধাবন করতে ব্যর্থ হন।

প্রাথমিক সংঘাত সত্ত্বেও, ভারতে মুসলমান শক্তির ক্রমপ্রসারের গোড়া থেকেই এমন একটা সংস্কারবাদী ধারা প্রবাহিত ছিল, যা কালক্রমে এই দুই সংস্কৃতির মধ্যস্থিত পাঁচিলটিকে একটু একটু করে ভেঙে ফেলতে সাহায্য করেছিল। আরব সেনাপতি মহম্মদ-বিন্-কাশিম সিন্ধু ও মুলতান দখল করার পর (৭১১ - '১২ খ্রীঃ) খলিফার কাছ থেকে এখানকার হিন্দুদের জন্য 'জিম্মি'র মর্যাদা আদায় করে আনেন। একান্ত রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে খলিফা পৌত্তলিকদের জন্য এই মর্যাদা সম্প্রসারিত করে রাষ্ট্রপ্রজ্ঞার পরিচয় দেন এবং ভবিষ্যতে এই দুটি মহান ও সবল সংস্কৃতির মিলনের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেন। ঐতিহাসিক *এ. এল. শ্রীবাস্তব* এটিকে খলিফার 'তাৎক্ষণিক' এবং 'প্রয়োজনভিত্তিক' সিদ্ধান্ত বলে অভিহিত করেছেন। ইতিমধ্যে ইসলামীয় আইন বা 'শরা' ব্যাখ্যাকারী হিসেবে চারটি গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটেছিল। এগুলি হল হানাফি, মালাকি, শাফী এবং হানাবলী। হানাফি মতবাদের প্রবক্তা আবু হানিফা (৬৯৯ - ৭৬৬ খ্রীঃ) কেবলমাত্র ইসলামীয় রাষ্ট্রে পৌত্তলিকদের 'জিজিয়া' প্রদানের বিনিময়ে বসবাস ও নিরাপত্তার তত্ত্ব প্রচার করেন। ভারতের তুর্কী-সুলতানগণ প্রয়োজনগত ভাবেই হোক্ কিংবা আদর্শগত ভাবেই হোক্ 'হানাফি' মতটিকেই অধিক গুরুত্ব দেন। এইভাবে একটি ইসলামীয় রাষ্ট্রে পৌত্তলিক হিন্দুদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রাথমিক সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। তুর্কো-আফগান সুলতানেরা ধর্মাশ্রয়ী রাষ্ট্রের (Theocratic state) তত্ত্বকে আক্ষরিক অর্থে অস্বীকার করে সংস্কৃতি-সমন্বয়ের কাজকে আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে দেন।

সংস্কৃতি-সমন্বয়ের কাজে মোঙ্গলদের পরোক্ষ অবদান উল্লেখ্য। মোঙ্গলদের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার ফলে পশ্চিম-এশিয়া ও আফগানিস্তান থেকে ভারতবর্ষে মুসলমানদের ব্যাপক

অনুপ্রবেশ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ভারতে ধর্মান্তরিত মুসলমানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হয় এবং এরাই এদেশে ইসলামধর্ম ও সংস্কৃতির রক্ষকে পরিণত হয়। মুসলমানদের প্রধান অংশ প্রাক্তন হিন্দু হওয়ার ফলে দেশের মূল জনসমাজের জীবনধারণ-পদ্ধতির সঙ্গে মুসলমানদের তেমন কোন পার্থক্য ছিল না। স্বভাবতই দুই ধর্মের মধ্যে প্রভেদ থাকলেও হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে এক সমঝোতা ও আদান-প্রদানের মনোভাব গড়ে ওঠে। একই সাথে দীর্ঘকাল বসবাস করার সূত্রে উভয় সংস্কৃতির মেলবন্ধন সম্ভব হয়। ধর্ম, শিল্পকলা, সাহিত্য ও সামাজিক জীবনে সংস্কৃতি-সমন্বয়ের প্রভাব বেশি করে অনুভূত হয়।

আলোচ্য পর্বে ধর্মের ক্ষেত্রে এক উদার ও পরমতসহিষ্ণুতার আদর্শ জন্ম নেয় এবং জনমনে গভীর প্রভাব ফেলে। বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুযোগীদের প্রভাব ইসলামের মধ্যে অতীন্দ্রিয়বাদের উদ্ভবে কোন-না-কোন ভাবে সাহায্য করে বলে কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন। আবার ইসলামের একেশ্বরবাদ এদেশে ভক্তিবাদী আন্দোলনের উৎস হিসেবে কাজ করে বলে মনে করা হয়। সুফীবাদ ও ভক্তিবাদ উভয় মতবাদেই 'এক ঈশ্বর' এবং প্রেম ও ভক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভের তত্ত্ব প্রচার করা হয়। মুসলিম সুফী-সন্তগণ ধর্মসহিষ্ণুতার নীতি প্রচার করেন। সুফী-সন্তদের 'দরগা' হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত ধর্মপ্রাণ মানুষের মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয়। এই ধর্ম-সহিষ্ণুতার পরিণত স্বরূপ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সত্যপীরের আরাধনা জনপ্রিয়তা পায়। একথা অনস্বীকার্য যে, মধ্যযুগে ভারতে সংস্কৃতি-সমন্বয়ের অন্যতম উৎস হিসেবে এই দুই মতবাদ নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করে। সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এর প্রভাব পড়ে। নিম্নবর্ণের বহু মানুষ সুফীবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সুফীবাদের প্রভাবে হিন্দু-সমাজে প্রচলিত জাতিভেদ বা বর্ণভেদ প্রথার ব্যাপকতা কিছুটা হ্রাস পায়। অবশ্য সামাজিক সমন্বয়ের ধারা সমাজের সর্বস্তরে সমানভাবে প্রতিফলিত হয়নি। তবে এই পর্বে সমন্বয়ের যে ধারা জন্ম নিয়েছিল, বর্তমান কালের সামাজিক মেলবন্ধন তারই ফলশ্রুতি।

শিল্প-স্থাপত্যে সমন্বয়ের প্রক্রিয়া ছিল তুলনামূলকভাবে সরল এবং এর প্রভাব ছিল গভীর। তুর্কীদের সাথে ভারতে এসেছিল আরবী ও পারসিক শিল্পরীতি। ক্রমে বৌদ্ধ ও হিন্দু স্থাপত্যরীতির সাথে পারসিক শিল্পরীতির সম্মেলনে জন্ম নিল এক নতুন ধারা। মন্দির ভেঙে মসজিদ করতে গিয়ে প্রচলিত 'চৌকাট'-সম্পন্ন খিলানের পাশাপাশি তির্যক খিলান ও গম্বুজের সহাবস্থান ইন্দো-পারসিক শিল্পরীতির জন্ম দেয়। ভারতীয় কারিগর বা শিল্পী মসজিদ নির্মাণ করতে গিয়ে কখন নিজের অজান্তে পারসিক-রীতির সাথে শিল্পীমনের গভীরে লালিত ভারতীয়-রীতির মিলন ঘটিয়ে ফেলে। ড. *রোমিলা থাপার* লিখেছেন ঃ *"মুসলমান ও ভারতীয় স্থাপত্য-রীতির মিলনে যে নতুন রীতির জন্ম হয়, তার সঙ্গে উভয় প্রথাগত স্থাপত্যের পার্থক্য ছিল। হিন্দু প্রতীক, যেমন পদ্মফুল নতুন রীতির অঙ্গীভূত হয়ে যায়। এই সমন্বয় নানাভাবে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির মিলনের চরিত্র নির্দেশ করে। ব্রাহ্মণ বা উলেমা প্রমুখ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করার জন্য সচেষ্ট হলেও মিলনের স্রোত ধীরে ধীরে গতিশীল হয়ে উঠে।"*

ক্রমে ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এই দুই সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ আদান-প্রদান গড়ে উঠে। সাহিত্যে সমন্বয়ী ধারার পথপ্রদর্শক ছিলেন কবি আমীর খসরু। তখন সরকারি ভাষা ছিল ফার্সী। আমীর খসরুর প্রখ্যাত গ্রন্থগুলি ফার্সীতেই রচিত হয়েছিল। তবে তিনি হিন্দীতেও বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা

করেন। খসরু ফার্সী ভাষার ভারতীয়করণ করেন। সুফী-সন্ত এবং খসরুর মত ভারতপ্রেমী সাহিত্যসেবীদের নেতৃত্বে ফার্সী ও হিন্দী ভাষার সমন্বয়ে উর্দু ভাষার জন্ম হয়। ফলে ফার্সীভাষী তুর্কীগণ কিংবা হিন্দীভাষী ভারতীয়দের মধ্যে ভাবের সেতুবন্ধন সহজতর হয়। এই পর্বে বহু মুসলমান লেখক হিন্দীতে এবং হিন্দু লেখক উর্দুতে কাব্য সৃষ্টি করে ভাবজগতের মেলবন্ধন ঘটান। ভাষা-সাহিত্যের মেলবন্ধনের পরিণতিস্বরূপ বহু সংস্কৃত গ্রন্থ ফার্সীতে অনূদিত হয় এবং ফার্সী গ্রন্থ অনূদিত হয় হিন্দীতে।

সংস্কৃতি-সমন্বয়ের ঢেউ, সামান্যভাবে হলেও, উভয় সম্প্রদায়ের বিজ্ঞান-মনস্কতাকেও স্পর্শ করে। হিন্দু ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন মুসলমানদের আকৃষ্ট করে। ভারতীয় বেদান্ত-দর্শন, যোগ-দর্শন তাঁরা আগ্রহের সাথে অধ্যয়ন করেন। সুফীবাদের প্রসারে ভারতীয় যোগ-দর্শনের প্রভাব আছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। আবার মুসলমানদের সংস্পর্শে এসে হিন্দুরা জ্যোতির্বিদ্যায় নানা দিক, অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত হয়। বর্ষপঞ্জী, কোষ্ঠীবিচার প্রভৃতির ব্যাপারেও হিন্দুরা ইসলামীয় সংস্কৃতির কাছে কম ঋণী নয়।

সুলতানি যুগে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতি সমন্বয় ব্যাখ্যা প্রসঙ্গ আবেগাপ্লুত হওয়া ইতিহাসসম্মত নয়। সমকালীন বৈষ্ণব সাহিত্য বিশ্লেষণ করলে প্রসঙ্গটির সাদা-কালো দু'টি ছবিই দেখা যাবে। দীর্ঘদিনে একত্রে বসবাসের অনিবার্য ফলস্বরূপ এই দু'টি সংস্কৃতি পরস্পরের কাছাকাছি এসেছে। তবে এই মিলন অনেকটাই বাহ্যিক। একে অপরের জীবনধারা, বিশ্বাস, সংস্কার ইত্যাদির উপর হয়তো প্রভাব ফেলেছিল। কিন্তু মানুষ বা সমাজের বাহ্যিক আচরণের মধ্যেই এই প্রভাব সীমাবদ্ধ ছিল। কোন সংস্কৃতিই অপর সংস্কৃতির মর্মকে স্পর্শ করতে বা মৌলিক কোন পরিবর্তন আনতে পারেনি। ***ড. মজুমদার*** (R.C. Majumdar) লিখেছেন ঃ "*Each was influenced by other, in varying degrees, not only in different spheres of life, but also in ideas, beliefs and even superstitions. But all these merely affected, the external and superficial in man and society, and left untouched the core of the heart and the mind.*" এটিও লক্ষণীয় যে, হিন্দুধর্মের রক্ষণশীলতা যেমন নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ইসলামের সাম্যবোধের প্রতি আকৃষ্ট করেছে, তেমনি ইসলামের গ্রাস থেকে হিন্দুধর্মকে রক্ষা করার জন্য এই ধর্মের মধ্যে রক্ষণশীলতা নতুন করে জেঁকে বসেছে। এই নেতিবাচক প্রতিরোধ হয়তো সঠিক নয় ; কিন্তু ইতিহাসের ধারা এভাবেই অগ্রসর হয়েছে।

নবম অধ্যায়

ধর্ম ও সংস্কৃতি
(Religion and Culture)

ভারতীয় জীবনধারার সাথে ধর্মের সংযোগ অবিচ্ছেদ্য। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সমাজব্যবস্থায় রূপান্তর যেভাবে ঘটেছে, তার মূলে অনেকটাই আছে তার ধর্মভাবনার পরিবর্তন। বৈদিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসেবে জন্ম নিয়েছে বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম বা আজিবিক মতবাদ। আবার ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনিবার্য প্রভাবের ফলে পরিবর্তন এসেছে এই সকল প্রতিবাদী ধর্মের মধ্যেও। তারপরে ভারতে এসেছে ইসলাম মতাদর্শ। ইসলামের আগমনের ফলে ভারতের ধর্মজীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ভারতের রাজদণ্ডধারী শাসকের ধর্ম অনিবার্য ভাবে দ্রুত দৃঢ় ভিত্তি পেয়েছে এদেশের সমাজে। ব্রাহ্মণ্যধর্মের অন্তর্নিহিত ও স্ব-আরোপিত দুর্বলতা, বৌদ্ধধর্মের পতন এবং অতি ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে জৈনধর্মের আবদ্ধ হওয়ার ফলে ইসলামের নতুন আদর্শ ও তত্ত্ব, দক্ষিণ-ভারত ছাড়া, প্রায় সমগ্র দেশে দ্রুত প্রসারলাভের সুযোগ পেয়েছে। সনাতন হিন্দুধর্ম বা ব্রাহ্মণ্যবাদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম এবং রাজশক্তির প্রত্যক্ষ বা প্রচ্ছন্ন সমর্থনপুষ্ট ইসলাম মতাদর্শের স্বাভাবিক প্রসার সুলতানি আমলের প্রথম পর্বের ধর্ম-ভাবনার মূল সুর হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। বিধি-বিধানের কঠোরতা হিন্দুধর্মে ছিল, ক্রমে ইসলামের মধ্যেও এক ধরনের স্বার্থান্বেষী, সংকীর্ণমনা গোষ্ঠীর প্রভাব বৃদ্ধি পায়। এই পটভূমিতে ভারতের ধর্মীয় বিবর্তনের ইতিহাসে এক উদার ও সমন্বয়বাদী ধর্মতাত্ত্বিকের অভ্যুত্থান ঘটে। সাধারণভাবে এঁরা 'সন্ত' বা 'অতীন্দ্রিয়বাদী সাধক' নামে অভিহিত হন। নবম থেকে ষোড়শ শতকে অতীন্দ্রিয়বাদী বহু সাধক ভারতের ধর্মজীবন গভীর প্রভাব বিস্তার করেন।

○ ভক্তি-আন্দোলনের ধারা ঃ

ভক্তিবাদের উদ্ভব ঃ প্রাথমিকভাবে ভক্তি বলতে বোঝায় ভাগাভাগি। ড. রামশরণ শর্মা দেখিয়েছেন যে ভাতকেও ভক্তি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। সমাজে প্রথম ভক্তির উদ্ভবের ক্ষেত্রে রাজা ও কর্মচারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। মধ্যযুগে ভূস্বামীদের উপর প্রজা বা আধা-ভূমিদাসদের সম্পূর্ণ নির্ভরতার মধ্যে ভক্তিবাদ প্রতিবিম্বিত হয়েছে। তবে ধর্মের ক্ষেত্রে ভক্তিবাদের সূচনা ও বিকাশের সংজ্ঞা ও পটভূমি স্বতন্ত্র। ভারতে আদি-মধ্যযুগের সূচনায় সপ্তম শতকে দক্ষিণ ভারতে ধর্মে ভক্তিভাবের প্রকাশ ঘটে। এক্ষেত্রে ভক্তি বলতে বোঝায় ঈশ্বরের কাছে ভক্তের সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে ধর্মীয় ভক্তিবাদের ধারা দক্ষিণ থেকে উত্তর ভারতে সম্প্রসারিত হয়। ষোড়শ শতক পর্যন্ত ভক্তিবাদের রেশ ভারতে ধর্মাচরণের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে সক্রিয় ছিল। দিল্লী সুলতানির আমল ছিল ভক্তিবাদী ধারার চূড়ান্ত জনপ্রিয়তার কাল। ব্যাপক জনপ্রিয়তার বিচারে কেউ কেউ একে আন্দোলনের সাথে তুলনা করেছেন। বস্তুত, ভক্তিবাদী তত্ত্ব ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্মাচরণ প্রক্রিয়ার যে বিকল্প পথের সন্ধান দিয়েছিল তাকে নীরব বিপ্লব আখ্যা দেওয়া যায়। সহজ, সরল এবং

একান্তভাবে মানবিক ভক্তিবাদী তত্ত্ব সমাজের বৃহত্তর অংশে যে আন্তরিকতার সাথে গৃহীত হয় এবং তৎকালীন সমাজ চিন্তা, সাহিত্য, সংস্কৃতির উপর তা যে প্রভাব ফেলে তার বিচারে একে যথার্থই একটি আন্দোলন বলা চলে। ঐতিহাসিক ***শ্রীবাস্তব*** (A.L.Srivastava) বলেছেন যে, *"বৌদ্ধধর্মের পতনের পর আমাদের দেশে ভক্তিবাদী আন্দোলনের মত এত ব্যাপক ও জনপ্রিয় আন্দোলন আর সংঘটিত হয়নি।"* (***"Perhasps after the decline of Buddhism, there has never been a more widespread and popular movement in our Country than the Bhakti Movement."***)।

প্রাচীন ভারতীয় ধর্মসাহিত্যে ভক্তিবাদের গুরুত্ব স্বীকার করা হয়েছে। ভাগবদ্‌গীতায় কৃষ্ণের প্রেমের বাণী ভক্তিভাবনাকে কেন্দ্র করে উচ্চারিত হয়েছে। পুরাণ গ্রন্থে কৃষ্ণের জীবন উপাখ্যানে ভক্তিভাবনাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ভাগবদ্‌গীতার বাণীকে উপজীব্য করেই প্রথমে কৃষ্ণ ও পরবর্তীকালে রামকে কেন্দ্র করে সপ্তম শতকে দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ুতে ভক্তিবাদের প্রসার ঘটে। দেবলোকের অধিবাসী কৃষ্ণ ক্রমে বৃন্দাবনের কানুতে পরিণত হন। মানুষের জীবনের সাথে তাঁর জীবনকে একাত্ম করার প্রয়াস শুরু হয়। দেবতার গুণসম্পন্ন কৃষ্ণ ও রাম মানুষের রূপে মানুষের মাঝে আবির্ভূত হয়ে লীলাখেলার মধ্য দিয়ে মানুষকে সত্যের পথ প্রদর্শন করেন। এই বিশ্বাস থেকে জন্ম নেয় অবতার পদ। দেবতা, অবতার ও গুরু একই আধারে একাকার হয়ে মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নেন। জাঁকজমকপূর্ণ পূজার্চনার পরিবর্তে ভক্তের আবেগ, প্রেম ও একান্ত ভালবাসার মাধ্যমে অবতাবের তথা ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করা সম্ভব এই প্রত্যয় দ্রুত প্রসারিত হয়।

সপ্তম শতকে তামিলনাড়ুতে ভক্তিবাদের সূচনা হয়। আদি-তামিল সাহিত্যে প্রেম ও ভক্তিভিত্তিক সম্পর্ককে উপজীব্য করে কাব্য-সাহিত্য রচনার প্রচলন ছিল। অতীন্দ্রিয়বাদের (Mysticism) সংস্পর্শে এসে তামিল ভক্তিভাবের ধারা দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করে। চতুর্দশ শতকে উত্তর ভারতেও ভক্তিবাদের প্রাবল্য ঘটে। তবে দক্ষিণ ভারতে ভক্তিবাদের মৌল চরিত্র এবং উত্তর ভারতে ভক্তিবাদের প্রেক্ষাপট ও চরিত্র অভিন্ন ছিল না। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির তারতম্য হেতু ভারতের দু'প্রান্তে ভক্তিবাদের স্বতন্ত্র চরিত্রভাতি দৃষ্ট হয়। দক্ষিণ ভারতে সামাজিক ভেদাভেদের তীব্রতা ছিল খুবই কম। আর্যসংস্কৃতির বিলম্বিত বিস্তারের ফলে দক্ষিণে উপজাতীয় বৈশিষ্ট্যকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। সেখানে ক্ষত্রিয় নামক বর্ণের অস্তিত্ব ছিল না। ব্রাহ্মণদের সংখ্যাও ছিল তুলনামূলক ভাবে খুব নগণ্য। উত্তর ভারতে প্রচলিত বর্ণাশ্রম প্রথার প্রবক্তা এবং পরিস্থিতির অনুপস্থিতির ফলে দক্ষিণে ব্রাহ্মণ্যবাদ ছিল দুর্বল। পক্ষান্তরে সমাজ ও রাজনীতিতে বৌদ্ধ ও জৈনদের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল প্রখর। রাজতন্ত্রের উপর বৌদ্ধ ও জৈনদের প্রভাব ছিল যথেষ্ট। তাই সেখানে মূলত বৌদ্ধ ও জৈনদের ধর্মীয় আচরণের প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে ভক্তিবাদের প্রসার ঘটে। বৈষ্ণব আলবার ও শৈব নায়নার সাধকদের নেতৃত্বে দক্ষিণ ভারতে ভক্তিবাদের সূচনা ও প্রসার ঘটে। এ কারণে কেউ কেউ দক্ষিণ ভারতে ভক্তিবাদের উদ্ভবকে হিন্দুত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন বলে অভিহিত করেন। সারা দক্ষিণ ভারতে ছড়ানো অসংখ্য মন্দিরকে কেন্দ্র করে হিন্দুদের ধর্মাচরণ নতুন গণভিত্তি খুঁজে পায়। তাকে দক্ষিণের মন্দিরকেন্দ্রিক হিন্দুত্ব কখনই উত্তরের ব্রাহ্মণ্যবাদের মত হিন্দু সমাজব্যবস্থায় ভেদাভেদ ও কর্তৃত্ববাদের পর্যায়ে যায়নি।

দক্ষিণ ভারতের পরিস্থিতি ছিল স্বতন্ত্র। সেখানে আর্যসংস্কৃতির প্রবল প্রতিপত্তির সূত্রে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র ছিল রক্ষণশীল এবং কর্তৃত্বকারী। সপ্তম শতকের পরবর্তীকালে রাজপুত জাতির উত্থান সামাজিক ক্ষেত্রে নতুন সমীকরণ ঘটায়। প্রতিবাদী ধর্ম আন্দোলন ও ইসলাম ধর্মতত্ত্বের উদ্ভব ব্রাহ্মণ্যবাদের উপর যে চাপ সৃষ্টি করেছিল, রাজপুতদের উত্থানের ফলে, তা অনেকটাই কেটে যায়। সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, গুপ্তযুগের শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্বর্ণ মডেলটির উপর নির্ভর করে সমস্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিধিনিয়ম গড়ে উঠেছিল।[1] আদি মধ্যযুগে ক্ষত্রিয়দের স্থান নেয় রাজপুতগোষ্ঠী। মনে করা হয় যে একটি বর্ণসংকর বা উপবর্ণ হিসেবে রাজপুত জাতির আবির্ভাব ঘটেছে। এরা বৃত্তি হিসেবে যুদ্ধকে বেছে নেয় এবং সামাজিক মর্যাদা অর্জনের জন্য জমির স্বত্ব লাভের জন্য তৎপরতা দেখায়। প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় ব্রাহ্মণদের প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পর্কে রাজপুতদের সম্যক ধারণা ছিল। তাই নিজেদের সামাজিক অবস্থান সুদৃঢ় করার জন্য রাজপুতরা ব্রাহ্মণদের প্রতি প্রয়োজনভিত্তিক আনুগত্য প্রদর্শন করতে থাকে। তারা নিজেদের 'গো-ব্রাহ্মণ প্রতিপালক' হিসেবে তুলে ধরে। অন্যদিকে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ বর্ণাশ্রম প্রথা এবং ব্রাহ্মণদের সামাজিক কর্তৃত্ব রক্ষা করার তাগিদে বর্ণবহির্ভূত হলেও সামরিক শক্তির অধিকারী ও ভূস্বামী শ্রেণীর রাজপুতদের ক্ষত্রিয় হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে বর্ণ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। এইভাবে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের বোঝাপড়ায় গড়ে ওঠা সমাজে অ-বর্ণ বা নিম্নবর্ণের মানুষদের উপর ধর্মীয় ও সামাজিক নানা বিধিনিষেধের বোঝা ক্রমে ক্রমে অত্যাচারের পর্যায়ে নেমে আসে। এমতাবস্থায় ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র বা হিন্দু বহুঈশ্বরবাদের প্রতিবাদে অব্রাহ্মণদের নেতৃত্বে ভক্তিবাদের ধারা জনপ্রিয়তা পায়। একই সময়ে ভারতে মুসলমান শাসনের প্রতিষ্ঠা ও দ্রুত প্রসার পরোক্ষভাবে ভক্তিবাদের উত্থান ত্বরান্বিত করে। হিন্দুত্ববাদে মন্দির ও দেবমূর্তি ঈশ্বর আরাধনার প্রায় অপরিহার্য দুটি বিষয় হিসেবে চিহ্নিত হয়। এদের সামনে রেখে নানা ধরনের আচার বিচার, শক্তিতত্ত্ব, অধিকার-অনধিকারের প্রশ্ন ইত্যাদি বিষয়ক অলৌকিক বা অতি-লৌকিক তত্ত্ব মানুষের সামনে উপস্থিত করে কৃত্রিম ভীতি ও শ্রদ্ধা জাগ্রত করা হত। সাধারণ মানুষ তা মেনে নিতে বাধ্য হত। কিন্তু তুর্কী যোদ্ধারা নির্বিচারে মন্দির ধ্বংস করে, মূর্তি ভেঙে বা ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের হত্যা করে ক্ষমতা বিস্তার করে। এত ধ্বংসলীলার পরেও মুসলমানদের কোন ক্ষতি হয়নি। এই ঘটনা একদিকে ব্রাহ্মণ্যবাদের ধর্মপ্রচার সম্পর্কে মানুষের ভীতি ও মোহভঙ্গ ঘটায়। অন্যদিকে মুসলমান শাসনের প্রতিষ্ঠার ফলে সামাজিক ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্যমূলক ভাবে গড়ে তোলা বর্ণব্যবস্থার প্রাচীরে ফাটল ধরে। বলা বাহুল্য ভারতের এই রাজনৈতিক রূপান্তর সামাজিক পরিবর্তনের পথ খুলে দেয়। সেই পথে ভক্তিবাদ ছড়িয়ে পড়ে উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অংশে।

○ ভক্তিবাদের আদর্শ ঃ

ভক্তিবাদের মূল কথা হল আত্মার সাথে পরমাত্মার তথা ভক্তের সাথে ভগবানের রহস্যময় বা অতীন্দ্রিয় মিলন। ভক্তিবাদী সাধকেরা প্রথাগত ভাবে কোন ধর্মীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না কিংবা তাঁরা স্বতন্ত্রভাবে কোন গোষ্ঠী গড়ে তোলার কথা চিন্তা করেননি। কোন বিশেষ ধর্মমতের

বন্ধনে তাঁরা আবদ্ধ ছিলেন না কিংবা কোন ধর্মশাস্ত্রের প্রতিও তাঁদের অন্ধ আনুগত্য ছিল না। চিন্তার স্বাধীনতা এবং একান্ত আধ্যাত্মচর্চার মাধ্যমে তাঁরা সৃষ্টির প্রকৃত রহস্য অনুসন্ধান করতেন। সত্যের আলোকদর্শনের জন্য ভক্তিবাদীরা কোনরূপ আচার-অনুষ্ঠান পালন করতেন না। কোন অপরিবর্তনীয় বা দুঃষ্পরিবর্তনীয় মতবাদ—যা কিনা যুক্তিতর্কদ্বারা সমর্থিত নয়, তার প্রতি এঁদের কোন আস্থা ছিল না। ঈশ্বরের একত্বে (Unity of God) ছিল তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস। কৃষ্ণ, শিব, রাম, আল্লাহ্, সবাই—ভক্তিবাদীদের হৃদয়মন্দিরে একাকার হয়ে বিরাজ করতেন। অধিকাংশ ভক্তিবাদী সাধক পৌত্তলিকতার বিরোধী ছিলেন। ভক্তিবাদী সাধকেরা প্রচার করেন ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। সকল ধর্মে নানা নামে একই ঈশ্বরের কথা বলা হয়েছে। তাঁরা বলেন যে, আত্মার সাথে পরমাত্মার মিলনেই ঘটে মোক্ষলাভ বা মুক্তি। নিষ্কাম কর্মের দ্বারা মোক্ষলাভ সম্ভব। কিন্তু নিষ্কাম কর্মের সাধনা খুব দুরূহ কাজ। বস্তুত, বেদ ও উপনিষদে ভক্তিযোগের নির্দেশ বর্তমান। কিন্তু সেখানে জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ভক্তিবাদীরা অন্য দুটি পথ বাদ দিয়ে শুধুমাত্র ভক্তিযোগের উপর গুরুত্ব দেন। তাঁরা দৃঢ়তার সাথে প্রচার করেন যে, একমাত্র ভক্তি এবং আত্মনিবেদনের মাধ্যমেই ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভ সম্ভব। ***ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের*** ভাষায় ভক্তি হল ঃ "***Single-minded, uninterrupted and extreme devotion to God without any ultimate motive (ahaituki), growing gradually into an intense love.***" ভক্তিবাদীরা সৃষ্টিকর্তার প্রতি ভক্তি থেকে গভীর ভালবাসায় উত্তীরণের কথা বলেছেন। এই ভালবাসা হবে প্রভুর প্রতি অনুগত ভৃত্যের, দয়িতার প্রতি প্রেমিকের, সন্তানের প্রতি মায়ের ভালবাসার মত গভীর, একান্ত এবং প্রশ্নহীন। এঁদের মতে, ধর্মীয় সত্য এবং বিশ্বাস সর্বদা যুক্তিনির্ভর হতে পারে না। এক্ষেত্রে মানুষের আবেগ এবং ইচ্ছার একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। ভক্তিবাদীদের ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও ভালবাসার এই তত্ত্বটিকে ***ড. মজুমদার*** ভারতের ধর্মভাবনার ইতিহাসে ভক্তিবাদী আন্দোলনের প্রধান ও স্থায়ী অবদান বলে উল্লেখ করেছেন। ভক্তিবাদী সাধকেরা মনে করেন, ঈশ্বরের কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ এবং একান্ত ভক্তিমার্গের সাধনার পথ কঠিন। তাই এই কাজে ভক্তের প্রয়োজন একজন গুরুর সান্নিধ্য। গুরু ভক্তকে সঠিক পথের নির্দেশ দেন। অন্ধকার থেকে আলোকে, অজ্ঞানতা থেকে জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশের জন্য গুরুর পথনির্দেশিকা আবশ্যিক।

অধিকাংশ ভক্তিবাদী সাধক ও দার্শনিক জাতিভেদ, বর্ণভেদ প্রভৃতি সামাজিক বিভেদ-বৈষম্যের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। এঁরা উচ্চনীচ ভেদাভেদের পরিবর্তে মানুষের মধ্যে সর্বজনীন ভ্রাতৃত্বের তত্ত্ব প্রচার করেছেন। তাঁদের মতে, যে-কোন জাতি বা বর্ণের মানুষ একান্ত ভক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভে সক্ষম। মূর্তি-পূজার বিরোধিতা করে তাঁরা প্রচার করেন যে, ঈশ্বর নিরাকার এবং বর্ণহীন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব মনের গভীরে। দক্ষিণ-ভারতের প্রখ্যাত ভক্তিবাদী সাধক ***নামদেব*** বলতেন, "*পাথরের দেবতা এবং মিথ্যা ভক্তি পরস্পরের পরিপূরক হতে পারে না। তুর্কীরা পাথরের দেব-দেবীকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলেও তাদের আর্তনাদ শোনা যায়নি!*" একইভাব ***কবীর*** বলেছিলেন, "*পাথরের মূর্তির মধ্যেই যদি ঈশ্বরের অধিষ্ঠান, তাহলে আমি সুবিশাল পর্বতকেই দেবতা হিসেবে পূজা করার পক্ষপাতী।*" তাঁদের যুক্তিবাদী দর্শন খুব স্বাভাবিক ভাবেই মানুষের মনে ভক্তিবাদের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে। ভক্তিবাদী সাধকেরা দেবার্চনার কাজে সংস্কৃত ভাষার একাধিপত্যের অবসান ঘটান। তাঁরা প্রচার করেন যে, "*ঈশ্বর অন্য কোন ভাষা*

বোঝেন না ; তারা বোঝেন ভক্তের অন্তরের ভাষা, অর্থাৎ একাত্ম আহ্বান।" যে-কোন ভক্ত তার মনের ভাষাতেই ঈশ্বরকে আহ্বান করতে পারে। এজন্য কোন বিশেষ ভাষা, স্তোত্র বা ভজনের প্রয়োজন নেই। ভক্তিবাদী দার্শনিকরা সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে স্থানীয় কথ্য ভাষায় তাঁদের মতাদর্শ প্রচার করেছেন। ফলে তাঁদের বক্তব্য খুব সহজেই সাধারণ মানুষের বোধগম্য হয়। জটিল দার্শনিক তত্ত্বের প্রচার এঁরা করেননি। পরন্তু সহজ-সরল ভাবে কখনো রূপকের সাহায্যে, কখনো আকর্ষক প্রবচন প্রয়োগ করে এঁদের কথা প্রচারিত হওয়ার ফলে অশিক্ষিত সাধারণ মানুষের কাছে খুব সহজেই এঁদের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভক্তিবাদে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং বর্ণপ্রথাকে আক্রমণ করার ফলে নিম্নবর্ণের বহু মানুষ ভক্তিবাদের অনুগামী হয়। ভক্তিমার্গী উপাসকদের মত ভক্তিবাদের প্রচারকরা বেশির ভাগ ছিলেন নিম্নবর্ণের মানুষ।

◎ ইসলাম ধর্মের প্রভাব ঃ হিন্দুধর্মের স্বাভাবিক বিবর্তনের একটা স্তরে 'ভক্তিবাদী' তত্ত্বের উদ্ভব ঘটেছে, নাকি সমকালীন অন্যান্য ধর্মমতের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ধর্ম-সংস্কারকগণ ভক্তিবাদ প্রচার করেছেন—এ সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। ইউরোপের প্রখ্যাত পণ্ডিত ***ওয়েবার*** (Weber) মনে করেন, "*মোক্ষলাভের পথ হিসেবে ভক্তিমার্গের ধারণা খ্রীষ্টধর্ম থেকেই নেওয়া হয়েছে।*" একইভাবে ঐতিহাসিক ***গ্রীয়ারসন*** (Grierson)-এর মতে, খ্রীষ্টধর্মেই প্রথম একেশ্বরবাদ তত্ত্ব প্রচারিত হয়। আধুনিক ঐতিহাসিকেরা ইউরোপীয়দের এই দাবিকে অযৌক্তিক এবং প্রমাণের অযোগ্য বলে বাতিল করে দিয়েছেন। কিন্তু ভক্তিবাদের উত্থানে ইসলামের প্রভাব-সংক্রান্ত বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। অধ্যাপক ***ইউসুফ হুসেন*** তাঁর *'Glimpses of Medieval Indian Culture'* গ্রন্থে বলেছেন যে, ভক্তিবাদী আন্দোলনের প্রেরণা এসেছিল ইসলাম ধর্মের নীতি ও আদর্শ থেকে। তিনি মনে করেন যে, *'মধ্যযুগে অতীন্দ্রিয়বাদের প্রধান ও প্রথম প্রবক্তা রামানন্দ ইসলামের আদর্শ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং সম্ভবত তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ভক্তিবাদ প্রচার করেছিলেন।'* অধ্যাপক ***হুসেন*** বিশ্বাস করেন যে, 'ভক্তিমার্গ' ভারতীয় ঐতিহ্যর সাথে সুপ্রাচীন কাল থেকেই জড়িত। কিন্তু মধ্যযুগের ভক্তিবাদ ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটা ধারণা—যাকে প্রাচীন ভারতীয় ধর্মভাবনার সাথে সম্পর্কিত করা যাবে না। মধ্যযুগের ভক্তিবাদে যে 'বিশ্বভ্রাতৃত্ব' ও 'সামাজিক সাম্যের' কথা বলা হয়েছে, তা ইসলামধর্মের প্রভাবের ফল।

অধ্যাপক হুসেন ভক্তি-আন্দোলনকে দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। প্রথম পর্যায়টির পরিধি শ্রীমৎভগবদ্গীতার সময় থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত। এই পর্যায়ে ভারতের ধর্মভাবনায় মুষ্টিমেয় একেশ্বরবাদের সাথে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের বহু ঈশ্বরবাদের সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ের পরিধি ত্রয়োদশ শতক থেকে ষোড়শ শতক পর্যন্ত। এই সময়ে ভারতের অভ্যন্তরে ইসলামের ব্যাপক প্রসার ঘটে গিয়েছিল। তাই ইসলামের সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সূত্রে হিন্দুধর্মে একেশ্বরবাদ-তত্ত্বের প্রাধান্য ঘটে এবং ভক্তিবাদী আন্দোলনে নতুন জোয়ার আসে। ইসলামের ভ্রাতৃত্ববোধ, মানবতাবাদ ও সামাজিক সাম্যের তত্ত্বদ্বারা ভক্তিবাদীরা প্রভাবিত হন এবং ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণদ্বারা মুক্তির সন্ধানে ব্রতী হন। ড. ***রোমিলা থাপার*** ***'ভারতবর্ষের ইতিহাস'***গ্রন্থে লিখেছেন, "*ভক্তি আন্দোলনের প্রবক্তারা, যাঁরা ধর্মীয় চিন্তার চেয়ে সামাজিক ধারণার উপরই বেশি প্রভাব ফেলেছিলেন, তাঁরা সকলেই ইসলামের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। বিশেষত, সুফীদের শিক্ষার প্রভাব তাঁদের উপর বিশেষভাবে পড়েছিল।*"

ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, এ. এল. শ্রীবাস্তব প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ উপরিলিখিত মতের বিরোধিতা করেছেন। এঁদের মতে ইসলাম ধর্মতত্ত্বে অ-বিশ্বাসী বা কাফেরদের বিশ্বাসী বা ইসলামীদের সম-মর্যাদা বা সম-অধিকার দেওয়া হয়নি। মধ্যযুগের ভক্তিবাদী সাধকদের দৃষ্টিতে গোঁড়া ইসলাম ও গোঁড়া হিন্দুধর্মের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ ছিল না। *ড. মজুমদার* লিখেছেন ঃ "*ইসলামের সৌভ্রাতৃত্বের তত্ত্ব শুধুমাত্র ইসলামের অনুগামীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হত, হিন্দুদের জন্য ইসলামের তত্ত্ব কোন সার্বিক সাম্যের বাণী বহন করে আনেনি।*"("*...neither the theory of Islam, nor its practice, as regards the Hindus, could appeal to the later as bringing a new message of equality of man.*")।

কোন কোন ঐতিহাসিক মধ্যযুগে ভক্তিবাদের প্রসারে ইসলামের পরোক্ষ প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। ভারতে ইসলাম-ধর্মের প্রসার এবং বহু হিন্দুর ধর্মান্তরিত হওয়ার ঘটনা হিন্দুধর্মের সামনে এক সংকট সৃষ্টি করেছিল। এই অবস্থায় হিন্দু-সংস্কারকদের একাংশ হিন্দুধর্মের ভাবাদর্শের মধ্যেই সর্বজনগ্রাহ্য ও সহজে বোধগম্য ধর্মভাবনা খুঁজে বের করতে প্রয়াসী হন এবং এঁরাই ভক্তিবাদের বিকাশে ইসলামের এহেন পরোক্ষ অবদানের কথা স্বীকার করে নিলেও স্মরণে রাখা দরকার যে, ভক্তিবাদের তত্ত্ব হিন্দুধর্মাদর্শের মৌলিক কাঠামোর মধ্য থেকেই সংগৃহীত হয়েছিল, অন্য কোন ধর্মের আদর্শকে ভিত্তি করে নয়। যেমন, ঊনবিংশ শতকে রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ পাশ্চাত্য ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়েও ভারতীয় ঐতিহ্যের মধ্য থেকেই সমাজ-সংস্কারে প্রয়াসী হয়েছিলেন। এই বিচারে ভক্তিবাদের উপর 'সুফীবাদের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। দশম শতকে সুফীরা পারস্যের জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ক্রমে ভারতেও সুফী সাধকদের উত্থান ঘটে। এঁরাও আল্লাহ্‌র প্রতি ভক্তি ও নিঃশর্ত আত্মসমর্পণকে মুক্তির পথ হিসেবে প্রচার করেন। গোঁড়া উলেমাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সুফী-সন্তরা উদারতা ও ধর্ম-সমন্বয়ের বাণী প্রচার করেন। একইভাবে ভক্তিবাদের উৎসও ছিল রক্ষণশীল হিন্দুধর্ম ও বর্ণভেদ জর্জরিত হিন্দু সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বিশেষ। সুফীবাদ ও ভক্তিবাদ উভয় আন্দোলনের পশ্চাৎপট ছিল প্রায় এক। দুটি আন্দোলনই ছিল প্রচলিত দুটি বিশিষ্ট ধর্মের গতিপথ পরিবর্তনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং উভয় ক্ষেত্রেই সমাজপতি ও ধর্মবিদ্‌দের মানবতাবাদ বিবর্জিত সমাজ ও ধর্মজীবন পরিচালনার বিরুদ্ধে সমাজের নিম্নস্তরের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। এই কারণে সুফীবাদ ও ভক্তিবাদের মধ্যে বহু মিল লক্ষ্য করা যায়। উভয় ক্ষেত্রেই ঈশ্বর ও মানুষের প্রেমময় সম্পর্কের উপর জোর দেওয়া হয়। দুই মতবাদই গুরু বা পীর-এর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে। উভয় ক্ষেত্রেই সমাজের নিচুতলার অধিকাংশ মানুষের যোগদান ঘটেছিল। ভক্তিবাদের উপর সুফীবাদের একপাক্ষিক প্রভাব পড়েছিল তা নয়। সম্ভবত উভয়েই পরস্পরেরদ্বারা পুষ্ট হয়েছিল।

বস্তুত, বৈদিক হিন্দুধর্মের মধ্যেই ভক্তিবাদের তত্ত্ব নিহিত ছিল। বেদে ব্রহ্মাকেই সৃষ্টির সূত্র এবং আনন্দের উৎস বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ঈশ্বরের কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের (প্রপত্তি) কথা বলা হয়েছে শ্রীমৎভগবদ্‌গীতায়। সেখানে *কৃষ্ণ* বলেছেন ঃ "*সমস্ত ধর্ম ত্যাগ করে আমাকে অনুসরণ কর, আমিই মুক্তির পথ নির্দেশ করবো।*" বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মে জাতিভেদ-প্রথা অস্বীকার করা হয়েছে এবং স্থানীয় ভাষায় প্রচার করা হয়েছে ধর্মের বাণী। হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে মুক্তির পথ হিসেবে জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে প্রাচীনকালে

ভক্তিযোগের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। বৌদ্ধধর্মের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার সূত্রে ভগবানের উপর ভক্তিব তত্ত্ব বিকশিত হয়। হিন্দুধর্মের প্রখ্যাত সংস্কারক শংকরাচার্য অদ্বৈত মতবাদের কথা প্রচার করেন। তবে তিনি জ্ঞানযোগের উপর বেশি গুরুত্ব দেবার ফলে তা সাধারণ মানুষের হৃদয়কে আকর্ষিত করতে ব্যর্থ হয়। সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে দক্ষিণ-ভারতে ভক্তিবাদ প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা লাভ করে। শৈব 'নায়নার' এবং বৈষ্ণব 'আলওয়ার সম্প্রদায়ের স্তবগানের মধ্যে ভক্তিবাদ বিকশিত হত। তামিল ভক্তিবাদে সর্বপ্রথম ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে প্রত্যক্ষ ভালবাসার সম্পর্কের কথা উচ্চারিত হয়। তামিল সাধকদের ভক্তিবাদের কাছে জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্মও নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। দক্ষিণ-ভারত থেকে ভক্তিবাদের ঢেউ উত্তর-ভারতে আছড়ে পড়ে। তবে এজন্য অপেক্ষা করতে হয় ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত। কারণ নায়নার ও আলওয়ার সম্প্রদায় তামিল ভাষায় তাদের মতবাদ প্রচার করায় ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছিল। বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক **ড. ক্ষেত্র গুপ্ত** লিখেছেন ঃ "*এদেশে ভক্তিবাদী আন্দোলন প্রায় জন্মকালেই শাস্ত্রীয় ধর্মানুশীলনের কঠোরতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মত হিন্দু ধর্মশাসিত ও ব্রাহ্মণ্য নিয়ন্ত্রিত ধর্মের বিধি-বিধানের বিরুদ্ধে মধ্যযুগে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে ভক্তি আন্দোলন বিচিত্র রূপ ধরে আত্মপ্রকাশ করে।*" **ড. গুপ্তের** মতে, অনেক ক্ষেত্রেই এই প্রতিবাদী ধর্ম আন্দোলনের উদ্ভব সমাজে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের মধ্য থেকেই ঘটেছে। শেষ পর্যন্ত পণ্ডিত ও সাধকদের মাধ্যমে ভক্তিবাদ উত্তর-ভারতে প্রসারিত হয়েছে এবং একটা ধর্ম-আন্দোলনের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।

❍ ভক্তিবাদী সাধকগণ ঃ

মধ্যযুগে ভারতে বহু ভক্তিবাদী সাধকের আবির্ভাব ঘটেছিল। এঁদের মধ্যে স্মরণীয় কয়েকজন হলেন *রামানুজ, নিম্বার্ক, বল্লভাচার্য, নামদেব, রামানন্দ, কবীর, নানক, শ্রীচৈতন্য* প্রমুখ। ভক্তিবাদের আদি প্রবক্তাদের অন্যতম ছিলেন রামানুজ। দক্ষিণ-ভারতের শ্রীপেরামপুদুরে ১০১৭ খ্রীষ্টাব্দে রামানুজের জন্ম হয়। বৈষ্ণবসাধক যমুনামুনির কাছে তিনি দীক্ষা নেন। শংকরাচার্য বলেছিলেন, মুক্তির একমাত্র পথ হল 'জ্ঞান'। রামানুজ শংকরের মতের বিরোধিতা করে বলেন, জ্ঞান মুক্তির একমাত্র পথ নয়, অন্যতম পথ। তিনি মুক্তির জন্য জ্ঞানের পরিবর্তে 'ভক্তি'র উপর বেশি জোর দেন। রামানুজ হিন্দুদর্শন ও ভক্তিবাদের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করেছিলেন। রামানুজের সমসাময়িক ছিলেন ***নিম্বার্ক***। ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করে তিনি *'বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভ'* রচনা করেন। নিম্বার্ক অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদের মধ্যে সমন্বয়সাধনের চেষ্টা করেন। **ড. *রমা চৌধুরী*** লিখেছেন ঃ "*He did a great service to mankind by pointing, to a path which satisfied both intellected and feeling, head and heart, without overemphasizing the one at the expense of the other.*"

দক্ষিণ-ভারত থেকে উত্তর-ভারতে ভক্তিবাদের বাণী বহন করে আনেন রামানন্দ। তিনি রামানুজের 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' প্রচার করেন। বস্তুত, রামানন্দ বর্ণভেদ-প্রথা নির্মূল করার কথা বলেননি। ব্রাহ্মণ ও শূদ্রকে একাসনে অধিষ্ঠিত করার ব্যাপারে তাঁর দ্বিধা ছিল। তবুও একথা সত্য যে, তিনি বর্ণভেদ-প্রথার কঠোরতা হ্রাস করার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে সমস্ত জাতির মানুষই ছিলেন। তিনি হিন্দীভাষায় কবিতা রচনা করে ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও ভক্তির বাণী সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেন। রামানন্দের বড় কৃতিত্ব হল যে, তিনি

সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে গড়ে তোলা এমন অসংখ্য শিষ্য রেখে যান, যাঁরা ভক্তিবাদকে দ্রুত দেশের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে দিতে পারেন। এই কারণে বলা হয় '*মধ্যযুগে ভক্তিবাদী আন্দোলন রামানন্দের সাথেই সূচিত হয়েছিল।*'

*ড. **রোমিলা থাপার*** লিখেছেন ঃ "*ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে মধ্যযুগের ভক্তি-আন্দোলনে সবচেয়ে বেশি দান এসেছিল **কবীর ও নানক**-এর কাছ থেকে।*" কথিত আছে যে, কবীর (১৪৪০ — ১৫১৮ খ্রীঃ) এক ব্রাহ্মণ-বিধবার সন্তান ছিলেন। মা কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে তিনি এক মুসলমান তাঁতীর ঘরে পালিত হন। প্রথম জীবনে কবীর রামানন্দের ভক্ত ছিলেন। পরে তিনি নিজস্ব ধারণা প্রচার করতে শুরু করেন। ইসলামীয় চিন্তাধারার সংস্পর্শে থাকার ফলে তাঁর চিন্তাভাবনায় কিছুটা নতুনত্ব ছিল। তিনি ধর্মীয় উদারতার সঙ্গে সঙ্গে সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন দাবি করেন। কবীর বলতেন— ***"ঈশ্বর এক, কেবল নামে ভিন্ন। তাঁর মতে, আল্লাহ্ ও রাম একই ঈশ্বরের আলাদা নাম।" কবীর*** বিভিন্ন ধর্মের স্বাতন্ত্র্য ও বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করে বলতেন ঃ "*ঈশ্বর মসজিদে নেই ; মন্দিরেও নেই ; কাবাতেও নেই, কৈলাসেও নেই ; আচারেও নেই, অনুষ্ঠানেও নেই ; যোগেও নেই, ত্যাগেও নেই।*" তাঁর মতে, ঈশ্বরের অধিষ্ঠান মানুষের হৃদয়ের মধ্যে। ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভের জন্য গার্হস্থ্যধর্ম পরিত্যাগেরও তিনি বিরোধী ছিলেন। ঐতিহাসিক ***তারাচাঁদ***-এর মতে, "*সর্বধর্ম-বর্ণ-সমন্বয়ী প্রেমের ধর্মপ্রচার করাই ছিল কবীরের লক্ষ্য।*" দু-লাইনের এক-একটি শ্লোকের (দোহা) মধ্য দিয়ে কবীর অত্যন্ত সহজ-সরল ভাবে তাঁর বক্তব্য প্রচার করতেন' ফলে এগুলি সহজেই সাধারণ মানুষের বোধগম্য হত।

নানক জন্মেছিলেন (১৪৬৯-১৫৩৯ খ্রীঃ) পাঞ্জাবের গ্রাম তালবন্দীতে। এক মুসলমান বন্ধুর উদারতায় তিনি শিক্ষালাভের সুযোগ পান। বাল্যকাল থেকেই তাঁর মন আচ্ছন্ন করে রাখত অতীন্দ্রিয় জগৎ। অল্পবয়সে সংসার ত্যাগ করে তিনি সুফী-সন্তদের সঙ্গে যোগ দেন। কিছুকাল পরে সুফীদের ত্যাগ করে দেশের নানা স্থান পরিভ্রমণ করেন। কথিত আছে—নানক মক্কা, মদিনা ও সিংহলদ্বীপ ভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর উপদেশাবলী 'আদিগ্রন্থ' পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা আছে। কবীরের মত ইনিও একেশ্বরবাদ-তত্ত্ব প্রচার করেন। তিনি বলেন যে, মানুষ পুরস্কার ও তিরস্কার দুই-ই পায় ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী। জাতিধর্মনির্বিশেষে যে কেউ প্রেম ও ভক্তি সহযোগে বারবার ঈশ্বরের নাম জপলে মোক্ষলাভ করবে। ঈশ্বরের আশীর্বাদ-লাভের জন্য তিনি চরিত্র ও আচরণের পবিত্রতা এবং গুরুর সান্নিধ্যলাভের উপর জোর দেন।

*ড. **থাপার*** লিখেছেন যে, কবীর ও নানক কেউই সচেতনভাবে ধর্মসমন্বয়ের চেষ্টা করেননি। হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের ভাবধারা গ্রহণ করে দুই ধর্মের পার্থক্য দূর করার বা কোন নতুন সমন্বয়বাদী ধর্মমত প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা এঁদের ছিল না। তবে উভয়ের বক্তব্যই খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। বিশেষত কারিগর ও কৃষকশ্রেণীর মধ্যে এই দুই প্রচারক জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন। তার প্রধান কারণ এঁদের মতবাদ ছিল সহজবোধ্য এবং বাস্তবজীবনের সাথে সংযুক্ত। এঁরা উভয়েই সামাজিক সমস্যার কথা অনুভব করেছিলেন এবং তা দূরীকরণে সচেষ্ট ছিলেন। জাতিভেদ-প্রথা অস্বীকার করে সামাজিক সাম্যের ভিত্তিতে এঁরা সমাজকে পুনর্গঠিত করার আহ্বান জানান। কবীর ও নানক কোন নতুন ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নেননি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এঁদের অনুগামীরা যথাক্রমে '*কবীর পন্থী*' ও '*শিখ-সম্প্রদায়*' নামে স্বতন্ত্রগোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত হন।

ষোড়শ শতকে বাংলাদেশে ভক্তিবাদের জোয়ার নিয়ে আসেন ***শ্রীচৈতন্য*** (১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রীঃ)। চৈতন্য নদীয়ায় জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই তাঁর বিদ্যাচর্চা হয়। চৈতন্যদেব স্পষ্টভাষায় ঘোষণা করেন যে, জাতিবর্ণনির্বিশেষে প্রতিটি মানুষ আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী। একান্তচিত্তে ভক্তিভাব জাগরণের মাধ্যমে সেই আধ্যাত্মিক শক্তির স্পর্শ পাওয়া সম্ভব। এই আধ্যাত্মভাব জাগরণের জন্য শ্রীচৈতন্য সমবেত সঙ্গীত বা কীর্তনের উপর জোর দেন। তাঁর মতে, কীর্তন হলো এক বিশেষ ধরনের অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা যেখানে ভগবানের নামসংকীর্তনে বাইরের পার্থিব জগৎ শূন্য হয়ে যায়। জীবে দয়া, ঈশ্বরে ভক্তি এবং ভক্তিভাব জাগরণের জন্য নাম-সংকীর্তন—এই ছিল চৈতন্যের মূল বাণী। তিনি জাতিভেদের অবসান এবং সমস্ত মানুষের ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান। সারা দেশ ভ্রমণ করে চৈতন্য তাঁর মতবাদ প্রচার করেন। মুসলমান ও নিম্নবর্ণের মানুষ-সহ অনেকেই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। চৈতন্য নিজে কোন স্বতন্ত্র ধর্মসংগঠন প্রতিষ্ঠা করেননি। তবে তাঁর শিষ্যরা পরবর্তীকালে ***'গৌড়ীয় বৈষ্ণব'*** নামে পৃথক একটি সম্প্রদায়ে সংগঠিত হন। এছাড়াও বহু ভক্তিবাদী সাধক ও প্রচারক ভক্তিবাদের সহনশীল ও সাম্যবাদী তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন। পঞ্চদশ শতকের ভক্তিদর্শন পরবর্তীকালেও নানা মুখে প্রচারিত হয়েছে। এঁদের বক্তব্যেও ভক্তিবাদের মূল বৈশিষ্ট্যগুলির প্রাধান্য ছিল।

❍ **ভক্তিবাদের প্রভাব ঃ** ভারতীয় ধর্ম ও সমাজের উপর ভক্তিবাদের প্রভাব সম্পর্কে নির্দিষ্ট ভাবে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া কষ্টকর। অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও সমালোচক মনে করেন যে, ভক্তিবাদী আন্দোলনের প্রেরিত বার্তা ধর্ম ও সমাজ-জীবনে পরিবর্তনের আহ্বান জানালেও এর পরিণতি সম্পূর্ণ ছিল না। তার অন্যতম কারণ হলো খুব কমসংখ্যক মানুষ আন্তরিকভাবে এই ভাবধারার সাথে যুক্ত হতে পেরেছিলেন। ধর্ম-সংস্কারের মধ্য দিয়ে সমাজ-সংস্কারের আহ্বান জানিয়েছিলেন ভক্তিবাদীরা। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সামাজিক অসাম্যের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই একদল মানুষ ভক্তিমার্গের অনুগামী হয়েছিলেন। তাই দেখা যায়, সমাজের নিচুতলায় বা নিম্নবর্ণের মানুষরাই মূলত ভক্তিবাদের অনুগামী হয়েছিলেন। বাস্তবক্ষেত্রে সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন তাঁদের সাধ্যাতীত ছিল। তাছাড়া, ভক্তিবাদী সাধকেরা যে আন্তরিকতার সাথে ভক্তির বাণী প্রচার করেছিলেন, অনুগামীদের মধ্যে সেই ত্যাগ ও উদারতা ছিল না। তাই দেখা যায়, ভক্তিবাদ প্রচারিত হওয়ার অল্পকালের মধ্যেই বিভিন্ন সাধকের অনুগামীরা স্বতন্ত্রগোষ্ঠী গঠন করে আর এক ধরনের সামাজিক বিভেদ ও বিরোধের জন্ম দিয়েছেন। ***ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার*** মনে করেন, ভক্তিবাদী আন্দোলন প্রচলিত হিন্দুসমাজ ও ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারেনি। তিনি লিখেছেন ঃ *"...they failed to modify either the religious ideas nd practicies or the outward structure of the Hindu Society to any appreciable extent."*

ড. এ. এল শ্রীবাস্তব কিছুটা স্বতন্ত্রভাবে বিষয়টির ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, ভক্তিবাদী আন্দোলনের দু'টি লক্ষ্য ছিল। একটি হলো, হিন্দুধর্মের সংস্কার করে তাকে একটি সহজ-সরল রূপ দেওয়া—যাতে ইসলামধর্মের সাম্যবাদী আদর্শের আহ্বান থেকে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের সরিয়ে আনা যায়। অপর লক্ষ্যটি হলো, হিন্দু ও ইসলামধর্মের বিরোধ কমিয়ে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষকে কাছাকাছি নিয়ে আসা। ভক্তিবাদ প্রথম লক্ষ্যটি পূরণে সফল ছিল। বর্ণভেদ-প্রথার বিরোধিতা

এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পরিবর্তে সাধনপথে ঈশ্বরলাভের তত্ত্ব প্রচার করে ভক্তিবাদীরা নিম্নবর্ণের মানুষের কাছে হিন্দুধর্মের জনপ্রিয় করতে পেরেছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় লক্ষ্যপূরণে তাঁরা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিলেন। ভক্তিবাদীদের বক্তব্য সামগ্রিকভাবে মুসলমানদের কাছে আদৃত হয়নি। ***শ্রীবাস্তবের*** ভাষায় ঃ *"Neither the Turko-Afgan rulers nor the Muslim public accepted the Rama-Sita creed. They refused to believe that Rama and Rohim, Iswara and Allah were the name of the same God."*

সমাজ ও সংস্কৃতির নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে ভক্তি আন্দোলনের ইতিবাচক প্রভাব অস্বীকার করা কঠিন। অধ্যাপক সুকুমার সেন চৈতন্যদেবের মতাদর্শকে কোন বিশেষ ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার না-করে সামাজিক উপযোগিতার দিক থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। চৈতন্যদেবের আন্দোলন নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষাপ্রসারের মাধ্যমে একটি সমাজ-বিপ্লবের সূচনা করেছিল বলে তিনি মনে করেন। পূর্ব ভারতে এবং বিশেষ ভাবে বাংলাদেশ শ্রীচৈতন্যের আহ্বানে অসংখ্য মানুষের সক্রিয় যোগদানের প্রেক্ষিতে ড. *সেন* লিখেছেন, *"তাঁর (শ্রীচৈতন্য) অপূর্ব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া বাঙালীর প্রতিভা কি ধর্মে, কি দার্শনিক চিন্তায়, কি সাহিত্যে, কি সংগীতকলায় সর্বত্র বিচিত্রভাবে স্ফূর্ত হইতে থাকে। ইহাই বাঙালী জাতির প্রথম জাগরণ।"* সমকালীন সমাজের উপর ভক্তি আন্দোলনের প্রভাব বর্ণনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক ***রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়*** লিখেছেন, *"The chaitanya vaishnave movement added a new strand of morality and goodness to the Indian character."* বিশেষত সাংস্কৃতিক জীবনে এই আন্দোলন একটা পরিবর্তনের ঢেউ আনতে পেরেছিল। ভক্তিবাদী সাধকেরা তাঁদের বাণী প্রচার করতেন আঞ্চলিক ভাষায়। এতদিন শাস্ত্রপুরাণ সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে ছিল। কারণ তা রচিত ছিল সংস্কৃত ভাষায়, যা সাধারণ মানুষ বুঝত না। এখন ভক্তিবাদীদের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে আঞ্চলিক ভাষায় প্রাচীন গ্রন্থ অনুবাদ শুরু হয়। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, গীতা ইত্যাদি সাধারণ মানুষের বোধগম্য হয়ে ওঠে। এইভাবে আঞ্চলিক ভাষা—যেমন হিন্দী, বাংলা, মারাঠী, মৈথিলী, ইত্যাদির বিপুল চর্চা শুরু হয়। বৈষ্ণব সাহিত্য ও চৈতন্যদেবের জীবনভিত্তিক রচনাগুলি বাংলা ভাষাকে আধুনিকতার পথে কয়েক ধাপ এগিয়ে দেয়। তাই ***ড. শ্রীবাস্তব*** লিখেছেন ঃ *"The period of Bhakti movement proved to be a golden period in the history of the growth of our vernacular literature."*

সামাজিক সাম্য ও সহনশীল সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনের পথে হিন্দু-সমাজকে কিছুটা এগিয়ে দেওয়ার কাজে ভক্তিবাদী আন্দোলনের ইতিবাচক ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। শিক্ষা চেতনা আনে—একথা যদি সত্য হয়, তাহলে ভক্তিবাদী আন্দোলন নিম্নবর্ণের মানুষের মধ্যে সাম্যবোধের চেতনাসৃষ্টির কাজ নিশ্চয় কিছুটা সম্পন্ন করেছিল। জাতপাতের ভেদাভেদকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে ভক্তিবাদী সাধক ও দার্শনিকরা হিন্দু সমাজব্যবস্থার মর্মমূলে আঘাত করেছিলেন। ফলে বিভিন্ন সামাজিক সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন-সম্ভাবনা প্রশস্ত হয়েছিল। অধ্যাপক ***ইউসুফ হুসেন*** লিখেছেন ঃ *"It sought to refashion the collective life on a new basis, envisaging a society in which there shall be justice and equality for all and in which men of all creeds shall be able to develope to their full moral and spiritual stature."*

স্থাণুবৎ ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু সমাজব্যবস্থায় গতিশীলতা (mobility) আনার দিক থেকেও ভক্তি আন্দোলনের অবদানকে অস্বীকার করা যায় না। ভারতে ইসলাম ধর্মের প্রসার রক্ষণশীল হিন্দু সমাজকে আরো বেশি রক্ষণশীল করে তুলেছিল। বর্ণভেদ ও নতুন নতুন স্মৃতিশাস্ত্রের কঠোর বিধানদ্বারা সমাজপতিরা হিন্দু-সমাজকে এক অচলায়তনে রূপান্তরিত করে ইসলাম ধর্মের গ্রাস থেকে রক্ষা করতে তৎপর হয়েছিলেন। ***রোমিলা থাপার*** লিখেছেন নিম্নবর্ণের হিন্দুরা দলে দলে এই নতুন ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট না হলে হয়তো এই কঠোর লক্ষণরেখা গড়তে হত না। কিন্তু রক্ষণশীলদের এই কঠোরতা পরিণামে আহত করেছিল অসংখ্য অবহেলিত ও অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষকেই। ভক্তিবাদী আন্দোলন সামাজিক সাম্য ও ন্যায় বিচারের আহ্বান জানিয়ে সেই রুদ্ধ মানবগোষ্ঠীকে স্বধর্মে মুক্তির পথ দেখিয়েছিল। কবির, নানক, শ্রীচৈতন্য প্রমুখ অস্পৃশ্য, অন্ত্যজ অসংখ্য মানুষের মনে সামাজিক প্রতিষ্ঠার আশা সঞ্চার করে তাদের নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। ভক্তিবাদের এই সামাজিক সচলতাকে, সুলতানি আমলের অনন্য অবদান বলা যায়।

ভক্তিবাদ পরোক্ষভাবে হলেও ধর্মীয় সহনশীলতার একটা বাতাবরণ তৈরি করেছিল। ভক্তিবাদী আন্দোলন গোঁড়া মুসলমান বা গোঁড়া হিন্দুদের আস্থা অর্জন করতে পারেনি। কিন্তু ইসলামের উদারতাবাদী সম্প্রদায় 'সুফী'-সন্তদের সাথে ভক্তিবাদী সাধকদের অনেক ক্ষেত্রেই মিল ছিল। এই দুটি অতীন্দ্রিয়বাদী আন্দোলন হিন্দু ও ইসলাম সংস্কৃতির সেতুবন্ধনের কাজে অনেকটা সফল হয়েছিল। অধ্যাপক ***রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়*** লিখেছেন : *"Sufism and Bhakti which constitute the mystical core or essence of Islam and Hinduism, have been firm and essential binders of the two cultures."* ***ইউসুফ হুসেন*** লিখেছেন : *'ইউরোপের সংস্কার-আন্দোলনের মত মধ্যযুগে হিন্দুধর্মের সংস্কার-আন্দোলনও সামাজিক ক্ষেত্রে পরিবর্তনের বার্তা বয়ে আনে এবং ভক্তিবাদের উপর ভিত্তি করে হিন্দু-দর্শনকে নতুন সমাজ গঠন ও আধ্যাত্মিকতা বিকাশের উপযোগী করে তোলেন।"*

○ সুফী-আন্দোলন :

ইসলামধর্মের সূচনাকাল থেকেই ইসলামের এক শ্রেণীর অতীন্দ্রিয়বাদী ও রহস্যবাদী মানুষ ছিলেন। পরবর্তীকালে এঁরা *'তাসায়ুফ'* বা *'সুফী'* নামে পরিচিত হন। অবশ্য সুফী নামটাই বেশি প্রচারিত হয়েছে। ***ইউসুফ হুসেন***-এর ভাষায়, *"ইসলামের বক্ষদেশ থেকেই সুফীবাদের জন্ম"* (born in the bosom of Islam)। হজরত মহম্মদ যখন ইসলামের মর্মবাণী প্রচার করেন, তখন একদল জ্ঞানী অথচ কিছুটা নির্বিবাদী ও ভাববাদী মানুষ এই ধর্মের অনুগামী হয়েছিলেন। ***ফিলিপ হিট্টির*** ভাষায়, *"সুফীবাদ হলো ইসলামের অতীন্দ্রিয়বাদী রূপ। এটি কেবল কতকগুলি তত্ত্বের সমাবেশ নয়। সুফীবাদের ভিত্তি হলো ধর্ম বিষয়ে কিছু গভীর ভাবনা ও অনুভূতি"* (*"Sufism is the form which mysticism has taken in Islam. It is not so much a set of doctrines as it is a mode of thinking and feeling in the religious domain."*)[1] হিট্টির মতে, মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে এই মতবাদের উৎস ধর্মীয় সত্য ও ঈশ্বর উপলব্ধির জন্য ব্যক্তির ঐকান্তিক আকুতি, ঈশ্বরের সাথে প্রত্যক্ষ যোগ সাধনের ইচ্ছা এবং এ

বিষয়ে সাধকের গভীর অভিজ্ঞতা। কোরান তাঁদের কাছে ছিল পবিত্র ধর্মগ্রন্থ এবং পয়গম্বর ছিলেন হজরত মহম্মদ। কোরানের মর্মবাণী এবং হজরতের জীবন-দর্শন থেকেই তাঁরা সত্যাসত্যের শিক্ষা গ্রহণ করেন। কিন্তু ইসলামের নির্দিষ্ট ধর্মপালন-পদ্ধতি ও আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি তাঁদের অনীহা ছিল। বাহ্যিক ধর্মীয় আচরণের পরিবর্তে এই সাধকশ্রেণী সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের (আল্লাহ্) আশীর্বাদ ও করুণা লাভের জন্য ব্যক্তির অন্তরের পবিত্রতার উপর জোর দেন। ***মির ভালিউদ্দিন*** লিখেছেন ঃ *"পবিত্র অন্তরের মধ্যেই ঈশ্বরের অধিষ্ঠান সম্ভব"* বলে সুফীরা বিশ্বাস করতেন। প্রথম পর্বের প্রখ্যাত সুফী-সাধকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বসরার মহিলা সুফী রাবেয়া (অষ্টম শতক) এবং মনসুর-বিন্-হল্লাজ (দশম শতক)। এঁরা প্রেম ও ভক্তিকে ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভের প্রধানতম পথ বলে গ্রহণ করেন। তাঁরা প্রচার করেন যে, সর্বভূতেই ঈশ্বরের সাথে মানুষের মিলন সম্ভব। ঈশ্বর ও মানুষ সম্পর্কে তথা স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্পর্কে এই অভেদ ভাবনা গোঁড়া পন্থীদের ক্ষুব্ধ করে। তাই ধর্মদ্রোহিতার অপরাধে মনসুরের প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। সুন্নী বা শিয়া উভয় সম্প্রদায়ই সুফীদের বিরুদ্ধাচরণ করেন। এই বিরূপতা সত্ত্বেও অতীন্দ্রিয়বাদী ধ্যান-ধারণা জনপ্রিয়তা পেতে থাকে।

❍ সুফীদর্শনের উদ্ভব ঃ নবম শতক পর্যন্ত সুফীবাদ ছিল একটি অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক চেতনা। নবম শতক থেকে সুফীদর্শন তত্ত্বের উদ্ভব ও প্রচার ঘটে। সুফীদর্শন তত্ত্বের উদ্ভব ঘটে প্রখ্যাত সুফী সাধক হুসেন-বিন্-মুনসুল-এর আমলে (দশম শতক)। তাঁর জীবন ধারার মধ্য দিয়ে আত্মার সাথে পরমাত্মার মিলনের তত্ত্ব পরিস্ফুট হয়। পরমাত্মার উপলব্ধির ভিত্তিতে তিনি ঘোষণা করেন 'আনল্ হক্', আনল্ হক্ অর্থাৎ 'আমিই তিনি'। এই উপলব্ধির সাথে উপনিষদের ঘোষিত সত্য 'অহম্ ব্রহ্মাস্মি, অহম ব্রহ্মাস্মি বা আমিই ব্রহ্মা'-এর মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এই তত্ত্বানুযায়ী বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির আগে ঈশ্বরই ছিলেন পূর্ণ সত্ত্বা 'একামেবদ্বিতীয়ম্'। এই 'একত্ব' থেকে ইহজাগতিক বহুত্বের (multiplicity) আবির্ভাব ঘটে। *কে. এন. চিট্‌নিস্*-এর ভাষায়, *'The process of creation was marked by the illumination of 'God' in his perfect unity of Love.*[1] হিন্দুদর্শনের সৃষ্টিতত্ত্ব 'পুরুষ' ও 'প্রকৃতি'র ধারণার সাথে এই ধারণার মিল দেখা যায়।

বিশ্বব্যাপী ইসলামী সাম্রাজ্য সম্প্রসারিত হওয়ার পর ক্ষমতাগর্বী একদল মুসলমান কোরানের মর্মবাণী ও পয়গম্বরের জীবনাদর্শ থেকে সরে গিয়ে ঐশ্বর্যের স্থূল আড়ম্বরের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং নৈতিক অবনতির শিকার হন। এই বিচ্যুতি ভাববাদীদের প্রতি সাধারণ মানুষকে বেশি করে আকৃষ্ট করে। তবে গোঁড়া পন্থীদের সাথে ভাববাদীদের বিরোধ এই শেষোক্ত ধারার সরল অগ্রগতিকে ব্যাহত করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত আরবীয় দার্শনিক আল গজালী (১০৫৭-১১১২ খ্রীঃ) সুফীদের অতীন্দ্রিয়বাদ ও ইসলামের গোঁড়া মতবাদের মধ্যে একটা সমন্বয়সাধনের কাজে কিছুটা সফল হন। তিনি ইসলামের রহস্যবাদকে অধিবিদ্যামূলক ভিত্তি দেন। যুক্তিবাদীদের দর্শনকে নস্যাৎ করে তিনি প্রমাণ করেন যে, কেবল যুক্তিতর্কদ্বারা ঈশ্বরের মহিমা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। ঈশ্বরের প্রকাশের মাধ্যমেই এই জ্ঞানার্জন সম্ভব। কোরান হলো ঈশ্বরের বাণী। তাই

রহস্যবাদীদের কাছে এই গ্রন্থ অপরিহার্য। তিনি যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করেন যে, অতীন্দ্রিয়বাদ ইসলামসম্মত। তাঁর ব্যাখ্যার ফলে সুফীবাদ ইসলামের অন্যতম শাখা হিসেবে অগ্রসর হওয়ার পথ খুঁজে পায়। পরবর্তীকালে দেখা যায়, বহু ক্ষমতাবান শাসক এবং অভিজাত ব্যক্তি-সুফী-সাধকদের অনুগামী হয়েছিলেন।

○ সুফীবাদের উপর অন্যান্য দর্শন ও সাহিত্যের প্রভাব ঃ

ইসলামের বক্ষদেশ থেকে নিঃসৃত সুফীবাদের উপর সমকালীন ধর্মতত্ত্ব ও সাহিত্যের প্রভাব লক্ষণীয়। প্রাথমিকভাবে খ্রীষ্টান ধর্মতত্ত্বের সংস্পর্শে এসে সুফীবাদ নতুন গতিবেগ পায়। খ্রীষ্টবাদ দু'ভাবে সুফীবাদকে প্রভাবিত করে—বিধিগত ও নৈতিক। বিধিগত ভাবে ঈশ্বরের নাম স্মরণ বা প্রার্থনা করা এবং নৈতিকভাবে ইহজাগতিক বিষয়ে অনাশক্তির শিক্ষা দেয় খ্রীষ্টবাদ। নবম শতকে গ্রীক সাহিত্যে আরবীতে অনূদিত হলে সুফীবাদ নতুন প্রেরণা পায়। এই নব্য-প্লেটোনিক মতবাদ (New-platonism) তিনভাবে প্রেরণা দেয়। ***প্রথমত,*** এটি সুফীদের মধ্যে আত্মনিবেদনের চেতনাকে গভীরতর করে, ***দ্বিতীয়ত,*** ঈশ্বরের প্রতি আস্থা গভীরতর করে এবং ***তৃতীয়ত,*** সর্বেশ্বরবাদের ধারণাকে পুনরুজ্জীবিত, ও গতিশীল করে।

চূড়ান্ত পর্যায়ে সুফীবাদ বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্মের প্রভাবাধীন হয়। মুসলমান রহস্যবাদী সাধকেরা অজ্ঞাতসারে বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের বেশ কিছু দর্শনতত্ত্ব ও আচার গ্রহণ করেন এবং সুফীবাদের সাথে যুক্ত করেন। সুফীবাদের চারটি অঙ্গীকার পবিত্রতা, শুদ্ধতা, সততা ও দারিদ্র্য (cleanliness, purity, truth and poverty) ছিল হিন্দুদর্শনের উপজাত ফল। ভারতীয়দের মতই সুফীরা ঈশ্বরের (আল্লাহ্) নাম স্মরণ করার সময় জপমালা ব্যবহার শুরু করেন। বৌদ্ধদর্শন থেকেই তাঁরা 'নির্বাণ' (ফানা) এবং আর্য-অষ্টাঙ্গ মার্গ (সালুক্)-এর ধারণা গ্রহণ করেন। সুফী-সাধকদের ধর্মাচরণ-পদ্ধতি যেমন—কৃচ্ছসাধন, যোগাসন প্রভৃতির সাথে বৌদ্ধ ও হিন্দু যোগীদের সাধনার মিল লক্ষ্য করা যায়। অধ্যাপক ***সতীশচন্দ্র*** উল্লেখ করেছেন যে, ইসলামের আবির্ভাবের অনেক আগে থেকেই মধ্য-এশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম পরিচিত ছিল। ইসলামের আবির্ভাবের পরেও হিন্দু যোগীরা পশ্চিম-এশিয়ায় যেতেন। বুদ্ধের বহু কাহিনী ইসলামের লোকগাথায় প্রচলতি ছিল। *'অমৃতকুণ্ড'* নামক যোগসাধনার একটি গ্রন্থ ফার্সীতে অনূদিত হয়েছিল। স্বভাবতই বৌদ্ধ ও হিন্দু যোগসাধকদের ধর্মাচরণ-পদ্ধতি সম্পর্কে সুফীরা পরিচিত হয়েছিলেন এবং তাঁদের আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে এগুলির সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন। অধ্যাপক *এ. এল. শ্রীবাস্তব* মনে করেন, ভারতে প্রবেশ করার পর সুফী ধ্যান-ধারণার উপর হিন্দু ধর্মবিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের প্রভাব পড়েছিল। আত্মা ও পরমাত্মার সাথে প্রেমিক ও প্রেমিকার সম্পর্কের ধারণা হিন্দুদর্শন থেকেই গৃহীত হয়েছিল। অহিংসা ও শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন পদ্ধতির যে আদর্শ ভারতীয় সুফীদের একান্ত পালনীয় কর্তব্যরূপে গণ্য হত, তা বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দুদর্শন থেকে গৃহীত হয়েছিল। সুফীদের কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন এবং আত্মপীড়নমূলক সাধনপদ্ধতি, যেমন—'চিল্লা' বা নির্জন কক্ষে একান্তে টানা ৪০ দিন ব্যাপী সাধনা, *'চিল্লা-ই-মা কুস'* অর্থাৎ গাছের ডালে পা বেঁধে মাথা নিচে রেখে ৪০ দিন সাধনা করা *'পাস-ই-আনপাস'* অর্থাৎ ধ্যানে লিপ্ত থাকা ইত্যাদি হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের কাছ থেকে গ্রহণ করা হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। এছাড়া হঠযোগীদের সাথে সুফীসাধকদের একটা সুসম্পর্কের ধারা ভারতে বর্তমান ছিল। স্বভাবতই ভারতীয় যোগসাধনার

দ্বারা সুফীরা কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ***ঐতিহাসিক রিজভী*** (S.A.A.Rizzvi) তাঁর *'Islam in Modern India'* গ্রন্থে লিখেছেন, *"Vrious anecdotes indicate that Sufis approved of some ethical values of the yogi's as well of their corporate way of living."* অবশ্য অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মনে করেন যে, এ সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে কোন সিদ্ধান্ত টানা সম্ভব নয়। তবে সুফীবাদের সাথে বৌদ্ধ ও হিন্দু যোগীদের মত ও পথের যে কিছু সাদৃশ্য ছিল, একথা সত্য।

○ নামকরণ ও সুফীদর্শন ঃ

মুসলিম অতীন্দ্রিয় ও রহস্যবাদীরা কেন 'সুফী' নামে পরিচিত হলেন, সে সম্পর্কে একাধিক মত প্রচলিত আছে। কেউ কেউ মনে করেন 'সাফা' অর্থাৎ 'পবিত্রতা' শব্দ থেকে 'সুফী' কথাটি এসেছে। এই সকল অতীন্দ্রিয়বাদী সাধক ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে হৃদয়, চিন্তা ও আচরণের পবিত্রতার উপর জোর দিতেন বলে এঁরা 'সুফী' নামে অভিহিত হন। অনেকের মতে, 'সাফ' বা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো কথাটি থেকে 'সুফী' শব্দটি এসেছে। আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছানোর জন্য তাঁর ভক্তমণ্ডলীর যে সাফ বা সারি তার শীর্ষে আছেন এইসব অতীন্দ্রিয়বাদী সাধকগণ। তাই এঁরা 'সুফী' নামে পরিচিত হন। তৃতীয় ব্যাখ্যানুসারে 'সুফা' থেকে সুফী' শব্দের উৎপত্তি। এই সকল ভাববাদী সাধক তাঁদের পবিত্র ও ধর্মীয় জীবনের জন্য পয়গম্বর হজরতের অতি বিশ্বস্ত ও নিকট জন 'আসাব-উল্-সুফ'-এর সমকক্ষ ছিলেন। তাই এঁরা 'সুফী' নামে খ্যাত হন। আর একটি মত হলো এই সকল অতীন্দ্রিয়বাদী সাধক 'সুফ' বা মোটা উলের পোশাক পরিধান করতেন বলে সুফী নামে সাধারণ্যে পরিচিত হন।

'সুফী' নামকরণের পশ্চাৎপট সম্পর্কে দ্বিমত থাকলেও, সুফীবাদের উৎস ও মতবাদ সম্পর্কে সকলেই একমত। ইসলামের মধ্যে থেকেই সুফীবাদের জন্ম। কোরান সুফীবাদের ভিত্তি। সুফীরা ইসলামের শান্তিদূত। অন্ধকারের দেশ (দার-উল্-হার্ব)-কে বিশ্বাসীর দেশে (দার-উল্-ইসলাম)-এ পরিণত করাই ছিল তাদের জীবনের ব্রত। অ-মুসলমানকে ইসলামধর্মে দীক্ষিত করার কাজে সুফীগণ যথেষ্ট তৎপর ছিলেন। তবে তাঁদের পথ ছিল শান্তির পথ। মানুষের মনে আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসের আসন প্রতিষ্ঠা করে তাঁরা এই কাজ সম্পন্ন করতেন। ***ইউসুফ হুসেন*** লিখেছেন ঃ *"সুফীবাদ ইসলামধর্মের একটা অংশ, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তফাত এই যে, গোঁড়া মুসলামানরা ধর্মাচরণের উপর জোর দেন, কিন্তু সুফীরা গুরুত্ব দেন অন্তরের শুদ্ধতাকে। গোঁড়াপন্থীরা বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বরের করুণালাভের জন্য ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান নিখুঁতভাবে পালন করা উচিত। কিন্তু সুফীরা মনে করেন, একান্ত প্রেম ও ভালবাসার মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানো সম্ভব।"* প্রখ্যাত মুসলমান ধর্মবিদ্, ***জাকারিয়া আন্‌সারীর*** লেখা থেকে সুফীবাদের মূল আদর্শ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি লিখেছেন ঃ *"সুফীবাদ শিক্ষা দেয় অনন্ত শান্তিলাভের জন্য কিভাবে আত্মাকে শুদ্ধ করতে হয়, নৈতিক মান উন্নত করতে হয় এবং ব্যবহারিক জীবনে আচরণ করতে হয়। এর মূল বিষয় হলো আত্মার শুদ্ধি এবং প্রধান লক্ষ্য হলো স্বর্গীয় আশীর্বাদ লাভ করা।"* ইসলামের অগ্রগতির যুগে সুখী-সন্তরা শান্তি ও মানবতাবাদের কথা প্রচার করে বিজিত মানবগোষ্ঠীকে ইসলামের প্রতি আগ্রহী করে তোলেন।

সুফিবাদে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে মানুষের মানস-সত্ত্বাকে। এখানে মূলত দুটি প্রশ্নের উত্তর খোঁজার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। এগুলি হলো—(১) মানুষ কিভাবে তার অন্তরে ঈশ্বরকে

অনুভব করবে এবং (২) এই সৃষ্টির সাথে ঈশ্বরের সম্পর্ক কি? এই প্রশ্নের উত্তরলাভের জন্য, দুটি পথের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—মার্গ (তরীফৎ)-এর জ্ঞান (মরীফৎ)। মার্গ সাতটি, যথা—সেবা, প্রেম, ত্যাগ, ধ্যান, যোগ, সংযোগ ও সমীকরণ। জ্ঞান হলো ঈশ্বরের চেতনাগত উপলব্ধি। জ্ঞান দু'প্রকার—(১) ইলম বা বুদ্ধিনির্ভর জ্ঞান এবং (২) মরীফৎ বা অপরোক্ষ জ্ঞান। সুফীবাদের আধ্যাত্মদর্শন 'ওয়াদাত-উল্-ওয়াজুদ' বা সত্ত্বার ঐক্য (unity of being) ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। স্রষ্টা (হক্) এবং সৃষ্টি (খালক্)-এক। এই বিশ্বের দৃশ্যমান বৈচিত্র্য বা বিভিন্নতা একই ঈশ্বরের নানামুখী প্রকাশ। ***শেখ্ মহিউদ্দিন ইবন্-এল্-আরবী*** সুফী দর্শন ব্যাখ্যা করে লিখেছেন ঃ *"There is nothing but God, nothing in existence other than He ; there is not even a 'there' where the essence of all things is one."*। সুফীদের অপর এক গোষ্ঠী স্রষ্টাও সৃষ্টির অদ্বয়তত্ত্বকে কিছুটা সংশোধিত আকারে মান্য করতেন। প্রথমোক্তরা *'ওজুদীয়া'* এবং দ্বিতীয়োক্তরা *'শুহুদীয়া'* নামে খ্যাত হন। ওজুদীয়ারা যখন বলতেন যে 'সকলই ঈশ্বরময়' (হাস্য ওসৎ) তখন শাহুদীয়ারা বিশ্বাস করতেন যে বিশ্বসংসারের সবকিছুই ঈশ্বর থেকে সৃষ্ট (হামা আজ্ ওসৎ)। ওজুদীয়ারা মারীফৎ বা তত্ত্বজ্ঞানকে শরিয়ত-এর উপরে স্থান দিয়েছিলেন। স্বভাবতই ঈশ্বরের সাথে মানবাত্মার সরাসরি মিলনের এই তত্ত্ব রক্ষণশীল মুসলমানদের পছন্দ ছিল না। সুফীরা জীব ও ঈশ্বরের এই মিলনতত্ত্ব গ্রহণ করলে রক্ষণশীলরা ক্ষুব্ধ হন। কিন্তু কোন বিরূপতাই সুফীদের *'ওয়াদৎ-উল্-ওয়াজুদ'* দর্শন থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। স্রষ্টার সাথে মিলনের জন্য সুফীরা ঈশ্বর চিন্তায় অবিরাম নিমগ্ন থাকতেন। অতীন্দ্রিয় সাধনার মাধ্যমে ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভের আশায় তাঁরা সকল প্রকার জাগতিক সুখ ও ঐশ্বর্য ত্যাগ করে দুঃখ-কষ্টের মধ্যে জীবনযাপনের পথ বেছে নেন। পাছে সুখ ও ঐশ্বর্য তাঁদের ঈশ্বরবিমুখ করে এই চিন্তায় সুফীরা সদা শঙ্কিত থাকতেন। এই কারণে পার্থিব শক্তি বা বিষয়াদি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকাই তাঁদের জীবনদর্শন ছিল। এখানেই হিন্দু অদ্বৈত বেদান্তদর্শনের সাথে সুফীবাদের মিল।

সুফীদর্শনে 'পীর' বা গুরুর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঈশ্বরের সাথে আত্মার মিলনের জন্য 'মুরিদ' বা শিষ্যকে পীর সঠিক পথ ও পদ্ধতির সন্ধান দেন। পীরের সান্নিধ্য ছাড়া আত্মার সাথে ঈশ্বরের মিলন কিংবা স্বর্গীয় আশীর্বাদ লাভ করা সম্ভব নয়। গুরুর নেতৃত্বে ও প্রদর্শিত পথে অখণ্ড প্রেম ও ভক্তিভাবনা দ্বারা স্রষ্টা ও সৃষ্টির মিলন সম্ভব।

একটি মতানুসারে একজন সুফী সাধনার দশটি স্তর অতিক্রম করলে তবেই ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করতে পারে। এই স্তরগুলি হলো—(ক) তত্তবা বা অনুশোচনা, (খ) ওয়ারা বা নিবৃত্তি, (গ) জুহদ বা ধার্মিকতা, (ঘ) ফক্র বা দারিদ্র্যের স্বাদ গ্রহণ, (ঙ) সব্র বা সহনশীলতা অর্জন, (চ) শুক্র বা কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন, (ছ) খুফ্ বা অন্যায়ের প্রতি ভীতি, (জ) রজা বা আল্লাহ্র করুণা লাভের ইচ্ছা, (ঝ) তওয়াক্কুল বা আনন্দে-বিষাদে অচঞ্চল থাকা এবং (ঞ) রিজা বা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা। ভক্তিবাদী সাধকদের মত সুফীরাও পার্থিব জগতের সাথে সম্পর্কশূন্য থাকাকে আবশ্যিক মনে করতেন। এটি হল *'তারক্-ই-দুন্যা'*। *ড. **নিজামী*** (K. A. Nizami) লিখেছেন ঃ *"সুফীবাদে সমাজ ও সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস-জীবনযাপন আবশ্যিক নয়। সমাজ-সংসারের মধ্যে থেকেও পার্থিব চাওয়া-পাওয়ার ঊর্ধ্বে থাকাটাই সুফীদর্শনের নির্দেশ। কারণ পার্থিব বিষয়ের প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি পেলে আধ্যাত্ম-সাধনা বিঘ্নিত হয়।"*

সুফীদের একাংশ বিবাহ্ করে সাধারণ সংসারজীবন-যাপন করতেন। তবে অধিকাংশই গুরু বা পীরের নেতৃত্বে নির্জন স্থানে 'খান্‌কা' বা 'দরগা'য় বসবাস করতেন। এইসব দরগায় পীর তাঁর শিষ্যদের ইসলামীয় শাস্ত্রে শিক্ষা দিতেন এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি বিষয়ে দীক্ষা দিতেন। শিক্ষা-দীক্ষা ছাড়াও দরগা বা খান্‌কা দরিদ্রকে অন্নদান ও চিকিৎসার কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হত। এঁরা জীবিকা নির্বাহের জন্য মূলত নির্ভর করতেন মানুষের অযাচিত দানের উপর। অবশ্য কেউ কেউ পতিতজমিতে চাষ-আবাদ করতেন। সাধারণভাবে সুফীরা সরকারি কাজকর্মের সাথে যুক্ত থাকা পছন্দ করতেন। সুফী পীর ও দরবেশরা কেউ কেউ হিন্দুরাজ্য জয়ের জন্য যুদ্ধ করতেন বলে ড. মজুমদার উল্লেখ করেছেন। সুফীরা প্রধানত দুটি ভাগে বিভক্ত ছিলেন। একদল ইসলামী আইন-কানুন বা 'শরা' অনুসরণ করতেন। এঁরা 'বা শরা' নামে অভিহিত হন। অপর সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশ যে-কোন ধরনের নিয়মে আবদ্ধ না থেকে মুক্তভাবে অন্তরের বিকাশে আস্থাবান ছিলেন। এঁদের বলা হত 'বে-শরা'। ভারতে দু'দলেরই অস্তিত্ব ছিল। তবে প্রভাব-প্রতিপত্তি বা সংখ্যার বিচারে 'বা-শরা' গোষ্ঠীই ছিলেন অগ্রণী।

○ ভারতে সুফী সাধকগণ ঃ

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে সিন্ধুদেশে আরবদের বিজয়-অভিযানের সময় ভারতে সুফীরা প্রথম প্রবেশ করেছেন বলে মনে করা হয়। সিন্ধু অঞ্চলে তিনশো বছর-ব্যাপী আরব-আধিপত্যের যুগে সুফী-সাধকদের কেউ কেউ ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিলেন ধরে নেওয়া যেতে পারে। তবে তুর্কীদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর মধ্য-এশিয়া থেকে দলে দলে সুফী ভারতে প্রবেশ করেন এবং সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েন। গ্রামপ্রধান ভারতের অভ্যন্তরে দরিদ্র ও শোষিত অ-মুসলমান পাশাপাশি বসবাস করা সুফীদের পক্ষে সহজ হয়। বৈরাগ্য, উদারতা ও সহজ-সরল জীবনযাপন পদ্ধতি দ্বারা এঁরা খুব সহজেই নিম্নশ্রেণীর ভারতবাসীর হৃদয় জয় করতে সক্ষম হন। অতঃপর এঁরা অ-মুসলমানদের ইসলামের যুক্তিবাদের প্রতি আগ্রহান্বিত করে ধর্মান্তরিত করার কাজ করতে থাকেন। সুফী-পীর ও দরবেশগণ অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করতেন। তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের প্রতি সাধারণ ভারতবাসীর একটি গভীর টান আগে থেকেই ছিল। এখন সুফী সাধকদের অলৌকিক শক্তির প্রতি সাধারণ মানুষের বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। অনেকেই পীরের দরগা'য় নিয়মিত আসতে শুরু করেন। এঁদের অনেকে ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন। লক্ষণীয় যে, হিন্দুরাজার শাসনাধীন অঞ্চলেও সুফীদের অবাধ বিচরণে কোন বাধা সৃষ্টি করা হত না। ভারতীয় সুফীরা গোঁড়া ধর্মকেন্দ্রগুলির সাথে কোন যোগাযোগ রাখেননি। রাজনীতি থেকেও দূরে সরে থাকা তাঁদের প্রধান নীতি ছিল। উলেমাদের সঙ্গে স্বভাবতই সুফীদের বিরোধ বাধে। সুফীদের উদার চিন্তা উলেমাদের অপছন্দ ছিল। পক্ষান্তরে সুফীরা মনে করতেন, রাজনীতি ও বিষয়ে বৈভবের সাথে উলেমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে এবং তা ইসলাম-বিরোধী। আগেই বলা হয়েছে যে, বহু সুফী সমাজেই বসবাস করতেন এবং সংসার করতেন। কিন্তু মন অসন্তোষ থাকলেও রাজতন্ত্র বা উলেমাতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলনের চিন্তা তাঁদের মনে আদৌ ছিল না। তবে এঁরা মনে করতেন যে, পৃথিবীতে নতুন যুগ আসছে, যখন এক ইসলামী উদ্ধারকর্তা (মাহদী) ইসলামের মর্মবাণী পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবেন।

ভারতে আসার আগেই সুফীদের মধ্যে অসংখ্য *'সিলসিলাহ'* বা সম্প্রদায় গড়ে

উঠেছিল। একটি পরিসংখ্যানে সুফীদের ১৭৫টি 'সিলসিলা'র কথা বলা হয়েছে। আবুল ফজল লিখেছেন যে, ভারতবর্ষে সুফীদের চৌদ্দটি সম্প্রদায় প্রবেশ করেছিল। অবশ্য এদের মধ্যে মাত্র দু'টি—চিশ্‌তি ও সুরাবর্দী সিলসিলাহ ভারতে প্রভাবশালী ছিল। তবে সুরাবর্দী সম্প্রদায়ের কার্যকলাপ মূলত সীমাবদ্ধ ছিল সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে, কিন্তু চিশ্‌তি সম্প্রদায়ের প্রভাব সারা ভারতে প্রসারিত হয়। উভয় সম্প্রদায়ই বা-শরা অর্থাৎ শরা'র অনুগামী ছিলেন।

ভারতে চিশ্‌তি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন খাজা মইনউদ্দিন চিশ্‌তি (১১৪১-১২৩৫ খ্রীঃ)। ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ তিনি শিস্তান থেকে ভারতে আসেন। লাহোর ও দিল্লীতে কিছুদিন অবস্থানের পর আজমীরে চলে যান এবং সেখানেই জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অবস্থান করেন। একজন হিন্দু সন্ন্যাসীর মতই তিনি জীবনযাপন করতেন এবং বেদান্ত দর্শনের মতই অদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। প্রভেদ এই যে, তিনি সৃষ্টিকর্তাকে *'আল্লাহ্'* নামে অভিহিত করেন। আজমীরে মইনউদ্দিনের সমাধি হিন্দু-মুসলমান উভয়ের কাছেই পবিত্র স্থান রূপে গণ্য হয়। খাজা মইনউদ্দিনেক শিষ্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন শেখ হামিদাউদ্দিন, নাগোরী ও কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকি। শেখ হামিদউদ্দিনের পিতামাতা ঘুরী আক্রমণের আগেই ভারতে বসবাস শুরু করেছিলেন। শেখ হামিদ অল্পবয়সে মইনউদ্দিনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। রাজস্থানের নাগাউরে তিনি গৃহী জীবনযাপন করতেন। সর্ব ধর্মের প্রতি ছিল তাঁর সমান শ্রদ্ধা। হিন্দুদের 'কাফের' বলতে তিনি অস্বীকার করেছিলেন। ধর্মবিদ্ আল-গজালীর লেখার একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে তিনি খ্যাতি পান। স্থানীয় হিন্দাবী ভাষায় তিনি সুফীতত্ত্ব প্রচার করতেন। শেখ কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকি ফারগানার উচ-এ জন্মগ্রহণ করেন। ইলতুৎমিসের রাজত্বকালে তিনি ভারতে আসেন। ইলতুৎমিস এই সাধককে রাজপ্রাসাদের সন্নিকটে বসবাসের অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু কুতুবউদ্দিন সেই আমন্ত্রণ উপেক্ষা করে শহরের সীমান্তে 'দরগা'য় বসবাস শুরু করেন। সুলতান তাঁকে শেখ-উল্-ইসলাম পদ গ্রহণের জন্যেও অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু শেখ কুতুব তা বিনীত ভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। তবে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সুলতানের সাথে মধুর সম্পর্ক বজায় ছিল। অনুমান করা হয় এই সাধকের স্মৃতিরক্ষার্থে দিল্লীর কুতুবমিনার নির্মিত হয়েছিল। উত্তর ভারতে সুফীবাদের বিশিষ্ট প্রচারক ছিলেন শেখ ফরিদউদ্দিন-গঞ্জ-ই শক্কর (১১৭৫-১২৬৫ খ্রীঃ)। বাবা ফরিদ নামেই তিনি বিশেষ পরিচিত ছিলেন। অল্প বয়সেই তিনি শেখ কুতুবউদ্দিনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে হান্সিতে খান্কা প্রতিষ্ঠা করেন। পরে বর্তমান পাকিস্তানের অযোধান অঞ্চলে স্থায়িভাবে খান্কা স্থাপন করে দর্শন প্রচার শুরু করেন। তাঁর শিষ্যরা একাধিক খান্কা স্থাপন করে সুফী দর্শন প্রচার করতেন। হিন্দু-ভক্তিবাদী সাধকদের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এত উদার ও উচ্চমার্গের ছিল যে, পরবর্তীকালে শিখদের 'আদি গ্রন্থে' শেখ ফরিদের বহু পদ উদ্ধৃত করা হয়েছে। অযোধানে স্থাপিত শেখ ফকিরদের খান্কা বা জমাইতখানা তাপিত হৃদয়ের তাপমোচনের পুণ্যভূমি রূপে সমস্ত শ্রেণীর মানুষের কাছে বন্দিত হয়। এ প্রসঙ্গে ***নিজামী*** (K. A. Nizami) লিখেছেন ঃ *"Jamaat khana at Ajodhan was one of the great mystic centres of the age, and all sorts of people-high and low, rich and poor, flocked to it to soothe their tired nerves in the spiritual*

atmosphere prevailed there the message of Baba Farid still echoes through the corridors of time.''

চিশ্‌তি সম্প্রদায়ের সর্বাধিক জনপ্রিয় সুফী-সাধক ছিলেন বাবা ফরিদের শিষ্য হজরত নিজামউদ্দিন আউলিয়া (১২৩৬-১৩২৫ খ্রীঃ)। তাঁর জন্ম বদাউনে। বাল্যকালেই তিনি পিতৃহারা হন। মাত্র ২০ বছর বয়সে তিনি বাবা ফরিদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সারা দেশেই নিজামউদ্দিনের খান্‌কা স্থাপিত ছিল। তাঁর জীবৎকালে দিল্লীর সিংহাসনে সাতজন সুলতান অধিষ্ঠিত হয়েছেন। কিন্তু হজরত নিজামউদ্দিন একবারের জন্যও রাজদরবারে যাননি কিংবা সুলতানের সাহায্য নেননি। সুলতান জালালউদ্দিন খলজী, সুলতান মুবারক শাহ্ খলজী প্রমুখের একান্ত বাসনা ছিল যে এই মহান সাধক একবার তাঁদের দরবারে সশরীরে উপস্থিত হন। কিন্তু শেখ নিজামউদ্দিন সমস্ত অনুরোধই প্রত্যাখ্যান করেন। সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক মনে করতেন যে, নিজামউদ্দিন বাংলার স্বাধীনতাকামী শাসক সুলতান নাসিরউদ্দিন খসরু শাহের প্রতি সহানুভূতিশীল। এই কারণে তিনি শেখের প্রতি বিদ্বিষ্ট ছিলেন। সুলতান ঘোষণা করেছিলেন যে, গৌড় অভিযান সমাপ্ত করেই তিনি এই সুফী-সন্তকে শাস্তি দেবেন। সুলতানের এহেন হুমকীর পরিপ্রেক্ষিতে শেখ নিজামউদ্দিন বলেছিলেন 'দিল্লী হনুজ দূর অস্ত' অর্থাৎ দিল্লী এখন অনেক দূর। ঘটনাচক্রে এই অভিযান সমাপন করে দিল্লীতে প্রবেশের আগেই সুলতান গিয়াসউদ্দিন মারা যান। এই পরিণতি সুফী সাধকের ঐশীশক্তি ও ভবিতব্য দর্শনের দৃষ্টান্ত হিসেবে জনমনে গভীর রেখাপাত করে। যাই হোক, বহু অভিজাত এবং রাজপরিবারের সদস্য 'পীর' হিসেবে তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন। চিশ্‌তি সম্প্রদায়ের আর এক সর্বজন শ্রদ্ধেয় সাধক ছিলেন শেখ নাসিরউদ্দিন চিরাগ-ই-দিল্লী। নিজামউদ্দিনের পরে দিল্লী খান্‌কার দায়িত্ব এই মহান শিষ্যের হাতে অর্পিত হয়েছিল। শেখ নাসিরউদ্দিনের বাধাদানের ফলে সুলতানি প্রশাসন সুফীদের জীবনযাত্রায় হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হয়েছিল। সুলতান মহম্মদ-বিন্-তুঘলক কিছুটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও সুফীদের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র জীবনযাপন পদ্ধতি মেনে নিয়েছিলেন। দীন-দরিদ্র ও আর্তের সেবা এবং মঙ্গলকামনায় নাসিরউদ্দিনের সারা জীবন অতিবাহিত হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ত শেখ সেলিম চিশ্‌তি'র একান্ত অনুরাগী ছিলেন প্রখ্যাত মুঘল সম্রাট আকবর।

বাগদাদে সুরাবর্দী সিলশিলাহ'র প্রতিষ্ঠা করেন শেখ শিহাবউদ্দিন সুরাবর্দী। মুলতানের শেখ বাহাউদ্দিন জাকারিয়া আরবদেশে গিয়ে সুরাবর্দীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন এবং মুলতানে এসে খান্‌কা প্রতিষ্ঠা করে সুরাবর্দীর ধর্মদর্শন প্রচার করেন। এই সম্প্রদায়ের অন্যান্য প্রখ্যাত সন্ত ছিলেন সদরউদ্দিন আরিফ, সৈয়দ জালালউদ্দিন বুখারী প্রমুখ। সুরাবর্দী সম্প্রদায়ের কার্যকলাপ মূলত পাঞ্জাব ও মুলতান অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল।

চিশ্‌তি ও সুরাবর্দী সম্প্রদায়ের জীবনদর্শনে কিছু মৌলিক পার্থক্য লক্ষণীয়। চিশ্‌তি সম্প্রদায়ের সন্তরা নির্জন স্থানে খান্‌কা স্থাপন করে গভীর সাধনার পক্ষপাতী ছিলেন। সমাজের হীন, দরিদ্র ও অবহেলিত মানুষের জন্য তাদের সাধনগৃহ সদা উন্মুক্ত ছিল। তাঁদের জীবনযাত্রা ছিল সহজ, সরল অথচ কঠোর সংযমপূর্ণ। সংগীত, নৃত্য ও যোগসাধনার মাধ্যমে এঁরা বাণী প্রচার করতেন। এঁদের ভক্তিসঙ্গীত 'সমা' খুবই জনপ্রিয় ছিল। রাজশক্তি, বিলাস-বৈভব থেকে দূরে থেকে ঈশ্বরের নামগান করাই ছিল এঁদের লক্ষ্য। কিন্তু সুরাবর্দী সম্প্রদায়ের সুফীরা অতিরিক্ত

কৃচ্ছসাধন বা পার্থিব জগৎ থেকে দূরে থাকার বিরোধী ছিলেন। এঁরা ধর্ম-সংক্রান্ত বা বিচার-বিভাগীয় উচ্চপদে যুক্ত থেকে ধর্মচর্চা করতেন। স্বভাবতই এঁদের জীবনে বিলাসের অভাব ছিল না। পরন্তু এঁদের যোগাযোগ ছিল কেবল সমাজের উচ্চশ্রেণীর সাথে। নিম্নশ্রেণীর বা গরীব মানুষ, ফকির প্রমুখ এঁদের খান্‌কায় প্রবেশাধিকার পেতেন না।

তুলনামূলকভাবে অল্পখ্যাত ও ছোট সিলসিলাহ্‌গুলির মধ্যে কয়েকটি হলো (১) সমরকন্দের শেখ বদরউদ্দিন প্রতিষ্ঠিত *'ফিরদোসী সিলসিলাহ'*। দিল্লীতে এদের প্রথম প্রকাশ ঘটলেও পরবর্তীকালে বিহার ফিরদোসীদের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। (২) শেখ মুহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী প্রতিষ্ঠিত *'কাদেরী সিলসিলাহ'*। এই গোষ্ঠীর প্রধান সংগঠক ছিলেন শাহ নিমুতুল্লা কাদের, সৈয়দ মকদুল গিলানী প্রমুখ। এই গোষ্ঠীর আদর্শগত অভ্যন্তরীণ বিরোধ ও মতভেদ এদের প্রসারের কাজকে বারে বারে ব্যাহত করেছিল।

সুফীবাদ এবং ভক্তিবাদের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন—(১) দুটি মতবাদেই মনে করা হয় যে, সৃষ্টিকর্তা ও তাঁর সৃষ্টির মিলনই মুক্তি বা শান্তির সূচক। এই মিলন সম্ভব ; (২) বাহ্যিক আড়ম্বর বা অনুষ্ঠানাদির পরিবর্তে পবিত্র হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রতি গভীর প্রেম এবং একান্ত আত্মসমর্পণের পথেই এই মিলন ঘটে। (৩) নামগান, সংগীত, নৃত্য ইত্যাদি ঈশ্বরেব প্রতি প্রেমনিবেদনের অতি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। (৪) ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভের জন্য পীর বা গুরুর নেতৃত্ব আবশ্যিক। একজন গুরুই শিষ্যকে ভক্তিমার্গের সঠিক পথের সন্ধান দিতে সক্ষম। (৫) উভয়ক্ষেত্রেই প্রচারকগণ নিজেরা যেমন অতি সাধারণ জীবনযাপন করতেন, তেমনি তাঁদের অনুগামীদের অধিকাংশই ছিলেন নিম্নবর্ণের মানুষ। শ্রমজীবী ও সমাজে অবহেলিত মানুষের মধ্যে মেলবন্ধনের দূত ছিলেন এঁরা। প্রায় একই সময়ে ভারতে, ধর্মজগতে সুফীবাদী ভক্তিবাদী জাগরণের পরিপ্রেক্ষিতে ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে, এই দুটি ধারা একে অপরকে প্রভাবিত করেছে এবং পরিণামে প্রভাবিত হয়েছে।

❍ সুফীবাদের প্রভাব ঃ

মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থা রূপায়ণের ক্ষেত্রে সুফীবাদ একটি সামাজিক শক্তি হিসেবে কাজ করেছিল। সুফীবাদের সহজ-সরল জীবনযাত্রা, চারিত্রিক মাধুর্য ও গভীর নীতিবোধ সাধারণ মানুষকে মুগ্ধ করেছিল। তাই কোন বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায় নয়, সকল শ্রেণী ও স্তরের মানুষ সুফীবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সামাজিক সাম্য ও সহনশীলতার শিক্ষা নিয়েছিলেন। সুফীবাদের সর্বজনীন আদর্শ ধর্মীয় উত্তেজনা প্রশমিত করে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ককে সাবলীল করে তুলতে সাহায্য করেছিল। ইসলামের সাম্যবোধ ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের আবেদন সুফীদর্শনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি স্পষ্টরূপে প্রকাশ পেয়েছে। সুফীদর্শন মুসলিম যুব সম্প্রদায়ের নৈতিক মানোন্নয়ন ঘটাতে সাহায্য করে এবং জীবনকে বাস্তব রূপে দেখতে সাহায্য করে। সুফীবাদের সাম্যভাবনা খুব সংগত কারণে আকৃষ্ট করে সমাজের নিম্নবর্ণের মানুষকে। মুসলমানদের পাশাপাশি বহু হিন্দু সুফী-সাধকদের অনুরাগীতে পরিণত হন। সুফী-সাধকগণ ধর্মান্তরের কথা বললেও তাঁদের জীবন ও দর্শনের আকর্ষণে বহু মানুষ স্বেচ্ছায় ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন। হিন্দুধর্মের উপর সুফীবাদের প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল নগণ্য ; কিন্তু হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় সহনশীলতা গড়ে তোলার পক্ষে ও ইতিবাচক সামাজিক পরিবেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সুফীবাদের প্রভাব অনস্বীকার্য। সুফী-

সন্তরা ইসলামের ভারতীয়করণ (Indianisation of Islam) করেন। বহু মুসলিম শাসক ও প্রভাবশালী অভিজাত সুফীবাদের সংস্পর্শে এসে অনুভব করেন যে, ধর্মীয় সহনশীলতা ব্যতীত রাজকর্তৃত্ব ও রাষ্ট্রীয় ঐক্য সুদৃঢ় করা সম্ভব নয়। হয়তো মুঘল সম্রাট আকবরের আমলে এই ধারণা পূর্ণ রূপ পেয়েছিল ; তথাপি একথাও সত্য যে, তুর্কো-আফগান শাসনের শেষপর্বে এই সামাজিক প্রক্রিয়ার সূচনা করেছিলেন সুফী-সন্তরা।

সুলতানি আমলে সামাজিক সচলতার (social mobility) উপাদান হিসেবে সুফী দর্শনের অবদান স্মরণীয়। সুফী দর্শনের সাম্য ভাবনা সামাজিক নিম্নক্রমের মানুষকে উচ্চক্রমে উত্তরণের পথ দেখিয়েছিল। অধ্যাপক *সিদ্দিকি* (I. H. Siddiqui) দেখিয়েছেন কিভাবে তৎকালীন সমাজে অস্পৃশ্য হিসেবে অপাংক্তেয় সাধারণ মানুষ সুফী সাধকদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে পরবর্তীকালে অসংখ্য মানুষের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন। হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের রক্ষণশীল বর্ণ বা জাতিভিত্তিক ভেদাভেদের বিরুদ্ধে এক বিপ্লব ছিল সুফী দর্শন। এই সামাজিক সচলতা পরবর্তীকালে মানব সম্পদের (Human resource) যথার্থ প্রয়োগের পথ খুলে দিয়েছিল।

মধ্যযুগের শিক্ষা ও সাহিত্যের উপর সুফী-দর্শনের ও সুফী-আন্দোলনের প্রভাব ছিল লক্ষণীয়। 'খান্‌কা' বা 'জমাইত খানা'-গুলি বিদ্যাচর্চা ও জ্ঞানান্বেষণের অন্যতম কেন্দ্র ছিল। প্রত্যহ সমবেত মানুষের কাছে সুফী-সন্তরা জীবনমুখী ধর্ম ও সৃষ্টির অলৌকিক রহস্য ব্যাখ্যা করে তাদের মানসিক বিকাশে সহায়তা করতেন। অনেক খানকায় নিয়মিত বিদ্যালয় পরিচালনা করা হত। সুফীরা হিন্দী ও উর্দুভাষার সমন্বয়ে হিন্দভী ভাষায় কবিতা রচনা করার ফলে তা সাধারণ মানুষের বোধগম্য হয়। ফলে সেই সময় হিন্দী ভাষার শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল। সঙ্গীতকেও ঈশ্বর আরাধনার অন্যতম মাধ্যম বলে এঁরা মনে করতেন। সুফীদের গীত বাউলধর্মী 'সম' গান তখন খুবই জনপ্রিয় ছিল। সঙ্গীতও পুষ্ট হয়েছিল। তাই ঐতিহাসিকের ভাষায় বলা যায় যে, সুফীবাদ উভয় সম্প্রদায়ের সামাজিক-সাংস্কৃতিক নেতৃত্বে উদার হৃদয়বেত্তা ও সহনশীলতার বিকাশ ঘটায়, ধর্মীয় সহিষ্ণুতার বিকাশ ঘটায় এবং উভয় সম্প্রদায়ের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সমন্বয়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। (*"Sufism developed broad-mindedness and catholicity of the Socio-cultural leadership of both the communities and fortered the feelings of religious tolerence and hastened the process of synthesis between their Socio-cultural traits."*)

○ নাথপন্থা ও নাথ সাহিত্য ঃ

আদি-মধ্যযুগের ভারতে নাথ ধর্ম বিশেষ জনপ্রিয়তা পায়। 'শিব'কে কেন্দ্র করে যোগ সাধনার মাধ্যমে একদল মানুষ মোক্ষলাভে প্রয়াসী হন। এঁরাই নাথ যোগী সম্প্রদায় নামে পরিচিত হন। এঁদের আদিগুরু শিব। যিনি 'আদিনাথ' নামেও জনপ্রিয়। আদিনাথের অনুগামী হিসেবে এঁরা নাথ সম্প্রদায় নামে অভিহিত হন। আদি-মধ্যযুগের সংস্কৃত ও আঞ্চলিক সাহিত্যে নাথ-সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ', 'আগম সংহিতা', 'পরাশর সংহিতা', 'তন্ত্রালোক' প্রভৃতি গ্রন্থে শৈবনাথ ধর্ম সম্পর্কে নানা আলোচনা আছে। ভারতের নানাস্থানে এঁদের মঠ ও সাধনকেন্দ্র আছে। তবে শিব আদিনাথ হলেও গুরু গোরক্ষনাথই নাথ সম্প্রদায়ের প্রধান গুরু। নাথ ধর্মের কেন্দ্রে আছেন গোরক্ষনাথ। কেউ কেউ গোরক্ষনাথকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলে মনে করেন।

কথিত আছে, অষ্টম থেকে চতুর্দশ শতকের মধ্যবর্তীকালে যে-কোন সময় তিনি মানবদেহে মর্তধামে বিরাজ করেছিলেন। ভারতের নানাস্থানে তাঁর আবির্ভাব-সংক্রান্ত কাহিনী প্রচলিত আছে। এ বিষয়ে প্রচলিত গরিষ্ঠ মতটি হলো যে, গোরক্ষনাথ পাঞ্জাবের কোন অঞ্চলে জন্ম নেন এবং পরে বিহারের গোরক্ষপুরে বসবাস করে তাঁর দর্শন ও প্রচার করেন। *ড. অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়ের* মতে, গোরক্ষনাথ দশম-দ্বাদশ শতকের পরবর্তী ছিলেন না এবং সম্ভবত তিনি একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন। পরবর্তীকালে শিব-মৎসেন্দ্রা নাথের পৌরাণিক আখ্যানের সাথে তাঁর কাহিনী যুক্ত করে তাঁকে পৌরাণিক চরিত্রে পরিণত করা হয়েছে। তাই মধ্যযুগে নাথপন্থীরা 'গোরক্ষপন্থী' নামেও পরিচিতি লাভ করেন। দশম শতক থেকে সারা উত্তর ভারতে গোরক্ষপন্থী নাথ সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব দেখা যায়। পশ্চিম ভারতেও এদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। বাংলাদেশেও অতি প্রাচীনকাল থেকে এই সম্প্রদায় সাধন-ভজন করে আসছেন। বর্তমানেও নানা শাখা-প্রশাখায় নাথ পন্থীরা বাংলায় ছড়িয়ে আছেন। যোগ সাধনার মাধ্যমে এঁরা মুক্তির পথ অনুসরণ করতেন। এই অর্থে তাঁর 'যোগী'। কিন্তু শব্দটি ভ্রষ্ট হয়ে 'যুগী' এই অপশব্দে পরিণত হয়েছে। উত্তর ভারতের বহু স্থানে নাথ পন্থীরা 'কান্-ফট যোগী হিসেবে পরিচিত। এঁরা কান ফুটো করে একজাতীয় অলংকার ধারণ করেন। একে বলা হয় 'মুদ্রা' বা 'দর্শন বা 'কুন্তল'। এই যোগীরা ত্রিশূল ও রুদ্রাক্ষ ধারণ করেন এবং শিবরাত্রি উৎসব পালন করেন। এঁদের দেবতাদের মধ্যে আছেন নিরঞ্জন, শূন্য, ও আদিনাথ ও অনাদিনাথ। এর ভিত্তিতে *ড. নরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য* বলেছেন যে, নাথ ধর্মের উপর শৈব, শাক্ত, বৌদ্ধ ও জৈন সব ধর্মেরই প্রভাব আছে। নাথ ধর্মে নয়জন গুরুর কথা জানা যায়। বৌদ্ধ 'সহজযান' বা 'কালচক্রযান'-এর সিদ্ধাচার্যদের সাথে এই নবম নাথের পূজাও প্রচলিত ছিল। চর্যাপদে নাথধর্ম ও নাথগুরুদের উল্লেখ পাওয়া যায়। নাথ সাহিত্যে উল্লেখিত নয়জন নাথগুরু হলেন—পূর্বে গোরক্ষনাথ, উত্তরাপথে জালন্ধর. (জ্বালামুখী তীর্থ), দক্ষিণে নাগার্জুন, পশ্চিমে দত্তাত্রেয়, দক্ষিণ-পশ্চিমে দেবদত্ত, উত্তর-পশ্চিমে জড়ভরত, কুরুক্ষেত্র ও মধ্যদেশে আদিনাথ এবং দক্ষিণ-পূর্বের সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় মৎসেন্দ্রনাথ (বাংলায় মীননাথ)। মারাঠী বৃত্তান্ত অনুসারে আদিনাথ শিবের কাছে 'মহাজ্ঞান' লাভ করেন তাঁর ঘরণী পার্বতী, মৎসেন্দ্রনাথ ও জালন্ধর। মৎসেন্দ্রনাথের কাছে দীক্ষা নেন গোরক্ষনাথ ও চোরঙ্গীনাথ। জালন্ধরের দুই শিষ্য কানিফা বা কানুপা ও ময়নামতী। গোরক্ষনাথের দুই শিষ্য গৈনীনাথ ও চর্পটিনাথ। এঁরাও অনেককে দীক্ষা দিয়ে শিষ্যত্বে বরণ করেছেন।

ড. নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য-র মতে[১] নাথপন্থার উদ্ভব নিম্নশ্রেণীর মানুষের মধ্যেই ঘটেছিল। এই ধর্মমতের উপর জৈন ও আজীবিক ধর্মের গভীর প্রভাব ছিল। দক্ষিণ ভারতের মাহেশ্বর সিদ্ধ নামক যে সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব আছে তারাই মূল নাথপন্থী। এঁদের প্রধান সিদ্ধাই হলেন শ্রীমূলনাথ। তত্ত্বের দিক থেকে এঁরা শৈব ও শাক্ত আগমসমূহ থেকে প্রেরণা পেয়েছিলেন। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এঁদের লক্ষ্য ছিল রহস্যময় (নিগূঢ়) পদ্ধতিতে সিদ্ধিলাভ করা।

সহজিয়া সাধকদের মত নাথপন্থীরা প্রচলিত বেদ বিধিসম্মত পূজা ও আচার-আচরণের বিরোধী ছিলেন। প্রাচীন ভারতে কোন কোন দর্শনতত্ত্বে জড়দেহকে মুক্তির পথে বাধা না ভেবে

মুক্তির সোপান হিসেবেই দেখা হত। তাঁরা নানা ধরনের যোগ, তন্ত্রাচার, রাসায়নিক ও আয়ুর্বেদীয় ভেষজ বিদ্যার সাহায্যে জড়দেহকে পরিশুদ্ধ করে তাকে মোক্ষ ও মুক্তি লাভের উপযোগী করে তুলতেন। পতঞ্জলির যোগদর্শন এবং তন্ত্রাচার ও হঠযোগদ্বারা তাঁরা জড়দেহকে দিব্যদেহে পরিণত করতে চেষ্টা করতেন। এইভাবে যোগদর্শন ও কায়াসাধনার মাধ্যমে এই যোগীরা ভঙ্গুর জীবনকে অমর-অজর ও প্রাজ্ঞ করে তুলতে প্রয়াসী হতেন। যোগসাধনার দ্বারা প্রাণায়াম ক্রিয়ার সাহায্যে এঁরা শ্বাস-প্রশ্বাসকে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন। পূরক-কুম্ভক-রেচক ইত্যাদি বায়ু বশীভূত করে মোক্ষলাভের প্রথম সোপান অতিক্রম করেন। পরবর্তী পর্যায়ে তন্ত্রসার অনুসারে কুল-কুণ্ডলিনী তত্ত্ব অবলম্বনে নিজ দেহের মধ্যে শিব-শক্তির মিলন সম্ভূত দিব্যানুভূতি লাভ করতে সক্ষম হন। এই পর্যায়ে উপনীত হলে জড়দেহ দিব্যদেহে রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ নাথপন্থীদের সাধনার ক্ষ্য দ্বিবিধ। একটি হলো চরম লক্ষ্য শিবত্ব অর্জন বা পরামুক্তি ; অন্যটি হলো তাৎক্ষণিক লক্ষ্য অর্থাৎ জড়দেহের মধ্যে থেকেই মুক্তি অর্জন করা। এঁদের মতে, জীবনমুক্তির মধ্য দিয়েই পরামুক্তি সম্ভব। জীবনমুক্ত সাধক সর্ববিধ কামনা-বাসনাকে জয় করেন। মৃত্যু তাঁর কাছে পরাভূত হয়। এই অবস্থার মধ্য দিয়ে সাধক নিজে শিব বা আদিনাথে বিলীন হয়ে যান। নাথপন্থীদের সাধনপথের বাধা হিসেবে রমণীরা বিবেচিত হতেন। কারণ দেহস্থিত রস শোষণ করেই নাথেরা জীবনমুক্ত হন। কিন্তু নারী সেই দেহরস অপচয়ের কারণ হিসেবে বিবেচিত হতেন। দেহরস আত্মীকরণের যৌগিক পদ্ধতি সম্পর্কে গুহ্যরীতি ও গুরুবাদ অনুসরণ করা হত।

বাংলা সাহিত্যে আদিনাথ শিব, পার্বতী, মৎস্যেন্দ্রনাথ বা মীননাথ, গোরক্ষনাথ, জালন্ধরিপাদ বা হাড়িপা, রানী ময়নামতী, কানুপা (জালন্ধরের শিব) এবং ময়নামতীর একমাত্র পুত্র গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দ চন্দ্রকে কেন্দ্র করে কিছু কিছু ছড়া, কবিতা ও পাঁচালী লেখা হয়েছে। এর মধ্যে মীননাথ ও গোরক্ষনাথের কাহিনীকে ভিত্তি করে একাধিক পুঁথি লেখা হয়েছে। অন্যদিকে ময়নামতী গোপীচন্দ্রের সম্পর্কে অধিকাংশই মৌখিক ছড়া পাওয়া গেছে। নাথ সাহিত্যের আখ্যান বাংলার বাইরেও প্রচলিত ছিল। তবে সেক্ষেত্রেও এই দুটি আখ্যান প্রাধান্য পেয়েছে। ***ড. সুকুমার সেনের*** মতে, নাথ সাহিত্যের চরিত্রগুলির উপরে বাংলার বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। তাঁর মতে, উত্তর ও উত্তর-পূর্ব বাংলা নাথ ধর্মের উৎপত্তিস্থল। বাংলার অতি জনপ্রিয় বাউল ধর্ম আদতে নাথ ধর্মেরই পরিবর্তিত রূপ বলে ড. সেন মনে করেন।

বাংলাদেশে গোরক্ষনাথের মহিমাভিত্তিক দু'ধরনের বই লেখা হয়। একটি 'গোরক্ষবিজয়' বা 'গোর্খবিজয়' এবং অন্যটি 'মীনচেতন'। দুটি গ্রন্থেই গোরক্ষনাথের ত্যাগ, তিতিক্ষা, সংযম ও কর্তব্যবোধের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। গোরক্ষবিজয় সম্পর্কিত তিনটি পুঁথি ছাপা হয়েছে—(১) কবি শ্যামাদাস সেন বিরচিত এবং ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত 'মীনচেতন' (১৯১৫ খ্রীঃ), (২) শেখ ফয়জুল্লা বিরচিত ও মুন্সি আব্দুল করিম সম্পাদিত 'গোরক্ষ বিজয়' (১৯১৭ খ্রীঃ) এবং (৩) ভীমসেন বিরচিত ড. পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত 'গোর্খবিজয়' (১৯৪১ খ্রীঃ)। এখন এই তিনটি পুঁথি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কিনা এবং এদের রচনাকাররা পৃথক পৃথক ব্যক্তি কিনা, সে বিষয়ে কিছুটা জটিলতা আছে। ***ড. আহমেদ শরীফ*** মনে করেন, 'গোরক্ষ বিজয়ের' রচয়িতা শেখ ফয়জুল্লা। ভীম সেন লিপিকর অথবা গায়েন অথবা দুই-ই হতে পারেন। ***ড. ক[illegible]*** মনে করেন, মূল কাব্যটির নাম সম্ভবত, 'মীনচেতন-গোরক্ষবিজয়' বা 'গোরক্ষবিজয়-মীনচেতন'

ছিল। পরে নানা লিপিকারের হাতে পড়ে পৃথক পৃথক নামে অভিহিত হয়েছে। এই গ্রন্থের কাহিনী আকারে সংক্ষিপ্ত। গুরু মীননাথ কদলী রাজ্যে গিয়ে মোহগ্রস্ত হন। তাঁর সাধন-জ্ঞান-সিদ্ধি লোপ পায়। মৃত্যু আসন্ন হয়। গোরক্ষ নটীর ছদ্মবেশে কদলীরাজ্যে প্রবেশ করে নৃত্যগীতের ছলে গুরুকে কায়সাধনার জ্ঞান দিয়ে প্রলোভন থেকে উদ্ধার করেন। এর কাব্যগুণ খুবই কিঞ্চিৎ, তবে নৈতিক গুণ কিছুটা আছে। *ড. ক্ষেত্র গুপ্তের* মতে, মানবজীবন সম্পর্কে বিরূপতা এঁদের দৃষ্টিকে এতটাই আচ্ছন্ন করেছিল যে, মানবজীবন ও হৃদয়ের স্বাভাবিক বিকাশগুলি গুরুত্ব পায়নি। *ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের* মতে, স্বল্প প্রতিভার অর্ধশিক্ষিত মানুষেরা এগুলি রচনা করতেন। ফলে লোকসাহিত্য হিসেবে আদৃত হলেও ; এদের রচনায় সাহিত্য গুণ খোঁজা বৃথা। তবে আকারবিশিষ্ট ঈশ্বর চেতনা নাথকায় মুসলমান সাধকেরাও নাথপন্থার অনুসারী হতে পেরেছিলেন। ময়নামতী-গোপীচন্দ্র-বিষয়ক আখ্যান-কাব্যে দুর্লভ মল্লিক, ভবানী দাস ও সুকুর মহম্মদ—এই তিনজন কবির নাম পাওয়া যায়। দুর্লভ মল্লিকের রচনা সংক্ষিপ্ত এবং কাব্যগুণ বর্জিত। ধর্মতত্ত্বের প্রতি আনুগত্য বেশি। অন্য দুজনের রচনা তুলনামূলক ভাবে বিস্তারিত ও লোককাহিনীতে সমৃদ্ধ।

আখ্যানকাব্য ও পাঁচালী ছাড়াও বিশুদ্ধতত্ত্বদর্শন-বিষয়ক কিছু ছড়া পাওয়া গেছে, যা নাথ ধর্মের সাথে সম্পর্কিত। এগুলি হলো—'যোগীর গান', 'যুগীকাচ', 'গোর্খসংহিতা', 'যোগ-চিন্তামনি' প্রভৃতি। এগুলিতে কোন কাহিনী নেই, কেবল কায়সাধন প্রসঙ্গে নানাপদ সংকলিত হয়েছে। এখানে দেহকে অমর করার কৌশল, হঠযোগ, তন্ত্র ইত্যাদি নাথ-যোগতত্ত্ব রূপকের ছলে বিবৃত হয়েছে। যুগীরা এই গান গেয়ে ভিক্ষা করেন। শৈবনাথ ধর্ম এখনও ভারতবর্ষে জীবিত আছে।

○ বারকরী আন্দোলন ও বিঠোবা-উপাসনা ঃ

আদি-মধ্য ও মধ্যযুগে উত্তর ও পূর্ব ভারতে নিম্নবর্ণের মানুষদের প্রেরণায় যেভাবে সংস্কারবাদী নবধর্ম আন্দোলন শুরু হয়েছিল, দক্ষিণ ভারতে সেরকম কোন ব্যাপক সংস্কারমুখী আন্দোলন সংগঠিত হয়নি।[১] দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত ধর্মকে ভিত্তি করে যে সকল ধর্ম-সম্প্রদায় গড়ে ওঠে তাদের কাজের মধ্যেও সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার আকুলতা লক্ষ্য করা যায়। তবে এই সকল আন্দোলনের নেতৃত্ব উচ্চবর্ণের মানুষদের নিয়ন্ত্রণে থাকার ফলে এরা কার্যত সমাজ ব্যবস্থার কোন মৌলিক পরিবর্তনের ডাক দিতে পারেনি। তবে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মত মহারাষ্ট্রেও মধ্যযুগে ভক্তিবাদী আন্দোলনের বিকাশ ঘটে।

মধ্যযুগে মহারাষ্ট্রে চারটি ভক্তিবাদী সম্প্রদায়ের উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠা লক্ষ্য করা যায়। এগুলি হলো—মহানুভব, বারকরী (Warkari), ধারকরী ও দত্তাত্রেয়। এদের উপাস্য দেবতা ছিলেন যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণ, বিঠ্ঠল শ্রীরাম এবং দত্তাত্রেয়। বারকরী সম্প্রদায়ের প্রবক্তা ছিলেন নিবৃত্তিনাথ এবং জ্ঞানদেব (জ্ঞানেশ্বর)। পরবর্তীকালে নামদেব, তুকারাম ও একনাথের উদ্যোগে বারকরী মতবাদ জনপ্রিয়তা লাভ করে।

বারকরী আন্দোলন কর্ণাটকের দাসকূট সম্প্রদায় দ্বারা প্রভাবিত ছিল। দাসকূটদের মতই বারকরী আন্দোলনের মূলকথা ভক্তি এবং উপাস্য দেবতা। পন্ধারপুরের বিগ্রহ বিঠ্ঠল বা বিঠ্ঠু।

পন্ধারপুরের ভীমা নদীর তীরে অবস্থিত বিঠোবার মন্দিরকে কেন্দ্র করে বারকরী আন্দোলন বিকাশ লাভ করে। ভাণ্ডারকরের মতে, সংস্কৃত ভাষায় বিষ্ণু কানাড়ি ভাষার অপভ্রংশ হলো বিঠ্‌ঠু। অর্থাৎ বিঠ্‌ঠু হলেন বিষ্ণু। ড. ভাণ্ডারকর তার *'Vaisnavism, Saivism and Minor Religious System'*. শীর্ষক গ্রন্থে লিখেছেন যে, ত্রয়োদশ শতকে পন্ধারপুরে বিঠোবার মন্দিরকে কেন্দ্র করে মহারাষ্ট্রে বৈষ্ণবধর্ম জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। সমকালীন যাদববংশীয় দেবগিরির শাসক কৃষ্ণের একটি তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে দেবগিরির সেনাপতি ১২৪৯ খ্রীষ্টাব্দে একটি সামরিক অভিযানের সময় ভীমরথী নদীর তীরবর্তী 'পৌণ্ডরিকাক্ষেত্র' নামক একটি তীর্থস্থানের নিকটস্থ একটি গ্রাম বিষ্ণু-উপাসকদের দান করেছিলেন। ১২৭০ খ্রীষ্টাব্দের (১১৯২ শকাব্দ) আর একটি শিলালেখ থেকে জানা যায় যে, পন্ধারপুরের অপর নাম ছিল পাণ্ডুরঙ্গ। শিব বা রুদ্রের এক নাম পাণ্ডুরঙ্গ। লক্ষণীয় যে, পন্ধারপুরে একটি শিবমন্দিরও আছে। ঐতিহাসিকদের অনুমান 'পৌণ্ডরিকাক্ষেত্র' এবং পন্ধারপুর একই স্থানের নাম। সম্ভবত বারকরী আন্দোলন জনপ্রিয় হওয়ার আগে শিব পাণ্ডুরঙ্গই ছিলেন মহারাষ্ট্রের জনপ্রিয় দেবতা। ক্রমে বিঠোবার গুরুত্ব পায় এবং শিবের গুরুত্ব হ্রাস পায়। তবে বিঠোবার মন্দির দর্শনে যাওয়ার পথে পুণ্যার্থীরা আবশ্যিকভাবে শিবের মন্দিরে পূজাপাঠে অংশ নেন। অন্য একটি মতে, মহারাষ্ট্রে বিঠ্‌ঠল উপাসনার প্রবর্তক ছিলেন জনৈক পুণ্ডরীক। পন্ধারপুরকে কেন্দ্র করে তিনি এই মতবাদ প্রচার করেন। তাঁর নামানুসারেই পন্ধারপুর 'পৌণ্ডরীক' নামেও পরিচিত লাভ করে।

মহারাষ্ট্রে ভক্তিবাদী আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ছিলেন জ্ঞানদেব (জ্ঞানেশ্বর)। তাঁর পিতামহ গোবিন্দ রাও এবং প্রপিতামহ ত্রিম্বক পন্থ ছিলেন নাথপন্থী সাধক। জ্ঞানদেবের পিতা বিঠ্‌ঠল সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। পরে তিনি গৃহীজীবনে প্রত্যাবর্তন করলে তাঁকে বহু সামাজিক নির্যাতন ভোগ করতে হয়। তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা নিবৃত্তিনাথ জ্ঞানদেবকে ভক্তিবাদের প্রতি আকৃষ্ট করেন। আনুমানিক ১২৯০ খ্রীষ্টাব্দে জ্ঞানদেব গীতার টিকাভাষ্য 'জ্ঞানেশ্বরী' রচনা করেন। এছাড়াও তিনি 'অমৃতানুভব' ও 'চাঙ্গদেব প্রশস্তি' নামক আরও দুটি গ্রন্থ ও 'অভঙ্গ' পর্যায়ভুক্ত কিছু ভক্তিমার্গী কবিতা রচনা করেন। জ্ঞানদেবের পর নামদেব (১৪ শতক), একনাথ (১৫ শতক), তুকারাম (১৬ শতক) প্রমুখ সাধক মহারাষ্ট্রে ভক্তিবাদী বারকরী আন্দোলনের প্রসার ঘটান।

'বারকরী' শব্দের অর্থ 'তীর্থযাত্রার পথ' (Pilgrim's Path)। বারকরী সম্প্রদায়ের ভক্তেরা প্রতিবছর পন্ধারপুরে গিয়ে বিঠোবাকে দর্শন ও পূজাপাঠকে অতি পুণ্যকর্ম বলে বিবেচনা করতেন। তীর্থযাত্রার গুরুত্বকে তুলে ধরার জন্য বিঠোবার অনুগামীরা বারকরী নামে পরিচিত হন। বারকরী আন্দোলনের মূল ভিত্তি ছিল ভক্তি। বারকরী সম্প্রদায়ের লোকেরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস (Existance of the other World) করেন এবং তাঁদের দৃঢ় ধারণা যে প্রত্যেক মানুষের পক্ষেই ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করা সম্ভব। মানুষ যেমন ইন্দ্রিয়ানুভূতি দ্বারা সুখ বা দুঃখ উপলব্ধি করতে পারে, তেমনি ঐকান্তিক ভক্তি দ্বারা আধ্যাত্ম চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিরন্তর প্রশান্তি অর্জন করতে পারে। মানুষ যখন সাধনা দ্বারা ঈশ্বর লাভ করে তখন তার মধ্যে বিষয়ী ও বিষয় (Subject and object) একাকার হয়ে যায়। বাহ্যজগতে বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে যে স্বাতন্ত্র্য বিরাজমান, পরমজ্ঞানীর অন্তর্লোকে একীভূত হয়ে যায়। সাধনার মাধ্যমে ঈশ্বর লাভের পথ তৈরি করে নিতে হয়। সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য আবশ্যিক হলো পবিত্রতা অর্জন করা। নিঃস্বার্থ হয়ে

আন্তরিকভাবে (Whole hearted and disinterested) ঈশ্বরকে ভালবাসার মাধ্যমে এই পবিত্রতা অর্জন করতে হয়। সৎগুরু শিষ্যকে নিঃস্বার্থতা ও ভালবাসার তত্ত্ব অনুধাবন করতে সাহায্য করেন। ***জ্ঞানদেব*** লিখেছেন যে, স্রষ্টা ও সৃষ্টি এক নয়। স্রষ্টা অদৃশ্য, নিরাকার, অনির্বচনীয়। কিন্তু সৃষ্টি দৃশ্যমান। স্রষ্টার ইহজাগতিক প্রকাশ। তাই স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে কোন দুর্ভেদ্য প্রাচীর নেই। মানুষ সাধনার দ্বারা ঈশ্বর লাভ করতে পারে, কিন্তু সে কখনও ঈশ্বর হয়ে যেতে পারে না। জ্ঞানেশ্বরী গ্রন্থের মতে, ঈশ্বর সর্বত্রব্যাপী, অপরিমেয়, অমেয় (inmeasurable), পবিত্র ও অবর্ণনীয়। তবে সাধক রামদাস ঈশ্বরের চারটি রূপের কথা বলেছেন—মূর্তি, অবতার, আত্মা ও ঈশ্বর। জ্ঞানদেবের মতে, ঈশ্বর লাভের প্রধান মার্গ হলো ভক্তি। ভক্তির সাথে জ্ঞান, কর্ম, সাধনা ও আনুগত্যের সমন্বয় কালে সাধক ঈশ্বরমুখী হতে পারে। সাধনার পথ সহজ নয়। সাধককে বিষয় বিমুক্ত হয়ে উদার মনে অবিচলিতভাবে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করতে হবে। এজন্য কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন বা সন্ন্যাস গ্রহণের প্রয়োজন নেই। সাধনার জন্য নির্জন পাহাড় বা বনবাসে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। ইন্দ্রিয়পরায়ণতা মুক্ত হয়ে যে-কোন নির্জন স্থানে সাধনা করা যেতে পারে। পরম ভক্তি সহকারে সাধক তার মান, যশ, গর্ব, লোভ, ভয়, ক্রোধ ইত্যাদি সবকিছুই ঈশ্বরের পায়ে সমর্পণ করলে পরম শান্তি লাভ করতে পারেন।

বারকরী ধর্ম দর্শনে জাতিভেদ বা বর্ণভেদের কোন স্থান নেই। উচ্চ-নীচ কোন ভেদাভেদ এখানে স্বীকৃত নয়। এই ধর্মের প্রচারক ও অনুগামীদের অনেকেই ছিলেন সমাজের অধঃপতিত ও অবহেলিত অংশের মানুষ। নামদেব নিজেই ছিলেন একজন দরদী। বারকরী সাধকরা সামাজিক বৈষম্য থেকে মানুষকে মুক্ত থাকার শিক্ষা দেন। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমন্বয় সাধনের পথ এঁরা প্রশস্ত করেন। জ্ঞানদেব-এর মতে, ঈশ্বর জ্ঞানই হলো প্রকৃত জ্ঞান। নৈতিকতা, শুচিতা, পবিত্রতা, অহিংসা, নম্রতা ও বহুর মতে একের প্রকাশ দর্শনই হলো প্রকৃত জ্ঞান। ভক্তি ও সাধনার পথে এই জ্ঞান অর্জন দ্বারা ঈশ্বর লাভের পথ খুঁজে নিতে হয়। বারকরী সম্প্রদায়ের সাধকেরা ন'প্রকার ভক্তির কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলি হলো—শ্রবণ, নামকীর্তন, স্মরণ, পদসেবন, অর্চনা, বন্দনা, দাস্যভক্তি, সখ্য ও আত্মনিবেদন। তুকারাম কীর্তনের মাধ্যমে ঈশ্বর আরাধনার উপর জোর দেন। একনাথ ও রামদাস অর্চনা ও বন্দনার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক চেতনা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। একনাথ সাধকের জীবনের নানা স্তরে এই পাঁচটি রীতি অনুশীলনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

জ্ঞানদেব (জ্ঞানেশ্বর) বারকরী আন্দোলনের মাধ্যমে মহারাষ্ট্রে যে ভক্তিবাদের সূচনা হয়, তাকে জনপ্রিয় করে তোলেন নামদেব (১২৭০-১৩৫১ খ্রীঃ)। নামদেবের জন্ম একটি দর্জি পরিবারে। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন ডাকাত। পরে অনুতাপে দগ্ধ হয়ে তাঁর মানসিক রূপান্তর ঘটে। তিনি জ্ঞানদেবের সাথে বহুস্থান পর্যটন করেন। জ্ঞানদেবের মত তিনিও বিঠোবার উপাসনার কথা প্রচার করেন। নিম্নবর্ণের বহু মানুষ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সামাজিক মর্যাদা ফিরে পান। নামদেব ঐকান্তিক ভক্তি ও প্রেমের বাণী প্রচার করে মহারাষ্ট্রে জাতি ও বর্ণের বৈষম্য ভেদ করে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা জাগ্রত করেন।

নামদেবের মৃত্যুর প্রায় দু'শতক পরে একনাথ (১৫৩৩-১৫৯৮ খ্রীঃ) মহারাষ্ট্রে ভক্তিবাদ প্রচার করেন। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত সাধক ভানুদাসের প্রপৌত্র। একনাথ জ্ঞানদেব লিখিত 'জ্ঞানেশ্বরীর

একটি নবতম সংস্করণ প্রকাশ করেন। তিনি নিজেও বহু ভক্তিগীতি রচনা করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নানা সময় জাতিভেদ প্রথাকে অগ্রাহ্য করে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রকাশ করেন। একবার তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের প্রদত্ত অন্ন অন্ত্যজ শ্রেণীর পারিয়াদের ভক্ষণ করান। উপাস্য দেবতাকে উৎসর্গ করার জন্য নিয়ে আসা গোদাবরীর পবিত্র জল তৃষ্ণার্ত গর্দভকে দান করে নীরবে বিপ্লব ঘটান।

তুকারাম (১৫৯৮-১৬৫০ খ্রীঃ) ছিলেন এক সাধারণ চাষী পরিবারের সন্তান। জ্ঞানদেব, একনাথ প্রমুখের রচনাবলী পাঠ করে তিনি ভক্তিবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। বহু প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে তাঁর সাধকজীবন অতিবাহিত হয়। তিনি বিঠোবার উদ্দেশ্যে অনেকগুলি অভঙ্গ বা ভক্তিসংগীত রচনা করেন। মারাঠা নেতা শিবাজী তাঁর অনুগামী ছিলেন।

মহারাষ্ট্রে ভক্তিবাদের বিশিষ্ট প্রবক্তা ছিলেন রাম দাস (১৬০৮-১৬৮১ খ্রীঃ)। তবে তিনি বিঠোবার উপাসক ছিলেন না। তাঁর উপাস্য দেবতা ছিলেন রাম। রামদাস প্রবর্তিত সম্প্রদায় 'ধারকরী' নামে পরিচিত। ড. নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মতে, দর্শন তত্ত্বের বিচারে ধারকরী মতবাদ বারকরী মতবাদের তুলনায় অধিক যুক্তিবাদী ও বাস্তবমুখী ছিল। তিনি 'দাসবোধ' নামক বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করে সাধারণ মানুষের মধ্যে ভক্তিবাদ প্রচার করেন। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে কিছু কিছু রাজনৈতিক চিন্তার আভাস পাওয়া যায়। ঈশ্বর উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি জাগতিক জ্ঞান চর্চার উপরেও জোর দেন। তাঁর রচনা ও শিক্ষা মারাঠা জাতিকে শিবাজীর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হতে এবং স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ঝাঁপ দিতে অনুপ্রাণিত করে।

দশম অধ্যায়

সুলতানি আমলে স্থাপত্য-শিল্প
[Architecture during the Sultanate Period]

তুর্কো-আফগান শাসকদের সংস্কৃতি-চেতনা সম্পর্কে প্রাথমিক-পর্বের ভারতীয় লেখকদের সাথে আধুনিক গবেষকদের কিছুটা মতভেদ আছে। প্রথমে তুর্কী অভিযানকারীদের অসভ্য বর্বর বলে আখ্যায়িত করার প্রবণতা ছিল। এটা তেমন অস্বাভাবিকও ছিল না। কারণ যে নৃশংসতা, হত্যাকাণ্ড, লুণ্ঠন ও অত্যাচার দ্বারা তুর্কী-যোদ্ধারা ভারতভূমিতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিল, তাতে তাদের মধ্যে শিল্পীর উদারতা, সূক্ষ্মতা বা কোমলতার অস্তিত্ব কল্পনা করাও কষ্টকর ছিল। আধুনিক গবেষকরা এই মূল্যায়নকে যথার্থ বলে মনে করেন না। ***স্যার জন মার্শাল*** মনে করেন, মধ্যযুগে এশিয়ার অধিকাংশ যোদ্ধাজাতির মধ্যেই উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তাই বলে তুর্কো-আফগান জাতি ইসলামীয় শিল্প-সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল, একথা কেবল অসত্য নয়, অযৌক্তিকও। তবে ***ড. কুরেশী*** দিল্লীর সুলতানি রাষ্ট্রকে '*cultural-state*' বলে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, তাও অতিরঞ্জনদোষে দুষ্ট। ***ড. এ. এল. শ্রীবাস্তব*** মনে করেন যে, সুলতানি রাষ্ট্র ছিল 'ধর্মাশ্রয়ী' ; নৃত্য, গীত, ভাস্কর্য বা জীবিত প্রাণীর চিত্রাঙ্কন ইসলামীয় তত্ত্বে অস্বীকৃত ছিল। স্বভাবতই এই রাষ্ট্রকে এককথায় cultural-state বলা যায না। তবে তিনিও স্বীকার করেছেন যে, ইসলামীয় শিক্ষা ও শিল্পের প্রতি তুর্কো-আফগান শাসকদের যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। তিনি লিখেছেন ঃ *"Though primarily a military people our Turko-Afgan rulers patronized Islamic learning and arts."*

তুর্কীদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে ভারতের শিল্পভাবনার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। তুর্কীজাতি মধ্য এশিয়া থেকে পশ্চিম এশিয়ায় এসে ইসলামধর্ম গ্রহণ করে এবং সেখানকার সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হয়। নবম-দশম শতকে আরবীয় ও পারসিক সভ্যতা চূড়ান্ত উৎকর্ষ লাভ করেছিল। এই সকল অঞ্চলে ইসলামের সম্প্রসারণের ফলে স্থানীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির সাথে ইসলামের পরিচয় ও আত্তীকরণ ঘটে। তাই তুর্কীরা যখন ভারতে আসে, তখন শিল্প-স্থাপত্য সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল। তবে তুর্কো-আফগান যুগে ভারতে যে স্থাপত্যকলার চর্চা শুরু হয়, তা সম্পূর্ণ বহিরাগত বা ইসলামীয় ছিল না। ভারতে বসবাস শুরু করার পর তুর্কীরা ভারতীয়দের সুপ্রাচীন ও সৌন্দর্যমণ্ডিত শিল্প-স্থাপত্যের সাথে পরিচিত হয়। তুর্কীদের উপর পারসিক শিল্পের প্রভাব ছিল সর্বাধিক। আবার সুপ্রাচীন কাল থেকেই পারসিক ও ভারতীয় শিল্প-সংস্কৃতির মধ্যে মিল ছিল। কারণ উভয় অঞ্চলেই ছিল আর্য-

সংস্কৃতির উপস্থিতি। তাই তুর্কী-শাসনকালে ভারতীয় শিল্প-স্থাপত্যে হিন্দু বা ভারতীয় ধারার সাথে ইসলামীয় ধারার সংমিশ্রণ ঘটে। উভয় ধারার সমন্বয়ে শেষ পর্যন্ত এদেশে এক সমৃদ্ধ শিল্পরীতির বিকাশ হয়। ***অধ্যাপক সতীশচন্দ্রের*** মতে, *"এই সংমিশ্রণের কাজ চলেছিল দীর্ঘদিন ধরে, বহু উত্থান ও পতনের মধ্য দিয়ে। আত্তীকরণ ও সংঘাত দুটোই পাশাপাশি চলেছিল, তবে স্থান ও কাল বিশেষে কোনটা বেশি বা কোনটা কম।"* ***শেরওয়ানী*** (H. K. Sherwani) লিখেছেন : *"They (Hindu and the Perso-Turks) could not but be impregnated by each other in their culture and their ideas which are so visibly enshrined in Medieval architecture, art and literature."* যাই হোক্, তুর্কী যোদ্ধারা 'পৌত্তলিক' ভারতবর্ষের সংস্কৃতির প্রতি হীনমন্যতার ভাব দ্রুত কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হন এবং ঐতিহ্যশালী হিন্দুশিল্পে অপার্থিব সৌন্দর্য-সুষমা, কর্তৃত্বব্যঞ্জক ভঙ্গিমা ও উদারতার সাথে ইসলামীয় স্থাপত্যের মানসিকতা, ধর্ম ও ভৌগোলিক প্রয়োজনবোধ, ইত্যাদির সংমিশ্রণ ঘটিয়ে এক নবতম শিল্পধারার জন্ম দেন। সুলতানি-আমলের এই শিল্পধারা 'ইন্দো-ইসলামীয় স্থাপত্য', 'ইন্দো-সারাসেনীয় স্থাপত্য' বা 'পাঠান-স্থাপত্য' নামে আখ্যায়িত হয়। তবে ফার্গুসন (Fergusson)-এর দেওয়া 'পাঠান' শিল্পধারা নামটিতে ***অধ্যাপক সরস্বতী*** (S.K.Saraswati) আপত্তি করেছেন। কারণ সুলতানি-শাসনের সাথে যুক্ত রাজবংশগুলির মধ্যে শুধুমাত্র শেষ বংশটি ছিল পাঠানজাতির প্রতিনিধি।

সুলতানি-আমলের শিল্পধারার সমন্বয়ে বা সংমিশ্রণের ক্ষেত্রে প্রচলিত হিন্দুরীতি এবং নবাগত ইসলামীয়-রীতির মধ্যে কোন্‌টির প্রভাব বেশি ছিল, সে বিষয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। ***হ্যাভেল***-এর মতে, এই শিল্পরীতির শরীর ও মন দুই-ই ছিল ভারতীয়। শিল্প-নিদর্শনে হিন্দু-স্থাপত্যের প্রাধান্যই বেশি। অন্যদিকে ***ফার্গুসন, ভি. স্মিথ*** প্রমুখ মনে করেন, সুলতানি-আমলের শিল্প-স্থাপত্যে হিন্দুরীতির প্রভাব ছিল নেতিবাচক। কিন্তু ***স্যার জন মার্শাল, ড. মজুমদার*** প্রমুখ মনে করেন, ইন্দো-ইসলামীয় শিল্পরীতি কেবল ইসলামীয়-রীতির স্থানীয় (ভারতীয়) রূপ কিংবা হিন্দু-স্থাপত্যের রূপান্তরিত প্রকাশ ছিল না ; এর মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন শিল্পরীতির সাথে মুসলমান অভিযানকারীগণ কর্তৃক বাহিত পশ্চিম ও মধ্য-এশিয়া এবং উত্তর-আফ্রিকান শিল্পরীতির অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল। এই মত সমর্থন করে ***মার্শাল*** লিখেছেন : *"Indo-Islamic architecture derives its character from both sources though not always in equal degrees."* অধ্যাপক মার্শাল মনে করেন, হিন্দু-স্থাপত্যের অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল শক্তি সৌন্দর্যের সমান্তরাল প্রকাশ। ইন্দো-ইসলামীয় শিল্পধারায় হিন্দু-স্থাপত্যের এই বিশিষ্টতার উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষণীয়।

হিন্দু ও বৌদ্ধ শিল্পরীতির সাথে ইসলামী-রীতির মিলনের কয়েকটি বিশেষ কারণ লক্ষ্য করা যায়। ***প্রথমত,*** তুর্কীরা ভারতে প্রথমে এসেছিল সামরিক ভাগ্যান্বেষী রূপে। তাদের সাথে দক্ষ কারিগর বা স্থপতি ছিল না। এদেশে কর্তৃত্ব-স্থাপনের পর তারা যখন বাসগৃহ ও

উপাসনালয় নির্মাণে উদ্যোগী হয়, তখন তাদের নির্ভর করতে হয় ভারতীয় শিল্পী-কারিগরদের উপর। এই কারিগররা নিজেদের অজান্তে এবং খুব স্বাভাবিক কারণে, পারসিক শিল্পরীতির মাঝে ভারতীয় রীতি ঢুকিয়ে দেয়। যেমন—ভারতীয় প্রতীক পদ্মফুলের সাথে পারসিক নকশা লতাপাতার সর্পিল অলংকরণ একাকার হয়ে যায়। ***দ্বিতীয়ত,*** মুসলিম শাসকরা প্রথমদিকে অল্প খরচে এবং অল্প সময়ে তাদের প্রয়োজনীয় বাসগৃহ ও উপাসনালয় গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। এজন্য তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন হিন্দু বা জৈন মন্দির বা অট্টালিকা। এই সকল নির্মাণের সামান্য পরিবর্তন, যেমন—দেওয়াল ভেঙে কয়েকটি খিলান এবং মাথার উপরে গম্বুজ নির্মাণ করে এগুলিকে মসজিদে রূপান্তরিত করেন। ফলে সম্পূর্ণ স্থাপত্য-কর্মটির মধ্যে ভারতীয় শিল্পধারা নানাভাবে বর্তমান থেকে যায়। ***তৃতীয়ত,*** বিশ্বের কোন দেশের স্থাপত্যে শক্তি ও সৌন্দর্যের এমন সুষম বহিঃপ্রকাশ ঘটেনি ; —যা ভারতীয় স্থাপত্য-রীতিতে লক্ষ্য করা যায়। মুসলমান স্থপতি ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষকগণ ভারতীয়-স্থাপত্যের এই অনন্যতাকে গ্রহণ করতে দ্বিধা করেননি। তাই ইসলামী শিল্পরীতির মধ্যে বিশেষত স্থাপত্যে ভারতীয় ধারার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। অধ্যাপক ***সরসীকুমার সরস্বতী*** মনে করেন, ভারতে সমন্বয়ী আদর্শের জন্যই মুসলমান-শাসিত ভারত অন্যান্য মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলের তুলনায় উন্নততর স্থাপত্যের সৃষ্টি করতে পেরেছিল।

তুর্কো-আফগান শাসকদের আমলে ভারতীয়-স্থাপত্যের রূপ বা অবয়ব এবং অলংকরণের ক্ষেত্রে অভিনবত্ব আসে। ভারতীয় শিল্পী-কারিগররা কংক্রিটের ব্যবহার জানতেন না। ভারতীয়দের স্থাপত্য-কৌশল ছিল একের পর এক পাথর বসিয়ে দেওয়াল তৈরি করা এবং শীর্ষদেশে বীম স্থাপন করে আচ্ছাদিত করা। কংক্রিট বা চুন, বালি ও জলের মিশ্রণে আস্তর (Mortor) তৈরির কৌশল ভারতীয়দের অজানা ছিল। ফলে প্রশস্ত স্থানের উপর আচ্ছাদন সমন্বিত মন্দির বা প্রাসাদ তৈরি করার কাজে উৎসাহ দেখানো হত না। তুর্কীদের সাথে সাথে ভারতীয় স্থাপত্যে খিলান ও গম্বুজ-এর ব্যবহার শুরু হয়। হিন্দু বা বৌদ্ধ স্থাপত্যে খিলান বা গম্বুজের অস্তিত্ব ছিল না। সতীশচন্দ্রের মতে, খিলান বা গম্বুজের ব্যবহার ভারতীয়দের অজানা ছিল না ; কিন্তু খিলান তৈরির বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি এবং মর্টার সম্পর্কে ভারতীয়দের অভিজ্ঞতার অভাব ছিল বলে হিন্দু বা বৌদ্ধ স্থাপত্যে খিলান বা গম্বুজ ব্যবহার হত না। মুসলমানরা পারস্যে এসে এই বিশিষ্ট স্থাপত্যধারার সঙ্গে পরিচিত হয়। পারসিক-স্থাপত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল খিলান, তির্যক খিলান, গম্বুজ এবং গম্বুজের নিচে আটকোণ-বিশিষ্ট গৃহ। গম্বুজগুলি ছিল স্থপতিদের আত্মবিশ্বাস আর মুসলমান শাসকদের দম্ভের প্রতীক। চারকোণ-বিশিষ্ট অট্টালিকার উপর নির্মিত গম্বুজগুলির উচ্চতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল। খিলান আর গম্বুজ ব্যবহারের ফলে বড় বড় উন্মুক্ত হলঘর নির্মাণ সম্ভব হয়েছিল। সমবেত প্রার্থনা কিংবা আলোচনাসভার পক্ষে এই ধরনের কক্ষ খুবই উপেযোগী ছিল। কংক্রিটের অধিকতর ব্যবহারের ফলে পারসিক-স্থাপত্যে বেশি জায়গা আচ্ছাদিত করাও সম্ভব হয়েছিল।

সুলতানি আমলের স্থাপত্যে খিলান ও গম্বুজের পাশাপাশি প্রস্তরফলক ও বীম-পদ্ধতিও ব্যবহার করা হত।

ভারতীয়দের মত তুর্কীরাও অলংকরণপ্রিয় ছিল। ইসলামধর্মে জীবিত প্রাণীর প্রতিকৃতি অঙ্কন নিষিদ্ধ ছিল। তাই তুর্কীরা গৃহের শোভাবৃদ্ধির জন্য জ্যামিতিক আকৃতি, লতাপাতায় জড়ানো নকশা এবং কোরানের বাণী-সম্বলিত লিপি ব্যবহার করত। এর সাথে তুর্কীরা কিছু সংশোধন-সহ ভারতীয় অলংকরণ পদ্ধতি গ্রহণ করে, যেমন—স্বস্তিকা, পদ্মফুল, ঘণ্টাকৃতি ইত্যাদি। এইভাবে সুলতানি আমলের স্থাপত্যকর্মের নির্মাণ-পদ্ধতি ও অলংকরণের ক্ষেত্রে এদেশে প্রচলিত হিন্দু ও বৌদ্ধ শিল্পরীতি এবং মুসলমানগণ বাহিত পারসিক শিল্পরীতির অপূর্ব সম্মেলন দেখা যায়। তাই ***ঐতিহাসিক দেশাই*** (Z. A. Desai) যথার্থই লিখেছেন : *"The Islamic architecture of India is an interesting story of these two seemingly opposite styles mingling with each other with varying degrees in different parts of the country at different periods of time."*

সুলতানি-আমলে 'ইন্দো-ইসলামীয়' স্থাপত্যের উদ্ভব ও বিকাশে তিনটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। প্রথম পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল 'দাস' ও 'খলজী' বংশীয় সুলতানদের আমলে সৃষ্ট লাহোর, দিল্লীর ও আজমীরের স্থাপত্যকর্মগুলি। দ্বিতীয় পর্যায়ে ছিল তুঘলকদের আমলের কাজগুলি, যেগুলি পূর্বেকার কাজের থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র এবং উন্নত ছিল। তুঘলকদের পতনের পর দিল্লী সুলতানি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সাম্রাজ্যের সংহতি বিপন্ন হয়। এই সময়ে শুরু হয় তৃতীয় পর্যায়ের, যখন প্রাদেশিক স্তরে এবং নবনব গঠিত স্বাধীন রাজ্যগুলিতে নতুনভাবে স্থাপত্যকর্ম বিকাশলাভ করে।

পার্সি ব্রাউন (Percy Brown)-এর মতে, হিন্দু-স্থাপত্য ছিল স্তম্ভ-সর্দল (Trabeate system) রীতির উপর প্রতিষ্ঠা। অন্যদিকে মুসলিম স্থাপত্য ছিল খিলান নির্ভর (Arcute system) রীতিতে নির্মিত। মন্দিরের শিখরগুলি কোণাকৃতি দীর্ঘবিশিষ্ট কিংবা পিরামিড আকৃতির উচ্চস্তম্ভ (Tower) দ্বারা সুশোভিত। অন্যদিকে মসজিদের ছাদের ওপর একটি বা একাধিক গম্বুজ ও মিনার নির্মিত হত। মুসলমান যুগে এই দুটি স্থাপত্য শৈলীর সমন্বয়ে একটি নবতম ধারার উদ্ভব ঘটে। তাই ভারতে এই ধারা ***ইন্দো-ইসলামিক*** বা ***ভারতীয় মুসলিম*** স্থাপত্য নামে আখ্যায়িত হয়। ভারতে এরূপ প্রাণবন্ত স্থাপত্য সৃষ্টির পেছনে পার্সি ব্রাউন দুটি কারণের উল্লেখ করেছেন। ***প্রথমত,*** ইন্দো-ইসলামিক স্থাপত্য ধারা তুলনামূলক ভাবে অন্যান্য স্থাপত্য ধারার চেয়ে পরে বিকশিত হয়েছিল। ***দ্বিতীয়ত,*** ভারতীয় স্থপতি ও কারিগরদের মধ্যে নতুন প্রযুক্তিকে বুঝে নেওয়ার বিশেষ প্রতিভা ও দক্ষতা ছিল । প্রথম কারণ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, কায়রো, বাগদাদ, দামাস্কাস, জেরুজালেম প্রভৃতি নগরে সুদৃশ্য মসজিদ, সাকবারা ইত্যাদি নির্মিত হবার পর ভারতে মুসলিম স্থাপত্যের বিকাশ ঘটেছিল। ফলে পূর্ব অভিজ্ঞতা এদেশের স্থাপত্যকে সমৃদ্ধ করেছিল। দ্বিতীয় কারণটি সম্ভবত বেশী গুরুত্বপূর্ণ। পার্সি ব্রাউন,

সুলতান আহমেদ প্রমুখের মতে, সুলতানি আমলে অনন্য সাধারণ স্থাপত্য সৃষ্টির মুখ্য কারিগর ছিলেন ভারতীয় স্থপতিদের মনীষা, প্রজ্ঞা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব।

ভারতীয়দের মত তুর্কীরাও অলংকরণপ্রিয় ছিল। ইসলামধর্মে জীবিত প্রাণীর প্রতিকৃতি অঙ্কন নিষিদ্ধ ছিল। তাই তুর্কীরা গৃহের শোভাবৃদ্ধির জন্য জ্যামিতিক আকৃতি, লতাপাতায় জড়ানো নক্সা এবং কোরানের বাণী-সম্বলিত লিপি ব্যবহার করত। এর সাথে তুর্কীরা কিছু সংশোধন-সহ ভারতীয় অলংকরণ পদ্ধতি গ্রহণ করে, যেমন—স্বস্তিকা, পদ্মফুল, ঘণ্টাকৃতি ইত্যাদি। এই ভাবে সুলতানি আমলের স্থাপত্যকর্মের নির্মাণ-পদ্ধতি ও অলংকরণের ক্ষেত্রে এদেশে প্রচলিত হিন্দু ও বৌদ্ধ শিল্পরীতি এবং মুসলমানগণ বাহিত পারসিক শিল্পরীতির অপূর্ব সম্মেলন দেখা যায়। তাই ঐতিহাসিক *দেশাই* (Z. A. Desai) যথার্থই লিখেছেন : *'The Islamic architecture of India is an interersting story of these two seemingly opposite styles mingling with each other with varying degrees in different parts of the country at different periods of time.'*

দিল্লীর সুলতানি আমলে স্থাপত্যের ক্রম বিকাশের ধারাকে পার্সি ব্রাউন তিনটি ধাপে বিভক্ত করেছেন। প্রথম ধাপে সীমা ছিল খুব কম। এই সময় আরব ও তুর্কী যোদ্ধারা হিন্দু স্থাপত্য (মন্দির) অপবিত্রকরণ ও ধ্বংস করার নীতি নেন। ধর্মীয় আবেগ এবং আক্রমণকারীর দম্ভ জাহির করার জন্যই এ কাজ করা হত। দ্বিতীয় ধাপে মন্দির বা হিন্দু ইমারতগুলি নির্মমভাবে ভাঙা হত না। ইমারতের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি সরিয়ে নিয়ে গিয়ে মসজিদ বা মাতবারার অংশ হিসেবে ব্যবহার করা হত। বড় বড় থাম, কড়ি বা বর্গা হাতির সাহায্যে নতুন নির্মাণ স্থলে সরিয়ে নেওয়া হত। তৃতীয় ধাপের সূচনা হয় এদেশে মুসলিম শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর। এই ধাপে পরিকল্পিত নকশা ধরে নতুন নতুন ইমারত, মসজিদ ইত্যাদি নির্মাণ শুরু হয়।

সুলতানি আমলে 'ইন্দো-ইসলামীয়' স্থাপত্যের উদ্ভব ও বিকাশে তিনটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। প্রথম পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত ছিল 'দাস' ও 'খলজী' বংশীয় সুলতানদের আমলে সৃষ্ট লাহোর, দিল্লী ও আজমীরের স্থাপত্যকর্মগুলি। দ্বিতীয় পর্যায়ে ছিল তুঘলকদের আমলের কাজগুলি, যেগুলি পূর্বেকার কাজের থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র এবং উন্নত ছিল। তুঘলকদের পতনের পর দিল্লী সুলতানি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সাম্রাজ্যের সংহতি বিপন্ন হয়। এই সময়ে শুরু হয় তৃতীয় পর্যায়ের, যখন প্রাদেশিক স্তরে এবং নবনব গঠিত স্বাধীন রাজ্যগুলিতে নতুনভাবে স্থপত্যকর্ম বিকাশ লাভ করে।

কুতুবউদ্দিন আইবকের উদ্যোগে ভারতে ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যের সূচনা হয়। প্রথমে তিনি অনুচরদের জন্য উপাসনাগৃহ নির্মাণে হাত দেন এবং সম্পূর্ণ নতুন গৃহ-নির্মাণের পরিবর্তে পুরানো মন্দির বা অট্টালিকাকে মসজিদে রূপান্তরিত করেন। তাঁর আমলে নির্মিত এরূপ দুটি প্রাচীনতম নিদর্শন হল দিল্লীর *'কুয়াত-উল্-ইসলাম'* মসজিদ ও আজমীরের *'আড়াই দিনকা-*

ঝোঁপড়া' প্রাসাদ। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ চৌহানের পরাজয়ের অব্যবহিত পরে একটি জৈন মন্দির ভেঙে 'কুয়াত-উল্-ইসলাম' মসজিদটি নির্মিত হয়। মন্দিরের গর্ভগৃহটি ভেঙে তার সম্মুখভাগে তিনটি সুদৃশ্য খিলান তৈরী করা হয়। মন্দিরের পশ্চিমদিকে তৈরী করা হয় উপাসনার স্থানটি। খিলানের সামনে লতা-পাতা-ফুলের সর্পিল অলংকরণ এবং কোরানের বাণী খোদাই করে আকর্ষণ বৃদ্ধি করা হয়। এই ভাবে সামান্য পরিবর্তনের ছোঁয়া দিয়ে মন্দিরকে পরিণত করা হয় মসজিদে। পরবর্তী সুলতানদের আমলে একটু একটু করে এই মসজিদের পরিধি বিস্তৃত করা হয়। আজমীরে একটি বৌদ্ধমঠ ও সংস্কৃত পাঠকেন্দ্রকে পরিবর্তিত করে 'আড়াই-দিনকা-ঝোঁপড়া' অট্টালিকা নির্মিত হয়েছিল। মুঘলদের পরাজিত করে মারাঠারা এই অট্টালিকা দখল করে আড়াই দিন বিজয়-উৎসব পালন করেছিল। তারপর থেকে এটি 'আড়াই-দিন-কা ঝোঁপড়া' নামে পরিচিত হয়। তবে এই অট্টালিকার নির্মাণে শিল্পীর কল্পনার দৈন্য স্পষ্ট। তাই প্রখ্যাত শিক্ষা-সমালোচক ড. *সরস্বতী* লিখেছেন ঃ *'It was a perfect example of mathematical precision and technical skill; but in no account it can be regarded an artistic triumph.'* কিলা-ই-রায়-পিথুরা বা পৃথ্বীরাজ চৌহানের দুর্গকে কেন্দ্র করে কুতুবউদ্দিন যে প্রাসাদরাজি নির্মাণ করেন, তাকে Gordon Hearson 'মুসলিম শাসকগণ নির্মিত সাতটি নগরের প্রথম সৃষ্টি' বলে বর্ণনা করেছেন। কুতুবউদ্দিন ১১৯৯ খ্রীস্টাব্দে কুতুবমিনার নামক সুউচ্চ ও সুদৃষ্ট স্থাপত্য কাঠামোর ভিত্তি স্থাপন করেন। পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যতগুলি মিনার নির্মিত হয়েছে তার মধ্যে কুতুবমিনার সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। ফারগুসনের (Fergussion) মতে, সৌন্দর্যের প্রতীক রূপে এটি মধ্যযুগ থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্ববন্দিত হয়ে আছে। একমাত্র কায়রোর হাসান মসজিদের মিনারই কুতুবমিনার থেকে বেশী উঁচু।[1] এই মিনারের আদি উচ্চতা ২২৮ফুট এবং শীর্ষে অবস্থিত চন্দ্রাতপ বা ছত্রীর উচ্চতা কমপক্ষে ১০ ফুট। অর্থাৎ মোট উচ্চতা ২৩৮ফুট। এটি প্রথমে চারতলায় সমাপ্ত হয়েছিল। প্রতিটি স্তরে বা তলায় ঝুলন্ত বারান্দা প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। নীচের দিকে তিনতলা কক্ষও আছে। কিন্তু চতুর্থ তলা পরবর্তী কালে সংস্কার করা হয়। এই সময় একটি নতুন তল-এর সাথে যুক্ত করা হয়। প্রথম তলার অধিকাংশ কাজ সুলতান কুতুবউদ্দিনের সময় করা হয়। মিনারের অবশিষ্ট কাজ সম্পূর্ণ করেন সুলতান ইলতুৎমিস। পরে বজ্রপাতে এর ক্ষতি হলে ফিরোজশাহ তুঘলক এটি পুনর্নির্মাণ করেন। পুনর্নির্মাণ কাজে যে মালমশলা ও বহির্সজ্জায়ন ব্যবহার করা হয়, তা ছিল স্বতন্ত্র। তুঘলক বংশের শাসনকালে এর আবার সংস্কার করা হয়। সময়ের ব্যবধানের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রযুক্তির পরিবর্তন ঘটেছিল। তাই এর নির্মাণে বৈচিত্র্য আছে। তাই দেখা যায় ফিরোজ তুঘলক যখন ওপর তলার সংস্কার করেন তখন ঐ অংশটুকু সম্পূর্ণ নতুন আকৃতিতে নির্মিত হয়। এতে একটি নতুন তলার সংযোজন ঘটে। চতুর্থ ও পঞ্চম তলা লাল বেলেপাথরে নির্মিত এবং এর পৃষ্ঠদেশ

শ্বেত পাথরে ঢেকে দেওয়া। ***সতীশচন্দ্র*** লিখেছেন, *"কুতুবমিনার নানা কারণে অদম্য। এমন সুকৌশলে সৌধের অলিন্দগুলি নির্মিত হয়েছে যে, অলিন্দগুলি সৌধ থেকে অভিক্ষিপ্ত হয়েও ছিল সৌধের সাথে যুক্ত। প্যানেলসমূহে ও মিনারের ঊর্ধ্বে লাল ও বেলেপাথর ও মার্বেলের ব্যবহার আর পাঁজরের মত বক্রাকার আকৃতি কুতুবমিনারকে শিল্প-সার্থকতা দান করেছে।"*

কুতুবমিনার নির্মাণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে নানা কথা প্রচলিত আছে। (১) মিনারের অভ্যন্তরে অবস্থিত নাগরী লিপিতে উৎকীর্ণ একটি পাথরের অবস্থান থেকে মনে করা হয় যে, এটি একটি হিন্দু স্থাপত্য কর্ম এবং পরে মুসলমানেরা এর বাইরের দেওয়াল নতুন ভাবে খোদাই করেছে। অনুমান যে চৌহান পৃথ্বিরাজ তাঁর কন্যার যমুনা দর্শনের ইচ্ছা পূরণের জন্য একটা মিনার নির্মাণ করেছিলেন। কুতুবমিনারে কিছু কিছু অলংকরণে ও সজ্জায়নে হিন্দু স্থাপত্যের প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন দড়ি ঝুলানো নকশা, প্রস্ফুটিত পদ্মফুল ইত্যাদি। কিন্তু এই কারণে এটিকে হিন্দু স্থাপত্য বলা যায় না। কারণ ইরান, তুর্কিস্থান সহ বহু দেশে মুসলিম স্থাপত্যের অলংকরণে হিন্দু প্রতীক ব্যবহারের দৃষ্টান্ত আছে। (২) অন্য একটি মতে, বিশিষ্ট সুফি সাধক খাজা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাজী (উচ্-কা-পীর)-এর স্মৃতি রক্ষার্থে এই মিনারের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। (৩) তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিক মনে করেন যে, কুতুবমিনার আসলে একটি বিজয় তোরণ। ফারগুসনের মতে, গোলাকার দীর্ঘদণ্ড, অক্ষরেখা বা মেরুদণ্ড, ন্যায়বিচার ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক। কুতুবমিনারের গায়ে তোঘরা ঢঙের উৎকীর্ণ আরবী লিপিমালায় ঘোষণা করা হয়েছে যে আল্লাহর ছায়া পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্তে প্রসারিত। পশ্চিম প্রান্তে আর এক মুসলিম শাসক প্রথম ইউসুফ স্পেনের সেভিলে অনুরূপ একটি উচ্চাকার স্তম্ভ নির্মাণ করেছেন। কুতুবমিনার সেভিল মিনারকে পরোক্ষে পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে মুসলিম রাজ্য বিস্তারের প্রতীষ্ঠা করা হয়েছে । বিশ্বের দরবারে ইসলামের প্রতিপত্তি, গর্ব ও মর্যাদা ঘোষণা করার জন্য এরূপ সুউচ্চ মিনার নির্মাণের আরও দৃষ্টান্ত আছে, যা এই মতকে সমর্থন করে। (৪) ***পার্সি ব্রাউন***-এর মতে, এই বিজয়স্তম্ভটি মসজিদের মিনারহিসেবে সম্পূরক দায়িত্ব পালন করত।[1] মসজিদের সন্নিকটে উচ্চ মিনার থেকে মুসল্লিদের নামাজে শরিক হওয়ার জন্য আহ্বান জানানোর রেওয়াজ ইসলামের বিকাশের গোড়া থেকেই দেখা যায়। সামার (ইরাক), ইব্‌নেতুলুন (কায়রো) রাক্কা (সিরিয়া) প্রভৃতি মসজিদের পাশে এমন মিনার দৃষ্ট হয়। তাই 'কুয়াত-উল্-ইসলাম' মসজিদের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে নির্মিত কুতুবমিনারও এই উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছিল। শেষ দুটি অভিমতই অধিক গ্রহণযোগ্য। যাই হোক, কুতুবমিনারের পরিকল্পনা কুতুবউদ্দিন আইবকের সৃজনশীল প্রতিভার অনবদ্য দৃষ্টান্ত, যা ভারতীয় স্থপতিদের মেধা ও মননশীলতার গুণে আজও বিশ্বের বিস্ময় হিসেবে স্বীকৃত হয়।

পারসিক শিল্পধারার এক অসামান্য নিদর্শন হল কুয়াতুল মসজিদের পাশে ইলতুৎমিসের

নির্মিত সমাধিসৌধ। এতে তীর্যক খিলানের সার্থক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। ধূসরবর্ণের গ্রানাইটের বহিরঙ্গের উপর লাল বেলেপাথরের ব্যবহার করে এই এককক্ষযুক্ত সৌধটিকে রঙীন ও প্রাণবন্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। সমাধির ছোট ছোট দেওয়ালগুলিতে এত সূক্ষ্ম কারুকার্য করা হয়েছিল যে এক বর্গ ইঞ্চি জায়গাও খালি ছিল না। ইলতুৎমিসের আমলে নির্মিত অন্য কয়েকটি স্থাপত্যকর্ম হল 'হাউজ-ই-সামসী'; 'সামসী-ইদ্‌গাহ', 'জান-ই-মসজিদ' ইত্যাদি। রায় পিথুরার দক্ষিণ-পূর্বে নির্মিত সমকোণী ও গম্বুজ-বিশিষ্ট বলবনের সমাধি-সৌধটি ইন্দো-ইসলামীয় শিল্পধারার আর একটি ক্ষয়িষ্ণু নিদর্শন।

আলাউদ্দিন খলজি রাজ্য বিজয়ের পাশপাশি স্থাপত্য সৃষ্টির কাজেও উৎসাহী ছিলেন। কুতুবমিনারকে সম্প্রসারণ করার এক বৃহৎ পরিকল্পনা তাঁর ছিল। অবশ্য সে কাজ তিনি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি। তবে তিনি রাজকীয় চৌহদ্দির প্রবেশদ্বার স্বরূপ সুউচ্চ তোরণ আলাইদরওয়াজা নির্মাণ করেন, যা Treasure Gem of Islamic architecture' হিসেবে শিল্পরসিকগণ কর্তৃক সমাদৃত হয়েছে। এই প্রবেশদ্বারের মাথায় একটি সুন্দর গম্বুজ আছে। এর খিলানগুলিও খুব সুন্দর। এই স্থাপত্য-কাজটিতে কারিগরদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। আলাইদরওয়াজা নির্মাণে কোন সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি। দেশীয় ও বহিরাগত উভয় উপাদানের সমন্বয়ে এটি নির্মিত হয়। ইমারতের মূল কাঠামো ভারতীয় আঙ্গিকে নির্মিত। তবে কোন কোন কিনারার আকার এবং নকশায় বহির্ভারতীয় প্রভাব বর্তমান। বস্তুত আলাইদরওয়াজা আলাউদ্দিন পরিকল্পিত জামি মসজিদের চারটি দরজার অন্যতম প্রবেশদ্বার হিসেবে নির্মিত হয়েছিল। পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণে অন্য প্রবেশদ্বার নির্মাণের পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু কেবল দক্ষিণেরটি সমাপ্ত হয়েছিল। তাই আলাইদরওয়াজাকে একটি নিঃসঙ্গ স্থাপত্য কাঠামো বলা যায়। পার্সি ব্রাউনের মতে, সুলতান মসজিদের দক্ষিণের প্রাসাদে অবস্থান করতেন। এই পথ ধরে মসজিদের অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য অতি দ্রুততার সাথে এই দরওয়াজা নির্মাণ করেন। এই ইমারত একটি বর্গাকৃতি স্থাপত্য কাঠামো, যার প্রতি পার্শ্ব ৫৫ফুট এবং গম্বুজসহ উচ্চতা ৬০ ফুট। প্রত্যেক পার্শ্বের মাঝে দরজা এবং পার্শ্বদেশে পাথরের জালিকাট জানালা বর্তমান। এখানে ব্যবহৃত খিলান সূক্ষ্মাগ্র অশ্বক্ষুরাকৃতি খিলান' (pointed horse-shoe arch) নামে পরিচিত। এই শৈলীর ব্যবহার খলজী পরবর্তী স্থাপত্যে দেখা যায় না। এই খিলানে মসৃণ সমতল পাথর ব্যবহার করা হয়েছে। ড. সুলতান আহমেদ লিখেছেন, "আলাই দরজায় ব্যবহৃত খিলানের আকারত্ব, এর সজ্জায়ন, অলংকরণ ও চিত্রাঙ্কন প্রণালী জোরালো ভাবে এর সৌন্দর্যের প্রতিরূপকে আকারত্বে ও বিশিষ্টতায় প্রকাশিত হতে সাহায্য করেছে।' আলাউদ্দিন কুতুবমিনারের কয়েক কিলোমিটার দুরে সিরিতে নতুন রাজধানী নির্মাণ করেন। এখানে তিনি হাজার স্তম্ভবিশিষ্ট (Mahal Hazar Satun) একটি মনোরম প্রাসাদ নির্মাণ করেন। পাশে ৭০ একর জায়গা জুড়ে একটি বৃহৎ পুস্করিণী খনন করে সুদৃশ্য প্রাচীর দ্বারা তাকে বেষ্টিত করেন। এটি 'হাউজ-ই-খাস' বা 'হাউজ-ই-ইলাহী' নামে খ্যাত। এই সব

স্থাপত্য-কর্মের সামান্য ধ্বংসাবশেষ অবশিষ্ট আছে মাত্র। সন্ত নিজামউদ্দিন আউলিয়ার দরগার কাছে 'জামাতখানা' মসজিদটিও আলাউদ্দিনের আমলে নির্মিত হয়। মার্শালের মতে, এটিই ছিল সম্পূর্ণভাবে ইসলামীয় আদর্শের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভারতে নির্মিত প্রথম মসজিদ। এই মসজিদের নির্মাণ কাজ আলাউদ্দিনের পুত্র খিজির খাঁর সময়ে সম্পূর্ণ হয়। প্রথমে এটিকে শেখ নিজামউদ্দিন আউলিয়ার মাজার রূপে নির্মাণ করা হয়েছিল। তখন এর কেন্দ্রীয় কক্ষটিই শুধু ছিল। তুঘলকদের সময় একে মসজিদে রূপান্তরিত করা হয় এবং পার্শ্ববর্তী কক্ষদুটি যুক্ত করা হয়। মুঘল সম্রাট আকবরের আমলে এর আরও পরিবর্তন ঘটানো হয়।

তুঘলকবংশের শাসনকালে দিল্লী-সুলতানি যেমন উন্নতির শীর্ষে আরোহণ করে, তেমনি এই সময়েই সুলতানির পতন সূচিত হয়। তুঘলকদের আমলে সুলতানি-স্থাপত্য লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে। রেখার বাহুল্য বর্জিত হয়। অলংকরণ কমিয়ে দেওয়া হয়। বহিরঙ্গের সৌন্দর্য-সুষমার পরিবর্তে প্রাসাদ বা মসজিদগুলিকে অধিকতর ব্যবহারযোগ্য করার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়। অধ্যাপক শ্রীবাস্তবের মতে, এই পরিবর্তন দুটি কারণে ঘটেছিল। যথা— (১) তুঘলক শাসকরা ছিলেন গোঁড়া সুন্নী মুসলিম। তাই ধর্মীয় নির্দেশ অনুযায়ী স্থাপত্য সৃষ্টিতে আগ্রহী ছিলেন এবং (২) তুঘলকদের রাজকোষ পূর্বের মত সচ্ছল ছিল না, যাতে স্থাপত্যে বেশী অর্থব্যয় করা সম্ভব। স্যার জন মার্শাল আর একটি নতুন কারণ যোগ করেছেন। তাঁর মতে, তুঘলকদের আমলে উন্নত দক্ষ কারিগর ও শিল্পীর অভাব ছিল। ড. *সরস্বতী* খলজী আমলের সুদৃশ্য স্থাপত্যকর্মের সাথে তুঘলক-আমলের সুদৃঢ় ও বস্তুমুখী স্থাপত্যের তুলনা করে লিখেছেন, *'In marked contrast to the rich and elaborate ornamental style of the Khalji buildings, those of the Tughluqs are characterized by a stark simplicity of design bordering almost on puritanical severity.'* ড. সরস্বতী মনে করেন, তুঘলক যুগের স্থাপত্যে শক্তি ও কাঠিন্যের প্রকাশ ছিল, কল্পনার বিলাস সেখানে ছিল না।

সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক ছিলেন মূলত একজন সমর নেতা। তাঁর স্থাপত্য কর্মের মধ্যেও এই মানসিকতার প্রকাশ দেখা যায়। তিনি দিল্লীতে তৃতীয় নগরী 'তুঘলকাবাদ' নির্মাণ করেন। আজ তার জীর্ণ ধ্বংসাবশেষটুকু বর্তমান। ইবন বতুতা এর সৌন্দর্য প্রসঙ্গে লিখেছেন যে, এখানে রাজ্যের অগণিত সম্পদ সঞ্চিত হত। বিরাট স্বর্ণপ্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল। যখন সূর্যের আলোক পড়ত, তখন প্রাসাদটি ঝলমল করে উঠত। তুঘলকাবাদ নগর একাধিক অংশ নিয়ে গঠিত ছিল। এটি ছিল নগর, দুর্গ ও রাজপ্রাসাদের এক যৌগিক নির্মাণ। মোঙ্গল আক্রমণের কারণে আবাসিক এলাকার পাশেই সামরিক এলাকা গড়ে উঠেছিল। পার্সি ব্রাউনের মতে, তুঘলকাবাদ নগরটি রোমান ঢঙ-এ নির্মিত ছিল। অবশ্য এর সাথে আরবদের 'শিবির-নগর' (camp-city)-এর একটা সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়।[1] এর চতুর্দিকের পরিসীমা ছিল ৬.৪৪ কিলোমিটার। দুর্গের প্রবেশ দ্বারে উপদুর্গের মত বহির্দেওয়াল সংলগ্ন প্রহরীদের চৌকি এবং প্রতি কোণে স্থূলাকার বুরুজ

ছিল। বুরুজগুলি বৃত্তাকার এবং প্রায় দু'তলার সমান উঁচু করে নির্মিত। দুর্গ ও রাজপ্রাসাদ অংশ বেড়া দিয়ে আলাদা করা ছিল। রাজপ্রাসাদের জানালা মহলের নীচে দীর্ঘ করিডোর ও ঘর ছিল, যার দরজা বহির্মুখী। যমুনানদীর তীরে এক উপত্যকার শীর্ষে নির্মিত এই নগরীর সুবৃহৎ প্রাসাদ ও একাধিক অট্টালিকার ধ্বংসস্তূপ আজ কেবল অতীত সাক্ষী হয়ে পড়ে আছে। ইবন বতুতা লিখেছেন ঃ হয়তো একান্ত মনে খুঁজলে আজও সেদিনের সুপ্রশস্ত রাজপথ নজরে পড়বে; নজরে পড়বে সেই রাজকীয় প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ যার শরীর জুড়ে ছিল সোনালী গিল্‌টি করা টালি ও ইট, যার উপর সূর্যালোক পতিত হলে বিচ্ছুরিত আভার দিকে তাকিয়ে থাকা একদা অসম্ভব হত।' গিয়াসউদ্দিনের স্বনির্মিত সমাধি-সৌধটিও অনবদ্য স্থাপত্যের নিদর্শন। সুউচ্চ বেদীর উপর পঞ্চভূজ এই সৌধের গম্বুজটি মার্বেল পাথরের নির্মিত হওয়ার পর সৌন্দর্য বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছিল। একটি কৃত্রিম হ্রদের মাঝখানে এটি অবস্থিত। ২৫০গজ দীর্ঘ সরু বাঁধানো রাস্তা দ্বারা এটিকে মূল দুর্গ শহর তুঘলকাবাদের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। ফলে এটিও স্বতন্ত্র দুর্গের আকার নিয়েছে। তবে এর প্রবেশদ্বার স্বাভাবিক সৌষ্ঠবময় হলেও, এটি এমন কৌশলে নির্মিত যে কেউ জোরপূর্বক প্রবেশ করতে চাইলে এটি তার মৃত্যুফাঁদে পরিণত হতে পারত। সমাধি সৌধের অধিকংশ স্থান লাল বেলে পাথরে নির্মিত। গম্বুজ অংশ এবং নক্‌শা দ্বারা অলংকৃত করার স্থানগুলি শ্বেতমর্মর দ্বারা নির্মিত। এই নির্মাণের বিশেষত্ব হল বহির্দেওয়ালের ঢালুতা। এটি ৭৫ ডিগ্রী কোণ উৎপন্ন করে পিরামিড অনুরূপ ঢালু হয়েছে। এর মূল ভিত্তিটি প্রতি পার্শ্বে ৬১ ফুট এবং গম্বুজ চূড়া সমেত এর উচ্চতা ৮০ ফুট। এই সমাধি-সৌধ দুটি পদ্ধতির সংমিশ্রণ ঘটেছে—বর্গা (lintel) বা চৌকাঠ হিন্দু রীতি এবং খিলান (arch). নির্ভর মুসলিম রীতি। সম্ভবত খিলান পদ্ধতির কার্যকারিতা সম্পর্কে হিন্দু কারিগরদের সংশয় এবং ঐতিহ্যের গভীর আস্থা তাদের খিলানের সাথেই বর্গা ব্যবস্থার প্রয়োগ ঘটাতে প্ররোচিত করেছিল। পার্সি ব্রাউন এটিকে নিয়মবিরুদ্ধ স্থাপত্যকর্ম বলে উল্লেখ করেছেন। মূলতানের প্রাদেশিক শাসনকর্তা থাকাকালে গিয়াসউদ্দিন সেখানে একটি আগাম সমাধি-সৌধ নির্মাণ করেছিলেন। দিল্লীর সুলতান পদে অধিষ্ঠিত হলে এটির প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত পীর শাহ্ রুকন-ই-আলমের স্মৃতি-সৌধ হিসেবে এটি ব্যবহার করেন। পীরের প্রতি এমন শ্রদ্ধা প্রদর্শনের দৃষ্টান্ত মধ্যযুগের ইতিহাসে বিরল। ভারতীয় উপমহাদেশে নির্মিত অষ্টভুজ সমাধি সৌধগুলির মধ্যে এটি সুন্দরতম। ইট ও কাঠে নির্মিত এই সৌধের উচ্চতা ৫০ ফুট। প্রতি কোণে ছোট ছোট মিনার ও দেওয়ালে পাঞ্জাবে তৈরী উজ্জ্বল টালি ব্যবহৃত হয়েছে। *'শাহ্-রুকন-ই-আলম'* মাকবারার প্রশংসা করে *জন মার্শাল* লিখেছেন, '*The tomb of Rukan-i-Alam is one of the splendid memorials even erected in honour of the dead.*'[1] মহম্মদ-বিন্-তুঘলক 'আড়াই-দিন-কা-ঝোঁপড়' এবং 'সিরি' নগরের মাঝে দিল্লীর চতুর্থ নগরী জাহানপনাহ' নির্মাণ করেন এবং সুদৃঢ় দেওয়াল দ্বারা প্রথম ও দ্বিতীয় নগরীকে একসূত্রে গ্রথিত করেন। দৌলতাবাদে নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠার সূত্রে মহম্মদ তুঘলক নিশ্চয়ই সেখানে বহু প্রাসাদ ও উপাসনালয় নির্মাণ করেছিলেন। তবে দ্রুত নির্মাণের জন্য এবং উপযুক্ত মালমশলা ব্যবহার না করার ফলে সেগুলির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া

যায়নি। মহম্মদ তুঘলক নির্মিত নগর প্রাসাদের কিছু দূরে আর একটি স্থাপত্য কর্মের সন্ধান পাওয়া যায়, যা 'বিজয়মণ্ডল' নামে পরিচিত। এর ছাদ সমতল টাওয়ার সদৃশ। পি. ব্রাউন এটিকে 'হাজার স্তম্ভ' প্রাসাদ বলেছেন। জন মার্শালের মতে, মহম্মদ তুঘলকাবাদ নগরের সম্প্রসারণ করে আদিলাবাদ দুর্গটি নির্মাণ করেন (Adilabad which was merely an outwork of the large city of Tughluqabad and almost identical with it in style.)।

ফিরোজ তুঘলক ছিলেন সু-নির্মাতা। তাঁর উদ্যোগে নির্মিত হয়েছিল অসংখ্য নগর প্রাসাদ, মসজিদ, সরাইখানা, জলাশয়, পুল, ক্যানেল ইত্যাদি। তিনি দিল্লীর 'পঞ্চম নগরী' ফিরোজাবাদ নির্মাণ করেন সিরি'র উত্তরদিকে। এ ছাড়া ফতেহাবাদ, হিসার-ফিরোজ এবং জৌনপুর শহর ও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রখ্যাত প্রাসাদ-দুর্গ ও কোটাল-ফিরোজ শাহ তাঁর আর একগুচ্ছ স্থাপত্যকর্মের কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত।

তুঘলক স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য হল ঢালু দেওয়াল। এর ফলে তৎকালীন অট্টালিকাগুলি প্রায় দুর্গের মত শক্ত ও মজবুত হয়েছিল। অলংকরণের ক্ষেত্রে তুঘলকদের নতুনত্ব হল খিলানের সাথে চৌকাঠের সমন্বয়। অর্থাৎ এই সময়ের খিলানগুলি ছিল তীক্ষ্ণ এবং খিলানগুলির তলায় আড়াআড়ি ছিল একটি করে চৌকাঠ, যদিও সেগুলির ব্যবহারিক উপযোগিতা ছিল না।

ফিরোজ তুঘলকের আমলেই সুলতানি স্থাপত্যের অবক্ষয়ী রূপ পাচ্ছিল। এই সময় স্থাপত্যের অনগ্রসরতার কারণ হিসেবে অনেকগুলি বিষয় নির্দিষ্ট করা যায়। যেমন—(১) দক্ষ প্রস্তর কারিগরের অভাব (২) অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রকৌশলী জনশক্তি অভাব, (৩) মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের অস্থির নীতির ফলে সৃষ্টির কাজে নিরুৎসাহ ইত্যাদি।

১৩৯৮-৯৯ খ্রীষ্টাব্দে আমীর তৈমুর লঙ-এর আক্রমণ সাধারণভাবে উত্তর ভারতের সাংস্কৃতিক বিকাশ এবং নির্দিষ্টভাবে দিল্লী-সুলতানির স্থাপত্যকর্মের উপর বিরাট আঘাত হিসেবে উপস্থিত হয়। মূর্তিমান অভিশাপ তৈমুর ও তাঁর বাহিনীর দাপটে দিল্লীর অধিকাংশ শহর শ্মশানে পরিণত হয়। মানুষের তৈরী স্বর্গীয় শোভাযুক্ত অসংখ্য অট্টালিকা মাটির সাথে মিশে যায়। সৈয়দ বা লোদী বংশীয় সুলতানরা ইচ্ছা থাকলেও সময় ও শক্তির অভাবহেতু স্থাপত্যশিল্পের সেই গৌরবময় অধ্যায়ের পুনঃস্থাপন করতে ব্যর্থ হন। অবশ্য সীমিত রাজনৈতিক ও আর্থিক সামর্থ্যের মধ্যেও তাঁরা স্থাপত্যের স্বর্ণযুগকে ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট ছিলেন।

অধ্যাপক সুলতান আহমেদ-এর মতে, এ সময়ে যে সামান্যতম স্থাপত্যকর্ম গড়ে উঠেছিল তা প্রশমিত মননের প্রাণচাঞ্চল্যহীন অবদানরূপে প্রতিভাসিত হয়েছে। তেমনি কোন বৃহদাকার বা দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্য সৃষ্টি করা হয়নি। সৈয়দ ও লোদীদের স্থাপত্য চেতনায় যুগ-সন্ধিক্ষণের আভাস স্পষ্ট। ভাঙনের মুখে দাঁড়িয়ে শাসক ও প্রজাদের মানসিক প্রবণতা ছিল মৃতের কবরের উপর স্মৃতিসৌধ নির্মাণের প্রতি অধিক প্রবণতা। সৈয়দ বংশ (১৪১৪-'৫১ খ্রীঃ) ও লোদী বংশের (১৪৫১-১৫২৬ খ্রীঃ) আমলে কবরের উপর সৌধ নির্মাণের আন্তরিক প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এই সমাধি-সৌধগুলির অবয়ব ও স্থাপত্য শৈলী একরকম ছিল না। কোনটি সাধারণ উন্মুক্ত স্তম্ভায়িত সুদৃশ্য চন্দ্রাতপ আচ্ছাদিত, আবার কোনটি সুঅলংকৃত আবেষ্টনী প্রাচীর দ্বারা আবৃত এবং সুউচ্চ তোরণ দ্বারা সংযুক্ত। অষ্টভুজবিশিষ্ট এবং বর্গাকৃতি উভয় প্রকার সৌধ এই পর্বে নির্মিত হয়। তিনটি রাজকীয় অষ্টভুজ সমাধি-সৌধের মধ্যে দুটি সৈয়দ বংশ এবং একটি লোদী

বংশের কীর্তি। মোবারক সৈয়দ-এর সমাধি একটি বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ স্থাপত্য কাঠামো। মহম্মদ সৈয়দ-এর সমাধির ক্ষেত্রেও অনুরূপ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। কিন্তু সিকন্দার লোদীর মাকবারা একটি দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্য কর্ম। প্রতিটি অষ্টভূজ বাহুর মুখে তিনটি খিলান বিশিষ্ট দরজা আছে। এর মধ্যে মাঝের দরজাটি অপেক্ষাকৃত বড়।

সৈয়দ ও লোদী আমলে নির্মিত অন্যান্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সমাধি-সৌধ হল—(১) বড় খান-কা-গম্বুজ, (২) ছোট খান-কা-গম্বুজ, (৩) বড় গম্বুজ (১৪৯৪ খ্রীঃ), (৪) শীষ গম্বুজ, (৫) দাদী-কা-গম্বুজ, (৬) শিহাবউদ্দিন তাজ খান-কা-গম্বুজ ইত্যাদি। এই পর্বে সরকারীভাবে শাসকদের উদ্যোগ ও অর্থসাহায্যে কোন জামি মসজিদ নির্মিত হয়নি। অবশ্য বেসরকারী. উদ্যোগে সমাধি-সৌধের পাশে পাশে কয়েকটি জামি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। এধরনের একটি নির্মাণ হল মট-কা-মসজিদ। সিকন্দার লোদীর প্রধানমন্ত্রী ১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দে এটি নির্মাণ করেন। এর কয়েক বছর আগে নির্মিত হয় বড় গম্বুজ মসজিদ (১৪৯৪ খ্রীঃ)। সম্ভবত মাখদুমা-ই-জাহান নামক জনৈক-মহিলা এটি নির্মাণ করেছিলেন। পূর্বযুগে ব্যবহৃত স্থাপত্যশৈলীর কিছু বৈশিষ্ট্য এর নির্মাণে প্রকাশ পেয়েছে। এখানে বিকাশমান পর্যায়কে পার্সি ব্রাউন যুক্তিসম্মত শিল্পসত্তার বিকাশ' (logical development) বলেছেন। আনুমানিক ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে সিকন্দার লোদীর প্রধানমন্ত্রী 'মট-কা-মসজিদ' নির্মাণ করেন। তবে ***মি. স্টিফেন ও ব্রাউনের*** মতে, এর নির্মাণকাল যথাক্রমে ১৪৮৮ ও ১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দে। স্যার ***জন মার্শালের*** মতে --*"মট-কা-মসজিদটি ছিল শেষ পর্বের সর্বোৎকৃষ্ট স্থাপত্যসৃষ্টি।"*

লোদীদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই স্থাপত্যে শিল্পীদের কল্পনার স্বাধীনতা, নকশার বৈচিত্র্য, আলোছায়ার অপূর্ব সমন্বয় এবং রেখা ও রং-এর অপূর্ব সাযুজ্য লক্ষণীয়। এই মসজিদের সৌন্দর্য ও অভিব্যক্তির প্রশংসা করে তিনি লিখেছেন ঃ *"The mosque epitomises in itself all that is best in the architecture of the Lodies; and displays a freedom of imagination, a bold diversity of design, on appreciation of constracting light and a sense of harmony in line and colour which combine to make it one of the most spirited and picturresque buildings of its kind in the whole range of Islamic art."*

○ আঞ্চলিক স্থাপত্য ঃ

দিল্লীর সুলতানি সাম্রাজ্যের ভাঙনের সূত্রে যেমন একাধিক আঞ্চলিক স্বাধীন রাজ্য গড়ে উঠে, তেমনি ঐ সকল আঞ্চলিক রাজ্যের নিজস্ব স্থাপত্য-রীতি গড়ে উঠে। দিল্লীর সুলতানদের স্থপত্যকর্মের মত এত বিশাল ও ব্যাপক না হলেও, ইন্দো-ইসলামীয় স্থাপত্যধারার নিদর্শন হিসাবে এদের গুরুত্ব কম নয়। এই সব আঞ্চলিক স্থাপত্যে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য ও স্থাপত্যরীতির প্রভাব ছিল লক্ষণীয়। স্থানীয় উপকরণ এবং শিল্পী-কারিগরদের সহায়তায় গড়ে ওঠা এই সকল স্থাপত্যকর্মেও শিল্পীদের নিষ্ঠা ও সৌন্দর্যবোধের পরিচয় পাওয়া সম্ভব। বাংলাদেশ, জৌনপুর, গুজরাট, মালব ও দক্ষিণ ভারতের বাহমনী ও বিজয়নগর রাজ্যে স্থানীয় স্থাপত্যের বহু নিদর্শন আজও কালের সাক্ষী হয়ে কোনক্রমে দাঁড়িয়ে আছে।

● **পাঞ্জাব ঃ** ভারতে আঞ্চলিক স্তরে মুসলিম স্থাপত্যের প্রাচীনতম ক্ষেত্র হল পাঞ্জাব। পাঞ্জাবে মুলতান ও লাহোরকে কেন্দ্র করে ইসলামী সভ্যতা গড়ে ওঠে। অবশ্য এই দুটি নগরে স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য অনুরূপ ছিল না। মূলতানে যেসব স্থাপত্যশিল্প সৃষ্টি হয়েছিল তা আরব ও পারস্য সংস্কৃতি থেকে উৎসারিত। অন্যদিকে লাহোরে গড়ে ওঠা স্থাপত্য ও সংস্কৃতি গজনী ও সেলজুক্ তুর্কী বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রভাবিত। ***মিচেল*** (G. Michell)-এর ভাষায় ,*'The architecture of Multan blossomed from a blending of indegenous Indian building tradition and culture likes with southern Iron....*[1] সামগ্রিকভাবে এই দুটি ধারাকেই একত্রে 'পাঞ্জাব-স্থাপত্য' হিসেবে গণ্য করা হয়। ইমারতগুলির নির্মাণ উপকরণ ছিল ইট। ইটের দেওয়াল অতিরিক্ত মজবুত করার জন্য কড়ি বা বর্গা দেওয়ালের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হত। বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা ঝুল বারান্দা (Balcony) নির্মিত হত। মূলতান ও লাহোরের সমাধি-সৌধগুলির নির্মাণ বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে **পার্সি ব্রাউন** লিখেছেন যে, এখানে আরবীয় পারসিক ও ভারতীয় এই তিনটি সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটেছে (*"In the style the mausoleum represents three pattern of culture Arabian, persian and Indian."*

● **বাংলা ঃ** বাংলার স্বাধীন ও অর্ধস্বাধীন মুসলিম রাজবংশগুলি রাজ্যের নানাস্থানে প্রশাসনিক কেন্দ্র গড়ে তুলেছিল। নদীমাতৃক বাংলার মুসলিম স্থাপত্যের খুব কমই এখন টিকে আছে। যেগুলি আছে তাদের অবস্থাও জরাজীর্ণ। মূলত গৌড় ও পাণ্ডুয়াকে কেন্দ্র করেই বাংলার মুসলিম স্থাপত্য বিকশিত হয়। বাংলার মুসলিম স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্যের ক্রম পরিবর্তনের ভিত্তিতে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়—(১) ১২০২থেকে ১৩৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে নির্মিত স্থাপত্য যার অধিকাংশই গৌড় নগরীতে অবস্থিত, (২) ১৩৪০--১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কাল যখন স্থাপত্যকর্ম পাণ্ডুয়াতে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। (৩) তৃতীয় তথা শেষ পর্বের সময়কাল ১৪৪২ থেকে সুলতানি সাম্রাজ্যের অবসানকাল পর্যন্ত প্রসারিত। এই সময় স্থাপত্য কর্মের কেন্দ্র পুনরায় রাজধানী গৌড়ে সরে গিয়েছিল। প্রথম পর্বের ইমারতগুলি ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম ও হুগলীর পাণ্ডুয়াতে নির্মিত হয়। এই সময় ইট ও পাথর দিয়ে গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ নির্মিত হয়। এগুলির কোন বুরুজ বা কার্নিস ছিল না। মসজিদের মিহরাবের মধ্যে টেরাকোটার অলংকরণ থাকত।

বাংলায় সুলতানি স্থাপত্যের দ্বিতীয় ধাপে গুরুত্বপূর্ণ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। এই স্থাপত্য কর্মে মুসলিম স্থপতিদের নিজস্ব আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিফলন দেখা যায়। পাণ্ডুয়ার **আদিনা মসজিদ** এই পর্বের একটি অনবদ্য স্থাপত্য নিদর্শনরূপে অভিহিত হয়। সুলতান সিকন্দার শাহ ১৩৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর নতুন রাজধানীর (পাণ্ডুয়া) কেন্দ্রস্থলে এই মসজিদ নির্মাণ করেন। আদিনা মসজিদের প্রাঙ্গণটি সুবিস্তৃত আয়তাকার এবং অসংখ্য খিলানায়িত পথ দ্বারা পরিবেষ্টিত। এর অঙ্গনের পরিমিতি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে যথাক্রমে ৪০০ ফুট ও ১৩০ ফুট। মসজিদের ছাদের সমস্ত ভার ২৬০ টি স্তম্ভের উপর স্থাপিত। মসজিদের সামগ্রিক দৈর্ঘ্য ৫০৭.৫ ফুট ও প্রস্থ ২৮৫.৫ফুট। দামাস্কাসে নির্মিত আদি মসজিদের সাথে আদিনা মসজিদের সীমানা প্রায় সমান। প্রাঙ্গণের অভ্যন্তর ভাগ ৮৮টি স্তম্ভনির্ভর একটানা খিলান পর্দা দ্বারা শোভিত। মসজিদের প্রবেশ পথটি

তুলনামূলকভাবে অপরিসর ও ভ্রান্তস্থানে পরিকল্পিত। বিশাল মসজিদের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে তিনটি খিলানায়িত প্রবেশদ্বারটি বাইরের দিকে উন্মুক্ত। মসজিদের বিশাল জুল্লাহ বা মুসল্লাটি পশ্চিম অংশে স্থাপিত। এটি এখন ছাদ বিহীন অবস্থায় আছে। আড়াআড়ি ভাবে পাঁচসারি খিলান পথের সাথে অবস্থিত। এটি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে যথাক্রমে ৭০ ফুট ও ৩৪ ফুট। মসজিদের উপরাংশের খিলান ও গম্বুজ মূলত ইট দ্বারা নির্মিত। তবে সামনের দেওয়ালের উপকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে মসৃণ ঘোর কৃষ্ণবর্ণের পাথর ব্যবহৃত হয়েছে। তবে এই প্রস্তরখণ্ডগুলি নতুন নয়। সম্ভবত লক্ষণাবতী বা নিকটবর্তী কোন হিন্দুস্থাপত্যের কাঠামো থেকেই এগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে। ড. **সুলতান আহমদ**-এর মতে প্রথম পর্যায়ের মুসলিম স্থাপত্যের উপকরণগুলি অধিকাংশই হিন্দু স্থাপত্য থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। আদিনা মসজিদের অভ্যন্তর দেওয়ালে খোদাই করা প্রস্তরখণ্ড মূর্তির ছাপযুক্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে, যা এই মত সমর্থন করে। মসজিদের দরজাগুলি সবই প্রয়োজন অনুসারে পুরানো স্থাপত্য থেকে সংগ্রহ করে এসে বসানো হয়েছে। লক্ষণাবতীর সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা ধ্বংস করে সম্ভবত এগুলি সংগ্রহ করা হয়েছিল।

আদিনা মসজিদের চোরাকুঠরিটি খুবই সৌষ্ঠবময়। এর সৌন্দর্য ও অলংকরণ মানবমনের সৌন্দর্যানুভূতির অনবদ্য প্রকাশ রূপে বিবেচিত হবে। এর মিহরাবটি সম্ভবত বৌদ্ধ বা হিন্দু মন্দিরের পবিত্র বিগ্রহের অধিষ্ঠানের ক্ষেত্র ছিল। ***পার্সি ব্রাউন*** লিখেছেন যে, *"সামান্য রদবদলের পর বৌদ্ধ স্তূপের ডিঙি নৌকার মত কুলঙ্গি বা হিন্দু মন্দিরের অলংকৃত ডিভাগোস্তাকে (Devagosta) মুসলিম মিহরাব হিসেবে আদিনা মসজিদে স্থাপন করা হয়েছে।"* সামগ্রিকভাবে আদিনা মসজিদ রাজকীয় মর্যাদা, গাম্ভীর্য ও শিল্পচর্চার উৎকর্ষতা সম্পন্ন একটি শিল্পসৃষ্টি হিসেবে স্বীকৃত।

বাংলার সুলতানি স্থাপত্য শিল্প বিকাশের তৃতীয় পর্যায়ে (১৪৪০-১৫২৬ খ্রীঃ) নতুন স্থাপত্য ধারার সূচনা ঘটে। ইতিমধ্যে বাংলার স্থাপত্য শিল্পে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছিল। এখন বাংলার আর্দ্র জলবায়ুর উপযোগী স্থাপত্য সৃষ্টির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়। ছাদের জল দ্রুত অপসারণের জন্য ঢালু ছাদ ও বক্র কারনিসের সংযোজন ঘটে। তৃতীয় পর্বের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য সৃষ্টি হল ***একলাখি সমাধি*** (১৪২৫ খ্রীঃ), ***দাখিল দরওয়াজা*** (১৪৫৯-৭৪ খ্রীঃ), ***তাঁতিপাড়া মসজিদ*** (১৪৭৫ খ্রীঃ), ***ছোটসোনা মসজিদ*** (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ), ***সুরা মসজিদ*** (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ), ***বড়সোনা মসজিদ*** (১৫২৬ খ্রীঃ), ***কদম রসুল মসজিদ*** (১৫৩০ খ্রীঃ) ***ইত্যাদি।***

সুলতান জালালউদ্দিন মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে (১৪১৪-'৩১ খ্রীঃ) একলাখি স্মৃতি সৌধটি নির্মিত হয় (১৪২৫ খ্রীঃ)। এখানে সুলতানি স্থাপত্য শৈলীর তৃতীয় ধারার প্রথম প্রকাশ দেখা যায়। এর ভিত্তি বর্গাকার। প্রতি পার্শ্ব ৭৬ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং উচ্চতা কারনিস পর্যন্ত ২৫ ফুট। এর উপরে আছে ৪০ ফুট ব্যাসার্ধের গোলাকার গম্বুজ। চূড়া অষ্টভুজাকৃতি। দূর থেকে দেখলে মনে হয় দ্বিতল বিশিষ্ট। প্রকোষ্ঠের উন্মুক্ত স্থানগুলি সুচারুরূপে অলংকৃত। তবে অলংকরণের জন্য কোন লতা-পাতার নকশা ব্যবহৃত হয়নি। প্রতি পার্শ্বের মাঝখানে প্রস্তর নির্মিত দরজা। মূল কবরের প্রকোষ্ঠের গড়ন অষ্টভুজাকৃতি এবং এখানে কোন জানালা নেই। দরজার

উপর দিয়ে আলো প্রবেশের ব্যবস্থা আছে। দাখিল দরওয়াজা একটি বিজয় তোরণ হিসেবে গৌড় দুর্গের উত্তর প্রাকারের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। সুলতান বারবাক শাহ আনুমানিক ১৪৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এটি নির্মাণ করেন। এর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা হল ১১৩ফুট × ৭৩ ফুট ৪ ইঞ্চি × ৬০ ফুট। বিশালাকার এই নির্মাণ মুসলিম শাসকদের বিপুলাকার স্থাপত্য সৃষ্টি দ্বারা চমক জাগানো মানসিকতার পরিচয় দেয়। গৌড়ের ***তাঁতিপাড়া মসজিদ*** ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়। এর বহির্ভাগ দৈর্ঘ্যে ৯১ ফুট এবং প্রস্থে ৪৪ ফুট। আয়তাকার এই মসজিদের দেওয়াল গড়ে ৬ফুট। নির্মাণশৈলী ও স্থায়িত্বের বিচারে এটি দাখিল দরওয়াজা থেকে অনেক উন্নত। সৌন্দর্যময়তার দিক থেকে ছোটসোনা মসজিদ অনবদ্য। আলাউদ্দিন হুসেন শাহের রাজত্বকাল জুড়ে এর নির্মাণকাজ চলেছিল। **পার্সি ব্রাউনের** মতে, ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে এর নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছিল। আয়তাকার এই মসজিদের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের পরিধি ৮২ ফুট × ৫২ ফুট। মসজিদ কাঠামোর চার কোণায় চারটি অষ্টভুজাকৃতি বুরুজ (Tower) শোভা আছে। শীর্ষে আছে ১২টি গম্বুজ। মাঝখানের ছাদ বাংলার আদি কুঁড়েঘরের চৌচালার আদলে নির্মিত। ঘোড়াঘাটা দুর্গের (দিনাজপুর জেলা) ৭ কিলোমিটার পশ্চিমে সুরা মসজিদ নির্মিত হয়। বর্গাকার সুরা মসজিদের নামাজগৃহের প্রতি বাহুর অভ্যন্তরীণ পরিমাপ ৪.৯০ মিটার। মোট আটটি প্রস্তর স্তম্ভের উপর সুবিশাল একটি ইট দ্বারা নির্মিত গম্বুজ আছে। দেওয়ালে ফুল ও লতাপাতার অলংকরণ-এর শোভা বৃদ্ধি করেছে। অধ্যাপক ***দানি*** (A.H.Dani)-র মতে, এটি হুসেন শাহের আমলে নির্মিত হয়েছিল।

গৌড়ের মসজিদগুলির মধ্যে বৃহত্তম ছিল ***বড়সোনা মসজিদ***। বর্গাকার এই নির্মাণের সম্মুখভাগের দৈর্ঘ্য ২০০ ফুট। এর উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ দিকের মাঝবরাবর একটি করে খিলানবিশিষ্ট তোরণদ্বার আছে, নির্মাণ উপকরণ হিসেবে এখানে ইট ও পাথর উভয় উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে। মূল মসজিদটি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ১৬৮ × ৭৬ ফুট। মসজিদের নামাজঘর তিনটি খিলানায়িত আইলে বিভক্ত। মূল মসজিদের অংশ বিশেষ কারুকার্য শোভিত। অলংকরণের উপকরণ হিসেবে উজ্জ্বল মিনা করা বহু বর্ণের টালি ব্যবহৃত হয়েছে। বড়সোনা মসজিদের বহিরাঙ্গ দৃষ্টিনন্দন নয়, কিন্তু এর সারল্য মনোমুগ্ধকর। ***ফারগুসনের*** (J.Ferguson)-এর মতে, *"এখনো টিকে থাকা গৌড়ের স্থাপত্য কীর্তিগুলির মধ্যে বড়সোনা মসজিদ বাংলা স্থাপত্যের একটি সুন্দর ও অনবদ্য হর্ম।"*[1] **জন মার্শালের** মতে, এই মসজিদের নকশা দ্রাবিড় স্থাপত্যের অনুরূপ। তাই অনেকে এটিকে দ্রাবিড় স্থাপত্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত সৃষ্টি বলে মনে করেন। গৌড়ের কদম রসুল মসজিদের নির্মাণ উপকরণ স্থূল এবং সম্ভবত এগুলি হিন্দু ইমারত থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

● **জৌনপুর স্থাপত্য ঃ** জৌনপুর সুলতানি পাশ্চাত্যের অন্যতম অঙ্গরাজ্য ছিল। এই অঞ্চলের শাসক তুঘলক আমলে ***'মালিক-আস-শার্ক'*** বা ***'প্রাচ্যের রাজা'*** উপাধি পান। কালক্রমে শার্ক বংশীয় সুলতান দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করে জৌনপুরে স্বাধীন শার্কী বংশের শাসন শুরু করেন। শার্কী বংশের আমলেই এখানে স্থাপত্যচর্চা হয়। *ড.* ***ঈশ্বরীপ্রসাদের*** মতে, *"জৌনপুরের*

সুলতানরা শিক্ষা ও শিল্পের একান্ত অনুরাগী ছিলেন। তাঁদের নির্মিত একাধিক অট্টালিকা ও মসজিদ তাঁদের সু-উন্নত স্থাপত্য রুচির পরিচয় বহন করে।" তবে এখানেও দুর্গ ও কয়েকটি মসজিদ ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোন স্থাপত্যকর্ম দেখা যায় না। যাই হোক, জৌনপুরের শাসকরা প্রজাদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ দিতে কার্পণ্য করতেন না। তাঁরা স্বল্পকালের মধ্যেই সুন্দর প্রাসাদ, মসজিদ, মাকবারা ইত্যাদি নির্মাণ করে রাজধানীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন। জৌনপুর স্থাপত্যের একটি উল্লেখযোগ্য কাঠামো হল ***অটলা মসজিদ***। সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক একদা এর ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। ১৪০৮ খ্রীষ্টাব্দে জৌনপুরের শার্কী শাসক শামসউদ্দিন ইব্রাহিম এটির নির্মাণ সম্পূর্ণ করেন। ১৭৭ ফুট ব্যাসযুক্ত বর্গাকার অঙ্গন নিয়ে এটি গঠিত। অটলা মসজিদ নামকরণ থেকে অনুমিত হয় যে, সম্ভবত অটলাদেবী নামক কোন মন্দির থেকে এর উপকরণ সংগৃহীত হয়েছিল। এর নির্মাণশৈলী প্রচলিত মসজিদ স্থাপত্যের অনুরূপ। তিনদিকে ৪২ ফুট লম্বা ছাদযুক্ত বারান্দা এবং পশ্চিম দিকে মুল্লাহ অবস্থিত। অটলা মসজিদের জুল্লাহ বা নামাজঘরটি খুবই সুদৃশ্য। সামনের দেওয়াল জৌনপুরের শিল্পকর্ম দ্বারা শোভিত। মধ্যপ্রান্তে সুউচ্চ পিরামিড সদৃশ তোরণ, যার উচ্চতা প্রায় ৭৫ফুট। এই মসজিদের গঠন-বৈশিষ্ট্য থেকে শিল্পসমালোচকরা মনে করেন যে এখানে তুঘলক স্থাপত্যশৈলী অনুকরণের আন্তরিক চেষ্টা করা হয়েছে। জৌনপুরের অন্যদুটি স্থাপত্য সৃষ্টি হল 'খালেছ মোঘলেছ মসজিদ' এবং 'জাহাঙ্গীরি মসজিদ'। অত্র অঞ্চলের দুজন শাসক মালিক খালেছ ও মোঘলেছ-এর নির্দেশে প্রথমটি নির্মিত হয়েছিল। এর গঠনশৈলী ও অলংকরণ অতি সাধারণ। দ্বিতীয় মসজিদটির খিলান তোরণে মসৃণ পর্দাযুক্ত থাকার কারণে একে জাহাঙ্গীরি (পর্দা) মসজিদ বলা হয়। এর নির্মাতারা ইমারতের সমুদয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুষমতার প্রতি যত্নবান হননি। তাই এর সৌন্দর্যময়তার সাথে কাঠামোর অসামঞ্জস্যতা চোখে পড়ে। ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক কাময়ু নামক হিন্দু স্থপতি ***লাল দরওয়াজা মসজিদটি*** নির্মাণ করেছিলেন। শার্কীবংশের সর্বশেষ শাসক হোসেন শাহ ১৪৭০ খ্রীষ্টাব্দে জৌনপুরে জাম মসজিদ নির্মাণ শুরু করেন। এই নির্মাণকে জৌনপুরের সর্বাধিক উচ্চাভিলাষী স্থাপত্য সৃষ্টি বলা হয়। ***সতীশ গ্রোভারের*** মতে, এই মসজিদের গড়ন ও বিশালত্ব থেকে প্রতীয়মান হয় যে এটি সম্পূর্ণ হতে অন্তত এক যুগ সময় লেগেছিল ("This is apparent from the form and shape of the great Jami Mosjid of Jaunpur that took over a generation to complete")। ২০ ফুট উঁচু বেদীর উপর মসজিদটি স্থাপিত। বর্গাকার মসজিদ গৃহের প্রতি পার্শ্বের দৈর্ঘ্য ২১ ফুট। ক্রমোন্নত সিঁড়ি বেয়ে মসজিদে প্রবেশ করতে হত। এই সোপান বিশিষ্ট নির্মাণ পদ্ধতি ফিরোজশাহ তুঘলকের আমলে প্রথম পরিলক্ষিত হয়। মসজিদের নামাজঘরের ঠিক সম্মুখ ভাগে প্রশস্ত প্রবেশ পথটি অবস্থিত। বিশাল মসজিদের অভ্যন্ত ভাগ স্তম্ভ বা অন্য কোনরকম আলম্ব দ্বারা ভারাক্রান্ত নয়। এ ধরনের উন্মুক্ত স্থাপত্য কাঠামো অন্যত্র চোখে পড়ে না। আদিনা মসজিদের সাথে এর কিছুটা মিল দেখা যায়। তবে আদিনার ইট নির্মিত স্থাপত্য কাঠামো প্রায় মাটিতে মিশে গেছে। কিন্তু জৌনপুরের ধনুকাকৃতি ছাদ এখনো অক্ষত আছে।

● **গুজরাট স্থাপত্য ঃ** গুজরাটে সুলতানি স্থাপত্যের সূচনা হয় চতুর্দশ শতকের গোড়ায়। সুলতান আলাউদ্দিন খলজীর প্রাদেশিক গভর্নর উলুঘ খাঁ তৎকালীন রাজধানী অনহিলওয়াড়া-

পাটনা শহরকে কেন্দ্র করে স্থাপত্য গড়তে শুরু করেন। এই স্থাপত্য ধারা অব্যাহত ছিল ষোড়শ শতকের শেষ দিকে গুজরাটের স্বাধীন আহমদশাহী বংশের অবসানকাল পর্যন্ত। এই বংশের স্বাধীন শাসনের সূচনা করেন মুজফ্‌ফর শাহ (১৪০৭ খ্রীঃ)। এই বংশের রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বেশী। এঁরা স্থাপত্য সৃষ্টির কাজে ধারাবাহিক ভাবে আগ্রহ দেখায়। অবশ্য শিল্পকলা বা সৌন্দর্যপ্রীতি থেকে তাঁরা এই কাজে ব্রতী হয়েছিলেন তা নয়। তাঁদের ক্ষমতার প্রতীক হিসেবে এগুলি নির্মিত হয়েছিল। তবে প্রাদেশিক মুসলিম স্থাপত্যের ইতিহাসে গুজরাটের মুসলিম স্থাপত্য অবশ্যই দৃষ্টিনন্দন। গুজরাটে ভারতের সবচেয়ে পারদর্শী কারিগর ও স্থপতিদের বসবাস ছিল। এই সকল দক্ষ স্থানীয় কারিগরদের যোগান গুজরাটে স্থাপত্যের বিকাশে সহায়ক ছিল। প্রাথমিক পর্বের স্থাপত্য কর্মগুলিতে প্রচলিত ' শীলপাস' (Silpas) রীতি অনুসৃত হত। পরবর্তী পর্যায়ে মুসলমান স্থপতিদের সহযোগী হিসেবে হিন্দু স্থপতিরা শিল্প সৃষ্টিতে যুক্ত হতেন।

গুজরাটে সুলতানি স্থাপত্যের প্রথম পর্বের পরিধি ১৩০০ থেকে ১৪১১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। এই সময় পাটনে শেখ ফরিদের সমাধিসৌধ ও একটি আদিনা মসজিদ নির্মিত হয়। এই সকল নির্মাণের উপকরণ হিন্দুমন্দির থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। পুরানো উপাদাননির্ভর এই দুটি স্থাপত্য দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। একই ধরনের আর একটি নির্মাণ হল ভারুচ (ব্রোচ)-এর জামি মসজিদ। অবশ্য হিন্দু বা জৈন মন্দির থেকে স্তম্ভগুলি সংগ্রহ করা হলেও মসজিদে সেগুলি হুবহু ব্যবহার করা হয়নি। নতুন কাঠামোর প্রয়োগ অনুসারে সেগুলিতে পরিবর্তন ঘটানো হয়। ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রধান প্রশাসনিক কেন্দ্র ভারুচ থেকে ক্যাম্বে শহরে স্থানান্তরিত হলে এই বন্দর শহরে স্থাপত্য নির্মাণ শুরু হয়। স্থানীয় গভর্নর মহম্মদ বুতমারী ক্যাম্বেতে জামি মসজিদ নির্মাণ করেন। আয়তাকার ক্যাম্বে মসজিদের চৌহদ্দি উত্তর-দক্ষিণে ৭৬.৮০ মিটার এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৬৪.৬০ মিটার ছিল। মসজিদের মূল নামাজ গৃহ ৭আইল ও ২৭ টি 'বে' (Bay) তে বিভক্ত ছিল। এর চূড়ায় ছিল ১৪টি গম্বুজ। এই মসজিদের নির্মাণশৈলী ও পদ্ধতির সাথে খলজী আমলের স্থাপত্যশৈলীর প্রচুর মিল দেখা যায়।

গুজরাট স্থাপত্যের দ্বিতীয় পর্বের পরিধি ১৪১১-'৫৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। সুলতান প্রথম আহমদ শাহর (১৪১১-'৪২ খ্রীঃ) ক্ষমতালাভের সঙ্গে সঙ্গে গুজরাটে স্থাপত্যচর্চার পরিবেশ ফিরে আসে। তিনি ১৪১১ খ্রীষ্টাব্দে নিজ নামে আহমেদাবাদ শহর প্রতিষ্ঠা করে রাজধানী সরিয়ে আনেন। এই দুর্গনগরী আয়তাকার পরিবেষ্টন সহ নদীর তীর বরাবর প্রলম্বিত। দুর্গের প্রধান ফটকের অনতিদূরে রাজকীয় বিজয় তোরণটি স্থাপিত। আহমদ শাহের আমলে চারটি মসজিদ নির্মিত হয়—*সৈয়দ আলম মসজিদ* (১৪১২ খ্রীঃ), *আহমদ শাহ মসজিদ* (১৪১৪ খ্রীঃ), *হায়রৎ খাঁর মসজিদ* (১৪২৪ খ্রীঃ) এবং *আহমেদাবাদ জামি মসজিদ* (১৪২৪ খ্রীঃ)। আহমদ শাহ তিন দরজা নামক একটি স্থাপত্য কাঠামো নির্মাণ করেন। এটি হল প্রাসাদের প্রবেশ মুখের সম্মুখস্থ সদর দরজা। মন্ত্রী, অমাত্য সহ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ রাজদরবারে প্রবেশের প্রাক্কালে এখানে সমবেত হতেন। সম আকারের তিনটি দরজা দ্বারা এটি সুসজ্জিত। মাঝের দরজাটি সুন্দর ও মজবুত ভাবে ঢালাই করা মিনার দ্বারা সমর্থিত। এছাড়াও আহমদ শাহর সমাধি, রানী-কা, হুজরা, দরিয়াখানের সমাধিসহ অসংখ্য মসজিদ ও সমাধি-সৌধ এই পর্বের স্থাপত্যধারাকে সমৃদ্ধ করেছিল।

গুজরাট স্থাপত্যের তৃতীয় পর্বের সূচনা হয় সুলতান মাহমুদ বাগড়ার শাসনকালে (১৪৫৮-১৫১১ খ্রীঃ)। তিনি চম্পানীর, মাহমুদাবাদ ও জুনাগড় শহর প্রতিষ্ঠা করে বহু সুদৃশ্য ইমারত ও পথঘাট দ্বারা শোভিত করেন। এই পর্বে চম্পানার জামি মসজিদ, নাগিনা মসজিদ, শাহী মসজিদ, নওলাখি মসজিদ ইত্যাদি নয়ন মনোহর স্থাপত্য সৃষ্টি সম্পন্ন হয়। সোপানবিশিষ্ট কূপ নির্মাণের কাজেও এযুগের কারিগররা বিশেষ দক্ষতা দেখান।

● **মালোয়া (মালব) স্থাপত্য ঃ** মালোয়া চতুর্দশ শতকের শেষ পর্যন্ত দিল্লী সুলতানির অধীনে ছিল। ১৪০১ খ্রীষ্টাব্দে মালোয়ার সুবাদার দিলওয়ার খাঁ ঘোরী শাহ উপাধি নিয়ে স্বাধীন শাসনের সূচনা করেন। তাঁর পুত্র হুমাং শাহুর (আদি নাম আলবা খাঁ)-এর আমলে মালোয়াতে ইসলামিক স্থাপত্যের নতুন যুগের সুচনা হয়। মালোয়াতে স্থাপত্য চর্চার দুটি প্রধান কেন্দ্র ছিল ধর ও মাণ্ডু। তবে এই দুটি শহরে কোন শিল্প ঐতিহ্য ছিল না। ফলে এখানে স্থাপত্য চর্চার জন্য বহিরাগত স্থপতি ও কারিগরদের উপর নির্ভর করতে হয়। ইতিমধ্যে তৈমুর লঙের আক্রমণের ফলে দিল্লীর সুলতানদের রাজনৈতিক ও আর্থিক প্রতিপত্তি এতটাই বিনষ্ট হয়েছিল যে, স্থাপত্যচর্চার মত মানসিকতা ও আর্থিক সঙ্গতি তাঁরা হারিয়ে ফেলেছিলেন। এই অবস্থার সুযোগ পায় মালোয়া। রাজধানী দিল্লীর এই সকল কর্মহীন কারিগর জীবিকার সন্ধানে মালোয়া, গুজরাট প্রভৃতি প্রাদেশিক রাজ্যগুলিতে পাড়ি দেয়। ***পার্সি ব্রাউন*** মনে করেন যে, মালোয়ার স্থাপত্য কর্মগুলির সাথে দিল্লীর স্থাপত্যশৈলীর সাযুজ্যের ভিত্তিতে মালোয়ার স্থাপত্যে দিল্লীর স্থপতিদের অবদানের ধারণা করা যায়।

মালোয়া-স্থাপত্যে ইমারতগুলি সুউচ্চ ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত। ক্রমোন্নত সোপান বেয়ে মূল মেঝেতে আসতে হত। এই সুউচ্চ চত্বর সমগ্র কাঠামোকে একটা বিশেষ মর্যাদা ও আভিজাত্য মণ্ডিত করেছে। সোজা ও ঊর্ধ্বমুখী এই কাঠামোর অনন্য বৈশিষ্ট্য হল বিচিত্র রঙের কারুকার্য দ্বারা অলংকরণ। কালের নিয়মে এই সকল রঙ এখন অনেকটাই ম্লান। তথাপি অবশিষ্ট নিদর্শন সেকালের শিল্পীদের সৌন্দর্যরসিক মানসিকতার সাক্ষ্য দেয়। রঙ করার জন্য নানা রঙ-এর পাথর ও মার্বেল ব্যবহার করা হত। এছাড়া মাটির ঢালিকে আগুনে পুড়িয়ে রঙিন করে তোলা হত এবং পরে তারা নানা খণ্ড ইমারতের দেওয়ালে লাগানো হত। ইমারতের মূল উপকরণ হিসেবে বেলে পাথর ও স্নিগ্ধ লাল আভাযুক্ত বেলে পাথর ব্যবহৃত হত। মালোয়ার প্রথম পর্বের স্থাপত্য সৃষ্টিগুলির অন্যতম চারটি মসজিদ। এগুলি হল ধরের (১) ***কামাল মওলা মসজিদ*** ও (২) ***লাট মসজিদ***। দুটিই ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়। অন্য দুটি মসজিদ (৩) ***দিলোয়ার খাঁর মসজিদ*** (১৪০৫ খ্রীঃ) এবং (৪) ***মালিক মুগিম মসজিদ*** (১৪৫২ খ্রীঃ) নির্মিত হয় মাণ্ডুতে।

মাণ্ডুতে মালোয়ার রাজধানী স্থানান্তরিত হলে সেখানে ব্যাপক স্থাপত্য নির্মাণ ঘটে এবং মালোয়া স্থাপত্যের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়। হুসাং শাহের আমলে এই কাজের সূচনা হয়। রাজধানী স্থানান্তরের প্রকৃত লক্ষ্য ছিল সুপ্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা। তাই মাণ্ডু নগর দুর্গের চতুর্দিকে সুউচ্চ, মজবুত প্রাচীর এবং বহির্দিকে প্রসারিত তোরণের উপর প্রহরা চৌকির ব্যবস্থা দ্বারা এই নির্মাণকে স্মরণীয় করেছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২ হাজার ফুট উচ্চতায় অবস্থিত দুর্গনগরীর মাণ্ডুর পরিধি প্রায় ৪০ বর্গকিলোমিটার। এখানকার গুরুত্বপূর্ণ ইমারতগুলির মধ্যে সর্বাধিক চিত্তাকর্ষক স্থাপত্য কর্মটি হল ***মাণ্ডু জামি মসজিদ***। বর্গাকার এই মসজিদ সুলতান প্রথম মাহমুদ

শাহ ১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মাণ করেন। এছাড়া স্বতন্ত্র তিনটি কাঠামোর সমন্বয়ে গড়ে ওঠা যৌগিক স্থাপত্য আশরাফি মহল ও মাণ্ডুর দৃষ্টি নন্দন একটি স্থাপত্য কর্ম। প্রথমে মহাবিদ্যালয় হিসেবে এটি পরিকল্পিত হয়। পরে প্রশাসনিক ভবন হিসেবে ব্যবহারের জন্য এর কিছু রদবদল ও সংযোজন করা হয়। অবশেষে এই যৌগিক ইমারতের এক অংশের উপর রাজকীয় স্মৃতি সৌধ নির্মাণ করা হয়। পার্সি ব্রাউনের মতে, এই ইমারতের গাঁথুনি বা নির্মাণ প্রক্রিয়া অলংকরণ দ্বারা সমৃদ্ধশালী করা হলে এই সমাধি-সৌধ মুসলিম স্থাপত্যের এক অনিন্দ্যসুন্দর কীর্তি রূপে চিহ্নিত হয়ে থাকত। ১৪৪৩ খ্রীষ্টাব্দে এই স্থাপত্য কাঠামোর সাথে একটি বিজয়স্তম্ভ যোগ করা হয়. চিতোরের রানাকে পরাজিত করার গৌরবের সাক্ষ্য হিসেবে সুলতান মাহম্মদ উত্তর-পূর্ব কোনাকে ১৫০ ফুট উঁচু করে এই বিজয়স্তম্ভ রচনা করেন। তবে দ্রুততার সাথে এবং যথেষ্ট মজবুত রূপে নির্মাণ না করার কারণে বর্তমানে এর কেবল ভিত্তিটুকু অবশিষ্ট আছে। মাণ্ডুতে নির্মিত আর একটি স্মরণীয় স্থাপত্য কর্ম হল হুসাংশাহের সমাধি। তিনি স্বয়ং এটির সূচনা করেন এবং সমাপ্ত করেন তাঁর বংশধর মাহমুদ (১৪৪০ খ্রীঃ)।

মাণ্ডুতে আদি পর্বের স্থাপত্য শৈলীতে নির্মিত দুটি উল্লেখযোগ্য ইমারত হল ***হিন্দোলা মহল*** ও ***জাহাজ মহল***। প্রাসাদ জাতীয় এই দুটি ইমারতের নির্মাণ বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্র। হিন্দোলা মহল মালোয়া স্থাপত্যের কাঠিন্য ও অদম্য রূপটি তুলে ধরে। অন্যদিকে জাহাজ মহল প্রাণময়তা ও জীবনী শক্তির প্রকাশ। হিন্দোলা মহল ছিল দরবার কক্ষ বা জামাতখানা। এর গঠন অতি সুঠাম। এর পুরু ঢালু দেওয়াল এটিকে অনেকাংশে দুর্গের প্রতিরূপ দিয়েছে। এর ভূমি নকশার আকার অনেকটা ইংরেজি 'T' অক্ষরের মত। নীচু থেকে উর্ধ্বমুখী লম্বমান অংশটিই প্রধান মিলনায়তন। মাথার উপরের আড়াআড়িভাবে স্থাপিত T অংশটি মাথা হিসেবে পরে বসিয়ে দেওয়া হয়। প্রধান মিলনায়তনের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা হল ১১০ x ৬০ x ৩৫ ফুট। জাহাজ মহলকে মাণ্ডু স্থাপত্যের ক্রান্তিলগ্নের সৃষ্টি বলা যায়। ***পার্সি ব্রাউন*** লিখেছেন, *"The Jahaz Mahal, in the final building representing the classic phase of the building art at Mandu"*[1] রাজকীয় প্রাসাদের প্রাণচাঞ্চল্য এই নির্মাণের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কারুকার্যমণ্ডিত এই নির্মাণটি বিলাস সম্ভারে পরিপূর্ণ এবং সম্ভবত রাজপরিবারের মহিলাদের চিত্ত বিনোদনের জন্য ব্যবহৃত হত। প্রয়োজনমত দরবার কক্ষ হিসেবেও এর ব্যবহার ছিল। ***জন মার্শালের*** মতে, *"Its (Jahaz Mahal) fine arched halls, its roof, pavilions and badly designed reservoirs still forms one of the most conspicuous landmarks in Mandu"*.[2] স্থানীয় ভিত্তিতে স্থাপত্যের কেন্দ্র হিসেবে চান্দেরী শহরের অবস্থানও গুরুত্বপূর্ণ। এখানকার একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্মাণ হল চান্দেরীর রাজপ্রাসাদ। এটি কুশাক মহল (Kushak Mahal) নামে পরিচিত। মালোয়ার শাসক প্রথম মাহমুদ ১৪৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ফতেহাবাদের নিকট সাততলা বিশিষ্ট এই প্রাসাদ নির্মাণ করেন। ফেরিস্তার বিবরণেও এর উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া কিছু মাকবারা, মাদ্রাসা, মসজিদ এখনো নির্মিত হয়।

○ দাক্ষিণাত্যের মুসলিম স্থাপত্য ঃ

দক্ষিণ ভারতে সুলতানি আমলে যে ইসলামিক স্থাপত্য গড়ে উঠেছিল তা অন্যান্য প্রাদেশিক স্থাপত্যশৈলী থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র ছিল। উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে স্থাপত্য সৃষ্টির কাছে স্থানীয় প্রতিভাবান স্থপতি ও কারিগরদের নিয়োজিত করা হয়েছিল। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের মুসলমান শাসকরা যে স্থাপত্য সৃষ্টি করেন তা অপরাপর প্রাদেশিক মুসলিম স্থাপত্যের অনুরূপ যেমন ছিল না, তেমনি সেগুলি মৌলিক ইসলামী স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্যসম্পন্নও ছিল না। ড. সুলতান আহমেদ লিখেছেন যে, এগুলো মূলগতভাবে দুটি ইসলামী স্থাপত্য ধারার পরিপক্ক অবস্থার সংমিশ্রণ মাত্র। এগুলোর একটি হচ্ছে দিল্লী সুলতানির স্থাপত্যশৈলীর দ্বারা প্রভাবিত প্রাদেশিক ধারা এবং অন্যটি সম্পূর্ণ বহিরাগত উৎস, যা পারস্য থেকে এসেছিল। এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য উন্নয়ন ধারার সংস্পর্শে একটা স্থাপত্য ধারা দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে নতুন ইসলামী স্থাপত্য ধারার অবকাশ সৃষ্টি করেছিল।[১] দাক্ষিণাত্যে বহু গুরুত্বপূর্ণ ইমারতে ইরানী নকশার প্রয়োগ দেখা যায়। বাহমনী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আলাউদ্দিন হাসান বাহমন শাহ ছিলেন একজন পারস্যবাসী সেনানায়ক। আবার তিনি তুঘলক শাসনকালে দিল্লীতে কর্মরত ছিলেন। ১৩৪৭ খ্রীষ্টাব্দে গুলবর্গায় তিনি বাহমনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। দিল্লীর ইন্দো-ইসলামিক স্থাপত্য ও পারসিক স্থাপত্যের সাথে বাহমন শাহের পরিচয়কে দক্ষিণ ভারতে মিশ্র স্থাপত্য ধারার আবির্ভাবের অন্যতম কারণ হিসেবে দেখা যায়। গুলবর্গায় রাজধানী স্থাপনের সূত্রে সেখানেই দক্ষিণী-মুসলিম স্থাপত্যের প্রথম অনুশীলন শুরু হয়। ১৪২৮ খ্রীষ্টাব্দে বাহমনী রাজ্যের প্রশাসনিক কেন্দ্র গুলবর্গা থেকে বিদরে স্থানান্তরিত হলে সেখানে দক্ষিণী স্থাপত্যের দ্বিতীয় পর্বের সূত্রপাত ঘটে। আবার বাহমনী রাজ্য ভেঙে যাওয়ার পর গোলকুণ্ডায় কুতুবশাহী বংশ তাদের রাজধানী স্থাপন করে এবং স্থাপত্য চর্চায় বিশেষ উদ্যোগ নেয়। এটিকেই দক্ষিণী মুসলিম স্থাপত্য বিকাশের তৃতীয় বা শেষ পর্যায় বলা যায়। প্রথম পর্বের স্থাপত্য সৃষ্টির মধ্যে গুলবর্গা দুর্গ ও জামি মসজিদ গুরুত্বপূর্ণ। গুলবর্গা দুর্গের চতুর্দিকের পরিবেষ্টন মাত্র ২ কিলোমিটার। তবে নির্মাণে কোন সুসামঞ্জস্যতার ছাপ স্পষ্ট নয়। তবে জামি মসজিদটি দাক্ষিণাত্যের স্বতন্ত্র মিশ্র স্থাপত্যের একটি আকর্ষণীয় নিদর্শন। ১৩৬৭ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এই মসজিদের সমস্ত কাঠামোটাই ছাদযুক্ত। ইন্দো-ইসলামিক স্থাপত্যের অনুরূপ উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের অভাব এই মসজিদকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। অধ্যাপক সুলতান আহমেদ এই মসজিদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন যে এর চেহারার প্রধান আকর্ষণীয় বস্তু হিসেবে গম্বুজের অবস্থান দেখা যায়। সুউচ্চ শক্তিশালী বর্গাকার ক্লেরেস্টরির (Clerestory) উপর গম্বুজ স্থাপনের মধ্য দিয়ে একে অতিশয় জাঁকালো ও মর্যাদাময় করা হয়েছে। বিদরে রাজধানী স্থানান্তরের (১৪২২ খ্রীঃ) মাধ্যমে দাক্ষিণাত্যে দ্বিতীয় পর্বের স্থাপত্য অনুশীলন শুরু হয়। এই কাজে অগ্রণী ভূমিকা নেন সুলতান আহমদ শাহ (১৪২২-'৩৬ খ্রীঃ)। এখানকার রাজপ্রাসাদ, মসজিদ, মাদ্রাসা ও রাজকীয় মাকবারাগুলি স্থাপত্য নিদর্শন হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। এখানকার ইমারতের দেওয়াল চিত্রণ ও রঙিন টালি ব্যবহারের প্রবণতা লক্ষণীয়। মসজিদ স্থাপত্যের অংশ হিসেবে *চাঁদমিনার*-এর পরিকল্পনা এখানেই প্রথম দেখা যায়। ইতিপূর্বে নির্মিত মিনারগুলি

মূলত বিজয়-স্মারক হিসেবে পরিকল্পিত হয়েছিল। চাঁদমিনারের উচ্চতা প্রায় ১০০ ফুট। চারতলা বিশিষ্ট এই নির্মাণের প্রথম তিনটি তলা গোলাকার। একটি তলার বেড় খাঁজকাটা। এই নির্মাণে সৌন্দর্য ও সুঠামতার সমন্বয় দেখা যায়। কুতুবশাহী বংশের আমলে গোলকুণ্ডা রাজ্যে (১৫১২-১৬৮৭ খ্রীঃ)। দাক্ষিণাত্য স্থাপত্যের তৃতীয় পর্যায়ের বিকাশ ঘটে। এখানেও যথারীতি দুর্গযুক্ত রাজপ্রাসাদ, মসজিদ, মাকবারা ইত্যাদি নির্মিত হয়। কুতুবশাহী যুগের স্থাপত্য কর্মগুলির মূলত হায়দ্রাবাদ শহরকে কেন্দ্র করে রূপায়িত হয়েছিল। স্থাপত্যিক মূল্যবিশিষ্ট নির্মাণ হিসেবে ***'চারমিনার'***-এর নাম উল্লেখের দাবি রাখে। ***জি. মিচেল***-এর মতে, ১৫৯১ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ কুলী বিজয়স্মারক হিসেবে এটি নির্মাণ করেছিলেন। বর্গাকার এই মিনারের প্রতিপার্শ্বের পরিধি ১০০ ফুট। চারকোণায় ১৮৬ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট চারটি মিনার একে অনিন্দ্যসুন্দর করেছে। নিম্নভাগে চারটি প্রশস্ত খিলান পথ আছে। উপরের অংশ ক্রম হ্রাসমান রূপে উপরের দিকে উঠে গিয়েছে। ***পার্সি ব্রাউন***-এর মতে, চারমিনারের অবস্থান ও বাহ্যিক অবয়ব দেখে মনে হয় যে বহু পূর্বে গুজরাটের আমেদাবাদের তিন দরজা নির্মাণের উদ্দেশ্য ও হায়দ্রাবাদের চারমিনারের নির্মাণ উদ্দেশ্য একই ছিল (*"In position and appearance it seems to have served the same purpose as the Tin Darwaza built at a much earlier date in the city of Ahmedabad, Gujrat"*)[1]

বিজাপুরের আদিলশাহী রাজবংশ এবং খান্দেশের ফারুকী রাজবংশের উদ্যোগে ঐ দুটি আঞ্চলিক রাজ্যে মুসলিম স্থাপত্যের বিকাশ ঘটে। রাজপ্রাসাদ, মসজিদ ও মাকবারা ছিল এদের স্থাপত্যের প্রধান প্রধান ক্ষেত্র। বিজাপুরের আদিল শাহী রাজবংশ মূলক তুর্কী জাতিগোষ্ঠীর মানুষ ছিল। ***ব্রাউনের*** (P. Brown) মতে, বিজাপুরের স্থপতিবৃন্দ সম্ভবত অটোমান তুর্কীদের স্থাপত্য-শৈলী ও প্রযুক্তিজ্ঞান দ্বারা উদ্বুদ্ধ ছিলেন। এরা অট্টালিকার প্রতীক হিসেবে পতাকাকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন. যা ইসলামীয় রীতির অন্যতম বিশেষত্ব। গম্বুজ নির্মাণেও কিছু নতুনত্বের সংযোজন দেখা যায়। গম্বুজগুলি অর্ধ-গোলাকার হয়ে প্রচলিত পাপড়ি বিশিষ্ট বন্ধনীসহ উপরের দিকে উঠে গিয়েছে। বিজাপুর জামি মসজিদ, ইব্রাহিম রওজা (দ্বিতীয় ইব্রাহিম আদিল শাহের সমাধি), মোগল গম্বুজ (মহম্মদ আদিল শাহ'র সমাধি), মিহতার মহল প্রভৃতির নাম উল্লেখ্য। খান্দেশ রাজ্যের সালনার ও বুরহানপুরে স্থাপত্য অনুশীলনের নিদর্শন দেখা যায়। এখানকার স্থপতিরা মূলত পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির স্থাপত্য ধারা দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিলেন। খান্দেশ রাজ্যের মসজিদ, মাকবারাগুলিতে মালোয়া, মাণ্ডু প্রভৃতি রাজ্যের স্থাপত্যশৈলীর প্রভাব স্পষ্ট।

কাশ্মীর স্থাপত্য ঃ ভারতের উত্তরাংশে উঁচু পর্বতবেষ্টিত উপত্যকা রাজ্য কাশ্মীর। পঞ্চদশ শতকে কাশ্মীরে মুসলিম স্থাপত্যের বিকাশ ঘটে। এখানে প্রচলিত স্থাপত্য ধারার সাথে মুসলিম স্থাপত্যের প্রধান প্রভেদ উপকরণগত। আদি শিল্পে পাথর দ্বারা ইমারত নির্মাণের প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু মুসলিম শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পর নির্মাণের উপাদান হিসেবে কাঠ গুরুত্ব পায়। কাঠ সরবরাহের প্রাচুর্য থেকেই সম্ভবত কাঠের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছিল। এখানে আবাসগৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে কাঠকে কেটে নানারূপ আকৃতি দেওয়া হত না। ছোট ছোট কাঠের দণ্ড সরাসরি

একাদশ অধ্যায়

সুলতানি যুগের সাহিত্য ও ধর্মসম্প্রদায়
(Sultanate Literature and Religious cults)

○ সুলতানি যুগের সাহিত্য ঃ

দিল্লীর সুলতানি শাসনকালে রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়ার পাশাপাশি সাহিত্য ও শিল্পচর্চার দিকেও দৃষ্টি দেওয়া হয়। প্রথাগত ভাবে ভারত ভূখণ্ডে সংস্কৃত ভাষা ছিল সাহিত্যের প্রধান মাধ্যম। উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্যচর্চার কাজ প্রাচীন ও আদি-মধ্যযুগের ভারতে অব্যাহত ছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুজীবনের সূত্রধরে সপ্তম-অষ্টম শতকে সংস্কৃত ভাষার চর্চাতেও নবজীবন লক্ষ্য করা যায়। দশম শতকের পরবর্তীকালে ভারতে তুর্কীদের অভিভাষণ ও স্থায়ীভাবে বসবাস করার সূত্রে এদেশের সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রেও রূপান্তর ঘটে। ভারতীয় রাজনীতিতে তুর্কীজাতির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ফলে সমাজ ও সংস্কৃতির উপরেও গভীর ও সুদূর প্রসারী প্রতিক্রিয়া ঘটে। রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার সূত্রে সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে প্রথমে আরবী ও পরে ফার্সীভাষা সাহিত্যের ভাষা হিসেবে প্রথম সারিতে স্থান করে নিতে সক্ষম হয়। আঞ্চলিক ভাষাচর্চার ক্ষেত্রেও পরিবর্তনের এই ধারা লক্ষ্য করা যায়।

○ ফার্সী সাহিত্য ঃ

দশম শতক থেকে পারস্য ও মধ্য এশিয়ায় ফার্সী ভাষার চর্চার ব্যাপকতা দেখা যায়। দশম শতকের পরবর্তী কয়েক শতক বিশিষ্ট পারসিক কবি ও সাহিত্যিকরা বহু অমর সাহিত্য সৃষ্টি করেন। ভারতে তুর্কী শাসন প্রতিষ্ঠার আদি পর্বে আরবী ভাষার বিশেষ গুরুত্ব ছিল। ক্রমে তাঁরা ফার্সী ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হন। উলেমা প্রমুখ ধর্মীয় আইন বিষারদদের মধ্যে তখনও আরবী ভাষার জনপ্রিয়তা থাকলেও, প্রশাসন ও কাব্য-সাহিত্যের ভাষা হিসেবে ফার্সী দারুণ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তুর্কী শাসকগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতার ফলে ফার্সীভাষা চর্চা দ্রুত ব্যাপকতা লাভ করে। গজনী ও ঘুর প্রদেশের শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রখ্যাত ফার্সী কবি সাহিত্যিক ফিরদৌসী, সাদি, মহম্মদ হাফিজ, হামজাশাহ, তাজউদ্দিন হাসান প্রমুখ ফার্সী ভাষায় সাহিত্যচর্চার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, ভারতের তুর্কীশাসকেরা সে ধারা অনুসরণ করে এয়োদশ শতক ও পরবর্তীকালে এদেশেও ফার্সী ভাষার চর্চাকে এগিয়ে নিয়ে যান। বিখ্যাত ফার্সী *আমির খসরু* গর্বভরে বলেছিলেন যে, মধ্য এশিয়ার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বুখারার থেকে ভারত সাহিত্যচর্চাতে পিছিয়ে ছিলনাতো বটেই, উপরন্তু বুখারার সাংস্কৃতিক প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দ্রুত দিল্লী উঠে এসেছিল। মোঙ্গলদের আক্রমণের চাপে পড়ে বহু পারসিক পণ্ডিত ভারতে চলে এলে এখানে সাদর অর্ভ্যর্থনা পান। তুর্কী শাসকেরা নানাভাবে বহিরাগত পণ্ডিতদের সাহিত্য সৃষ্টির কাজে সহযোগিতা করেন। সরকারী উদ্যোগে দিল্লী, জলন্ধর, ফিরুজাবাদসহ ভারতের নানা স্থানে মুসলিম শিক্ষার কেন্দ্র গড়ে ওঠে। স্থাপন করা হয় আরবী ও পারসিক গ্রন্থের পাঠাগার সমূহ। ফার্সী ভাষা ও সাহিত্যচর্চার কেন্দ্র হিসেবে লাহোর বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে।

তুর্কী-আফগান আমলে ভারতের অগ্রণী ফার্সী সাহিত্যকার ছিলেন *আমির খসরু* (১২৬৩-১৩২৫ খ্রীঃ)। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, সাহিত্যিক ও সঙ্গীতজ্ঞ। সুলতান বলবনের জ্যেষ্ঠপুত্র মহম্মদের গৃহশিক্ষক হিসেবে তিনি প্রথম পাদপ্রদীপের আলোকে আসেন। আলাউদ্দিন খলজীর সভাকবি হিসেবে তিনি খ্যাতি ও প্রতিপত্তির শীর্ষে আরোহণ করেন। কাব্য সৃষ্টিতেই তাঁর আগ্রহ ছিল সর্বাধিক। তিনি মসনভি, দিওয়ান, কাসিদাও গজল রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। আলাউদ্দিন খলজীর শাসনকালে তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি সৃষ্টি হয়। তিনি তিনটি ইতিহাসমূলক গ্রন্থ রচনা করেন—খাজাইন-উল্-ফুতুহ্, ন্যুসিপিহর ও তুঘলকনামা। প্রথমটি গদ্যে ও অন্য দুটি পদ্যে রচিত। সুফীদর্শনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং শেখ্ নিজামউদ্দিন আউলিয়ার শিষ্য আমির খসরুর রচনায় সহনশীলতা ও মানবিক গুণাবলীর প্রকাশ দেখা যায়। ভারতবর্ষকে তিনি নিজের জন্মভূমি বলতে গর্ববোধ করতেন। তাঁর বিভিন্ন কাব্য-সাহিত্যে ভারতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ভূয়সী প্রশংসা ধ্বনিও হয়েছে। *'ভারতের তোতাপাখি'* নামে তিনি অভিহিত হতেন।

কুতুবউদ্দিন আইবকের আমলের রাজকর্মচারী হাসান নিজামী আরবী ও ফার্সী ভাষায় গুরত্বপূর্ণ সাহিত্যচর্চা করেন। নিজামী রচিত *'তাজ-উল্-মাসির'* সুলতানি যুগের প্রথম ইতিহাসমূলক সাহিত্য হিসেবে গুরুত্ব পায়। এই গ্রন্থে আরবি ও ফার্সী ভাষার অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ দেখা যায়। লেখক আরবী ভাষায় রচনা শুরু করে নানাক্ষেত্রে ফার্সী ভাষার প্রয়োগ ঘটান। হাসান নিজামী গদ্যে ও পদ্যে পারদর্শী ছিলেন। তাই তাঁর গদ্য সাহিত্যেও কাব্যের মাধুর্য উপলব্ধি করা যায়। আলাউদ্দিন খলজীর রাজত্বকাল একদিকে যেমন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ পর্ব হিসেবে চিহ্নিত হয়, তেমনি এই পর্ব সাহিত্য সংস্কৃতির স্বর্ণ যুগ রূপেও বন্দিত হয়। ***জিয়াউদ্দিন বরণী*** লিখেছেন যে, আলাউদ্দিনের আমলে ভারতে নানা জাতির বিখ্যাত পণ্ডিতদের সমাবেশ দেখা যায়। সাহিত্য, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের নানা শাখার প্রখ্যাত ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিভার সমাবেশের ফলে দিল্লী বাগদাদের শত্রু, কায়রোর প্রতিদ্বন্দ্বী এবং কনস্ট্যান্টিনোপলের সমমর্যাদার স্তরে উন্নীত হয়েছিল (*'The capital of Delhi by the presence of these unrivalled men of great talents, had become the envy of Baghdad, the rival of Cairo and equal of constantinople'*)। ধর্মপ্রাণ পণ্ডিত নিজামউদ্দিন আউলিয়া ও অন্যান্য বহু পণ্ডিত এই সময় ফার্সী ভাষায় সাহিত্য চর্চা করেন।

গিয়াসউদ্দিন তুঘলক ও মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের আমলেও ফার্সী ভাষায় কাব্য-সাহিত্যচর্চার উৎসাহ দেখানো হয়। মহম্মদ-বিন-তুঘলক স্বয়ং সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান ইত্যাদির প্রতি আগ্রহী ছিলেন। তিনি নিয়মিত দার্শনিক, ধর্মবিদ্, তার্কিক, চিকিৎসা বিজ্ঞানী প্রমুখের সাথে মত বিনিময় করতেন। তাঁর সমকালে ফার্সী ভাষা-সাহিত্যের প্রখ্যাত সাধক ছিলেন সুয়াইয়ান-উদ্-দিন-উমরানী। তিনি ফার্সীতে *"হুসেইনী', 'তলখিস্', 'সিফ্তা'* ইত্যাদির উপর টীকা রচনা করেন। সুলতান ফিরোজ শাহ স্বয়ং সাহিত্যরসিক ছিলেন। তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ *'ফুতুহ্-ই-ফিরোজশাহী'* ফার্সী সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ। সমসাময়িক কালের সুপরিচিত ফার্সী সাহিত্যকারদের অন্যতম ছিলেন কাজী আবদুল মুকত্াদির সানিহি, মৌলানা খাজাগি, আহমেদ থানেশ্বরী প্রমুখ।

দিল্লী সুলতানির অবক্ষয়ের যুগেও ফার্সী সাহিত্যচর্চায় ভাটা পড়েনি। লোদী বংশীয়

শাসকদের মধ্যে সুলতান সিকন্দর লোদী স্বয়ং ছিল একজন কাব্যরসিক ও কবি। আঞ্চলিক স্তরে বাহমনি রাজ্য এবং অন্যান্য মুসলিম রাজ্যসমূহ যেমন বিজাপুর, আহমদনগর, গোলকুণ্ডা, মালব, জৌনপুর, বাংলা, মুলতান প্রভৃতিও ভাষা সাহিত্যচর্চার কেন্দ্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাহমনী রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী মামুদ গাওয়ান ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন সাহিত্যরসিক ও কবি। লোদি আমলের শ্রেষ্ঠ ফার্সী কবি ছিলেন দিল্লীর শেখ জামালউদ্দিন। পারস্যের কবি জমিদারের সাথে তাঁর যোগাযোগ ছিল।

সুলতানি আমলে ফার্সী ভাষায় বহু মূল্যবান ইতিহাসমূলক সাহিত্য রচিত হয়। মিনহাজউদ্দিনের *'তাবাকত্-ই-নাসিরী'* গ্রন্থ ঐশ্লামিক আন্দোলনের বিস্তারিত বিবরণে সমৃদ্ধ। লেখক তাঁর গুনমুগ্ধ পৃষ্ঠপোষক সুলতান নাসিরউদ্দিন মামুদের নামে এই ইতিহাসমূলক গ্রন্থের নামকরণ করেন। আলাউদ্দিনের রাজত্বকালের বিবরণ সমৃদ্ধ গ্রন্থ আমির খসরুর *'তারিখ-ই-আলাই'*, মহম্মদ-বিন্-তুঘলক ও ফিরোজশাহ তুঘলকের রাজত্বকালের বিবরণ ভিত্তিক জিয়াউদ্দিন বরণীর গ্রন্থ *'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী'* ও *'ফুতুহ-ই-জাহান্দারী'* প্রভৃতি ফার্সী ভাষা সাহিত্যের অনবদ্য নিদর্শন। এই ধরনের অসংখ্য ফার্সী গ্রন্থের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাম হল শামস্-ই-সিরাজ 'আফিফ' রচিত *'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী'*, ইয়াহিয়া-বিন-শির হিন্দী রচিত *'তারিখ-ই-মুবারকশাহী'*, ইসামী রচিত *'ফুতুহ-উক্-সালাতিন'* ইত্যাদি।

রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোযকতার ফলে সুলতানি যুগে ফার্সী ভাষার দ্রুত বিস্তার সম্ভব হয়। খসরুর সময় থেকে ফার্সীতে নতুন ধারার সূচনা ঘটে। একে বলা হত *'সবক-ই-হিন্দি'* বা *ভারতের রীতি।* তিনি হিন্দিকে বলতেন *'হিন্দভি'।* এই সময় ফার্সী ভাষার সাথে হিন্দি ভাষার অপূর্ব সমন্বয় ঘটে। উদ্ভব ঘটে *'উর্দু'* নামক এক মিশ্র ভাষার। এর ফলে ফার্সী ভাষা ও হিন্দি ভাষার সাথে পরিচিত লোকেদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান অনেক সহজ হয়ে যায়।

○ সংস্কৃত ঃ

সুলতানি যুগে সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞান বিষয়ক বহু গ্রন্থ লেখা হয় সংস্কৃত ভাষায়। তুলনামূলকভাবে পূর্ববর্তী কয়েক শতকের তুলনায় কম হলেও, মুসলমান শাসকদের আমলে সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্যচর্চার পথ অন্তত সরকারিভাবে অমসৃণ ছিল না। ড. ***কালিকিঙ্কর দত্ত*** বলেছেন ঃ *"The period was not entirely barren of important composition in sanskrit, religious as well as secular..."*। দেশের নানা স্থানে সংস্কৃত চর্চার জন্য শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করা হয়। রাজনৈতিকভাবে এই সকল প্রতিষ্ঠানের কাজে হস্তক্ষেপ করা হত না। শংকরাচার্যের 'অদ্বৈতবাদ'কে কেন্দ্র করে বহু সংস্কারক সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্য ও দর্শন রচনা করেন। ত্রয়োদশ শতকে পার্থসারথি মিশ্র 'কর্ম-মিমাংসা'র উপর বহু গ্রন্থ রচনা করেন। এদের মধ্যে বহুল প্রচলিত গ্রন্থটির নাম *'শাস্ত্র দীপিকা'*। সুলতানি আমলে যোগ, বৈশেষিক ও ন্যায় দর্পণের উপর বহু টীকা রচিত হয়। দ্বাদশ শতকে ***বিজ্ঞানেশ্বর*** লেখেন *'মিতাক্ষরা'* নামক আইন সংকলন। হিন্দু আইনের উত্তরাধিকার সম্পর্কে ***জিমুতবাহন*** লেখেন *'দায়ভাগ'* গ্রন্থ।

সংস্কৃত ভাষায় রচিত নাটকগুলি ছিল বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সমকালে রচিত গুরুত্বপূর্ণ নাটকটি হল জয়সিংহ সুরী রচিত 'হাম্মির-মদ-মর্দন'। আনুমানিক ত্রয়োদশ শতকের বিশের দশকে এটির রচনা সম্পূর্ণ হয়। অনুরূপ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নাটক হল কেরলের যুবরাজ রবি বর্মন

রচিত *'প্রদ্যুম্ন-অভ্যুদয়'*, বিদ্যানাথ রচিত (১৩০০ খ্রীঃ) *'প্রতাপ-রুদ্র-কল্যাণ'*, বামন ভট্ট রচিত 'পার্বতী পরিণয়' (১৪০০ খ্রীঃ) ইত্যাদি। গুজরাটের সুলতান দ্বিতীয় মহম্মদের বিরুদ্ধে চম্পানরের জনৈক যুবরাজের বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধকে স্মরণীয় করার জন্য গঙ্গাধর রচনা করেন *'গঙ্গাদাস প্রতাপ বিলাস'*। আনুমানিক ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার নবাব হুসেন শাহের মন্ত্রী রূপ গোস্বামী *'বিদগ্ধ মাধব'* ও *'ললিত মাধব'* নামক দুটি বিখ্যাত নাটক রচনা করেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় প্রায় পঁচিশটি সাহিত্য রচনা করেছিলেন।

মধ্যযুগে মিথিলা ও বাংলায় স্মৃতিশাস্ত্র ও ব্যকরণ বিষয়ক অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়। সে যুগে মিথিলার প্রখ্যাত লেখক ছিলেন *পদ্মনাভ দত্ত, বিদ্যাপতি উপাধ্যায়, বাচস্পতি মিশ্র* প্রমুখ। বাংলার খ্যাতিমান শাস্ত্রকারদের অন্যতম ছিলেন *রঘুনন্দন*। মধ্যযুগে বহু ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ জৈন সাহিত্য রচিত হয়। আঞ্চলিক ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষা চর্চার কেন্দ্র হিসেবে বিজয়নগর রাজ্যের বিশেষ খ্যাতি ছিল। বিশিষ্ট পণ্ডিত ও বৈয়াকরণিক সায়নাচার্য ও তাঁর ভাই মাধব বিদ্যারণ্য রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বহু গ্রন্থ রচনা করেন। সেযুগে কোন কোন মুসলিম পণ্ডিতও সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞানার্জন করে সাহিত্যচর্চার কাজে লিপ্ত ছিলেন বলে জানা যায়।

❍ আঞ্চলিক সাহিত্য ঃ

ভক্তিবাদী আন্দোলনের ফলে ভারতের সমাজ ও ধর্মজীবনে যেমন সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়েছিল, তেমনি এই আন্দোলনের সূত্র ধরে সাধারণ মানুষের কথ্য ভাষাও সাহিত্যের ভাষা হিসেবে উপরের সারিতে উঠে আসার সুযোগ পায়। রক্ষণশীল হিন্দুরা সংস্কৃত ভাষার চিরাচরিত মর্যাদায় বিস্মৃত হতে পারেননি। তুর্কী শাসকরা আরবী ও ফার্সী ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসেবে গুরুত্ব দিতে তৎপর ছিলেন। কিন্তু ভক্তিবাদী সংস্কারকেরা মানুষের কথ্য ভাষাকেই তাঁদের মত প্রচারের মাধ্যম হিসেবে বেছে নিলে, স্থানীয় কথ্য ভাষার গুরুত্ব বৃদ্ধিপায়। রামানন্দ ও কবির হিন্দি ভাষাতেই কবিতা রচনা করেন। কবিরের 'দোহা' এবং *'সকিস্'* গুলি আধ্যাত্মিক রসে সমৃদ্ধ হয়ে হিন্দি ভাষা-সাহিত্যকে এক নতুন মাত্রা ও জনপ্রিয়তা দেয়। সাধিকা মীরাবাঈ ও তাঁর অনুগামীরা *'ব্রজভাষা'য়* রাধা-কৃষ্ণের বন্দনা গান রচনা করেন। নামদেব কথ্য মারাঠি ভাষায় তাঁর মতাদর্শ প্রচার করেন। নানক ও তাঁর অনুগামীরা পাঞ্জাবী ও গুরুমুখী ভাষায় গীত রচনা করেন। বাংলা ভাষা-সাহিত্যে বৈপ্লবিক রূপান্তর আনেন বৈষ্ণব সাধকবৃন্দ। কবি চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতি ঠাকুর প্রমুখ বাংলা ভাষায় কাব্যচর্চা করে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। বিদ্যাপতি ঠাকুর মিথিলায় জন্ম নিলেও বাংলা ভাষাকে তাঁর সাহিত্যকর্মের মাধ্যম হিসেবে বেছে নেন। আঞ্চলিক সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে স্থানীয় রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিদ্যাপতি জনৈক হিন্দু সামন্ত শিব সিংহের সভাকবি হিসেবে কাব্যচর্চার বিশেষ সুযোগ পান। বাংলার মুসলমান শাসকেরাও বাংলাভাষায় সাহিত্যচর্চার কাজে বিশেষ উৎসাহ দেখান। তাঁদের উদ্যোগে রামায়ণ ও মহাভারত সংস্কৃত থেকে বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়। সুলতান বারবক শাহ (১৪৫৯-'৭৬ খ্রীঃ) সাহিত্যের একান্ত অনুরাগী ছিলেন। সেকালের বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিক বৃহস্পতি মিশ্র, মালাধর বসু, কৃত্তিবাস প্রমুখ তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। বৃহস্পতি মিশ্র, *'পদচন্দ্রিকা'* কাব্য রচনা করে বিশেষ খ্যাতি পান। এছাড়া তিনি গীতগোবিন্দ, কুমারসম্ভব, রঘুবংশ প্রভৃতি বহু গ্রন্থের টীকা লেখেন। মালাধর বসু 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়', কাব্য রচনার (১৪৭৩ খ্রীঃ) জন্য সুলতানের কাছ

থেকে *'গুণরাজ খাঁ'* উপাধি পান। 'বাংলার বাইবেল' হিসেবে কথিত রামায়ণের বঙ্গানুবাদ করে কৃত্তিবাস বাংলা ভাষা সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করেন। গৌড়ের সুলতান নসরত্ শাহের উদ্যোগে শ্রীকর নন্দী মহাভারতের বাংলা অনুবাদ করেন। হুসেন সাহের সেনাপতি পরাগল খাঁ'র উদ্যোগে কবিন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের অপর একটি বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। বিজয় নগরের শাসকদের উদ্যোগে তেলেগু ভাষায় ব্যাপক সাহিত্যচর্চা হয়। রাজা কৃষ্ণদেব রায় স্বয়ং তেলেগু ভাষায় রাষ্ট্রনীতি-বিষয়ক গ্রন্থ' আমুক্ত মাল্যদা রচনা করেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় 'জাম্ববতি-কল্যাণম্' নামে একটি নাটকও রচনা করেন। বিশিষ্ট তেলেগু কবি পেড্ডান ও নন্দী তিমায়া রচনা করেন যথাক্রমে 'মনুচরিতম্' ও 'পারিজাত পহরনামু' নামক দুটি গ্রন্থ।

○ জগন্নাথ উপাসনা ঃ

জগন্নাথদেব ও জগন্নাথ উপাসনার উদ্ভব ও বিকাশের প্রেক্ষাপটে উড়িষ্যা রাজ্যের ভৌগলিক বিন্যাস ও আদি মধ্যযুগের সূচনাপর্বে নানা ধর্মমতের আবির্ভাব, সমাবেশ ও পরিণতিতে সমন্বয়ের ইতিহাস বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মহাপ্রভু জগন্নাথের ক্ষেত্র বর্তমান উড়িষ্যার নানা অংশ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। বৈতরণী নদীর উপত্যকাসহ গোটা উপকূল ভাগ কলিঙ্গ নামে পরিচিত ছিল। মৌর্য রাজা অশোকের আমলেও কলিঙ্গ নামটি প্রচলিত ছিল। অশোক কলিঙ্গ বিজয়ের পর একে উত্তর ও দক্ষিণ দুটি অংশে বিভক্ত করেন। যথাক্রমে তোসালী ও সোমপা ছিল এই দুই অংশের প্রধান কর্মকেন্দ্র। আদি মধ্যযুগে ভৌম রাজাদের তাম্রশাসন থেকে জানা যায় তোসালী, কোঙ্গদসহ উত্তরাংশ ভৌম শাসনাধীন ছিল। এবং কলিঙ্গসহ দক্ষিণভাগ শাসন করত আদি গঙ্গ রাজবংশ। পরবর্তীকালে তোসালীকেও উত্তর ও দক্ষিণ, এই দু'ভাগে ভাগ করা হয়। বর্তমান উড়িষ্যা নামকরণ হয়েছে *'ওড্রবিষয়'* নাম থেকে যা আদি-মধ্যকালে উত্তর তোসালীর অংশ ছিল। বর্তমান উড়িষ্যার পশ্চিমাংশ (মহানদী উপকূল ভাগ) দক্ষিণ কৌশল নামে পরিচিত ছিল। সোমবংশী শাসনকালে এটি তোসালীর অন্তর্ভুক্ত হয়। একইভাবে উত্তর ভাগ পরিচিত ছিল উৎকলদেশ নামে। বর্তমানে গঞ্জাম ও পুরী জেলার নাম ছিল কোঙ্গদ। উড়িষ্যার এই সমগ্র ভৌগোলিক একক শ্রীজগন্নাথ ধর্মমতের উদ্ভব ও বিকাশের ক্ষেত্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রাথমিক পর্বে এই ভৌগোলিক সীমার মধ্যে জগন্নাথ উপাসনা আবদ্ধ ছিল ; গঙ্গ বংশের রাজকীয় কর্তৃত্ব প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জগন্নাথ উপাসনাও সন্নিহিত অঞ্চলগুলিতে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

পুরুষোত্তম জগন্নাথ উপাসনার বিকাশের পশ্চাদ্পটে উড়িষ্যা ভূখণ্ডে বিভিন্ন ধর্মমতের আবির্ভাব, প্রসার ও পরিণামে একটি সমন্বয়বাদী সংস্কৃতির উদ্ভবের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান ও সাহিত্যসূত্রের বিশ্লেষণ থেকে জানা যায় যে, যীশুখ্রিষ্টের আবির্ভাবের আগে থেকেই কলিঙ্গ নানা ধর্মের মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল।[1] খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধের সাথে এই অঞ্চলের আত্মিক যোগ স্থাপিত হয়। জৈন গ্রন্থ *'হরিভদ্রীয় বৃত্তি'* থেকে জানা যায় যে, কলিঙ্গ রাজের আমন্ত্রণে মহাবীর স্বয়ং সেদেশে গিয়ে ধর্মমত প্রচার করেন। পরবর্তীকালে সম্রাট অশোক ও খারবেলের পৃষ্ঠপোষকতায় যথাক্রমে বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম কলিঙ্গ

দেশে প্রসার লাভ করে। বর্মার উপকথা অনুযায়ী তপসু ও ভল্লিক নামক দুই স্থানীয় বণিক (উৎকল দেশীয়) সরাসরি গৌতম বুদ্ধের কাছে দীক্ষা গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। চণ্ডাশোক কলিঙ্গ যুদ্ধের পরেই রূপান্তরিত হয়েছিলেন ধর্মাশোকে। ড. *কানুচরণ মিশ্রর* মতে, অশোকের এই মানসিক পরিবর্তন কোন আকস্মিক বা অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। সমকালীন কলিঙ্গ দেশের উদার ও সহনশীল কিছু পণ্ডিতের সান্নিধ্য ও পরামর্শ সম্রাট অশোকের মনন ও কর্মের উপর প্রভাব ফেলেছিল। বিখ্যাত জৈন শাসক খারবেলও তাঁর ধর্মীয় উদারতা ও সহিষ্ণুতার জন্য খ্যাত ছিলেন। গুপ্তযুগে উড়িষ্যা ভূখণ্ডে বৈষ্ণবধর্ম প্রতিষ্ঠা পায়। সমকালীন তাম্রলিপি থেকে জানা যায় যে, গুপ্ত রাজারা বিষ্ণুরূপী শ্রীমাধবের উপাসনা করতেন। আদিত্য সেনের *'অপসদ্'* স্তম্ভ লিপিতে গুপ্ত রাজা মাধব গুপ্তকে শ্রীমাধবের উপাসক বলা হয়েছে। মাধব গুপ্ত কর্ণ-সুবর্ণের রাজা শশাঙ্কের সমসাময়িক ছিলেন। কোঙ্গদ মণ্ডল (উড়িষ্যা)-এর শাসক মাধব বর্মন ছিলেন রাজা শশাঙ্কের অধীনস্ত সামন্ত। সম্ভবত, শিলোদ্ভব বংশীয় মাধব বর্মনও বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। বকাটক বংশীয় প্রবর সেনের পট্টম লেখ থেকে জানা যায় তিনিও বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। খ্রীষ্টীয় ৪র্থ বা ৫ম শতকের আগে কলিঙ্গতে মথরা (Matharas) বংশের শাসন ছিল। এই বংশীয় শক্তিবর্মনের তাম্রলেখ থেকে জানা যায় যে, তিনি ভগবান নারায়ণ-এর উপাসক ছিলেন। সিংহলী বৃত্তান্ত অনুসারে জনৈক সিংহবাবু কলিঙ্গ থেকে সিংহলে গিয়ে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে সিংহল ও কলিঙ্গর মধ্যে যোগ স্থাপন হয়। এই সম্পর্কের সূত্রে শবর, পুলিন্দ ইত্যাদি উপজাতীয় সংস্কৃতির প্রভাব সিংহল ও কলিঙ্গের উপর আরোপিত হয়। তাম্রলেখ থেকে জানা যায় মথরা বংশীয়, রাজারা ছিলেন নারায়ণের উপাসক ও পরমভাগবত। কলিঙ্গের মথরা শাসকগণ সেখানে প্রথম বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন এবং 'পরমাদ্বৈত' উপাধি নেন। এই বংশের শাসনকালে মহেন্দ্র পর্বতের উপর যে মন্দিরটি নির্মিত হয় সেটিকে *'সিদ্ধাই'*, *'সাধক'* ও *'তপস্বী'*-দের সাধনক্ষেত্র বলে সমকালীন তাম্রলেখতে বলা হয়েছে।

খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতকে মধ্য ও পূর্ব উড়িষ্যায় (তোসালী) *'মনিনাগেশ্বর'* নামক দেবতার উপাসনা প্রচলিত ছিল। উড়িষ্যার খোন্দ্ উপজাতির কাছে নাগদেবীর উপাসনা জনপ্রিয় ছিল। হিন্দুরা শেষ নাগ বা অনন্ত নাগের অবতার হিসেবে বলদেবের উপাসনা করতেন। বালেশ্বরে এখনও বলদেবের পূজা প্রচলিত আছে। সম্ভবত, শৈলোদ্ভবদের পতনের পর কোঙ্গদ ও তোসালী ভৌমকারদের শাসনাধীনে এলে পুরুষোত্তম, বলদেব ও দেবী স্তম্ভেশ্বরী রাষ্ট্রদেবতা হিসেবে আরাধ্য হন। এই ঘটনাকে পুরুষোত্তম জগন্নাথের ত্রয়ী রূপ জগন্নাথ, বলভদ্র ও শুভদ্রার রূপ কল্পনার সূত্র হিসেবে গ্রহণ করা যায়। পুরুষোত্তম এবং বলভদ্র নামের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ৭ম শতকে ভৌমকার বংশীয় প্রথম শুভকর দেবের তাম্র লেখতে। সম্ভবত, বৌদ্ধ ভৌমকার বংশ নীলমাধব ওরফে পুরুষোত্তমের উপাসক ছিলেন এবং প্রভু পুরুষোত্তমের রথযাত্রা উৎসব অংশও বৌদ্ধ ধর্মাচার পদ্ধতিরই অনুসরণ। হেমচন্দ্র বিরচিত *'অভিধান চিন্তামনি'* গ্রন্থের ভিত্তিতে বলা যায় নীলমাধব তথা পুরুষোত্তম বৌদ্ধদের পাশাপাশি ব্রাহ্মণ ও জৈনদেরও উপাস্য দেবতা ছিলেন। জৈনরা তাঁকে তীর্থঙ্কর রূপেই উপাসনা করতেন।

অর্থাৎ জগন্নাথ, বলভদ্র, শুভদ্রা ও সুদর্শন এই চার দেব-দেবীর উপাসনাতত্ত্ব বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে। উপরোক্ত আলোচনার নিরিখে এই জগন্নাথ উপাসনার

বিবর্তনকে নিম্নলিখিত উপ-বিভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্যায় খ্রীষ্টীয় ৩৫০ থেকে ৫০০ শতক। এই সময় মাথরা বংশ কলিঙ্গ শাসন করতেন এবং মহেন্দ্র পর্বতে তাঁদের বংশ দেবতা নারায়ণকে প্রতিষ্ঠা করে আরাধনা করতেন। দ্বিতীয় পর্বের পরিধি ৫০০ থেকে ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রসারিত। এই পর্বে আদি গঙ্গা বংশ ও শৈলোদ্ভবদের অধীনে যৌগিক দেবতা পুরুষোত্তম-জগন্নাথের ধারণা বিকাশ লাভ করে। তৃতীয় পর্বে অর্থাৎ অষ্টম শতকের মধ্যভাগ থেকে এগারো শতকের মধ্যভাগে ভৌম ও সোমবংশীয় শাসকদের অধীনে উড়িষ্যায় সমন্বয়ী ধর্ম ভাবনা জনপ্রিয়তা পায়। অবশেষে এগারো শতকের পরবর্তীকালে পরবর্তী গঙ্গা ও সূর্যবংশীয়দের আমলে জগন্নাথ, বলভদ্র, শুভদ্রা ও সুদর্শনের উপাসনা প্রসার লাভ করে *(The theology of Jagannath as found today, developed actually during the Ganga and Suryavamsi periods)*। *ড. কে. সি. মিশ্রের* মতে, এই পর্বে বৌদ্ধ মহাযান বাদের সাথে ব্রাহ্মণ্য তান্ত্রিক ধর্মের মিশ্রণ ঘটে এবং এর সাথে শৈব ও বৈষ্ণব ধ্যান-ধারণা যুক্ত হয়ে জগন্নাথ উপাসনার উদ্ভব ঘটে। তিনি লিখেছেন, *"The cult which is not derived from any particular religious system, is a combination of many religious thoughts and ideas current in this and the adjoining regions."*

মাদলাপঞ্জি'র বিবরণ থেকে অনুমিত হয় যে, সোমবংশীয় রাজা যযাতি কেশরী উত্তর-ভারত থেকে ব্রাহ্মণদের আমন্ত্রিত করে এনে রাজধানী জাজপুরে যাগ-যজ্ঞ পরিচালনা করেন ও বৌদ্ধ ধর্মের কেন্দ্রে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ভুবনেশ্বরে লিঙ্গরাজ মন্দির নির্মাণ করেন। সম্ভবত, তাঁর আমলেই পুরীতে জগন্নাথ মন্দিরের নির্মাণকার্য শুরু হয়। তবে তিনি তা সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি। গঙ্গাবংশীয় রাজা চোড়গঙ্গ মন্দিরের নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ করেন।

আধুনিক জগন্নাথ ধর্মতত্ত্ব মূলত গঙ্গা ও সূর্যবংশের আমলে বিকাশ লাভ করে। বৌদ্ধ মহাযান বাদের সাথে তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সমন্বয় এবং শৈব ও বৈষ্ণববাদের দর্শনতত্ত্বের মিলনে জগন্নাথ ও উপাসনার নতুন ধর্মতত্ত্ব গড়ে ওঠে। *ড. কানুচরণ মিশ্র* লিখেছেন : *"It was doing this period (Ganga and Suryavamsi periods) that some Mahayanist elements mixed with tantricism were combined with the Saivite and vaisnavite ideologies and gave rise to a new theological conception of the Jagannath cult."* জগন্নাথ উপাসনায় *'তন্ত্রযোগ'* পদ্ধতি নাথ ধর্ম থেকে গৃহীত হয়েছে। 'হরি-হর' সম্পর্কিত ধারণা উড়িষ্যার প্রচলিত প্রাচীন ঐতিহ্য থেকে এসেছে। জগন্নাথ ও বলভদ্র *'হরি-হর'* ধারণার প্রতীক এবং শুভদ্রা হলেন শাক্ত তথা তান্ত্রিক বাদের প্রতীক। বলভদ্র মাঝে মাঝে নাগতন্ত্রের প্রতীক বলে বিবেচিত হন। তবে আসলে তিনি বৈষ্ণব মতবাদের হলধরের প্রতিভূ বলেই বিবেচিত হন।

উড়িষ্যার মহাকবি সরলা দাস ও 'পঞ্চসখা তত্ত্ব' জগন্নাথ উপাসনার ক্ষেত্রে নতুন ধারার সূচনা করেন। শ্রীচৈতন্যের পাঁচজন শিষ্য বলরাম, জগন্নাথ, যশোবন্ত, অনন্ত ও অচ্যুত ত্যাগ ও যোগতত্ত্ব প্রচার করেন। জগন্নাথ উপাসনার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির পশ্চাতে এঁদের অবদান স্মরণ করে *ড. কানুচরণ মিশ্র* লিখেছেন : *"These five poet sages are not only regarded as the five elements constituting Jagannatha but also are considered as the very*

essence of the Lord, a living god enshrined in the hearts of the children of the soil." Bengal past and present গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, মানুষের হৃদয়ে ও মননে জগন্নাথ তত্ত্বের প্রভাব এতটাই গভীর যে কেবল সমগ্র উড়িষ্যাকে উদ্বেলিত করেনি, মুসলিম শাসনাধীনে ভারতে হিন্দুদেরও অনুপ্রাণিত হতে সাহায্য করেছিল।[1] পঞ্চসখা সম্প্রদায় জগন্নাথ উপাসনার সাথে শূন্যবাদের ধারণাকে গভীরভাবে যুক্ত করেন। বৌদ্ধ-বজ্রযান ধর্মের এই শূন্যবাদ বৈষ্ণববাদের মধ্যে আরোপিত হয় এবং বৈদান্তিক দর্শনের *'নির্গুণ ব্রহ্ম'*-এর ধারণার সাথে এর মিল খুঁজে পাওয়া যায়। বলরাম দাস তাঁর *'সারস্বত গীতা'* গ্রন্থে *'শূন্য'* ও *ব্রহ্ম*কে একই ধারণার প্রকাশ বলে উল্লেখ করেছেন। *অচ্যুতানন্দ দাস 'শূন্য সংহিতা'* গ্রন্থে বলেছেন যে, শূন্য হল সৃষ্টির কারণ, শূন্য পুরুষ হলেন আদি, নির্গুণ নিরাকার। জগন্নাথ সেই আদি পুরুষ। তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের মতে, জগন্নাথ শূন্য পুরুষ। শুভদ্রা হলেন 'যোগমায়া' (Union of space) এবং বলভদ্র হলেন 'কালরূপ' (Time)। ড. *রাধাকৃষ্ণের* ব্যাখ্যানুযায়ী পুরীধামে বৌদ্ধ ধর্মের বৈষ্ণব ধর্মে রূপান্তর ঘটে এবং গৌতম বুদ্ধকে উৎসর্গীকৃত মন্দিরের কৃষ্ণরূপী জগন্নাথের অধিষ্ঠান ঘটে। উপনিষদ ও পুরাণ-কথিত গুরুবাদ তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে সর্বাধিক গুরুত্ব পায়। এই গুরুবাদ জগন্নাথ উপাসনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জগন্নাথ হলেন ব্যক্তি ও সমগ্র জগতের *'পরমগুরু'* ও *'স্রষ্টা'।* বৈষ্ণব ধর্ম বিশ্বাসের মত 'ধর্মপূজা বিধান' গ্রন্থেও বলা হয়েছে যে, নবম অবতারে ঈশ্বর (হরি) জগন্নাথ নাম নিয়ে ধরায় অবতীর্ণ হন এবং সমুদ্রতীরে নিজ আবাস প্রতিষ্ঠা করেন। এখান থেকেই তিনি জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে 'প্রসাদ' বিতরণ করে মুক্ত করেন। *('In the Ninth incarnation god was born as Jagannath, who was none but Lord Buddha, and he settled his residence on the sea coast, where he was relieved the whole world by distributing to all his prasada)*[2] । পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের প্রবেশ পথে তাই নবম অবতার রূপে জগন্নাথকে বুদ্ধদেবের প্রতিনিধি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থে জগন্নাথকে উড়িষ্যার হিন্দু-মুসলমান সকলেরই সমন্বয়কারী ও ত্রাতা রূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

জগন্নাথ মন্দিরের বিগ্রহগুলির অবয়ব অসম্পূর্ণ। এ প্রসঙ্গে একাধিক অলৌকিক লোকশ্রুতি প্রচলিত আছে। অনেকের মতে, আদি উপজাতীয় সংস্কৃতির প্রভাব এবং শিল্পকলার অজ্ঞতা জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলভদ্রের এরূপ অসম্পূর্ণ রূপকল্পের মূল কারণ। কিন্তু প্রশ্ন হলো, পরবর্তীকালে সভ্যতা-সংস্কৃতির রূপান্তরের পরেও পুরীর মন্দিরে সপার্ষদ জগন্নাথ দেবের অবয়বের অসম্পূর্ণ রূপ কেন পরিবর্তন করা হলো না। কেউ কেউ মনে করেন কালাপাহাড়ের আক্রমণের ফলে প্রভুর মূর্তির এই অসম্পূর্ণ দেহরূপ ঘটেছে। এক্ষেত্রেও প্রশ্ন জাগে যে, পরবর্তীকালে রাজপরিবার কেন নবরূপে তাঁদের প্রতিষ্ঠা করেননি। এ প্রসঙ্গে একটি দার্শনিক ব্যাখ্যা অনেককে আকৃষ্ট করে। এই মতে, সপার্ষদ জগন্নাথের এই দেহরূপ প্রতীকী মাত্র। যিনি পরম ব্রহ্ম, যাঁর আকার নেই তাঁকে কিভাবে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এই অসম্পূর্ণ রূপ পরম প্রভুর রূপ যে ব্যাখ্যার অতীত, বর্ণনার অতীত এবং চিন্তার অতীত, তাই প্রকাশ করে।

এই অবয়ব অসীমকে অসীম রূপেই উপস্থাপিত করেছে। এঁদের সাথেই আছেন রূপহীন রূপধারী সুদর্শন। একাধারে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অস্ত্র এবং অন্যধারে পরিবর্তনশীল জগতের প্রতীক হিসেবে সুদর্শনের কল্পনা। *তিনটি মূর্তির স্বতন্ত্রগাত্র বর্ণও ব্যঞ্জনাময়।* প্রকৃতি বা শক্তির প্রতীক শুভদ্রা *পীতবর্ণা। অর্থাৎ তিনি ইহজাগতিক সকল জীব ও তাদের গতিপ্রকৃতির* উৎস। সৃষ্টি ও কাল পরিক্রমার সঙ্গে সঙ্গে ইহজাগতিক জীব ও বস্তুর বর্ণ পরিবর্তিত হয়। কিন্তু আদিতে তা সবই পীতবর্ণ থাকে। বলভদ্র হলেন বিশুদ্ধতা বা বিশুদ্ধ অনির্ণীত আত্মার (Pure indeterminate spirit) প্রতীক। তাই তাঁর বর্ণ শ্বেতশুভ্র, যা একই সাথে সকল দৃশ্যমান বর্ণের সমন্বয় ও অস্বীকৃতি। মহাপ্রভু জগন্নাথ কৃষ্ণবর্ণ। এই বর্ণ সকল বর্ণের অস্বীকৃতি বা বর্ণহীনতার প্রতীক। জগন্নাথকে কেন্দ্র করে যে রহস্যময়তার আবরণ আছে, এই বর্ণ তারই প্রকাশ।

ভারতীয় সংস্কৃতির ধারায় জগন্নাথ উপসানার গুরুত্ব অসীম। জগন্নাথ কোন বিশেষ অঞ্চল বা জাতির দেবতা নয়। শাক্ত, শৈব, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব ও উপজাতীয় সংস্কৃতির সমন্বয়ে জগন্নাথ প্রকৃত অর্থেই মানুষের দেবতায় পরিণত হয়েছেন। ভারতের নানাভাষায় তাঁর মহিম বর্ণিত হয়েছে। এতে সমৃদ্ধ হয়েছে আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্য। বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব এই দুটি সংস্কারবাদী ধর্মদর্শনের সমন্বয়ে জগন্নাথ উপাসনা উড়িষ্যা তথা ভারতের অন্যতম সংস্কারকামী আন্দোলনের পথ প্রদর্শকে পরিণত হয়েছে।

○ পূর্ব ভারতে বৈষ্ণব আন্দোলন ঃ

বৈষ্ণব ধর্মের উদ্ভব ঘটে পশ্চিম ভারতে। *ড. নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের* মতে, বৈষ্ণব ধর্মের আদি প্রবক্তারা ছিলেন সম্ভবত যাদব উপজাতির (ট্রাইব) ভাঙনের যুগের মানুষ। প্রাথমিক পর্বে এই ট্রাইবের বীর সন্তান কৃষ্ণ ও তাঁর জ্ঞাতিরা দেবতার পর্যায়ে উন্নীত হন। পরবর্তীকালে তাঁদের প্রধান দেবতা কৃষ্ণ সুপ্রাচীন বৈদিক দেবতা বিষ্ণুর সাথে অভিন্ন বলে গৃহীত হন। এই কারণে ভাগবত ধর্ম পরবর্তী পর্যায়ে বৈষ্ণব ধর্ম নামে পরিচিত হয়। দেবতা কৃষ্ণের নামের সাথে আরো দুটি ধারার সংযোগ দেখা যায়। একটি ধারার ভিত্তি ছান্দোগ্য উপনিষদ। এখানে কৃষ্ণ দেবকীর পুত্র। অন্য ধারায় কৃষ্ণ পশ্চিম ভারতের পশুপালক আভীর উপজাতির দেবতা। পরবর্তীকালের সাহিত্যে গোপীদের সাথে কৃষ্ণের লীলা-সংক্রান্ত যে সকল কাহিনী পাওয়া যায়, তা আসলে এই পশুপালক দেবতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে।

পূর্ব ভারতে দেবতা রূপে বিষ্ণুর আরাধনার দৃষ্টান্ত সুপ্রাচীন লিপিতে পাওয়া যায়। বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পর্বত গুহায় রাজা চন্দ্রবর্মার লিপিতে বাংলায় বিষ্ণুপূজার উল্লেখ পাওয়া যায়। চন্দ্রবর্মা সম্ভবত খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে বাংলার শাসক ছিলেন। *রমেশচন্দ্র মজুমদার* 'বাংলার ইতিহাস' (১ম খণ্ড) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, সপ্তম শতকের উৎকীর্ণ লিপিতে দেখা যায় বাংলার পূর্ব প্রান্তে অরণ্য প্রদেশে অনন্তনারায়ণ মন্দিরে বিষ্ণুর উপাসনা হত। বাংলার সেনবংশীয় রাজারা ছিলেন বিষ্ণুর উপাসক। রাজা লক্ষ্মণ সেন ছিলেন পরম বৈষ্ণব। অষ্টম শতক থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে পূর্ব-ভারতে বৈষ্ণব ধর্মের জনপ্রিয়তার নিদর্শন হিসেবে সমকালে প্রাপ্ত অসংখ্য বিষ্ণুমূর্তির কথা উল্লেখ করা যায়। বিশিষ্ট কবি জয়দেব কৃষ্ণের মহিমা বর্ণনামূলক অমর ও জনপ্রিয় কাব্যগ্রন্থ *'গীতগোবিন্দ'* এই সময়েই রচনা করেন।

ষোড়শ শতকে পূর্ব ভারতে বৈষ্ণব ধর্ম আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন চৈতন্যদেব (১৪৮৬-

১৫৩৩ খ্রীঃ)। তাঁর পিতা জগন্নাথ মিশ্র ছিলেন বিশিষ্ট সংস্কৃত পণ্ডিত। মাত্র ৪৭ বৎসর বয়সে তাঁর দেহান্তর ঘটে। কিন্তু এই স্বল্প পরিসর জীবনে তিনি বাংলা তথা পূর্ব ভারতের ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রে এক দীর্ঘস্থায়ী আলোড়ন সৃষ্টি করে যান। কৈশোরে অতি-দুরন্ত নিমাই যৌবনে কৃষ্ণপ্রেমে আপ্লুত হয়ে বাংলা ও উড়িষ্যার সমাজ ও ধর্মজীবনে ভক্তিবাদের জোয়ার আনেন। বৃন্দাবন দাস বিরচিত *'চৈতন্য ভাগবত'* ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ-এর *'চৈতন্য চরিতামৃত'* গ্রন্থ থেকে তাঁর জীবন ও কর্মের বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়। চৈতন্যদেব নিজে কোন তত্ত্বমূলক গ্রন্থ রচনা করেননি। তবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ বিশ্বাস করেন যে *'দশমূল-শ্লোক'* শ্রীচৈতন্যের নিজস্ব রচনা। ১৫০৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গয়াধামে গিয়ে ঈশ্বর পুরীর কাছে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা নেন। কাটোয়ায় কেশব ভারতী তাঁকে সন্ন্যাস দেন। চৈতন্যের দীক্ষাগুরু ও সন্ন্যাসগুরু উভয়েই ছিলেন *'মাধব'* সম্প্রদায়ভুক্ত। চৈতন্য নিজেকেও এই সম্প্রদায়ের সদস্য বলে গণ্য করতেন।

জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে চৈতন্যদেব সকলকে কৃষ্ণপ্রেমে অনুপ্রাণিত করেন। তিনি প্রচার করেন যে শুধু কৃষ্ণ নাম নিয়ে জীব মুক্তি লাভ করতে সক্ষম। ড. *নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের* মতে, চৈতন্যদেব যে মত প্রচার করেন তা *'অচিন্ত ভেদাভেদ'* নামে পরিচিত। চৈতন্য ও তাঁর অনুগামীরা শংকরাচার্য প্রচারিত *'নির্গুণ ব্রহ্মের পরমতত্ত্ববাদ'*কে অস্বীকার করেন। এঁদের মতে, পরমতত্ত্ব হচ্ছেন সেই ব্রহ্ম যিনি এই বিশ্বজগতের প্রভুস্বরূপ এবং একই সঙ্গে বিশ্বের জীবকুলের সাথে যাঁর প্রেম ও স্নেহের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান। চৈতন্যবাদে ঈশ্বর ও তাঁর শক্তি হলেন যথাক্রমে কৃষ্ণ ও রাধা। অচিন্ত্য ভেদাভেদ হলো ঈশ্বর, জীবসমূহ ও জড় জগতের মধ্যে সম্পর্কের ধারণা। জীবশক্তি ও মায়াশক্তি ঈশ্বরের স্বরূপ শক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপ। তবে তাঁর আর একটি বিশ্বাতীত রূপ আছে। তিনি বিভিন্ন শক্তি ব্যবহার করলেও তা পূর্ণ ও অপরিবর্তিত থাকে। ঈশ্বর তাঁর বিভিন্ন শক্তির ব্যবহারের মধ্য দিয়ে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের অতিক্রম করে এই সকল শক্তির সাথে অচিন্ত্য ভেদাভেদ সম্বন্ধসহ নিজেকে প্রকাশিত করেন।

কৃষ্ণই পরম ব্রহ্ম। তিনি অসীম ও পূর্ণ চৈতন্য স্বরূপ। চিৎশক্তি যুক্ত জীবাত্মা তাঁর একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ। তবে অংশী ও অংশ অভেদ হলেও ; জীবাত্মার পৃথকসত্তা হেতু পরম ব্রহ্ম ও জীবাত্মার মধ্যে সূক্ষ্ম প্রভেদ বর্তমান। কৃষ্ণ মায়াশক্তি রূপে গোটা বিশ্বজগৎ আচ্ছাদিত করে আছেন। প্রভাব বিলাস ও বৈভব বিলাস এই দুই শক্তির মাধ্যমে তিনি বহুরূপে নিজের প্রকাশ ঘটান। প্রভাব বিলাস দ্বারা তিনি গোপীদের সাথে রাসলীলা কালে বহু কৃষ্ণে পরিণত হন। আবার বৈভব বিলাস শক্তির বশে তিনি বাসুদেব (বুদ্ধি), সংকর্ষণ (চেতনা), প্রদ্যুন্ন (প্রেম) ও অনিরুদ্ধ (লীলা) এই চতুর্ব্যূহ রূপ পরিগ্রহ করেন। কেবল নাম সংকীর্তনের মাধ্যমে পরমব্রহ্ম কৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ করা যায়।

বাংলা ও উড়িষ্যার চৈতন্যবাদের সর্বাধিক জনপ্রিয়তা দেখা যায়। পাপী-তাপী, দীন-হীন সকল মানুষকে তিনি হতাশার অন্ধকার ও বৈষম্যের গ্লানি থেকে মুক্ত করে নবজীবনের আশ্বাস দেন। *স্যার যদুনাথ সরকারের* মতে, এক ঐতিহাসিক মুহূর্তে চৈতন্যদেব পূর্ব-ভারতে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করে অধঃপতিত হিন্দু সমাজকে রক্ষা করেন। *অধ্যাপক সুকুমার সেন* চৈতন্যদেবের মতাদর্শকে কোন বিশেষ ধর্মীয় দিক থেকে বিচার না করে সামাজিক উপযোগিতার (social utility) দিক থেকে দেখা উচিত বলে মনে করেন। চৈতন্যদেবের আন্দোলন ছিল নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চেতনা

প্রসারের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের এক বলিষ্ঠ অথচ নম্র পদক্ষেপ। ড. *সেনের* মতে, এটিই ছিল বাঙালীর প্রথম জাগরণ। চৈতন্যদেবের জীবন ও দর্শনতত্ত্বকে ভিত্তি করে পূর্ব-ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতিতে ব্যাপক পরিবর্তনের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়।

আসামে বৈষ্ণবধর্ম ও ভক্তিবাদ প্রচার করেন ***শংকরদেব*** (১৪৮৬-১৫৬৮ খ্রীঃ)। তাঁর পিতা ও মাতা ছিলেন যথাক্রমে কুসুমবর ও সত্যসন্ধা। অল্প বয়সে তিনি পিতৃমাতৃহীন হন। বাল্যকাল থেকেই সাহিত্যচর্চায় তাঁর ঝোঁক দেখা যায়। চিত্রাঙ্কনেও তাঁর সহজাত দক্ষতা ছিল। শংকরদেবকে অসমীয়া সাহিত্যের জনক বলা যায়। যৌবনে তিনি নওগাঁ জেলায় এসে বসবাস শুরু করেন। এখানে তিনি বিবাহ করে সংসার ধর্মে ব্রতী হন। কিন্তু অল্পবয়সে পত্নী-বিয়োগের ফলে তাঁর মন ঈশ্বরমুখী হয়। তীর্থদর্শনে বেরিয়ে তিনি বৃন্দাবন, মথুরা, বদরিকাশ্রম, গয়া, কাশী, পুরীধাম, দ্বারকা, রামেশ্বরম প্রভৃতি পুণ্যস্থান পরিভ্রমণ করেন। ভারতের নানাপ্রান্তে ভক্তিবাদী বৈষ্ণব ধর্মের জনপ্রিয়তা তাঁকে আপ্লুত করে। নামসংকীর্তনের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের দর্শনতত্ত্ব শংকরদেবকে গভীরভাবে আকর্ষিত করে। পুরীধামে এসে তিনি স্বয়ং চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ পান। এই সময় তাঁকে পুনরায় সংসারমুখী করার জন্য তাঁর আত্মীয়রা শংকরের দ্বিতীয় বিবাহের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু বিবাহ করতে বাধ্য হলেও, শংকর আধ্যাত্ম চিন্তায় বিভোর থাকেন। ভগবত পুরাণের বক্তব্য তাঁর মনকে উতলা করে তোলে।

এই সময় বাংলা, উড়িষ্যা ও আসাম শাক্তধর্ম ও তন্ত্রাচারের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। পুরীর জগন্নাথদেব উপজাতীয় দেবতা ছিলেন বলে মনে করা হয়। কালক্রমে তাঁর উপর বৈষ্ণববাদের আবরণ দেওয়া হয়েছে। তবে তাঁর পূজার্চনার ক্ষেত্রে শাক্ততান্ত্রিক রীতির প্রভাব ও প্রকাশ স্পষ্ট। অনুরূপভাবে গৌহাটির কামাখ্যাদেবী আসলে খাসি উপজাতির মাতৃদেবী, যিনি পরে শাক্ততান্ত্রিক দেবীতে রূপান্তরিত হয়েছেন। শংকরের উদার ভাষ্য দ্রুত আসামে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি ও সাহিত্য রচনায় তাঁর দক্ষতা সহজেই শংকরের দর্শনতত্ত্ব মানুষের হৃদয়ে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়। তিনি প্রথমে সহজ-সরল ভাষায় ভাগবতের অনুবাদ করেন। কামরূপী ভাষায় ভাগবত ব্যাখ্যা করেন। গান, নাটক ও ছোটছোট কাব্যগাথা রচনা করে তিনি মানুষের মন জয় করে নেন। কামরূপী ভাষায় মার্কণ্ডেয় পুরাণের রাজা হরিশচন্দ্রের কাহিনী এবং ভাগবত পুরাণের কয়েকটি অধ্যায় অনুবাদ করেন। বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে ভক্তিধর্মের সারাৎসার সংগ্রহ করে তিনি *'ভক্তি রত্নাকর'* গ্রন্থটি রচনা করেন। *'ভক্তি প্রদীপ'* শীর্ষক গ্রন্থে তিনি ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। তাঁর গ্রন্থ এবং কীর্তনের ভাব ও ভাষা আসামের জনগণের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। তিনি ছ'টি একাংক নাটক (অনকিয়া নাট্য) রচনা করেন। এর মধ্যে পাঁচটিরই বিষয়বস্তু ছিল পরমব্রহ্ম কৃষ্ণের জীবন ও দর্শনভিত্তিক। কামরূপী ভাষায় কৃষ্ণ ও রামকে ব্রহ্মারূপে কল্পনা করে শংকরদেব অনেকগুলি গীতও (বরগীত) রচনা করেন। তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে কুচবিহারের কোচরাজা তাঁকে সেই রাজ্যে আশ্রম স্থাপনের অনুরোধ জানান। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ সমাজ শংকরদেবের বিরুদ্ধে বহু প্রচার চালান। কিন্তু শংকরের উদার দর্শনতত্ত্ব ও ভক্তিবাদ আসামের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রচার লাভ করে।

শংকরদেবের ভক্তিবাদের মূল কথা হলো *ভক্ত ও ভগবানের মিলন*। জ্ঞান বা কর্মযোগের পরিবর্তে তিনি ভক্তিযোগের উপর বেশি গুরুত্ব দেন। ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থে তিনি ঘোষণা করেন যে

'জীব' ও *'জগত'* ব্রহ্ম থেকে স্বতন্ত্র নয়। জীবজগত ও ব্রহ্মের স্বাতন্ত্র্যের ধারণার ভিত্তি হল অজ্ঞানতা। তিনি বলেন ব্রহ্ম সম্পর্কে অভেদ-এর ধারণাই হলো 'জ্ঞান'। তিনি লিখেছেন *'ক্ষর'* ও *'অক্ষর'*-এর সমন্বয়েই এই বিশ্বজগত। ক্ষর হলো *'জীবাত্মা'* এবং 'অক্ষর' হলো *পরমাত্মা'*। পরমাত্মা সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের নির্দেশক। পরমাত্মা হলেন পুরুষোত্তম। পুরুষোত্তম কৃষ্ণই পরমাত্মার প্রতিভূ। নামসংকীর্তনের মধ্য দিয়েই পুরুষোত্তম কৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ করা যায়। ভাগবত গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *'কেবল আমাকে স্মরণ কর।'* শংকরদেব তাই এক স্মরণের কথা বলেছেন। এজন্য তাঁর ধর্মমত *'এক শরনিয়া ধর্ম'* নামে পরিচিত। 'নাম ঘর'-এর মধ্যে কীর্তন ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে তিনি ঈশ্বরকে স্মরণ করার কথা বলেন।

শংকরদেবের প্রধান শিষ্য ছিলেন মাধবদেব। মাধবদেবের মৃত্যুর (১৫৯৬ খ্রীঃ) পর তাঁদের প্রবর্তিত 'মহাপুরুষিয়া সম্প্রদায়' একাধিক উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে যায়। দামোদরদেব *'ব্রহ্মসংহতি'* বা *বামুনিয়া* সম্প্রদায় গঠন করেন। অন্য একটি সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন অনিরাজদেব। এই সম্প্রদায়ের অধিকাংশ সদস্য ছিলেন মৎস্যজীবী। এঁরা তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠানে বিশ্বাস করতেন। এই সম্প্রদায় *'মোয়া-মারিয়া'* নামে পরিচিত ছিল। শংকরদেবের পৌত্র পুরষোত্তম ঠাকুর *'ঠাকুরিয়া'* সম্প্রদায় গঠন করেন। তাঁরই জনৈক অনুচর গোপালদেব *'কালসংহতি'* নামে অপর একটি সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব দেন। পূর্ববঙ্গে চৈতন্যবাদের প্রসার ঘটান নরোত্তম ঠাকুর। চৈতন্যদেব জাতিভেদ প্রথার বিরোধিতা করার কারণে নিম্নবর্ণের বহু মানুষ চৈতন্যবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। ধনী বণিকদের অনেকেই বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

দিল্লী-সুলতানির ভাঙনে উদ্ভূত আঞ্চলিক রাজ্যসমূহ
[Disintegration of the Sultanate ; Rise of Provincia' Kingdoms]

আক্ষরিক অর্থে দিল্লী-সুলতানির পতন ঘটেছিল পানিপথের প্রান্তরে সুলতান ইব্রাহিম লোদীর পরাজয় এবং জহিরুদ্দিন মহম্মদ বাবর কর্তৃক মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠার সাথে (১৫২৬ খ্রীঃ)। কিন্তু প্রকৃত অর্থে এই ভাঙনের সূচনা হয়েছিল অনেক আগেই সুলতান মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের রাজত্বকালে। মহম্মদ তুঘলকের অবাস্তব পরিকল্পনাসমূহের উপর্যুপরি ভ্রান্তি ইত্যাদি একাধিক কারণে সুলতানি শাসন যখন অস্থির, তখন উচ্চাকাঙ্খী প্রাদেশিক শাসকরা আঞ্চলিক স্বাধীনতা অর্জনের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার সুযোগ পান। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে একের পর এক বিদ্রোহ দেখা দেয়। বিদ্রোহদমনের জন্য সুলতান দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে বেড়ান। কয়েকটি ক্ষেত্রে বিদ্রোহ দমনে তিনি সফলও হয়েছিলেন। কিন্তু ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়া ছিল বেশি ক্ষতিকর। দক্ষিণ-ভারতে স্থাপিত হয স্বাধীন বিজয়নগর সাম্রাজ্য। দাক্ষিণাত্যের আরও উত্তরে বহিরাগত মুসলমানরা দৌলতাবাদকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠা করেন স্বাধীন মুসলমান রাজ্য। পরে এটিই 'বাহমনী সাম্রাজ্যে' পরিণত হয়। পূর্ব-ভারতে বাংলাদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। যে মহম্মদ তুঘলকের আমলে দিল্লী-সুলতানি বিস্তৃতির সর্বোচ্চ-সীমায় পৌঁছেছিল ; সেই মহম্মদের রাজত্বের শেষ পর্বে শুরু হয়েছিল ভাঙনের অধ্যায়। পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার ক্রমিক অবনতি ; তৈমুর লঙ্গের বিধ্বংসী আক্রমণ, তুঘলবংশীয় শাসনের অবসান ইত্যাদির সুযোগে কয়েকজন প্রাদেশিক শাসক এবং ছোট ছোট স্বশাসিত রাজ্যের রাজারা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। দাক্ষিণাত্যের বাহমনী ও বিজয়নগর রাজ্যে এবং পূর্ব ভারতে বাংলাদেশ-এর পথে অগ্রসর হয় পশ্চিম-ভারতের সিন্ধু ও মুলতান, গুজরাট, মালব ও জৌনপুর (পূর্ব-উত্তরপ্রদেশ)। আজমীর থেকে মুসলমান শাসনকর্তাকে বিতাড়িত করে রাজপুতানার রাজ্যগুলিও তাদের হৃতস্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করে। ১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সুলতানি সাম্রাজ্যের পরিধি উত্তরভারতের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

তুঘলক-শাসনের অবসান ও মুঘল-সাম্রাজ্যের উত্থানের অন্তবর্তী কালে ভারতের রাজনৈতিক কেন্দ্রবিন্দু দিল্লী থেকে অন্তর্হিত হয়েছিল। আলোচ্যপর্বে উত্তর-ভারতের সদ্য-স্বাধীন রাজ্যগুলির ক্ষমতাদখলের চেষ্টা এবং দিল্লীর সৈয়দ ও লোদী বংশীয় শাসকদের সুলতানির মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যর্থ প্রচেষ্টার মধ্যেই ভারতের রাজনৈতিক কর্মসূচী সীমাবদ্ধ হয়েছিল। তবে এই সময় আঞ্চলিক রাজ্যগুলির মধ্যে শক্তিসাম্য বজায় রাখার নির্দিষ্ট প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ এই সকল রাজ্যের রাজনৈতিক কর্মসূচীর মধ্যে বৃহত্তর সাম্রাজ্যস্থাপনের প্রয়াস যেমন দেখা যায়নি ; তেমনি কোন একটি বিশেষ রাজ্যের শক্তিবৃদ্ধির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে অন্যান্যদের উদ্যোগেরও অভাব ছিল না। পশ্চিম-ভারতে গুজরাট, মালব ও মেবার একে অপরের

শক্তিবৃদ্ধির পথে বাধা হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকে। বাংলাদেশের সাথে সংঘাত চলে উড়িষ্যা ও জৌন্যপুরের মধ্যে। লোদীদের দ্বারা জৌনপুর অধিকৃত হলে একদিকে বাংলার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে লোদীশাসক রাজপুতনা ও মালবে কর্তৃত্ব-বিস্তারের কাজে উদ্যোগী হন। *অধ্যাপক সতীশচন্দ্রর* মতে, এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী রাজ্যই উত্তর-ভারতের কর্তৃত্ব অর্জনের অধিকারী হত। সম্ভবত, এই কারণে রানা সংগ্রাম সিংহ দিল্লীর বিরুদ্ধে বাবরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল মুঘলের সাহায্যে লোদী-শক্তিকে ধ্বংস করে মেবারকে উত্তর ভারতের নেতৃশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। অবশ্য এই ঘটনা সত্যি হলে স্বীকার করতে হয় যে, রানা সংগ্রামের মধ্যে দেশপ্রেমের অভাব হয়তো ছিল না, কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাব অবশ্যই ছিল।

○ বিজয়নগর সাম্রাজ্য ঃ

বিজয়নগর সাম্রাজ্যের উৎপত্তি সম্পর্কে নানা মত প্রচলিত আছে। তবে দু'টি প্রাথমিক বিষয়ে সবাই একমত যে, মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের আমলে দাক্ষিণাত্যের তুর্কী-মুসলমানদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া এই হিন্দুরাজ্যের উৎপত্তির প্রেরণা দিয়েছিল এবং সঙ্গমবংশীয় দুই ভাই *হরিহর* এবং *বুক্ক* ছিলেন এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। ঐতিহাসিক *সীওয়েল (Sewell)* তাঁর বিখ্যাত *'এ ফরগটন এম্পায়্যার'* গ্রন্থে বিজয়নগরের উৎপত্তি সম্পর্কে সাতটি কিংবদন্তীর উল্লেখ করেছেন। এগুলির মধ্যে হরিহর ও বুক্ক সম্পর্কিত কাহিনীটি একাধিক পণ্ডিতের বক্তব্যে সমর্থিত হয়েছে। সিওয়েল লিখছেন যে, বরঙ্গলের কাকতীয়বংশের অধীনে সামন্ত হিসেবে সঙ্গমবংশ নিয়োজিত ছিল। কাকতীয়বংশীয় রাজা প্রতাপরুদ্রদেবের অধীনে সঙ্গমবংশীয় হরিহর ও বুক্ক নামক দুই ভাই নিয়োজিত ছিলেন। সুলতানি-বাহিনী বরঙ্গল আক্রমণ করলে এই দুই ভাই হোয়সলরাজ তৃতীয় বীরবল্লালের রাজ্যে চলে আসেন এবং তাঁর অধীনের চাকুরি গ্রহণ করেন। সুলতানি-বাহিনী হোয়সলরাজ্য আক্রমণ কালে এই দুই ভাইকে বন্দী হিসেবে দিল্লীতে নিয়ে যায়। সেখানে তাদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয়। পরে দাক্ষিণাত্যের হিন্দু বিদ্রোহকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে মহম্মদ তুঘলক এদের আনেগুণ্ডিতে শাসকপদে নিযুক্ত করেন। পরে সুযোগমত এঁরা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং স্বাধীন বিজয়নগর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

ইতিহাসবিদ্ *ভেঙ্কটরামনাইয়া (N. Venkataramanayya)* এবং ড. *রমেশচন্দ্র মজুমদার* বিজয়নগর রাজ্যের উৎপত্তির মূল প্রেরণা হিসেবে দাক্ষিণাত্যে মুসলিম-বিরোধী-হিন্দু-প্রতিক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। ড. *স্মিথ (V. A. Smith)* লিখেছেন ঃ *"There is however no doubt that the new power was the outcome of the efforts made by the five brothers, sons of Sangama, to stay the tide of the Muslim invasion and preserve the Hindu Dharama in the penisula."* এঁদের মতে, শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষমতাদখলের উচ্চাকাঙ্খা নয় ; বিজয়নগর রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল দাক্ষিণাত্যে ক্রমপ্রসারমান মুসলিম অধিপত্যকে বাধা দেবার জন্য। ড. *মজুমদারের* মতে, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্র এবং কৃষ্ণা-তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণতীরের হিন্দু রাজ্যগুলির মধ্যে মুসলমান সম্প্রসারণ-বিরোধী একধরনের শক্তিজোট গড়ে উঠেছিল। এর অন্যতম কারণ হল দক্ষিণভারতে মুসলমান শক্তির অগ্রগতির প্রাথমিক চরিত্র যতটা রাজ্যবিজয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল, তার থেকে অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ ছিল একদল শক্তিশালী

মানুষের দম্ভপূর্ণ কর্তৃত্ব জাহির করা ও লুঠতরাজের মানসিকতার সাথে। দক্ষিণ-ভারতের যেখানেই মুসলমান-বাহিনী গিয়েছে, সেখানেই তারা ধ্বংস ও মৃত্যু বয়ে নিয়ে গেছে। তখন দক্ষিণ-ভারতে হিন্দুরাই ছিল সংখ্যায় ও কর্তৃত্বে গরিষ্ঠ। স্বভাবতই মুসলমান আক্রমণের ফলে হিন্দুরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সব থেকে বেশি এবং এই ক্ষতি হয়েছিল আর্থিক ও প্রতিপত্তি উভয় দিক থেকেই। এমতাবস্থায় দক্ষিণ-ভারতে হিন্দু-সম্প্রদায়ের মধ্যে যে অসন্তোষ দানা বেঁধেছিল, তাই ক্রমে মুসলিম-বিরোধী মুক্তি সংগ্রামের রূপ নেয়। মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের আমলে হিন্দু প্রতিক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কৃষ্ণা-গোদাবরী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে জনৈক প্রলয় নায়ক হিন্দু-অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দেন। প্রলয় নায়ক-এর মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র *কাপায় নায়ক* (বা কৃষ্ণ নায়ক)- এর নেতৃত্বে হিন্দু-সংগঠন আরো জোরদার হয়। দক্ষিণ- ভারতের প্রায় পঁচাত্তর জন হিন্দু নায়ক কৃষ্ণ নায়কের নেতৃত্বে আন্দোলন চালিয়ে যান। হোয়সলরাজ তৃতীয় বীর-বল্লালের সহায়তায় তিনি বরঙ্গলের মুসলমান গভর্নর মালিক মকবুলকে বিতাড়িত করে অন্ধ্র অঞ্চল মুসলিম-কর্তৃত্বমুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ক্রমে এই হিন্দু-জাগরণ পশ্চিম দাক্ষিণাত্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। তুঙ্গভদ্রার উপকূল অঞ্চলে চালুক্য সোমদেবের নেতৃত্বে হিন্দুরা সংঘবদ্ধ হন। কাম্পিলির মুসলমান গভর্নর মালিক মহম্মদের বিরুদ্ধে সোমদেব ব্যাপক আন্দোলন শুরু করেন। পর্তুগীজ পর্যটক *নুনিজ*-এর বর্ণনা থেকেও কাম্পিলির নিকবর্তী আনেগুন্ডিতে হিন্দু-কর্তৃত্ব স্থাপনের কাহিনী সমর্থিত হয়েছে। সুলতান মহম্মদ-বিন্-তুঘলক কূটনৈতিক উপায়ে কাম্পিলি পুনঃরুদ্ধারের উদ্যোগ নেন। তিনি ইতিপূর্বে হরিহর ও বুক্ক নামক দু'ভাইকে কাম্পিলি থেকে বন্দী করে রাজধানীতে এনেছিলেন। এঁরা ইসলামে ধর্মান্তরিতও হয়েছিলেন। মহম্মদ আনুগত্যের শপথ করিয়ে নিয়ে এই দুই ভাইকে কাম্পিলির শাসক পদে নিয়োগ করেন। সুলতানের উদ্দেশ্য প্রাথমিক পর্যায়ে সফল হয়। আনেগুন্ডিতে এই দুই ভাই জনসমর্থনলাভে সমর্থ হন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই এই দুই ভাই দিল্লীর আনুগত্য অস্বীকার করেন। এঁরা বুঝতে পারেন যে, দিল্লীর বহু দূরে অবস্থিত এই হিন্দুপ্রধান অঞ্চলে দিল্লী-সুলতানির আধিপত্য বজায় রাখা খুবই কষ্টকর। আবার দিল্লীর প্রভাবমুক্ত স্বাধীন সুলতানি প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করা প্রায় অসম্ভব। এমতাবস্থায় হরিহর এবং বুক্ক ইসলামধর্ম ত্যাগ করে পুনরায় হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে স্বাধীন হিন্দুরাজ্যের সূচনা করেন।

ইসামী ও *বরণীর* রচনাতেও জনৈক বিধর্মী কর্তৃক কাম্পালায় স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার কাহিনী উল্লেখিত হয়েছে। স্বধর্মে প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে হরিহর ও বুক্ককে প্রভাবিত করেন তাঁদের গুরু মাধব বিদ্যারণ্যে। স্বধর্মে প্রত্যাবর্তনের কাজটাও খুব সহজ ছিল না। কারণ হিন্দু ধর্মে কোন অন্য ধর্মাবলম্বীকে পুনর্গ্রহনের রীতি ছিল না। তাছাড়া, মুসলিম শাসকের প্রতিনিধি হবার ফলে এই দুই ভাইকে হিন্দুরা কিছুটা সন্দেহ ও অবিশ্বাস করত। হিন্দুদের এই সন্দেহ দূর করার জন্য বিদ্যারণ্যে তাঁর শৃঙ্গেরীর অদ্বৈত মঠের প্রধান বিদ্যাতীর্থের শরণাপন্ন হন। বিদ্যারণ্যে তাঁর গুরুকে বোঝান যে, মুসলমানদের হাত থেকে হিন্দুধর্মকে রক্ষা করার জন্য এই দু'জনকে হিন্দুধর্মে পুর্নগ্রহণ আবশ্যিক। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত তিনি সফল হন। জনগনকে সন্তুষ্ট করার জন্য ঘোষনা করা হয় যে, হরিহর ভগবান শ্রীবিরূপাক্ষের প্রতিনিধি রূপেই দেশ শাসন করবেন। এজন্য হরিহর

'শ্রীবিরূপাক্ষ' নাম গ্রহণ করেন এবং এই নামেই সমস্ত সরকারি নথিতে স্বাক্ষর দেন। ১৩৩৬ খ্রীষ্টাব্দে হরিহর 'হাম্পি-হস্তিনাবতী'র রাজা হিসেবে অভিষিক্ত হন। এই বিজয়কে স্মরণীয় করে রাখার জন্য তুঙ্গভদ্রার তীরে নতুন রাজধানী বিজয়নগর-এর ভিত্তি স্থাপন করেন। ঐতিহাসিক *দেশাই* একটু স্বতন্ত্রভাবে এই ঘটনার ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, দাক্ষিণাত্যে হিন্দু জাগরণের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন হোয়সলরাজ তৃতীয় বীরবল্লাল। তিনিই অধীনস্থ রাজ্য হিসেবে হাম্পিরাজ্যের পত্তন করেন এবং হরিহরকে শাসক নিযুক্ত করেন। তৃতীয় বল্লাল নিহত হবার পর হরিহর স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন শুরু করেন। যাই হোক, একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, হরিহর এবং বুক্ক বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং দাক্ষিণাত্যের মুসলমান শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে প্রায় তিনশো বছর বিজয়নগর রাজ্যে নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল।

○ রাজনৈতিক ইতিহাস ঃ বাহমনী-বিজয়নগর সংঘর্ষ ঃ

ক. সঙ্গমবংশ ঃ বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হরিহর ও বুক্ক-র পিতা সঙ্গমের নামানুসারে এই রাজবংশ *'সঙ্গমবংশ'* নামে পরিচিত হয়েছে। হরিহর ও বুক্ক ছাড়াও সঙ্গমের অপর তিন পুত্র *কম্প, মুরপ্পা* ও *মুদপ্পাও* রাজনৈতিক কাজে অংশ নিতেন। হরিহর ১৩৩৬ খ্রীষ্টাব্দে সঙ্গমবংশের শাসন শুরু করেন। তবে হরিহর এবং বুক্ক সম্ভবত রাজা উপাধি গ্রহণ করেন নি। পার্শ্ববর্তী দুই শক্তিশালী রাজ্য—মহীশূরের হোয়সল রাজা এবং মাদুরাই-এর সুলতানি রাজ্যের ঈর্ষা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতামুক্ত থেকে শক্তিসংগ্রহের উদ্দেশ্যেই তাঁরা রাজকীয় উপাধি গ্রহণে দ্বিধান্বিত ছিলেন। অবশ্য সাহস ও উদ্যোগের অভাব তাঁদের আদৌ ছিল না। হরিহর জানতেন যে, অবিরত যুদ্ধের দ্বরাই তাঁকে রাজ্য রক্ষা ও বিস্তার করতে হবে। তবে সুযোগের জন্য অপেক্ষা ও সাফল্যের জন্য ধৈর্য রক্ষার মহৎ গুণ তাঁর ছিল। মাদুরার সুলতান ছিলেন উচ্চাভিলাষী। তিনি এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে হোয়সলরাজ তৃতীয় বীরবল্লালকে পরাজিত ও হত্যা করেন। অতঃপর হরিহর ও বুক্ক পতনোন্মুখ হোয়সল রাজ্যটিকে গ্রাস করতে উদ্যত হন। স্বভাবতই মাদুরার সাথে বিজয়নগরের সংঘর্ষ বাধে। সঙ্গম-ভাইয়েরা সাফল্যের সাথে মাদুরার আক্রমণ প্রতিহত করে ১৩৪৬ খ্রষ্টাব্দের মধ্যে সমগ্র হোয়সল রাজ্যটিকে বিজয়নগরের অধিকারভুক্ত করেন। বিজিত অঞ্চলের শাসনভার সঙ্গমের পুত্রগণ ও সহযোগী আত্মীয়দের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়। হোয়সল রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ থাকে হরিহরের হাতে, পূর্ব ও মধ্যভাগের দায়িত্ব পান *বুক্ক*। উদয়গিরি ও উত্তর কানাড়া অঞ্চল পান যথাক্রমে *কম্প* ও *মুরপ্পা*। মহীশূরের দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগের শাসনভার পান মুদপ্পা। এই ব্যবস্থাকে অধ্যাপক *শতীশচন্দ্র 'সমবায় লোকায়ততন্ত্র'* ধরনের শাসন বলে উল্লেখ করেছেন। এইভাবে উত্তর ও দক্ষিণে কৃষ্ণা ও কাবেরী নদীর মধ্যবর্তী ভূখণ্ড ও পূর্ব-পশ্চিম দুই সমুদ্রের মধ্যবর্তী অঞ্চল বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। *ফেরিস্তার* বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, বাহমনী রাজ্যের হাতে পরাজিত হয়ে হরিহর তাঁর রাজ্যের কিছু ভূখণ্ড সুলতান বাহমন শাহকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। হরিহরের মৃত্যুর পর ১৩৫৬ খ্রীঃ বিজয়নগরের সিংহাসনে বসেন বুক্ক। তিনি ১৩৭৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। বুক্কর প্রধান কৃতিত্ব হল প্রতিবেশী শত্রু রাজ্য মাদুরার বিরুদ্ধে সফল অভিযান চালিয়ে ঐ রাজ্যের শক্তি খর্ব করা। সম্ভবত, বুক্কর মৃত্যুর বছরেই সম্পূর্ণ মাদুরারাজ্য বিজয়নগরের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। দক্ষিণে রামেশ্বরম্ পর্যন্ত তিনি সাম্রাজ্য

সম্প্রসারিত করতে সক্ষম হন। একটি লিপিতে তিনি নিজেকে *'পূর্ব-পশ্চিম-দক্ষিণ সমুদ্রের অধিপতি'* বলে অভিহিত করেছেন।

বুক্কর সময় বাহমনী রাজ্যের সাথে বিজয়নগেরর দীর্ঘ সংগ্রামের সূচনা হয়। রাজ্যের উত্তরদিকে মুসলমান-শাসিত বাহমনী রাজ্য ছিল বিজয়নগরের সবথেকে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী। ১৩৪৭ খ্রীষ্টাব্দে বাহমনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জনৈক আফগান সৈনিক ***আলাউদ্দিন হাসান শাহ***। তিনি ***'বাহমান শাহ'*** উপাধি নিয়েছিলেন। তাই এই রাজ্যটি ***'বাহমনী রাজ্য'*** নামে পরিচিতি লাভ করে। যাই হোক, মুসলমান-শাসিত বাহমনী রাজ্যের সাথে হিন্দু-শাসিত বিজয়নগর রাজ্যের সংঘাত ছিল ইতিহাসের অনিবার্য পরিণতি। সাধারণভাবে বলা যায় যে, হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনের ধারক হিসেবে বিজয়নগর রাজ্য মুসলমান-শাসিত বাহমনী রাজ্যের বিনাশসাধনে উন্মুখ ছিল। আবার বাহমনী রাজ্যের শাসকদের হিন্দু-বিদ্বেষ অস্বাভাবিক কোন ঘটনা ছিল না। কিন্তু শুধুমাত্র ধর্মীয় বিদ্বেষ এই দুটি দক্ষিণী-রাজ্যের দীর্ঘ সংঘাতের মূল কারণ ছিল না। এই সংঘর্ষের আপাত লক্ষ্য ছিল দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক প্রাধান্য অর্জন করা। তবে সেই লক্ষ্য গভীর অর্থনৈতিক প্রয়োজনবোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল। তুঙ্গভদ্রা-দোয়াব, কৃষ্ণা-গোদাবরী ব-দ্বীপ ও মারাঠা রাজ্য—এই তিনটি সুনির্দিষ্ট অঞ্চলের উপর কর্তৃত্ব স্থাপনের সাথে অর্থনৈতিক লাভ-ক্ষতির প্রশ্ন জড়িত ছিল। (১) কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল ***তুঙ্গভদ্রা-দোয়াব*** বা ***রায়চুর-দোয়াব*** নামে পরিচিত ছিল। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য প্রাচীনকাল থেকেই এই অঞ্চলকে কেন্দ্র করে দক্ষিণী রাজ্যগুলির মধ্যে সংঘাত চলত। প্রাচীনকালে পশ্চিমী-চালুক্য ও চোলদের মধ্যে এবং পরে যাদব ও হোয়সলদের মধ্যে এই ধরনের দীর্ঘ সংঘাত ঘটেছিল। মধ্যযুগে সেই স্বার্থ-সংঘাতের ধারা লক্ষ্য করা যায় বিজয়নগর ও বাহমনী রাজ্যের মধ্যে। (২) কৃষ্ণা-গোদাবরী উপকূল অঞ্চলটি ছিল অত্যন্ত উর্বর ও বাণিজ্য-সমৃদ্ধ। এই অঞ্চলে অনেকগুলি সমৃদ্ধ ও ব্যস্ত বন্দর থাকার ফলে ব্যাপক বহির্বানিজ্য সম্ভব হত এবং কৃষিজ উৎপাদনের ক্ষেত্রও অঞ্চলটি ছিল লোভনীয়। স্বভাবতই এই সমৃদ্ধ অঞ্চলের কর্তৃত্বলাভের জন্য দক্ষিণ-ভারতের দুটি অগ্রণী শক্তির মধ্যে সংঘর্ষ ছিল অনিবার্য। (৩) বিজয়নগর-বাহমনী সংঘর্ষের তৃতীয় কারণ ছিল কোঙ্কন ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কর্তৃত্ব দখলের ইচ্ছা। পশ্চিমঘাট পর্বত ও সমুদ্রের মর্ধবর্তী কোঙ্কন অঞ্চলটি ছিল এই অঞ্চলের মধ্যে। ভারতে ভালজাতের ঘোড়া ছিল না। ভাল ঘোড়ার জন্য ভারতীয় শাসকদের নির্ভর করতে হত মধ্য-এশিয়ার ব্যবসায়ীদের উপর। গোয়া বন্দর হয়ে ঘোড়া আমদানি সহজ ছিল। তাই এই অঞ্চলের সামরিক উপযোগিতাও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তাই বিজয়নগর ও বাহমনী রাজ্য দুটি এই তিনটি অঞ্চলে আধিপত্য স্থাপনের লক্ষ্যে দীর্ঘ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল।

বিলুপ্তির পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত বিজয়নগর ও বাহমনী রাজ্যদ্বয়ের মধ্যে প্রায়ই সামরিক সংঘাত চলেছিল। এই যুদ্ধে বহু মানুষ প্রাণ হারায় এবং বিনষ্ট হয় প্রভূত ধন-সম্পদ। ধ্বংসের কাজে কোনপক্ষই পিছিয়ে ছিল না। উভয়েই অপরের গ্রাম ও নগর লুণ্ঠন করত, অগ্নিসংযোগ করত এবং স্ত্রী, পুরুষ ও শিশুদের বন্দী করে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করত। সব মিলিয়ে উভয় রাজ্যই নৃশংসতা ও বর্বরতার আশ্রয় নিত। বিজয়নগররাজ বুক্ক রায়চুর-দোয়াবে 'মুদ্গল' দুর্গ আক্রমণ করে (১৩৬৭ খ্রীঃ) এই দীর্ঘ সংঘর্ষের সূচনা করেন। বুক্ক এই আক্রমণকালে যথেষ্ট নৃশংসতার

পরিচয় দেন। এর প্রত্যুত্তরে বাহমনী রাজ্যের সুলতান একলক্ষ হিন্দুকে হত্যা করার শপথ নিয়ে বিজয়নগরের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। তিনি মুদ্‌গল দুর্গ পুনর্দখল করেন এবং তুঙ্গভদ্রা অতিক্রম করে বিজয়নগর রাজ্যে প্রবেশ করেন। এই যুদ্ধে উভয়পক্ষই সর্বপ্রথম কামান ব্যবহার করেছিল। অবশ্য তুলনামূলক ভাবে রাজ্যের অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ বাহিনী বেশি দক্ষতার পরিচয় দেন। দীর্ঘদিন যুদ্ধের পরেও ফলাফল অমীমাংসিত থেকে যায়। শেষ পর্যন্ত রণক্লান্ত উভয়পক্ষই সন্ধিস্থাপনে আগ্রহ প্রকাশ করে। শর্তানুসারে উভয়পক্ষ যুদ্ধপূর্ব অবস্থায় ফিরে যায়। এবং দোয়াব-অঞ্চল উভয়ের ভাগাভাগি হয়! উভয় রাজ্যই যুদ্ধে নিষ্ঠুরতা পরিহার করার পক্ষে মতপ্রকাশ করে। স্থির হয়, ভবিষ্যত যুদ্ধে অকারণে অসামরিক ব্যক্তিদের হত্যা করা হবে না। ড. *সতীশচন্দ্র* লিখেছেন ঃ *"কখনো কখনো এ মতৈক্য লঙ্ঘিত হলেও এই সন্ধি দক্ষিণ-ভারতের যুদ্ধবিগ্রহের মানবিকতাবোধকে জাগ্রত করতে সাহায্য করেছিল।"* বুক্ক রামেশ্বরম্ পর্যন্ত তাঁর কর্তৃত্ব প্রসারিত করেন এবং একটি লেখতে নিজেকে পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ সমুদ্রের অধিপতি বলে বর্ণনা করেছেন। শাসক হিসেবেও তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। আঞ্চলিক শাসকদের উপর তিনি কেন্দ্রের কার্যকরী নিযন্ত্রণ আরোপে সক্ষম ছিলেন। ভাষা-সাহিত্যের প্রতিও তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। তাঁর আমলে বেদের নতুন ব্যাখ্যা রচিত হয়। তেলেগু ভাষার উন্নয়নে তিনি বিশেষ আগ্রহ দেখান। তেলেগু-কবি নাচনা সোমা তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা অর্জন করেছিলেন।

বুক্কের মৃত্যুর পর সিংহসনে বসেন তাঁর পুত্র দ্বিতীয় হরিহর (১৩৭৭ - ১৪০৬ খ্রীঃ)। তিনিই সর্বপ্রথম *'মহারাজাধিরাজ' এবং 'রাজা পরমেশ্বর'* উপাধি নেন। সুযোদ্ধা দ্বিতীয় হরিহর মাদুরাই দখল করে পূর্ব উপকূলের দিকে রাজ্যবিস্তারে মন দেন। এই অংশে কয়েকটি হিন্দু-রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। এদের মধ্যে উচ্চ-ব-দ্বীপ অঞ্চলে রেড্ডিরা এবং কৃষ্ণা-গোদাবরী নিম্ন ব-দ্বীপ অঞ্চলে বরঙ্গল রাজ্য ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এই পূর্ব-উপকূলের দিকে উড়িষ্যা রাজ্য এবং বাহমনী রাজ্যের কর্তৃত্ব বিস্তারের ইচ্ছা ছিল। যাই হোক, বরঙ্গল রাজ্যের সাথে বাহমনী সুলতানের মিত্রতার ফলে হরিহরের ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। বরঙ্গল-বহামনী জোট পঞ্চাশ বছরের অধিক স্থায়ী ছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও দ্বিতীয় হরিহর বিজয়নগরের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হন। তাঁর বড় কৃতিত্ব হল যে, তিনি বাহমনী সুলতানের কাছ থেকে পশ্চিমে বেলগাঁও এবং গোয়া দখল করতে সক্ষম হয়েছিলেন। গোয়া দখল করার ফলে বিজয়নগরের আর্থিক ও সামরিক শক্তি বৃদ্ধি পায়। সম্ভবত সিংহলের বিরুদ্ধেও তিনি একটি অভিযান পাঠিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় হরিহরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রদের মধ্যে উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত বিরোধ দেখা দেয়। প্রথমে *প্রথম বিরূপাক্ষ* সিংহাসন দখল করেন। কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁকে অপসৃত করে ক্ষমতা দখল করেন *দ্বিতীয় বুক্ক*। তবে শেষ পর্যন্ত তাঁকে সরিয়ে স্থায়িভাবে সিংহাসন দখল করেন *প্রথম দেব রায়* (১৪০৬-'২২ খ্রীঃ)। তাঁর আমলে আবার বাহমনী রাজ্যের সাথে সংঘর্ষ হয়। বাহমনী-সুলতান ফিরোজ শাহ দেব রায়কে পরাস্ত করে দশ লক্ষ মুদ্রা, বহু মুক্তা, হস্তি ও বিজয়নগর রাজকন্যার সাথে বাহমনী সুলতানের বিবাহ দিতে বাধ্য করেন। এই বিবাহ উপলক্ষে তিন দিন ধরে উৎসব চলে। তবে এই বৈবাহিক সম্পর্ক উভয় রাজ্যের মধ্যে স্থায়ী রাজনৈতিক মৈত্রী রক্ষা করতে পারে নি। কিছুদিনের মধ্যেই দেব রায় বরঙ্গল রাজ্যের সাথে জোটবদ্ধ হন। তাঁদের লক্ষ্য ছিল দুর্বল 'রেড্ডি' রাজ্যটিকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেওয়া। বাহমনী মৈত্রীজোট থেকে

বরঙ্গলের বেরিয়ে আসার ফলে দক্ষিণ-ভারতের রাজনৈতিক শক্তিসাম্যের পরিবর্তন ঘটে। দেবরায় বাহমনী-সুলতান ফিরোজ শাহকে পরাজিত করে কৃষ্ণানদীর তীর পর্যন্ত সমগ্র ভূ-খণ্ড নিজ অধিকারভুক্ত করেন।

প্রথম দেবরায়রে পর মাত্র কয়েক মাসের জন্য সিংহাসনে বসেছিলেন *বিজয় রায়।* তারপর শুরু হয় সঙ্গমবংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি *দ্বিতীয় দেবরায়*-এর শাসন (১৪২২ - '৪৬ খ্রীঃ)। তাঁর আমলেও বাহমনী রাজ্যের সাথে সংঘর্ষ অব্যাহত ছিল। দ্বিতীয় দেবরায় উপলব্ধি করেন যে, সুদক্ষ তীরন্দাজ-বাহনী দেশের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান উপাদন। *ফেরিস্তা* লিখেছেন যে, বিজয়নগর বাহিনীকে তীবন্দাজিতে সুদক্ষ করে তোলার জন্য দ্বিতীয় দেবরায় জায়গির দিয়ে দু'হাজার মুসলিম প্রশিক্ষক নিয়োগ করেছিলেন। তবে *ড. সতীশচন্দ্র* মনে করেন যে, ইতিপূর্বেই বিজয়নগর-বাহিনীতে মুসলমান সৈন্য নিয়োজিত ছিল। দক্ষ তীরন্দাজও বিজয়নগরে ছিল। সম্ভবত অশ্বারোহী নিপুণ তীরন্দাজ হিন্দু-বাহিনীতে ছিল না। এই ত্রুটি দূর করার জন্য দ্বিতীয় দেবরায় হয়তো কিছু নতুন মুসলমান প্রশিক্ষক নিয়োগ করেছিলেন। যাই হোক, সামরিক-বহিনীর শক্তিবৃদ্ধি করার পর তিনি রাজ্যবিস্তারে মন দেন। এই সূত্রে দ্বিতীয় দেবরায় বাহমনী রাজ্য আক্রমণ করেন। ১৪৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বাহমনী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত মুদ্গল, বাঁকাপুর প্রভৃতি স্থান পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। দু'-রাজ্যের মধ্যে তিনটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কিন্তু কোনপক্ষই বিজয়ী না-হওয়ায় স্থিতাবস্থা মেনে নিতে বাধ্য হয়।

ভারতে আগত পুর্তগীজ *নুনিজ*-এর লেখা থেকে জানা যায় যে, কুইলন, শ্রীলঙ্গা, পুলিকট, পেগু (ব্রহ্মদেশ) ও তেনাসামির (মালয়) প্রভৃতি রাজ্য দ্বিতীয় দেবরায়কে কর দিত। তবে এরা সবাই বিজয়নগরের করদ-রাজ্য ছিল বলে মনে হয় না। *ড. সতীশচন্দ্রের* মতে, বিজয়নগর রাজ্য নৌ-বাহিনীতে এত বেশি দক্ষ ছিল না যে, পেগু বা তেনাসেরিম এর মত উপকূলবর্তী রাজ্য থেকে নিয়মিত কর আদায় করতে পারত। সম্ভবত মৈত্রীর নিদর্শন হিসেবে তাঁরা বিজয়নগরে উপঢৌকন পাঠাতেন। তবে সিংহলের বিরুদ্ধে বিজয়নগর কয়েকবার সফল অভিযান পাঠিয়েছিল এবং হয়তো সেখান থেকে বিজয়নগর নিয়মিত কর লাভ করত।

দ্বিতীয় দেব রায়ের মৃত্যুর পর (১৪৪৬ খ্রীঃ) তাঁর পুত্র *মল্লিকার্জুন* বিজয়নগরের শাসনভার গ্রহণ করেন। তাঁর দীর্ঘ ১৯ বছরের রাজত্বকালে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল বাহমনী ও উড়িষ্যা রাজ্যদ্বয়ের মিলিত আক্রমণ। অবশ্য মল্লিকার্জুন এই আক্রমণ প্রতিহত করে নিজ রাজ্যকে অটুট রাখেন। এই কাজে বিশেষ কৃতিত্ব দেখান চন্দ্রগিরির সালুভবংশীয় জনৈক সেনানায়ক *নরসীমা।* স্বভাবতই বিজয়নগর রাজ্যে নরসীমার প্রভাব ও মর্যাদা খুবই বৃদ্ধি পায়। মল্লিকার্জুনের পর বিজয়নগরের সিংহাসনের বসেন তাঁর ভাই *দ্বিতীয় বিরূপাক্ষ* (১৪৬৫ খ্রীঃ)। দীর্ঘ দু'দশক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকলেও শাসক হিসেবে তিনি ছিলেন খুবই অদক্ষ। ফলে সারা রাজ্যে বিশৃঙ্খলা প্রকট হয়ে ওঠে। বহু সামন্ত তাঁর কর্তৃত্ব অস্বীকার করে স্বাধীন আচরণ করতে থাকেন। উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যেও লোভ ও শোষণপ্রবণতার বাহুল্য দেখা দেয়। প্রজাদের দুঃখ-দুদর্শা বাড়তে থাকে। এই সুযোগে উড়িষ্যার রাজা *পুরুষোত্তম গজপতি* দক্ষিণদিকে তিরুভেন্নামেলাই পর্যন্ত ভূ-খণ্ড দখল করে নেন। বাহমনী রাজাও বিজয়নগরের ভূ-খণ্ড গ্রাস করতে উদ্যত হন। এই সার্বিক বিশৃঙ্খলা ও ভাঙনের মুহূর্তে সেনানায়ক নরসীমা রাজা দ্বিতীয় বিরূপাক্ষকে

সিংহাসনচ্যুত করে ক্ষমতা দখল করে নেন। এইভাবে সঙ্গমবংশের অবসান ঘটে ও সালুভবংশের শাসন শুরু হয়।

খ. সালুভবংশ ঃ সালুভবংশীয় শাসন চালু ছিল মাত্র সতের বছর (১৪৮৬ - ১৫০৩ খ্রীঃ) প্রতিষ্ঠাতা রাজা নরসীমা মোটামুটি দক্ষ শাসক ছিলেন। অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা তিনি কঠোর হাতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। তবে উড়িষ্যা ও বাহমনী রাজ্যের হাত থেকে যথাক্রমে উদয়গিরি ও রাইচুর-দোয়াব অঞ্চল তিনি পুনরধিকার করতে ব্যর্থ হন। তাঁর পুত্র ইম্মাদি নরসিংহের আমলে জনৈক সেনাপতি ***নরসনায়ক*** রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা হস্তগত করেন। সিংহাসনে না-বসলেও তিনিই ছিলেন প্রকৃত শাসক। নরসনায়কের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ***বীর নরসিংহ*** পিতার ক্ষমতার অধিকারী হন। তবে তিনি ছিলেন বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষী। তাই ইম্মাদীকে হত্যা করে তিনি নিজেকেই 'বিজয়নগরের রাজা' বলে ঘোষণা করেন। এটি ছিল বিজয়নগর রাজ্যের দ্বিতীয় সামরিক অভ্যুত্থান। এর ফলে সালুভবংশের শাসনের সমাপ্তি ঘটে এবং সূচনা হয় তুলভবংশের শাসনপর্ব।

গ. তুলভবংশ ঃ বীর নরসিংহ অবশ্যই দক্ষ শাসক ছিলেন। কিন্তু তাঁর শাসনকাল (১৫০৫ - ১৫০৯ খ্রীঃ) অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও মুসলমানদের অক্রমণ দ্বারা বেশ সংকটপূর্ণ ছিল। নরসিংহ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বিদ্রোহী সমান্তদের দমন করেন। এই সময় বাহমনী রাজ্য ভেঙে বিজাপুর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। বিজাপুর শাসক ইউসুফ আদিল শাহ রায়চুর-দোয়াব দখল করতে উদ্যত হলে বিজয়নগরের রাজার সাথে সংঘর্ষ বাধে। এই সময় বাহমনী সুলতান মামুদ শাহের উদ্যোগে মুসলমান অভিজাতরা বিজয়নগরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। বিজাপুর সুলতান রায়চুর ও মুদ্গল দুর্গ দখল করে নেন। তবে বিজাপুর সুলতান বিজয়নগরের অভ্যন্তরে ক্ষমতা বিস্তারের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। এক্ষেত্রে বীর নরসিংহ আরভিডু অঞ্চলের শাসক রাম রায় ও তাঁর পুত্র তিম্মার বিশেষ সাহায্যলাভে উপকৃত হন। যুদ্ধ-ব্যস্ততার মাঝেও বীর নরসিংহ সামরিক বাহিনীর সংস্কার সাধন করেন। তিনি পর্তুগীল গভর্নর ***আলমিদার*** এক চুক্তি দ্বারা তাঁর আমদানিকৃত সমস্ত ঘোড়া কেনার ব্যবস্থা করেন। এর ফলে বিজয়নগরের অশ্বারোহী বাহিনী শক্তিশালী হয়। রায়তদের অবস্থার উন্নতির জন্য তিনি কৃষি-সম্পর্কের ক্ষেত্রেও সংস্কার করেন।

○ কৃষ্ণদেব রায় ও তাঁর কৃতিত্ব ঃ

বীর নরসিংহের পর তাঁর সৎ-ভ্রাতা ***কৃষ্ণদেব রায়*** বিজয়নগরের সিংহাসনে বসেন। তিনি কেবল এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন না ; অনেকেই তাঁকে বিজয়নগরের সমস্ত রাজার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম শাসক বলে মনে করেন। এই মূল্যায়ন অযৌক্তিকও নয়। ব্যক্তিগত গুণাবলীর বিচারে তিনি ছিলেন অসাধারণ। সামরিক ও অসামরিক উভয় কাজে তাঁর দক্ষতা ছিল অতুলনীয়। তাঁর রাজত্বকালে (১৫০৯-'৩০ খ্রীঃ) বিজয়নগরের রাজ্য গৌরবের শীর্ষে আরোহণ করেছিল। বহিরাগত প্রায় সকল পর্যটকই রাজা কৃষ্ণদেবের চরিত্রের ও কৃতিত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। যোদ্ধা হিসেবে তিনি ছিলেন সাহসী ও দক্ষ, কূটনীতিবিদ হিসেবে বিচক্ষণ, শাসক হিসেবে প্রজাদরদী, মানুষ হিসেবে ন্যায়পরায়ণ, দয়ালু এবং সংস্কৃতিমনস্ক।

কৃষ্ণদেব রায়ের সিংহাসনারোহণ কালে দেশ অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সমস্যাকীর্ণ ছিল। বীর নরসিংহ প্রাদেশিক শাসকদের দমন করলেও কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব তখনো

সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল না। দেশের নানা অংশে ক্ষমতাবান পলিগারগণ কেন্দ্রের আনুগত্য অস্বীকার করতে দ্বিধান্বিত ছিল না। বিজয়নগরের পূর্বাঞ্চল উড়িষ্যার রাজা গজপতির দখলে ছিল। বাহমনী রাজ্য ভেঙে গেলেও বিজয়নগরের বিরুদ্ধে মুসলমান সুলতানদের প্রতিরোধ তখনো ছিল অব্যাহত। উত্তর সীমান্তে নবগঠিত বিজাপুর সুলতানি বিজয়গনরের পক্ষে যথেষ্ট শঙ্কার কারণ হয়ে উঠেছিল। কৃষ্ণদেব রায় যথেষ্ট সাহস ও বিচক্ষণতার সাথে এই বহুমুখী সমস্যার মোকাবিলা করেন।

শাসনের শুরুতেই কৃষ্ণদেব বাহমনী রাজ্যের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। সুলতান মামুদশাহ বিশাল বাহিনী ও অভিজাতবৃন্দের সাহায্যপুষ্ট হয়ে বিজয়নগর আক্রমণ করেন (১৫০৯ খ্রীঃ)। 'দোনি ও কোভেলা কোণ্ডার' যুদ্ধে বিজাপুরের শাসক ইউসুফ আদিল শাহ নিহত হন। এর ফলে সদ্যগঠিত বিজাপুর রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সেই সুযোগ নেন রাজা কৃষ্ণদেব। ১৫১২ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণদেব রায় কৃষ্ণা-তুঙ্গভদ্রার 'দোয়াব' আক্রমণ করে 'রায়চুর দুর্গ' দখল করে নেন। অতঃপর তিনি 'গুলবর্গা দুর্গ'ও দখল করতে সক্ষম হন। 'বিদর' আক্রমণ করে 'বারিদ' দুর্গটিও তিনি হস্তগত করেন। এরপর কৃষ্ণদেব কূটনৈতিক চাল হিসেবে মামুদ শাহকে বাহমনী রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। এই কাজকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য তিনি ***'যবন রাজ্যস্থাপন আচার্য'*** উপাধি নেন। কৃষ্ণদেব রায় জানতেন যে, স্বাধীন ও স্বতন্ত্র বাহমনী রাজ্যের অস্তিত্ব বিজাপুর, গোলকুণ্ডা প্রভৃতি নবগঠিত রাজ্যগুলির কাছে সহনীয় হবে না। এই সূত্রে মুসলিম রাজ্যগুলির মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেবে এবং তাদের দুর্বলতার কারণ সৃষ্টি করবে।

এরপর কৃষ্ণদেব রায় দক্ষিণ-মহীশূরের বিদ্রোহী শাসক পলিগার-এর বিরুদ্ধে অভিযান চালান। বীর নরসিংহের আমল থেকে উচ্চ-কাবেরী উপত্যকা অঞ্চলে জনৈক পলিগারের স্বাধীন শাসন চলছিল। পলিগারের স্পর্ধা ও শক্তির মূলে ছিল *'শ্রীরঙ্গপত্তম্'* ও *'শিবনসমুদ্রম্'* নামক দুটি দুর্গের অস্তিত্ব। কাবেরীর দুটি শাখার মধ্যবর্তী ব-দ্বীপে অবস্থিত এই দুর্গ ছিল অজেয়। যাই হোক, কৃষ্ণদেব প্রথমে শ্রীরঙ্গপত্তম দখল করেন। বিপদ বুঝে উমাত্তুরের শাসক গঙ্গারাজা শিবনসমুদ্রমে সরে যান। কৃষ্ণদেব এটিও দখল করেন। পলায়মান গঙ্গারাজা কাবেরীর জলে ডুবে মারা যান। কৃষ্ণদেব রায় এই অঞ্চলে একটি নতুন প্রশাসনিক কেন্দ্র গড়ে তোলেন। প্রধান কার্যালয় স্থাপিত হয় 'শ্রীরঙ্গপত্তমে'।

উড়িষ্যার রাজা ***গজপতি প্রতাপরুদ্র*** বিজয়নগরের অন্তর্গত *'উদয়গিরি'* ও *'কোণ্ডাভিড়ু'* অঞ্চল দুটি আগেই দখল করেছিলেন। পূর্ববর্তী বিজয়নগর রাজারা তা পুনর্দখলের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছিলেন। এখন কৃষ্ণদেব রায় হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারে উড়িষ্যার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হন। বিজয়নগর-বাহিনী পরপর 'উদয়গিরি' (১৫১৩ খ্রীঃ) ও 'কোণ্ডাভিড়ু' (১৫১৪ খ্রীঃ) দখল করে। কৃষ্ণানদীর তীর পর্যন্ত উপকূল-অঞ্চল কৃষ্ণদেব রায়ের হস্তগত হয়। কোণ্ডাভিড়ু'র পতনের সাথে সাথে উড়িষ্যার যুবরাজ ও ভাবীরাজা বীরভদ্র ও গজপতির এক রানী কৃষ্ণদেবের হাতে বন্দী হয়ে বিজয়নগরে আনীত হন। উড়িষ্যার বিরুদ্ধে অন্য দুটি যুদ্ধ দ্বারা কৃষ্ণদেব *বেজওয়াদা* এবং *কোন্দাপল্লী* দুর্গ দুটিও দখল করে নেন। এই অঞ্চল দখল করার ফলে উড়িষ্যার অধীনস্থ *তেলেঙ্গানা* ও *ভেঙ্গী* দখল করার জন্য কৃষ্ণদেব উৎসাহিত বোধ করেন। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে তেলেঙ্গানা ভেলমাদের অধীনে ছিল। জনৈক ***সিতাব খাঁ*** (সীতাপতি) গজপতির সাহায্য নিয়ে

ঐ অঞ্চল দখল করে শাসন করছিলেন। কৃষ্ণদেব রায় তেলেঙ্গানা আক্রমণ করলে গজপতি সীতাব খাঁ'র সাহায্যে অগ্রসর হয়। কিন্তু কৃষ্ণদেবের অপ্রতিরোধ্য বাহিনী তেলেঙ্গানা দখল করে রাজামুন্দ্রী পর্যন্ত অগ্রসর হয়। *রাজামুন্দ্রী* ও *ভেঙ্গী* বিজয়নগরের হস্তগত হয়। অতঃপর সামান্য বিরতির পর কৃষ্ণদেব উড়িষ্যার রাজধানী কটক আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেন। শেষপর্যন্ত রাজা গজপতি কৃষ্ণদেবের কাছে শান্তির প্রস্তাব পাঠাতে বাধ্য হন। মৈত্রীর প্রমাণস্বরূপ গজপতি নিজ কন্যাকে কৃষ্ণদেবের সাথে বিবাহ দেন এবং পরিবর্তে কৃষ্ণানদীর উত্তরাংশে শাসন করার অধিকার ফিরে পান। পর্যটক *নুনিজ*-এর মতে, গজপতির পুত্র বীরভদ্র বিজয়নগরে বন্দী-অবস্থায় আত্মহত্যা করার ফলে গজপতির মন ভেঙে গিয়েছিল এবং তিনি ভগ্নমনোরথ হয়ে সন্ধির প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

উড়িষ্যার সাথে যুদ্ধে কৃষ্ণদেব রায়ের ব্যস্ততার সুযোগে গোলকুণ্ডার শাসক *কুলি কুতুব শাহ* বিজয়নগরের সীমান্তবর্তী দুর্গ *পাঙ্গল, গুন্টুর* ইত্যাদি দখল করে নেন। গজপতির উপর্যুপরি ব্যর্থতার সুযোগে সীতাব খাঁর কাছ থেকে কুতুব শাহ বেশকিছু দুর্গ দখল করে নেন। কৃষ্ণা-গোদাবরীর মধ্যবর্তী ভূভাগ দখল করার পর তিনি বিজয়নগরের অধীনস্থ *কোণ্ডাভিডু* দুর্গ দখল করেন। অবশ্য কৃষ্ণদেবের সাহায্যে কোণ্ডাভিডু'র দুর্গাধিপতি *সালুভ তিম্মা* গোলকুণ্ডার বাহিনীকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হন।

বিজাপুর রাজের বিরুদ্ধে কৃষ্ণদেব রায়ের সাফল্য ছিল উল্লেখযোগ্য। একাধিকবার তিনি এই মুসলিম রাজ্যের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং প্রতিবারেই বিজয়ী হন। ইতিপূর্বে কৃষ্ণদেব যখন *'রায়চুর দুর্গ'* দখল করেন (১৫১২ খ্রীঃ) তখন বিজাপুরের ইসমাইল আদিল শাহ ছিলেন নাবালক। সাবালক হয়ে ক্ষমতা দখল করার সঙ্গে সঙ্গে ইসমাইল আদিল রায়চুর দুর্গ পুনর্দখলের উদ্যোগ নেন এবং কৃষ্ণদেব রায়ের উড়িষ্যা-যুদ্ধে ব্যস্ততার সুযোগ *'রায়চুর'* দখল করতে সক্ষম হন। ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে সালুভ তিম্মার নেতৃত্বে বিজয়নগর-বাহিনী রায়চুর পুনরুদ্ধারের জন্য যুদ্ধ শুরু করে। বিজাপুর-বাহিনী যুদ্ধে বিধ্বস্ত হয় এবং আদিল শাহ প্রাণভয়ে আত্মগোপন করেন। অবশ্য তার পরেও মুসলমান-বাহিনী দুর্গের অবরোধ চালিয়ে যায়। কৃষ্ণদেব রায় শেষ পর্যন্ত পর্তুগীজ গোলন্দাজদের সাহায্যে দুর্গ দখল করেন। কিছুদিনের মধ্যে ইসমাইল আদিল বিজয়নগরে দূত প্রেরণ করে রায়চুর প্রত্যাবর্তনের দাবি জানান। প্রত্যুত্তরে কৃষ্ণদেব জানান যে, বিজাপুর সুলতান রাজা কৃষ্ণদেবের পদচুম্বন করে কৃতজ্ঞতা জানালে তিনি রায়চুর ফিরিয়ে দেবেন। আদিল খাঁ প্রথমে এই শর্তে রাজী হন, যদিও শেষ পর্যন্ত তিনি তা করেন নি। পরন্তু নানাভাবে কৃষ্ণদেবকে উত্ত্যক্ত করতে থাকেন। ক্রুদ্ধ কৃষ্ণদেব রায় এক বিশাল বাহিনীসহ বিজাপুর আক্রমণ করেন এবং বিজাপুর-বাহিনীকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে *'গুলবর্গা'* দখল করেন। *নুনিজ* লিখেছেন ঃ কৃষ্ণদেব গুলবর্গা শহর ধ্বংস করেন এবং দুর্গটিকে ধূলিস্মাৎ করে দেন। অতঃপর তিনি বাহমনী সুলতান দ্বিতীয় মহম্মদ শাহের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ঐ অঞ্চলের শাসক নিযুক্ত করে মহম্মদ শাহের অন্য দুই পুত্রসহ বিজয়নগরে ফিরে আসেন। বাহমনী রাজ্যের ভগ্নস্তূপের উপর গড়ে-ওঠা রাজ্যগুলির সামনে কাঁটার মত বাহমনী রাজ্যকে টিকিয়ে রাখার জন্যই সম্ভবত কৃষ্ণদেব এই ব্যবস্থা নেন। এটি তাঁর কূটনৈতিক জ্ঞানের পরিচায়ক।

পর্তুগীজ বণিকদের সাথে সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে কৃষ্ণদেব বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। ইতিমধ্যে পর্তুগীজরা বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। আরব ও পারসিক নাবিকদের পরাস্ত করে এবং

মিশরীয় নৌ-বাহিনী ধ্বংস করে পর্তুগীজরা কার্যত অশ্বের বাণিজ্যে একচেটিয়া কর্তৃত্ব অর্জন করেছিল। ভারতীয় সেনাবাহিনীর দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য এই অশ্বের যোগান ছিল আবশ্যিক। তাই কৃষ্ণদেব পর্তুগীজ বণিকদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি গ্রহণ করেন। এর ফলে তিনি উন্নতমানের অশ্বের যোগান পান। কৃষ্ণদেবের বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারের জন্য বহু পর্তুগীজ পর্যটক ও দূত তাঁর রাজ্যে আগমন করেন ও অবস্থান করেন। অবশ্য পর্তুগীজদের বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ না করলেও, তাদের রাজনৈতিক উচ্চাশাকে বা কার্যকলাপকে কৃষ্ণদেব কখনো সমর্থন করেন নি। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন, পর্তুগীজদের প্রতি কৃষ্ণদেবের আপসনীতি ভবিষ্যতে ভারতের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়েছিল। নৌ-বাহিনীর উন্নয়ন ও পর্তুগীজদের প্রতিপত্তিবৃদ্ধি নিরোধের ব্যাপারে নিস্পৃহ থেকে রাজা কৃষ্ণদেব অদূরদর্শিতার পরিচয় দেন।

গুলবর্গা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর কৃষ্ণদেব অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই সময় তিনি নাবালক পুত্র ***তিরুমালাদেব*** মহারাজাকে সিংহাসনে বসিয়ে নিজে তাঁর অভিভাবক রূপে শাসন পরিচালনা করতে শুরু করেন। কিন্তু আট মাস পরে এই পুত্র অকস্মাৎ অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। কৃষ্ণদেব জানতে পারেন যে, তাঁর বিশ্বস্ত মন্ত্রী সালুভ তিম্মার পুত্র তিম্মা দণ্ডনায়কের ষড়যন্ত্রের ফলেই তাঁর প্রিয় পুত্রের প্রাণনাশ হয়েছে। ক্ষুব্ধ রাজা দণ্ডনায়ককে বন্দী করেন। কিন্তু কিছুদিন পর তিম্মা নিজেকে মুক্ত করে কৃষ্ণদেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণদেব তিম্মাকে বন্দী ও হত্যা করে শান্তি ফিরিয়ে আনেন। ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজা কৃষ্ণদেব গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে জনৈক আত্মীয় অচ্যুত রায়কে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর সফল ও কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে।

কেবল সুযোদ্ধা নয়, বিচক্ষণ শাসক ও সংস্কৃতিমনস্ক ব্যক্তি হিসেবেও রাজা কৃষ্ণদেব রায় সমসাময়িক লেখকদের প্রশংসা অর্জন করেছেন। পর্তুগীজ পর্যটক ও বণিক ***পায়েজ***, ***নুনিজ***, ***বারবোসা*** প্রমুখ কৃষ্ণদেবের রাজসভায় বেশ কিছুদিন কাটিয়েছেন। এঁদের বিবরণী থেকে তাঁর ব্যক্তিগত গুণাবলী ও চারিত্রিক মাধুর্যের আভাস পাওয়া যায়। ***পায়েজ*** লিখেছেন : *"তিনি (কৃষ্ণদেব) ছিলেন একজন মহান শাসক ও ন্যায়বিচারক। তবে আকস্মিক তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতেন।"* ***সিওয়েল (Sewell)*** লিখেছেন : *"He was real ruler. He commanded his enormous armies in person, was able, brave and statesmanlike, and was a man of much gentleness and generosity of character."*

প্রজাদরদী ও পরিশ্রমী শাসক হিসেবেও কৃষ্ণদেব সমসাময়িক লেখকদের প্রশংসা অর্জন করেছেন। প্রশাসনের খুঁটিনাটি বিষয়ে তিনি ব্যক্তিগতভাবে খোঁজখবর রাখতেন। বছরে অন্তত একবার তিনি সারা রাজ্য পরিভ্রমণ করে ব্যক্তিগতভাবে প্রজাদের অভাব-অভিযোগ শুনতেন এবং তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করতেন। ড. ***ভেঙ্কটরামনাইয়া (N. Venkatramanayya)*** লিখেছেন, কৃষ্ণদেবের এই ব্যবস্থার ফলে আঞ্চলিক শাসকদের প্রভাব-প্রতিপত্তি নিয়ন্ত্রিত ছিল এবং এই গণসংযোগ রাজতন্ত্রকে দৃঢ়ভিত্তি দিয়েছিল। কৃষি-ব্যবস্থার উন্নয়নে তিনি বিশেষ যত্নবান ছিলেন। সেচব্যবস্থার উন্নতির জন্য কৃষ্ণদেব একাধিক সেচ-খাল ও কূপ খনন করেন। প্রজাদের উপর থেকে কয়েকটি জবরদস্তিমূলক কর, যেমন বিবাহ-কর তুলে দিয়ে তিনি সাধারণ মানুষের ভার লাঘব করেন। কৃষিজমি বৃদ্ধির জন্য তাঁর নির্দেশে বহু জঙ্গল কেটে সেখানে চাষযোগ্য জমি

তৈরি করা হয়েছিল। ড. *ঈশ্বরীপ্রসাদ* মনে করেন, রাজা কৃষ্ণদেব প্রজাকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিলেন। তিনি লিখেছেন ঃ *"Krishna Deva Raya was always anxious to promote the welfare of his subjects. His liberal endowments endered him all the more to his subjects."*

কৃষ্ণদেব রায়ের রাজত্বকাল দক্ষিণ-ভারতের সাহিত্যে এক নবযুগের সূচনা করেছিল। কৃষ্ণদেব স্বয়ং তেলেগু ও সংস্কৃত ভাষার প্রতিভাবান পণ্ডিত ছিলেন। কবি ও সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতাকে তিনি রাজার অন্যতম কর্তব্য বলেই বিবেচনা করতেন। একজন সাহিত্যসেবী হিসেবে তিনি সংস্কৃত, কানাড়ি-সহ দক্ষিণ-ভারতের সমস্ত ভাষার চর্চাকে উৎসাহিত করতেন। তবে তেলেগু সাহিত্যের বিকাশের ক্ষেত্রে কৃষ্ণদেবের আমল *"তেলেগুভাষার স্বর্ণযুগ"* রূপে বিবেচিত হতে পারে। ড. *সতীশচন্দ্র* লিখেছেন ঃ *"তাঁর রাজত্বকালে তেলেগু সাহিত্যে এক নবযুগের সূচনা হয়। কারণ এই সময়েই সংস্কৃত সাহিত্যের অনুসরণ না-করে তেলেগু ভাষায় স্বাধীন রচনার সূত্রপাত হয়।" এন ভেঙ্কটরাও* লিখেছেন যে ঃ প্রতি বছর বসন্ত-উৎসবের সময় তাঁর রাজসভায় দেশের প্রখ্যাত কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিকদের আমন্ত্রণ করে কৃষ্ণদেব তাঁদের বহু মূল্যবান উপহার দিয়ে সম্মানিত করতেন। দেশের আটজন প্রখ্যাত পণ্ডিত তাঁর রাজসভা আলোকিত করতেন। এঁরা 'অষ্টাদিগ্‌গজ' নামে সম্মানিত ছিলেন। কৃষ্ণদেব স্বয়ং একাধিক সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। ফলে সেগুলির মধ্যে মাত্র দুটির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গেছে। এগুলি হল তেলেগু ভাষায় রচিত ভারতে রাষ্ট্রদর্শন বিষয়ক গ্রন্থ *'আমুক্তামাল্যদা'* এবং সংস্কৃত ভাষায় রচিত নাটক *'জাম্ববতি-কল্যাণম্'*/এছাড়া অল্লসনি পেড্ডান-এর *'মনুচরিতম্'*, নন্দী তিমায়া'র *'পারিজাত পহরনামু'* প্রভৃতি তেলেগু ভাষায় সাহিত্যচর্চার প্রধানতম ফসলরূপে স্বীকৃতি পেয়েছে। পেড্ডান *'অন্ধ্রকবিতা পিতামহ'* নামে সম্মানিত ছিলেন। কৃষ্ণদেবের উদ্যোগে তেলেগু ভাষা-সাহিত্যের অভূতপূর্ব বিকাশের প্রেক্ষিতে ড. *ভেঙ্কটরামানাইয়া* লিখেছেন ঃ *"The Augustan age of Telegu literature, which began with the accession of Saluva Narasimha, burst forth in full splendour in the reign of Krishnadeva Raya, and his court become the centre of light and learning in the country."*

কৃষ্ণদেব একজন মহান নির্মাতাও ছিলেন। বিজয়নগরের অনতিদূরে মাতা *নাগলম্ব*'র স্মৃতির উদ্দেশ্যে তিনি একটি সুসজ্জিত নতুন শহর নির্মাণ করেন। এই শহর *'নাগালপুর'* নামে পরিচিত হয়। এছাড়া কৃষ্ণমন্দির, হাজার স্বামীমন্দির, বিঠলমন্দির প্রভৃতি তাঁর স্থাপত্য কীর্তি ও ধর্ম ভাবনার অন্যতম নিদর্শন।

ধর্মীয় উদারতা ও পরধর্মসহিষ্ণুতা ছিল কৃষ্ণদেব রায়ের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিনি নিজে ছিলেন বৈষ্ণব। কিন্তু সমস্ত ধর্মের প্রতি ছিল তাঁর সমান শ্রদ্ধাবোধ। তাঁর সাম্রাজ্যে প্রজাদের ধর্মাচরণ সম্পর্কে কোন বিধিনিষেধ ছিল না। বিদেশী পর্যটক *ফ্রেডরিক বারবোসা* কৃষ্ণদেবের ধর্মীয় উদারতা ব্যাখ্যা করে লিখেছেন ঃ *"রাজা সবাইকে এতটাই স্বাধীনতা দিয়েছিলেন যে, তাঁর সাম্রাজ্যে যে কেউ আসতে পারত, এখানে থাকতে পারত এবং নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারত। কেউ তাকে প্রশ্ন করত না যে সে খ্রীষ্টান, ইহুদী, মূর নাকি ধর্মহীন ব্যক্তি।"*

সব মিলিয়ে রাজা কৃষ্ণদেব ছিলেন একজন পরিপূর্ণ শাসক। দক্ষিণ-ভারতের অন্য কোন

শাসকের মধ্যে এমন বহুমুখী প্রতিভা ও গুণের সমন্বয় লক্ষ্য করা যায় না। তাই ***ঈশ্বরীপ্রসাদ*** যথার্থই লিখেছেন ঃ *"Polite and amiable in private society; wise and far-sighted in council, eloquent and cultured when he listened to literatures, dignified and awe-inspiring in his public livies, Krishna Deva was formidable in war and indeed a jewel among all the princes."*

○ কৃষ্ণদেবের পরবর্তীকালে বিজয়নগর ঃ তালিকোটার যুদ্ধ ঃ

কৃষ্ণরায়ের মৃত্যুর সঙ্গেই শুরু হয় বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অবক্ষয় ও পতনের পর্ব। কৃষ্ণদেব মনোনীত উত্তরাধিকারী অচ্যুত রায়ের বিরুদ্ধে এবং কৃষ্ণদেবের আঠারো মাসের নাবালক সন্তানের পক্ষে সিংহাসন দাবি করেন কৃষ্ণদেবের শ্যালক রাম রায় (রাম রাজা)। অচ্যুত রাম রায়কে প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ পদ ও অর্থ প্রদানের বিনিময়ে কোনক্রমে সিংহাসনে বসান। বিজয়নগরের এই অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগে উড়িষ্যার *প্রতাপরুদ্র গজপতি* এবং বিজাপুরের *ইসমাইল আদিল শাহ* প্রায় একই সঙ্গে বিজয়নগর আক্রমণ করেন। অচ্যুত গজপতিকে পরাজিত ও বিতাড়িত করলেও আদিল শাহকে বিতাড়িত করতে ব্যর্থ হন। রায়চুর ও মুদ্‌গল আদিল শাহ দখল করে নেন। ঠিক এই মুহূর্তে ত্রিবাঙ্কুরের রাজার মদতে বিজয়নগরের জনৈক মন্ত্রী সেলাপ্পা ওরফে সালুভ নরসিংহ নায়ক বিদ্রোহ ঘোষণা করলে, অচ্যুত রায় আদিল শাহ'কে মোকাবিলা না-করেই সরে আসতে বাধ্য হন। ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দে অচ্যুত বিদ্রোহীদের দমন করে দক্ষিণ-ভারতে নিজ-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন। ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ইসলমাইল আদিল শাহের মৃত্যুর ফলে বিজাপুরের সিংহাসনকে কেন্দ্র করে তাঁর পুত্রদ্বয় মল্লু ও ইব্রাহিমের মধ্যে বিরোধ বাধে। এই সুযোগে অচ্যুত হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। ***নুনিজের*** বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, অচ্যুত রায়চুর পুনরুদ্ধারে সক্ষম হয়েছিলেন।

অচ্যুত রায়ের সাফল্যের মূল নায়ক ছিলেন তাঁর শ্যালক *তিরুমালা*। এদিকে কৃষ্ণদেবের শ্যালক রাম রায় তখন ক্রমশ ক্ষমতার অলিন্দ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে কৃষ্ণদেবের নাবালক পুত্রও মারা গেছে। এখন কৃষ্ণদেবের স্ত্রীর সমর্থন নিয়ে রাম রায় আবার বিদ্রোহী হন। সৈয়দ আলির বিবরণ মত, তিনি অচ্যুত রায়কে বন্দী করে সমস্ত ক্ষমতা হস্তগত করেন। অল্পদিনের মধ্যেই অচ্যুত রায় বন্দীমুক্ত হলে আবার গৃহযুদ্ধের আবর্তে পড়ে বিজয়নগর।

বিজয়নগরের অন্তর্দ্বন্দ্বের সংবাদে উৎসাহিত হয়ে বিজাপুর সুলতান *ইব্রাহিম আদিল শাহ* বিজয়নগর আক্রমণ করেন। রাম রায় বা অচ্যুত কেউই তাঁকে বাধা দিতে অগ্রসর হয়নি। ইব্রাহিম 'নাগলপুর' শহরটিকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেন। তবে অবশ্যম্ভাবী পতনের হাত থেকে বিজয়নগর রক্ষা পায় ঘটনাচক্রে সেই সময় *নিজাম শাহ* বিজাপুর আক্রমণ করলে ইব্রাহিম স্বরাজ্যে ফিরে যেতে বাধ্য হন। অচ্যুত রায় প্রভূত অর্থ প্রদানের বিনিময়ে নিজ সিংহাসন ফিরে পান। অতঃপর তাঁর শাসন ছিল কুশাসনের নামান্তর মাত্র। শ্যালকদ্বয়ের পরামর্শে তিনি পরবর্তী ছয় বছর নির্বিচারে প্রজাশোষণ ও পীড়ন চালিয়ে যান। বিক্ষুব্ধ জনতার সমর্থনে মাদুরা, তাঞ্জোর প্রায় স্বাধীন হয়ে পড়ে। তুতিকোরিনে পর্তুগীজ বণিকদের স্বাধীন উপনিবেশ গড়ে ওঠে। একদা সমৃদ্ধ ও সংহত বিজয়নগর চূড়ান্ত পতনের প্রহর গুণতে থাকে। অচ্যুত রায়ের মৃত্যুর (১৫৪২

খ্রীঃ) পর সিংহাসনে বসেন তাঁর পুত্র প্রথম ভেঙ্কট। কিন্তু সমস্ত ক্ষমতা থাকে অচ্যুতের শ্যালক তথা ভেঙ্কটের মাতুল শালাকারাজু তিরুমল-এর হাতে। ক্ষমতালোভী মাতুল ভেঙ্কটকে হত্যা করে নিজেকেই সিংহাসনে বসান। এমনকি সিংহাসন রক্ষার জন্য তিনি বিজাপুরের ইব্রাহিম আদিলকে আক্রমণ করে রাজধানীতে আনতেও দ্বিধা করেন নি। এমতাবস্থায় অধিকাংশ অভিজাত রাম রায়ের নেতৃত্বে তিরুমালার বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। শেষ পর্যন্ত ১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দে সদাশিব (অচ্যুত রায়ের ভাইপো) সিংহাসনে বসলে আপাত বিপর্যয় থেকে বিজয়নগর রাজ্য রক্ষা পায়।

সদাশিব রায়ের শাসনকালে (১৫৪২-'৭০ খ্রীঃ) বিজয়নগরের প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল মন্ত্রী রাম রায় ও তাঁর দুই ভ্রাতা তিরুমল ও ভেঙ্কটের হাতে। ড. *জি. ভেঙ্কটরাও* লিখেছেন : কৃষ্ণদেব রায়ের আমল থেকে রাম রায় ও তিরুমল রাজ্যের বিভিন্ন সংকটের সাথে জড়িত থাকার ফলে স্বাভাবিক নেতৃত্বের অধিকারী হয়েছিলেন। বস্তুত এই মুহূর্তে বিজয়নগরের সামনে যে ত্রিমুখী সমস্যা ছিল, অর্থাৎ (১) বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির মূলোচ্ছেদ করা এবং ত্রিবাঙ্কুরের শাসকের উচ্চাকাঙ্ক্ষা দমন করা, (২) দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে পর্তুগীজদের প্রভাব রোধ করা এবং (৩) সুযোগসন্ধানী বিজাপুরের আদিল শাহী সুলতানের গতিরোধ করা,—যা মোকাবিলা করার ক্ষমতা সদাশিবের আদৌ ছিল না। এই সংকটকালে রাম রায় বিজয়নগরের হাল ধরেন এবং অতি দক্ষতার সাথে, সাময়িকভাবে হলেও দক্ষিণ-ভারতীয় রাজনীতিতে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করেন। ড. *ভেঙ্কটকরাও* লিখেছেন : *"Vijoynagar could witness the revival of the Glories of the days of Krishna Raya, was only due to the vigilance and diplomacy of Ram Raja."* কিছুটা অতিরঞ্জিত হলেও তেলেগু ভাষার *'রামরাজিয়ামু* গ্রন্থ থেকে রাম রায়ের দক্ষতা ও কৃতিত্ব সম্পর্কে বহু তথ্য পাওয়া যায়।

রাম রায় খুব সহজেই অভ্যন্তরীণ বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলিকে দমন করেন। কিন্তু বাহমনী রাজ্যের ধ্বংসস্তুপের উপর গড়ে-ওঠা মুসলমান রাজ্য-পঞ্চকের উচ্চাশা দমন করা ছিল কষ্টকর। উদ্ভূত পরিস্থিতি এবং অতীত অভিজ্ঞাতার ভিত্তিতে রাম রায় সিদ্ধান্ত নেন যে, চিরাচরিত শক্তিপ্রয়োগ নীতি দ্বারা এই সুলতানি রাজ্যগুলিকে দমন করা অসম্ভব। তাই তিনি মুসলিম রাজ্যগুলিতে কূটনীতির দ্বারা বিরোধ ও বিভেদ সৃষ্টি করে তাদের ক্ষমতা খর্ব করার উদ্যোগ নেন। প্রথমে তিনি আহম্মদ নগরের সুলতান বুরহান নিজাম শাহের সাথে মৈত্রী স্থাপন করে পরপর তিনটি যুদ্ধে বিজাপুরকে পরাজিত করেন। পুর্তগীজ বণিকদের সাথে এক চুক্তি স্বাক্ষর করে রাম রায় বিজাপুরকে ঘোড়া সরবরাহ বন্ধ করে দেন। কিন্তু বুরহানের পর হুসেন নিজাম শাহ আহম্মদনগরের সিংহাসনে বসে গোলকুণ্ডার সাথে মিলিতভাবে বিজাপুর আক্রমণ করলে পরিস্থিতি পাল্টে যায়। বিজাপুর সুলতান রাম রায়ের সাহায্যপ্রার্থী হন। পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করেন রাম রায়। তাঁর কূটচালে গোলকুণ্ডা পরাস্ত হয়। অতঃপর তিনি ও বিজাপুর মিলিতভাবে আহম্মদনগর আক্রমন করেন (১৫৫৫ খ্রীঃ)। এই যুদ্ধে বিজয়নগরের হিন্দুসেনারা সম্ভবত অকথ্য অত্যাচার ও ধ্বংসকার্য চালায়। *ফেরিস্তার* বিবরণ অনুসারে, *'হিন্দুসেনার প্রতিহিংসামূলক মনোভাব দ্বারা চালিত হয়ে আহম্মদনগরে ধ্বংস ও হত্যাকাণ্ড চালায়। মসজিদ ধূলিসাৎ হয়, নারীর সম্ভ্রম পদদলিত হয়, এমনকি পবিত্র কোরানও বিজয়ী-বাহিনীর হাত থেকে রক্ষা পায়নি।'*

ক্রমে রাম রায়ের কূটনৈতিক উদ্দেশ্য মুসলিম রাজ্যগুলির কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। অক্ষমতার দম্ভে রাম রায়ও কিছুটা উগ্র হয়ে উঠেন। তিনি ভুলে যান যে বিজাপুর, গোলকুণ্ডা ইত্যাদি এক-একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাজ্য। তিনি অনেক ক্ষেত্রেই ঐ সকল রাজ্যের সূক্ষ্ম অনুভূতিতে আঘাত করেন। ক্রমে প্রায় প্রতিটি রাজ্যই তাঁর সার্বিক খবরদারিতে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। শুরু হয় মুসলিম-জোট গড়ার প্রচেষ্টা। হিন্দু বিজয়নগরের বিরুদ্ধে এই মুসলিম জোট গড়ার প্রকৃত উদ্যোক্তা কে, সে বিষয়ে মতানৈক্য আছে। *সৈয়দ আলির* মতে, আহম্মদনগরের নিজাম শাহ এই কাজের পথ-প্রদর্শক ছিলেন। কিন্তু *ফেরিস্তার* মতে, বিজাপুরের আলি আদিল শাহ ছিলেন এর উদ্যোক্তা। *জি. ভেঙ্কটরাও* প্রমুখ আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে, এ কাজে মূল ভূমিকা ছিল গোলকুণ্ডার সুলতান ইব্রাহিম কুতুব শাহর। তিনি নিজামশাহী ও আদিলশাহী বংশের মধ্যে মিলন ঘটানোর জন্য বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগী হন। ফলস্বরূপ নিজাম শাহের কন্যা *চাঁদবিবির* সাথে আদিল শাহের বিবাহ হয়। আবার আদিল তাঁর কন্যার সাথে নিজাম শাহের জ্যেষ্ঠপুত্র মুর্তজার বিবাহ দেন। যাই হোক, এই জোটে বিদর রাজ্যও যোগ দেয়। তবে বেরার এই জোটের বাইরে থাকে।

প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হবার পর আদিল শাহ রাম রায়ের কাছে রায়চুর মুদ্‌গল দাবি করেন। স্বাভাবিক কারণেই রাম রায় এই অন্যায় দাবি নস্যাৎ করে দেন। সঙ্গে সঙ্গে চার রাজ্যের মুসলিম বাহিনী বিজয়নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা শুরু করে (ডিসেঃ ১৫৬৪ খ্রীঃ)। রাম রায় প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হন। কৃষ্ণা থেকে সিংহল পর্যন্ত সমস্ত মিত্র ও সামন্তকে তিনি এই যুদ্ধে যোগ দিতে আহ্বান জানান। কৃষ্ণা নদীর তীরে দুই বাহিনী মুখোমুখি হয়। *'রাখসস্'* ও *'তাংদি'* নামক গ্রামের সন্নিকটে শুরু হয় সংগ্রাম। এটিই ইতিহাসে *"তালিকোটার যুদ্ধ"* (১৫৬৫ খ্রীঃ) নামে খ্যাত। রাম রায় ও তার দুই ভ্রাতা বীর বিক্রমে যুদ্ধ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিজয়নগর পরাজিত হয়। মুসলমান পদাতিক অশ্বারোহী তীরন্দাজ বাহিনীর দক্ষতা এবং বিজয়নগরের দু'জন মুসলমান সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতার ফলে মুসলিম জোট বিজয়ী হয়। হুসেন নিজাম শাহ স্বহস্তে রাম রায়কে হত্যা করেন। মুসলিম-বাহিনী চালায় অবর্ণনীয় অত্যাচার, লুণ্ঠন ও ধ্বংস। *ফেরিস্তার* মতে, প্রায় এক লক্ষ হিন্দু এই যুদ্ধে নিহত হয়। অবাধ লুণ্ঠনের ফলে প্রতিটি মুসলমান সৈনিক প্রভূত সম্পদের অধিকারী হয়। সমগ্র বিজয়নগর পরিণত হয় ধ্বংসস্তূপে। বিজয়ী-বাহিনীর অভূতপূর্ব ধ্বংসলীলা বর্ণনা করে **Sewell** তাঁর *'A forgotton Empire'* গ্রন্থে লিখেছেন ঃ *"শত্রুপক্ষ বিজয়নগর ধ্বংস করতে এসেছিল এবং সে কাজ তারা অবিশ্রান্ত ভাবেই সম্পন্ন করেছে। নির্দয়ভাবে হিন্দুদের হত্যা করেছে, ধ্বংস করেছে মন্দির, দেবমূর্তি ও প্রাসাদরাজির.....পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ ধ্বংসলীলা সম্ভবত আর ঘটে নি।" তাঁর ভাষায় ঃ "Never perhaps in the history of the world has such havoc been worght, and worght so suddently, on so splendid a city"..*

ড. *ঈশ্বরীপ্রসাদ* তালিকোটার যুদ্ধকে বিজয়নগর রাজ্যের 'মৃত্যুঘণ্টা' বলে অভিহিত করে লিখেছেন যে, এই যুদ্ধে বিপর্যয়ের ধাক্কা কাটিয়ে ওঠা বিজয়নগরের পক্ষে সম্ভব হয় নি। এর পরেও বিজয়নগর রাজ্যের অস্তিত্ব অরবিড়ুবংশীয় তিরুমল,দ্বিতীয় রঙ্গ, দ্বিতীয় ভেঙ্কট, তৃতীয় রঙ্গ প্রমুখের নেতৃত্বে হয়তো কিছুকাল টিকেছিল ; কিন্তু অতীতের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি সে কখনোই পুনরুদ্ধার করতে পারে নি। তালিকোটার বিপর্যয় এবং অবাধ ধ্বংসকার্যের ফলে বিজয়নগরের আর্থিক মেরুদণ্ড সম্পূর্ণ ভেঙে যায়। স্বভাবতই রাজনৈতিক প্রতিপত্তি পুনরুদ্ধার তার পক্ষে

অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। *দ্বিতীয়ত,* তালিকোটার যুদ্ধের ধাক্কা থেকে পুর্তুগীজদের বাণিজ্যও রক্ষা পায় নি। এই যুদ্ধের ফলে দক্ষিণ-ভারতের বহু ব্যস্ত বাজার ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে পর্তুগীজদের সম্ভার বাজারজাত করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। *তৃতীয়ত,* মুসলমান রাজ্যগুলির পক্ষেও এই যুদ্ধ শুভ ছিল না। আপাতভাবে তালিকোটার যুদ্ধ মুসলমানদের ঐক্য ও সাফল্যের প্রতীক। কিন্তু এর পরিণতি ছিল ক্ষতিকর। হিন্দুরাজ্য বিজয়নগরের সদর্প উপস্থিতি মুসলিম রাজ্যগুলির মধ্যে ঐক্যবন্ধনের উপাদান হিসেবে কাজ করতো। কিন্তু এই রাজ্যের বিপর্যয় তাদের মনে এক ধরনের সামরিক নিস্পৃহতার জন্ম দিয়েছিল এবং তারা নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে নিজেদেরই ধ্বংস ডেকে এনেছিল। তাই বলা চলে, তালিকোটার যুদ্ধ যদি বিজয়নগর রাজ্যকে ধ্বংস করে, তাহলে এই যুদ্ধই মুসলমান রাজ্যগুলির পতনের পথও প্রশস্ত করে দিয়েছিল।

○ বিজয়নগরের কৃষি ব্যবস্থা ঃ

পণ্ডিত নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী লিখেছেন যে, বিজয়নগরের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ গ্রামে বসবাস করতো এবং তাদের প্রধান জীবিকা ছিল কৃষি উৎপাদন। জমির মালিকানা সকল বৃত্তির মানুষের কাছেই সামাজিক মর্যাদার দ্যোতক হিসেবে বিবেচিত হত। এইভাবে গ্রামগুলি কৃষক ও ভূস্বামীদের আবাসস্থলে পরিণত হয়েছিল। *শাস্ত্রীর* ভাষায়, *"The village was thus primarily a settlement of peasants, and its assembly an association of landlords."* অতীতকাল থেকেই এখানে কৃষিযোগ্য জমি গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে সময়ভিত্তিক (Periodical) বণ্টন করা হত। ছোট-বড় ভূস্বামী ছাড়াও ছিল অসংখ্য ভূমিহীন ক্ষেতমজুর। এই 'কৃষক সর্বহারা' (agrarian-proletariat) শ্রেণী ছিল কৃষি উৎপাদনের প্রধান শক্তি। তবে এদের অধিকাংশের অবস্থা ছিল ভূমিদাসদের সমতুল্য। সামাজিক ক্ষেত্রে গুরুত্বহীন এই শ্রেণীর মানুষ নিজেদের অবস্থার রূপান্তর ঘটানোর কোন ক্ষমতাই ধরত না। কামার, কুমোর, তাঁতি ইত্যাদি ক্ষুদ্র কারিগরদের গ্রামে আটকে রাখার জন্য কিছু কিছু জমি চাষের অধিকার দেওয়া হত। নিম্নবর্গের গৃহভৃত্যদের কাজের বিনিময়েও কিছু জমি বরাদ্দ করা হত।

দৈনিক কৃষি-মজুরদের সাধারনত উৎপন্ন শস্যে মজুরী দেওয়া হত। বর্গা চাষ বিজয়নগরে জনপ্রিয় ছিল। বিশেষত মঠ ও মন্দিরের জমিগুলি বর্গা বা ভাগচাষীদের মধ্যে বণ্টন করে চাষাবাদ করা হত। *নীলকণ্ঠ শাস্ত্রীর* মতে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ধরনের বর্গাচাষে কৃষক বা বর্গাদার জমির আংশিক মালিকানার অধিকারী হয়ে যেতেন।

খাদ্যশস্য ও ডাল জাতীয় শস্য উৎপাদনের পাশাপাশি বিজয়নগরে ফুল, ফল ও অন্যান্য কাঁচা-আনাজের চাষ জনপ্রিয় ছিল। কালক্রমে বিভিন্ন অর্থকরী বাণিজ্যিক পণ্য যেমন তুলা, আখ ইত্যাদি চাষের দিকেও বিজয়নগরের কৃষকেরা নজর দেয়। বড় বড় বাগিচাগুলিতে পান, সুপারি, আদা, হলুদ, ও নানারকম ফল-ফুল চাষ করা হত। পর্যটক *আব্দুর রজ্জাক* বিজয়নগরে গোলাপ ব্যবসায়ীদের সংখ্যাধিক্যের কারণ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, বিজয়নগরে, খাদ্যের মতই জনজীবনে গোলাপের ব্যবহার গুরুত্ব পেত।

বিজয়নগরে জলসেচের ব্যবস্থার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত। এজন্য নদী ও খালের উপর বাঁধ দিয়ে কৃষি জমিতে জলের যোগান দেওয়া হত। যে সব একালায় প্রাকৃতিক ভাবে

জল যোগানের সুযোগ ছিল না, সেখানে জলাশয় খনন করে জমিতে জলসেচ দেওয়া হত। সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এই সকল জলাশয় রক্ষাণাবেক্ষণে বিশেষ নজর রাখতেন। অনাবাদী জমিকে কৃষিজমিতে উন্নীত করার জন্য কৃষকদের উৎসাহ দেওয়া হত। এই সকল ক্ষেত্রে উদ্যোগী কৃষকদের করভার লাঘব করে কিংবা বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে উৎসাহিত করা হত।

সাধারণভাবে কৃষকদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করত অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর। তবে এজন্য কৃষকদের অধীন জমির বন্দোবস্তের শর্তাদি ও রাজস্ব আদায়কারী সংগঠনের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ধর্ম প্রতিষ্ঠান বা জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের জমিতে চাষরত কৃষকদের অবস্থা তুলনামূলক ভাবে ভাল ছিল। ভূস্বামী হিসেবে মঠ বা মন্দির কর্তৃপক্ষ অনেকবেশি সহনশীল ও উদার ছিলেন। উচ্চপদস্থ কর্মচারী বা অভিজাতদের মালিকানাধীন জমির কৃষকদের উপর করের বোঝা ছিল সাধারণ ভাবে নিপীড়ণমূলক। নায়ঙ্কর ব্যবস্থা জোরালো হলে কৃষকেরা নায়কদের নির্ধারিত মূল্যে নগদ অর্থে শস্য কিনতে বাধ্য হত। এতে কৃষকদের অবস্থার দারুণ অবনতি ঘটে।

কৃষিকাজের পাশাপাশি গো-পালন ও দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন (cattle-raising and dairy farming) বিজয়নগর রাজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কৃষিজমির বাইরে গো-চারণ ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করা থাকত। মন্দির কর্তৃপক্ষের অধীনে বহু গবাদি পশু থাকত। বিভিন্ন মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের জন্য জ্বালানী হিসেবে ঘি ব্যবহার করা হত। এছাড়া অভিজাত শ্রেণীর খাদ্য তালিকায় গব্য-ঘৃত ছিল অতি-আবশ্যিক একটি পদ। স্বভাবতই, গো-পালন বিজয়নগর রাজ্যে একটি প্রয়োজনীয় ও লাভজনক বৃত্তি হিসেবে গন্য হত।

পর্যটক *পায়েজ*-এর বিবরণ থেকে বিজয়নগর রাজ্যের কৃষি-জীবনের একটা সার্বিক চিত্র পাওয়া সম্ভব। তিনি লিখেছেন, *"এদেশে প্রচুর ধান, অন্যান্য শস্য, শিম-জাতীয় ফসল আমাদের দেশে হয়না এমন সব শস্য উৎপন্ন হয় ; কার্পাসের প্রচুর চাষ হয়। এদেশে অসংখ্য গ্রাম, শহর ও বড় বড় নগর আছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে রাজাদের সজাগ দৃষ্টি ছিল। বেশিসংখ্যক জমিকে সেচের আওতায় আনার জন্য এবং অনাবাদী জমিকে চাষযোগ্য করে তোলার জন্য সরকারের তরফে নানা ব্যবস্থা গৃহীত হয়।"*

○ কর ব্যবস্থা ঃ

বিজয়নগরের কর ব্যবস্থার কেন্দ্রে ছিল ভূমি-রাজস্ব। এছাড়াও প্রজাদের কাছ থেকে সম্পদ-কর, বিক্রয়-কর, যুদ্ধ-কর, বিবাহ-কর, বেগার-শ্রম ইত্যাদি আদায় করা হত।

ভূমি-রাজস্ব নির্ধারনের জন্য সরকার একাধিক বিষয় বিবেচনা করত। উক্ত জমি দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা কিনা, বা ব্রাহ্মনদের জন্য উৎসর্গ হয়েছে কিনা, এছাড়া জমির পরিমাণ, উৎপাদিকাশক্তি, জমির চরিত্র অর্থাৎ সেচ বা অ-সেচ একালার অন্তর্ভূক্ত কিনা ইত্যাদি বিবেচনা করা হত। জমির উর্বরতার ভিত্তিতে একই অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের কর নির্ধারিত হত। মোটামুটি ভাবে পরিষ্কার যে, মোট উৎপাদনের উপর রাজস্ব নির্ধারন করা হত। ইংরেজ পর্যটক হ্যামিলটনের বিবরণ (১৯ শতক) থেকে জানা যায় যে, রাজা কৃষ্ণদেব রায় জমি জরিপ করে রাজস্ব নির্ধারনের বিষয়ে যত্নবান ছিলেন। সম্ভবত, জলাজমি ও শুকনো জমি তিনি পৃথক পৃথক ভাবে জরিপের

ব্যবস্থা করেন। সমকালীন শিলালেখ থেকে জমিজরিপের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন মাপ ব্যবহারের কথা জানা যায়। আবার একই এলাকায় দু'ধরনের মাপ ব্যবহার হচ্ছে এমন দৃষ্টান্তও আছে। সরকার অবশ্য একই ধরনের মাপ ব্যবহারের পক্ষপাতি ছিল। *'বৃদ্ধচলম'*-এর একটি শিলালেখ থেকে জানা যায় যে একই রকম মাপ চালু না থাকার ফলে কৃষকেরা ঘন ঘন বাসস্থান পরিবর্তন করত। এতে কৃষি উৎপাদন ব্যহত হবার সম্ভাবনা ছিল। সাধারণভাবে সরকার উৎপাদনের এক-ষষ্ঠাংশ রাজস্ব হিসেবে নিত। ব্রহ্মদেয় জমিতে কুড়িভাগের একভাগ এবং মন্দিরের জমিতে তিনভাগের এক ভাগ রাজস্ব আদায়ের রীতি ছিল। হরিহরের আমলে শস্যের পরিবর্তে নগদ টাকায় খাজনা নেবার ব্যবস্থা করা হয়। জমির উর্বরতা, বীজের ব্যবহার ও শস্যের গড় মূল্যের ভিত্তিতে শস্যকে টাকায় রূপান্তরিত করা হত। পণ্ডিত *শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার* সহ অনেকেই মনে করেন যে বিজয়নগরের করের হার ছিল যথেষ্ট উঁচু। বিদেশী পর্যটকরা- বিজয়নগেরর শাসকদের অতুল সম্পদ ও বিলাস-বৈভবের যে বিবরণ দিয়েছেন তার ভিত্তিতে অনুমান করা যায় যে, প্রজাদের উপর যথেচ্ছকর আদায় করা হত।

ভূমি-রাজস্ব ছাড়াও বিজয়নগর রাজ্যে বৃত্তি কর, সামাজিক কর ইত্যাদি আদায় করা হত। গ্রামের মোড়ল, মেষপালক, ছুতোর, ধোপা, নাপিত, কুমোর, স্বর্ণকার, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি বিভিন্ন বৃত্তির জন্য কর দিতে হতো। সদাশিব রাও-এর আমলে নাপিতদের কর প্রদান থেকে রেহাই দেওয়া হয়। পেশা ভিত্তিক কর বছরে একবার দিতে হত। কুটির শিল্পের কারিগরদেরও কর দিতে হত। তাঁত, ঘাঁনি, হীরক শিল্প, রেশমজরি, লৌহ-চুল্লি ইত্যাদি শিল্পে কর আরোপ করা হত। তবে এক্ষেত্রে করের পরিমাণ, কর নির্ধারনের ভিত্তি কি ছিল, তা স্পষ্ট নয়। সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্যও কর আদায় করা হত। যেমন বিবাহ-কর। কন্যাপক্ষ ও বরপক্ষ উভয়কেই এই কর দিতে হত। গ্রামের মন্দিরে অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য *'পিদারিভারী'* নামক কর সংগ্রহ করা হত। বিবাহ-কর সব থেকে অ-জনপ্রিয় ছিল। তাই পরবর্তী কালে কৃষকদের রায় এই কর বাতিল করে দেন। রাজার জন্মদিনে রাজার পুত্র সন্তানের জন্ম উপলক্ষ্যে সামন্ত ও স্থানীয় নেতারা রাজাকে বিশেষ কর দিতেন। বিচারকার্য সম্পাদনের জন্য প্রাদেশিক কর্তা বা গ্রাম-প্রধান একধরনের কর আদায় করতেন। এই করের একাংশ রাজারপ্রাপ্য ছিল। নিচুজাতের লোকদের ধর্মীয় কাজকর্ম করার জন্য গ্রাম-প্রধানরা অধস্তন কর্মী নিয়োগ করতেন। এদের বলা হত *'দাসারী'*। অনুষ্ঠান শুরুর আগে নিচুজাতের লোকেরা 'দাসারীদের একটা প্রাপ্য দিতে বাধ্য থাকত। এই অর্থের একটা অংশ রাজাকে দেওয়া হত। এই প্রথাকে বলা হত *'সমাচার'*। সরকারি উচ্চ আমলা গ্রাম পরিদর্শনে এলে তাদের কিছু উপঢৌকন দিয়ে বরণ করা বাধ্যতামূলক ছিল।

মধ্যযুগের ভারতে বেগার-শ্রম একটি বহুল প্রচলিত প্রথা। বিজয়নগরেও এই প্রথার প্রচলন ছিল। এই বিনা পারিশ্রমিকের বাধ্যতামূলক শ্রমকে বলা হত *'উলিয়াম'*। রাস্তা নির্মান, সংস্কার ও সম্প্রসারণ, জলসেচের খাল খনন, মন্দিরের পাঁচিল নির্মাণ ইত্যাদি কাজ বেগার-শ্রম হিসেবেই গন্য হত। দুর্গ নির্মাণ বা সংস্কাররের জন্যও স্থানীয় মানুষ বিনা মজুরীতে শ্রমদিতে বাধ্য হত। তবে এক্ষেত্রে বেগার-শ্রম দিতে অপারগ হলে পরিবর্তে *'কোট্রাজ'* নামক কর দিয়ে রেহাই পাওয়া যেত।

বিজয়নগরের রাজস্ব দপ্তরের নাম ছিল *'অথবান'*। রাজস্ব বিষয়ক কেন্দ্রীয় কর্মী এটির তত্ত্বাবধান করতেন। রাজস্ব-প্রধানকে সহযোগিতা করতেন প্রদেশ ও জেলা স্তরের আমলাবৃন্দ। কেন্দ্রীয় রাজস্ব দপ্তরকে ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করে প্রতিটি বিভাগকে একজন করে দায়িত্বশীল আমলার তত্ত্বাবধানে রাখা হত। কর সংগ্রহের জন্য বিজয়নগরে চারটি প্রথার প্রচলন ছিল। একটি প্রথানুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার নিযুক্ত কর্মচারী সরাসরি উৎপাদকের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করতেন। দ্বিতীয় প্রথায় সরকার কর আদায়ের দায়িত্ব ইজারা হিসেবে কোন ব্যক্তিকে অর্পন করত। তৃতীয় প্রথা অনুযায়ী সরকার গ্রামের কিছু মানুষ বা গোষ্ঠীর সাথে ঐ এলাকার কর আদায়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হত। চুতর্থ এবং শেষ প্রথাটি হল 'নায়ক' নামক এক বিশেষ ধরনের ভূস্বামীর হাতে সরকার সাম্রাজ্যের কিছু অংশ ইজারা দিয়ে নির্দিষ্ট সামরিক সাহায্য ও নির্দিষ্ট অংকের টাকা কর হিসেবে গ্রহণ করত। প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন, অনাবৃষ্টি, বা অতিবৃষ্টির সময় বিজয়নগর রাজ্যে কৃষককে করের ছাড় দেওয়া হত। এই কর-ছাড়ের ক্ষমতা ছিল একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থাৎ রাজার। *'ভালুড়ুর লেখ'* (১৪০২/৩ খ্রিঃ) এবং *'আদুতুরাই লেখ'* (১৪৫০ খ্রিঃ) থেকে কর ছাড় দেবার উল্লেখ পাওয়া যায়।

○ নায়ঙ্কারা (নায়ক) প্রথা ঃ

বিজয়নগর রাজ্যের সামরিক ব্যবস্থা ও ভূমিদান রীতির সাথে বিশেষ ভাবে জড়িত ছিল 'নায়ক' বা *'নায়ঙ্কারা'* প্রথা। ষোড়শ শতকে পর্তুগীজদের প্রতিবেদনে বিজয়নগরের 'নায়ক' উপাধিধারীদের *'ক্যাপ্টেন'* বলে অভিহিত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে তারা দক্ষিন-আমেকিরান উপনিবেশে প্রচলিত পদ্ধতির সাথে নায়ক ব্যবস্থাকে মিলিয়ে ফেলেছেন। সস্কৃত সাহিত্যে 'নায়ক' অর্থে নেতা বা বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বোঝান হয়। কিন্তু বিজয়নগরের 'নায়ক' প্রথা কিছুটা স্বতন্ত্র। নায়কদের অধিকার, কর্তব্য ও নায়ক প্রথার প্রকৃতি সম্পর্কে ঐতিহাকিদরে মধ্যে মতভেদ আছে। অধ্যাপক ***অনিরুদ্ধ রায়ের*** মতে,[1] বিজয়নগরে নায়করা স্থানীয় নেতৃবর্গের থেকে স্বাধীন। ফলে নতুন নতুন মানুষ সহজেই এই রাজনৈতিক কাঠামোর অন্তর্ভূক্ত হয়ে যেতে পারে। যেমনভাবে তেলেগু যোদ্ধারা তামিলদের মধ্যে মিলে গিয়েছিল। বিজয়নগরের বিভিন্ন শিলালেখতে *'অমরয়ঙ্কর'* শব্দটি পাওয় যায়। এখানে 'অমর' অর্থে সৈন্যাধ্যক্ষ, 'নায়ক' অর্থে নেতা এবং 'কর' বলতে সরকারি কাজকে বোঝান হয়েছে। এই ব্যাখ্যার ভিত্তিতে 'নায়ক' বা 'নায়ঙ্কর' প্রথার বৈশিষ্ট্যগুলি অনুধাবন করা যায়।

পণ্ডিত নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে লিখেছিলেন যে, ১৫৬৫ সাল পর্যন্ত নায়করা বিজয় নগর রাজার ইচ্ছার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল ছিলেন। পরে তাঁরা আধা-স্বাধীন হয়ে যান। ১৯৫৫ সালে তিনি বলেন যে, নায়করা মূলত ছিল সামন্ত এবং তাঁরা রাজাকে সামরিক সাহায্য দানের শর্তে ভূমির অধিকার ভোগ করতেন। কিন্তু ১৯৬৪ সালে পণ্ডিত শাস্ত্রী তাঁর পূর্ব-অভিমত থেকে সরে আসেন এবং বলেন যে, বিজয়নগর একটি *'যোদ্ধারাজ্য'* বা war-state এবং এই সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক সংগঠন তার সামরিক প্রয়োজন অনুসারেই গড়ে উঠেছে। তাঁর মতে বিজয়নগর সাম্রাজ্য ছিল অসংখ্য সামরিক নেতার মিলিত প্রয়াসের ফল। ***মহালিঙ্গম*** *(T. V.*

Mahalingam)-এর বক্তব্যেও[1] এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন যে, বিজয়নগরের অভ্যন্তরীণ সংগঠনের প্রধান ভিত্তি ছিল 'নায়ঙ্করা' ব্যবস্থা। এই প্রথানুযায়ী রাজা নায়কদের হাতে ভূমি-রাজাস্বের অধিকার অর্পন করতেন। নায়করা একাধারে ছিলেন সামরিক নেতা ও স্থানীয় প্রশাসক। এছাড়া তাঁরা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের আদায়ীকৃত রাজস্বের একাংশেও কেন্দ্রীয় কোষাগারে জমা দিতেন। তামিল দেশে পনেরো শতকের শেষভাগ ও ষোল শতকের গোড়ায় নায়ঙ্করা ব্যবস্থার ব্যাপকতা দেখা যায়। তামিল এলাকার অধিকাংশ নায়ক ছিলেন বাহিরাগত তেলেগু যোদ্ধা।[2] এই যোদ্ধারা এবং তাদের কৃষকরা তামিল সমভূমি অঞ্চলের সমৃদ্ধ অবস্থা দেখে আকৃষ্ট হয়। তামিল কৃষকরা এই এলাকাকে উর্ব্বর করে তুলে ছিল। তেলেগু যোদ্ধারা এইসব এলাকা দখল করলেও সমভূমির উত্তর দিকের তামিল নেতাদের উৎখাত করেনি এবং বহুক্ষেত্রে তাদের জমির উপর অধিকারও মেনে নিয়েছিল।

সমকালীন স্থানীয় লেখমালা এবং বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ থেকে বিজয়নগরে দুর্গ ও দুর্গাধিপতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার স্বীকৃতি পাওয়া যায়। সমকালীন তেলেগু কবিতায় দেখানো হয়েছে যে, বিজয়নগরের শ্রেষ্ঠ রাজা কৃষ্ণদেব রায়ও দুর্গ, ব্রাহ্মন সামরিক নেতা ও বিচ্ছিন্নগোষ্ঠীর মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে রাষ্ট্রশক্তি বৃদ্ধির কথা বলেছেন। চোলদের আমলে প্রচলিত ব্যবস্থারই সম্প্রসারিত ও পরিবর্তিত প্রথা হিসেবে সামরিক নেতৃত্বের কাজে ব্রাহ্মনদের উত্থান ঘটে। চোলযুগে নাত্তারের মাধ্যমে ব্রাহ্মনদের জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হত। বিজয়নগরের আমলে ব্রাহ্মনরা সম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ বাড়ানোর প্রচেষ্টা করেন। এঁদের সরাসরি দুর্গের অধ্যক্ষ (দুর্গাধিপতি) নিয়োগ করে সামরিক নেতৃত্বের অংশীদারে পরিণত করা হয়। স্থানীয় ব্রাহ্মনদের পাশাপাশি মহারাষ্ট্র অঞ্চল থেকেও বহু ব্রাহ্মণ এসে সামরিক নেতৃত্বের কাজে লিপ্ত হন।

বিজয়নগরের এই রাজনৈতিক ও সামরিক বব্যস্থা সে দেশের কৃষি সম্পর্কের উপরেও প্রভাব ফেলে। প্রধানত, জমির উপর নিয়ন্ত্রনের চরিত্র থেকেই সাধারণ কৃষক, রাজা ও সামরিক নায়কদের ক্ষমতার ভিত্তি ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বা কর্তৃত্বের সম্পর্ক বিকশিত হয়। ***ভেঙ্কটরামনাইয়া (venkataramanaya)*** প্রমুখ কেউ কেউ মনে করেন যে, বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দক্ষিণ ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতির লক্ষনীয় পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। এই প্রসঙ্গে তাঁরা পূর্ব মারিয়াদে বা প্রাচীন রীতি অনুসরণ করার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। মুসলমান অগ্রগতির মুখে হিন্দু ধর্মের ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখার জন্য দক্ষিণ ভারতে প্রাচীন রীতিনীতিকে কঠোর ভাবে আঁকড়ে থাকার প্রবণতা ছিল বলে এঁরা মনে করেন। ***পণ্ডিত নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী*** এই আদর্শবাদের অস্তিস্ব স্বীকার করে নিয়েও বিজয়নগরের আমলে পরিবর্তনের দিক্‌টি উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, চোল আমলে জনপ্রিয় 'সভা', 'উর' বা 'নাডু' ইত্যাদির আস্তিত্ব বিজয়নগরের আমলে শিথিল হতে থাকে এবং কালক্রমে প্রায় বিলোপ ঘটে। পণ্ডিত কৃষ্ণস্বামীর মতে, বিজয়নগর রাষ্ট্রের সামরিক সংস্থা ও সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতি থেকে উদ্ভূত অবহেলার ফলে পূর্বেকার স্থানীয় সংগঠন গুলি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। এই পুরানো প্রথাগুলির স্থান নিয়েছিল ***'নায়ঙ্করা'*** ও ***'আইগার'*** প্রথা। তাঁর মতে,

বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অধীনে আসার পর তামিল দেশে *"আইগার"* প্রথার আবির্ভাব ঘটে। এই প্রথার মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মচারীদের জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হত। অধ্যাপক ***অনিরুদ্ধ রায়ের*** মতে, ***'নাত্তার'*** নামক গ্রামীণ কর্মচারী পদের বিলোপ এবং 'নায়ক' পদের উত্থান এক।স্তই স্থানীয় পরিবর্তন হিসেবে আবির্ভূত হয়। এই নতুন নেতা হিসেবে সম্পূর্ণ অচেনা ব্যক্তির উত্থানও ঘটে। এইভাবে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের আমলে প্রচলিত দক্ষিণ ভারতীয় রীতি এবং গোষ্ঠী, নেতা ও গ্রামের মধ্যে সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটে। এর পরিণামে ভূমি ব্যবস্থারও আমূল পরিবর্তন ঘটে যায়।

নায়ঙ্করা প্রথার উদ্ভবের সাথে সাথে বিজয়নগর রাজ্যের রাষ্ট্রনৈতিক চরিত্র এবং সামন্ততন্ত্রের সাথে এই প্রথার সামঞ্জস্যের বিষয়টি ঐতিহাসিক বিতর্কের কেন্দ্রে চলে এসেছে। ***অধ্যাপক রায়***-এর মতে, বিজয়নগরের 'নায়ক' প্রথাকে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে একীভূত করা সঠিক নয়। কেবল সামরিক সাহায্যের বিনিময়ে জমি ভোগ করার অধিকার থাকলে নায়ঙ্করা প্রথাকে সামন্ততান্ত্রিক প্রথার কাছাকাছি বলা যেত। কিন্তু বিজয়নগরের 'নায়ক' এমন একজন যোদ্ধা যে রাজ্যের সামরিক ব্যবস্থার অন্যতম অঙ্গ এবং যে সবসময় তার নিজের অধিকারে একজন জমিদার স্থানীয়। ***পণ্ডিত নীলকণ্ঠ শাস্ত্রীও*** মনে করেন যে, নায়ক ব্যবস্থা তথাকথিত সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার সমতুল্য ছিল না ; পরন্তু বিজয়নগর রাজ্য ছিল আমলাতান্ত্রিক এবং বহুলাংশে কেন্দ্রীকরণ প্রবণতা সম্পন্ন। পর্যটক ***নুনিজ*** প্রায় ২০০ জন নায়কের সন্ধান পেয়েছেন এবং তিনি এমন কোন ইঙ্গিত দেননি যে বিজয়নগর বিকেন্দ্রীভূত প্রশাসনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিল।

বার্টন স্টাইন* (Burton stein) *'কেম্ব্রিজ ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে (১৯৮২ খ্রীঃ) প্রকাশিত প্রবন্ধে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীক চরিত্র ও ভূমিব্যবস্থা সম্পর্কে নতুন মূল্যায়ন করেছেন। তাঁর মতে, মধ্যযুগীয় দক্ষিণ ভারতের রাজনীতি অনুসারে বিজয়নগর রাজ্যও ছিল একাধিক অংশের সমন্বয় বা Segamentary state. বিজয়নগরকে একটি বৃহত্তর এলাকা বা Macro-region হিসেবে চিহ্নিত করলেও, বিজয়নগরের রাজা কার্যত একটি ছোট্ট এলাকা বা micro-region'-কে প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করতেন। রাজ্যের অবশিষ্ট অংশের আঞ্চলিক শাসকরা (নায়ক) রাজার প্রতি আনুগত্য দেখালেও প্রায় স্বাধীনভাবে শাসন পরিচালনা করতেন। এই খণ্ডিত অংশগুলি (micro-regions) সম্মিলিতভাবে বিজয় নগরের সামগ্রিক রাজ্য (macro-region) সৃষ্টি করে ছিলেন। ***স্টাইনের*** মতে, বিজয়নগর সাম্রাজ্য বর্তমান অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু ও কর্ণাটকের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত ছিল। এই সকল এলাকায় *'পূর্ব-মরিয়াদে'* বা প্রাচীন পদ্ধতি অনুসরণ করা হত। স্বভাবতই বিজয়নগরের পক্ষে রাজ্যের সর্বত্র একই ধরনের প্রশাসন বলবৎ করা সম্ভব ছিল না। স্টাইনের মতে, বিজয়নগরের শাসনব্যবস্থায় যে রূপান্তর (shift) এসেছিল তাহল বিকেন্দ্রীকরণ প্রবণতার বিকাশ। স্থানীয় সামরিক নেতা বা নায়কেরা ছিলেন আঞ্চলিক সর্বেসর্বা। তিনি স্থানীয় রাজস্ব আদায়, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। নায়ক দুর্গ নির্মাণ করে নিজের ক্ষমতা ও অধিকার সুরক্ষিত রাখতেন এবং সামরিক শক্তির সংরক্ষক হিসেবে রাজাকে তাদের উপর নির্ভরশীল থাকতে বাধ্য করতেন।

নায়কদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি প্রসঙ্গে বিজয়নগরের ভূমিব্যবস্থা লক্ষণীয়। বিজয়নগরের যুগে তিন ধরনের এলাকা ছিল—*'অমরা', 'ভণ্ডারভড়া'* এবং *'মান্য'*। সব থেকে ছোট এলাকা ছিল ভণ্ডারভড়া বা সরকারি গ্রাম। এর আয়ের কিছু অংশ দুর্গের রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয় করা হত। কিছু

আয় মঠ, মন্দির ইত্যাদিকে দান করা হত। মান্য ছিল নিষ্কর গ্রাম যা দেবস্থান বা ব্রাহ্মণদের দান করা হত। অবশিষ্ট সকল অঞ্চল ছিল 'অমরা'র অন্তর্ভুক্ত। এই সকল গ্রাম বিজয়নগরের রাজারা 'অমরা নায়ক'দের অর্পণ করেছিলেন। ফলে নায়কদের হাতে অর্থ ও শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। স্টাইনের মতে, অমরা নায়করা এইভাবে বিজয়নগর অর্থনীতির সিংহভাগ দখল করেছিলেন এবং কার্যত তাঁরাই ছিলেন রাজার সম্পদ সংগ্রহের প্রধান মাধ্যম। সামরিক ও আর্থিক ক্ষমতার অধিকারী এই সকল নায়কের কর্তৃত্ব অস্বীকার করা রাজার পক্ষে অসম্ভব ছিল। স্টাইনের মতে, নায়কদের হাতে জমির কেন্দ্রীকরণ ঘটলেও, বিজয়নগরের ব্যবস্থাকে ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের সমতুল্য বলা চলে না। বিজয়নগরের পঁচাত্তর শতাংশ জমি বিভিন্ন নায়কদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে ছিল। এই ব্যবস্থা জাপানের সামন্ততন্ত্রের কিছুটা কাছাকাছি। তবে এক্ষেত্রেও স্পষ্ট প্রভেদ লক্ষণীয়। নায়কদের মতই জাপানের সামন্তরা (দাইমিও) সামরিক নেতা ছিলেন ; কিন্তু তাঁদের উপরে ও নিচে অনেকগুলি আর্থ-সামাজিক স্তর বিন্যাস ছিল। অন্যদিকে বিজয়নগরে নায়করা প্রত্যক্ষভাবে জমি নিয়ন্ত্রণ করতেন এবং এখানে কোন স্বীকৃত মধ্যবর্তীর অস্তিত্ব ছিল না। এই বিচারে বিজয়নগরকে একটি 'যুদ্ধরাষ্ট্র' (war-state) বলা সংগত, সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র নয়।

○ শাসনব্যবস্থার স্বরূপ ঃ

যে-কোন সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের জন্য ক্ষাত্রশক্তিই যথেষ্ট নয়। সুবিন্যস্ত ও সু-নিয়ন্ত্রিত শাসনব্যবস্থার উপর তা বহুলাংশে নির্ভরশীল। বিজয়নগর রাজ্যের ক্ষেত্রে একথা আরো বেশি ভাবে প্রযোজ্য। কারণ দিল্লী-সুলতানির ধ্বংসস্তূপের উপরে গড়ে-ওঠা এই রাজ্যে কোন প্রাচীন রাজতান্ত্রিক ঐতিহ্য ছিল না। তাই অল্পকালের সময়সীমায় ঐ রাজ্যে চারটি বংশকে রাজত্ব করতে দেখা যায়। পরন্তু দক্ষিণ-ভারতের প্রতিবেশী বাহমনী রাজ্য সদা-সর্বদা বিজয়নগরকে গ্রাস করতে উদ্যত ছিল। অবশ্য বিজয়নগরের শাসকেরা রাজ্যের এইসব বিপদ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং সু-নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রীয় শাসনের প্রয়োগ দ্বারা এই সীমাবদ্ধতার মোকাবিলা করেছিলেন।

মধ্যযুগীয় রীতি অনুযায়ী রাজা ছিলেন সমস্ত ক্ষমতার আধার। তিনি ছিলেন প্রধান শাসক, প্রধান আইন-প্রণেতা ও প্রধান বিচারক। রাজাই ছিলেন প্রধান সেনাপতি। প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হলেও রাজা স্বেচ্ছাচারী বা অত্যাচারী ছিলেন না। বিজয়নগরের শাসনব্যবস্থা প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচারিতার আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ ছিল। বিজয়নগরের তথা দক্ষিণ-ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের *'আমুক্ত-মাল্যদা'* গ্রন্থ থেকে সেখানকার শাসনের প্রকৃতি বোঝা সম্ভব। তিনি লিখেছেন ঃ *"সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজা সর্বদা ধর্মের দিকে চোখ রেখে রাজ্যশাসন করবেন।"* রাজকর্তব্য সম্পর্কে তিনি উপদেশ দিয়েছেন যে, রাজা অতি সতর্কতার সঙ্গে এবং নিজের শক্তি অনুযায়ী দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করবেন। তিনি লিখেছেন ঃ *"রাজা কূটনীতিতে পারদর্শী ব্যক্তিদের সংগঠিত করে শাসন পরিচালনা করবেন।"*

একটি মন্ত্রিপরিষদের সাহায্যে রাজ্যশাসন পরিচালনা করতেন। এই পরিষদে সম্ভবত ছয় থেকে আটজন মন্ত্রী থাকতেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের মধ্য থেকে নিয়োগ করা হত। অনেক ক্ষেত্রেই, প্রধানত উচ্চবর্ণের ক্ষেত্রে মন্ত্রী-পদ বংশানুক্রমিক ছিল। মন্ত্রীগণকে দপ্তর পরিচালনায় সাহায্য করতেন। একদল দায়িত্বশীল কর্মী। এঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন খাজাঞ্চী বাণিজ্য-অধিকর্তা,

পুলিশ-অধিকর্তা, পরিবহণ-অধিকর্তা প্রমুখ। রাজপ্রাসাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হত। রাজসভাটি ছিল খুবই আড়ম্বরপূর্ণ। কবি, সাহিত্যিক, পুরোহিত, জোতিষী, সংগীতজ্ঞ ইত্যাদি বিভিন্ন শাখার জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা সর্বদা রাজসভার মর্যাদা বৃদ্ধি করতেন। বিজয়নগর রাজসভার চাকচিক্য ও আড়ম্বর দেখে প্রায় অধিকাংশ বিদেশী পর্যটক বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।

বিজয়নগর রাজ্যটি কয়েকটি মণ্ডলম্ বা প্রদেশে বিভক্ত ছিল। এগুলি আবার 'জেলা' (নাড়ু), 'মহকুমা' (স্থল), 'গ্রাম' প্রভৃতি ছোট ছোট এককে বিভক্ত ছিল। *পায়েজ* ভ্রান্তিবশত তখন২০০টি প্রদেশের অস্তিত্বের কথা লিখেছেন। সম্ভবত প্রদেশের সাথে সামন্ত, উপসামন্ত প্রমুখকে এক করে দেখার ফলে এই ভ্রান্তি হয়েছে। ড. *কৃষ্ণশাস্ত্রীর* মতে, বিজয়নগরে ছয়টি প্রদেশ ছিল। প্রদেশের শাসনদায়িত্বে থাকতেন একজন করে গভর্নর। সাধারণত রাজপরিবারের সদস্যদের মধ্যে থেকে গভর্নরদের নিয়োগ করা হত। কোন কোন ক্ষেত্রে রাজা দায়িত্ববান অভিজাতদেরও এই পদে নিযুক্ত করতেন। কেন্দ্রের মত প্রাদেশিক শাসকরাও (গভর্নর) সামরিক, অসামরিক ও বিচারবিভাগ নিয়ন্ত্রণ করতেন। প্রাদেশিক শাসকরা কেন্দ্রে আয়ব্যয়ের হিসেব পেশ করতে বাধ্য ছিলেন। রাজার প্রয়োজনে গভর্নররা সামরিক-বাহিনী দিয়ে সাহায্য করতেন। আইনত রাজার অধীনস্থ হলেও প্রাদেশিক শাসকরাও প্রচুর পরিমাণে স্বাধীনতা ভোগ করতেন। তাঁদের নিজস্ব দরবার ছিল, নিজস্ব সেনাবাহিনী ছিল। প্রদেশের কর্মচারীদের নিয়োগ ও পদচ্যুতি গভর্নর-এর ইচ্ছাধীন ছিল। এ ব্যাপারে রাজা হস্তক্ষেপ করতেন না। এমনকি গভর্নররা নিজনামে মুদ্রাও প্রচলন করতে পারতেন। গভর্নরদের কার্যকালের কোন নির্দিষ্ট সীমা ছিল না। রাজার ইচ্ছা এবং গভর্নরের সামর্থ্য ও শক্তির উপর তার কার্যকাল নির্ভর করত। রাজা সেনাপতিদের নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব প্রদানের শর্তে ভূমিদান করতেন। একে বলা হত *'অমরম্'*। এই সেনাপ্রধানদের *'পলিগর'* বা *'নায়ক'* বলা হত। রাজার প্রয়োজনে এরা রাজাকে অর্থ, সৈন্য, ঘোড়া, হাতি দিয়ে সাহায্য করতে বাধ্য ছিলেন। *ফার্নাও নুনিজ* বিজয়নগরে প্রায় দুইশত 'নায়ক'-এর অস্তিত্ব লক্ষ্য করেছেন। কানাড়ী-তেলেগুভাষী এই নায়করা ছিলেন মূলত কর্ণাটক-অন্ধ্র অঞ্চলের লোক। ক্রমে এই নায়করা খুবই শক্তিশালী ও স্বাধীনতাকামী হয়ে উঠেছিলেন। কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল পয়ে পড়লে নায়কদের কেউ কেউ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং সাম্রাজ্যের ভাঙন ত্বরান্বিত করেন।

বিজয়নগরের সর্বনিম্ন বা ক্ষুদ্রতম শাসনবিভাগ ছিল গ্রাম। চোলদের গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসনের ঐতিহ্য এখানেও বর্তমান ছিল। উত্তর-ভারতের পঞ্চায়েত-এর মত দক্ষিণে গ্রাম্য 'সভা' শাসন পরিচালনা করত। গ্রামীণ প্রশাসনিক কর্মচারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন *সেনাতোভা* বা *হিসাবরক্ষক, তলরা* বা *পরিদর্শক, বেগারা* ইত্যাদি। এই সকল কর্মচারী তাদের বেতন হিসেবে জমি ভোগ করতেন। কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সাথে গ্রামীণ প্রশাসনের সংযোগ রক্ষা করতেন *'মহানায়কাচার্য'* নামক কর্মচারী। পূর্বের তুলনায় পরবর্তীকালে গ্রামগুলির স্বশাসন-ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছিল এবং এর মূলে ছিল 'নায়ক'দের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির প্রসার।

বিজয়নগর রাজ্যকে প্রতিনিয়ত বাহমনী রাজ্যের সাথে সংঘর্ষ করে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে হত। তাই দক্ষ বাহিনী গঠনে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়। কৃষ্ণদেব রায়ের আমলে সাত লক্ষ পদাতিক, সাড়ে তিন হাজার অশ্বারোহী এবং সাড়ে ছয়শত রণহস্তী ছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল

একটি কামান-বাহিনী। উন্নতমানের অশ্বসংগ্রহের জন্য বিজয়নগরের রাজারা পর্তুগীজ বণিকদের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষার চেষ্টা করতেন। সেনাবিভাগের তত্ত্বাবধান করত *'কাণ্ডাচার'* নামক একটি দপ্তর। এই দপ্তরের প্রধান ছিলেন *প্রধান সেনানায়ক* বা *'দণ্ডপতি'*। এছাড়া প্রাদেশিক গভর্নরদের বা সামন্তদের কাছ থেকেও রাজা সেনা-সাহায্য পেতেন। তখন সম্ভবত নৌ-বাহিনী গড়ার দিকে নজর দেওয়া হয়নি। দক্ষিণ-ভারতের নদীপ্রধান অঞ্চলে স্থাপিত এই রাজ্যে নৌ-বাহিনীর প্রতি উদাসীনতা পরিণামে ক্ষতির কারণ হয়েছিল।

অন্যান্য বিষয়ের মত রাজা ছিলেন সর্বোচ্চ বিচারক। তবে সারাদেশে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য বিচারালয়ের মাধ্যমে বিচারকার্য নিষ্পত্তি হত। গ্রামীণ বিরোধ গ্রাম-পঞ্চায়েতে নিষ্পত্তি করা হত। কোন কোন ক্ষেত্রে সরকার-নিযুক্ত বিচারক স্থানীয় সভার সাথে আলোচনা করে গ্রামীণ বিরোধের মীমাংসা করতেন. সাধারণভাবে দেশের প্রচলিত রীতি-নীতি প্রথা-প্রকরণ ও আচার-ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে বিচারকার্য সম্পন্ন করা হত। ফৌজদারী দণ্ডবিধির যথেষ্ট কঠোরতা ছিল। চুরি, নৈতিক ব্যভিচার, দেশদ্রোহিতা প্রভৃতি অপরাধে কঠোর শারীরিক নির্যাতন বা মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত। সাধারণ অপরাধের জন্য অর্থদণ্ড বা সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ ইত্যাদি শাস্তি দেওয়া হত।

সামগ্রিকভাবে বিজয়নগরের শাসনব্যবস্থা ছিল সুসংগঠিত ও কার্যকর। তবে এরও কতকগুলি সহজাত ত্রুটি ছিল। যেমন—(১) প্রাদেশিক শাসক বা সামন্তদের ক্ষমতা-নিয়ন্ত্রণের যথাযথ ব্যবস্থা ছিল না। ফলে সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক সংহতি শিথিল হয়েছিল। (২) সামরিক বাবস্থা সম্পূর্ণ স্বনির্ভর ছিল না। বাহমনী রাজ্যের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত এই রাজ্যের সামরিক শক্তি স্থানীয় সামন্ত বা প্রাদেশিক গভর্নরদের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল থাকার ফলে, এর কার্যকারিতা ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। (৩) রাজ্যের পূর্ব-উপকূলে পর্তুগীজ বণিকদের অবস্থান ও ক্ষমতাবৃদ্ধির ব্যাপারে উদাসীনতা বিজয়নগরের পক্ষে শুভ হয়নি। (৪) প্রজাবর্গের 'ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রবণতা' রোধ করার কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ফলে জাতীয়তাবোধ শিথিলমূল হয়ে পড়েছিল। (৫) সমুদ্র ও নদী বেষ্টিত হওয়ার ফলে বিজয়নগরে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের সম্ভাবনা ছিল প্রবল। কিন্তু উপযোগী উপাদানের প্রতুলতা সত্ত্বেও রাজারা ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য কখনোই সুপরিকল্পিত কর্মসূচী নেননি।

○ বিদেশী পর্যটকদের দৃষ্টিতে বিজয়নগরের অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি ঃ

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে একাধিক পর্যটক ও দূত ভারতে এসেছিলেন। এঁদের অনেকেই বিজয়নগর রাজ্যে অবস্থান করে সমকালীন অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেন এবং তা লিপিবদ্ধ করেন। বিজয়নগরের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এইসব বিবরণীর গুরুত্ব অপরিসীম। পঞ্চদশ শতকের প্রথমদিকে বিজয়নগরের রাজা দ্বিতীয় দেবরায়-এর রাজত্বকালে (১৪২২-'৪৬ খ্রীঃ) দু'জন পর্যটক এদেশে এসেছিলেন। ইতালীদেশীয় পর্যটক *নিকোলো কান্টি (Nicolo Conti)* ১৪২২ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ বিজয়নগরে আসেন। তাঁর অভিজ্ঞতার বিবরণ পোপের সচিব প্রথমে ল্যাটিন ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন। পরে এটি পর্তুগীজ ভাষায় অনূদিত হয়। আরো *পরে রামুসিও (Ramusio)* এটিকে ইতালী ভাষায় অনুবাদ করেন। পারসিক

দূত ও পর্যটক *আব্দুর রজ্জাক* ১৪৪২ খ্রীষ্টাব্দে কালিকট বন্দরে উপস্থিত হন। একবছর পর তিনি বিজয়নগরে এসে উপস্থিত হন। ষোড়শ শতকের প্রথমদিকে পর্তুগীজদের সঙ্গে বিজয়নগরের বাণিজ্যিক সম্পর্কের দ্রুত উন্নতি ঘটতে থাকে। বাণিজ্যিক সূত্রে বহু পর্তুগীজ বণিক বিজয়নগরে এসে উপস্থিত হন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দু'জন হলেন *ডোমিনগোস পায়েজ (Domingos Paes)* এবং *ফার্নাও নুনিজ (Fernao Nuniz)* । বিজয়নগর রাজ্যের স্বর্ণময় যুগে পায়েজ এই রাজ্যে আসেন (১৫২২ খ্রীঃ)। তাঁর প্রায় দশ-পনের বছর পরে আসেন নুনিজ। এঁদের আগমনকালে বিজয়নগরের রাজা ছিলেন নৃপতিতিলক ***কৃষ্ণদেব রায়।*** পায়েজ-এর ভ্রমণকাহিনীতে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে রাজ্যের চিত্রাকর্ষক প্রকৃতি ও পরিবেশ, নগর-শহর, স্থাপত্য-ভাস্কর্য ইত্যাদি। অন্যদিকে *নুনিজ* গুরুত্ব দিয়েছেন ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর উপর।

ক. আর্থিক চিত্র ঃ বিদেশী পর্যটকদের বিবরণী থেকে বিজয়নগরের ঐশ্বর্য, চাকচিক্য এবং জনসাধারণের আর্থিক প্রাচুর্যের আভাস পাওয়া যায়। এঁদের বর্ণনায় রাজধানী-নগরী বিজয়নগরের এক মনোরম চিত্র ফুটে উঠেছে। বিজয়নগর ছিল সমকালীন বিশ্বের অন্যতম সম্পদশালী রাজ্য। বিজয়নগরের বর্ণনা প্রসঙ্গে ***নিকোলো কন্টি*** লিখেছেন ঃ *"শহরের পরিধি ছিল ৬০ মাইল ; এর দেওয়ালগুলি দূরের পাহাড়ঘেরা উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই শহরে প্রায় ৯০ হাজার অস্ত্রধারণে সক্ষম পুরুষ বাস করত। ভারতের যে-কোন রাজার থেকে এখানকার রাজা ছিলেন অধিক শক্তিশালী।"* পারসিক দূত ***আব্দুর রজ্জাক*** লিখেছেন ঃ *"দেশটি এতই জনবহুল যে, তার প্রকৃত চিত্র লিখে বোঝানো কষ্টকর। রাজার কোষাগারে একাধিক প্রকোষ্ঠ আছে, যার প্রতিটি তরল সোনায় পরিপূর্ণ। রাজ্যের সমস্ত উচ্চ-নীচ, এমনকি বাজারের কারিগররাও, দেহের নানা অঙ্গে অলংকারাদি পরিধান করত।"* পর্তুগীজ পর্যটক ***পায়েজ*** বিজয়নগরকে বিশ্বের সেরা শহর হিসেবে চিহ্নিত করে এখানকার সমৃদ্ধ বাণিজ্যের উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ *"এখানকার উন্নত বহির্বাণিজ্যের কারণে বিশ্বের নানা দেশের লোকের সন্ধান পাওয়া যায়। বাজারগুলিতে নানা ধরনের সামগ্রী, ধান, চাল, ডাল, গম, বার্লি প্রভৃতি মজুত থাকত। খাদ্যদ্রব্যের দাম খুবই সস্তা।"* পায়েজ বিজয়নগরের রাজার অপরিময়ে ঐশ্বর্য ও হাতি, ঘোড়া-সহ বিশাল সেনাবাহিনীর কথাও উল্লেখ করেছেন। ***এডোয়ার্ডে বারবোসা (Edoardo Barbosa)*** নামক জনৈক পর্যটক ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে এদেশে আসেন। তিনিও বিজয়নগর রাজ্যের আর্থিক প্রাচুর্য ও বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ *"নগরটি ছিল সুবিস্তৃত, জনবহুল এবং বাণিজ্যে অগ্রণী। পেগুর সাথে হীরা, রুবি, চীন ও আলেকজান্দ্রিয়ার সাথে সিল্ক এবং মালাবারের সাথে চন্দনকাঠ, কর্পূর ও নানা ধরনের মসলার বাণিজ্য চলত।"*

বিদেশী পর্যটকদের সকলেই প্রায় একমত যে, বিজয়নগর রাজ্যে লক্ষণীয় আর্থিক সচ্ছলতা ছিল। সমস্ত মানুষের আয়ব্যয় হয়তো সমান ছিল না ; উচ্চবিত্তের পাশে নিম্নবিত্ত মানুষ অনেক ছিল; কিন্তু সাধারণভাবে যাকে দারিদ্র্যের যন্ত্রণা বলে, তা বিজয়নগরের কোন মানুষকেই ভোগ করতে হত না। দেশের এই সমৃদ্ধির প্রধান উৎস ছিল *কৃষি, শিল্প* ও *বাণিজ্যের* অগ্রগতি। কৃষিক্ষেত্রে বিজয়নগর ছিল খুবই উন্নত। ***পায়েজ*** লিখেছেন ঃ *"এদেশে প্রচুর ধান ও অন্যান্য শস্য, শিম-জাতীয় ফসল এবং আমাদের দেশে হয় না এমন সব শস্য উৎপন্ন হয় ; কার্পাসের প্রচুর চাষ হয়। এদেশে অসংখ্য গ্রাম, শহর ও বড় বড় নগর আছে। কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে রাজাদের*

সজাগ দৃষ্টি ছিল। বেশিসংখ্যক জমিকে সেচের আওতায় আনার জন্য এবং অনাবাদী জমিকে চাষযোগ্য করে তোলার জন্য সরকারের তরফে নানা ব্যবস্থা গৃহীত হয়। সরকারি আয়ের প্রধান উৎস ছিল ভূমি-রাজস্ব। সাধারণভাবে উৎপন্ন ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ ভূমি-রাজস্ব হিসেবে আদায় করা হত। তবে দেশের প্রয়োজনে রাজস্বের হার বৃদ্ধি করা হত। অবশ্য শস্যভেদে, মৃত্তিকাভেদে এবং সেচভুক্ত ও অসেচভুক্ত এলাকায় রাজস্বের হারে তারতম্য ছিল। যেমন—একটি শিলালিপি থেকে জানা যায়, 'শীতকালে কুরুভয়ি (ধান) উৎপন্নের এক-তৃতীয়াংশ ; তিল, রাগী, ছোলা ইত্যাদির এক-চতুর্থাংশ ; জোয়ার ও শুকনো জমির উৎপন্নের এক-ষষ্ঠাংশ' রাজস্ব দিতে হত। ভূমি-রাজস্ব ছাড়াও প্রজাদের সম্পদ-কর. বিক্রয়-কর, যুদ্ধ-কর, বিবাহ-কর ইত্যাদি নানা ধরনের অতিরিক্ত কর দিতে হত।" ষোড়শ শতকে আগত পর্যটক ***নিকিতন*** লিখেছেন : *"রাজ্যে বহু লোকের বাস ছিল। পল্লী-অঞ্চলের লোকদের অবস্থা ছিল শোচনীয় ; কিন্তু অভিজাতরা ছিলেন অতি সমৃদ্ধিশালী এবং বিলাসব্যসনে মত্ত।"* ***ড. সতীশচন্দ্র*** মনে করেন যে, বিদেশী পর্যটকগণ বিজয়নগরের কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে এক ধরনের কথা বলেননি। তার প্রধান কারণ হল অধিকাংশ পর্যটক গ্রামীণ জীবনযাত্রা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে বস্ত্র-শিল্প, খনি-শিল্প ও ধাতু ছিল প্রধান। এছাড়া সুগন্ধ দ্রব্য উৎপাদনে বিজয়নগরের খ্যাতি ছিল।

বিজয়নগরের আর্থিক সমৃদ্ধির মূলে কৃষির পরেই ছিল বাণিজ্যের স্থান। অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্য উভয় ক্ষেত্রেই বিজয়নগর ছিল অগ্রণী একটি দেশ। সারাদেশে একাধিক ব্যস্ত বন্দর ছিল। আব্দুর রজ্জাক এখানে তিনশো বন্দরের উল্লেখ করেছেন। মালাবার উপকূলে এ-যুগের ব্যস্ততম বন্দর ছিল কালিকট। পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, ব্রহ্মদেশ, মালয়, উপদ্বীপ, চীন, আরব, পারস্য, দক্ষিণ-আফ্রিকা, আবিসিনিয়া, পর্তুগাল প্রভৃতি দেশের সাথে বিজয়নগরের বাহির্বাণিজ্য চলত। প্রধান রপ্তানি-দ্রব্যাদির মধ্যে ছিল নানাধরনের বস্ত্র, সুগন্ধি মসলা, চাল, চিনি, সোরা, লোহা ইত্যাদি। বিদেশ থেকে আমদানি হত প্রধানত ঘোড়া, হাতি, তামা, কয়লা, পারদ, প্রবাল, ভেলভেট ইত্যাদি। অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যও যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল। স্থলপথে ও জলপথে অন্তর্দেশীয় বাণিজ্য চলত। স্থলপথে ঘোড়া বলদ ও গো-শকটে মাল পরিবহণ হত। সমুদ্রের উপকূলবর্তী বন্দরগুলিকেও অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যে ব্যবহার করা হত। উপকূলের বাণিজ্যে ছোট ছোট জলযান ব্যবহৃত হত। তবে বিজয়নগরে বড় জাহাজও তৈরি হত। বারবোসা দক্ষিণ-ভারতের মালদ্বীপে বড় জাহাজ তৈরির কারখানা ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া, রাজাদের উৎকীর্ণ কিছু কিছু লিপি থেকেও অনুমান করা হয় যে, জাহাজ-নির্মাণশিল্প সেকালে আজানা ছিল না। পর্তুগীজ বণিকদের সাথে বিজয়নগরের সুসম্পর্কের প্রেক্ষিতে ধারণা করা যায় যে, জাহাজশিল্প ও জাহাজের ব্যবহার সম্পর্কে বিজয়নগরের অধিবাসীরা যথেষ্ট অভিজ্ঞ ছিল। অবশ্য অনেকের অভিযোগ এই যে প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে দক্ষ নৌ-বাহিনী গড়ার ব্যাপারে বিজয়নগরের শাসকেরা যথেষ্ট উদাসীন ছিলেন।

এ যুগে শিল্প ও বাণিজ্যে 'গিল্ড' বা বণিকসংঘের বিশেষ গুরুত্ব ছিল। একই ধরনের শিল্প বা ব্যবসা শহরে নির্দিষ্ট স্থানে গড়ে-ওঠার প্রবণতা ছিল। ***আব্দুর রজ্জাক*** লিখেছেন : এক এক ধরনের শিল্প বা ব্যবসার জন্য এক-একটি স্বতন্ত্র গিল্ড বা সংঘ গড়ে উঠত। গিল্ডের তত্ত্বাবধানে

এই ব্যবসা শহরের নির্দিষ্ট অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হত। *পায়েজের* বর্ণনাতেও ব্যবসায়ী সংঘ এবং কেন্দ্রীভূত বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে ওঠার কথা পাওয়া যায়।

বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে বিজয়নগরে মুদ্রার প্রচলন ছিল। সোনা ও তামার মুদ্রার প্রচলন ছিল বেশি। সামান্য পরিমাণ রৌপ্যমুদ্রাও প্রচলিত ছিল। মুদ্রাগুলির গায়ে নানা ধরনের কারুকার্য করা থাকত। মুদ্রাতে দেব-দেবীর মূর্তি ও পশু-পাখির ছবি খোদিত থাকত। সাধারণত উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীভুক্ত লোকেদের আর্থিক সচ্ছলতা ছিল এবং এঁরা বিলাসব্যসনে জীবন অতিবাহিত করতে অভ্যস্ত ছিলেন। তবে দেশের সাধারণ মানুষ ছিলেন গরীব। অবশ্য নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিস-সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে বা জীবনধারণের ন্যূনতম সংস্থানের অভাব কারো ক্ষেত্রে ছিল না। বিজয়নগরের আর্থিক ব্যবস্থার অন্যতম ত্রুটি হল এই যে, করভারের বোঝাটা মূলত নিম্নবিত্ত সাধারণ মানুষকেই বহন করতে হত। অবশ্য বিজয়নগরের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা বাহমনী রাজ্যের থেকে অনেক বেশি সুস্থ ও সমৃদ্ধ ছিল।

খ. সমাজজীবন ঃ বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ ও দেশীয় সূত্র থেকে বিজয়নগরের সমাজ-জীবনের বিস্তারিত চিত্র পাওয়া যায়। জাতিভেদ-প্রথা এবং আনুষঙ্গিক সামাজিক সম্পর্কের ধারা বিজয়নগরে বর্তমান ছিল। জাতিভেদ-প্রথার ভিত্তিতে গড়ে-ওঠা সমাজব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখাই রাজার অন্যতম কর্তব্য বলে বিবেচিত হত। প্রখ্যাত কবি ***পেড্ডান*** রচিত ***'মনচরিত্রম্'***-গ্রন্থে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের যথাক্রমে *বিপ্রুলু, রাজুলু, মোতিকিরাতল* এবং *নলভজতিভারু* বলে অভিহিত করা হয়েছে। সমাজে ব্রাহ্মণদের সর্বাধিক সম্মান ছিল। বিজয়নগরের রাজারা ব্রাহ্মণদের বিশেষ মর্যাদা দিতেন। ফলে সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে ব্রাহ্মণদের বিশেষ কর্তৃত্ব তো ছিলই ; ক্রমে রাজনীতিতেও তাদের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল। পর্যটক *নুনিজ* ব্রাহ্মণদের সৎ, দক্ষ, পরিশ্রমী, তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন এবং হিসাবশাস্ত্রে পারদর্শী বলে অভিহিত করেছেন। *পায়েজ* লিখেছেন ঃ *"ব্রাহ্মণ স্ত্রী-পুরুষেরা ফর্সা ও সুন্দরী ; অন্যান্য জাতির লোকদের মধ্যে ফর্সার সংখ্যা খুবই কম।"* সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান পালনের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের অনুমোদন জরুরী ছিল। *বারবোসা'র* বিবরণীতেও সমাজের বর্ণভেদের কথা স্বীকৃত হয়েছে। তিনি লিখেছেন ঃ *"গ্রামাঞ্চলে হিন্দুর সংখ্যাই বেশি, মুসলমান ছিল খুবই সংখ্যাল্প। হিন্দু-সমাজে ক্ষত্রিয়রা ছিলেন যোদ্ধা ও প্রশাসক গোষ্ঠীর অন্তর্গত। রাজা নিজেও এই শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। ব্রাহ্মণরা ধর্ম ও তৎসংক্রান্ত বিষয় তত্ত্বাবধান করতেন। জাতিভেদ-প্রথা থাকলেও বিভিন্ন জাতির মধ্যে মেলামেশার কঠোরতা ছিল না।"*

বিজয়নগরের সমাজে নারীর বিশেষ মর্যাদা ছিল। রাজনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রে নারীরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করতেন। মুষ্টিযুদ্ধ, অস্ত্রবিদ্যা, মল্লযুদ্ধ কাজেও নারীরা রপ্ত ছিলেন। সংগীত, নৃত্য, সাহিত্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীদের দক্ষতা ছিল প্রশংসনীয়। *গঙ্গাদেবী, তিরুমালাম্মা* ছিলেন সে যুগের প্রখ্যাত কবি। রাজমহিষীরাও সংগীতে পারদর্শিনী ছিলেন। ***পায়েজ*** লিখেছেন ঃ *"অন্তঃপুরে অনেক স্ত্রীলোক ছিল—যাদের হাতে ঢাল-তলোয়ার থাকত, যারা তুরী, বাঁশি বা অন্য বাদ্যযন্ত্র বাজাত। কুস্তি লড়ার জন্যেও মেয়েছেলে ছিল।"* ***নুনিজের*** বর্ণনা থেকেও এই বক্তব্য সমর্থিত হয়। তিনি লিখেছেন ঃ *"বিজয়নগরের রাজা নারী-মল্লযোদ্ধা, নারী-দ্বাররক্ষী, নারী-জ্যোতিষী ও নারী-হিসাবরক্ষক নিয়োগ করতেন।"* বিদেশীদের বিবরণ অনুযায়ী বিজয়নগরের নারীদের দুটি ভাগে ভাগ করা যায় ; যথা—গৃহস্থঘরের নারী ও ভ্রষ্টা নারী।

গৃহস্থঘরের নারীরা ছিলেন সুন্দরী এবং কদাচিৎ তাঁরা ঘরের বাইরে বেরোতেন। এই কারণে *পায়েজ* এদের 'অসামাজিক' বলে অভিহিত করেছেন। ভ্রষ্টা-নারীদের দু'ভাগে ভাগ করা যায়। ; যথা—(১) যারা রাজধানীতে হালকা অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে স্বাধীনভাবে জীবিকা সংগ্রহ করতেন এবং (২) দেবদাসী। দেবদাসীদের ভরণপোষণ চলত মন্দিরের আয় থেকে। পর্যটকরা দেবদাসীদের ভ্রষ্টচরিত্রা বলে উল্লেখ করেছেন। তবে সাধারণ দেহোপজীবিনীর সাথে দেবদাসীদের পার্থক্য নির্ণয় করা বিদেশী পর্যটকদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। সাধারণ দেহোপজীবিনীদের অবস্থা খুবই সচ্ছল ছিল। ***আবদুল রজ্জাক*** লিখেছেন ঃ *"এদের বাড়ির জাঁকজমক, এঁদের সৌন্দর্য ও কটাক্ষ বর্ণনার অতীত। তাদের দেহ দামী পোশাক ও মণিমুক্তায় সুশোভিত থাকে।"*

সমাজে বাল্যবিবাহ, পুরুষদের বহুবিবাহ এবং সতীদাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল। সতীদাহ পুণ্যকাজ বলে বিবেচিত হত। সচ্ছলশ্রেণীর লোকের বিবাহে পণপ্রথার ব্যাপকতা ছিল। বিদেশী পর্যটকরা রাজাদের অসংখ্য পত্নী দেখে বিস্মিত হয়েছেন। ***নিকোলো কন্টি*** লিখেছেন ঃ *"দেব রায়ের বারো হাজার পত্নী ছিলেন"*। ***নুনিজ*** লিখেছেন। *"রাজা অচ্যুত রায়ের পত্নীর সংখ্যা ছিল পাঁচশত"* তবে *পায়েজের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, "রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের আইনসম্মত বারোজন রাণী ছিলেন, তার মধ্যে মাত্র তিনজন রানীর সন্তান সিংহাসনের দাবিদার হতে পারত।"* যাই হোক, এই পরিসংখ্যান কিছুটা অতিরঞ্জিত হলেও একথা অনস্বীকার্য যে, মুঘল হারেমের তুলনায় বিজয়নগরের রাজাদের অন্তঃপুর ছিল অনেক বড়।

খাদ্যাভ্যাসের দিক থেকে বিজয়নগরের অধিকাংশ মানুষ ছিলেন মাংসভোজী। কেবল ব্রাহ্মণরা নিরামিষভোজী ছিলেন। রাজাও মাংস ভক্ষণ করতেন। গোরু বা বলদের মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। ***নুনিজ*** লিখেছেন ঃ *"বাজারে অবাধে পশু-পাখির মাংস কেটে বিক্রি করা হত।"* তবে বিজয়নগরের রাজা ও অব্রাহ্মণদের খাদ্যতালিকা দেখে ***ড. ভি. স্মিথ*** কিছুটা বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। হিন্দুত্ববাদের রক্ষক এবং বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী শাসক ও সাধারণ মানুষের এত বেশি মাংসভোজী হওয়ার কথা এবং প্রাণীহত্যার ঘটনা তাঁর কাছে কিছুটা অবাস্তব মনে হয়েছে।

গ. সংস্কৃতির ধারা ঃ বিদেশী পর্যটকরা বিজয়নগরের উন্নত ও সুস্থ সাংস্কৃতিক জীবনের প্রশংসা করেছেন। সাহিত্য ও শিক্ষা-সংস্কৃতিতে বিজয়নগরের খ্যাতি ছিল সর্বজনবিদিত। রাজা কৃষ্ণদেব রায় ছিলেন পণ্ডিত ও সাহিত্যের একান্ত অনুরাগী। অন্যান্য রাজারাও সাহিত্য-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রাজাদের উদ্যোগে ভাষা-সাহিত্যের অভাবনীয় উন্নতি ঘটে। এযুগে সংস্কৃত, তেলেগু, তামিল ও কানাড়ী ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। সংস্কৃত ভাষার প্রভাবমুক্ত তামিল ভাষা-সাহিত্যের বিকাশ এ যুগের প্রধানতম অবদান। সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ও বেদের ভাষ্যকার সায়নাচার্য এবং তাঁর ভাই মাধব বিদ্যারণ্য বিজয়নগরের উত্থানের সাথে যুক্ত থেকে এই রাজ্যকে একটি সাংস্কৃতিক ভিত্তি দেন। কৃষ্ণদেব রায়ের আমলে সাহিত্যকীর্তি গৌরবের শীর্ষে আরোহণ করে। সমকালীন বহু পণ্ডিত, সাহিত্যিক, দার্শনিক, জ্যোতির্বিদ, নাট্যকার তাঁর রাজসভা অলংকৃত করেন। এঁরা ***'অষ্টাদিগ্‌গজ'*** নামে খ্যাত ছিলেন। কৃষ্ণদেব স্বয়ং বহু সাহিত্য রচনা করেছেন।* রাজপরিবারের সদস্য, কর্মচারী প্রমুখও বিজয়নগরের সাংস্কৃতিক ধারার বিকাশে

বিশেষভাবে সচেষ্ট ছিলেন। এদের আগ্রহে দর্শন, তর্কবিদ্যা, ব্যাকরণ, সংগীত, নৃত্যকলা, নাটক ও জ্ঞানবিজ্ঞানের অন্যান্য নানা বিষয়ে এযুগে বহু সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল।

শিল্প-স্থাপত্যের দিকটিও বিজয়নগর রাজ্যে অবহেলিত ছিল না। শিল্প-স্থাপত্যের প্রতি বিজয়নগরের রাজাদের সহজাত আকর্ষণ ছিল। রাজা কৃষ্ণদেব রায় ছিলেন এক মহান নির্মাতা। ***নীলকণ্ঠ শাস্ত্রীর মতে,*** বিজয়নগর রাজ্যে দক্ষিণ ভারতীয় শিল্প-স্থাপত্য স্বাধীন, স্বতন্ত্র ও চূড়ান্ত রূপে প্রকাশ পায়। বিজয়নগরের শাসকদের প্রধান লক্ষ্য ছিল মুসলমানদের আক্রমণের পরে অবশিষ্ট যে হিন্দু শিল্প-স্থাপত্য টিকে আছে তাকে রক্ষা করা এবং ব্যাপক সংস্কারের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত সৌধ, মন্দির ইত্যাদিকে স্বমহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। পুরানো মন্দিরগুলিকে সংযোজিত হলঘর, মণ্ডপ ইত্যাদি দ্বারা অধিকতর প্রশস্ত ও সুন্দর করে তোলার প্রয়াস নেওয়া হয়। মন্দিরের বাম দিকে গড়ে তোলা হয় *'কল্যাণমণ্ডপ'*। অসংখ্য থামবিশিষ্ট ছাদের নিচে ঠিক মাঝখানে রাখা হয় একটি মঞ্চ। এখানে রাজকীয় উৎসব-অনুষ্ঠানে দেবতার প্রতিষ্ঠা ও আরাধনা করা হত। থাম বা স্তম্ভগুলির বিচিত্র ও জটিল অলংকরণ ছিল বিজয়নগর শিল্পরীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিশালাকার এক একটি পাথর খণ্ডের উপর অসংখ্য ভাস্কর্য কর্ম দ্বারা স্তম্ভগুলিকে অলংকৃত করা হত। তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণতীরের প্রায় সর্বত্র বিজয়নগর শিল্পরীতির নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। তবে সর্বাধিক সুন্দর ও বিচিত্র শিল্পগুণে সমৃদ্ধ ছিল বিজয়নগর শহরটি। বিজয়নগরের দুটি দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্য সৃষ্টি হল *'হাজার-রাম'* মন্দির ও *'বিঠলস্বামী'* মন্দির। কৃষ্ণদেব রায়ের আমলে হাজারা মন্দিরটিকে বিশেষজ্ঞরা *"হিন্দুস্থাপত্য-শৈলীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন"* বলে উল্লেখ করেছেন। বিজয়নগরের স্থাপত্যকর্মের আর একটি অমর দৃষ্টান্ত হল *বিঠলস্বামী মন্দির*। পর্যটকেরা বিজয়নগর শহর ও রাজপ্রাসাদের নির্মাণ-শৈলীর প্রশংসা করেছেন। *রাজপ্রাসাদটি* ছিল অতি-সুরক্ষিত দুর্গবিশেষ। ***আব্দুর রজ্জাক*** লিখেছেন : *"সারা পৃথিবীতে বিজয়নগরের মত শহর চোখে দেখিনি, কানেও শুনিনি। সাতটি প্রাচীর দিয়ে নগরটি তৈরি হয়েছে প্রত্যেকটি প্রাচীর দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত। নগরের মধ্যস্থলে আছে সপ্তম দুর্গটি, এই দুর্গটি হিরাট শহরের প্রধান বাজারটির দশগুণেরও বেশি জমি অধিকার করে আছে।"* ***পায়েজের*** মতে, *"বিজয়নগর রাজপ্রাসাদটি লিসবনের দুর্গের থেকেও বড়।"* বিজয়নগরের স্থাপত্যকর্মে ইন্দো-সারাসেনীয় (বা ইন্দোপারসিক) স্থাপত্য-রীতির প্রভাব স্পষ্ট। মন্দিরগুলির ক্ষেত্রে পল্লব বা জৈনরীতির প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। বিজয়নগর রাজ্যটি ইসলামের বিরুদ্ধে হিন্দুধর্মের রক্ষক হিসেবে গড়ে উঠলেও, ধর্মীয় অনুদারতা এই রাজ্যকে গ্রাস করেনি। নাগরিকদের ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতা ছিল, সামরিক-বাহিনীতে বহু মুসলমান সদস্য ছিল। নাগরিকদের মধ্যে যেমন মুসলমানরা ছিল তেমনি শিল্পের ক্ষেত্রেও ইসলামীয় রীতির চর্চা অব্যাহত ছিল। শিল্প, সাহিত্য, স্থাপত্য, ধর্ম—প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিজয়নগর রাজ্য এক সমন্বয়ী ও নিরপেক্ষ ও আদর্শবোধ দ্বারা উদ্বুদ্ধ ছিল। বিজয়নগরের উন্নত সংস্কৃতিমনস্কতার প্রেক্ষিতে জনৈক ঐতিহাসিক লিখেছেন : *"the empire brought about a synthesis of South Indian culture."*

○ বাহমনী রাজ্য—উত্থান ও পতন :

দিল্লীর সুলতানি-সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের কালে গড়ে-ওঠা রাজ্যগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল

বাহমনী রাজ্য। দক্ষিণ-ভারতের এই মুসলমান-শাসিত রাজ্যটি ছিল দক্ষিণের আর একটি সমসাময়িক হিন্দুরাজ্য বিজয়নগরের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের রাজত্বকালে দক্ষিণ-ভারতে সুলতানিতে নানা গোলযোগ দেখা দিয়েছিল। এজন্য বিশেষভাবে দায়ী ছিলেন 'সাদাহ' আমীরগণ। একশোটি করে গ্রামের দায়িত্বপ্রাপ্ত আমীরদের *'সাদাহ'* বলা হত। উচ্চশ্রেণীভুক্ত ও প্রতিপত্তিশালী সাদাহ-আমীরদের বিশেষ কর্তৃত্ব ছিল দক্ষিণ-ভারতের প্রশাসন ও সাধারণ মানুষের উপর। সুলতান মহম্মদ-বিন্-তুঘলক সাদাহ-আমীরদের ক্ষমতা খর্ব করার পরিকল্পনা করলে এরা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন এবং বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। নানা সমস্যায় বিব্রত সুলতান এদের দমন করার উদ্দেশ্যে স্বয়ং দৌলতাবাদে উপস্থিত হলেও, কাজ অসমাপ্ত রেখে গুজরাটে ছুটে যেতে বাধ্য হন। বিদ্রোহীরা দৌলতাবাদ দখল করে *ইসমাইল মুখ* নামক জনৈক আমীরকে 'স্বাধীন সুলতান' বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু ইসমাইল স্বেচ্ছায় *আলাউদ্দিন হাসান* নামক আর এক আমীরের পক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করেন। এই আফগান প্রথম জীবনে গঙ্গু নামক জনৈক ব্রাহ্মণের অধীনে কাজ করতেন। তাই তিনি *হাসান গঙ্গু* নামে বেশি পরিচিত ছিলেন। যাই হোক্, তিনি *'আলাউদ্দিন হাসান বাহমন শাহ'* উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন (১৩৪৭ খ্রীঃ)। হাসান নিজেকে ইরানের পৌরাণিক বীর বাহমনের বংশধর বলে দাবি করতেন, সম্ভবত এই কারণে তাঁর রাজ্য ***"বাহমনী রাজ্য"*** নামে পরিচিত হয়।

বাহমন শাহ নিঃসন্দেহে একজন দক্ষ শাসক ছিলেন। সুযোদ্ধা ও প্রশাসক হিসেবে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি পান। তিনি নবগঠিত রাজ্যের সীমানা উত্তরে ওয়াইনগঙ্গা নদী থেকে দক্ষিণে কৃষ্ণ নদী পর্যন্ত এবং পূর্বে ভেঙ্গীর পশ্চিমে দৌলতাবাদ পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেছিলেন। প্রশাসনের সুবিধার্থে তিনি *গুলবর্গায়* রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। সারা রাজ্যকে চারটি তরফ বা প্রদেশে বিভক্ত করা হয়। এগুলি হল *গুলবর্গা, দৌলতাবাদ, বেরার* এবং *বিদর*। প্রতি অংশের দায়িত্ব একজন গভর্নরের হাতে ন্যস্ত ছিল। প্রাদেশিক শাসকেরা সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসন চালনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করতেন। *'বুরহান-ই-মাসির'* গ্রন্থে বাহমান শাহকে একজন ন্যায়পরায়ণ ও প্রজাদরদী শাসক বলে অভিহিত করা হয়েছে। সমকালীন লেখক **ইসামীও** তাঁর প্রশংসা করে লিখেছেন : *"একজন সফল শাসকের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তিনটি গুণই বাহমন শাহের মধ্যে ছিল ; তিনি সর্বদাই অত্যাচারিতের পাশে থাকতেন, দীন-দরিদ্রের প্রতি ছিল তাঁর গভীর দয়া এবং ধর্মের স্থির থাকার জন্য তিনি চূড়ান্ত কষ্ট স্বীকারেও রাজী ছিলেন।" বাহমান শাহ-র* মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রথম মহম্মদ শাহ (১৩৫-'৭৩ খ্রীঃ)। ইনিও সুযোদ্ধা ও সুদক্ষ শাসক ছিলেন। মহম্মদ শাহ বাহমনী রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু রাজ্যদ্বয় যথাক্রমে বরঙ্গল ও বিজয়নগরের বিরুদ্ধে দীর্ঘসংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। তিনি কঠোর হাতে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহও দমন করেন। যোদ্ধা ও সাহিত্য সংস্কৃতির প্রতি তাঁর আগ্রহের প্রশংসা করে অধ্যাপক *শেরওয়ানী (H. K. Sherwani) লিখেছেন : "Mahammad Shah (1) was one of the greatest rulers of the Bahamani Dynasty. By his campaign in the East and the South, he demonstrated to his neighbours the power of the new Sultanate. He sought the company of the learned and made the Deccan the centre of the learned."* পরবর্তী শাসক আলাউদ্দিন মুজাহিদ (১৩৭৩ -'৭৭ খ্রীঃ) ছিলেন

ব্যর্থ শাসক। তিনি বিজয়নগর রাজ্যের দু'টি যুদ্ধেই পরাজিত হন। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তিনি পারসিক ও তুর্কী মুসলমানদের অধিক গুরুত্ব ও মর্যাদা প্রদান করে মহা ভুল করেন। এর ফলে ভারতীয় মুসলমানদের সাথে বহিরাগত মুসলমানদের দ্বন্দ্বের সূচনা হয়— যা পরিণামে রাজ্যের প্রচণ্ড ক্ষতি করে। জনৈক আত্মীয় দাউদের হাতে মুজাহিদ নিহত হলে সাময়িক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। অবশেষে *দ্বিতীয় মহম্মদ শাহ* (১৩৭৮-'৯৭ খ্রীঃ) সিংহাসনে বসেন। তবে ইনি ছিলেন একান্তভাবে যুদ্ধবিরোধী ও শান্তিপ্রিয় মানুষ। তাই কোন যুদ্ধ তিনি করেননি। তবে সাধারণ মানুষের সুখসুবিধা বৃদ্ধি ও শিক্ষা-সাহিত্যের প্রসারে তাঁর উদ্যোগের অভাব ছিল না। অতঃপর তাঁর দুই পুত্র যথাক্রমে *গিয়াসউদ্দিন* ও *সামসুদ্দিন* কয়েক মাসের জন্য সিংহাসনে বসেন। ১৩৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বাহমন শাহ-র জনৈক পৌত্র *ফিরোজ* সিংহাসন দখল করেন এবং *'তাজউদ্দিন ফিরোজ শাহ'* উপাধি নিয়ে শাসন শুরু করেন।

বাহমনী রাজ্যের অন্যতম কৃতী সুলতান ছিলেন *ফিরোজ শাহ বাহমন* (১৩৯৭-১৪২২ খ্রীঃ)। খেরলার গণ্ডরাজা নরসিংহ রায়কে পরাজিত করে তিনি বেরারের দিকে রাজ্যবিস্তার করেন। এখান থেকে তিনি প্রচুর সোনা-রূপা ও হাতি উপঢৌকন হিসেবে লাভ করেন। বিজয়নগররাজ প্রথম দেব রায়কে পরাজিত করে তিনি রাজ্যের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। অবশ্য ১৪১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম দেব রায়ের কাছে তিনি পরাজিত হন। এই পরাজয়ের ফলে ফিরোজের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব হ্রাস পায়। তাঁর বয়োবৃদ্ধি ও মতিভ্রমের সুযোগে তাঁর দুইজন প্রিয় ক্রীতদাস ক্ষমতা কুক্ষিগত করে নেয়। সুলতানের ভ্রাতা আহম্মদের বিরুদ্ধে এরা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এই সূত্রে শুরু হয় গৃহযুদ্ধের। এই গৃহযুদ্ধে দাক্ষিণাত্যের জনপ্রিয় সুফীসন্ত *গেসুদরাজ* আহম্মদকে সমর্থন করেন। শেষ পর্যন্ত ফিরোজ ভায়ের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এর কয়েকদিন মধ্যেই তিনি মারা যান।

ফিরোজ শাহের রাজত্বকালের অন্যতম গুরুত্ব এই যে, তিনি বাহমনী রাজ্যকে ভারতের সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্রে পরিণত করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ধর্মশাস্ত্র ও প্রকৃতিবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। কবিতা-রচনায় তিনি ছিলেন পারদর্শী। *ফেরিস্তার* মতে, ফিরোজ কেবল ফার্সী, আরবী বা তুর্কী ভাষাতেই নয়, তেলেগু, কানাড়ী, মারাঠী প্রভৃতি দক্ষিণ-ভারতীয় ভাষাতেও পারদর্শী ছিলেন। তাঁর রাজসভায় দেশী-বিদেশী গুণীর সমাবেশ ঘটেছিল। দিল্লী-সুলতানির অস্থিরতার ফলে সেখান থেকে বহু পণ্ডিত দক্ষিণ-ভারতের ফিরোজের সভায় আশ্রয় পান। ফিরোজ মনে করতেন যে, রাজার কাছে নানা দেশের জ্ঞানীগুণী ব্যক্তির সমাবেশ হওয়া উচিত ; কেননা তাঁর কাছ থেকে দেশবিদেশের খবর সংগ্রহ করে রাজা নিজের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে পারবেন। গভীর রাত পর্যন্ত তিনি কবি, দার্শনিক ধর্মবিদ্‌দের সঙ্গে আলোচনা করতেন। খ্রীষ্টান ধর্মগ্রন্থ 'বাইবেল' সম্পর্কেও তাঁর জ্ঞান ছিল যথেষ্ট। বাইবেলের *ওল্ড টেস্টামেন্ট* ও *নিউ টেস্টামেন্ট* তিনি আগ্রহের সাথে আদ্যোপান্ত পাঠ করেন। জ্যোতির্বিদ্যা চর্চার জন্য ফিরোজ দৌলতাবাদে একটি মানমন্দির নির্মাণের ব্যবস্থা করেছিলেন। ফিরোজ শাহের আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হল শাসনকার্যে হিন্দুদের নিয়োগ। শোনা যায়, তিনি রাজস্ববিভাগে বহু দক্ষিণী ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর উদ্যোগে *চাউল* ও *দাভোল* বন্দর দুটির সংস্কার করা হয়। ফলে পারস্য উপসাগর ও লোহিত সাগরের পথে ভারতের সাথে বহির্বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয়।

'বুরহান-ই-মাসির' গ্রন্থে ফিরোজ শাহকে একজন ন্যায়পরায়ণ ও অতুলনীয় শাসক বলে প্রশংসা করা হয়েছে। তবে *ফেরিস্তার* মতে, নানা মানবিক গুণের অধিকারী ফিরোজের চরিত্রের সীমাবদ্ধতাও ছিল। তিনি ছিলেন ঘোর মদ্যপ, তাঁর হারেমটি ছিল খুবই বৃহৎ, সেখানে নানা জাতির নারী থাকতেন, সঙ্গীতের প্রতিও তাঁর গভীর আসক্তি ছিল। এই সকল দুর্বলতা তাঁর পতনের অন্যতম কারণ ছিল।

আহম্মদ শাহ (১৪২২-'৩৫ খ্রীঃ) বাহমনী রাজ্যের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেন। বিজয়নগর রাজ্যকে পরাজিত করে তিনি বহু অর্থ সংগ্রহ করেন এবং পূর্ব-পরাজয়ের গ্লানি দূর করেন। বিজয়নগরের মিত্রদেশ বরঙ্গলের রাজাকে পরাস্ত করে বহু ভূখণ্ড তিনি দখল করেন। বরঙ্গলের অধিকাংশ অঞ্চল দখল করার ফলে বাহমনী রাজ্য প্রভূত শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং দক্ষিণ-ভারতের শক্তিসাম্য বিঘ্নিত হয়। মালব ও কোঙ্কনের শাসকদেরও তিনি পরাস্ত করেন। নিরাপত্তার কারণে তিনি গুলবর্গা থেকে বিদরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন (১৪২৫ খ্রীঃ)। আহম্মদ শাহ ধর্মান্ধ ছিলেন, তবে বিদ্বান ব্যক্তির প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল।

আহম্মদ শাহ-র রাজত্বকালে তাঁর দরবারে অভিজাতদের মধ্যে পরস্পরবিরোধী দুটি দলের সৃষ্টি হয়েছিল। একদিকে ছিল সুন্নিপন্থী স্থানীয় মুসলমানগণ, অন্যদিকে ছিল তুর্কী, পারসিক, আরবীয় প্রভৃতি বহিরাগত মুসলমানগণ। এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফলে বাহমনী শাসন দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

আহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় আলাউদ্দিন শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৪৩৫-'৫৭ খ্রীঃ)। সিংহাসনে বসেই তিনি খান্দেশ ও কোঙ্কনের বিদ্রোহ দমন করেন। তাঁর সময়ে বিজয়নগরের রাজা দ্বিতীয় দেব রায় রায়চুর-দোয়াব আক্রমণ করেন। কিন্তু দেব রায় পরাজিত হন এবং করদানে প্রতিশ্রুত হন। তিনি বেশকিছু প্রজাকল্যাণমূলক কাজ করেন। শিক্ষা ও শিক্ষিতের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাবোধ ছিল।

পরবর্তী শাসক হুমায়ুন শাহ (১৪৫৭-'৬১ খ্রীঃ) ছিলেন অকর্মণ্য ও অত্যাচারী। এজন্য জনগণ তাঁকে 'জালিম' (oppressor) নামে অভিহিত করেন। হুমায়ুনের মৃত্যুর পর তাঁর নাবালক পুত্র *নিজাম শাহ* সিংহাসনে বসেন (১৪৬১-'৬৩ খ্রীঃ)। তাঁর নাবালকত্বের সুযোগে উড়িষ্যা ও তেলেঙ্গানার রাজারা বাহমনী রাজ্য আক্রমণ করেন। তিনি অকালে মারা গেলে সিংহাসনে বসেন তাঁর ভ্রাতা *তৃতীয় মহম্মদ শাহ*। তিনিও ছিলেন বিলাসপ্রিয়, নৈতিক চরিত্রহীন ও অযোগ্য শাসক ; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সেই সময়ে মামুদ গাওয়ান নামক জনৈক দক্ষ ও দেশপ্রেমিক মন্ত্রীর উত্থান ঘটে।

○ মামুদ গাওয়ান-এর অবদান ঃ

মামুদ গাওয়ান-এর প্রধানমন্ত্রিত্বে বাহমনী সাম্রাজ্য বিস্তৃতি ও শক্তির চরম শিখরে উপনীত হয়েছিল। *অধ্যাপক সেরওয়ানীর* ভাষায় ঃ *"The premiership of Khawaja-i-Jahan Mahmud Gawan saw the Bahamani state attain a height unequalled in the whole of its history."* প্রথম জীবনে ব্যবসায়ী গাওয়ান তাঁর প্রতিভাদীপ্ত কর্মধারার দ্বারা বাহমনী রাজ্যকে ভৌমিক অখণ্ডতা ও নিরাপত্তা, রাজনৈতিক স্থিরতা এবং সাংস্কৃতিক উজ্জ্বলতা

দ্বারা মহিমময় করে তুলেছিলেন। নাবালক সুলতান নিজাম শাহের কাজ তত্ত্বাবধান করার জন্য তিন সদস্যের যে প্রতিনিধিসভা গঠিত হয়, তার অন্যতম সদস্য ছিলেন *মামুদ গাওয়ান*। অপর প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন রাজমাতা *নার্গিসবেগম*। নাবালক রাজার মৃত্যু পর্যন্ত, প্রায় দু'বছর এই চতুর ও বিচক্ষণ মহিলা দক্ষিণ-ভারতীয় রাজনীতিতে কর্তৃত্ব করেন। এই সময়ে রাজনীতিতে মামুদ গাওয়ান-এর গুরুত্বও উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। ১৪৬৪ খ্রীষ্টাব্দে খাজা-ই-জাহান তুর্ক-এর মৃত্যু এবং রাজনীতির অঙ্গন থেকে নার্গিসবেগম-এর অবসর গ্রহণের ফলে মামুদ গাওয়ান ক্ষমতাবৃদ্ধির অপূর্ব সুযোগ পেয়ে যান। নবনিযুক্ত সুলতান তৃতীয় মহম্মদ মামুদ গাওয়ানকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করে *'খাজা-ই-জাহান'* উপাধিতে ভূষিত করেন। এই সময় থেকে আমৃত্যু, প্রায় উনিশ বছর, মামুদ গাওয়ান প্রধানমন্ত্রী-পদে অধিষ্ঠিত থেকে প্রকৃত অর্থেই দেশকে সঠিক নেতৃত্ব দান করেছিলেন (১৪৬৪-'৮৩ খ্রীঃ)।

মামুদ গাওয়ান অত্যন্ত দায়িত্ববোধ ও সেবার মানসিকতা দ্বারা দপ্তরের কাজ সম্পাদন করেন। প্রকৃত বীরের মতই নিঃশঙ্কচিত্তে তিনি স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করেন এবং সাফল্যের সাথে রাজ্যের ভৌমিক সম্প্রসারণ ঘটান। তিনি কোঙ্কনের রাজাকে পরাজিত করেন এবং সঙ্গমেশ্বরের পরাজিত রাজাকে খালনা দুর্গ হস্তান্তর করতে বাধ্য করেন। সুলতান প্রথম আহম্মদ শাহের আমল থেকেই খলজী-শাসিত মালবরাজ্য সংগ্রামে লিপ্ত ছিল। পূর্ব-স্বাক্ষরিত এক চুক্তি দ্বাবা ঠিক হয়েছিল যে, বেরার বাহমনী সুলতানের অধীনে থাকবে। এখন মালব বেরার পুনর্দখলের চেষ্টা করলে মামুদ গাওয়ান তা প্রতিরোধ করেন। এজন্য তিনি মালবের বিরুদ্ধে একাধিক যুদ্ধে লিপ্ত হন। গুজরাটের শাসকের সহায়তায় মামুদ গাওয়ান মালবের বিরুদ্ধে সফল হন। পশ্চিম উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলিতে মামুদ-গাওয়ান-এর সামরিক অভিযান ও সাফল্য ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দাভোল, গোয়া, রাজমুন্দ্রী, কোন্দাভির-সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চল তিনি দখল করতে সমর্থ হন। এই সকল বন্দর জয় করার ফলে ইরাক, ইরান প্রভৃতি দেশের সাথে বাহমনী রাজ্যের বহির্বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। পরন্তু এই সকল স্থান হস্তচ্যুত হবার ফলে চিরশত্রু বিজয়নগর বড় আঘাত পায়। বিজয়নগরের বিরুদ্ধেও তাঁর সাফল্য কম গৌরবোজ্জ্বল ছিল না। বিজয়নগরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে কাঞ্চী পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে মামুদ গাওয়ান নিজ সামরিক শক্তির প্রমাণ দেন। কাঞ্চী বা কাঞ্চীভরম শহরটি মুসলমান সৈন্যদের হাতে সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয়। এখান থেকে লুণ্ঠিত বিশাল ধনসম্পদে স্ফীত হয় বাহমনী রাজ্য। উড়িষ্যার বিরুদ্ধেও গাওয়ান অভিযানে নেতৃত্ব দেন এবং সেখান থেকে প্রচুর অর্থ ও হাতি উপঢৌকন হিসেবে সংগ্রহ করেন। এইভাবে বঙ্গোপসাগরের তীর থেকে আরবসাগরের তীরভূমি পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয় বাহমনী রাজ্যের শাসন। সমুদ্র থেকে সমুদ্র পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকা মামুদ গাওয়ান-এর সাফল্যের দ্যুতি।

রাজ্যের অভ্যন্তরীণ সংস্কারের মাধ্যমে দৃঢ় প্রশাসনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজেও গাওয়ান কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। কালক্রমে রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধি পেলেও প্রশাসনিক সংস্কার করা হয়নি, একথা গাওয়ান উপলব্ধি করেন। প্রাদেশিক গভর্নরদের শক্তি ও ক্ষমতাবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তিনি একাধিক ব্যবস্থা নেন। ইতিপূর্বে রাজ্য চারটি তরফে বিভক্ত ছিল। গাওয়ান তরফ বা প্রদেশের সংখ্যা বাড়িয়ে আটটি করেন। প্রতিটি প্রদেশের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট অংশকে সরাসরি সুলতানের শাসনাধীনে রাখেন। প্রদেশগুলির মধ্যে স্থাপিত দুর্গগুলির মধ্যে একটি ছাড়া

সবগুলির কিল্লাদারদের কাজের জন্য সরাসরি কেন্দ্রের কাছে দায়বদ্ধ রাখা হয়। এমনকি জায়গিরদাররাও তাঁদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বপালনের ব্যাপারে সুলতানের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকেন। ভূমি-সংস্কারের ক্ষেত্রে গাওয়ান যথেষ্ট বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। গাওয়ান রাজ্যের সমস্ত জমি জরিপ করে ভোগদখলকারীর তালিকা প্রস্তুত করেন। এজন্য গাওয়ানকে 'মুঘলযুগের প্রখ্যাত সংস্কারক টোডরমলের পূর্বসূরী ও পথপ্রদর্শক' বলা চলে। ইতিমধ্যে দক্ষিণী মুসলমান ও বিদেশী মুসলমান (আফাকি বা খরাবি) অভিজাতদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই যে তীব্র হয়ে উঠেছিল, তা-ও দূরদর্শী মামুদ গাওয়ান-এর দৃষ্টি এড়ায়নি। এই বিরোধ প্রশমিত করে ক্ষমতার ভারসাম্য সৃষ্টির জন্য তিনি উভয়পক্ষের সমানসংখ্যক আমীরকে বিভিন্ন প্রদেশের শাসনপদে নিযুক্ত করেন। নিজে একজন আফাকি হয়েও দক্ষিণী মুসলমানদের সম্মান ও ক্ষমতা দিয়ে গাওয়ান উদারতার পরিচয় দেন।

শিক্ষা-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক রূপেও গাওয়ান কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। শিক্ষাপ্রসারের উদ্দেশ্যে রাজধানী বিদরে তিনি একটি সুবিশাল মাদ্রাসা নির্মাণ করেন। এখানে প্রায় এক হাজার ছাত্র ও শিক্ষক পঠন-পাঠন করতেন। নিপুণ স্থাপত্যকর্ম হিসেবেও এই মাদ্রাসাটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দেশবিদেশের বহু পণ্ডিত এখানে শিক্ষাদানের কাজে নিয়োজিত থাকতেন। রুশ-পর্যটক *আথানাসিয়াস নিকিতন* তৃতীয় মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে দীর্ঘদিন (১৪৭০-'৭৮ খ্রীঃ) বিদরে অবস্থান করেছিলেন। তিনি এই শহর ও জনগণের নানা দিক সম্পর্কে মনোজ্ঞ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। *নিকিতন* লিখেছেন যে, *"বিদর শহরটি ছিল খুবই বিশাল, সুপরিকল্পিত, সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসজ্জিত। সুলতান ও অভিজাতগণ অত্যন্ত বিলাসব্যসন ও জাঁকজমকের মধ্যে দিনাতিপাত করতেন। তবে সাধারণ মানুষের সাথে অভিজাতদের বৈষম্য ছিল লক্ষণীয়।"* তিনি লিখেছেন ঃ *"গ্রামের মানুষ খুবই জীর্ণ পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে। কিন্তু অভিজাতরা যেমন বিত্তবান তেমনি তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তিও রাজ্যের সর্বত্র।"*

দক্ষ প্রশাসক গাওয়ান-এর শেষ পরিণতি ছিল খুবই দুঃখজনক। তিনি শেষ পর্যন্ত গোষ্ঠী রাজনীতির বলি হন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাহমনী রাজ্যে স্থায়িভাবে বসবাসকারী বিদেশী বা দক্ষিণীদের সাথে নবাগত বিদেশী বা আফাকিদের বিরোধ ছিল তীব্র। গাওয়ান উভয়পক্ষকেই সন্তুষ্ট করে দেশের স্বার্থে উভয় গোষ্ঠীর সর্বোচ্চ সেবাগ্রহণের চেষ্টা করেছিলেন। তথাপি নবাগত বিদেশী হিসেবে তিনি দক্ষিণী মুসলমানদের আস্থা অর্জন করতে পারেননি। যুদ্ধের কারণে গাওয়ান অধিকাংশ সময় রাজধানীর বাইরে থাকতেন। এই সুযোগ নেন দক্ষিণীরা। গাওয়ান যখন পশ্চিমাঞ্চলের অভিযানে ব্যস্ত, সেই সময়ে বিরোধীরা তাঁর এক হাব্‌সী সহকারীকে হাত করেন। মত্ত অবস্থায় ঐ হাব্‌সী ভুলবশত গাওয়ান-এর সরকারি মোহর একটি সাদা কাগজে দিয়ে ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে তুলে দেন। বিরোধীরা এই কাগজে সুলতানের বিরুদ্ধে উড়িষ্যার শাসকের সাথে মামুদ গাওয়ান-এর এক ষড়যন্ত্রভিত্তিক জালপত্র রচনা করে সুলতানের কাছে পেশ করেন। এই জঘন্য ষড়যন্ত্রের সম্ভাবনা বোঝার ক্ষমতা সুলতান মহম্মদের ছিল না। একজন বিচক্ষণ ও নিবেদিতপ্রাণ সৈনিকের কর্মধারার সঠিক মূল্যায়ন না-করেই তিনি ষড়যন্ত্রদের কথায় বিশ্বাস করেন এবং মামুদ গাওয়ান-এর প্রাণদণ্ড দেন। ষড়যন্ত্রকারীর মিথ্যা অপবাদ মাথায় নিয়ে তিয়াত্তর বছরের নিবেদিতপ্রাণ এই দেশনায়ক বিনা প্রতিবাদে প্রাণ বিসর্জন দেন (১৪৮১ খ্রীঃ)।

○ অভিজাতদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ঃ দক্ষিণী বনাম পরদেশী ঃ বাহমনী রাজ্যের পতন ঃ

বাহমনী রাজ্যের রাজনীতিতে অভিজাতদের দ্বি-মেরুকরণ ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এই রাজ্যকে কালক্রমে সংকটাকীর্ণ করে তুলেছিল। বাহমনী রাজ্যের সূচনা থেকেই গোষ্ঠী-রাজনীতির উপাদান লক্ষ্য করা যায়। প্রতিষ্ঠাতা-শাসক বাহমন শাহ (হাসান) এই রাজ্যকে প্রথম চারটি তরফে বিভক্ত করে একজন করে তরফদারের অধীনে তা পরিচালনা করার যে রীতি প্রবর্তন করেছিলেন, পরবর্তীকালে সেখান থেকেই অভিজাতদের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয়। তরফদাররা মোটামুটিভাবে স্বাধীনতা ভোগ করতেন। কেন্দ্রে শক্তিশালী সুলতান কিংবা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও বিচক্ষণ প্রধানমন্ত্রীর অবস্থানকালে এই সকল তরফদার ক্ষমতার অপব্যবহার বা কেন্দ্রের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করার সাহস বা সুযোগ পাননি। কিন্তু সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এইসব ক্ষমতালোভী প্রাদেশিক শাসক স্থানীয়ভাবে প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী হন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার সুযোগে ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের উদ্দেশ্যে অভিজাতদের মধ্যে গোষ্ঠী-রাজনীতিকে পুষ্ট করেন।

পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বাহমনী রাজ্যের মুসলমান অভিজাতরা ক্রমশ দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়লে তরফদারদের বিচ্ছিন্নতাকামী প্রবণতা জোরদার হয়ে ওঠে। এই সময় মুসলমান অভিজাতরা—(১) দক্ষিণী মুসলমান ও (২) বিদেশী মুসলমান—এই দুদলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। বিদেশীরা 'পরদেশী' বা 'আফাকি' বা 'ঘরিব' বা 'খরাবি' নামেও অভিহিত হতেন। দক্ষিণী মুসলমান বলতে তাঁদের বোঝাত যাঁরা দীর্ঘকাল আগে বহির্ভারত থেকে এদেশে এসে বসবাস করছেন। দীর্ঘকাল এদেশে থাকার ফলে এঁদের রীতি-নীতি, আদব-কায়দা, কথাবার্তা এমনকি গাত্রবর্ণের ক্ষেত্রেও এদেশীয় প্রভাব ছিল স্পষ্ট। এই সকল বহিরাগত মুসলমান এদেশের মহিলাদের বিবাহ করে এদেশের মাটির সঙ্গে প্রায় একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। বাহমনী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাকালে হাসান বাহমন যাঁদের রাজকার্যে নিযুক্ত করেছিলেন, কালক্রমে তাঁরা সবাই দক্ষিণী-মুসলমান হিসেবে পরিচিত হন। এই গোষ্ঠীর মধ্যে ধর্মান্তরিত হিন্দুরাও ছিলেন। যেমন, বেরারের ফতাউল্লা ইমাদ শাহ এবং আহম্মদনগরের আহমদ নিজাম শাহ আদিতে ছিলেন ব্রাহ্মণসন্তান। দক্ষিণী গোষ্ঠী স্বাভাবিক কারণেই নিজেদের এই রাজ্যের বৈধ দাবিদার, ধারক ও বাহক বলে মনে করতেন। নতুনভাবে বিদেশী মুসলমানদের আগমন ও বাহমনী রাজ্যের উচ্চপদে নিযুক্তি দক্ষিণীদের কাছে আদৌ কাম্য ছিল না।

অন্যদিকে রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পরবর্তীকালে বহিরাগত মুসলমানরা *'পরদেশী'* (বিদেশী) বা 'আফাকি' নামে পরিচিত হন। এদের অনেকেই বণিক হিসেবে এদেশে আসেন এবং অষ্টাদশ শতকে ব্রিটিশ বণিকদের মতই, বণিকের মানদণ্ড ত্যাগ করে শাসকের রাজদণ্ড হাতে তুলে নেন। বাহমনী সুলতানরা বহিরাগত বিদেশীদের বেশি পছন্দ করতেন তাদের শৌর্য, বীর্য এবং দক্ষতার জন্য। ফলে পারস্য, তুরস্ক, আরব, আফগানিস্তান ও মধ্য-এশিয়ার ভাগ্যান্বেষী সৈনিকেরা দলে দলে ভারতে এসে বাহমনী রাজ্যে আশ্রয় নেন। বাহমনী সুলতানদের বদান্যতায় রাজ্য-প্রশাসনে পরদেশীদের সংখ্যা ও প্রভাব বাড়তে থাকে। সুলতান মুজাহিদ শাহ (১৩৭৫-'৭৮ খ্রীঃ) পারসিক ও তুর্কী মুসলমানদের প্রকাশ্য অগ্রাধিকার প্রদান করে দক্ষিণীদের ক্ষুব্ধ করে তোলেন।

দক্ষিণ-গোষ্ঠী 'পরদেশী'দের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকলেও, প্রথমদিকে তাঁরা এঁদের বিপজ্জনক বলে মনে করতেন না। কারণ দক্ষিণীদের তুলনায় 'পরদেশী'-দের সংখ্যা ছিল খুবই কম। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরদেশীদের সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধও বাড়তে থাকে। প্রথমদিকে সংখ্যাল্পতার কারণে পরদেশীরা অনেক ক্ষেত্রেই দক্ষিণীদের সাথে মিলেমিশে থাকতে আগ্রহী ছিলেন। উভয়পক্ষের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার ফলে সমন্বয়ের সম্ভাবনাও ছিল প্রবল। কিন্তু ক্রমে পরদেশীদের সংখ্যা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেলে তাঁরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও উচ্চমার্গ সম্পর্কে অধিক সচেতন হয়ে ওঠেন এবং দক্ষিণীদের প্রতি উন্নাসিক আচরণ শুরু করেন। ফলে দ্বি-মেরুকরণ চূড়ান্ত হয়।

ধর্মীয় কারণেও উভয়পক্ষের মধ্যে তীব্রতর বিরোধ ছিল। পরদেশীদের অধিকাংশই ছিলেন 'শিয়া'-সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান। অন্যদিকে দক্ষিণীদের অধিকাংশ ছিলেন 'সুন্নী'-মতবাদের সমর্থক। সুলতান আহম্মদ শাহ প্রকাশ্যে 'শিয়া'-মুসলমানদের সমর্থন করতেন এবং দরবারে উপস্থিত হবার জন্য তাদের আমন্ত্রণ জানান। এই ধর্মীয় কারণে সুন্নী-মতবাদের অন্তর্ভুক্ত আবিসিনীয়রা দক্ষিণীদের পক্ষ গ্রহণ করে। শিক্ষিত, সুদর্শন পারসিক বা তুর্কী মুসলমানদের কাছে অশিক্ষিত, কৃষ্ণবর্ণ হাবসীরা সর্বদাই অবহেলার পাত্র হিসেবে বিবেচিত হত। স্বভাবতই ধর্মকে সামনে রেখে এরা দক্ষিণীদের পক্ষ নেয়।

ক্ষমতার দৌড়ে টিকে থাকার জন্য দক্ষিণীরা সুযোগের সন্ধানে থাকে। আহমদ শাহ'র রাজত্বের শেষদিকে সেই সুযোগ উপস্থিত হয়। ১৪৩০-'৩১ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাটের বিরুদ্ধে বাহমনীদের তিনটি উপর্যুপরি আক্রমণ ব্যর্থ হয়। দক্ষিণীরা এই ব্যর্থতার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী খালাফ হাসানের (মালিক-উত্-তুজ্জার) অপদার্থতাকে দায়ী করে। ইনি ছিলেন 'পরদেশী' গোষ্ঠীর লোক। সুলতান দক্ষিণীদের কথা বিশ্বাস করেন এবং এদের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেন। দক্ষিণী অভিজাত মিঞা মইনউল্লাহ *'নিজাম-উল্-মুলক'* উপাধিসহ মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত হন। ক্ষমতায় ফিরে এসেই দক্ষিণীরা প্রতিপক্ষকে চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। ১৪৪৬ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণীদের হাতে বহু পরদেশী নিহত হন। অতঃপর কোঙ্কনের বিরুদ্ধে এক সংঘর্ষে বাহমনী-বাহিনীর ব্যর্থতার জন্য দক্ষিণীরা খালাফ হাসান ও পরদেশী মুসলমানদের বিশ্বাসঘাতকতাকে দায়ী করে সুলতানের (দ্বিতীয় আলাউদ্দিন) কান ভারী করেন। ক্রুদ্ধ সুলতান কোনরূপ অনুসন্ধান ছাড়াই, পরাজিত পরদেশীদের একাংশকে হত্যার নির্দেশ দেন। অবশ্য পরমুহূর্তেই সুলতান দক্ষিণীদের মিথ্যাচার বুঝতে পেরে তাদেরও শাস্তি দেন এবং ক্ষমতাচ্যুত করেন।

এইভাবে অভিজাতদের পরস্পরবিরোধী গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ বাড়তেই থাকে এবং সমঝোতার সম্ভাবনা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়। এখন একে অপরকে ধ্বংস করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠে। এই মানসিকতায় দুঃখজনক পরিণতি স্বরূপ সুলতান তৃতীয় মহম্মদ শাহ (লস্করী) বাহমনী রাজ্যের সম্ভবত সর্বাধিক শুভানুধ্যায়ী ও দক্ষতম সংগঠক মামুদ গাওয়ান-এর প্রাণদণ্ড দেন। *পি. এম. যোশী* এই প্রসঙ্গে লিখেছেন : *"The false accusation and violent death of this upright minister constitute one of the tragedies of medieval India."*

মামুদ গাওয়ান-এর হত্যাকাণ্ড বাহমনী রাজ্যের ভাঙন অবশ্যম্ভাবী করে দেয়। বিচ্ছিন্নতাবাদী

শক্তির মত্ততা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। জাতীয়তাবোধ-বর্জিত, ক্ষুদ্র স্বার্থান্বেষী অভিজাতদের মধ্যে সংঘাত নগ্নরূপ ধারণ করে। এমতাবস্থায় রাজ্যের সংহতি ও সমন্বয়সাধনের জন্যে প্রয়োজন ছিল মামুদ গাওয়ান-এর মত আর একজন প্রশাসকের। কিন্তু তেমন কেউ আর বাহমনী রাজ্যে ছিলেন না। তাই বাহমনী সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ে। ***অধ্যাপক শেরওয়ানী*** লিখেছেন ঃ *"Another Mahmud Gawan might have slammed the door to egotism, intrigue and disorder, but as no such statesman was forthcoming, the kingdom fell at the first rush of the wind like a house of cards."*

সত্যই তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়েছিল হাসান গঙ্গুর স্বপ্নরাজ্য। মামুদ গাওয়ানের প্রাণদণ্ডের এক বছরের মধ্যেই শোকদগ্ধ তৃতীয় মহম্মদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর নাবালক পুত্র মামুদ শাহ সিংহাসনে বসলে অভিজাতদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব সর্বব্যাপী হয়ে ওঠে। অযোগ্য মামুদ শাহ-র পক্ষে তার মোকাবিলা ছিল অসম্ভব। শেষ পর্যন্ত সুলতান রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা *কাশিম বারিদ* নামক জনৈক তুর্কী অভিজাতদের হাতে তুলে দেন। কিন্তু প্রাদেশিক গভর্নররা কাশিম বারিদ-এর কর্তৃত্ব মানতে অস্বীকার করেন। এবং একে একে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। মালিক আহ্মদ নিজাম-উল্-মুল্ক সর্বপ্রথম আহম্মদনগরে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন (১৪৯০ খ্রীঃ)। তাঁর পথে অগ্রসর হয়ে আদিল খাঁ বিজাপুরে এবং ইমাদ-উল্-মুল্ক বেরারে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। অবশ্য এই মুহূর্তে এরা কেউই 'সুলতান' উপাধি গ্রহণ করেননি। ভঙ্গুর অবস্থায় নামসর্বস্ব বাহমনী রাজ্য আরো কিছুকাল টিকেছিল। বাহমনী রাজ্যের শেষ শাসক কলিমউল্লাহ ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ মারা যান। ইতিমধ্যে আরো দুটি অঞ্চলে রাজ্য গড়ে ওঠে—গোলকুণ্ডায় কুতুবশাহী বংশ ও বিদারে বারিদশাহী বংশের শাসন শুরু হয়। এদের মধ্যে তিনটি রাজ্য—গোলকুণ্ডা, আহম্মদনগর ও বিজাপুর দাক্ষিণাত্যের রাজনীতিতে বেশ প্রতিপত্তিশালী হয়ে ওঠে। এই রাজ্য-পঞ্চকের রাজনৈতিক ইতিহাস পারস্পরিক বিরোধ ও সংঘর্ষের এক ক্লান্তিকর ঘটনামাত্র। শেষ পর্যন্ত এগুলি মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলে দাক্ষিণাত্যে স্বাধীন সুলতানির অবসান ঘটে।

○ সুলতানি আমলে বাংলাদেশ ঃ

মহম্মদ ঘুরীর বিশ্বস্ত অনুচর ইখ্তিয়ারউদ্দিন মহম্মদ-বিন্-বখতিয়ার খলজী আনুমানিক ১২০৩-০৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার রাজা লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করে বাংলাদেশের একাংশে মুসলমান শাসনের সূচনা করেন।* তবে দিল্লী-সুলতানির গৌরবোজ্জ্বল দিনেও বাংলাদেশ দিল্লী অধীনতামুক্ত থেকে নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছে। বাংলার শাসকেরা কখনো দিল্লীর দোর্দণ্ডপ্রতাপ সুলতানের প্রতি নিছক মৌখিক আনুগত্য মাত্র জানিয়ে ; কখনো বা সুলতানকে আপসমুখি মনোভাব গ্রহণে বাধ্য করে নিজেদের প্রায়-স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রেখেছেন। বিদ্রোহী বাংলার এই স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অন্যতম কারণ হল দিল্লী থেকে বাংলাদেশের দূরত্ব, জলবায়ুর পার্থক্য এবং যোগাযোগ-ব্যবস্থার অপ্রতুলতা। তখন দিল্লীর সাথে বাংলাদেশের যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম ছিল নদীপথ। কিন্তু এই জলপথ তুর্কীদের কাছে ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত। তাই দিল্লীর ক্ষমতাবান

সুলতানরাও বাংলাদেশের উপর সরাসরি খবরদারি করার ইচ্ছাকে চেপে রাখতে বাধ্য হয়েছেন। অবশ্য প্রথমদিকে দিল্লীর প্রতি মৌখিক আনুগত্য জানালেও শেষ পর্যন্ত, বাংলাদেশে স্বাধীন সুলতানির প্রতিষ্ঠাই ঘটেছিল।

বাংলাদেশে বখতিয়ার খলজীর শাসন মোটামুটি দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের বীরভূম জেলা ও উত্তর-পূর্ব বাংলার দিনাজপুর জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ১২০৩ থেকে ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বাংলায় শাসনসংগঠনে ব্রতী ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ তিনি তিব্বতদেশে এক দুঃসাহসিক অভিযানে অগ্রসর হন এবং ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেন। ইতিমধ্যে তাঁর অনুচরদের কেউ কেউ ক্ষমতালোভী হয়ে উঠেছিলেন। এবং এমনই এক অনুচর আলী মর্দান ঘুমন্ত অবস্থায় অসুস্থ বখতিয়ারকে হত্যা করেন (১২০৬ খ্রীঃ)। একই বছরে মহম্মদ ঘুরীরও মৃত্যু হয়। ফলে তুর্কী অধিকৃত ভারতবর্ষে উচ্চাকাঙ্ক্ষী আমীরদের মধ্যে ক্ষমতাদখলের লড়াই অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশেও এর প্রভাব পড়ে। বখ্‌তিয়ারের হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে তাঁর আর এক অনুচর ইজুদ্দিন মহম্মদ শিরান খলজী আলিমর্দানকে আক্রমণ ও বন্দী করেন। ইতিমধ্যে ঘুরীর অন্যতম অনুচর কুতুবউদ্দিন আইবক দিল্লীর সিংহাসন দখল করে স্বাধীন সুলতানির সূচনা করেছেন। শিরান দিল্লীর প্রতি মৌখিক আনুগত্য দেখান। কিন্তু বন্দী আলিমর্দান কারাগার থেকে পালিয়ে গিয়ে শিরানের বিরুদ্ধে কুতুবউদ্দিনকে প্ররোচিত করেন। শিরানকে বিতাড়িত করে কুতুব জনৈক আইওয়াজ খলজীকে দেবকোটের (বাংলা) শাসক নিযুক্ত করেন। কিছুদিন পরে আইওয়াজের পরিবর্তে আলিমর্দান বাংলার দায়িত্ব পান (১২১০ খ্রীঃ)। কুতুবউদ্দিনের জীবদ্দশায় আলিমর্দান দিল্লীর বশ্যতা মেনে চলেন। তবে কয়েক মাসের মধ্যে কুতুবউদ্দিন মারা গেলে আলিমর্দান দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করেন এবং 'আলাউদ্দিন' নাম নিয়ে স্বাধীন সুলতানি শুরু করেন। তিনি মাত্র দু'বছর বাংলা শাসন করেন। তিনি ছিলেন ন্যায়নীতিবর্জিত নিষ্ঠুর রাজনীতিক। তাঁর শাসনকাল ছিল স্বৈরাচারী, নির্মম ও আতঙ্কে পূর্ণ। অবশেষে খলজীর আমীররা সংঘবদ্ধ হয়ে আলিমর্দানকে হত্যা করেন। লক্ষ্মণাবতী বা লখ্‌নৌতির সিংহাসনে বসেন হুসামউদ্দিন আইওয়াজ খলজী (১২১৩ খ্রীঃ)। ইনি *'গিয়াসউদ্দিন আইওয়াজ'* নামে পরিচিত হন। গিয়াসউদ্দিন চৌদ্দবছর (১২১৩-'২৭ খ্রীঃ) বাংলা শাসন করেন। তাঁর আমলে দেবকোটের গুরুত্ব কমে যায় এবং লখ্‌নৌতি রাজধানীর গুরুত্ব অর্জন করে। বাংলার খলজী শাসকদের মধ্যে গিয়াসউদ্দিন ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর রাজত্বকাল ছিল বাংলার শান্তি ও সমৃদ্ধির কাল। মুসলমান শাসকদের মতে, তিনিই প্রথম নদীমাতৃক বাংলাদেশে রণতরীর উপযোগিতা বুঝতে পারেন ও একটি নৌবহর নির্মাণ করেন। নবপ্রতিষ্ঠিত রাজধানীর নিরাপত্তা ও নৌ-পরিবহণ বৃদ্ধির প্রয়োজনে তিনি একাধিক খাল খনন করেন, সেতু ও বাঁধ নির্মাণ করেন। শেষপর্যন্ত গিয়াসউদ্দিন নিজেকে 'স্বাধীন সুলতান' বলে ঘোষণা করেন এবং নিজনামে 'খুৎবা' পাঠ করেন ও 'মুদ্রা' প্রচলন করেন। আব্বাসিদ খলিফা আল্ নাসিরীর কাছ থেকে সম্মানসূচক অনুমোদনও লাভ করেন। দিল্লীর সুলতান ইলতুৎমিস গিয়াসউদ্দিনকে দমন করার উদ্দেশ্যে ১২২৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা অভিযান করেন। গিয়াসউদ্দিন ইলতুৎমিসের বশ্যতা স্বীকার করে নেন এবং তাঁর নামে খুৎবা পাঠ করতে ও মুদ্রা উৎকীর্ণ করতে রাজী হন। সুলতান বাংলা থেকে ৮ লক্ষ টাকা ও ৩৮টি হাতি উপহার পান। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে গিয়াসউদ্দিন দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করেন এবং বিহার থেকে দিল্লীর প্রতিনিধি

আলাউদ্দিন জানিকে বিতাড়িত করেন। অবশেষে ইলতুৎমিসের নির্দেশে তাঁর পুত্র নাসিরউদ্দিন বাংলা আক্রমণ করে গিয়াসউদ্দিনকে পরাজিত ও হত্যা করেন।

○ মামেলুক বংশের আমল ঃ

বাংলাদেশে মামেলুক শাসনের সূচনা করেন নাসিরউদ্দিন মামুদ (১২২৭ খ্রীঃ)। এই বংশের গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য প্রতিনিধি ষাট বছর (১২২৭-'৮৭) বাংলাদেশে শাসন পরিচালনা করেছিলেন। এঁদের মধ্যে অন্তত দশজন ছিলেন দিল্লী দরবারের প্রভাবশালী অভিজাত। বাল্যজীবনে এঁরা ছিলেন ক্রীতদাস। অবশ্য বাংলার শাসনভার গ্রহণের আগে প্রত্যেকেই দিল্লীতে উচ্চপদে আসীন ছিলেন। স্বভাবতই এঁদের শাসনাধীনে লক্ষ্মণাবতী দিল্লীর প্রতিচ্ছবিতে পরিণত হয়েছিল। এই পর্বে বাংলার রাজনৈতিক জীবন ছিল খুবই তপ্ত ও অস্থির। লক্ষ্মণাবতী তখন পরিণত হয়েছিল রাজনৈতিক ঝটিকাকেন্দ্রে। কারণ লক্ষ্মণাবতীর কর্তৃত্ব লাভ করা তখন বিশেষ মর্যাদার বিষয় বলে গণ্য হত। বাংলাদেশ দখল করতে পারলেই *'মালিক-উস্-শাক'* বা *'পূর্বদেশের প্রভু'* মর্যাদা লাভ করা যেত। তাই অযোধ্যা, উড়িষ্যা, কনৌজ প্রভৃতি অঞ্চলের শাসকরা লক্ষ্মণাবতী দখলের জন্য সর্বদা উন্মুখ হয়ে থাকতেন। পরিণতিতে ঘন ঘন সংঘর্ষ ঘটত।

যুবরাজ নাসিরউদ্দিন মামুদ মাত্র আঠারো মাস বাংলা শাসন করেছিলেন। তিনি পিতার কাছ থেকে *'মালিক-উস্-শান'* উপাধি পান। এই সময়ে বাংলা পুরোপুরি দিল্লীর নিয়ন্ত্রণে আসে। নাসিরউদ্দিন অযোধ্যা ও বাংলাকে এক শাসনাধীনে আনেন। অসুস্থ অবস্থায় নাসিরুদ্দিন আকস্মিক মারা গেলে ইখতিয়ারউদ্দিন মালিক 'বল্কা' নামক জনৈক আমীর বিদ্রোহী হন এবং বাংলার সিংহাসন দখল করেন। ইলতুৎমিস বল্কাকে হত্যা করে বিহারের প্রদেশপাল আলাউদ্দিন 'জানি' নামক তুর্কীস্থানের রাজবংশোদ্ভূত এক ব্যক্তিকে লক্ষ্মণাবতীর শাসক নিযুক্ত করেন। অবশ্য এক বছর পরেই তাঁকে অপসারিত করে ইলতুৎমিস সৈফুদ্দিন আইবককে বাংলার শাসক নিযুক্ত করেন। তাতারবংশোদ্ভূত সৈফুদ্দিন তিন বছর অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বাংলাদেশ শাসন করেছিলেন। ইলতুৎমিস তাঁকে *'ইউগানতৎ'* উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেছিলেন।

ইলতুৎমিসের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে দিল্লীতে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি হয়, তার প্রভাব বাংলাদেশেও পড়ে। এই সুযোগে আওর খাঁ ইবাক নাম্মী জনৈক তুর্কী লক্ষ্মণাবতী দখল করে নেন। বিহারের প্রদেশপাল তুগরল তুগান খাঁ আওর খাঁকে হত্যা করে শেষ পর্যন্ত লক্ষ্মণাবতী দখল করতে সক্ষম হন। তুগরল তুগান দিল্লীর সুলতান রাজিয়ার প্রতি বশ্যতা জ্ঞাপন করে বাংলা শাসন করেন। জাজনগরের সাথে সংঘর্ষে তুগান খাঁ'র সাহায্যে এসে অযোধ্যার শাসক তমুর খাঁ দিল্লীর সুলতানের কর্তৃত্ব অস্বীকার করেই দু'বছর লখ্নৌতি শাসন করেন (১২৪৫-'৪৭ খ্রীঃ)। পরবর্তী শাসক আলাউদ্দিন জানি চার বছর বাংলা শাসন করেন (১২৪৭-'৫১ খ্রীঃ)। তিনি দিল্লীর প্রতি আনুগত্য বজায় রাখেন। অবশ্য দিল্লীর দুর্বলতার সুযোগে আনুগত্য জ্ঞাপনের পাশাপাশি তিনি *'শাহ'* উপাধিও গ্রহণ করেন।

পরবর্তী শাসক ইখতিয়ারউদ্দিন ইউজবাক দিল্লীর প্রতি বিদ্রোহী-ভাবাপন্ন ছিলেন। তবে দিল্লীর উজীর বলবনের স্নেহভাজন হওয়ার ফলে দিল্লীর বিরোধিতা তাকে বিব্রত করেনি। তিনি বাংলায় মুসলমান শাসনের সীমানা দক্ষিণ দিকে লক্ষ্মণাবতী থেকে মান্দারণ পর্যন্ত প্রসারিত

করেন। মান্দারণ বিজয় সম্পন্ন করার অব্যবহিত পরে তিনি আবার প্রকাশ্যে দিল্লীর আনুগত্য অস্বীকার করেন এবং 'মুঘিসউদ্দিন' উপাধি নিয়ে নিজনামে 'মুদ্রা' চালু করেন। বিহার ও অযোধ্যার উপরেও তিনি নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। কামরূপ অভিযান পরিচালনার সময় তাঁর মৃত্যু ঘটে। মুঘিসউদ্দিনের মৃত্যুর পর যথাক্রমে মসুদ জানী, ইয়াজউদ্দিন বলবন ও তাজউদ্দিন আসরাল খাঁ রাজত্ব করেন। এঁরা মোটামুটি দিল্লীর প্রতি আনুগত্য বজায় রাখেন।

○ সুলতান বলবনের আমলে বাংলাদেশ ঃ

বলবন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করার পর সুলতানি শাসনে বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটে। স্বভাবতই আঞ্চলিক শাসকদের উপরেও দিল্লীর কর্তৃত্ব কিছুটা বৃদ্ধি পায়। বলবনের সিংহাসনারোহণ কালে বাংলাদেশের শাসক ছিলেন তাতার খাঁ। ইনি দিল্লীর সুলতান নাসিরউদ্দিনের বশ্যতা অগ্রাহ্য করলেও বলবনকে উপঢৌকন দ্বারা খুশি করার চেষ্টা করেন। পরবর্তী শাসক শের খাঁর রাজত্বকাল সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। বলবন, অতঃপর আমিন খাঁকে লক্ষ্মণাবতীর শাসক নিযুক্ত করেন। একই সঙ্গে তিনি বাংলার সহকারী শাসকপদে তুগরল খাঁকে (তুঘ্রিল) নিযুক্ত করেন। বাংলার প্রশাসনে এই প্রথম সহকারী শাসকের আবির্ভাব ঘটে। তুগরলের চরিত্রে তুর্কীসুলভ বহু গুণ ছিল। তিনি ছিলেন সাহসী, বীর, বুদ্ধিমান ও উচ্চাভিলাষী। তাই সহকারী শাসক হলেও, কার্যক্ষেত্রে আমিন খাঁকে আড়ালে রেখে তিনিই বাংলাদেশের প্রধান শাসকে পরিণত হন। জাজনগর অভিযান করে তিনি প্রচুর অর্থ ও হাতি সংগ্রহ করেন, সোনারগাঁও অঞ্চলে নির্মাণ করেন এক দুর্ভেদ্য দুর্গ। বরণী এটিকে *'তুগরলের কেল্লা'* বলে অভিহিত করেন। তুগরল লুণ্ঠিত অর্থের এক-পঞ্চমাংস নিয়মানুযায়ী দিল্লীর সুলতানকে প্রদান না করে বিদ্রোহী মনোভাবের পরিচয় দেন। সম্ভবত, এর পরেই তিনি আমিন খাঁকে বিতাড়িত করে পূর্ণ শাসনক্ষমতা করায়ত্ত করেন। এই সময় বলবন সীমান্তে মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করার কাজে ব্যস্ত থাকায় বাংলাদেশের ঘটনাবলীর দিকে মন দিতে পারেননি। অতঃপর বলবনের অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে তুগরল নিজেকে 'স্বাধীন সুলতান' বলে প্রচার করেন এবং *'মুইজউদ্দিন'* উপাধি নেন। নিজনামে তিনি 'মুদ্রা' উৎকীর্ণ করেন এবং 'খুৎবা' পাঠ করেন। তুগরলের অবাধ্যতায় ক্ষুব্ধ হয়ে বলবন বাংলার বিরুদ্ধে পর পর দুটি অভিযান প্রেরণ করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় অভিযানে সুলতানি-বাহিনীর নেতৃত্ব দেন যথাক্রমে মালিক তুরমতি ও বাহাদুর খাঁ। দুটি অভিযানই ব্যর্থ হয়। অবশেষে বলবন স্বয়ং বাংলাদেশ অভিযানে নেতৃত্ব দেন এবং বাংলা পুনরুদ্ধার করেন। বিদ্রোহী তুগরল পরাজিত ও নিহত হন। বিদ্রোহীদের তিনি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেন। লক্ষ্মণাবতীর প্রায় দু'মাইল রাজপথের দুপাশে অসংখ্য ফাঁসির মঞ্চ তৈরি করে তুগরলের পুত্র, জামাতা, মন্ত্রী, কর্মচারী, ক্রীতদাস, সৈন্য পাইকসহ সমস্ত ধরনের সমর্থকদের ফাঁসি দেন। তুগরলের কিছু অনুচরকে প্রাণদণ্ড দেবার জন্য দিল্লীতেও ধরে অনেন। অবশ্য দিল্লীর কাজীর অনুরোধে এদের অধিকাংশকে মুক্তি দেন। লক্ষ্মণাবতীতে তিনি যে নৃশংসতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তাকে বলবনের সমর্থক ও পাত্রমিত্রদের অনেকেই অন্তর থেকে মেনে নিতে পারেননি।

তুগরল খাঁ বিদ্রোহদমনের পরেও কিছুকাল বাংলায় অবস্থান করে বলবন শাসনব্যবস্থাকে সংগঠিত করেছিলেন। অতঃপর তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র বুগরা খাঁ'কে রাজকীয় উপাধিসহ বাংলার শাসক

নিযুক্ত করে (১২৮২ খ্রীঃ) দিল্লীতে ফিরে যান। বুগরা খাঁ প্রথম চার বছর দিল্লীর অধীনস্থ সুলতান হিসেবে বাংলাদেশ শাসন করেন। কিন্তু বলবনের মৃত্যুর পর (১২৮৭ খ্রীঃ) পর তিনি নিজেকে বাংলাদেশের 'স্বাধীন সুলতান' বলে ঘোষণা করেন। বুগরা খাঁ ছিলেন অলস, বিলাসী ও স্থূল-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। তাই বলবনের মৃত্যুর পর দিল্লীর সুলতানপদ গ্রহণের সুযোগ তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। বলবনের মৃত্যুর পর প্রথমে কাইখসরু সুলতান হন। কিন্তু আমীরওমরাহগণ তাঁকে হটিয়ে বুগরা খাঁর পুত্র কাইকোবাদকে সিংহাসনে বসান। কাইকোবাদ তাঁর পিতার চেয়েও অধিক বিলাসী ও উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। এই সুযোগে মালিক নিজামউদ্দিন ও মালিক কোয়ামউদ্দিন দিল্লীর সর্বময় কর্তায় পরিণত হন। সারা রাজ্যে অনাচার শুরু হয়। কেন্দ্রীয় প্রশাসন ভেঙে পড়ে। পুত্রের অপদার্থতায় ক্ষুব্ধ হয়ে বুগরা খাঁ দিল্লী অভিযানের সিদ্ধান্ত নেন। কাইকোবাদও পিতাকে বাধা দিতে অগ্রসর হন। সরযূনদীর তীরে দু'পক্ষের শিবির স্থাপিত হয়। তবে যুদ্ধের পরিবর্তে পিতা-পুত্রের সাক্ষাৎকার দীর্ঘ বিরহের পর মধুর মিলনের মাঝে সমাপ্ত হয়। এই ঘটনাকে ভিত্তি করে আমীর খসরু *'কিরান-ই-সদাইন'* নামে একটি কাব্য লিখেছিলেন। বুগরা খাঁ পুত্রকে সংযত হয়ে এবং বিবেচনার দ্বারা রাজ্যশাসনের পরামর্শ দিয়ে বাংলায় ফিরে যান। অতঃপর তিনি প্রকৃত অর্থেই স্বাধীনভাবে বাংলার শাসন পরিচালনা করেন। জীবনের শেষ দিকে বুগরা খাঁ স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করে সেখানে কনিষ্ঠ পুত্র কাইকাউসকে বসিয়ে দেন। কাইকাউস ১২৯১-১২৯৮/৯৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা শাসন করেছিলেন। তাঁর অপসারণ বা মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় বলবনী শাসনের অবসান ঘটে।

কাইকাউসের পর সামসউদ্দিন ফিরোজ শাহ লক্ষ্মণাবতীর শাসক হন। এঁর বংশপরিচয় সম্বন্ধে মতভেদ আছে। ইতালীয় পর্যটক ইবনবতুতার মতে, ফিরোজ ছিলেন বুগরা খাঁর পুত্র। *ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের* মতে, এই বিবরণ সঠিক নয়। মুদ্রা ও অন্যান্য সূত্রের ভিত্তিতে ড. মজুমদার মনে করেন, ফিরোজ বলবনের বিশ্বস্ত একজন ক্রীতদাস ছিলেন। বুগরা খাঁকে বাংলার শাসকপদে নিযুক্ত করার পরে বলবন 'ফিরোজ' নামের যে দুজন ব্যক্তিকে বাংলাদেশে রেখে এসেছিলেন, সামসউদ্দিন ফিরোজ তাঁদেরই একজন। ফিরোজ শাহ দক্ষতার সাথে সুদীর্ঘ ২১ বছর (১৩০১-১৩২২ খ্রীঃ) বাংলাদেশ শাসন করেছিলেন। তিনি বহু নতুন অঞ্চল লক্ষ্মণাবতীর শাসনাধীনে নিয়ে আসেন। সাঁতগাঁও, ময়মনসিংহ, সোনারগাঁও তিনি দখল করেন। সুদূর শীহট্ট বা সিলেট পর্যন্ত ফিরোজ শাহ-র কর্তৃত্ব প্রসারিত ছিল। ইয়াহিয়া আহমেদের *'মলফুজৎ'* থেকে জানা যায় যে, সোনারগাঁও ফিরোজ শাহের রাজধানী ছিল। ফিরোজের নামানুসারে সম্ভবত পাণ্ডুয়া নগরের নাম পরিবর্তন করে 'ফিরোজাবাদ' হিসেবে মুদ্রায় উৎকীর্ণ হয়েছিল।

সামসউদ্দিন ফিরোজের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রদের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়েছিল। এই পর্বের ইতিহাস সমকালীন লেখক জিয়াউদ্দিন বরণী, ইসামী ও ইবনবতুতার বিবরণ থেকে জানা যায়। ফিরোজের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শিহাবুদ্দিন বুগরা শাহ সিংহাসনে বসেন। কিন্তু তাঁর ভাই গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহ শিহাবকে বিতাড়িত করে লক্ষ্মণাবতী দখল করে নেন। শিহাবউদ্দিন ও নাসিরউদ্দিন ইব্রাহিম ছাড়া অন্যান্য ভাইয়েরা গিয়াসউদ্দিনের হাতে নিহত হন। কিছুদিনের মধ্যে শিহাবউদ্দিনও মারা যান। এই সময় নাসিরুদ্দিন ভাইয়ের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দিল্লীর সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের সাহায্য চান। দিল্লীর বাহিনী গিয়াসউদ্দিন

বাহাদুর শাহকে পরাজিত ও বন্দী করে। গিয়াসউদ্দিন তুঘলক বাংলাদেশকে দিল্লীর অন্তর্ভুক্ত করে নতুনভাবে শাসন-দায়িত্ব বণ্টন করেন। লক্ষ্মণাবতীর শাসক হন নাসিরউদ্দিন ইব্রাহিম। সোনারগাঁও এবং সাতগাঁও-এর শাসন-দায়িত্ব দেওয়া হয় তাতার খাঁকে (গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের পালিত পুত্র)। ইনি সুলতানের কাছ থেকে *'বহরম খাঁ'* উপাধি পেয়েছিলেন।

মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের আমলে বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থার ব্যাপক রদবদল করা হয়। লক্ষ্মণাবতীর শাসনভার শুধুমাত্র নাসিরউদ্দিনের হাতে না রেখে পিণ্ডার খলজী নামক জনৈক ব্যক্তিকে লক্ষ্মণাবতীর সহকারী শাসক নিযুক্ত করেন। পিণ্ডারকে *'কদর খাঁ'* উপাধি দেওয়া হয়। গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহকে মুক্তি দিয়ে বাংলায় পাঠিয়ে দেন এবং সোনারগাঁওয়ে তাতার খাঁর সহযোগী শাসক নিযুক্ত করেছিলেন। সাতগাঁও-এর শাসকপদে নিযুক্ত হন মালিক ইয়াজউদ্দিন ইয়াহিয়া। গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর ১৩২৫ থেকে ১৩২৮ পর্যন্ত মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের অধীনতা মেনে সোনারগাঁও শাসন করেন। এই সময় মহম্মদ তুঘলক সুলতানের বিদ্রোহদমনে ব্যস্ত হয়ে পড়লে বাহাদুর শাহ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। অবশ্য তাতার খাঁ তৎপরতার সাথে এই বিদ্রোহ দমন করেন। বাহাদুর শাহ নিহত হন। পরবর্তী দশ বছর মহম্মদ তুঘলকের অধীনস্থ শাসক হিসেবে কদর খাঁ, তাতার খাঁ এবং ইয়াজউদ্দিন যথাক্রমে লক্ষ্মণাবতী, সোনারগাঁও ও সাতগাঁও শাসন করেন।

বহরম খাঁর (তাতার খাঁ) মৃত্যুর পর তাঁর বর্মরক্ষক ফকরউদ্দিন সোনারগাঁও অধিকার করে নিজেকে 'স্বাধীন সুলতান' বলে ঘোষণা করেন এবং *'মুবারক শাহ'* উপাধি নেন। তাঁর স্বাধীনতা ঘোষণার বিরুদ্ধে বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের দিল্লীর অনুগত শাসকেরা কদর খাঁ-র নেতৃত্বে সোনারগাঁও আক্রমণ করেন। ফকরউদ্দিন বিতাড়িত হন। সোনারগাঁও আবার দিল্লীর অধীনস্থ হয়। কিন্তু কদর খাঁ এই অভিযানে প্রাপ্ত অর্থসম্পদ তাঁর সৈন্যদের মধ্যে বণ্টিত না করে নিজেই আত্মসাৎ করেন। এতে তাঁর সৈন্যরা ক্ষুব্ধ হয়। এই সুযোগে ফকরউদ্দিন পুনরায় সোনারগাঁও দখল করে নেন। তিনি সাময়িকভাবে লক্ষ্মণাবতীও দখল করেন এবং মুবারক মুঘলিশকে সেখানকার শাসক নিযুক্ত করেন। কয়েকদিনের মধ্যেই কদর খাঁ-এর *'আরিজ-ই-লস্কর'* আলী মুবারক মুঘলিশকে হত্যা করে লক্ষ্মণাবতী পুনর্দখল করে নেন। তিনি সুলতান মহম্মদ-বিন্ তুঘলকের কাছে লক্ষ্মণাবতীর শাসক প্রেরণের আবেদনও জানান। সুলতান জনৈক ইউসুফকে লক্ষ্মণাবতীর শাসক নিযুক্ত করেন। কিন্তু দায়িত্বভার গ্রহণের পূর্বেই তিনি মারা যান। অতঃপর আলী মুবারক আলাউদ্দিন *'আলী শাহ'* নাম নিয়ে লক্ষ্মণাবতী শাসন করতে থাকেন। ইনি পাণ্ডুয়াতে (ফিরোজাবাদ) রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। পরবর্তী একশো বছর পাণ্ডুয়াই বাংলার রাজধানী ছিল। অন্যদিকে ফকরউদ্দিন সোনারগাঁও সমেত পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ অঞ্চলে স্বাধীন শাসন চালাতে থাকেন। আলী শাহের সাথে ফকরউদ্দিনের ঘন ঘন সংঘর্ষ হত বলে ইবনবতুতা উল্লেখ করেছেন। পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত *'শাহ জালালের দরগা'* আলী শাহ নির্মাণ করেন। আলী শাহ মাত্র এক বছর (১৩৪১-'৪২ খ্রীঃ) রাজত্ব করেন। তাঁরই অধীনস্থ কর্মচারী মালিক ইলিয়াস হাজী আলী শাহকে হত্যা করে সিংহাসনে বসেন। ইনিই ইতিহাসের বিখ্যাত *'ইলিয়াস শাহী'* বংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

○ ইলিয়াস শাহী বংশের শাসন ঃ

সামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ *'ইলিয়াস শাহী'* বংশ নামে খ্যাত। বস্তুত, ইলিয়াস শাহের সিংহাসনারোহণের মাধ্যমে বাংলাদেশের ইতিহাসে এক নতুন পর্যায়ের সূচনা হয়েছিল। দিল্লীর অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতি এই স্বাধীন সুলতানির প্রতিষ্ঠার পটভূমি 'তৈরি করে দেয়। এই সময় উত্তর-ভারতের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা সুলতান মহম্মদ-বিন্-তুঘলককে বিব্রত ও ব্যস্ত করে রেখেছিল। এই সুযোগে হাজী ইলিয়াস লক্ষ্মণাবতীর শাসনক্ষমতা নিজ হাতে তুলে নেন। তবে ঠিক কোন সময়ে তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন, তা বিতর্কিতই থেকে গেছে। *ড. এন. বি. রায়* মনে করেন, যেহেতু সোনারগাঁও ও লক্ষ্মণাবতীতে যথাক্রমে ফকরউদ্দিন ও আলী শাহ ১৩৪০-'৪৫-এর মধ্যবর্তীকালে শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেহেতু হাজী ইলিয়াস সম্ভবত সাতগাঁওকে কেন্দ্র করে নিজ দক্ষতা সংহত করেছিলেন। এবং ১৩৪৫-'৪৬ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন এক সময়ে লক্ষ্মণাবতীর কর্তৃত্ব দখল করেন।

সামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহের পূর্ব-ইতিহাস কিছুটা অস্পষ্ট। আরবী ঐতিহাসিক ***ইবন্ হজর ও আল-সখাই***-এর মতে, ইলিয়াসের আদি নিবাস ছিল পূর্ব-ইরানের সিজিস্তান। আবার কোন কোন গ্রন্থে তাঁকে আলী শাহের বৈমাত্রেয় ভাই কিংবা ভৃত্য বলা হয়েছে। যাই হোক্, তিনি আলী শাহের অধীনে রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং ষড়যন্ত্র দ্বারা ক্ষমতা দখল করেছিলেন। *তারিখ-ই-ফিরোজশাহী, তবকৎ-ই-আকবরী, তারিখ-ই-ফিরিস্তা, সিরাৎ-ই ফিরোজশাহী* প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে তাঁর রাজত্বকালের বিবরণ জানা যায়। লক্ষ্মণাবতীর সিংহাসন দখল করার পরেই ইলিয়াস শাহ রাজ্যবিস্তারে মন দেন। ত্রিহূত অধিকার করে তিনি হাজীপুর পর্যন্ত অগ্রসর হন। চম্পারণ, গোরক্ষপুর, কাশী প্রভৃতি অঞ্চলও তিনি জয় করেন। চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইলিয়াস শাহ ঐশ্বর্যশালী উড়িষ্যার পূর্ব-গঙ্গা রাজ্য আক্রমণ করেন। গঙ্গারাজ্যে প্রবল প্রতিরোধ ভেঙে ইলিয়াস শাহের বাহিনী চিল্কা হ্রদ পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল। সুলতান উড়িষ্যা থেকে ৪৪টি হাতি ও প্রচুর ধনরত্নসহ প্রত্যাবর্তন করেন। নেপালের বিরুদ্ধেও তিনি সফল অভিযান প্রেরণ করেন। নেপালের বহু মন্দির ধ্বংস করেন। পশুপতিনাথের বিখ্যাত মূর্তিটিও তিনি তিন খণ্ডে পরিণত করেন (১৩৫০ খ্রীঃ)। নেপালে থেকে বহু অর্থ সংগ্রহ করে ইলিয়াস স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৩৫২ খ্রীষ্টাব্দে গাজী শাহকে পরাজিত করে ইলিয়াস পূর্ববঙ্গের সোনারগাঁও অঞ্চল দখল করেন। ফলে বাংলায় রাষ্ট্রীয় ঐক্য স্থাপিত হয়। কামরূপ রাজ্যের কিয়দংশও তাঁর অধিকারভুক্ত হয়।

ইলিয়াস শাহের সামরিক সাফল্যে ও ক্ষমতার দ্রুত প্রসার দিল্লীর সুলতান ফিরোজ তুঘলককে শঙ্কিত ও ক্ষুব্ধ করেছিল। তাই ইলিয়াসকে দমন করার জন্য তিনি বিশাল বাহিনীসহ বাংলাদেশ আক্রমণ করেন (১৫৫৩ খ্রীঃ)। সুলতানি-বাহিনী ত্রিহূত পুনর্দখল করে বাংলায় উপস্থিত হয় এবং পাণ্ডুয়া দখল করে নেয়। পরিস্থিতি বিবেচনা করে ইলিয়াস শাহ সপরিবারে পাণ্ডুয়ার অনতিদূরে দুর্ভেদ্য *'একডালা দুর্গে'* আশ্রয় নেন। দীর্ঘদিন একডালা দুর্গ অবরোধ করে রেখেও ফিরোজ তুঘলক ইলিয়াস শাহকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে বিফল হন। দিল্লীর সুলতানি সৈন্যের এই অবরোধে ইলিয়াস শাহের সেনাদের মধ্যে সর্বাধিক বীরত্ব দেখায় বাঙালী পাইক বা পদাতিক-বাহিনী। পাইকদের সর্দার সহদেব এই যুদ্ধে প্রাণ দেন। অবশেষে ৪৪টি হাতি ও কিছু অর্থসম্পদ

দখল করে তিনি দিল্লীতে ফিরে যান। এই অভিযানের অগ্রগতি ও পরিণতি সম্পর্কে বিতর্ক আছে। বরণী, ইসামী প্রমুখের লেখা থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, সুলতান ফিরোজ তুঘলক ইলিয়াস শাহকে বিধ্বস্ত করেছিলেন কিন্তু দুর্গের অভ্যন্তরে ক্রন্দনরত মহিলাদের প্রতি করুণাবশত দুর্গ দখল না-করেই দিল্লী ফিরে গিয়েছিলেন। স্বভাবতই তাঁদের বক্তব্যে ঐতিহাসিক সত্যতা অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা জরুরী। ড. *মজুমদার, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়* প্রমুখ ইতিহাসবিদ্ মনে করেন, এই যুদ্ধে কোন পক্ষই চূড়ান্তভাবে জয়ী হতে পারেনি। যুদ্ধে উভয় পক্ষেরই প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। সম্ভবত, বর্ষাকালের আগমন-সম্ভাবনা থেকেই ফিরোজ তুঘলক একডালার অবরোধ অসম্পূর্ণ রেখে রাজধানীতে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। অনেকের মতে, ইলিয়াস শাহ ফিরোজের অবরোধ ভাঙার জন্য উড়িষ্যার গঙ্গরাজের সাহায্য চেয়েছিলেন। এটিও ফিরোজের আশঙ্কার কারণ ছিল। যাই হোক্, ফিরোজ তুঘলক দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করে বিজয়-উৎসব পালন করে আত্মপ্রমাদ লাভ করেন। এদিকে দিল্লীর বাহিনী বাংলাদেশ ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে ইলিয়াস তাঁর হারানো রাজ্যাংশগুলিও পুনরুদ্ধার করে নেন। শেষ পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে এক সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। সন্ধির দ্বারা ফিরোজ তুঘলক কার্যত, ইলিয়াস শাহের মর্যাদা স্বীকার করে নেন। পক্ষান্তরে, ইলিয়াস শাহ ফিরোজ তুঘলককে দু'বার প্রচুর মূল্যবান উপঢৌকন প্রেরণ করে সন্তুষ্ট করেন।

দিল্লীর অনুগ্রহপুষ্ট লেখকেরা ইলিয়াস শাহকে সিদ্ধি বা ভাঙ-জাতীয় নেশায় আসক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। সিরাৎ-ই-ফিরোজ শাহী'র মতে, তিনি কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত ছিলেন। ড. *মজুমদার* এই বক্তব্যকে *'বিদ্বেষ প্রণোদিত মিথ্যা উক্তি'* বলে মনে করেন। আনুমানিক ১৩৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ইলিয়াস শাহের মৃত্যু হয়।

ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র *সিকন্দর শাহ* বাংলার সিংহাসনে বসেন। সুদীর্ঘ তেত্রিশ বছর (১৩৫৮-'৯১ খ্রীঃ) তিনি রাজত্ব করেছিলেন। পিতার মত তিনিও যোগ্যতা ও দক্ষতাসম্পন্ন শাসক ছিলেন। নিজের ক্ষমতা সুদৃঢ় করার জন্য সিকন্দর দিল্লীর সাথে সংঘাত এড়িয়ে চলার পক্ষপাতী ছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রচুর উপঢৌকনসহ দিল্লীতে দূত পাঠান। কিন্তু সুলতান ফিরোজ তুঘলক প্রথমবার বাংলা অভিযানের ব্যর্থতা ভুলতে পারেননি। তাই সিকন্দর শাহের আমলে তিনি বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। সোনারপুরের জনৈক আমীরের প্রতি অমানবিক ব্যবহার করা হয়েছে, এই অজুহাতে ফিরোজ বাংলা আক্রমণ করেন। *'আফিফ'* ও *'সিরাৎ'* গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, সিকন্দর শাহ সুলতানি-বাহিনীর সাথে সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ না হয়ে পিতার মতই দুর্ভেদ্য একডালা দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ফিরোজ শাহ কয়েকমাস দুর্গ অবরোধ করে রাখেন, কিন্তু দুর্গ অধিকার করতে ব্যর্থ হন। শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষ ক্লান্ত হয়ে সন্ধি স্থাপন করেন। ফিরোজ শাহ ১৩৫৯ খ্রীষ্টাব্দে সসৈন্যে বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যান। পরবর্তী ঘটনা থেকে অনুমান করা যায় যে, সুলতান বাংলাদেশর উপর সিকন্দর শাহের সার্বভৌম কর্তৃত্ব মেনে নিয়েছিলেন। সম-মর্যাদাসম্পন্ন নৃপতির মতই উভয়ের মধ্যে দূত ও উপঢৌকন বিনিময় তার অন্যতম প্রমাণ। পরবর্তী দীর্ঘ দুশো বছর, আফগানের উত্থানের পূর্ব পর্যন্ত , বাংলাদেশে দিল্লীর কোন শাসক অভিযান করেননি।

সিকন্দর শাহ কেবল প্রতিভাসম্পন্ন যোদ্ধা ও শাসক ছিলেন না, শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক রূপেও

তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তাঁর উদ্যোগে বহু সুদৃশ্য মসজিদ, মিনার ও প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল। সিকন্দর শাহের বিশিষ্ট শিল্পকীর্তি হল পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত ***'আদিনা মসজিদ'*** (১৩৬৯ খ্রীঃ)। ড. ***মজুমদারের*** মতে ঃ *"স্থাপত্য-কৌশলের বিচারে এই মসজিদটি অতুলনীয়। ভারতবর্ষে নির্মিত সমস্ত মসজিদের মধ্যে আদিনা মসজিদ আয়তনের দিক থেকে দ্বিতীয়"।* গৌড়ের কোতোয়ালী দরওয়াজা, মোল্লা সিমলাই (হুগলী)-এর মসজিদ তাঁর আমলেই নির্মিত হয়। মুসলিম সাধু-সন্তদের প্রতিও তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবোধ ছিল। পাণ্ডুয়ার প্রখ্যাত দরবেশ আলা-অল্-হকের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। দেবীকোটের জনপ্রিয় সন্ত মোল্লা আতার স্মৃতিরক্ষার্থে সিকন্দর পূর্বোক্ত মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন।

সিকন্দর শাহের শেষজীবন খুব সুখের ছিল না। *'রিয়াজ-উস্-সালাতিন'* গ্রন্থের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, তাঁর পুত্রদের মধ্যে উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত বিরোধ তাঁকে যথেষ্ট বিব্রত করেছিল। তাঁর প্রিয় পুত্র *গিয়াসউদ্দিন* অকারণ আশঙ্কাবশত সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন ' সোনারগাঁও থেকে তিনি সসৈন্যে লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ করলে যে যুদ্ধ হয়, তাতে জনৈক সৈনিকের হাতে সিকন্দর শাহ নিহত হন। অবশ্য এই পরিণতি গিয়াসউদ্দিনের অনিচ্ছাকৃত ছিল এবং তাঁর মনে অনুতাপের সঞ্চার করেছিল।

পরবর্তী শাসক গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ প্রায় কুড়ি বছর (১৩৯১-১৪১১ খ্রীঃ) বাংলা শাসন করেন। পূর্বসূরীদের মত তিনিও প্রতিভাবান ব্যক্তি ছিলেন। তবে ইলিয়াস শাহ ও সিকন্দর শাহ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাঁর সামরিক দক্ষতা ও সাম্রাজ্যের সংগঠন-ক্রিয়ার জন্য। কিন্তু গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ খ্যাত ছিলেন তাঁর লোকরঞ্জক ব্যক্তিত্বের জন্য। **ড. *মজুমদারের*** মতে ঃ *"তাঁর মত বিদ্বান, রুচিবান, রসিক ও ন্যায়পরায়ণ নৃপতি এ পর্যন্ত খুব কমই আবির্ভূত হয়েছেন।"* যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেন। কামতারাজ্য ও অমোহন রাজ্যের মধ্যে বিরোধের সুযোগে তিনি কামতারাজ্যের একাংশ দখল করে নেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই কামতা ও অহোম রাজ্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে গিয়াসউদ্দিনের বাহিনীকে আক্রমণ করে ও কামতারাজ্য থেকে বিতাড়িত করে। এই ব্যর্থতা বাংলা সুলতানের মর্যাদা হানি করেছিল। অবশ্য ন্যায়পরায়ণতা ও বিদ্যোৎসাহিতার জন্য তাঁর নাম উজ্জ্বল হয়ে আছে। *'রিয়াজ'*-এ বলা হয়েছে যে, একবার গিয়াসউদ্দিন অসাবধানতা বশত এক বিধবার পুত্রকে আহত করলে বিধবা কাজীর কাছে বিচারপ্রার্থী হন। সুলতান সশরীরে কাজীর দরবারে উপস্থিত হয়ে দোষ স্বীকার করে নেন। এমনকি কাজীর সাহস ও নিরপেক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে সুলতান কাজীকে পুরস্কৃতও করেন। বিহারের দরবেশ মুজফ্ফর বলখির পত্র থেকেও গিয়াসউদ্দিনের ন্যায়-নিষ্ঠা ও ধর্মপরায়ণতার স্বীকৃতি পাওয়া যায়। ***বলখি*** লিখেছেন যে, সুলতান নির্ভীকতা, উদারতা, মহত্ত্ব বিদ্যানুরাগ ইত্যাদি বহু গুণে ভূষিত ছিলেন। পিতা ও পিতামহের মত সাধু-সন্তদের সাথেও গিয়াসউদ্দিনের মধুর সম্পর্ক ছিল। বলখি ছাড়াও প্রখ্যাত সন্ত নূর কুতব আলমের সাথে সুলতানের ঘনিষ্ঠতা ছিল। বহু অর্থব্যয় করে তিনি মক্কা ও মদিনার দুটি মাদ্রাসা নির্মাণ করেন। নিজে হানাফী হলেও ইসলামের অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার অভাব ছিল না। মক্কাতে তিনি একটি সরাইখানা নির্মাণ করেন ও খাল খননের ব্যয়ভার বহন করেন। মক্কা ও মদিনার লোকেদের দান করার জন্যও তিনি বহু অর্থ প্রেরণ করেন।

কবি ও কাব্যমোদী হিসেবে গিয়াসউদ্দিন আজন্ম খ্যাতি পেয়েছিলেন। পারস্যের অমর কবি

হাফিজের সাথে তাঁর যোগাযোগ ছিল। কথিত আছে যে, সুলতান একটি অসমাপ্ত ফার্সী গজল হাফিজের কাছে পাঠালে হাফিজ তা পূরণ করে ফেরৎ দিয়েছিলেন। অবশ্য ভারতীয় কবিদের সাথে তাঁর কতটা ঘনিষ্ঠতা ছিল, তা জানা যায় না। বিদ্যাপতি কবির নামযুক্ত একটি পদে জনৈক 'গ্যাসদীন সুরতান'-এর প্রশস্তি পাওয়া গেছে। অনেকের মতে, এই পদকর্তা মিথিলার প্রখ্যাত কবি বিদ্যাপতি এবং 'গ্যাসদীন সুরতান' বলতে গিয়াসউদ্দিন সুলতানকে বোঝানো হয়েছে। ড. *মজুমদার* এই মন্তব্যের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

বিদেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন গিয়াসউদ্দিনের একটি প্রশংসনীয় কাজ। জৌনপুরের সুলতান মালিক সরওয়ারের সাথে তাঁর দূতবিনিময় হয়েছিল। চীনদেশের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, চীনসম্রাট *ইয়ুং লোর* কাছে গিয়াসউদ্দিন ১৪০৫, ১৪০৮, ১৪০৯ খ্রীষ্টাব্দে দূত প্রেরণ করেছিলেন। প্রত্যুত্তরে চীনের দূতও বাংলাদেশে উপস্থিত হয়েছিলেন। এই দূতদের সাথে দোভাষী হিসেবে *মা-হুয়ান* এদেশে আসেন। তাঁর বিররণী থেকে তৎকালীন বাংলা ও বাঙালীদের সম্পর্কে বহু তথ্য জানা যায়। তিনি বাংলার উন্নত কৃষিব্যবস্থা ও সমৃদ্ধ বাণিজ্যের উল্লেখ করেছেন। বাঙালীদের আতিথেয়তার তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

গিয়াসউদ্দিনের লোকরঞ্জক চরিত্র তাঁর প্রচ্ছন্ন ধর্মীয় অনুদারতার জন্য কিছুটা নিষ্প্রভ হয়েছে। দিল্লীর সুলতান ফিরোজ তুঘলকের মত গিয়াসউদ্দিনের ধর্মীয় দানের সুফল ভোগ করেছি। কেবল মুসলমানরা। এমনকি রাজনৈতিক কাজেও তিনি হিন্দুদের যুক্ত করার পক্ষপাতী ছিলেন না। সমকালীন চৈনিক দূতরা উল্লেখ করেছেন যে, তখন বাংলার সুলতানের অমাত্য ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সকলেই ছিলেন মুসলমান। এমনকি চীনা দূতদের বিবরণীতে কেবলমাত্র মুসলমানদের বিবরণ স্থান পেয়েছে, হিন্দুদের সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই। ড. *মজুমদার* মনে করেন, গিয়াসউদ্দিন শেষজীবনে হিন্দুবিরোধী নীতির জন্যই হিন্দুরাজা গণেশ সুলতানের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছিলেন এবং তাঁকে হত্যার পটভূমি তৈরি করেছিলেন।

গিয়াসউদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সৈফুদ্দিন হামজা সাহ সিংহাসনে বসেন। দুই বছর রাজত্ব করে সৈফুদ্দিন মারা যান। আরবদেশীয় *ইবন্-ই-হজর*-এর লেখা থেকে জানা যায় যে, সৈফুদ্দিন হামজা তাঁর জনৈক ক্রীতদাস শিহাবউদ্দিন কর্তৃক নিহত হয়েছিলেন। অতঃপর ঐ ক্রীতদাস শিহাবউদ্দিন *বায়াজিদ শাহ* নাম নিয়ে বাংলার সুলতান হন। অবশ্য তিনি ছিলেন নামেমাত্র সুলতান। প্রকৃত শাসনক্ষমতা ছিল সমকালীন রাজনীতির প্রধান নিয়ন্ত্রক হিন্দু-সামন্ত রাজা গণেশের হাতে। ক্ষমতালাভের পর শিহাবউদ্দিন কিছুটা আত্মসচেতন হয়ে উঠলে রাজা গণেশ তাঁকে হত্যা করেন। অতঃপর শিহাবউদ্দিনের পুত্র *আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ*কে সিংহাসনে বসিয়ে রাজা গণেশই রাজত্ব চালাতে থাকেন। তবে কেবলমাত্র ১৪১৪-'১৫ খ্রীষ্টাব্দের কিছু মুদ্রা থেকে ফিরোজ শাহের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা গেছে। সমকালীন কোন গ্রন্থে এর উল্লেখ পাওয়া যায় না। সম্ভবত, কয়েক মাসের মধ্যেই আলাউদ্দিন ফিরোজকে হত্যা করে রাজা গণেশ প্রকাশ্যে শাসনক্ষমতা দখল করেছিলেন।

○ রাজা গণেশ ও তাঁর বংশধরদের শাসন :

রাজা গণেশ বাংলাদেশের সিংহাসন দখল করলে বাংলায় ইলিয়াস শাহী শাসনের সাময়িক

ছেদ ঘটেছিল। গণেশের রাজত্বকাল বিশেষ স্মরণীয় এই কারণে যে, বাংলায় পাঁচ শতাধিক বছরেরও বেশি মুসলমান শাসনের মাঝে তিনি একমাত্র হিন্দু যিনি অন্তত কিছুদিন এখানে হিন্দু রাজার শাসন প্রবর্তনে সক্ষম হয়েছিলেন। *'তবকৎ-ই আকবরী, তারিখ-ই-ফিরিস্তা, মাসির-ই-রহিমী'* প্রভৃতি গ্রন্থে গণেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাওয়া যায়। এছাড়া বুকাননের ডায়েরী, দরবেশেদের জীবনীগ্রন্থ *'মিরাৎ-উল্-আসবার,* নূরকুতব আলমের *'পত্রাবলী'* এবং জনৈক চৈনিক দূতের 'বিবরণী' থেকে রাজা গণেশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়। রাজা গণেশের কোন মুদ্রা বা লিপি আবিষ্কৃত না হওয়ার ফলে ইতিহাস রচনার কাজ কিছুটা কষ্টকর হয়েছে। অবশ্য তাঁর ইতিহাসগত অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

উত্তরবঙ্গের ভাতুরিয়ার এক জমিদারবংশে গণেশের জন্ম। বিচক্ষণ ও সাহসী গণেশ ইলিয়াস শাহীবংশীয় সুলতানের অন্যতম আমীর হিসেবে সম্মানিত হন। গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ, হাজমা শাহ ও বায়াজিদ শাহের আমলে গণেশ বাংলার রাজনীতিতে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিলেন। বায়াজিদ শাহের আমলে বাংলার সুলতানি প্রশাসনে রাজা গণেশই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি। বায়াজিদ শাহ ছিলেন গণেশের হাতের পুতুলমাত্র। সম্ভবত গণেশের চক্রান্তে বায়াজিদ শাহ নিহত হ অতঃপর কিছু মুদ্রায় আলাউদ্দিন ফিরোজশাহ নামক জনৈক সুলতানের উল্লেখ পাওয়া যায়। (১৪১৪-'১৫খ্রীঃ)। যাই হোক্, গণেশ শেষ পর্যন্ত সামরিক অভ্যুত্থান দ্বারা বাংলায় ইলিয়াস শাহীবংশের উচ্ছেদ করে স্বয়ং বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

রাজা গণেশের শাসনকাল ছিল স্বল্পস্থায়ী। তবে স্বল্পকালের জন্য হলেও বাংলার অধিকাংশ অঞ্চলের উপর তাঁর কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়েছিল। উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের প্রায় সমস্ত অংশ এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গের একাংশ গণেশের শাসনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মুসলমানদের সার্বিক আধিপত্যের যুগে গণেশের পক্ষে হিন্দুশাসন টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। বাংলার দরবেশদের নেতৃত্বে মুসলমানদের একাংশ গণেশের তীব্র বিরোধিতা শুরু করেন। রাজা গণেশ প্রাথমিক পর্যায়ে বিদ্রোহীদের কঠোর হাতে দমন করেন। কয়েকজন নেতৃস্থানীয় দরবেশকে তিনি হত্যাও করেন। এমতাবস্থায় দরবেশের অন্যতম নেতা নূর কুতব আলম জৌনপুরের শাসক ইব্রাহিম শার্কীর সাহায্যপ্রার্থী হন। তৎকালীন উত্তর ও পূর্ব-ভারতের পরাক্রান্ত সুলতান ইব্রাহিমের কাছে তাঁর রাজা গণেশের অত্যাচারে বাংলাদেশে ইসলাম-বিপন্ন জাতীয় চিত্র তুলে ধরেন। ইব্রাহিম শার্কী বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। গণেশ তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়ে মুসলিম-বাহিনীর গতিরোধ করেন। কিন্তু নিজপুত্র যদু বা জিৎমল-এর বিশ্বাসঘাতকতার জন্য শেষ পর্যন্ত গণেশ পিছু হটতে বাধ্য হন। সিংহাসনের লোভে যদু শত্রুশিবিরে যোগ দেন এবং ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন। পরে *'জালালউদ্দিন মহম্মদ'* শাহ নাম নিয়ে যদু বাংলার সিংহাসনে বসেন। ১৪১৫-'১৬ খ্রীষ্টাব্দে এই পরিবর্তন ঘটেছিল।

জৌনপুরের সুলতান স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তনের কিছুদিনের মধ্যেই রাজা গণেশ পুনরায় বাংলার রাজনৈতিক কর্তৃত্ব নিজ হস্তগত করেন। সুতলান-পদে অবশ্য জালালউদ্দিনই বহাল ছিলেন। তবে রাজা গণেশের ইচ্ছানুসারেই তিনি রাজ্য চালাতে বাধ্য হন। এইভাবে কিছুদিন চলার পর গণেশ পুত্র জালালউদ্দিনকে অপসারিত করে নিজে *'দনুজমর্দনদেব'* নাম নিয়ে পুনরায় সিংহাসনে বসেন। জালালউদ্দিনকে হিন্দুধর্মে পুনর্দীক্ষিত করে গণেশ তাঁকে কারারুদ্ধ করে রাখেন।

'দনুজমর্দনদেব' নামে গণেশ সমগ্র ১৩৩৯ শকাব্দ (১৪১৭-'১৮ খ্রীঃ) এবং ১৩৪০ শকাব্দের (১৩১৮-'১৯ খ্রীঃ) কিছুকাল রাজত্ব করে পরলোক গমন করেন।

ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার রাজা গণেশকে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও কুশাগ্রবুদ্ধি ও কূটনৈতিক বলে অভিহিত করেছেন। *ফেরিস্তার* মতে, গণেশ ছিলেন দক্ষ শাসক। নিষ্ঠাবান হিন্দু হিসেবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। চণ্ডীদেবীর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে তিনি নিজমুদ্রায় *'চণ্ডীচরণপরায়ণস্য'* শব্দটি খোদিত করেন। কিছু মসজিদ ও ইসলামিক প্রতিষ্ঠান গণেশ ধ্বংস করেছিলেন। তবে তাঁর এই কাজের মূল অনুপ্রেরণা এসেছিল রাজনৈতিক দিক থেকে, ধর্মীয় দিক থেকে নয়। দরবেশরা গণেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তার রোষের শিকার হয়েছিলেন। অনথ্যায় সাধারণভাবে তিনি মুসলমানবিদ্বেষী ছিলেন না। *ফেরিস্তাও* স্বীকার করেছেন যে, রাজা গণেশ অনেক মুসলমানের আন্তরিক ভালবাসা অর্জন করেছিলেন। স্থাপত্যকর্মেও গণেশের আন্তরিক আগ্রহ ছিল বলে অনেক ঐতিহাসিক বিশ্বাস করেন। এঁদের মতে, গৌড় ও পাণ্ডুয়ার কয়েকটি বিখ্যাত স্থাপত্য সৃষ্টি গণেশের আমলে সম্পন্ন হয়েছিল। এ-ধরনের দুটি দৃষ্টান্ত হল—গৌড়ে 'ফতে খাঁর সমাধিভবন' এবং পাণ্ডুয়ার 'একলাখী প্রাসাদ'। গণেশ বিখ্যাত আদিনা মসজিদেরও সংস্কার করেছিলেন।

গণেশের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে হিন্দুশাসন পুনরুত্থানের সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায়। অতঃপর তাঁর বংশধররা কিছুকাল রাজত্ব করেন। তবে তাঁরা ছিলেন ধর্মান্তরিত মুসলমান।

রাজা গণেশের মৃত্যুর পর *জালালউদ্দিন* (যদু) স্বাধীনভাবে রাজত্ব শুরু করেন। তিনি সুশাসক ও ন্যায়বিচারক ছিলেন। হিন্দুদের প্রতি তিনি কিছুটা কঠোর আচরণ করেন। *বুকাননের* বিবরণী মতে, জালালউদ্দিন বহু হিন্দুকে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করেছিলেন। তাঁর তীব্র হিন্দুবিদ্বেষের অন্যতম কারণ হল—তাঁর পিতা রাজা গণেশ ধর্মান্তরিত যদুকে হিন্দুধর্মে পুনর্দীক্ষিত করেছিলেন। কিন্তু সনাতনপন্থী হিন্দুরা তাঁকে সমাজে প্রত্যাবর্তনের অধিকার দেননি। তাই ক্ষমতালাভের পর জালালউদ্দিন হিন্দুদের উপর প্রধানত ব্রাহ্মণদের উপর নির্যাতন চালান। তবে এই বিদ্বেষ যে তাঁর রাষ্ট্রচিন্তাকে আচ্ছন্ন করেনি তার প্রমাণ হল কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদে হিন্দুদের নিয়োগ। তাঁর সেনাপতি ছিলেন রাজ্যধর নামক জনৈক হিন্দু। বস্তুত যোগ্য হিন্দুকে মর্যাদা দিতে তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন না। জালালউদ্দিন পাণ্ডুয়া থেকে গৌড় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। জালালউদ্দিনের মৃত্যুর (১৪৩২-'৩৩ খ্রীঃ) পর তাঁর পুত্র সামস্উদ্দিন আহম্মদ শাহ সিংহাসনে বসেন। তাঁর কুশাসনে অতিষ্ঠ হয়ে বাংলার আমীরবর্গ সুলতানের দু'জন ক্রীতদাসের সাহায্যে তাঁকে হত্যা করেন। সামস্উদ্দিনের মৃত্যুর (১৪৪২ খ্রীঃ) সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় গণেশী-বংশের শাসনের অবসান ঘটে।

○ পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশ ঃ

গণেশীবংশীয় সামস্উদ্দিনকে হত্যা করে তাঁর দুইজন ক্রীতদাস ক্ষমতাদখলের দ্বন্দ্বে মত্ত হলে বাংলায় অরাজকতা দেখা দিয়েছিল। এই অবস্থায় দায়িত্বশীল অভিজাতগণ ইলিয়াস শাহের জনৈক পৌত্র নাসিরউদ্দিন মামুদ শাহকে সর্বসম্মতিক্রমে সিংহাসনে বসান (১৪৪২ খ্রীঃ)। এইভাবে বাংলায় ইলিয়াস বংশের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। নাসিরউদ্দিন উদার মনোভাবাপন্ন ও ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন। তাঁর আমলে বাংলায় শিল্পকলার যথেষ্ট উন্নতি হয়। তাঁর সুদীর্ঘ

শাসনকালে প্রজারা সুখে শান্তিতে বাস করতেন বলে সমকালীন গ্রন্থ থেকে জানা যায়। নাসিরউদ্দিন দু'বার চীনদেশে দূত প্রেরণ করেছিলেন।

পরবর্তী ইলিয়াস শাহী শাসকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন নাসিরউদ্দিনের পুত্র রুকনউদ্দিন বারবক শাহ (১৪৫৯-'৭৬ খ্রীঃ)। সতের বছর শাসনকালের মধ্যে শেষ দু'বছর, অর্থাৎ ১৪৭৪-'৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি নিজপুত্রের সাথে যুগ্মভাবে রাজ্যশাসন করেন। উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত জটিলতা এড়ানোর জন্যই সম্ভবত এরূপ ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল। বারবক শাহ ছিলেন সুযোদ্ধা, সুশাসক এবং শিল্প-সাহিত্যের একান্ত অনুরাগী। বহু নতুন অঞ্চল জয় করে তিনি নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। একাজে তাঁর প্রধান সহায়ক ছিলেন আরবদেশীয় সেনাপতি ইসমাইল গাজী। ফার্সী গ্রন্থ *'রিসালৎ-ই-শুহদা'* থেকে ইসমাইলের জীবনকাহিনী ও কৃতিত্বের বিবরণ জানা যায়। এতে বলা হয়েছে যে, ইসমাইল মান্দারণের বিদ্রোহী রাজা গজপতিকে পরাজিত ও নিহত করে ঐ দুর্গ দখল করেন। এক্ষেত্রে গজপতি বলতে উড়িষ্যার রাজা গজপতি কপিলেন্দ্রদেবের কোন সেনাপতিকে পরাস্ত করার কথা বলা হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। গড়মান্দারণের দক্ষিণদিকে *'উড়িয়া মর্দানা'* বা *'উড়িয়া হত্যাকারী'* নামে একটি বিশাল তোরণ আছে। সম্ভবত, ইসমাইল গাজী উড়িয়াদের বিরুদ্ধে সাফল্যের ঘটনাকে স্মরণীয় করার জন্য এই তোরণ নির্মাণ করেছিলেন। অতঃপর ইসমাইল কামরূপ রাজ্য আক্রমণ করেন। সম্ভবত এখানেই যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি পরাজিত ও নিহত হন। অন্যমতে রাজবিরোধী ষড়যন্ত্রের অভিযোগে বারবক শাহ ইসমাইলকে প্রাণদণ্ড দেন। মোল্লা তকিয়ার বয়াজ অনুসারে বারবক ত্রিহুত আক্রমণ করে হাজীপুর ও সন্নিহিত অঞ্চল দখল করেন। উত্তরে বুড়ি গণ্ডক নদী পর্যন্ত তাঁর আধিপত্য সম্প্রসারিত ছিল।

বারবক শাহ শাসক হিসেবে ধর্মীয় উদারতার পরিচয় দেন। বহু হিন্দুকে তিনি উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন বারবক শাহের চিকিৎসক অনন্ত সেন ও নারায়ণ দাস, দুর্গাধ্যক্ষ ভান্দসী রায়, অন্যতম মন্ত্রী বিশ্বাস রায় প্রমুখ। উচ্চপদস্থ কর্মচারী কুলধরকে বারবক *'সত্য খাঁ'* ও *'শুভরাজ খাঁ'* উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেছিলেন। বারবকের হিন্দু-সভাসদ্‌দের মধ্যে সুনন্দ, কেদার খাঁ, গন্ধর্ব রায়, তরুণী, সুন্দর, শ্রীবৎস, মুকুন্দ প্রমুখ ছিলেন বিশেষ ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী। মুকুন্দ ছিলেন রাজপণ্ডিত, সুন্দর ও শ্রীবৎস ছিলেন বিচারবিভাগীয় কর্মচারী। কেদার খাঁ বিশেষ প্রতিপত্তিশালী সভাসদ্‌ ছিলেন। কেবল হিন্দু নয়, রাজ্যের প্রয়োজনে তিনি বিদেশীদেরও সরকারি কাজে নিয়োজিতকরতেন। এদের মধ্যে ছিল আফগান ও আবিসিনীয় হাবসীগণ। বারবক প্রায় ৮০ হাজার হাবসী আমদানি করে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেছিলেন। অবশ্য এরাই পরে ক্ষমতা দখল করে ইলিয়াস শাহী শাসনের সমাপ্তি ঘটায়।

শিক্ষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে বরাবক শাহ খ্যাতিলাভ করেন। পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি *'অল-ফাজিল'* ও *'অল-কামিল'* উপাধিতে ভূষিত হন। তাঁর শিলালিপিতে এই দুটি উপাধির উল্লেখ আছে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের কবি ও পণ্ডিত তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সেযুগের প্রখ্যাত টীকাকার ***বৃহস্পতি মিশ্র***। তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ ***'পদচন্দ্রিকা'***। *গীতগোবিন্দ, কুমারসম্ভব, রঘুবংশ, শিশুপাল বধ* প্রভৃতি বহু গ্রন্থের টীকাকার হিসেবে তিনি খ্যাতিলাভ করেন। বারবক শাহ তাঁকে ***'পণ্ডিত সার্বভৌম'*** উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন। বিখ্যাত বাংলা কাব্য 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-এর রচয়িতা মালাধর বসুকে বারবক শাহ *'গুণরাজ*

খাঁ' উপাধি প্রদান করেন। বাংলাভাষায় রামায়ণ-এর রচয়িতা কবি কৃত্তিবাস নিজেই স্বীকার করেছেন যে, তিনি গৌড়েশ্বরের সভায় গিয়েছিলেন এবং সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। পণ্ডিতদের মতে, এই গৌড়েশ্বর ছিলেন বারবাক শাহ। জ্যোতির্বিদ বিশারদ-ও সুলতানের সাহায্যলাভে ধন্য হয়েছিলেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বারবক বহু প্রতিভাবান হিন্দুকে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করেছিলেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই প্রশাসনের সাথে সাথে সংস্কৃতি-চর্চাও করতেন ; যেমন—তাঁর সভাসদ্ গন্ধর্ব রায় ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ ও সুকণ্ঠের অধিকারী। বলা বাহুল্য যে, বারবক শাহের দরবারে বহু মুসলমান পণ্ডিত সম্মানের সাথে অবস্থান করেছিলেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন *'শরফনামা'* নামক শব্দকোষের রচয়িতা ইব্রাহিম ফারুকী। তাঁর রাজকবি হিসেবে আমীর জৈনউদ্দিন হরুই খ্যাতিবান ছিলেন। শিল্পকলার প্রতিও তাঁর যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তিনি ছিলেন প্রকৃত একজন সৌন্দর্যরসিক। তাঁর মুদ্রা ও শিলালিপিগুলির অলংকরণে সুলতানের সৌন্দর্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। বারবক শাহের প্রাসাদটিও ছিল অত্যন্ত সুন্দর। *ড. মজুমদারের* ভাষায় ঃ *"এই প্রাসাদটির মধ্যে উদ্যানের মত একটি শান্ত ও আনন্দঘন পরিবেশ বিরাজ করত, এর নিচ দিয়ে প্রবাহিত ছিল একটি পরম রমণীয় জলধারা.... ।"* গৌড়ের বিখ্যাত ও বিশাল তোরণ *'দাখিল দরওয়াজা'* বারবাক শাহের স্থাপত্যকর্মের এক অনবদ্য নিদর্শন।

পরবর্তী শাসক বারবক শাহের পুত্র সামস্উদ্দিন ইউসুফ শাহ প্রায় ছয়বছর রাজত্ব করেন। গৌড়ের বিখ্যাত *'লোটন মসজিদ'* সম্ভবত এঁর আমলে নির্মিত হয়েছিল। ইলিয়াস শাহী বংশের শেষ সুলতান ছিলেন জালালউদ্দিন ফতে শাহ (১৪৮১-'৮৭ খ্রীঃ)। সমকালীন বিভিন্ন গ্রন্থে এঁকে *'বুদ্ধিমান শাসক'* বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এঁর রাজত্বকালেই নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম হয়। ফতে শাহ অসংখ্য হাবসী আমদানি করে সরকারি কাজে নিয়োগ করে নিজের এবং রাজ্যের বিপদ ডেকে এনেছিলেন। ধীরে ধীরে হাবসীরা ক্ষমতার চূড়ায় উপস্থিত হয়ে সুলতানের কর্তৃত্বকেই অগ্রাহ্য করতে শুরু করেছিল। ফতে শাহ দুর্বিনীত বহু হাবসীকে হত্যা করে সুলতানের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলেও, তা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। ক্ষমতালোভী হাবসী প্রাসাদরক্ষীরা এক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে নিদ্রিত অবস্থায় ফতে শাহকে হত্যা করে। ফতে শাহর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে একশো আঠারো বছর ব্যাপী ইলিয়াস শাহী বংশের শাসনের অবসান ঘটে।

❂ মূল্যায়ন ঃ ইলিয়াস শাহী বংশের শাসকদের শতাধিক বছরের শাসনকালে বাংলাদেশের ইতিহাসে এক নবতম অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল বলে একাধিক ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন। এর অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে তাঁরা বাংলায় দিল্লীর কর্তৃত্বমুক্ত শাসন প্রতিষ্ঠার কাজে ইলিয়াস শাহী শাসকদের সাফল্যের কথা বলেছেন। কিন্তু দিল্লী-সুলতানির বাইরে থেকে বাংলার নিরাপত্তা রক্ষা করা এবং প্রগতির পথে এগিয়ে যাওয়া কতটা সম্ভব বা যুক্তিসঙ্গত, তা আলোচনার দাবি রাখে। আঞ্চলিক স্বাধীন শাসন কায়েম করার এই প্রবণতাকে বিচ্ছিন্নতাবাদের জনক বলা খুব অসঙ্গত হবে না। পরন্তু এই ধরনের প্রচেষ্টাই ঐক্যবদ্ধ ভারতরাষ্ট্র গঠনের কাজকে জটিল করে তুলেছিল। এজন্য মুঘলদের অপেক্ষা করতে হয়েছিল একজন আকবরের জন্য। আকবরের পক্ষেও কাজটা খুব সহজ হয়নি। তবে ইলিয়াস শাহী সুলতানদের প্রথম তিনজন শাসক ছিলেন নিঃসন্দেহে প্রতিভাবান। অন্তত বাংলাদেশের খণ্ডিত তিন অংশকে এক শাসনের অন্তর্ভুক্ত করে

তাঁরা বাংলার ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। লক্ষ্মণাবতীর নেতৃত্বে সাতগাঁও একত্রিত হওয়ার ফলে রাজ্যের সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হয়েছিল। পরন্তু বিহার, উড়িষ্যা, অসম অঞ্চলে কর্তৃত্ব সম্প্রসারিত করে তাঁরা বাংলার শক্তি বৃদ্ধি করতে পেরেছিলেন।

ভাষা-সাহিত্যের বিকাশের ক্ষেত্রে ইলিয়াস শাহী শাসকদের অবদান অবশ্যই প্রশংসনীয়। একাজে সর্বাধিক অগ্রণী দু'জন শাসক ছিলেন গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ এবং রুকন্‌উদ্দিন বারবক শাহ। এঁরা ব্যক্তিগতভাবে সাহিত্যসাধক ছিলেন। কাব্য-প্রতিভার নিদর্শন এঁরা রেখে গেছেন। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে কবি-সাহিত্যিকদের প্রতি এঁদের শ্রদ্ধা ও পৃষ্ঠপোষণ বাংলার সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে জোয়ার নিয়ে এসেছে। তুর্কী আক্রমণের পূর্বে গৌড়বঙ্গে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা বা দরবারী ভাষা হিসেবে প্রাধান্য পেয়েছিল সংস্কৃত ভাষা। কিন্তু তুর্কী শাসকেরা বাংলায় বসবাসের সূত্রে বাংলা ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হন। ড. ***দীনেশচন্দ্র সেনের*** মতে, বাংলাভাষা তুর্কী শাসকগোষ্ঠীর কাছে একপ্রকার মাতৃভাষার সমাদর পেয়েছিল। ড. ***সেন*** তাঁর *'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'* শীর্ষক গ্রন্থে লিখেছেন, *"মুসলমানগণ ইরান, তুরান প্রভৃতি যে স্থান হইতেই আসুন না কেন, এদেশে আসিয়া সম্পূর্ণরূপে বাঙালী হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা হিন্দু প্রজামণ্ডলী পরিবৃত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। মসজিদের পার্শ্বে দেবমন্দিরের ঘণ্টা বাজিতে লাগিল ; মহরম, ঈদ্, সবেবরাত প্রভৃতির পার্শ্বে দুর্গোৎসব, রাস, দোলোৎসব প্রভৃতি চলিতে লাগিল। রামায়ণ, মহাভারতের অপূর্ব প্রভাব মুসলমান সম্রাটগণ লক্ষ্য করিলেন। এদিকে দীর্ঘকাল এদেশে বাসনিবন্ধন বাঙ্গালা তাঁহাদের একরূপ মাতৃভাষা হইয়া পড়িল।"* রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি সংস্কৃত ভাষায় রচিত মহাকাব্যকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করার কাজে ইলিয়াস শাহী সুলতানদের আন্তরিক প্রয়াসকে তাঁদের বঙ্গভাষা প্রীতির নিদর্শন রূপে উপস্থাপিত করা যায়। গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ, বারবক প্রমুখের আন্তরিক পৃষ্ঠপোষকতার ফলে চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে বাংলা ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে যে জোয়ার এসেছিল, তা সত্যই প্রশংসার।

শিল্প-স্থাপত্যের অনুরাগী হিসেবেও ইলিয়াস শাহী বংশের একাধিক শাসক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এ ব্যাপারে ইলিয়াস শাহ, সিকন্দর শাহ, আজম শাহ এবং বারবক শাহের রাজত্বকাল উল্লেখযোগ্য। এইসব নিদর্শনের অনেকগুলিই কালের করাল গ্রাসে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। যে কয়েকটি মসজিদ, প্রাসাদ বা দুর্গ আজো দাঁড়িয়ে আছে, তা-ই বাংলার শিল্পীমনের পরিচয় বহন করার পক্ষে কম নয়। পাণ্ডুয়ার *'আদিনা মসজিদ'* লক্ষ্মণাবতীর *'লোটন মসজিদ'*, বাইশ দরওয়াজা মসজিদ প্রভৃতির গঠনশৈলী, অলংকরণ ইত্যাদি শিল্প-সমালোচকদের প্রশংসা অর্জন করেছে। এই সকল স্থাপত্যকর্মে এক নতুন শিল্পরীতির বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। ইট ও পাথরের সমন্বয়ে ছোট ছোট স্তম্ভযুক্ত গম্বুজ এবং হিন্দুমন্দির ও আটচালার আদলে মসজিদ ও অট্টালিকা নির্মাণের রীতি এই পর্বে গৃহীত ও বাস্তবায়িত হয়েছিল। আদিনা মসজিদের নির্মাণশৈলীতে এই রীতির প্রকাশ ঘটেছে।

○ বাংলায় আবিসিনীয় বা হাবসী শাসন ঃ

বাংলাদেশের রাজনৈতিক মঞ্চে আবিসিনীয়দের উত্থান যেমন আকস্মিক, তেমনি তাদের পতনও ছিল আকস্মিক। ১৪৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ইলিয়াস শাহের বংশধর সুলতান জালালউদ্দিন ফতে

শাহ-র মৃত্যুর সুযোগে বাংলার রাজনৈতিক ক্ষমতা আবিসিনীয় হাবসী ক্রীতদাসদের হস্তগত হয়। ১৪৮৭ থেকে ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ছয় বছর বাংলার শাসনক্ষমতা হাবসীদের হস্তগত ছিল। এই ছয় বছরে চারজন হাবসী বাংলার শাসন পরিচালনা করেছিলেন। এই শাসনকালের চরিত্র বিচার করে পণ্ডিতেরা আলোচ্য কালকে বাংলায় *'অন্ধকার যুগ'* বা *'Dark Age'* বলে বর্ণনা করেছেন।

ফেরিস্তার বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ইলিয়াস শাহীবংশীয় শাসক রুকনউদ্দিন বারবক-এর আমলে আবিসিনীয় হাবসী ক্রীতদাসের সংখ্যা দারুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাঁর অধীনে হাবসী ক্রীতদাস ছিল প্রায় ৮ হাজার। এদের তিনি সামরিক-বাহিনীর বিভিন্ন পদে নিয়োগ করেন। রাজ-প্রাসাদের নিরাপত্তার দায়িত্বও অর্পিত ছিল এই হাবসীদের হাতে। বিদেশী ক্রীতদাসদের উপর বারবক শাহ-র এত নির্ভরতার কারণ খুব স্পষ্ট নয়। ফেরিস্তার ধারণা, বারবক সম্ভবত পুরাতন অভিজাতদের ক্ষমতা খর্ব করে নতুন এক অভিজাতমণ্ডলী গড়তে চেয়েছিলেন। হাবসী ক্রীতদাসদের আনুগত্যের উপর তাঁর গভীর আস্থা ছিল। এদের সমর্থনের উপর দাঁড়িয়ে তিনি নিজের ক্ষমতা সর্বময় করার স্বপ্ন দেখছিলেন। পরবর্তী সুলতান সামস্‌উদ্দিন ইউসুফ-এর আমলেও (১৪৭৪-'৮১ খ্রীঃ) হাবসী ক্রীতদাসদের ক্ষমতা অব্যাহত ছিল। ইউসুফও হাবসীদের তোষণ করে নিজ-কর্তৃত্ব সুদৃঢ় করতে সচেষ্ট ছিলেন। সামস্‌উদ্দিনের মৃত্যুর সময় রাজ্যের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ও বে-সামরিক বিভাগে হাবসীদের কর্তৃত্ব কায়েম হয়েছিল। বাংলাদেশের রাজনীতিতে স্থাপিত হয়েছিল আবিসিনীয়দের সর্বময় কর্তৃত্ব। প্রতিটি ক্ষেত্রে শুরু হয়েছিল তাদের সদম্ভ পদচারণা। অথচ এদের কোন রাজতান্ত্রিক ঐতিহ্য ছিল না। শিক্ষা-দীক্ষারও যথেষ্ট অভাব ছিল। রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি এদের সাধারণ বোধবুদ্ধিকেও গ্রাস করেছিল। প্রতি মুহূর্তে এরা স্বপ্ন দেখছিল আরো বেশি ক্ষমতা, আরো বেশি প্রতিপত্তির। অর্থ-সম্পদের লালসা এই রুক্ষ হাবসীদের মনের কোমল অনুভূতিগুলিকে সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস করেছিল। তাই দিনে দিনে এদের আচরণের মধ্যে ঔদ্ধত্য ও নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পাচ্ছিল নির্লজ্জ ভাবে। ক্ষমতাগর্বে এইসব ক্রীতদাস উন্মাদের মত আচরণ করতে থাকে। ড. *হবিবুল্লাহ (Dr. Habibullah)*-এর ভাষায়ঃ "*Power made them arrogant and like the Turks in the employment of the later Abbaside Caliphs, they behaved with the citizen with increasing violence.*"

উদার ও শিক্ষিত সুলতান জালালউদ্দিনের কাছে আবিসিনীয়দের ঔদ্ধত্য এবং অসভ্য আচরণ সহ্য করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এমতাবস্থায় তিনি ক্রীতদাসদের ক্ষমতা খর্ব করে তাদের নিয়ন্ত্রণে আনার উদ্যোগ নেন। জালালউদ্দিনের এহেন মনোভাব ক্রীতদাসদের ক্রুদ্ধ করে তোলে। তাছাড়া অন্যান্য সুলতান-বিরোধী কিছু সাধারণ কর্মচারীও ক্রীতদাসদের সাথে হাত মেলায়। প্রাসাদরক্ষী ও পাইকদের (Paiks) অধ্যক্ষ সুলতান শাহজাদা-র নেতৃত্ব আবিসিনীয় গোষ্ঠী এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তারা সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। এদিকে জালালউদ্দিনের অনুগত ক্রীতদাস তথা সৈন্যাধ্যক্ষ মালিক আনদিল রাজ্যজয়ের জন্য রাজধানীর বাইরে গেলে সেই সুযোগে সুলতান শাহজাদা জালালউদ্দিন ফত্‌-কে হত্যা করে (১৪৮৭ খ্রীঃ) ইলিয়াস শাহী শাসনের অবসান ঘটান এবং বাংলাদেশে আবিসিনীয় হাবসীদের শাসনের সূচনা করেন। *ব্লকম্যান (Blockman)*-এর

ভাষায় ঃ *"from protectors of the dynasty, the Abyssinians became master to the kingdom."*

বস্তুত, সুলতান বারবক শাহ্-র অদূরদর্শী নীতির পরিণতি হচ্ছে ফতেশাহ্-র হত্যাকাণ্ড এবং হাবসী শাসনের সূচনা। তিনি অন্ধের মত সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে আবিসিনীয় ক্রীতদাসদের বসিয়ে তাদের লোভ ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছেন। আভিজাত্যহীন বা ঐতিহ্যশূন্য কোন একটি গোষ্ঠীর পক্ষে অতঃপর চূড়ান্ত ক্ষমতা দখল করাটা ছিল খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। আবার পুরাতন অভিজাত সম্প্রদায়ের অস্তিত্বহীনতার ফলে, যার জন্যও বারবক শাহ্-র ভ্রান্ত নীতি সম্পূর্ণ দায়ী, বহিরাগত ক্রীতদাস তথা প্রাসাদরক্ষীদের এত বড় ঔদ্ধত্য প্রায় প্রতিবাদহীনই থেকে যায়। ড. *হবিব উল্লাহ* যথার্থই লিখেছেন ঃ *"This blind policy (of Barbak) had resulted in destroying the old nobility is shown by the utter lack of opposition...."*

পাইকদের সমর্থনপুষ্ট হয়ে শাহজাদা বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। এবং তাঁর নতুন নাম হয় বারবক্ শাহ। তাঁর রাজত্বকালের স্থায়িত্ব সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি। ঐতিহাসিক *গোলাম হোসেন সেলিম* 'Buchman' -এর বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে লিখেছেন ঃ হাবসী বারবক্ সম্ভবত ছয় মাস রাজত্ব করেছিলেন। একদল নীচ-বংশোদ্ভূত কর্মীগোষ্ঠীর সাহায্যে তিনি শাসন শুরু করেন। প্রথমে তিনি সুপরিকল্পিত ভাবে বিরোধী মনোভাবাপন্ন কর্মচারীদের ক্ষমতাচ্যুত করেন। বারবকের নাতিদীর্ঘ শাসনকালে কোন উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গৃহীত হয়নি। এবং তাঁর কুশাসনে দেশে অরাজকতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইতিমধ্যে ইলিয়াস শাহী রাজবংশের প্রতি অনুগত হাবসী সেনাপতি মালিক আনদিল রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলে বারবক কিছুটা শঙ্কিত হয়ে পড়েন। যাই হোক্, জাতির দোহাই দিয়ে তিনি আনদিলকে এই শপথ করিয়ে নেন, যে বারবক্, যতদিন সিংহাসনে আসীন থাকবেন, ততদিন আন্দিল তাঁর কোন ক্ষতির চেষ্টা করবেন না। কিন্তু প্রভুর প্রতি আন্দিলের আনুগত্য ছিল প্রশ্নহীন। তাই তিনি কিছুদিনের মধ্যেই বহু পাইককে নিজপক্ষে আনতে সক্ষম হন এবং সুযোগ পাওয়ামাত্র বারবক্‌কে হত্যা করেন।

আন্দিল প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত বাংলার সিংহাসনে বসার জন্য সুলতান ফতে শাহ্-র নাবালক পুত্রের নাম প্রস্তাব করেন। কিন্তু ফতে শাহ্-র বিধবা পত্নী সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে মসনদে বসার জন্য আন্দিলকেই অনুরোধ করেন। অধিকাংশ রাজকর্মচারীও এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। অতঃপর আন্দিল 'সৈফুদ্দিন ফিরুজ' নাম নিয়ে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৪৮৭-'৯০ খ্রীঃ) আবিসিনীয়দের অপদার্থ শাসনব্যবস্থা বাংলার ইতিহাসে যে 'অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগের' প্রবর্তন করেছিল, তার মধ্যে একমাত্র ফিরুজের শাসনাধীন তিন বছর কিছুটা আশার সঞ্চার করতে পেরেছিল। সেনাপতি হিসেবে তিনি ছিলেন যেমন দক্ষ, তেমনি শাসক হিসেবেও ছিলেন প্রজাদরদী। গোলাম হোসেন সেলিমের বক্তব্য অনুসারে হাবসী ফিরুজ দীন-দরিদ্রের প্রতি আন্তরিক ছিলেন এবং তাঁর খাজাঞ্চিখানা দরিদ্রদের সেবায় সদা উন্মুক্ত থাকত। ইলিয়াস শাহী বংশের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা ছিল বলে পূর্বতন রাজবংশের সমর্থকগণও ফিরুজের বিরোধিতা করেননি। ফলে অন্যান্যদের তুলনায় কিছুটা জাতীয় উদ্যোগও তিনি নেন। উত্তর ময়মনসিংহের শেরপুর নামক স্থানে প্রাপ্ত ফিরুজের মুদ্রা থেকে অনুমান করা হয় যে, ঐ অঞ্চলে তাঁর আধিপত্য

বিস্তৃত হয়েছিল। শিল্প-স্থাপত্যেও তাঁর অনুরাগ ছিল। গৌড়ে এখনও তাঁর রাজত্বের স্মৃতি ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছে 'ফিরুজ মিনার'। যোগ্যতা থাকলেও ফিরুজের রাজত্ব দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি মূলত স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রের ফলে। তখন পাইকরাই পরিণত হয়েছিল রাজস্রষ্টা-তে (king makers)। তারা এক চক্রান্ত করে ফিরুজকে হত্যা করলে আবিসিনীয় শাসনের শেষ আলোকরশ্মিটুকু মুছে যায়।

ফিরুজের মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন মাসুদ। তাবাকৎ-ই-আকবরীর মতে, তাঁর রাজত্বকাল স্থায়ী হয়েছিল মাত্র এক বছর (১৪৯০-'৯১ খ্রীঃ)। মামুদের পিতৃ-পরিচয় সম্পর্কে মতভেদ আছে। 'তাবাকৎ' গ্রন্থের উপর নির্ভর করে *সেলিম* বলেছেন ঃ মামুদ ছিলেন ফিরুজের পুত্র। কিন্তু ফিরিস্তার মতে, মামুদ ছিলেন ইলিয়াস শাহী সুলতান ফত্ শাহ-র পুত্র। যাই হোক, মামুদের কোন মুদ্রাতে তাঁর পিতৃপরিচয় সম্পর্কে কোন উল্লেখ পাওয়া যায়নি। ফলে বিষয়টি তর্কাধীন থেকে গেছে।

মামুদের সিংহাসনারোহণের সাথে সাথে আবার বাংলার ভাগ্যাকাশে দুর্দিন ঘনিয়ে আসে। অল্পবয়স্ক হবার জন্য সুলতান হলেও প্রকৃত শাসনক্ষমতা তাঁর হাতে ছিল না। মামুদের প্রতিনিধিস্বরূপ শাসন পরিচালনার দায়িত্ব ছিল হবস্ খান নামক জনৈক ব্যক্তির উপর। *আরিফ কান্দহারীর* মতে, হবস্ খান ছিলেন মামুদের গৃহশিক্ষক। যাই হোক, হবস্ খান কিছুদিনের মধ্যেই অপর এক হাবসী আমীর সিদি বদর কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত হন। সিদি বদর ছিলেন উচ্চাকাঙক্ষী ও বিকৃতমস্তিষ্ক। তিনি প্রতিনিধিত্বের পরিবর্তে নিজেই সিংহাসনে বসার পরিকল্পনা করেন এবং ক্ষমতালোভী, অস্থিরমতি পাইকদের হাত করে ১৪৯১ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। বর্ধমান জেলার কালনায় প্রাপ্ত মুদ্রা থেকে মনে করা হয় যে, মামুদের স্বল্পকালীন রাজত্বেও উড়িষ্যার দিকে বিজয়-অভিযান অব্যাহত ছিল।

সিদি বদর ১৪৯১ খ্রীষ্টাব্দে 'সামস্উদ্দিন মুজফ্ফর' নাম নিয়ে বাংলার সিংহাসনে বসেন। তাঁর তিন বছরের রাজত্বকাল ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন, আবিসিনীয় শাসনের অন্ধকারময় সময়। ***হবিবউল্লাহ্-র*** ভাষায় ঃ "*....his rule was a fitting climex to the infamous Abyssinian epoch in Bengal, for his was a perfect reign of terror.*" তাঁর রাজত্বের তিন বছর জুড়ে দেশে চলেছিল অবাধ হত্যা ও শোষণ। সিংহাসনকে বিপদমুক্ত করার মানসে তিনি নির্বিচারে প্রতিভাবান আমীর, কর্মচারী ও বিদগ্ধ ব্যক্তিদের হত্যা করেছিলেন। এক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমান কোন সম্প্রদায়ের মানুষই রেহাই পায়নি। সাধারণ গরীব প্রজাদের উপর শুরু হয় অতিরিক্ত খাজনা আদায়ের জুলুম। এমনকি সেনাবাহিনীর বেতনও তিনি অনেক হ্রাস করেছিলেন। এইভাবে একদিকে দেশের সমস্ত শ্রেণীর মানুষকে ক্ষুব্ধ করে তোলেন এবং সেনাবাহিনীকে চটিয়ে নিজের শক্তি নিজেই ক্ষয় করেন। একসময় তাঁর অত্যাচার সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে যায়। অবশ্য এসব কাজে সুলতানের প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন তাঁর উজীর সৈয়দ হুসেন। কিন্তু দেশব্যাপী যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল, তা হুসেনের দৃষ্টি এড়ায়নি। তাই তিনি মুজফ্ফরের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ দেশবাসীর নেতৃত্ব করাকেই শ্রেয় মনে করেন। এমতাবস্থায় মুজফ্ফর তাঁর অনুগামীদের নিয়ে এক সুরক্ষিত দুর্গে আত্মগোপন করেন। সৈয়দ হুসেনের নেতৃত্বে বিক্ষোভকারীরা সেই দুর্গ অবরোধ করে। এই অবরোধ ও সংঘর্ষ চলে প্রায় চার মাস ধরে। উভয়পক্ষে মিলিয়ে নিহত হয় প্রায় কুড়ি

হাজার মানুষ। শেষ পর্যন্ত এক গুপ্তঘাতকের হাতে মুজফ্ফর নিহত হলে (১৪৯৩ খ্রীঃ) কুখ্যাত আবিসিনীয় শাসনের অবসান ঘটে। অতঃপর সৈয়দ হুসেন *'আলাউদ্দিন হুসেন শাহ'* উপাধি নিয়ে বাংলার সিংহাসনে বসেন এবং শুরু হয় হুসেন শাহী বংশের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়।

বাংলাদেশে আবিসিনীয় হাবসী ক্রীতদাসদের ছয় বছরের শাসন ছিল এক দুঃস্বপ্নের মত। বহিরাগত আবিসিনীয়দের না-ছিল রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, না-ছিল বংশগত কোন ঐতিহ্য। সামান্য প্রাসাদরক্ষী থেকে সিংহাসনে আরোহণ করলেও রাজ্যের ভার-বহনের ক্ষমতা এদের ছিল না। সৈফুদ্দিন ফিরুজ ব্যতীত প্রত্যেক শাসকই ছিলেন হীনমনা, অত্যাচারী ও ক্ষমতালোভী। বাংলাদেশের প্রতি এঁদের কোন দরদ থাকা ছিল অসম্ভব ব্যাপার। অল্পকালের মধ্যে ঘন ঘন শাসক পরিবর্তন এবং অভ্যন্তরীণ চক্রান্তে রাজতন্ত্রের ভিতটাকেই দুর্বল করে দিয়েছিল। সিদি বদর, যিনি সাধারণভাবে *'উন্মাদ'* (দিওয়ানা) বলে খ্যাত ছিলেন, তাঁর রাজত্বকালে অরাজকতা ও অত্যাচার চরমে পৌঁছেছিল। রুদ্ধ হয়ে পড়েছিল দেশের অগ্রগতি। তাই ড. ***হবিব উল্লাহ*** বলেছেন : *"The Habsi interregnum had violently arrested her (Bengal's) social progress and weakened her military prestige.......threatened to destroy monarchy itself so that Bengal became the target of contemporary satire."*

○ হুসেন শাহী বংশ (১৪৯৩-১৫৩৮ খ্রীঃ)

✪ আলাউদ্দিন হুসেন শাহ : ১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ আলাউদ্দিন হুসেন শাহ ও তাঁর বংশধরদের শাসনকাল ইতিহাসে হুসেন শাহী বংশের আমল হিসেবে পরিচিত। হুসেনশাহী সুলতানের আমলেও বাংলাদেশ তাঁর রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও আর্থ-সামাজিক প্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে সক্ষম ছিল। হুসেন শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা আলাউদ্দিন হুসেন-এর প্রকৃত পরিচয় ও পূর্ব-ইতিহাস অনেকটাই অনুমাননির্ভর। মুদ্রা, শিলালিপির সাক্ষ্য থেকে মনে হয় যে, তিনি আরব বা তুর্কীস্থানের সৈয়দ বংশের সন্তান। *'রিয়াজ-উস্-সালাতিন'* গ্রন্থের বিবরণ মতে, হুসেন পিতার সাথে বাংলায় আসেন এবং মুর্শিদাবাদের চাঁদপাড়া গ্রামে বসবাস করতে থাকেন। এই অঞ্চলে সুলতান হুসেন শাহ-র বহু লিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। অন্য মতে, হুসেন বহিরাগত নন, বাংলারই সন্তান। *বুকানন*-এর মতে, হুসেন রংপুর জেলার অন্তর্গত দেবনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। হুসেন শাহের মাতা যে হিন্দু ছিলেন এমন কিংবদন্তীও প্রচলিত আছে। বাবরের আত্মজীবনীতে হুসেনের পুত্র নসরৎ শাহকে 'বাঙালী' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কোন কোন চৈতন্য-জীবনী গ্রন্থে হুসেনের দেহ 'কৃষ্ণবর্ণ' ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই সকল মতামতের ভিত্তিতে ড. *রমেশচন্দ্র মজুমদার* মনে করেন যে, হুসেন শাহ বিদেশী নয়, বাঙালী ছিলেন। বহু পূর্বে বাংলাদেশে আগত কোন এক সৈয়দবংশে সম্ভবত তাঁর জন্ম হয়েছিল।

'তবকৎ-ই-আকবরী', *'রিয়াজ-উস্-সালাতিন'*, *'বাবরনামা'* প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সিংহাসনলাভের পূর্বে সৈয়দ হুসেন বাংলার হাবসী সুলতান মুজফ্ফর শাহের উজির ছিলেন। শাসক হিসেবে মুজফ্ফর ছিলেন ভীষণ অত্যাচারী। উজীর হিসেবে হুসেন শাহ দ্বৈত ভূমিকা পালন করেন। একদিকে তিনি সুলতানের শোষণমূলক কাজকর্মে মদত দেন, অন্যদিকে বিক্ষুব্ধ অভিজাতদের কাছে সুলতানের আচরণের বিরূপ সমালোচনা করেন। নিন্দনীয় হলেও এরূপ

আচরণ দ্বারা তিনি মুজফফ্‌র শাহের বিরোধীদের আস্থা অর্জন করেন এবং বিদ্রোহী পাইকদের (পদাতিক) সহায়তায় সুলতানকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করেন। *ফেরিস্তার* মতে, হুসেন শাহ প্রভুহন্তা ছিলেন না। মুজফ্‌ফরের মৃত্যুর পর রাজ্যে যে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টি হয়েছিল, তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য হিন্দু-মুসলমান সান্তরা তাঁকে সিংহাসনে বসার অনুরোধ করেছিলেন। অতঃপর তিনি সিংহাসনে বসে *'আলাউদ্দিন হুসেন শাহ'* নাম নিয়ে শাসন শুরু করেন।

প্রশাসক হিসেবে হুসেন শাহ বিচক্ষণতা ও দৃঢ়তার পরিচয় দেন। 'রিয়াজ' গ্রন্থ ও ফেরিস্তার বিবরণ থেকে জানা যায় যে, হুসেন শাহ রাজ্যের প্রভাবশালী অমাত্যদের সমর্থন না-পাওয়ার জন্য এক চুক্তি দ্বারা মাটির উপরের সমস্ত ধনসম্পত্তির উপর অমাত্যদের এবং মাটির নিচে সঞ্চিত সম্পদের উপর সুলতানের অধিকার স্বীকার করে নিয়েছিলেন। সন্ধি অনুযায়ী অমাত্য ও তাদের সহযোগী পাইকরা গৌড়ের ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন করতে থাকেন। কিছুদিনের মধ্যেই তাদের আচার-আচরণ সুলতানের মর্যাদা ও দায়িত্ববোধকে আহত করে। ফলে হুসেন শাহ প্রথমে এই লুঠতরাজ বন্ধ করার অনুরোধ জানান। কিন্তু সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হলে তিনি কঠোর হাতে লুণ্ঠনকারীদের দমন করেন। প্রায় বার হাজার লুঠেরাকে তিনি হত্যা করেন। লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি পুনরুদ্ধার করেন। এই সময় তিনি প্রায় ১৩ শত সোনার থালা ও বহু ধনসম্পদ লাভ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তখন উচ্চবিত্ত লোকেরা সোনার থালাতেই খাওয়াদাওয়া করতে অভ্যস্ত ছিলেন। যাই হোক্, ক্রূর কূটনীতি ও হীন চাতুরি দ্বারা ক্ষমতা দখল করলেও হুসেন শাহ সত্বর রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপন করে কৃতিত্বের পরিচয় দেন। বিচক্ষণ হুসেন শাহ দ্রুততা ও কঠোরতার সাথে পাইকদের দলকে ভেঙে দেন এবং প্রাসাদরক্ষার কাজে নতুন রক্ষীদল নিযুক্ত করেন। বিশৃঙ্খলার উপর উৎস হাবসীদের তিনি বাংলা থেকে বিতাড়িত করেন। এরা গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যে গিয়ে আশ্রয় নেন। বিভিন্ন সরকারি পদে ক্ষমতাসম্পন্ন সৈয়দ, মুঘল ও আফগানদের নিযুক্ত করে তিনি প্রশাসন যন্ত্রকে গতিশীল করে তোলেন।

হুসেন শাহকে রাজত্বকালের অধিকাংশ সময় যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকতে হয়েছিল। রাজত্বের প্রথম থেকেই তিনি মুদ্রায় নিজেকে *'কামরূপ-কামতা-জাজনগর-উড়িষ্যা-বিজয়ী'* বলে অভিহিত করে এই সকল রাজ্যজয়ে উদ্যোগী হন। 'রিয়াজ, বুকাননের বিবরণ, 'অসম বুরঞ্জী' অনুসারে অনুমিত হয় যে, হুসেন শাহ কামতাপুর ও কামরূপ রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে প্রাথমিক সাফল্য পেয়েছিলেন। কয়েক বছরের চেষ্টায় কামতাপুর (কোচরাজ্য) ও কামরূপ (পশ্চিম অসম) তিনি সম্পূর্ণ দখল করেন। তবে এই সকল স্থায়িভাবে বাংলার শাসনাধীনে এসেছিল কিনা, তা সঠিক ভাবে বলা যায় না। শিহাবউদ্দিন তালিশ রচিত *'তারিখ-ফতে-ই-আসাম'* গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, হুসেন শাহ আসাম রাজ্য দখল করে নিজ-পুত্রকে সেখানকার শাসক নিযুক্ত করেছিলেন। গোলাম হোসেন (রিয়াজ-উস্-সালাতিন) এই বক্তব্য সমর্থন করেছেন। এই বিজয়ের শেষ পরিণতি হুসেন শাহের পক্ষে শুভ হয়নি। শেষ পর্যন্ত অসম-যুদ্ধে বাংলার সুলতান শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছিলেন। হুসেন শাহ উড়িষ্যারাজ্যের সাথেও দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। তবে এই যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে পরস্পরবিরোধী মত পাওয়া যায়। 'রিয়াজ' ও ত্রিপুরার 'রাজামালা'র সাক্ষ্য অনুযায়ী উড়িষ্যার বিরুদ্ধে হুসেন শাহ বিজয়ী হয়েছিলেন। অন্যদিকে

বৈষ্ণবগ্রন্থ *'ভক্তিভাগবত'*, উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্রের *'সরস্বতী বিলাসম্'* ও পুরীর জগন্নাথ-মন্দিরের *'মাদলাপাঞ্জী'*র মতে, উড়িষ্যার প্রতাপরুদ্রই বাংলার সুলতান হুসেন শাহকে পরাজিত করেছিলেন। যাই হোক্, একথা ঠিক যে, (১) হুসেন শাহের সাথে উড়িষ্যারাজ্যের যুদ্ধ হয়েছিল এবং (২) এই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে কোন পক্ষই স্থায়ী ফল লাভ করতে পারেনি। তবে এই আক্রমণকালে হুসেন শাহ যে পুরীর জগন্নাথ-মন্দিরসহ উড়িষ্যার বহু মন্দির ও দেবমূর্তি (জগন্নাথদেবের মূর্তি ছাড়া) ধ্বংস করেছিলেন, তা একাধিক চৈতন্যচরিত গ্রন্থে ও মাদলাপঞ্জীতে উল্লেখ করা হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যের সাথেও হুসেন শাহ সংঘর্ষে লিপ্ত হন। সম্ভবত, ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই হুসেন শাহ ত্রিপুরার অংশবিশেষ জয় করতে পেরেছিলেন। ত্রিপুরার রাজবংশের ইতিবৃত্ত 'রাজমালা'র সাক্ষ্য অনুসারে হুসেন শাহ্ ত্রিপুরার বিরুদ্ধে প্রাথমিক সাফল্য পেলেও শেষ পর্যন্ত ত্রিপুরা-বাহিনীর হাতে সুলতানি-বাহিনীর প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়েছিল। অন্যদিকে হুসেন শাহের লিপি, কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারত প্রভৃতি থেকে হুসেন শাহের সাফল্যের বিবরণ পাওয়া যায়।

ছোটখাট আরো বহু সংঘর্ষে হুসেন শাহ লিপ্ত হয়েছিলেন। আরকানীদের বিতাড়িত করে তিনি চট্টগ্রাম পুনর্দখল করেন। ত্রিহুতের একাংশ সমেত বর্তমান বিহারের কতকাংশ তিনি বাংলার শাসনাধীনে আনতে সক্ষম হন। পাটনা ও মুঙ্গেরে তাঁর শিলালিপি পাওয়া গেছে। পর্তুগীজ বণিকদের বিরুদ্ধেও হুসেন শাহ্ সফল প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তাঁর শাসনকালেই বাংলাদেশে পর্তুগীজ বণিকরা প্রথম প্রবেশ করে। এদের উদ্দেশ্য ছিল চট্টগ্রামে কুঠি নির্মাণ করে বাণিজ্য চালানো। কিন্তু পর্তুগীজদের উচ্চাশা এবং অন্যায়ভাবে ক্ষমতাবিস্তারের প্রবণতা সম্পর্কে সুলতান অবহিত ছিলেন। তাই তিনি প্রথম থেকেই পর্তুগীজদের সাথে কঠোর ব্যবহার করেন এবং বাংলার মাটি থেকে তাদের বিতাড়িত করেন। হুসেন শাহ্ একবার দিল্লীর সুলতানের মুখোমুখি হয়েছিলেন। জৌনপুরের বিতাড়িত শাসক হুসেন শার্কীর সাথে দিল্লীর সুলতান সিকন্দর লোদীর বিরোধের সূত্রে হুসেন শার্কী বাংলার সুলতানের সাহায্যপ্রার্থী হলে দিল্লীর সাথে বাংলার সংঘর্ষ-সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। বিহারের 'বাঢ়' নামক স্থানে উভয়পক্ষের বাহিনী পরস্পরের মুখোমুখি হয়। অবশ্য শেষ পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে এক সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। দিল্লীর সুলতান হুসেন শাহের সাথে সমতার ভিত্তিতে চুক্তি স্বাক্ষর করলে হুসেন শাহের মর্যাদা নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পায়।

হুসেন শাহ বাংলার রাজধানী গৌড় থেকে নিকটবর্তী একডালায় স্থানান্তরিত করেন। সম্ভবত, একডালার অধিক নিরাপত্তা এবং ক্রমাগত লুণ্ঠনের ফলে গৌড় নগরীর শ্রীহীন হয়ে পড়ার পরিপ্রেক্ষিতে হুসেন শাহ রাজধানী স্থানান্তরের কথা চিন্তা করেন। ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে হুসেন শাহ মারা যান।

মধ্যযুগের বাংলায় হুসেন শাহ মর্যাদাপূর্ণ ও বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। তাঁর শাসনকালকে 'বাংলার ইতিহাসে এক গৌরবদীপ্ত অধ্যায়' বলে অনেকেই মনে করেন। যোদ্ধা, শাসক এবং শিক্ষা-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে তিনি যথেষ্ট দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন। এক অনিশ্চিত ও অস্থির পরিস্থিতিতে তিনি বাংলার সিংহাসনে বসেন। তাঁর পূর্ববর্তী কয়েকজন শাসক পরপর আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছিল। ফলে রাজ্যজুড়ে দেখা দিয়েছিল অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা। উচ্চাকাঙ্ক্ষী হাবসী কর্মচারী, ক্ষমতালোভী পাইকদল এবং সুযোগসন্ধানী অভিজাত

ও সামন্তবর্গের গোষ্ঠী-স্বার্থ পূরণের অসুস্থ প্রতিযোগিতার মাঝে হুসেন শাহ সিংহাসনে বসেছিলেন। অদম্য মনোবল, একান্ত ইচ্ছা এবং দূরদর্শিতার সফল প্রয়োগের দ্বারা তিনি এই জটিল পরিস্থিতি থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করেন। দেশে কঠোর হাতে আইন-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যসীমা বৃদ্ধি করে তিনি অনন্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। বাংলাদেশের প্রায় সম্পূর্ণ অংশ এবং বিহারের একাংশ তাঁর রাজ্যভুক্ত ছিল। কামরূপ, কামতারাজ্য, উড়িষ্যা এবং ত্রিপুরার কোন কোন অংশের উপরেও তিনি সাময়িকভাবে বাংলার কর্তৃত্ব জারি করেন। চট্টগ্রাম থেকে আরাকানীদের বিতাড়িত করে এবং পর্তুগীজ বণিকদের ঘাঁটি গড়ার পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দিয়ে সুলতান হুসেন শাহ রাজ্যের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করেন। বিশাল আয়তনবিশিষ্ট এই রাজ্যে দীর্ঘ ছাব্বিশ বছর অপ্রতিহত ভাবে রাজত্ব করে তিনি প্রশাসনিক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

হুসেন শাহ দীর্ঘকাল যুদ্ধে লিপ্ত থাকলেও দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা ব্যাহত হয়নি। কারণ সব যুদ্ধই সংঘটিত হয়েছিল দেশের বাইরে। তাঁর প্রতি যে জনসাধারণের গভীর আস্থা ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া অসম্ভব নয়। সেনাবাহিনী-সহ তিনি দীর্ঘ সময় রাজ্যের বাইরে কাটালেও কদাপি তাঁর বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র হয়নি। মধ্যযুগীয় রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতাদখলের রাজনীতির যুগে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী থেকে শুরু করে প্রজাসাধারণ যে তাঁর নেতৃত্বের প্রতি অবিচল আস্থা বজায় রেখেছিলেন, এটা অবশ্যই তাঁর ব্যক্তিগত কৃতিত্বের ফল।

প্রশাসক হিসেবে হুসেন শাহ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি বহু ঐতিহাসিকের প্রশংসা অর্জন করেছে। সমকালীন মুসলমান ঐতিহাসিক ও কাহিনীকার ছাড়াও কোন কোন হিন্দু কবির রচনাতেও তাঁর নিরপেক্ষ রাজ-চরিত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। সমসাময়িক কালে বাংলায় আগত পর্যটক *ভার্থেমা* এবং *বারবোসা*-র বিবরণীতেও হুসেন শাহের প্রশংসা করা হয়েছে। উচ্চ রাজপদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সুলতান ধর্ম বা গোষ্ঠী-স্বার্থের পরিবর্তে প্রশাসনের দাবিকেই বেশি গুরুত্ব দিতেন। তাই সরকারি পদে নিয়োগের মাপকাঠি ছিল পদপ্রার্থীর যোগ্যতা ও দক্ষতা। মুসলমানদের পাশাপাশি বহু হিন্দুকেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করতেন। হুসেন শাহের উচ্চপদস্থ হিন্দু-কর্মচারীদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য দুটি নাম হলো *সনাতন গোস্বামী* ও *রূপ গোস্বামী*। এঁরা ছিলেন সহোদর ভাই। সনাতনের উপাধি ছিল *'সাকর মল্লিক'* বা *ছোট রাজা।* তিনি হুসেন শাহের মন্ত্রী, সভাসদ্ হিসেবে প্রভূত ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। ছোট ভাই রূপ ছিলেন হুসেন শাহের মন্ত্রী এবং ব্যক্তিগত সচিব (দবীর খাস)। এছাড়া বল্লভ, শ্রীকান্ত, চিরঞ্জীব সেন, মুকুন্দ, দামোদর, কেশব প্রমুখ বহু বিশিষ্ট হিন্দু হুসেন শাহের সচিব, কর্মী, চিকিৎসক হিসেবে সম্মানিত ছিলেন। প্রশাসনিক বিভাগ ও রাজকর্মচারীদের বেতনের জন্য নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের রাজস্ব বরাদ্দ ছিল।

শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক রূপেও হুসেন শাহ সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের প্রশংসা অর্জন করেছেন। শিক্ষা ও শিক্ষিত ব্যক্তির প্রতি সুলতানের গভীর শ্রদ্ধাবোধ ছিল। জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতার কাজে হুসেন শাহ ছিলেন আন্তরিক। রূপ, সনাতন, কেশব, যশোরাজ খাঁ, দামোদর প্রমুখ কবি হুসেন শাহের অমাত্য বা কর্মচারী ছিলেন। রূপ গোস্বামী সংস্কৃতে *'বিদগ্ধমাধব'* ও *'ললিতামাধব'* নামে দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। হুসেন শাহের প্রচেষ্টায় তখন বাংলাসাহিত্যের চর্চাতেও নতুন জোয়ার আসে। তাঁর সেনাপতি পরাগল খাঁর আগ্রহে পরমেশ্বর কবীন্দ্র নামক জনৈক কবি

সমগ্র-মহাভারত বাংলায় অনুবাদ করেন। বিপ্রদাস পিপিলাই, শ্রীকর নন্দী প্রমুখ সমসাময়িক কবিদের কাব্যেও হুসেন শাহের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক *যদুনাথ সরকার*-সহ কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন যে, হুসেন শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় মালাধর বসু *'শ্রীমদ্ভাগবতগীতা'*বাংলায় অনুবাদ করে *'গুণরাজ খাঁ'* উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। বাংলা সাহিত্যে নবজাগরণের পথিকৃৎ এবং ধর্মসহিষ্ণুতার প্রচারক শ্রীচৈতন্য হুসেন শাহের রাজত্বকালেই তাঁর মত ও দর্শন প্রচার করে জনজীবনে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। সুলতানের উদ্যোগে জনৈক মুসলমান পণ্ডিত *'ধনুর্বিদা'* নামে একটি পুস্তক রচনা করে তা হুসেন শাহকে উৎসর্গ করেন।

নির্মাতা হিসেবেও হুসেন শাহ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর উদ্যোগে বহু সুদৃশ্য, প্রাসাদ, মসজিদ ও ফটক নির্মিত হয়েছিল। এদের মধ্যে গৌড়ের *'গুমতি ফটক'* এবং গৌড়ের অনতিদূরে ফিরোজপুরে নির্মিত *'ছোট সোনামসজিদ'* উল্লেখযোগ্য। এদের শিল্প-সৌন্দর্য এখনো শিল্পরসিকদের বিস্মিত করে। বীরভূমের *'বাদশাহী সড়ক'* এবং *'গণ্ডক নদীর বাঁধ'* তাঁর আরো দুটি অনবদ্য সৃষ্টি। এছাড়া রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে তিনি বহু সরাইখানা ও মাদ্রাসা নির্মাণ করে পথচারী ও শিক্ষানুরাগীদের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী হুসেন শাহের সার্বিক সাফল্যের নিরিখে কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁকে "বাংলার শ্রেষ্ঠ সুলতান" বলে উল্লেখ করেছেন। *ব্লখম্যান্* (Blochman) লিখেছেন ঃ *"The name of Hussain Shah, the good, is still remembered from the frontiers of Orissa to the Brahamaputra."* এঁদের মতে, হুসেন শাহের নেতৃত্বে বাংলাদেশ ও বাঙালীজাতি চরম সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। *অধ্যাপক বি. এন. রায়* লিখেছেন ঃ *"Viewed as a whole, it may be said, without much exaggeration that under Sultan Hussain Shah Bengal enjoyed such a spell of peace, prosperity and all round progress as she had not done before under any other Sultan."*

ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ আধুনিক ঐতিহাসিকেরা সুলতান হুসেন শাহের কৃতিত্বের উপরিলিখিত মূল্যায়ন সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। প্রশ্ন হলো ঃ তাঁর সামরিক অভিযানগুলি কতটা সুফলপ্রসূ ছিল, সমকালীন সাহিত্যের উন্নতির সাথে তিনি সরাসরি কতটা জড়িত ছিলেন ; তিনি প্রকৃত অর্থে ধর্মনিরপেক্ষ ও সমদর্শী ছিলেন কিনা ইত্যাদি। এঁদের মতে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই হুসেন শাহের দুর্বলতা বা সীমাবদ্ধতা খুঁজে পাওয়া কষ্টকর নয়। *প্রথমত*, হুসেন শাহ বহু যুদ্ধ করেছেন, বহু অর্থব্যয় করেছেন অভিযান পরিচালনার জন্য। কিন্তু লক্ষণীয় যে, তিনি খুব কম যুদ্ধেই পূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চুক্তি করে তিনি সরে এসেছেন অথবা সামান্য ভূখণ্ড সাময়িকভাবে দখল করতে পেরেছেন। বস্তুত, যুদ্ধে তিনি যে পরিমাণ সময়, শক্তি ও অর্থব্যয় করেছেন লাভ করেছেন তার তুলনায় খুবই কম। *দ্বিতীয়ত*, তাঁর আমলে বাংলাসাহিত্যের চর্চা বাড়লেও সেই কাজের সাথে সুলতানের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল খুবই কম। সমকালীন কবি-সাহিত্যিকদের কাব্যসৃষ্টির মূলে হুসেন শাহের অনুপ্রেরণা ছিল সামান্যই। এঁদের অনেকের সাথে সুলতানের সাক্ষাৎ-পরিচয়ও ছিল না। হুসেন শাহ কোন কবি বা পণ্ডিতকে কোন উপাধি দেননি। মালাধর বসুর সাথে তাঁর নামটি ভ্রমবশত যোগ করা হয়েছে। বৃন্দাবন দাসের *'চৈতন্য-ভাগবত'*-এ বলা হয়েছে, *'না করে পাণ্ডিত্যচর্চা রাজা সে যবন।'* হুসেন শাহ শিক্ষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষণ

করলে সম্ভবত এ ধরনের কথা লেখা হত না। ড. *মজুমদারের* মতে, বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসের কোন পর্বকে 'হোসেন শাহী আমল' বলার সার্থকতা নেই। কারণ তাঁর আমলে মাত্র কয়েকটি বাংলা-সাহিত্যে রচিত হয়েছে এবং সেগুলি বাংলা ভাষা বা সাহিত্যে বিশাল কোন পরিবর্তনের সূচনা করেনি। এমনকি পদাবলী-সাহিত্যের স্বর্ণযুগ এসেছিল হুসেন শাহের অনেক পরে। কবি জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রমুখের আবির্ভাবের পরে বাংলার পদাবলী সাহিত্যের চরম উন্নতি ঘটেছিল ; এবং এঁরা কাব্যচর্চা করেছিলেন হুসেন শাহের মৃত্যুর কয়েক দশক পরে।

ঐতিহাসিকদের অনেকেই হুসেন শাহের ধর্মীয় উদারতার প্রশংসা করেছেন। এঁদের বিশ্বাস সুলতান হুসেন শাহ হিন্দু-মুসলমানের প্রতি সমদর্শী নীতি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সমকালীন বিভিন্ন গ্রন্থের বক্তব্য এবং পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে তাঁর মধ্যে উদারতার স্পষ্ট অভাব লক্ষ্য করা যায়। *'চৈতন্যভাগবত'*গ্রন্থে হুসেন শাহকে *'পরম দুর্বার'*ও *'যবন রাজা'*বলে অভিহিত করা হয়েছে। *'চৈতন্যচরিতামৃত'* গ্রন্থে লেখা হয়েছে যে, সুলতানের কর্মচারীরা বৈষ্ণব কীর্তনীয়াদের নানাভাবে অপদস্থ করত। এমনকি কীর্তন করার অপরাধে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে জাতি নষ্ট করার হুমকিও প্রায়শই দেওয়া হত। সুলতান উদারমনা ও ধর্মসহিষ্ণু হলে তাঁর কর্মচারীরা নিশ্চয়ই এ কাজ করতে সাহস পেত না। বৈষ্ণব গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, হুসেন শাহ উড়িষ্যা অভিযানে গিয়ে বহু মন্দির ও দেবমূর্তি ধ্বংস করেছিলেন। সমসাময়িক পর্তুগীজ পর্যটক *বারবোসা* লিখেছেন যে, সুলতানকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীরা প্রতিদিন বাংলাদেশে বহু হিন্দুকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করত। বিপদ্রাস পিপিলাই-এর *'মনসামঙ্গল'*কাব্যে লেখা হয়েছে যে, মুসলমানরা 'জুলুম' করত এবং ছৈয়দ (সৈয়দ) মোল্লারা হিন্দুদের কলমা পড়িয়ে মুসলমান করত।

শ্রীচৈতন্যদেবকে হুসেন শাহের রাজত্বকালের সাথে জড়িয়ে সুলতানের ধর্মসহিষ্ণুতার কল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু চৈতন্যদেবের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও খুব ভাল ছিল না। বহুবার সংকীর্তন করতে গিয়ে তিনি কাজী ও তার সাগরেদদের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছেন। প্রসঙ্গত লক্ষণীয় যে, সন্ন্যাসগ্রহণের পর চৈতন্যদেব বাংলা ছেড়ে হিন্দুরাজ্য-শাসিত উড়িষ্যা রাজ্যে চলে গিয়েছিলেন। এমনও অসম্ভব নয় যে, বাংলার সুলতানি শাসনে তিনি স্বাধীনভাবে ধর্মচর্চা করতে না-পেরেই দেশান্তরী হয়েছিলেন। এরূপ ধারণাকে দৃঢ় করে সনাতন গোস্বামীর প্রতি হুসেন শাহের কিছু আচরণ। সনাতন চৈতন্যদেবের সংস্পর্শে এসে ঐহিক জগৎ সম্পর্কে নিস্পৃহ হয়ে পড়েন এবং সুলতানের সাথে উড়িষ্যা অভিযানে যেতে অস্বীকার করেন। এই অপরাধে হুসেন শাহ তাঁর অনুগত ও বিশ্বস্ত মন্ত্রীকে কারারুদ্ধ করে উড়িষ্যা অভিযানে বের হন। সনাতন কোনক্রমে কারাগার থেকে পালিয়ে নিজের জীবন রক্ষা করেন। অতি বিশ্বস্ত অনুগামীর প্রতি সুলতানের এই 'লঘু পাপে গুরু দণ্ড' নীতি নিশ্চয়ই কোন গভীর ক্ষোভ থেকে সৃষ্টি হয়েছিল। লক্ষণীয় যে, কারাগার থেকে পালিয়ে সনাতন শ্রীচৈতন্যের শরণাপন্ন হয়েছিলেন।

কিছু কিছু উচ্চ রাজপদে হুসেন শাহ হিন্দুদের নিয়োগ করেছিলেন। তাঁর গুণগ্রাহী লেখকরা এই কাজকে হুসেন শাহের উদার মানসিকতার অন্যতম দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থিত করেছেন। কিন্তু একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে হুসেন শাহের এই কাজের মধ্যে নৈতিক উদারতার পরিবর্তে বাস্তব প্রয়োজনবোধের ছবিটাই বেশি প্রকট মনে হবে। বিচক্ষণ সুলতান জানতে, যে, নিছক ধর্মীয়

কারণে অযোগ্য মুসলমানদের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করলে প্রশাসন ভেঙে পড়বে। ইতিপূর্বে ইলিয়াস শাহের আমলেও হিন্দুরা কোন কোন দপ্তরে নিযুক্ত হয়ে তাদের দক্ষতা ও বিশ্বস্ততা প্রমাণ করেছে। তাই হুসেন শাহও প্রশাসনের প্রয়োজনে যোগ্য হিন্দুদের বিভিন্ন পদে নিয়োগ করেছিলেন। বহু পরে মুর্শিদকুলী খাঁর আমলেও ঠিক এই কারণে হিন্দুরা রাজপদে নিযুক্তি হোতেন।

উপরিলিখিত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এ কথা স্বীকার্য যে, হুসেন শাহ মধ্যযুগীয় সংকীর্ণতা দ্বারা আচ্ছন্ন ছিলেন না। শাসক এবং মানুষ হিসেবে তিনি অনেক মধ্যযুগীয় শাসক থেকে উন্নতমনা ছিলেন। তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান মুসলমান। কিন্তু উৎকট হিন্দু-বিদ্বেষী বা ধর্মোন্মাদ তিনি ছিলেন না। তাই তাঁর আচরণ কখনোই অ-মুসলমানদের ক্ষেত্রে অসহনীয় হয়ে ওঠেনি। একথা ঠিক যে, সুলতানের মধ্যে কিছুটা সহনশীলতা না থাকলে শ্রীচৈতন্য বাংলাদেশে তাঁর ধর্মাদর্শ প্রচার করতে পারতেন না। এমন প্রমাণও আছে যে, ত্রিপুরা অভিযানের সময় তাঁর হিন্দু-সেনারা গোমতী নদীর তীরে পাথরের প্রতিমা পূজা করেছিল। সুলতান তাদের কাজের বিরোধিতা করেননি। রাজধানীর খুব কাছেই বহু নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব বসবাস করতেন। আসলে হুসেন শাহ ছিলেন একজন সম্পূর্ণ মুসলিম নরপতি। মুসলমান হিসেবে তিনি নিজ ধর্মের মহিমা প্রচারে পরোক্ষ মদত দিয়েছেন ; আবার শাসক হিসেবে অ-মুসলমানদের প্রতি অসহনীয় নয় এমন নীতি অনুসরণেরও চেষ্টা করতেন। তাই বলা চলে, হিন্দু-বিদ্বেষের বিষময় প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থেকে হুসেন শাহ মুসলমান-তোষণ নীতি অনুসরণ করেছেন। সুলতানের উপর আস্থা ও শ্রদ্ধাবোধ থেকেই জনগণ তাঁকে *'নৃপতিতিলক', 'জগৎভূষণ'* প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করেছিল। ***অধ্যাপক যদুনাথ সরকার*** তাঁকে মুঘল সম্রাট আকবরের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন যে, *"হুসেন শাহের কাছে আবুল ফজলের মত কোন সুহৃদ ও ঐতিহাসিক ছিলেন না ; তাই তাঁর মহত্ত্বের বহু তথ্য অজ্ঞাত থেকে গেছে।"* অধ্যাপক সরকারের ভাষায় ঃ *"Alauddin Hussain shah was unquestionable the best, if not the greatest, of the medieval rulers of Bengal."*

○ নসরৎ শাহ (১৫১৯-'৩২ খ্রীঃ) ঃ হুসেন শাহের মৃত্যুর পর বাংলার সিংহাসনে বসেছিলেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র *নাসিরউদ্দিন আবুল মুজফ্‌ফর নসরৎ শাহ।* সাধারণভাবে তিনি ***'নসরৎ শাহ'*** নামেই খ্যাত ছিলেন। মুদ্রার সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় যে, তিনি পিতার মৃত্যুর অন্তত তিন বছর পূর্বে যুবরাজ পদে অধিষ্ঠিত হয়ে মুদ্রাপ্রকাশের সুযোগ পান। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, হুসেন শাহের জ্যেষ্ঠপুত্র নসরৎ শাহ নির্বিবাদে সিংহাসনে বসেন। ক্ষমতা লাভ করেই তিনি কনিষ্ঠ সতের জন ভাইয়ের বরাদ্দ ভাতা বাড়িয়ে দ্বিগুণ করে দেন। এই ঘটনা সত্যি হলে স্বীকার করতে হয় যে, নসরৎ মধ্যযুগীয় সংকীর্ণতা দ্বারা আচ্ছন্ন ছিলেন না। নসরৎ শাহের মোট চৌদ্দ বছরের শাসনকালকে দুটি পর্বে ভাগ করা যায়। তাঁর রাজত্বের প্রথম সাত বছর মোটামুটি শান্তিতে অতিবাহিত হয়েছিল। ফলে এই সময় তিনি শিল্প-সাহিত্যের উন্নতির প্রতি মন দিতে পারেন। শেষ সাত বছর ভারতের রাজনীতির পরিবর্তনের ফলে তাঁকে নানাভাবে ব্যস্ত থাকতে হয়।

দিল্লীর লোদী সুলতানদের দুর্বলতা এবং মুঘলবীর বাবরের ভারত-আক্রমণের ফলে এদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি দ্রুত পাল্টে যায়। লোদী শাসকদের দুর্বলতার ফলে পাটনা থেকে জৌনপুর পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল তাঁদের হাতছাড়া হয়ে যায় এবং লোহানী ও ফর্মুলি বংশীয় আফগানদের

কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। এদের সাথে নসরৎ শাহের মৈত্রী গড়ে ওঠে। এদিকে ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে পানিপথের যুদ্ধে লোদীবংশের পতন ঘটিয়ে মুঘলবীর বাবর দিল্লীর শাসন-কর্তৃত্ব দখল করে দ্রুত রাজ্যবিস্তার শুরু করলে আফগান নায়কেরা বিতাড়িত হয়ে নসরৎ শাহের কাছে আশ্রয় নেন। ফলে বাবরের সাথে নসরৎ শাহের সংঘাত-সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। বিচক্ষণ নসরৎ শাহ পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পেরে শেষ পর্যন্ত বাবরকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাঁর কাছে নানা উপহার প্রেরণ করেন। পরবর্তীকালে (১৫২৯ খ্রীঃ) মুঘল-আফগান দ্বন্দ্বে নসরৎ জড়িয়ে পড়লে বাবরের সাথে তাঁর সংঘর্ষ বাঁধে। এই যুদ্ধে নসরৎ শাহ পরাজিত হন এবং বাবরের হাতে কিছু অঞ্চল ছেড়ে দিয়ে শান্তি স্থাপন করেন। পরবর্তী মুঘল সম্রাট হুমায়ুন বাংলাদেশ আক্রমণের উদ্যোগ নিলে নসরৎ শাহ মুঘলের শত্রু গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে শক্তিসাম্য রক্ষা করেন। এটি তাঁর কূটনৈতিক জ্ঞানের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। *'রিয়াজ'* গ্রন্থের ভিত্তিতে জানা যায় যে, নসরৎ শাহ ত্রিহুতের রাজাকে পরাজিত করে ঐ রাজ্য সম্পূর্ণভাবে দখল করার উদ্যোগ নেন। অহোমদের আক্রমণ থেকে বাংলাকে তিনি রক্ষা করেন। এইভাবে প্রায় সমগ্র বাংলাদেশ ত্রিহুত ও বিহারের বহুলাংশ এবং উত্তরপ্রদেশের একাংশে তিনি নিজ-কর্তৃত্ব কায়েম করতে সক্ষম হন।

পিতার মতই নসরৎ শাহ শিল্প-সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। তাঁর উদ্যোগে বহু সুদৃশ্য প্রাসাদ ও সুসজ্জিত মসজিদ নির্মিত হয়। এর মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলো *'বারদুয়ারী'* বা *'সোনা মসজিদ'।* গৌড়ের প্রখ্যাত *'কদম রসুল'* ভবনের সংস্কার-কাজেও তিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন। এই ভবনের প্রকোষ্ঠে তিনি একটি মঞ্চ নির্মাণ করেন এবং তার উপরে হজরত মহম্মদের পদচিহ্নযুক্ত একটি কৃষ্ণবর্ণ সুদৃশ্য মর্মরবেদী স্থাপন করেন। বিভিন্ন বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্রেও তিনি একাধিক মসজিদ নির্মাণ করেন। শ্রীকর নন্দী, কবিশেখর প্রমুখ খ্যাতনামা কবিগণ তাঁর অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন। নসরৎ শাহের আমলে মহাভারতের বাংলা অনুবাদ করেন শ্রীকর নন্দী। নসরৎ ধর্মপ্রাণ মুসলমান ছিলেন। তবে কোনরকম ধর্মীয় গোঁড়ামি বা পরধর্মবিদ্বেষ তাঁর ছিল না। ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক আততায়ীর হাতে নসরৎ নিহত হন।

● পরবর্তী সুলতানগণ ঃ নসরৎ শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র *ফিরোজ শাহ* (দ্বিতীয়) সিংহাসনে বসেন। মাত্র এক বছর রাজত্ব করে তিনি পিতৃব্য গিয়াসউদ্দিন মামুদের হাতে নিহত হন। ফিরোজ শাহের আমলে শ্রীধর কবিরাজ নামক জনৈক কবি *'কালিকামঙ্গল'* বা *'বিদ্যাসুন্দর'* কাব্য রচনা করেন। সম্ভবত পিতা নসরৎ শাহের জীবিতাবস্থায় ফিরোজ চট্টগ্রামের আঞ্চলিক শাসকপদে নিযুক্ত ছিলেন এবং তখনই তিনি এই কাব্যরচনার ব্যাপারে উৎসাহ দেখান।

হুসেন শাহী বংশের শেষ প্রতিনিধি ছিলেন গিয়াসউদ্দিন মামুদ শাহ (১৫৩৩-১৫৩৮ খ্রীঃ)। ইনি ছিলেন দুর্বল, নির্বোধ, অদূরদর্শী ও ইন্দ্রিয়াসক্ত একজন মানুষ। স্বভাবতই রাজ্যের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা ছিল তাঁর সাধ্যাতীত। এই সময়ে মুঘল সম্রাট হুমায়ুন এবং আফগান বীর শেরশাহের মধ্যে ক্ষমতা দখলের লড়াই চলছিল। এই পরিস্থিতিতে যে ধরনের রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা দরকার, —তা মামুদ শাহের ছিল না। তাই তিনি রাজনৈতিক চালে বারবার ভুল করেন। হুমায়ুনের বিরুদ্ধে কোন শক্তিজোটে যোগ দিতে তিনি ব্যর্থ হন। আবার বিহারের জালাল খাঁর লোহানীর সাথে মিত্রতাবদ্ধ হয়ে শের খাঁকে বাংলার শত্রুতে পরিণত করেন। ফলে শের খাঁর নির্দেশে তাঁর ভ্রাতা খাওয়াস খাঁ গৌড়নগরী দখল করে নেন। রাজ্যচ্যুত মামুদ শাহ

এই সময়ে শের খাঁর বিরুদ্ধে হুমায়ুনের সাহায্য চেয়ে পাঠান। কিন্তু হুমায়ুন চৌসার যুদ্ধে পরাজিত হলে বাংলা শের খাঁর হস্তগত হয়। মামুদ শাহ আফগানদের হাতে নিহত হন। এইভাবে বাংলাদেশে হুসেন শাহী বংশের শাসনের অবসান ঘটে এবং দুই শতাধিক বছর ব্যাপী বাংলাদেশের স্বাধীন সুলতানির সমাপ্তি ঘটে।

○ হুসেন শাহী বংশের শাসনকালের গুরুত্ব ঃ

বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসে হুসেন শাহী বংশের শাসনকাল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই বংশের দুই প্রধান সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহ ও নসরত শাহের কৃতিত্বে বাংলাদেশ তথা বাঙালী জাতি রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এক নতুন ও গৌরবোজ্জ্বল যুগের প্রান্তে এসে উপস্থিত হয়েছিল। রাজনৈতিক সংহতিসাধন, শাসনতান্ত্রিক শৃঙ্খলা, সামাজিক সাম্য, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও সাংস্কৃতিক বিকাশ যদি আধুনিকতার মানদণ্ড হয় তাহলে হুসেন শাহী বংশের রাজত্বকালে বাংলাদেশ সেই আধুনিক যুগের আশ্বাস পেয়েছিল,—একথা বললেও অত্যুক্তি হয় না।

হুসেন শাহের রাজত্ব (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ) শুরু হওয়ার সময় থেকে বাংলায় স্বাধীন সুলতানি যুগের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা হয়। ইলিয়াস শাহী বংশের শাসন অবসানের পর দীর্ঘ ৬ বছর বাংলায় হাবসী শাসন প্রচলিত ছিল। হাবসী শাসনকে বাংলার *'অন্ধকার যুগ'* বলে অভিহিত করা যায়। হুসেন শাহের সিংহাসন দখলের প্রশ্নে সমসাময়িক ঐতিহাসিকের মধ্যে মতভেদ থাকলেও হাবসী অত্যাচারের অবসান ঘটিয়ে তিনি বাংলাকে রক্ষা করেছিলেন এ বিষয়ে দ্বিমত নেই। আলাউদ্দিন হুসেন শাহের রাজত্ব ছিল দীর্ঘ। ***স্যার যদুনাথ সরকারের*** ভাষায় ঃ *"Alauddin Hussain Sah was unquestionably the best, if not the greatest of the medieval rulers of Bengal."* তাঁর দক্ষ প্রশাসনব্যবস্থা, উদারনীতি এবং ভৌমিক বিস্তৃতির ফলে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে উন্নতি ও সমৃদ্ধির যে যুগ শুরু হয়, তা প্রতীয়মান হয় তাঁর আমলের নির্মিত কিছু সৌধ থেকে। অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা, ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা এবং বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে মোঙ্গল জাতিগুলির বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান ও উড়িষ্যার রাজা গজপতির রাজ্যসীমা পর্যন্ত বাংলার আঞ্চলিক বিস্তৃতি দেশের সামরিক শ্রেণীকে যেমন বিশেষ অনুপ্রেরণা যোগায়, তেমনি পূর্ব-ভারতে বাংলার প্রাধান্য বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। সমসাময়িক স্থানীয় সাহিত্যে এর প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়।

উদারতা ও প্রজাহিতৈষণার জন্য হুসেন শাহের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়ে থাকে। তাঁর মধুর ব্যবহার, নম্রতা ও দয়ালুতার জন্য জনগণ তাঁকে ***'নৃপতি-তিলক'*** ও ***'জগদ্ভূষণ'*** আখ্যায় ভূষিত করেছিল। তিনি ছিলেন উদারতার মূর্ত প্রতীক। তাঁর শাসনাধীন বাংলায় অ-মুসলমানদের জীবন ও ধর্ম সচ্ছল ও নিরাপদ ছিল বলেই অধিকাংশ পণ্ডিতের বিশ্বাস। তাই বলা হয়ে থাকে হুসেন শাহের মত উদারতা ও মনের বদান্যতা আকবরের পূর্বে আর কোন মধ্যযুগীয় সুলতানের কাছে পাওয়া যায় না।

হুসেন শাহের পর বাংলার সিংহাসনে বসেন তাঁরই পুত্র ***নসরৎ শাহ*** (১৫১৯-১৫৩২ খ্রীঃ) অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ক্ষেত্রে তিনি পিতার নীতি যথাযথভাবে পালন করেন। তাঁর রাজত্বের

প্রথমার্ধ মোটামুটি শান্তিতে কেটেছিল। ঐ সময় তিনি শিল্প ও সংস্কৃতির উন্নয়নে নিজেকে আত্মনিয়োগ করতে পেরেছিলেন। কিন্তু রাজত্বের দ্বিতীয়ার্ধে সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার সমস্যা তাঁকে বিব্রত করে তোলে। মুঘলবংশীয় বাবর ইতিমধ্যে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে (১৫২৬ খ্রীঃ) ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে দিল্লীর সিংহাসন দখল করলে বাংলার বিপদ উপস্থিত হয়। নসরৎ শাহ বাবরের প্রতি আনুগত্য জানিয়ে নিজ-অধিকার অব্যাহত রাখতে সক্ষম হন। দুর্ভাগ্যবশত এক আততায়ীর হাতে তিনি নিহত হন। অতঃপর সিংহাসনে বসেন তাঁর পুত্র আলাউদ্দিন ফিরুজ। নসরতের মৃত্যুর পর অসম ও রায়েত অঞ্চলে বাংলার সুলতানি প্রাধান্য নষ্ট হয়ে যায়। ফিরোজকে হত্যা করে সিংহাসনে বসেন গিয়াসউদ্দিন মামুদ শাহ। মাত্র পাঁচ বছর রাজত্ব করার পর তিনি সিংহাসনচ্যুত হন। এবং এরই সাথে বাংলায় হুসেন শাহী বংশের শাসনের অবসান হয়।

বাংলার শিক্ষা-সংস্কৃতির ইতিহাসে হুসেন শাহী বংশের শাসনকাল বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। আলোচ্য সময়ে বাঙালী প্রতিভার অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটে। স্থানীয় মনীষার ভিত্তিতে বাংলা-সাহিত্যের নবজাগরণ ঘটে। এই যুগের জাগরণ স্বতস্ফূর্ত এবং এর মূলে ছিল পুরাণের আখ্যানের প্রতি সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধাবোধ এবং সুলতান হুসেন শাহ ও নসরৎ শাহের পৃষ্ঠপোষকতা।

ব্যক্তিগত জীবনে হুসেন শাহ ছিলেন সংস্কৃতমনা এবং পরধর্মসহিষ্ণুতার মূর্ত প্রতীক। শিক্ষা ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধাবশত তিনি রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে রাজস্বের একটি বড় অংশ শিক্ষাখাতে খরচ করতেন। একই সঙ্গে যুক্ত ছিল তাঁর প্রজাহিতৈষণার কাজ। বিদ্বান এবং ধর্মজ্ঞানীদের জন্য তিনি যেমন নিয়মিত ভাতা-র ব্যবস্থা করেছিলেন, তেমনি প্রতিটি জেলায় তৈরি করেছিলেন মসজিদ, হাসপাতাল প্রভৃতি। হুসেন শাহের শাসনব্যবস্থা ছিল মূলত ধর্মনিরপেক্ষ তাঁর উজির রূপ ও সনাতন গোস্বামীকে সুলতান ব্যক্তিগত সচিবের পদে উন্নীত করেছিলেন। তাঁর আমলে সংস্কৃত ও বাংলা-সাহিত্যের নবজাগরণ ঘটেছিল বলা যায়। এই পর্বে রূপ গোস্বামী সংস্কৃতে *'বিদগ্ধমাধব'* ও *'তিলকমাধব'* নামে দুখানি গ্রন্থ রচনা করেন। সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতায় মালাধর বসু শ্রীমৎভাগবত বাংলায় অনুবাদ করেন এবং এই কাজের জন্য সুলতান মালাধরকে *'গুণরাজ খাঁ'* উপাধিতে ভূষিত করেন বলে অনেকে মনে করেন। সেনাপতি পরাগল খাঁর আগ্রহ ও আতিশয্যে পরমেশ্বর কবীন্দ্র নামে জনৈক কবি সমগ্র মহাভারত বাংলায় অনুবাদ করেন। পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁর আনুকূল্যে মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ করেন শ্রীধর নন্দী। আবার রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস প্রমুখ *'মনসামঙ্গল'* কাব্য রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। বাংলা ভাষার সাথে সাথে সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনচর্চা সেযুগে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এছাড়া হস্তলিখন পদ্ধতিও উৎকর্ষতা অর্জন করেছিল।

হুসেন শাহী বংশের রাজত্বকালে মানবতাবাদী ও ভাবসর্বস্ব কাব্যেরও বিশেষ উন্নতি সাধন হয়েছিল। ভক্তিবাদী আন্দোলনের প্রাণপুরুষ শ্রীচৈতন্য ভক্তিবাদের উদারতা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা-সাহিত্যের বিকাশেও বিশেষ সহায়তা করেছেন। শ্রীচৈতন্যের জীবনী-গ্রন্থগুলি দেশীয় সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিতে সাহায্য করে। সুলতানদের ধর্মীয় উদারতা বাংলার ধর্মজীবনে নিয়ে আসে নতুন আস্বাদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত বাংলাদেশের ইতিহাসগ্রন্থের মতে, এই যুগে বৈষ্ণববাদ ও বাংলা-সাহিত্যের বিকাশ সমসাময়িক গৌড়রাজ্যের উদারতা ও আলোকপ্রাপ্ত মন ছাড়া সম্ভব হত না। শ্রীচৈতন্যের জীবন ও বাণী বাঙালীর চিন্তা ও জীবনধারায় বয়ে আনে নতুন বিপ্লব।

স্থাপত্য-শিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রেও হুসেন শাহী বংশের অবদান অনস্বীকার্য। হিন্দু ও ইসলামীয় রীতির সংমিশ্রণে এ যুগেই বহু মন্দির ও মসজিদ নির্মিত হয়। এই প্রসঙ্গে বড় সোনা মসজিদের নাম উল্লেখযোগ্য। ইট ও পাথর দ্বারা নির্মিত এইসব মন্দিরে প্রাদেশিক রীতির প্রভাব লক্ষণীয়।

প্রসঙ্গত স্মরণীয়, হুসেন শাহী বংশের উদারতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রসঙ্গ সমালোচনামুক্ত নয়। *ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার* তাঁর *'বাংলাদেশের ইতিহাস'* গ্রন্থে নানা তথ্যসহ প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, হুসেন শাহী বংশের উদারতা, ধর্ম-নিরপেক্ষতা, সাহিত্যানুরাগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি। তাঁর মতে, হুসেন শাহের শিলালিপিগুলির সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তিনি একজন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান সুলতান ছিলেন এবং ইসলামধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার ও মুসলমানদের মঙ্গলসাধনের জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট ছিলেন। উড়িষ্যার *'মাতলাপাঞ্জি'*, বাংলায় *'চৈতন্যচরিত'* গ্রন্থগুলি থেকে জানা যায় যে, হুসেন শাহ উড়িষ্যা অভিযানে গিয়ে বহু দেবমন্দির ও দেবমূর্তি ধ্বংস করেছিলেন। বৃন্দাবন দাস চৈতন্যভাগবতে হুসেন শাহকে *'পরম দুর্বার যবন রাজা'* বলে অভিহিত করেছেন। সমসাময়িক পর্তুগীজ বণিক *ফ্রেডারিক বারবোসা* হুসেন শাহ সম্বন্ধে লিখেছেন যে, তাঁর এবং তাঁর অধীনস্থ শাসনকর্তাদের আনুকূল্য অর্জনের জন্য প্রতিদিন বাংলায় অনেক হিন্দু ইসলামধর্ম গ্রহণ করত। সুতরাং হুসেন শাহ যে হিন্দু-মুসলমানের প্রতি সমদর্শী ছিলেন, একথা বলা যুক্তিসঙ্গত নয়। শাস্তিবিধানের সময় তিনি হিন্দুদের প্রতি অনুদার ব্যবহার করতেন। হিন্দুদের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ *ড. মজুমদার* বলেছেন যে, এই ধারা হুসেন শাহী বংশের অনেক আগে থেকে চলে আসছিল। এবং এর অন্যতম কারণ ছিল যোগ্যতাসম্পন্ন মুসলমান কর্মচারীর অভাব। কিন্তু একথা মনে রাখা দরকার যে, হিন্দুদের তিনি যে ধরনের গোপনীয় কাজে নিযুক্ত করেছিলেন, তা ইতিপূর্বে কেউ করেননি ; এবং সেটা তাঁর উদারতার জন্যই সম্ভব হয়েছিল। *ড. মজুমদারও* স্বীকার করেছেন যে, হুসেন শাহ, নসরৎ শাহ প্রভৃতি সুলতানগণ ছিলেন বিচক্ষণ ও চতুর রাজনীতিবিদ। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের গুরুত্ব তাঁরা বুঝতেন ; তাই তাদের হিন্দুবিদ্বেষ কখনো মাত্রা ছড়িয়ে যায়নি।

সমসাময়িক বিভিন্ন পর্যটকদের বিবরণ, বৈষ্ণব পদাবলী ও মঙ্গলকাব্য থেকে সে-যুগের অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ পাওয়া যায়। হুসেন শাহী বংশের শাসনকাল ব্যবসা-বাণিজ্যে ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হয়েছিল। অনেক মঙ্গলকাব্যেরই নায়ক একজন সওদাগর। নিকোলো কন্টির বিবরণ থেকে জানা যায়, পঞ্চদশ শতকে ভারতে প্রস্তুত নৌকা ইউরোপের নৌকার থেকে বড় এবং মজবুত ছিল। এই ঘটনা নৌ-বাণিজ্যের অগ্রগতির সূচনা করে। বাঙালী বণিকেরা বঙ্গোপসাগর পার হয়ে ব্রহ্মদেশ, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়াতে বাণিজ্য ব্যাপারে যাতায়াত করতেন। এই আমলে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর হলো পুরী, কলিঙ্গপত্তনম্, চিল্কাচুলী, লঙ্কাপুরী, রামেশ্বর, বিজয়নগর প্রভৃতি। ষোড়শ শতকের প্রথমে পর্তুগীজ পর্যটক বারবোসার একটি বিবরণ থেকে জানা যায়, এদেশের সমুদ্রতীরে ও দেশের অভ্যন্তরে বহু নগরী ছিল। সেগুলিতে দেশী-বিদেশী বণিকেরা বসবাস করতেন। উৎকৃষ্ট সাদা চিনি, সূতী কাপড়, মসলিন খুব চড়া দামে বিদেশের বাজারে বিক্রি হত। ষোড়শ শতকের প্রথমদিকে রচিত ইটালীয় পর্যটক *ভার্থেমার* বিবরণী থেকেও বাংলাদেশের বিস্তৃত বাণিজ্যসম্ভার এবং সুতা ও রেশম কাপড়ের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ভার্থেমা বলেন যে, বাংলাদেশের মত ধনী বণিক তিনি অন্য কোথাও দেখেননি। আর এক পর্তুগীজ *জাঁয়া-দে-বারস* লিখেছেন যে, গৌড় নগরী বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। নয় মাইল দীর্ঘ এই শহরে প্রায় ২০ লক্ষ লোক বাস করত। দোকানপাট, বাণিজ্য-সম্ভারে শহর পরিপূর্ণ ছিল। সোনারগাঁ, হুগলী, চট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রাম ছিল ব্যস্ততম বাণিজ্যকেন্দ্র। ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সিজার ফ্রেডারিক সাতগাঁওকে খুব সমৃদ্ধিশালী বন্দর বলে বর্ণনা করেছেন। এদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের বণিকরা বাংলায় বাণিজ্য করতে আসত। এদের মধ্যে কাশ্মীরী, মুলতানী, পাঠান, ভুটিয়া ও সন্ন্যাসীদের বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায়।

ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক প্রচলন থাকলেও কৃষি ছিল বাঙালীর প্রধান জীবিকা। সমসাময়িক সাহিত্য ও বিদেশী পর্যটকের বিবরণীতে বাংলার অতুলনীয় সম্পদের উল্লেখ পাওয়া যায়। হুসেন শাহের আমলেও বাংলাদেশে বছরে তিনবার ফসল হত। সাধারণভাবে বাঙালী ছিল পরিশ্রমী। বহু কষ্ট স্বীকার করেও জঙ্গল কেটে সে যুগে জমিকে চাষের উপযোগী করার নিদর্শন আছে। সরকারি রাজস্বের পরিমাণ ছিল খুবই কম। উৎপন্ন ফসলের এক-পঞ্চমাংশ মাত্র। পঞ্চদশ শতকের শেষদিকে আগত চৈনিক রাজদূতের বিবরণ থেকে জানা যায়, বাংলাদেশে কৃষিজাত সম্পদের প্রাচুর্য ছিল এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে বহু অর্থাগম হত। পোশাক-পরিচ্ছদ ও মণিমুক্তাখচিত অলংকারের প্রাচুর্য দেখে চৈনিক রাজদূতেরা বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন।

তবে এই যুগে দারিদ্র্য যে একেবারে ছিল না তা নয়। দ্রব্যাদির দাম সস্তা হলেও সাধারণ কৃষক ও প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশার অবধি ছিল না। রাজকর্মচারীদের অযথা অত্যাচার ও উৎপীড়ন অব্যাহত ছিল। রাজস্বের টাকা দিতে না পারলে হিন্দুদের স্ত্রী ও সন্তানদের নীলামে বিক্রি করা হত। যুদ্ধকালে সৈন্যদের লুটপাট অব্যাহত ছিল।

○ সুলতানি আমলে বাংলার আর্থিক অবস্থা ঃ

মধ্যযুগের রাজনৈতিক ইতিহাস রচনার কাজে প্রাচীন উপাদান ছিল সমকালীন মুসলমান কবি, সাহিত্যক, সভাসদ্‌দের রচনা। কিন্তু এঁরা সমকালীন অর্থনৈতিক অবস্থা বর্ণনার ক্ষেত্রে অদ্ভুত ধরনের উদাসীনতা দেখিয়েছেন। এর সম্ভাব্য কারণ হলো মুসলমান লেখকদের মসি-চর্চার প্রধান বিষয় ছিল রাজনীতি এবং মূল লক্ষ্য ছিল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শাসক ও অভিজাতদের সন্তুষ্টিবিধান। অবশ্য সুলতানি যুগে বাংলাদেশে যেসব বিদেশী পর্যটক ও রাজদূত এসেছিলেন, তাঁদের সতর্ক দৃষ্টি থেকে এদেশের অর্থনৈতিক চিত্র বঞ্চিত হয়নি। বস্তুত তাঁদের বর্ণনা এবং সমকালীন হিন্দু-কবিদের কোন কোন রচনা থেকে সমকালীন বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্র পাওয়া যায়। সুলতানি আমলে বাংলাদেশ অধিকাংশ সময় দিল্লীর নিয়ন্ত্রণমুক্ত ছিল। ফলে দিল্লীর শোষণ থেকে বাংলাদেশ মুক্ত থাকতে পেরেছিল। আবার দিল্লীর বিরুদ্ধে নিরন্তর অস্তিত্বরক্ষার লড়াইয়ে ব্যস্ত থাকার ফলে বাংলার অর্থব্যবস্থা স্থানীয় শাসকদের আনুকূল্য থেকে অনেকটাই বঞ্চিত ছিল। এর অন্য একটা দিকও ছিল। সর্বদা যুদ্ধে ব্যস্ত থাকার ফলে বাংলার সুলতানেরা এখানকার কৃষি ও বাণিজ্য ব্যবস্থাতে সাধারণত হস্তক্ষেপ করতেন না। ফলে কৃষককুল ও বণিকদল আপন আপন বৃত্তিতে স্বাধীনভাবে আত্মনিয়োগ করতে পারত।

সুলতানি আমলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ছিল লক্ষণীয়। কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প,

প্রভৃতি অর্থাগমের প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাংলা ছিল আত্মনির্ভরশীল। বাংলার এই আর্থিক সমৃদ্ধিতে প্রধান ভূমিকা ছিল হিন্দুদের। ***স্টুয়ার্ট*** (Charls Stewarts) তাঁর *'History of Bengal'* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ঃ *"দেশের বাণিজ্যাদির উপর শাসকেরা হাত দিতেন না। ইহারা চাষ-আবাদ সম্পর্কেও আদৌ উৎসাহিত ছিলেন না। ধনশালী হিন্দুরাই তখন কৃষিপ্রধান বাংলার একরূপ মালিক ছিলেন ; শুধু কৃষি নয়, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদিও হিন্দুদের হাতে ছিল। ধনশালী হিন্দুরাই জাগিরগুলি ইজারা নিতেন এবং এঁরাই ব্যবসা-বাণিজ্যের সমস্ত সুবিধা ভোগ করতেন।"* ***নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য*** *'বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস'* গ্রন্থে এদেশের আর্থিক সমৃদ্ধির উল্লেখ করে লিখেছেন ঃ *"বঙ্গদেশে কোন স্বর্ণখনি না থাকিলেও মহাসমৃদ্ধির জন্য এদেশে 'সোনার বাংলা' উপাধি পাওয়ার যোগ্য হইয়াছিল।"* ***ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার*** ও সুলতানি আমলে বাংলার সমৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ *"এই সময় বাংলা স্বাধীন ছিল। তার ধন-সম্পদ দেশের মধ্যেই থাকত। তাই বাংলা ছিল খুবই সম্পদশালী। এই সমৃদ্ধির মূলে ছিল বাংলার শস্য-সম্পদ, শিল্প-বাণিজ্য।"* পঞ্চদশ শতকে বাংলার অবস্থা বিশ্লেষণ করে ***স্টুয়ার্ট*** লিখেছেন ঃ *"এই সময় বাংলার প্রধান ব্যক্তিরা ভোজনের সময় স্বর্ণপাত্রের প্রদর্শনী করতেন।"* ***দীনেশচন্দ্র সেন*** তাঁর *'বৃহৎ বঙ্গ'* গ্রন্থে লিখেছেন ঃ *"বণিক-বধূরা সোনার কলসী লইয়া জল আনিতে যাইতেন ; অর্ণব যানগুলির মাস্তুল স্বর্ণমণ্ডিত থাকত।" 'তারিখ-ই-ফিরিস্তা'* এবং *'রিয়াজ'* গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, গৌড় ও পূর্বগৌড়ের সমাজ বিরোধীদের হত্যা করে ১৩০০ সোনার থালা ও বহু ধনরত্ন সংগ্রহ করেছিলেন বলে জানা যায়; —যা বাংলার আর্থিক সমৃদ্ধির তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

বিভিন্ন পর্যটকের বর্ণনা থেকে বাংলার উন্নত কৃষি-উপাদানের কথা জানা যায়। বাংলার অর্থব্যবস্থার মেরুদণ্ডই ছিল এদেশের উন্নত কৃষি-উৎপাদন। গাঙ্গেয় পলিমাটি সম্পন্ন অঞ্চলের জমি ছিল খুবই উর্বরা। জনৈক চীনা পর্যটক উল্লেখ করেছেন যে, বাংলাদেশে বছরে তিনবার ফসল উৎপাদন করা হত। বাংলার কৃষকেরা ছিল খুবই পরিশ্রমী। মধ্যযুগে কৃষিকার্য বাঙালীদের কাছে যথেষ্ট মর্যাদার বৃত্তি বলে বিবেচিত হত। কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ব্রাহ্মণ হয়েও কৃষিকার্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন বলে উল্লেখ করেছেন। সেকালে চাকুরিকে অসম্মানের কাজ বলে গণ্য করা হত। আবার বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজন ছিল মূলধনের। তাই বাঙালী কৃষিকার্যে আত্মনিয়োগ করত। পরিশ্রম করে বাঙালীরা জঙ্গল কেটে বহু জমিকে চাষের উপযোগী করেছিল। সরকারি রাজস্বের হার ছিল উৎপন্ন ফসলের এক-পঞ্চমাংশ। কৃষি-উৎপাদনের সর্বাগ্রে ছিল ধান। ***ইবন বতুতা*** লিখেছেন যে, চতুর্দশ শতকে বাংলাদেশে প্রচুর ধান উৎপাদন হত। তাঁর মতে, এই ধান উদ্বৃত্ত হত বলে নিকটে ও দূরে নানাদেশে তা রপ্তানি করা হত। সমুদ্রপথে মুসলিপত্তনম্, করমণ্ডল উপকূলের নানা বন্দরে এবং সিংহল ও মালদ্বীপে ধান রপ্তানি করা সম্ভব হত। গমের উৎপাদন খুব বেশি না হলেও বাঙালীর চাহিদার পক্ষে তা ছিল পর্যাপ্ত। বেশি আখ উৎপাদন হওয়ার ফলে চিনি ও গুড় প্রচুর তৈরি হত। বাংলার চিনি আরব, ইরান ও মেসোপটেমিয়ায় রপ্তানি করা হত। অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে গুড়, সুপারি, তামাক, তেল, আদা, পাট, মরিচ ছিল উল্লেখযোগ্য।

সুলতানি যুগে বাংলার নানাবিধ শিল্পও বেশ উন্নত ছিল। শিল্পক্ষেত্রে সর্বাগ্রে বয়নশিল্পের নাম উল্লেখ করতে হয়। বাংলার মসলিন ছিল খুবই সুক্ষ্ম ও সুন্দর। এর চাহিদা ছিল বিশ্বজোড়া।

ইউরোপে সূক্ষ্ম মসলিনের খুব চাহিদা ছিল। ইরাক, আরব, বর্মা, মালাক্কা, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশেও বাংলার মসলিন রপ্তানি হত। বর্তমান বাংলাদেশ-এর ঢাকা ছিল মসলিন উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। এছাড়া বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে রেশম ও রেশমবস্ত্র উৎপাদিত হত। ঢাকার শঙ্খশিল্প ছিল খুবই উন্নত। নৌকানির্মাণ কাজে বাঙালীরা খুব দক্ষ ছিল। বিদেশী পর্যটকরা বাংলার নদীতীরবর্তী গ্রামগুলিতে নৌকা নির্মাণকারী শিল্পী (সূত্রধর)-দের ভিড় লক্ষ্য করেছেন। 'যুক্তি কল্পতরু' নামক সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, মধ্যযুগে ভারতে নানা আকারের তৈরি নৌকা ইউরোপের নৌকার থেকে বড় ও মজবুত ছিল। কাঁঠাল, শাল, পিয়াল, তমাল প্রভৃতি কাঠ থেকে উৎকৃষ্ট নৌকা তৈরি করা হত। চীনা পর্যটকদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, তখন বাংলাদেশে গাছের ছাল থেকে এক ধরনের উন্নত কাগজ তৈরি করা হত। এই কাগজের রং ছিল সাদা, এর গা ছিল খুবই মসৃণ। মধ্যযুগে এদেশে সোনার প্রাচুর্য থেকে অনুমান করা যায় যে, অলংকারশিল্পেও বাঙালীদের যথেষ্ট দক্ষতা ও আগ্রহ ছিল।

প্রাচীনকাল থেকে বহির্বাণিজ্যের সাথে বাঙালী ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। বহির্দেশে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপনের দৃষ্টান্তও আছে। মধ্যযুগে সুলতানি আমলে বাংলাদেশ ও বাঙালী বণিকেরা ঐতিহ্যশালী বাণিজ্যবৃত্তিকে আরো সম্প্রসারিত করেন। বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ থেকে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের বহু তথ্য পাওয়া যায়। বাঙালী সওদাগরদের (বণিক) সমুদ্রপথ ধরে দূরদেশে বাণিজ্যযাত্রার কথা মধ্যযুগের বাংলা আখ্যান ও সাহিত্য থেকেও জানা যায়। বঙ্গোপসাগর ও আরবসাগরের পথে বাঙালী বণিকদের বাণিজ্য-তরীর বিদেশযাত্রার বিশদ বিবরণ বিজয়গুপ্ত ও বংশীদাসের *'মনসামঙ্গল'* এবং মুকুন্দরামেব *'চণ্ডীমঙ্গল'* কাব্য থেকে পাওয়া যায়। ***পর্যটক বারবোসার*** বিবরণ থেকে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন ঃ *"এদেশে সমুদ্রতীরে ও দেশের মধ্যে বহু নগরী আছে। সমুদ্রতীরের বন্দরগুলিতে হিন্দু-মুসলমান বাস করে—এরা জাহাজে করে বাণিজ্যদ্রব্য নানা দেশে পাঠায়। এই দেশের প্রধান বন্দরের নাম 'বেঙ্গল' (Bengal)।"* সমকালীন ইতালীয় পর্যটক ***ভার্থেমাও*** 'বেঙ্গল' বন্দরের নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু প্রায় সমকালীন পর্যটক ***সিজার ফ্রেডরিক*** কিংবা আরো দু'দশক পরে আগত, ***র‍্যাফল ফিচ্*** 'বেঙ্গল' বন্দরের কোন নামোল্লেখ করেননি। তবে সোনারগাঁও, সাতগাঁও (সপ্তগ্রাম), হুগলী, চট্টগ্রাম প্রভৃতি যে সেকালের খুব ব্যস্ত বন্দর ছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। সপ্তগ্রামে লক্ষপতি ব্যবসায়ীরা বাস করতেন। চৈতন্যচরিতামৃতে লেখা হয়েছে ঃ

"হিরণ্য-গোবর্ধন নামে দুই সহোদর,
সপ্তগ্রামে বার লক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর।"

বাংলার সাথে জলপথে মালাবার, কাম্বে, পেগু, টেনাসেরিম, সুমাত্রা, সিংহল, মালাক্কা, আরবদেশ ও পারস্যের বাণিজ্য লেনদেন চলত। চর্তুদশ শতকে ইবন বতুতা মাত্র চল্লিশ দিনে সমুদ্রপথে সোনারগাঁও থেকে সুমাত্রা পৌঁছেছিলেন। এ থেকে বোঝা যায়, তখনও সমুদ্রপথ, সমুদ্রযাত্রার গতি-প্রকৃতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতার অভাব ছিল না। বাংলাদেশ থেকে এশিয়া ও ইউরোপের নানা দেশে সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হত মসলিন বস্ত্র। এছাড়া ধান, আখ, সাদা চিনি, রেশম বস্ত্র, তুলা, আদা, মরিচ ও কিছু ফল বহির্দেশে রপ্তানি করা হত।

বাংলাদেশের উর্বরভূমি, প্রাকৃতিক শস্য-সম্পদ এবং প্রসারিত ব্যবসা-বাণিজ্য এদেশে যে প্রভূত সম্পদ সৃষ্টি করত, তার প্রেক্ষিতে এটি স্বাভাবিক যে, বাংলাদেশের মানুষ খুব সুখে দিনাতিপাত করতে পারত। অধিক উৎপাদনের ফলে জিনিসপত্রের মূল্য কম হত। মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে তা সহজে যেত না। ***ইবন বতুতা*** ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী হয়ে বাংলায় এসে বলেছিলেন যে, পৃথিবীর কোথাও বাংলাদেশের মত কম দামে জিনিস পাওয়া যায় না। ***অল মাসূদী*** নামক জনৈক মরক্কোবাসী ইবন বতুতাকে বলেছিলেন যে, একজন ভৃত্যসহ তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর বাৎসরিক খোরাক এক দিনারে হয়ে যেত। রৌপ্য-দিনার প্রায় এক টাকার সমান। স্বর্ণমানের হিসেবে সাত টাকা। ইবন বতুতার দেওয়া হিসেব অনুযায়ী তখন এক টাকার প্রায় ৮ মণ ধান পাওয়া যেত। সুলতান ও মুসলমান অভিজাতবৃন্দ কৃষিকার্যে উদাসীন হওয়ার ফলে যে জমিভিত্তিক বাঙালীগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছিল, তাদের অবস্থা ছিল সচ্ছল। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ধনী ব্যক্তিদের ঘরে সোনার ছড়াছড়ি থাকত। সম্ভবত সবথেকে সম্পদশালী ছিলেন বণিকসম্প্রদায়। এঁরা সীমাহীন ধন-সম্পদের অধিকারী ছিলেন এবং অস্বাভাবিক প্রাচুর্যের মধ্যে জীবনযাপন করতেন।

এদেশে সম্পদশালী ধনী ব্যক্তির পাশাপাশি দারিদ্র্যক্লিষ্ট সাধারণ মানুষের কথাও সমসাময়িক সাহিত্য থেকে পাওয়া যায়। দ্রব্যাদির মূল্য কম হবার ফলে কৃষকদের আয় বেশি হত না। তাই সাধারণ কৃষক ও প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশা কম ছিল না। এর প্রধান কারণ ছিল প্রজাদের উপর রাজস্ব আদায়কারীদের উৎপীড়ন। শাসকগণ কেবল রাজস্বের কথাই বুঝতেন। তাই জমিদার বা সামন্তদের প্রজাপীড়ন সুলতানের মাথাব্যথার কারণ হত না। কারণ অত্যাচারী ভূ-স্বামীরাই রাজকোষে অধিক অর্থ জমা দিতেন। মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের আমলেও এই ধারা অব্যাহত ছিল। তখন বাংলাকে শোষণ ও নিপীড়ন করে মুর্শিদকুলী খাঁ দিল্লীর কোষাগারে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দিতেন। অবশ্য একথাও সত্য যে, সুলতানি আমলের অর্থব্যবস্থায় কোন অসুস্থ প্রতিযোগিতা ছিল না। রায়তদের অবস্থা সামন্ত বা বণিকদের মত সচ্ছল না হলেও, তাদের সর্বহারাশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। সামগ্রিকভাবে সুলতানি আমলে বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থা ছিল 'সুপরিকল্পিত, সুবিন্যস্ত, যুক্তিপূর্ণ এবং সহনীয়।'

○ **গুজরাট ঃ**

অর্থনৈতিক কারণে গুজরাট রাজ্যের রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল বেশি। কাম্বে, সুরাট, ব্রোচ ইত্যাদি সমুদ্রবন্দরের সমাহারে গুজরাট ভারতের বাণিজ্যিক মানচিত্রে একটি উজ্জ্বল কেন্দ্র হিসেবে স্থান পেয়েছিল। এই বাণিজ্যিক গুরুত্বের জন্যই গুজরাটের প্রতি দেশী-বিদেশী রাজনৈতিক শক্তিগুলির লোলুপ দৃষ্টি ছিল। আলাউদ্দিন খলজী ১২৯৭ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাট রাজ্য দখল করে দিল্লী সুলতানি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। একজন প্রাদেশিক গভর্নরের নেতৃত্বে গুজরাটে সুলতানী শাসন কায়েম করা হয়। ফিরোজ শাহ তুঘলকের আমলে দিল্লী সুলতানির অবক্ষয়ের যুগে গুজরাটও দিল্লীর অধীনতা মুক্ত হবার প্রক্রিয়া শুরু করে। জনৈক ধর্মান্তরিত রাজপুত্রের সন্তান *জাফর খাঁ* ১৩৯১ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাটের গভর্নর নিযুক্ত হলে সেই প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। ১৪০১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৪০৩ খ্রীষ্টাব্দে জাফর খাঁ'র পুত্র তাতার খাঁ কিছু বিদ্রোহী অভিজাতদের সাথে ষড়যন্ত্র করে

জাফর খাঁকে অসওয়াল দুর্গে বন্দী করে নিজেকে সুলতান বলে ঘোষণা করেন। তিনি নাসিরউদ্দিন মহম্মদ শাহ নামে পরিচিত হন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী তাতার খাঁ দিল্লী অভিযান করে সুলতানি সাম্রাজ্য দখলের কর্মসূচী নেন। কিন্তু এই অভিযানে তিনি নিহত হন। এই সুযোগে জাফর খাঁ বন্দীমুক্ত হয়ে সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেন এবং সুলতান মুজফ্ফর শাহ উপাধি নিয়ে শাসন শুরু করেন।

মুজফ্ফর শাহ মালবের শাসক হুসাং শাহকে পরাজিত করে ধর দখল করতে সক্ষম হন। ১৪১১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পৌত্র আহমদ্ শাহ গুজরাটের শাসক হন। আহমদ্ শাহকে স্বাধীন গুজরাট রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়। পূর্ববর্তী দু'জন শাসকের আমলে গুজরাটের রাজ্যসীমা অসওয়ালের সন্নিহিত এক ক্ষুদ্র অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। আহমদ্ শাহ তাঁর সাহসিকতা ও উদ্যম দ্বারা রাজ্যসীমা বৃদ্ধি করেন এবং দীর্ঘ ত্রিশ বছর দক্ষতার সাথে রাজ্য পরিচালনা করেন। মালব, অসিরগড়, রাজপুতানা ও সন্নিহিত অন্যান্য অঞ্চলের বিরুদ্ধে তিনি সফল সামরিক অভিযান চালান। সাধারণ প্রশাসনকে সুসংগঠিত করা এবং নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা প্রণয়নের কাজে তিনি বিশেষ দক্ষতা দেখান। রাজত্বের প্রথম বছরেই (১৪১১ খ্রীঃ) তিনি সুদৃশ্য আহ্মেদাবাদ শহরের পরিকল্পনা করেন এবং এখানে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এই শহরের বিন্যাস ও বিভিন্ন সৌধের স্থাপত্যশৈলী তাঁর গভীর সংস্কৃতি মনস্কতার সাক্ষ্য বহন করে। অবশ্য বহুগুণের অধিকারী হলেও, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা তাঁর চারিত্রিক ঔজ্জ্বল্যকে খানিকটা ম্লান করে দিয়েছে।

সুলতান আহমদ্ শাহ'র মৃত্যুর (১৪৪২ খ্রীঃ) পর গুজরাটের শাসক হন তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র মহম্মদ শাহ (১৪২২-'৫১ খ্রিঃ)। তাঁর পরে সিংহাসনে বসেন যথাক্রমে তাঁর পুত্র কুতুবউদ্দিন আহমদ্ এবং ভ্রাতা দাউদ খাঁ। দাউদ খাঁ'র অযোগ্যতা ও দমনমূলক শাসন রীতি অভিজাতদের ক্ষুব্ধ ও বিদ্রোহী করে। বিদ্রোহী অভিজাতদের সমর্থনে আহমদ্ শাহের পৌত্র ফৎ খাঁ সিংহাসনে বসেন। তিনি *'মামুদ বেগর্হা'*র নামে অধিক জনপ্রিয় ছিলেন।

*ড. কালীকিঙ্কর দত্ত 'ডিস্ইন্টিগ্রেশন অফ দি দিল্লী সুলতানেট'*শীর্ষক প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন যে, মামুদ বেগর্হা ছিলেন তাঁর বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক *('Mahmud Begarha was by far the most eminent sultan of his dynasty')*। সমকালের অগ্রণী ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে, তিনি গুজরাট রাজ্যকে গৌরব ও দীপ্তি দ্বারা মহিমামণ্ডিত করেছেন। তাঁর আগে বা পরে গুজরাটের এমন দক্ষ প্রতিভাবান কোন শাসক আসেননি। উদারতা, ন্যায়পরায়ণতা, সাহস, শক্তি ইত্যাদি বহু গুণাবলীর সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর চরিত্রে। শাসন ক্ষমতা দখল করেই তিনি অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও সংহতি বিধানের উদ্যোগ নেন। প্রথমেই তিনি উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও বিরোধী আত্মীয় বা অভিজাতদের ক্ষমতাহীন করেন। কোন মন্ত্রী বা আত্মীয়ের পরামর্শ ছাড়াই তিনি প্রায় তিপান্ন বছর দক্ষতার সাথে শাসন পরিচালনা করেন।

প্রতিটি সামরিক অভিযানেই মামুদ সফল হন। তিনি মালবের সুলতান মামুদ খলজীর আক্রমণ থেকে বাহমনী নিজাম শাহী বংশকে রক্ষা করেন। কুচের দুর্ধর্ষ সুমরা ও বোধা উপজাতী সর্দারদের তিনি দমন করেন এবং জগৎ (দ্বারকা)-এর জলদস্যুদের বিতাড়িত করেন। মামুদ বেগর্হা'র সামরিক সাফল্যের ফলে গুজরাট রাজ্যের চূড়ান্ত বিস্তৃতি সম্ভব হয়। দুটি রাজপুত দুর্গ গিরনার ও চম্পানের দখল নিয়ে তিনি নিজ শক্তি বৃদ্ধি করেন। তার আমলে গুজরাটের রাজ্যসীমা পশ্চিমে

আরব সাগর, পূর্বে মালবদেশ ; উত্তরে রাজস্থানের জালোর ও নাগৌর এবং দক্ষিণে খান্দেশ-এর সীমানা পর্যন্ত প্রসারিত হয়। রাজত্বের শেষ দিকে মামুদ মিশরের সুলতান আল ঘউর-এর সাথে যুক্তভাবে ভারত সাগরে পর্তুগীজদের ক্ষমতার প্রসার রোধ করার প্রয়াস চালান। *ভাস্কো-ডা-গামা* কর্তৃক উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ভারতে আসার পথ আবিষ্কারের কয়েক দশকের মধ্যেই পর্তুগীজদের লোহিত সাগর ও মিশরের মধ্যে চলাচলকারী লাভজনক মশলা বাণিজ্য নিজের কুক্ষীগত করে নেয়। এর ফলে ক্যাম্বে, চাউল প্রভৃতি পশ্চিম ভারতীয় বন্দরগুলি এবং এখানে বাণিজ্যরত মুসলমান বণিকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জেড্ডার গভর্নর আমির হুসেন-এর নেতৃত্বে মিশরীয় নৌবহর এবং মালিক আয়াজ-এর নেতৃত্বে গুজরাটের বাহিনীর যৌথ আক্রমণে ১৫০৮ খ্রীষ্টাব্দে চাউল বন্দরে পর্তুগীজরা পরাজিত হয়। কিন্তু পরের বছরেই পর্তুগীজদের পাল্টা আক্রমণে মুসলমান বাহিনী প্রচণ্ডভাবে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হয়। সুলতান মামুদ পর্তুগীজদের সাথে এক সমঝোতায় আসতে বাধ্য হন। দিউ'তে পর্তুগীজদের কারখানা স্থাপনের জন্য একটি জমি বরাদ্দ করা হয়। শিল্প-স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসেবেও তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল। বারথেমা ও বারবোসার বিবরণে তাঁর জনপ্রিয় গুণাবলীর বহু উল্লেখ পাওয়া যায়।

মামুদ বেগর্‌হা'র মৃত্যুর (১৫১১ খ্রীঃ) পর গুজরাটের সুলতান হন তাঁর পুত্র দ্বিতীয় মুজফ্‌ফর শাহ। মালবের সুলতানের মিত্ররূপে তিনি মেবারের রানা সংগ্রাম সিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং সাফল্যের সাথে সুলতান মামুদ খলজীকে মালবের সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। মুজফ্‌ফর-এর মৃত্যুর পর তাঁর দুই পুত্র সিকন্দর ও দ্বিতীয় মামুদ স্বল্পকালের জন্য সিংহাসনে বসেন। অতঃপর সিংহাসনে বসেন গুজরাটের আর এক সফল শাসক বাহাদুর শাহ (১৫২৬-'৩৭ খ্রীঃ)। পিতামহ মামুদ বেগর্‌হার মতই সাহসী ও সুযোদ্ধা বাহাদুর শাহ মধ্যযুগের ভারত-ইতিহাসের একজন খ্যাতিমান ব্যক্তি হিসেবেই চিহ্নিত হন। একের পর এক রাজ্যকে পরাজিত করে তিনি গুজরাটের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেন। ১৫৩১ খ্রীষ্টাব্দে মালবের শাসক দ্বিতীয় মামুদকে তিনি পরাজিত করেন ও তাঁর রাজ্য দখল করে নেন। ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাটের অন্যতম প্রধান প্রতিপক্ষ মেবার রাজ্য আক্রমণ ও ধ্বংসকার্য চালান। গুজরাটের সেনাবাহিনী মেবারের রাজধানী চিতোরের উপর ব্যাপক লুঠতরাজ চালায়। কিন্তু আশ্চর্য্যজনকভাবে তিনি মুঘল শাসক হুমায়ুনের কাছে পরাজিত হন। এই ব্যর্থতার ফলে গুজরাট রাজ্যের কিছু অংশ মুঘলের অধিকারভুক্ত হয়। এদিকে পূর্ব-ভারতে শেরখানের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হুমায়ুন গুজরাট ছেড়ে চলে এলে বাহাদুর শাহ তাঁর হারানো অঞ্চলগুলি পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন। অতঃপর তিনি পর্তুগীজদের বিতাড়িত করার পরিকল্পনা করেন। ইতিপূর্বে মুঘলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পর্তুগীজদের সামরিক সাহায্যের বিনিময়ে বাহাদুর শাহ দিউ'তে পর্তুগীজদের একটি দুর্গ নির্মাণের অনুমতি দিয়েছিলেন (১৫৩৫ খ্রীঃ)। কিন্তু মুঘলের সাথে যুদ্ধকালে তিনি পর্তুগীজদের কোন সাহায্য পাননি। তখন হুমায়ুন শেরখানের সাথে যুদ্ধে ব্যস্ত হয়ে পড়লে বাহাদুর শাহ পর্তুগীজদের দমন করার কর্মসূচী নেন। ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পর্তুগীজ গভর্নর দ্য কুন্‌হো'র সাথে বোঝাপড়ার জন্য অগ্রসর হন। বাহাদুর শাহের মনোভাব পর্তুগীজরা আগেভাগেই বুঝতে পেরে গিয়েছিল। তাই এক ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা পর্তুগীজরা বাহাদুর শাহর নৌ-যানগুলি সমুদ্রে ডুবিয়ে দেয়। বাহাদুর শাহের উত্তরাধিকারীরা সবাই ছিলেন অদূরদর্শী ও অদক্ষ। এই

সুযোগে উচ্চাকাঙ্ক্ষী অভিজাতরা ধীরে ধীরে সমস্ত ক্ষমতা দখল করে নেন। অভিজাতদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব তীব্রতর রূপ নেয়। গুজরাট তার অতীত গৌরব হারিয়ে একটি অন্তর্দ্বন্দ্বে দীর্ণ রাজ্যে পরিণত হয়। শেষ পর্যন্ত সম্রাট আকবর ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাটকে মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

○ রাজস্থান ঃ রাজপুতদের উদ্ভব ও বৈশিষ্ট্য ঃ

আদি-মধ্যযুগের ভারতীয় সমাজ ও রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ে *'রাজপুত'* নামক নতুন জাতির উত্থান। রাজপুতদের উৎপত্তি সম্পর্কে নানামত প্রচলিত আছে। গুপ্ত-পরবর্তী যুগে ভারতে বসবাসকারী বিদেশীদের মধ্য থেকে রাজপুতদের উৎপত্তি বলে যেমন মনে করা হয় ; তেমনি কেউ কেউ এদের আর্যবংশ সম্ভূত যোদ্ধা জাতি বলেই সিদ্ধান্তে এসেছেন। আবার ভারতের নিম্নবর্ণভুক্ত কোন কোন জাতি সামাজিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে রাজপুত এবং ক্ষত্রিয় বর্ণভুক্ত হয়েছে বলেও অনেকের ধারণা। আধুনিক ইতিহাসচর্চায় ভারতের পরিবর্তনশীল আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রাজপুতদের উৎপত্তি ও রাজনৈতিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা হয়।

অধ্যাপিকা রোমিলা থাপার লিখেছেন, *"এরা (রাজপুত) যে কোথা থেকে এসেছিল, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। সম্ভবত এরা বিদেশী। এমন ধারণার কারণ হলো, ব্রাহ্মণরা বিশেষ প্রচেষ্টা করে এদের রাজবংশ সম্ভূত বলে আখ্যা দিয়েছে এবং তাদের ক্ষত্রিয় বর্ণভুক্ত করেছে। ব্রাহ্মণরা রাজপুতদের আদি পূর্বপুরুষ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাদের একেবারে সূর্যবংশ বা চন্দ্রবংশ সম্ভূত বলে বর্ণনা করেছে। অর্থাৎ পৌরাণিক ঐতিহ্যের ধারা অনুসারে কোন রাজবংশকে যতখানি মর্যাদাসম্পন্ন করা যায়, রাজপুতদের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণরা সেই চেষ্টাই করেছে।"*[1] কোন কোন পণ্ডিত এই প্রসঙ্গে *'চাঁদ রইসা'* গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। এতে বলা হয়েছে যে, আবু পর্বতে এক পবিত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়েছিল। সেই যজ্ঞের অগ্নিকুণ্ড থেকে এক পৌরাণিক মানুষের সৃষ্টি হয়। সেই মানবের বংশধর হলো রাজপুতদের চারটি গোষ্ঠী (১) প্রতিহার বা পরিহার। গুর্জর-প্রতিহারদের সাথে স-পর্ক থাকলেও এরা অভিন্ন নয়। (২) চাহমান বা চৌহান, (৩) চৌলুক্য। দাক্ষিণাত্যের চালুক্য এবং এরা স্বতন্ত্র। এরা সোলাংকি নামেও অভিহিত হয় এবং (৪) পরমার বা পাওয়ার। এই কারণে এই চারটি বংশ *'অগ্নিকুল'* নামে খ্যাত। এই কিংবদন্তীর মাধ্যমে বিদেশী হূন জাতির সাথে রাজপুতদের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া সম্ভব। ***অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়*** লিখেছেন, *"অগ্নিকুলোদ্ভব'* এক বিশেষণ মাত্র। এর তাৎপর্য হলো যে সম্ভবত অগ্নিশুদ্ধি দ্বারা বর্ণবহির্ভূত বিদেশীকে উচ্চবর্ণের হিন্দু *পর্যায়ে উন্নীত করা হয়েছিল। রাজপুতানা বা রাজস্থান ও দক্ষিণ পাঞ্জাবের হূন, শক প্রভৃতি বিদেশী এইভাবে হিন্দু সমাজে প্রবেশের অধিকার লাভ করে।"* ***রোমিলা থাপার***-এর মতে, বিদেশী হূন এবং তাদের ভারতে অনুপ্রবেশকালে আরো ভিন্ন ভিন্ন উপজাতির যেসব লোক ভারতে এসেছিল এবং পরে উত্তর ও পশ্চিম ভারতে বসতি স্থাপন করেছিল, রাজপুতরা তাদেরই বংশধর। গুপ্ত রাজাদের শিলালিপি থেকে জানা যায় যে হূনদের আক্রমণের সময় রাজস্থানে ছোট ছোট

গণরাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। উদারতন্ত্রী গণরাজ্যগুলিতে বর্ণ ব্যবস্থার কঠোরতা ছিল না। ঐতিহ্য নিয়ে এরা মাথা ঘামাত না। ফলে হূন আক্রমণকারীরা খুব সহজে এইসব অঞ্চলের অধিবাসীদের সাথে মিশে যেতে পারে। উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজনৈতিক অস্থিরতা এই সাঙ্গীকরণের কাজকে সহজ করেছিল।

বি. এন. এস. যাদব-এর মতে বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ এবং উপজাতীয়দের মধ্য থেকেই বিভিন্ন রাজপুত গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছিল। অধ্যাপক ***শশীভূষণ চৌধুরীর*** অনুমান যে, রাজপুতদের বহু কথিত ছত্রিশটি গোষ্ঠীর মূল শিকড় ছিল ভারতবর্ষেই। যদিও হূন বা গুর্জরদের মত বহিরাগত উপজাতিগুলি রাজপুতদের মর্যাদা দাবি করে। *'বৃহৎধর্মপুরাণ'*গ্রন্থে রাজপুতদের একটি 'মিশ্র' জাতি বলা হয়েছে। *'শূদ্র কমলাকর'*গ্রন্থের লেখক রাজপুতদের 'উগ্র' অর্থাৎ ক্ষত্রিয় পুরুষ ও শূদ্রানারীর সন্তানরূপে গণ্য করেছেন। ***অধ্যাপক যাদব*** মন্তব্য করেছেন যে, এই সকল কিংবদন্তী আদি-মধ্যযুগে ক্ষত্রিয় শাসক ও অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে তথাকথিত নিম্নস্তরের উপাদানের উপস্থিতির সম্ভাবনা ইঙ্গিত দেয়। অবশ্য রাজপুতরা এবং বিশেষ করে 'অগ্নিকুল' ভুক্ত চারটি বংশে নিজেদের সোচ্চারে ক্ষত্রিয় বলে গর্ববোধ করত।

রাজপুতরা আদি ভারতীয় বর্ণব্যবস্থার অংশ ক্ষত্রিয় বর্ণভুক্ত, নাকি রূপান্তর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তারা ক্ষত্রিয়ত্ব অর্জন করেছে, এই বিতর্কে দশম-একাদশ শতকের কিছু বিবরণ ও লিপি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করে। আরবদেশীয় পর্যটক *ইব্‌ন খুরদাদ্‌বাহ* (মৃত্যু ৯১২ খ্রীঃ) লক্ষ্য করেছিলেন যে ভারতের ক্ষত্রিয় সম্প্রদায় দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—(১) সারকুফ্রীয় বা সৎক্ষত্রিয় এবং (২) কতরীয় বা ক্ষত্রিয়। দশম শতকের একটি লেখতে দেখা যায় যে পাঞ্জাবের ভাতিণ্ডা অঞ্চলের জনৈক রাজা নিজেকে *'সুক্ষত্রিয়ান্বয়-বিভূষণ'*নামে উল্লেখ করেছেন। একাদশ শতকের প্রখ্যাত লিপিকার ক্ষেমেন্দ্র এবং দ্বাদশ শতকে উমাপতি ধর *'সুক্ষত্রিয়'*শব্দটি নানাক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। বৎসরাজ লিখিত *'কিরাতার্জুনীয়'*গ্রন্থে (দ্বাদশ শতক) 'সৎক্ষত্রিয়' শব্দটি পাওয়া যায়। ***সি. ভি. বৈদ্য (C. V. Vaidya)*** মনে করেন যে, শাসক গোষ্ঠী *'সুক্ষত্রিয়'*নামে পরিচিত হত এবং সাধারণ কৃষিজীবির একাংশ *'ক্ষত্রিয়'*নামে অভিহিত হত। কিন্তু ঐতিহাসিক ***যাদব (B. N. S. Yadav)*** মনে করেন এই নামকরণের আরো গভীর মাত্রা আছে। *'পৃথ্বিরাজ বিজয়'*গ্রন্থে কিছু মানুষকে *'বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়'*বলা হয়েছে। আবার এ কথাও স্বীকার করা হয়েছে যে অনেকেই গায়ের জোরে ক্ষত্রিয়ত্ব অর্জন করেছে। *'দ্বয়াশ্রয়'* গ্রন্থে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় (যুদ্ধক্ষত্র) ও সাধারণ ক্ষত্রিয়দের পৃথক অস্তিত্বের কথা স্বীকার করা হয়েছে। *'বর্ণরত্নাকর'*, গ্রন্থে রাজপুত গোষ্ঠীগুলির দুটি পৃথক তালিকা দেওয়া হয়েছে। একটি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত আছে ছত্রিশটি কুলীন গোষ্ঠীর নাম। অন্যটিতে অন্যান্য অসংখ্য গোষ্ঠীর নাম উল্লেখ আছে।

জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চায় 'রাজপুত'দের ভারতীয় উৎসের তত্ত্ব প্রচার করা হয়। ইতিহাসমূলক সাহিত্যসমূহে রাজপুতদের সাহসিকতা, সততা ও সামরিক দক্ষতার নানা কাহিনী প্রচার করে তাদের জাতীয় বীরের পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। ***অধ্যাপক বৈদ্য (C.V. Vaidya)*** এই প্রসঙ্গে প্রায় চরমপন্থী মতবাদে বিশ্বাস করেন। তিনি মনে করেন যে আদি-মধ্যযুগে রাজপুতরা ঐতিহ্যগত পরম্পরা রক্ষা করার জন্য যে সাহসিকতা ও ত্যাগ প্রদর্শন করেছে, তা একমাত্র বৈদিক আর্যদের কাছ থেকেই আশা করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন, ***"The Rajputs***

who now came to the front and who by their heroism diffuse such glory on the period of Medieval Indian history cann(! but have been the descendents of vedic Aryans. None by vedie Aryans could have fought so valiantly in defence of ancestral faith"[1] অনুরূপ বক্তব্যের আর একটি দিক্ হলো যে, *"রাজপুতরা ক্ষত্রিয়দের মতই দেশ, জাতি ও সংস্কৃতির জন্য নিরন্তর সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে ভারতীয় রাজনীতির শীর্ষে উঠে আসতে সক্ষম হয়।"*[2]

অধ্যাপক ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় *'Origin of the Rajputs'* শীর্ষক প্রবন্ধে রাজপুতদের উত্থান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[1] তাঁর মতে, আদি-মধ্যযুগে সামাজিক উত্তরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন জাতি বা গোষ্ঠীর সামাজিক মর্যাদাময় 'ক্ষত্রিয়' অভিধা অর্জনের প্রয়াস থেকে 'রাজপুত' শব্দটির উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা সম্ভব। তাই রাজপুতদের উৎপত্তি ঘটনাটিকে কোন একটি গোষ্ঠীর বংশানুক্রমিক ধারাকে প্রকাশ করার উদ্যোগ রূপে না দেখে বিভিন্ন উপজাতিভুক্ত গোষ্ঠী কর্তৃক সামাজিক ও রাজনৈতিক মর্যাদা বৃদ্ধির প্রয়াস হিসেবে দেখা উচিত। তিনি বলেছেন যে 'রাজপুত' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ 'রাজপুত্র' হলেও প্রকৃতপক্ষে রাজপুত বলতে রাজপুতানা অর্থাৎ বর্তমান রাজস্থানের বিশেষ বিশেষ অভিজাত যোদ্ধাশ্রেণীকে বোঝায়। সাধারণভাবে রাজপুত ও অ-রাজপুতদের মধ্যে পৃথকীকরণের কাজ বেশ জটিল। বিভিন্ন লিপি ও সাহিত্যে *'রাজপুত্র'* শব্দের ব্যবহার সত্ত্বেও, একথা সত্য! *'কুমারপাল চরিত'*, *'বর্ণরত্নাকর'*, এমনকি *'রাজতরঙ্গিনী'* গ্রন্থেও রাজপুতদের ছত্রিশটি গোষ্ঠীর নাম পাওয়া যায়। এই তালিকার নামগুলির অভিন্নতা নেই। ড. ***চট্টোপাধ্যায়ের*** মতে, সমকালীন সংগ্রাহকরাও এদের অপরিবর্তনীয়তা অস্বীকার করেছেন। এই দিক থেকে আদি-মধ্যযুগ ও মধ্যযুগে 'রাজপুতরা' ছিল মিশ্রজাতি। দ্বাদশ শতকের রচনা ***'অপরাজিত প্রছা'*** (Aparajita prachha)-এর সাক্ষ্য অনুযায়ী এই রাজপুতদের অনেকেই ছিল ভূম্যাধিকারী ও ছোট ছোট আঞ্চলিক সর্দার। রাজপুত্রদের ক্ষমতায় উত্তরণের সূচনাপর্বে রাজপুতদের গোষ্ঠী গঠনের শর্তাবলী তৈরি করা হয়। রাজনৈতিক কর্তৃত্বের দিক থেকে অগ্রণী গোষ্ঠীগুলির নামোল্লেখ সমকালীন লিপি বা সাহিত্যে বার বার পাওয়া যায়। যেমন—চাহমান (বা চৌহান), প্রতিহার ইত্যাদি।

আদি-মধ্যযুগের প্রত্নতত্ত্ব ও সাহিত্য উপাদানগুলির সাক্ষ্য থেকে ঐতিহাসিক অনুমান যে দুটি বিশেষ প্রবণতা থেকে রাজপুতদের উদ্ভব ও বিকাশের গতিপ্রকৃতি অনুধাবন করা যায়। একটি প্রবণতা হলো রাজপুতনার বিভিন্ন অঞ্চলে যোদ্ধা গোষ্ঠীগুলির নতুন উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। সমকালীন কোন কোন লিপির সাক্ষ্যে কৃষি এলাকার সম্প্রসারণ থেকেই এই বসতি বিস্তারের সমর্থন পাওয়া যায়। *অধ্যাপক কে. সি জৈন* তাঁর *'Ancient cities and Towns of Rajasthan (Delhi, 1972)'* শীর্ষক গবেষণা গ্রন্থে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের ভিত্তিতে রাজস্থানের নানা অঞ্চলে নতুন বসতি বিস্তারের তথ্য প্রমাণ তুলে ধরেছেন। চাহমান বা চৌহানরা ছিল রাজপুতদের একটি শক্তিশালী গোষ্ঠী। আদি-মধ্যযুগের পক্ষে চাহমানদের অধিকৃত ভূখণ্ডকে

'*সপাদ লক্ষ্য*' বা তাদের পদতল দ্বারা চিহ্নিত অঞ্চল বলে অভিহিত করা হয়েছে। '*স্কন্দ পুরাণ*' গ্রন্থে রাজপুতদের রাজ্য ও অধিকৃত জনপদের সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। নানান অঞ্চলে প্রাপ্ত একটি লিপিতে নাডোল-চাহমান বংশের পক্ষে দাবি করা হয়েছে যে, তাঁদের রাজ্য 'সপ্তশত' নামে পরিচিত ছিল এবং জনৈক চাহমান নৃপতি সীমান্তবর্তী সর্দারদের হত্যা করে তাদের ভূখণ্ডগুলিকে চাহমান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং চাহমান রাজ্য '*সপ্তসাহস্রিকা*'নামে পরিচিত হয়। এই সংখ্যাবাচক অভিধা এবং অভিধার পরিবর্তন রাজপুত রাজ্যের ক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধির সংকেত দেয়। ***অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের*** মত, এইসকল প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য সপ্তম শতকে কৃষি অর্থনীতির বিকাশের সাথে রাজপুতদের উত্থানের সম্পর্ক নির্দেশ করে। কিস্কিন্ধার গুহিলাদের প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য সেচ ব্যবস্থা সমন্বিত কৃষি উৎপাদনের যে প্রমাণ দেয়, তার সমর্থন পাওয়া যায় মান্দোর-এর প্রতিহারদের লেখতে। ৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত কাক্কাকু'র ঘটিয়ালা লেখতে তাঁকে এই বলে কৃতিত্ব দেওয়া হয়েছে যে তিনি অগম্য ভাটানানকা অঞ্চল দখল করে সেই অঞ্চলকে কৃষি-সমৃদ্ধ করে তোলেন। বলা হয়েছে '*Kakkuka made the land fragrant with the leaves of blue lotuses and pleasant with groves of mango and madhuka trees, and coverd it with leaves of excellent sugarcane.*'[1] ৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের অপর একটি দলিলে 'অভীর' উপজাতি অধ্যুষিত একটি দুর্গম অঞ্চলে রাজপুত সংস্কৃতি বিস্তারের দাবি করা হয়েছে। আদি-মধ্যযুগের লেখগুলিতে রাজ্য জয়ের পাশাপাশি অধিকৃত সভ্য ও সংস্কৃতবান মানুষ বিবর্জিত অঞ্চলগুলিতে ব্রাহ্মণ, সৈনিক ও মহাজনদের পুনর্বাসনের কৃতিত্ব কাক্কুকাকে দেওয়া হয়েছে। সমকালীন লেখতে 'হট্ট', 'মহাজন' ইত্যাদি শব্দ থেকে উক্ত অঞ্চল সমূহে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থার প্রচলনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পশ্চিম ও মধ্য ভারতের কিছু লিপিতে শাসকশ্রেণী কর্তৃক শবর, ভীল, পুলিন্দ প্রভৃতি স্থানীয় উপজাতি সম্প্রদায়কে দমনের কাহিনী জানা যায়।

আদি-মধ্যকালীন লিপিসমূহ থেকে রাজপুত জাতির উদ্ভবের অন্তত দুটি বৈশিষ্ট্য বোঝা যায়। ***প্রথমত***, বেশ কিছু অঞ্চলে তথাকথিত রাজপুত শক্তির উত্থান ও প্রসার ঘটেছিল স্থানীয় উপজাতি বসতিগুলি দখলের মাধ্যমে। গুহিল ও চাহমান বংশের ক্ষেত্রে এই চিত্রটি পরিষ্কার। গুহিলদের (বা (গুহিলট) কৃতিত্ব বিষয়ক অসংখ্য চারণগীতিতে ভীল উপজাতি সর্দারদের সরিয়ে দক্ষিণ রাজস্থানে গুহিল রাজ্য প্রতিষ্ঠার উল্লেখ আছে। ***জেমস্ টড্***-এর '*Annals and Antiquities of Rajasthan*' গ্রন্থ এবং একলিঙ্গজী মন্দিরের গাত্রে খোদিত লিপি থেকে গুহিলদের সাথে ভীল উপজাতির সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া যায়। চাহমানদের লিপি থেকে জানা যায় যে তারা অহিচ্ছত্রপুর থেকে 'শাকম্ভরী' বা জঙ্গলদেশে কর্তৃত্ব সম্প্রসারণ করেছিল। 'জঙ্গল দেশে' রাজপুতদের সম্প্রসারণকে একটি অজ্ঞাত অঞ্চলে উপনিবেশ বিস্তারের ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করা যায়। উত্তর-পূর্ব মাড়োয়াড়ে চাহমানদের নাদোল গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা ঘটান শ্রীলক্ষ্মণ। '*পুরাতনপ্রবন্ধ সংগ্রহ*' শীর্ষক গ্রন্থে লক্ষ্মণকে একজন দুঃসাহসিক সামরিক অভিযানকারী এবং গডোয়ার অঞ্চলে মেদ উপজাতিদের পরাস্ত করে চাহমান রাজ্য প্রতিষ্ঠাকারী হিসেবে প্রশংসা

করা হয়েছে। *'পাল্লিভল চাঁদ'* শীর্ষক লোকগাথাতেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এই লোকগাথার বিষয়বস্তু হলো রাঠোর শিহা কর্তৃক 'মেদ্' ও 'মিন' প্রভৃতি উপজাতীয়দের বশীভূত করার কাহিনী। *ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়ের* মতে উপজাতীয় অঞ্চলে রাজপুত রাজনীতির প্রতিষ্ঠাকে রাজস্থানের উপজাতীয় অর্থনীতি থেকে আধুনিক ও উন্নত, সীমিত অর্থে, অর্থনীতিতে রূপান্তরের ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

দ্বিতীয়ত, শুধুমাত্র বসতি বিস্তার (colonization) প্রক্রিয়া দ্বারা রাজপুতদের উদ্ভব হয়েছিল, এমন ধারণা ঠিক নয়। এক্ষেত্রে সামাজিক গতিশীলতার (Social mobility) বিশেষ ভূমিকা ছিল। সপ্তম শতকে দেশের সর্বত্র সামাজিক নিম্নস্তরের মানুষের উচ্চতর 'ক্ষত্রিয়' স্তরে উন্নীত হওয়ার যে প্রবণতা সক্রিয় ছিল, রাজস্থানও তা থেকে মুক্ত ছিল না। রাজপুতদের ছত্রিশটি গোষ্ঠীর মধ্যে 'মেদ' ও 'হূণ'দের নাম পাওয়া যায়। *অধ্যাপক যাদব (B. N. Jadav)* দেখিয়েছেন যে, নিম্নশ্রেণীভুক্ত 'মেদ' উপজাতি ও বহিরাগত 'হূণ'দের রাজপুত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্তি সামাজিক ক্রমোচ্চস্তরে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অন্যতম দৃষ্টান্ত।[1]

অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সরকার, রোমিলা থাপার প্রমুখ দেখিয়েছেন যে, আদি-মধ্যযুগে বিভিন্ন জাতি ও উপজাতি কাল্পনিক বংশ তালিকা তৈরি করে 'ক্ষত্রিয়' মর্যাদা অর্জনের চেষ্টা করত। গুর্জর-প্রতিহারদের উত্থানের সেই একই প্রবণতা সক্রিয় ছিল। পশুপালক গুর্জরদের সাথে প্রতিহারদের সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রয়াস কেউ কেউ করেছেন। এঁদের মতে 'গুর্জর-প্রতিহার' শব্দগুচ্ছের গুর্জর বলতে হূণদের বংশধর এবং গুজরাটে বসবাসকারী 'গুর্জর'দের বোঝান হয়নি। তবে অধিকাংশ পণ্ডিত মনে করেন যে পুশুপালক গুর্জর বংশের উত্তরাধিকারী হলো রাজপুত প্রতিহার বংশ। *অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়* দেখিয়েছেন যে সপ্তম শতকে পশ্চিম-ভারতে একাধিক গুর্জর শাসকগোষ্ঠীর অস্তিত্ব, আলোয়ার অঞ্চলে প্রতিহারদের 'বাড়গুর্জর' নামে পরিচিতি কিংবা 'পঞ্চতন্ত্র' গ্রন্থে গুর্জরদের উট বিক্রেতা হিসেবে উল্লেখ প্রমাণ করে যে গুর্জর-প্রতিহার অভিন্ন এবং পশুপালক গুর্জর থেকেই প্রতিহারদের আবির্ভাব। মেবারের গুহিলট বংশের প্রতিষ্ঠাতা বাপ্পা'র উপাধি ছিল 'রাওল' বা রাজকুল। অর্থাৎ কোন রাজবংশের সামন্ত হিসেবেই মেবারের গুহিল রাজবংশ প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। অনুরূপভাবে গুজরাট ও রাজস্থানের চাহমান বা চৌহানরা ছিল গুর্জর-প্রতিহারদের সামন্ত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে চাহমান বংশতালিকার দ্বিতীয় নামের সাথে 'সামন্ত' উপাধি যুক্ত, কিন্তু তৃতীয় নামের সাথে 'নৃপ' বা 'নরদেব' শব্দটি যুক্ত। ১১৬৯ খ্রীষ্টাব্দের বিজহলি লিপিতে এই প্রভেদ দেখা যায়। 'সামন্ত' পদ থেকে স্বাধীন শাসক হিসেবে এই রূপান্তর ঘটে সামরিক শক্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে।

রাজপুতদের আবির্ভাবের একটি অর্থনৈতিক স্তরের অস্তিত্ব লক্ষণীয়। এই ব্যবস্থায় দেখা যায় যে প্রতিহার ও চাহমানদের মত বৃহদাকার গোষ্ঠী এবং অন্যান্য ছোট ছোট রাজপুত গোষ্ঠীগুলির মধ্যে এক বিশেষ ধরনের জমি বন্দোবস্ত ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এই ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হলো শুধুমাত্র নিজ গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে উর্ধ্বতন প্রভু কর্তৃক ভূমি বণ্টনের বাধ্যবাধকতা পালন করা এবং এর লক্ষ্য ছিল নিজ নিজ গোষ্ঠীর ক্ষমতা ও পরিধি বিস্তার

করা। চাহমানদের বংশ কর্তৃত্ব বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা খুবই সক্রিয় ছিল। তুলনামূলকভাবে বৃহত্তর প্রতিহার রাজ্যের মধ্যে ভূস্বামী হিসেবে অ-প্রতিহার বা অ-রাজপুতদের অস্তিত্ব ছিল। তবে আলোয়ারের গুর্জর-প্রতিহার মন্থন-এর রাজোরগড় লিপিতে *'বংশপোতকভোগ'* শব্দের উল্লেখ থেকে স্ববংশীয়দের মধ্যে ভূমি বণ্টন প্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায়। চাহমানদের হর্ষ লেখতে (৯৭৩ খ্রীঃ) এই ধরনের ভূমিবণ্টনের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানে সিংহরাজ, তাঁর দুই ভ্রাতা ও দুই পুত্রের 'স্বভোগ' বা ব্যক্তিগত জমির বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। এখানে গুহিল বংশীয় জনৈক ব্যক্তির জমিও জনৈক উচ্চ কর্মচারীর 'ভোগ'-এর উল্লেখ আছে। তবে জমি হস্তান্তরের প্রশ্নে চাহমানবংশীয় ও বংশবহির্ভূত ব্যক্তির অধিকারগত প্রভেদ ছিল।

ভূমি বণ্টন ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত আর একটি বিষয় হল গ্রামের সমষ্টি বা একক নির্ধারণ। রাজপুতদের ভূমিব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ছিল ছয়টি গ্রামের সমষ্টি নিয়ে একটি একক গঠন। বৃহত্তর এককগুলি গঠিত হত ৬-এর গুণিতকে যেমন—বারো, আঠারো, চব্বিশ, ত্রিশ ইত্যাদি। এই এককগুলি মণ্ডল, ভুক্তি, বিষয় ইত্যাদি প্রশাসনিক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তথাপি সমকালীন লিপির বক্তব্য থেকে অনুমিত হয় যে এই ধরনের এককগুলি স্থানীয় কর্তৃত্বের ভিত্তি হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ছয়-এর গুণিতকে সৃষ্ট চুরাশিটি গ্রামের এক একটি প্রশাসনিক এককের নেতা 'চৌরাশিয়া' অভিধায় পরিচিত হতেন। নবম শতকে গুর্জর-প্রতিহার বংশীয় রাজপুত গোষ্ঠীর অধীনে এমন বৃহত্তর এককের প্রাথমিক উল্লেখ দেখা যায়। ক্রমে শাসকশ্রেণীর গোষ্ঠীগত নিয়ন্ত্রণ জোরালো করার জন্য এই ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হয়। চতুর্দশ শতকে 'চৌরাশিয়া' পদের শাসকদের 'বিশালদেবরসো' গ্রন্থে 'অতি পরিচিত শাসক গোষ্ঠী' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই ব্যবস্থার গুরুত্ব প্রসঙ্গে ***ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়*** লিখেছেন, "*.......the rudiments of the 'caurasia' arrangement and its connection with distribution of land can be traced to the early phases of the crystallization of Rajput polity.*"[1]

শাসনতান্ত্রিক একক হিসেবে ভূমি বন্দোবস্ত দেবার সঙ্গে সঙ্গে শাসকশ্রেণী উক্ত অঞ্চলে নিজেদের কর্তৃত্ব সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে দুর্গ প্রাকার নির্মাণ করেন। *অধ্যাপক জৈন* দেখিয়েছেন যে, আদি-মধ্যযুগে রাজপুতদের উত্থানের সাথে দুর্গাদি নির্মাণ দ্বারা ক্ষমতা সংহত করার প্রবণতা একটা বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছিল, কারণ প্রাচীন রাজস্থানে দুর্গের অস্তিত্ব ছিল না।[2] গুর্জর প্রতিহারদের গোপগিরি লেখতে আদি-মধ্যযুগে একটি দুর্গের সামরিক ও প্রতিরক্ষা-বিষয়ক গুরুত্ব সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়েছে। আদি-মধ্যযুগে রাজস্থানের নানা অঞ্চলে রাজপুত শক্তির প্রতীক হিসেবে নির্মিত দুর্গগুলির অন্যতম হল কাম্যকিয়কোট্ট (ভরতপুর), রাজ্যপুরা (রজোর), মন্দভ্যপুর দুর্গ (মান্দোর), চিত্রকূট মহাদুর্গ (চিতোর), কোষবর্ধনদুর্গ (কোটা), শুভরণগিরি দুর্গ (জালোর), শ্রীমালিয়াকোট্ট (ভিনমল) ইত্যাদি। শাসকগোষ্ঠীর ক্ষমতার ভিত্তি এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ভূস্বামীদের উপর নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার ছিল এই সকল দুর্গ।

ভূমিভিত্তিক অভিজাত শাসকশ্রেণী হিসেবে রাজপুতদের উদ্ভবের ফলেই তাদের মধ্যে বিভিন্ন স্তর ও মর্যাদার উৎপত্তি হয়। *'অপরাজিতা প্রচ্ছা'* গ্রন্থে দেখানো হয়েছে যে ক্ষত্রিয় রাজপুতশ্রেণী এক জটিল স্তর বিভাজনের মধ্যে আবদ্ধ ছিল —

অভিধা	গ্রামের সংখ্যা
(১) মহামণ্ডলেশ্বর	(১) ১,০০,০০০
(২) মাণ্ডলিক	(২) ৫০,০০০
(৩) মহাসামন্ত	(৩) ২০,০০০
(৪) সামন্ত	(৪) ১০,০০০
(৫) লঘু সামন্ত	(৫) ৫,০০০
(৬) চতুরাংশিক	(৬) ১,০০০

এই স্তর বিন্যাসের সর্বোচ্চ ছিলেন সমগ্র রাজ্যের অধীশ্বর মহারাজধিরাজ। নিচের দিকে ছিলেন পঞ্চাশ, কুড়ি, তিন, দুই বা একটি গ্রামের অধিকারীরা। চতুরাংশিকরা ছিলেন ক্ষুদ্র ভূস্বামী এবং তাদের নিচে ছিলেন রাজপুত বা গ্রাম প্রধানরা। তবে এই সারণী পুঁথিগত। বাস্তবে এই সকল ক্ষত্রিয় ভূস্বামীর সবাই ছিলেন রাজপুত। এই পিরামিড সদৃশ্য কাঠামোর মধ্যে প্রভু-সামন্ত (Lord-vassal) সম্বন্ধ লক্ষণীয়। চক্রবর্তী মহারাজাধিরাজ ছিলেন সর্বোচ্চে এবং সর্ব নিম্নে ছিলেন 'রাউট' বা রাজপুত। এই তালিকায় 'ঠাকুর'দের নামোল্লেখ নেই। তবে তারাও ক্ষত্রিয়-রাজপুত গ্রাম প্রধান রূপে নিজেদের দাবি প্রতিষ্ঠা করেছিল, *অধ্যাপক যাদবের* মতে রাজপুতরা ছিল স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় জাতি। চান্দ্রবংশ বা অগ্নিকুল উৎপত্তির দাবির মধ্যে একটা 'বিশুদ্ধতার গৌরব' (Purifactory character) প্রকাশ পেত। একইভাবে সমরকুশল গোষ্ঠী হিসেবে রাজপুতদের মধ্যে একটা 'গোষ্ঠী উন্নাসিকতা' (high sense of clan, superiority) ছিল। তাই নিজের পরিমণ্ডলের মধ্যে অন্য কোন সামাজিক উপাদানের অনুপ্রবেশ সম্পর্কে রাজপুতরা ছিল খুবই সাবধানী। এই কারণে কনৌজের পরাক্রান্ত গাহড়বাল বা বাংলার শক্তিশালী সেন বংশ কখনও শুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের মর্যাদা পায়নি।

উৎপত্তির সূচনা পর্বে অগ্নিকুলভুক্ত চারটি রাজপুত গোষ্ঠী প্রতিহার, চাহমান বা চৌহান, শোলাংকি বা চৌলুক্য এবং পরমার বা পাওয়ার ছিল বেশি উল্লেখযোগ্য। রাজনৈতিক কর্তৃত্বের কারণে আদি-মধ্যযুগের লিপি ও সাহিত্যে এই চারটি বংশের উল্লেখ বেশি পাওয়া যায়। প্রাক্তন প্রতিহার রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর এই রাজপুত গোষ্ঠীগুলি নতুন রাজপুত রাজ্য গড়ে তোলে। দক্ষিণ রাজস্থানে রাজত্ব শুরু করে রাজপুত-প্রতিহার গোষ্ঠী। আদি প্রতিহারদের সামন্ত ছিল চাহমান বা চৌহানরা। আরবদের আক্রমণকালে মুসলমান আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে চৌহানরা কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। পরে এরা স্বাধীনতা ঘোষণা করে 'মহারাজাধিরাজ' ইত্যাদি উপাধি নিয়ে দিল্লীর দক্ষিণ-পশ্চিমে পূর্ব রাজস্থানে রাজত্ব গড়ে তোলে। শোলাংকিদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব স্থাপিত হয় কাথিয়াবাড় অঞ্চলকে কেন্দ্র করে। তাদের শাখা-প্রশাখা প্রসারিত হয় চেদি, পাটন ও ব্রোচ অঞ্চলে। পাওয়ার বা পরমাররা প্রথমে ছিল রাষ্ট্রকূটদের সামন্ত প্রধান। দশম শতকের শেষদিকে এরা বিদ্রোহী হয় এবং ইন্দোরকে কেন্দ্র করে রাজ্য গড়ে তোলে।

অন্যান্য বহু রাজপুতগোষ্ঠী, যারা নিজেদের চন্দ্র বা সূর্য বংশোদ্ভুত বলে দাবি করত, তারা পশ্চিম-ভারত ও উত্তর-ভারতের নানা অংশে রাজ্যস্থাপন করে। দশম শতকে খাজুরাহ অঞ্চলে চন্দেল্লরা বিশেষ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। চাহমান রাজ্যের উত্তর-পূর্ব দিকে রাজ্য স্থাপন করে তোমর গোষ্ঠী। আদিতে এরাও ছিল প্রতিহারদের সামন্তরাজা। দিল্লীর সন্নিকটে হরিয়ানা অঞ্চলে এরা স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। ৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তোমর গোষ্ঠীর উদ্যোগে 'ধিল্লিক' বা 'দিল্লী' শহর প্রতিষ্ঠা করে। দ্বাদশ শতকে তোমর রাজ্য চৌহান গোষ্ঠীর দখলীভুক্ত হয়। চৌহান রাজ্যের দক্ষিণ দিকে মেবারের সেহলট বা গুহিল গোষ্ঠী রাজ্য স্থাপন করে। আরব আক্রমণের প্রতিরোধে এরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। আরব আক্রমণ কালে প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূটরা সামরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়লে তাদের সামন্ত রাজারা স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এইভাবে প্রতিহারদের সামন্ত-কলচুরিরা জব্বলপুরের কাছে ত্রিপুরীতে রাজ্য গড়ে তোলে।

আদি-মধ্যযুগে প্রধান রাজপুত গোষ্ঠীগুলির ভাঙনের ফলে এবং অন্যান্য কারণে একাধিক উপগোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে। *'প্রবন্ধ চিন্তামণি'* গ্রন্থে পরমার গোষ্ঠীর শত রাজপুত্রের কথা বলা হয়েছে। মাউন্ট আবুর আকলেশ্বর লিপিতে (১২৮৫ খ্রীঃ) গুহিল গোষ্ঠীর অসংখ্য শাখা ও উপশাখার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যান্য গোষ্ঠীগুলির ক্ষেত্রেও এই ধরনের উপগোষ্ঠী সৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল ধরে নেওয়া যায়। চাহমানদের উপগোষ্ঠী হিসেবে 'দেওদা', 'মোহিল', 'সোনি' (বা শোনিগরা), পরমারদের 'ডোডা' গোষ্ঠী, গুহিলদের 'পিপাদিয়া', 'মঙ্গল্য' গোষ্ঠী, রাঠোরদের 'দাধিকা' গোষ্ঠী ইত্যাদির উল্লেখ সমকালীন লেখতে পাওয়া যায়। আন্তঃগোষ্ঠী বিবাহ সম্পর্কের কিছু সমকালীন বিবরণ থেকেও উপগোষ্ঠীর সমর্থন পাওয়া যায়।[1] নতুন নতুন এলাকায় মুখ্য রাজপুত গোষ্ঠীগুলির সম্প্রসারণের প্রেক্ষিতে স্বতন্ত্র উপযোগী গঠনের তত্ত্ব সম্পর্কে *ড. ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়* সংশয় প্রকাশ করেছেন। পক্ষান্তরে *ড. চট্টোপাধ্যায়* উপগোষ্ঠী উদ্ভবের প্রধান উপাদান হিসেবে *'স্থানিক বৈশিষ্ট্য'* (Localism)-এর উল্লেখ করেছেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে রাজপুতকরণ ছিল সামাজিক সচলতার প্রক্রিয়ার একটি ফল এবং এই প্রক্রিয়াতেই 'মেদ' বা 'হূণ'দের রাজপুত গোষ্ঠীভুক্তি সম্ভব হয়। এই প্রেক্ষাপটে রাজপুতদের উপগোষ্ঠী সৃষ্টির কারণ হিসেবে বিভিন্ন মূল গোষ্ঠীর সদস্যদের স্থানীয় বৈশিষ্ট্য আত্মীকরণের বিষয়টিকে গুরত্ব দিতে হয়। রাজপুত উপগোষ্ঠী সৃষ্টির এইরূপ স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের প্রভাব পিপাদিয়া গুহিল বা শোনিগরা চাহমানদের ক্ষেত্রে প্রতীয়মান হয়। *'পিপ্পলপাদ'* ও *'সুবর্ণগিরি'* নামক অঞ্চল দুটির ভিত্তিতে উপগোষ্ঠীগুলি *'পিপাদিয়া'* ও *সোনিগরা'* নামে পরিচিত হয়। এছাড়া আন্তঃগোষ্ঠী বিবাহসম্পর্ক উপগোষ্ঠীর প্রসারে সহায়তা করে।

আদি-মধ্যযুগে রাজপুতদের উদ্ভব এবং পরবর্তী চারশ/পাঁচশ বছরে তাদের বিস্তার অর্থাৎ সপ্তম শতক থেকে ত্রয়োদশ শতকের অন্তবর্তীকালে রাজপুত গোষ্ঠীর প্রাথমিক আবির্ভাব ও পরবর্তীকালে তাদের অসংখ্য উপগোষ্ঠীর সৃষ্টিতে দুটি প্রধান উপাদান হিসেবে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বর্ণভিত্তিক সমাজে ক্ষত্রিয়তার সাথে নিজেদের সম্পর্কিত করার প্রয়াস এবং সম্প্রসারণ কর্মসূচীর ফলে স্থানিকবাদের প্রভাবে উপগোষ্ঠীর সৃষ্টি গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

○ রাজপুত রাজ্যসমূহ ঃ

উত্তর-ভারতের যে সকল অংশে রাজপুতরা কর্তৃত্ব স্থাপন করে তা সাধারণ ভাবে 'রাজস্থান' (বা রাজপুত্রদের বাসস্থান) নামে পরিচিত হয়। এখানে অনেকগুলি প্রায় স্বাধীন বা স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ঘটে। এদের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রাজ্য হল যোধপুর, (মরু) জয়স্পমীর (মদ্), বিকানির (জঙ্গলদেশ), আজমির (অজয়মেরু), উদয়পুর (মেবার) ইত্যাদি। দীর্ঘকাল সংঘাত ও ভাঙনের মধ্য দিয়ে এই রাজ্যগুলির সৃষ্টি হয়। এই রাজপুত অধ্যুষিত অঞ্চলের উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও পূর্বদিকে ছিল সুলতানি সাম্রাজ্য, দক্ষিণ-পশ্চিমে মালব রাজ্য, পশ্চিমে ছিল উচ্, দিপালপুর ও মুলতান এবং দক্ষিণ দিকে ছিল গুজরাট রাজ্যের সীমানা। ***জেম্স টড্***-এর মতে, মোটামুটি ভাবে প্রায় তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বর্গমাইল ব্যাপী রাজপুতদের কর্তৃত্ব সম্প্রসারিত ছিল। ভৌগোলিক আকৃতির দিক থেকে রাজস্থান ছিল একটি সমবাহু অসম কোন বিশিষ্ট চতুর্ভুজের মত। এর প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যও বিচিত্র। উত্তর থেকে দক্ষিণ-পূর্বে প্রসারিত আরাবল্লী পর্বতমালা, যার পশ্চিমে আছে বিশ্বখ্যাত মরু অঞ্চল। উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিমে আছে যথাক্রমে কৃষিযোগ্য সমতলভূমি এবং সমৃদ্ধ মালভূমি অঞ্চল। এই ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য রাজস্থানের প্রাকৃতিক সীমানা ও সে অঞ্চলের সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির ধারাকে প্রভাবিত করেছে। পার্বত্য অঞ্চল রাজস্থানকে দিয়েছে বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রকৃতিদত্ত নিরাপত্তা। মরুভূমি অঞ্চলও বিদেশী আক্রমণকারীদের হাত থেকে লুকিয়ে থাকার নিরাপদ স্থান হিসেবে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। প্রাচীন গ্রীকদের মতই রাজস্থানের এই ভৌগোলিক অবস্থান, মরুভূমির ও পাহাড়ের রুক্ষতা, রাজপুতদের চরিত্রে অদম্য প্রত্যয়, দুঃসাহস এবং অসীম ধৈর্য্যের সন্নিবেশ ঘটিয়ে তাদের প্রায় অপ্রতিরোধ্য একটি জাতিতে পরিণত করেছে। তাই সপ্তম-অষ্টম শতকে আরব আক্রমণের সময় থেকে ষোড়শ শতকে মোগল আক্রমণ পর্যন্ত সময়কালে রাজস্থান বার বার বহিরাক্রমণ দ্বারা অস্থির হলেও কেউই রাজপুত যোদ্ধাদের চূড়ান্তভাবে পরাস্ত করতে বা এই অঞ্চলের উপর নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব স্থাপন করতে পারেনি। রাজস্থানের সাংস্কৃতিক জীবনের উপরেও এই প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলের ইতিবাচক প্রভাব ছিল বলে ***ড. জি. এন. শর্মা*** মনে করেন, তিনি লিখেছেন, *"The abundance of luxuriant vegetation, the peaceful atmosphere of the fertile valleys and productive land of the plateau have also contributed to the cultural development of Rajasthan."*[1]

চতুর্দশ শতকের শেষ দিকে দিল্লী সুলতানির দুর্বলতার সুযোগে বহু আঞ্চলিক শাসক (মাক্তি) কার্যত স্বাধীনভাবে শাসন পরিচালনা শুরু করেন। এই সুযোগে রাজস্থানের রাজপুত গোষ্ঠীগুলিও নিজ নিজ এলাকায় শক্তিসংহত করে স্বাধীন রাজত্ব কায়েম করে। রাজনৈতিক প্রতিপত্তি বিস্তারের দিক থেকে অগ্রণী রাজপুত গোষ্ঠীগুলির অন্যতম ছিল গুহিলট বা গুহিল চৌহান, রাঠোর, কাচোয়া, হাড়া ইত্যাদি। দিল্লীর সুলতান, মালব ও গুজরাটের শক্তিশালী রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে এই রাজপুত রাজ্যগুলি সামরিক সাফল্য অর্জন করলেও, এরা সম্মিলিত ভাবে গোটা রাজস্থানের উপর কোন বৃহৎ রাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা কল্পনাও করত না।

✪ **মেবার ঃ** আদি-মধ্যযুগে রাজস্থানের অন্যতম শক্তিশালী রাজ্য ছিল মেবার। সম্ভবত খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে পার্শ্ববর্তী গুজরাট থেকে রাজপুতদের গুহিলট শাখা রাজস্থানে প্রবেশ করে এবং দক্ষিণ-পশ্চিম রাজস্থানের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে। দীর্ঘ আট শতক ব্যাপী রাজনৈতিক কর্তৃত্ব পরিচালনা এবং তুর্কী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ প্রতিরোধ গড়ে তোলার কারণে মেবার ভারত-ইতিহাসে বিশেষ সর্বদা ও গৌরবের অধিকারী হয়ে আছে। মেবারে গুহিলট্ রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সূচনা করেন বাপ্পা রাওয়াল। উদয়পুরের চৌদ্দ মাইল উত্তরে নাগদা অঞ্চলকে কেন্দ্র করে তিনি শক্তি সঞ্চয় করেন এবং চিতোর দুর্গ দখল করে মেবারের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। আরব সেনাপতি জুনাইদ-এর আক্রমণ প্রতিহত করে তিনি দক্ষতা দেখান। তাঁর উত্তরসূরী দ্বিতীয় খুম্মন (৮১২-'৩৬ খ্রীঃ) বাবার মতই দক্ষ যোদ্ধা ছিলেন। গুজরাটের শাসকের সাথে যৌথভাবে তিনি নবম শতকে আরব আক্রমণকারীদের সুলতান ও সিন্ধু থেকে বিতাড়িত করেন। পরবর্তী চার দশকে গুহিলটদের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি বার বার সংকটের মুখে পড়ে। চৌহান, পারমার, চালুক্য প্রভৃতি রাজবংশের আক্রমণের ফলে মেবারের বহু অঞ্চল গুহিলটদের হস্তচ্যুত হয়। তথাপি গুহিলটরা দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে নিজেদের শক্তি সংহত করার কাজ চালিয়ে যান। দ্বাদশ শতকের শেষ দিকে মহম্মদ ঘুরির হাতে তরাইনের যুদ্ধে পৃথ্বিরাজ চৌহানের উপর্যুপরি পরাজয় এবং গুজরাট ও মালব রাজ্যের অভ্যন্তরীণ সংকটের সুযোগে জৈত্র সিং (১২১৩-'৬১ খ্রীঃ) পুনরায় শক্তি সংহত করেন এবং রাজস্থানে তুর্কীদের অগ্রগতি প্রতিহত করেন। কিন্তু ইলতুৎমিস নাগদা দখল করে নেন। অতঃপর চিতোরকে কেন্দ্র করে গুহিলটদের রাজনৈতিক কার্যাবলী পরিচালিত হয়।

আলাউদ্দিন খলজী ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে চিতোর আক্রমণ করেন। আমীর খসরুর মতে, তাঁর প্রথম দুটি অভিযান ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত রানা রতন সিংহ আত্মসমর্পণ করলে চিতোরের শাসনভার আলাউদ্দিনের পুত্র খিজির খাঁর হাতে ন্যস্ত করা হয়। তবে কিছুদিনের মধ্যেই আলাউদ্দিন রাজপুতদের হাতে মেবার ফিরিয়ে দেন। সুলতানের অন্যতম কর্মচারী তথা রানা রতন সিংহের ভাগিনেয় রানা মালদেবকে মেবারের শাসক নিযুক্ত করেন। মালদেবের মৃত্যুর পর মেবারে অন্তর্দ্বন্দ্ব ঘনীভূত হয়। রাজপুত চারণগীতি অনুসারে মালদেবের পুত্র জৈসা গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের বিরুদ্ধে দিল্লী সুলতানের সাহায্য প্রার্থী হন। মহম্মদ-বিন্-তুঘলক মেবারে একটি অভিযানও পাঠান। কিন্তু হামিরদেব তা প্রতিহত করেন। রানা হামির (১৩২৬-'৬৪ খ্রীঃ) তাঁর দেশপ্রেম, সাহসিকতা ও আত্মত্যাগের জন্য ভারত ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি মেবারের সীমানা বৃদ্ধি করেন এবং মাড়োয়ার, অম্বর, গোয়ালিয়র, রাইসিন, চান্দেরী ও কাল্পীর শাসকরা রানা হামিরের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব মেনে নিতে বাধ্য হন। *'কম্প্রিহেনশিভ হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া'র* মতে, *"He (Hammir) left a name which is still honoured for gallantry and valour of a very high order."* মৃত রানা হামির মৃত্যুকালে তাঁর পুত্র ক্ষেত্র সিংহের জন্য একটি প্রসারিত ও শক্তিশালী রাজ্য রেখে যান। আজমীর, জাহাজপুর, মণ্ডলপুর প্রভৃতি অঞ্চল দখল করে তিনিও সামরিক কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। হাড়াদের ক্ষমতাচ্যুত করে তিনি হাড়াবতীকেও মেবারের অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হন।

মেবারের পরবর্তী শাসক লখার (১৩৮২-১৪২১ খ্রীঃ) রাজত্বকালে চিতোর রাজনৈতিক

ও অর্থনৈতিক দিক থেকে অনেকটা এগিয়ে যেতে পারে। মাড়োয়ার রাজ্যের পার্বত্য অঞ্চল দখল করে এবং সীমান্তের উপজাতীয় সর্দারদের পরাজিত করে তিনি সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করেন। তিনি মের ও ভীল সর্দারদের ধ্বংস করেন এবং নগরচলের সংখল রাজপুতদের ধ্বংস করে বাদনোর দখল করেন। তুর্কীদের বিরুদ্ধেও তিনি লড়াই চালিয়ে যান। তাঁর আমলে জাওয়ার অঞ্চলে রূপা ও সীসার খনি আবিষ্কৃত হলে মেবারের আর্থিক ভিত্তি যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই সম্পদ ব্যবহার করে তিনি তুর্কী আক্রমণকালে ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া মন্দির ও প্রাসাদগুলি পুনর্নির্মাণ বা সংস্কার করেন এবং কৃষির উন্নতির জন্য বৃহৎ জলাশয় খনন করেন এবং বাঁধ দেন। উদয়পুরের বিখ্যাত পিচ্‌চোলা হ্রদ তাঁর আমলেই নির্মিত হয়েছিল। সেকালের বিখ্যাত সংস্কৃত সাহিত্যের কবি ঝোটিঙ্গা ভট্ট ও ধনেশ্বর ভট্ট লখার রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন। মেবারের পরবর্তীশাসক ছিলেন মোকাল (১৪২১-৩৩ খ্রীঃ)। মাত্র বার বছর বয়সে তিনি সিংহাসনে বসেন। তবে পিতার ইচ্ছানুসারে মোকালের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চণ্ড নাবালক রানার পরিচালক নিযুক্ত হন। চণ্ড স্বেচ্ছায় সিংহাসনের দাবি ত্যাগ করার পুরস্কার হিসেবে রাজ্য পরিচালনার দায়িত্বের পাশাপাশি সমস্ত রাজকীয় দলিলে তাঁর ব্যক্তিগত প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করার অধিকার পান। চণ্ড অত্যন্ত দক্ষতা ও বিশ্বস্ততার সাথে রাজকার্য পরিচালনা শুরু করেন। কিন্তু নাবালক রানার মাতা তথা চণ্ডর বিমাতা রানী হংসবাঈ চণ্ডর প্রতি সন্দেহপরায়ণ হয়ে ওঠেন এবং নানাভাবে তাঁর কর্তৃত্বকে আঘাত করতে থাকেন। বলা বাহুল্য সৎ ও নির্লোভী চণ্ড বিমাতাকে প্রত্যাঘাত না করে মাণ্ডুতে চলে যান। অতঃপর রাজমাতার ইচ্ছানুসারে তাঁর ভ্রাতা রণমল মাড়োয়ার থেকে এসে মেবারের রানার পক্ষে শাসন পরিচালনা শুরু করেন। তিনি মাড়োয়ার থেকে নিজ গোষ্ঠীর (রাঠোর) রাজপুতদের এনে মেবারের অধিকাংশ উচ্চপদে নিয়োগ করেন। এইভাবে মেবার কার্যত রাঠোরদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। ইতিমধ্যে মোকাল সামরিক শক্তি সংগঠিত করে একের পর এক রাজ্য জয় করতে থাকেন। তিনি ১৪২৮ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান ফিরোজ খানকে পরাজিত করেন। সম্ভর, জালোর তাঁর দখলে আসে। গুজরাটের শাসক আহমদ শাহকে পরাজিত করে এবং হাডা গোষ্ঠীর মর্যাদার প্রতীক জাহাজপুর দুর্গ দখল করে তিনি মেবারের সামরিক দক্ষতা জাহির করেন।

সামরিক কৃতিত্বের পাশাপাশি মোকালের রাজত্বকালে মেবার শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও গৌরব অর্জন করে। রাজপুত শিল্পশৈলীর অন্যতম নিদর্শন চিতোরের *'সমিধেশ্বর'* মন্দির তিনি সংস্কার করেন। বিখ্যাত একলিঙ্গ মন্দিরের চতুঃস্পার্শে তিনি একটি সুউচ্চ প্রাচীর নির্মাণ করেন। সমকালীন লেখ থেকে জানা যায় যে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সমর্থক মাকাল অনেকগুলি শৈব, বৈষ্ণব ও শাক্ত মন্দির নির্মাণে সহায়তা করেছিলেন। 'পাপমোচন তীর্থে' তিনি একটি জলাশয় নির্মাণ করেন। মেবারের প্রখ্যাত ভাস্কর মনা, ফন্না ও বিশাল তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন। কবিরাজ বাণীবিলাস (জোগেশ্বর), ভট্টবিষ্ণু প্রমুখ পণ্ডিত তাঁর রাজসভা অলংকৃত করেন। তাঁর শেষজীবন সুখকর হয়নি। রাঠোর সর্দারদের ক্ষমতার লোভ ও দ্বন্দ্ব তাঁকে ভীষণভাবে বিব্রত করে। শেষ পর্যন্ত ক্ষেত্র সিংহের পুত্রদ্বয় চাচা ও মেরা এক ষড়যন্ত্র দ্বারা মোকালকে হত্যা করেন।

মোকালের মৃত্যুর পর মেবারের সিংহাসনে বসেন তাঁর পুত্র কুম্ভ (১৪৩৩-৬৮ খ্রীঃ)। তাঁর

রাজত্বের সূচনা পর্বে মেবারের রাঠোর ও গুহিলট্‌দের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব কিছু অস্থিরতা সৃষ্টি করে। রানা কুম্ভ প্রথমেই তাঁর পিতার হত্যাকারীদের বন্দী ও হত্যা করেন। কিন্তু এই যুদ্ধকালে রাঠোর সর্দার রণমলের কিছু সিদ্ধান্ত গুহিলট্ নেতাদের ক্ষুব্ধ করে। চণ্ডর ভ্রাতা রাঘদেব মেবারের অভিজাতদের সাথে রাঠোরদের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে রণমল এক ষড়যন্ত্র দ্বারা রাঘদেবকে হত্যা করেন। এই ঘটনা মেবারের অভিজাতদের শঙ্কিত করে এবং তারা চণ্ডকে স্বরাজ্যে এসে রাঠোরদের আধিপত্য ধ্বংস করার আহ্বান জানান। সে চণ্ডতাদের আহ্বানে সাড়া দেন এবং মেবারে এসে আর এক ষড়যন্ত্র দ্বারা রণমলকে হত্যা করে মেবারের রাজনীতিতে রাঠোরদের কর্তৃত্ব ধ্বংস করেন।

রানা কুম্ভের নেতৃত্বে শিশোদিয়া রাজপুত বংশের সামরিক কর্তৃত্ব গৌরবের শীর্ষদেশ স্পর্শ করে। চিতোর, কুম্ভলগড়, রণপুর প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত সমকালীন লেখ এবং *'একলিঙ্গ মাহাত্ম্য'* নামক সাহিত্য থেকে রানা কুম্ভের সামরিক সাফল্যের বিবরণ জানা যায়। তিনি দক্ষতার সাথে শত্রু রাজ্যগুলিকে পরাজিত করে ঐ সকল অঞ্চলের শাসকদের আনুগত্য অর্জন করেন। হাড়াবতী (কোটা), মালপুরা, অমরাদত্রি (অম্বর), গিরিপুর, সরঙ্গপুর, বৃন্দাবতী (বুন্দী) প্রভৃতি অঞ্চলের পরাজিত শাসকবৃন্দ মেবারের প্রতি আনুগত্যের বিনিময়ে নিজ নিজ রাজ্যের শাসনভার ফিরে পান। সম্ভর, মান্দোর, নাগাউর, রণথম্ভোর, শিরোহী, আবু, মণ্ডলগড়, আজমীর, প্রভৃতি স্থান দখল করে তিনি মেবারের রাজ্যভুক্ত করে নেন। স্বাধীনচেতা রাজ্য জাহাজপুর, জাত্তর, বন্দোর প্রভৃতির বিরুদ্ধে সফল সামরিক আক্রমণ দ্বারা এদের বশ্যতা আদায় করেন। এই সকল সফল অভিযানের সূত্রে রচনা কুম্ভ বিপুল সম্পদেরও অধিকারী হন।

রানা কুম্ভের সামরিক সাফল্য এবং সীমান্তবর্তী অঞ্চলে কর্তৃত্ব সম্প্রসারণের ফলে মালব ও গুজরাটের সাথে মেবারের সংঘাত অনিবার্য হয়। হরৌতি, মান্দাসোর, প্রভৃতি সীমান্তবর্তী অঞ্চল মেবার দখল করে নিলে মালবের সুলতান ক্ষুব্ধ হন এবং মেবারের অগ্রগতি রোধ করার জন্য প্রয়োজনে যুদ্ধে নামার সিদ্ধান্ত নেন। অন্যদিকে মেবারের কিছু বিক্ষুব্ধ সর্দারকে এবং বিশেষভাবে মাকালের হত্যাকারী পনওয়ারকে আশ্রয় দেবার কারণে রানা কুম্ভও মালবের উপর ক্ষুব্ধ ছিলেন। যাই হোক্, মাকালের হত্যাকারীকে প্রত্যার্পণের দাবি সুলতান মামুদ খলজী প্রত্যাখ্যান করলে মেবার ও মালব যুদ্ধে নামে (১৪৩৭ খ্রীঃ)। সরঙ্গপুরের যুদ্ধে রানা কুম্ভ মালবের সুলতানকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। রাজস্থানের চারণগীতি এবং রণপুর ও কুম্ভলগড়ের লেখমালা থেকে জানা যায় যে, রানা সরঙ্গপুরকে ভস্মীভূত করেন এবং অসংখ্য যুদ্ধবন্দীসহ সুলতান মামুদ খলজীকে বন্দী করে চিতোরে নিয়ে যান। অবশ্য কিছুদিন পরে রানা মামুদকে কারামুক্ত করে স্বরাজ্য ফিরিয়ে দেন। কেউ কেউ মনে করে এই সিদ্ধান্ত অদূরদর্শিতার নামান্তর। কারণ কিছুদিনের মধ্যেই সুলতান মামুদ শক্তি সঞ্চয় করে মেবারকে বিব্রত করতে শুরু করেন। অবশ্য একাংশের মতে মালবের উপর সরাসরি নিয়ন্ত্রণ রাখা সম্ভব নয় বলেই রানা এই কূটনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। যাই হোক্, পাঁচবছর শক্তি সঞ্চয়ের পর মামুদ খলজী কুম্ভলগড় আক্রমণ করেন। কিন্তু রাজপুতদের প্রবল প্রতিরোধের ফলে পিছু হটে আসতে বাধ্য হন এবং বনমাতার মন্দির ধ্বংস করেন ও বিগ্রহগুলি ভস্মীভূত করেন। চিতোরের বিরুদ্ধে একাধিক ব্যর্থ অভিযানের পর মালবের সুলতান সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলি দখল করার চেষ্টা চালান।

মালবের মতই রানা কুম্ভর প্রবল শত্রু ছিলেন সীমান্তবর্তী গুজরাটের সুলতান কুতুবউদ্দিন।

কুতুবউদ্দিন শিরোহীর দেওরা প্রধানের সাথে মিলিতভাবে মেবার দখলের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। অতঃপর মালব ও গুজরাটের শাসকদ্বয় সম্মিলিতভাবে মেবারের সীমান্ত অঞ্চলগুলি দখল করার জন্য অভিযান চালান। কিন্তু রানা কুম্ভর সাহসিকতা ও রাজপুত যোদ্ধাদের বীরত্বের কাছে সুলতানি বাহিনী বার বার পরাজিত হয়।

কেবল সুযোদ্ধা নয়, উচ্চ সংস্কৃতিমনস্কতার জন্যও রানা কুম্ভর নাম ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে *('.......Kumbha, who left behind him a name which is honoured in history and is remembered to this day as one of the greatest rulers of Hindu India"—Comprehensive Hist. of India, Voll-V.P. 794)*। সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা ইত্যাদি মননশীলতার নানা বিষয়ে তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি গীতগোবিন্দর টীকা *'রসিক প্রিয়া'* এবং *'একলিঙ্গ মাহাত্ম্য'* গ্রন্থের শেষাংশ রচনা করেন। সম্ভবত তিনি চারটি নাটকও রচনা করেছিলেন। সংস্কৃত, প্রাকৃত, কানাড়া, মারাঠী ইত্যাদি ভাষার উপর তাঁর যথেষ্ট দখল ছিল। তিনি নিজে ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ এবং সঙ্গীতশাস্ত্রের উপর তাঁর গভীর ব্যুৎপত্তি ছিল। *'সঙ্গীত রাজা', 'সঙ্গীত মীমাংসা', 'সঙ্গীত রত্নাকর'* ইত্যাদি সঙ্গীত বিষয় একাধিক গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। স্থাপত্য শিল্পের প্রতিও তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তাঁর উদ্যোগে একাধিক প্রাসাদ, মঠ, বিহার ও বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। চিতোরের 'কীর্তিস্তম্ভ' রানা কুম্ভর স্থাপত্য রুচির এক অনবদ্য নিদর্শন। তাঁর উদ্যোগে *'শৃঙ্গারচোরী', 'চতুর্মুখবিহার', 'কুম্ভশায়ম'* ইত্যাদি মন্দির নির্মিত হয়েছিল। তাঁর আমলে নির্মিত একাধিক বৃহদাকার দুর্গ সেকালের বৃহৎ স্থাপত্য কর্মে শিল্পীদের দক্ষতা প্রমাণ করে। কুম্ভলগড়, অচলগড়, ভৈরত প্রভৃতি দুর্গ তাঁর আমলেই নির্মিত হয়। তাঁর রাজত্বে প্রধান স্থপতি ছিলেন মন্দন। এছাড়া জৈতা, পুঞ্জা, দীপ প্রমুখ শিল্পী হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের এমনই পরিহাস যে, দেশপ্রেমিক, বীর যোদ্ধা, সংস্কৃতবান রানা কুম্ভের জীবনাবসান ঘটেছিল তাঁরই পুত্র উদার হাতে।

উদা ছিলেন স্বৈরাচারী এবং জঙ্গী আবেগ ও উচ্চাশার অধিকারী। তাই তাঁর শাসনকাল (১৪৬৮-'৭৩ খ্রীঃ) ছিল সীমিত এবং সমস্যা জর্জরিত। মহান কুম্ভকে হত্যা করার জন্য কোন অভিজাতর সমর্থন তিনি পাননি। অভিজাতরা মেবারের সিংহাসন দখল করার জন্য তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রায়মলকে আহ্বান জানান। রায়মল ১৪৭৩ থেকে ১৫০৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মেবারের শাসন পরিচালনা করেন। তাঁর রাজত্বকাল ছিল চূড়ান্ত অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তায় জর্জরিত। উদা নিজ পিতাকে হত্যা করে লোভ ও অকৃতজ্ঞতার যে বিষবৃক্ষ রোপণ করেছিলেন, রাইমলের আমলে তাই বিষফলে পরিপূর্ণ হয়। মেবার রাজপুরুষদের ষড়যন্ত্র ও সংঘর্ষের এক অন্ধকার রাজ্যে পরিণত হয়। রাইমলের চারপুত্র পৃথ্বীরাজ, জয়মল, জয়সিংহ ও সঙ্গ, প্রত্যেকেই ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও ক্ষমতা দখলের জন্য লালায়িত। এঁদের গৃহযুদ্ধ কয়েক বছর মেবারের রাজনীতিকে অস্থিরতার আবর্তে নিক্ষেপ করে। শেষ পর্যন্ত ১৫০৮ খ্রীষ্টাব্দে সংগ্রাম সিংহ সিংহাসনে বসলে মেবারের পূর্ব গৌরব ফিরে আসার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। সংগ্রাম সিংহ'র জনপ্রিয় নাম ছিল সঙ্গ। তাঁর সিংহাসনারোহণকালে মেবার নানা সমস্যায় বিব্রত ছিল। গৃহযুদ্ধের ফলে আর্থিক ও সামরিক শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছিল। মালব, গুজরাট ও দিল্লীর সুলতানেরা মেবারকে

আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। রানা সঙ্গ দক্ষতার সাথে এই সংকটের মোকাবিলা করেন। তিনি ছিলেন *'একজন বিশিষ্ট যোদ্ধা, দক্ষ সেনাপতি. উৎসাহী সংগঠক এবং হিসেবি রাজনীতিবিদ্'* (*'a distinguished warrior, an able general, an indesatigable organiser and a calculating politician'*)[1]

মেবারের অন্যতম শত্রু মালবের অভ্যন্তরীণ সংকট রানা সঙ্গের কাজ কিছুটা সহজ করে দেয়। মালবের সুলতান তাঁর অন্যতম আঞ্চলিক শাসক রাজপুত নেতা মেদিনীরাই-র ক্ষমতা বৃদ্ধিতে কিছুটা ঈর্ষান্বিত ছিলেন। সুলতান ও মুসলিম অভিজাতরা রাজপুতদের ক্ষমতাহীন করার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। এই উদ্দেশ্যে সুলতান মামুদ খলজী গুজরাটের সুলতান দ্বিতীয় মুজফ্ফর শাহের সাহায্যপ্রার্থী হন। অন্যদিকে মেদিনীরাই রানা সঙ্গের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে গগরৌনের যুদ্ধে মামুদ খলজী পরাজিত ও বন্দী হয়ে চিতোরে আনীত হন। দূরদর্শী রানা সঙ্গ সুলতানকে কিছু রাজ্যের বিনিময়ে মুক্তি দিয়ে উভয় দেশের মধ্যে বন্ধুত্বের বাতাবরণ গড়ে তুলতে সক্ষম হন। রানা সঙ্গের উত্থান দিল্লীর লোদী সুলতানকেও চিন্তিত করেছিল। তাই মালবের সাথে মেবারের সংঘর্ষে তিনি মেবারের বিরুদ্ধাচরণ করেন। অবশ্য রানা সঙ্গ দক্ষতার সাথে সেই সংকটের মোকাবিলা করেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর একটি পা বাদ যায়। তথাপি তিনি মেবারের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যান। শেষ পর্যন্ত মোগল নেতা বাবরের মুখোমুখি হলে তাঁর চূড়ান্ত পরীক্ষা শুরু হয়। বাবর উপলব্ধি করেছিলেন যে উত্তর-ভারতে মোগলের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রধান বাধা মেবারেব রানা সঙ্গ। তাই তিনি রানাকে ক্ষমতাচ্যুত করার উদ্যোগ নেন। ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে খানুয়ার যুদ্ধে রানা সঙ্গ পরাজিত ও আহত হয়ে আত্মগোপন করতে বাধ্য হন। তাঁর মৃত্যুর পরেও অন্তত কয়েক দশক কাল মেবার রাজস্থানের গৌরব ধরে রাখতে সচেষ্ট ছিল।

❍ মাড়োয়ার ঃ রাজপুতদের আর একটি শক্তিশালী গোষ্ঠী ছিল রাঠোর। মাড়োয়ারকে কেন্দ্র করে রাঠোরদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু হয়। মাড়োয়ার রাঠোরদের রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সূচনা করেন সেটরামের পুত্র সিহ। সম্ভবত সেটরাম ভাগ্যান্বেষণে পলি অঞ্চলে এসে বসবাস শুরু করেছিলেন। বাণিজ্যের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ পলি অঞ্চলকে মীর ও মীনা উপজাতিদের অত্যাচার থেকে মুক্ত করে সিহ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন এবং ১২৪৩ খ্রীষ্টাব্দে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলি দখল করে রাঠোরদের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ১২৭৩ খ্রীষ্টাব্দে সিহর মৃত্যুর পর রাঠোরদের নেতা হন তাঁর পুত্র *আস্থান*। তিনিও পিতার মত সাহসী ও উদ্যমী ছিলেন। *গুহিলটদের* পরাজিত করে তিনি দক্ষিণ-পশ্চিমে খেদ পর্যন্ত রাজ্যসীমা বৃদ্ধি করেন। ভীলদের হাত থেকে ইদর জয় করেন। তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকালে তিনি নিহত হন (১২৯১ খ্রীঃ)। আস্থানের মৃত্যুর পর রাঠোরদের কালানুক্রম কিছুটা অস্পষ্ট। তবে তাঁর উত্তরাধীকাররা যে রাজ্যসীমা বৃদ্ধির কাজে সদা তৎপর ছিলেন, তা বোঝা যায়। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে মাড়োয়ার রাজ্যের সম্প্রসারিত রাজ্যসীমা তা প্রমাণ করে। আস্থানের জ্যৈষ্ঠ পুত্র ***রাওধুহ*** প্রায় দেড়শো গ্রাম জয় করেছিলেন। ১৩০৯ খ্রীষ্টাব্দে পরিহারদের সাথে এক সংঘর্ষে তিনি প্রাণ হারান। কিন্তু তাঁর পুত্র রাও রায়পাল

পরিহারদের পরাস্ত করে মান্দোর দখল করেন এবং কিছুকাল নিজ নিয়ন্ত্রণে রাখেন। পারমারদের পরাজিত করে তিনি মল্লানি অঞ্চল জয় করেন। ভাট্টি রাজপুতদের পরাস্ত করে তিনি জয়শলমীরের দিকেও রাজ্যসীমা সম্প্রসারিত করেন। তাঁর উত্তরাধিকারী রাওকর্নপল ভাট্টি ও তুর্কীদের সাথে যুদ্ধে প্রাণ হারন। পরবর্তী শাসক ভীম ভাট্টিদের পরাজিত করে কাক নদীর তীর পর্যন্ত মাড়োয়ারের রাজ্যসীমা সম্প্রসারিত করেন।

ভীমের ভাই রাওজানালসি সামরিক দক্ষতা দ্বারা রাঠোরদের কর্তৃত্ব বৃদ্ধি করেন। তিনি যোধা রাজপুত, মুলতানের মুসলিম শাসক এবং ভিনমলের শোলাঙ্কিদের পরাজিত করেন। তবে ভাট্টি ও তুর্কীদের যৌথ আক্রমণে আনুমানিক ১৩২৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নিহত হন। তাঁর পুত্ররাও তুর্কীদের হাতে নিহত হন। জালানসির জনৈক পৌত্র মল্লিনাথ মুসলমানদের অধিকার থেকে মাহেভা দখল করতে সক্ষম হন এবং *'রাওয়াল'* উপাধি নেন।

মান্দোরে রাও চণ্ডর নেতৃত্বে (১৩৮৪-'১৪২৪ খ্রীঃ) রাঠোরদের ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁর রাজধানী মান্দোরের উপর গুজরাটের শাসক জাফর খানের আক্রমণ তিনি দক্ষতার সাথে প্রতিহত করেন (১৩৯৬ খ্রীঃ)। দিল্লী সুলতানির দুর্বলতার সুযোগে খাটু, দিদ্ওয়ান, সম্ভোর, নবগৌর ও আজমীর তিনি দখল করে নেন। চৌহান রাজপুতদের হাত থেকে নাদোলও তাঁর দখলে আসে। তুর্কীদের বিরুদ্ধে নিজ ভাই জয়সিংহের সাহায্য না পাওয়ায় চণ্ড ক্ষুব্ধ ছিলেন। তাই ১৪১১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জয়সিংহের রাজ্যাংশ ফালোদি দখল করে নেন। কিন্তু তাঁর দ্রুত ক্ষমতা বৃদ্ধি স্বজাতীয় ও অন্যান্য শাসকদের ঈর্যান্বিত করে। ফলে রাজপুত ভাট্টি, সাংখালা গোষ্ঠী এবং মুলতানের মুসলিম গভর্নর মিলিতভাবে নাগৌর আক্রমণ করেন এবং বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা তাঁকে হত্যা করে (১৪২৩ খ্রীঃ)। ***নিজামীর*** মতে, চণ্ডর নেতৃত্বে মাড়োয়ার রাজ্য মর্যাদাকর স্থানে উন্নীত হয়েছিল।

চণ্ডর জ্যেষ্ঠপুত্র রাও রণমল মেবারে চলে গেলে রাও কানা ও রাও সত্তা মাড়োয়ার শাসন করেন। এঁদের স্বল্প শাসনকালে মাড়োয়ার রাজ্য তার অর্জিত গৌরব কোনক্রমে টিকিয়ে রাখে। রাও রণমল মেবারে চক্রান্তকারীদের হাতে নিহত হলে তাঁর পুত্র যোধা চিতোর ছেড়ে মাড়োয়ারে ফিরে আসেন। ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে মান্দোর দখল করে তিনি মাড়োয়ারের রাজনৈতিক অস্থিরতা দূর করেন। মেরতা, ফালোদি, পোখ্রান, ভদ্রযান, সোজাত্, শিবা, সিওয়ানসহ গোদওয়াদ ও নাগউর-এর বিস্তীর্ণ অঞ্চল দখল করে তিনি মাড়োয়ার রাজ্যের সংহতি দৃঢ় করেন। প্রতিবেশী উপজাতি শাসকদের ধ্বংস করে উত্তরদিকে হিসার পর্যন্ত এলাকা তিনি দখল করে নেন। বিভিন্ন অঞ্চলে নিজপুত্রদের শাসক নিযুক্ত করে তিনি হাত শক্ত করেন। তাঁর জনৈক পুত্র বিকা জঙ্গলদেশে গিয়ে স্বতন্ত্র বিকানীর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন; ক্ষমতা সুদৃঢ় করার জন্য যোধা ১৪৫৯ খ্রীষ্টাব্দে যোধপুর দুর্গ ও শহর প্রতিষ্ঠা করেন। যোধার নেতৃত্বে মাড়োয়ারের রাজনৈতিক মর্যাদা প্রতিপত্তি এতটাই বৃদ্ধি পায় যে মেবারের রানা কুম্ভ, তাঁর পুত্র উদা প্রমুখ যোধার সাথে মৈত্রী সম্পর্ক গড়ে তোলেন। তাঁর দীর্ঘ চার দশকের ব্যস্ততম রাজনৈতিক জীবন শেষ হয় ১৪৮৯ খ্রীষ্টাব্দে। অতঃপর রাও শতল (১৪৮৯-'৯২ খ্রীঃ) রাও সুজা (১৪৯২-১৫১৫ খ্রীঃ), রাও গঙ্গা (১৫১৫-'৩২ খ্রীঃ) প্রমুখ মাড়োয়ার শাসন করেন।

আগেই বলা হয়েছে যে যোধার পঞ্চমপুত্র বিকা জঙ্গলদেশ দখল করে বিকানীর রাজ্যের

প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি দক্ষিণদিকে সিরসা, লাদ্‌নু, ভাত্‌নার, ভাতিন্দা, সিংহানা, নোহার, পুগাল প্রভৃতি অঞ্চল দখল করে পাঞ্জাব-সীমানা পর্যন্ত রাজ্য সম্প্রসারিত করেন। পরবর্তী শাসক বিকার জ্যেষ্ঠপুত্র রাও নারা সিংহাসন আরোহণের কয়েক মাসের মধ্যে মারা গেলে, সিংহাসনে বসেন নারার ভাই রাও লুনাকর্ণ (১৫০৫-'২৬ খ্রীঃ)। তিনি জয়সল্মীর দুর্গ আক্রমণ করে প্রচুর অর্থ-সম্পদ লুঠ করেন। কাঁঠালিয়া, দিদ্‌ওয়ান্‌, ভগভ, নরহদ্‌, সিংঘানা প্রভৃতি এলাকা তিনি দখল করেন। শিল্প-সাহিত্যের অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল।

○ চৌহান বংশ ঃ সাহসিকতা ও সাম্রাজ্যের বিশালতার বিচারে রাজপুতদের চৌহান গোষ্ঠীর ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। চৌহানদের অনেকগুলি গোষ্ঠী উত্তর-ভারতের পশ্চিমের সমভূমি অঞ্চলে একাধিক রাজ্য স্থাপন করেছিল। যেমন—সম্ভর, রণথম্ভোর, ভ্রগুকদ্ধ, নাদোল, জালোর প্রভৃতি। এদের মধ্যে সম্ভরের চৌহানদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব বেশি। প্রতিহারদের উপ-সামন্ত হিসেবে এই গোষ্ঠীর উত্থান শুরু হয়। দশম শতকে চৌহান নেতা দ্বিতীয় বিগ্রহরাজ স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। একাদশ শতকের শেষদিকে রাজস্থানের কেন্দ্রস্থল আজমীরে চৌহানদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি নিরঙ্কুশ হয়ে ওঠে। ১১৬৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পূর্ব পাঞ্জাব, রেওয়ারী ও উত্তর-পূর্ব রাজস্থান চৌহানদের দখলে চলে আসে। কার্যত তাদের রাজ্যসীমা হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। এই কারণে চৌহানরা কার্যত উত্তর-পশ্চিম ভারতের দ্বাররক্ষীতে পরিণত হয় এবং পাঞ্জাবের গজনী রাজ্য ও অবশিষ্ট রাজস্থানের মধ্যে একটি প্রাচীর হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকে।

চৌহান বংশের গৌরবরশ্মি উজ্জ্বলতর হয় তৃতীয় পৃথ্বীরাজের আমলে (১১৮০-৯২ খ্রীঃ)। ভাণ্ডনক্‌দের পরাজিত করে তিনি রেওয়ার তহশিল, ডিওয়ানী ও আলওয়ারের একাংশ দখল করেন। কনৌজরাজ জয়চন্দ্র ও পৃথ্বীরাজের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব তীব্রতর হয়েছিল। কিংবদন্তী অনুসারে কনৌজের রাজকন্যা সংযুক্তাকে বিবাহ করার কারণে পৃথ্বীরাজের প্রতি জয়চন্দ্র ক্ষুব্ধ ও প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে উঠেছিলেন। রাজপুতদের অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগে মহম্মদ ঘুরী ভারত সীমান্তে প্রবেশ করলে রাজপুত রাজারা প্রথমে তা প্রতিহত করেন (১১৭৮ খ্রীঃ)। কিন্তু এই যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ সংকীর্ণ স্বার্থ-চিন্তাবশত নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেন। বস্তুত, তাঁর এই সংকীর্ণ ও অদূরদর্শী সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা ও চৌহানদের গৌরবের পক্ষেই চরম ক্ষতিকর ছিল। তরাইনের প্রথম যুদ্ধে (১১৯১ খ্রীঃ) পৃথ্বীরাজ কোনক্রমে বিজয়ী হলেও পরের বছরেই দ্বিতীয় যুদ্ধে মহম্মদ ঘুরীর কাছে পরাজিত ও বন্দী হন। আজমীর ও দিল্লী থেকে চৌহান রাজত্বের অবসান সামগ্রিকভাবে রাজপুত জাতির মর্যাদা ও প্রতিপত্তির উপর আঘাত হানে এবং উত্তর ভারতের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত রাজপুত সাম্রাজ্যবাদের পতন সূচিত করে।

আজমীর হস্তগত হওয়ার পর পৃথ্বীরাজের পুত্র গোবিন্দরাজ রাজস্থানের রণথম্ভোরে এসে চৌহান শক্তিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। গোবিন্দরাজার মৃত্যুর পর চৌহানরা আবার দুর্বল হয়ে পড়ে। তাঁর পুত্র বল্‌হন্‌ কিছুকাল সুলতান ইলতুৎমিসের অধীনে সামন্ত হিসেবে রাজ্যশাসন করে। তাঁর মৃত্যুর পর আবার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব চৌহানদের দুর্বল করে তোলে এবং এই সুযোগ নেন ইলতুৎমিস। সুলতানের এক সেনাপতি বল্‌হনের ভাই পহ্লাদের পুত্র বাগভট্টকে পরাজিত করে রণথম্ভোর দুর্গ দখল করে নেন। অবশ্য কিছুকালের মধ্যেই

বাগভট্টের উত্তরাধিকারী জৈত্র সিংহ রণথম্ভোর পুনরুদ্ধার করে চৌহানদের পূর্ব গৌরব কিছুটা পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু তুর্কীদের পুনঃপুনঃ আক্রমণে বিব্রত হয়ে তিনি নিজপুত্র হামিরদেব (হাম্বিরদেব)-কে সিংহাসনে বসিয়ে (১২৮৩ খ্রীঃ) বনবাসে চলে যান। ১২৮৩ থেকে ১২৮৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময় তিনি সিংহাসনে বসেছিলেন। একজন উদ্যমী, সাহসী ও দেশপ্রেমিক নেতা হিসেবে তিনি ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। একের পর এক সফল সামরিক অভিযান চালিয়ে তিনি নিজ রাজ্যকে রাজনীতির কেন্দ্রে নিয়ে আসেন। প্রথমেই তিনি সরসাপুরের রাজা অর্জুনকে হারিয়ে তাঁর বশ্যতা আদায় করেন। বীর-এর রাজা ভোজ, মেবারের রানা এবং আবু পর্বতের প্রধানকে পরাস্ত করে তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দেন। মালব ও মেবারেব একাধিক শাসক ও সামন্ত তাঁর বশ্যতা মেনে তাঁকে নিয়মিত উপঢৌকন দিতে রাজী হন। হামিরদেবের ক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে সুলতান জালালউদ্দিন খলজী তাঁর রাজ্য আক্রমণের প্রস্তুতি নেন। কিন্তু সেই অভিযান শেষ পর্যন্ত তিনি বাতিল করে দেন। এই ঘটনা হামিরদেবের মর্যাদা বৃদ্ধি করে। আলাউদ্দিন খলজীর আমলে কিন্তু বিদ্রোহী নব-মুসলমান (পরাজিত মোঙ্গলদের অনেকেই দিল্লী সুলতানের বশ্যতা মেনে 'নব-মুসলমান' নামে দিল্লীতে ছিলেন) হামিরদেবের কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় নেন। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে সুলতানি বাহিনী রণথম্ভোর আক্রমণ করে। রানা হামির ও তাঁর অনুগামীরা প্রাণপনে প্রতিরোধ চালিয়ে যান। দীর্ঘ অবরোধের পর সুলতান আলাউদ্দিন ১৩০১ খ্রীষ্টাব্দে রণথম্ভোর দখল করতে সক্ষম হন। রানা হামিরদেব ও তাঁর অনুগামীদের প্রায় সবাই যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। রাজপুত রমণীরা তাদের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য অনেকেই জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে (জৌহর ব্রত) প্রাণ বিসর্জন দেন। হামির দেবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে রণথম্ভোরের চৌহান বংশের গৌরব রশ্মিও অস্তমিত হয়। রাজস্থানের ইতিহাসে কেবল একজন সাহসী যোদ্ধা হিসেবে নয় ; ধর্মসহিষ্ণুতার কারণেও হামিরদেবের নাম স্মরণীয় হয়ে আছে।

চৌহানদের 'দেওরা' গোষ্ঠীর নেতা লুম্বা ১৩১১ খ্রীষ্টাব্দে পারমারদের কাছ থেকে আবু ও চন্দ্রাবতী পর্বত দখল করে স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩২১ খ্রীষ্টাব্দে থুম্বা মারা যান। তাঁর পরবর্তী পাঁচজন শাসকের রাজত্ব সম্পর্কে বিশেষ তথ্য পাওয়া যায় না। এই পর্বে অচলেশ্বর মন্দিরের নবরূপায়ণ করা হয়। এঁরা কখনো চন্দ্রাবতী আবার কখনো আবু পর্বতের চার মাইল উত্তরে অচলগড়ে রাজধানী স্থাপন করে রাজত্ব চালনা করেন। এই গোষ্ঠীর জনৈক বংশধর শিবভান শিরওয়ানা পাহাড়ের চূড়ায় শিবপুরীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন (১৪০৫ খ্রীঃ)। তাঁর পুত্র শাহশমল ১৪২৫ খ্রীষ্টাব্দে সিরোহীতে রাজধানী স্থানান্তর করেন। এর ফলে গুজরাটের শাসক আহমেদ শাহ'র আক্রমণ থেকে রাজপুতরা নিরাপদ দূরত্বে সরে আসতে সক্ষম হন।

শাহশমল সাম্রাজ্য বিস্তারে উদ্যোগী ছিলেন। শোলাঙ্কিদের রাজ্যের একাংশ দখল করে তিনি চৌহানদের রাজ্যসীমা বৃদ্ধি করেন। মেবারের রানা কুম্ভ তখন স্থানীয় বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত ছিলেন। এই সুযোগে শাহশমল মেবারের সীমান্তে সেনা সমাবেশ ঘটান। কিন্তু রানা কুম্ভ তাঁর সেনাপতিদের নেতৃত্বে যুদ্ধ চালিয়ে আবু পাহাড়, বসন্তগড় ও ভুলা দখল করে এবং সিরোহী রাজ্যের পূর্ব প্রান্তে মেবারের আধিপত্য সম্প্রসারিত করেন (১৪৩৭ খ্রীঃ)। এই বিজয়কে স্মরণীয়

করে রাখার জন্য পরবর্তীকালে অচলগড় দুর্গ, কুম্ভস্বামী মন্দির এবং একটি বৃহৎ জলাশয় ও প্রাসাদ নির্মাণ করেন। তবে শাহশমলের পুত্র ও উত্তরাধিকারী লখার হাতে রানা কুম্ভের পুত্র উদা আবু পুনঃহস্তান্তর করেন। লখা ছিলেন 'প্রজাদরদী ও জ্ঞানদীপ্ত শাসক' (a benerolent and enlightened ruler')। রাজ্যের অভ্যন্তরীণ অস্থিরতার সময় যে সকল মানুষ রাজ্য ছেড়ে গিয়েছিলেন, তিনি তাদের ফিরে আসার আহ্বান জানান। সৃষ্টির কাজেও তিনি দক্ষতা দেখান। তিনি কালিকামাতা'র মন্দির ও 'লাখেলাও' সরোবর নির্মাণ করে কৃতিত্ব দেখান। লখার পুত্র ও পরবর্তী শাসক জয়মল ছিলেন উচ্চাভিলাষী। দিল্লীর সুলতান বহ্লুল লোদীকে পরাস্ত করার লক্ষ্যে তিনি ১৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দে মেবারের রানা রায়মলের সাথে হাত মেলান। জালোরের শাসক মজিদ খানকে বন্দী করে তিনি কৃতিত্ব দেখান। পরে প্রচুর অর্থের মুক্তিপণের বিনিময়ে মজিদ খানকে ছেড়ে দেন।

ক্রমে পারিবারিক বিবাদ সিরোহীতে সংকট ঘনীভূত করে। জগমলের ভাই হামির রাজ্যের কিছুটা দখল করে স্বাধীন শাসন কায়েম করতে চাইলে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে হামির পরাজিত ও নিহত হন। কিন্তু রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা চলতেই থাকে। এই সময় দিল্লী থেকে আমেদাবাদের দিকে যাওয়ার সময় সিরোহীর কাছে বহু উন্নতমানের অশ্ব লুণ্ঠিত হয়ে যায়। অশ্বগুলি সম্ভবত গুজরাটের শাসক মামুদশাহ বেগরহার উদ্দেশ্যে প্রেরিত হচ্ছিল। এখন সুলতান মামুদ শাহ সমস্ত অশ্ব ফিরিয়ে দেবার দাবি করেন, অন্যথায় শিরোহী আক্রমণের হুমকি দেন। রানা জগমল চাপের মুখে পড়ে সকল অশ্ব ফেরৎ দেবার বন্দোবস্ত করেন। এতে শিরোহীর রাজনৈতিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়।

১৫২৩ খ্রীষ্টাব্দে জগমলের পুত্র প্রথম আখেরাজ শিরোহীর সিংহাসনে বসেন। যুদ্ধে তাঁর ক্ষিপ্রতার জন্য রাজস্থানের চারণ কবিরা তাঁকে *'উড়ানা আখেরাজ' ('the flying Akheraj')* নামে সম্বোধিত করে বহু লোকগীত রচনা করেন। তিনি উত্তর-পশ্চিম মুখে অভিযান চালিয়ে যোধপুরের লোহিয়ানাতে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। রানা সঙ্গের সহযোগীরূপে আখেরাজ বাবরের বিরুদ্ধে খানুয়ার যুদ্ধেও অংশ নেন। *'মহারাজশ্রী'* উপাধি গ্রহণ তাঁর সামরিক কৃতিত্বের সাক্ষ্য বহন করে। ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর শিরোহীর চৌহানদের গুরুত্ব দ্রুত কমতে থাকে।

✪ হাডাবতী ঃ বুন্দী ও কোটা জনপদ দুটি সমন্বিত করে হাডাবতী রাজ্য গড়ে উঠেছিল। চৌহান বংশের হাডা গোষ্ঠীর নেতা দেব সিংহ উসারা উপজাতীদের পরাস্ত করে বুন্দীতে হাডাবতী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন (১২৪১ খ্রীঃ)। তিনি গজমল, মনোহর দাস, জসকরণ ও অন্যান্যদের পরাজিত করে খতপুর, পাটন ও কারওয়ার দখল করেন। গোন্দ্ উপজাতিকে পরাজিত করে জেনোলি দখল করে ছিলেন বলে মনে করা হয়। লাখেরীর যুদ্ধে তুর্কী বাহিনীকে পরাজিত করে তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দেন। শক্তির উপাসক হিসেবে তিনি গঙ্গেশ্বরীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ১২৪৩ খ্রীষ্টাব্দে পুত্র সমর সিংহকে সিংহাসনে বসিয়ে তিনি অবসর জীবনযাপন করেন।

সমর সিংহও সুযোদ্ধা ও সংগঠক ছিলেন। তিনি ভীল উপজাতির কোটিয়া গোষ্ঠীকে পরাজিত করে তাদের মুল ঘাঁটি আকালগড় ও মুকুন্দরা ধ্বংস করে দেন। পরে এই দুই স্থানে

হাড়াবতী রাজ্যের সামরিক দুর্গ গড়ে তোলা হয়। এই যুদ্ধে সমর সিংহের পুত্র জৈত্র সিংহ মূল ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাই সমর সিংহ ১২৭৪ খ্রীষ্টাব্দে জৈত্র সিংহকে এই অঞ্চলের শাসক নিযুক্ত করেন। জৈত্র সিংহ গোদ্, পনওয়ার ও মেদ্ গোষ্ঠীর রাজপুতদের পরাজিত করে কৈথুন, শিশোয়ালী, বরোদ, রেইলান, রামগড় প্রভৃতি স্থান নিজ রাজ্যভুক্ত করেন। ফলে বুন্দী ও কোটাজেলার বিস্তীর্ণ অংশে হাড়াবতী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। গিয়াসউদ্দিন বলবনের আমলে তুর্কীদের আক্রমণের বিরুদ্ধে (১২৫২-'৫৩ খ্রীঃ) সমর সিংহ বুন্দী ও রণথম্ভোরের স্বাধীনতা রক্ষা করেন। তবে আলাউদ্দিন খলজীর আক্রমণ কালে বম্বাভাড়া দুর্গে প্রতিরোধকালে তিনি বীরের মৃত্যু বরণ করেন। সমর সিংহের মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন নপুর্জী। তিনিও শোলাঙ্কিদের পরাজিত করে পলাইথা ও টোডা দখল করেন। শোলাঙ্কিদের সাথে যুদ্ধে জৈত্র সিংহ মারা গেলে উত্তরে টোডা ও দক্ষিণে পাটন পর্যন্ত নিজ শাসন সম্প্রসারিত করেন। সম্ভবত আলাউদ্দিনের সাথে এক যুদ্ধকালে তিনি নিহত হন (১৩০৪-'৫ খ্রীঃ)। তাঁর মৃত্যুর পর হাড়াবতী রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে।

○ রাজপুত সংস্কৃতি ঃ ভারতীয় বৈদেশিক জাতি, আদিম উপজাতি এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মধ্যে মিলন ও মিশ্রণের ফলে রাজপুত জাতির উদ্ভব হওয়ায় তাদের সমাজ সংগঠন ও সংস্কৃতির উপর ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্যগুলির প্রভাব ছিল সর্বাধিক। কোন কোন শাখার মধ্যে বৈদেশিক উপাদান বেশি ছিল, আবার অন্যশাখার ক্ষেত্রে কোথাও কৌম (উপজাতি) উপাদান কোথাও বা ভারতীয় ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় উপাদানের অধিক প্রকাশ দেখা যায়।[1]

রাজপুত সমাজের ভিত্তি ছিল গোষ্ঠী। প্রতিটি গোষ্ঠী বাস্তব বা কাল্পনিক একজন ধর্মীয় বা ঐতিহাসিক পূর্ব-পুরুষ থেকে সৃষ্টি হয়েছে বলে বিশ্বাস করা হয়। তাই রাজপুতদের গোষ্ঠী চেতনা ছিল প্রায় সার্বিক। গোষ্ঠীগুলি এক একটি বিশেষ এলাকায় নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাস করত। গোষ্ঠী নেতা ছিলেন শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রে। কর্মসূত্রে অন্য গোষ্ঠীর লোক ঐ অঞ্চলে অবস্থান করলেও ; সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল ঐ বিশেষ গোষ্ঠীর সদস্যরাই। রাজপুতদের আয়ের প্রধান উৎস ছিল ভূমি। তবে ভূমির অধিকার ও বণ্টনের ক্ষেত্রে সামন্ততান্ত্রিকতার প্রভাব ছিল স্পষ্ট। ***ঐতিহাসিক টড*** (Tod) তাঁর *'Annals and Antiquities of Rajasthan'* গ্রন্থে রাজস্থানে মধ্যযুগীয় ইউরোপের অনুরূপ সমস্ত প্রথা বিরাজমান ছিল বলে মন্তব্য করেছেন। তবে মধ্যযুগের সূচনা পর্বে রাজস্থানের ভূমি-ব্যবস্থা ও ভূমি-সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে ইউরোপীয় মডেলের ছিল না। মধ্যযুগের ইউরোপে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় সকল জমির মালিক ছিলেন রাজা এবং তিনি অনুগত ব্যক্তিদের মধ্যে নির্দিষ্ট সেবা ও আনুগত্যের বিনিময়ে ভূমিবণ্টন করতেন। কিন্তু রাজস্থানের ব্যবস্থা ছিল স্বতন্ত্র। রাজপুত জাতির বিকাশের পূর্বে জমির মালিকানা ছিল গোষ্ঠীর (clan) হাতে। রাজা গোষ্ঠীর প্রধান হলেও, একক ভাবে জমির উপর তাঁর অধিকার স্বীকৃত ছিল না। ভূমিস্বত্ব ভোগ করত যৌথভাবে সমগ্র গোষ্ঠী। যেমন—মেবারে জমির স্বত্ব ছিল গুহিলট গোষ্ঠীর, মাড়োয়ারে ভূমিস্বত্ব ছিল রাঠোর গোষ্ঠীর ইত্যাদি। রাজা ও গোষ্ঠীর প্রধানরা নিজ নিজ বংশগত অধিকারে ভূমিস্বত্ব লাভ করতেন। ভূমিস্বত্ব লাভের ক্ষেত্রে রাজার ইচ্ছা

অনিচ্ছার কোন ভূমিকা ছিল না। পরবর্তী পর্যায়ে গোষ্ঠীর পরিবর্তে জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা ক্রমশ স্বীকৃতি পায়। শাসকশ্রেণী ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণ বা মন্দির কর্তৃপক্ষকে নিষ্কর ভূমিদান শুরু করেন। আবার শাসনকার্যে সহায়তা ও সামরিক সাহায্য দানের শর্তে ব্যক্তির মধ্যে ভূমিবণ্টন করতে থাকেন। এইভাবে 'সামন্ত' বা মধ্যস্বত্ব ভোগীশ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে। প্রধান সামন্তরা তাঁর অধিনস্ত জমি উপ-সামন্তদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। উপ-সামন্তরা আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে তাঁর জমি ভাগ করে দিতেন রাজপুত যোদ্ধাদের মধ্যে। জমি বণ্টনের ক্ষেত্রে অবশ্যই গোষ্ঠীভুক্ত লোকেদের প্রাধান্য দেওয়া হত। *জেমস টড্* দেখিয়েছেন যে, মেবারের ভূস্বামীদের দুটি অংশ ছিল গ্রাস্য ঠাকুর (Lord) এবং 'ভূঁইয়্যা' (Bhoomia)। প্রথমোক্তরা রাজার কাছে থেকে ভূমিদান গ্রহণ করেন এবং বিনিময়ে ঘরে-বাইরে তাঁকে সেবা দেন। নির্দিষ্ট সময় অন্তর এই অধিকার নবীকরণ করতে হত। অন্যদিকে ভূঁইয়্যা শ্রেণী ধারাবাহিক ভাবে জমির স্বত্ব ভোগ করতেন। এঁরা আঞ্চলিক স্তরে সরকারকে সেবা দিতে দায়বদ্ধ থাকতেন।

সাধারণভাবে রাজস্থানে কৃষকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা দেশের অবশিষ্ট অংশের তুলনায় ভাল ছিল না। ভূমি, পরিবার ও আত্মমর্যাদার প্রতি সচেতন রাজপুত্র জাতিও সাধারণ কৃষকের প্রতি ছিল দয়া-মায়াহীন। প্রধান-সামন্ত হতেন মূলত প্রধান শাসক বা গোষ্ঠী প্রধানের নিকট আত্মীয়রা। রাজপুত আদর্শ অনুসারে পবিত্রতার প্রতীক হিসেবে রাজা সাধারণভাবে কোন সামন্তকে বন্দোবস্ত দেওয়া জমি পুনর্গ্রহণ করতেন না। কিন্তু কৃষকদের ক্ষেত্রে এই নীতি বা আদর্শবাদ মান্য হত না। সামন্তদের অধীন কৃষকদের কোনরূপ অধিকার বা স্বাধীনতা স্বীকৃত ছিল না। ভূস্বামী নিজ ইচ্ছামত কৃষকদের ভূমি বন্দোবস্ত দিতেন এবং উৎখাতও করতে পারতেন। কৃষকের কাছে কর আরোপ এবং তা আদায়ের কাজেও সামন্তপ্রভুর ইচ্ছা-অনিচ্ছা চূড়ান্ত ছিল। ফলে মধ্যযুগের ইউরোপে জমির সাথে কৃষকের অচ্ছেদ্য বন্ধন বিষয়টিকে বাদ দিলে মধ্যযুগের রাজপুতানায় কৃষকদের অবস্থা 'সার্ফ' বা ভূমিদাসদের সমতুল্যই ছিল।

রাজপুত সমাজ ব্যবস্থায় জাতিভেদ ও বর্ণাশ্রম প্রথা যথেষ্ট জনপ্রিয় ও কার্যকরী ছিল। চারটি প্রধান বর্ণ ছাড়াও কিছু উপবর্ণের সৃষ্টি হয়েছিল। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের কর্তৃত্ব ও মর্যাদা ছিল অন্যান্যদের তুলনায় বেশি। বর্ণ ব্যবস্থার তৃতীয় স্থানভুক্ত বৈশ্যরা প্রথম দিকে কৃষিকার্যে লিপ্ত ছিলেন। পরে এঁরা কৃষিকার্য ছেড়ে ব্যবসা-বাণিজ্যকে জীবিকা রূপে গ্রহণ করেন। রাজপুত সমাজে নারী বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। পর্দা প্রথার প্রচলন ছিল। তবে পরিবারের সদস্যদের কাছে নারীর মর্যাদা স্বীকৃত ছিল। শিক্ষালাভ করে নারী তার সামাজিক অবস্থান সুদৃঢ় করতে পারতেন। জীবনসঙ্গী বেছে নেওয়ার অধিকার সীমিত অর্থে স্বীকৃতি ছিল। আত্মমর্যাদা সম্পর্কে অতি-সচেতনতা ছিল রাজপুত রমণীর বৈশিষ্ট্য। সম্ভ্রম রক্ষার জন্য তাঁরা সানন্দে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে (জৌহর ব্রত) প্রাণ বিসর্জন দিতে পারতেন। অস্ত্রচালান, শিকারযাত্রা বা যুদ্ধযাত্রায় নারীর অংশগ্রহণের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

আঞ্চলিক বাণিজ্য ও নগরায়ণ
[Regional Trade and Urbaniztion]

○ দক্ষিণভারতের বাণিজ্য ও নগরায়ণ ঃ

মার্কোপোলো, আব্দুর রজ্জাক, নিকলো কন্টি, নিকিতন প্রমুখ বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ থেকে দক্ষিণ ভারতের বন্দর, বণিক ও সমৃদ্ধ বাণিজ্য ধারার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনদিক সমুদ্রবেষ্টিত হওয়ায় এবং সরাসরি কোন স্থলপথ না থাকায় দক্ষিণ-ভারতীয় বাণিজ্যের কেন্দ্রে ছিল সমুদ্রবাণিজ্য। দক্ষিণ-ভারতীয় উপদ্বীপের ছোট-বড় অসংখ্য উপকূল-বন্দর ছিল এই বাণিজ্যের উৎকেন্দ্র। এই বন্দর সমূহকে অবস্থানগত ভাবে পাঁচটি বর্গে (Group) ভাগ করা যায়—কোঙ্কন, তুলুনাদ, মালাবার, করমণ্ডল (মাবার) এবং তেলেঙ্গানা বর্গ। এদের মধ্যে কোঙ্কন-বর্গ মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত। আমাদের আলোচনা পরবর্তী চারটি বর্গ সম্পর্কে।

তুলুনাদ বর্গের বিস্তৃতি উত্তরে গোয়া থেকে দক্ষিণে মাউন্ট দেল্লি পর্যন্ত। এই বর্গের কয়েকটি ব্যস্তবন্দর হলো মিরজান, হোন্নাভার, ভাটকল, বসরুর, ম্যাঙ্গালোর ইত্যাদি। পর্যটক বারবোসা গোয়া বন্দরের নাগরিক বৈশিষ্ট্য ও বাণিজ্যিক ব্যস্ততার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাঁর আগমনকালে গোয়া বন্দরে মুর বণিকদের সংখ্যাধিক্য ছিল, যাদের অনেকেই ছিল বহিরাগত। শহরটি ছিল উঁচু প্রাচীর-বেষ্টিত এবং সুদৃশ্য গৃহ, দুর্গ শোভিত। শহরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ছিল বিস্তীর্ণ উর্বর ভূমি, মিষ্ট ফলের বাগিচা ও বিশুদ্ধ পানীয় জলের কূপ। বিজয়নগর রাজ্যের আমদানি দ্রব্যের মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল উন্নতমানের ঘোড়া। ঘোড়া আমদানির প্রধান কেন্দ্র ছিল এই গোয়া বন্দর। ওরমুজ থেকে ঘোড়া বোঝাই জাহাজগুলি গোয়াবন্দরে ভিড়ত। বিজয়নগর ও দাক্ষিণাত্যের বণিকরা এদের কিনে নিতেন। বিনিময়ে ওরমুজের জাহাজগুলি গোয়া থেকে প্রচুর পরিমাণ চাউল, চিনি, লোহা, আদা, গোলমরিচ, মশলা ও ঔষধি বোঝাই করে ফিরে যেত। মক্কা ও এডেন থেকেও গোয়াতে জাহাজ আসত। চাউল, মালাবার, দাভোল থেকে ছোট ছোট নৌকা এখান থেকে পণ্য সংগ্রহ করে নিয়ে যেত।

গোয়া বন্দর তুলুনাদ বর্গের শুরুর মুখে অবস্থিত হলেও, এই বর্গের প্রথম বন্দর ছিল মিরজান। একই নামের নদীর তীরে মিরজান বন্দর-শহরটি গড়ে উঠেছিল। মালাবারের 'জাম্বুকোস' (zambuquos) নামক জাহাজগুলি এখানে নারকেল, নারকেল তেল এবং তালমিছরি ইত্যাদি পৌঁছে দিত। এর বদলে কালো মোটা দানার চাল নিয়ে ফিরে যেত। হোন্নাভার ও মালাবারের মধ্যে কালো চাউল, নারকেল, নারকেল তেল, তালমিছরি এবং তাড়ি (palm-winc) ইত্যাদি বাণিজ্য চলত। ভাটকল ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি বন্দর-শহর। পর্যটক ***বার্থেমা*** (Varthema) লিখেছেন, ***"ভাটকল ভারতের একটি মহতীনগর .....প্রাচীর বেষ্টিত, সুদৃশ্য এবং সমুদ্র থেকে মাত্র এক মাইলের মধ্যে অবস্থিত" ("Bathacala was a***

very noble city of India ...walled and very beautiful and almost a mile distant from the sea.")। বারবোসা ভাটকল শহরের বর্ণনা প্রসঙ্গে এটিকে জনবহুল, সুদৃশ্য বাগিচা, উর্বর কৃষিক্ষেত্র এবং বিশুদ্ধ জল সমৃদ্ধ বলে উল্লেখ করেছেন। *সুর* ও *জেন্টিল* (Gentiles) বণিকদের বসতি গড়ে উঠে এই শহরে। এখান থেকে ওরমুজে রপ্তানি হত প্রধানত সাদা চাল, গুঁড়ো চিনি ও লোহা। আরব ও পারস্যের সুর বণিকদের কাছে হরীতকীর বিশেষ চাহিদা ছিল। মুরদের মক্কাগামী জাহাজে নানা ধরনের মশলা নিয়ে যাওয়া হত। মালাবারের বণিকরা এখান থেকে লোহা ও চিনি কিনতেন। ওরমুজের জাহাজগুলি প্রতিবছর ভাটকল বন্দরে নিয়ে আসত প্রচুর সংখ্যক ঘোড়া ও মুক্তা। মালাবারের বণিকেরা এখানে আনত তালমিছরি। নারকেল, নারকেল তেল, তাড়ি, প্রচুর পরিমাণে গোলমরিচ এবং ঔষধ। বারবোসা ভাটকলে আমদানি পণ্য হিসেবে এছাড়াও মুদ্রা ও রান্নার সরঞ্জাম তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় তামা ও পারদ, সিন্দুর, প্রবাল, ফটকিরি, হাতির দাঁত ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন।

'হোন্নাভার' (Honnavar) শব্দের আক্ষরিক অর্থ 'একটি সোনার গ্রাম' (a golden village)। পর্যটক *পিয়েত্রো ডেলা ভেল* (Pietro Della Valle) ১৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে এই বন্দরের বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখেন যে, সমুদ্র তীরবর্তী এই ছোট্ট এলাকাটিকে উত্তর-দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত দুটি নদী যেন দুই বাহু দিয়ে ঘিরে রেখেছে। নদী দুটি দুর্গের কাছে এসে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। হোন্নাভার শহরের পাশে প্রবাহিত শরাবতী (সরস্বতী) নদীতে ২০০ থেকে ৩০০ টনের জাহাজ ভিড়তে পারে। জনৈক ওলন্দাজ লেখকের বিবরণী থেকে জানা যায় যে এই ব্যস্ত বন্দরটি ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজ বণিকদের অসহযোগিতার ফলে যথেষ্ট গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছিল।

সমুদ্র উপকূলবর্তী আর একটি ব্যস্ত বন্দর শহর ছিল বসরুর (Basrur)। প্রাচীন কুণ্ডাপুর নদীর খাতের ধারে অবস্থিত এই বন্দর থেকে আরব ও মিশরের সাথে বাণিজ্য চলত। ওলন্দাজরা এই নদী খাতের এক মাইলের মধ্যে একটি কুঠি ও দুর্গ নির্মাণ করে এখান থেকে চাল ক্রয়-বিক্রয় করত। পর্তুগীজরা এখান থেকে গোয়ার জন্য চাল নিয়ে যেত। ছয় থেকে আটটি পর্তুগীজ বাণিজ্যপোত এখান থেকে মাস্কটে চাল নিয়ে যেত এবং সেখান থেকে আমদানি করত ঘোড়া, খেজুর, মুক্তা ইত্যাদি আরবদেশীয় পণ্য। বাসরুর শহরটি দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল। পিয়েত্রো ডেলাভেল উচ্চ-বাসরুর শহরের বৃক্ষশোভিত প্রশস্ত রাজপথের সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। বারকুর ও বসরুর থেকে মালাবার, ওরমুজ, এডেন, জায়ের প্রভৃতি স্থানে খোসা ছাড়ানো সরু চাল রপ্তানি হত। আমদানি হতো নারকেল, নারকেল তেল, তামা, গুড় ইত্যাদি।

ম্যাঙ্গালোর বন্দর কানাড়া অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল বলে আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন মন্তব্য করেছেন। ম্যাঙ্গালোর থেকে এডেন ও মালাবারে কালো চাল ও গোলমরিচ রপ্তানি হত। কুম্বলা (Kumbla) থেকে মালদ্বীপ ও মালাবারে যেত কালো চাল। মালদ্বীপ থেকে আমদানি করা হত নারকেল ছোবড়ার দড়ি। কালো চাল সস্তা হওয়ায় মালাবারের লোকেরা তা সহজে ক্রয় করতে পারত।

মালাবার বর্গের বিস্তৃতি ছিল উত্তরে মাউন্ট দেল্লি থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা। মালাবার

বর্গের উল্লেখযোগ্য বন্দরগুলি হলো কোচিন, কান্নানোর, কালিকট, কায়নকোলম, কুইলন প্রভৃতি।এই বর্গের বন্দরগুলিতে তুলুনাদ বর্গের তুলনায় বেশি বাণিজ্য চলত। এই বর্গের প্রধান বন্দর কোচিনের সাথে আফ্রিকা, ইউরোপ, আরবদেশ, পারস্য, সিংহল ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ছয়টি অঞ্চলের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। পূর্ব-আফ্রিকার সোফালা, মোজাম্বিক, মোম্বাসা প্রভৃতি বন্দরগুলিতে এখান থেকে রপ্তানি হত বস্ত্রাদি, মশলা ও ভেষজ দ্রব্য। আফ্রিকা থেকে আমদানি পণ্যের মধ্যে প্রধান ছিল সোনা, হাতির দাঁত, আবলুস কাঠ এবং ক্রীতদাস। ইউরোপের সাথে দক্ষিণভারতের বাণিজ্য পরোক্ষভাবে চলত লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরের মাধ্যমে। লিসবন থেকে জাহাজগুলি কোচিন বা গোয়া বন্দরে পৌঁছাত। এরা নিয়ে আসত রূপা ইত্যাদি ধাতু ও অন্যান্য বিলাস সামগ্রী। ফেরার পথে জাহাজগুলি নিয়ে যেত গোলমরিচ, সুস্বাদু মশলা, ভেষজ দ্রব্য ইত্যাদি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাথে ভারতের বাণিজ্য-সম্পর্কের ঐতিহ্য খুবই প্রাচীন। একটা বাণিজ্য সূত্রেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। এখানকার যে সকল শহরে ভারতীয় পণ্যের কদর ছিল তাদের অন্যতম হলো মালাক্কা, জাভা, সুমাত্রা, বোর্ণিও ইত্যাদি। মালাক্কা থেকে ভারতে আমদানি হত পোর্সিলিন, কর্পূর, সুগন্ধি ইত্যাদি।জাভা, সুমাত্রা, বোর্ণিও থেকে আসত সোনা, গোলমরিচ। মলুক্কা, বান্দা ইত্যাদি বন্দর থেকে আসত লবঙ্গ, জায়ফল ইত্যাদি। ভারত থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় রপ্তানি পণ্যের মধ্যে ছিল বস্ত্রাদি, মশলা ও বিভিন্ন ধরনের ভেষজ। পারস্যের প্রধান সমুদ্রবন্দর ছিল ওরমুজ। মালাবার উপকূল বন্দরগুলি থেকে এখানে রপ্তানি করা হত সূতীর জামাকাপড়, চিনি, গোলমরিচ ও অন্যান্য মশলা। অন্যদিকে মালাবারে আমদানি করা হত রৌপ্য মুদ্রা, ঘোড়া, রেশমবস্ত্র ইত্যাদি। আরবদেশের অন্যতম প্রধান ছিল এডেন, মোচা ও জেদ্দা। লোহিত সাগরের তীরবর্তী এই বন্দরগুলিতে ভারত থেকে রপ্তানি করা হত নানা রকম মশলা, সূতীবস্ত্র ও ভেষজ দ্রব্য। আরবীয় বন্দরগুলি থেকে ভারতীয় পণ্য ভূমধ্যসাগরের পথ ধরে বা স্থলপথে ইউরোপ ও মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলিতে চালান যেত। কান্নানোর বা (কান্নানুর)-এর বণিকরা যথেষ্ট ধনী এবং ব্যক্তিগত ভাবে জাহাজের মালিক ছিলেন বলে বারবোসা উল্লেখ করেছেন। পর্যটক বার্থেমার বিবরণ অনুসারে প্রতিবছর এই বন্দর থেকে অন্তত ২০০ টি জাহাজ দেশের মধ্যে ও বিদেশে বাণিজ্য পণ্য নিয়ে চলাচল করত। বারবোসার বিবরণ মতে ধর্মপত্তনম্-এর বণিকেরাও যথেষ্ট ধনী ও জাহাজের মালিক ছিলেন। এখান থেকে সিংহলে চাল রপ্তানি করা হত এবং আমদানি করা হত মণিমুক্তা।

মালাবার বর্গের ব্যস্ততম ও জনপ্রিয় বন্দরটি ছিল কালিকট। বারবোসা. আব্দুর রজ্জাক, নিকিতন প্রমুখ বহু পর্যটক কালিকট বন্দরের প্রশংসা করেছেন। ভাস্কো-দা-গামার নেতৃত্বে পর্তুগীজরা কালিকট বন্দরে উপস্থিত হলে (১৪৯৮ খ্রীঃ) ইউরোপের সাথে দক্ষিণ-ভারতের নির্ভরযোগ্য সমুদ্রপথ আবিষ্কৃত হয়। কালিকটের শাসক জামোরিণ বণিকদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। ফলে দেশীয় বণিকদের পাশাপাশি বিদেশী বণিক ও প্রযুক্তিবিদ্‌রা এখানে এসে বসবাস শুরু করে। বণিকদের কাছে কালিকটের আকর্ষণের আর একটি কারণ

হলো এর নিরাপত্তা। বিদেশীদের জন্য জামোরিণ 'দেহরক্ষী' (নায়রে) এবং 'হিসাবরক্ষক' (চাতিম)-এর বন্দোবস্ত করতেন। বিদেশী বণিকেরা বন্দরে পণ্য নামিয়ে নিশ্চিন্তে যে-কোন জায়গায় চলে যেতে পারতেন। পণ্য হস্তান্তর না হওয়া পর্যন্ত সরকার স্বতপ্রণোদিত ভাবেই সেগুলির তত্ত্বাবধান করত। কালিকট থেকে প্রতিবছর ১০-১৫ টি জাহাজ গোলমরিচ, আদা, এলাচ, দারুচিনি, হরীতকী, তেঁতুল এবং দামি পাথর, মুক্তা, কস্তুরী, ঘৃতকুমারী, কার্পাসবস্ত্র, পোর্সিলিন ইত্যাদি পণ্যদ্রব্য লোহিত সাগর, এডেন, মক্কা ও জেড্ডাতে নিয়ে যেত। জেড্ডার বণিকরা আবার ঐসব পণ্য কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়া, ভেনিস প্রভৃতি বন্দরে পৌঁছে দিত। কালিকটের জাহাজগুলি জেড্ডা থেকে আমদানি করত তামা, পারদ, সিঁদুর, প্রবাল, জাফরান, গোলাপজল, রঙিন ভেলভেট, সোনা, রূপা ইত্যাদি। চীন, জাভা, সিংহল, মালদ্বীপ, ইয়েমেন ইত্যাদি দেশের জাহাজ নিয়মিত কালিকট বন্দরে পৌঁছাতো বলে নিকলো কন্টি, আব্দুর রজ্জাক প্রমুখ উল্লেখ করেছেন। নিকলো কন্টি কালিকট বন্দরকে *"a noble emporium for all India"* বলে প্রশংসা করেছেন। গোলমরিচ. লাক্ষা, আদা, দারুচিনি, হরীতকী ইত্যাদির প্রচুর যোগান কালিকটের বন্দরের ব্যস্ততা ও সমৃদ্ধির প্রধান কারণ ছিল।

দক্ষিণভারতের শেষ প্রান্তে অবস্থিত কুইলন বন্দরের সাথে বহুকাল থেকেই দূরপ্রাচ্য এবং বিশেষ করে চীনের সাথে বাণিজ্যসম্পর্ক ছিল। চীনা বণিকরা পশ্চিমদেশগুলিতে বাণিজ্যপণ্য নিয়ে যাওয়ার সময় কুইলন বন্দরে কিছুটা সময় কাটাতেন। এখানকার মুর ও হিন্দু বণিকদের প্রভূত সম্পদ ও নিজস্ব বাণিজ্যপোত ছিল। কুইলনের প্রধান বাণিজ্যপণ্য ছিল গোলমরিচ। এছাড়াও নানা ধরনের পণ্য এখান থেকে বণিকেরা সিংহল, করমণ্ডল উপকূল, বাংলা (Bengal), মালাক্কা, পেগু, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশে চালান দিত।

পূর্ব উপকূলে ছিল মাবার (বা করমণ্ডল) ও তেলিঙ্গানা বর্গের বন্দরগুলি। পূর্ব উপকূলের বন্দরগুলির সমুদ্র বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল তুলনামূলক ভাবে কম। এখানে বন্দরের সংখ্যাও কম। করমণ্ডল বর্গের প্রধান বন্দর ছিল কায়েল, নেগাপতনম্, মাইলাপুর ও পুলিকট। এই বন্দরসমূহ থেকে সিংহল, ব্রহ্মদেশ, মালাক্কা, সুমাত্রা, চীন প্রভৃতি দেশের সাথে বাণিজ্য চলত। ফ্রেডারিক বারবোসা কায়েল (Cael) বন্দরকে মণিমুক্তার বাণিজ্যের জন্য খ্যাত বলে উল্লেখ করেছেন। কায়েল সহ করমণ্ডল বর্গের বণিকদের 'চাটিস'(Chatis) বা 'শেঠিঠ' (Settis) বলা হত। মালাবার ও বেংগালা (Bengala) থেকে বাণিজ্য জাহাজ কায়েল বন্দরে আসত। বারবোসার বিবরণ মতে, পূর্বে উপকূলে কেবল মাইলাপুর ও পুলিকট বন্দর বিজয়নগর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মালাবারের জাহাজগুলি এখান থেকে চাল সংগ্রহ করত। চাল ব্যবসা বেশ লাভজনক ছিল। এছাড়া, ক্যাম্বে থেকে আসত তামা, পারদ, সিঁদুর, গোলমরিচ ইত্যাদি। মালাক্কা, চীন ও বেঙ্গালা থেকে আসত নানা ধরনের মশলা ও ভেষজ দ্রব্য। আদি-মধ্যযুগে মাইলাপুর বন্দর হিসেবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। উত্তর প্রান্তে পুলিকট এই সময় বন্দর হিসেবে ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছিল। সমুদ্রপথ ছাড়া স্থলপথেও এখানে কিছু বণিকের যাতায়াত ছিল। পুলিকট থেকে মালাক্কা, পেগু, সুমাত্রা, মালাবার ও গুজরাটে ছাপা সূতীকাপড় রপ্তানি হত। ক্যাম্বে, মক্কা, মালাবার থেকে এখানে আমদানি করা হত তামা, পারদ, সিঁদুর, ভেলভেট, গোলাপজল ইত্যাদি।

তেলিঙ্গানা বর্গের প্রধান দুটি বন্দর ছিল মতুপল্লী ও মসুলিপতনম্। মতুপল্লীর বণিকরা প্রধানত মুক্তা, গোলাপজল, চন্দনকাঠ, চীনাকর্পূর, হাতির দাঁত, কর্পূর-তেল, তামা, দস্তা, সিসা, সিল্ক, প্রবাল, সুগন্ধি, গোলমরিচ ইত্যাদির বাণিজ্য করত। মার্কোপোলো এই দুটি বন্দরকেই সুন্দর ও বৃহদাকার হীরের জন্য বিখ্যাত ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। মতুপল্লীর শাসকেরা বহিরাগত বণিকদের নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি যত্নবান ছিলেন। ১২৪৫ খ্রীষ্টাব্দে কাকতীয় গণপতিদের এবং অন্নপোতা রেড্ডী এক সরকারি সনদ (অভয়-শাসন) দ্বারা সমুদ্র-বণিকদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেন এবং শোষণমূলক শুল্কগুলি বাতিল করে দেন।।

❍ অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ঃ

আদি-মধ্যযুগে বিজয়নগর সহ দক্ষিণভারতের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের তিনটি ধারা লক্ষ করা যায়—উপকূল বাণিজ্য, নদীপথ বাণিজ্য ও স্থলপথ বাণিজ্য। ইতিপূর্বে সমুদ্র বাণিজ্য প্রসঙ্গে উপকূল বাণিজ্যের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। ছোট ছোট জলযানে উপকূল বাণিজ্য পরিচালিত হত। ক্যাম্বে, ভাটকল, ম্যাঙ্গালোর, মালাবার, কোচিন, কয়াল, পুলিকট, মসুলিপত্তনম্, মতুপল্লীর মধ্যে উপকূলরেখা ধরে পণ্য লেনদেন চলত। মালাবার থেকে ক্যাম্বে ও সুরাটে যেত চাল, নারকেল, নারকেল তেল, তালমিছরি ও অন্যান্য পণ্য। ক্যাম্বে ও সুরাট থেকে মালাবার উপকূলে আসত সূতী ও রেশমবস্ত্র। কয়াল থেকে আসত মুক্তা, পুলিকট থেকে বস্ত্রাদি, মতুপল্লী ও মসুলিত্তনম্ থেকে হীরা ও দামী পাথর। এই সকল পণ্য মালাবার উপকূলসহ গোয়া, সুরাট, ক্যাম্বে এমনকি বাংলা পর্যন্ত ছড়িয়ে যেত।

উত্তরভারতের মত দক্ষিণভারতে নদীপথ বাণিজ্য সমৃদ্ধ ছিল না। গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু ইত্যাদি উত্তর-ভারতে প্রবাহিত নদীগুলির নাব্যতা দক্ষিণী নদীগুলির ছিল না। দক্ষিণ-ভারতের প্রধান নদীগুলি যেমন—কৃষ্ণা, কাবেরী ও গোদাবরী উপত্যকা ও পর্বতসঙ্কুল দক্ষিণ-ভারতে স্বাভাবিক গতিপথ বা নাব্যতা পায়নি। তাই বছরের কিছুটা সময় এগুলি নৌ-যান চলার উপযোগী হলেও, জলাভাবের কারণে বাকি সময়টা বাণিজ্য পরিবহণের সহায়ক ছিল না। বিদেশী পর্যটকরা দক্ষিণ-ভারতের নদী পরিবহণের কাজে একধরনের ঝুঁড়ি জাতীয় নৌকা (Basket-boat), ভেলা, শালতি ইত্যাদি ব্যবহৃত হত। স্বল্পাকারে হলেও দক্ষিণ-ভারতে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে নদীপথগুলি ব্যবহার করা হত।

স্থলপথ বাণিজ্যের কেন্দ্রে ছিল বিজয়নগর রাজ্য। দক্ষিণ-ভারতের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ স্থলপথগুলি বিজয়নগর থেকে বেরিয়ে দেশের নানা অঞ্চলে প্রসারিত ছিল। *অধ্যাপক চিট্‌নিস* (K. N. chitnis) বিদেশী পর্যটকদের বিবরণীর প্রেক্ষিতে সাতটি প্রশস্ত রাজপথের উল্লেখ করেছেন। এগুলি হলো ঃ— (১) বাঁকাপুর হয়ে গোয়া, (২) শিবসমুদ্রম্ হয়ে শ্রীরঙ্গপত্তম্ (৩) কোচিন ও মালাবার পর্যন্ত, (৪) চন্দ্রগিরি, তিরুপতি, কাঞ্চী, তিরুভান্ন-মালাই, মাদুরাই ও রামেশ্বরম্ হয়ে ধনুস্কোদি পর্যন্ত, (৫) কোন্দাভিদু হয়ে উদয়গিরি পর্যন্ত, (৬) কাম্পিলিও কোভিল কোণ্ড হয়ে মসুলিপত্তম্ পর্যন্ত এবং (৭) রায়চুর ও তার দক্ষিণের অংশ পর্যন্ত

প্রসারিত। বিদেশী পর্যটকরা এই সকল রাজপথের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেননি। তাঁদের দেওয়া বিক্ষিপ্ত-বিবরণ এবং ধর্মীয় পদযাত্রা ও সামরিক বাহিনীর গতিপথের উল্লেখের ভিত্তিতে এবিষয়ে একটা ধারণা গড়ে তোলা যায়। পথচারীদের নিরাপত্তা ও আনুষঙ্গিক ভ্রমণকালীন সুযোগ-সুবিধার দিকেও বিজয়নগরের শাসকদের লক্ষ্য ছিল। পিয়েত্রো-ডেল-ভেল, জ্যাকব ভিস্‌চের প্রমুখ বিভিন্ন পথের উভয় পার্শ্বে রোপিত বৃক্ষরাজি, বিশ্রামাগার ও পাহারা-চৌকির অস্তিত্বের উল্লেখ করেছেন। আলেকজাণ্ডার হ্যামিল্‌টন বলেছেন যে, রাস্তার নানা স্থানে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে পথিকদের জল দানের ব্যবস্থা করা ছিল।

স্থলপথ পরিবহণের কাজে হাতি, ঘোড়া, খচ্চর, পালকি, গোরুর-গাড়ি, ষাঁড় এমনকি মহিষ ও গাধাকেও ব্যবহার করা হত। পালকি ও ঘোড়া সাধারণভাবে অভিজাতদের যাতায়াতের জন্য ব্যবহার করা হত। সাধারণ মানুষের জন্য ছিল গো-যান, স্থলবাণিজ্যের পসরার মধ্যে প্রধান ছিল গোলমরিচ। এছাড়া ছিল এলাচ, নারকেল, তেঁতুল, খেজুর, বাঁশের ঝুড়ি, তালমিছরি ঘি, তেল, লবণ, ধান, চাল, বস্ত্র ইত্যাদি।

❍ ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্য ঃ

ভারতের বহির্বাণিজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশজুড়ে আছে ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্য। ভারত মহাসাগরের পথ ধরে ভারতীয় পণ্যের রপ্তানি ও বিদেশী পণ্যের আমদানির ইতিহাস খ্রীষ্টপূর্ব কাল থেকে খুঁজে পাওয়া যায়। হরপ্পা সংস্কৃতির আমলে (খ্রীষ্টপূর্বে ২৩০০-২৭৫০ অব্দ) সিন্ধুনদের তীর থেকে ভারতীয় জলযান পারস্য উপসাগর পাড়ি দিয়ে মেসোপটেমিয়ার বন্দরে পৌঁছাতো। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকের শেষ ভাগ থেকে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত চীন-রোম বাণিজ্যে ভারত ও ভারত মহাসাগর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। চীনের বিশ্বখ্যাত রেশম বাণিজ্যে নিয়োজিত চীন ও রোমের বাণিজ্যপোতগুলি ভারতীয় বন্দরে এসে পণ্য বিনিময় করত। রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারত মহাসাগরে দূর পাল্লার বাণিজ্য কিছুটা ঝিমিয়ে পড়ে। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে ইসলামের আবির্ভাব ও ক্রমপ্রসারের ফলে ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবন ঘটে।

সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, ভারত মহাসাগরের পশ্চিম ও দক্ষিণ সীমা যথাক্রমে উত্তমাশা অন্তরীপ এবং দক্ষিণ-মেরু অঞ্চল। লোহিতসাগর ও পারস্য উপসাগর ভারত মহাসাগরের অন্তর্ভুক্ত। তবে চীন সমুদ্র এর বৃত্তের বাইরে। ভারত মহাসাগরের উত্তরে আছে ভারত, পাকিস্তান, ইরাণ (পারস্য) ও আরব দেশ। পশ্চিমে আফ্রিকা মহাদেশ। পূর্বপ্রান্তে মালয় উপদ্বীপ, ইন্দোনেশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ এবং দক্ষিণে এন্টর্কটিকা।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে ইসলামের উত্থান ও প্রসার বিশ্বের সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে যুগান্তকারী পরিবর্তন নিয়ে আসে। ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতিকে ভর করে আরবদেশ যেন দীর্ঘ নিদ্রা থেকে জেগে ওঠে এবং নবজীবনের নতুন প্রাণশক্তিকে ভিত্তি করে ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বের নানা প্রান্তে। ইসলামের সম্প্রসারণকে কেন্দ্র করে ভারত মহাসাগরের বাণিজ্যিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। খ্রীষ্টীয় বারো শতকে ধর্মযুদ্ধের (crusade) সময় থেকে ইউরোপে প্রাচ্যের দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা ব্যাপক বৃদ্ধি পায়। আরব ও তুর্কী শাসকদের জাঁকজমকপূর্ণ ও বিলাসবহুল জীবনধারা

ইউরোপীয় শাসকদের আকর্ষণ করে। ফলে রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর ইউরোপের বি-নগরায়ণ ও ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দার যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল তার অবসান ঘটে এবং এশিয়ার সাথে ইউরোপের বাণিজ্যে নতুন গতিবেগ সঞ্চারিত হয়। এই সূত্রে অনিবার্যভাবে ভারত মহাসাগর বাণিজ্য-অর্থনীতির কেন্দ্রে চলে আসে।

মধ্যযুগের গোড়ায় ভারত মহাসাগর ও চীন সমুদ্রে বাণিজ্যের চরিত্রগত পরিবর্তন দেখা যায়। ভারতীয় ও চীনা দ্রব্য সামগ্রী মধ্য-এশিয়ার ভিতর দিয়ে স্থলপথে পাঠানো ছিল ব্যয়বহুল ও বিপদজ্জনক। আদি-মধ্যযুগে এই চিরাচরিত পথ বন্ধ হয়ে যায়।[1] ফলে চীন ও পারস্য উপসাগরের সাথে সপ্তম শতক থেকেই সামুদ্রিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়। প্রথম দিকে পারসিকরা তাদের নিজ পণ্য নিজস্ব জাহাজে নিয়ে বাণিজ্য শুরু করে। অষ্টম শতক থেকে আরব বণিকরা চীনের ক্যান্টন বন্দরে আসতে শুরু করে।[2]

ভারতের কাপড়, মশলা ও বিলাসদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে ভারতীয় উপকূলের সাথে আরব বণিকদের সম্পর্ক বাড়তে থাকে। ইহুদী, খ্রীষ্টান, পারসিক বণিকদের পাশাপাশি আরব বণিকরা পশ্চিম উপকূলে বসবাস শুরু করে। প্রাক্ মুসলমান যুগে এই প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং মুসলমান বিজয়ের পর এই প্রবণতা অনেক বৃদ্ধি পায়। আদি-মধ্যযুগে ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যে আরব বণিকদের প্রাধান্য থাকলেও, এটাই সমুদ্র বাণিজ্যের সম্পূর্ণ চিত্র নয়। একই সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সাথে ভারত ও চীনের বাণিজ্যে সিংহলী ও করমণ্ডলের ক্লিং বণিকদের জাহাজগুলির বিশেষ ভূমিকা ছিল। দ্বাদশ শতকের চীনা সাক্ষ্য উল্লেখ করে *ড. অনিরুদ্ধ রায়* লিখেছেন যে ঃ চীনের 'জাঙ্ক' জাহাজগুলি মাল পরিবহণ শুরু করার পরেও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে ভারত ও চীনের পণ্য নামত এবং হাতবদল হয়ে বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ত।

ভৌগোলিক অবস্থার প্রয়োজনে সারা মধ্যযুগে এশিয়ার সামুদ্রিক বাণিজ্য দু'টি অংশে বিভক্ত ছিল। একটি পূর্বদিকের এবং অন্যটি পশ্চিমদিকের বাণিজ্য। একই মৌসুমী বায়ুর উপর নির্ভর করে চীন থেকে ইউরোপের বন্দরে যাওয়া যেত না। তাই পূর্ব ও পশ্চিমের জাহাজগুলি মাঝামাঝি কোন বন্দরে অপেক্ষা করত পরবর্তী অনুকূল বায়ুপ্রবাহের জন্য। এখানেই উভয় প্রান্তের জাহাজগুলি মাল বিনিময় করে নিজ নিজ বন্দরে ফিরে যেত। *ড. অনিরুদ্ধ রায়* উল্লেখ করেছেন যে ঃ দু'টি ভিন্ন ধরনের জাহাজে দু'দিকের বাণিজ্য চলত। পূর্ব প্রান্তের জাহাজটিকে 'জাঙ্ক' বলা হয় এবং পশ্চিম প্রান্তের জাহাজটির নাম ছিল 'ধাও'। এগুলির নির্মাতা ছিল যথাক্রমে চীন ও আরব। ভারতীয় মহাসাগরের জাহাজগুলি ভূমধ্যসাগরীয় ও উত্তর ইউরোপীয় জাহাজগুলির তুলনায় বড় ছিল। তবে ভারতীয় জাহাজগুলি পল্‌কা হলেও দড়িবাঁধা বলে ভারতীয় বন্দরের বড় বড় ঢেউ এদের ক্ষতি করতে পারত না।

ভারতের পশ্চিম উপকূলের গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রবন্দর ছিল মালাবারের কালিকট ও কোচিন এবং গুজরাটের সুরাট, ব্রোচ, ক্যাম্বে প্রভৃতি। এগুলি থেকে প্রাচ্যদেশগুলি ও ইউরোপের

মধ্যে সমুদ্রবাণিজ্য চলত। চীনা সিল্ক, মাটির বাসন, সোনালি কলাই, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মশলা ইত্যাদি মালাবার উপকূলে আনা হত। এবং সেখান থেকে জাহাজ বোঝাই হয়ে পারস্য উপসাগর ও লোহিত সাগরের বন্দরগুলিতে নিয়ে যাওয়া হত। স্থলপথে কিছু পণ্য যেত বর্তমান সিরিয়ার অন্তর্গত এলেপ্পোতে এবং ইজিপ্টে। সেখান থেকে ইতালীয় (জেনোয়া, ভেনিস) বণিকরা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে চালান দিত। *অধ্যাপক সতীশচন্দ্রের* মতে : পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল, লোহিত সাগর ও পূর্ব-আফ্রিকার বন্দরগুলির সাথে গুজরাটের বন্দরগুলির বিপুল বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। ভারত থেকে এইসব পণ্য সমুদ্রপথে বহণ করে নিয়ে যেত মূলত আরব বণিকরা। পঞ্চদশ শতক থেকে এরা মালাবারে বসতি স্থাপন করে মালয় প্রণালী ও দক্ষিণ চীনের ক্যান্টন পর্যন্ত ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত থাকে। অবশ্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ইন্দো-পারস্য বাণিজ্যে ভারতীয়দেরও সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। পঞ্চদশ শতকে মিশরের 'করিম' নামক একটি বাণিজ্য সংস্থা মিশর ও পশ্চিম ভারতের উপকূলের মধ্যে বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি 'করিম' বণিকদের গুরুত্ব কমে যায়। এখন হিন্দু বেনিয়া, মুসলিম বণিক, ইহুদী, আর্মেনীয় প্রভৃতি নানা জাতি ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যে লিপ্ত হয়। বলাবাহুল্য, সমুদ্র বণিকদের যথেষ্ট আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল। একাদশ শতকে এডেন থেকে ভারত ও চীনের মধ্যে বাণিজ্যে জনৈক ইরাণীয় বণিক যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিলেন। ত্রয়োদশ শতকে ইব্রাহিম টিবে নামক জনৈক পারসিক বণিক প্রায় একশো জলযান নিয়ে ভারতীয় উপকূলে পৌছেছিলেন। গুজরাটী বণিকদের অর্থ-সম্পদ ও প্রতিপত্তি ছিল আকর্ষণীয়। বহু ভারতীয় বণিক পারস্য উপসাগরে হরমুজ, ওমান, বসরা প্রভৃতি বন্দরে বসতি স্থাপন করে সমুদ্র বাণিজ্যে অংশ নিতেন। আফ্রিকার মোম্বাসা, মালিন্দি-পেত, কিলাওয়া প্রভৃতি বন্দরেও ভারতীয় বণিকদের উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল।

অষ্টম শতকে সিন্ধুদেশের উপর আরবদের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হলে ভারতের সমুদ্র বাণিজ্যে গতি আসে। ইতিমধ্যে পারস্য উপসাগরের উপর আরবদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম হয়েছিল। এখন সিন্ধু তাদের দখলে এলে ভারতের পশ্চিম উপকূল ও পারস্য উপসাগর একই রাজনৈতিক বৃত্তের মধ্যে চলে আসতে পারে। ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসে (মগধ, ১৯৮১ খ্রীঃ) সভাপতির ভাষণে *অধ্যাপক ওমপ্রকাশ বলেছেন যে* : ভারত মহাসাগরের বাণিজ্যে ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের বন্দরগুলি চিরদিনই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত ক্যাম্বের ব্যস্ততা ছিল চূড়ান্ত। ক্যাম্বের গুরুত্ব হ্রাস পেলে পশ্চিম উপকূলে সুরাট ও দিউ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। লোহিত সাগরের উপকূল বন্দরের সাথে এই দুটি বন্দরের বাণিজ্যিক যোগ ছিল বেশি। এছাড়া চাউল, দাভোল, ভাটকল, কালিকট, পুলিকট, নেগাপত্তম্ প্রভৃতি বন্দর থেকে ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যতরী যাত্রা করত। আরব বণিকরা এডেন ও মালাবার বন্দরের মধ্যে নিয়মিত বাণিজ্য পরিচালনায় লিপ্ত ছিল। পঞ্চদশ শতকের শেষ দিকে বাংলার সাতগাঁ, চট্টগ্রাম ও শ্রীপুর বন্দর সমুদ্র বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। সিন্ধুর লাহোরি বন্দরটিও এই কারণে একদা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

ইউরোপীয় লেখকদের ব্যাখ্যানুযায়ী ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যে ভারতীয় বণিকরা ছিল আর্থিকভাবে দুর্বল। এশীয় জাহাজগুলি ছিল হাল্কা ও অনুন্নত এবং আমদানি-রপ্তানি দ্রব্যের

মূল অংশ দখল করেছিল বিলাস সামগ্রী। কিন্তু এমন ধারণা ভ্রান্ত। ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যে দৈনন্দিন জীবনের অতি প্রয়োজনীয় পণ্যের লেনদেন ঘটত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির খাদ্যে ঘাটতি ছিল। সেখানে চাল উৎপাদন হত কম। আবার মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলিতে বস্ত্র, চিনি, ইত্যাদির যথেষ্ট চাহিদা ছিল। স্বভাবতই ভারত থেকে রপ্তানি হত বিপুল পরিমাণ বস্ত্র। মালয়, আরব ও ইন্দোনেশিয়ায় ভারতের মোটাবস্ত্রের বড় বাজার ছিল। ইউরোপের দেশগুলিতে চাহিদা ছিল ভারতীয় সূক্ষ্ম বস্ত্রের। এছাড়া রপ্তানি হত চাল, ডাল, গম, তেল ইত্যাদি। খাদ্যশস্য বেশি যেত মালাক্কা, হরমুজ ও এডেনে। বাংলা থেকে রপ্তানি হত কাঁচা রেশম ও চিনি, গুজরাট থেকে যেত কাঁচা তুলো, মালাবার পাঠাত নানা রকমের মশলা। ভারতে আমদানি করা হত সোনা, রূপা, মালয়ের টিন, পূর্ব আফ্রিকার হাতির দাঁত, মদ, গোলাপজল, ফল ও ঔষধ।

○ ভারত মহাসাগরে পর্তুগীজদের আবির্ভাব ঃ

ভারতে পর্তুগীজদের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যে সুদূর-প্রসারী পরিবর্তন দেখা দেয়। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের গোড়া থেকে পর্তুগালের রাজা হেনরী ভারতে আসার জন্য জলপথ অনুসন্ধানের কাজ শুরু করেন। সমুদ্র-অভিযানে তাঁর এই উৎসাহের কারণে তিনি 'নাবিক হেনরী' নামে পরিচিত। ভারতে আসার পথ অনুসন্ধানের পেছনে তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—(১) প্রাচ্যের সমৃদ্ধ ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশ নেওয়া এবং (২) এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করা। লক্ষণীয় যে পর্তুগালের দুটি লক্ষ্যের পেছনে ছিল আরব তথা মুসলমানদের উচ্ছেদ ঘটানোর অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় প্রেরণা। ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টান ধর্মগুরু পোপ পঞ্চম নিকোলাস এক নির্দেশনামা (Papal Bulls) জারী করে পর্তুগালের কর্মসূচী ও অধিকারকে বৈধতা দান করেন। এতে বলা হয় যে, আফ্রিকার নতুন অন্তরীপ অতিক্রম করে ভারত পর্যন্ত যে সকল দেশ পর্তুগীজরা আবিষ্কার করবে সেই সকল দেশের অধিবাসীদের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করার শর্তে ঐ সকল ভূখণ্ডের উপর চিরকালের জন্য পর্তুগালের অধিকার ও কর্তৃত্ব থাকবে (the right total and absolute)। তিন বছর পর পোপ তৃতীয় ক্যালিক্সটাস আর এক 'পেপেল বুল' দ্বারা এই অধিকারকে স্বীকৃতি দেন। এইভাবে ভারত মহাসাগরের উপর পর্তুগীজদের দখলদারী একটা 'বৈধ অধিকারে' রূপান্তরিত হয়।

১৪৮৭ খ্রীষ্টাব্দে বার্থোলোমিউ দিয়াজ উত্তমাশা-অন্তরীপ ঘুরে ইউরোপ ও ভারতের মধ্যে সমুদ্রপথে যোগাযোগের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেন। ইতিমধ্যে নবজাগরণ ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন আবিষ্কারের ফলে নৌ-অভিযানের কাজ নিরাপদ ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। দিক্‌নির্ণয় যন্ত্র, দূরবীন, বারুদ ইত্যাদির আবিষ্কার দুঃসাহসিক কাজে নাবিকদের নতুন উন্মাদনা ও প্রেরণা দেয়। অবশেষে ভাস্কো-ডা-গামা ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে দুটি জাহাজ নিয়ে কালিকট বন্দরে পৌঁছালে ভারত ও ইউরোপের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। কালিকটের শাসকের (জামোরিণ) সাথে আরবদের সুসম্পর্ক ছিল না। তাই জামোরিণ পর্তুগীজদের সাদরে গ্রহণ করেন এবং এদেশ থেকে বাণিজ্যপণ্য ক্রয় করে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেন। পর্তুগীজ সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে ভারত ও ইউরোপের মধ্যে সরাসরি বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

পর্তুগীজরা ভারত মহাসাগরের বাণিজ্যের চরিত্র পাল্টে দিতে উদ্যত হয়। তারা ভারত মহাসাগরে জাহাজ চালানোর নতুন নিয়মবিধি চালু করে। ভারত মহাসাগরের উপর তারা সার্বভৌম কর্তৃত্ব দাবি করে। তাদের অনুমতি ছাড়া ভারত মহাসাগরে যে-কোন দেশের, এমনকি ভারতের জাহাজ চলাচল বন্ধ করে দেয়। তাদের কাছ থেকে 'কার্তেজ' (Cartazes) নামক এক ধরনের ছাড়পত্র নিয়ে অন্যান্য বণিকদের জাহাজ পরিবহণ বাধ্যতামূলক করে। কয়েকটি নির্দিষ্ট পথে এবং বিশেষ কয়েকটি পণ্যের উপর পর্তুগীজ বণিকদের একচেটিয়া কর্তৃত্ব স্থাপন করা হয়। প্রাথমিক ভাবে প্রাচ্যের বাণিজ্যে পতুর্গীজ শাসকরা অন্যান্য দেশের বণিকদের পাশাপাশি বেসরকারী পর্তুগীজদেরও ক্ষমতাচ্যুত করতে দ্বিধা করেননি।

মুসলমান বণিকদের বিরুদ্ধে পর্তুগীজদের জেহাদ মুসলমানদেরও শঙ্কিত করে। এমতাবস্থায় মিশরের সুলতান ষোড়শ শতকের গোড়ায় পর্তুগীজ বণিকদের বিরুদ্ধে এক নৌ-অভিযান পাঠান। এই সংঘর্ষে পর্তুগালের যুবরাজ ডন আলমাইদা নিহত হন। তবে ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগাল মিশর ও গুজরাটের যৌথ বাহিনীকে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করে। অতঃপর ভারত মহাসাগরে পর্তুগীজদের সর্বময় কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। পারস্য উপসাগর ও লোহিত সাগরের বাণিজ্যেও পর্তুগীজদের কর্তৃত্ব সুদৃঢ় হয়। এই ঘটনার অল্পকাল পরে প্রাচ্যের পর্তুগীজ অধিকারভুক্ত অঞ্চলগুলির গভর্নর পদে যোগ দেন আলফানসো অলিবুকার্ক। তিনি মনে করতেন যে, কেবল নৌ-বাহিনীর উপর নির্ভর করে কোন রাজ্য টিকে থাকতে পারে না। দুর্গ না থাকলে শাসকের পক্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা ও কূটনৈতিক সম্পর্ক রক্ষা করা সম্ভব নয়। এজন্য তিনি এশিয়া ও আফ্রিকার গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে দুর্গ নির্মাণ করেন। এর সঙ্গে গড়ে তোলেন শক্তিশালী নৌ-বাহিনী। এইভাবে প্রাচ্যের বাণিজ্য তথা ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যের উপর পর্তুগীজদের কর্তৃত্ব ও খবরদারী সুদৃঢ় করেন।

বাণিজ্যিক কর্তৃত্ব সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে আলবুকার্ক ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে বিজাপুরের কাছ থেকে গোয়া বন্দর দখল করেন। সামরিক ও বাণিজ্যিক দিক থেকে গোয়ার বিশেষ গুরুত্ব ছিল। এখান থেকে মালাবারের ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা সহজ ছিল এবং দাক্ষিণাত্যের রাজাদের উপর নজর রাখা যেত। অন্যদিকে গুজরাটের বন্দরগুলি সন্নিকটে হওয়ায় গোয়া থেকে পর্তুগীজদের পক্ষে ঐ অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করা যেত। এইভাবে পর্তুগীজরা গোয়াকে তাদের প্রাচ্যের প্রধান বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলে। বিজাপুরের সুলতান ইউসুফ আদিল শাহ এক আকস্মিক অভিযান চালিয়ে গোয়া পুনর্দখল করেন এবং সাময়িকভাবে গোয়া থেকে পর্তুগীজদের বিতাড়িত করেন। কিন্তু সুলতান সেই বছরে (১৫১০ খ্রীঃ) মারা গেলে আলবুকার্ক গোয়া পুনরধিকার করেন। বিজাপুরের গুরুত্বপূর্ণ বন্দর দন্দা-রাজৌর ও দাভোল অবরোধ ও লুণ্ঠন করে নিজেদের হাত শক্ত করে। গোয়াকে ঘাঁটি করে পর্তুগীজরা সিংহল, কলম্বো, সুমাত্রার আকিন ও মালাক্কা বন্দরে দুর্গ নির্মাণ করে সমুদ্র-বাণিজ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ আরো সুদৃঢ় করে। এই সময় থেকে পর্তুগীজরা ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ জোরদার করে। তাদের অনুমতি বা ছাড়পত্র ব্যতিরেকে ভারতীয় বা আরব বণিকদের মাল পরিবহণ নিষিদ্ধ করে। গোলমরিচ ও সামরিক সম্ভার বহনের উপর তাদের একচেটিয়া অধিকার কায়েম করে। ভারতীয় ও আরব বণিকদের বাণিজ্য

সম্পূর্ণভাবে পর্তুগীজদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। সন্দেহবশত অন্যান্য বণিকদের জাহাজ তল্লাসী করা কিংবা যে-কোন জাহাজকে শত্রুভাবাপন্ন ভেবে সমুদ্রে ডুবিয়ে দেওয়া ইত্যাদি কাজ দ্বারা পর্তুগীজরা কার্যত ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যে তাদের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে। দক্ষিণ-ভারতীয় রাজ্যগুলি ভাল জাতের ঘোড়া আমদানির জন্য গোয়া বন্দরের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল ছিল। স্বভাবতই গোয়া বন্দর পর্তুগীজদের দখলে থাকায় দক্ষিণী রাজ্যগুলি পর্তুগীজদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে বাধ্য হয়। পর্তুগীজদের সাথে মিত্রতা থাকলে ভাল জাতের ঘোড়া আমদানি করে অশ্বারোহী বাহিনীকে দক্ষ করে তোলা সম্ভব হত। এইভাবে কূটনৈতিক ভাবে পর্তুগীজরা দক্ষিণ-ভারতীয় রাজনীতির উপর পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। সেই সঙ্গে পর্তুগীজরা লোহিত সাগরের প্রবেশমুখে সকোত্র দ্বীপে একটি ঘাঁটি নির্মাণ করে এডেন অবরোধ করে। ওরমুজের শাসক সেখানে একটি পর্তুগীজ দুর্গ নির্মাণের অনুমতি দিতে বাধ্য হন। ওরমুজে দুর্গ নির্মাণের ফলে পারস্য উপসাগরের প্রবেশপথও পর্তুগীজদের নিয়ন্ত্রণে আসে।

পঞ্চদশ শতকে অটোমান তুর্কীজাতির উত্থান ও রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সম্প্রসারণ ঘটলে সমুদ্রবাণিজ্যে পর্তুগীজদের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। গুজরাটের উপকূল বন্দর সমূহ এবং আরব উপসাগরের উপর আধিপত্যের বাসনা থেকে দীর্ঘ সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। ইউরোপ ও প্রাচ্যের অধিকাংশ বাণিজ্য চলত তুর্কী-অধিকৃত ভূখণ্ডের মধ্য দিয়ে। ফলে এই বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা তুর্কীরাই বেশি ভোগ করত। পর্তুগীজরা এই বাণিজ্যকে অন্যত্র সরিয়ে নিতে উদ্যোগী ছিল। ভারত মহাসাগরে পর্তুগীজদের ক্ষমতা বৃদ্ধি অটোমান তুর্কীদের অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রতিকূল ছিল। ভূমধ্যসাগর থেকে লোহিত সাগরে জাহাজ নিয়ে যাওয়ার অসম্ভাব্যতা তুর্কীদের চিন্তান্বিত করে। তাই গুজরাটের সাথে মিত্রতা স্থাপন করে জাহাজ নির্মাণের উপযোগী কাঠ সংগ্রহ এবং ভারতের পশ্চিম উপকূলে তুর্কী-নৌবাহিনীর জন্য পোতাশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে তুর্কী শাসকরা আগ্রহী হন। গুজরাটের সুলতানের আমন্ত্রণ ক্রমে অটোমান শাসক আরব সাগর থেকে পর্তুগীজদের বিতাড়নের জন্য যুদ্ধে নামার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কী সেনাপতি সুলেমান রাই-এর নেতৃত্বে একটি নৌবহর গুজরাটে এসে উপস্থিত হয়। দু'জন উচ্চপদস্থ তুর্কী কর্মচারীকে ভারতীয় নাম দিয়ে সুরাট ও দিউর শাসক নিয়োগ করা হয়। এদের অন্যতম ছিলেন রুমীখান্ যিনি পরবর্তীকালে শ্রেষ্ঠ গোলন্দাজ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।

তুর্কীদের সাথে মিত্রতা সুদৃঢ় হওয়ার আগে পরিস্থিতির চাপে পড়ে গুজরাটের সুলতান পর্তুগীজদের সাথে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হন। মোগল সম্রাট হুমায়ুনের আক্রমণের বিরুদ্ধে সাহায্যের বিনিময়ে সুলতান পর্তুগীজদের বেসিন দ্বীপটি অর্পণ করেন। দিউতে পর্তুগীজরা একটি দুর্গ নির্মাণের অনুমতি পায়। তবে এই সমঝোতা গুজরাটের পক্ষে আদৌ সুফলপ্রসূ হয়নি। পরন্তু পর্তুগীজদের উত্তরোত্তর ক্ষমতা বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে পুনরায় তুর্কীদের সাহায্য প্রার্থী হন। তবে পর্তুগীজদের চূড়ান্ত পতনের আগেই সুলতান জলে ডুবে মারা যান (১৫৩৬ খ্রীঃ)। পরবর্তী গুজরাট-সুলতানের আমলে বিশাল তুর্কী বাহিনী পর্তুগীজদের উৎখাত করতে অগ্রসর হয়। কিন্তু পর্তুগীজদের অপরাজেয় নৌ-শক্তি তুর্কী বাহিনীকে বিফল হয়ে ফিরে যেতে

বাধ্য করে। ১৫৫১ থেকে ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ভারতের পশ্চিম উপকূলের বন্দরগুলিকে পর্তুগীজদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করার জন্য তুর্কীরা কয়েকটি ছোট সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ষাটের দশকের গোড়ায় তুর্কী সম্রাট ও পর্তুগীজদের মধ্যে একটা সমঝোতা হয়। স্থির হয় যে, প্রাচ্যের ব্যবসা-বাণিজ্যে তুর্কী ও পর্তুগীজরা আপসে অংশগ্রহণ করবে।

তালিকোটার যুদ্ধে (১৫৬৫ খ্রীঃ) বিজয়নগরের পরাজয়ের পর দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলির নিরন্তর সংঘর্ষের অবসান ঘটে এবং বিজাপুরের নেতৃত্বে দক্ষিণী রাজ্যগুলি দাক্ষিণাত্য উপকূল থেকে পর্তুগীজদের বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে যৌথভাবে প্রয়াসী হয়। ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে বিজাপুর ও আহমদনগর এক মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করে। কালিকটের জামোরিণও এই মৈত্রীর শরিক হন। এই রাজ্যত্রয় পর্তুগীজদের ঘাঁটিগুলি আক্রমণ ও ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু পর্তুগীজদের নৌ-শক্তির কাছে দাক্ষিণাত্যের মিলিত বাহিনী পরাজিত হয়। ফলে ভারত মহাসাগর ও দাক্ষিণাত্য উপকূলে পর্তুগীজদের নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত থাকে।

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে ভারত মহাসাগর ও পূর্ব উপকূলে পর্তুগীজদের একাধিপত্যের ফল সুদুর প্রসারী ছিল বলে *ড. সতীশচন্দ্র* মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে পর্তুগীজদের ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং বিজ্ঞানে অনীহার ফলে সম্ভবত ভারতে ইউরোপীয় নবজাগরণের প্রভাব বিলম্বিত হয়েছিল। তবে পর্তুগীজদের রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল বাণিজ্যকেন্দ্রিক। তাই দীর্ঘ একশো বছর ভারত মহাসাগরে আধিপত্য করলেও ভারতের অভ্যন্তরে ঢোকার চেষ্টা তারা করেনি। প্রধানত সমুদ্র-উপকূল অঞ্চলে দুর্গ ও ঘাঁটি তৈরি করে বাণিজ্যিক কর্তৃত্ব রক্ষার কাজেই তাদের সম্পূর্ণ উদ্যম নিয়োজিত ছিল। *কীর্তিনারায়ণ চৌধুরীর* মতে, পর্তুগীজদের আগমনের ফলে ভারতের অর্থনীতির বদ্ধ দশা কিছুটা শিথিল হয়। পর্তুগীজদের উদ্যোগে কোচিনে আধুনিক জাহাজ নির্মাণ কারখানা স্থাপিত হয়। ফলে ভারতে উন্নতমানের জাহাজ তৈরির সূচনা ঘটে। পর্তুগীজদের মাধ্যমে দক্ষিণ আমেরিকার আলু, আনারস, প্রভৃতি ভারতে প্রবেশ করে। ভারতীয় কৃষকেরা উন্নতমানের পণ্য গ্রহণ করে আর্থিক ক্ষেত্রে লাভবান হন। পর্তুগীজদের লাভজনক ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্য ক্রমে অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকদেরও ভারতে বাণিজ্যকর্মে লিপ্ত হতে প্ররোচিত করে। এইভাবে ওলন্দাজ, ইংরেজ, ফরাসী ইত্যাদি ইউরোপীয় বণিকগোষ্ঠী ভারত মহাসাগরে উপস্থিত হয়। শেষ পর্যন্ত ইংরেজ বণিকদের 'মানদণ্ড' রাজদণ্ডে রূপান্তরিত হলে ভারত ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা ঘটে।

— — — —

চতুর্দশ অধ্যায়

আফগান স্বৈরতন্ত্র
[The Afgan Despotism]

○ আফগান স্বৈরতন্ত্র

দিল্লী সুলতানির অন্যান্য রাজবংশের তুলনায় সৈয়দবংশের কালসীমা ছিল খুবই সীমিত, মাত্র সাঁইত্রিশ বছর (১৪১৪-১৪৫১ খ্রীঃ)। অধ্যাপক *নিজামীর* মতে, সৈয়দবংশের রাজত্বকাল খলজীদের মত সাম্রাজ্যবাদী সাফল্য কিংবা তুঘলকদের মত শাসনতান্ত্রিক উদ্ভাবন কোন কিছু দ্বারাই বিশিষ্টতা অর্জন করতে পারেনি। ছোট ছোট আঞ্চলিক সর্দার ও জমিদারদের বিদ্রোহ দমনের মধ্যেই সৈয়দদের কর্মসূচী সীমাবদ্ধ ছিল। কেন্দ্রীকরণ নীতির পরিবর্তে আঞ্চলিকতাবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদ এই শাসনকালে শক্তি সঞ্চয় করেছিল।

○ আফগান উপজাতীয় রাজনীতির বৈশিষ্ট্য ঃ

দিল্লী সুলতানির আমলে শেষ শাসক বংশ ছিল লোদী বংশ। *নিজামীর* ভাষায় ঃ *'খলজীদের থেকে লোদীবংশের রাজত্বকাল ছিল দীর্ঘ ; এবং পরবর্তী-তুঘলক ও সৈয়দদের তুলনায় এদের কৃতিত্ব ছিল বেশি'* (*"It had a greater life-span than the Khaljis and had better achieve-ments to its credit than the later Tughluas and the Saiyyids."*)। লোদী বংশের পঁচাত্তর বছরের (১৪৫১-১৫২৬ খ্রীঃ) শাসনকালের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল—(ক) সুলতান ও অভিজাতদের দ্বন্দ্ব ; (খ) ক্ষমতাবান 'হাকিম'দের সাথে ক্ষুদ্র জমিদারদের সংঘাত, (গ) কেন্দ্রবিমুখ শক্তির সাথে কেন্দ্রমুখী প্রবণতার সংঘাত এবং (ঘ) রাজার নিরঙ্কুশ ক্ষমতার তত্ত্বের সাথে আফগান জাতির অংশীদারী সম্মত রাষ্ট্রনীতির সংঘাত। বস্তুত, তুঘলক-পরবর্তী ভারতীয় রাজনীতির কেন্দ্রবিমুখ প্রবণতা তথা আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যবোধের পাশাপাশি আফগানদের জাতিগত ও ঐতিহ্য অনুসারী জাত্যাভিমান এই পর্যায়ের ভারতীয় রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছিল। *আখুন্দ দারওয়েজা* (Akhund Darweza) বলেছেন যে, প্রাচীনকাল থেকেই একজন আফগান কাউকে রাজা বলে সর্বোচ্চ মর্যাদা দিতে কিন্তু ক্ষমতাসীন কোন ব্যক্তির কাছে মাথানত করতে অভ্যস্ত ছিল না। তাই তারা সামাজিক সাম্যে বিশ্বাস করত। এবং এ কারণেই সকল আফগান 'মালিক' নামে সম্বোধিত হন। এমতাবস্থায় একজন আফগান সুলতানকে একদিকে যেমন বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনৈতিক শক্তিগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হত, অন্যদিকে তেমনি লড়াই চালাতে হত আফগানদের উপজাতীয় ঐতিহ্যের সাথেও। রাষ্ট্রের শত্রু ও ক্ষতিকারক শক্তিগুলিকে দমন করার জন্য আফগান সৈনিকদের সহায়তা ছিল জরুরী। কিন্তু আফগান সেনাদের ব্যক্তিগত মর্যাদা, উপজাতীয় আবেগ ও মর্যাদার প্রতিও শাসককে সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হত। নিজামীর মতে, আফগান উপজাতির সহায়তা ছাড়া লোদী বংশ রাজত্ব চালাতে পারত

না। তবে আফগান উপজাতীয় কর্তৃত্ববাদের কঠোর নিয়ন্ত্রণ থেকে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করার কাজেও লোদী শাসকদের সদা সর্তক থাকতে হত।

ভারতে সুলতানি শাসনের প্রথম থেকেই এদেশে আফগান যোদ্ধাদের অনুপ্রবেশ লক্ষ্য করা যায়। সুলতান নাসিরুদ্দিন মামুদের সেনাবাহিনীতে বহু আফগান যোদ্ধা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবনের আমলে সীমান্তবর্তী চৌকিগুলিতে আফগান সেনাদের মোতায়েন করা হয়। মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে আফগান যোদ্ধারা যথেষ্ট সাহস ও দক্ষতার পরিচয় দেন। এই সময় থেকেই ভাগ্যান্বেষী আফগানরা ভারতীয় রাজনীতিতে তাদের গুরুত্ব উপলব্ধি করে এবং ক্ষমতার কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত হওয়ার প্রত্যাশা সৃষ্টি হয়। ইখতিয়ারউদ্দিন-ইয়াল-আফগান, এবং মালিক মাখ আফগান খলজী এবং তুঘলক বংশের রাজত্বকালে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। ভারতে লোদী শাসনের প্রতিষ্ঠাতা বহলুল লোদীর পিতামহ মালিক বাহ্‌রাম একটি বাণিজ্য দলের সদস্য হিসেবে ভারতে প্রবেশ করেন এবং এখানেই স্থায়ীভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর অন্যতম পুত্র মালিক কালা খিজির খান কর্তৃক দৌরালার গভর্নর নিযুক্ত হন। মালিক কালার পুত্র ছিলেন বহলুল। পিতা-মাতার অকাল মৃত্যুর ফলে তিনি পিতৃব্য ইসলাম খানের (মালিক সুলতান শাহ্) কাছে প্রতিপালিত হন। দক্ষ যোদ্ধা ও সংগঠক ইসলাম খান প্রায় বারো হাজার আফগান সেনার একটি বাহিনী গড়ে তোলেন। এদের অধিকাংশই ছিলেন তাঁর উপজাতি গোষ্ঠীর মানুষ। তিনি আফগান উপজাতীয় বৈশিষ্ট্য অনুসারে নিজ সাবলক পুত্রের পরিবর্তে বহলুল'কেই নিজ উত্তরাধিকার মনোনীত করেন।

এই প্রসঙ্গে আফগানদের উপজাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ্য। এ কথা ঠিক যে, খলজী ও তুঘলকদের আমলে আফগান সর্দাররা সুলতানি বাহিনীর সদস্য হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। কিন্তু সেই প্রাথমিক পর্যায়ে তারা সংখ্যাল্পতার কারণে তুর্কী রীতির উপরে আফগান উপজাতীর বৈশিষ্ট্য কায়েম করতে উদ্যোগী হননি। কিন্তু কালক্রমে এদেশে আফগান অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে তারা ভারতীয় রাজনীতির উপর উপজাতীয় ধ্যানধারণা প্রয়োগ করতে প্রয়াসী হন। *অধ্যাপক নিজামী* 'কম্প্রিহেনসিভ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া" গ্রন্থে আফগান উপজাতির গণতান্ত্রিক প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা করেছেন। *প্রথমত*, শাসনতান্ত্রিক উত্তরাধিকারের প্রশ্নে আফগানজাতি দক্ষতা ও উপযুক্ততাকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। বংশগত অধিকার বা বর্তমানে শাসকের ইচ্ছা-অনিচ্ছা (মনোনয়ন) ছিল গুরুত্বহীন। এই নীতি অনুসারেই ইসলাম খাঁ নিজ পুত্রের পরিবর্তে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র বহলুল লোদী'কে শিরহিন্দের পরবর্তী শাসক মনোনীত করেছিলেন। এই রীতির ভাল ও খারাপ দুটি দিকই ছিল। এর ফলে একদিকে যেমন সর্বোচ্চপদে দক্ষতা ও যোগ্যতা মর্যাদা পেত, তেমনি এই ব্যবস্থা থেকেই আফগানদের গোষ্ঠীগত বিভেদ দানা বাঁধত, যা শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যের পক্ষেই ক্ষতিকর হত। যেমন—ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর আফগান সর্দাররা তিনটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত হন। ইসলাম শাহের ইচ্ছানুযায়ী একটি গোষ্ঠী সমর্থন করেন বহলুল লোদীকে। দ্বিতীয় গোষ্ঠী সমর্থন দেন ইসলাম খাঁর ভাই মালিক্ ফিরোজকে এবং তৃতীয় গোষ্ঠী ইসলাম খাঁনের পুত্র

কুতুব খাঁনকে সমর্থন জানান। বহলুল লোদী অবশ্য দক্ষতার সাথে এই সংকট কাটিয়ে উঠতে পারেন। সুলতান ইব্রাহিম লোদী বহলুলের মত বিচক্ষণ ও সহনশীল ছিলেন না। তিনি উপজাতি ভিত্তিক বৈশিষ্ট্যের উপরে রাজতন্ত্রের ক্ষমতা ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার আদর্শে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। এ কারণে ক্ষুব্ধ আফগান সর্দাররা গুজরাটের শাসক আলম খানকে সামনে রেখে প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে তুলতে চেষ্টা চালান। ডঃ *নিজামী* লিখেছেন ঃ "*......their ambition to maintain their personal freedom created a number of complication in the administration.*"

আফগান শাসনকালে দিল্লী সুলতানি সেনাবাহিনীর চরিত্র পরিবর্তিত হয় এবং 'রাজার সেনাবাহিনীর' পরিবর্তে তা একটি 'উপজাতীয় সমরগোষ্ঠী'তে রূপান্তরিত হয়। বর্তমান ব্যবস্থায় বিভিন্ন আফগান মালিক নিজ নিজ গোষ্ঠীর সদস্যদের সমন্বয়ে ভিন্ন ভিন্ন বাহিনী গড়ে তোলেন। কেন্দ্রীয়ভাবে সেনাবাহিনীর নিয়োগ ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা বাতিল হওয়ায় সেনাবাহিনীর সমসত্ত্বতা (Homogeneity) নষ্ট হয়। বলাবাহুল্য ইতিপূর্বে সুলতানি বাহিনীর যে দক্ষতা ও কার্যকারিতা ছিল, আফগান উপজাতীয় প্রথার প্রচলনের ফলে তা ক্ষুণ্ণ হয়। এই কারণে সংখ্যাধিক্য হওয়া সত্ত্বেও, আফগান বাহিনী পানিপথের প্রথম যুদ্ধে সংখ্যাল্প কিন্তু সুসংগঠিত মুঘল বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়েছিল।

আফগান জাতির ঐতিহ্য অনুসারে এই সময় বহু উচ্চপদস্থ কর্মচারী সুলতানের জন্য নির্দিষ্ট ক্ষমতা ও সুবিধা ভোগ করতে থাকেন। যেমন—হাতি রক্ষণাবেক্ষণ ও হস্তিপৃষ্ঠে ভ্রমণ এতকাল রাজকীয় মর্যাদা ও অধিকারের অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হত। কিন্তু আফগান শাসনকালে বহু উচ্চকর্মচারী ও অভিজাত নিজ নিজ হস্তিবাহিনী গঠন, পরিপোষণ করতে থাকেন এবং সংঘর্ষের সময় তা কাজেও লাগান।

আফগান শাসনাধীন ভারতের প্রধান রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য ছিল সারা উত্তরভারত জুড়ে অসংখ্য শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ জমিদারের অস্তিত্ব। লাহোর থেকে মানিকপুর পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকা এই সকল আফগান জমিদারের শক্তি ও সম্পদ ছিল কল্পনারও অতীত। সাধারণ কৃষকদের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের সূত্রে এই সকল সামন্তপ্রভুর লোকবলও ছিল প্রবল। ডঃ *নিজামী* লিখেছেন যে, একধরনের অস্থিরতা, এ্যাডভেঞ্চার ধর্মীতা এবং সাময়িক উচ্চাকাঙ্ক্ষা সমকালের সকল রাজনৈতিক ঘটনার মূল সুর ছিল ; কিন্তু কখনোই সেই কর্মধারা একটি নির্ভরযোগ্য কেন্দ্রীভূত সাম্রাজ্য গঠনের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়নি। আফগান সর্দারদের কর্মধারা ও কর্মসূচীর প্রকৃতি ছিল স্থানীয়, উপজাতীয় অথবা গোষ্ঠীসর্বস্ব। *নিজামীর* ভাষায়, "*Their activities were limited by local, tribal or racial considerations and could not pave the way for the emergence of a contralized empire*". তবে নিজামীও মনে করেন যে, আফগান উপজাতীয় গণতান্ত্রিক চেতনা তার অন্তর্নিহিত সারবত্তার জোরেই দীর্ঘ পঁচাত্তর বছর ভারতীয় রাজনীতিতে লোদী বংশের শাসন কায়েম রাখতে সক্ষম হয়েছিল। উপরন্তু মুঘল বংশীয় বাবরের কাছে ইব্রাহিম লোদী পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হয়েছিলেন, একথা যেমন সত্য, তেমনি একথাও অস্বীকার করা যাবে না যে, আর এক আফগান যুবক শের খাঁ (শাহ্) মুঘল শাসক হুমায়ুনকে বিতাড়িত করে ভারতে আফগান কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

অধ্যাপক ত্রিপাঠী (R. P. Tripathy) মনে করেন যে, বহলুল লোদী তাঁর সহনশীলতা এবং আফগান উপজাতীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতি আনুগত্য দ্বারা আফগান উপজাতী গোষ্ঠীর প্রধানদের আনুগত্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। রাজকীয় স্বৈরতন্ত্রের ধারণাকে নমনীয় করে তিনি আফগান মালিকদের আবেগকে মর্যাদা দেন। আফগান-গোষ্ঠীসর্দার ও অভিজাতদের উপর প্রশাসনিক দায়িত্ব ও তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ স্বৈরতন্ত্র ও সংসদীয় রাজতন্ত্রের মধ্যে একটা যোগসূত্রের পথ তৈরি করে দেয়। ডঃ *ত্রিপাঠীর* মতে ঃ এই পরিবর্তন ইসলামিক রাজতন্ত্রের ধারণাকে আরো উন্নত ও সংসদীয় প্রকৃতিবিশিষ্ট করার সম্ভাবনা তৈরি করেছিল।[1] কিন্তু আফগান সর্দারদের বিভেদ, ঈর্ষা, সংকীর্ণ স্বার্থপরতা, পরিস্থিতির মূল্যায়নের ব্যর্থতা এবং সাধারণ মানুষের উদাসীনতা শেষ পর্যন্ত সেই সম্ভাবনা বিনষ্ট করে দেয়।

○ শের খান (শাহ্) ১৫৪০-'৪৫ খ্রীষ্টাব্দ ঃ

জহিরুদ্দিন মহম্মদ বাবর ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করলেও সেই সাম্রাজ্যের ধারাবাহিকতায় ছেদ টেনেছিলেন জনৈক আফগান যুবক শের খান। ভাগ্যান্বেষী যুবক শের খান দিল্লীর মসনদ থেকে মুঘল শাসক হুমায়ুনকে বিতাড়িত করে ভারতে আফগান কর্তৃত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটান। ১৫২৭-২৮ খ্রীষ্টাব্দের কোন এক সময় মুঘলের এক সাধারণ কর্মচারী হিসেবে বাবরের সাথে শের খাঁর প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে। প্রথম দর্শনে সেই আফগান যুবক সম্পর্কে বাবরের মূল্যায়ন পাওয়া যায় আব্বাস শেরওয়ালী রচিত *'তারিখ-ই-শেরশাহী'* গ্রন্থ থেকে। বাবর তাঁর প্রধানমন্ত্রী (উজীর) নিজামউদ্দিন খলিফাকে বলে ছিলেন, *"শের খাঁর উপর নজর রাখুন। এ অতি বিচক্ষণ এবং এর কপালে রাজটিকা অঙ্কিত আছে। আমি বহু আফগানকে দেখেছি ; কিন্তু তারা আমাকে কোনভাবে প্রভাবিত করতে পারেনি। কিন্তু এর (শের খাঁ) মধ্যে আমি বহু সম্ভাবনা ও শক্তির অধিষ্ঠান লক্ষ্য করেছি।"* বাবরের এই মূল্যায়নের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছিল কয়েক বছরের মধ্যেই। দূরদর্শী বাবর তাঁর কর্মচারীপদ থেকে শের খাঁকে সরিয়ে দিলেও ; হুমায়ুনের পথ থেকে সরাতে পারেননি। একক প্রয়াস, কর্মদ্যোগ ও ভাগ্যকে সমন্বিত করে এই আফগান যুবক শেষ পর্যন্ত হুমায়ুনকে সরিয়ে 'দ্বিতীয় আফগান সাম্রাজ্যের' প্রতিষ্ঠা ঘটাতে পেরেছিলেন।

শের খাঁর বাল্যনাম ফরিদ। জন্ম সম্ভবত ১৪৭২ খ্রীষ্টাব্দে (মতান্তরে ১৪৮৬ খ্রীঃ)। তাঁর পিতা হাসান ছিলেন বিহারের অন্তর্গত সাসারামের জায়গিরদার। কিন্তু বিমাতার ষড়যন্ত্রে ফরিদকে বারবার গৃহত্যাগ করতে হয়। বিমাতার কুব্যবহার তাঁকে বাস্তবের মুখোমুখি হতে সাহায্য করে। জৌনপুরে গিয়ে নিজের উদ্যোগে আরবী ও ফারসী ভাষা এবং সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। শোনা যায়—গুলিস্তাঁ, *বোস্তাঁ, সিকন্দরনামা* প্রভৃতি কাব্য তিনি স্মৃতি থেকেই আবৃত্তি করতে পারতেন। এই সময় গভর্নর জামাল খানের উদ্যোগে ফরিদ সাসারামে ফিরে যান এবং পিতার জায়গির দেখাশোনার দায়িত্ব পান। কিন্তু বিমাতার বিরূপ আচরণে মর্মাহত হয়ে তিনি আবার সাসারাম ত্যাগ করেন এবং বিহারের গভর্নর বাহার খাঁ'র অধীনে চাকুরি নেন। এই সময় তিনি নাকি খালি হাতে একটা বাঘ শিকার করেছিলেন এবং সেই কারণে বাহার খাঁ

তাঁকে *'শের খান'* উপাধি দেন। কিন্তু এখানেও তাঁর আসন স্থায়ী হলো না। শের খাঁর উন্নতিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে লোহানী সর্দাররা বাহার খাঁকে শের খাঁর বিরুদ্ধে উত্তক্ত করলে শের খাঁ বিতাড়িত হন এবং আগ্রায় চলে যান।

পানিপথ আর খানুয়ার জয়মাল্য পরে বাবর তখন দিল্লী-আগ্রাকে কেন্দ্র করে ভারত-সাম্রাজ্য গঠনের পরিকল্পনা করছেন। শের খাঁর বীরত্ব কথা তিনিও কিছুটা শুনেছেন। আবার শের খাঁও জানতেন, মোঙ্গলদের যুদ্ধ-পদ্ধতির সাথে পরিচিত হতে পারলে তাঁরই লাভ হবে। তাই লক্ষ্য স্বতন্ত্র হলেও দু'জনের মিলন ঘটতে অসুবিধা ছিল না (১৫২৭-'২৮খ্রীঃ)। কিন্তু অচিরেই শের খাঁ বুঝতে পারেন যে, মুঘলের অধীনে আফগানদের উন্নতির সম্ভাবনা খুবই কম। তাই তিনি দিল্লী ত্যাগ করে আবার বিহারে ফিরে আসেন। এই সময় বিহারের শাসক ছিলেন বাহার খাঁর নাবালক পুত্র তথা শের খাঁর প্রাক্তন ছাত্র জালাল খাঁ। খুব সহজেই শের খাঁ জালাল খাঁর অভিভাবকত্ব লাভ করেন এবং নিজ প্রতিভা ও দক্ষতায় প্রায় সব ক্ষমতাই কুক্ষিগত করে নেন। ১৫৩১ খ্রীষ্টাব্দে চুনার দুর্গের অধিপতি ও তাঁর পুত্রের মধ্যে দ্বন্দ্বের সুযোগে চুনার দুর্গ শের খাঁর অধীনে চলে আসে। দুর্গাধিপতির বিধবা পত্নী শের খাঁকে বিবাহ করে তার অধিকারকে আইনী স্বীকৃতি দেন। এই সময় হুমায়ুন চুনার অবরোধ করলে চতুর শের খাঁ তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে বিপদমুক্ত হন।

শের খাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে লোহানী আফগান সর্দাররা এখন প্রায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন। জালাল খাঁও শের খাঁর প্রভাবমুক্ত হবার জন্য উন্মুখ ছিলেন। এমতাবস্থায় বাংলার শাসক মামুদ শাহ'র সাথে মিলিতভাবে জালাল খাঁ শের খাঁকে ক্ষমতাচ্যুত ও বিতাড়িত করার প্রস্তুতি নেন। সুরজগড় বা কিউলের যুদ্ধে (১৫৩৩ খ্রীঃ) সব হিসেব পাল্টে দেন শের খাঁ। পরাজিত হন জালাল ও তাঁর মিত্রবাহিনী। সমগ্র বিহার করায়ত্ত হয় এক ভাগ্যান্বেষী, গৃহচ্যুত উদ্যমী সৈনিক শের খাঁর। কিন্তু এতেই সন্তুষ্ট হবার মত সামান্য মানুষ শের খাঁ ছিলেন না। তাই তিনি হাত বাড়ান বাংলার দিকে। বাংলার শাসক মামুদ শাহ সুরজগড়ের যুদ্ধেই শের খাঁর শক্তি দেখেছেন। তাই তিনি প্রচুর অর্থ এবং রাজ্যখণ্ড উপঢৌকন দিয়ে শের খাঁকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেন (১৫৩৬ খ্রীঃ)। প্রথমবার এতে সন্তুষ্ট হলেও পরের বছরই শের খাঁ আবার বাংলা আক্রমণ করে গৌড় দখল করে নেন।

শের খাঁর এহেন ক্রমোন্নতি দেখেও হুমায়ুন আগ্রাতে বিলাস-ব্যসনে মত্ত ছিলেন। কিন্তু বাংলা তাঁর করায়ত্ত হলে হুমায়ুন প্রমাদ গুণেন এবং শের খাঁকে দমন করার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন। কিন্তু তাঁর ভ্রান্ত রণনীতি, সময়ের অপব্যবহার এবং আলস্য তাঁকে কেবল অন্ধকার আবর্তেই নিক্ষেপ করে। সময়, অর্থ ও শক্তি ব্যয় করে তিনি কেবল শের খাঁ নামক আলেয়ার পিছনে দৌড়ে বেড়ান এবং শেষ পর্যন্ত চৌসা (১৫৩৯ খ্রীঃ) ও বিল্বগ্রামের যুদ্ধে (১৫৪০ খ্রীঃ) পরাজিত হয়ে প্রথমে রাজ্যচ্যুত হন এবং পরে দেশত্যাগ করে পারস্যে চলে যেতে বাধ্য হন। দিল্লীর সিংহাসনে বসেন শের খাঁ। তাঁর নতুন উপাধি হয় *'শের শাহ'*।

দিল্লীর মসনদে আফগান শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার পর শের শাহ রাজ্যসীমা বিস্তারে মন দেন। কিছুটা ইচ্ছায় এবং কিছুটা পরিস্থিতির চাপে তাঁকে বার বার রণক্ষেত্রে যেতে হয়। বাংলা, পাঞ্জাব ও গুজরাটের বিস্তীর্ণ এলাকা তাঁর অধীনে আসে। বুন্দেলখণ্ডে বিখ্যাত

কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধ করার সময় আকস্মিক এক বোমা বিস্ফোরণে মৃত্যু ঘটে শের শাহ'র (২২শে মে, ১৫৪৫ খ্রীঃ)। অবসান ঘটে এক অপরাজেয় সৈনিকের বৈচিত্র্যময় জীবনসংগ্রামের।

○ শাসনব্যবস্থা ও মূল্যায়ন ঃ

শের শাহ'র রাজনৈতিক কার্যকলাপের পরিধি মাত্র পাঁচ বছর। এই সামান্য সময়ের মধ্যে একজন ভাগ্যান্বেষী যুবক হিসেবে জীবন শুরু করে তিনি ভারত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন। বাবরও এমনি প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ভারতে মুঘল-বংশের শাসনের সূচনা করেছিলেন। কিন্তু বাবর যা পারেননি, শের শাহ তাও করেছিলেন। সেটি হলো নবগঠিত সাম্রাজ্যের জন্য একটা প্রশাসনিক পরিকাঠামো প্রবর্তন ও তাকে সচল রাখা। মধ্যযুগের স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের আদর্শবাদ শের শাহের মধ্যে পুরোমাত্রায় ছিল। তিনিও মনে করতেন, রাজা সকল ক্ষমতার উৎস। কিন্তু স্বৈরাচারতন্ত্র তাঁর কাছে স্বেচ্ছাচার হিসেবে সমাদৃত হয়নি। এখানেই তাঁর অনন্যতা। আধুনিক সভ্যতার পীঠস্থান এবং মানবতাবাদের উৎসভূমি রূপে বন্দিত ইউরোপের অধিকাংশ দেশেই যখন স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র এবং রাজার 'ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতার' মতবাদ (Divine origin of Kingship) প্রচণ্ড দাপটের সাথে অবস্থান করছে, তখন শের শাহ মধ্যযুগীয় পরিকাঠামোর মধ্যেই কিছুটা স্বাতন্ত্র্য ও উদারতার হাওয়া প্রবাহিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। ঐতিহাসিক *ঈশ্বরীপ্রসাদ* শের শাহের মধ্যে ইউরোপের অষ্টাদশ শতকের জ্ঞানদীপ্তীর পূর্বাভাস কল্পনা করতেও দ্বিধা করেননি। তিনি লিখেছেন ঃ "*ষোড়শ শতকীয় একজন শাসক যখন মধ্যযুগীয় সীমাবদ্ধতা দ্বারা আচ্ছন্ন থাকতেন, তখন শের শাহ তাঁর কাজের মধ্যে ইউরোপের অষ্টাদশ শতকের জ্ঞানদীপ্ত শাসকের বিচক্ষণতা, দৃঢ়তা ও ত্যাগের প্রকাশ ঘটান*" (*"Inspite of the Limitations which hampered a sixteenth century king in India he (Sher Shah) brought to bear upon his task the intelligence, the ability and the devotion of the enlightend despots of the eighteenth century in Europe."*)। এই বক্তব্যের মধ্যে হয়তো আবেগের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যাবে। কিন্তু সময়ের বিচারে শের শাহ যে উদারতা দেখিয়েছেন তাতে কিছুটা আবেগাপ্লুত হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

ডঃ কে. কে. কানুনগো শের শাহকে আফগানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ 'প্রশাসনিক ও সামরিক প্রতিভার' অধিকারী বলে উল্লেখ করেছেন। আফগান সর্দারদের সংকীর্ণ গোষ্ঠীচিন্তা শের শাহ'র মনে স্থান পায়নি। ধর্ম বা গোষ্ঠীর প্রভাবমুক্ত হয়ে জনগণের জন্য শাসন প্রবর্তন করাই ছিল শের শাহের লক্ষ্য। উলেমাদের প্রভাব তিনি সম্পূর্ণ খর্ব করতে পারেননি ঠিকই, কিন্তু প্রশাসনিক কাজে উলেমাদের নিয়ন্ত্রণ হ্রাস করার বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন। সীমিতভাবে হলেও প্রশাসনে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে যোগ্য মানুষদের স্থান দিতে তাঁর কুণ্ঠা ছিল না। অবশ্য আনুগত্যের দিকটা এক্ষেত্রে কঠোরভাবে বিচার্য হত এবং তা অস্বাভাবিক কিছুই ছিল না। কারণ তখন সিংহাসনে রাজ-অস্তিত্ব নির্ভর করত তরবারির ঝলকানির উপর, জনগণের আনুগত্য বিষয়টি ছিল অর্ধজাগ্রত বা অজাগ্রত একটি ধারণা। তাই একান্ত অনুগত ও বশংবদ কর্মচারী গোষ্ঠী দ্বারা পরিবৃত হয়ে থাকা রাজনৈতিক প্রয়োজন হিসেবেই বিবেচিত হত। ***উইলিয়াম আরস্কিন*** (W. Erskine) মন্তব্য করেছেন যে, "*শের শাহের রাজাদর্শে প্রজাসাধারণের*

স্বার্থরক্ষা রাজার অন্যতম কর্তব্য বলে বিবেচিত হত। আইনপ্রণেতা এবং নিরাপত্তার রক্ষক হিসেবে শের শাহ আকবরের পূর্ববর্তী মুসলমান শাসকদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন।"

স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করে প্রধানত শাসকের সদিচ্ছা ও কর্ম-প্রেরণার ওপর। শের শাহের চরিত্রে এই দু'টি গুণেরই সমাবেশ ঘটেছিল। তিনি নিজেকে প্রজাসাধারণের রক্ষক ও পালক বলে মনে করতেন। ঐতিহাসিক ক্রুক (W. Crook)-এর মতে, *"শের শাহ প্রধানত জনগণের ইচ্ছার ওপর তার সাম্রাজ্যের ভিত গড়ার উদ্যোগ নিয়েছিলেন।"* তাঁর ভাষায় : *"Sher Shah was the first who attempted to found an Indian Empire broadly based upon the people's will.....He had the genious to see that the Government must be popularised, that the king must Govern for the benefit of his subjects."*

○ শাসন সংস্কার : সমগ্র শাসনব্যবস্থা শের শাহ'র নিয়ন্ত্রণে ছিল। কেন্দ্রে শাসনকার্যে শের শাহকে সাহায্য করতেন চারজন বিশিষ্ট কর্মচারী। কেউ কেউ এদের মন্ত্রী বলে অভিহিত করেছেন। তবে প্রশাসনে শের শাহের নিয়ন্ত্রণের পরিপ্রেক্ষিতে গবেষকরা এদের মন্ত্রী না বলে অমাত্য বা সচিব বলাই অধিক যুক্তিসংগত মনে করেন। এই চারজন হলেন *দেওয়ান-ই-ওয়াজিরাত, দেওয়ান-ই-আরজ, দেওয়ান-ই-রিসালত এবং দেওয়ান-ই-ইনশা*। এঁরা যথাক্রমে অর্থ, সেনাবাহিনী, কূটনীতিক সম্পর্ক এবং সরকারি দলিল রক্ষণাবেক্ষণ ও মুসাবিদার কাজ পরিচালনা করতেন। এছাড়া কম গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী দপ্তর হিসেবে ছিল *দেওয়ান-ই-কাজা, দেওয়ান-ই-বারিদ* প্রভৃতি দপ্তর। প্রথমটি বিচারবিভাগ এবং দ্বিতীয়টি গুপ্তচর-বিভাগের কাজ পরিচালনা করত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই সকল পদাধিকারী স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন না। বস্তুত, রাজার বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি হিসেবে এঁরা রাজ-নির্দেশকে দপ্তর অনুযায়ী কার্যকরী করতেন। শের শাহ নিজেই প্রতিটি বিষয়ে খোঁজখবর এবং সিদ্ধান্ত নিতেন। এজন্য দৈনিক ১২-১৪ ঘণ্টা কাজ করতেও তিনি দ্বিধা করতেন না।

শের শাহ বিকেন্দ্রীভূত শাসনকাঠামো গড়ে তুলেছিলেন। তবে এই বিকেন্দ্রীকরণের প্রকৃতি সম্পর্কে মতভেদ আছে। ড. *কানুনগো* মনে করেন, *"শের শাহের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক বিভাগ ছিল 'সরকার', যাকে মহকুমার সাথে তুলনা করা যেতে পারে।"* কিন্তু ড. *পি. শরণ* মনে করেন : *"শের শাহের আমলে প্রদেশ-এর অস্তিত্ব ছিল।"* উপরের কোন মতটিই সম্ভবত সম্পূর্ণ ঠিক নয়। সুলতানি আমলেও প্রদেশের সমপর্যায়ভুক্ত প্রশাসনিক বিভাগ ছিল। তবে এদের আয়তন ও পরিধির মধ্যে কোন মিল ছিল না। তৎকালীন 'ইক্তা' ব্যবস্থার মধ্যে এর পূর্বাভাস লক্ষ্য করা যায়। *অধ্যাপক আর. পি. ত্রিপাঠী*'র মতে, *"শের শাহ বাংলায় যে স্বতন্ত্র শাসনরীতি চালু করেছিলেন তা প্রদেশের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল। সুবাদার শ্রেণীর কর্মচারী এর তত্ত্বাবধান করতেন এবং এর অধীনে অনেকগুলি সরকার ছিল।"* যাই হোক্ শের শাহের আমলে বাংলার শাসনব্যবস্থাকে একটি ব্যতিক্রম হিসেবে ধরা চলে। তাছাড়া এর কর্মচারী নিয়োগ-পদ্ধতি বা তাদের ক্ষমতা ও অধিকারের সীমা সম্পর্কে কোন স্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি।

মোটামুটিভাবে শের শাহের সাম্রাজ্য ৪৭টি শিক বা সরকারে বিভক্ত ছিল। সরকারের নিযুক্ত দু'জন প্রধান প্রশাসক হলেন *শিকদার-ই-শিকদারান* বা *প্রধান শিকদার* এবং *মুনসিফ-*

ই-মুনসিফান বা প্রধান মুনসিফ। এঁরা যথাক্রমে প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা এবং বিচার ও রাজস্ব শাসন-পরিচালনা করতেন। এঁদের সাহায্য করার জন্য অন্যান্য কর্মীগোষ্ঠী থাকত। প্রতিটি সরকার কয়েকটি পরগণায় বিভক্ত ছিল। এখানেও সিকদার ও মুনসিফ নামক দু'জন প্রধান পদাধিকারী ছিলেন। শিকদার ছিলেন পরগণার প্রধান প্রশাসক। আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, বিদ্রোহ দমন, সামরিক প্রয়োজনে প্রধান শিকদারকে সাহায্য করা ইত্যাদির দায়িত্ব শিকদারকে পালন করতে হত। মুনসিফ বিচারকার্য ও জমিজায়গা-সংক্রান্ত বিষয় দেখাশোনা করতেন। এছাড়া কারকুন, আমিন, কানুনগো, ফোতেদার প্রভৃতি নানা কর্মচারী ছিল। আমিনের কাজ ছিল নিরপেক্ষভাবে জমি জরিপ করা, রাজস্ব নির্ধারণ এবং তা আদায় করা। আমিনের ভূমিকাকে আচার্য *যদুনাথ সরকার* *'....an imperial between the state demanding revenue and the individual ryots paying it'* বলে বর্ণনা করেছেন। কায়েমী স্বার্থ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে শের শাহ দুই বা তিন বছর অন্তর সরকার ও পরগণার প্রধান কর্মচারীদের বদলী-নীতি প্রবর্তন করেছিলেন। প্রশাসনের সর্বনিম্ন একক ছিল গ্রাম। *খুৎ, চৌধুরী, মুকাদ্দম, পাটোয়ারী* প্রভৃতি বহু কর্মচারী গ্রামে শাসনের সাথে যুক্ত ছিল। তবে গ্রামগুলি ছিল বহুলাংশে স্বশাসিত। উপরিলিখিত কর্মচারীরা প্রধানত ভূমি-রাজস্ব আদায় ও ভূমি-সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির কাজে লিপ্ত ছিল। গ্রাম-প্রশাসনে গ্রাম-পঞ্চায়েতের বিশেষ ভূমিকা ছিল। গ্রামীণ কর্মচারীদের নিয়োগ ও পারিশ্রমিক প্রদানের দায়িত্ব গ্রাম-পঞ্চায়েতের ওপর ন্যস্ত ছিল।

⭘ রাজস্ব সংস্কার : ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কারের কাজে শের শাহ বিশেষ আন্তরিকতা ও কৃতিত্ব দেখান। সাসারামে পৈত্রিক জায়গিরের পরিচালক হিসেবে তিনি ভূমি-রাজস্ব প্রশাসন ও কৃষি-উৎপাদন ব্যবস্থার সমস্যা ও সমাধান বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। ভারতের শাসক হিসেবে তিনি সেই অভিজ্ঞতাকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। আব্বাস খান শেরওয়ানীর '*তারিখ-ই-শেরশাহী*' গ্রন্থের একটি ভাষ্য থেকে কৃষি-উৎপাদন ও কৃষকদের গুরুত্ব সম্পর্কে শের শাহের উপলব্ধির কথা অনুমান করা যায়। শের শাহ জানতেন যে 'কৃষকদের প্রচেষ্টার উপর চাষাবাদ নির্ভরশীল ; কারণ তারা (কৃষকরা) যদি দুর্বল হয় তাহলে উৎপাদন ব্যাহত হবে, কিন্তু তারা যদি সচ্ছল হয় তাহলে তারা প্রচুর উৎপাদন করবে।' জায়গিরদারের সন্তান হিসেবে জীবন শুরু করার কারণে কৃষকশ্রেণীর প্রতি তাঁর একটা সহমর্মিতা গড়ে উঠেছিল, এমন ধারণাও বাহুল্য নয়।

তিনটি মূল লক্ষ্য সামনে রেখে শের শাহ তাঁর ভূমি-রাজস্ব কর্মসূচী গড়ে তোলেন। এই তিনটি লক্ষ্য হলো—(১) কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা, (২) কৃষকদের অবস্থা সচ্ছল করা এবং (৩) ভূমি-রাজস্ব খাতে সরকারি আয় বৃদ্ধি করা। এজন্য প্রথমে তিনি আবাদযোগ্য সমস্ত জমি জরিপ করার সিদ্ধান্ত নেন। আমিন, কানুনগো, পাটোয়ারী, মুকদ্দম প্রমুখ রাজস্ব কর্মচারীদের উপর আবাদী জমির সঠিক মাপ ও ভূখণ্ডের উপর কৃষকদের সঠিক অধিকার নির্ধারণের দায়িত্ব দেন। এই কাজে তিনি সিকন্দর লোদী কর্তৃক ব্যবহৃত মাপ অনুসরণ করেন। 'সিকন্দরী গজ' (যা আধুনিক এক মিটার দৈর্ঘ্যের তিন-চতুর্থাংশ) জমির আয়তন পরিমাপের কাজে ব্যবহৃত হয়। অতঃপর জমিগুলিকে উৎপাদিকা শক্তি হিসেবে উৎকৃষ্ট, মাঝারি ও নিকৃষ্ট-এই তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রতি বিঘা জমির (৬০x৬০ বর্গগজ) বার্ষিক উৎপাদনের

গড় হিসেব করে জমির বার্ষিক মোট উৎপাদন ক্ষমতার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। এই গড় উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ তিনি রাজস্ব হিসেবে সরকারি কোষাগারে জমা দেবার নির্দেশ দেন। উৎপাদিত শস্য কিংবা নগদ অর্থে ভূমি-রাজস্ব মেটানো যেত। নগদে রাজস্ব প্রদানের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বিভিন্ন শস্যের মূল্যতালিকা কৃষকদের অনুসরণ করতে হত।

জমি ভোগ দখলের অধিকার ও সরকারি রাজস্ব প্রদানের দায়বদ্ধতার বিষয়টিকে শের শাহ আইনগত ভিত্তি দানের চেষ্টা করেন। সম্ভবত তিনিই ছিলেন মধ্যযুগে বিশ্বের প্রথম শাসক যিনি জমির উপর কৃষকের আবাদী-অধিকারটিকেও আইনগত নিরাপত্তা দিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এজন্য তিনি *'পাট্টা'* ও *'কবুলিয়ৎ'*-এর প্রচলন করেন। সরকার জমি জরিপের ভিত্তিতে কৃষকের অধীন জমির পরিমাণ, দাগ নম্বর, রায়তের নাম ইত্যাদি নথিবদ্ধ করে এবং নির্দিষ্ট জমিতে কৃষকের অধিকার স্বীকার করে নিয়ে চাষীকে একটি 'পাট্টা' (Title deed) প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। পরিবর্তে কৃষকও উক্ত জমিতে চাষাবাদ করা এবং সরকারকে ধার্য রাজস্ব প্রদান করার দায় কবুল করে একটি অঙ্গীকার পত্র বা 'কবুলিয়ৎ' (Deed of agreement) জমা দিতে বাধ্য থাকে। ভূমি-রাজস্ব ছাড়াও কৃষকদের দু'একটি অতিরিক্ত 'সেস্' দিতে বলা হয়। যেমন—'জরিবানা' বা জমি পরিমাপকের মজুরী, 'মুহসিলানা' বা রাজস্ব আদায়কারীর পারিশ্রমিক ইত্যাদি। সাধারণভাবে রাজস্বের ২.৫ শতাংশ থেকে ৫শতাংশ হারে এই সেস্ ধার্য করা হত।

শের শাহের ভূমি-রাজস্ব সংস্কারের একটি গুরুত্বপুর্ণ দিক হলো মধ্যসত্বভোগী শ্রেণীর বিলোপ। শের শাহ ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহের দায়িত্ব থেকে জমিদার, ইজারাদার প্রমুখকে রেহাই দেন এবং সরকারি কর্মচারীগণ দ্বারা সরাসরি উৎপাদকের (কৃষক) কাছ থেকে রাজস্ব সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন। বলাবাহুল্য, তাঁর এই সিদ্ধান্তের ফলে কৃষকশ্রেণী রাজস্ব সংগ্রহকারী মধ্যবর্তীদের লালসা ও নিপীড়ন থেকে মুক্তি পান। এই কারণে শের শাহকে 'ভারতে' রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত' ব্যবস্থার পথিকৃৎ বলা যায়। অবশ্য গোটা রাজ্যে রায়তওয়ারী ব্যবস্থা তিনি প্রয়োগ করেননি। সুলতান, মালব, রাজপুতানা প্রভৃতি অঞ্চলের 'ইক্‌তা'গুলি এবং সীমান্তবর্তী কিছু কিছু সামন্তশাসিত এলাকা এই নতুন বন্দোবস্ত ব্যবস্থার বাইরেই থেকে গিয়েছিল।

প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা ভ্রান্ত সরকারি সিদ্ধান্তের কারণে কৃষকের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হলে, তার ক্ষতিপূরণের দিকেও শের শাহের সতর্ক দৃষ্টি ছিল। রায়তওয়ারী ব্যবস্থায় রাজস্ব আদায়কারী সরকারি কর্মচারীদেরও অসৎ বা অত্যাচারী হয়ে পড়ার সম্ভাবনা ছিল। এ বিষয়ে শের শাহ সতেচন ছিলেন। *'তারিখ-ই-শেরশাহী'* গ্রন্থের ভাষ্য থেকে জানা যায় যে এ বিষয়ে শের শাহ মাঝে মাঝেই সরকারি কর্মীদের শতর্ক করে দিতেন। নির্ধারিত হারের অতিরিক্ত রাজস্ব সংগ্রহ করলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর শাস্তিদানের ব্যবস্থাও ছিল। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে তিনি মাঝে মাঝেই রাজস্ব-সংগ্রাহক কর্মীদের বদলী করে দিতেন। তিনি আমিন, কানুনগো প্রমুখকে কঠোর নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণের যথেষ্ট যুক্তিবাদী, উদার হওয়া আবশ্যক। কিন্তু রাজস্ব আদায়ের সময় কোনরকম শিথিলতা সহ্য করা হবে না। অবশ্য অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, যুদ্ধকালে সেনাবাহিনীর যাতায়াত ইত্যাদি কারণে উৎপাদন ব্যহত হলে শের শাহ

খাজনা মুকুব করতেন এবং যথাযথভাবে কৃষিকার্য সম্পন্ন করার জন্য কৃষকদের 'তকাভি' ঋণ দানের ব্যবস্থাও রাখেন।

রাজস্ব আদায়ের মূল দায়িত্ব পরগণাভিত্তিক ভাবে সিকদারের হাতে ন্যস্ত ছিল। এই কাজে তাকে সাহায্য করত করণিকগণ। আইনানুযায়ী ভূমি-রাজস্ব বিভাগের প্রশাসনিক খরচা রায়তদের বহন করতে হত। এজন্য তাদের জরিপ খরচা (জরিমানা) এবং রাজস্ব আদায়কারীর খরচা (মহাশিলওয়ালা) বাবদ উৎপন্ন ফসলের ৫ ভাগ আদায় দিতে হত।

শের শাহ'র ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার কয়েকটি ত্রুটির প্রতি ড. *আর পি. ত্রিপাঠী* আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যেমন—তিন শ্রেণীর জমিতে উৎপন্ন ফসলের গড় ধরে রাজস্ব নির্ধারণের ফলে প্রথম শ্রেণীর জমির কৃষকেরা লাভবান হয়েছিল, কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর, বিশেষত তৃতীয় শ্রেণীর জমির মালিকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তাছাড়া নগদ মূল্যে রাজস্ব আদায়ের জন্য ফসলের বাৎসরিক মূল্য নির্ধারণের যে দীর্ঘসূত্রী ব্যবস্থা ছিল তাতে উৎপাদক ও রাজস্ব আদায়কারী উভয়েই সমস্যার সম্মুখীন হত।

○ মুদ্রা সংস্কার ঃ শের শাহ'র আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক তথা অর্থনৈতিক সংস্কার হলো মুদ্রা ব্যবস্থার পরিবর্তন ও মানোন্নয়ন। তাঁর সিংহাসনারোহণ কালে দেশের প্রচলিত মুদ্রা-ব্যবস্থা প্রায় ছিল বিশৃঙ্খল। নানা ধরনের মুদ্রা একই সাথে প্রচলিত ছিল, মুদ্রায় ধাতুর মান স্থির ছিল না ইত্যাদি। এই ভেঙে-পড়া মুদ্রা-ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজান শের শাহ। তিনি নির্দিষ্ট হারে সোনা, রূপা ও তামার মুদ্রা চালু করেন। সোনার মুদ্রা ছিল তিন ধরনের, যথা—১৬৮.৫ গ্রেন, ১৬৭ গ্রেন এবং ১৬৬.৪ গ্রেনের। রূপার টাকার ওজন ছিল ১৮০ গ্রেন এবং এতে নিখাদ রূপার পরিমাণ ছিল ১৭৫ গ্রেন। এছাড়া ছিল বহু নতুন তামার মুদ্রা যাকে বলা হত 'দাম'। বিভিন্ন ধাতু মুদ্রার বিনিময় হারও সুনির্দিষ্ট ছিল। একটি রূপার টাকা ও তামার মুদ্রার বিনিময় হার ছিল ১.৬৪। মুদ্রা-ব্যবস্থার সংস্কার করে শের শাহ দেশের অর্থ-ব্যবস্থায় যে সচ্ছলতা আনেন তাই ভারতের ভবিষ্যৎ মুদ্রা-ব্যবস্থার রূপরেখা তৈরিতে বিশেষ সাহায্য করেছে। সমগ্র মুঘল যুগে এমনকি ভারতীয় ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের মুদ্রা-ব্যবস্থারও ভিত্তি ছিল শের শাহের মুদ্রানীতি।

○ বিচার সংস্কার ঃ শের শাহের বিচারব্যবস্থার ভিত্তি ছিল ন্যায় ও সাম্য। বিচারের ক্ষেত্রে তিনি আত্মীয়-পরিজন, অভিজাত বা উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সাথে সাধারণ নাগরিকের কোন প্রভেদ রাখতেন না। সম-অপরাধে সম দণ্ড ছিল তাঁর নীতি। সুলতান স্বয়ং আপীল বিচার নিষ্পত্তি করতেন। তাঁর পরেই ছিল প্রধান কাজীর স্থান। প্রধান কাজী আপীল বিচার নিষ্পত্তির সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বিচার-পর্বের তত্ত্বাবধান করতেন। ফৌজদারী মামলা ও দেওয়ানী মামলা যথাক্রমে সিকদার ও মুনসেফ নিষ্পত্তি করতেন। পরগণার রাজস্ব-সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তি করতেন আমিন। সামগ্রিক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং প্রজাদের ধন-সম্পত্তি ও জীবনের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য শের শাহ প্রধান শিকদার ও শিকদারদের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। গ্রামে গ্রাম-পঞ্চায়েত এবং গ্রাম-প্রধান এই দায়িত্ব পালন করতেন। সংশ্লিষ্ট কর্মচারী আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যর্থ হলে বা চুরি-ডাকাতির ঘটনা ঘটলে এবং দোষীকে ধরতে না পারলে, সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকেই শাস্তি পেতে হত। ***ফিরিস্তা*** লিখেছেন যে, *"শের শাহের আমলে পুলিশি-ব্যবস্থা*

এতই সুবিন্যস্ত ও দক্ষ ছিল যে, পর্যটক বা বণিকেরা পথের ধারে তাদের মূল্যবান দ্রব্য-সামগ্রী রেখে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে নিতে পারত।" তাঁর ভাষায় : *"Such was the public security during his reign, that travellers and merchants, depositing their property on the road side, lay down to sleep without apprehension of robbery."* ফিরিস্তার বক্তব্যে কিছুটা অতিরঞ্জন হয়তো আছে, কিন্তু এ থেকে অনুমান করা অসম্ভব নয় যে তখন আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি যথেষ্ট উন্নত ছিল।

পরিবহণ সংস্কার : ভারতে মুসলমান শাসকদের মধ্যে সম্ভবত শের শাহ ব্যাপক যোগাযোগ-ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রথম উদ্যোগ নেন। সামরিক-বাহিনীর দ্রুত চলাচল, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, গুপ্তচরদের দ্রুত সংবাদ আদান-প্রদান প্রভৃতি একাধিক উপযোগিতার দিকে লক্ষ্য রেখে শের শাহ সারা দেশব্যাপী রাস্তা-নির্মাণ কর্মসূচী নেন। তাঁর আমলে নির্মিত চারটি সুদীর্ঘ রাস্তার অন্যতম হলো—(১) বাংলাদেশের সোনার গাঁ থেকে আগ্রা হয়ে সিন্ধু পর্যন্ত বিস্তৃত সড়কটি। *সড়ক-ই-আজম'* নামে (বর্তমান গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড) অভিহিত এই রাস্তার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫০০ ক্রোশ। অন্য তিনটি রাস্তা হলো—(২) আগ্রা থেকে যোধপুর ও চিতোর, (৩) আগ্রা থেকে বুরহানপুর এবং (৪) লাহোর থেকে মুলতান পর্যন্ত প্রসারিত রাস্তা। রাস্তার পাশে নির্মিত হয়েছিল বহু সরাইখানা, যেখানে পথচারীগণ রাত্রিযাপন করতে পারত। হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা থাকত। সরাইখানাকে কেন্দ্র করে বাণিজ্যও চলত। তাছাড়া সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য '*ডাক-চৌকি*' হিসেবেও এগুলি ব্যবহৃত হত। মানবদেহে বিভিন্ন ধমনী যেমন রক্ত সঞ্চালন করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সচল রাখে, শের শাহের আমলে নির্মিত সরাইখানাগুলিও তেমনি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে শক্তিসঞ্চার করত। ঐতিহাসিক ড. *কানুনগোর* ভাষায় : *"These (Sarais) became the veritable arteries of the empire diffusing a new life among the hitherto benumbed limbs."*

সামরিক সংস্কার : তরবারির সাহায্যে লব্ধ-সাম্রাজ্যের অধীশ্বর শের শাহ সামরিক-বাহিনীর দক্ষতা ও নিয়মানুবর্তিতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন স্বাভাবিকভাবেই। এ বিষয়ে তিনি বিশেষ অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন খলজী সুলতান আলাউদ্দিনের সামরিক ব্যবস্থা দ্বারা। তবে সামরিক প্রয়োজনে সামন্তদের ওপর নির্ভর করার বিপদ সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। তাই তিনি সরাসরি নিজের অধীনে সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন। সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সেনাদের এক-একটি দলকে মজুত রেখে তিনি নিরাপত্তা-ব্যবস্থাকে নিশ্চিত করেন। এই সকল বিভাগকে বলা হত 'ফৌজ'। একজন করে ফৌজদারের অধীনে এদের রাখা হত। ঘোড়ার উপর '*দাগ*'ও '*হুলিয়া*' প্রথা তিনি অব্যাহত রাখেন। সেনানিয়োগে শের শাহ স্বয়ং হস্তক্ষেপ করতেন এবং বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার দিকে সর্বদা নজর রাখতেন। সম্ভাব্য সামরিক অভ্যুত্থান রোধ করার জন্য তিনি ফৌজদার ও সৈনিকদের মধ্যে কোনরকম ব্যক্তিগত সম্পর্ক যাতে না গড়ে ওঠে সেদিকে নজর রাখতেন। শের শাহের নিয়ন্ত্রণাধীন বাহিনীর মধ্যে ছিল প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার অশ্বারোহী, ২৫ হাজার পদাতিক, ৫ হাজার যুদ্ধ হস্তী এবং কিছু গোলন্দাজ। সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলার প্রশ্নে তিনি ছিলেন খুব কঠোর। সেনারা যুদ্ধের সময় যাতে ফসল নষ্ট না-করে সেদিকে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ছিল। শোনা যায়, কোন সৈনিক অকারণে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে

ফসল নষ্ট করলে শের শাহ তার কান কেটে এবং গলায় ঐ নষ্টকরা ফসলের বোঝা বেঁধে হেঁটে যেতে বাধ্য করতেন।

❍ মূল্যায়ন ঃ সাধারণভাবে শের শাহের শাসনব্যবস্থা ঐতিহাসিকদের প্রশংসা অর্জন করেছে। ঐতিহাসিক ***কিনি*** (Keene) মনে করেন, "*ব্রিটিশদের থেকেও শের শাহের শাসন-প্রতিভা অনেক বেশি উজ্জ্বল ছিল।*" তিনি লিখেছেন ঃ "*No government not even the British, has shown so much wisdom as did this pathan.*" ***থমসন্*** ও ***গ্যারাট*** লিখেছেন ঃ '*Few men have crowded more into the short space of five years than this able and conscientious man.*' ***ডঃ কানুনগোর*** মতে ঃ "*শের শাহের সংগঠনী-প্রতিভা সম্রাট আকবরের চেয়েও বেশি ছিল। বস্তুত, দীর্ঘস্থায়ী সুলতানি-শাসন ও মুঘল-শাসনের যোগসূত্র হিসেবে শের শাহের শাসনসংস্কার বা পরিকল্পনাগুলি নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ। একজন নিরপেক্ষ শাসকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি শাসন-পরিচালনা করতে চেয়েছিলেন। মধ্যযুগীয় সীমাবদ্ধতা তাঁকে গ্রাস করতে পারে নি।*"

তবে শের শাহের শাসনব্যবস্থার মধ্যে মৌলিকত্ব ছিল কিনা, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। ড. ***ত্রিপাঠী, ডঃ. শর্মা*** প্রমুখ মনে করেন ঃ "*শের শাহের শাসন-পরিকল্পনায় মৌলিকত্বের অভাব আছে। এঁরা মনে করেন, শের শাহ ছিলেন একজন সংস্কারক; উদ্ভাবক নয়।*" ***ডঃ ত্রিপাঠীর*** ভাষায় ঃ "*He (Sher Shah) was more a reformer than an innovator.*" একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, শের শাহ প্রবর্তিত প্রশাসনিক বিধান বা সংগঠনের মধ্যে নতুন বা মৌলিক কিছু নেই। সুলতানি আমলে প্রচলিত শাসনধারা, বিশেষত আলাউদ্দিনের শাসন-কাঠামোকেই তিনি অনুসরণ করেছেন। শের শাহের দপ্তর-বিন্যাস, বিচারব্যবস্থা ও আইনসমূহ, প্রশাসনিক বিভাগ প্রভৃতি সবই সুলতানি আমলে অন্য নামে চালু ছিল। এমনকি সুদক্ষ গুপ্তচর-ব্যবস্থা এবং ডাক-চৌকিপ্রথাও আলাউদ্দিনের আমলে ছিল। সেনাবাহিনী গঠনেও শের শাহ আলাউদ্দিনকে অনুসরণ করেছেন। '*দাগ*' ও '*হুলিয়া*' পূর্বেও ছিল। কেবল ভূমি-রাজস্ব প্রশাসনে শের শাহ কিছুটা নতুনত্বের প্রয়োগ করেছেন। অবশ্য জমি জরিপ করে রাজস্ব নির্ধারণের রীতি আলাউদ্দিনের আমলেও ছিল। তবে তখন জরিপ-ব্যবস্থায় ব্যাপকতা ছিল কম এবং রাজস্ব নির্ধারণের জন্য কেবল জমির পরিমাণ নয়, উৎপাদন-ক্ষমতাও যে বিচার করা দরকার এটা শের শাহ প্রথম উপলব্ধি ও প্রয়োগ করেন।

কেবল মৌলিকত্বের অভাব নয়, শের শাহের শাসনরীতিতে কিছু ত্রুটিও ছিল। শের শাহ সাম্রাজ্যের বিকেন্দ্রীকরণ করলেও প্রশাসনিক কর্তৃত্বের কেন্দ্রীকরণ বজায় রেখেছিলেন। কেন্দ্রেও কোন মন্ত্রীপরিষদ ছিল না, ছিল আজ্ঞাবাহক কর্মীমণ্ডলী। অর্থাৎ একটা বিশাল সাম্রাজ্য সচল রাখার জন্য যে স্বনির্ভর পরিকাঠামো দরকার, এ সত্য তিনি উপলব্ধি করেননি। তাঁর সমগ্র শাসনব্যবস্থাই আবর্তিত হত সুলতানের নির্দেশে। এর অনিবার্য ফলস্বরূপ তাঁর শাসনবিভাগগুলি এত দুর্বলভাবে গড়ে উঠেছিল যে, শের শাহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তা ভেঙে পড়ে। তাই ***ডঃ ত্রিপাঠী*** লিখেছেন ঃ ***"As a consequence of his policy the structure of the central and Provincial government became woefully weak."***

কৃতিত্ব বিচার :

শের শাহের দেহে রাজরক্ত ছিল না। তাঁর বংশের ছিল না রাজতান্ত্রিক ঐতিহ্য। সামান্য জায়গিরদারের সন্তান শের শাহ পিতা-মাতার সামান্যতম সমর্থন বা সহানুভূতি পাননি। পরন্তু বিমাতা এবং ঈর্ষান্বিত আফগান সর্দারদের অবিরাম ষড়যন্ত্র তাঁকে বিব্রত করেছে বারবার। তথাপি শুধুমাত্র অধ্যবসায়, বিচক্ষণতা আর অদম্য ইচ্ছাশক্তির দ্বারা তিনি উত্তর-ভারতের অধিপতি হতে পেরেছিলেন। তাই অধিকাংশ ঐতিহাসিক তাঁকে অনন্য কৃতিত্ব এবং কর্তৃত্বের 'প্রতীক' বলে অভিহিত করেন। পরিস্থিতির যথার্থ মূল্যায়ন এবং কূটনীতিপূর্ণ বিচক্ষণতা দ্বারা পরিস্থিতিকে স্বপক্ষে রূপান্তর করার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

পেশাদার সৈনিক শের শাহ ছিলেন না। কিন্তু সেনা অভিযানকে সফল করার কৌশল ছিল তাঁর করায়ত্ত। আফগানদের জাতীয় ঐক্য স্থাপনের মাধ্যমে মুঘলদের বিরুদ্ধে নিজশক্তিকে সংহত করার ক্ষেত্রে তাঁর উদ্যোগ ছিল। সেই উদ্যোগ ছিল উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আফগান সর্দারদের বিধ্বস্ত করার ক্ষেত্রেও। তাঁর সামরিক পরিকল্পনাসমূহ ছিল 'সাবধানতা ও উদ্যোগের' সমন্বয়ে অনন্যতামণ্ডিত। মুঘল সম্রাট হুমায়ুনের দুর্বলতা তাঁর অজানা ছিল না। তাই প্রতিপক্ষের দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে তিনি খুব সহজেই ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হন। হুমায়ুনের দুর্ভাগ্য যে, শের শাহের মত এক বিচক্ষণ ও কর্মদ্যোগী প্রতিপক্ষের সম্মুখীন তাঁকে হতে হয়েছিল।

কেবল সমরবিজয়ী নেতা নয় সাম্রাজ্যের সংগঠক হিসেবেও শের শাহ অনন্য কৃতিত্বের দাবিদার। পাঁচ বছরের সংক্ষিপ্ত কার্যকালে তিনি রাজ্যজয় ও বিদ্রোহ দমনের সঙ্গে একটি শাসনতান্ত্রিক পরিকাঠামো গড়ে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন এবং সফলও হয়েছিলেন। প্রত্যহ সূর্যোদয়ের আগে তিনি শয্যাত্যাগ করতেন এবং পুনরায় নিদ্রায় যেতেন গভীর রাতে। সমস্ত দিন করতেন অক্লান্ত পরিশ্রম। প্রশাসনের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় তাঁর নজরে থাকত। সম্ভবত কুতুবউদ্দিন আইবক থেকে ঔরঙ্গজেবের মধ্যবর্তী সময়ে কোন শাসকই প্রশাসনের নানা দিক সম্পর্কে শের শাহের মত এত গভীরভাবে সম্পর্কিত থাকতেন না। তাই *আর্সকিন* (Erskine) মন্তব্য করেছেন, *"আকবরের পূর্ববর্তী যে-কোন শাসকের তুলনায় আইনপ্রণেতা ও জনগণের অভিভাবকত্বের প্রেরণা শের শাহের মধ্যে বেশি ছিল"। ("Sher Shah had more the spirit of a legislator and a guardian of his People than any prince before Akbar.")*। শের শাহ স্বৈরাচারী হলেও তাঁর রাজ্যশাসনের আদর্শ ছিল প্রজাকল্যাণমূলক। রাজস্বব্যবস্থায় সংস্কার-সাধন করে তিনি নিঃসন্দেহে দীর্ঘকালের একটা চাহিদাপূরণের চেষ্টা করেছিলেন। জমির ব্যাপক জরিপ এবং উৎপাদিকা-শক্তি অনুযায়ী রাজস্বনির্ধারণের ব্যবস্থা থেকে যে আকবরও শিক্ষা নিয়েছিলেন একথা অস্বীকার করা যায় না। একইভাবে তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতা লক্ষ্য করা যায় মুদ্রা-সংস্কারের মধ্যে। ধাতব মুদ্রার গুণগত ও পরিমাণগত মানের মধ্যে এবং সমতাস্থাপনের মধ্যে যে মুদ্রা অর্থনীতির সাফল্য নির্ভর করে, এই উপলব্ধি তাঁর ছিল। ***ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার*** স্বীকার করছে যে, *"ভারতে ব্রিটিশ-শাসনের সময়েও শের শাহের মুদ্রানীতির প্রভাব অম্লান ছিল।" ("The reformed system of currency of Sher Shah*

lasted through out the Mughal period was maintained by the East India Company down to 1835, and is the basis of the......British Currency ....") পথঘাট নির্মাণ ও সম্প্রসারণ, সরাইখানা স্থাপন, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, সুদক্ষ পুলিশি-ব্যবস্থার প্রবর্তন, জায়গিরদারি-ব্যবস্থার সংকোচন, দীন-দরিদ্র, জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির রাজকীয় পৃষ্ঠপোষণ প্রভৃতি প্রতিটি কাজের মধ্য দিয়ে তাঁর প্রতিভার দ্যুতি প্রকাশ পেয়েছে।

শের শাহের ধর্মীয়-উদারতা সম্পর্কে কিছুটা সন্দেহের অবকাশ আছে বলে অনেকের ধারণা। ড. *কানুনগো* মনে করেন ঃ *"হিন্দুদের প্রতি শের শাহ উদারতা প্রদর্শন করতেন। বিচার বা নিয়োগের ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য করা হত না। 'ঘৃণা মিশ্রিত অত্যাচারের পরিবর্তে শ্রদ্ধাপূর্ণ স্বীকৃতি" ('not Contemptuous sufference but respectful deference')* প্রদান ছিল তাঁর হিন্দুনীতির বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ড. *রামশর্মা* মনে করেন ঃ শের শাহের মধ্যে অন্ধ ধর্মীয় আনুগত্য ছিল। গোঁড়া সুন্নি মুসলমান শের শাহ একাধিক ক্ষেত্রে ধর্মীয় গোঁড়ামির পরিচয় দিয়েছেন। যেমন রাইসিন দখল করার সময় পুরণমলের বিরুদ্ধে তিনি 'জেহাদ' ঘোষণা করে ইসলামের অনুভূতিকে উত্তেজিত করতে দ্বিধা করেননি। মাড়বারের অধিপতি মালদেবের প্রতি তাঁর আচরণও ধর্মীয় গোঁড়ামী দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল। হিন্দুদের ওপর থেকে *'জিজিয়া'* কর তুলে নেবার মত উদারতা তিনি দেখাতে পারেননি। দরবারে আফগান অভিজাতদের অতিরিক্ত প্রাধান্য অলিখিত নিয়মে পরিণত হয়েছিল। এই সকল দৃষ্টান্ত নিঃসন্দেহে শের শাহের চরিত্রকে ধর্মীয় দিক থেকে কিছুটা সংকীর্ণ করেছে। কিন্তু এই কারণে তাঁকে *'ধর্মান্ধ'* বলা যথার্থ নয়। কাশ্মীরের জয়নুল আবেদিন কিংবা মুঘল সম্রাট আকবরের মত ধর্মীয় উদারতার স্তরে হয়তো তিনি উন্নীত হতে পারেননি ; কিন্তু একথা সত্য যে ধর্মীয় গোঁড়ামী দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে তিনি রাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ করেননি। *এ. এল. শ্রীবাস্তবের* মতে, শের শাহ ইসলামকে যথার্থ মর্যাদা দেবার কাজে যেমন আগ্রহী ছিলেন, তেমনি অন্যান্য ধর্মমত ও ধর্মাবলম্বীদের নিকৃষ্ট কোন মতাদর্শ ভাবার মত মানসিক দৈন্যও তাঁর ছিল না। তাঁর পদস্থ কর্মচারী ছিলেন ব্রহ্মজিৎ গৌড়। বৈষ্ণব ধর্মমতের প্রসার তখন ঘটেছিল বিনা প্রতিরোধে। সুলতান স্বয়ং ধর্মান্ধ হলে এগুলি সম্ভব হত না। সাহিত্য এবং শিল্পে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয় শের শাহের চিন্তাধারার মধ্যে লক্ষ্য করা অসম্ভব নয়। শের শাহ সময় পেয়েছিলেন মাত্র পাঁচ বছর। একটি রাজ্য গঠন করে তাকে সুশাসন দ্বারা সুদৃঢ় ভিত্তি দেওয়ার জন্য সময়টা ছিল খুবই কম। বাবর প্রায় সমান সময় পেয়েছিলেন। কিন্তু প্রশাসন-বিষয়ক কিছুই করে যেতে পারেননি। আবার আকবর তাঁর মহত্ত্ব অর্জন করার জন্য পেয়েছিলেন দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর সময়। শের শাহের কৃতিত্বের মূল্যায়নের সময় এ দিকটা বিবেচনা করা আবশ্যিক। এই কারণেই ঐতিহাসিক *ভিনসেন্ট স্মিথ* বলেছেন যে, *"শের শাহ আরও কিছুকাল জীবিত থাকলে ভারতের ইতিহাসে হয়তো মহান মুঘলদের আবির্ভাবই অসম্ভব হয়ে পড়ত।"* তাঁর ভাষায়, *"if Sher had been spared he would have established his dynasty, and the 'Great Moguls' would not have appeared on the stage of history."*

শের শাহকে মহান মুঘল সম্রাট আকবরের সাথে তুলনা করার একটা প্রবণতা ইতিহাসে লক্ষ্য করা যায়। শের শাহকে আকবরের পথপ্রদর্শক বলে অভিহিত করা হয়। ড. *কানুনগো*

(Qanungo) তাঁর 'Sher Shah' শীর্ষক গ্রন্থে আরো একধাপ এগিয়ে শের শাহকে 'আকবরের চেয়েও অগ্রণী সাংগঠনিক প্রতিভা ও জাতীয় রাষ্ট্রের স্রষ্টা' বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু উভয়ের তুলনামূলক মূল্যায়ন করার সময় যথেষ্ট সাবধান থাকা উচিত। শের শাহ-কৃত রাজস্ব-ব্যবস্থা মুদ্রানীতি ইত্যাদির প্রভাব আকবরের শাসনকার্যে প্রতিফলিত হতে অবশ্যই দেখা যায়। কিন্তু মনে রাখা দরকার, আকবরের সংস্কারগুলির মধ্যে যথেষ্ট মৌলিকত্ব ছিল। অনন্য সৃজনীপ্রতিভার অধিকারী আকবরের ব্যবস্থাগুলি ছিল গতানুগতিকতামুক্ত, প্রাণবন্ত এবং সুদূরপ্রসারী। কিন্তু শের শাহের ব্যবস্থাগুলির অধিকাংশই ছিল আলাউদ্দিন খলজী-কৃত ব্যবস্থার নতুন সংস্কারণ মাত্র। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, শের শাহ কেন্দ্রীয় শাসন সংগঠনে কোন মৌলিক পরিবর্তন আনেননি। তিনি দিল্লী-সুলতানির আমলে প্রচলিত পারসিক শাসন ধারাকেই হুবহু বলবৎ রেখেছিলেন। শের শাহ সংগঠিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীপরিষদ কিংবা প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর সৃষ্টি করে দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভার মাধ্যমে শাসন পরিচালনার কোন ধারার উদ্ভাবম করেননি। কিন্তু আকবর বা শিবাজী এক ধরনের মন্ত্রীসভা গঠন করে কেন্দ্রীয় শাসনকে গতিশীল করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। শাসন-ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণের ক্ষেত্রেও শের শাহ গঠনমূলক ও মৌলিকত্বের পরিচয় রাখেননি। স্থানীয় উপ-শাসন বিভাগ কিংবা ভূমি-সংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকার মূল ভিত্তি হল ভারতের পূর্ব-প্রচলিত ব্যবস্থাবলী। প্রচলিত ব্যবস্থাকেই তিনি কিছুটা পরিবর্তন করে গ্রহণ করেছেন। অনুরূপভাবে তাঁর সামরিক সংস্কার, যেমন—দাগ ও 'চেহরা' প্রথার প্রবর্তন, অনেক আগেই আলাউদ্দিন খলজীর আমলে প্রচলিত ছিল। শের শাহ কোন অর্থেই ভারতের জাতীয় শাসকের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেননি। খুব বেশি হলে তিনি ছিলেন আফগানদের জাতীয় নেতা। জাতিগত ভাবে আফগানদের প্রতি তাঁর দুর্বলতা ছিল ; ধর্মগতভাবে সুন্নি-মুসলমানদের প্রতি। তবে তাঁর এই মানসিকতার নির্লজ্জ প্রকাশ কখনো ঘটেনি। আকবরের উদারতা ছিল আদর্শভিত্তিক, কিন্তু শের শাহ উদারতাকে বরণ করেছিলেন প্রয়োজনবোধ থেকে। তাই বলা চলে, *"শের শাহ ছিলেন মধ্যযুগীয় সুলতানদের শেষ প্রতিনিধি ; কিন্তু আকবর ছিলেন আধুনিক ধারার প্রথম সৈনিক এবং ভারতের প্রথম জাতীয় শাসক।"*

সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও শের শাহ'কে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান বলতে কুণ্ঠিত হবার কারণ নেই। মধ্যযুগীয় সামাজিক ও ধর্মীয় বাধ্যবাধকতার মধ্যে তিনি যে উদারতা ও নৈপুণ্য দেখিয়েছেন তা অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য। আকবরের সমতূল্য প্রশাসনিক উদ্ভাবনী প্রতিভা না থাকলেও, শের শাহ প্রকৃত অর্থেই ছিলেন সুপ্রশাসক। তাঁর চরিত্রের সহজাত গুণাবলীর দ্বারা প্রচলিত শাসনকাঠামো ও ব্যবস্থাকে গতিশীল ও কল্যাণমুখী করে তোলার কাজে তিনি অবশ্যই সফল ছিলেন। অধ্যাপক *জে. এন. চৌধুরীর* ভাষায় বলা যায় : *"জনগণের প্রতি তাঁর ভালবাসা ও সহানুভূতি, কৃষকদের স্বার্থ সম্পর্কে সতর্ক দৃষ্টি, উদার দৃষ্টিভঙ্গি, নিরপেক্ষ বিচার-চেতনা, অক্লান্ত পরিশ্রম, কর্তব্যে নিষ্ঠা এবং সর্বোপরি গঠনমূলক রাষ্ট্রপ্রজ্ঞা প্রভৃতির নানা দিক বিবেচনা করে তাঁকে পূর্বসূরিদের থেকে অনেক ওপরে এবং আকবরের ঠিক পরেই স্থান দেওয়া উচিত।"* (*"Considering from different aspects his love and sympathy for his subjects, care for peasantry, liberal outlook, sense of even handed justice, inde-*

fatigable industry, devotion to duty, above all his Constructive statesmanship, he must be accorded a position much ahead of his predecessors in medieval India and next only to that of Akbar.") ।

○ বাবর ও আকবরের যোগসূত্র ঃ

মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর এবং শ্রেষ্ঠ মুঘল সম্রাট আকবরের যোগসূত্র হিসেবে শের শাহের নাম উচ্চারিত হয়। এই প্রসঙ্গে জনৈক ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন যে, *"শের শাহের জীবন বাবরের মত আকর্ষণীয় এবং আকবরের থেকে কম শিক্ষণীয় ছিল না।"* এই মন্তব্য বহুলাংশে সত্য। বাবরের মতই শের শাহ ছিলেন ভাগ্যান্বেষী সৈনিক মাত্র। বাবরের মতই তিনি বার বার আত্মীয়-পরিজনদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হয়েছেন। উত্তরাধিকার সূত্রে এঁরা কেউই রাজপদ পাননি। জীবনে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য এঁরা দু'জনেই উদ্যোগ ও শ্রম ব্যয় করেছেন অকাতরে। উভয়েরই মনোবল ছিল অসীম। বার বার ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে বঞ্চিত হলেও ভেঙে না পড়ে, পুনরায় নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন হারানো জমি উদ্ধারের সংগ্রামে। বাবরের বাল্যজীবন, আত্মীয়বর্গের বিরূপতা, কঠোর জীবনসংগ্রাম, অদম্য ইচ্ছাশক্তি, ইচ্ছাপূরণের জন্য নিরলস প্রচেষ্টা ইত্যাদির সাথে শের খাঁ'র জীবনচক্রের আশ্চর্য মিল লক্ষ্য করা যায়। প্রাথমিক জীবনে মুঘল বীর বাবর এবং আফগান যুবক শের খাঁ কেউই ভাগ্যদেবীর আনুকূল্য পাননি। পৈত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত, আত্মীয়-পরিজনদের ষড়যন্ত্রে বিব্রত বাবর একটু প্রতিষ্ঠার জন্য, সামান্য রাজনৈতিক আশ্রয়ের জন্য সমরখন্দ থেকে কাবুল পর্যন্ত যেভাবে ছোটাছুটি করেছেন, শের খাঁর জীবন ছিল যেন সেই অস্থিরতার প্রতিচ্ছবি। সাসারাম থেকে বিহার কোথাও তিনি স্থায়ী আশ্রয় পাননি। তাঁর উদ্যম ও অধ্যাবসায় প্রতিক্ষেত্রেই তাঁর শত্রুর সংখ্যাই বৃদ্ধি করেছে। বাবর তাঁর পিতৃভূমিতে উজবেক্ সর্দারদের দ্বারা যেভাবে উত্তক্ত হয়েছেন, ঠিক তেমনি ভাবে বিহারে লোহানী সর্দাররা শের খাঁকে বার বার অনিশ্চিত জীবনে ঝাঁপ দিতে বাধ্য করেছেন। এমনকি বাবরও শের শাহের সাফল্য অর্জন এবং ক্ষমতার শীর্ষে অধিষ্ঠানের সময়কালের মধ্যেও অদ্ভুত মিল দেখা যায়। উভয়েই সিংহসন দখল করেছিলেন এবং উভয়ের কার্যকালের মেয়াদ ছিল মাত্র পাঁচ বছর। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত রাজত্বকাল উভয়ের ক্ষেত্রেই ছিল অস্থিরতায় ভরা। বাবর সিংহাসনে আরোহণের পরেও তার স্থায়িত্ব সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে পারেননি। আফগান ও রাজপুত জাতির নিরন্তর বিরোধিতা তাঁকে বারবার যুদ্ধক্ষেত্রে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। একইভাবে শের শাহ সিংহাসনে আরোহণ করার পরেও মুঘলের সাথে যুদ্ধে নেমেছেন। সদা বিব্রত থেকেছেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী আফগান অভিজাতদের ষড়যন্ত্রে। তবে দুজনেই আগত সমস্যার মোকাবিলা করেছেন অতি দক্ষতা ও সাফল্যের সাথে। প্রতিটি রাজতন্ত্র-বিরোধী প্রয়াসের মূলোচ্ছেদ ঘটেছে এই মুঘল ও আফগান যুবকের ব্যক্তিগত দক্ষতার মাধ্যমে। জীবনে প্রতিষ্ঠালাভের পথে বহুমুখী বাধা-বিঘ্ন এবং সেই সকল বাধা অতিক্রম করার জন্য কঠোর এবং অনিশ্চিত সংগ্রামের প্রেক্ষিতে শের শাহের জীবনকে বাবরের জীবনের মতই আকর্ষণীয় বলা চলে।

বাবরের মত আকর্ষণীয় জীবনধারার বাহক শের শাহ-র শাসনতান্ত্রিক প্রতিভা, মানবিকতাবোধ, উদারতা, রাজাদর্শ ইত্যাদি আকবরের মতই ছিল শিক্ষণীয়। বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের দীর্ঘ

ঐতিহ্য শের শাহ'র ছিল না। কিন্তু মধ্যযুগের সীমাবদ্ধতা ও সংকীর্ণতা অতিক্রম এক আন্তরিক প্রয়াস তাঁর প্রতিটি কাজের মধ্যে পরিস্ফুটিত হয়েছে। যে মহান রাজাদর্শ প্রয়োগ করে আকবর ভারত তথা বিশ্ব ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন ; তার বহুল প্রকাশ শের শাহর কর্মধারার মধ্যে খুঁজে পাওয়া সম্ভব। আকবর তাঁর চিন্তা-চেতনার প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠার জন্য পাঁচ দশক সময় পেয়েছিলেন। কিন্তু শের শাহ পেয়েছিলেন মাত্র পাঁচ বছর সময়। এই সংক্ষিপ্ত শাসনকালেও তিনি রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতিটি ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী ক্ষমতার স্বাক্ষর রেখে যেতে সক্ষম হয়েছেন। এদিক থেকে শের শাহ যথার্থই ছিলেন আকবরের যোগ্য পূর্বসূরি। রাজ-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর শেব শাহ তাঁর শাসন-প্রতিভার প্রকাশ ঘটান। বহু ভাষা ও ধর্ম অধ্যুষিত ভারতবর্ষের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলে রাখার জন্য যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োজন, তা শের শাহের ছিল। মধ্যযুগীয় শাসক হলেও তাঁর চিন্তাধারার মধ্যে আধুনিক যুগের উদারতাবাদের প্রভাব দেখা যায়। এই কারণে তাঁর কর্মপ্রণালীকে আকবরের কর্মপ্রণালীর মতই শিক্ষণীয় বলে মন্তব্য করা হয়। শের শাহ আকবরের মতই ধর্মীয় সংকীর্ণতা-মুক্ত মনে প্রজাসাধারণের কল্যাণসাধনকেই তাঁর রাজতান্ত্রিক আদর্শ রূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর শাসন-প্রণালীর ধারা ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে এই সত্য অনুধাবন করা যায়। আইনের শাসন (Rule of law) প্রতিষ্ঠায় তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ প্রসঙ্গে বিদেশী ঐতিহাসিকেরাও ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। স্বৈরতান্ত্রিক অধিকার অক্ষুণ্ণ রেখে শের শাহ প্রজাবর্গের সার্বিক কল্যাণবিধানের যে কর্মসূচী গ্রহণ ও রূপায়িত করেছিলেন, তা খুব স্বাভাবিক ভাবেই মহামতি আকবরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এমনকি বহু ক্ষেত্রে আকবরও শের শাহ অনুসৃত ব্যবস্থাকে পরিমার্জন বা পরিবর্তন করে গ্রহণ করেছিলেন। কেবল ভারতবর্ষ নয়, বিশ্বের অন্যান্য দেশ, এমনকি ইউরোপেও সেকালে যে রাজনৈতিক আদর্শ প্রচলিত ছিল, তার তুলনায় শের শাহের রাজাদর্শ ছিল বেশি উদার, সর্বজনীন এবং গ্রহণযোগ্য। অবশ্যই পরবর্তীকালে সম্রাট আকবর আরো বেশি উদার বা কার্যকরী শাসন সংস্কার প্রবর্তন করেছিলেন। কিন্তু শের শাহ মাত্র পাঁচ বছর সময়কালে ভারতের রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে যে উদারতার হাওয়া প্রবাহিত করেছিলেন, তা কম শিক্ষণীয় নয়। হয়তো আকবরের মত মৌলিকত্ব শের শাহের রাজাদর্শে ছিল না, তথাপি তাঁর আন্তরিকতা ও নীতির গ্রহণযোগ্যতা অবশ্যই তাঁকে ভারতের রাজনৈতিক দর্শনের বিকাশের ধারায় একটি দিকচিহ্ন হিসেবে অমর করে রাখবে।

○ শের শাহের উত্তরাধিকারীগণ ঃ

রাজত্বরক্ষার জন্য রাজতান্ত্রিক ঐতিহ্য যে কত জরুরী তা বোঝা যায়, শের শাহের মৃত্যুর পর তাঁর প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের দুর্দশা দেখে। যে শের শাহকে 'মহান আকবরের পূর্বসূরি' বলা হয়, তাঁর বংশধরদের মধ্যে এমন একজনও ছিল না—যে অন্তত কিছুকালের জন্যও তাঁর সৃষ্টিকে রক্ষা করতে সক্ষম। শের শাহের মৃত্যুর পর তাঁর দ্বিতীয় পুত্র জালাল খাঁ *'সলীম শাহ'* উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন ; তখন সারা রাজ্য জুড়েই চলছিল বিশৃঙ্খলা এবং ক্ষমতাদখলের জন্য বিভিন্ন আফগান সর্দারদের মধ্যে ষড়যন্ত্র ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তাই জালাল খাঁ খুব কঠোর হাতেই সন্দেহভাজন আফগানদের দমন করতে থাকেন। তাঁর মধ্যে সাফল্যের সম্ভাবনা কিছুটা

প্রতিভাত হচ্ছিল। কিন্তু ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বরে তিনি অকস্মাৎ মারা যান। সিংহাসনে বসেন তাঁর পুত্র ফিরোজ খান। মাতুল মুবারিজ খান প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নাবালক ভাগিনেয়কে হত্যা করে সিংহাসন দখল করে নেন। মুবারিজ উপাধি নেন ***'মহম্মদ আদিল শাহ'।*** শাসক হিসেবে ইনি ছিলেন সম্পূর্ণ অপদার্থ। সাধারণ মানুষ একে 'অন্ধ' বা 'মূর্খ' ছাড়া কিছুই ভাবতে পারত না। অবশ্য তাঁর বিচক্ষণ ও কর্মঠ হিন্দু-মন্ত্রী হিমু রাজ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য বেশ কয়েকটি ইতিবাচক পদক্ষেপ নেন। কিন্তু মুবারিজের সন্দিগ্ধচিত্ততার জন্য হিমুও নিষ্ক্রিয় হয়ে যান। রাজ্যের সর্বত্র বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এই সুযোগে আদিল শাহ'র জ্ঞাতিভ্রাতা ইব্রাহিম খান দিল্লী ও আগ্রা দখল করে নেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই অপর ভ্রাতা সিকন্দর শূর সিন্ধু ও গঙ্গার মধ্যবর্তী সমগ্র ভূভাগ দখল করে নেন। আফগানদের অন্তর্দ্বন্দ্বজনিত বিশৃঙ্খলার সুযোগ নেন রাজ্য বিতাড়িত মুঘল সন্তান হুমায়ুন। শিকন্দর শূর'কে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে হুমায়ুন আবার দিল্লী দখল করেন (১৫৫৫ খ্রীঃ) এবং মুঘলশাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। শের শাহ মাত্র পাঁচ বছর শ্রমে যে গৌরবমণ্ডিত আফগান শাসনের সূচনা করেছিলেন, অযোগ্য উত্তরাধিকারীদের হাতে তা চরম অগৌরবের সাথে ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে মুছে যায়।

○ বাবর (১৫২৬-'৩০ খ্রীঃ) ঃ

ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা জহিরুদ্দিন মহম্মদ বাবর-এর শরীরে এই দুই বিখ্যাত যোদ্ধার রক্ত প্রবাহিত ছিল। পিতার দিক থেকে বাবর ছিলেন তৈমুর লঙ্গের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ এবং মাতার দিক থেকে ছিলেন চেঙ্গিজ খাঁর অধস্তন চতুর্দশ পুরুষ। বাবরের পিতা ওমর শেখ মীর্জা ছিলেন মধ্য-এশিয়ার ক্ষুদ্র রাজ্য ফারগানার শাসক। পিতার দিক থেকে বাবর ছিলেন তুর্কী। তাই তাঁর প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের নাম তুর্কী-সাম্রাজ্য হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু তিনি মাতার সূত্রে মোঙ্গল রক্ত ধারণ করেছিলেন এবং সেই নামেই নিজের বংশ-পরিচয় দিয়েছিলেন। অবশ্য 'মোঙ্গল' নামের পরিবর্তে তিনি *'মুঘল'* বা *'মোগল'* নামটি ব্যবহার করেন। যাই হোক, চেঙ্গিজ এবং তৈমুর দু'জনেই ছিলেন বীর এবং দু'জনেই যথাক্রমে ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে ভারত আক্রমণ করেছিলেন। অবশ্য সেই আক্রমণের কোন স্থায়ী রাজনৈতিক প্রভাব ছিল না। কিন্তু তাদের বংশধরদের মনে এর যথেষ্ট প্রভাব ছিল। এই সূত্রেই সম্ভবত ***বাবর*** তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছিলেন ঃ *"আমার হৃদয়ে সর্বদাই হিন্দুস্থানের উপর কর্তৃত্বের কথা জাগরুক ছিল। ....আমি এগুলিকে নিজরাজ্য বলেই মনে করি এবং শান্তি বা যুদ্ধ যে পথেই হোক এইসব স্থান দখলের ইচ্ছা করি"* (*'As it was always in my heart to possess Hindusthan, and as these several countries—, I pictured them as my own and was resolved to get them to my hands whether peacefully or by force.'*)।

○ মুঘল আফগান দ্বন্দ্ব ঃ মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের আমলেই দিল্লী-সুলতানির দুর্বলতা প্রকট হয়ে উঠেছিল। অতঃপর সৈয়দ ও লোদী বংশের শাসনাধীনে সুলতানি সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত পতন ছিল সময়ের অপেক্ষামাত্র। তৈমুর লঙ্গ-এর বিধ্বংসী আক্রমণ ভারতের কেন্দ্রীয় প্রশাসনকে ও অর্থব্যবস্থাকে যেভাবে আঘাত করেছিল, তাকে পুনরুদ্ধার করা পরবর্তী শাসকের পক্ষে সম্ভব হয়নি। সৈয়দবংশ (১৪১৪-'০৫ খ্রীঃ) সুলতানি সিংহাসনে বসলে শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারের একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সৈয়দবংশীয় চারজন শাসকই ছিলেন অযোগ্য। আঞ্চলিক শাসক বা প্রাদেশিক গভর্নর হিসেবে হয়তো তাঁর যোগ্য ছিলেন, কিন্তু সুলতানি সিংহাসনে বসে ভারতব্যাপী শাসন পরিচালনার দক্ষতা তাঁদের আদৌ ছিল না। এঁদের কেউ কেউ প্রাক্তন

সুলতানদের 'আণুবীক্ষণিক প্রতিনিধি' বলে অভিহিত করেছেন। সৈয়দবংশীয় শেষ প্রতিনিধি আলাউদ্দিন আলম শাহ-এর আমলে সুলতানির ভৌগোলিক সংকীর্ণতা প্রসঙ্গে জনৈক সমকালীন কবি ব্যঙ্গভরে লিখেছিলেন—

'শাহানশাহী শাহ্ আলম
উস্ দিল্লী তা পালাম'

কার্যতই তখন সুলতানি সাম্রাজ্যের পরিধি দিল্লী ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। আফগান-লোদীবংশের প্রতিষ্ঠার ফলে আবার একটা ঘুরে দাঁড়ানোর সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। বিশেষ করে বহলুল লোদী (১৪৫১-'৮৯ খ্রীঃ) এবং শিকন্দর লোদী (১৪৮৯-১৫১৭ খ্রীঃ) আপাতদক্ষ শাসনব্যবস্থা কায়েম করে একটা আশার আলো দেখিয়েছিলেন। কিন্তু ***ড. কে. এস. লাল*** (K. S. Lal) এর ভাষায় ঃ *"তা ছিল নিভন্ত প্রদীপের শেষ অস্থির কম্পন" ("the last flicker of the dying lamp.")।* আফগানদের সামন্ততান্ত্রিক উপজাতীয় শাসন এবং আফগান সর্দারদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বাতন্ত্র্যবোধ ঐক্যবদ্ধ ও বিস্তৃত ভারত সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার পক্ষে আদৌ উপযুক্ত ছিল না। বাবরের আক্রমণের প্রাক্কালে দিল্লীর সুলতান ছিলেন আফগান বংশীয় ***ইব্রাহিম লোদী*** (১৫১৭-'২৬ খ্রীঃ)। তিনি ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী, জেদী, ধৈর্যহীন এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞাবর্জিত শাসক। স্বভাবতই তাঁর আমলে বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তিগুলি দ্রুত মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। আফগান আমীররাই ইব্রাহিমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। লোদী রাজ্যের বাইরে মুলতান, সিন্ধু, গুজরাট, মালব, বাংলা প্রভৃতি অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল কয়েকটি ছোট ছোট মুসলিম রাজ্য। দক্ষিণ ভারতের রাজনীতি জটিল হয়ে উঠেছিল বাহমণী-রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের উপর গড়ে ওঠা পাঁচটি রাজ্যের (বেরার, বিদর, বিজাপুর, আহমদনগর ও গোলকুণ্ডা) অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে। উত্তর-ভারতের রাজস্থান, পূর্বে উড়িষ্যা এবং সুদূর দক্ষিণে বিজয়নগরে অধিষ্ঠিত ছিল হিন্দু রাজ্য। মেবারের রানা *সংগ্রাম সিংহ* (সংগ) ছিলেন যথেষ্ট শক্তিশালী এবং রাজপুতদের সংঘবদ্ধ করে তিনি দিল্লীর ক্ষমতা দখলের পরিকল্পনাও সম্ভবত করেছিলেন। সুদূর দক্ষিণে বিজয়নগরও বেশ প্রতিপত্তিশালী ছিল। কিন্তু উত্তর-ভারতের ব্যাপারে তাঁর তেমন আগ্রহ ছিল না। অর্থাৎ কোথাও অন্তর্দ্বন্দ্ব, কোথাও উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং কোথাও নিস্পৃহতা ভারতের রাজনৈতিক আকাশকে এতই জটিল, অস্থির ও ভঙ্গুর করে তুলেছিল যে, উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও সীমাহীন উদ্যমের অধিকারী বাবর সেই সুযোগ হাতছাড়া করার মত ভুল করতে পারেননি।

১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে পানিপথের যুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয়লাভের আগেও বাবর ভারতের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। বাবরের নিজের ব্যাখ্যানুযায়ী তিনি ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ভারত আক্রমণ করেন এবং বাজৌর দখল করেন। কিন্তু আবুল ফজল-এর মতে, বাবর ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযান পাঠান ১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দে। তারপর আবার ১৫০৭ খ্রীষ্টাব্দে। অর্থাৎ ভারতের বিরুদ্ধে বাবরের মোট অভিযানের সংখ্যা ছিল সাত। সম্ভবত, ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দু'বার ভারত আক্রমণ করেছিলেন। দ্বিতীয় আক্রমণকালে পেশোয়ার হয়ে শিয়ালকোট পর্যন্ত অগ্রসর হন। কিন্তু কান্দাহারের শাসক শাহবেগ আরঘন কর্তৃক কাবুল আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা দেখা দিলে, তিনি ভারত অভিযান অসমাপ্ত রেখেই ফিরে যান। এই পর্যায়ে বাবর উপলব্ধি করেন যে, কান্দাহারের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করতে পারলে কাবুলের নিরাপত্তা যেমন বৃদ্ধি পাবে তেমনি ভারত-আক্রমণও সহজ হবে। অতঃপর কয়েকটি ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর ১৫২২

খ্রীষ্টাব্দে তিনি কান্দাহার দখল করে সেখানকার শাসনভার কনিষ্ঠপুত্র মীর্জা কামরানের হাতে অর্পণ করেন।

কান্দাহার দখল করার ফলে বাবরের পক্ষে ভারত অভিযান পরিচালনা অনেক সহজ হয়ে যায়। ভারতের লোদী (আফগান) শাসকদের অন্তর্কলহ এবং দুর্বলতা বাবরের উচ্চাকাঙ্ক্ষার আগুনে ঘৃতাহুতি করে। প্রায় বারো হাজার অশ্বারোহী ও দক্ষ গোলন্দাজ বাহিনীসহ বাবর ১৫২৪-এ আবার ভারত অভিযান করেন। তাঁর পূর্বের আক্রমণকালে লাহোরের গভর্নর দৌলত খাঁ লোদী মুঘলের বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধ না গড়ে 'অপেক্ষা ও পর্যবেক্ষণ'-এর নীতি অনুসরণ করেছিলেন। এখন পেশোয়ারে বাবরের নেতৃত্বে বিশাল মুঘল বাহিনীর আগমন-সংবাদে ভীত হন। তিনি যুদ্ধের পরিবর্তে বাবরের সাথে একটা রাজনৈতিক সমঝোতায় পৌঁছাতে সচেষ্ট হন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আফগান আঞ্চলিক শাসক বা উচ্চ অভিজাতরা ইব্রাহিম লোদীর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না। এঁদের প্রত্যেকের লক্ষ্য ছিল দিল্লী-সুলতানির অবসান ঘটিয়ে স্বাধীন রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করা। এজন্য বিদেশী মুঘলের সাথে মিত্রতা করতেও এঁদের আপত্তি ছিল না। তাই তিনি অতি সাবধানতার সাথে পরিস্থিতিকে কাজে লাগাতে সচেষ্ট হন। যাই হোক, দৌলত খাঁ পাঞ্জাবের শাসক হিসেবে তাঁর স্বীকৃতির বিনিময়ে দিল্লীর বিরুদ্ধে মোঙ্গলদের সাহায্য করার প্রস্তাব দেন। একই সময়ে ইব্রাহিম লোদীর পিতৃব্য আলম খাঁ লোদীও বাবরের সাথে হাত মেলান। তবে তাঁর শর্ত ছিল মুঘলরা পাঞ্জাবের কর্তৃত্ব নিক, বিনিময়ে দিল্লীর সিংহাসনে আলম খাঁ-কে প্রতিষ্ঠিত করুক। বাবর আফগানদের অন্তর্দ্বন্দ্বকে বিচক্ষণতার সাথে নিজের কাজে নিয়োজিত করেন। পাঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল দখল করে বাবর লাহোরের দিকে অগ্রসর হন। ইতিমধ্যে ইব্রাহিম লোদীর বাহিনী লাহোর থেকে দৌলত খাঁকে বিতাড়িত করেছিল। বাবর লাহোর পুনরুদ্ধার করে পেশোয়ার-এ উপস্থিত হন। দৌলত খাঁকে বাবর জলন্ধর ও সুলতানপুরের দুটি জেলার দায়িত্ব দেন। আলম খাঁকে দেন দীপালপুরের দায়িত্ব। গোটা পাঞ্জাবের দায়িত্ব না পেয়ে দৌলত ক্ষুব্ধ হন, তবে আপাতত মিত্রভাব বজায় রেখে চলেন। তিনি বাবরকে একই সাথে পানিপথ ও রোটকের পথে দিল্লীর বিরুদ্ধে দ্বিমুখী আক্রমণ চালানোর পরামর্শ দেন। দৌলতের অভিপ্রায় ছিল দ্বিধাবিভক্ত মুঘল বাহিনীকে দিল্লীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিয়ে বাবরের শক্তি হ্রাস করা। কিন্তু দৌলতের পুত্র দিলওয়ার খাঁ এই ষড়যন্ত্র বাবরের কাছে ফাঁস করে দেন। বাবর দৌলতকে প্রাথমিক ভাবে কারারুদ্ধ করেন। তবে শীঘ্রই অনুতপ্ত দৌলতকে মুক্ত করে কেবল জলন্ধর জেলার দায়িত্ব দেন। সুলতানপুর দেন দিলওয়ারকে। ক্ষুব্ধ দৌলত তাঁর বাহিনীসহ পার্বত্য অঞ্চলে আত্মগোপন করেন। এমতাবস্থায় বাবর দিল্লীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়া অনুচিত হবে বিবেচনা করেন এবং লাহোর ও শিয়ালকোটে কিছু সেনা মোতায়েন রেখে কাবুলে ফিরে যান।

○ পানিপথের প্রথম যুদ্ধ (১৫২৬ খ্রীঃ) ঃ

১৫২৪-এর অভিযানের ব্যর্থতা এবং দৌলত খাঁর বিশ্বাসঘাতকতা বাবরকে ভারত অধিকার সম্পর্কে আরো বেশি জেদী করে তুলেছিল। তাঁর কাবুলে প্রত্যাবর্তনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দৌলত খাঁ আত্মপ্রকাশ করেন এবং জলন্ধর, দীপালপুর-সহ পাঞ্জাবের মুঘল-অধিকৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধার করে তৈমুরের বংশধরের সামনে মর্যাদা রক্ষার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন। দিলওয়ার খাঁ যথারীতি পিতার সাথে হাত মেলান। ভীত আলম খাঁ লোদী কাবুলে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন। ঘটনার অগ্রগতিতে বাবর আদৌ বিস্মিত হননি, পরন্তু তিনি এখান থেকেই তাঁর পরবর্তী কর্ম-পরিকল্পনা

সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হন। তিনি স্থির করেন প্রথমে স্বার্থান্ধ ও অবিশ্বাসী আফগান সর্দারদের দমন করা জরুরী, তারপর দিল্লী দখলের স্বপ্ন। সঙ্গে সঙ্গে বাবর আলম খাঁকে পাঞ্জাবে ফেরৎ পাঠিয়ে দেন এবং নির্দেশ দেন তিনি যেন পেশোয়ারে মোতায়েন মুঘল বাহিনীসহ দিল্লী আক্রমণের প্রস্তুতি শুরু করেন। কিন্তু আলম খাঁ ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী, ষড়যন্ত্রী কিন্তু ভীতু ও অলস। তাই দিল্লীর বিরুদ্ধে অভিযানে না গিয়ে তিনিও দৌলত খাঁর সাথে সমঝোতায় উপনীত হন। স্বভাবতই বাবর অতঃপর পাঞ্জাবের সকল আফগান অভিজাতকেই তাঁর শত্রু বলে চিহ্নিত করেন এবং চূড়ান্তভাবে মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করেন।

১৫২৫-এর নভেম্বরে বাবর আবার বিশাল বাহিনীসহ ভারতের বিরুদ্ধে অভিযানে বের হন। এটিই ছিল ভারতের বিরুদ্ধে তাঁর শেষ অভিযান। পানিপথের প্রান্তরে চূড়ান্ত বিজয় সম্পন্ন করে তিনিই ভারতের সংগঠক ও রক্ষকে পরিণত হন। বাবর বার হাজার সেনাসহ ভারতমুখে অগ্রসর হন। পরে বাদাখশান থেকে হুমায়ুন তাঁর বাহিনীসহ পিতার সাথে যোগ দেন। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল পেশোয়ারে অবস্থানরত মুঘল বাহিনী। পাঞ্জাবে উপস্থিত হয়ে প্রথমেই বাবর দৌলত খাঁকে বন্দী করেন। তবে এই বিশ্বাসঘাতককে বাবর প্রশ্নবাণে জর্জরিত করলেও কঠোর শাস্তি দেননি। অবশ্য শৃঙ্খলিত অবস্থায় বেহরা দুর্গে পাঠানোর সময় পথিমধ্যেই তিনি অসুস্থ হয়ে মারা যান। দৌলত খাঁর সমস্ত সৈনিক তাদের অস্ত্রশস্ত্র সহ বাবরের পক্ষে যোগ দেয়। আলম খাঁর ওপরেও বাবরের কোন আস্থা ছিল না। তবে পানিপথের যুদ্ধ পর্যন্ত তিনি আলম খাঁকে নিজের সাথেই রেখে দেন। পরে আলম গুজরাটে পালিয়ে সেখানকার শাসকের সাথে যোগ দিয়েছিলেন। সম্ভবত, এই সময় মেবারের রাজপুত রানা সংগ্রাম সিংহ (সঙ্গ) দিল্লীর বিরুদ্ধে অভিযানে অগ্রসর হবার জন্য বাবরের কাছে এক প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। বাবর এই বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত না নিলেও, এই আমন্ত্রণে কিছুটা উৎসাহিত অবশ্যই হয়েছিলেন। হিসার-ফিরোজে কর্মরত দিল্লীর সুলতানের প্রতিনিধি হামিদ খাঁকে পরাজিত করে (২৬শে ফেব্রুয়ারি)। হুমায়ুন মুঘল বাহিনীর কাজ অনেকটাই সহজ করে দেন। বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে এই ঘটনাকে *'শুভ লক্ষণ'* (very good omen) বলে অভিহিত করেছেন।

মুঘলবাহিনীর গতিরোধ করার জন্য ইব্রাহিম লোদী সসৈন্যে সাহাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হন। সুলতানি বাহিনীতে ছিল প্রায় একলক্ষ সেনা ও একহাজার হাতি। *ফিরিস্তার* মতে, ইব্রাহিমের সাথে একশত হাতি ছিল, একহাজার নয়। এই সংবাদে বাবরও যুদ্ধ-প্রস্তুতি শুরু করেন এবং পানিপথ থেকে যমুনা নদী পর্যন্ত প্রায় দু-তিন মাইল এলাকা জুড়ে নিজ বাহিনী মোতায়েন করেন। ১২-১৯শে এপ্রিল বাবর তার বাহিনীকে পরিকল্পনামত মোতায়েন করেন। প্রধানত তিনটি দলে বিভক্ত বাহিনীর কেন্দ্রবর্তী দলের নেতৃত্বে থাকেন বাবর স্বয়ং। দক্ষিণভাগের নেতৃত্ব দেন হুমায়ুন ও খাজা কালান। অন্যদিকে বামভাগের নেতৃত্বে থাকেন সুলতান মীর্জা ও মাহদি খাজা। হুমায়ুন পানিপথের দিক থেকে এবং সুলতান মীর্জা যমুনার দিক থেকে আক্রমণের প্রস্তুতি নেন। তবে এই যুদ্ধে বাবরের তিনটি বড় অস্ত্র ছিল তাঁর যুদ্ধ-কৌশল, গোলন্দাজ বাহিনী ও আব্দুল আজিজের নেতৃত্বাধীন সংরক্ষিত রণদক্ষ অশ্বারোহী বাহিনী।

ইতিহাসখ্যাত পানিপথের প্রান্তরে উভয় পক্ষ মুখোমুখি হয় ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে এপ্রিল। সংখ্যার বিচারে ইব্রাহিমের সৈন্য ছিল গরিষ্ঠ। যুদ্ধক্ষেত্র ছিল তাদের পরিচিত। আবহাওয়া ছিল ভারতীয় যোদ্ধাদের পক্ষে সহনীয়। তবুও যুদ্ধের পরিণতি হয় উল্টো। পরাজিত হন ইব্রাহিম। নিহত হন যুদ্ধক্ষেত্রেই। দিল্লী-আগ্রা দখল করে নিশ্চিন্ত হন বাবর। দিল্লীর মসজিদে নিজ নামে

'খুৎবা' পাঠ করেন। গ্রহণ করেন *'বাদশাহ'* উপাধি। ভারত-ইতিহাসের সূচনা ঘটে এক নতুন ও বৈচিত্র্যময় অধ্যায়ের। শুরু হয় মুঘলদের দীর্ঘ শাসন। পানিপথের যুদ্ধ ভারতের শাসক-পদে বাবরকে প্রতিষ্ঠিত করে ভারতের সার্বভৌম কর্তৃত্ব চাঘতাই তুর্কীদের হস্তগত হয়। ড. ***ঈশ্বরীপ্রসাদের*** ভাষায় ঃ *"The battle of Panipath placed the Empire of Delhi in Babur's hands.......The sovereignty of Hindusthan passed to the Chaghtai Turks."*

পানিপথের সংগ্রামে বাবরের সৈন্য ছিল সাকুল্যে ১২-১৩ হাজার। পক্ষান্তরে, ইব্রাহিম লোদীর পক্ষে ছিল প্রায় ১ লক্ষ সৈন্য এবং এক হাজার হাতি। স্বভাবতই এই যুদ্ধে ইব্রাহিমের পরাজয় যথেষ্ট বিস্ময়ের উদ্রেক করে। *ফিরিস্তার* মতে, ইব্রাহিমের হাতি ছিল একশত, এক হাজার নয়। এতদ্‌সত্ত্বেও উভয়পক্ষের শক্তির তারতম্য অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। এক্ষেত্রে বাবরের জয়লাভের কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা যায়। ***প্রথমত,*** বাবর এই যুদ্ধে এক সুনিপুণ গোলন্দাজ-বাহিনী নিয়োজিত করেছিলেন। কৌশল হিসেবে অনুসরণ করেছিলেন, *'রুমী'* পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অনুসারে তিনি বহু গো-শকট সংগ্রহ করে সম্মুখভাগে সেগুলিকে সারিবদ্ধভাবে রেখে একটি কৃত্রিম প্রাচীর তৈরি করেন। ঠিক তার পিছনে মাটির ঢিপি তৈরি করে তার উপর থেকে কামান যুদ্ধ করেন। এতে তাঁর বাহিনীর নিরাপত্তা যেমন বেশি হয়, তেমনি কামানের গোলার পাল্লা বাড়ানো যায় এবং নিশানা অব্যর্থ থাকে। ***দ্বিতীয়ত,*** বাবরের রণদক্ষতা ও পরিচালন ক্ষমতা ইব্রাহিম লোদীর তুলনায় বহুগুণ অগ্রণী ছিল। নিজ সেনাবাহিনীতে তাঁর নিয়ন্ত্রণ ছিল প্রশ্নাতীত। বাহিনী মোতায়েন করার কাজে তিনি অভূতপূর্ব পারদর্শিতা দেখিয়ে তাদের শক্তির সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। গো-শকটের আড়ালে চাকাযুক্ত মাটির ঢিপির ওপর কামান সাজিয়ে এবং বাহিনীর প্রতিটি অংশের মধ্যে দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা বজায় রেখে যে বিজ্ঞানসম্মত রণকৌশল মুঘলরা সাজিয়েছিল, তাতে জয় এসেছিল অনিবার্যভাবে। অন্যদিকে ইব্রাহিম লোদী যথেষ্ট সাহসী ছিলেন, সেনাবাহিনী ও যুদ্ধ-উপকরণও যথেষ্ট ছিল, কিন্তু পরিকল্পনার অভাব ও সচেতনতার সংকট তাঁর ব্যর্থতা এনেছিল। ***বাবর*** নিজেই বলেছেন, *"ইব্রাহিম ছিলেন একজন যুদ্ধে অনভিজ্ঞ যুবক, যার পরিকল্পনা বা দূরদর্শিতা কিছুই ছিল না।"* পরন্তু আফগান উপজাতীয় গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এবং ইব্রাহিম লোদীর অজনপ্রিয়তা দিল্লীর শক্তি হ্রাস করেছিল। বাবরের সুকৌশলী নেতৃত্ব, মুঘল-বাহিনীর শৃঙ্খলাপরায়ণতা, জয়লাভের একান্ত ইচ্ছা, আত্মকলহ এবং অসন্তোষ দীর্ণ সুলতানি-বাহিনীকে সহজেই পরাস্ত করতে সক্ষম হয়।

❂ যুদ্ধের গুরুত্ব ঃ মধ্যযুগের ভারত-ইতিহাসে পানিপথের প্রথম যুদ্ধ অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই যুদ্ধে বাবরের নেতৃত্বাধীন মুঘল বাহিনী দিল্লীর সিংহাসন থেকে লোদী বংশকে অপসারিত করে দীর্ঘ তুর্কী-আফগান সুলতানি শাসনের অবসান ঘটায়। একদিক থেকে এটি ছিল চূড়ান্ত যুদ্ধ। পানিপথের বিজয়ের পরেই দিল্লীর সিংহাসনে বাবরের নেতৃত্বে মুঘল শাসনের সূচনা ঘটে। মুঘলদের নেতৃত্বে শুরু হয় ভারত-ইতিহাসের নতুন অধ্যায়ের। এই প্রথম মুঘল সম্রাটদের নেতৃত্বে সমগ্র ভারতব্যাপী ঐক্যবদ্ধ ভারতরাষ্ট্র গঠনের প্রয়াস শুরু হয় এবং তা বহুলাংশে বাস্তবায়িতও হয়। রাজনৈতিক ঐক্য, ধর্মীয় সহনশীলতা, সাংস্কৃতিক জাগরণ ইত্যাদির মাধ্যমে ভারতে *'জাতীয় রাষ্ট্র'* গঠনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। এই যুদ্ধে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড এবং পরিণতি ইতিহাসের পাতায় 'পানিপথের প্রান্তরকে স্মরণীয়' করে রেখেছে। ***বাবর*** তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, *"আমাদের হিসাব অনুযায়ী প্রায় ২০/২১ হাজার মানুষ নিহত হয়েছিল, তবু হিন্দুস্থানের মানুষের হিসাবে এই সংখ্যা ছিল ৫০ থেকে ৬০ হাজার।"* ***বদাউনি***

লিখেছেন, "এই যুদ্ধের বহু পরেও যুদ্ধক্ষেত্রের পাশ দিয়ে গভীর রাতে অতিক্রমকালে যুদ্ধের চিৎকার ও মানুষের আর্তনাদ শোনা যায়।" ১৫৮৮-তে এই পথ দিয়ে ফতেপুর সিক্রি যাওয়ার সময় তিনি স্বয়ং এই আর্তনাদ শুনেছেন বলেও উল্লেখ করেছেন। এই বক্তব্যে হয়তো কল্পনা আছে, কিন্তু এত মানব সম্পদ ও যুদ্ধ উপকরণ বিনষ্ট হওয়ায় ভারতের প্রাণশক্তি যে দুর্বল হয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

অন্যদিকে কেউ কেউ মনে করেন, পানিপথের প্রথম যুদ্ধের তাৎক্ষণিক গুরুত্ব সম্পর্কে অতিরঞ্জন করা হয়েছে। এই যুদ্ধে নিশ্চিতভাবে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটায়নি। পানিপথের প্রথম যুদ্ধ নির্দিষ্টভাবে দুর্বল ও অবক্ষয়ী লোদীবংশের শাসন অবসিত করলেও ; ভারতের সার্বিক রাজনীতির পরিবর্তন ঘটায়নি। পলাশীর যুদ্ধে (১৭৫৭ খ্রীঃ) যেমন বাংলায় ব্রিটিশ কোম্পানির শাসনের সূচনা করেনি, তেমনি পানিপথের বিজয়ের ফলেও বাবর ভারত-সম্রাট হননি। এই যুদ্ধের ফলে লোদী-শাসনের অবসান ঘটলেও ভারতে মুঘল-শাসনের সূচনা হয়েছিল, একথা বলা চলে না। বরং বলা ভাল, দিল্লীতে মুঘল-শাসনের সূচনা হয়েছিল। ঐতিহাসিক *এস. রায়*-এর ভাষায় ঃ *"It sealed the fate of Lodi Dynasty....It did nothing, more ; it could not finally decide the fate of Hindusthan. Babur had won the throne of Delhi, but not yet the empire of Hindusthan."* ইব্রাহিম লোদী পরাজিত হলেও তখন ভারতের বহু অঞ্চলে আফগান সর্দারদের যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল এবং এদের অনেকেই দিল্লীর মসনদে বসতে আগ্রহী ছিলেন। বিহার খাঁ'র নেতৃত্বে আফগানরা প্রতি-আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। মেবারে রাজপুত শৌর্য-বীর্যের প্রতি হিসেবে তাপ বিকিরণ করছিলেন রানা সংগ্রাম সিংহ বা রানা সঙ্গ। ভারত-সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হবার স্বপ্ন তাঁরও ছিল। পানিপথের প্রথম যুদ্ধে নিশ্চিতভাবে বাবর কিংবা ভারতের ভাগ্য নির্ধারিত হয়েছিল একথা বলা যায় না। তাই ভারতে মুঘল কর্তৃত্ব সুনিশ্চিত করতে বাবরকে আবার আফগানদের সাথে যুদ্ধে নামতে হয়েছিল। এমনকি আকবরদেরও আফগান-বিরোধী পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে নামতে হয়েছিল।

○ আঞ্চলিক রাজপুত ও আফগানদের বিরোধিতা ঃ

পানিপথের যুদ্ধে সাফল্য অর্জনের অব্যবহিত পরেই বাবরের নির্দেশে হুমায়ুন ও মাহদী খাজা যথাক্রমে আগ্রাদুর্গ ও দিল্লীর ওপর মুঘলবাহিনীর দখলদারী কায়েম করেন। ২৭শে এপ্রিল মহাসমারোহে বাবর দিল্লীতে প্রবেশ করেন। রাজধানীর জনতা তাঁকে বিপুল ভাবে সম্বর্ধিত করেন। ১০ই মে বাবর আগ্রা দুর্গে প্রবেশ করেন। ইতিমধ্যে তাঁর পুত্র হুমায়ুন আগ্রা প্রাসাদ ও রাজকোষের নিয়ন্ত্রণ নিজ হাতে তুলে নিয়েছিলেন। এখন তিনি পিতা বাবরকে সমারোহের সাথে দুর্গে বরণ করেন এবং বিশ্ববিখ্যাত 'কোহিনুর মণি'-সহ বিশাল অর্থভাণ্ডার পিতার হাতে তুলে দেন। ৩২০ রতি-বিশিষ্ট কোহিনুর মণি গোয়ালিয়রের রানা বিক্রমজিতের পরিবারের কাছ থেকে দখল করেছিলেন হুমায়ুন। এই মণির মূল্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বাবর লিখেছেন যে, এর বিক্রিত অর্থে সারা বিশ্বের মানুষকে আড়াই দিন খাদ্য যোগান যেত। বাবর পুত্রের ভূমিকায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে এই হীরকখণ্ড প্রত্যাবর্তন করেন। বিজয়ী হলেও পরাজিত আফগানদের প্রতি বাবর কোনরকম প্রতিহিংসা-পরায়ণতা দেখাননি। পরন্তু ইব্রাহিম লোদীর মা-সহ পরিবারের সদস্যদের যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পুনর্বাসনের সমূহ ব্যবস্থা করে দেন। অবশ্য কিছুদিন পরে ইব্রাহিম

লোদীর মা খাদ্যে বিষ মিশিয়ে বাবরকে হত্যার একটা ষড়যন্ত্র করেছিলেন, যদিও বাবর সে-যাত্রায় রক্ষা পেয়ে যান।

আগ্রা এবং দিল্লী দখল করলেও বাবর তথা মুঘলের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব তখনো প্রশ্নহীন ছিল না। পানিপথের পরে দিল্লী-আগ্রা দখল করলেও ভারতের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে তখনো বহু স্বাধীন রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। এই সকল স্থানীয় রাজ্য লোদী বংশের প্রতি মৌখিক আনুগত্য জানালেও, আদপে এরা প্রত্যেকেই ছিলেন স্বাধীন কর্তৃত্বের অধিকারী। স্বভাবতই দিল্লীর ওপর বাবরের কর্তৃত্ব কোন অর্থেই সমগ্র ভারতের ওপর মুঘল কর্তৃত্বের প্রতীক ছিল না। পরন্তু আফগান সর্দাররা এখন উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, বাবর স্থায়িভাবে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্যই ভারতে এসেছেন। তাই প্রত্যাঘাত দ্বারা মুঘলের কর্তৃত্ব থেকে দিল্লীর কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নিতে আফগান গোষ্ঠীগুলি উদ্যোগী হয়। সম্বল, বায়না, মেওয়াট, কালপি, এটাওয়া, ধোলপুর, গোয়ালিয়র প্রভৃতি স্থানের আফগান সর্দারগণ মুঘলকে চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্য প্রস্তুতি শুরু করেছিলেন। *প্রথমত,* সম্বল, বায়না, মেওয়াট, কালপি, এটাওয়া, ধোলপুর, গোয়ালিয়র প্রভৃতি স্থানের আফগান অভিজাতবর্গ মুঘলের ওপর আঘাত হানার জন্যই প্রস্তুত হচ্ছিল। আফগান সর্দারদের ঐক্যবদ্ধ করার কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন ইব্রাহিম লোদীর ভাই মহম্মদ লোদী এবং বিহারের বিহার খাঁ প্রমুখ। *দ্বিতীয়ত,* ভারতের তপ্ত আবহাওয়া তুর্কী-সৈন্যদের সহ্য হচ্ছিল না। তাই তাদের অনেকেই স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য মত-প্রকাশ করছিল। *তৃতীয়ত,* ভারতের সাধারণ মানুষ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মুঘল কর্তৃপক্ষের সাথে অসহযোগিতা করছিল। কৃষকেরা চাষ-আবাদ বন্ধ রেখে মুঘল অধিকারমুক্ত স্থানে পালিয়ে যাচ্ছিল। *চতুর্থত,* রানা সংগ্রাম সিংহের নেতৃত্বে রাজপুত শক্তি তখনও দক্ষিণ-পূর্ব ভারতের রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করছিল। দিল্লীর ওপর বহিরাগত বাবরের স্থায়িভাবে কর্তৃত্বের সিদ্ধান্ত তাঁকে রুষ্ট করেছিল।

বহুমুখী সমস্যার সম্মুখীন হয়েও বাবর, তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আদৌ ধৈর্যচ্যুত বা হতাশ হননি। ভারতের প্রাকৃতিক পরিবেশ, অফুরন্ত সম্পদ তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। কাবুলের রুক্ষভূমি কিংবা মধ্য-এশিয়ার উত্তপ্ত রাজনীতি থেকে মুক্ত হয়ে শান্তিতে রাজত্ব চালানোর উপযুক্ত স্থান হিসেবে হিন্দুস্থান তাঁর প্রথম পছন্দের স্থানে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু মুঘল সেনানীর গৃহমুখী মন তাঁকে কিছুটা বিব্রত করেছিল। প্রথমেই তিনি নিজ অনুগামীদের মনোবল বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেন। সেনাবাহিনীর এক সভা ডেকে তিনি এক ভাষণে বলেন, *"বহু বছর কঠোর শ্রম, বহু ক্লেশ সহ্য করে এবং দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আমি এবং আমার সৈন্যরা যুদ্ধের আগুনে ঝাঁপ দিয়েছি। ঈশ্বরের দয়ায় শত্রুকে বিধ্বস্ত করে সুবিস্তৃত ভূমি লাভ করেছি। এখন এমনকি ঘটল যে আমরা এই স্থান ত্যাগ করব। কাবুলে আমাদের জন্য কি অপেক্ষা করছে কঠোর দারিদ্র্য ছাড়া!"* অতঃপর তিনি বলেন যে, কেউ যদি দেশে ফিরে যেতে চায় তাহলে তিনি তার সুব্যবস্থা করতেও দ্বিধা করবেন না। অধিকাংশ সৈনিকই তাঁর ভাষণে অভিভূত হয়ে তাঁর সাথে থাকার সিদ্ধান্ত নেয়।

○ রাজপুতদের সাথে যুদ্ধ ঃ

অতঃপর বাবর তাঁর সাম্রাজ্যের পথে বড় বাধা রাজপুতদের সাথে চূড়ান্ত বোঝাপড়ার সিদ্ধান্ত নেন। মেবারের রানা সংগ্রাম সিংহ বা সঙ্গ ছিলেন রাজপুত জাতির ঐক্য ও বীরত্বের প্রতীক। পানিপথের যুদ্ধের মতই এখানেও উভয়পক্ষের সেনাবাহিনীর সংখ্যাগত তারতম্য ছিল বিশাল। **টড** (Tod) তাঁর *'রাজস্থানের ইতিহাস'* গ্রন্থে লিখেছেন, রানা সংঘের বাহিনীতে ছিলেন সাতজন

উচ্চ পর্যায়ের স্থানীয় শাসক, ১০৪ জন সর্দার এবং ৮০ হাজার অশ্বারোহী ও ৫০০ হাতিসহ অন্যান্য সৈনিকেরা। ***রাশব্রুক উইলিয়ামের*** মতে, রাজপুত ও মুঘল-বাহিনীর অনুপাত ছিল ৭ ঃ ১। অবশ্য *ড. এ. এল. শ্রীবাস্তবের* মতে, এই অনুপাত ছিল ২ ঃ ১। ***এড্ওয়ার্ড ও গ্যেরাট*** (Edwards & Gareet) লিখেছেন *'রানা সংঘের বাহিনীকে হিন্দুসংঘ বলে উল্লেখ করা হলেও এতে অহিন্দু আফগান ও অন্যান্য কিছু মুসলিম যোদ্ধা সমবেত ছিল।"* বাবরের আত্মজীবনীর ভাষ্য থেকে জানা যায়, হাসান খাঁ মেওয়াটি তাঁর বারো হাজার অশ্বারোহী যোদ্ধাসহ রানা সঙ্গের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। সিকন্দার লোদীর পুত্র মহম্মদ খাঁ প্রায় দশ হাজার যোদ্ধাসহ রাজপুতদের পক্ষে যুদ্ধে নেমেছিলেন। একজন হিন্দু রাজার পক্ষে কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে মুসলমান অভিজাতদের যোগদান সম্ভবত ভারত-ইতিহাসের এটিই প্রথম দৃষ্টান্ত। ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ উভয় বাহিনী আগ্রার অদূরে খানুয়ার প্রান্তরে পরস্পরের মুখোমুখি হয়। এবারেও ভাগ্যদেবীর কৃপাধন্য বাবর পানিপথের মত সামান্য সৈন্য নিয়ে বিশাল রাজপুত-বাহিনীকে বিধ্বস্ত করে দেন। অধিকাংশ রাজপুত সর্দার যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ হারান। রানা সংগ্রাম কোনক্রমে পালিয়ে প্রাণরক্ষা করেন। এই যুদ্ধজয়ের পরে বাবর *'গাজী'* (Defender of Faith) উপাধি নেন। খানুয়ার যুদ্ধ রাজপুতদের মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়। পরের বছর চান্দেরীর মেদিনীরাওকে পরাজিত ক'রে এবং গুরুত্বপূর্ণ চান্দেরী দুর্গ দখল ক'রে রাজপুত প্রতিরোধের সমস্ত সম্ভাবনা তিনি শেষ করে দেন।

খানুয়ার যুদ্ধের গুরুত্ব ছিল সুদূরপ্রসারী। ঐতিহাসিক ***ঈশ্বরীপ্রসাদের*** ভাষায় ঃ *"The battle of Khanwah is one of the decissive battles of Indian history,"* ***কে. কে. দত্তও*** *মনে করেন, "এটি ছিল একটি চূড়ান্ত যুদ্ধ এবং এখানেই ভারতে মুঘলের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল।"* বস্তুত, খানুয়ার যুদ্ধের পর বিপর্যস্ত ও ছত্রভঙ্গ রাজপুত জাতি মুঘলের বিরুদ্ধে তেমন কোন প্রতিরোধ গড়ার সম্ভাবনা তৈরি করতে পারেনি। এই যুদ্ধের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করে ***রাসব্রুক উইলিয়ামস*** যথার্থই বলেছেন ঃ *"এতদিন পর্যন্ত ভারত অধিকারের প্রশ্ন ছিল বাবরের দুঃসাহসিক জীবনের একটি উপাখ্যান মাত্র ; কিন্তু এখন থেকে এই বিষয়টি ছিল তাঁর বাকী জীবনেরএকান্ত বাস্তব ও প্রধান ঘটনা"* (*'Hitherto the occupation of Hindusthan might have been looked upon as a mere episode in Babar's career of adventure, but from henceforth, it became the keynote of his activities for the remainder of his life.'*)। দিল্লী-সুলতানির অবক্ষয়ের যুগে ভারতে রাজপুতদের নেতৃত্বে হিন্দুশাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার যে সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল, খানুয়ার যুদ্ধের পর তা সম্পূর্ণভাবে অন্তর্হিত হয়। এই যুদ্ধে বাবরের জীবনের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার অবসান ঘটায়। এর পরেও তাঁকে যুদ্ধ করতে হয়েছে, কিন্তু তা অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নয়, সেই যুদ্ধ ছিল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির জন্য এবং বিদ্রোহ দমন করে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য।

○ আফগানদের মোকাবিলা ঃ

রাজপুতদের শক্তি খর্ব করার পর বাবর আফগানদের প্রতি নজর দেন। ইব্রাহিম লোদী পানিপথের প্রান্তরে পরাজিত হলেও আফগান-শক্তি একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে মাসুদ লোদী বিহার দখল করে নিজের ক্ষমতা সংহত করার পর অন্যান্য আফগান নৃপতিদের একত্রিত করে মুঘলের ওপর আক্রমণ হানার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। বাংলার

সুলতান নসরৎ শাহও মামুদ লোদীকে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দেন। বাবর কালক্ষেপ না করে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে বারাণসী, এলাহাবাদ ও চুনার দখল করে নেন। পাটনার উত্তরে গঙ্গা ও গর্গরা নদীর সঙ্গমস্থলে মামুদ লোদীর নেতৃত্বে আফগান বাহিনী ও বাবরের সংঘর্ষ হয় (৬ই মে, ১৫২৯ খ্রীঃ)। মুঘল বাহিনী খুব সহজেই জয়লাভ করে। বহু আফগান সর্দার বাবরের বশ্যতা মেনে নেন। নসরৎ শাহ বাবরের সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে সমমর্যাদার ভিত্তিতে পরস্পরের অস্তিত্ব ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান মেনে নেন। উভয়পক্ষ পরস্পরের সীমানা ও সার্বভৌমত্ব মেনে চলতে অঙ্গীকারবদ্ধ হন। একে অপরের শত্রুকে আশ্রয় বা সহায়তা না দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। রাজপুতদের পরাজিত করার পর আফগানদের পক্ষচ্ছেদ করার ফলে ভারতের আকাশ মুঘলদের উন্মুক্ত উড়ানক্ষেত্রে পরিণত হয়।

ভারতবর্ষে বাবরের কর্মকালের পরিধি মাত্র চার বছর। এই সময়কালের অধিকাংশ সময় ব্যস্ত ছিলেন যুদ্ধবিগ্রহে। একের পর এক ভারতীয় শক্তি তাঁকে প্রতিহত ও ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য এগিয়ে এসেছে। তাই শাসনতান্ত্রিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার মত যথেষ্ট সময় তিনি পাননি। তাছাড়া ভারতবাসীর আস্থা অর্জন করাও ছিল রীতিমত কঠিন একটা কাজ। তাই এদেশের প্রচলিত-ব্যবস্থার ওপর আঘাত হানার কোন চেষ্টা করেননি। এই সকল কারণে ঐতিহাসিক *আর. পি. ত্রিপাঠী* (R. P. Tripathy) বলেছেন ঃ *"বাবরের কৃতিত্বের যথার্থ বিচারের জন্য তিনি কি করতে পারেননি, তা না-দেখে, দেখা উচিত তিনি কি করতে চেয়েছেন বা করেছেন" ("It will be wrong to judge Babur's statesmanship by what he did not or rather could not do. He should be judged by what he actually did or aimed at doing.")*। বাবর তাঁর পূর্ব-পুরুষদের সাহসিকতা ও রণদক্ষতা গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তাদের নৃশংসতা বর্জন করেছেন। যাযাবর সৈনিক হিসেবে জীবন শুরু করে তিনি রাজকীয় শাসন প্রবর্তনের চেষ্টা করেছেন। এই কারণে ঐতিহাসিক ***স্ট্যানলী লেনপুল*** (S. Lanepool) বলেছেন ঃ *"Babur was the link between central Asia and India and between predatory hordes and imperial government of Asia....."* বস্তুত একদিকে তৈমুর বংশের রুদ্ররূপ আর অন্যদিকে সম্রাট আকবরের শান্ত অথচ শক্ত রাজকীয় শাসনব্যবস্থা— এই দুই বিপরীত ধারার যোগসূত্র ছিলেন বাবর। *হ্যাভেল* (Havell) যথার্থই বলেছেন, *"সব মিলিয়ে বাবর ছিলেন ইসলাম জগতের এক অতি আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব।"*

○ হুমায়ুনের আমলে (১৫৩০-'৫৬ খ্রীঃ) মুঘল-আফগান দ্বন্দ্ব ঃ

বাবরের মৃত্যুর চারদিন পরে (৩০ শে ডিসেম্বর, ১৫৩০ খ্রীঃ) তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। 'হুমায়ুন' শব্দের অর্থ *ভাগ্যবান*। কিন্তু ভাগ্যের এমন পরিহাস যে, হুমায়ুনের গোটা জীবনটাই ছিল দুর্ভাগ্যের উপাখ্যান। ঐতিহাসিক ***লেনপুল*** তাই বলেছেন ঃ *"His name means fortune and never was an unlucky sovereign more miscalled."* তবে মধ্যযুগের রাজনৈতিক জীবনে ভাগ্য নিজের কাউকে কিছু দিত না। হয়তো একালের ক্ষেত্রেও একথা সত্য, তবে তখন এটি ছিল মহাসত্য। তখন ভাগ্যকে গড়ে নিতে হত বুদ্ধি ও শক্তি দিয়ে। হুমায়ুনের জীবনে এই দুটি জিনিসেরই ছিল অভাব। তাই ভাগ্যদেবীর করুণা তিনি পাননি।

হুমায়ুনের রাজনৈতিক জীবনকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম পর্যায়ে বিস্তৃতি ছিল ১৫৩০ থেকে ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। এই দশ বছরে তিনি সিংহাসনে তাঁর অধিকার রক্ষার জন্য অনবরত যুদ্ধ করেছেন। দ্বিতীয় পর্যায়ের কালক্রম ১৫৪০ থেকে ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত।

এই সময় তিনি ছিলেন রাজ্যচ্যুত ও আশ্রয়চ্যুত একজন হতভাগ্য রাজপুরুষ। আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটে বেড়িয়েছেন ভারতের নানা প্রান্তে। শেষ পর্যন্ত ভারত ত্যাগ করে আশ্রয় নিয়েছেন পারস্যের শাহ দরবারে। ১৫৪৫ থেকে ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ছিল তাঁর জীবনের তৃতীয় পর্যায়। এই পর্যায়ে তিনি আবার নতুন করে রাজ্য পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন দেখেছেন। সংগ্রহ করেছেন সেনাবাহিনী, অর্থ ও রসদ। কাবুল, কান্দাহারকে কেন্দ্র করে রচনা করেছেন নতুন অভিযান পরিকল্পনা। আর চতুর্থ তথা শেষ পর্যায় ছিল ১৫৫৫ থেকে ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দ। এই সামান্য কাল তিনি আবার বসেছেন দিল্লীর সিংহাসনে। আংশিকভাবে হলেও পুনরুদ্ধার করেছেন পিতার হৃত সাম্রাজ্য।

সিংহাসনে আরোহণের সময় হুমায়ুনের বয়স ছিল মাত্র তেইশ। বাবর যে সাম্রাজ্য রেখে গিয়েছিলেন তার ভিত্তি ছিল খুবই দুর্বল। সিংহাসনের দাবিদার ছিল অনেক। মুঘলদের নির্দিষ্ট কোন উত্তরাধিকার আইন না-থাকার ফলে হুমায়ুনের আত্মীয়বর্গ, কিছু উচ্চাকাঙক্ষী অভিজাত এবং অন্যান্য ভারতীয় শক্তির নেতারা প্রত্যেকেই সিংহাসন দখলের জন্য লালায়িত ছিলেন। হুমায়ুনের চরিত্রে সারল্য ও কৃতজ্ঞতাবোধ ছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যরক্ষার সংগ্রামে এই দুটি মানবিক গুণ খুব বেশি কার্যকরী ছিল না। পিতার নির্দেশমত তিনি অপর তিন ভাই কামরান, আসকারি ও হিন্দালকে যথাক্রমে কাবুল-কান্দাহার, সম্বল এবং আলওয়ার প্রদান করেন। উচ্চাকাঙক্ষী কামরান তাঁর প্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি আকস্মিক প্রায় সমগ্র পাঞ্জাব দখল করে নেন। সরল হৃদয় হুমায়ুন ভাইয়ের কাজে কিন্তু কোন অন্যায় দেখতে পাননি। তিনি পাঞ্জাবের ওপর কামরানের আধিপত্য স্বীকার করে নেন। এমনকি ভাইয়ের আবদার রক্ষার্থে 'হিসার ফিরোজ' ও কামরানের হাতে তুলে দেন। এর ফলে বাবরের সুগঠিত সাম্রাজ্যের মূল অংশ, প্রচুর রাজস্ব এবং উপযুক্ত সেনাবাহিনী সংগ্রহের প্রধান অঞ্চল হুমায়ুনের হাতছাড়া হয়ে যায়। অথচ তা উপলব্ধি করার মত দূরদৃষ্টি হুমায়ুনের ছিল না।

হুমায়ুনের ভাগ্যবিপর্যয়ের প্রধান নায়ক ছিল আফগানগণ। প্রথম পানিপথ (১৫২৬ খ্রীঃ) এবং ঘর্ঘরার যুদ্ধে (১৫২৯ খ্রীঃ) মুঘলের হাতে পরাজিত হলেও আফগান-শক্তি নিঃশেষিত হয়ে যায়নি। এখন তারা উত্তর-পূর্ব ভারতে মামুদ লোদীর নেতৃত্বে দিল্লীর সিংহাসন দখলের জন্য শক্তিসংগ্রহ করেছিল। আফগান সর্দাররা মনে করত দিল্লীর সিংহাসনে বৈধ অধিকারী আফগানগণ। মুঘলরা বহিরাগত এবং জবরদখলকারী। এই মানসিকতা আফগান সর্দারদের অন্তর্দ্বন্দ্ব চাপা রেখে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস গড়তে সাহায্য করে। এছাড়া আর এক ভাগ্যান্বেষী আফগান যুবক শের খাঁ ব্যক্তিগত দক্ষতা ও অধ্যবসায় দ্বারা ইতিমধ্যেই পূর্ব-ভারতের রাজনীতিতে নিজের উজ্জ্বল উপস্থিতি ঘোষণা করেছেন। বিচ্ছিন্ন রাজপুতদের সংঘবদ্ধ করে দিল্লীর সিংহাসন দখল ছিল তাঁর চূড়ান্ত লক্ষ্য। এছাড়া হুমায়ুনের বড় বিপত্তি ছিলেন গুজরাটের শাসক বাহাদুর শাহ। বাহাদুর শাহ মালব ও গুজরাট দখল করে সমগ্র রাজপুতানার ওপর কর্তৃত্ব স্থাপনের জন্য উদ্গ্রীব ছিলেন। তাঁরও লক্ষ্য ছিল যে, আফগান-সর্দারদের জাতীয়তাবোধকে উস্কে দিয়ে তাদের সাহায্য পাওয়া এবং দিল্লীর সিংহাসন করায়ত্ত করা। শুধু তাই নয়, হুমায়ুনের শত্রুদের আশ্রয় দিয়ে তিনি ইতিমধ্যেই হুমায়ুনের সামনে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন।

এইরূপ সমস্যাসঙ্কুল পরিস্থিতিতে হুমায়ুন প্রথমে বুন্দেলখণ্ডের কালিঞ্জর দুর্গ আক্রমণ করেন। এটা তাঁর বিচক্ষণতার পরিচয়। কারণ সীমান্তে অবস্থিত এই দুর্গ নিরাপত্তার কারণে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু দুর্গাধিপতির আত্মসমর্পণে সন্তুষ্ট হয়ে হুমায়ুন সন্ধি করে আবার অস্থিরচিত্ততা ও অদূরদর্শিতার পরিচয় দেন। অতঃপর হুমায়ুন পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে জৌনপুর

আক্রমণ করে মামুদ লোদীকে শায়েস্তা করতে চান। দৌরার যুদ্ধে (১৫৩২ খ্রীঃ) পরাজিত হয়ে মামুদ পাটনা হয়ে বাংলায় পালিয়ে যান। এরপর হুমায়ুন চুনার দুর্গ আক্রমণ করে আবার বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। কিন্তু একইভাবে শের খাঁ'র চাতুরীতে বিভ্রান্ত হয়ে তাঁর সাথে সন্ধি করে নেন। এখন হুমায়ুন যদি শের খাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করতেন, তাহলে হয়তো তাঁর ও ভারতের ভাগ্য অন্য খাতে প্রবাহিত হত।

চুনার থেকে প্রত্যাবর্তন করে হুমায়ুন প্রায় দেড় বছর দিল্লীতে অলসভাবে কাটিয়ে দেন। ইতিমধ্যে গুজরাটে বাহাদুর শাহ তাঁর ক্ষমতা যথেষ্ট বৃদ্ধি করে নিয়েছেন। হুমায়ুনের অন্যতম প্রতিপক্ষ আলম খাঁ লোদী, মুহম্মদ জামান মীর্জা প্রমুখকে আশ্রয় দিয়ে তিনি হুমায়ুনকে আরও ক্ষুব্ধ করে তোলেন। এমন সময়ে বাহাদুর শাহ মেবার আক্রমণ করেন। মেবারের রাজমাতা কর্ণদেবী হুমায়ুনের সাহায্য-প্রার্থনা করলে তাঁর সামনে বাহাদুর শাহকে দমন করার সহজ সুযোগ উপস্থিত হয়। কিন্তু হুমায়ুন আবার ভুল করেন। এখন কর্ণদেবীর আহ্বানে সাড়া দিলে রাজপুতদের সাহায্যে আফগানদের শক্তি বিধ্বস্ত করা সহজ হত। কিন্তু মুসলমানের বিরুদ্ধে হিন্দুর সাহায্যে অগ্রসর হওয়া ধর্মসম্মত কিনা, এই চিন্তায় তিনি কালক্ষেপ করে মহাভুল করেন। যাই হোক, চিতোরের পতনের পর হুমায়ুন বাহাদুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং তাঁকে পরাজিত ও বিতাড়িত করে মধ্য-গুজরাট দখল করে নেন (১৫৩৫ খ্রীঃ)। কিন্তু দখলীকৃত অঞ্চলে নিজ-কর্তৃত্ব দৃঢ় করার কোন পরিকল্পনা না-নিয়ে তিনি দিল্লী ফিরে যান। ফলে এক বছরের মধ্যেই গুজরাট মুঘল-কর্তৃত্ব মুক্ত হয়ে আবার বাহাদুর শাহের হস্তগত হয়ে যায়।

ইতিমধ্যে পূর্ব-ভারতে শের খাঁ আফগান জাতির একমাত্র নেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার পথে অনেকটাই এগিয়ে গেছেন। বিহারে নিজ-কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করে তিনি বাংলার দিকে হাত বাড়িয়েছেন। প্রথমবার গৌড় অবরোধ করে (১৫৩৪ খ্রীঃ) তিনি বাংলার সুলতান মেহমুদ শাহ'র কাছ থেকে কিউল থেকে সকরিগলি পর্যন্ত প্রায় ২০ হাজার বর্গমাইল ভূখণ্ড এবং ১৫ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা লাভ করেন। কিন্তু বাংলার দুর্বল শাসন আর রাজনৈতিক গুরুত্ব তাঁকে আবার বাংলা আক্রমণে প্ররোচিত করে। ১৫৩৬ খ্রীষ্টাব্দে শের খাঁ আবার গৌড় অবরোধ করে সমগ্র বাংলাকে নিজ অধীনে আনার উদ্যোগ নেন। এবার হুমায়ুন আলস্য কাটিয়ে শের খাঁর বিরুদ্ধে অগ্রসর হবার সিদ্ধান্ত নেন। আসকারী, হিন্দাল-সহ বিরাট বাহিনী নিয়ে তিনি চুনার দুর্গ অবরোধ করেন (১৫৩৭ খ্রীঃ)। শের খাঁ গৌড়ে পালিয়ে যান। প্রায় ৬ মাস অবরোধের পর চুনার মুঘলের হস্তগত হয়। কিন্তু চুনার দখল এক বিরাট সামরিক সাফল্য হলেও, কৌশলগত দিক থেকে ছিল বিরাট ভুল (*'an admirable military triumph but a tremendous strategical blunder'*)। কারণ সোজাসুজি গৌড়ে না-গিয়ে তিনি শের খাঁ'কে ক্ষমতা সংহত করার সুযোগ দেন। ৬ মাস পর যখন তিনি গৌড় যান তখন আবার শের খাঁ বিহারে প্রত্যাবর্তন করে কনৌজ ও জৌনপুরে মুঘল কর্তৃত্বের অবসান ঘটিয়ে নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন। শেষ পর্যন্ত বক্সারের নিকটে চৌসা গ্রামে শের খাঁ ও হুমায়ুন মুখোমুখি হন (১৫৩৯ খ্রীঃ)। কিন্তু এখানেও তিনি এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত প্রায় তিনমাস অলসভাবে কাটিয়ে দেন। ফলে শের খাঁ তার সেনাবাহিনী সংগঠিত করার সুযোগ পান। দুর্ভাগ্য হুমায়ুনের যে, এই সময় বর্ষাকালীন বৃষ্টিপাত শুরু হয়ে যায়। প্রবল বর্ষায় মুঘল শিবির গঙ্গা ও কর্মনাশার জলস্ফীতির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শের খাঁ এই সুযোগ নেন। ২৫শে জুন তাঁর সেনা মোতায়েন ভেঙে দেন এবং প্রচার করে দেন যে, তিনি বিদ্রোহী উপজাতি গোষ্ঠীর নেতা মহারথ চেরোকে দমন করার জন্য বিহারের সাহাবাদ

জেলার দিকে অগ্রসর হতে ইচ্ছুক। এই সংবাদে নিশ্চিত হয়ে মুঘল বাহিনীও তাদের সেনা মোতায়েন ভেঙে বন্যার কবল থেকে মুক্ত হবার জন্য তোড়জোড় শুরু করে। আসলে শের খাঁ মুঘল বাহিনীকে মিথ্যা প্রচার দ্বারা অসতর্ক করতেই চেয়েছিলেন। মুঘলের অপ্রস্তুত অবস্থার সুযোগে তিনি গভীর রাতে মুঘলের ওপর ত্রিমুখী আক্রমণ চালান। বহু মুঘল সেনা নিহত হয়। অনেকেই গঙ্গার জলে ডুবে মৃত্যুবরণ করে। হুমায়ুন কোনক্রমে চৌসা থেকে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন। চৌসার ক্ষত নিয়ে হুমায়ুন আগ্রায় ফিরে যান।

চৌসার পরাজয় ও ক্ষয়ক্ষতি ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূলে নাড়া দিয়েছিল। কিন্তু এই সংকটকালেও হুমায়ুনের ভায়েরা অন্তর্দ্বন্দ্ব ভুলে তাঁর কাছে সমবেত হতে পারেননি। তাঁর ভ্রাতা কামরান এই সময় মুঘল বাহিনীর সর্বাধিনায়কত্ব দাবি করেন। কিন্তু তা না পেলে নিজ অনুগামী বাহিনী নিয়ে আগ্রা থেকে লাহোরে চলে যান। এদিকে শের খাঁ নিজেকে ভারত-সম্রাট ঘোষণা করে *'শের শাহ'* উপাধি গ্রহণ করেন। নিজের নামে *'খুৎবা'* পাঠ করেন। অতঃপর দিল্লী ও আগ্রা দখল করার প্রস্তুতি শুরু করেন। হুমায়ুন শের শাহকে বাধা দিতে অগ্রসর হয়ে কনৌজে উপস্থিত হন (এপ্রিল, ১৫৪০ খ্রীঃ)। শের শাহ গঙ্গার দক্ষিণতীরে তাঁর বাহিনী মোতায়েন করেন। কিন্তু এবারেও প্রবল বর্ষণে হুমায়ুনের শিবির ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই সুযোগে শের শাহ পূর্ণ শক্তি নিয়ে মুঘলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। এটিই *কনৌজ* বা *বিল্বগ্রাম*-এর যুদ্ধ নামে খ্যাত। বিভ্রান্ত মুঘলবাহিনী প্রায় বিনা প্রতিরোধে শের শাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে। হুমায়ুনের আত্মীয় ও অন্যতম সেনাপতি ***মীর্জা হায়দার*** অত্যন্ত বেদনাহত চিত্তে লিখেছেন, *"কনৌজে চাঘতাইরা একটি গুলিও বর্ষণ না করে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়েছিল।"* অবশ্য হুমায়ুন এককভাবে সাহসিকতা ও দৃঢ়তার সাথে আফগানদের মুখোমুখি হবার চেষ্টা চালান। কিন্তু এমন বিপর্যস্ত একটা বাহিনী নিয়ে তাঁর পক্ষেও কিছু করা সম্ভব ছিল না। তাই এবারেও তিনি পরাজয় মেনে নিয়ে রাজধানী আগ্রায় পালিয়ে প্রাণরক্ষার চেষ্টা করেন। কিন্তু শের শাহ পলায়মান মুঘলবাহিনীর পশ্চাৎধাবন করলে হুমায়ুন লাহোরে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। দিল্লী ও আগ্রা শের শাহর হস্তগত হয়। বাবর অনলস শ্রম দ্বারা যে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পাঁচ বছরের মধ্যেই তা আবার আফগানদের অধীনস্ত হয়।

চৌস ও কনৌজ-এ হুমায়ুনের ব্যর্থতাকে কেউ কেউ প্রকৃতির বিরূপতা ও শের শাহ-এর ষড়যন্ত্রের পরিণতি বলে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। কিন্তু প্রকৃতির উপর দোষ চাপিয়ে হুমায়ুনের দুর্বলতা বা ব্যর্থতাকে চাপা দেওয়া নিরর্থক। কারণ প্রকৃতির বিরূপতা উভয়পক্ষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল। আর রণক্ষেত্রে ষড়যন্ত্র তৎকালীন রাজনীতিতে কোন নতুন বা অন্যায্য পথ ছিল না। আসলে শের শাহ-এর সুনেতৃত্ব, কর্মদক্ষতা, দূরদৃষ্টি ইত্যাদির কাছে হুমায়ুনের আলস্য অদূরদর্শিতা, বিশৃঙ্খল বাহিনীর পরাজয় ছিল স্বাভাবিক ও অনিবার্য পরিণতি।

পরবর্তী পাঁচ বছর রাজ্যচ্যুত হুমায়ুন সামান্য একটু আশ্রয়ের সন্ধানে ঘুরে বেড়ান নানা স্থানে। ভাই কামরান আশ্রয় দিয়ে তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেন। কোনক্রমে পালিয়ে প্রাণ বাঁচান তিনি। তারপর অমরকোটের রানার আশ্রয়ে কাটান কিছুদিন। অবশেষে চলে যান পারস্যের শাহ তহমাস্পের দরবারে। এক চুক্তির মাধ্যমে তিনি তাঁর সাহায্যে দখল করেন কাবুল ও কান্দাহার (১৫৫৫ খ্রীঃ)। হত্যা করেন বেইমান ভায়েদের। এরপর একে একে দখল করেন লাহোর, আগ্রা, ও দিল্লী (১৫৫৫ খ্রীঃ)। পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় মুঘল সাম্রাজ্য। সামান্যভাবে হলেও বাবরের কষ্টার্জিত রাজ্যকে সচল দেখেই হুমায়ুন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (১৫৫৬ খ্রীঃ)।